P305 সংখ্যা-১-১২ ৫৫.3

১১শ বর্ষ | বৈশাখ, ১৩২৮ | ১ম সংখ্যা

756.2
012

বৈশাখ

(শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী)

হে নবীন, হে বন্ধু বৈশাখ !
মহাকালকুণ্ডলীর
আজি তুমি খুলিলে যে পাক
নূতন করিয়া ধরণীতে,
সে যেন প্রত্যক্ষ হয়
ভারতের অদৃষ্টগ্রন্থিতে।
উদ্দেশ্য তোমার নাহি জানি ;
তবু যেন মনে হয়,
কটি বন্ধন নিলে টানি'
লাঞ্ছিতের চিরনাগপাশে ;
ইঙ্গিত যেন
জাগরণ মুক্তাকাশে ভাসে ;
প্রখর রৌদ্রালোকে
কার যত
মিথ্যা হয়ে দেখা দেয় চোখে।

শীতের শিশিরশীর্ণ আশা—
বসন্তের বনে যাহা
পুষ্পমুখে পেয়েছিল ভাষা,
আজি হেরি, তোমার পরশে
পরিপূর্ণ ফলরূপে
ভরিয়া উঠিতে চায় রসে ;
বিমুগ্ধ মলয় অবসানে,
উষ্ণ সমীরণ
তন্দ্রাবেশে জাগরণ হানে ;
সুচিরসঞ্চিত বাষ্পরাশি,
তোমার প্রথম মেঘে
বৃষ্টিরূপে দেখা দেয় আসি ;
তপঃক্লিষ্ট তব মৃত্তিকায়
তোমারি আশীষ লভি
সিদ্ধিশস্য অঙ্কুরিতে চায়।

প্রশান্ত অথচ ভয়ঙ্কর
হে বৈশাখ, পশুপতি
শিব তুমি পিনাকী শঙ্কর !
রৌদ্রশুভ্র নগ্ন দেহ তব
সৃষ্টির আনন্দে ভরা
রুদ্রতার মূর্ত্তি অভিনব।
ধ্বক্ ধ্বক্ দীপ্ত নেত্রত্রয়,
অতীতে করিয়া ধ্বংশ
বিশ্বেরে বাঁচাও মৃত্যুঞ্জয় !
স্কন্ধে মৃতকালকল্পা সতী,
ভবিষ্যৎ অক্ষি আগে
গৌরীরূপে করিছ প্রণতি
মহাকালচরণের পরে,
প্রসন্ন হাসিতে তুমি
তাহারে বরিছ সমাদরে।

হে বান্ধব, হে শুভ বৈশাখ,
সুদীর্ঘ বৎসর অন্তে
এলে যদি, কেন মৌনবাক্ ?
তোমার ও চরণের কাছে
নীরবে ফেলিব বলে'
কত অশ্রু বুকে জমে' আছে !
হে আচার্য্য, কর উপদেশ—
বন্দীর বন্ধন কবে
স্পর্শে তব সত্য হবে শেষ ;
বঞ্চিতের সঞ্চিত বেদনা
সঙ্কল্পের দৃঢ়তায়
লভিবে সে নূতন চেতনা
পেয়ে তব অমৃতের ধারা ;
অন্তরে বাহিরে করে
মুক্ত হবে অন্ধকার কারা !

তব কাল বৈশাখীর ঝড়ে
সর্ব্ব অপরাধগ্লানি
উড়ে যাক্ শুভঙ্কর বরে
লভিয়া তোমার সংমার্জ্জনা,
অন্ধকার কোণ হ'তে
বর্জ্জনীয় যত আবর্জ্জনা।
পুঞ্জীভূত দুর্ব্বলের ভয়
তোমার মাভৈঃ মন্ত্রে
হে বীর, করিয়া যাও জয়
এবারের নব অভ্যুদয়ে,
জন্মান্ধসংস্কার যদি
ব্যথা পায় সে দৃপ্ত বিজয়ে,
তবু তারে তুচ্ছ ধূলি সম
ফুৎকারে উড়ায়ে দাও
আগন্তুক হে প্রিয় নির্ম্মম।

শিখাও নবীন কর্ম্মগীতা,
কি হবে করিয়া শোক,
নির্ব্বাপিত আজি চৈত্র-চিতা
পুরাতন বর্ষে করি গর্ত ;
শেষ করে' দিয়ে তার
ভুল ভ্রান্তি অপরাধ যত।
সেই শেষভস্ম মাখি গায়ে
এস এস হে বৈশাখ,
বীজমন্ত্র চৌদিকে ছড়ায়ে
আকাশে বাতাসে দিশে দিশে :
অণু পরমাণু হয়ে
দিকে দিকে যাক তাহা মি
তারি ফলে, হে ভাগ্যবিধাতা !
ঘরে ঘরে হোক্ খোলা
নূতন কর্ম্মের হালখা

যেন এবার একটু বাড়িতে পায় আর অন্তঃপুর
হইতে হেন হিষ্টিরিয়া বিদায় গ্রহণ করে।

দ্বিতীয়তঃ,—কিন্তু 'প্রথমতঃ' শুনিয়াই তুমি
ভীত হইয়া পড়িয়াছ মনে হইতেছে, অথচ শততা
(সতত) বলিলেও যে আমাদের বাসনা ফুরায় না।
ভয় পাইবার প্রয়োজন ছিল না, যদি একটি জিনিষ
দিতে পারিতে। দাও, আমাদের প্রেম, যাহা
তোমার ঐ নীল আকাশের মত স্থির ও ব্যাপ্ত, ঐ
ভাতের মত শান্ত ও করুণ, ঐ বাতাসের মত
ল ও স্বচ্ছ। বৃথা অনুরোধ, তুমি সে সমস্ত
দিতে আস নাই। আকাশে যে নূতন
খুলিয়াছ তাহা একটু মিষ্টিমুখ করাইবার
বৎসরের সমস্ত দেনা মিটাইয়া দিবার
ণ মাত্র। হে নববর্ষ, অতএব তোমায়

কিছুই দিতে আস নাই ; তথাপি
করিয়া পুনরায় বলি যে আমাদের
ক। প্রেম দেওয়া না দেওয়া
। তোমাকে দেখিয়া আমাদের
বিনা কারণে প্রেম উথলিয়া
াদের দেখিয়া সেরূপ প্রেম
দের অদৃষ্টের দোষ। কিন্তু
দিতে পার না ? এই
মরা বড় কষ্টে আছি।
দের সকলের মাসিক
প্রয়োজনের উপর

২৪

দিতে পার না ?

পরদিন গল্পের বাকী অংশ শুনিব
দর প্রত্যেকের
উৎকণ্ঠিত হইলাম। একটু সময় থা
আমি করিয়া
কয়েদীকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। বেয়ারা ফি
য়া পড়িবার
আসিল, বলিল পাগ্‌লা আজ আর কিছুতেই আম
ত্ত বলিয়া
নিকট আসিবে না।

য় যেন
বুঝিলাম তাহার মাথায় কি একটা খেয়াল
আয়
চাপিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে আর একজন লোক

সমষ্টির অপেক্ষা কিছু
পরিবারস্থ বাহুভূতের
সিন্নির ব্যয়স্বরূপ ঐ শ
তাহা ত মোটেই বেশী
পরামর্শ লইয়া এই নিয়
করিতে পার তবে দে
সমস্যা অতি সুন্দররূপে
অসম্ভব বলিলে ছাড়িব
প্রাণের প্রিয়তম কামনা। ত্রিভুজের
ভুজ অপর দুই ভুজের সমষ্টি অপেক্ষা বৃহৎ না
ক্ষুদ্র এ নিয়ম খাটে। কারণ সেখানে
ভুজই নিজে ছোট হই কি বড় হই সে দি
না রাখিয়া নির্ব্বোধের মত প্রতিজ্ঞা
বসিয়াছে যে তাহাদের একটা ছোট
বাঁধিতেই হইবে। এরূপ দুর্ব্বল ভুজ লইয়া
সমাজ বাঁধিতে চাহি না। হে নূতন, আ
এই আন্তরিক অর্থের বাসনা পূর্ণ কর।

অতএব তথাপি অথচ কিন্তু তোমায়
প্রণাম করিয়া আমরা গতবৎসরের ন্যায়
জীবনযাত্রা আরম্ভ করিলাম। আমাদের
আকাঙ্ক্ষা যদি এবারও পূর্ণ না হয় তবে
করিতেছি যে গত বৎসরের ন্যায় আমরা
গ্রীষ্মের রৌদ্রে ঘরের বাহির হইব না, নিদ্রা
করিব। বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজিব না, ছাতা
শরতের পূজায় ছুটি লইব। হেমন্তের হিমে
জড়াইয়া শীতের প্রভাবে ৮৷৹য় বিছানা
এবং বসন্তের বাতাসে বিরহ করিব ও
লিখিব। হে নববর্ষ, এইরূপে ন্যায় ধর্ম্ম
প্রতি বিশ্বাস স্থির রাখিয়া আমরা
কর্ত্তব্যপথে পুনরায় অগ্রসর হইলাম,
আশীর্ব্বাদ কর, ছয়রিপুকে উক্তরূপে দমন
করিতে তোমার ছয়ঋতু আমাদের
ভাবে কাটিয়া যায়।

নববর্ষ

(শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি. ই.)

LIBRARY

খন নিতান্তই আসিলে
লও। পুরাতন বৎসর
তার গ্রীষ্ম কালে যেমন
শীতকালে তেমনই শীত পড়িয়াছিল।
যেমন মুষলধারে বৃষ্টি, বসন্তে তেমনি হালকা
। সে আমাদের বড় কষ্ট দিয়াছে, সুতরাং
ভালই হইয়াছে। আমি সকলকে জিজ্ঞাসা
ছি তাহার আমলে কেহই সুখে কাল
ইতে পারে নাই। সকলেই কোনরকমে
সহিত মনের যোগ রাখিয়াছিল, কিন্তু
সহিত বাক্যের যোগ প্রায় কেহই রাখিতে
নাই। তদুপরি ডাক্তারের রোগী ছিল না,
লর মক্কেল ছিল না। কেরাণীদের প্রায়
রো বেতন বৃদ্ধি হয় নাই, উপরন্তু অনেকের
গিয়াছে। গৃহস্থের ঘরে কন্যা এবং গোয়ালে
এঁড়ে বাছুর জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পুত্রেরা
ক পরীক্ষায় ফেল করিয়া বৎসর নষ্ট করিয়াছে,
অনূঢ়া কন্যারা সকলেই বয়সে পুরা একবৎসর
গিয়াছে। এমনি করিয়া সকল রকমের
য়া যে চলিয়া গেল, তাহার জন্য আমরা
টাও চোখের জল ফেলিতে রাজী নহি।

আসিয়াছ, আমরা সাদরে তোমার
করিতেছি। তোমার মুখ দেখিয়া আমাদের
আশা অনেক আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে।
ন হইতেছে তোমার আমলে আমাদের সকল
তৃপ্ত হইবে। তোমার প্রথম অরুণালোক
দিকে করুণভাবে চাহিয়াছে; তোমার
তাসে যেন বড় সহানুভূতি মাখান
বতএব আমাদের আশা আশঙ্কা তোমার
নিকট সমস্ত খুলিয়া বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি।
তুমি নূতন আসিয়াছ, সহানুভূতি থাকিলেও
আমাদের সকল দুঃখ তোমার জানা না থাকি
পারে।

প্রথমতঃ আমরা চাই,—গ্রীষ্মকালে বেশ
হাওয়া বহিবে, পাখার কোন
থাকিবে না। বর্ষায় বৃষ্টি হইয়া প্রচুর ধা
হইবে, কিন্তু পথঘাট মোটেই কর্দ্দম
না; আশ্বিনের পূজার বাজারে
বিনামূল্যে খরিদ হইয়া যাইবে।
গরম পড়িবে; তবে যাহাদের
কোম্পানীর কাগজ আছে তাহাদে
করিবে। আর বসন্তের হাও
আদালত স্কুল কলেজের স
বন্ধ হইয়া যাইবে এবং য
করিয়া যাই ততদিন খু
যাহার যত দেনা আছে
যায়, আর সকলের পা
কাহারও ঘরে কন্যা
রাঙা টুকটুকে বধূ
তাহা হইয়াছে,—
বয়স না বাড়ে
না পাকে।

এবং এ জগ
না মিশাই

লিখিতে
দালালি
আমা
কি

ত বড় শত্রু, তা কেমন করিয়া
হয়, অর্থাৎ একজনকে শত্রুভাবে
যায় এবং সেই ভাবেই নাকি শীঘ্র
তাই রাবণ প্রকৃত পক্ষে রামকে
পাসনা করিয়াছিলেন। ওগো সাধু
রা তেমনি করিয়া চরিত্রহীনতাকে সহজে
আনিতেছ না ত?
হারা সহৈকেলে চড়িতে শিখিয়াছেন তাঁহারা
খাটা বুঝিতে পারিবেন। নূতন চড়িতে শিখিলে
য়ই দেখিবেন রাস্তায় যে ইঁটখানা, যে বাঁশটা
এড়াইয়া যাইব বলিয়া মনে করি, সাইকেলের চাকা
ঠিক সেইখানে যাইয়া গুতা খায়। যতদূর হইতে
সাবধান হইনা কেন কিছুতেই তা এড়াইতে পারিব

বাঙ্গালার পল্লী

(শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু এম. এ.)

বিশেষ কার্য্যবশতঃ আমি কিছুদিন যশোহর জেলার উত্তর পশ্চিম অংশে বাস করিয়াছিলাম। আমার মনে হয় Rider Hagard এর লিখিত 'She' পুস্তকে Plains of Kor এর যে বিভীষিকা-ময়ী বর্ণনা পড়িয়াছি,-আর কিছুদিন পরে জগতের অন্য কোনও সভ্যদেশ হইতে একজন পরিব্রাজক আসিয়া তেমনি এদেশের একটা নরকের চিত্র বর্ণনা করিয়া আর একটা ভূতুড়ে গল্পের অবতারণা করিতে পারিবেন। গ্রামের পর গ্রাম দেখিলাম উজাড় হইয়া গিয়াছে, বসতির চিহ্ন আছে, লোক নাই। সমগ্র দেশটা জঙ্গলে পরিপূর্ণ। বেলা দুপুরে অনেক জায়গায় সূর্য্যের আলো প্রবেশ করে না। সন্ধ্যার পর ঘরের বার হইতে হইলে দার্শনিক মতে ভূত নাই স্থির করিয়া লইলেও, গা ঝিমঝিম করিতে থাকে। অশরীর জীব বাদে শরীরধারী জীবের সংখ্যা বড় অল্প নয়। নলডাঙ্গায় মন্দিরের ভিতর বাঘ ঘুমায়, কোটচাঁদপুরের স্কুল ঘরের ভিতর বাঘ মারা পড়ে। সন্ধ্যার পর ফেউ ডাকে, রাত দুপুরে মাঝে মাঝে গুরুগম্ভীর ঘর্ঘর রবে ঘুমন্ত শিশু শিহরিয়া উঠে। কেউটে গোক্ষুরা এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায়,—বৎসরে সর্পাঘাতে মৃত্যুর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। প্রাচীন পোড়ো বাড়ী, ইটের স্তূপ, কাঁটা বাঁশের ঝোপ, তার তলে প্রাচীন মজা পুকুরের ধারে বড় বড় বোড়া সাপ বড় বড় গাছের গুড়ির মত অচল অটল নির্জীব অবস্থায় শুইয়া থাকে। নলাডাঙ্গায় একবার একটী ছয় সাত বৎসরের মেয়েকে একটা বোড়া সাপে মাথা পর্য্যন্ত গিলিয়া ফেলে। এখানে নদী অপ্রতুল নয়, কিন্তু সেগুলিকে নদী বলিলে ভূগোলে নদীর সংজ্ঞা বদলাইয়া রাখিতে হয়

নদীর ধারের মত পরিষ্কার খোলা বালির
কোথাও নাই। ঝোপ, গাছ, বাঁশ ঝাড়
উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া নদীর স্বল্প প্রাণটাকে
মারিতেছে। নদীতে পানা, পাটাশেওলা
সর জমিয়া গিয়াছে। কোটচাঁদপুর প্র
পাটাশেওলা চিনি পরিষ্কার করিতে
এই পচা নদীর জলই আবার দূরে
লোক আছে তাহাদের একমাত্র
ম্যালেরিয়া ত আছেই, কালা জ্ব
কমতি নাই। নলডাঙ্গার নিক
জগৎব্যাপী ভীষণ এসিয়াটি
সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার লিয়ো
অনুমান করেন। এক
হইয়াছে। আজকাল
মাথার মণি ডাক্তার স্ত
জীবজন্তুর শারীরি
বর্ত্তমান প্রমাণ
তিনি এমন কথ
Research I
গাছপালা
জিজ্ঞাস্য
সাদৃশ্য
গাছপ
শুধু
জী

যশোহর জেলার উত্তর পশ্চিমাংশ, নদীয়া মুর্শিদাবাদ, হুগলি ও হাওড়া জেলা পুরা, চব্বিশ পরগণার উত্তরাংশ, মেদিনীপুরের উত্তর পূর্ব্বাংশ ও বর্দ্ধমানের পশ্চিমের একটু বাদে আর সবটা, আমার মনে হয় জগতে ইহাদের অপেক্ষা মনুষ্যবাসের অযোগ্য স্থান আর নাই। ডি, এল, রায় ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে পারেন, বঙ্কিমবাবুর এদেশ সুজলা সুফলা মলয়জ-শীতলা হইতে কিন্তু মানুষ ত এখানে বাস করিতে পারে না। এ কথা নয়, গত এক শতাব্দীর ভিতর কত নলডাঙ্গা, মহেশপুর, গদখালি, এখন জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইল, কে দেখিল, কে তাহা বুঝিল, কে চেষ্টা করিল? নলডাঙ্গায় আজ কর বাস, তাহাও প্রায় শেষ তার নিকটস্থ দুই এক গ্রামের এরূপ পরিবার খুঁজিয়া ও অবস্থা প্রায় তদ্রূপ। দিনে মানুষ চলে না। কে গ্রাম শেষ হইয়া ection, ধর্ম্ম আর শান্তি পাওয়া

তেই সীমাবদ্ধ য়া আছে, টাঙ্গাইলে শ্রীহট্টে না য়া

রোগীকে শুধু ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বলিয়া ক্রমে ভুগাইয়া ভুগাইয়া আমরা পরপারে পাঠাইয়া দিই তাহার অধিকাংশই কালা আজারের। আমি ডাক্তার নই, এ বিষয়ে জোর করিয়া কিছু বলিতে পারিব না। তবে তাঁহাদের পুস্তকের উপসর্গগুলির কথা মনে করিয়া এইরূপ অনুমান করি। রোজার্স, ব্রহ্মচারী কি মুর সাহেব একবার কিছুকালের জন্য এই পোড়া দেশটার অবস্থা নিজেদের চোখে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে অনেক বিষয় আবিষ্কার করিতে পারিবেন।

তার পর কলেরার কথা আর নাই বলিলাম। বসন্তও ঠিক নিয়মিতরূপে বৎসরে একবার করিয়া খাজনা আদায় করিয়া যান। ক্ষয়কাশ সুদূর পল্লী-গ্রামের কোণেও ঢুকিয়াছে। তারপর মোটা মোটা রোগ যথা সন্নিপাত বিকার, নিউমোনিয়া প্রভৃতি বিনা নোটীশে যে কোন সময়ে যে কোন ঘরে পরওয়ানা লইয়া যাইতেছেন। বাঙ্গলার পল্লীতে বিউবোনিক প্লেগ বড় দেখা যায় না। গেলেও আমাদের আপত্তি নাই। 'সমুদ্রে পেতেছি শয্যা, শিশিরে কি ভয়!'

এই আমার সোণার বাঙ্গালা। আমরা এখানে বড় সুখেই আছি! এমন দেশকে যে ভাল না বাসে তাহাকে লক্ষ্মীছাড়া বলিব না কেন? এ দেশে যে একদিন কত মহাত্মা বাস করিতেন। আর এখন বোধ হয় সব পাপাত্মা বাস করেন। তাই এ দেশের লোকের মুর্খতার অভিমানে চিত্ত ভরপুর। পশুর ন্যায় চিন্তাহীন কর্ম্মই ইহাদের ধর্ম্ম, আর তাহাই ইহারা জগতের শ্রেষ্ঠ জিনিষ বলিয়া ব্যাখ্যা করে। প্রাচীন মহাত্মাদের দেশে বাস করিয়াও সেই পুরাণোক্ত ঋষিদের সন্তান হইয়াও যে আমরা এ কষ্ট পাইতেছি এটা নাকি আমাদের ইহজন্মের অপরাধ নহে, পূর্ব্বজন্মের পাপের ফলে। কুসংস্কারের জটীল পাকের ভিতর জড়াইয়া পড়িয়া কোন দিন এ দেশের লোক প্রতিকারের চেষ্টা করে নাই, বাহির হইতে কেহ

...ত্ত বাধা দিয়াছে। বলে ইহা ...হে জীবন নশ্বর, দুদিনের জন্য পৃ... যা যাহা বলে তগবানে বিশ্বাস ...বুদ্ধি। ইহারা ইহাদের এই বুদ্ধি ...ঝিয়া পায় না যে জীবন যাহাই হউক ...ক্ষয়, দুঃখের জন্য ভগবানের দোষ ...াই,—তোমার ও'ধনটা নির্ব্বিঘ্নে ...ই করিতে হইবে। কলেরার প্রকো... অর্থ ব্যয় করিয়া ইহারা কালী পূজা ...কিরণশে দিয়া যদি একটী ডাক্তারের ...হা হইলে যে কত লোক বাঁচিয়া ...হারা কোন দিন বুঝিবে না।

...ক থাক বা না থাক ওষুধ ইহাদের ...এবং কালীপূজা, বারওয়ারী পূজা ...কোন ত্রুটী দেখা যাইবে না। ...'থাকতে খেতে না দিয়ে ম'লে' ...প্রসিদ্ধি আছে। কেন না মেয়েটী ...ছাড়িয়া গেলেই তাহাতে সেই ...য় গৌড়িক পদার্থ খাইবার লোক ...পড়ে।

বিশেষ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত পল্লীগ্রামগুলিতে ...কাশ ছেলেদের নাম বৈদ্যনাথ, ... প্রভৃতি। যেন নামের ভয়েই ... ঘেঁসিবে না। যমের কিন্তু বাছবিচার ...ই ছেলেগুলির গলায় বাহুপাশ ...য় অনেক সময় তাহাদের নিজেদের ...অপেক্ষা বিশেষ কম হইবে ...ন জিনিষ বহিতে অক্ষম ?

...ক্ষিকা জিনিষটী কি তাহা সকল ...ওয়ালার ছাপা পচা কাগজের ...য় বড় সোজা নয়। ঐই লইয়া ...ত সহিত আর এক খেলো ...—উপভোগ করিবার জিনিষ ... যোকদ্দমা পর্য্যন্ত হয়।

মেলিয়া দেখে নাই। সঙ্গীত অনভিজ্ঞের নিকট যেমন সব সুরই এক রকম লাগে বাঙ্গালীর চোখে তেমনই ওগুলি আকাশের গায় এক পাল জোনাকীর মিটির মিটির ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। গ্রহ নক্ষত্রকে বাঙ্গালী ভাগ্যনিয়ন্তা মনে করে কেন, না, তাহারা শুনিয়াছে তাহাদের অভ্রান্ত মুনিঋষিরা ঐরূপই বলিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালীর জীবন আজ তিনটী পরস্পরবিসম্বাদী সে চালাইতেছে। শুনিলে বিশ্বাস করা কঠিন, াস্তবিক ব্যাপার তাই। একটী গ্রহ নক্ষত্রের দ্বিতীয় জন্মান্তর বাদ, তৃতীয় কর্ম্মফল। এ ার বড় সার্ব্বজনীন, এরা হিন্দু মুসলমান করে না। কেমন করিয়া যে এই হৃদয়ে বাস করিতে পারে তাহা ঠিন। কেমন করিয়া বাঙ্গালীর এর পাশাপাশি ভগবানের নিয়ন্তৃতে, বিশ্বাস স্থান পায় াসল কথা বঙ্গবাসীর দার্শনিক টী শোনাকোথার সমাবেশ ন গান। কিন্তু সংস্কারের শী যে বাঙ্গালী ন্যায়-লেও, কারণ সঙ্গত বদলাইবে না। যা ন্তু তাই বলিয়া বিশ্ব যে প্রতি-কে অস্বীকার া অস্বীকার তান্ত না ল সেই কান ধ্য

আর একবার বৎসর কয়েক আগে, চরকা চরক করিয়া দেশে একটা প্রবল সাড়া পড়িয়াছিল, আজ-কালও আর একবার তাই। আমার অনেক বার মনে হইয়াছে আবার চরকা কেন? কলে কলে জগৎ ছাইয়া গেল, বাঙ্গালা কি কেবল বাঁশের চরকা আর খড়ের ঘর করিয়াই কাটাইবে? দেশের আদর্শ নাকি সেই জঙ্গলে বাস করিতেন যে সব মুনি ঋষি, তাঁহারা? তাঁহাদের সে অবস্থা আদর্শ না আর কিছু তাহারা তাহা জানিতেন না, এই বুঝিতেই যে গোল বাধি যায়। মুনিদের তপোবনে খড়ের কুঁড়ে থাকিতে প কিন্তু তাহার বাহার বর্ত্তমানের বড় বড় রাজড়াদের বাগান বাড়ীকেও হার মানায় পুতিলেই কি বাবুগিরি হয়? এই যে সে বঙ্গ ঝড়ে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। আদর্শের জে অমনি করিয়া না মরিয়া একটু বাসের ব্যবস্থার জ দালান দেওয়া যাহারা খারাপ বলে, তাহারা এখনও আফ্রিকার নিগ্রোদের অপেক্ষা কতটুকু উচ্চ স্তরে জীব তা দেখা দরকার।

আমাদের সকল সংস্কারের মূলসূত্র প্রা ভক্তি। যদিও rational education এর প্রভ একটু কমিতেছিল কিছুদিন যাবৎ কতকগুলা হি reactionary movement আর স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বিজাতি বিদ্বেষ আবার বাড়িয়া যাইতেছে। তীব্রভাবে প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের বহুমুখী প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। বড় সৌভাগ্য আমাদের, আমাদের দেশে অবতারের কোনও দিন অভাব নাই। বর্ষাকালে বিলের ধারে কেউ কি কই মাছ উজাইতে দেখিয়াছেন? তেমনি দলে দলে, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে অবতার এদেশকে পবিত্র করিতে আসেন। তাঁহাদের কেবল কথা 'সমস্ত পাশ্চাত্য ভাবকে ঘৃণা কর'। পাশ্চাত্য আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, লেখাপড়া, খেলাধূলা সবই তাঁহারা ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেন; কেবল ছুটো জিনি বাদ। একটা অজ্ঞাতসারে, আর একটা জ্ঞাতসা

২৩

অজ্ঞাতসারে বাদ দেন Nationality, Love of country, আর জ্ঞাতসারে বাদ দেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।

সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনবিমুখ দেশে হোমিওপ্যাথি ভক্তি ঠিক খাপ খায়। যে চিকিৎসা শাস্ত্র Schwann এর Biological cell theory ও Liesseur Pasteur এর Bactriology এখনও হিসাবে আনে নাই, বোধ হয় সে চিকিৎসা শাস্ত্র ব্যবহারে আনিলেও একেবারে তাকে সার্ব্বভৌমিকত্ব দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু এ দেশে ঐ যে ঔষধের latent action, যা কিনা Mysticism এর অন্য মূর্ত্তি, সেটা বড় সহজে বুঝিয়া ফেলিয়াছে, কারণ সেইটেই যে বোঝা বড় গোলমেলে। কিন্তু বাঙ্গালী তুমি তোমার এই অদ্ভুত সংস্কার, অদ্ভুত বিশ্বাস ও অদ্ভুত ভক্তির বশবর্ত্তী হইয়া আজ যে Leonard Rogers এর যুগপরিবর্ত্তনকারী Saline injection বাঙ্গালায় কলেরা-প্রপীড়িত পল্লীগুলিতে প্রবেশ করিতে দিতেছ না। তাহাতে তোমার নিজের পায়ে নিজে যে কুঠারাঘাত করিতেছ তা কি বুঝিতে পার।

যাক্, বাঙ্গালার অবস্থা যাহা চোখে দেখিয়াছি সে সম্বন্ধে এখনও কিছু বলিবার আছে। অবতারের দল এখন গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। আজকাল আর শুধু সেকেলে নাগা ফকির নয়। এখন দলে দলে আলখেল্লা পরা গ্রাজুয়েট কত ঘুরিয়া বেড়ান। বড় দুঃখে বলিতে হয় সবই একটী একটী অদ্ভুত পদার্থ। একদিন তাঁহাদের কোনও গুরুজির সঙ্গে আলাপে বুঝিলাম তাঁহারা আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন বা করিবেন এই রকম অবস্থা। সেটা কি ভাবে হয় জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম যে তা Realise করিবার জিনিষ, তর্কের জিনিষ নয়। এই realisation মানে যে কি, ক্ষমা করিবেন, তাহা এখনও আমার বুদ্ধির অগম্য। সেটা নাকি সাধনার বস্তু, সেকি যেসে পায়! হবে বা

কিন্তু আমার মনে হয় প্রভুত্ব করিবার সাধারণ প্রবৃত্তি মানুষের অন্তঃকরণে সকল সময় সমান ভাবে আছে। কেউ বা অর্থ বলে কেউ বা জ্ঞান বলে কেউ শারীরিক বলে সেই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। কিন্তু যার এ তিনটির কোনটাই নাই সে কি করে? সে তখন হয় সাধু। "ওগো, আমি লেখাপড়া শিখি নাই, আমার অর্থ নাই আমি ম্যালেরিয়ায় প্রপীড়িত বাঙ্গালী। কিন্তু আমি অন্তরের ভিতর দিব্যচক্ষু খুলিয়া ভগবানের জ্যোতি দেখিয়াছি। অর্থাৎ কিনা আমি তোমাদের সকলের চাইতে বড়। অতএব সকলে আসিয়া আমার পায় লুটাইয়া পড়!"

এই কি বাঙ্গালার অবতারের সংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারণ নয়? আলসের দেশে এর চাইতে আর বেশী কি আশা করা যায়! কিন্তু এদের ভড়ং অনেক। এঁরা নাকি বাঙ্গালার ছেলেদের চরিত্রোন্নতির প্রধান সহায়। চরিত্র বলিতে যে কতটুকু এঁরা বোঝেন তার এখনও কোন হিসাব পাই নাই। তবে এঁদের প্রধান ঝোঁক ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবার উপর। কিন্তু ফলে সেটা নষ্ট করিতেছেন কিনা তা একবার ভাবিবার বিষয়। একদিন রামায়ণের এক কথকতায় শুনিয়াছিলাম রাবণ রামের হাতে মরিয়া স্বর্গে যায়। রামের [illegible] হইল? তা নাকি [illegible] ডাকিলেও পাওয়া [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] শত্রুভাবে [illegible] দল, তোম[illegible] ডাকিয়া [illegible]

এ [illegible]

না। তার কারণ তখন হাত আর চোখ এক লক্ষে না রাখিয়া চালাইতে পারি না। ঐ যে চোখ দেখে ইট আর সামনের চাকা হাত দিয়া ধরিয়া রাখি সেই ইট মুখো। হে বাঙ্গালার সাধু-সম্প্রদায়, তোমরা এমনি করিয়া চরিত্রহীনতার ভয় দেখাইয়া দেখাইয়া বাঙ্গালার ছেলেদের চরিত্রহীনতার পথেই আগাইয়া দিতেছে না ত?

এ ত গেল ব্যক্তিগত চরিত্র। কিন্তু ব্যবহারিক চরিত্র যা, ইংরাজিতে যাকে Common honesty বলে, তা আরও ভয়াবহ। হিন্দুর ধর্ম্মে চিরদিন এই ব্যক্তিগত চরিত্র ঠিক রাখিবার উপদেশ দিয়াছে, তাই আবার নিজের চাইতে অন্যে পালন করে কি না দেখিবার জন্য হিন্দুতে বেশী ব্যস্ত। সমাজ যে মানুষের সাধারণ সততা ও সত্যপ্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে তা বোধ হয় কোন দিনই হিন্দুর ধারণায় আসে নাই, তাই তাহা তাহাদের Programme এ ঠাঁই পায় নাই।

আমি নিজে কিছু বুঝি না। ভবিষ্যৎ কি ভাবে গড়িতে হইবে তাহা ভাবিয়া বাহির করিবার ক্ষমতা আমার নাই। আমি শুধু দেশের দুর্দ্দশা চাহিয়া দেখিয়াছি। প্রতিকার ভাবিয়া পাই নাই। এক দিকে দেখিয়াছি ব্যাধিগ্রস্ত অন্নহীন, কঙ্কালসার কতকগুলি দেহ, তার ছিন্ন পর্ণকুটীরের চারিদিকে বিপুল জঙ্গল, জঙ্গলের বাঘ ভালুকের সাথে যেন কতকগুলা ভূত প্রেতের বাস। তার মনের চারিদিকে কুসংস্কারের দুর্ভেদ্য কাঁটা বন। জ্ঞানের আলো সেখানে প্রবেশ করে নাই, সহজে করিতে পারিবেও না। তারপর কর্ম্মের ছুরিতে তার উচ্ছেদ, সে বহু যুগের কথা। যে মনুষ্যত্ব, স্নেহ মমতা, সমত্ব-বোধ মানুষের অন্তরের স্বর্গীয় কুসুম, যার সৌরভে মানুষ প্রকৃত মানুষ, এদেশে তার একান্ত অভাব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভাবিতে প্রাণ ফাটিয়া যায়, Retrogressive Evolution এর হিসাবে এ দেশের মানুষের পশুতে পরিণত হইতে দেরী কত?

কয়েদীর কথা

(বড় গল্প)

সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ)

র জন্য
কতেই
রিয়া
র

পাঠাইলাম। তাহার ফিরিতে বিলম্ব হইল। দেখিলাম তাহার পশ্চাতে কয়েদীও আসিতেছে।

কয়েদী নিকটস্থ হইয়া বলিল "মহাশয়, অন্য দিন যদি আপনার আজ্ঞা অবহেলা করিতাম, তাহা হইলে হয়ত চাবুক খাইতে হইত। আজ এত সদ্ব্যবহার কেন? আমার কাছে কিছু পাইবার আশা করেন কি?"

আমি বলিলাম "হাঁ পাইবার আশা আছে বৈকি। আপনার গল্পটা শুনিতে হইবে যে।"

কয়েদী বলিল "দেখুন, অত সহজে কেহ আপনার স্বার্থটা প্রকাশ করে না। দেখিতেছি আপনি পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নতচিত্ত। তখন ছিল পদে পদে অভিমান, এখন সে অভিমানকে রীতিমত শাসন করিতেছেন।"

আমি বলিলাম "দেখুন অভিমান ক্রোধ এ সব না থাকিলে সংসার চলে না।"

কয়েদী বলিল "সংসারের জন্য যদি এ সব আবশ্যক বুঝিয়া থাকেন, ক্রোধ,অভিমান প্রকাশ করুন ক্ষতি নাই, তাহাতে না যাইলেই হইল। যাহা বস্তুতা আনিয়া দেয় জানার্থী মানুষের তাহা পরিত্যাজ্য নয় কি?

আমি বলিলাম "কথাটা ঠিক; এখন আপনার গল্প বলুন।"

কয়েদী বলিল "অত যদি ব্যস্ত হন, তাহা হইলে আমার গল্প এখানেই শেষ করিব।"

আমি বলিলাম "আচ্ছা, যাহা ইচ্ছা আপনি করিতে পারেন, আমি আর আপনাকে কোন অনুরোধ করিব না।"

কয়েদী বলিল "দুঃখিত হইবেন না, শুনুন আমার গল্পই আরম্ভ করিতেছি।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই কয়েদী আত্মকথা আরম্ভ করিল :—

সে দিন রাত্রে সুকৃতির অনুসরণ করিয়া আমি পূর্ব্বে যে ঘরে শয়ন করিতাম, সেই ঘরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম আজ আমি এখানে আসিব আসিয়াই কে যেন আমার ঘরটি সাজাইয়া রাখিয়াছে। শয্যা বিস্তৃত ছিল। তাহার উপর বসিয়া পড়িলাম। সুকৃতি মেঝের উপর বসিল।

অনেকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া কেহ কাহারও দিকে না চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। দেখিতে পাইলাম মাতুলের কক্ষটি অর্গলবদ্ধ—কিন্তু একটি ছিদ্র দিয়া দেখিতে পাইলাম ভিতরে আলোক জ্বলিতেছে। আরও বুঝিতে পারিলাম—ভিতরে যাঁহারা আছেন তাঁহারা নিদ্রায় একেবারে সংজ্ঞাহীন হন নাই।

কিছুক্ষণ পরে সুকৃতি বলিল "এখন হাত মুখ ধুইয়া আহারাদি কর।"

আমি বলিলাম "এই রাত্রি আড়াই প্রহর কাটিতে চলিল, এখন তুমি কি আহারাদি দিবে?"

সুকৃতি বলিল "সে ভাবনা আমার।"

আমি হাত মুখ ধুইয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—আহারাদি প্রস্তুত। চুপ করিয়া আসনে উপবেশন করিলাম। তারপর আহারে প্রবৃত্ত হইলাম।

আহার করিতেছি, মনে হইতেছে সুকৃতির নিজের জন্য যে আহার্য্য রাখিয়াছিল তাহাই আমার জন্য লইয়া আসিয়াছে. তাহারই আহার্য্য উদরসাৎ করিতেছি। এই ভাবনা সময়ে সময়ে প্রাণটাকে আকুল করিয়া তুলিতেছে। সুকৃতি যদি নিজ হাতে এমন আহার্য্য আনিয়া না দিত, তাহা হইলে আহারে প্রবৃত্ত হইতাম না।

খট্ করিয়া আমার জানালার পাখী খুলিয়া গেল। বুঝিলাম বাহিরে কেহ আমাদের কার্য্য-কলাপ বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতেছে। আরও দেখিলাম—শব্দ শুনিয়াই সুকৃতি উঠিল। ধীরে ধীরে আলোকের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল "তবে ঘুমাও, আমি যাই!" আলোক নিবিল। আমি শয়ন করিলাম। মনে হইল—সুকৃতি যেন ঘর ছাড়িয়া বাহিরে যায় নাই। কিছুক্ষণ পরে ইচ্ছা হইল আলোক জ্বালিয়া একবার দেখি। কিন্তু আলোক জ্বালিতে পারিলাম না। সেই নিবিড় অন্ধকারে সেখানে আমি ছাড়া একটিও প্রাণীর সাড়াশব্দ নাই আলোক জ্বালিয়া সেখানে যদি অপর একটিমাত্র প্রাণীর সন্ধান পাই, তাহা হইলে সারাপ্রাণ তাহারই দিকে ছুটিয়া যাইবে, আবার সেই প্রাণী যদি কামনার একমাত্র সামগ্রী হয় তাহা হইলে আমি আর আমাতে থাকিব না, জ্ঞান হারাইব,

বিচারশক্তি লুপ্ত হইবে। যে কাজে বিচারশক্তি লোপ পায়, তাহা করিতে সাহস হয় না।'

তারপর আবার ভাবিলাম আলোক আলিয়া সুকৃতিকে কখনই দেখিতে পারিব না—যদি তাহাকে না দেখিতে পাই তাহা হইলেও ভয়ের কারণ আছে। সুকৃতি যদি কোন উপায়ে জানিতে পারে আমি আলোক আলিয়াছি, তাহা হইলে আমার অন্তর তাহার কাছে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। সে বুদ্ধিমতী, তাহার চক্ষু দুটি অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পায়।

বুঝিতে পারিলাম—বুকটা আহত পক্ষিশাবকের মত ধুক্‌ধুক্‌ করিতেছে। মনে হইল যতই গর্ব্ব করি না কেন, আমি একটি সামান্য জীব, এই বিশাল সংসার সমুদ্রে তরঙ্গাহত হইয়া আপনার কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রতিক্ষণে আমাকে অভিভূত করিতেছে। আর শক্তি নাই। মনে হইল একবার চীৎকার করিয়া বলি "ওগো, যদি কেহ থাক আমাকে শক্তি দাও, আমার সব আছে নাই কেবল শক্তি, আমার স্থিরতা আনিয়া দাও।"

কিন্তু শুনিবে কে? বিশ্ব সংসারের যদি কোন কর্ত্তা থাকে তিনি বধির। আমি যাহাকে ভগবান্ বলি, তিনি বড় উদাসীন, আমি তাঁহার নিকট হইতে কত দূরে। হায়রে এখন কি কেহ নাই যাহাকে প্রাণটা বিলাইয়া দিতে পারি।

মনে হইল একবার ডাকি, ভগবান্, তুমি আমার দও, আমি নিজের কর্ত্তৃত্বভারে পীড়িত হইয়াছি তুমি এস, যাহা আমার প্রাণ চাহিতেছে তাহারই রূপে তুমি নিকটে এস; আমার এই কর্ম্মক্লান্ত প্রাণ তোমাতে অর্পণ করি।

অন্তরের মধ্যে কে যেন বলিয়া উঠিল "তুই যাহা চাস আমি তাহারই রূপে তোর নিকটে রহিয়াছি।"

সত্যই ত, যখন যাহা চাহিয়াছি তখনই তাহারই রূপে তুমি দেখা দিয়াছ। আমি তোমাকে, দেখিয়াছি, তুমি আমার চারিদিক ঘিরিয়া আছ। আমার ধর্ম্মে তুমি, কর্ম্মে তুমি; আমি যে সব পাপপুণ্য করিতেছি তাহা তোমারই করা হইতেছে। শৈশব হইতে তুমিই নানা পথ দিয়া আমাকে লইয়া যাইতেছ একথা মুখে বলি বটে, বাস্তবিক কিন্তু তুমিই তোমার কাজ করিতেছ, মাঝখানে কেবল খানিকটা অহংকারকে প্রশ্রয় দিয়া আপনাকে কর্ত্তা মনে করিয়া সুখ দুঃখের ভাগী হইয়াছি। আমার কর্ত্তৃত্ব আর চাই না। আমার প্রাণ তোমার হইয়া যাক্ তোমাতে আমাতে এক হইয়া যাই।

কিন্তু তুমি কোথায়!

হঠাৎ মাতুলের কক্ষদ্বার খুলিয়া গেল। দেখিলাম মাতুল মহাশয় আলোক লইয়া আমারই কক্ষাভিমুখে আসিতেছেন। জানালা দিয়া দেখিতে পাইলাম—তিনি অতি সন্তর্পণে পা ফেলিয়া চলিতেছেন, আলোকটি অতি ক্ষীণ তারপর যখন তিনি কক্ষের নিকটে আসিলেন, তখন সহসা আলোক উজ্জ্বল হইল, তিনি আমার অর্গলমুক্ত দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আমি সহসা শিহরিয়া উঠিলাম। অন্তরে একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইল, নিজের জন্য নয়, সুকৃতির জন্য। যদি সে কক্ষের মধ্যেই অবস্থান করে?

মাতুল একবার ঘরের এদিক সেদিক দেখিলেন, তারপর হাত হইতে সিগারেটটি ফেলিয়া দিয়া আবার তাহা কুড়াইয়া লইবার ছলে খাটের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত দেখিয়া লইলেন, আমি চুপ করিয়া তাঁহার কার্য্য-কলাপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। যখন সুকৃতি সে ঘরে নাই স্থির বুঝিলাম, তখন সাহস হইল, বলিলাম "মামা, হঠাৎ এ সময়ে কেন?"

মাতুল একটু থতমত খাইয়া বলিলেন, "তোমার বিছানাপত্র সব ঠিক্ আছে কিনা দেখিতে আসিলাম।"

আমি বলিলাম "এত রাত্রে?"

মাতুল আর জবাব দিতে পারিল না।

আমি বলিলাম "মামা, আর দেরী করিবেন না; যান্—ঘুমাইয়া পড়ুন।"

"যাই যাই" বলিয়া মামা চলিয়া গেলেন। আমি অন্ধকারে বিছানায় পড়িয়া বর্ত্তমান রহস্য উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

শেষরাত্রে বোধ হয় একটু নিদ্রা আসিয়াছিল। যখন জাগিয়া উঠিলাম তখন গাছে গাছে প্রভাতের আলোকপ্রবাহ উচ্ছল হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমে মায়ের সঙ্গে দেখা হইল। প্রবাস প্রত্যাগত পুত্রকে দেখিয়া মাতৃহৃদয়ে যে আবেগের সঞ্চার হয়, আমি তাঁহার মুখে চোখে সেই আবেগেরই চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। কে বলিল—আমার মা নাই। মহাশয়, এত বড় জগতে মাতৃত্ব শুধু একটি মাত্র প্রাণীতে আবদ্ধ হইয়া নাই। আপনার মধ্যে শিশুত্ব থাকিলে মাতৃত্বের অভাব হয় না। সত্য বলিতেছি সুকৃতির মাকে দেখিলে আমি আপনাকে শিশু ভাবিতে বাধ্য হইতাম।

মাকে বলিলাম "মা, আমার একটা বড় কাজ আছে, সেটা যাহাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয় সেই জন্য এখানে আসিলাম। আমি দিন কতক এখানে থাকিয়া আবার যাকিরে যাইব।"

মা বলিলেন "কোথায় যাইবে?"

আমি বলিলাম "একবার গোপালনগরে যাইব।"

মা আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। অন্য কেহ হইলে কেন যাইবে কখন যাইবে এই সব অসংখ্য প্রশ্ন করিয়া আমাকে বিরক্ত করিতেন। মায়ের আমার কিন্তু সে স্বভাব ছিল না। তিনি বুঝিতেন জগৎসংসারে যে যে পথে স্বাধীনভাবে চলিয়াছে, তাহা চলুক—কোন প্রশ্ন করিয়া তাহার গতিতে বাধা দিবার প্রয়োজন নাই। তিনি এই ভারতবর্ষের রমণী 'মন্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' এই উপদেশের মর্ম্ম তিনি বুঝিতেন, সেই জন্য অপরের স্বাতন্ত্র্যরক্ষণ করিবার জন্য তিনি আপনার স্বাতন্ত্র্য একেবারে ভুলিয়া যাইতেন। তিনি যেন ভাবিতেন যাহা হইবার হউক, সবই তাঁহাকে সহিতে হইবে—বিশ্বসংসারে তিনি দুঃখকষ্ট সহিবার জন্যই আসিয়াছেন, পূর্ব্বজন্মে তিনি অনেক পাপ করিয়াছেন, তাহার ফলভোগ ত চাই। অতএব যাহা তাঁহার অদৃষ্টে আছে তাহা যথাসময়ে ঘটিবে কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না। এ জগতে স্বাতন্ত্র্য নারীর নয়, স্বাতন্ত্র্য পুরুষের। এ সব কথাও তিনি মাঝে মাঝে জলের মত অতি সহজে বুঝাইয়া বলিতেন, আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইতাম—তখন সময়ে সময়ে মনে হইত আধুনিক যুগের যে সভ্যতার স্পর্দ্ধা আমরা নিরন্তর করিয়া থাকি, তাহা আমাদের বুদ্ধিকে একটা কৃত্রিম নতোন্নত পথে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে, সেইজন্য আমাদের শাস্ত্রের উপদেশগুলা আমরা ততটা বুঝিতে পারি না, কিন্তু স্ত্রীলোক বা গ্রাম্যবৃদ্ধেরা যাহাদের আমরা অশিক্ষিত বলি, তাহারা অতি সহজে বুঝিতে পারি। আমি দেখিয়াছি একটি নিরক্ষর ব্রাহ্মণ সন্তান বড় বড় দার্শনিক কথা একদিন আমার কাছে অতি সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিল। শুধু বই পড়িলেই যে শিক্ষিত হওয়া যায়, এ ধারণা আমার পূর্ব্বে ছিল, এখন আর নাই।

মায়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া বাহিরে আসিয়া বসিলাম। বেহারীর বয়স হইয়াছে, আর সে ভাল কাজকর্ম্ম করিতে পারে না, শুধু বসিয়া থাকে আর মাঝে মাঝে বিষয় আশয়ের তত্ত্বাবধান করে। একটা কোণে বসিয়া সে তামাক সাজিতে সাজিতে গান ধরিয়াছে,

বেলাতে রতন হারায়ো না মন
হরি হরি বল বদনে।

একবার ভাবিলাম—হরি হরি কেন বলিব? হরি কি? যিনি প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন? প্রহ্লাদ যেমন কল্পিত তিনিও সেইরূপ? আমি মনুষ্যরূপী ভগবান্ মানি না, ভগবান্ অনাদি, অনন্ত তিনি বুদ্ধির পারে অর্থাৎ কেহ তাঁহাকে বুঝিতে পারে না, আমিও পারি না: সেই জন্য আমার ভগবান্ সুদূর, সেই জন্যই আমি "সুদূরের পিয়াসী" সেই সুদূরকে বুঝিবার জন্যই আমি শৈশব হইতে

জ্ঞানে অজ্ঞানে নানা পথে ছুটিয়া চলিয়াছি, কিন্তু আমার অনন্ত দেবতা অনন্ত হইয়াই আছেন, তাঁহাকে বুঝিতে হইলে আমাকে শুধু এ জন্ম নয়, হয়ত আরও কত জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। বেশ, লক্ষ জন্ম গ্রহণ করিতে হয় করিব, আমি তাহাকে বুঝিতে চাই।

তৎক্ষণাৎ অন্তরে কোথা হইতে বলের সঞ্চার হইল। ভাবিলাম তবে আর তাঁহাকে জানিবার জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি?

হঠাৎ মনে হইল কথাটা ভাবের ঘোরে বলিয়া ফেলিয়াছি—লক্ষ জন্ম ধরিয়া তাঁহাকে জানিবার সাহস বা শক্তি আমার নাই, এক জন্মে বা কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁহাকে জানা যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে একবার চেষ্টা করিয়া দেখি। মনে তর্ক উপস্থিত হইল—তাহা হইলে আর তো ভগবান্ অনন্ত হয় না, অনন্তকে কি নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে জানা যায়?

ভাবিতেছি—হঠাৎ বেহারী কথা কহিল, বলিল "মামা বাড়ীর হালচাল কেমন বুঝিতেছ?"

আমি বলিলাম "এ কথা বলিতেছিস্ কেন?"

বেহারী বলিল "মামার সঙ্গে আলাপ হইয়াছে? কেমন মানুষ তিনি?"

আমি বলিলাম "লোকটা ভাল নয়।"

তারপর বেহারীর মুখে মামার সম্বন্ধে দু চারিটা কথা শুনিলাম। বুঝিলাম—আমি সুকৃতির সঙ্গে কথা কই শুনিয়াই তিনি একটু চটিয়াছেন; এখন তিনি এই সংসারে কিছু আধিপত্য করিতে চান্।

তৎক্ষণাৎ যে সব ব্যাপার রহস্য বলিয়া মনে হইতেছিল, তাহা সহসা অতি স্পষ্ট বলিয়া বোধ হইল। আমি জানি—সুকৃতি বুদ্ধিমতী, তাহার বিচারশক্তি আছে, সে আমার সঙ্গে কথা কওয়া দোষ বলিয়া বিবেচনা করে না, সেই জন্য মামাকে দেখাইয়াই আমার সহিত মিশিতে ও কথা কহিতে চায়।

মজাটা মন্দ নয়? দেখিবার সাধ হইল। এমন সময় দেখিলাম—মামা নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মামা বয়সে প্রায় আমারই মত, তাঁহার মাথায় টেড়ী, হাতে হাত-ঘড়ি, নাকে চশমা, কথায় কথায় ইংরাজী বুকুনি; তাঁহার মধ্যে এমন কিছু দেখিলাম না যাহা তাঁহার স্বরূপটি প্রকাশ করিতে পারে। তাঁহার চালচলন পরের নিকট হইতে ধার করা; কথাবার্ত্তা একটাও নিজের নয় সবই দেশী বিলাতী গ্রন্থকারদের কথা। তিনি জ্ঞানী বা শিক্ষিতের অভিনয় করেন মাত্র, প্রকৃত পক্ষে তিনি সংকীর্ণচেতা তাহার সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে সব কথা শুনিয়াছি তাহাতে মনে হয় তাঁহার লালসা আমার অপেক্ষাও অধিক।

দেখিলাম মামা গম্ভীর; গাম্ভীর্য্য গাম্ভীর্য্যকেই আকর্ষণ করে। আমি, বেহারী দু' জনেই গম্ভীর হইলাম। মামা কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে এদিকে ওদিকে চাহিয়া একবার যে হাতে সিগারেটটি খুব উদাসীন করিতেছিল, সেই হাতটি ঈষৎ ঘুরাইয়া ঘড়িটা দেখিয়া লইলেন, তারপর আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন "দেখ নরেশ, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।"

আমি বলিলাম "চলুন, শুনি!"

মামা চলিলেন "দেখ, তুমি এ family'র কেহ নও, তবুও যেন সেইরূপ হইয়া পড়িয়াছ। ইহা বড়ই সুখের কথা, তবে তোমার কি একটু সত্য কথা মানিয়া চলা উচিত নয়?"

আমি বলিলাম "মামা, আমায় ত কি ভাবে চলিতে বলেন?"

মামা বলিল "তোমার বোঝা উচিত যে তুমি গরীবের ছেলে, ভাগ্যক্রমে এখানে স্থান পাইয়াছ, এ বাড়ীর লোকেদের সঙ্গে তোমার এতটা ঘনিষ্ঠতা শোভা পায় না।"

আমি বলিলাম "মামা, এ বাড়ীর লোকেরা এতই আপনার করিয়া লইয়াছে যে আপনার পরামর্শ মোটেই মানিয়া চলা যায় না।"

সহসা অন্তঃপুরের দ্বার হইতে সুকৃতি অনুচ্চকণ্ঠে ডাকিল "দাদা, মা ডাকিতেছেন।" আমি তাহার দিকে চাহিলাম, দেখিলাম—আজ তাহার মূর্ত্তি অন্যরূপ। আজ আবার মনে হইল আমি যেন অতীত কালে বিচরণ করিতেছি, আমি যেন একটি বালক, সুকৃতি যেন একটি বালিকা, এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই, বাবা ছাড়া আর কাহাকেও যদি কেহ প্রাণ দিয়া ভালবাসে তবে সে আমি; আমাকে সে এমন সুন্দর ভাবে সম্বোধন করিল যে আমি তাহার কথাগুলি বীজমন্ত্রের মত অন্তরে অন্তরে গাঁথিয়া না লইয়া যে থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম "চল্ দিদি যাইতেছি।"

মুখ দিয়া কথাটা আপনি বহির্গত হইল; পরক্ষণে আমি দেহখানির ভার গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত। উঠিলাম, কিন্তু উঠিতে ইচ্ছা ছিল না, কারণ মামা তখন আমার সঙ্গে কথোপকথন করিতেছেন, হঠাৎ সে সময়ে উঠিয়া গেলে মামার প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করা হয়।

সে অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ হইল। ধর্ম্ম জানেন, সেটা প্রকৃত অবজ্ঞা নয়, তবুও অসত্যই সত্য হইয়া পড়িল—মামার মুখখানা একবার আড়ভাবে দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম সে বিশেষ ভাবে চটিয়া গিয়াছে।

যাই হোক্ আমি সুকৃতির অনুসরণ করিলাম, মনে হইল সে যেন আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

সুকৃতির পিছনে পিছনে আমি আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম। আমি খাটের উপর উপবেশন করিলাম। সুকৃতি ঘরের এদিকে ওদিকে ঘুরিতে লাগিল।

আমি চুপ করিয়া কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিলাম। মনে হইল এই অন্তহীন বিরাট বিশ্বের বিপুল মিথ্যার অন্ধকারের কোলে একটি মাত্র সত্যের তারা ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে সত্য দুইটি ভাই বোন—তাহার মধ্যে একজন সুকৃতি আর একজন আমি।

ভাবিতেছিলাম সুকৃতি আমার ভগিনী। অল্প বয়সে আমার একটি সহোদরার মৃত্যু হয়। তাহার হাস্যদীপ্ত কোমল মুখখানি আজও মনে পড়ে। সেদিন মনে হইতেছিল আমার ভগিনীটি পরলোকে নাই, সে সুকৃতির রূপে ইহলোকেই বর্ত্তমান। এই সব ভাবনায় বিভোর হইয়াছি, এমন সময় আমাকে চকিত করিয়া সুকৃতি বেডের উপর উপবেশন করিল। একবার তাহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল; সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারিলাম এতক্ষণ একটা কল্পনার রাজ্যে ভ্রমণ করিতেছিলাম।

তারপর সুকৃতি যখন কথা কহিল, তখন দেখিলাম একটা সত্যের নির্দ্দয় বন্ধনের মধ্যে আমি উৎপীড়িত হইয়া উঠিয়াছি।

অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না, চিন্তামগ্ন মনটিকে বিক্ষুব্ধ করিয়া সুকৃতি কথা কহিল, বলিল "কি ঠিক করিলে?"

আমি প্রশ্নটা বুঝিয়াও না বুঝিবার ভাণ করিলাম, "বলিলাম কি ঠিক করার কথা বলিতেছ?

সুকৃতি বলিল "তুমি যাহা ঠিক করিবার জন্য বাহিরে গিয়াছিলেন তাহা ঠিক হইয়াছে কি?"

আমি বলিলাম "হাঁ, একরকম ঠিক হইয়াছে, আমি শীঘ্রই বলিব।"

সুকৃতি বলিল "কবে বলিবে?"

আমার মনে হইল—সুকৃতি যেন গৃহকর্ত্রী আর আমি বেতনভোগী ভৃত্যের মত তাহার আজ্ঞা পালন করিতেছি। কিন্তু কি করিব, আজ্ঞা পালন ব্যতীত তখন আমার অন্য কোন উপায় ছিল না।

ব্যস্ত হইয়া বলিলাম "আচ্ছা কালই বলিব।"

সুকৃতি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল।

আমি স্তব্ধ হইয়া প্রথমে ভাবিলাম—আমি সুকৃতির দাস বলিয়া মনে হইল কেন? তবে আমি কি তাহার কাছে কিছু প্রার্থনা করি, বিবেক বলিয়া উঠিল—তাহাতে আসক্ত বলিয়াই আমি তাহার

গোলাম। করিয়া কি কিছু ভোগ করা চলেনা ?

বুঝিলাম আমরা যাহাকে ভোগ বলি তাহা গোলামী ছাড়া অন্য কোন উপায়ে লাভ করা যায় না। পিতৃত্ব পুত্রের গোলামী, ভ্রাতৃত্ব ভ্রাতার গোলামী, পতির পত্নীর গোলামী। স্বাধীন ভাবে কাহারও গোলামী না করিয়া যে ভোগ করিতে পারে সে নিস্পৃহ, আমার কাছে যাহা ভোগ তাহা তাহার নিকটে ভোগ নাও হইতে পারে।

গোলামীর একটা নেশা আছে, যখনই দেখিলাম গোলামী ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই, তখনই গোলামীটাকে ভালবাসিতে হইয়াছে, কাজেই তর্ক, যুক্তি, বাক্-বিতণ্ডা সাহায্যে সেই গোলামীটারই সমর্থন করিতেছি। গোলামীটার স্বরূপ কি তাহাও মনকে জানিতে দিই না। সেদিন কিন্তু গোলামীটাকে গোলামী বলিয়াই বুঝিয়াছিলাম।

কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই স্থির করিলাম—গোলামী ছাড়া যখন অন্য উপায় নাই, তখন গোলামীই করিতে হইবে, তবে মনে রাখিতে হইবে আমি গোলামী করিতেছি এবং সুবিধা পাইলেই তাহা হইতে মুক্তি লাভও করা চাই।

উত্তর দিলাম, বলিলাম—"ঠিক কিছুই করিতে পারি নাই।"

সুকৃতি বলিল—"কবে পারিবে ?"

আপনার অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া লজ্জিত হইলাম। বলিলাম "আমি শীঘ্রই ঠিক করিব।"

সুকৃতি বলিল "একটা সময় আমাকে বলিয়া যাও।"

আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। সুকৃতি বলিল "কথা বলিতেছ না কেন ?"

নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলাম, উত্তর মিলাল না।

সুকৃতি বলিল "তবে ভাবিয়া পরে উত্তর দিও।"

সুকৃতিকে জিজ্ঞাসা করিবার কথা অনেক ছিল, আমাকে এমন ভাবে ডাকিয়া আনিবার কারণ কি এ কথাটা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়া ছিলাম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাইলাম না। সুকৃতির কাছে বোকার মত বসিয়া রহিলাম, সেই বোকামীর জন্য একটা লজ্জা প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে কশাঘাত করিতে লাগিল।

সহসা অন্তর সতেজ হইয়া উঠিল, ভাবিলাম কিসের লজ্জা, কিসের সঙ্কোচ—যাহা ভাল বুঝি, তাহাই করিব। আমি স্বাধীন, আমি কর্ত্তা—নিজের কর্ম্মফল নিজে ভোগ করিব। সুকৃতিকে বিবাহ করিতে যখন ইচ্ছা হইয়াছে তখন তাহাই করিব। বলিলাম "সুকৃতি এতক্ষণে তোমাকে বলি, কি করিবে তাহা দিন ঠিক হইয়া গিয়াছে।"

বুঝিলাম মিথ্যা বলিতেছি, তবুও ভাবিলাম এ সব মিথ্যা দূষনীয় নয়।

সুকৃতি বলিল "আচ্ছা আর এক দিন না হয় বলিও।"

আমি বলিলাম "অন্য দিন কেন, আজই বলিতেছি।"

সুকৃতি বলিল "এত ব্যস্ত কেন ? না হয় অন্য দিনই একটু ভাবিয়া বলিবে।"

লজ্জিত হইলাম, গম্ভীরভাবে বলিলাম "আচ্ছা তাহাই বলিব।"

সুকৃতি চলিয়া গেল। স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। মনে হইল বিশ্ব-জগৎ একটা বিরাট রহস্য, সেই রহস্যের অতল প্রবাহে ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের মত কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছি, কোন জ্ঞান নাই, কেবল মাঝে মাঝে মনে হইতেছে আমি ভাসিয়া চলিয়াছি, হায় রে এ ভাসার অন্ত নাই। আর শক্তি নাই, বল নাই। ইচ্ছা হইল ডাক ছাড়িয়া বলি - ওগো কে আছ আমাকে শক্তি দাও। আমি তোমাকেই চাই। আমি ভিখারী, তুমি রাজাধিরাজ, তুমি আমার বাক্যমনের অগোচর তুমি আছ ইহাই আমার বিশ্বাস। আমার কে যেন তাড়িতময় বাক্যে বলিয়া উঠিল "মিথ্যাবাদী, তোমার বিশ্বাস

বিশ্বাস বলা যায় না।" কই ভগবান্ আছেন একথা বিশ্বাস করি কি? কখনই নয়। তাঁহাকে বিশ্বাস করিলে মানুষের ভয় কোথায়? এ বিশ্বের যদি এক মঙ্গলময় বিধাতা থাকেন তাহা হইলে দুঃখও থাকিতে পারে না, কিন্তু ভগবান কেমন জিনিস? মঙ্গলময় বিধাতারই বা কি স্বরূপ? আমি জানিতে চাই। এই অনন্ত বিশ্বের অনন্ত রহস্য আমার কাছে প্রভাত আলোকের মত ফুটিয়া উঠুক। এই বিশ্ব-রহস্য ফুটিবার জন্যই আমার এই জীবন।

বাহিরে চলিয়া আসিলাম। মনে নানা ভাবের উদয় হইতেছিল। দেখিলাম মামা ঘরের একটা কোণে একখানা পুরাতন সংবাদের কাগজের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কত কি ভাবিতেছেন। আমি বলিলাম "মামা, ভাবনা কিসের?"

তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন "কিছুই ভাবি নাই।"

আমি বলিলাম "মনটা যে ভাবনা ছাড়া থাকিতে পারে না।"

মামা একটু অপ্রস্তুত হইয়াই বলিলেন "না তেমন কোন ভাবনা আমার নাই। তুমি যে কথা না বলিতেই অর্থ বুঝিয়া ফেল দেখিতেছি।"

আমি বলিলাম "আমি কি আর বুঝি, আপনারা বুঝাইয়া দেন যে?"

মামা চুপ করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন আমি তাঁহার কথার জবাব দিতে সাহস করিব না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

আমি ভাবনার সমুদ্রে ভাসিয়া চলিলাম। স্থির করিলাম আজ একটা সিদ্ধান্তে আসিতেই হইবে। মনে হইল আল্লাকে তিনি কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তিনিই আমার কার্য্যের জন্য দায়ী; অতএব মামা খুলি তাহাই করিয়া যাই। কিন্তু আমার কার্য্য আমিই করিতেছি, আমিই তাহার ফলভাগী। যদি কেহ আমার প্রবর্ত্তক থাকেন, তিনি আমার জ্ঞানাতীত—আমি তাঁহাকে জানিতে চাই। যখন জানিব তখন স্বেচ্ছাচারী হইতে পারি। এখন আমাকে বিচার করিয়া চলিতে হইবে।

বেহারী হঠাৎ হুঁকা হাতে করিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল "কি গো দাদা, ভাবনা কিসের?"

আমি বলিলাম "আচ্ছা, বেহারী দাদা, বল ত একটা কাজ যদি নিন্দনীয় হয়, তাহা হইলে কি সেটা করা উচিত?"

বেহারী বলিল "না ভাই, সে কাজ কি করিতে আছে?"

আমি বলিলাম "কেন, আমি যদি সে কাজে কোন দোষ দেখিতে না পাই—"

বেহারী বলিল "তাহা কি হয় ভাই? নিজের দোষ কি লোকে বুঝিতে পারে?

বেহারী আমাকে বুঝাইয়া দিল আমার কাছে যে কাজ ভাল, তাহা সমাজের কাছে নিন্দনীয় হইতে পারে। তবে কি সমাজের কাছে মাথা নীচু করিয়া থাকিতে হইবে। কখনই নয়। বেহারী ভৃত্য, সে লোকের নিন্দা বা সমাজের শাসনকে ভয় করিয়া চলুক, আমি নির্ভীক হইয়া থাকিতে চাই। আমি স্বাধীন, আমি বিচার করিয়া যাহা ভাল তাহাই করিব। পরের মত মানিয়া চলা আমার কার্য্য নয়।

আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া বাগানের এদিকে সেদিকে পায়চারি করিতে লাগিলাম। বেহারী গান ধরিল;—

"আয় রে আয় হরি বলে বাহু তুলে নেচে আয়
ডাকলে হরি রইতে নারে রাখবে তোরে
রাজা পায়।"

বুঝিলাম বেহারীর 'হরি' কাল্পনিক, যে তাহাকে ডাকে তাহাকেই তিনি রাজা চরণে স্থান দেন। আমি তাঁহাকে ডাকিতে চাই না, সুতরাং রাজা চরণে স্থান না পাইলেও আমার বিশেষ কোন ক্ষতি নাই।

সে দিন গভীর চিন্তায় কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পরই নারিকেলের পত্রান্তরালে চন্দ্র নবজাত হাস্য-মুখ অনিন্দ্যসুন্দর শিশুটির মত প্রপঞ্চটার চারিদিক বিমুগ্ধ করিয়া তুলিল। আমার মনে বাল্যকালের নানা চিত্র ফুটিয়া উঠিল।

বাড়ীতে মামা নাই। মনে হইল এবার আমি স্বাধীন কোন বাধা নাই। মামা যে কিসের বাধা তাহা তখন আমি বুঝিতে পারি নাই। একটু এদিকে সেদিকে ঘুরিয়া আমি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। শুনিলাম মা উপরে আছেন। সুকৃতি নীচে রন্ধনের জোগাড় করিতেছে। আমি ফিরিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলাম।

কিছুক্ষণ পরে কে যেন টানিয়া আমাকে অন্তঃপুরের দিকে লইয়া আসিল। ভিতরে আসিতেই সুকৃতি বলিল "এ সময়ে তুমি ত এখানে আস না।"

আমি উত্তর দিতে পারিলাম না। সুকৃতি চলিয়া গেল। আমি ভাবিলাম এ কি ব্যাপার!

নিঃশব্দে বাহিরে আসিলাম। রাত্রে আহারাদির পর মামার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় সুকৃতি সহোদরার মত আমাকে ডাকিল "দাদা, তুমি ঘরে এস, কথা আছে।"

আবার মামার মুখখানা গম্ভীর করিয়া আমি উঠিলাম। মৃগের মত সুকৃতির অনুসরণ করিয়া তাহার কক্ষে প্রবেশ করিলাম। সুকৃতি মেঝের উপর এবং আমি খাটের উপর বসিলাম।

দুই জনেই নীরব হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। তারপর সুকৃতি কহিল "তোমার বড় ভাবনা হইয়াছে।"

আমি বলিলাম "কেন?"

"তুমি রোগা হইয়া গিয়াছ। তোমার ভাবনা কিসের?"

আমি বলিলাম "কিসের ভাবনা তুমি কি তাহা জান না?"

সুকৃতি বলিল "ভাবনা আমার জন্য ত?"

আমি বলিলাম "না, ভাবনা নিজের জন্য—আমি কি করিব তাহাই দিবারাত্র ভাবিতেছি।"

সুকৃতি বলিল "কিছু ঠিক করিয়াছ?"

আমি বলিলাম "তোমাকে আমি শাস্ত্রমতে বিবাহ করিব।"

সুকৃতি বলিল "আমার এ ক্ষেত্রে কি কর্ত্তব্য তাহা ঠিক করিয়াছ কি?"

আমি বলিলাম "তোমার কি তাহাতে অমত আছে?"

সুকৃতি বলিল "অমত নাই, তবে আমার কর্ত্তব্য কি?"

আমি বলিলাম "বিবেচনা কর।"

সুকৃতি বলিল "তুমি পুরুষ মানুষ, তোমাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমার বিবেচনা শক্তি নাই বলিয়াই তো তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

আমি বলিলাম "আচ্ছা, এবারের উত্তর আমি দিতেছি। তুমি কি চাও?"

সুকৃতি বলিল "আগে চাহিতাম তুমি আমাকে গ্রহণ কর। সেদিন কিন্তু মামাকে রাগাইবার জন্যই যখন তোমাকে ছোট বোনের মত ডাকিয়া আনিলাম তখন হইতে ভাবিতেছি তুমি আমার কি কর্ত্তব্য বলিয়া দাও।"

আমি মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া রহিলাম। সুকৃতি বলিল "দেখ, আমি জানি আমার রূপ আছে, তবুও সে রূপ তুচ্ছ করিয়া যেদিন তুমি আমাকে ছাড়িয়া গেলে, সেই দিন হইতে তোমার প্রতি আমার ভক্তি বাড়িয়া উঠিয়াছে। যখন ভাবি তুমি আমার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছ, তখন আনন্দ হয় সত্য, কিন্তু তোমাতে সে তেজ নাই দেখিয়া দুঃখিত হই। তুমি শিবের মত তেজস্বী হও। আমার কর্ত্তব্য কি বলিয়া দাও—তুমি উদার হইয়া যাহা বলিবে তাহাই করিব।"

আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। সুকৃতি ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

রাত্রি গভীর হইয়া আসিল। একবার ভাবিলাম —মুক্তিকে সহোদরার মত দেখাই আমার উচিত। এক সময় তাহাকে এই রূপেই দেখিয়া পরিতৃপ্ত ছিলাম; এখন দেখিতেছি সে সহোদরার চেয়েও অধিক। তাহাকে সহোদরার মত ছোট ভাবিলে অন্যায় অসত্য হইবে। তাহা ভাবিতে পারিব না। সহোদরার প্রীতি তাহাতে পাইয়াছি, লক্ষ্মীকেও দেখিয়াছি; সে কিন্তু একাধারে সহোদরা ও প্রণয়িনী। তাহার মুখখানি বালিকার মত কোমল—তাহাকে দেখিলে অন্তর স্নেহরসে ভরিয়া উঠে। সে একাধারে বালিকা, যুবতী, তরুণা, সহোদরা ও প্রেমময়ী। তাহার প্রেমময়ী মূর্ত্তিই আমার অন্তরে তখন স্পষ্টতম, তাহাকে পাইলে অন্তর পরিতৃপ্ত হয়। আমি তাহার জন্য কাঙ্গাল। আমি তাহাতে আসক্ত, কেমন করিয়া তাহার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিব।

বাগানের মধ্যে একটা শৃগাল হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি চমকিত হইলাম, তারপর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিলাম। আমার কথা আজ এই খানেই শেষ করিলাম।

* *

আমি বলিলাম "চল আরো খানিকটা হোক।"

কয়েদী বলিল "কাল বলিব।"

আমি বলিলাম "আপনি কয়েদী, আপনাকে প্রত্যহ এখানে ডাকিয়া আনা ভাল দেখায় না?"

কয়েদী বলিল "না ডাকিতেও পারেন।"

আমি বলিলাম "তাহা পারিলে আপনাকে ডাকিতাম কি?"

কয়েদী থামিল, বলিল "ঠিক জবাবটা দিতে পারিলে না ভাই। মনে করিয়াছিলাম, বলিবে আমি না ডাকিলে তোমারও তো চলে না!"

আমি বলিলাম "ও কথাটা মনে হয় নাই, বলুন তো আপনাকে এত কথা বলিতে হইতেছে কেন?"

কয়েদী বলিল "তোমাকে প্রতিদিন যে গল্প শুনাইতেছি তখন বলিবার প্রয়োজন কি তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছে? প্রয়োজন আমার নয়, তাঁহার; কি উদ্দেশ্যে তিনি যে আপনার আমার মধ্যে এতটা ঘনিষ্ঠতা আনিয়া দিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। আমার বলিতে আনন্দ হয়, সেই জন্যই এত বকি। তবে আজ চলিলাম।"

এই কথা বলিয়া কয়েদী প্রস্থানের উদ্যোগ করিল।

(ক্রমশঃ)

ভিক্ষা

(শ্রীমতী লীলা দেবী)

নমি হে চরণে নমি সম্মুখে নমি তোমাদের বারংবার
নমি হে ঊর্দ্ধে নমি হে অধোতে অবহেলা ওগো ক'র না আর!
রুদ্ধ গৃহের বদ্ধ কারায় ধায় ধায় ধায় হ'য়েছে প্রাণ,
ধাও হে মুক্তি ধাও স্বাধীনতা ঘুচাও মোদের এ অপমান।
ভারতের কোটী কোটী নারী আজ হে পুরুষ তব চরণ-তলে,
যাচিছে ভিক্ষা, যাও হে দীক্ষা ডুবিল ভারত নয়ন-জলে।

কঠিন কারার শৃঙ্খল-হার হাজার বছর বহি যে হায়
ঘিরু বাতাস, ধূসর আকাশ, ধরার ভ্রূকুটি, দেখা না যায়!
লৌহ-প্রাচীর ভেদিয়া কখন অন্ধকারের ভেদিয়া বুক,
উদিত না হয় জ্ঞানের সবিতা হেরি না কখন রবির মুখ।
বুক-ফাটা দুখে গুমরিছে বুকে শুধুই মিথ্যা আশার ছল,
ওগো ভারতের ত্যাগী ঋষি জ্ঞানী মুছাও মোদের নয়ন-জল।

দাও ছেড়ে দাও কর্ম্মের মাঝে চলিব ধরিয়া স্বামীর হাত,
দাও মিটাইতে জ্ঞানের পিপাসা ফুটুক্ আলোক ঘুচুক্ রাত।
দাও স্বাধীনতা অম্লান মুখে তুচ্ছ করিব মিথ্যা ভয়,
জ্ঞানের পথেতে বিবেক রথেতে দারুণ শত্রু করিব জয়।
দাও খুলে দাও বন্ধ দুয়ার অন্ধ করিয়া রেখো না চোখ,
মাঠের হাওয়ায় সবুজ ধরায় তটিনীর, গায় ভুলিব শোক।

স্বার্থ তুষ্ট হীনতা দৈন্যে লক্ষ নারীর পরাণ বলি,
সহে না যে আর দাও প্রতিকার ত্যাগের গর্ব্বে চলিব বলি'—
—ধর্ম্মের নামে সমাজের হেয় রমণী বধের এ প্রতারণা;
যে চায় দাও হে থাকিতে কুমারী তাপসিনী নারী শুদ্ধমনা—
—জ্ঞানে প্রেমে যোগে অতুল প্রতিভা উঠিবে ফুটিয়া সাধনা বলে
আবার ভারত তপোবনে বনে হোমের বহ্নি উঠিবে জ্ব'লে!

স্মৃতি

(অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য এম এ.)

ঝর্ ঝর্ ঝর্! আকাশ জুড়ে, মাঠ ছেয়ে আষাঢ়ের বারিধারা বহুদিনের সঞ্চিত অশ্রুবিন্দুর ন্যায় অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে ঝরে পড়ছে। আর শন্ শন্ শন্! সেই কালো মেঘের কালো জলরাশি ভেদ করে প্রবল বাতাস হু হু শব্দে সুপ্ত বেদনার অফুরন্ত উচ্ছ্বাস বুকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত ধরণীর উপর দিয়ে ছুটে চলেছে।

সেদিনও ঠিক এমনি করে বৃষ্টি নেমেছিল। তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়তাম। আষাঢ়ের দীর্ঘ দিনগুলি আর কিছুতেই কাটতে চায় না। সেবার পরীক্ষার বছর ছিল, বন্ধুরা সব বলতেন, মনোযোগ দিয়ে পড়, ভাল করে অনার্স পাওয়া চাই। আমার কিন্তু সেই সব দুর্ব্বোধ্য গণিতের বইগুলির মাঝখান দিয়ে প্রাণটা ক্রমেই হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিল।

শুক্রবার—সেদিন বোধ হয়, কিসের একটা ছুটী ছিল। সারাদিন বইয়ের মধ্যে ডুবে থেকে বিকেল বেলায় শরীরটা বড় অবসন্ন বোধ হ'তে লাগ্‌ল। ভাবলাম—যাই একবার ইডেন গার্ডেন দিয়ে বেড়িয়ে আসি।

বেরিয়ে পড়লাম। কলেজ ষ্ট্রীট দিয়ে, বৌবাজার দিয়ে, জেনারেল্ পোষ্ট অফিসের পাশ দিয়ে, একে-

P.305

বারে হাইকোর্টের কাছে এসে উপস্থিত হলাম। পরীক্ষার ভাবনায় অত্যন্ত অন্যমনস্ক ছিলাম, কাজেই এধারে যে মাথার উপর চারিদিক অন্ধকার করে আষাঢ়ের জলদমালা আকাশ ঘিরে ক্রমেই গাঢ়তর হচ্ছিল, সেদিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না। গঙ্গার ধারে উপস্থিত হয়ে দেখি গঙ্গার জলে মেঘের দল তাদের কালো ছায়া নামিয়ে দিয়েছে।

বাগানের মধ্যে ঢুকতে না ঢুকতে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হল। পট্ পট্ পট্! গাছের পাতায়, কোপের উপর, দালানের ছাদে, চারিদিকে এক তুমুল কলরব উঠ্‌ল। জলো হাওয়া রাস্তার ভেজা ধুলোর গন্ধ বহন করে এনে বৃষ্টির ফোঁটাগুলিকে ছাতার নীচে দিয়ে গায়ের উপর ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। নেহাৎ বেগতিক দেখে দৌড়িয়ে সামনের সেই উঁচু মন্দিরটার মাঝখানে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। বাগানে যারা শুধু হাওয়া খেতে এসেছিলেন তারা সেই হাওয়ার সঙ্গে অত্যধিক পরিমাণে জলযোগেরও ব্যবস্থা দেখে চারি দিক থেকে ছুটে এসে সেই ঘরটীতে জড় হ'লেন।

আমি দাঁড়িয়েছিলাম খালের দিকে একেবারে পশ্চিমের কোণে। এই আকস্মিক দৈবদুর্যোগের বিষয় চিন্তা কচ্ছিলাম, হঠাৎ চেয়ে দেখি একজন যুবক একটী মেয়ে সঙ্গে করে আমার কাছে এলেন। সে স্থানে দু'জনের মত দাঁড়ানর জায়গা ছিল না। মেয়েটী বৃষ্টিতে ভিজতে লাগল। আমি তাড়াতাড়ি একটু সরে গিয়ে মেয়েটীর দিকে চেয়ে বল্লাম,—"আপনার কষ্ট হচ্ছে, আপনারা এখানে আসুন।" অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে মেয়েটী আমার পূর্ব্বের জায়গাটীতে এসে দাঁড়াল। সঙ্গের ভদ্রলোকটী বলতে লাগলেন, "আপনি শুধু শুধু আমাদের জন্য ভিজতে লাগলেন"—"না না, কিছু না, আমার সঙ্গে ছাতা আছে" বলে আমি তাড়াতাড়ি ছাতাটী খুললাম। ও যেন আমার কিছুই অসুবিধা হয় নাই তাই মেয়ের জন্য পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করে অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে পড়তে লাগলাম। বৃষ্টির ছিটে এসে আমার গায়ে পড়তে লাগল। চেয়ে দেখলাম আমার অবস্থা দেখে মেয়েটী অত্যন্ত লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। তার জন্যই যে আমি এতটা কষ্ট কচ্ছি, সে যেন তা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে। মনে মনে আমার এই বীরত্বের জন্য একটা আনন্দ অনুভব করতে লাগলাম।

ঝম্ ঝম্ ঝম্। সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকার ভরে, পথ, ঘাট, মাঠ ভাসিয়ে বাদলের ধারা বয়তে লাগল।

"মতিবাবু! বৃষ্টি যদি না থামে?" "তাকি হয়! এক্ষুণি পেমে যাবে!"

দেখলাম বালিকার সেই সুন্দর মুখের উপর একটা তীব্র উৎকণ্ঠার ছবি ফুটে উঠেছে বৃষ্টির সেই গভীর গর্জ্জন ছাপিয়ে তার সেই কথাগুলি এসে আমার কানে বাজতে লাগল,—"বৃষ্টি যদি না থামে?" কি মধুর স্বর। হায় রে আমার যদি উড়বার ক্ষমতা থাকত, তাহ'লে আমি তখনি মেয়েটীকে নিয়ে তাদের বাড়ী পৌঁছিয়ে দিয়ে আসতাম। তাদের বাড়ী কোন্ দিকে? হয়ত বহুদূরে শ্রামবাজার বা ভবানীপুরের কাছে, অথবা খুব নিকটেই, এইখানে কোথাও হবে। আবার এমন হতে পারে যে আমরা যে মেসে থাকি তারই পাশে এদের বাড়ী। কেন জানি না আমার সারাটা মনের উপর দিয়ে হঠাৎ একটা তড়িতের মত আনন্দ-স্রোত খেলে গেল। যদি তাই হয়? তাহ'লে কি হয়? কিছুই না। অথচ নিজের অজ্ঞাতসারে কত রকমের চিন্তা এসে মনের মধ্যে জড় হ'তে লাগল।

কতবার ভাবলাম জিজ্ঞাসা করে সব জেনে নিই। কিন্তু কেন জানি না বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব লজ্জা এসে সেদিন আমার কণ্ঠ রোধ করে দিল। চির পরিচিতের ন্যায় এত কাছে পেয়েও আমি মুখ ফুটে তাদের সঙ্গে একটা কথা বলতে পারলাম না।

23.267

ক্রমে বৃষ্টির শেষ হ'ল। সকলেই নিজ নিজ আবাস অভিমুখে যাত্রা করলেন। তারাও চলে গেল। যাবার সময় সে আমার দিকে একটীবার দৃষ্টিপাত করলে,—সে দৃষ্টি মৌন কৃতজ্ঞতা-ব্যঞ্জক। আমার ইচ্ছে করতে লাগল সঙ্গে গিয়ে তাদের বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দিই, কিন্তু কিছুতেই তখন আমার পা উঠল না। শেষ পর্য্যন্ত সেই ঘর খানির মধ্যে ব'সে রইলাম। আমি মনের মধ্যে যেন কিসের একটা তীব্র বেদনা অনুভব করতে লাগলাম। পরীক্ষার ভাবনায় কি? হবে। রাত্রির আঁধার মনের মাঝখানকার অন্ধকারকে যেন আরও গাঢ়তর করে ফেলছিল।

কতক্ষণ এরূপভাবে বসেছিলাম মনে নেই, হঠাৎ কানে গেল "আপ ঘরমে নেই যাইয়েগা?" সত্যিই ত অনেক রাত্রি হয়ে গেছে। মেসের সকলে ভাববে আমি পিটোর দেখতে গিয়েছি। ছি, বড় অন্যায় হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি মেসে ফিরবার জন্য রওনা হ'লাম।

সেইদিন থেকে কেমন রোগ হয়ে দাঁড়াল, বিকেল হ'লেই ইডেন গার্ডেনের দিকে যেতে ইচ্ছা করত। সারাদিনের কঠিন খাটুনীর মধ্যে অন্ততঃ দশবার মনে হ'ত কখন পাঁচটা বাজবে। পাঁচটা বাজলেই বেরিয়ে পড়তাম। বাগানের আশে পাশে নানা জায়গায় ঘুরে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে সেই মন্দিরটীর ভিতর গিয়ে বসতাম। সেইখানে বসলেই কত কথা মনে জাগত। আজও যদি সেরূপ ভাবে বৃষ্টি নামে? আর সেই সঙ্গে আবার আজও যদি তাদের দেখা পাওয়া যায়? তাহ'লে কি হয়? বোধ হয় কিছুই না। অথচ কেন যে আমার চক্ষু দুটী কাহার দর্শন প্রত্যাশায় সেই বাগানের চারিদিক দিয়ে ছুটাছুটী করতে থাকত, কর্ণযুগল কোন পরিচিত কণ্ঠের স্বর শুনবার জন্য ব্যগ্র হয়ে খাড়া থাকত, আমি তা ভেবেই ঠিক করতে পারতাম না।

দিনের পর যেমন দিন যেতে লাগল, আমার বাগানে যাওয়ার নেশাটা তেমনি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। বন্ধুরা অনেক সময় বলতেন,—"কিহে, আজকাল যে রোজই বাগানে যাওয়া হচ্ছে।' আমি উত্তর করতাম—'হাঁ, পরীক্ষার পড়ার পর, মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে, তাই একটু ঘুরে আসি।'

কোনদিন রাত্রে মেসে শুয়ে যদি বৃষ্টি নামত, অমনি নিজের অজ্ঞাতসারে মনটা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠত, ভাবতাম হয়ত তারা এখন বাগানে বেড়াতে এসেছে, আর এই বৃষ্টির জন্য সেই ঘরটীতে আশ্রয় নিয়েছে, তখনই বাগানে ছুটে যাবার জন্য ব্যস্ত হতাম, কিন্তু পরক্ষণেই নিজের এই অসম্ভব কল্পনায় ব্যথিত হয়ে শুয়ে পড়তাম।

সে দিন রেঙ্গুন থেকে একখানা মেল জাহাজ এসেছিল। বেড়াতে বেড়াতে অন্যমনস্কভাবে আউটরাম ঘাটে এসে দেখলাম অনেক লোক জাহাজ দেখতে জড় হয়েছে। আমিও চুপ করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জাহাজ থেকে যাত্রীদের নামা দেখতে লাগলাম। হঠাৎ এক পাশে মজর পড়ায় আমি চমকে উঠলাম। সেই দিনের সেই ভদ্র লোকটী না? হাঁ নিশ্চয়ই সেই 'মতিবাবুই' হবে। চকিতের মত চারিদিকে একবার চেয়ে দেখলাম, তার সঙ্গে সেও এসেছে কিনা। কই না? সে চক্ষু দুটী যে আমি হাজার লোকের মাঝখান থেকেও বের করতে পারতাম। মনে ভাবলাম, হয় ত সে কাছেই কোথাও কারও সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছে, আর মতিবাবু তার জন্য এখানে অপেক্ষা কচ্ছেন, সে এলে সকলে ফিরে যাবেন। আমার ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হচ্ছিল সে কোথায় গিয়েছে, কিন্তু পা দুখানি বিদ্রোহীর মত কিছুতেই উঠতে রাজী হচ্ছিল না।

কিছুকাল চেয়ে থাকবার পর দেখলাম ভদ্রলোকটী প্রস্থান করবার উদ্যোগ কচ্ছেন। আর যদি কোন দিন না দেখা হয়? অদৃষ্টে যা থাকে

আজ তার সঙ্গে কোন গতিকে আলাপ কত্তেই হবে।

ভদ্রলোকটী প্রায় চলে যাচ্ছিলেন, এমন সময় আমি কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—"আপনি কি রেঙ্গুন যাবেন?"

"না। এই জাহাজ ত এইমাত্র রেঙ্গুন থেকে এল।"

"আচ্ছা রেঙ্গুনের ভাড়া কত?"

"আমি ঠিক জানিনে, আপনি অফিসে গিয়ে খোঁজ করুন।"

ভদ্রলোকটী আমার দিকে আর না তাকিয়ে চলতে লাগলেন। আমিও তাঁর পিছন পিছন চলতে সুরু করলাম। "আপনারা এখানে কোথায় থাকেন?" "গণেশ মুখার্জ্জীর ষ্ট্রীটে।" "সেখানে কি ভাল মেস টেস্ পাওয়া যায়?" "কলিকাতার সহরে মেসের আর অভাব কি?" ব'লে ভদ্রলোকটী আমার দিকে একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত করে সামনেই একখানা গাড়ীতে উঠে বসলেন। গাড়ী চলতে লাগল।

গাড়ীখানা দৃষ্টির বহির্ভূত হয়ে গেলে আমার হঠাৎ মনে পড়ল আচ্ছা এ গাড়ীর মধ্যে সে ছিল না ত। অমনি ঘট্ করে একটা অনুতাপের বেদনা এসে আমার মনকে তীব্রভাবে দংশন করতে লাগল। হায়! কেন আমি এদিকে এসে একবার খোঁজ করলাম না! অন্ততঃ যাবার সময়ও ভাল করে গাড়ীখানার ভিতরটা দেখে নিলাম না।

সে রাত্রে মেসে ফিরে এসেই একখানা ডাইরেক্টরী পত্রিকা বের করে দেখে নিলাম গণেশ মুখার্জ্জীর ষ্ট্রীটটা কোথায়। পরদিন সকালে উঠে ঠাকুরকে বললাম—"ফিরতে একটু দেরী হবে, আমার ভাত যেন ঢেকে রেখে দেওয়া হয়।' বন্ধুদের বললাম—একটা জরুরী কাজের জন্য যাচ্ছি, আজ আর কলেজে যাওয়া হবে না।

অনেক খোঁজা-খুঁজির পর দেখলাম গণেশ মুখার্জ্জির ষ্ট্রীট একটী ছোট রাস্তা, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট থেকে বেরিয়েছে। গলিটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দু'ধারে অনেক ভদ্রলোকের বাড়ী। মেসও দুই তিনটী মিলল, কিন্তু সবগুলিই ভর্ত্তি, কোথাও সিট নাই। অবশেষে রাস্তার শেষ প্রান্তে গিয়ে দেখলাম একটা বাড়ীর সামনে লেখা আছে মেষার আবশ্যক। ভিতরে খোঁজ করবার পর ম্যানেজার মহাশয় বললেন একটীমাত্র সিট খালি আছে, এক্ষুনি টাকা জমা দিলে সেটী আমি পেতে পারি। আমি আর দ্বিরুক্তি না করে টাকা দিয়ে সিটটী ঠিক করে এলাম।

দু'দিন পরে পুরাতন মেস ছেড়ে চলে আসবার জন্য বন্দোবস্ত করতে লাগলাম। বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ শুনে অবাক্ হলেন, অনেকে কানাকানি করতে লাগলেন, কেহবা আমার আসন্ন বিরহে অত্যন্ত কাতর হ'য়ে পড়তে লাগলেন। আমি সকলকে বুঝিয়ে বুঝালাম, এখানে খরচ বেশী পড়ে তাই মেস বদলাচ্ছি।

নূতন মেসে নূতন সিটে এসে প্রথম রাত্রি আমার ঘুম এল না। সামনের জানালা খুলে দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। এখনও আকাশের পশ্চিম প্রান্তে কয়েকখণ্ড সাদা মেঘ জমাট বেঁধে রয়েছে। আর তার পাশ দিয়ে অস্ত যাচ্ছে শুক্লপক্ষের অর্দ্ধচন্দ্র। ভেজা জ্যোছনা এসে কত বাড়ীর ছাদের উপর, দেওয়ালের পাশে, জানালার গায়ে নীরবে বিশ্রাম করছে। যতদূর চাওয়া যায় বাড়ীর উপর বাড়ী—অলক্ষ্য সৌধমালা তাদের ভিতরে কত অজ্ঞের রহস্য নিয়ে শুয়ে আছে। এরই মধ্যে কোন বাড়ীতে হয় ত কত জ্যোছনা তার গায়ে এসে পড়েছে, কত বাতাস তার পাশ দিয়ে শিউরে চলে যাচ্ছে। শেষ রাত্রে একটু তন্দ্রার মত এসেছিল, তারই মধ্যে একটী দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠে দেখি ভোর হয়ে গিয়েছে।

পূর্ব্বেই বলেছি আমার এ মেসটী ছিল রাস্তার

যেত পশ্চিম দিকে। কাজেই কলেজে যেতে ও আসতে রাস্তার সব বাড়ীগুলিকে দুবেলা করে দেখবার অবকাশ হত। কিছুদিনের মধ্যে প্রায় সব বাড়ীই মুখস্ত হয়ে গেল। অনেক বাড়ীর লোকের মুখও আমার পরিচিত হয়ে দাঁড়াল। মাঝে মাঝে অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি, মতিবাবুরা কোথায় থাকেন, কিন্তু কেহ তাঁদের ঠিকানা বলতে সমর্থ হয় নি।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলে গেল। আষাঢ় কেটে শ্রাবণ এল, ক্রমে শ্রাবণও শেষ হয়ে ভাদ্র দেখা দিল। আকাশে এখনও মেঘের খেলা পূর্ণোদ্যমে চলেছে। সেই বর্ষণ-সিক্ত ধরণীর শ্যাম শোভা ও রজনীর মেঘমন্দ্র অম্বরের গুরু গুরু ধ্বনির নানাস্থান দিয়ে আমার কেবলই মনে হতে লাগল,—শূন্য তরা বাসর, ঘর ভাদর, শূন্য মন্দির মোর'—জীবনের ক্লান্ত দীর্ঘ দিনগুলি যেন ক্রমেই পরিপূর্ণ বাধার ভার নিয়ে মনকে অবসন্ন করে দিতে লাগল। কলেজ থেকে এসেই বইগুলিকে ছুঁড়ে এক দিকে ফেলে দিয়ে শুয়ে পড়তাম। টেবিলের উপর এলোমেলো ভাবে বিছান পুস্তকের রাশি, আলনার কাপড়গুলির বিপর্য্যস্ত ভাব, চোখের সামনে এমনি একটা বিশৃঙ্খলার ছবি ফুটিয়ে তুলত যে জীবনের উপর একটা তীব্র বিতৃষ্ণা এসে পড়ত। চিরদিন এমনি করে মেসেই কেটে গেল, এ অগোছাল জীবনটাকে একদিনের জন্যও কেউ গুছিয়ে নিলে না।

ইদানীং বাড়ী দেখবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীও দেখতে লাগলাম। জানালার কাছে বসে চেয়ে দেখতাম কত রকমের গাড়ী কত রু-বেরংএর যাত্রী বুকে নিয়ে চলেছে। এরই মধ্যে যদি সেদিনকার সেই গাড়ীখানা দেখতে পাওয়া যায়? আর তার মধ্যে যদি—পরক্ষণেই একটা নৈরাশ্যের বেদনা এসে সমস্ত কল্পনাকে ম্লান করে গভীর দুঃখে মনপ্রাণ পূর্ণ করে ফেলত।

ক্রমেই শরীর ও মন নিস্তেজ হতে লাগল। ব্যর্থ-প্রেমের ফলে কি? হয়ত তাই। পুরাতন বন্ধুরা দেখে বললেন আমার শরীর আগের চেয়ে খুব খারাপ হয়ে গেছে। আমি বললাম এ মেসের খাওয়া দাওয়া ভাল না তাই এরূপ হচ্ছে।

দেখতে দেখতে বর্ষার অশ্রু মুছে গিয়ে চারিদিকে শরতের হাসি ফুটে উঠল। মধুর শরৎ! নারাটা বছরের ছুটে একটা আশা ও আনন্দের উদ্দীপনা জাগিয়ে দিয়ে মধুর আশ্বিন মাস দেখা দিল। এমনই একটা দিনের বিকাল বেলা এ মেসের নূতন জ্যোতিষ এসে বল্লে, ওহে একটা কাজ করে দিতে পার?

"কি কাজ জ্যোতিষ দা?"

"আগে বল করবে কিনা?"

"আচ্ছা করব, বল।"

"আমার এক বন্ধু তার টিউশনিটা তিন দিন করে দিতে বলেছিলেন, তা' আমিও আজ বাড়ী যাচ্ছি, তুমি এ কয়দিন চালিয়ে দিতে পারবে?"

"তা আর এমন শক্ত কি?"

"তবে এই নাও চিঠি। এই চিঠিতেই ঠিকানা লেখা আছে। এই বাড়ীতে গিয়ে এই চিঠিখানা দিলেই সব ঠিক হবে।"

আমি আর দ্বিরুক্তি না করে চিঠিখানা নিয়ে পকেটের মধ্যে রাখলাম।

সন্ধ্যার পর চিঠিখানা নিয়ে নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় দরোয়ানের হাতে দিলাম। কিছুকাল পর একটী ছোট ছেলে এসে আমায় নিয়ে দোতলায় একটী ঘরে গিয়ে বল্লে,—"আপনি বসুন এইখানে।"

আমি একখানা চেয়ারে গিয়ে বসলাম।

আট দশ মিনিট বাদে একটী মেয়ে কতকগুলি বই হাতে করে সেই ঘরে প্রবেশ করল। প্রথমটা আমি লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু আমার কাছে এসে বসতেই আমি চমকে উঠলাম। এ 'সে' না? হাঁ সেই ত। মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমার সারা শরীর ও মনের মধ্যে একটা তীব্র চাঞ্চল্য অনুভব করতে লাগলাম। যার জন্য কতদিন কত যায়গায় ঘুরেছি

সে আজ আমার এত কাছে! এ স্বপ্ন অথবা আমার অলীক কল্পনা নয় ত? তাড়াতাড়ি চোখ মুছে আবার দেখলাম, না না সেই ত! তার ছবি যে আমার মানস পটে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হয়ে গেছে।

মেয়েটী কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে নতমুখে জিজ্ঞাসা করল 'আপনাকে কি মতি বাবু পাঠিয়েছেন?' 'না তার একজন বন্ধু পাঠিয়েছেন।' আমার মনে আর কোন সন্দেহ রইল না। এ নিশ্চয়ই সে। সে কি আমায় চিনতে পেরেছে? বোধ হয় না। একটা প্রবল ঔৎসুক্য আমার মনের মধ্যে জাগতে লাগল,—সে দিনকার বাগানের কথা তার মনে আছে কিনা? মুখ ফুটে কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে আমার সঙ্কোচ বোধ হতে লাগল। আমি একান্ত নির্বিষ্ট ভাবে আমার হাতের বোতামটী খুঁটতে লাগলাম।

"এখন কি পড়ব?"

"যা হয় একটা।"

সে একখানা জ্যামিতি নিয়ে পড়তে আরম্ভ করল। "আচ্ছা রাইট অ্যাঙ্গেল মানে যা, সমকোণ মানেও কি তাই?"

"হাঁ।"

"তা হ'লে এক সমকোণে কয় ডিগ্রী?"

আমি অন্যমনস্কভাবে উত্তর করলাম, "সমকোণ বুঝে, ত্রিশ ডিগ্রী চল্লিশ ডিগ্রীও হয়, আবার কখন বেশীও হয়।"

মেয়েটী একটু বিস্মিত হয়ে বলে, "মতি বাবু যে বলতেন এক সমকোণে সবই ডিগ্রী?"

ঠিকই ত আমি কি বলতে কি বলেছি। অত্যন্ত লজ্জিতভাবে বললাম—"হাঁ সব সমকোণই সমান এবং প্রত্যেকটী নব্বই ডিগ্রী করে।" মনে মনে ঠিক করলাম এবার থেকে আর অন্য দিকে মন দেওয়া হবে না।

এবার সে জ্যামিতি রেখে একখানা ভূগোল পড়তে আরম্ভ করল। "আচ্ছা অ্যাডিলেড কোথায়?"

"আমি উত্তর করলাম 'অষ্ট্রেলিয়ায়'।"

"সেখানে কি পাওয়া যায়?"

"বিশেষ কিছুই না।"

মেয়েটী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে অন্য দিকে চেয়ে বল্লে—"মতিবাবু কত গল্প করে এ সব বুঝিয়ে দিতেন।" হায়রে! কি করে তার প্রশংসায় ভরা মতি বাবুর সে মহান্ ছবিটীর পাশে আমার এ অমন হীন মূর্তিটীকে খাড়া করি। নিজের অক্ষমতায় নিজেই মরে গেলাম।

মেয়েটী আপন মনে একটী ছোট বাক্স খুলে তার পেন্সিলগুলি রেখে দিতে দিতে বল্লে—"মতি বাবু কখন আসবেন?"

"ঠিক জানি নে বোধ হয় তিন চার দিন পরে।"

"থাক আজ আর পড়বো না," বলেই বইগুলি গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। কিছুই যে পড়া হ'ল না, আর কিছুক্ষণ যে পড়া দরকার, কি করে সেটা তাকে বলি। অগত্যা আমাকেও উঠতে হ'ল। আমার যা জিজ্ঞেস করবার কই তা ত কিছুই জিজ্ঞাসা করা হল না। আরও দুদিন আসতে পারব ভেবে মনকে প্রবোধ দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বেরিয়েই প্রথমেই বাড়ীটার নম্বরটা দেখে নিলাম। বড় রাস্তার পাশে গণেশ মুখার্জ্জীর ষ্ট্রীটে দক্ষিণ পাশে ঐ বাড়ীটী। প্রতিদিন দুবার করে এ বাড়ীর কাছ দিয়ে যাতায়াত করেছি, কিন্তু এখানে যে সে থাকে তা' কখনই ভাবি নাই। এতদিন পরে আজ তার সঙ্গে দেখা হ'ল।

সে রাত্রে মেসে ফিরে কেবলই মনে হতে লাগল কখন ভোর হবে। পরদিন সকালে উঠে ভাবলাম আজ আর কলেজে যাব না, সন্ধ্যা হ'লেই তার সঙ্গে দেখা হবে এই ভাবী আনন্দটা সম্যক উপভোগ করবার জন্য সারাদিন বিছানায় শুয়ে রইলাম।

সন্ধ্যা হতে না হতেই তাড়াতাড়ি পড়ে যাত্রা করলাম। পথে চলতে চলতে ভাবলাম আজ নিশ্চয়ই সেদিনকার কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে। কারও অপেক্ষা না করে একেবারে ভেতরে গিয়ে বসলাম। আমাকে সে ছেলেটী আমায় দেখতে পেয়ে ছুটে ভিতরে গেল ও কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে খবর দিল—"দিদি বলে সে আজ পড়বে না।" হায়রে, মানুষ কল্পনা করে আর ঈশ্বর ব্যবস্থা করেন! আমার ইচ্ছা করতে লাগল ছেলেটীকে বলি সে তার দিদিকে গিয়ে বলুক—"মাষ্টার মশায় বলেন একটু পড়তে হবে, না হ'লে কি চলে?" কিন্তু এরূপ অনুরোধের অযৌক্তিকতা নিজেরই কাছে তীব্র ভাবে এসে উপলব্ধি করতে লাগল।

যা হোক আর এক দিন মাত্র বাকী আছে। মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলাম—"হে ঈশ্বর, এ দিনটীকে খুব বড় করে দাও, এ দিনটীর উপর যে আমার সব আশা ভরসা নির্ভর করছে।"

পর দিন এসে দেখলাম সেই ছোট ছেলেটীও নাই, একটী ঝি এসে সংবাদ দিলে—"মতিবাবু ফিরে এসেছেন, দিদিমণিরা তাঁর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছেন, আপনি আর কাল থেকে আসবেন না।" আমার মস্তকে যেন সহস্র বজ্রপাত হ'ল। হায়রে! শুধু একটী সাত বোনের দেখা তাতেও ঈশ্বর বাদ সাধলেন। ফিরে আসবার সময় আমার আর পা উঠ্‌ছিল না। সে সামান্য কটা সিঁড়ী দিয়ে নামতেও আমার অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল।

সে রাত্রে কিছুই না খেয়ে শুয়ে পড়লাম, ঠাকুরকে বল্লাম—[illegible] মাথা ধরেছে।"

সেই দিন থেকে যাবার ও আসবার সময় ঐ বাড়ীটার দিকে চেয়ে থাকতাম। উত্তর দিকে জানালা খোলাই থাকত। যতক্ষণ দেখা যেত ঐ জানালা গুলি থেকে আমি আর চোখ ফিরাতাম না। তাদের মধ্যে যে আমার জগতের সমস্ত রত্ন লুকান ছিল। দিনের পর দিন যেতে লাগল, হতভাগা আমি, এক দিনের তরেও সে জানালার কাছে এল না।

জীবনে কোন দিন কারও সঙ্গে যেচে আলাপ করতে পারি নি। যতদিন মা বেচে ছিলেন, বলতেন—"ছেলেটী আমার মুখ-চোরা।" বন্ধুরাও তাই বলতেন, সুতরাং এক দিনের জন্য যে তাদের বাড়ী গিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করব সে সাধ্য ত আমার হয় নি।

পরে গিয়ে যেমন এল এ অশান্তিময় জীবন যে আর চলতে চায় না। দিন দিন মন ভেঙ্গে পড়তে লাগল। জগতের কোন বস্তুতে কোন কার্য্যে আর আকাঙ্ক্ষা বা উৎসাহ রইল না। জীবন যেন শুধু জীবন ধারণের জন্যই বোধ হতে লাগল, সেই এক-ঘেয়ে জীবন! কলেজে যাওয়া খাওয়া আর শুয়ে থাকা। মনকে বহুই জোর করে কাজের মধ্যে নিয়ে যেতে চাইতাম সে ততই বন্ধনের বাইরে গিয়ে অধিকতর দুর্দ্দমনীয় ও উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে উঠ্‌তে লাগল। একবার ভাবলাম ডাক্তার দেখাই, নিশ্চয়ই কোন মাথার বিকার হয়েছে, কিন্তু কোনরূপ যুক্তিই মনে স্থান পেত না।

সময় কারও ধার ধারে না। হেমন্তের পর শীত এল। যে জানালাগুলি এত কাল খোলা থাকত, শীতের ভয়ে তাও আজ কাল বন্ধ হ'য়ে গেল। হায় দুর্ভাগ্য! "অভাগা যে দিকে চায় সাগর শুকিয়ে যায়।" জগতে সমস্ত আলোই যেন আমার কাছে নিবে আসতে লাগল।

শীতও ফুরাল বসন্ত এল। সুখময় বসন্ত। জগতে নূতন ফল ফুলের সঙ্গে নূতন সৌন্দর্য্য নবীন উদ্যম ও নবীন সজীবতা উছলে উঠ্‌তে লাগল। আর পরীক্ষার মাত্র দুটী মাস বাকী আছে।

একদিন কলেজে যাবার সময় দেখলাম তাদের বাড়ীতে সানাই বাজছে। একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কা ও উদ্বেগে আমার প্রাণ কেঁপে উঠ্‌ল। তার বিয়ে না ত, সে দিন আর স্নানাহার না করে দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে ফেললাম।

যা ভয় করেছিলাম তাই! আজ তারই বিয়ে মতিবাবুর সঙ্গে। পা কাঁপছিল, আর দাঁড়াতে পারছিলাম না। কলেজে ত গেলাম না। স্টার থেকে ফিরে এসে বইগুলিকে একদিকে ছুঁড়ে ফেলে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। এত শীঘ্র যে তার বিয়ে হবে তা ত কখনও স্বপ্নেও ভাবি নি!

বিকেল বেলা উঠে মনকে অত্যন্ত শক্ত করবার চেষ্টা করলাম। তার বিয়ে হচ্ছে বেশ হচ্ছে! তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? না না আর ওসব বিষয় ভাবা হবে না। পরীক্ষা এসে পড়েছে. আজ থেকে পড়তে আরম্ভ করতে হবে।

বহুদিন বইয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল না, এক যায়গায় কতগুলি দরকারী বই ও খাতাপত্র রেখেছিলাম। এ মেসে এসে অবধি এতদিন তাদের খোঁজ খবর নেই নাই। আজ খুঁজতে গিয়ে দেখি তার মধ্যে অনেকগুলি উইয়ে কেটে ফেলেছে। আমার এত সাধের বই, আমারই অবহেলায় আজ তাদের এ অবস্থা! সব ঝেড়ে মুছে টেবিল সাজিয়ে সন্ধ্যাকালে আলো জেলে পড়তে বসলাম।

একখানা বইয়ের দুই তিন লাইন পড়েছি এমন সময় জ্যোতিষ এসে বল্লে—"ওহে আমি আজ মতির বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি, ফিরতে একটু দেরী হ'তে পারে। তুমি ত অনেক রাতটাত জেগে পড়, দরজা বন্ধ থাকলে খুলে দিও কিন্তু, বুঝলে।"

'আচ্ছা' বলে আমি মাথা নীচু করলাম। আমার চোখে বইগুলির অক্ষর সব ঝাপ্‌সা ঠেক্‌তে লাগল। হাজার চেষ্টা করেও তার একটী লাইন পড়তে পারলাম না। ফিরে এসে জ্যোতিষ বল্লে—'তুমি ত আজ খুব পড়ছ, বিয়ে হয়ে গেল, আমরা খেলাম, তার পর এই আস্‌ছি আর তুমি এখনও শোও নি?"

"না না এবার শোব" বলে তাড়াতাড়ি আলোটা নিবিয়ে বিছানার মধ্যে গিয়ে মুখ লুকালাম। আমার শত চেষ্টা সত্ত্বেও বন্ধনবিহীন নির্ঝরিণীর ন্যায় অশ্রু এসে বালিশ ভিজিয়ে ফেলতে লাগল। এতক্ষণে তবে সব শেষ হয়ে গেছে। সে চিরদিনের জন্য পর হয়ে গেল। পাশের বাড়ীর খোলা ছাদ থেকে কে যেন তখন স্তব্ধ রাত্রি মুখরিত করে বিপুল উচ্ছ্বাসে গান গাচ্ছিল—

"আর ত হ'ল না দেখা এ জনমে দোঁহে একা,
চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনা তীরে মধু যামিনী রে!"

সেই রাত্রিতেই আমার প্রবল জ্বর হল। তিন দিন বেহুস হয়ে পড়ে থাকলাম দশ দিন পরে অন্ন পথ্য করলাম। এই সামান্য কয়দিনের জ্বরেই শরীর এত দুর্বল হ'য়ে পড়েছিল যে বন্ধুরা অনেকে আমায় দেখে চিনতে পারলেন না। ডাক্তার রোজ একটু একটু বেড়াতে ও কিছুক্ষণ খোলা হাওয়া খেতে উপদেশ দিলেন। একটু সুস্থ হয়ে একদিন ভাবলাম—যাই আজ একবার ইডেনগার্ডেন থেকে বেড়িয়ে আসি।

বহুদিন পরে আবার ইডেনগার্ডেনে এলাম। সে দিন, আর এ দিন! মধুর বসন্তের মধুর সৌন্দর্য্য এসে সারাটা বাগান ঘিরে ফেলেছে। সকলের মুখেই হাসি, সকলের মুখেই আনন্দ। বেড়াতে বেড়াতে অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে একটী ঝোপের আড়ালে একখানি খালি বেঞ্চের উপর গিয়ে বসলাম। অদূরে মন্দিরের সেই উচ্চ চূড়াটী কত সুখ দুঃখের স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সেদিকে ফিরে তাকাতেই দেখলাম থামের ধারে ঘাসের উপর বসে মতি আর সে। বহুদিন পরে আবার তাকে দেখলাম। বসন্ত সন্ধ্যার আলো তার সর্ব্বাঙ্গে পড়েছিল, এত সুন্দর ত আর তাকে কখনও দেখি নি। আমি একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। সে আজ পরের, তথাপি সে দিক থেকে সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও চোখ ফেরাতে পারলাম না।

আধ ঘণ্টা পরে তারা উঠে গেল। আমি ভাবলাম যাই একবার সে যেখানে বসেছিল সেখান কার মাটি স্পর্শ করে আসি। সে স্থান যে আমার

কাছে তীর্থের ন্যায় পবিত্র। সেখানে যেতেই দেখলাম একখানি ছোট রুমাল সেইখানে পড়ে রয়েছে। এ নিশ্চয়ই তারই রুমালখানি,—একদিকে তার তিনটী অক্ষর লেখা আছে 'সুষমা।' তার নাম তা হ'লে সুষমা। বা! কি সুন্দর নাম। এতদিন পরে তার নাম জানতে পারলাম। লক্ষমুদ্রা পেলে কাঙ্গালের মনে যেমন আনন্দ হয় এ রুমালখানি পেয়ে আমার মনে সেরূপ আনন্দ হ'তে লাগল। যাক তার এই স্মৃতিচিহ্ন বুকে করে আমি বেঁচে থাকতে পারব। রুমালখানি নিয়ে অতি সন্তর্পণে পকেটে পুরে রেখে ফিরতেই দেখি সুষমা ও মতিবাবু ফিরে এসেছেন।

'আমার রুমালখানি এখানে ছিল, আপনি দেখেছেন?' আমার মাথা ঘুরতে লাগল। কলের পুতুলের ন্যায় আমি বল্লাম 'না'। "না! আমি নিজে দেখেছি আপনাকে সে রুমাল!" মা বসুন্ধরে! তুমি দুই ভাগ হও, আমি তার মধ্যে প্রবেশ করি। লজ্জায় আমার মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল। মুখ নীচু করে চুপ করে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। "ছি! ছি! আপনার এই কাজ, একখানা সামান্য রুমালের জন্য আপনি মিথ্যে কথা বললেন!" "উনি যখন বলছেন জানেন না, তখন আর ওঁকে বিরক্ত করে দাও কি? তুমি চলে এস আমার সঙ্গে।" বলে মতিবাবু তাকে নিয়ে চলে গেলেন।

আমি মর্ম্মাহতের ন্যায় সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার কানে কেবলি বাজতে লাগল তার সেই শেষ কথাগুলি—"আপনার এই কাজ, একখানা সামান্য রুমালের জন্য আপনি মিথ্যে কথা বললেন!" মিথ্যে কথা বলেছি সত্য। কিন্তু তাকি একখানা সামান্য রুমালের জন্য! সে যে আমার কাছে লক্ষ মুদ্রার চেয়েও মূল্যবান্, সাগর-ছেঁচা অমূল্য রত্ন!

সেই আষাঢ়ের শেষ দেখা তার পর কত মাস কত বৎসর চলে গেছে। সে দেশও নাই আর তাদের সেই বাড়ীতেও এখন আবার নূতন লোক এসেছে। এ জীবনে আর তার সঙ্গে দেখা হয় নাই। চিরদিনের জন্য সে চলে গেছে। চলে গেছে। চলে গেছে, বেশ হয়েছে! সে আমার কে ছিল? জীবনে তিনদিন তাকে দেখেছিলাম।

কিন্তু তবু একঘেঁয়ে জীবন বহুবছরের পরেও আজ তার মুখ স্মরণ করে কেঁদে উঠে কেন? বর্ষার অপ্রান্ত প্লাবনের মাঝখান দিয়ে সেই অতীতের ছবি আজ এমনি করে মন প্রাণ ব্যাকুল করে জেগে উঠে কেন? কত মেঘের দিনে শুধু রাতে তার সেই রুমালখানি বুকে করে কেঁদেছি। সে আমার চিরসঙ্গী সুখ-দুঃখ-পূর্ণ অতীতের স্মৃতি! ওগো তোমরা বলিয়া দাও সে আমার কিসের স্মৃতি, সুখের না দুঃখের? স্নেহের দান নয়, আদরের চিহ্ন নয়, ভালবাসার উপহার নয়, সে যে চিরলাঞ্ছিতের কাছ থেকে কঠোর বেদনা পেয়ে চোরের মতন নিয়ে আসা, সে যে আমার বেদনাময় আগ্রহ, ক্রন্দনময় শান্তি, সুখময় দুঃখ। হৃদয়ের সব ব্যথা সব রক্ত দিয়ে আমি তাকে পেয়েছি, তাই সেই ছোট রুমালখানি, আর তার মাঝের তিনটী অক্ষর আমার জীবনের সকল বাসি অক্ষর মাঝখান দিয়ে এতদিন চলে এসেছে এবং তাই সে আমার জীবনের সব শূন্য পূর্ণ করে, সব বেদনা দূর করে সকল ব্যথা সার্থক করে উজ্জ্বল স্মৃতি রূপে শেষ দিন পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে!

ঝর্ ঝর্ ঝর্! আকাশ জুড়ে, মাঠ ছেয়ে অন্ধকার করে জগতের সমস্ত ব্যথা ও অশ্রু বুকে নিয়ে আজ বৃষ্টি নেমেছে। আর গুড় গুড় গুড়। সেই মেঘের বুক চিরে চমক করে বিদ্যুৎ এসে কানের কাছে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাচ্ছে সেই আমার এ জীবনের শেষ সন্ধ্যাকাল!

দিল্লীর লাড্ডু

(শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এম. এ.)

রূপকথার রাজকন্যা কল্পনালোকের স্বর্ণপালঙ্কে নিদ্রা যান, বাহিরে তাঁহার সাড়া পাই না, তাই বলিয়া মনের মধ্যে কি তিনি কম নাড়া দেন! বস্তুতন্ত্রের পাণ্ডারা বলিবেন, অন্বের আশা হয় না, কিন্তু ঘোড়ার ডিম যে আমাদের সাহিত্যে সত্য তাহা কি পাঠকপাঠিকারা অস্বীকার করিতে পারেন?

সুতরাং দিল্লী যাওয়ার পূর্ব্বে সেখানকার প্রবাদ-প্রসিদ্ধ খাদ্যটির তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইব, বিচিত্র নয়। জনৈক পশ্চিম-প্রবাসী বন্ধু বলিলেন, বোধোদয়ে পদার্থের যে সংজ্ঞা আছে, সামগ্রীটি তাহার অন্তর্ভুক্ত নহে, অর্থাৎ ইতস্ততঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে তিনি আশা করিলেন, দিল্লী দর্শন শেষ হইলে আমি উহার কিছু কিছু সন্ধান পাইব। অতএব সোৎসাহে সহর দেখিতে লাগিয়া গেলাম।

দিল্লী ষ্টেশনটি বেশ বড়। 'ওভার ব্রিজে' উঠিয়া প্ল্যাটফর্ম্মগুলি পার হইতে হয়। ফটকে টঙ্গা ও ল্যাণ্ডো বিস্তর, বড় বড় পাল্কী গাড়ীও আছে। একখানি ঢাকা গাড়ীর ভিতরে বসিয়া ও ছাদে তরীতরা চাপাইয়া চলিলাম। কুইন্‌স্ গার্ডেনের মধ্যে মিউনিসিপাল আপিস, সম্মুখে চাঁদনী চক; 'রাজসিংহের' রসিকা পানওয়ালি এইখানেই মিঠাবুলির মসলা মিশাইয়া মিঠাখিলি বেচিতেন! বাম দিকে পথের প্রান্তে শাজাহানের কেল্লার চূড়ায় ইয়ুনিয়নের নিশান উড়িতেছে। দক্ষিণে ফতেপুরে প্রকাণ্ড মস্‌জিদ। বাদশাহের ফতেপুরী বেগম এই দিকে থাকিতেন। আগে দুর্গের দরওয়াজা দেওয়ান্-ই-আমের সোজাসুজি খোলা ছিল, সুতরাং নয়নে নয়নে প্রিয় সম্ভাষণ চলিত। চাঁদনী চকে কোতোয়ালি, পাশেই সোণেরী মস্‌জিদ। নাদির শা এইখানে বসিয়া দিল্লীবাসীদের বধের আদেশ দিয়াছিলেন। এ অঞ্চলে একটা খাবারের দোকান আছে, তাহার উপরে লেখা— "ভূতপূর্ব্ব মোগল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষিত।" যে কচুরি শিঙ্গাড়া রসনবিলাসে খাইত, ফকিরেও এখন তাহা খাইতে পায়!

নইলড়কের মোড়ে রক্ত ও মর্ম্মর প্রস্তরমণ্ডিত বিশাল জুমা মস্‌জিদ। দেখিতে এতই নূতন, মনে হয় যেন সেদিনকার গড়া! দুই পয়সা দর্শনী লাগে। শাজাহান নাকি বহুব্যয়ে মক্কা হইতে মহম্মদের চুল ও নখ আনাইয়া এখানে রাখিয়াছেন। সোঁড়া মুসলমান ভিন্ন অন্য কাহাকেও তাহা দেখান হয় না। জুমার চারিদিকে ছোট ছোট ছাউনীর নীচে নানা জিনিষের কেনা বেচা চলে। দিল্লীর বাজারে কোথাও মাছের দোকান নাই, মস্‌জিদের পাশে মহুত কিনিতে হয়। নূতন সহরে বাঙ্গালী পাড়ায় অবশ্য ব্যাপারীরা মাছের ঝিরি করিয়া বেড়ায়।

কাজী হৌদের পথে আজমীর দরওয়াজা ছাড়াইলে বাদশাহের প্রতিষ্ঠিত শাজাহানাবাদের সীমা শেষ হইল। যে উচ্চ প্রাচীরে নগর বেষ্টিত ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, শুধু কতকটি মুক্ত পুরুষের মত নির্ব্বিকার ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সম্মুখে গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ পেনিন্‌সুলা রেলের উপরে সেতু ও-পারে পাহাড়গঞ্জ। এদিকে বর্দ্ধিষ্ণু লোকের বাস বিরল, জীর্ণ পাকা বাড়ী ও মাটির কোঠা বিস্তর। পাহাড়গঞ্জের সীমানায় অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া মেয়েদের জন্য লেডি হার্ডিং কলেজ ও হাস্‌পাতাল।

কলেজের প্রান্তে রেইসিনার প্রান্তর সুরম্য হর্ম্ম্যশ্রেণীতে দিনে দিনে শোভাময় হইয়া উঠিতেছে। বড় বড় চওড়া সড়কে রাত্রে বিজলী বাতির ব্যবস্থা।

এখানে বিষয়ের একটি শুভদোয়ারা আছে। ক্যান্টন মেন্টের "হি পয়েন্ট" ডিঙাইয়া মাঠ, মোরাদিয়র মোটর কোম্পানির গাড়ীগুলি এইখান হইতে ছাড়ে। সরকারের অস্থায়ী দপ্তর সাত মাইল দূরে, সেখানে খানাতাব বাঁধিয়া ছোট বড় কেরাণীরা রেইসিনায় থাকেন। মোটরে চড়িয়া তাঁহারা আপিসে যাতায়াত করেন। যানগুলি যেন জাতীয় মহাসমিতির ক্ষুদ্র সংস্করণ! বাঙ্গালী পাঞ্জাবী মাদ্রাজী মারাঠী প্রভৃতি নানা প্রদেশবাসীরা মোটরে পাশাপাশি বসেন।

রেইসিনায় মাঠে রাজা জয়সিংহের স্থাপিত মানমন্দির, এখানকার ভাষায় "যন্তর্ মন্তর্"। ভিন্ন ভিন্ন ইমারতে নানা রকমের নক্সা, সেগুলি 'যুগেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে।' উঁচুতে একটা 'ঘুর-ঘড়ি' আছে, সিঁড়ি দিয়া সেখানে উঠিলে দূরে হুমায়ুনের সমাধি, সফদরজং ও কুতবমিনারের অভ্রংলেহী চূড়া দৃষ্টিগোচর হয়।

দিল্লীর কেল্লা শাজাহানের প্রাসাদ ছিল, এখানে এখন মিলিটারি আড্ডা। দর্শনী দুই আনা, ফটকে টিকিট পাওয়া যায়। গোরা পাহারাওয়ালা বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া ঘুরিতেছে। ভিতরে নহবৎখানার উপরে জাফরি যুদ্ধের নানা সরঞ্জাম সজ্জিত, সম্মুখে মেসোপোটামিয়ার কয়েকটি তুর্কী কামান। দেওয়ান্-ই-আমের দেওয়ালে লতাপাতা ফুলফল পাখী প্রভৃতির চমৎকার নক্সা, মর্মরে নানা রংএর পাথর বসাইয়া এ সব নক্সা তৈয়ারি। এখানে পাথর খোয়া গিয়াছে, আগ্রার কারিকরেরা নূতন পাথর বসাইয়া সে সব জায়গা রিপু করিয়াছে। দেওয়ান্ ই-খাসের দেওয়ালে স্তম্ভের ফুলাদণ্ডের ছবি আঁকা। এই খানেই সেই বিখ্যাত কবিতা লেখা আছে—

"আগর্ ফিরদৌস্ বরুরে জমিনস্ত্
হমিনস্ত্ হমিনস্ত্ হমিনস্ত্।"

"ভূতলে যদি স্বর্গ থাকে, এই এই সে এই"। লতাপাতার যে চৌকা নক্সা ছিল তাহা নাকি খাঁটি সোণার। মারির সময় সেগুলি নষ্ট করিয়া সোণার তাল সঙ্গে লইয়া যান। এখন যাহা আছে তাহা খুঁটা অনুকরণ।

রূপের স্বপ্নপুরী রঙ্মহলের ভগ্ন অংশটুকু দেখিয়া তাহার পূর্ণ বৈভবের কল্পনা হয় না। একটি কামরার ছাদ কালীমাখা, মিউটিনির সময় ইংরেজ সৈনিকেরা নাকি সেখানে রুটি সেঁকিত! হাম্মাম বা স্নানাগারের চারিটি ঘর; সর্বশেষেরটিতে জল গরমের ব্যবস্থা ছিল। সেই কামরার চারিদিকে দুই পুরু দেওয়ালের ফাঁকে উষ্ণ বাষ্প চলিত। ভোগ্য সামগ্রী সমস্তই নশ্বর, আর ভোগের জন্য যে দেহ তাহাও ক্ষণভঙ্গুর, তাই বিলাসের এই সব চূড়ান্ত প্রয়াস ফুৎকারে জলবিম্বের মত লয় পাইয়াছে!

মমতাজমহলের এক কামরায় মিউজিয়ম। সেখানে বাহাদুর শা'র চৌদ্দখানি মার্ব্বেলের তাস দেখিলাম। দাবার সরঞ্জামও আছে। দেওয়ান্-ই-আমে বাদশাহেরা যে কেদারায় বসিতেন তাহার তিন খানি রাখা হইয়াছে। ছিন্ন গদিগুলি এখনও বর্ত্তমান।

দিল্লীর ট্রাম সাদাসিধা রকমের। গাড়ী একখানি, ভাড়াও কম। চারি পয়সায় চাঁদনী চক হইতে সব্জিমণ্ডী। সেখানে রোশিনারা বাগ। এই নির্জ্জন উদ্যানে শাজাহান-দুহিতা রোশিনারার সমাধি-মন্দির আছে। যাগানে একটি ঝিল, তাহার পাশে সাহেব সুবার খেলিবার আড্ডা।

আগ্রা লাইনের উপর দিল্লী হইতে দ্বিতীয় ষ্টেশনের নাম নিজাম উদ্দীন। এখানে ঐ নামের মুসলমান পীর, কবি খুস্রু ও "খীন আল্লা সম্রাট কন্যা" জাহানারা অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত। পিতৃভক্ত দুহিতার নিরাভরণ সমাধির উপর ঘন ঘন শ্বাস বায়ুহিল্লোলে যেন তাঁহার পবিত্র পদপ্রান্তে নত হইতে চায়! এখানে দিনরাত দর্শকের ভিড়। একটা কবরখানার প্রকাণ্ড মার্ব্বেলের কপাট, এমন আর এ প্রদেশে দেখি নাই।

দুর্গটীরের ইহাতেই প্রথম ভগ্নদশার হুমায়ুনের দুর্গ। ইহার নাম "পুরাণা কেল্লা।" হুমায়ুনের মস্‌জিদ ও পাঠাগার এখনও অবিকৃত আছে। লাইব্রেরীর সিঁড়িগুলি বড়ই উঁচু, বাদশাহ পা পিছ্‌লাইয়া কেন যে মারা গিয়াছিলেন, বুঝা যায়। পাশেই একটি গভীর কূপ; উপর হইতে জলের কিনারা পর্য্যন্ত অনেকগুলি সোপান।

শুসেক্রেটেরিয়েটে যাওয়ার পথে তিশহাজারী মাঠ। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এখানে ইংরেজের বিপুল বাহিনী সমবেত হইয়াছিল। কেল্লার দেওয়ালে তাহাদের কামানের গোলার দাগ সুস্পষ্ট। অদূরে মিউটিনি মেমোরিয়েল, তাহার গায় মর্ম্মর-ফলকে হত ইংরেজ সেনানীদের নাম লেখা। উপরে উঠিলে যমুনাতীরে সরকারের নবনির্ম্মিত সুধাধবল গৃহশ্রেণী মাঠের মধ্যে শুভ্র এক পাল বকের মত দেখায়।

মেমোরিয়েলের পাশে অশোকস্তম্ভ, স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া অবশেষে এখানে স্থিতিলাভ করিয়াছে। শিলালিপি কতকগুলি বিন্দু, গবেষকেরা নাকি তাহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। আমাদের অক্ষর পরিচয় নাই, শুধু স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া দেখিলাম।

একটু দূরে মাটির নীচে "ফিরোজ শা'কা বাউরি।" এটা বোধ হয় সম্রাটের নিজস্ব নিবাস ছিল। প্রবেশের পথ ভূগর্ভে, সেখানে যাইতে কাঁটাগাছে গা ছিঁড়িয়া যায়। কাশ্মীর দরওয়াজা দিল্লীর চৌরঙ্গী এখানে সাহেব সওদাগরদিগের সুসজ্জিত দোকান। কলেজ দুইটিও এই দিকে। রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পুরাণ শাজাহানবাদের আর কোন অংশ এমন সুদৃশ্য নয়। এ অঞ্চলের অনেক আসবাবের দোকানে খাটচৌকী ভাড়া পাওয়া যায়। নেওয়ারের খাটিয়ার চলনই বেশি। হিন্দুস্থানীদের মজবুত দেহ, কিন্তু শক্ত কাঠে ইহারা শুইতে পারে না; তক্তপোষ খুঁজিয়া পাওয়া ভার।

দুটির দিনে কুতব সড়কে ভিড় করিয়া দর্শকদের গাড়ী ঘোড়া ছুটিতে থাকে। কুতবমিনার রেইলিঙ্গ হইতে প্রায় সাত মাইল। সিঁড়িগুলি এমন সহজ যে শিশুরাও অনায়াসে উপরে উঠিতে পারে। তবে আমাদের দলের একজন লোক অল্প দূর অগ্রসর হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হামাগুড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন। মিনারের মাথায় দাঁড়াইলে নূতন ও পুরাতন দিল্লীর বড় বড় গাছপালা ও অট্টালিকা খুব ছোট ছোট দেখায়। মনে হয়, এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে হিন্দুর গৌরব ধূলিসাৎ হইয়াছে; মোগল পাঠানের কীর্ত্তিও নানা শোরস্থানে অন্তিম শয্যায় শায়িত!

কুতবমিনারের নিকটই সেই বিশ্ববিখ্যাত স্তম্ভ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেক মাথা ঘামাইয়াও বুঝিতে পারেন নাই, এটা ঠিক কোন্ ধাতুতে নির্ম্মিত। লোকে বলে খাঁটি লোহার; কিন্তু কত যুগ কাটিয়া গেল, এ পর্য্যন্ত ইহাতে মরিচা ধরে নাই! যোগমায়ার মন্দির এই দিকে; ইনি পৃথ্বীরায়ের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

মাইলখানেক পথ গেলে অনেকগুলি ভগ্নস্তূপ। কয়েকটা খিলানের উপর পাথরের ছাদ, নীচে রাশি রাশি প্রস্তরখণ্ড ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। মোগল বাদশাহেরা মৃতদেহের উপর সুন্দর করিয়া মন্দির গড়িতেন, পাঠান নরপতিদের অতখানি উৎসাহ ছিল না। ধ্বংসাবশেষের শোভাসম্পদ্ কিছুই নাই। কাটলে কাটলে অশ্বত্থ ও মেস্কের উপর কাঁটাগাছ জন্মাইয়াছে। থামের আড়ালে প্রেতাত্মাদের মত চামচিকা ঝুলিতেছে। তাহারা দর্শকের সাড়া পাইলে সশব্দে উড়িয়া বেড়ায়।

এখানে একটা ইঁদারা আছে, সাহেবী কেতাবে তাহার নাম "জম্প কূপ" (jumping well)। একটি লোক নাকে কাণে তুলা গুঁজিয়া খাড়া হইয়া তাহার মধ্যে লাফাইয়া পড়িল এবং ভিজা কাপড়ে আসিয়া হাত পাতিল। তাহাকে আট আনা বখ্‌সিস দিলাম।

চৈত্রের শেষ ; দিনে দুঃসহ গ্রীষ্ম, রাত্রে লেপের দরকার হয়। মাঠের সবুজ ঘাস রৌদ্রে পুড়িয়া লাল হইয়াছে। আপিসগুলি পালা করিয়া সিমলায় গিয়াছে। রেইসিনার 'কোয়ার্টারে' "একে একে নিবিছে দেউটী ;" প্রত্যহ কন্টনমেণ্ট বোর্ড দিয়া বাক্সবিছানা বোঝাই গোরুর গাড়ী ষ্টেশনে চলিয়াছে।

এ ভাঙ্গা আসরেও ভ্রমণের বিরাম নাই। হীরেন্দ্র নাথ তরুণ সাহিত্যিক হইলেও একটু অ-সাধারণ। নবীন কবির চুলের তোয়াজের বেওয়াজ সত্ত্বেও তাঁহার কেশ ছোট করিয়া ছাঁটা। উহু লেখক-দের পাকুনিপি শুদ্ধ থাকে, কিন্তু তাঁহার বাঁধানো খাতার কবিতা কাগজে ছাপা হয় এবং পড়িলেই বুঝা যায়। বানান সম্বন্ধে নানান্ রকম সৌখীন খেয়ালও তাঁহার নাই। তিনি একদিন প্রস্তাব করিলেন, একখানা বেড়াইয়া আসা যাক্। সেখানে যমুনা হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত খাল কাটা হইয়াছে।

আমাদের টঙ্গা একটা বাগানের বাহিরে দাঁড়াইল, ভিতরে নানা ফুল ও ফলের গাছ, সম্মুখে যমুনার নিস্তরঙ্গ নীলাভ জল। ও-পারে বালির চড়া ধূ ধূ করিতেছে, হাঁসেরা কূলের কাছে ভাসিতেছে। দূরে দিকের আড়ালে দিল্লী সহর অদৃশ্য, চারিদিকে পল্লীসুলভ নিস্তব্ধতা।

এখানে ছোট বাছ ধরাই সমস্যা দাঁড়ায়। হীরেন বাবু রেশমী চাদর ও জুতাজোড়া খুলিয়া-তোয়ালে লইয়া জলে নামিলেন। তাঁহার এই ভীষণ আয়োজন সত্ত্বেও মাছেরা নির্ব্বিঘ্নে জলকেলি করিতে লাগিল। মরলা কাপড় পরা একজন লোক সেই পথে যাইতেছিল, সে বাবুজীর দুর্দ্দশা দেখিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে দু'সের আড়াই সের চাঁদির মত চক্‌চকে মাছ ধরিয়া দিল।

আকাশে মেঘের সঞ্চার হইয়াছিল। হঠাৎ গাছের ঝরা পাতা ও ধূলা উড়াইয়া ঘোর ঝঞ্ঝনে ঝড় আসিল। সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারায় বর্ষণ। বায়ু তাড়িত বৃষ্টির জলে বাষ্পাকার পর্দ্দা হইয়া চারিদিক একাকার ঢাকিয়া ফেলিল। হীরেনবাবু নদীর মধ্যেও গায়ের গাতা বাঁচাইয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্যে তাঁহার মাথা পর্য্যন্ত বেজায় ভিজিয়া গেল! রাত্রি হইলে দুর্য্যোগ থামিল ; ক্ষীণ চন্দ্রালোকে সুদীর্ঘ লিঙ্গ মাঠ পাড়ি দিয়া আমরা বাড়ী ফিরিলাম।

লাঙ্গুর ওর আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দু মুসলমান রাজবংশ যে মিষ্ট রস আস্বাদন করিয়া পলাইয়াছেন, আর এখন যাঁহারা স্মৃতি চিহ্নগুলি শুধু চাহিয়া দেখেন, তাঁহাদের পল্লীশ্রী কি কম!

স্মৃতি

(শ্রীরামবন্ধু পট্টনায়ক)

আলোড়িয়া হৈলাতুমি
উর্দ্ধি শত শত
চলে গেছে, ফিরে গেছে
যে যাহার মত ;
রেখে গেছে তবু, দেখ
রেখাচিহ্ন তার,
করিয়াছে বেলা যারে
জীবনের-হার।

তেমনি হে সখা মোর
প্রাণ আজি দু'লে,
অন্তরের তীরে তীরে
কত ঢেউ তুলে।
চলে গেছ, ফিরে গেছ
হ'তে গেছে শেষ,
তবুও রয়েছে প্রাণে
সেই স্মৃতি-রেশ।

হ'তে পার্ত্তাম!

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি. এ

সেদিন রাস্তায় চলিতে চলিতে এক ভদ্রলোককে দেখিতে পাইলাম, হাতে, মাথাতে, স্কন্ধে, বুকে বগলে অসংখ্য প্রকারের জিনিষ লইয়া বাজার হইতে বাড়ী ফিরিতেছেন। জিনিষগুলি তাহাকে এরূপ পাইয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। হাতের জিনিষ সাম্‌লাইতে গিয়া বুকের জিনিষ পড়িয়া যাইতেছে, বুকের জিনিষ ঠিক রাখিতে বগল খালি হইতেছে। হতাশ হইয়া লোকটি কিছুক্ষণ উদাস নয়নে দাঁড়াইয়া রহিল। বোধ হয় তখন তাহার মনে হইতেছিল,—'আহা যদি একটি লেজ থাকিত!'

আমাদের দেশের বাবুর দলের অনেককেই এই ভাবনা ভাবিতে হয়। চাকরে পয়সা লইয়া বাজারে গেলে চুরি করে, সুতরাং নিজের যাইতে হয়। কিনিবার সময় যার চাকর আছে, তিনি ত নিশ্চিন্ত, কিন্তু যার নাই, তার অবস্থাটা নেহাৎ সুবিধার যে হয় না একথা নিশ্চিত। বাবুগিন্নির অসম্মান করিয়া এমন কোন পাত্র তাঁহারা বাজারে লইয়া যাইতে পারেন না, যাহাকে বোঝা বলিয়া লোকে ঠাওর করিতে পারে। সুতরাং উপরোক্ত ভদ্রলোকের মতই তাহাকে লেজের জন্য আপশোষ করিতে হয়।

ডেলি পেসেঞ্জারগণ লেজ থাকিলে ও বর্ত্তিয়া যাইতেন। 'ঘন ঘোর বরিষায়' একহস্তে ছত্রদণ্ড অন্যহস্তে বিনাযিযুগল ধরিয়া চলিবার সময় যখন নিতান্ত অসহায়ভাবে কাপড়চোপড় ভিজিতে থাকে, অথবা বাজার-করা জিনিষগুলি অর্দ্ধেক হইয়া যায়, তখন একটি লেজের কথা তাহারা না ভাবিয়াই পারেন না। যে বধূ সদ্য সন্তানের জননী হইয়াছেন, তাহার একটি লেজের যে কত আবশ্যক তা তিনিই জানেন। সন্তানটী যখন চীৎকার করিয়া গলা সাধিতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বামী যখন আফিসে যাইবার বেলা হইয়া গেল বলিয়া মাঝে মাঝে তাঁহার

পার্টের বহলা দিতে আরম্ভ করেন, তখন ব্যতিব্যস্ত বধূটির দুই হাতে কাজ করিবার সময় দোলনা দোলাইবার জন্য একটি লেজের যে বিশেষ প্রয়োজন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যদি ঐতিহাসিক মহাত্মাদের কথা ঠিক হয়, তাহলে পুরাকালে আবিসিনিয়ার অধিবাসিদিগের যে লেজ ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। তাহাদের কাহারো কাহারো লেজ শুনিতে পাই এমন শক্ত ছিল, যে লেজের একটি চোটে অনেক বড় বড় ঘোড়াকেও নাকি 'বাপ বাপ' বলিতে হইয়াছে।

আরও শুনিতে পাই, জন ষ্টুরি নামক একজন

পর্ত্তুগীজ নাবিক ১৬০০ খৃঃ অব্দে করমোসা হইতে ফিরিয়া আসিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছিলেন, যে সেখানকার বাসিন্দাদের নাকি লেজ ছিল। তখন করমোসার নাম খুব কম লোকেই জানিত। সুতরাং তার কথা সত্য কিনা, তাহার কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু জোরের বিষয় এই যে, এখন আর এমন কাহাকেও দেখা পাইবার উপায় নাই, যাহার নিকট হইতে জানা যায়, যে কিরূপে তাহারা তাহাদের লেজ ব্যবহার করিত।

অনেকে কিন্তু এই আপত্তি তুলিবেন, যে যখন দুই হাতেই অধিকাংশ কাজকর্ম করিতে পারা যায়, তখন সামান্য লাভের জন্য মর্য্যাদা নষ্ট করিবার বৃহৎ ক্ষতি কিছুতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। আবার মর্য্যাদা আর লেজ দুইটা ঠিক এক সময়েও যে থাকিতে পারে না। কি দুর্দ্দৈব!

আচ্ছা, লেজ না হয় নাই হইল। বিধাতা ইচ্ছা করিলে ত আমাদের অন্য প্রকারেও উপকার করিতে পারিতেন। কেন তিনি আমাদের শরীরের নিম্ন-ভাগটা গ্রীক দেবতা Panএর মতনই সুন্দর-শোভন করিয়া দেন নাই? পা থাকিবার উদ্দেশ্য চলা-ফেরা করা এবং উহাদের যাত্রা বেশী হইলে ছোটা। তবে আমাদের পাগুলি যদি ছাগল বা খরগোসের পায়ের মত হইত, তবে কি সুবিধাটাই হইত। ছাগ-পদ থাকিলে টেলি-গ্রেনেরাদের কি আর ট্রেণ ধরিতে বেগ পাইতে হইত; না চাকুরে-বাবুদের অফিসে বিলম্বে উপস্থিতির জন্য মাহিনা কাটা যাইত।

এ অবস্থায় চেহারাটা একটু বে-মানান হইত বটে, কিন্তু সুবিধা হইত কত? এমন কি জুতা কিনিবার খরচা পর্য্যন্ত বাঁচিয়া যাইত, একপাত লোহার টুক্‌রা মারিয়া দিলেই—ব্যাস!

হাঁ, ছাগলের-পা থাকিলে যে কিছু সুবিধা হইত তা ঠিক! কিন্তু বিধাতা আমাদের কান দু'খানা যেখানে রাখিয়াছেন, সেইখানে রাখিয়াই বড় ভালো কাজ করিয়াছেন। সেখানে তারা নির্ব্বিবাদে ভক্ত প্রজার মত নিজেদের কর্ত্তব্যপালন করিয়া যাইতেছে।

যদি তাহা আর খানিকটা উপরে কপালের দুইপাশে থাকিত—যেমন কোন কোন জন্তুর থাকে—তাহা হইলে কি বিশ্রীই দেখাইত। রামঃ! তারপর যেখানে আছে, সে তবু একটু পেছনে, একটু বড় চুল

হইলে নজরেও পড়ে না, সেইখানেই মর্দ্দ, উপভোগের বিরাট্ঠাই, আর সাম্‌নে থাকিলে কি রক্ষা ছিল!

প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে কপালের উপর একটা চোখ থাকিলেই তো দেখিবার কোন অসুবিধা হইত না। তবে দুটি চোখ দিবার প্রয়োজন কি? বিধাতাকে কিন্তু ধন্যবাদ দিতে হয়, যে তার ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি এমন প্রখর ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন বিংশ-শতাব্দির বৈজ্ঞানিক উন্নতির দিনে দুটো চোখই লোকের কম বলিয়া মনে হইবে। লোকের ঘরে বসিয়া থাকিতে হইবে, এমন কি গড়পারের গর্জ্জন রাস্তার মোড় পার হওয়া মানুষের পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিবে। সত্যই এখন আমরা পিছনে আর দুটি চক্ষুর অভাব অনুভব করিতেছি। একটা প্রস্তাব বোধ হয় করা যাইতে পারে, যাহা হইলে বাস্তবিকই আমাদের উপকার হইত। আমাদের হাত দু'খানা বর্ত্তমানে যেরূপ আছে, তার দ্বিগুণ হইলে বেশ হইত! এরূপ যে থাকিতে পারে, তার প্রমাণ পরিষ্কার। পরিষ্কার হাতদুখানা তার দেহের অতন্দ্র সখা। আমাদের কেন হইবে না?

গদি-আটা ইজিচেয়ারে শুইয়া পড়িয়া পড়িবার সময় অভিধানের জন্য যদি উঠিয়া তাকের কাছে যাইতে হয়, তখন কি বিরক্তই লাগে! গলার বোতাম পরিবার সময় বোতামটা মাটীতে পড়িয়া গেলে, কুঁজো হইয়া তুলিবার সময় কি অশান্তিটাই হয়! উপুড় হইয়া জুতার ফিতা বাঁধিবার সময় কি কষ্টই ভোগ করিতে হয়। যদি বিধাতা আমাদের

পাঁচহুট লম্বা হাত দিতেন, ওঃ কি সুবিধাটাই হইত!

লম্বা হাত থাকিলে মইএর আর প্রয়োজন হইত না। আর সকলের চেয়ে সুবিধা হইত এই যে পৌষের শেষদিনে ঝুল ঝাড়িতে মেয়েদের গজ্‌গজানি আর শুনিতে হইত না।

কিন্তু অসুবিধাও যে হইত না, এমন বলিতে পারিনা। কোন স্থানে গোপনে প্রবেশান্তর আত্মগত দ্রব্যটি লুকাইয়া লইয়া সরিয়া যাইবার সময় বাস্তবিকই অসুবিধা হইত। তাহা হইলে বৃথাই এ আলোচনা? খোদার উপর কারিগিরি চলে না; বৃথা—বৃথা এই আলোচনা, যেমন রয়েছি মোরা তেমনি রহিব। 'হায়রে বেধাতি—।"

বাসন্তী—১২শে ফাল্গুন।

শেষ আঘাত

(গল্প)

(শ্রীকণীন্দ্রনাথ পাল)

(১)

কয়দিন পরে প্রশান্ত বি, এ পরীক্ষা দিয়া যখন নিজগ্রামে ফিরিয়া আসিল, তখন এ পাড়া ও পাড়ার ছেলে মেয়েরা আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং সকলে হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। প্রশান্ত একে একে সকলকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া আদর করিল। তাহার হৃদয় এক নূতনতর আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

দশম বর্ষীয়া বালিকা লক্ষ্মী এই ছেলেমেয়েদের দল হইতে একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল। প্রশান্ত তাহার দিকে চাহিতেই তাহার চোখে মুখে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। প্রশান্তদাদা তাহাকে চিনিতে পারিল না! এই ছয় বৎসরে, তাহার কতখানি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, লক্ষ্মী তাহা জানিত না, তাহার বয়সের পক্ষে সে যে কত বেশী বড় হইয়া পড়িয়াছে, তাহাও আজ পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে বুঝাইয়া দেয় নাই, তাই প্রশান্তর উপর তাহার অভিমান হইল। অথচ সে যদি প্রশান্তকে অন্য কোথাও দেখিত, তাহা হইলে সেও তাহাকে চিনিতে পারিত না। প্রশান্তর চেহারারও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। তবে নামটা মনে ছিল বলিয়া এবং সকলের কাছে এই নাম শুনিয়া সে বুঝিয়া লইয়াছিল এই তাহার প্রশান্ত দাদা! তাহাকে না চিনিতে পারায় প্রশান্তর কোন অপরাধই ছিল না, সে ভাবিতে পারে নাই, ছয় বৎসরের সেই লক্ষ্মী, এই লক্ষ্মী। তাহার উপর দীর্ঘ চারি বৎসর কলিকাতায় অনাত্মীয়ের মধ্যে বাস করিয়া, এই অপরিচিত মেয়েটীর সহিত কথা বলিতে তাহার কেমন সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। তাই সে লক্ষ্মীকে হঠাৎ কোন প্রশ্ন করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া লক্ষ্মী অভিমান ভরে তেমনই নিঃশব্দে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

প্রশান্ত তাহার পিসীমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ও মেয়েটাকে ত চিন্‌তে পারলাম না?"

তাহার পিসীমা হাসিয়া বলিলেন, "ও যে লক্ষ্মী!"

প্রশান্ত আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "কোন্ লক্ষ্মী!"

পিসীমা কহিলেন, রামঠাকুরপোর মেয়ে লক্ষ্মী।"

প্রশান্ত 'ও' বলিয়া হাসিয়া ফেলিল, "কি আশ্চর্য্য আমি ওকে চিন্‌তেই পারলাম না, ও

খুব বড় হ'য়ে পড়েছে! যাই আমি একবার রাম-কাকার সঙ্গে দেখা করে আসি, আর লক্ষ্মীকে ডেকে আনি।" এই বলিয়া প্রশান্ত কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল।

প্রশান্ত শ্যামচন্দ্রের বাটীর উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "কাকিমা।"

লক্ষ্মীর জননী ঘর হইতে দাওয়ায় বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন, "কে প্রশান্ত, এস বাবা এস।" প্রশান্ত অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

লক্ষ্মীর জননী আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "শুনলাম, এবার বাবা তুমি দেশে বাস করতে এসেছ?"

প্রশান্ত হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ কাকিমা, পরীক্ষায় পাশ হই, ফেল হই, আর কলকাতায় ফিরে যাব না। কাকিমা, লক্ষ্মী কোথায় গেল?"

লক্ষ্মীর জননী কহিলেন, "তুমি তাকে চিন্‌তে পার নি বলে তার অভিমান হ'য়েছে। লক্ষ্মী, ও লক্ষ্মী!"

লক্ষ্মী ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া জননীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রশান্ত হাসিয়া কহিল, "দুষ্টু মেয়ে, আমার ওপর রাগ করা হ'য়েছে বুঝি!"

লক্ষ্মী কোন কথা বলিল না, মায়ের পিঠের উপর মুখ লুকাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রশান্ত কহিল, "আমি তোমার জন্যে ভাল ভাল বই এনেছি। চল দেখ্‌বে চল।"

লক্ষ্মীর জননী হাসিয়া কহিলেন, "আ আমার পোড়া কপাল, লক্ষ্মী কি আমার লেখাপড়া জানে যে সে আবার বই পড়বে।"

প্রশান্ত আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "সে কি, লক্ষ্মী এত বড় হ'য়েছে, এখনও স্কুলে দেননি কাকিমা।"

লক্ষ্মীর জননী কহিলেন, "তুমি কি বাবা আমাদের গ্রামের কথা একেবারেই ভুলে গেছ, এখানে কি মেয়েদের স্কুল আছে যে ওকে স্কুলে দেব?"

প্রশান্তর মনে পড়িল, সত্যই ত গ্রামে কোন মেয়ে স্কুল নাই! কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিল। এ গ্রামের আট দশ জন লোকও ত বি, এ, এম-এ পাশ করিয়াছে, তাহা ছাড়া অনেকে ত স্কুল কলেজে পড়িতেছে, অথচ এখানে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার কোনরূপ ব্যবস্থা নাই! এই সে দিন, কলিকাতা হইতে আসিবার পূর্ব্ব দিন, মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে কত আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা সহরের মধ্যে এমন একটী বিদ্যালয় নাই, যেখানে মেয়েরা তাহাদের উপযোগী লেখাপড়া শিখিতে পারে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ সম্বন্ধে একেবারে নীরব, সহরের বড় লোকের দলও এ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। যাহারা এ সম্বন্ধে চিন্তা করে মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা দিবার কোনরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য যাহারা ব্যস্ত, তাহারা অর্থাভাবে কিছুই করিতে পারে না।

লক্ষ্মীর জননী কহিলেন, "তা বাবা ভাববার কথা বটে তোমার সত্য বলছি, লেখাপড়া জানিনা বলে আমার ভারি দুঃখ হয়, আমি যদি নিজে মূর্খ না হ'তাম, তা হ'লে কি আর আমার লক্ষ্মী মূর্খ হয়ে থাকত। তুমি ত এবার দেশে থাক্‌বে বলে এসেছ, তুমি মেয়েদের লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করে দাও।"

প্রশান্ত বলিল, "কাকিমা আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই কাজ নিয়ে আমি জীবন কাটাতে পারি।" তার পর লক্ষ্মীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "লক্ষ্মী আজ বিকেলেই তোমার হাতেখড়ি হবে। আমার স্কুলের লক্ষ্মীই প্রথম ছাত্রী হবে কি বলেন কাকিমা।"

লক্ষ্মীর জননী কহিলেন, "বেশ ত বাবা, তা লক্ষ্মী আমার ক'দিনই বা পড়বে।"

প্রশান্ত কহিল, "ক'দিন পড়বে কি কাকিমা—ওর কতইবা বয়েস হয়েছে।" এস লক্ষ্মী আমাদের বাড়ী।

২)

প্রশান্ত নিজেদের বাটীর বৈঠকখানায় মেয়ে ফুল খুলিল। প্রতিদিন সকালে এ পাড়ার ও পাড়ার মেয়েরা নিয়ম মত স্কুলে আসিতে লাগিল। দুই ঘণ্টা থাকিয়া সকলে বাড়ী ফিরিয়া যাইত, কেবল লক্ষ্মী সব সময় সেখানে থাকিত, তাহার নিজের বাড়ীতে তাহাকে বড় দেখা যাইত না।

সেদিন স্কুল বন্ধ ছিল। প্রশান্ত কি একখানা বই লইয়া সবে পড়িতে বসিয়াছে, এমন সময় লক্ষ্মী আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। প্রশান্ত একবার বই হইতে মুখ তুলিয়া চাহিয়া আবার পুস্তকে মনঃসংযোগ করিল। লক্ষ্মী ডাকিল, "প্রশান্ত দাদা?"

প্রশান্ত অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, "কি।"

লক্ষ্মী কহিল, "এই গল্পটা পড়িয়ে দিন না।"

প্রশান্ত কহিল, "এখন পারব না, আমার নিজের পড়া আছে। কাল সকালে পড়িয়ে দেব।"

লক্ষ্মী কহিল, "আপনার পায়ে পড়ি প্রশান্ত দাদা, একটু বলে দিন।"

প্রশান্ত কহিল, "বলছি এখন আমার সময় নেই, তবু বিরক্ত করছ।"

লক্ষ্মী গম্ভীর হইয়া কহিল "দেবেন না ত পড়িয়ে?"

প্রশান্ত কহিল, "একবার বলিচি না, ফের আবার—"

"বেশ নাই দিলেন" বলিয়া লক্ষ্মী রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

প্রশান্ত মিনিট পনের চেষ্টা করিয়াও পড়ায় মনঃসংযোগ করিতে পারিল না। অবশেষে সে বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এক একবার তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, লক্ষ্মীকে ডাকিয়া আনে। কিন্তু তাহার অভিমান হইল, লক্ষ্মী নিজে না আসিলে সে কখনও তাহাকে ডাকিবে না। যে লক্ষ্মী ছায়ার মত প্রশান্তের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত, আজ সারাদিন তাহারও দেখা পাওয়া গেল না। সেও মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল, প্রশান্ত দাদা তাহাকে না ডাকিলে সে আসিবে না। কিন্তু প্রশান্তও ডাকিল না, সেও সে দিন আসিল না।

পরদিন স্কুলে লক্ষ্মীকে দেখা গেল না। প্রশান্ত একটী মেয়েকে ডাকিয়া বলিল, "দেখে এস ত লক্ষ্মীর কি হ'য়েচে, সে আজ এখনও স্কুলে এল না কেন?"

মেয়েটী ছুটিয়া লক্ষ্মীর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। লক্ষ্মী তখন দাওয়ায় একখানি মাদুর পাতিয়া বই লইয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

মেয়েটী কহিল, "হাঁ ভাই, তুমি স্কুল যাওনি কেন? তোমার মাষ্টার মহাশয় ডাকছেন যে।"

লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বইখানি হাতে করিয়া বলিল, "চল যাচ্ছি।"

লক্ষ্মীকে আসিতে দেখিয়া প্রশান্ত মেয়েদের খুব উৎসাহের সহিত পড়াইতে আরম্ভ করিল। লক্ষ্মী ধীরে ধীরে নিজের জায়গায় আসিয়া বসিল। প্রশান্ত তাহার দিকে চাহিয়াও দেখিল না।

খানিক পরে লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ দেরী হ'ল যে আস্‌তে।"

লক্ষ্মী কোন কথা বলিল না। সে আবার কহিল, "আর দেরী করে এস না; এলে শাস্তি পেতে হবে।"

লক্ষ্মী কাঁদিয়া ফেলিল। প্রশান্ত দাদা যে সকলের সামনে তাহাকে তিরস্কার করিল, ইহা তাহার সহ্য হইল না।

"বসে বসে পড়, আমি আস্‌চি। গোলমাল কর না কিন্তু" ছাত্রীদের এই কথা বলিয়া প্রশান্ত কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, লক্ষ্মী চোখের জল মুছিয়া মুখখানি কালা করিয়া বসিয়া আছে। সে ধীরে ধীরে তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া বলিল, "বই দেখি।" তার পর অন্যান্য মেয়েদের দিকে চাহিয়া বলিল, আজ তোমাদের ছুটী। সকলে কলরব করিতে করিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল। প্রশান্ত লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "তারি দুষ্টু মেয়ে ত রাগ করে রয়েছ? আর রাগ করবে?"

এক নিমেষে লক্ষ্মী সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া গেল। সে আস্তে আস্তে কহিল, "কেন আপনি আমায় পড়িয়ে দিলেন না, তাই রাগ করেছিলাম।"

প্রশান্ত হাসিয়া কহিল, "আজ তোমায় অনেক বেশী করে পড়িয়ে দেব, তা হ'লে শোধ হয়ে যাবে ত ?"

মাসখানিক পরে এক দিন দুপুর বেলা লক্ষ্মী তাহার বইখানি হাতে লইয়া প্রশান্তর শয়ন কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রশান্ত খবর কাগজ পড়িতেছিল, লক্ষ্মী তাহার পাশে বসিয়া বলিল, "আমিও বসে বসে পড়ি, যেটা না বুঝতে পারব তা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে নেব।"

প্রশান্ত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "বেশ।"

এমন সময় ও পাড়ার কামিনীর উচ্চস্বর শোনা গেল,—"লক্ষ্মী ও লক্ষ্মী।"

লক্ষ্মী শুষ্কমুখে উত্তর দিল, "কি বলচ ?"

কামিনী ঘরের বাহিরে দরজার পাশে দাঁড়াইয়া কহিল, "আজ আমাদের বাড়ী তোর চড়াইভাতির নেমন্তন্ন যে।"

কামিনী লক্ষ্মীর অপেক্ষা বয়সে মাস ছয়েকের বড়। তাহার বিবাহের বয়স হইয়াছে বলিয়া তাহার জনক জননী তাহাকে প্রশান্তর স্কুলে পাঠাতে দেন নাই।

লক্ষ্মী কহিল, "আমি ত আজ যেতে পারব না, আমার অনেক পড়া তৈয়ারি কর্ত্তে হবে।" তার পর প্রশান্তর দিকে মিনতিভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া অতি মৃদুস্বরে কহিল, "আপনি বলে দিন প্রশান্ত দাদা, না হ'লে আমায় ধরে নিয়ে যাবে।"

প্রশান্ত কহিল, "কে কামিনী, লক্ষ্মী আজ যেতে পারবে না। তুমি বাইরে রৌদ্রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ভিতরে এস।"

কামিনী কহিল, "সবাই আমার জন্যে বসে রয়েছে, আমি আর দেরী করতে পারব না।" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

এমনই ভাবে বৎসর দেড়েক অতিবাহিত হইল।

সে দিন মেয়েদের ছুটি দিয়া প্রশান্ত লক্ষ্মীদের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন লক্ষ্মী সাজিয়া গুজিয়া আড়ষ্ট হইয়া পাত্র পক্ষের সম্মুখে বসিয়াছিল। প্রশান্তকে দেখিয়া সে একেবারে জড়সড় হইয়া পড়িল। তাহার মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল। প্রশান্ত কিছু না বলিয়া নীরবে একধারে উপবেশন করিল। পাত্র পক্ষ আশীর্ব্বাদের দিন স্থির করিয়া চলিয়া গেল, প্রশান্ত গম্ভীরমুখে লক্ষ্মীর জননীকে কহিল, "আপনি এর মধ্যে লক্ষ্মীর বিয়ে দেবেন না কি ?"

লক্ষ্মীর জননী কহিলেন, "এর মধ্যে কি বাবা ! লক্ষ্মীর আমার বাটের কোলে বার বছরে পড়েছে। তার ওপর বাড়ন্ত বয়স। এতদিন বিয়ের জোগাড় করে উঠতে পারিনি বলে পাঁচ জনে কত কথা বলছে। আর কি মেয়েকে আইবুড়ো করে রাখতে পারি বাবা।"

প্রশান্ত কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া গেল। সারাদিন সে লক্ষ্মীর প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল, লক্ষ্মী আসিল না। পরদিন যথাসময়ে স্কুল বসিল। লক্ষ্মী ছাড়া অন্যান্য মেয়েরা আসিয়া যে যাহার স্থানে বসিল, প্রশান্ত আজ বেশী উৎসাহ ভরে তাহাদের পড়াইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মিনিট পাঁচেক পরে হঠাৎ বই বন্ধ করিয়া বলিল, "আজ আর পড়াব না, তোমাদের ছুটি।"

আরও তিন দিন প্রশান্তর স্কুল কোন রকমে চলিল। চতুর্থ দিনে প্রশান্ত বলিয়া দিল, তাহাকে বিশেষ কাজে কলিকাতায় যাইতে হইবে, কাজেই কিছুদিনের জন্য স্কুল বন্ধ থাকিবে।

সত্যই প্রশান্ত পরদিন কলিকাতায় চলিয়া গেল।

(৩)

চার বৎসরের পরের কথা। প্রশান্ত তক্তপোষের উপর বসিয়া কি একখানা বই পড়িতেছিল,

আর তাহার ষোড়শী পত্নী সরযূ তাহার দুই বৎসরের শিশু পুত্রটিকে কোলের উপর চাপিয়া ধরিয়া দুধ খাওয়াইতেছিল। এমন সময় লক্ষ্মী ধীরে ধীরে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল এবং প্রশান্ত মুখ তুলিয়া চাহিতেই নত হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল।

প্রশান্ত আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, "ভাল আছ লক্ষ্মী?"

লক্ষ্মী নতমুখে কহিল, "আপনি ভাল আছেন। বৌদিদি উঠে দাঁড়ান, আপনাকে যে প্রণাম করা হ'ল না।"

সরযূ খোকাকে প্রশান্তর কোলে দিয়া লক্ষ্মীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। লক্ষ্মী তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল।

সরযূ হাসিয়া কহিল, "তোমার দাদাটি ত লক্ষ্মী বল্‌তে অজ্ঞান! তুমি ত ভাই ঠাকুরঝি মানুষ বশ করবার খুব মন্ত্র জান,—আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে কিন্তু ভাই।"

লক্ষ্মী তাহার এ পরিহাসের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রশান্ত কহিল, "জান সরযূ লক্ষ্মী আমার স্কুলের সব চেয়ে ভাল ছাত্রী ছিল!"

সরযূ হাসিয়া কহিল, "তাই বুঝি বইগুলো আনা হয়েছে প্রাইজ দেওয়ার জন্যে?"

প্রশান্ত কহিল, "সবগুলো না হ'ক পাঁচখানা লক্ষ্মীর, আর পাঁচখানা আর পাঁচ জন মেয়েকে দিতে হবে। কাল মেয়েদের ডেকে আনাব, এনে বই-গুলো যার যার হাতে দিয়ে দেব।"

এমন সময় লক্ষ্মীর জননী একটী শিশুকে কোলে লইয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রশান্ত তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

লক্ষ্মীর জননী কহিলেন, "চিরজীবি হও বাবা, এতকাল গ্রামের মায়া কাটিয়ে বিদেশে থাকতে হয় বাবা। তুমি এসেছ, শুনে লক্ষ্মীর আমার আহ্লাদ দেখে কে, এই যে মা চির আয়ুষ্মতী হও, তোমার হাতের নোয়া সিঁথের সিঁদুর অক্ষয় হ'ক।" তারপর প্রশান্তর ছেলেটীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এটী বুঝি তোমার খোকা—দেখ দেখ কি আশ্চর্য্য, লক্ষ্মীর ছেলে দেখ্‌তে ঠিক তোমার খোকার মত হ'য়েছে ঠিক যেন যমজ ভাই। মুখ চোখ গড়ন পেটন যেন এক ছাঁচে ঢালা। তবে তোমার খোকার রঙ্ কর্সা। লক্ষ্মী ধরত মা।"

প্রশান্ত লক্ষ্মীর ছেলের দিকে চাহিয়া হাসিমুখে কহিল, "সত্যিই ত ভারি আশ্চর্য্য কাণ্ড। দু'জনের চেহারা ঠিক এক রকম।"

লক্ষ্মী লজ্জারুণ মুখে পুত্রকে কোলে লইতেই লক্ষ্মীর জননী প্রশান্তর ছেলেটীকে কোলে তুলিয়া লইয়া কহিলেন, "তা বাবা এখন এখানেই থাকবে?"

প্রশান্ত কহিল, "মাসখানেক থাকব, তার পর কলকাতায় ফিরে যাব।"

লক্ষ্মীর শ্বশুরবাড়ী ঐ গ্রামেই তাহার বাপের বাড়ী ও শ্বশুর বাড়ীর মাঝখানে মাত্র একটী বড় আমকাটালের বাগানের ব্যবধান। তাই লক্ষ্মী যখন তখন বাপের বাড়ী আসিতে পারিত। তাহার স্বামী গ্রামের স্কুল হইতে মধ্যবৃত্তি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া আর লেখাপড়া করে নাই, নিজেদের জমিজমা দেখিতেছিল। শ্বশুরবাড়ীতে লক্ষ্মীর কোন কষ্ট ছিল না। শ্বশুর শাশুড়ীর নিকট বিশেষ আদর যত্ন না পাইলেও, স্বামীর আদরে সে সুখী ছিল। তবে শ্বশুর শাশুড়ী তাহাকে কোনরূপ নির্য্যাতন করিত না, কিম্বা বিনা প্রয়োজনে তাহাকে কোন কটু কথাও বলিত না।

যে একমাস প্রশান্ত কলিকাতায় ছিল, সে একমাস দিনের অধিকাংশ সময় লক্ষ্মী প্রশান্তদের গৃহে থাকিত। নিজের ছেলেটীকে জননীর কাছে রাখিয়া প্রশান্তর ছেলে গৌরচন্দ্রকে কোলে লইয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। গৌরও তাহাকে দেখিলে ঝাঁপাইয়া তাহার কোলে আসিত এবং

কিছুতেই তাহার কোল হইতে আসিতে চাহিত না।

সে দিন বৈকালে গৌর লক্ষ্মীর গলা আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল, কিছুতেই তাহার কোল হইতে নামিবে না। সরযূ আসিয়া অন্য দিনের মত নানারূপ খাবার ও খেলনার লোভ দেখাইয়া তাহাকে ভুলাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া কহিল, "না ঠাকুরঝি তুমি সত্যই গুণ জান, আমার স্বামীটিকে ত আগেই বশ করেছ, তাতেও তোমার মন উঠ্‌ল না, দু'দিনের মধ্যে আমার ছেলেটীকেও বশ করে ফেলেছ।"

লক্ষ্মী উচ্ছ্বসিত আনন্দে কহিল, "খোকাকে আজ আমি নিয়ে যাই বৌদিদি, ও রাত্রে আমার কাছেই থাকবে'খন।"

সরযূ হাসিমুখে কহিল, "ও ডাকাত ছেলে, ওর কি আর আমার ওপর মায়া দয়া আছে,—ও স্বচ্ছন্দে তোমার কাছে থাকবে।"

"তা হ'লে আমি নিয়ে যাই বৌদিদি," বলিয়া গৌরকে বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া সে চলিয়া গেল।

রাত্রে গৌরকে স্বামীর কোলে তুলিয়া দিয়া কহিল, "দেখ দিকি যা বলেছিলাম ঠিক কিনা, গৌর দেখ্‌তে আমার সোণার মত।"

তাহার স্বামী গৌরের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "সত্যি যেন যমজ ভাই, তোমার এক ছেলে ছিল, এবার দুই ছেলে হ'ল।"

লক্ষ্মী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "প্রশান্তদাদা যে আর বেশী দিন এখানে থাকবে না, তখন গৌরকে ফেলে কি করে থাকব?"

তাহার স্বামী হাসিয়া কহিল, "তুমিও তোমার দাদার সঙ্গে যেও তা হ'লে আর কোন দুঃখ থাকবে না।"

"ইস্ তা বৈ কি,—তুমি এখানে থাকবে, আর আমি প্রশান্তদাদার সঙ্গে চলে যাব! তুমি যদি আমায় নিয়ে যাও, তা হ'লে কিন্তু ভারি মজা হয়।" এই বলিয়া সে হাসি-ভরা দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল।

তাহার স্বামী কহিল, "আমার কি এখন কোথাও যাওয়ার জো আছে, চাষ আবাদ দেখবে কে?"

লক্ষ্মী কহিল, "তা হ'লে আমিও যাব না।"

তাহার স্বামী কহিল, "তোমার নতুন ছেলেটীকে ছেড়ে থাকতে পারবে?"

"তা কি করব," বলিয়া লক্ষ্মী চুপ করিয়া রহিল।

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া লক্ষ্মী গৌরকে কোলে করিয়া প্রশান্তর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। সরযূর সম্মুখে গিয়া কহিল, "নাও দিদি তোমার গৌরকে, তোমরা ত দু'দিন পরে আমাদের মায়া কাটিয়ে চলে যাবে, আমি তখন কেঁদে মরব আর কি করব।"

সরযূ হাসিয়া কহিল, "গৌরকে না হয় তোমায় দিয়ে যাব ঠাকুরঝি।"

লক্ষ্মী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তা কি আর তুমি দিতে পারবে!"

"পারব গো পারব" বলিয়া সরযূ দুই হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল।

(৪)

সেবার চৈত্রের শেষভাগে লক্ষ্মীদের ক্ষুদ্র গ্রামে ওলাউঠা ভীষণ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া যে মহামারির সৃষ্টি করিল, তাহাতে দুই দিনের মধ্যে লক্ষ্মী স্বামী পুত্র হারাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তাহার মাত্র সতর বৎসর বয়স। এই অল্প বয়সে, পরিপূর্ণ যৌবনে সংসারের সর্ব্বপ্রধান দুইটী বন্ধনই অভাগিনীর ছিন্ন হইয়া গেল। যখন তাহার জ্ঞান হইল, সে প্রথমটা কিছু বুঝিতে পারিল না। ভগবান কেন যে তাহার উপর এতটা নিষ্ঠুর হইলেন তাহা তিনিই জানেন! ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মী বুঝিল, ঐ জন্মের মত সে আর স্বামী পুত্রের মুখ দেখিতে পাইবে না। তখন সে মাটিতে পড়িয়া আছড়াপাছড়ি করিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার দেহ মন দুই অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে নিজের নিঃসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া বারবার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। এমন

সময় তাহার মনে পড়িল গৌরের কথা। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া [illegible]কে ব্যাকুল দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, তাহার অবোধ বিধির বিধানে বিধবস্ত [illegible] দুই হাত বাড়াইয়া গৌরকে বুকে চাপিয়া ধরিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই ব্যর্থ প্রয়াসে সে একেবারে নির্জীব হইয়া মাটির উপর চলিয়া পড়িল।

সে আজ তিন মাস আগেকার কথা। লক্ষ্মীর সব সহিয়া গিয়াছে। এমনি ধারাই যায়! সে দুবেলা খায়, সারাদিন কাজ করে এবং খাওয়া ও কাজের মধ্যে এবং অবসরে কত কথাই ভাবে। এমনই করিয়া তাহার জীবন চলিতে লাগিল। যখন সে পিত্রালয়ে যায়, তখন প্রত্যূষে দাওয়ায় বসিয়া উৎকর্ণ হইয়া প্রশান্তর গৃহের দিকে চাহিয়া থাকে। চাহিয়া-চাহিয়া বুক-ভাঙা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া অকারণে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়।

তখনও সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে উদিত হয় নাই, পাখীদের সবে ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল, তাহারা ডানা ঝাড়িয়া আলস্য ভাঙ্গিয়া আহারান্বেষণে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমনই এক প্রত্যূষে, লক্ষ্মীর দাওয়ার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল, এমন সময় প্রশান্ত রুক্ষ কেশে উদ্ভ্রান্তবেশে গৌরকে কোলে করিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল, লক্ষ্মী!"

লক্ষ্মীর সারাদেহ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, সে চোখ বুজিয়াই রহিল।

প্রশান্ত আবার ডাকিল, "লক্ষ্মী।"

লক্ষ্মী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া উঠানের দিকে চাহিতেই সে দুই চোখে অন্ধকার দেখিল।

লক্ষ্মীর জননী ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

লক্ষ্মীর যে এত বড় সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে সদ্য-পত্নীবিয়োগবিধুর প্রশান্ত তাহার কিছুই জানিত না। তাই এই দুঃসংবাদ শুনিয়া সেও বজ্রাহতের ন্যায় আড়ষ্ট হইয়া রহিল। এমন সময় গৌর—"মা যাব, মা যাব" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। লক্ষ্মী আর থাকিতে পারিল না, চোখের জল মুছিতে মুছিতে কম্পিতপদে দাওয়া হইতে নামিয়া প্রশান্তর অতি নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। গৌর তাহার দিকে চাহিয়াই পিতার কোল হইতে ঝুঁকিয়া পড়িতেই লক্ষ্মী দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইল। প্রশান্তর দুই চোখে জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে মুখ ফিরাইয়া দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

গৌরকে বুকে পাইয়া লক্ষ্মীর বুভুক্ষু হৃদয় অনেকটা শান্ত হইল। গৌরের মুখের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া তাহার মনে হইল, তাহার খোকামণি আবার মাতৃক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়াছে! আর সে খোকাকে যাইতে দিবে না। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর জন্য তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিয়া উঠিল, ঝরঝর করিয়া তাহার দুই চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

খানিক পরে লক্ষ্মী তাহার জননীকে কহিল, "মা একটু দুধ গরম করে দাও না, খোকামণির আমার ক্ষিদে পেয়েছে।" এই তিন মাস লক্ষ্মীর মুখে কেহ হাসি দেখে নাই; আজ তাহার মুখে হাসি দেখিয়া জননীর মনের দুঃখও অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় গৌর বায়না ধরিল "বাবা যাব।" লক্ষ্মী তাহাকে অনেক রকম করিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে শান্ত করিতে না পারিয়া ভারি বিব্রত হইয়া পড়িল। বিধবা হইবার পর হইতে লক্ষ্মী কাহারও বাড়ী যায় নাই। সে জননীর নিকট গিয়া কহিল, "মা খোকামণিকে একবার ও বাড়ীতে দিয়ে আসবে—ও কিছুতেই থাকচে না।"

কিন্তু গৌর তাহার কোল হইতে নামিল না, অগত্যা সমস্ত সঙ্কোচ, সমস্ত কুণ্ঠা, সমস্ত লজ্জা কোন রকমে চাপিয়া আজ বহুদিন পরে লক্ষ্মী প্রশান্তর

গৃহের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার পা কাঁপিতেছিল। কক্ষে প্রবেশ করিয়া সে নীরবে গৌরকে প্রশান্তর কোলে তুলিয়া দিল এবং তেমনই নীরবে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দাওয়ার উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

(৫)

দিন পাঁচেক পরে অতি প্রত্যূষে প্রশান্ত শয্যা ত্যাগ করিয়া দ্বার খুলিতেই দেখিল, লক্ষ্মী দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

প্রশান্ত কহিল, "তুমি কখন এলে লক্ষ্মী?"

লক্ষ্মী নতমুখে উত্তর করিল, "অনেকক্ষণ।"

প্রশান্ত কহিল, "আমায় ডাকলে না কেন?"

লক্ষ্মী কিছু বলিল না, চুপ করিয়া রহিল।

প্রশান্ত কহিল "খোকা আজ এখনও খুব ঘুমুচ্চে। কাল অনেক রাত্রি অবধি জেগেছিল কেবল মা যাব, মা যাব করে কেঁদেছে।"

লক্ষ্মী কহিল, "তা হ'লে আমি এখন যাই," এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। প্রশান্ত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। খানিক দূর গিয়া লক্ষ্মী আবার ফিরিয়া আসিল এবং উন্মুক্ত দ্বার দিয়া ধীরে ধীরে কম্পিত শঙ্কিত চরণে সেই পরিচিত কক্ষে প্রবেশ করিল।

পদশব্দে সেই দিকে চাহিয়া প্রশান্ত কহিল, "কি লক্ষ্মী?"

লক্ষ্মী কহিল, "খোকা কেঁদে উঠ্‌ল না?"

প্রশান্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "কৈ না।"

ঘুমন্ত শিশুর মুখপানে চাহিয়া লক্ষ্মী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। খোকাকে না লইয়া সে যে কিছুতেই গৃহে ফিরিতে পারে না!

এমনই ভাবে খোকাকে অবলম্বন করিয়া লক্ষ্মীর দুঃখের দিনগুলি বেশ কাটিয়া যাইতে লাগিল। সে প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া গৌরকে লইয়া আসিত এবং সমস্ত দিন তাহাকে বুকে করিয়া খেলা দিয়া দুধ খাওয়াইয়া সন্ধ্যার সময় প্রশান্তর নিকট পৌঁছাইয়া দিত। রাত্রিটা সে আর কাটিতে চাহিত না। অসহ্য বেদনা বু[redacted] করিয়া গভীর রাত্রে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বসিয়া উৎকর্ণ হইয়া থাকিত, ঐ বুঝি তাহার গো[redacted] তেছে। তাহার প্রবল ইচ্ছা হইত একবার ছুটিয়া গিয়া খোকাকে দেখিয়া আসে।

সেদিন রাত্রি দশটা হইবে। সমস্ত পল্লী প্রায় সুষুপ্ত। বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে টিপ্‌টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। এমন সময় বৃষ্টির জল ও অন্ধকার ভেদ করিয়া গৌরের কান্নার স্বর লক্ষ্মীর কর্ণরন্ধ্রে আসিয়া প্রবেশ করিল। 'মা যাব!' একবার, দুইবার, তিনবার। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। বৃষ্টি মাথায় করিয়া গভীর অন্ধকার তুচ্ছ করিয়া সে বাটীর বাহির হইয়া পড়িল।

পরদিন প্রত্যূষে লক্ষ্মীকে আর প্রশান্তর গৃহে দেখা গেল না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া প্রশান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া গৌরকে কোলে লইয়া লক্ষ্মীর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল; উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "লক্ষ্মী।" কোন সাড়া না পাইয়া সে মনে মনে অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল।

লক্ষ্মীর জননী ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "লক্ষ্মীর অসুখ করেছে।"

প্রশান্ত ব্যগ্র হইয়া কহিল, [redacted] করেছে,—আমার তাই মনে হ'য়েছিল কাকিমা,—না হ'লে সে আমার কাছে নিশ্চয়ই যেত, ঘরে শুয়ে আছে বুঝি, যাই দেখে আসি।"

লক্ষ্মীর জননী মিথ্যাকথা বলিয়া অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কাল রাত্রে লক্ষ্মী যখন প্রশান্তর শয়নকক্ষে খাটের উপর বসিয়া গৌরকে কোলে শোয়াইয়া ঘুম পাড়াইতেছিল, সেই সময় ও পাড়ার হরি দত্ত প্রশান্তর নিকট তাহার ছেলের জন্য হোমিওপ্যাথি ঔষধ লইতে গিয়াছিল এবং সেই রাত্রে বাড়ী ফিরিবার পথে সে লক্ষ্মীর পিতাকে বিধবা

কন্যা সম্বন্ধে যে কথা বলিয়া গেল, তাহা শুনিয়া পিতা কন্যার উপর [illegible] জারি করিয়া দিলেন, —"কালামুখী যেন আর এক পা বাড়ীর বার না হয়।"

হায় রে, লক্ষ্মী বুঝিল না, তাহার কোন্ অপরাধে পিতা এই নিদারুণ আদেশ জারি করিলেন। গৌরের মুখ না দেখিয়া তাহাকে কোলে করিতে না পারিয়া সে কি করিয়া বাঁচিবে! এ সংসারে যে সেই ক্ষুদ্র শিশুটিই তাহার একমাত্র অবলম্বন।

প্রশান্তকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া লক্ষ্মীর জননী ব্যস্ত হইয়া দ্বার আগুলিয়া কহিলেন, "লক্ষ্মীকে শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি, সে এখানে নেই, তুমি বাড়ী যাও বাছা।" প্রশান্তর এই আগ্রহ তাঁহার একেবারেই ভাল লাগিতেছিল না।

প্রশান্ত সেইখানে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। লক্ষ্মীর জননীর অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর, অভূতপূর্ব্ব ব্যবহারের কোন সঙ্গত কারণই সে খুঁজিয়া পাইল না।

এমন সময় গৌর তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া মুখের কাছে মুখ লইয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা, মা মা যাব," এবং পিতার নিকট কোন উত্তর না পাইয়া, সে 'মা যাব মা যাব' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঘরের মধ্যে লক্ষ্মী আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে ঝড়ের মত বাহির হইয়া আসিয়া প্রশান্তর সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুই হাত বাড়াইল। খোকা ঝাঁপাইয়া তাহার কোলে আসিতেই তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া সে তেমনই নীরবে ভিতরে চলিয়া গেল।

আজিকার এই সমস্ত ব্যাপারটি প্রশান্তর নিকট একটা স্বপ্নের মত বোধ হইল। সে স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

লক্ষ্মী সারাদিন গৌরকে বুকের মধ্যে আকড়াইয়া রাখিল। যেন তাহার সব সময় আশঙ্কা হইতে লাগিল, তাহার খোকামণিকে বুঝি কে এখনই ছিনাইয়া লইয়া যাইবে! যতই সে খোকাকে বেশী করিয়া বুকের মধ্যে লুকাইবার চেষ্টা করিল, ততই সে তাহার মনটাকে শক্ত করিল। শেষে এই স্থির করিল যে, সমস্ত ভর্ৎসনা, সমস্ত তিরস্কার সে অকাতরে সহ্য করিবে। খোকাকে না দেখিয়া সে কিছুতেই থাকিতে পারিবে না।

সন্ধ্যার সময় সে পূর্ব্বেকার মত গৌরকে প্রশান্তর গৃহে পৌঁছাইয়া দিতে গেল।

হরি দত্ত তখন প্রশান্তর ঔষধের অশেষবিধ গুণব্যাখ্যা করিতেছিল। লক্ষ্মীকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। তাহাকে দেখিয়া লক্ষ্মীর সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল।

এখানে আসিবার পূর্ব্বে সে স্থির করিয়াছিল, খোকাকে কোনরকমে সেখানে পৌঁছাইয়া দিয়া সে নিঃশব্দে চলিয়া আসিবে, কিন্তু তাহা হইল না। প্রশান্তর দিকে চাহিয়া কহিল, "প্রশান্তদাদা আপনার কি অসুখ করেছে, চেহারা অমন শুক্‌নো শুক্‌নো দেখাচ্ছে যে?"

প্রশান্ত সহজভাবেই কহিল, "আজ মনটা তেমন ভাল নেই লক্ষ্মী?"

লক্ষ্মী জোর করিয়া মুখের উপর হাসি টানিয়া কহিল, "আমি সকালে আসিনি বলে বুঝি আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন?"

হরিদত্ত ঔষধ না লইয়া হঠাৎ উঠিয়া পড়িলেন। পরম হিন্দু হরিদত্তর নিকট বিধবা লক্ষ্মীর এই ব্যবহার অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইল।

প্রশান্ত বলিয়া উঠিল, "হরি কাকা চলে যাচ্ছেন যে, ওষুধ নেবেন না?"

হরিদত্ত কহিল, "আমার ওষুধে আর দরকার নেই।"

লক্ষ্মী কহিল, "প্রশান্তদাদা আপনি ওঁকে এ বাড়ীতে ঢুকতে দেবেন না।" গৌর তখন তাহার কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

ধীরে ধীরে তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া কোন কথা না বলিয়া লক্ষ্মী কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। লক্ষ্মী-খানিকদূর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল। তাহার মনে হইল শোয়াইবার সময় গৌরের গা-টা যেন তাহার নিকট কেমন গরম বোধ হইয়াছিল। তাহার কি জ্বর হইয়াছে? সে নিঃশব্দে কক্ষে প্রবেশ করিয়া গৌরের কাছে দাঁড়াইয়া তাহার কপালে হাত দিয়া শিহরিয়া উঠিল। ইহারই মধ্যে জ্বরটা এত বেশী বাড়িয়া গিয়াছে! ব্যগ্রদৃষ্টিতে প্রশান্তর দিকে চাহিয়া সে কহিল, "খোকার যে খুব জ্বর হ'য়েছে।"

"জ্বর হয়েছে!" বলিয়া প্রশান্ত চঞ্চল পদে তাহার নিকট গিয়া দাঁড়াইল এবং গৌরের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কপালে হাত দিয়া দেখিল।

প্রশান্ত অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া কহিল, "গা টা গরম বোধ হচ্ছে বটে, তবে এখনও জ্বরটা বেশী হয় নি।"

লক্ষ্মী কহিল, "আমার সত্যি ভারি ভয় করছে। জ্বরটা যদি রাত্রে খুব বাড়ে তা হ'লে কি হবে?"

প্রশান্ত কহিল, "তুমি ওর কাছে থাকবে লক্ষ্মী?"

লক্ষ্মী নিতান্ত অসহায় দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "থাকতে দেবে না যে।"

এমন সময় হরিদত্ত লক্ষ্মীর পিতাকে সঙ্গে করিয়া সেই কক্ষ মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল।

লক্ষ্মীর পিতা কক্ষে প্রবেশ করিয়াই কন্যাকে সজোরে পদাঘাত করিলেন। সে সশব্দে মেজের উপর পড়িয়া গেল। প্রশান্ত কি বলিতে যাইতেছিল, তাহার উপর ইতর ভাষায় এমনই দুই চারিটি কথা প্রযুক্ত হইল যে সে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। তাহাকে শাসাইয়া এবং কন্যাকে প্রহার করিতে করিতে লক্ষ্মীর পিতা সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। সেই গোলযোগে গৌরের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে কাঁদিতে লাগিল, "মা যাব, মা যাব।"

লক্ষ্মীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তাহার খোকা-মণির জ্বর হইয়াছে, সে যে জ্বরের যন্ত্রণায় মা মা বলিয়া কাতরে ক্রন্দন করিতেছে! সে হঠাৎ মাটির উপর বসিয়া পড়িয়া তাহার অতি নিষ্ঠুর পিতার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "খোকামণি জ্বরে ছটফট করছে, আমায় একবার যেতে দাও বাবা, আমি তাকে দেখে আসি।"

প্রত্যুত্তরে তাহার পিশাচ পিতা এমনই জোরে তাহাকে পদাঘাত করিল যে, মাটিতে পড়িয়া গিয়া তাহার নাক দিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

(৬)

গৌরকে শান্ত করিয়া ঘুম পাড়াইয়া প্রশান্ত স্থির হইয়া সব কথা ভাবিতে লাগিল, লক্ষ্মীর জননীর সকালকার সেই দুর্ব্বোধ্য ব্যবহার তাহার নিকট এখন সহজ-বোধ্য হইয়া গেল। অনেক দিনকার পুরাণ কথা তাহার আজ মনে পড়িতে লাগিল। লক্ষ্মী যে তাহার অন্তরটা কতখানি জুড়িয়া বসিয়াছিল, সেই দিন সে প্রথম বুঝিয়াছিল, যে দিন লক্ষ্মীর বিবাহ স্থির হইয়া যায়। সে অন্তরের বেদনা গোপন রাখিয়া মেয়ে স্কুল তাহিয়া দিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। তাহার পর সরযূকে বিবাহ করিয়া সে লক্ষ্মীকে কতকটা ভুলিয়াছিল, কিন্তু যে দিন সরযূকে হারাইয়া নিরাভরণা লক্ষ্মীকে দেখিল, সেদিন অন্তরে যে স্মৃতি সে চাপিয়া রাখিয়াছিল তাহা আবার অতি উজ্জ্বল হইয়া তাহার মানসপটে প্রতিভাত হইয়া উঠিল। সেই অবধি সে কেবলই লক্ষ্মীর কথা চিন্তা করিয়াছে, কি করিয়া তাহাকে সুখী করিবে দিবা-রাত্র কেবলই সেই কথা ভাবিয়াছে। কিন্তু অপদার্থ সে, সেই লক্ষ্মী তাহার সম্মুখে নিষ্ঠুর পদাঘাতে মাটিতে লুটাইল আর সে তাহার কোন বিহিত করিতে পারিল না। প্রশান্ত অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এতক্ষণ হয়ত লক্ষ্মীকে ভীষণ নির্য্যাতন ভোগ করিতে

হইতেছে। এতদিন বলিবলি করিয়াও যে কথা লক্ষ্মীকে সে বলিতে পারে নাই, এইবার তাহা সে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া তাহাকে সমস্ত অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবে, মনে মনে ইহাই সে সংকল্প করিল। দিন পাঁচেক আগেকার একটী ঘটনা মনে পড়ায় তাহার সারাদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সেদিন লক্ষ্মী গৌরকে ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে তাহারই শয্যার উপর কেমন নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, আর সে একদৃষ্টে সেই ঘুমন্ত সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। তারপর হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া লক্ষ্মী লজ্জারুণ মুখে তাহার দিকে একবার চাহিয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সে দৃষ্টি এ এ জীবনে সে ভুলিতে পারিবে না। লক্ষ্মী, লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী তখন পিতৃগৃহের একটী শূন্য কক্ষের মধ্যে পড়িয়া অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল। কি নিদারুণ প্রহার! দেহের নানা স্থানে কালশিরা পড়িয়া গিয়াছে। নাকের রক্তে তাহার পরণ কাপড় স্থানে স্থানে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর যে সমস্ত কদর্য্য দোষারোপ করা হইয়াছে, তাহাতে মনের যাতনা দেহের যন্ত্রণাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। ছি ছি, পিতা হইয়া কি করিয়া কন্যার উপর এরূপ নির্দ্দয় কলঙ্কের বোঝা চাপাইলেন! দারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও সে একবার নিজের মনের ভিতরটা দেখিয়া লইল। তাহার সেই বদ্ধ অন্তরের মধ্যে কেবল গৌরের শুভ্র মূর্ত্তি উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। এই স্নেহকে কি না সকলে ভাণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে! বিধবা হইয়াছে বলিয়া কি ক্ষুদ্র শিশুটিকে বুকে করিবারও তাহার অধিকার নাই! যাতনায় বুক কাটিয়া যাইতে লাগিল। উঃ বলিয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া সে অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে যখন তাহার চিন্তা করিবার মত শক্তি আবার ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার গৌরের কথা মনে পড়িল। সে হয় ত এতক্ষণ ক্ষুধার ঘোরে মা মা বলিয়া কাতরে ক্রন্দন করিতেছে। হা রে মাতৃহীন শিশু! তাহার পিতার বিরুদ্ধে গ্রামের সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে কিছুতেই এ অন্যায় অত্যাচার মুখ বুজিয়া সহ্য করিবে না। সে প্রশান্ত দাদার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করিবে, তিনি কি তাহাকে আশ্রয় দিবেন না? তাহার যে আর কোথায় দাঁড়াইবার স্থান নাই। এ নিষ্ঠুর পিতার গৃহে সে কিছুতেই থাকিতে পারে না। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল একবার ছুটিয়া গিয়া গৌরকে দেখিয়া আসে। সে উঠিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। পরক্ষণেই তাহার মনে পড়িল, সে যে বন্দিনী। পিতা তাহাকে এই কক্ষে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এ ঘর হইতে যে তার বাহির হইবার উপায় নাই! সে মেঝের উপর মুখ গুজিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমনই অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও কখন যে রাত্রি পোহাইয়া গেল, তাহা সে জানিতেও পারিল না।

পরদিন প্রাতঃকালে মুক্তি পাইয়া লক্ষ্মী অতি কষ্টে উঠিয়া আসিয়া দাওয়ায় বসিল। পিতা কাজে বাহির হইবার পূর্ব্বে তাহাকে অত্যন্ত কুৎসিৎ ভাবে গালাগালি দিয়া শাসাইয়া গিয়াছে।

খানিক পরে গৌরের কান্নার শব্দ ভাসিয়া আসিয়া লক্ষ্মীর কানের মধ্যে প্রবেশ করিতেই সে পিতার শাসন, গালিগালাজ ও দারুণ প্রহারের কথা নিমেষে সমস্ত ভুলিয়া গেল। তাহার খোকামণি যে মা মা করিয়া কাঁদিতেছে। সে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। তার পর অতি কষ্টে নিজের ক্ষতবিক্ষত দেহ কোন রকমে টানিয়া লইয়া সে প্রশান্তের কক্ষদ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। গৌর তখনও মা মা বলিয়া কাঁদিতেছিল। লক্ষ্মী কোনদিকে না চাহিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার খোকামণিকে বড় আদরে কোলে তুলিয়া লইল। তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া বুঝিল, তাহার জ্বর

বিরাম হইয়া গিয়াছে। সে মনে মনে ভারি আরাম বোধ করিল।

প্রশান্ত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "একি লক্ষ্মী, কাল এমনই করে তোমায় মেরেচে!" লক্ষ্মী কোন কথা বলিল না। প্রশান্ত একেবারে তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল, তার পর বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া ডাকিল, "লক্ষ্মী!" আজিকার তাহার এই কণ্ঠস্বরে লক্ষ্মীর সারাদেহ কম্পিত হইয়া উঠিল। সে চকিত দৃষ্টিতে একবার প্রশান্তের মুখের পানে চাহিল। তাহার অন্তর অজ্ঞাত আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

প্রশান্ত কহিল, "লক্ষ্মী একটিবার তুমি মুখ ফুটে বল, আমায় ভালবাস—আমি যে তোমায়—"

লক্ষ্মীর চোখের সম্মুখে দিনের আলো সহসা ম্লান হইয়া আসিল। প্রশান্তর সমস্ত কথাগুলি সে শুনিতেও পাইল না। সৌরকে অতি সন্তর্পণে বিছানার উপর শোয়াইয়া দিয়া সে মাতালের মত টলিতে টলিতে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল এবং কোন রকমে গৃহে পৌঁছিয়া দাওয়ার উপর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। "খোকা খোকারে" বলিয়া সে একবার আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াই পরক্ষণে নীরব হইয়া গেল। তাহার জননী ছুটিয়া আসিয়া তাহার প্রাণহীন দেহ স্পর্শ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

জাতীয় শিক্ষার গৌর-চন্দ্রিকা

(শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ)

আচণ্ডালে বিদ্যে দান এটা আজকালকার শিক্ষিতের কাছে একটা ধুয়া বা গোঁড়ামিতে দাঁড়িয়েছে। যে একটু উদার প্রাণ—যার মনই জাতের কল্যাণে লেগেছে সেই এ বস্তু চায়। প্রাণ শক্তির সড়া মানসিক উন্নতির এই পুরাণ সভ্যতার বিদ্যা যে কতক অভাব ঘোচায় তা' একরকম ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আসলে শিক্ষা যে কি—শিক্ষার সব চেয়ে বড় আদর্শ কোন্‌টা—সে বিষয়ে একটা চূড়ান্ত জ্ঞান কারুর মনে নেই। শিক্ষার সম্বন্ধে একটা নিক্কষে ত হয়ই নি, তার ওপর বিদ্যের বিড়ম্বনায় দেশে কৈরঙ্গী আর দেশী মনের ও ধারার এই অবরদস্তি মাথা-ঠোকাঠুকি চলছে, এসিয়া আর ইউরোপের একেবারে বিপরীত জ্ঞান ও সভ্যতার মারমুখো রণ লেগেই আছে। শুধু কি তাই? রাজদণ্ড বা শাসনের শ্রীকোঁৎকা বিদেশীর হাতে থাকায় শিক্ষা-তরীর হাড় আর হাল রাঙা হাতেই ধরে আছে। এই সব বিপদের ওপর আবার স্বাধীনতার হাওয়ায় আমাদের জাগরণ আর জাতীয় শিক্ষার কোলাহল। কাজেই সবাই বুদ্ধিভ্রংশ অবস্থায় মহা গণ্ডগোলে পড়ে গেছে।

শুধু শিক্ষা যে কি বস্তু বা কি রকম হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধেই একটা স্পষ্ট বোধ নেই, তার ওপর জাতীয় শিক্ষা বলতে যে কি বুঝি সে জ্ঞান তো আরও বিরল। কেবল এইটুকু সবাই মনে প্রাণে বুঝতে পেরেছে যে, আজকালকার স্কুলে আর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা' খারাপ, তা'তে চরিত্র মন ও আত্মার জাত মেরে অধোগতি পাইয়ে আত্মঘাত ঘটায়, কারণ রাঙা হাতের দেওয়া বিদ্যের আছে বিদেশী গন্ধ, বিদেশী ছন্দ, বিদেশী মাল মসলা, বিদেশী গতি, বিদেশী প্রাণ। এ বিদ্যের চলবে না —এই "না" এর দিকটায় এক রায় হ'লেও আমাদের উপায় হবে না। বলা হচ্ছে, যে, আমরা মন্দ বিদ্যের

জায়গায় আদর্শতঃ আর কার্যতঃ ভাল শিক্ষার প্রবর্ত্তন করবো? একটা নামে মস্তবের বদ থাকতে পারে, কিন্তু একটা স্কুল বা কলেজ বা শিক্ষা কৌন্সিলের গায়ে "ন্যাশনাল" নামটা ছুড়ে দিলে চলবে না; যে বিদ্যের আমরা নিন্দে করছি সে বিদ্যের মানুষ হয়েছে এমনতর স্বদেশী এঞ্জেন্সির হাতে তার দিলে চিঁড়ে ভিজবে না; সেই পুরোণো পদ্ধতিটাকে ছেঁটে কেটে আর তাতে কিছু ছুড়ে তেড়ে বইগুলো বদলে আর তার ল্যাজে একটা টেক্‌নিকাল ক্লাস জুড়ে দিয়ে এ সমিস্তের নিরসনও হবে না আর তাতে শিক্ষার পরিবর্ত্তনও হবে না। এ রকম একটা হাত সাফাই দেখিয়ে কিস্তি মাৎ কর্ত্তে যাওয়া আর গম্ভীরভাবে উল্টো ডিগবাজী খেয়ে আগে যেখানে ছিলাম, সেইখানেই পড়ে ভাবা যে একটা নতুন মুলুকে গিয়ে পড়িছি, একই কথা। এ বুজরুকী অচল! এই সব নতুন পাঠশালে শিক্ষা ভাল হচ্ছে কি না হচ্ছে, সে কথা আলাদা; কিন্তু এ শিক্ষায় কোন্‌খানটা জাতীয়, সেই হ'লো প্রশ্ন।

জাতীয় শিক্ষার সমস্যা বড় জটিল, বড় দুরূহ। ঠিক কোন্ চিন্তা ধরে বা হাতে কলমে কাজটির কোন্‌খানে আরম্ভ কর্ত্তে হবে, শিক্ষার নবীন সৃষ্টি কি আদর্শের ভিত্তে উঠবে, এ ইস্যারৎ কোন নক্‌সায় গড়বে ভাল, এই ত হ'লো সমস্যা।

যা গড়তে যাচ্ছি তা' একেবারে আনকোরা নতুন জিনিষ, যেখানে গড়বো সেখানে এক অরণ্য সাফ করে নগর বসাতে হবে। আমাদের মান্ধাতার আমলের একটা কিছু পুরাতন অস্থি টস্থি টেনে এনে দিলেই তা জাতীয় হবে না; এককালে যা' চলেছিল এবং যাতে এ জাতের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তাকে এ যুগে বাঁচান আর বাজারে চালান দুষ্কর। এই বর্ত্তমানের নতুন জীবনের অভাব অভিযোগ আর আমাদের প্রকাণ্ড গৌরবখানা ভবিষ্যতের সব সুধা সে একমুটে পুরাণ ফুরে পুরবেনা। এটা যেমন একদিকের কথা তেমনি অপরদিকে কোন ইংরেজী আর্শাণ বা মার্কিন বিদ্যা-পদ্ধতি নিয়ে তার ওপর দেশী রং দেশী বার্ণীশ চড়িয়ে ও চালিয়ে দিলে অনেক চিন্তা ও চেষ্টা চরিত্রের দায় থেকে আমরা বাঁচতে পারি—একটা প্রাণকাড়া গোছের নতুন পদ্ধতি ব্যাপার খাড়া কর্ত্তে পারি বটে, কিন্তু তা'তেও কূল পাবে না। তা' হলেই যদি হতো তবে "ন্যাশনাল ন্যাশনাল" করে এ হট্টগোলের একটা কোন অর্থই থাকে না, দেশী পরিচালনে দেশভাষায় নতুন ধরণের বই বেছে নিয়ে জার্শাণী শিক্ষা দিলেই হয়। আমার বিশ্বাস আমরা যা খুঁজছি তা' এর চেয়ে ঢের বড় জিনিষ—ঢের গভীর করে তলিয়ে বোঝবার বস্তু; তাকে রূপ দেওয়া কঠিন হ'তে পারে, কিন্তু তাই আমরা খুঁজছি যাতে ভারতের জাতি-আত্মা—ভারতের প্রতিভা—ভারতের মন ও ধারা গড়ে তারই একটা তালিকার নাম জাতীয় শিক্ষা। কিন্তু শিক্ষণীয় বিষয় হলো শিক্ষার বহু প্রকার উপায়ের একটা উপায় মাত্র; জাতীয় শিক্ষার মূল লক্ষ্য মানব মন ও আত্মার শক্তি গড়ে তোলা—তার জ্ঞানের ঘুম ভাঙান—ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞাননাড়ীর বোধন ঘটান, যাতে সে নূতন জ্ঞান নূতন তত্ত্ব বা নূতন ধারার সৃষ্টিও করতে পারে এবং তা গ্রহণও করতে পারে। যদি কতকগুলা জড় বিজ্ঞানের কথা হজম করাই উদ্দেশ্য হ'ত, তা' হ'লে যা হোক করে সেইগুলো গিললেই চলতো। কিন্তু তা' তো নয়; এ জড় বিজ্ঞান নিয়ে আমরা কি করবো, কি উপায়ে বিজ্ঞানীর মন ও নব নব তত্ত্ব উদ্ভাবনের শক্তি পাওয়া যাবে তাই হ'লো আসল কথা। ভারতের মন ভারতের নিজের পথে মুক্তির আনন্দে নূতন উদ্ভাবনের পন্থা সৃষ্টি করবে—জড় বিজ্ঞানকে নূতন রূপ দেবে সে কথা না হয় আপাততঃ ছেড়েই দিলাম। যখন মানব মনের অন্য উচ্চাঙ্গের শক্তির কথা বলবো যখন আমাদের মেধা ও প্রকৃতির আরও ভাস্বর ও আরও শক্তিশালী প্রেরণার কথা বলবো তখন না হয়

সে নবীন সৃষ্টির কথা বলা যাবে ; সেইখানেই কিন্তু ভারতের মনের প্রকৃত ছাঁচ, তার চিরন্তন গতি আর পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত শক্তি জ্ঞান ও প্রতিভা—তার গূঢ় অন্তর ধারার (culture) সবটুকু পরিচয় রয়েছে। সংস্কৃত বা যে কোন ভাষা শিখতে গেলে অতীত শিক্ষাপ্রণালী ধরে শিখলেই চলবে না, যে উপায়ে সহজে স্বাভাবিক পথে মনের অনুশীলন সার্থক করে ভাষা শেখা যায় সেই প্রণালীই নিতে হ'বে। সংস্কৃত ও আর আর মাতৃভাষা কি ভাবে শিখলে তাদের সাহায্যে জাতীয় ধারার (culture) প্রাণ ও নিজস্ব ধর্ম খুঁজে বার করা যায়। আজও এ জাতীর বুকে অতীতের যা' কিছু জীবন্ত আছে আর ভবিষ্যতের সৃষ্টির জন্য যত শক্তি জাগবার অপেক্ষায় ঘুমিয়ে আছে সেই দুই বিদ্যুল্লতাকে কি যোগে কি বাঁধনে যুক্ত করা যায় এবং ইংরাজি ও অন্যান্য বিজাতীয় ভাষাই বা কোন পথে শিখে কি ভাবে ব্যবহার করলে অপরাপর দেশের জীবন ভাব ও ধারার আলোয় আপন জীবন গুছিয়ে নিয়ে চারিদিকে জগতের সঙ্গে মিলনসূত্র গড়ে তোলা যায় সেইগুলি হ'লো জাতীয় শিক্ষার মূল কথা। জাতীয় শিক্ষা মানে বর্ত্তমানকে মুছে ফেলা নয় কিন্তু আমাদের নিজের মনে নিজের আত্মায় নিজের অন্তর দেবতার ভিত্তি করে জীবনবেদ রচনা করাই জাতীয় শিক্ষা।

জাতীয় শিক্ষার প্রতিপক্ষ দল আর একটা যুক্তি স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেন, যে, পাশ্চাত্য সভ্যতাই আমাদের শিখতে হ'বে, আমাদের বাঁচবার কোন পন্থাই নাই আর তাই শেখবার উপায়ই প্রকৃত শিক্ষা। জাতীয় শিক্ষার আদর্শ এই ধারণার স্বতঃসিদ্ধত্বকেই অপ্রমাণ করতে চায়। প্রতীচ্য থেকে —মিশর, চ্যালডিয়া, ফিনিশিয়া ও ভারত থেকে ভাব নিয়ে ভিত রচনা করে তার ওপর য়ুরোপ নিজের সভ্যতা গড়েছে, প্রতীচ্যের সেই ভাব-ধন গ্রীস ও রোমের প্রতিভায়—তাদের প্রকৃতিগত গুণে সামাজিক মন ও প্রেরণায় আর তাদের জীবন ভঙ্গীতে আর এক রূপ ধরেছিল, সে যুগে য়ুরোপ কিছুকাল প্রতীচ্যের ভিত্তিটি হারিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু আবার আরব জাতির স্পর্শে তুর্ক ইরাণ আদি দেশ ও ভারত থেকে নূতন প্রেরণা পেয়ে, বিশেষতঃ Renaissance এর যুগে হারাণ ভাব-সম্পদটি আবার ফিরে নিয়ে টিউটন ল্যাটিন কেল্টিক ও জাত জাতিরা নিজ নিজ প্রতিভায় মন প্রাণ ও সমাজ গতির বলে সে সম্পদকে নতুন করে জীবনের অনুকূল রূপ দিয়ে নূতন সৃজনে সৃষ্টি করে নিয়েছে। এই রকমে গড়া সভ্যতাই যেন মানবজাতির উন্নতির শেষ কথা এই বলে সেটিকে এতদিন য়ুরোপ জগতের সামনে তুলে ধরেছিল। কিন্তু এসিয়ার জাতিরা তা' কেন ওভাবে অন্ধ অনুকরণে গ্রহণ করবে ? তার চেয়ে ভাল করে সার্থক করে নেবার পথ যে রয়েছে ; য়ুরোপ যা' কিছু নূতন ও সত্য জ্ঞান দিতে পারে তা' নিয়ে নিজের ধারায়—cultureএ ও জ্ঞানে মিশিয়ে এসিয়ার প্রকৃতি প্রতিভা ও সমাজ প্রেরণায় নূতন ছাঁচে অভিনব জীবনবেদ সৃষ্টির দ্বারা মানবের আত্মা গড়ে উঠবে, তা যে শুধু অতীতের রঙের ছবিই হলে চলবে তা' নয়, তা' এমন কিছু পরম পরশ ধন হওয়া চাই যা' ভারতের ভবিষ্যতের যত সাধ আশা—ভারতের দিনে দিনে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর জীবনের এই ভাবি আত্ম-সৃজনের অনুকূল হয় আর ভারতের চিরন্তন প্রাণের সত্য হয়। এইটী আমাদের মনে জ্ঞানে বেশ স্পষ্ট করে নিতে হবে, এই শিক্ষার মূলের খুব সুদৃঢ় ভিত্তি রচনে তবে ত তার ওপর আমরা বিশাল ও মহান করে সৃষ্টি আরম্ভ কর্ত্তে পারবো। তা' না করে যে কোন একদিকে একটা ভ্রান্তির পেছনে ছুটে পড়া অতি সহজ, শুনতে ও বলতে বেশ ; মুখভরা একটা বা, হোক রব তুলে একরকম মেঠো কাঁচা পথে বেরিয়ে পড়লে চলতে চলতে আমরা গিয়ে পড়বো খানায় ডোবায় কি নালায় তার ঠিক থাকবে না।

জাতীয় শিক্ষা বলতে গোড়ায়ই একটা প্রকাণ্ড

কথাকাটাকাটির কারণ হয় এই নিয়ে যে, শিক্ষা হ'লো সার্ব্বভৌমিক জিনিষ আর দেশপ্রেম হ'লো একটা সঙ্কীর্ণ ব্যাপার,—তা' বড় জোর দেশবাসীকে দেশের কর্ত্তব্যই না হয় শেখায়, শিক্ষার মাঝে আবার এ দেশপ্রীতির অনধিকার চর্চ্চা কেন? গোড়ায় এই প্রতিবাদের মূল নিরসন করা দরকার, নয় এর কোথায় কতটুকু সত্য আছে তা বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। এই দল বলের যে, দেশপ্রীতির কর্ত্তব্য কি পাশ্চাত্ত্য কি প্রাচ্য কি ইংলণ্ড কি জার্ম্মাণী কি জাপান কি ভারত সব জায়গায়ই নাকি এক, তা' শেখাবার জন্যে তাই আলাদা আলাদা শিক্ষার দরকার নেই। মানুষ যখন সর্ব্বত্রই এক এবং সত্য ও জ্ঞানের কোন জাতি বা দেশ নাই, সে হিসাবে শিক্ষাও সুতরাং বর্ণ গোত্র ও ভৌগলিক সীমাহীন এক সার্ব্বভৌমিক জিনিষ হওয়া দরকার। এই ধর জড় বিজ্ঞানে আবার জাতীয় শিক্ষা কি হতে পারে! জড় বিজ্ঞানের জাতি কোথায়? আমরা কি সেই আদি কালের বাঁধাবুড়ী ভাস্কর আর্য্যভট্ট ও বরাহ মিহির ধরে বসে থাকবো আর তারপরে যাঁরা হয়েছেন সেই গ্যালিলিও নিউটন থেকে আজকালকার এই অভিনব জড়বিজ্ঞান ছেড়ে দেব? কিম্বা ল্যাটিন গ্রীক অথবা অন্য ইয়ুরোপের ভাষা ও সংস্কৃত শিক্ষা পদ্ধতিতেই বা জাতীয় হিসাবে কি তফাৎ হতে পারে! তা' হ'লে কি নদীয়ার সেই সনাতন টোলের বাবস্থায় ফিরে যেতে হ'বে কিম্বা নালন্দ বা তক্ষশীলায় কেমন শিক্ষা বিধান ছিল তা যদি আবিষ্কার করা যায় ত তাই ধরে বসে থাকতে হবে! না হয় বড় জোর দেশের ভাষায় শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে ইংরাজি ভাষাকে একটা গৌণ ব্যাপার Second language করে রাখা যেতে পারে আর খুব করে অতীত ভারতের ব্যাপারের যত ইতিহাস শিকাই দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তা'তেও কথা আছে। যে বিংশ শতাব্দির যুগে আমরা আছি সে যুগে আবার চন্দ্রগুপ্ত বা আকবরের ভারতকে বাঁচিয়ে তোলা কঠিন হবে, জগতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বর্ত্তমান জ্ঞান সভ্যতা ও ধারার সঙ্গে নাড়ীর যোগ ছিঁড়ে হালফাসানি হয়েই যে আমাদের বাঁচতে হবে।

এ যুক্তি-বাণ তখনই সন্ধান করা চলে যখন জাতীয় শিক্ষা কেবল অতীতের ধুয়া ধরে পেছু হেঁটে চলেছে, কেবল সেইরূপ সেই বিগ্রহ নেবার চেষ্টাই করেছে যা' একদিন ভারতের জীবন্ত ধন থাকলেও এখন কাল প্রভাবে ঘরে আসছে। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা বলতে তা' তো আমরা বুঝছি নে। দেশের জীবন-ধারা এখন যেমন রেল বা মটর ছেড়ে পুরাণ রথ বা গরুর গাড়ী নিয়ে চলতে পারে না, তেমনি আমাদের নতুন জীবনের জীবন্ত জাতীয় শিক্ষাও ভাস্কর পণ্ডিতের অঙ্ক বা জ্যোতিষ শাস্ত্রে কি নাগাদ ফিরতে পারে না। এত বড় আন্দোলনের কোথাও পুরাণ ভারতকে ফেরাবার ওরকম উদ্ভট চেষ্টা বা পাগলামী থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু সমস্ত প্রেরণাটির সুর তা'ত নয়; বর্ত্তমানের জীবন্ত আগ্রত শক্তির ঘর যে জাতি আমা, আমাদের তার কথা ভাবতে হবে। সে হিসাবে এ প্রশ্ন তো অতীত বা বর্ত্তমানের ফল নিয়ে নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বিদেশী সভ্যতা ও ভারতের মন ও প্রকৃতি আজও যে সভ্যতা রচনার শক্তি ধরে সেই দুই সভ্যতা নিয়ে। আমাদের আমদানী করা রচনা হবে অতীত ও বর্ত্তমানের মাঝ পথে নয়। কিন্তু বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মাঝ পথে পঞ্চম শতাব্দিকে ফিরে আনার আবশ্যক নেই, আবশ্যক হচ্ছে বহু অনাগত শতাব্দির জন্ম দেওয়া; পেছু হটা আদৌ নয় এগিয়ে পড়া সেই পথে যে পথ বর্ত্তমানের এই কৃত্রিম মিথ্যা নকলের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ভারতের শক্তিতে ভারতের প্রাণ তার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য প্রেরণা ও সিদ্ধিকে জাগিয়ে তুলবে।

জাতীয় শিক্ষার বিরুদ্ধে এই সব যুক্তি তখনি আসরে নামে যখন এই রকম একটা ধারণা [illegible]

পেয়ে বলে যে শুধু কি কি বিষয় শেখান যেতে পারে তারই একটা তালিকার নাম জাতীয় শিক্ষা, ভবিষ্যৎ সভ্যতা এসিয়াই গড়ে দেবে না কেন? য়ুরোপে এই জড়বিজ্ঞানের বস্তুতান্ত্রিক বৈশ্য-প্রাণ অর্দ্ধ-গণতান্ত্রিক সভ্যতা য়ুরোপেই ভেঙে পড়েছে, সে বালির বাঁধ বসা কোঁপরা ভিতর উপর অঙ্কের মত আমাদের জীবন-ইমারত গড়ে তোলে যে বড় পাগলামী। য়ুরোপে এই রক্ত-সন্ধ্যার যখন য়ুরোপেরই বড় বড় প্রাণগুলি নূতন আধ্যাত্মিক সভ্যতার জন্য এসিয়ার প্রতিভার দিকে মুখ ফেরাতে আরম্ভ করেছে, তখন আমরা নিজের অন্তর নিহিত এত শক্তি ছেড়ে দিয়ে য়ুরোপের বসা মরা অতীতকে লতার মত জড়িয়ে থেকে আত্মঘাত করবো কেন?

আর সব শেষে এই প্রতিবাদী দলের মোক্ষম অব্যর্থ যুক্তি এই হয়ে দাঁড়ায়, যে দুনিয়া জুড়ে যত মানুষ আছে সবার মন মূলতঃ একই আর এক কাঁচি কলে ফেলে অর্ডার মাফিক তাদের একই মাপে কেটে ছেঁটে নেওয়া যায়। আমাদের মনের মুক্তির এই পুরাণ কুসংস্কারটা এবার ছাড়বার দিন এসেছে। কারণ মানবজাতির অখণ্ড আত্মার সেই একত্বের মাঝে প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত আত্মাগুলি জনে জনে তাদের সমদর্শী নিয়ে আবার তাদের লক্ষ বৈষম্য ভেদ ও অনির্ব্বচনীয়তা নিয়েও বিরাজ করছে। আবার অখণ্ড মানবজাতি আর ব্যক্তির মাঝে কত শত জাতি আত্মা (nation-souls) তাদেরও জাতিগত অভিনবত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জাতীয় শিক্ষা এই তিনটি আত্মারই জীবনের অনুশীলন বিষয়ে লক্ষ্য রাখবে, তবেই তা কৃত্রিম একটা কিছুতে পরিণত হবে না, তবেই তা' মানুষের আত্মার ও মনের প্রকৃত শক্তি গড়তে পারবে আর যা সুপ্ত আছে তাকে জাগিয়ে দেবে। জাতীয় শিক্ষা এই হিসাবেই মানুষের জীবনবেদ। বিজলী।

আমাদের কথা

এবার বরিশালে বৈঠকটা বন্ধ হয় নাই! সভাপতি অস্থির হইয়া সভা ত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করা ইতিপূর্ব্বে আর কখন শুনা যায় নাই। তবে সভাপতির আসনে বসিয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ বোধ হয় পার্লামেন্টের অনুকরণেই অনুকরণ। কারণ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে পার্লামেন্টী ধরণ অনুকরণ করা হয় নাকি! বিপিনবাবু নাকি মডারেট হইলেন! অনেক কাগজে তাঁহার বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতেছে। তবে Part company না হউক, নূতন দল গঠন বিপিন বাবুর পক্ষে নূতন নহে। পনের বৎসর পূর্ব্বে ঐ বরিশালেই আর একবার। বরিশালের সোনা হাওয়া বিপিন বাবুর পক্ষে অস্বাস্থ্যকর বলিয়াই বোধ হইতেছে।

বৈঠকের অন্যান্য খবর এখন পুরাণ হইয়া গেল। তবে বৈঠক বসিবার পূর্ব্বে নানারূপ আশা করা গিয়াছিল। পরে দেখিলাম সেই Stereotyped ধরণ। আজকাল আর একটা নূতন জিনিষ উঠিয়াছে Constitution এর ধসড়া তৈয়ার করা। তাতে আবার সমগ্র মানব-সমাজের শাসন পদ্ধতির মূল সূত্র ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টার সহিত একটা নূতন সূত্র দিবার ব্যগ্রতা। যদিও তাহার মধ্যে নূতন কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কিন্তু এও পুরাণ হইয়া গিয়াছে। একমাত্র পুরাণ হইয়াও নূতনের মত আদরে আছে Non-co-operation.

নন্‌কো-অপারেশন উচিত হউক অনুচিত হউক ভারতবাসী তাহা বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করিল না। ফলে তাহা ক্রমেই জটীলতর হইয়া উঠিতেছে। প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব হউক বা না হউক কিন্তু প্রশ্নের উত্তর বিশেষ দরকারী তাহা গোড়া হইতেই দেখা যাইতেছে। উত্তর প্রত্যুত্তরে মীমাংসা সম্ভব হইলেও তাহা সাতমাসের ভিতর শেষ হইয়া, কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে পরিণত হইয়া ফলপ্রসূ হইবে কিনা

সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে বলিয়াই বোধ হয়। এদিকে সময় যতই বহিয়া যাইতেছে আলিবাগ ওয়ালা বাগের রক্তবন্যা, গুজরাণওয়ালার কলেজ হোষ্টেলে বোমা পতন, অমৃতসরে মানুষকে পশুবৎ বুকে হাটিতে বাধ্য করণের স্মৃতি ক্রমে মলিন হইয়া আসিতেছে! মনে হয় মনকো-অপারেশন ভারতের বিনা প্রশ্নে মাথায় তুলিয়া লওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পেটজোড়া প্লীহা, বুকভরা কফকাশ, মাথাভরা অন্ন ও কন্যার বিবাহ চিন্তা, তাই বোধ হয় আমরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বনবাসী সাজিতে পারি নাই। সাত মাস ক্লিজের পেটে কিছু দিই বা না দিই, আমার পাপে আমার যে সন্তানগুলি পৃথিবীতে আসিয়া আধাপেটে দিন কাটাইতেছে, তাহাদেরও উপবাস করাইয়া পাপের মাত্রা আরও বাড়াইতে শঙ্কা বোধ হয়। হয় ত ভারতের স্নিগ্ধ আকাশতলে শুধু শস্য শয্যায় সাত মাস কাটাইতে পারিলে সুদিন ফিরিত। কিন্তু পেটজোড়া প্লীহা, বুকভরা কফকাশ, আরশ্যাই না খাই, শুই না শুই, কন্যা-বিবাহ!

আমার স্বাস্থ্যের বন্ধন, অন্নের ক্রন্দন, সমাজের পীড়ন, এতগুলি কাটাইয়া তবে ত রাজনীতিক স্বাধীনতা!

• • • • •

বিপিনবাবু ম্যাজিক দিতে পারেন নাই, লজিক দিয়াছেন! কিন্তু তিনি পুরাতন Platform Speaker আর একথা তিনি বেশ জানেন যে masses লজিক চায় না, তাহারা একটু ম্যাজিকই চায়। অবশ্য কংগ্রেস, কনফারেন্স পূর্ব্বে একেবারেই masseএর জিনিষ ছিল না। কিন্তু আজ সেখানে আর শুধু তর্ক শাস্ত্রের নিরস কর্ম্মহীন ব্যাখ্যায় চলে না। আজ চাই প্রাণের তীব্র আবেগ। বেজাবেদার মহাত্মা গান্ধী যে সব কথা বলিয়াছেন তাহাতে লজিক খুব বেশী পরিমাণে থাক বা না থাক, অন্ততঃ তাহাতে প্রাণের কথার অভাব নাই।

১লা মে হইতে নাকি উকীলগণ প্রাকটিস ত্যাগ করিবেন। হাইকোর্টের ব্যাপার যাহা বুঝিতেছি তাহা ঠিক মায়ের ডাক বা মহাত্মার উপদেশ নয়। সেখানে পেটে হাত পড়িয়াছে! যদি পেপার বুক সংক্রান্ত নূতন নিয়ম আবার পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে উকীলগণের এ কোট থাকিবে কি?

• • • •

Reformed লেজিসলেটিভ কাউন্সিলগুলি দ্বারা আমাদের কতটুকু স্বরাজ লাভ হইল তাহার আর মাপ করিয়া কি হইবে? বাঙ্গালার বিচক্ষণ গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে তাহা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। সহজ জ্ঞানে এইটুকু বুঝি নানারূপ ট্যাক্স ডিউটি বাড়িয়া গেল। কারণ খরচ অনেক। খরচের ভিতর বাজে খরচও যথেষ্ট। 'হিন্দুস্থান' ঠিক বলিয়াছেন যে যাহার ঘরে অন্ন নাই, চালে খড় নাই, তাহার আবার সভায় মেহগ্নি কাঠের আলমারী কেন? সে আলমারী আমরা রাখিব কোথায়? সমগ্র জগতের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি তাজমহল ভাল করিয়া সাজাইয়া রাখ, দিল্লীতে নূতন অমরাবতী গড়িয়া তোল, আর অনাবশ্যক হইলেও, নূতন নূতন মিনিষ্টার ও এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলার করিয়া ভারতীয় নব এরিষ্টক্রাসীর মুখে হাসি ফুটাইয়া তোল; আর হে জনসাধারণ, জগতের শ্মশানে শৃগাল কুকুরে তোমাদের টানিয়া ছিঁড়িয়া খাক। আর সেই শ্মশানের মাঝে তাজমহলের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় আমাদের মন্ত্রীগণ পটের ছবির মতন বাঁকা হাসিতে গাল ভরিয়া রাখুন। এই যদি স্বরাজের প্রথম সোপান হয় তবে 'ভিক্ষায় চাউলে কাজ নাই বাবা, কুকুর ঠেকাও।'

লেজিসলেটিব কাউন্সিলের কোন দাড়া খুঁজিয়া পাইলাম না। অনেক মেসর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী নিয়োগে Competitive Examination প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিতে করিতে হঠাৎ করিয়া থামিয়া গেলেন। যেমন মোটরকারের গতিবেগে মানুষ পড়িয়া গেলে ভাল ড্রাইভার হঠাৎ করিয়া ব্রেক আটিয়া দেয়। কৈফিয়ৎ

তিনি বলিয়াছেন যে কোন কোন মুসলমান বন্ধুর নিকট হইতে হঠাৎ পত্র পাইয়া তাঁহাকে এরূপ করিতে হইয়াছে। ইহাকেই কি বলে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি! যেখানে ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক সামান্য ক্ষতির জন্য সমগ্র সমাজের সমূহ অকল্যাণকর একটা কুনিয়ম পরিবর্ত্তনে এমন বাধা, সেখানে সমাজের উন্নতি, মঙ্গল প্রভৃতি শব্দ চিরদিন ধরুতায় এবং পুস্তকেই শোভা পাইবে। আমাদের ভুজুর ভয় সকল দিকেই।

* * * *

প্রহ্লাদ শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় গত মাসের প্রবাসীতে 'জাতি গঠনে বাধা ভিতরের ও বাহিরের' নামে একটী সুন্দর সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আজ যে হাওয়া দেশে বহিতেছে তাহার গতি বুঝিবার জন্য প্রবন্ধটী বিশেষ চিন্তাপূর্ব্বক পাঠ করা উচিত। হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির সম্বন্ধে তিনি যে কথা লিখিয়াছেন তাহাও সত্য। কেবল সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডি টানিয়া দিলে তাহার সঙ্কোচন ছাড়া প্রসারণের সম্ভাবনা করা হয় না। তিনি বলিয়াছেন "……আমরা এখন "জাতীয়" শিক্ষা চাই। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা কি? জাতীয় শিক্ষার অর্থে কি বটতলার বই পড়া? আর্য্য সমাজের লোক জাতীয় শিক্ষার অর্থ করছেন বেদপাঠ করা; কেননা তাহাদের মতে বেদ অভ্রান্ত। বিবেকানন্দের ভক্ত বলবেন বেদান্ত পাঠ কর—দ্বৈত, অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বিচার কর। আবার কেহ বা বলবেন রামায়ণ, মহাভারত পুরাণ পাঠ কর। কিন্তু হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি নানা ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসিগণ সকলে এই ব্যবস্থায় সম্মত হবেন কি?……" প্রকৃত উদারতার চোখে চাহিয়া মস্তিষ্ক কল্পিত সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডি কাটাইয়া যদি ব্যবস্থা না করা যায় তাহা হইলে এতগুলি লোককে কেমন করিয়া একসূত্রে গাঁথিবে, কেমন করিয়া জগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিবে 'আমরা এক দেশবাসী সব ভাই ভাই'।

প্রফুল্লচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিয়াছেন 'জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে ইংরাজি ভাষাকে একেবারে বাদ দেওয়া চলে কি?' তিনি বলিয়াছেন "শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক পুস্তকে যাঁরা হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়াছেন তাঁরা জানেন কারও স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন এ দেশে হয় নি।…… ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের যৌক্তিকতা প্রদর্শনকালে রামমোহন রায় লর্ড আমহার্ষ্টকে যে পত্র লিখেছিলেন তা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই পাঠ করে দেখা উচিত।"

যমুনার পাঠকবর্গকে আমরা উক্ত পত্রের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real Knowledge, the Baconian Philosophy would not have been allowed to displace the system of the Schoolmen, which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British legislature.

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে যে দেশে জাতীয়তার উদ্বোধন হইয়াছে এ কথা আজ কালকার আন্দোলন উত্তপ্ত অনেকে ঠিক স্বীকার করেন না। প্রবন্ধের প্রফুল্লচন্দ্রের নিম্নলিখিত কয়টী কথা তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিতে একবার অনুরোধ করি। "On national lines মানে কি নবদ্বীপের টোল বা মুসলমানদের মুক্তাব? কোন্ সাহিত্য চর্চ্চার ফলে দেশে রাজনীতি চর্চ্চা আরম্ভ হয়েছে? No taxation without representation কোন্ সাহিত্যের কথা?"

ভারতবাসীর স্বাধীন মতিলে ডুবিয়া মরিবার অবস্থা উল্লেখ করিয়া তিনি মান্দ্রাজের স্বর্গীয়

ঐ মাদেরাজের মৃত্যুকালীন যে খেদোক্তি তাঁহার প্রবন্ধে তুলিয়া দিয়াছেন তাহা বড় মর্ম্মান্তিক। The longer one lives, observes and thinks, the more does one feel that there is no community on the earth that suffers less from political evils and more from self inflicted or self accepted and therefore avoidable evils than the Hindu.

ধরণীপৃষ্ঠে হিন্দুজাতি ছাড়া আর এমন কোন জাতি নেই যাহারা পলিটিক্যাল বা রাষ্ট্রনীতিক দুঃখের চেয়ে আত্ম-সৃষ্টিত বা আত্মসৃষ্ট সুতরাং প্রতিকার্য্য সহজ দুঃখ বেশী ভোগ করে।"

একথার সত্যতা প্রতি পদে পদে অনুভব করিতেছি। একটা কঠোর-কল্পিত সুচিতার চিন্তায় আমাদের স্ত্রীলোকদিগের শারীরিক বা মানসিক উন্নতির এখনও আমরা বিরোধী। প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছেন "মা, ভগ্নী, সহধর্ম্মিণীকে মূর্খ করে রাখলে কি লাঞ্ছনা হয় তা ত আমরা প্রতিপদে বুঝতে পারছি। তবু ত আমাদের চেতনা হয় না! ইউরোপীয় যুদ্ধে স্ত্রীলোক কত কাজ করে দিয়েছেন তা আজ সকলেই জানেন। আমাদের ঐ সম্বন্ধে স্ত্রীলোকের কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশা কতটুকু? তাঁদের গতমূর্খ ও অকেজো পুতুল করে রেখে আমরা সমাজের আধখানা অঙ্গকে পক্ষাঘাতে পঙ্গু করে রেখেছি। স্ত্রীশিক্ষার স্থান ত কোথাও দেখছি না। আর পুরুষের যা শিক্ষা সে ত ডিগ্রী ও চাকরীর লোভে।"

পুরুষ শিক্ষায় আমাদের আপত্তি না থাক, কিন্তু তার ধরণ ধারণ ও রকমের কথা লইয়া যেরূপ আন্দোলন তাহাতে একবার ভাবিয়া দেখা উচিত মোটে কয়জন শিক্ষিত। এই মুষ্টিমেয় লোকের জন্য এ শিক্ষা ভালনা ও শিক্ষার মনুষ্যত্ব নষ্ট হয় প্রভৃতি নানারূপ কল্পিত আপত্তি উত্থাপন করিয়া আবার শিক্ষায় বিঘ্ন সৃষ্টি হইতেছে। প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছেন —"আবার লোক শিক্ষার কথা যদি ধরা যায় তা হলে ত বুক শুকিয়ে উঠে। দেশের শতকরা ৯৫ জন নিরক্ষর। আপনাদের শিক্ষার জন্য আমরা স্কুল কলেজ স্থাপন করছি; কিন্তু কোটী কোটী লোক যে অজ্ঞতার স্তূপের নীচে চাপ পড়ে যারা যাচ্ছে। তাদের বাঁচাবার জন্য আমাদের ক'জনের প্রাণ কেঁদেছে? লোক শিক্ষার জন্য সুদীর্ঘ বক্তৃতা হতে শুনেছি, কিন্তু খুব অল্প কর্ম্মেরও প্রতিষ্ঠা হতে ত দেখিনি। কিন্তু এই বিপুল জনসঙ্ঘ যদি চিরকালই শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে থাকে, তবে কি আমরা আকাশ থেকে জাতি গঠনের উপকরণ সংগ্রহ করবো? জনসাধারণকে নিয়ে জাতি। জনসাধারণকে বাদ দিয়ে যা থাকে, তা অন্য কিছু হ'তে পারে, কিন্তু জাতি কোন কালেই নয়। জাগরণের ঢেউ জনসাধারণের কাছে পৌঁছান চাই। যদি জিজ্ঞাসা করি—কলিকাতায় দোকানপাট বন্ধ হয়েছিল কেন? উত্তর হবে—মহাত্মার হুকুম। "কেন?" "তা জানি না।" কিন্তু জাপানেও ইংলণ্ডে এ রকম অজ্ঞতা দেখা যায় না। শতকরা ৯৫ জন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হ'লে জাতির দেহে বল সঞ্চারের সম্ভাবনা কোথায়? প্রজাশক্তি যদি জাগিয়ে তুলতে হয় তবে এখন শিক্ষার দীপ গ্রামে গ্রামে জ্বেলে দিতে হবে। তবেই ত রাজনৈতিক আন্দোলন জনসাধারণের ইচ্ছা, শক্তি,ও সহানুভূতির উপর দাঁড়াতে পারবে। এই সত্যটুকু উপলব্ধি করেই পুণ্যশ্লোক গোখলে জীবনের শেষভাগে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য কি পরিশ্রমই না করেছিলেন।

"জনসাধারণের শক্তির উপর ভিত্তি নেই বলে ভারতবর্ষে অনেক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। ইতিহাসে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। রণজিৎ সিংহ বা হায়দর আলির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সৈন্যদল বিধ্বস্ত হয়ে গেল। দেখা গিয়েছে সেনাপতি যেমনই হত হলেন, অমনি সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খরগোসের মত পালিয়ে গেল।

তাই বলি কোন আন্দোলনই মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের নিয়ে সফল হয় না। জনসাধারণের উপর ভিত্তি না থাকলে সব ইমারত তাসের ঘরের মত ভূমিসাৎ হয়ে যায়। আমি কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় বা রাজনীতিক দলের উপর কটাক্ষ করছি না। আমি দূর থেকে ঘটনাবলি পর্য্যবেক্ষণ করে অভিজ্ঞতার দ্বারা যেটুকু বুঝেছি তাই দেশবাসীকে জানাচ্ছি। আমাদের অনেক গলদ আছে। দেহের মধ্যে যদি দূষিত ক্ষত থাকে তবে অস্ত্র চিকিৎসা চাইই চাই। পুঁজ রক্ত বাহির করে দিতেই হবে, চাপা দিলে শুধু মৃত্যুকে ডেকে আনা হবে।

"আজ দেশই আমাদের একমাত্র দেবতা। তাঁর পূজার নৈবেদ্য সকলকেই সাজিয়ে আনতে হবে। কারও মুখ চেয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকলে রাজার পুকুরে দুধ ঢালবার মত দুধ আর এসে পৌঁছবে না, —আসবে শুধু জল। তাই আজ মনের ভক্তি ও দেহের শক্তি দিয়ে মায়ের সিংহাসন সাজিয়ে দিতে হবে। এ পূজায় সবারই সমান অধিকার। সকলকেই এ পূজার উপকরণ জোগাড় করে আনতে হবে। হিন্দু মুসলমান হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়ে সত্যধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা করবে।"

• • • •

একটা কথা বহুবার মনে হইয়াছে। আমরা যে পরাধীন সেটা শুধু ইংরাজের অধীন বলিয়া নয়। বোধ হয় পরাধীনতাই ভারতীয় চরিত্রের বিশেষত্ব। আমরা প্রাচীনতম কাল হইতে নিজেদেরই 'পরাধীন'। আমরা সহস্র বেড়ীর বন্ধনে নিজেদের হাত পা এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছি যে ইংরেজ চলিয়া গেলেও আমাদের মনুষ্যত্বের স্বাধীন বিকাশের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। শত সহস্র গণ্ডির ভিতর আবার নিত্য নূতন নূতন উপগণ্ডি আঁকিয়া থাকিয়া প্রচণ্ড জড় তত্ত্বতত্ত্বের দিকেই আমরা অগ্রসর হইয়াছি। যে দিন অচিন্তা এত প্রবল ছিল না সে-দিন আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ দ্বিপ্রহরে আহারান্তে তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া কেবল সমাজের কার কোথায় কতটুকু ঠাঁই তাহার ব্যবস্থা করিয়া পরকালের শুভ করিবার নামে তাহাদের ইহকালের চলচ্ছক্তি রোধ করিয়া দিয়াছেন। আমরা যে বাহিরে ইংরাজের অধীন আর ভিতরে মা বাপের অধীন শুধু তাই নয়। আমরা হিন্দুত্বের অধীন, হিন্দু আচার ব্যবহারের অধীন, হিন্দু পুরোহিতের লাগাত হিন্দু ধোপা নাপিতের অধীন। আমরা বয়স হইলে বিবাহ করিবার অধীন, কন্যা বিবাহ দিবার অধীন, এবং প্রতিপদে একঘরে হইবার অধীন। কাঁটা বাঁশের ঝাড়ে যেমন কাঁটার কঞ্চিতে জড়াইয়া জড়াইয়া এক দুর্ভেদ্য দুর্লঙ্ঘ্য জঙ্গলের সৃষ্টি করে, আমাদের সমাজের বহু জটীলতার ফলেও তাহাই হইয়াছে। মূল বাঁশটী কাটিয়া দিলেও কঞ্চির বন্ধন ছাড়াইয়া বাঁশটীকে বাহির করিয়া আনিবার সাধ্য কাহারও নাই। আমাদেরই কি মূল পরাধীনতা দূর হইলে প্রকৃত স্বাধীনতা আসিবে? কঞ্চির আর কাটার উপায় কি?

• • •

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাঙ্গালী যুবকের বিবাহের বিজ্ঞাপন ও কুলশীলের তালিকা দেখিয়া যে হতভম্ব হইয়াছেন সে সম্বন্ধে একটা কথা বলিবার আছে। শিক্ষা শুধু পুস্তক পাঠে হয় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রভাবের উপর তাহা অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। বাঙ্গালী যুবকের জীবনের উপর এখনও কোন্ প্রভাব অধিক পরিমাণে কার্য্য করিতেছে তাহা একবার চাহিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন বাঙ্গালীর পুস্তকগত শিক্ষা প্রকৃত ভাবে হইতে কত দেরী। Sadler commission এর Enquiry'র ভিতর দেখিলাম একব্যক্তি বাঙ্গালীর জীবনে তাহার বাড়ীর প্রভাবের সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। বাস্তবিক জন্মাবধি যে সমস্ত সংস্কারকে একেবারে অভ্যাস করিয়াছি তাহা শুধু পুস্তক পড়িয়াই দূর করা সম্ভব নহে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার

ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন ভিন্ন প্রকৃত মঙ্গল রাতারাতি আশা করা বাতুলতা মাত্র।

বাস্তবিক শুধু ভারতবর্ষ কেন, জগতের কোন দেশেই সামাজিক সংস্কারাদি রেলের গতিতে পরিবর্ত্তিত হয় নাই। ইংলণ্ডেও সেদিন পর্য্যন্ত ভালী বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। প্রকৃত পক্ষে No taxation without representation আরম্ভ হইয়াছে ১২১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে। কিন্তু ১২১৫ হইতে এ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে সাধারণ সামাজিক স্ত্রীপুরুষের ব্যক্তিগত অধিকারাদির কতটুকু পরিবর্ত্তন হইয়াছে? বাঙ্গলায় একটা জিনিষ বড় দ্রুতগতিতে চলিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে, সেটী 'বহু বিবাহ', বোধ হয় জগতের ইতিহাসে এত বড় সামাজিক পরিবর্ত্তন অন্য কোন দেশে কখনও দেখা যায় নাই। কিন্তু বহু কারণে বহু বিষয়ের প্রভাবে ইহার লোপ সাধন হইয়াছে। তন্মধ্যে অন্নচিন্তাটী বড় সোজা নয়। আর একটী বড় কারণ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলায় কতকগুলি নৈতিক আন্দোলনের ফলে পারিবারিক শুচিতার প্রতি আমাদিগের তীব্রতর আকর্ষণ। কিন্তু এ পরিবর্ত্তন দেখিয়াও আমরা এখনও বিশেষ আশাযুক্ত হইতে পারি নাই। কারণ আর এক দিকে চাহিয়া দেখিতেছি জাতি ভেদ, কৌলীন্য প্রভৃতির প্রতি নূতন করিয়া একটা মোহ না আসুক, সেগুলি ত্যাগ করিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আপত্তি। তত্ত্ব কুলীন নূতন মোটেই দেখা যায় না, অথচ কন্যা বিবাহের কষ্ট পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। তাই মনে হয় সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলানুযায়ী পরিবর্ত্তন এখনও বহু সময় সাপেক্ষ।

কিন্তু তাহার মানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে কাহাকেও অবশ্য বলা হইতেছে না। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বাঙ্গালী যুবককে অন্ততঃ গালাগালি দিয়াও যদি উত্তেজিত করিতে পারেন তাহা হইলেও যথেষ্ট কার্য্য হইবে। এই পারিবারিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে স্ত্রীশিক্ষা প্রধান সহায়। আমাদের একটী বিশেষ বন্ধু স্ত্রীবিশ্ববিদ্যালয় খুলিবার একটী Plan করিতেছেন। ইহা যে অতি আবশ্যক সে বিষয়ে যে কাহারও সন্দেহ আছে এরূপ মনে হয় না। তবে কি ভাবে হইবে সে বিষয় লইয়া যথেষ্ট কথা থাকিতে পারে, আমরা তাঁহার Scheme দেখিতে পাইলে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারিব। দেশের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রেই আশা করি এ বিষয় চিন্তা করিয়া নিজ নিজ মত দিয়া কার্য্যটীর সহায় হইবেন।

শোক-সংবাদ

৺রামরতন চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্যসেবী রামরতন চট্টোপাধ্যায় আর ইহজগতে নাই। তিনি যমুনার অন্যতম লেখক ছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধাদি দেখিয়া সকলেই বুঝিয়াছিলেন তিনি সত্বরই বাঙ্গালার সাহিত্যরথীগণের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইবেন। তিনি আলিপুরের ওকালতীতেও যেরূপ নাম করিয়াছিলেন তাহাতে সেখানেও যে তিনি সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হঠাৎ যে তাঁহারা এমন বন্ধুকে হারাইয়া কাঁদিব তাহা কখন ভাবি নাই।

৺সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বাঙ্গালার আর একজন শ্রেষ্ঠ অস্ত্রচিকিৎসক ফুরাইল। সুরেশচন্দ্র শুধু অস্ত্রচিকিৎসক ছিলেন না, তাঁহার ন্যায় চিকিৎসা-শাস্ত্রের সর্ব্ববিষয়ে সমান পারদর্শী চিকিৎসক জগতে খুব কমই দেখা যায়। দরিদ্রের প্রতি দয়া, রোগীর প্রতি যত্ন, সব যেন অস্বাভাবিক পরিমাণে তাঁহাতে ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র চিকিৎসা জগতের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব ভাবিয়া পাই না।

Printed by P. N. Pal at the Shastraprachar Press, 5 Chidammudi Lane
Published by P. N. Pal, 36/3 Scott Lane, Calcutta.

স্বর্গীয় রাজা স্যার্ সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

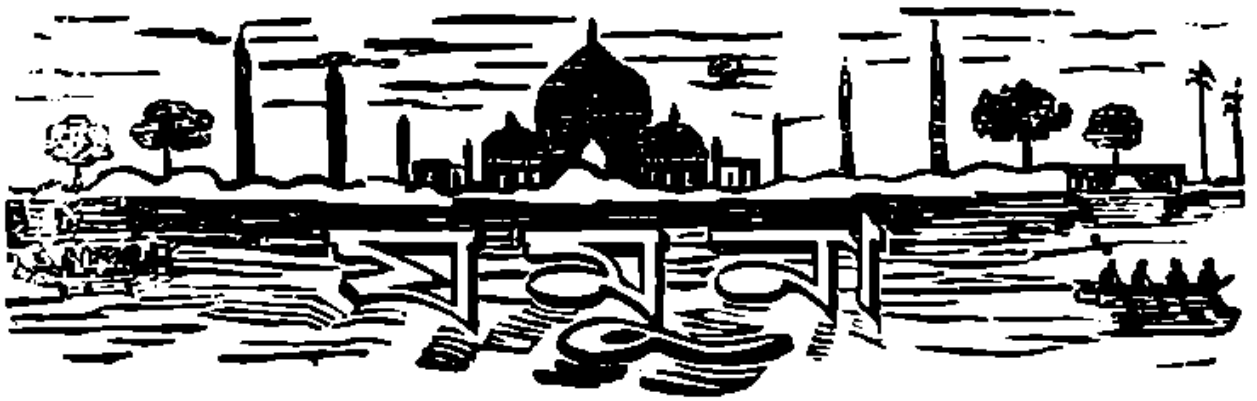

১১শ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ | ২য় সংখ্যা

মহাত্মা গান্ধী

গ্লাসগো হেরাল্ড পত্রিকায় জে, জেড, হোজেও লিখিয়াছেন :—বৃটীশ রাজের দর্প চূর্ণ করিয়া সম্পূর্ণ স্বরাজ লাভের জন্য যাঁহার অদ্ভুত নীতি ভারতবাসীর মনে অদম্য উৎসাহ দিয়াছে ও ইউরোপীয়দিগের নিকট বিস্ময় অর্জ্জন করিয়াছে, সেই অতিমানুষিক শক্তিসম্পন্ন মহাত্মা গান্ধী কে? তিনি ভারত বিপ্লবের মহাশক্তি, প্রাচ্য পাশ্চাত্য সমন্বয়ের প্রচারক, আজ ভারতের প্রভূত শক্তিশালী অদ্ভুতকর্ম্মা মহাপুরুষ। প্রায় একুট ৬ইঞ্চি মাত্র উচু, শীর্ণ শরীর সাধারণ পোষাকে, বিশেষ সৌন্দর্য্য বর্জ্জিত ইঁহাকে দেখিয়া হঠাৎ কোন বিশেষত্ব অনুভব করা যায় না। কিন্তু চোখের একটা জ্যোতি, হাটিবার একটা ভঙ্গি তাঁহাকে সাধারণ লোকের উপরে বসিয়া দেখাইয়া দেয়। তাঁহার জন্মগত কিম্বা জাতিগত কোন বিশেষত্ব নাই। তাঁহার পিতা কোন সামন্ত রাজ সরকারে সামান্য চাকুরী করিতেন। নিজে ব্যারিষ্টার ছিলেন, তাহাও কিছুকাল হইল ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কোন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেন নাই, সামান্য বৈশ্যের ঘরে তাঁহার জন্ম। কিন্তু ইংলণ্ডে সাত বৎসর এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় বিশ বৎসর বাস তাঁহাকে জগতে মানুষের বহু অবস্থা বিপর্য্যয়ের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছে, এবং ইংরাজি সাহিত্যে বিশেষরূপে বুৎপন্ন করিয়াছে। তিনি একজন বড় বক্তা নহেন, তবুও আজ সমগ্র ভারত তাঁহার মুখের বাণীর জন্য উৎকর্ণ। তিনি একজন মহাপণ্ডিত নহেন, জগতের চিরস্থায়ী সাহিত্যের উপযুক্ত তিনি কিছু লেখেন নাই, তিনি কোন দল বিশেষের নির্ব্বাচিত নহেন, তত্রাচ আজ

বাষট্টি বৎসর মাত্র বয়সে সমস্ত ভারতীয়ের অন্তঃকরণে তাঁহার সংযোজন আসন। তাঁহার এ শক্তির মূল কোথায়?—তাঁহাতেই!—কুটীরে তাঁহার জন্ম, চাষের কোনে তাঁহার উদ্ভাসিত জ্যোতি, চলনে তাঁহার মানুষ চালাইবার শক্তি; এই রাজনীতিকে পরিবর্ত্তিত করি, এই গৃহ প্রত্যাগত নির্ব্বাসিত, আজ জগতে টলষ্টয় ও রাস্কিনের শিক্ষার প্রচারক, ইনি ভারতের মহাপুরুষ। ইংলণ্ডে আজ এমন লোক নাই যাহার সহিত ইঁহার তুলনা হইতে পারে। পাশ্চাত্য জগতে সাধন সম্প্রদায়ের (Salvation Army) জেনারেল বুথ বা রেভারেণ্ড হল ব্রিন যদি শেষোক্তরাজনীতিক হইতেন তাহা হইলে ইঁহার সহিত কতকটা তুলনীয় হইতে পারিতেন, তবুও তাহারা প্রকৃত গান্ধী হইতে অনেক পশ্চাতে থাকিতেন। তাঁহার স্থান নির্ব্বাচনে বিফলমনোরথ হইতে হয়। দেশের লোকের কাছে তিনি কি ভাবে প্রতিভাত তাহা নিম্নলিখিত কথাগুলি হইতে বুঝা যাইবে। একজন বাঙ্গালী ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে শুনিলাম তিনি 'ভগবানের অবতার।' একজন অশিক্ষিত পল্লীবাসী বলিল 'ভগবান জগতে যুগ-বিবর্ত্তনকারী মাত্র একজন গান্ধীই পাঠাইয়াছেন।' কখন ছাত্র শিষ্যের মতে 'তিনি আমাদের মহাত্মা, মহাপুরুষ।' একজন কুট গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী বলেন 'গান্ধীকে দেখিলে ঋষিগণের কথা মনে হয়।' (বাইবেলের সেণ্টপল)। আমাদের জনৈক বিশেষ বন্ধু লিখিয়াছেন 'সাবধান, গান্ধী একজন ভীষণ বিপ্লববাদী।' 'বাক্ সর্ব্বস্ব উন্মাদ, নিষ্ফল আদর্শবাদী, বৃটীশ শাসনের কণ্টক, নির্দ্দোষ জনতার ভিতর লুক্কায়িত কূটনীতিক, দায়ীত্ববোধ বা অসত্যতা আপত্তিহীন বিপ্লববাদী, অসভ্য ড্রাগেরেও, আবার দেশের উদ্ধার কর্ত্তা, অদ্ভুতকর্ম্মা মহাপুরুষ গান্ধী'—বহুস্থানে এইরূপ বহুবিশেষণে তাঁহাকে অভিহিত হইতে শুনিয়াছি। কিন্তু বিপ্লব-বাদীই হউন আর বিবর্ত্তনবাদীই হউন, পয়গম্বরই হউন আর রাজনীতিকই হউন, কবিই হউন আর সাধারণ পাপীতাপী মানুষই হউন, বিপ্লববাদীই হউন আর দেশ সেবকই হউন, উন্মাদই হউন আর মহাবিজ্ঞই হউন, দেশের উদ্ধার কর্ত্তাই হউন আর অপকারীই হউন, ইনি অবশ্যই সাধারণ লোক নহেন। মানুষই হউন আর অতিমানুষই হউন, শান্তিই বা কি অশান্তিই বা কি, সব সময়েই সকল লোক তাঁহার মুখের কথার জন্য তক্ক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। ইংরাজি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে দুটা শ্লেষ-বাক্যের জন্য, অথবা অন্ধ জনসাধারণের তাঁহাকে পূজা করিবার জন্য, তাঁহাকে একজন সামান্য ব্যক্তি বলিয়া ভুলিয়া থাকা যায় না। বর্ত্তমান ভারতের অসন্তোষের কারণস্বরূপ লোকমত বিরোধী বহুবিধ আইন বিধান, কৃষিজীবি এবং শ্রমজীবিদের অসন্তোষ, দেশে বিদেশে ভারতবাসীর সামাজিক বৈষম্য, মহাযুদ্ধের বহুজটীলতা এবং পঞ্জাবে সামরিক আইন-জারির ফলাফল,—প্রভৃতি তাঁহাতেই মূর্ত্তিমান। এবং একমাত্র এইগুলির প্রতিবিধান হইলে তাঁহাকে নিরস্ত করা যাইতে পারে।

তাঁহার ন্যায় স্বদেশভক্ত আর কোন ভারতীয়কে দেখি নাই। আরও তিনি অদ্ভুত লোক। দারিদ্র্য তাঁহার জাতীয় পতাকা। পরণে তাঁহার নিজের হাতের কাপড়। তাঁহার এক মস্ত খেয়াল হাতে তাঁত। অভাব তাঁহার সামান্য। দুটী বাদাম কি অন্য ফল তাঁহার খাদ্য। ভারতে নিম্নশ্রেণীর প্রকৃত নিদর্শন স্বরূপ তিনি রেলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন। জাতি ও সামাজিক আচারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া নীচ জাতির সহিত একত্র ভোজন করিবার মনুষ্যত্ব এবং উদারতা তাঁহার যথেষ্ট আছে। খৃষ্টান মিশনারীর সহিতও একত্র ভোজন করিতে তাঁহার আপত্তি নাই। এরূপ ব্যাপারের কারণ তাঁহার স্বাভাবিক বিশেষত্বও হইতে পারে অথবা নীতি-কৌশল ও হইতে পারে। তিনি অন্তরের অন্তরে ঋষি, কিন্তু এ ঋষিত্ব তাঁহার মনুষ্যত্বকে ঢাকিয়া

ফেলে নাই। এই বহুমুখীনতার সাধারণ সূত্রের ভিতর স্থির প্রকৃতজ্ঞতা। তিনি আত্মপরীক্ষে নির্য্যাতনের চিহ্ন বহন করিতেছেন, এবং এইখানেই তাঁহার শক্তির মূল। তিনি ভারতবাসী বলিয়াই নির্য্যাতিত হইয়াছেন, তাঁহার দেশভক্তির বহুপরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। বিশেষ দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি তাঁহার প্রভূত আয়ের ব্যবহারাজীবির ব্যবসায়ে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহার দেশবাসীর দুঃখ কষ্ট মাথায় তুলিয়া লইয়া কারাবাস বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। একবার ভ্রান্তপথগামী দেশবাসীর হাতে নির্দ্দয় ভাবে মরিতে বসিয়াছিলেন। এই চিহ্নগুলিই আজ তাঁহার সম্মানের বিজয় নিশান। যাঁহারা জগতে ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেন তাঁহাদের উপাদানেই মহাত্মা গান্ধী বিরচিত।

তিনি রাজনীতিক বলদৃপ্ত বটে, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে গোঁড়ামী নাই। তিনি নিজেকে হিন্দু বলেন, কিন্তু হিন্দু শব্দটী বড় সার্ব্বজনীন, এবং বহু-বিষয়ে তিনি খৃষ্টান মুসলমানের মতের পোষক। আর বাস্তবিক পক্ষে মুসলমানদের প্রতি তাঁহারই সজীব সহানুভূতিতে খিলাফত আন্দোলনের এত তীব্রতা। তিনি টলষ্টয় ও রাস্কিনের মতাবলম্বী, কিন্তু যীশু খৃষ্টের প্রতিও সম্মানশীল, এবং গীতা ও বাইবেলের বচন সমান ভাবেই ব্যবহার করেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের সম্যক জ্ঞান তাঁহার বিশেষত্ব। সাহস এবং আন্তরিকতা তাঁহার মধ্যে সমান ভাবে বর্ত্তমান। ভারতবাসী সাধারণতঃ যাহাতে অপরের মনোরঞ্জন হয় এইরূপ কথা বলিতে চেষ্টা করে, এবং অপ্রিয় সত্য বলিতে সঙ্কোচ বোধ করে। কিন্তু গান্ধী অসীম সরলতার সহিত তাঁহার মনের কথা ব্যক্ত করিয়া থাকেন। তাঁহার চরিত্রের অপর বিশেষত্ব দৃঢ় চিত্ততা। একবার কিছুতে হাত দিলে সম্পূর্ণ ধ্বংস ভিন্ন আর কিছুতে তাঁহাকে টলাইতে পারে না। পঞ্জাবে Passive resistance এর ফলে যে কিয়ৎপরিমাণেও সেখানে জন-সাধারণের মধ্যে তীব্রভাবের প্রবাহ বহিয়াছিল এবং তাহার ফলে সেখানে কিছুদিনের জন্য যে নির্য্যাতনের রাজত্ব হইয়াছিল, তাহাতেই তাহা বড় মর্ম্মান্তিক ভাবে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার অন্তরের দৃঢ়তা সত্ত্বেও তিনি আপোষ মিমাংসার পক্ষপাতী, এবং তিনি যে বেশ বিবেচক কর্ম্মী তাহা বহুবার দেখাইয়াছেন। বাহান্ন বৎসর বয়সে প্রভূত কাজ কতক সফল করিয়াছি এবং কতক চেষ্টা করিয়াছি এরূপ কথা বলিতে পারেন এমন কর্ম্মী রাজনীতিক খুব কমই দেখা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনাবলী যিনি পড়িবেন তিনিই ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক গান্ধীর অদম্য দেশভক্তি ও অদ্ভুত ক্ষমতার কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। আজ জীবনের শেষভাগে ভারতবর্ষে ফিরিয়া তিনি দেশের সমস্ত জটীল সমস্যার ভিতর নিজেকে বাস্তবভাবে জড়াইয়া লইয়াছেন, এবং দেশের অধিকাংশ লোকের কাছেই স্বর্গীয় মহাত্মা গোখলের উপযুক্ত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। কিছুদিন তিনি সামাজিক এবং দেশের আর্থিক অবস্থার প্রতি মন দেন। তিনি চম্পারণ এবং কায়রা জেলার কৃষিবিপ্লবে যোগ দেন এবং তাহা সুফলপ্রসূ করেন, এবং শ্রম-জীবি সমস্যায় তাঁহার ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় দেন। তিনি কুটীর শিল্প বিশেষ হস্ত চালিত তাঁতের পুন-রুত্থানের একজন প্রধান প্রচারক, এবং দেশের লোকের আত্মসম্মান বোধের পুনরাগমনের জন্য ইহাঁর সদা চেষ্টিত। তিনি স্ত্রী স্বাধীনতা এবং ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলনের বিশেষ পক্ষপাতী। শেষে শ্রেষ্ঠ দেশশক্তির প্রকৃত আহ্বানে তিনি রাজনীতিক বিপদ সঙ্কুল মঞ্চে আরোহণ করিয়াছেন। আর আজ তিনি জাতীয়তানিষ্ঠ এক্সট্রীমিষ্ট দলের সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত শ্রেষ্ঠ নায়ক, এবং অসহযোগীতা নীতির প্রবর্ত্তক। ইহা প্রকৃতপক্ষে বর্জ্জন নীতি এবং ইহার পরিচালনে উদ্দেশ্য বৃটিশশাসন অসম্ভব করিয়া ভারতে

সম্পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠা। মূলে ইহার উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কের সহিত সন্ধিসূত্রের পরিবর্তন, এবং পঞ্জাবে দুর্নীতি মূলক অত্যাচারের প্রতিবিধান। কিন্তু আজ এ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাবী এক সম্পূর্ণ স্বরাজরূপ বৃহৎ দাবীর মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে।

এইখানে মনে রাখা উচিত এই সম্পূর্ণ স্বরাজ দাবীর মূলে শুধু গান্ধী নহেন, নিম্নলিখিত অসন্তোষের কারণগুলিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। (১) ভারতের রাজদ্রোহের সমূলে ধ্বংস সাধন উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারতবাসীর সমবেত আপত্তির বিরুদ্ধে যে রোলাট আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। (২) তুর্কীর সহিত যে সন্ধি হইয়াছে তাহাতে সকলের ধারণা তুর্ক সুলতানের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে এবং তদ্রূপ সমগ্র ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট অসন্তোষ। (৩) ১৯১৯ সালের এপ্রেল মাসের পাঞ্জাবের মর্ম্মভেদী দুর্ঘটনা। অপর পক্ষের মত এই যে ঐরূপ ভয়ঙ্কর উপায় অবলম্বন দ্বারা সমস্ত পঞ্জাবকে ভীষণ বিদ্রোহবহ্নি হইতে রক্ষা করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহার ফলে সমস্ত জাতির মনে ভীষণ নিরাশা, অসন্তোষ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি আনিয়া দেওয়া হইয়াছে। (৪) দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অন্যান্য স্থানে ভারতীয়দের প্রতি ব্যবহার। ভারতে জাতীয়তার উদ্বোধনের সহিত সকলের মনে নিকৃষ্টতার ছাপ অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে। (৫) গত মহাযুদ্ধের ফলে দেশে দারুণ অন্ন সমস্যা। দেখা যায় গবর্ণমেণ্ট যেন তাহা নিবারণে অসমর্থ। (৬) দেশে কৃষিজীবি ও শ্রমজীবিদের নানারূপ প্রকৃত অসন্তোষের কারণ বর্ত্তমান, এবং সে গুলি অতি সহজে রাজনীতিকের আন্দোলনে কাজে লাগান। (৭) সমস্ত জগৎময় বর্ত্তমান রীতিনীতির প্রতি সাধারণের ভিতর যে অসন্তোষের স্রোত চলিয়াছে ভারতেও তাহার ঢেউ আসিয়া লাগিতেছে। এই কথাগুলি মনে রাখিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে গান্ধীর ন্যায় আন্তরিক দেশভক্তের পক্ষে বৃটিশ শাসনকে দেশের পক্ষে অনুপযুক্ত মনে করা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। তাঁহাদের মতে শাসন নিজেদের হাতে থাকিলে দেশের অবস্থা এর চাইতে খারাপ হইত না। আজ তাঁহারা যত সত্বর সম্ভব ভারতে আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, এবং ও ধারণায় ভুল থাকিলেও তাঁহাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। এ পর্য্যন্ত শিক্ষিত ভারতবাসীর মতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতর স্বায়ত্ব শাসন লাভই চরম উদ্দেশ্য ছিল। আজ ন্যাশানালিষ্টদলের মধ্যে যাঁহারা চরমপন্থী তাঁহাদের মতে সর্ব্বপ্রকার আইনসঙ্গত ও বিধি সঙ্গত উপায়ে স্বরাজ লাভই ভারতের লক্ষ্য স্থল, এবং তদ্রূপ বৃটিশের সম্পর্কচ্যুত হইতেও তাঁহাদের আপত্তি নাই। এদিকে ভারত কিন্তু এক মহা আন্দোলনে পরিণত হইতে পারে।

আমার মতে অসহযোগীতা নীতি তাহার উপস্থিত উদ্দেশ্য সাধনে দুইটী বিশেষ কারণে ব্যর্থ হইবে। প্রথমতঃ—ইহা মানুষের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। ইহাতে যতদিন পর্য্যন্ত স্বরাজ লাভ না হয় ততদিন উকীলকে ওকালতী ত্যাগ করিতে বলে, ব্যবসায়ীকে বিলাতী জিনিষের ব্যবসায় বন্ধ করিতে বলে, রাজনীতিককে কাউনসিল ত্যাগ করিতে, অভিজাতকে উপাধি ত্যাগ করিতে, ছাত্রগণকে গভর্ণমেণ্ট স্কুল ত্যাগ করিতে, এবং পিতাকে সন্তানোৎপাদন ত্যাগ করিতে বলে। ইহা অতি মহান সন্দেহ নাই, কিন্তু মানুষের বর্ত্তমান ধারা যে ভাবে গঠিত তাহাতে তাহার উপর বড় অসম্ভব দাবী করা হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ—ইহা সর্ব্বপ্রাণী অত্যাবশ্যক কিছু দ্বারা প্ররোচিত নহে। ইহাতে একটা বড় বিষয়ে ভুল করিতেছে। সমাজের নিম্নস্তরের কৃষিজীবি এবং শ্রমজীবিরাই সমাজের প্রকৃত মূল। তাহারা জানে না যে স্বরাজ লাভে তাহাদের মঙ্গল আছে, এখনই স্বরাজ লাভ ত পরের কথা। কিন্তু অসহযোগীতা নীতি সফল হউক বিফল হউক, গান্ধীর বিজয়

অবশ্যম্ভাবী ; কারণ তাঁহাতে সমগ্র একটা জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি, এবং তাঁহার পন্থা অপেক্ষা তাঁহার মনুষ্যত্ব অনেক বড়। গান্ধীর এ অভিযানের মূলে বৃটিশ বিদ্বেষের চাইতে ভারতভক্তি অনেক বেশী ; তিনি নিজে সম্পূর্ণভাবে বিজাতি বিদ্বেষের অনেক উপরে। গত জার্ম্মান যুদ্ধের সময় তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদের সাহায্য করিয়াছিলেন। কিছুকাল পূর্ব্বে বুয়ার যুদ্ধের সময়ও তিনি নিজে এক আহত বাহকদল গঠন করিয়া আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেন। লর্ড রবার্টস তাঁহার অন্যতম বন্ধু ছিলেন, এবং সম্ভব লর্ড রেডিংও তাঁহার বন্ধুস্থানীয় হইবেন। আর যে দিন ভারতে "যুক্তরাজ্য" সংস্থাপিত হইবে, আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, সমগ্র জগৎ চাহিয়া দেখিবে তাহা শুধু বৃটিশ নীতির বিজয়োল্লাস নহে, তাহা মহাত্মা গান্ধীর একনিষ্ঠা ও অক্লান্ত কর্ম্মের মহা ফল।

বেণো জল

(নিছক নক্সা)

(শ্রীইন্দ্রদেব বসু)

সহরে ভা'য়ের সাথ পিরাণ দেখিয়া পাড়াগেঁয়ে ভাই প্রশ্ন করিয়াছিল, দাদা, তুই ওর ভিতর ঢুক্‌লি কেমন করে? ছেলেবেলা সেনেট্ হল্ সম্বন্ধে এমনি একটা প্রশ্ন বার বার আমার মনে উঠিত। আজ সেই আমি চৈত্রের উত্তপ্ত অপরাহ্নে এম্. বি-র ডিপ্লোমাখানি হাতে করিয়া, গলায় তিনখানি মেডাল ঝুলাইয়া সেই বিরাট বিশ্বভূকের কবল হইতে যখন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন আমার মনে কি হইতেছিল, আমিই জানি। আমার পাদমূলে সুবিস্তৃত সোপানশ্রেণী ধাপে ধাপে নামিয়া সুপ্তশস্ত কর্ণ-ওয়ালিস্-রম্যে মিশিয়া গিয়াছে। একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। মনে হইল, এই যে অবতরণ, ইহার শেষ কোথায়? রাস্তায় ও পারে গোলদীঘির উপর আমার দৃষ্টি পড়িল! মনে হইল যেন অগণ্য অঙ্গুলি সঙ্কেতে সে আমাকে আহ্বান করিতেছে।

এই সময় পৃষ্ঠদেশে মৃদুস্পর্শে আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম। ভয় হইল বুঝি কোন হিতৈষী আমার গলায় ঝুলানো স্বর্ণ-ফলকগুলির ভার লাঘব করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। বাঁ-হাতে সে গুলি তাড়াতাড়ি চাপিয়া ধরিয়া ফিরিয়া দেখি—অমূল্য! নিরক্ষে বেলে মাছের মত তাহার পাংশুমূর্ত্তি দেখিয়া আমি মনে মনে একখানা প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ লিখিয়া ফেলিলাম। কিন্তু তবু আমার ভয় গেল না। শুষ্ক গলায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কি?

কি কি?

আমার মনে হইল, অমূল্যর শরীর যেথায় থাক, তাহার স্বর কিন্তু আসিতেছে পরলোক হইতে। প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম, শরীরে যে এক ফোঁটা রক্ত নেই!

অমূল্য পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া বলিল, ঐ খানে স—ব নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছি। বলিয়া সে একটু হাসিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু নিস্তেজ জ্যোৎস্নার মত তাহার সেই ম্লান-বিকাশ—যাহাকে হাসি বলিলে সত্যের গলায় সত্যই ফাঁসি দেওয়া হয়—আর খানিকটা বলদের মত তাহার সেই শ্রান্ত, ক্লান্ত হতাশ শিরঃচালন বোধ করি, আমি ইহজন্মে ভুলিতে পারিব না। জিজ্ঞাসা করিলাম, ওষুধ খাবে?

উঁহুঃ! বিয়ে করব।

সসম্ভ্রমে আমার মুখ দিয়া আপনা আপনি বাহির হইয়া গেল—বাঃ।

অমূল্য বাসি ফুলের মত তাহার নিষ্প্রভ চক্ষু দুটা আমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া বলিল, যাবে?

কোথা?

আমার সঙ্গে?

কোন্‌খানে? বনে?

না। ক'নে দেখ্‌তে।

আমার মনে পড়িল, অমূল্যর বাপ, মা, ভাই, বোন কেহ নাই; আর সে নিজেও এক প্রকার না থাকার মধ্যে। এরূপ অবস্থায় ইহার একজন অভিভাবকের প্রয়োজন। জিজ্ঞাসিলাম, কখন যেতে হবে?

ভোর ছ'টার ট্রেণ।

পাঁচটায় না উঠিলে ছটার ট্রেণ ধরা যাবে না। আমাদের দেশের একটী ছাত্রের সুখ্যাতি ছিল, খুব ভোরে উঠে। তাহার শরণাপন্ন হইয়া বলিলাম, আজ তোর পাঁচটায় আমায় তুলে দিতে পারবে?

সে অম্লান বদনে উত্তর দিল, নিশ্চয়। কিন্তু তার আগে তুমি যদি আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিতে পার।

টাকা যার ব্যতীত লোকটার কাছে আর কখন কিছু চাহিব না প্রতিজ্ঞা করিয়া, সংকল্প করিলাম—সারা রাত জাগিয়া থাকিব। মশার মত রাত্রি জাগরণের ঔষধ আর নাই! ঘরে আসিয়া মশারিটা খুলিয়া ফেলিলাম। কাহারও তপঃ বা ধ্যান ভঙ্গ করিতে হইলে স্বর্গ হইতে অপ্সরা সরবরাহ করিতে হয়। মশা যে ইহাদিগের অপেক্ষা সমধিক শক্তিশালী—বঙ্গের ভাবী নাট্যকারগণ এ কথা স্মরণ রাখিলে সুখী হইব। যাহা হউক, আমার সকল উদ্বেগ নিশ্চিন্ত করিয়া রাত্রি সাড়ে চারিটার সময় অমূল্য আমার ঘারে ঘা পাড়িতে লাগিল।

যখন তাহার ভাবী শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলাম, তখন বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। কন্যার পিতা যথেষ্ট সমাদরে চণ্ডীমণ্ডপে আমাদের বসাইয়া, দুই একজন ভদ্রলোককে হেপাজতে রাখিয়া খবর দিবার জন্য অন্দরে গেলেন।

হাত, নখ এবং নাসিকা, এই তিনটী অমূল্যর ভাবী শ্বশুরমহাশয়ের বিশেষত্ব। হাতে, নখে তাঁর মুখখানি সর্ব্বদা তরপুর। কিন্তু নাকটী সে মুখের সঙ্গে এমন বে-প্যাটেণ্ট, বে-মানান, বে-খাপ যে, দেখিলে মনে হয়, সেটা যেন কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে। যিনি ভামালপুর পাহাড়ের টানেল্ দেখিয়াছেন, তিনিই সে সছিদ্র নাসিকা কতক অনুমান করিতে পারিবেন। নাকটির জন্য শ্বশুর মহাশয়ের মুখটিকে মুখস্ বলিয়া মনে হয়। এই বিশাল বিপুল নাসিকা স্বয়ম্ভু, অথবা নস্য ইহার ক্রম-পরিণতি সাধন করিয়াছে, এই উৎকট সমস্যা সমাধান করিতে আমার মস্তিষ্ক গুলাইয়া গেল। ইতিমধ্যে কন্যা আসিয়া সভায় উপস্থিত হইল।

মেয়েটীর মুখখানি মন্দ নয়, কিন্তু তবু যেন মনে হয়, তাহাতে কি একটা অভাব রহিয়াছে। সহসা আমি তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না। অমূল্যর মনের ভাব বুঝিবার জন্য তাহার মুখ চাহিলাম। দেখিলাম, তাহারও বুদ্ধি গুলাইয়াছে। কিন্তু স্বার্থপরতা যে পরার্থপরতা হইতে সমধিক সূক্ষ্মদৃষ্টি-সম্পন্ন, অচিরে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। অমূল্য তাহার ভাবী বধূর মুখ কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণভাবে নিরীক্ষণ করিতে করিতে হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া ফেলিল—নাক?

ঠিক কথা! মেয়েটীর নাক নাই! কিন্তু সে নাই যে কি রকম না থাকা, তাহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ব্যতীত উপলব্ধি হইবার নহে। আকাশ-কুসুম নাই, শশ-শৃঙ্গ নাই, অশ্ব-ডিম্ব নাই, তথাপি এ সকল না থাকিয়াও আছে। অজাগল-স্তনের ন্যায়, পরব্রহ্মগত ধনের ন্যায়, বিধর্ম্ম-ছিদ্রের মত এ নাসিকা যে

থাকিয়াও নাই! বাপ ও মেয়েকে এক সঙ্গে দেখিলে মনে হয় যেন বাপের নাসিকা গঠন করিয়া বিধাতা-পুরুষ একেবারে দেউলিয়া হইয়া গিয়াছিলেন। এক দিকে যেমন বাড় অন্যদিকে তেমনি বাড়ন্ত! নথ নাড়িবার ত কথাই নাই, অমূল্যের ভাবী পত্নী কখন যে নাক নাড়া দিবে সে সম্ভাবনাও অসম্ভব। বেহারা অমূল্য তথাপি পুনঃ প্রশ্ন করিল—নাক? যেন মুখের এই অলঙ্কারটী বধূ ভুলিয়া কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছে।

ঘটক সেখানে উপস্থিত ছিল। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ব্যস্ত হবেন না বাবু! নাক গজাবার এখনও ঢের সময় আছে। মেয়ে এই সবে এগারয় পড়েছে। পঁচিশ বছর অবধি নাকের বাড়। কেমন নয়, ডাক্তার সাহেব?

সদ্য ডিগ্রোমাপ্রাপ্ত শিক্ষা-নবিশকে ডাক্তার সাহেব সম্বোধন করিয়া সে আমার মুখ বন্ধ করিয়া দিল। অমূল্য বার বার তাহার সূচল-দৃষ্টির খোঁচা দিয়াও আমার মুখ হইতে একটা কথা বাহির করিতে পারিল না।

ঘটক বলিল, ওর মুখ চাইলে কি হবে, বাবু? মুখ চাইতে হয় ত আপনার শ্বশুরের মুখ চান! আপনিই বলুন দিকি, অমন ধারা নাক নিয়ে কি মানুষ সমাজে পারে? আপনার শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করুন, যত বয়েস বেড়েছে ততই ওঁর নাক বেড়েছে। কেমন নয় মশাই? এ নাকের বংশ। আপনার কোন ভয় নেই! আমি জামিন রইলাম। বয়েস কালে মেয়ের নাক ঠিক বাপের মতনই হবে।

অমূল্য শিহরিয়া উঠিল। একদিকে যেমন অনাবৃষ্টি, অন্য দিকে তেমনই অতিবৃষ্টি!

ঘটক বলিতে লাগিল, আর না-ই যদি বাড়ে, তাতেই বা কি? হুঁঃ, নাক নিয়ে যেন ধুয়ে খাবে! এদিকে যে একশো বিঘে ব্রহ্মোত্তর, বাড়ী, বাগান, বিল, বলদ, গাই, গোলা, তা ছাড়া দশ হাজার টাকা ঠোটায় খাটছে, আর ঐ মেয়ের যে সব—সেটা ত ভাবছেন না।

বর পণ আমাদের মজ্জাগত। ছেলের বাপকে যখন আমরা অতি লোভের দোষ দি, তখন ভুলিয়া যাই যে, ছেলেই কালে বাপ হয়। বিষয় বৈভবের আভাস পাইবামাত্র অমূল্যর সঙ্কল্প স্থির হইল। বিবাহের দিন স্থির করিয়া আমরা উঠিলাম।

ট্রেণে আসিতে আসিতে আমার মনে হইতে লাগিল, অর্থলোভে অমূল্য যে এই এক নি-নাক কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল, ইহার তাৎপর্য্য কি? ও কি যথার্থই ভাবিয়াছে যে, বয়সকালে বধূর নাক গজাইবে? ভাবিতে ভাবিতে আমি ঢুলিতে লাগিলাম। ট্রেন কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতেই দেখিলাম, এক কিম্ভূত-কিমাকার মনুষ্য এক অবগুণ্ঠনা নারী সহ আমার সম্মুখের আসনে বসিয়া আছে। ইহারা কে? কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিল। সাতিশয় উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, মশায়ের নিবাস?

কিম্ভূত কিমাকার উত্তরিল, সিংহল।

মশায়ের নাম?

বিভীষণ।

সিংহল? বিভীষণ? তবে কি ইনি সেই রাবণ রাজার ভাই? নিরতিশয় কৌতূহলে প্রশ্ন করিলাম, কোথায় যাওয়া হবে?

কল্‌কেতায়।

কল্‌কেতায়?

আজ্ঞে হাঁ। আমার এই ভগ্নীটীর চিকিৎসা করাতে। শুনেছি, কল্‌কেতায় এখন অনেক ডাক্তার এসেছেন, যাঁরা কেটে জোড়া দেন। তা কাটা অনেকদিন হয়ে গিয়েছে। এখন জোড়া দিতে পারলেই হয়।

বিভীষণ মশাই, আমিও একজন ডাক্তার। কিন্তু একটু বুঝিয়ে না বল্‌লে—

ঠিক, ঠিক। দিদি ঘোমটাটা খোল ত। ডাক্তারের সামনে লজ্জা নেই।

'ও, ভাই, বিভী, ভাই' বলিয়া রমণী অবগুণ্ঠন মোচন করিল। দেখিলাম, যেন কোন সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে তাহার নাকটী আমূল ছেদিত হইয়াছে। আমার বিস্ময় দেখিয়া বিভীষণ বলিলেন, জানেন না এঁর ইতিহাস? ইনি সূর্পনখা।

ওঃ, রামায়ণে পড়েছি।

রামায়ণের উল্লেখ করিতেই রক্ষকুলতিলক ভক্তিভরে যুক্তপাণি হইয়া প্রণাম করিলেন। তারপর কহিলেন, বোন্‌টার বে দিতে পারছিনি, মশাই!

'ও, ভাই, বিভী, ভাই' বলিয়া সূর্পনখা ভ্রাতাকে মৃদু তাড়না করিলেন। আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, বে? ইনি—

হাঁ, বিধবা। তাতে কি হয়েছে? আপনি পুরাতত্ত্ব পড়েন নি? প্রাচীন সভ্যজাতিমাত্রেই এ প্রথা প্রচলিত ছিল। দাদার স্ত্রীকে বিবাহ করে লঙ্কায় এ প্রথা আমিই প্রবর্ত্তিত করেছিলাম। কিষ্কিন্ধ্যায় বানর জাতির মধ্যে সুগ্রীব প্রথম রিফর্মার। তিনিও তাঁর দাদার স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করেন। আর ঔত্তরদেশে ত ছিলই - শাস্ত্র প্রমাণ আছে। আপনি ত ডাক্তার? এঁর নাকটা জোড়া দেবার উপায় করে দিতে পারেন?

আপনি বিলাত যান না কেন?

বিভীষণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, কও কথা! বিলাতে যাব।

সেখানে বড় বড় ডাক্তার আছেন। তাঁদের কাছে থেকেই ত আমরা শিখেছি। তাই বল্‌ছি।

বল্‌লেই হল, মশাই! স্বদেশে যদি পাই ত বিদেশে যাব কেন? তাতে গৌরব কি? আর খরচ কত! আর সেখানে এ নাক-কাণ-কাটা মুখ দেখাবেই বা কি করে?

ও, ভাই, বিভী, ভাই!

আমরা কাটা নাকটা তুলে রেখে দিয়েছি। সিপরে 'অপি' করত, শুনেছেন? সেই উপায়ে। আপনারা জুড়ে দিতে পারবেন না? নাকটা দেখাও ত বধূ?

"ও, ভাই, বিভী, ভাই' বলিয়া সূর্পনখা স্বীয় অঞ্চলের গ্রন্থিবন্ধন খুলিয়া নাকটী বাহির করিলেন। নারী যে রক্ষণশীল, তাহার এমন উৎকৃষ্ট প্রমাণ পূর্ব্বে কখন পাই নাই। ক্ষেত্রটা অর্দ্ধেকটা, তারপর পুরোপুরী ছাপর, গিয়াছে, কলিও যায় যায়। এই আড়াইটী যুগ ধরিয়া সূর্পনখা নাকটী পরম যত্নে অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে! 'ঠিক দেখি' বলিয়া হাত বাড়াইতেই গাড়ীর হ্যাচ্‌কা টানে আমি বিভীষণ ভগ্নীর কোলের উপর হুমড়ী খাইয়া পড়িলাম। চকিত হইয়া দেখি, অমূল্যও ঢুলিতেছে। সে কি স্বপ্ন দেখিতেছিল জানিবার জন্য ভারী কৌতূহল হইল। কিন্তু তাহাকে দেখিতে দেখিতে আমার চিন্তাধারা ভিন্ন স্রোতে বহিল। ভাবিতে লাগিলাম, পাশ্চাত্য জগতের স্ত্রী-চিকিৎসকগণ (Beauty doctors) অসাধ্য সাধন করিতেছেন। কুৎসিত মুখ কাটিয়া ছাঁটিয়া সুন্দর করিয়া দেওয়ার উপর দোকদারি করা হইতেছে। ভাল, সেই প্রণালীতে বধূর যেন একটা নূতন নাক গড়ান গেল। এই রক্তবিন্দুহীন ক্ষীণ জীবী সেই নাক ভোগ করিবে কয় দিন? ইহার জীবন ত শেষ হইয়া আসিয়াছে। আচ্ছা, ইহার কি কোন প্রতিকার নাই? কেন? এইত সেদিন জর্ম্মাণ যুদ্ধে এমন কত হইয়াছে! পুষ্টকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তির রক্ত মুমূর্ষুর দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া কৈল নিষেকে তিমিত প্রদীপবৎ কত নির্ব্বাপিত-প্রায় জীবন পুনরুজ্জ্বল হইয়াছে। কিন্তু হায়, অকাতরে বুকের রক্ত দিবে, এমন পরোপকারী লোক কোথায়! আর পরের নাকের জন্য নিজ দেহ হইতে মাল-মশলা যোগাইবে, এমনই বা কে আছে? হায়, কোথায় সে শিবি-রাজ, যিনি কপোতের জীবনরক্ষার্থ ক্ষুধিত শ্যেনকে

নিজগাত্র হইতে মাংস কেমন করিয়া দিয়াছিলেন [illegible] আর কোথায়ই বা সে এণ্টোনিয়ো যিনি নিজার্থে শাইলকের অস্ত্র-মুখে নিজ বক্ষদেশ উন্মোচন করিয়াছিলেন! কোথায়? কোথায়?

একে সারারাত্রি জাগরণ, তার উপর মেঠো হাওয়ার অবাধ সঞ্চরণ! ভাবিতে ভাবিতে ঢুলিতে লাগিলাম। ঢুলিতে ঢুলিতে মনে হইল, বাঃ এইত দিব্য উপায়! ঘটককে বলিলাম, দেখুন, আপনাদের চোখে চামড়া নেই বটে, কিন্তু আপনার গায় দেখছি বৃথা মাংস অনেক রয়েছে! আপনার গা থেকে যদি একটুখানি চামড়া দেন, আমি মেয়েটার একটা নাক তৈরি করে দি।

মশায়, খানিকটা ব্রহ্মরক্ত দর্শন করবেন?

আচ্ছা, না হয় কিছু মূল্য ধরে দেওয়া যাবে।

মশায়, ধনেশ্বরের কন্যা, স্বয়ং লক্ষ্মীমণি পাত্রী, আর যাঁর সঙ্গে বিবাহ হবে তিনি নিজে অমূল্য। দাম দেবার সময় এগুলি স্মরণ রাখবেন।

নাম, যশ, প্রতিষ্ঠা, প্র্যাক্‌টিস্, এমনি কতকগুলি কথা মনে উদয় হওয়ায় আমার মেজাজ তখন চড়িয়া গিয়াছে। সে যা বলিল, তাহাই স্বীকার করিলাম। ল্যান্‌সেট্ আমার সঙ্গেই ছিল। ঘটকের চামড়া কাটিয়া নাক তৈয়ারি করিতে উদ্যত হইলে সে কহিল, আরে মশাই অত করবার দরকার কি? মূল্য উচিত দিয়ে আমার নাকটা কেটে নেন্।

নারী হিতার্থে লোকটার উৎসাহ আমাকে আত্মহারা করিল। পাছে বিলম্ব করিলে মত পরিবর্ত্তন হয়, নাকটি তৎক্ষণাৎ পুঁচিয়া কাটিয়া লইলাম। ঘটক চেঁচাইতে লাগিল, ঔঁশাঁয়, মঁলুঁম —মঁলুঁম জঁলে মঁলুঁম।

হঠাৎ হুপ্‌হুপ্ করিয়া কতকগুলি শব্দধ্বনি আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। চাহিয়া দেখি চণ্ডীমণ্ডপ একেবারে জনশূন্য। সম্ভবতঃ ঘটকেরই প্রেতত্ব প্রাপ্তির কল্পনায় সকলের বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়াছে। নাক ত কাটা হইল। কিন্তু সেলাই করিয়া দিবার [illegible] সঙ্গী একেবারে বাঁকিয়া বসিল। অবশেষে প্লাষ্টিক্ প্ল্যাষ্টার দিয়া আঁটিয়া দিলাম। কিন্তু একটা ত্রুটি রহিয়া গেল। সঙ্গীর রং ছিল ধব্‌ধবে শাদা, আর ঘটকের রং কুচ্‌কুচে কাল। সেই শাদা মুখের উপর কৃষ্ণবর্ণের নাসিকা দেখাইতে লাগিল যেন বাস্তবিক সন্দেশের উপর মাছি বসিয়াছে।

কিন্তু অমূল্যর ব্যাপার এত সহজে মিটিল না। রক্ত পাওয়া যাইবে কোথায়? ঘটকের কাছে প্রস্তাব করিবামাত্র—নাকের দাম চাই না' বলিয়া সে ছুটিয়া পলাইল। রক্ত দিবার লোক ত পাওয়া গেল না। আচ্ছা কোন জানোয়ারের রক্ত? যেমন মনে উদয় হওয়া, অমনি চাহিয়া দেখি, আমাদের মেসের সামনে একটা দাগা ষাঁড় পথে পরিত্যক্ত এঁটো কলাপাতা চিবাইতেছে। একটা নূতন কীর্ত্তি করিবার উৎসাহে ছুটিয়া গিয়া অমূল্যকে ধরিয়া আনিলাম। যাইবার সময় মেসের ছাত্রদের বলিয়া গেলাম, যেমন করিয়া হউক, ষাঁড়টাকে আট্‌কাইতে।

অমূল্যর বেহে ষাঁড়ের রক্ত সঞ্চারিত করা হইল। কিন্তু তেজীয়ান বৃষশোণিতে ক্ষীণজীবী অমূল্য পাছে অতিমাত্রায় উত্তেজিত হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় তাহাকে অবসাদক ঔষধি দিয়া শয়ন করাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিলাম। সে ত কিছুতেই স্থির থাকিতে চায় না, মাথা নাড়িয়া ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া উঠে। অবশেষে বাঁধিয়া রাখিতে হইল। একটা দিন বৈত নয়! আজ রাত্রেই অমূল্যর বিবাহ।

মেসের কয়েকজন ছাত্র মিলিয়া বরকে ঘিরিয়া বিবাহ বাটীতে উপস্থিত হইলাম। চণ্ডীমণ্ডপে সভা হইয়াছে। কিন্তু সভায় বসিবার পূর্ব্বে অমূল্য এক কাণ্ড করিয়া বসিল। সিঁড়ি উঠিবার সময় গ্রীবা উঁচু করিয়া দরজায়া চণ্ডীমণ্ডপের এক গোছা খড় টানিয়া লইয়া আসনে বসিয়া সে অম্লান বদনে চিবাইতে লাগিল। একজন প্রতিবাসী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, একি মশাই?

বুঝতে পারলেন না ?

না।

কুলপ্রথা।

সে ব্যক্তি সংশয়-দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার পানে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল। কিন্তু ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিল। বরকে তুলিয়া লইয়া যাইবার জন্য শ্বশুরমহাশয় তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইতেই অমূল্য গলা লাফাইয়া উঠিয়া শির আস্ফালন করিতে লাগিল। তারপর তাড়িয়া গিয়া শ্বশুরের বক্ষি-প্রবেশে সজোরে এক ঢুঁ! শ্বশুরমহাশয় ও চৌচা-টে চিৎপাত হইলেন। সভায় হুলস্থূল পড়িল। সেই গোলযোগে বরও অন্তর্হিত হইয়া গেল।

আমার পূর্ব্ব প্রশ্নকর্ত্তা আমাকে পুনরায় প্রশ্ন রিলেন, এও বোধ করি কুলপ্রথা ?

এই অর্ব্বাচীনের কথার কোন উত্তর করিলাম ৷ বটে, কিন্তু নিরতিশয় ভীত হইয়া উঠিলাম। পাছে মূল্য আবার কি কাণ্ড করিয়া বসে, এই আশঙ্কায় ামার বুক গুর গুর করিতে লাগিল। বেণোহল রে ঢুকাইয়া একি বিপত্তি! সঙ্গীদের লইয়া মূল্যকে চারিদিকে খুঁজিতে লাগিলাম। তখন ার বহির্ব্বাটী অন্দর বলিয়া কোন সঙ্কোচ আমাদের ই। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি, অমূল্য ছাদনাতলায় াড়াইয়া একান্ত নিশ্চিন্ত চিত্তে কলাগাছ াইতেছে! একটা গাছ নিঃশেষ করিয়া অপরটা ক করিয়াছে। বরণডালা লইয়া কুলাঙ্গনারা াঙ্গনে দাঁড়াইয়া আছেন। বরণ করিতে বরের ক্তিমুখে অগ্রসর হইলেই সে অতি সাংঘাতিক ভাবে রুস্ফালন করিতেছে।

অনেক ধস্তাধস্তি করিয়া অমূল্যকে বিবাহের াসনে বসান হইল। বোধ করি বরযাত্রীদের ক্ষা করিবার জন্য একব্যক্তি কুশাসন লইয়া যাইতেছিল। অমূল্য তাহার কতকগুলি ছিনাইয়া লইয়া ক্রমে ক্রমে উদরসাৎ করিতে লাগিল। পুরোহিত সেদিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস করিলেন না। ভয়জড়িত স্বরে মন্ত্র আওড়াইতে লাগিলেন।

তারপর বাসর। বরকে বসাইয়া দিয়া আমরাও অলক্ষিতে আসে-পাশে রহিলাম। এই সময় এক নবাগতা প্রবীনা বাসরে প্রবিষ্ট হইলেন। পূর্ব্বকার ব্যাপার তিনি কিছুই জানিতেন না। ঈষৎ রসিকতার স্বরে প্রশ্ন করিলেন, কি হে বর তোমার নামটী কি ভাই ?

অমূল্য হঠাৎ গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল - ম্—বা—! অতঃপর শিরশ্চালন করিয়া লাফাইয়া উঠিতে হঠাৎ ক'নের গলার গোড়ে ছড়াটার দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া মুখ বাড়াইয়া মালা গাছটী ছিঁড়িয়া লইয়া এক লম্ফে বাসর ত্যাগ!

মহিলামণ্ডলীর কোলাহলে সে নৈশ বাসর যেন কল-কাকলীপূর্ণ কাননে পরিণত হইল। আমরা সকলে মিলিয়া বরের পশ্চাদ্ধাবন করিলাম। দূর হইতে শুনা গেল, ক'নের নাক বসিয়া পড়িয়াছে। সম্ভব। গলা হইতে মালা ছিঁড়িয়া লইবার সময় অমূল্যর মস্তকের সঘর্ষে এই অনর্থ ঘটিয়াছে। কিন্তু সে কোথায় ? সকলে মিলিয়া চারিদিক খুঁজিতে লাগিলাম। অবশেষে একটা গোয়ালে প্রবেশ করিয়া দেখি, একটী গাভীর পাশে চারিপায় দাঁড়াইয়া অমূল্য তাহার গা চাটিতেছে! তাহাকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া 'এই যে এই যে' বলিয়া চীৎকার করিবামাত্র অমূল্য ভীতস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল, কি রে, কি রে! সন্ত্রস্ত হইয়া চোখ চাহিয়া দেখি, ট্রেণ শিয়ালদহ ষ্টেশনে প্রবেশ করিয়াছে। মনে সমস্যা উঠিল, স্বপ্ন কি সত্যই অমূলক চিন্তা ?

—

তার কাঁধে মাথা রাখিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু চোখের কোলে এবং গালের স্থানে স্থানে তখন পর্য্যন্ত কান্নার জল শুখাইয়া রহিয়াছে।

কোন কথা বুঝিতে শশির বাকি রহিল না, সে গর্জ্জিয়া উঠিল, "এ মেয়ে তুমি কোত্থেকে পেলে বল ?"

শশির মা ঘুমন্ত শিশুটিকে বিছানার উপর আস্তে আস্তে শোয়াইয়া দিয়া বলিল, "সব কথা না শুনে আগে থাকতে চেঁচিয়ে মরছিস্ কেন! অনেক কালের এক আলাপি মেয়ে মানুষের সঙ্গে দেখা হোলো, তার কোলে ছট ফুটে মেয়েটিকে দেখে বল্লুম, "মেয়েটিকে আমায় দেবে দিদি—সে ত বল্লে "তা নাও না"—তা এতে আর দোষটা—"

বাধা দিয়া শশি বলিয়া উঠিল, "মিথ্যে কথা; তুমি নিশ্চয়ই কোন ভদ্রলোকের মেয়ে চুরি করে এনেছ।"

শশির মা ছিটকাইয়া উঠিল, আমি যদি মিথ্যে-কথা বলে থাকি ত,—ইত্যাদি ইত্যাদি।"

শশি মুখ বিকৃতি করিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার ও মুখে আগুন আর তোমার দিব্যির ও মুখে আগুন আমাকেও তোমার আলাপি মেয়েমানুষের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলে নয় ?"

"তা কি আর আমি বলছি।"

"আজই না হয় বলছ না, প্রথম যখন আমাকে চুরি করে এনেছিলে তখন পাড়ার লোককে ঐ কথাই বলেছিলে কিনা একবার মনে করে দেখ দেখি—তখন ও ঠিক এমনি করেই দিব্যি গেলে-ছিলে—লজ্জাও করে না মুখ নাড়তে।" বলিয়া শশি হাঁপাইতে লাগিল।

শশি মনে মনে ঠিক করিল কালই সে যেরূপে হউক মেয়েটিকে খড়দায় লইয়া যাইবে এবং সেখান-কার পুলিসের জিম্মায় তাহাকে রাখিয়া আসিবে। শশির মা কিন্তু ঠিক করিল মেয়েটিকে সে পুষিবে এবং বড় হইলে তাহার দ্বারা বেশ দুপয়সা রোজগার করিয়া লইবে, যদিও ততদিন পর্য্যন্ত সে যে টিকিয়া থাকিতে পারিবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

রাত্রে মেয়েটিকে অনেক করিয়া ভোলাইয়া শশি ঘুম পাড়াইল, বলিল, "কালই তোমাকে তোমার মার কাছে পাঠিয়ে দেবো। লক্ষ্মী মেয়ে আমার কেঁদো না" এবং সে ঘুমাইয়া পড়িলে অনেক রাত পর্য্যন্ত তার সেই করুণ মুখখানির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তার শূন্য প্রাণটা আজ যেন সহসা ভরিয়া উঠিয়াছে, বর্ষার নদীর মত সে যেন কূল ছাপাইয়া পড়িতে চায়। এই অজানা অচেনা মেয়েটির মুখের পানে তাকাইয়া তাকাইয়া তাঁর মনে হইতে লাগিল, এতদিন যে তার মনটা কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছিল না, সে কেবল এই মেয়েটিরই অভাবে —ঠিক এই মেয়েটি! কত রাত্রি যে তার কাছে নেহাতই ফাঁকা এবং নিঃশব্দ বলিয়া বোধ হইয়াছে কত দুপুর, কত বৈকাল, কত সন্ধ্যা যে আসিয়াছে এবং চলিয়া গিয়াছে অথচ তার বুকের উপর তাদের আসা যাওয়ার কোন পদচিহ্ন রাখিয়া যায় নাই সেও কেবল এই মেয়েটি ছিল না বলিয়া। সে আবেগ ভরে ঘুমন্ত খুকীকে আপনার বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

তার পর দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল কিন্তু মেয়েটিকে ফিরাইয়া দিয়া আসিবার কোন লক্ষণই শশি প্রকাশ করিল না। শশির মা প্রসঙ্গক্রমে ডাকিয়া বলিল, "যাগ্, ওর যে সুমতি হয়েছে, এই না আমার চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি।"

সন্ধ্যার কিছু পর একটি কাপ্তেন গোচের ছোকরা শশির মার সহিত শশির সম্বন্ধেই কি সব কথা বার্ত্তা কহিতেছিল এমন সময় ঘরজার আড়াল হইতে শশি ডাকিল, "মা একবার এদিকে এসো।"

তার মা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেই সে ভারি বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিল, "তাখ মা ফের যদি ঐ সব লোককে এ বাড়ীতে ঢুক্তে দাও ত আমি

এখান থেকে চলে যাবো, এ আমি বলে দিচ্ছি।" তার পর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে সেখান হইতে চলিয়া গেল এবং নিজের ঘরে আসিয়া খুকিকে প্রাণপণ বলে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল।

রাত্রে শয্যায় শুইয়া শশি আবার ভাবিল কত কি ভাবিতে লাগিল; এই যে মেয়েটি এ ত একদিন বড় হইয়া উঠিবে—তখন তাহারি মতন করিয়া এই ক্ষুদ্র জীবনটি কি কেবল—শশি মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। ঘুমন্ত খুকীকে জাগাইয়া তুলিয়া সে বলিল, 'মান্তু আমি তোর কে হই রে!"

তন্দ্রিত কণ্ঠে মান্তু উত্তর দিল, "মা!" শশির চোখ দুটো জ্বালা করিয়া উঠিল সে শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া ঘর মধ্যে পাচারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তার মনের মধ্যে অসংখ্য চিন্তা জাগিতে লাগিল—কেন সে তাকে ফিরাইয়া দিয়া আসিল না। কেন নিজের সুখের জন্য তাকে ধরিয়া রাখিল?—এখন ত আর উপায় নাই, আর উপায় থাকিলেই বা কি হইত? সে কি তাকে ফিরাইয়া দিয়া আসিবে? পাগল নাকি! এই যে এতবড় একটা মায়ার বাঁধন এটাকে একমুহূর্ত্তে ছিঁড়িয়া ফেলাটা কি এতই সোজা! না না সে কথা সে আজ ভাবিতেও পারে না।

প্রসন্ন আপনার ঘরে নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতেছিল শশি হঠাৎ গিয়া তাকে জাগাইয়া তুলিল এবং কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিল, "আমি কি করি বল্ দেখি পেসন্নী।" হিমাইতে হিমাইতে প্রসন্ন বলিল, "কেন, আবার কি হোলো!"

"তোদের কি বল্ না, তোরা ত দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিস—আমি যে কিন্তু আর পারি না; এমন জ্বালাতন, তবুনি যে ওকে"—কথাটা আর শেষ করা হইল না—শশি কাঁদিয়া ফেলিল।

শশব্যস্তে শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া প্রসন্ন বলিয়া উঠিল, "ওকি, কি হয়েছে তোর পাগল হলি নাকি!"

প্রসন্নর বুকের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া শশি ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল. "তোর পায়ে পড়ি পেসন্নী আমাকে বাঁচা—মান্তুকে আমি কিছুতেই আমাদের মতন হতে দোবো না—তোরা ভাল করে দেখিস্‌নি, মান্তুর আমার মুখখানি ঠিক যেন ঘুগ্‌গা ঠাকরুণের মতন।" শশি দ্বিগুণ বেগে কাঁদিয়া উঠিল।

নিজের ঘরে আসিয়া শূন্য শয্যায় শুইয়া শশি কত কি ছাই পাঁশ ভাবিতে লাগিল; সে ভাবিল, কাউকে কিছু না বলিয়া হঠাৎ সে একদিন মান্তুকে লইয়া কোনও সুদূর পল্লীগ্রামে পলাইয়া যাইবে এবং নিজেদের প্রকৃত পরিচয় লুকাইয়া সমাজের একজন হইয়া সেখানে বাস করিবে; তার পর মান্তু বড় হইলে একটি সুপাত্র দেখিয়া তাহার বিবাহ দিবে—তার পর?

তার পর কি হইবে কে জানে।

(৩)

তার পর এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, এই এক বৎসরের মধ্যে শশির মা ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছে এবং মান্তুর ক্ষুদ্র জীবন প্রদীপটিও ইহারি মধ্যে কোন একদিন হঠাৎ অলক্ষ্যে নিভিয়া গিয়াছে।

শশি তাদের পূর্ব্বেকার বাসা ত্যাগ করিয়া অন্যপল্লীর দিকে একটি ছোট খাট একতালা বাড়ী ভাড়া করিয়া প্রসন্নকে লইয়া বাস করিতেছে। তার মা তার জন্য যে টাকাটা রাখিয়া গিয়াছিল তাহাতে সে সার জীবন পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া খাইতে পারে—সেজন্য তার কোন চিন্তাই ছিল না—কিন্তু তথাপি তার মন কিছুতেই শান্ত হইতে চাহে না। মান্তু যতদিন জীবিত ছিল ততদিন তার সম্বন্ধে শশি যে সব জল্পনা কল্পনা মনে মনে আঁটিয়া রাখিত—তার মৃত্যুর পর সে সেইগুলোকে নিজের উপর অল্পে অল্পে চাপাইয়া দিতে আরম্ভ করিল।

সে ভাবিল, কোন পল্লীগ্রামে গিয়া নিজের প্রকৃত পরিচয় ভাঁড়াইয়া সমাজের একজন হইয়া বাস করিলে ত হয়। কেন, দোষ কি তাতে! কি অপরাধটা সে করিয়াছে সমাজের কাছে! তার মনে হইতে লাগিল, ঐ যে ক্ষুদ্র বালিকাটি তার জীবনের মাঝখানটিতে হঠাৎ একদিন অতিথির মত আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং প্রভাত না হইতেই চলিয়া গিয়াছে সে শুধু হাতে আসে নাই—সে আসিয়াছিল সমাজের কাছ হইতে তার জন্ত লিপি বহিয়া সে লিপির মধ্যে ছিল আনন্দের বার্ত্তা, সে লিপির মধ্যে ছিল সমাজের তরফ হইতে তার সাদর নিমন্ত্রণ।

(৪)

শশিমুখি প্রসন্নকে লইয়া যে বাড়ীতে বাস করিতেছিল তাহারি সম্মুখে ছিল একটা মেস-বাড়ী; মাঝখানে কেবল একটা সরু গলির ব্যবধান। এই মেস-বাড়ীর যে ঘরটি শশিদের ছাতের ঠিক সামনেই পড়িত তাহার মধ্যে থাকিত নলহাটির চাটুর্য্যেদের ছোট ছেলে সনৎকুমার।

এই তরুণ সুন্দর ছেলেটী গত বৎসর মাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় থাকিয়া আই, এ পড়িতেছিল। দেশে তাদের অবস্থা খুবই ভালো, তার উপর তার মাথার উপর উপযুক্ত দুই দাদা বর্ত্তমান; কাজেই ইচ্ছা করিলে সে থিয়েটার দেখিয়া, বায়স্কোপ করিয়া এবং ইয়ারকি দিয়া দিন গুলোকে সিগারেটের ধোঁয়ার মত করিয়া ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিতে পারিত কিন্তু তাহা হইল না; যে সকল ভূত মানুষ বিশেষকে সুখে থাকিতে দেখিলেই হঠাৎ আসিয়া কিলাইয়া যায় তাদেরি গুটিকতক আসিয়া তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল এবং তাহাকে এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিতে দিত না।

অমুক গ্রামে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে তার জন্ত পাড়ায় পাড়ায় চাঁদা আদায় করিয়া বেড়াইতে হইবে, পশ্চিম হইতে অমুক রাজনৈতিক পাণ্ডা কলিকাতায় আসিতেছেন, তাঁর সম্বর্দ্ধনার জন্ত বিশেষ করিয়া একটু আয়োজনাদি করিতে হইবে স্বদেশ হিতৈষী অমুক ভদ্রলোক অন্নাভাবে বড় কষ্ট পাইতেছেন কাজেই গোলদিঘীতে আসিয়া আর তেমন চিৎকার করিতে পারিতেছেন না—তাঁহার জন্ত একটা না একটা ব্যবস্থা করিতেই হইবে; এমনি ধারা নানান্ কাজ তার ঘাড়ের উপর ভূতের মতন চাপিয়া বসিয়া থাকিত এবং মুখে যদিও সে অত্যন্ত মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলিয়া বেড়াইত, যে এমন করিয়া সে আর পারে না আসলে কিন্তু সে ঠিক এই সকল কাজই চাহিত এবং ইহার জন্ত মনে মনে সে যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিত। সে যে কাজের ভার একবার লইত তাহার জন্ত এমনি কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাইত এবং এমনি নির্দ্দয় ভাবে আপনার শরীরটাকে খাটাইয়া খাটাইয়া অথম করিয়া ফেলিত যে দেখিয়া মনে হইত কাল আর সে উঠিতে পারিবে না; কিন্তু রাত না পোহাইতেই দেখা যাইত সে নূতন একটা কাজের ভার তেমনি উৎসাহের সঙ্গেই অম্লান বদনে ঘাড়ের উপর চাপাইয়া লইয়াছে এবং কন্যাদায় গ্রস্ত পিতার মত ব্যতিব্যস্ত ভাবে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে।

যার কাজ সে মুখুযে দাঁড়াইয়া যথেষ্ট তারিফ করিত বটে কিন্তু লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইত, আহাম্মক পাইয়া খুব খানিকটা বেওয়ারিশ খাটাইয়া লইয়াছে, কিন্তু কাজটাই হচ্ছে যাদের কাছে পুরস্কার. কাজ দিয়া তাহাদের ঠকাইতে যাইলে যে নিজেকেই সবচেয়ে বেশী ঠকানো হয় এ খবরটা তারা সম্ভবত জানিত না।

সে দিন দুপুর বেলায় শশি ছাতে চুল শুকাইতে উঠিয়াছিল, চাহিয়া দেখে মেস বাড়ীর মুখুযের ঘরে একটি ১৯, ২০ বছর বয়সের সুন্দর ছেলে টেবিলের ধারে বসিয়া অখণ্ড মনোযোগের সহিত কি একখানা বই পড়িতেছে। মুখখানি তার ভারি রুচি-এত রুচি যে তাহাকে দেখিয়া সরিয়া যাইবার কোন

প্রয়োজনীয়তাই শশির মনে উদয় হইল না—সে চুপ করিয়া সেই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ একসময় বই হইতে মুখ তুলিয়া জানালার দিকে চোখ ফিরাইয়া ছেলেটি সশব্যস্তে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ঘাড় হেঁট করিয়া জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল। মোটের উপর সে এমনি ভাবটা প্রকাশ করিল যেন ভুল করিয়া সে একটা মহা অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াছে।

শশি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এক পাও নড়িল না—নড়িবার শক্তিও তার ছিল না। এই যে সম্ভ্রমটুকু সে আজ এই অপরিচিত ভদ্রসন্তানটির কাছ হইতে অযাচিত ভাবে লাভ করিল, ইহার জন্য সে আদৌই প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু যখন সত্যসত্যই পাইল তখন তার সমস্ত বুকখানা হঠাৎ দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল ;—কি সে আত্মপ্রসাদ! তার সমস্ত নারীত্ব আজ যেন হঠাৎ মাথা উঁচু করিয়া কেবলি চিৎকার করিয়া বলিতে চাহিতে লাগিল, "আমি আছি, আমি আছি।" সেই তাদের পুরাতন বাটীর বারান্দার উপর দাঁড়াইয়া যে নারীত্ব একদিন হাজার লোকের লালসাদৃষ্টির আবর্জনার মধ্যে যন্ত্রাগ্রস্ত রোগীর মত ভিতরে ভিতরে তিল তিল করিয়া মরিতেছিল, এই তরুণ ছেলেটির একটি মাত্র সম্ভ্রম দৃষ্টি আজ তাহাকে হঠাৎ কি করিয়া কে জানে এক মুহূর্তে বাঁচাইয়া দিয়া গেল। তার মনে হইতে লাগিল, দুনিয়াটাকে সে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লয়।

রাত্রে শয্যায় শুইয়া তার মনে হইতে লাগিল, ঐ যে ছেলেটি, ও যখন দেশে ফিরিয়া যায় তখন ওর দিদি ওকে কতই না আদর করে,—মমতায় শশির বুকখানা ভরিয়া ভরিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু এই যে সম্মান, এ কি সত্যই তার প্রাপ্য ?—আজ যদি ঐ ছেলেটি কোন উপায়ে তার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া যায় তাহা হইলে সে কি আর কোন দিন অমন করিয়া—এক মুহূর্তে শশির মুখখানা কালো হইয়া উঠিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া ভাঁড়ার ঘরে বসিয়া কুটনো ছাড়াইতে ছাড়াইতে শশি বলিল, "আচ্ছা পেনটী যারা নিজে হতে বেরিয়ে আসে, তাদের না হয় সমাজ আর ফিরিয়ে না নিলে ; কিন্তু যে সব মেয়েকে ওরা ছেলেবেলায় চুরি করে এনে পোষে, তাদের অপরাধটা কি যে তারা অমন করে সারাটা জীবন জলতে থাকবে!" এবং প্রত্যুত্তরের জন্য একটুও অপেক্ষা না করিয়াই বলিয়া উঠিল, "সমাজের উচিত তাদের জন্য একটা কিছু বন্দোবস্ত করা।"

দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়া সারিয়া মেঝের উপর একটা মাদুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িয়া শশি নানান কথা ভাবিতে লাগিল,—প্রথমেই তার মনে পড়িয়া গেল মাস্টার কথা;—শশির চোখ দুটো জলে ভরিয়া উঠিল। তার পর অনেক দিন পূর্বেকার সেই সব জল্পনা কল্পনা ; সেই পরিচয় ভাঁড়াইয়া মাস্টারকে লইয়া কোন অচেনা পল্লীগ্রামে গিয়া বাস করিবার কল্পনা এবং পরে তার বিবাহ দিয়া তাকে সমাজের মধ্যে সকলের অজ্ঞাতসারে একটু একটু করিয়া চালাইয়া দেওয়া ; সে বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত একদিন তাহাকে লইয়া সে সুখের সংসার পাতিতে পারিত। তার পর চিন্তা স্রোত হঠাৎ ভিন্ন পথ ধরিল, তার নিজের জীবনটাও ঐ মাস্টারই মত কেবল দৈব বিড়ম্বনায় পড়িয়া এমন শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে—তা না হইলে সে আজ কোন ভদ্র সংসারের মধ্যে বেশ বাড়ীর ঐ সুন্দর ছেলেটির মতই একটি ছোট ভায়ের দিদি হইয়া—শশির দম ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল।

ক্রমশঃ

কৃষির কথা

(শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু এম এ.)

এই অন্ন সমস্যার দিনে আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে কৃষির উন্নতি-চেষ্টা করাই সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক। কৃষির মধ্যে বাঙ্গালায় ধানই সর্ব্বপ্রধান। পূর্ব্বে যত জমিতে ধান হইত গত কয়েক বৎসর যাবত তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণ জমিতে ধান হইতেছে: কিন্তু High price commission এর Report এ দেখা গেল উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ সেই অনুপাতে বাড়ে নাই, বরং অনেক কমিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যে জমিতে যত ধান্য হইত এখন আর তত হয় না। বাঙ্গলার জমির উর্ব্বরাশক্তি কি পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া গেল? অবশ্য মাঝে মাঝে নৈসর্গিক অত্যাচারে অনেক ক্ষতি হইয়াছে। গত পূর্ব্ব বৎসর আশ্বিন মাসের প্রচণ্ড ঝটিকায় পূর্ব্ব বঙ্গের হৈমন্তিক ধান্য সমূলে বিনষ্ট হয়। আমরা প্রকৃতির সহিত লড়াই করিবার জন্য বিজ্ঞানের সাহায্য এখনও বিন্দুমাত্রও লই নাই। বাঙ্গালার চাষী এখনও আকাশের পানে চাহিয়া ভবিষ্যতের অন্নের চিন্তা করে। কৃষিবিদ্যা শিখিয়া অনেক যুবক আমেরিকা ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের কেহ কোথাও যে কোন উন্নততর প্রণালীতে কৃষির কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন এ পর্য্যন্ত শুনিতে পাই নাই। যদি কেহ সে সম্বন্ধে আমাদের কোন খবর দিতে পারেন তাহা হইলে আমরা তাহা অতি যত্নের সহিত প্রকাশ করিব। এরূপ সংবাদ আজ বাঙ্গালার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য বিশেষ দরকার।

আমাদের দেশের মত উর্ব্বরা দেশ জগতে খুব কমই আছে। কিন্তু জমির ফসল উৎপাদনের ক্ষমতা কিছু অক্ষয় তূণীর নয়। জমিতে সার দেওয়ার ব্যবস্থা এখনও আমাদের কৃষকদের অজ্ঞাত। গোময় সার ক্বচিৎ কোথাও সামান্য পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। যশোহর জেলার উত্তর পশ্চিমাংশে ও নদীয়া জেলায় কোথাও কোথাও ধলা নদীর শেওলা দিয়া চিনি পরিষ্কার হয়। অনেকে তাহা লইয়া আবীর মাঠে দেয়। অবশ্য তাহার কোন একটা রীতিমত ব্যবস্থা সমস্ত ধারা নাই। Chilean Nitrate বা Sodium Nitrate কৃষি জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিতেছে। ইউরোপে বহুদিন হইতেই ইহার বহুল প্রচার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধের সময় খবরের কাগজে পড়িয়াছি সুইডেনের একখানা জাহাজে দশ হাজার টন নাইট্রেট যাইতেছিল, জার্ম্মানীরা তাহা ডুবাইয়া দেয়। আমাদের দেশে কিন্তু এখনও উহার নাম গন্ধ অনেকে শোনে নাই। কৃষি বিদ্যায় পারদর্শী যুবকগণ এ বিষয়ে একটা Propaganda work আরম্ভ করেন না কেন? সাবর ও পুষা কলেজের প্রফেসর ও ছাত্রগণ এ সম্বন্ধে পুস্তিকা লিখিয়া দিলে দেশের সমূহ উপকার হইতে পারে। নন-কো-অপারেশন আন্দোলনের গ্রামসংস্কারকগণ (Village organiser) এ সম্বন্ধে সকলকে উপদেশ দিলে গ্রামগুলির যথেষ্ট কাজ হইবে।

জমির উর্ব্বরতা কমিয়া আসিবার আর একটা মস্ত কারণ হইতেছে, একই চাষ পুনঃ পুনঃ করা। নিম্ন বঙ্গের অধিকাংশ স্থলে এক ধান্য ভিন্ন অন্য কোন ফসল উৎপন্ন হয় না। প্রাকৃতিক নানা অসুবিধা অবশ্য তাহার এক প্রধান কারণ। বরিশাল খুলনা প্রভৃতি জেলার ধানের জমিগুলি প্রায় জলাভূমি। সেখানে ধান ভিন্ন অন্য কোন সাধারণ ফসলের চাষ করিবার সুবিধা হয় না। কিন্তু সাধারণের অজ্ঞাত দুই একটা বৈজ্ঞানিক

ব্যবস্থা কিছু কি থাকিতে পারে না? এজন্যও আমরা কৃষি বিভাগ পরস্পরী ব্যক্তিগণের নিকট জিজ্ঞাসু।

আমাদের প্রধান কথা কৃষির উন্নতি বিধান সম্বন্ধে কৃষকদিগকে শিক্ষা দিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা।

"কৃষি বিদ্যালয়। কৃষক-সন্তানদিগকে বাঙ্গলা ভাষায় কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য সরকার চুঁচুড়ায় একটী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই কৃষি বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ কৃষক-সন্তানদিগকেই শিক্ষা প্রদান করা হইবে। তাহাদিগকে তথায় দুই বৎসর কাল শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয় সমূহের পঞ্চম ও ষষ্ঠ মানে পরীক্ষার জন্য যেরূপ পাঠ্যের ব্যবস্থা আছে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সেই সকল পুস্তক পড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে বর্ত্তমান কালের উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিতে পারে, তাহারও বন্দোবস্ত করা হইবে। ভূমি কর্ষণ, ভূমিতে সার প্রদান, বীজ বপণ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দানের সঙ্গে কৃষি যন্ত্র নির্ম্মাণ ও তাহা মেরামত করিবার প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে। কিন্তু দুই বৎসর কালের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা কতটুকু কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিবে তাহাই ভাবিবার বিষয়। সম্মিলনী।"

অবশ্য এরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আশার কথা। কিন্তু আমরা পুস্তকগত শিক্ষা কতদূর জমিতে কে লাগাইবে এখনও ঠিক বলিতে পারি না। গবর্ণমেণ্ট দুই এক জায়গায় Experimental farm করিয়াছেন। তাহাতে কৃষকগণের কতটুকু উৎসাহ হইয়াছে এবং তাহার প্রভাব কৃষকগণের উপর কতদূর হইয়াছে তাহা জানা দরকার। এ সম্বন্ধে রঙ্গপুরের কৃষি সমাজ এবং তত্রত্য কৃষকগণের আগ্রহাদি সম্বন্ধে কেহ কোন সংবাদ দিতে পারিলে আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইব।

আমরা মনে করি পুষা ও সাবর কলেজের প্রফেসার ও ছাত্রদের লইয়া একটা সমিতি গড়িয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক ছাপাইয়া গ্রাম্য পাঠশালায় বিতরণ করিলে কিছু উপকার হইতে পারে। এজন্য আমরা দেশের নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শুধু পুস্তিকাগুলি বিতরণ করিলেই সকলের উপকার হইবে না। মফস্বলে শিক্ষাবিভাগের যে সমস্ত স্কুল সবইনস্পেক্টর থাকেন তাঁহারা গ্রামে গ্রামে যাইয়া এক একটী পাঠশালার প্রাঙ্গণে সভা ডাকিয়া বহু লোককে ঐ সব বিষয় বুঝাইয়া দিতে পারেন। কৃষি সম্বন্ধে Itenerant lecture এর ব্যবস্থা আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে বহুদিন যাবৎ হইয়াছে। আমাদের দেশের স্বর্গগত সমুজ্জ্বল রত্ন শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ ঐরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে যে আড়াই লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন সে জন্য সমগ্র দেশবাসী তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কিরূপ ব্যবস্থা করেন দেখিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া রহিলাম।

বাস্তবিক এই কৃষির জন্য আমাদের Itenerant lecture এর যে কত দরকার তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তবে ঠিক্ আমেরিকার কায়দায় করিলে বিশেষ ফল হইবে না বলিয়াই মনে হয়। আমেরিকার অনেকস্থলে বক্তাগণ শুধু ট্রেণেই ঘুরিয়া বেড়ান, এবং এক যায়গায় ট্রেণ থামাইয়া ট্রেণের এক খোলা গাড়ীর উপর দাড়াইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দেন। বক্তৃতার ফলাফল দেখিবার তাঁহাদের দরকার হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে এরূপ ভাবের বক্তৃতা হইতে উপকার লাভ করিবার ক্ষমতা আমাদের কৃষকদিগের নাই। বোধ হয় ভয়ে (পুলিশের এবং জমিদারের) তাহার কাছে কেহ যাইবে না। জাকজমক করিয়া গ্রামে গেলে শুধু অর্থের অপব্যয় ভিন্ন আর কোন লাভ হইবে না। আমাদের সুবিধামত সময়ে এক এক গ্রামে যাইয়া তত্রত্য কৃষকদিগের মধ্যে কিছুকাল করিয়া বাস

করিয়া তাহাদের সহিত এক সঙ্গে কাজ করিয়া বুঝাইয়া দিলে তবে উপকার হইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যাবেলায় Lantern Lectures এর বন্দোবস্ত করিলে দরিদ্র কৃষকদিগের আমোদ ও শিক্ষার ব্যবস্থা এক যোগেই হইতে পারিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন—এবং কিরূপ ভাবে কার্য্য করিবার জন্য কিরূপ লোক নিযুক্ত করিবেন তাহা এখনও কিছু জানিতে পারা যায় নাই। তবুও পূর্ব্ব হইতে আমাদের মনে যাহা ভাল বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহা জানাইয়া রাখিলাম। কারণ সব সময়েই স্বাধীন সত্তা মত প্রকাশেই সমাজের প্রকৃষ্ট উপকার। অবশ্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের Scheme পাইলে আমরা তাহার উপর উপযুক্ত সমালোচনা করিতে পারিব।

অনেকে বলেন 'তোমরা কৃষকদিগকে শিখাইবে কি? এক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ, সেত অনেক অর্থের খেলা। এ দরিদ্রের দেশে এখনই তার জন্য ব্যস্ত হইবার দরকার নাই! আর যা, আমাদের দেশের কৃষকরা দেশের উপযোগী সে সবই জানে। একথা আমরা ঠিক স্বীকার করিতে পারিলাম না। অনেক সময়েই দেখিয়াছি আমাদের দেশের উপযোগী সকল বিষয়ই যে কৃষকেরা জানে তাহা সত্য নহেই এবং অনেক সাধারণ উন্নতিতে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হইবে না। সাধারণ চাষের আপাততঃ উন্নতির কথা ছাড়িয়া দিলেও চাষ রক্ষার অনেক ছোট বিষয় তাহাদের জানা নাই; সেগুলি জানা থাকিলে কৃষির অনেক বিপদের হাত হইতে তাহারা রক্ষা পাইতে পারিত। উদাহরণ স্বরূপ এস্থলে বৈশাখ মাসের 'প্রবাসীতে' ৭৮ বৎসর পূর্ব্বের 'গম্ভীরা' পত্রিকার এক সংখ্যা হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন আমরা নিম্নে তাহা দিলাম।—

"আম্রফলকে পোকা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ফাল্গুন মাসে যখন আম্রবৃক্ষে কচি কচি পাতা গজাইয়া উঠে, তখন নিম্নের লিখিত রাসায়নিক তরল-মিশ্রণ-পদার্থ দ্বারা সমস্ত গাছটীকে ভিজাইয়া দেওয়া উচিত।

"ত্রিশ ভাগ জলে চারি ভাগ পাথুরিয়া চুণ-গুলিতে হইবে। গন্ধক ও চুণ জলে মিশে না। এই দুই দ্রব্যকে ভালরূপ চূর্ণ করিয়া জলে মিশাইতে হইবে। জলের সহিত ইহা যতটুকু মিশ্রিত হয়—তাহাতেই কার্য্য হইবে। এই কাজ একটী পাম্পের (Pump) সাহায্যে সুচারুরূপে সাধিত হয়। প্রতি বৎসর আম্রবৃক্ষের পাতা গজাইবার সময় তিনদিন এই প্রণালীতে আম্রবৃক্ষকে ভিজাইয়া দিলে ইহার উপকারিতা দুই বৎসরের মধ্যেই দৃষ্ট হইতে পারে।"

গত পূর্ব্ব বৎসর বঙ্গের অধিকাংশ স্থলেই আম্র-মুকুল হয় নাই। কারণের মধ্যে এইটুকু দেখা গেল যে মাঘ মাসের মাঝামাঝি হঠাৎ একটু মেঘ করিয়া কয়েকদিন একটু গরমের ভাব পড়িয়া যায়। ফলে, প্রশাখা গুলির প্রান্তে প্রান্তে যে গোছ বাহির হইতেছিল সে গুলি সব পাতায় পরিণত হইয়া যায়। জার্ম্মানির প্রসিদ্ধ গেটে (Go the) জগতে উদ্ভিদ-বিদ্যার (Botany) এক নূতন মত প্রচার করেন। Flowers are nothing but metamorphosed leaves. অর্থাৎ ফুল বৃক্ষপত্রের পরিবর্ত্তিত অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নয়। যে গোছ গরম পড়িলে পাতা ভিন্ন আর কিছুই হইল না, তাহাই শীতের সময় পরিবর্ত্তিত হইয়া ফুলে পরিণত হয়। সে সময় গরমের একটা ভাব পড়িলে যে পাতা সেই পাতাই। থাকিয়া যায়। এরূপ অবস্থা দেশে মাঝে মাঝে হয়ই, কিন্তু আমাদের কৃষকেরা (শুধু কৃষকেরা কেন দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক পর্য্যন্ত) এরূপ ব্যাপারকে ভগবানের খেয়াল ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারে না, এবং ইহার যে কোন প্রতিকার সম্ভব তাহাও ধারণায়ও আনিতে পারে না।

আম্রগাছ সম্বন্ধে আরও দেখিয়াছি অনেক সময়

গাছে বেশ 'বোল' হইয়া ফাল্গুন মাসে এক পশলা বৃষ্টির অভাবে সমস্ত শুকাইয়া গেল, একটীও শুটী বাঁধিতে পারিল না। এ সময় সন্ধ্যার পর দুই এক দিন গাছে বেশ করিয়া জল ছিটাইয়া এবং গোড়ায় জল দিয়া দিতে পারিলে বোধ হয় ফল হইতে পারে। আমের অবশ্য বিপদ এখানেই শেষ নয়। ইহার পরে আছে বৈশাখী ঝড়। তাহারও কতকটা প্রতিকার সম্ভব। যথা পূর্ব্ব হইতে গাছ বেশী লম্বা হইতে না দেওয়া। ছাটিয়া ছাটিয়া গাছ ছোট করিয়া রাখিলে এবং বাড়াইয়া উঠিতে দিলে ফলও বেশী হয় অথচ ঝড় কম লাগে। আরও এক সুবিধা আছে, ফল পাড়িবার সময় বেশী নষ্ট হয় না। আমেরিকার একখানা বইতে পড়িয়াছিলাম, যে ফলের গাছ এত ছোট করিয়া রাখিবে যে অর্দ্ধেক ফল মাটীতে দাঁড়াইয়া পাড়া যায়, বাকী অর্দ্ধেকও প্রায় গাছে না উঠিয়া একটা উঁচু টুলের উপর দাঁড়াইয়া পাড়া যায়।

টোটকা বিষয় অনেক আছে, এবং সে গুলিতে বাস্তবিক উপকার হইতে পারে। এই গুলির জন্যই Itenerant lectere অথবা গ্রাম্য সমিতি প্রভৃতির দরকার। শুধু District Board হইতে বিভিন্ন প্রকারের বীজ বিতরণ করিলেই হইবে না। সে বীজ অনেকের ঘরে পচিবে ও ইঁদুরের খাদ্য হইবে। অথবা কোন শিশুর হাত হইতে খসিত হইয়া ওজনের এক কোণে কোন গতিকে জীবন ধারণ করিয়া কাতর নয়নে দেশের কৃষির উন্নতি-চেষ্টার ব্যর্থতা জ্ঞাপন করিবে। তাই বলি শুধু পড়াইলেই হইবে না, শুধু বক্তৃতা দিলেও হইবে না; গ্রামে গ্রামে চোখে আঙ্গুল দিয়া, নিজ হাতে সঙ্গে সঙ্গে কাজ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া আসিতে হইবে। আজ দেখিতেছি প্রকৃত পক্ষে চারিদল লোকে গ্রামের কাজ করিতে যাইবেন। কেহ কেহ যে ইতিমধ্যে যান নাই, আমরা এমন কথা বলিতেছি না। প্রথম —ননকো-অপারেশনের ভিলেজ অরগানাইজার দল, —দ্বিতীয়—ম্যাজিষ্ট্রেটদেরও উক্ত প্রকারের নাকি একটা দল হইবে, তৃতীয়—গবর্ণমেণ্ট, চতুর্থ—বিশ্ববিদ্যালয়। কে কি ভাবে অর্থ ও সামর্থ্যের শুধু মাত্র অপব্যবহার না করিয়া কতটুকু কাজ করেন আমরা জানিবার জন্য উদ্বিগ্ন রহিলাম।

গোপন কথা

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী)

১

ইলার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। আমি ব্যারিষ্টার হতে বিলেত যাবার আগেই তার মা আর আমার মা সব কথা ঠিক করে রেখেছিলেন। ইলা আমার বাল্যের সঙ্গী, খেলার সাথী, বন্ধু। এই দীর্ঘ তিন বৎসর যে কি ভাবে তার মুখ না দেখে কাটিয়েছি সে শুধু আমিই জানি। সেই সুদূর সাগর পার হতে বাতাস যেন তারই নিশ্বাস বয়ে আনত। তার মিলন-সোহাগ আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করতুম। দেশে ফিরে এসে তাকে দেখলুম, আমাদের দু'জনারই দু'জনার প্রতি ভালবাসা এই দীর্ঘ অদর্শনে বেড়েছে বই কমে নি। প্রবাসে যাবার আগে সে আমায় কথা দিয়েছিল, অনুক্ষণ সে আমায় ভাববে,—তার সোহাগ তার স্নেহ যাতে সব সময়ে আমার মনে জাগা থাকে ভালবাসার জোরে সে তা করতে পারবে। এখন তার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা,

সকাল সন্ধ্যা আমরা দু'জন এক সঙ্গে কাটাই, এক সোফায় বসে সে যখন তার মাথা আমার গায় রেখে, হাতে হাত রেখে আধ নিমীলিত নয়নে আমার পানে চেয়ে থাকে—তার রেশমী-কোমল কেশরাশির সমস্ত সুগন্ধ যখন এক নিঃশ্বাসে পান করে' নি সে সব মুহূর্ত্তে যে কোথা দিয়ে যায় বুঝতেও পারি না—কত প্রাণভরা আকাঙ্খা কত বেদনা কত কি জড়ানো তাতে। তার পর যখন সে চলে যায় তখন অশ্রুরাশি আমার নয়ন ছাপিয়ে ওঠে,—আমাতে আমি থাকি যতক্ষণ ইলা আমার পাশে থাকে।

ঘুমোতে মোটেই পারি না। আঁধারে তার সেই কমনীয় সৌন্দর্য্যে ভরা মুখখানি দেখি,—স্নেহ কৌতুক ভরা মুখের সে মধুর হাসি, প্রভাত সৌন্দর্য্যের মত তার সেই স্নিগ্ধ দৃষ্টি। যখন ভাবি সে আমারই পত্নী হতে যাচ্ছে, আমার গান গাইতে ইচ্ছা হয়, ইচ্ছা হয় চীৎকার করে হৃদয়ের আকাঙ্খা এই স্তব্ধ রাত্রিকে শোনাই।

ইলাও আমার মত ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। কেমন যেন মন-তোলা গোছ,—এই যে এক পক্ষ বাকী আছে আমাদের মিলনের, তার বোধ হয় এখনই যদি এ ব্যবধান দূর হয়ে যায়। তার মনে ব্যাকুলতার ছাপ মুখে এঁকটা পড়েছে যে একদিন তার এক বুড়ো দাদামশায় চা খেতে খেতে বলেই ফেল্লেন "তোমাদের দেখে কেউ মনে করবে যে সৈত্য তোমারা—ছুটির দিন আসছে তাই আশা পথ চেয়ে আছ।"

২

কি ভেবেছিলুম জানি না—কেমন একটা ভয় যেন আমার হঠাৎ হতে লাগল—সে যেন বিষাক্ত শরের মত আমায় বিঁধছিল। আমার সেই চির আকাঙ্খিত দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগল—যে দিন ইলা আমার হবে—শুধু আমারই, সেই অনিশ্চিত আশঙ্কা আমায় যেন কেমন সঙ্কুচিত করে তুলল, আমি ভালবাসি—খুব ভালবাসা পেয়েছিও, খুব কম দম্পতীই এই নূতন অজানিত জীবনে এত আশা এত নিশ্চিত সুখ নিয়ে প্রবেশ করে।

যাকে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি তার উপর আমার এত বিশ্বাস আছে, সে আমায় এত ভালবাসা দিয়েছে যে, এর মধ্যে যদি আমাদের মিলনের কোন বাধা হয় তো একবারও না ভেবে সেই মুহূর্ত্তেই আমি আমার জীবন শেষ করতে পারব! যদি ইলার কোন অসুখ হয়, যদি সে না বাঁচে—এমনও তো অনেক হয়েছে যাদের প্রথম রজনীর মধুর পরিচয়েই জীবন ভরা আকাঙ্খা বিষাদে পরিণত হয়েছে!

ইলা তার এই নূতন অজানিত জীবনে কি আশা করে? কিবা শুনেছে সে তার বিবাহিতা বন্ধুদের কাছ থেকে—কি তার আছে, কি সে চায়! তার এই মার্জ্জিত কোমল প্রকৃতি কি প্রথম গাঢ় আলিঙ্গনে মুয়ে আসবে! সেই আক্রমণের ব্যথায় তো সে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে না! নিজের মনে ভাবতে গেলে সত্যি মনে হয় এই বাঙলার আদর্শকে কতখানি নামিয়ে আনছি—এই প্রথম খেলায় এক-জনে হয়তো তার ভবিষ্যতের সকলই সুখ বিসর্জ্জন দিচ্ছে—কোন সামান্য তুচ্ছ ঘটনায় নারীকে কত আশা ভায়, আবার তেমনি নিরাশই করে—আদর্শকে হারায় বা বাঁচায়!

ইলার মতো সুন্দরী মনোহারিণী নারী আমি আর জানি না, ভালবাসায় আমায় জয় করেছে—তার সেই ঠোঁট দু'খানির জন্য আমি তৃষিত, তার প্রতি অণু পরমাণু আমি নিজের করে নিতে চাই—এত তাকে ভালবাসি।

৩

আমার শাশুড়ী কাল আমায় ডেকে নিয়ে জল ভরা চোখে কম্পিত কণ্ঠে বল্লেন—"আমাদের সব চেয়ে আদরের ভালবাসার ধন তোমারই হতে যাচ্ছে..... আমি তোমায় অনুরোধ কচ্ছি বাবা

খনো তার সামান্য একটু অসুখের কারণও হয়ো
।, তাকে ভালবেসো, তার ওপর সদয় থেকো,
।মার অনুগ্রহে ভালবাসায় সে সুখে জীবন
।টাতে পারবে।"

আরো অনেক কথা বলে শেষে বল্লেন—"তুমি
ন করো না তার এই নূতন কর্ত্তব্য পথে চলবার
। তাকে আমি তার স্বভাব সরল মাধুরী ভেঙ্গে
ছু শিক্ষা দিয়েছি, যখন দু'জনাই তোমাদের মত
।নাকে পুজো করে, তখন নারী যাতে অজ্ঞান
'ক তাতেও খুব শিগ্‌গীর পারদর্শী হয়ে উঠে।"

আমি তো তাঁর এই কথা শুনে প্রায় হেসেই
ল ছিলুম। তবেই বোঝা যাচ্ছে অনেক নারীরই
ফাটে তো মুখ ফোটে না। এমনও অনেক আছেন
। স্বামীকে মনে মনে খুব ভালবাসেন কিন্তু
দর সেই ভালবাসার তদগত ভাব সেই আপন
। তন্ময় স্বামীর বাহু পাশে বদ্ধ হয়েও ফুটে ওঠে
—তাই বন্ধুদের দেখেছি পত্নী থাকতেও তারা
প্রেমের আশ্রয় খুঁজতেন। সে প্রণয়ে দিব্য
র্য্য না থাকলেও ভালবাসার ছলনাটুকু
ওয়া যেত।

জীবনের আশীর্ব্বাদ পেয়ে আজ আমি কি
কোর করতে যাচ্ছি—যাতে মানুষকে নন্দনে দিয়ে
,—সব চেয়ে দূরে শুধু যেন একটা স্বপনের মাঝে
কছি। অমিলিত জীবনের সেই অপেক্ষা
তাশ, বেদনা—কত অনুমান কত ভাবনা—
ম অজ্ঞাত পথের প্রাণের কম্পন ভীতি
ক্তের কত না সুখ সঙ্গীতের আভাস দিয়ে যায়!
একমাত্র সুখ যাতে লোকে কখনো ক্লান্ত হয়ে
না—একটা কর্ত্তব্য।

শেষ মুহূর্ত্তের ওই সাধারণ স্বাভাবিক উপদেশ
ক থেকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার মন তোলপাড়
তে লাগল। বন্ধুদের মধ্যে সময় সময় যে সব
তনব্‌ হোত তাই মনে পড়তে লাগল।
।দের দু'জনার এই প্রেমের শেষ অবস্থা কি
হবে তার বা কি হবে আমার বা কি হবে! এই
ভালবাসা যা এমন আমার সব, সে কি কমে যাবে,
না শত ভাবে আরো আমায় জড়িয়ে ধরবে। সে
দিন আমার ইলা এমনি ভাবে পাখায় মুখ খানি
আধ ঢেকে বসে আছে এমন সময় আমার ঐ সব
অদ্ভুত ভাবনা ভরা চোখ দেখে বল্লে—

"অমন করে চেয়ে আছ কেন? বিয়ে করতে
যাচ্ছ সেই ভাবনায় না কি! তোমার মুখ যেন
কেমন হয়ে গেছে যদি এই চিন্তাই তোমায় এত
বিব্রত করে থাকে তো এখনো কিন্তু না বলবার
সময় আছে।" তার সেই মোহভরা চাহনির
পানে চেয়ে আমি বল্লুম "তোমায় আমি পুজো করি
এই শেষ মুহূর্ত্ত যা এখনো তোমায় আমার কাছ
থেকে দূরে রেখেছে—আমার তাই যুগ যুগান্ত বলে
বোধ হচ্ছে ইলা!

বিয়ে হয়ে গেল। অনুষ্ঠান আচার কি হোল
মনে নেই সে সব! শুধু দেখেছিলুম আমি ইলাকে—
ফুলে ফুলে সে ফুলরাণী সেজেছিল—ঢেউখেলান
দীর্ঘ চুলের রাশি একটা বিচিত্র খোঁপায় বাঁধনে
তার ছোট মাথার সৌন্দর্য্য সহস্রগুণে বাড়িয়ে
দিয়েছিল, তার সেই ফিরোজা রংএর রেশমী
পোষাকে, সেই লাবণি-ভরা মূর্ত্তির মত নয়নে সে
যখন আমার পানে তাকাচ্ছিল, সে যেন তার সরল
প্রাণ ভরা ভালবাসায় চলে পড়ছিল। এই সব
অনুষ্ঠান গুলো আমার কাছে কেমন কৃত্রিম কেমন
কেমন বোধ হতে লাগল। সত্যি এখানে সেই আগ্রহ
আকাঙ্ক্ষা ভরা সব নূতন করা ব্যাকুল চুম্বন, যাতে
স্বামী আর পত্নীর সমস্ত প্রাণ এসে তাদের অধরে
আগ্রহ ভরে জড় হয়, নারীর সমস্ত অস্ফুট যৌবন ফুটে
ওঠে, কোমল গাঢ় আলিঙ্গন সে চায়—শুধু স্বপ্ন; শুধু
একটা সুখের আশা—একটা অনিশ্চিত ভীতি
ব্যথার ভিতর দিয়ে তার প্রাণে ফুটে ওঠে।

৫

আমি ইলাকে যেমন পূজো করি ইলাও আমায় তেমনি ভালবাসে। সে তার পিতার স্নেহ মায়ের কোল ছেড়ে চললো। একবারও তার এত দিনের সমস্ত স্নেহ বন্ধনের পানে না চেয়ে শুধু গাড়িতে ওঠার সময় তার মা যখন তাঁর হাত ইলার মাথা হতে নামিয়ে নিলেন তখন তার চোখ দুটি ছল ছল করে উঠেছিল—সে অশ্রু বোধ হয় প্রথম চুম্বনে মুছিয়ে নেবে এই আশা।

সে যেন একটি পাখী। খাঁচা খোলা পেয়ে উড়ে বেরিয়েছে—কোথায় যেতে হবে তা সে জানে না—শুধু বাহিরের আলোয় মুক্তির আনন্দে ডানা ছুঁড়ছে আর ডেকে ডেকে হয়রাণ হয়ে যাচ্ছে। সে একই কথা বারবার বলতে লাগল, যেন কোন নেশায় অভিভূত হয়ে আছে—তার হাসি কলোতের প্রেম ভাবের মতো শোনাচ্ছিল। তার আলোক জড়িত চোখ দুটি তুলে সে আমারই পানে চেয়ে ছিল। তার হাত দু'খানি আমার গলায় নেকলেসের মতো জড়ান ছিল। তার রাঙা গাল দু'খানি আমার গালের সঙ্গে লাগান ছিল। ইলা বলে উঠলো—

"প্রিয়তম এই ভ্রমণ শেষ হতে কি তুমি তোমার জীবনের দশ বছর দিতে পার না!" সেই মাদকতা ভরা প্রশ্নের উত্তর কি দেব আমি, মাথা আমার ঘুরতে লাগল, যেন আমি ছাদের একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়া পড়েছি—তার মাতা তাকে যা বলেন নি সে কি তা সত্যি জানে—তার যাতে অজ্ঞ থাকা উচিত সে কি সে সত্যি শিখে ফেলেছে! তা হলে তা হলে?

ওঃ—মোমটায় ঢাকা মুখ, যাতে লাল আভা লুকিয়ে রাখে—ওই আবেশ ভরা চোখ, ওই কম্পিত আঙুরের মতো রসে ভরা ঠোঁট—ওই মৃণাল বাহু দু'খানি যা আমার হাতে রেখে বিবাহ বাসর আমার সব ম্লান করেছিল—ওই সরল মধুর কথাগুলি যাতে আমার অন্তরতম জিনিসটি পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো, যার—স্মরণে আমি চিরসুখী হব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না—সে কি কিছু না শুধু মিছে কথা শুধু ছলনা!

কিন্তু কি ভুল আমি করেছিলুম—কি বোকা আমি—এমন চিন্তা আমার আসায় করে আমার বুকভরা ভালবাসা প্রাণের সমস্ত স্পন্দনকে বিষাক্ত করে দিল। কি ঘৃণিত নীচ মন আমার এমন সরল প্রেম ভরা প্রশ্ন যার উত্তরে আমার তখনি বলা উচিত ছিল "বেশ দশ বছর কুড়ি বছর যত তোমার খুসী, তুমি আমার সুখ, আমার আশা, আমার প্রাণ, তুমি আমার পাশে রয়েছ!" বলতে না পেরে কি চিন্তাই আমার মনে জেগেছিল।

৬

সে শুয়ে ছিল আমি বিছানা থেকে উঠে পড়লুম। ইলা তার বিশ্লিষ্ট কেশরাশি লেসের বালিসের উপর রেখে শুয়েছিল তার বর্ণ এত স্বচ্ছ গোলাপী আভা রহিত যে, আমি তার ভেতর নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছিলুম তার ঠোঁট দুখানি আধ খোলা ছিল যেন সে স্বপ্ন দেখছে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল সে, আমি তার দিক থেকে দৃষ্টি সরাতে পাচ্ছিলুম না।

টেবিলের উপর স্যাম্পেনের বোতল ছিল—এক গ্লাস দু'গ্লাস তিন গ্লাস পান করলুম তৃষ্ণা গেল না। কেমন যেন জ্বর জ্বর বোধ হচ্ছিল। কি যেন একটা চিন্তা কোথা হতে আমায় নিয়ে কোথায় ফেলছিল। মন আর মাথা দুই যেন আমায় উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলছিল। মন আমার এমন হচ্ছিল কি জন্যে—সে কথা নিজের কাছে বলতেও কেমন বোধ হচ্ছিল, সেই চিন্তা যাতনায় আমার সমস্ত প্রাণ মথিত করে পাগল করে তুলেছিল—সেই অজ্ঞাত চিন্তাকে যে সরল ভাবে সাহস করে মন থেকে দূর করে দেব সে ক্ষমতাও আমার ছিলনা।

যাকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি পূজো করি—যতটা বুঝি, সেও আমায় কত ভালবাসে সে এখনো

কি পেলাম না, তার সম্বন্ধে এমন চিন্তা এমন কর কোন প্রমাণ না পেয়ে করার, তার নির্দোষিতা হতে সন্দেহ করনা করতে আমি নিজেই কত চিন্তিত হচ্ছিলুম। হায় কেন আমি বিয়ে করলুম!

জোর আস্তে একটু ফাঁক করে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করলুম। নেশা করে মানুষ যেমন ঘুমোয় তা তেমনি ঘুমোচ্ছিল। সে যখন এই স্বপ্ন থেকে জেগে আমায় ডেকে দেখবে সে আমার বাহু পাশে তখন তার মনের অবস্থা কেমন হবে! নিজের কত তর্ক যুক্তি করছিলুম, গত রজনীর প্রতি মুহূর্তের কথা আমার মনে হচ্ছিল এক একবার ভয় হচ্ছিল তার গোপন কথাটি···

ইলার চাহনি তার উজ্জ্বল হাসি পরিপূর্ণ মুখে সে কুলে ছাপিয়ে উঠেছিল সে বিজয়িনীর মতো গর্ব ভরে তাকাচ্ছিল, রমণীর মহিমায় আজ সে মহিমান্বিত—এই সমুদ্রের ধারে নির্জ্জন বাসরে আমরাই রাজারাণী। নবদম্পতীর আগমনে সারা বাড়ী খানি নূতন শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে—সম্মুখের বাগানের ফুলের গন্ধ খোলা জানালা দরোজা দিয়ে ব্যাকুল হয়ে প্রবেশ করছিল—না কি বলছে কি করছে সে নিজেই বুঝতে পারছিল না।—এবার ওঘর ছুটে যায় আবার আমার পাশে এসে দাঁড়ায়। আমার পাশে আসতে তার না ছিল কুণ্ঠা, একটু জড়িত ভাব—সেই যে একটু লজ্জা সঙ্কোচ ভাব যাতে নববিবাহিতাকে আরো সুন্দর দেখায় ইলার সে সব কিছু ছিল না। সে কাছে এসে আমার হাঁটুর ওপর বসতো, তার বাঁ হাত খানি দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরতো, তার গ্রীবা ও ঠোঁট আমার পানে এগিয়ে আসত। কিন্তু যখন আমি তার সমস্ত দেহ অধীর আগ্রহে চুম্বনে আচ্ছন্ন করে ফেলতুম, সে তখন কেমন হাসত, তার লতার মতো কমনীয় দেহ যেন কাঁপতে থাকতো, সে কত কথা আমার কানে বলত, তারপর আবেগে তার চোখ আচ্ছন্ন হয়ে আসতো, নাকটা একটু স্ফীত হয়ে উঠতো।

মনে ভাবলুম পুলিশ যেমন ধীর ভাবে অপরাধীর অনুসন্ধান করে আমিও তেমনি স্থির ভাবে সব করবো। এই বালিকার অতীত কথা আমি সব জানতে চাই সে সম্বন্ধে তো আমি কিছু জানি না—খুঁজলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

তবু আমি তাকে পুজো করতুম। আমার সুখময়ী রাণী ইলা—আর কিছু আমি চাই না—শুধু আমি মনে তাকে যা ভাবি সে যদি তাই হয়, শুধু যদি তার আর আমার মাঝে কোন গোপন কথার ব্যবধান না থাকে।

জেগে উঠে সে আমায় তেমনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকলে—আবার সেই চুম্বন, আমার সব চিন্তার বাহিরে জাগা রইল শুধু সেই চুম্বন।

শুধু বিশ্বাস অন্ধ বিশ্বাস—শুধু এই কথা যে, এসব মিছে কিছু নয়—আমার স্নেহ নিয়ে সে বিদ্রূপ করছে না—সে কখনো আর কারো ছিল না—আর কারো হবে না—শুধু আমারই।

৭

কখনো কখনো আমার ইচ্ছা হোত আমি যদি ইওরোপের সেই পুরোহিত হতুম যার কাছে নারীরা তাদের সব গোপন পাপ কথা স্বীকার করে! যার কাছে তারা তাদের আত্মা বিশ্বাস করে তার—উপদেশ চায়,—যদি ইলা তেমনি ভাবে আমার কাছে হাঁটু গেড়ে সব স্বীকার করতে বসে তো আমি তার সব কথা বের করে নিতে পারি।

এখন যেখানে আমি নারী মহলে মিশি সেইখানেই আমার কথাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উত্থাপন করি, যে তারা মনে আর দেহে সেই বিবাহ রজনীতে কি ভাবে! কেউ যেন আমার কথা বুঝতে না পেরে মুখে একটু হাসা আভা খেলিয়ে চলে যান। যেন এসব অপ্রীতিকর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আমি ভাল কাজ করি নি,—তাদের কাছে অপরাধী

হয়েছি যেন আমি তাদের প্রাণের ভিতর থেকে বহুমূল্যবান যত্ন সঞ্চিত অতি মধুর স্মৃতি বের করে নিতে যাচ্ছি।

কেউ বা আমার কথা শুনে হেসে খুন হয়ে আমায় একটি বোকা বনিয়ে চলে যান—২'তিন জন সুন্দরী তাদের কথা কৌতুক ভরে বলেছিলেন আমায়, কিন্তু সে অতি সাধারণ। এরা সব অদ্ভুত প্রেমের না আছে মাথা না আছে প্রাণ। সে আত্মহারা তন্ময় ভাবুক, সেই আমার পত্নীর প্রেমে যে প্রাচুর্য্য যে সব আপন করা ভাব পেয়েছি, তাতে আমায় মুগ্ধও করেছে আবার ভীতও করেছে। কে আমার এ ভুল ভেঙ্গে দেবে এই অন্ধকারের মাঝে আমি সব হারিয়ে ফেলেছি। কে আলো নিয়ে আসবে—কি যাদু মন্ত্রে তার উপর আমার বিশ্বাস ফিরে আসবে!

৮

ইলা বুঝতে পেরেছিল যে কিছু একটা কথা আমি তার কাছ থেকে গোপন করছি—কোন একটা বাধা যেন তার আর আমার মাঝে দুলছে, কোন একটা সন্দেহ যেন আমার অন্তর সদাই নির্য্যাতিত করছে তার বাহু পাশ হতে আমায় দূরে সরিয়ে রাখছে—সেই ভালবাসা যাতে আমার প্রাণে চিরদিন নব-জীবনের বসন্ত বাতাস বইয়ে রাখবে বলে আশা করেছিলুম—সেই নিরবচ্ছিন্ন সুখ—হায় আমার সকল স্বপ্নের সেরা স্বপ্ন!

সে কখনো মুখ ফুটে কিছু বলেনি—কিন্তু মনে হোত তার এই প্রাণ ঢালা ভালবাসায় এরূপ বিরাগ হবার কারণ কি সে সেই কথাটি আমার কাছে জানতে চায়। শত ভাবে সেবা দৃষ্টিতে সে আমায় ঘিরে রাখত, এত স্নেহ দিয়ে সে আমায় আনন্দিত করবার চেষ্টা পেত যেন আর কোন কিছু আমার তার থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে না পারে। হায় সে আমায় সব তাতে সুখী করতে পারতো শুধু যদি আমার এই পাগলামো……এ ব্যথা আমার ক্রমেই বেড়ে চলেছে—এমন কিছু নেই যাতে আমার এ বাধন হতে পারে?

কোন কোন সময় আমি প্রাণ ফিরে পেতুম, তার আলিঙ্গন যেন আমার বেদনা মুছিয়ে দিয়েছে—রক্ষা পেলুম যেন—সন্দেহ যেন আর মনে নেই, আবার যেন আমি তাকে পূজো করতে যাচ্ছি—যেমন ধারা আগে করেছি।

আমার ঠোঁট দু'খানি তার হাতের উপর রেখে তার পানে প্রেম দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতুম, সেই চোখ দু'টি যেন আমার কোন কাল স্বপ্নের মাঝ থেকে টেনে তুলত, অন্তরে আমার স্বর বন্ধ হয়ে আসত, তাকে বলতুম—

"তুমি আমায় ভালবাস, তাই বল—সব হৃদয় দিয়ে আমি তোমায় যত ভালবাসি তুমিও আমায় তত ভালবাস—তাই বল, প্রাণ আবার বল আর কিছু না শুধু ওই কথাটি শুনতে চাই গো।"

আনন্দে তার চোখ ভরে আসত আগ্রহ ভরা কণ্ঠে সে উত্তর দিত—

"তুমি কি এ জান না? তুমি কি প্রতি মুহূর্ত্তে দেখতে পাওনা আমি তোমায় কত ভালবাসি। তুমি আমার সব অধিকার করে নিয়েছ—তোমারই জন্যে তোমার পাশে বেঁচে রয়েছি।" তার চুম্বনে আমার নূতন জীবন ফিরে কি একটা মাদকতা আনতো। যেন কত দেশ বিদেশ কত বিপদ ঘুরে এসে আবার সেই চিরপরিচিত ভালবাসার জনের স্নেহবক্ষে আশ্রয় পেয়েছি, সেই আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে মনে হোত যেন সব ভুলে কোন এক স্বর্গীয় সুখে অভিভূত হয়ে আছি—আনন্দের নেশায় যেন মরে যাচ্ছি

৯

ট্রেণ যেমন কুয়াসাচ্ছন্ন রাত্রিতে পথপ্রদর্শক আলোর বর্ণ পরিবর্ত্তন সঙ্কেত বুঝতে না পেরে লক্ষ্য-হারা হয়ে কর্কশ গর্জ্জনে হৃদয় ব্যথা জানিয়ে সুপ্ত-গ্রাম প্রান্তরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ছুটে চলে, তার গতি থেমে যায় তখন যখন একটা ভীষণ সংঘাতে

তার সব ভেসে চুরমার করে ভাঙ্গে, আমারও সেই অবস্থা হয়েছিল—আমি ছুটে চলেছি—কোন পথে চলেছি সে ভাববার ক্ষমতা নেই।

একদিন ইলা আমার বুক মাথা রেখে তার রেশমী কোমল এলায়িত কেশরাশি দিয়ে আমার সব দেহ আচ্ছন্ন করে আমার মুখের পানে একদৃষ্টিতে চেয়ে ছিল—কেমন একটা মোহে আচ্ছন্ন হয়ে আছি—আবার সেই আলা—ইলাকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলুম—"ইলা—কোন স্বামীর যদি স্ত্রীর উপর সন্দেহ হয় তো তার কি করা উচিত?"—

ইলা একটু বিস্মিত হোল—তার আবেগ যেন একটু ভাঙ্গলো—ইলা বল্লে "তার মরণই মঙ্গল।" "কার?"—ইলা আবার আমায় জড়িয়ে ধরে বল্লে—"স্ত্রীর—আর যদি ভালবাসা থাকে তো দু'জনারই" —সব ভুলে গেলুম—আবার মোহ আবার স্বপন—ইলাকে আরো বুকে টেনে নিলুম।

পাগল হয়ে যাব বলে আমার ভয় হচ্ছিল। কখনো ভাবতুম আমার বংশে তো পূর্ব্বে কারো মানসিক বিকৃতি ছিল না! এতদিনের এই অনাহত উচ্ছ্বসিত আনন্দের বেগ তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে এমন মধুর পরশ বাতে রাত্রিকে দিন করে দিয়েছিল—এতে তো আমার মাথায় কোন ব্যাপার হয়ে যায়নি! মনে হচ্ছে কেউ যেন আমায় বাধ্য করে রেখেছে, আমার নিজের ইচ্ছা শক্তি কিছু নেই, কোন এক অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে যেন চালিত হচ্ছি। এত শিক্ষা এত কল্পনা তার পর দু'প্রাণ এক হয়ে সুখ সাগরে ভাসবার সময় এ আমার হোল কি!

আমি মনের জ্বালায় ইলার সব পূর্ব্ব কথার সন্ধান নিতে লাগলুম। ইলার বিয়ের পূর্ব্বে তার যে কি ছিল সে এখন এদের কাজ ছেড়ে দিয়ে পুরীতেই আছে। সে মধ্যবয়সী সুন্দরী এখানেও কাদের সঙ্গে কি হয়ে এসেছে। তার চরিত্রের সুনাম ছিল না—সাধারণ বি শ্রেণী যেমন হয়ে থাকে এও তাদের দল ছাড়া নয়।

দু'তিন দিন এখানে সে ইলার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ইলার সঙ্গে তার খুব ভাব—ছোট বোনটির মতো সে ইলাকে ভালবাসে। আমার মনে হলো এই ঝিকে হাত করে ইলার রহস্যকথা সব বের করে নিতে হবে। গোপনে ঝির সঙ্গে দেখা করে সব কথা জানবার সুযোগ খুঁজতে লাগলুম। একদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সমুদ্র ধারে আমার অশান্ত হৃদয় নিয়ে সেই অশান্ত উচ্ছল সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় দেখি ঝি একটি ছোট মেয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—আমার দিকেই আসছে। লোকজন দূরে দূরে সমুদ্রের ধার দিয়ে চলেছে—কেউবা সূর্য্যের দিকে মুখ করে কেউবা পেছন ফিরে। আমি ভাবলুম কথাটা উত্থাপন করবার এই তো সময়। সে আমার কাছে এলে দু'একটা কথা হ'তে তাকে আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওই কথাটি জিজ্ঞাসা করলুম। সে অবাক হয়ে আমার কথা শুনলে—হাঁ কি না—কিছু উত্তর করলে না। তার পর যখন আমি তাকে কিছু অর্থ দেবার প্রস্তাব করলুম তখন সে রেগে ঘাড় নেড়ে বল্লে—

"কি বোকা মানুষ গা, এই সব কল্পনা মনে এনে ইলার মতো লক্ষ্মী দিদিমণির মনেও অসুখ ভায়! অনেক কাজ করেছি জীবনে যার জন্যে পরে যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করেছি, কিন্তু আজ আপনার মুখে যে কথা শুনলুম তাতে আপনার উপর আমার মতো লোকেরও দয়া হচ্ছে। রেখে দিন আপনার টাকা—কি আর বলবো আপনাকে!" সে আমার দিকে পেছন ফিরে কেমন একটা ভঙ্গী করে মেয়েটির হাত ধরে চলে গেল। তার ঐ আমায় যা তা ভাবা আমার মনে কেমন একটা শান্তির বাতাস বইয়ে দিলে।

একবার ইচ্ছা হচ্ছিল তাকে ডেকে ফেরাই—বলি এ সব কথা কিছু নয়—ঠাট্টা করছিলুম শুধু—আমার পত্নীকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, তার বড় অনুরক্ত—শুধু আমি সকলের মুখে তার প্রশংসা

শুনতে ভালবাসি, তাই এমন বাজে কথায় জিজ্ঞাসা —কিন্তু সে ততক্ষণ দৃষ্টির বাহিরে চলে গিয়েছিল। তখন আমার মনে হচ্ছিল যে কেমন ভাগ্যকর নীচ বনে' গেছি আমি। যা হোক মনে প্রতিজ্ঞা করলুম—এই শিক্ষা থেকে আমারই খুব লাভ হোল—এখন থেকে ইলার আমার কাছে যা প্রাপ্য বিশ্বাস আর ভালবাসা সে আমি তাকে খুব দেব—ভাবলুম আমি পেয়ে গেছি—সম্পূর্ণ পেয়ে গেছি।

তবু আবার আমার ঐ সব কুচিন্তার পেয়ে বসলো, সেই সন্দেহ। মনে হলো বিটা আমায় মিথ্যা বলে গেল—নারী জাতির ছলনার কথা বলেছি, তাই সে বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে—কেউ হয়তো ঝিকে আগেই সাবধান করে দিয়েছে তাই সে আমায় ঠাট্টা করে' গেল, দয়ার পাত্র বিবেচনা করে গেল এর থেকে মুক্ত হবার শক্তি আমার নেই।

১০

কেউ কিছু জানে না। খোঁজ নিয়ে যতদূর জানলুম, ইলার সম্বন্ধে তার ছেলেবেলার ছেলেমো ছাড়া কিশোর ও যৌবনাগমের সেই লাজভার রাঙা মূর্তিখানি ছাড়া আর কেউ কিছু জানে না। আমার কাছে কিন্তু সব বিপরীত লাগছে। এ হতেই পারে না—সে কুসুম কোমলা সরলা অনভিজ্ঞা বালিকা নয় —তার বাহুপাশে সে যে-ভাবে আমায় জড়িয়ে ধরেছিল, আমার প্রথম চুম্বনের প্রতিদান যেমন মধুর ভাবে দিয়েছিল—আমার সঙ্গ যার এত ভাল লেগেছিল—যে একটা বিস্ময় বা ব্যথার কথা বলে নি—আমার সঙ্গ পেয়ে সে যেন আর সব ভুলে গিয়েছিল—না না, হাজার বার না সে সতী—না।

কি নেশা আমায় পেয়ে বসেছে! এই মিথ্যায় ঘেরা সাজান আলিঙ্গন হতে আমার দূরে সরে যাবার ইচ্ছা হচ্ছে! যখন সে তন্ময় হয়ে যায় তখন তার চোখের জলের সঙ্গে কেন সে তার একটা পুরাণ দোষের কথা স্বীকার করে ফেলে না—মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় তো এ সে করতে পারে—সম্ভবতঃ আমি সাধা সাধনা করে, অথবা জোর করে আমার আশা ভরা হতাকারীর মতো ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সুমুখে ফেলে তার হৃদয়ের গোপন কথাটি বের করে নিতে পারি —সেই এক মুহূর্ত্তের পাপ প্রলুব্ধ যার জন্যে হয়তো সে নিজে মোটেই দোষী নয়—সে তার বলতে বাধা কি!

বুঝতে পাচ্ছিলুম না ক্লার সে ভাব দেখে আমি ব্যথিত হয়ে উঠব কি না—আমাদের দু'জনার মাঝে যে হাহাকার উঠবে তাতে আমারও চোখের জল ছাপিয়ে উঠবে কি না! তার পর ক্লারার হাত দু'খানি হয়তো উন্মুক্ত করে দিতে হবে—সে যাতে এই প্রসারিত বক্ষে এসে শান্তির আশ্রয় নিতে পারে।

কি করি আমি—কি করি! একি কাকেও ভাল বেসেছিল—প্রথম যে এর দেহ অধিকার করেছিল সে প্রথম ভালবাসার জনকে কি এ এখনো ভালবাসে? কে বলে দেবে আমায় কে সাহায্য করবে। কে এর নিশ্চিত প্রমাণ আমায় এনে দেবে—যে সত্যি ইলাকে সন্দেহ করে আমি একটা ঘাচ্ছেতাই বনে' যাচ্ছি—যাকে আমার চোখ মুখে পুজো করা উচিত—অথবা সেই দোষী সে মিছে সব ভাণ কচ্ছে তাকে আমার ঐ ধরণের নারীর মতো সব সম্বন্ধ ছিঁড়ে দূরে সরে পড়া উচিত কি না!

১১

কল্পনায় কেবল একটা শুভ্র কমনীয় মূর্ত্তি হৃদয়ে এঁকে রেখেছিলুম—কত সতী কত স্বর্গীয় সে। এতটা অজ্ঞতা এমন অঙ্গের লাজ মেশান ভাব তাতে —তাই ইলার আকাঙ্ক্ষা উজ্জ্বল ভাব—তার নির্ভীকতা তার আকাঙ্ক্ষা ভরা চুমো আমায় কেমন করে দিলে, একটা সন্দেহ এসে তিক্ততায় চিত্ত ভরে গেল। এও আমি জানতুম প্রায় সকল বালিকাই এই ভাবেই শিক্ষা পায় এ গৃহেও সমবয়সী সঙ্গিনীদের সঙ্গে মেশামেশিতেই হয়ে থাকে—প্রত্যক্ষ ভাবে প্রেমের স্বাদ না পেলেও।

ইলা তার সব হৃদয় দিয়ে আমায় ভালবাসে—সে আমায় এ কথা অনেকবার বলেছে। যখন আমি তাকে আমার বাহুপাশে জড়িয়ে ধরি—হৃদয়ে একটু শান্তি পাই—চোখে মুখে একটা সুখের আভা আসে তখন ইলা আরো ঢলে পড়ে—আত্মহারা হয়ে যায়—ঐ কথাই বলে। সে এও বোধ হয় বুঝতে পেরেছে যে তার সৌন্দর্য্য আর সঙ্গ যদিও আমার প্রিয় কিন্তু পুরুষকে তো আর শুধু এ দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না তাই সে সব রকমে বালিকার ভাবভঙ্গী ত্যাগ করে যাতে আমার মনোরঞ্জন করতে পারে সেই চেষ্টাই করছিল।

মাঝে মাঝে আমার এই বিমনা ভাব দেখে সে কত যে অশান্তি বোধ করিত—কিন্তু মুখের ভাবে তার চিত্তের অস্থিরতা কিছু বোঝা যেত না—সে আরো বেশী কোমলতায় আমায় জড়িয়ে এই আবরণ মুছে ফেলে দিতে চাইত—সে বোধ হয় ভেবেছিল তার একান্ত আকাঙ্ক্ষার প্রাণভরা ভালবাসায় কোন বাধা চুম্বার ভেতর থাকবে না।

আমি নিজেই নিজেরে তিরস্কার করছিলুম যেন আর তাকে শুধু তিরস্কার করবার ইচ্ছা না হয়—আমার এই সন্দেহ ব্যাপারটা আমি আগাগোড়া বুঝতে চেষ্টা করছিলুম—বুঝতে পারছিলুম আমার এ ভুল ধারণা তবু আমার ভুলের মধ্যেই পড়ছিলুম, আমার নিজের বোকামো—এই সন্দেহের অপমান আমায় পাগল করছিল, তবু তার হাত এড়াবার আমার সাধ্য ছিল না।

এ বিশ্বে কি এমন কেউ আছে—দীন দরিদ্র হতভাগ্য যে ভিখারী একমুষ্টি অন্নের অভাবে মরণের পারে এসে দাঁড়িয়েছে—অথবা ভালবাসার কবলে পড়েই যারা হাহুতাশ করছে তাদের মধ্যে কি আমার মতো হতভাগ্য কেউ আছে?

১২

সে দিন অমলদের সঙ্গে হঠাৎ সমুদ্রধারে দেখা। অমল, কিশোরী আরো ছটি দুই বন্ধু পুরী এসেছেন হাওয়া খেতে। কথায় কথায় বিলাতের কথা উঠতে অমল বলে "ভাবি একটা মজার Rape-এর খবর পড়লুম Time-এ—আঠার বছরের একটি সুন্দরী কেমন যেন রক্তহীন বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছিল, তার বাপ মা মেয়ের অসুখ দেখে তাকে বাড়ীর পাশেই একজন ডাক্তার ছিলেন তার কাছে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে কি একটা অসুখের নাম করে বল্লেন এর খুব যত্ন নেবার দরকার—পিতামাতাকে বলে দিলেন এক মাস রোজ মেয়েটিকে একবার করে তার কাছে আনতে হবে—তাহলে অসুখ ভাল হতে পারে। বাপ মার অবস্থা এমন ছিল না যাতে একজন ধাত্রী রেখে মেয়ের শুশ্রূষা করিতে পারেন—বিশেষতঃ দুজনেরই কাজ করে' সংসার চালাতে হয়। তাই তারা ডাক্তারের দয়ায় কোন সন্দেহ না করে রোজ মেয়েকে নিয়ে ডাক্তার দেখাতে যেতেন। ডাক্তার রোজ মেয়েটিকে দেখেন—এই ভাবে দেখার পর মেয়েটি একটু সুস্থ হোল। কিন্তু আবার দু'তিন মাস পরেই তার যেন সব সময় কেমন গা বমি বমি করে—কেমন যেন একটা ভার বোধ হয়,—বাপ মা তো আবার কন্যার অসুখ দেখে চিন্তায় পড়ে গেলেন। কিন্তু সে ডাক্তারের কাছে যেতেও আর মন চাচ্ছিল না—কারণ তার পূর্ব্বের দর্শনীই কিছু দেয়া হয় নি—গেলে যদি কিছু দাবী করে বসেন—আর কত অনুগ্রহই বা চাওয়া যায় তার কাছে—তাই অন্য একজন বড় ডাক্তারকে ডেকে দেখালেন—'তিনি অবস্থা দেখে পরীক্ষা করে বল্লেন 'এ যে গর্ভবতী।' গর্ভবতী! তার মানে! কেমন করে হোল! বাপ মা দরিদ্র হলেও তাদের সম্মান জ্ঞান ছিল, তাই মেয়ের সেই মর্য্যাদা হারানোতে তারা মেয়েকে যা তা বলতে লাগলেন—মেয়েটি মা বাপের পা ধরে কত করে তার নির্দ্দোষিতার কথা বল্লে—ঘৃণায় সে তার চুল ছিঁড়তে লাগল,—এ সম্পূর্ণ অসম্ভব কথা। জ্ঞান সত্ত্বে কেউ কোন দিন তাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করেনি।—এ ডাক্তারের ভুল

—বাপ মা শুনে ঘৃণায় মেয়েকে কিরে শুধু বল্লেন "নাম বল্ হতভাগী।" অবশেষে মেয়েটি দিন দিন তার অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠলো—সে কক্ষের অন্ধকার কোণে নিজেকে লুকিয়ে রাখত—মা বাপের তিরস্কারে শুধু নিজের কপালে আঘাত করত। সে গত ক' মাসের মধ্যে প্রতিটি মুহূর্ত্ত স্মরণ করে দেখতে লাগল, কোথায় তার স্মৃতিশক্তি লোপ পেল কোথায় এমন কাজ হোল। অবশেষে সে বুঝল কে দোষী। হতাশ হয়ে একখানা কাগজ লিখল—

"বাবা, মা, আমি শপথ করে বলছি আমি কিছুতে দোষী নই। বুড়ো ডাক্তার এমন ব্যবহার দেখাতেন যে প্রায়ই আমার ডাক্তার খানা হতে দৌড়ে বেরিয়ে আসবার ইচ্ছা হোত—একদিন সে আমার অজ্ঞান করেছিল———"

আরটুকু সম্পূর্ণ করবার সাহস অভাগীর ছিল না—এই লিখে সে জলে ডুবে আত্মহত্যা করে—চিঠি দেখে বালিকার বাপ মা ডাক্তারের নামে কোর্টে নালিশ করে—অবশেষে সব কথা বের হয়!"

কথাটা শুনে এসে ইলাকে আমি সব বল্লুম—ইলা মুখে এমন একটা বিরক্তির ভাব আনলে যে এমন মুখের ঘৃণাভাব তার আর কখনো আমি দেখি নি,—তার পর নাসা কুঞ্চিত করে কঠোর স্বরে বল্লে "এমন লোকের ফাঁসী কাঠে ঝোলা উচিত।" ইলাও কি এমন কিছু ভোগ করেছে না কি!

(১৩)

কিন্তু কি বলব ইলাকে—তার এই উচ্ছ্বসিত বাল্যহাস্য, বালিকার মতো এমন শুভ্র হৃদয়—এত সৌন্দর্য্য এত ভালবাসা—ভালবাসার জনকে পেয়ে এমন আপনহারা সব বিলিয়ে দেওয়া—তার দু'প্রাণ এক করা এমন মোহভরা আলিঙ্গন! হয়তো বড় শুভ্র বড় সুন্দর বড় মধুর হৃদয় তার—নয়তো সে রাক্ষসী—হাসির অন্তরালে একটা গ্লানিভরা হৃদয় তার রয়েছে—হলনায় তার কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ হতে পায়ের পাতাটি পর্য্যন্ত অভ্রান্ত। এ ছলনায় এতটুকু শিহরণ নেই এতটুকু চমকে ওঠা নেই—এমন একটা লজ্জা তার হৃদয়ে চেপে রাখলে তো আভাসেও বোঝা যেত। আমার সতর্ক চক্ষু যে নিশিদিন সেই গোপন কথাটি বের করবার জন্য তার উপর রয়েছে। ওই প্রেমের ছলনায় তো সে অত শুকোবার নয়—সে তো দিনে দিনে বেড়ে যাবারই কথা।

এমন হলে মাঝে মাঝে হয়তো তাকে কাঁদতে দেখতুম, তার অসীম চিন্তারাশির মাঝে আমি কথা বলে হয়তো সে এগিয়ে যেত, বাইরের বা ঘরের আমাদের কোন ব্যাপারেই হয়তো তীব্র প্রাণের আগ্রহ কিছু দেখতে পেতুম না। এ চুম্বন তা হলে তার কাছে আগুনের পরশ বোধ হত, এতে তার চাহনিতে আমায় সব দেবার ভাব পেতুম না—একটা বিদ্রোহের ভাবই দেখতুম।

ভালবাসতে ভালবাসা পেতেই যেন ইলার জন্ম। না ছিল তার কোন চিন্তা ভাবনা—শুধু হাসি শুধু বালিকার উচ্ছ্বাস চাপল্য। সব বেশ; সব ভাবেই তাকে এমন মানাত যেন এ সব নারীর জন্ম শুধু পুরুষকে হাঁটু গেড়ে তাদের সুমুখে বসিয়ে রাখতে।

এমনি নারীই আমার জীবন সঙ্গিনী হবে ভেবেছিলুম—সত্যি জীবনে আমার সেই কল্পনা রাণীকে পেয়ে—এ আমার কি হোল! এই সদা আনন্দ ভাব আমায় শুধু আলায়—একটা অসহ্য গর্ব্ব বলে মনে হয়। ওই অধর যা সে আমার অধরে রেখেই খুসী যার সমস্ত রস আমায় সে নিঃশেষে পান করাতে চায়—সে সুধা নয় শুধু গরল—সে নিশ্বাসে শুধু মিছে কথা শুধু ছলনা।

যদি বিয়ের আগে আর কারো ভালবাসা সে পেয়ে থাকে—সে কি কচ্ছে কি হবে। এতো কিছু জানে নি শুধু প্রবৃত্তিতে যদি আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে থাকে—এখন সে আমার পত্নী, আমার আশ্রয় ছায়ায় আছে—ভুল থেকে নিজেরে ভুলে নিয়েছে সে

কিতে গেছে – সে এখন বোধ হয় মনে ভাবে আমি কিছু বুঝতে পারি নি!

কি যে আমার হৃদয় ব্যথা এর থেকে কি আমার মুক্তি নেই সে রাত্রি ক্রমেই বেশী আঁধার হয়ে চলেছে পাগল করে দিলে আমায়। ইলার আর আমার মাঝে কি একটা অভেদ্য ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। সেযে কি তার প্রেম আমায় রক্ষা করতে পারবে না – এত ভালবাসে সে আমায় সে আমার হৃদয়ের দেবী লক্ষ্মী আবার কি আমার জীবনে সে সেহ বাতাস আনতে পারবে না—আবার কি তার সামনে বসে তার পানে তেমনি বিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে আমি চাইতে পারব না? করুণাময়ী অতীতের সেই স্নেহ সেই বিশ্বাস সেই হৃদয় ফিরিয়ে আন—আমায় বাঁচাও—উদ্ধার কর।

(১৪)

শোবার ঘরের দিকে আমি তাকাতে পারতুম না। ভয় হতো, অশান্তি বোধ করতুম। আমার মনে হোত ইলার এ অভিমান যেন সেখান - আশা হোত মুহূর্তের অসাবধানতায় সে হয় তো কোন দিন সেই গোপন কথাটি প্রকাশ করে ফেলবে—কারো নাম বলে ফেলবে—সে নাম হয়তো আমার নয়। তাই আমি সব সময় জেগে কান সতর্ক রাখতুম; এই আমার হয়তো ঘুমের ঘোরেও কথাটা কোন দিন বের হয়ে পড়তে পারে—কেমন একটা উত্তেজনায় আমার সমস্ত স্নায়ু কেঁপে উঠতো মাথা ভোঁ ভোঁ করতে থাকতো।

কিন্তু তার দিকে যখন ফিরে চেয়ে দেখতুম কেমন ছোট্ট বালিকার মত খেলে খেলে ক্লান্ত হয়ে সে ঘুমোচ্ছে তার ঠোঁট দু'খানি খোলা—কেশরাশি বিস্রস্ত—তবে সেই ঘুমন্ত সরলতার দিকে চেয়ে আমার হিংসা, উন্মাদনা, ঘৃণা সব নিয়ে কেমন একটা ভাব হোত - হৃদয় আমার কোমল হয়ে আসত, এমন দেবীর সম্বন্ধে আমার এই ঘৃণিত ধারণা! মনে আমার সমস্ত শরীর ভিজে যেত, চোখের জলে বক্ষ ভেসে যেত—আমি উঠে পড়তুম যেন আমার কান্নার শব্দে তার বিশ্রামের ব্যাঘাত না হয়—ঘুম যেন না ভাঙে।

এমন তো দিন যেতে পারে না—তাই একদিন তাকে আমি বলুম আমি যেন বড় অবসন্ন বোধ করছি—কেমন অসুস্থ বোধ করছি তাই আলাদা কক্ষে ঘুমোনই আমার পক্ষে ভাল। সে যেন আমার কথা বিশ্বাস করলে – শুধু বল্লে –

"তোমার যা খুসী তুমি যা ভাল বোঝ প্রিয়তম।" হঠাৎ তার নীল চোখ দুটি কত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলো —কত বেদনা ভরা সে দৃষ্টি আমি মাথা ঘুরিয়ে নিলুম—ও দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছিলুম না।

(১৫)

দেশে ফিরে এলুম। সর্ব্ব-বেদনা-হর সাগর আমার অন্তরজ্বালা নিবারণ করতে পারল না। কার কাছে জিজ্ঞাসা করব। যার সঙ্গে আমার দেখা হয়, কথা হয় সেই আমায় বলে আমার মতো সুখী কে! সৌভাগ্য লক্ষ্মীকে আমি আমার অচলা লক্ষ্মী করেছি—জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ আনন্দময়ীকে জীবন সঙ্গিনী পেয়েছি। আমিই কি শুধু, যাকে আমার প্রাণ দিয়ে ভালবাসা বিশ্বাস করা উচিত সেই ইলাকে সন্দেহ করছি? আমার একমাত্র সুখ সাধনা, জীবনের শ্রেষ্ঠ আশা আকাঙ্ক্ষা সেই ছিল যে তাকে যে আমি পাগল হয়ে ভালবেসেছিলুম। ভগবান কি পথে চলেছি আমি। তার আলিঙ্গনে আমার সব ভুলিয়ে দাও—তার স্নেহভরা দৃষ্টি দিয়ে আমার জ্বালাভরা বেদনা অন্তর হতে মুছিয়ে দাও। তার সৌন্দর্য্যে তার প্রেমে তার চুম্বনে আমায় বিশ্বাস করবার ক্ষমতা দাও—তাকে পূজো করবার বল দাও।

(১৬)

সে দিন দু'তিনজন বন্ধুর সাথে এক গণকের কাছে হাত দেখাতে গিয়েছিলুম। তিনি আমার জন্মপত্রিকাখানি দেখে – হাতের রেখা বিচার করে

বল্লেন "তোমার জীবন-রেখা সুন্দর উজ্জ্বল—আট বছর পর্যান্ত তোমার পরমায়ু। কিন্তু দেখো স্বাধীন ভাবে যথেচ্ছাচারে নষ্ট করে ফেলো না বেশী ভাব-প্রবণতা ও মনের চাঞ্চল্য হ'তে খুব সাবধানে থেকো। তোমার প্রথম পূর্ণ যৌবনের সময় একটা রেখা কাঁচা দেখছি—সেই কাঁচা জায়গাটা সেই স্থানটিই কেমন কেমন—তোমার হৃদয় রেখা ভাল না……"

আমি হাতখানি সরিয়ে নিলুম—মুখে হেসে উঠলুম, সব সত্যি সে হৃদয়-রেখার কাঁকা জায়গার দিকে আমারি তাকাবার ক্ষমতা হচ্ছিল না, হৃদয় ভার। মানে পাগল হওয়া।

প্রাণের ইলা আমার জীবনরাণী ইলা—আমি পাগল।

(১৭)

বৈশাখের অপরাহ্ণ—অসহ্য গরম—একটু বাতাস নেই, ইলার ইচ্ছা একটু গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসে। বেরিয়ে পড়লুম, ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল, প্রতি পাতার মর্ম্মর-ধ্বনিতে একটা সোহাগের মধু আবেশ দিয়ে যাচ্ছিল। বাতাসের কোমলতায় যেন শুধু প্রিয়জনের মুখখানিই মনে হয় এমন দিনে। দু'জনেই নীরব, গাড়ির ঝাঁকুনিতে ঘোড় ফেরবার সময় প্রায়ই আমাদের গা পায় সঙ্গে লাগছিল। কেমন একটা যাদুমন্ত্রে আকৃষ্ট হ'য়ে ইলার দিকে ফিরে চাইলুম—দেখি তার চোখ দুটি জলে ভরা কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে—তার পানে চেয়ে আমার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠ্‌লো—সে যেন আর এ সহ্য করতে পারছিল না। হঠাৎ তার হাত দু'খানি আমার কণ্ঠলগ্ন হোল, তার ঠোঁট দু'খানি আমার প্রায় পরশ করে বল্লে—

"তুমি আর আমায় ভালবাস না কেন? আমার এত অসুখ দিয়ে কি লাভ তোমার—কি দোষ আমার বল প্রিয়তম?"

এই তো তাকে হাতে পেয়েছি। এমনি চন্দ্রালোকিত রজনীতে এমনি মাদকতায় নীরব সমস্ত তরী শিথিল হয়ে আসে—তার ইচ্ছাশক্তির উপর কোন হাত থাকে না—হৃদয় যে খুলে যায়—আমি ভাবলুম যে তার গোপন কথা সে প্রকাশ করতে যাচ্ছে তাই মুখ একটু সরিয়ে বল্লুম—

"তুমি কি জান না ইলা—তুমি কি বুঝতে পেরেছিলে না—দু'দিনে হোক দশদিনে হোক তুমি আমার কাছ থেকে যে কথা গোপন করবার চেষ্টা কচ্ছ সে আমি বের করে নিতে পারব?"

সে ভয় পেয়ে উঠে বস্‌লো—যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়লো—এমনি ভাবে বল্লে—

"কি আমি তোমার কাছ থেকে গোপন করবার চেষ্টা করেছি?"

অনেক বলে ফেলেছি—শেষ পর্য্যন্ত বলতেই হবে। তাই গাড়ির ঘর্ঘর শব্দের মধ্যে কর্কশকণ্ঠে বল্লুম

"তোমার কাছ থেকে যে আমি ক্রমেই দূরে সরছি—একি তোমারই দোষ নয় ইলা—এতে যে কেবল আমি অসুখী হচ্ছি তাই নয়—এত ভাল-বাসতুম, এত বিশ্বাস করতুম আমায় তুমি ঠকালে বিশ্বাস ভাঙ্গালে—" ইলা আমারই হাত দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করে চোখ দুটো বড় বড় করে তাকালে। মুখখানা তার একেবারে সাদা—আমি ভাবলুম মূর্চ্ছা যাবে নাকি! কেমন একটা স্বরে বলতে—

"থাম থাম গো. তোমার কথায় আমার ভয় হচ্ছে, এমন ভয় হচ্ছে মনে হচ্ছে তুমি পাগল—কথাটা শুনে আমি কেঁপে উঠলুম, যেন আঁধারে গাছ গুলোর ভেতর থেকে অদৃশ্য কিছু এসে আমার অদৃষ্ট নির্ণয় করে দিয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছা হোল গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ি—গঙ্গার অতল পরশ কি যেন সঙ্কেতে আমায় ডাকছিল—ঘুম-ঘুম—সেই অতল চক্ষে ঘুম—!

ইলা কোচোয়ানকে ডেকে বল্লে,—"ইমাম কুঠিতে চলো—জলদি হাঁকাও।"

আর একটা কথা হোল না পথে। ইলা সমস্তটা পথ কাঁদতে কাঁদতে চল্‌ল, পাছে আমি শুনতে না পাই সে জন্য মুখখানা চেপে ধরেছিল। আমি বুঝলুম—সব শেষ আমাদের ভালবাসা আমিই নষ্ট করলুম……

(১৮)

হাঁ শেষ হয়ে গেছে—বোকার মতো সব শেষ করেছি—তার সঙ্গে একটা বোঝা পড়া হলো না—তার সেই মিছে ভাব ছলনার একটা উত্তরও পেলুম না; সে আমায় শেষ কথা বলতে দিলে না—তার কম্পিত হাতখানি তুলে সে আমার কথা বন্ধ করে দিলে। কি বোকা বনে গেছি—কেন আমি তো কথাবার্ত্তার মধ্যে কোন উন্মাদের অসম্বন্ধ কাজ কিছু করি নি—ঠিক তো প্রকৃতিস্থ আছি—আমার গলার আওয়াজে আমার চোখে সে কি দেখলে যাতে আমায় পাগল ঠাওরালে? কি হোল সে যদি ভুল না করে থাকে—আমি কি বলছি কি করছি সে যদি আমার সত্যি জ্ঞান না থাকে—যদি যদি সে যা বলেছে তাই যদি আমার হয়!

আমার বোধ হচ্ছে একখানা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি আমার সব দেখতে পাচ্ছি—কি হিংসা কি জ্বালা কে যেন আমার সমস্ত স্নায়ুগুলোকে পেষণ করে একবার বড় করুণ সুর বের করছে একবার বড় গভীর আর্ত্তনাদ—একবার শত ঘামাচা সমুদয়ে যাচ্ছে আবার নীরব শ্মশানের মতো স্তব্ধ।

শুধু একটা স্মৃতি একটা কথা সব সময় আমার কানে ইলার কথা শুনিয়ে দিয়ে যাচ্ছে তার অতীতের সমস্ত ইতিহাস—সেই গভীর আনন্দ—অনন্ত নিরাশার রজনীর কথা!

(১৯)

সে আমায় নিশ্চয়ই ঘৃণা করে—একটা বিদায় কথা না বলে একবার তাকে শেষ দেখা না দিয়ে একটা লাইন না লিখে আমি বাড়ী ছেড়ে চলে গেলুম। সে আমায় মরার পাত্রও মনে করতে পারে, ঘৃণার পাত্রও মনে করতে পারে কিন্তু সে নিশ্চয়ই আর আমায় ভালবাসে না। আমি নিজেই সে প্রেম ভস্ম করেছি—যার জন্য আমি আমার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলুম। সে যুবতী সুন্দরী—সে হয়তো তার এই দু'দিনের স্মৃতি ভুলে যেতে পারবে। আমি আমি কোথায় কোন্ অন্ধকূপে আমার এ বিষাদ-ভরা জীবন শেষ হবে কে জানে! কার সঙ্গে ইলা আবার হেসে কথা কইবে—কাকে সে আপন ভুলে সব বিলিয়ে দেবে!

না না—ইলা আমার শুধু আমারই। সে আমার সম্পত্তি, আমার সুখ, আমার স্মৃতি। আমি তাকে পুজো করি—আমি তার সব নিজের করে নিতে চাই—যদি সে দোষীও হয়ে থাকে—আর তাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ছাড়বো না—তার বুকে মুখ লুকিয়ে থাকবো—তার পায় বক্ষ লুটাব—তার কাছে ক্ষমা চাইব—তার প্রেম তার চুমো আমি চাই।

আজ রাত্রে তার কাছে আমি যাব—আমাদের কক্ষে আমাদের বিছানায় শোব—তার সে কুঞ্চিত কেশে ঢাকা মুখখানির সঙ্গে মুখ মিশিয়ে থাকবো—চুমোতে সব বেদনা মুছিয়ে দেব—সে আর আমায় পাগল ভাববে না। যদি সে আমায় না বোঝে—আমায় প্রেম না চায়, তবে—তবে, তাকে আমি খুন করবো স্থির করেছি। তাকে আমি আমার ছুরিখানা দিয়ে খুন করবো সে খানা দার্জ্জিলিং আসবার সময় আমরা দু'জনে পছন্দ করে কিনেছিলুম; তার অঙ্গের কোন্‌খানটায় ছুরি বসাবো সেও স্থির করেছি। তার গ্রীবায়—এ'চার শুভ্র রেশমী কেশ তার সেথায় পড়েছে—আমার ছুরির ফলকের মত সে জায়গা শুভ্র। একদিন ঐ গ্রীবা আমায় এত মোহিত করেছিল—সে অতীতের স্মৃতি—অতীত স্মৃতি!

(২০)

হাঁ, হত্যা যেন করলুম—তারপর। বিচারকেরা

কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে বলবে আমি পাগল, ডাক্তারেরাও পরীক্ষা করে কোন পাগলা গারদের ব্যবস্থাই দেবে।—আমি এখনো জোয়ান আছি, আমার শক্তি আছে—কত বছর - কত বছর, সেই কারাকক্ষে তার লজ্জা, মিছে কথা, ছলনা আমার কণ্ঠলগ্ন হয়ে থাকবে, সেই স্মৃতি কত না যাতনা দেবে আমায়!

ঘরণের পাশে দৌড়ে চলেছি আমি—ঠিক আছে—আমার মাথা ঠিক আছে স্থিরচিত্তে আমি এ সব লিখছি। সামনের প্রতিটি মুহূর্ত আমার গণা, আমি বুঝতে পাচ্ছি তারপর আমার মাথায় আর কিছু থাকবে না·····শুধু আগুন···।

একটু আগে ইলা কাছে থাকলে তাকে আমি নিশ্চয়ই খুন করতুম; কার যেন অদৃশ্য হাত আমায় তার পানে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল, দৈববাণীর মত কি যেন তাকে খুন করবার জন্ত আমায় উত্তেজিত করছিল এই অসুখে আবার তেমনি কি দেখছি—কি হোল আমার!

তাই হোক—তাই হোক—এ সহস্রবার ভাল। আবার সেই অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিত, এই অবস্থাতেই সরে' পড়বার জন্ত—বিশ্বের সব চেয়ে ঘৃণিত কাজ করবার আগে কে যেন আমায় সরে' পড়তে বলছে!

আমার বেদনা আর দৈন্তের এই কাহিনী একদিন হয় তো ইলার হাতে পড়বে, সে কি শেষ পর্য্যন্ত এ পড়বে! একটু দুঃখ করবে, একটু আমায় ভাববে—একবার কি আমার কথা মনে করবে?

কয়েদীর কথা

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

(বড় গল্প).

(শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ)

(২৫)

পরদিন কয়েদী আসিলেই বলিলাম "আজই আপনার গল্প শেষ করুন।"

কয়েদী বলিল "আর ভাল লাগিতেছে না?"

আমি বলিলাম "তাহা নয়, ভয় হয় কখন খেয়ালের বশে গল্প বলা বন্ধ হইয়া যাইবে।"

কয়েদী বলিল "আজ তোমার আনন্দে বাধা দিব কেন?"

আমি বলিলাম "তবে আরম্ভ হোক।"

কয়েদী বলিতে লাগিল :—

আমার চিন্তা গভীর হইয়া উঠিল। মাঝে মাঝে সুকৃতিকে দেখিতে পাইতাম; তাহার সহিত মেলামেশা কিছু কম হইয়া পড়িয়াছিল। দেখিতাম তাহার মুখ পূর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীর, অম্লান সৌন্দর্য্যের আধারভূত দেহখানি ঈষৎ কৃশ হইয়া পড়িয়াছে, সেই জন্ত পূর্ব্বের লাবণ্য উজ্জ্বল—কে তাহা বাঁধিয়া রাখিবে!

তাহাকে দেখিলে আমার বুদ্ধির আলোক নিষ্প্রভ হইয়া আসিত; কখন কখন যদি সে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইত, আমি স্তম্ভিত হইয়া থাকিতাম—সেই অপার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের প্রতিমার কাছে আমার মস্তক অবনত হইয়া পড়িত, কথা কহিতে পারিতাম না।

তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা যখনই কমিল তখনই

বুঝিলাম পরের বাড়ী বসবাস করিতেছি। কেন ইহাদের খরচ বাড়াইয়া তুলি। একা আসিয়াছি, একা কাজ করিতেছি, একাই যাইতে হইবে। হঠাৎ মনে হইল আমি নিঃসহায় ; এ ইহাদের ছাড়িতে হয়, কোথায় দাঁড়াইব।

চিত্ত যখন অস্থির, তখনই ইন্দ্রিয়গুলি ভোগ্য বস্তুর জন্য ছুটাছুটি করিতে থাকে। যতই চিন্তাক্লিষ্ট হইতে লাগিলাম ততই সুকৃতিকে পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা বাড়িতে লাগিল। হায় তাহার কর্ত্তব্য, কেমন করিয়া নির্দ্ধারণ করিব, নিজের কর্ত্তব্য যে এখনও স্থির করিতে পারিলাম না।

একদিন মামা কলিকাতায় যাইতেছেন শুনিয়া বলিয়া ফেলিলাম "মামা, আমি তোমার সঙ্গে দিনকতক কলিকাতায় বেড়াইতে যাইব।"

মামা সম্মত হইলেন। আমিও ভাবিলাম—এ স্থান এই চিত্তচাঞ্চল্যের সময় ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

ছেলেবেলায় কিছু দিন কলিকাতায় পড়িয়াছিলাম। কাকা তখন মেসে থাকিয়া কলিকাতার একটি আফিসে চাকরী করেন। সেই সহরটির চিত্রখানি তখনও স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া যায় নাই। আমি সহরটি দেখিয়া কিছুদিনের জন্য অন্যমনস্ক থাকিতে ইচ্ছা করিলাম।

প্রস্থানের সময় মনে হইল আমার খরচের ভার কে গ্রহণ করিবে। মামাকে বলিলাম "মামা, তোমার মেসে আমাকে দিনকতক স্থান দিবে ?"

মামা বলিলেন "চল না বাবু আমি তোমার একটা seat দেখিয়া দিব।"

কাপড়জামা পরিলাম। মার কাছে বিদায় ভিক্ষা করিলাম, একবার ভাবিতে চেষ্টা করিলাম তিনি আমার পর। কিন্তু স্ত্রীজাতি পরকে আপনার করিবার জন্যই জন্মিয়াছে, আমার ভাবনা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না।

ষ্টেশনে যাইব বলিয়া বাহিরে আসিলাম। বাহিরে গোযান সজ্জিত ছিল। গাড়োয়ানকে জিনিসপত্র লইয়া অগ্রসর হইতে বলিয়া আমরা পদব্রজেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় হঠাৎ একজন কি সম্মুখে আসিয়া বলিল "বাবা, তোমাকে একবার ফিরিতে হইবে, দিদি একবার ডাকিতেছে।"

মামা চটিয়া উঠিলেন, বলিলেন "দিদির এমন ভাবে পিছু ডাকা কখনই উচিত নয়। তাকে বলগে বাবাজী কিছুতেই যাইতে পারে না।"

এই কথার পরেই আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "কি গো যাইবে না কি ?"

আমি বলিলাম "হাঁ মামা, যাইতে হইবে।"

মামা বলিলেন "তুমি তোমার ব্যাগটা লইয়া যাও —তোমার যাওয়া হইবে না, কেননা তোমার জন্য অপেক্ষা করিতে হইলে গাড়ী ধরিতে পারিব না।"

আমি বলিলাম "ব্যাগ গাড়ীতেই থাক্, আমি পথেই তোমাকে ধরিব, তাহা না পারি ব্যাগটা লইয়া যাইও, আমি কাল তোমার মেসে উঠিব।"

দ্রুতপদে গৃহে ফিরিলাম। সুকৃতি কয়দিন আমার সহিত একবারও প্রথমে কথা কয় নাই, আজ হঠাৎ ফিরে দিয়া আমাকে এ সময়ে এমন ভাবে ডাকিল কেন ? তাড়াতাড়ি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম—সম্মুখেই সুকৃতি দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে দেখিয়া সে ধীরে ধীরে একটি নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করিল, আমি তাহার অনুসরণ করিতে বাধ্য হইলাম। সুকৃতি বলিল "কলিকাতায় যাইতেছ, কিছু খরচ লইয়া যাও। এই জন্যই তাড়াতাড়ি ডাকাইয়াছি।"

আমি হাঁ করিতে পারিলাম, সুকৃতি দশখানি দশ টাকার নোট আমাকে দান করিল। আমি শুধু একবার বলিলাম "এত টাকা কি দরকার হইবে ?"

সুকৃতি কথার উত্তর দিল না। বুঝিলাম সে পল্লী।

সুকৃতি জিজ্ঞাসা করিল "ফিরিবে কবে ?"

আমি বলিলাম "বোধ হয় শীঘ্রই ফিরিব।"

আর বেশী কথা হইল না। আমি নিঃশব্দে বহির্গত হইলাম। তারপর খুব তাড়াতাড়ি চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিছুদূর গিয়াই দেখিলাম মামা আমার জন্য গাড়ীটা থামাইয়া রাখিয়াছেন। তিনি যে বিশেষ সভ্য সে কথা আমি বিশ্বাস করি। বাহিরের চাকচিক্য তাঁহার মধ্যে আছে; তাঁহার ইংরাজী ভাষায় জ্ঞান অসাধারণ, বক্তৃতা করিতে পারেন, মাঝে মাঝে সখ করিয়া মাতৃভাষায় এক একটা কবিতা লেখেন, সদাই ফিটফাট—শুনিয়াছি কলিকাতায় তাঁহার আদর সম্মানও আছে। কিন্তু তাঁহার আরও গায় নাই। তখনও তিনি প্রয়োজন অনুসারে কাজ করেন। ধর্ম্মের বড় একটা ধার ধারেন না, যদি ধারিতেন তাহা হইলে ভগ্নীর অস্থাবর সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিতেন না।

বহুদিন পরে কলের গাড়ীতে চড়িলাম। গাড়ী ছুটিতে লাগিল, দিক্ ভ্রম মাঠগুলি সুদূর দিগন্তে মিশিয়া গিয়াছে। মাঘের শেষে আলোকে বাতাসে বৃক্ষলতায় আগমন গান ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির আনন্দে যেন কোন বাধা নাই। কিন্তু যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই কৃত্রিমতার ছবি স্পষ্টতর হইতে লাগিল। চারিদিকে কোথাও লৌহবর্ত্ম, কোথাও ইমারত, কোথাও কল-কারখানা। ক্রমশঃ সহরে আসিয়া পড়িলাম। মামা একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিতে চাহিলেন, কিন্তু গাড়োয়ান যে ভাড়া চাহিল তাহাতে রাজী হইলেন না। অগত্যা চলিতে হইল।

সন্ধ্যার পোলের উপর দিয়া চলিয়াছি। পাশ দিয়া গরু ও মহিষের গাড়ীর শ্রেণী চলিয়াছে। দেখিলাম—একখানা গাড়ীতে কিসের বস্তা সাজানো রহিয়াছে, উপরে ভীমাকৃতি একজন গাড়োয়ান মহিষ দুটাকে কশাঘাত করিতেছে। মামা নিকটে ছিলেন, হঠাৎ চাবুকটা তাঁহার গায়ে লাগিল। তিনি যন্ত্রণায় ও ক্রোধে হাতের যষ্টি উত্তোলন করিয়া গাড়ীটার দিকে অগ্রসর হইলেন—কিন্তু যমদূতের মত গাড়োয়ানের দিকে চাহিয়া বেশী কথা বলিতে পারিলেন না। অবনতমুখে নির্ব্বাক হইয়া তাঁহাকে কিছুদূর অগ্রসর হইতে হইল। আমি মনে মনে হাসিলাম, ভাবিলাম মামার কোন কাণ্ড-জ্ঞান নাই, রাগ আছে, তবও আছে, অহঙ্কারও খুব, কেননা কেহ তুলিয়া তাঁহাকে আঘাত করিলে তিনি আপনাকে অবমানিত মনে করেন—ক্ষমা করিবার শক্তি তাঁহার অতি অল্প।

যাই হোক্, পোল পার হইয়া দুই জনে ট্রামে উঠিলাম। কন্‌ডক্টর বলিল, কোথাকার টিকিট চাই। মামা বলিলেন কলেজ ষ্ট্রীটের। কন্‌ডক্টর প্রথমে দুই জনের টিকিটের দাম বারটা পয়সা গ্রহণ করিয়াছিল, এখন মামার হাতে চারি পয়সা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল—টিকিট দিল না। বুঝিলাম লোকটা টিকিট না দিয়া আট পয়সা গ্রহণ করিতে চায়, বার পয়সাই সে গ্রহণ করিত, কিন্তু মামা পাছে তাহার অপরাধ প্রকাশ করিয়া ফেলে এই ভয়ে তাহাকে চারি পয়সা ঘুষ দিয়াছে। দেখিলাম মামা চারিটি পয়সা পকেটে ফেলিয়া বেশ অন্যমনস্কের মত বসিয়া রহিলেন, আমি বলিলাম "মামা, এ কাজটা কি অন্যায় হইল না?"

মামা বলিলেন "অন্যায় আর কি? গরীবের দু'পয়সা হয় হোক না।"

আমি বলিলাম "পরের ধন আপনি দান করেন কোন্ হিসাবে?"

মামা বলিলেন "না আমি দান করি নাই। গরীব লোক, দু'পয়সা নিক্ না, ট্রামওয়ে কোম্পানী সবই বড় লোক, এ বেচারা যে বড় গরীব।"

আমি বলিলাম "গরীব হয়, দান করুন, কিন্তু পরকে ঠকান্ কেন?"

মামা বলিলেন "ওরে বাবু, কন্‌ডক্টর দেশী লোক আর ট্রামওয়ে কোম্পানী বিদেশী।"

দেখিলাম—মামার অন্তরে দয়া আছে, দেশ-

ভক্তিও, আছে আবার পরকে প্রতারণা করিবার প্রবৃত্তিও মন্দ নয়। তাঁহার চাল আছে, ছলনা আছে, চতুরতা আছে। বাহির হইতে তাঁহার অন্তরের একটুও আভাস পাওয়া যায় না। কেবল পরভাব গ্রহণ করিতে গিয়া তিনি আপনার মনোভাব কি তাহাও ভুলিয়া গিয়াছেন। বলিলাম "মামা, বিদেশীকে না ঠকাইলে কি দেশভক্ত হওয়া যায় না; প্রবঞ্চনা কি মনুষ্যত্বের বিরোধী নয়?"

মামা বলিলেন, "বাবাজী, অত সরল হইলে আজ কাল চলা যায় না। আর ওটা ঠিক সরলতা নয়, ওটা বোকামী।"

আমি বলিলাম "আপনি দেশ-কাল বুঝিয়া যতটা চলেন ন্যায়-ধর্ম্ম মানিয়া ততটা চলেন না। স্বধর্ম্মের চেয়ে পরধর্ম্মের মূল্য আপনার কাছে বেশী।" যাক ও সব কথা, এখন টিকিট কিনুন, তাহা না হইলে হাঁটিয়া যাইব।"

মামা কনডক্টরকে ডাকিয়া বলিলেন "টিকিট দাও।" মামা দুই খানি টিকিটের দাম তাহার হাতে দিলেন। কণ্ডাক্টার আট পয়সা ফেরত দিল। মামা বলিলেন "ফেরত দিতে হইবে না।" কণ্ডাক্টার সেলাম ঠুকিয়া বলিল "না বাবু।" মামা পয়সা ফেরত লইলেন।

বুঝিলাম—ট্রামের ভাড়াটা একা আত্মসাৎ করিবার সাহস এ ব্যক্তির নাই, সেই জন্য মামাকে পর্য্যন্ত বলে লইতে চায়। মামা দেশভক্ত কিন্তু দেশের গুণটাকে ভাল না করিয়া আপনার দোষে দেশের দোষটাই সর্ব্বাগ্রে ভালবাসিয়াছেন, তাহা না হইলে কণ্ডাক্টারের চুরিটাকেও ভালবাসিবেন কেন?

কলিকাতায় মামার মেসে উঠিলাম। প্রথমদিন কাটিল। দ্বিতীয়দিন চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। তৃতীয় দিনে থিয়েটার বায়স্কোপ দুটাই দেখিলাম। চতুর্থ দিনে প্রাণটা ঘিঞ্জি শ্যাম পল্লীর জন্য ঈষৎ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তবুও স্থির করিলাম কলিকাতায় আরও দিন কতক থাকিতে হইবে।

মনে হয় কলিকাতাই প্রকৃত মায়াপুরী। ইহারই দীপ্ত আলোকে মুগ্ধ দেশবাসী পতঙ্গের মত ছুটিয়া আসিয়াছে। কত রকমের লোক, তাহাদের ভাষা বিভিন্ন, আকার বিভিন্ন; সকলেই সেখানে অর্থের জন্যই আসিয়াছে। অর্থই এখানকার দেবতা। যে দেবতা ক্ষণিক আনন্দ মাত্র দিতে পারেন, তিনিই এখানকার উপাস্য। এখানকার যা কিছু ক্ষণিক, এখানকার চালচলন, শিক্ষা ধর্ম্ম বেশী দিন টিকিতে পারে না। মামা যখন এখানে এতদিন আসিয়াছেন, তখন এখানকার অনেক ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া ভাবিয়াছেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

একদিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় কলিকাতার দৃশ্য দেখিবার জন্য বহির্গত হইলাম। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য, অর্থ দিলে এখানে সব জিনিসই পাওয়া যায়। সকলেই এখানে ব্যস্ত, কাহারও সময় নাই, সকলেই ক্ষতি ধরিয়া চলে, সকলেই অর্থাসু-সন্ধানে উন্মত্ত। এখানকার লোকে প্রাণ খুলিয়া কথা কয় না। অকপটচিত্তে কেহ কাহাকে ভালবাসে না—সকলেই লাভ খুঁজিয়া কাজ করে। এখানকার ভদ্রতা স্বার্থের জন্য, শিক্ষাধর্ম্ম সবই অর্থলাভের অনুকূল। এখানে পরিশ্রম আছে বিশ্রাম নাই; ভোগ আছে শান্তি নাই, ধর্ম্ম ও শিক্ষা বাক্যে, কার্য্যে নয়। আমি পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়াছি, এখানকার চালচলন এক সময়ে অনুকরণ করিয়াছিলাম, তার পর এই নগরীর শিক্ষাদীক্ষা পল্লীগ্রামে বসিয়াও কিছুদিন গ্রহণ করিয়াছি। ইংরাজি ভাষাও কিছু কিছু পড়িয়াছি। তবে এখানকার লোকেরা যতটা আত্মবিস্মৃত, আমি ততটা হইতে পারি নাই।

চারিদিকে গাড়ীঘোড়া, লালদায় উন্মত্ত মানুষের দল এদিকে ওদিকে ছুটিতেছে। সকাল

হইতে তিনটি মড়া দেখিয়াছি, পথে বাহির হইয়াই আর একটা দেখিতে পাইলাম। যেখানে লোক বেশী মৃত্যু সংখ্যাও সেখানে বেশী, সেখানে জীবনও কিছু সস্তা।

পথে পাহারাওয়ালা অনেক, চুরি ডাকাতিরও অভাব নাই। পথে দেখিলাম—দুইটা ভিখারী মৃত-প্রায় হইয়া পড়িয়া আছে। কেহই তাহাদের দিকে ফিরিয়া চায় না, যে যাহার কাজে ব্যস্ত, পরের দিকে চাহিবার সময় নাই।

সমাজনীতি বা ধর্ম্মনীতি মানিয়া চলা নগরবাসীর অভ্যাস নয়; অনিচ্ছাসত্ত্বে কেবল বাধ্য হইয়া তাহারা রাজনীতিটুকু মানিয়া চলে। এই রাজনীতি মানিয়া চলাই তাহাদের ধর্ম্ম। ইহারা ইন্দ্রিয়ের দাস, অর্থের দাস, ভোগলালসার দাস, কোন কাজই ইহারা স্বাধীনভাবে করিতে পারে না। এখানে ভদ্রলোকও মিথ্যা বলিতে দ্বিধা করে না—আপনাকে সরলভাবে প্রকাশ করিতে ইহারা ভীত হয়।

এত লোক ইহাদের মধ্যে মহাপ্রাণ নাই বলিলেও চলে। একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ সব মেলামেশা কাজ, বাক্যে বা কার্য্যে তাহার প্রাণের পরিচয় পাইবে না। ঘরের কথা জিজ্ঞাসা করা এখানে অভদ্রতা। সুতরাং বুঝিতে হয় এখানে লোকের গোপনীয় কথাই বেশী। ইহাদের বন্ধুত্বও ক্ষণিক, বাহিরে খুব ধুমধাম থাকে কিন্তু তাহা প্রগাঢ় নয়। বাহিরের সাজসজ্জাই বেশী।

ইহারা সদাই অশান্ত, পদে পদে পুলিশের ভয়। রাষ্ট্রশাস্ত্রের বিধিনিষেধ মানিতে মানিতে ইহারা সামাজিক, নৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আচারব্যবহার ভুলিয়া গিয়াছে।

পথে ঘুরিয়া বেড়াও, দেখিবে উদাসীন রাষ্ট্রযন্ত্র ঘর্ঘর শব্দে ঘুরিতেছে। কোথাও তাহার প্রাণ খুঁজিয়া পাইবে না। সব কাজই এই যন্ত্রের বিধি-নিষেধ মতে হইতেছে। অন্তত কোন কাজেই কর্ত্তার প্রাণের ভয় নাই। পল্লীতে স্বাধীনতা আছে, সেই জন্য আত্মশক্তির প্রয়োজন সেখানে স্বাভাবিক। পুলিশের জীবনের অধিকাংশ না কাটানই ভাল। আজ আমি কলিকাতার চিত্রটি নূতন চক্ষে দেখিতে পাইলাম, যারা এই নগরীতে আসক্ত; আমি আসক্ত নই; সেই জন্য ইহাকে যেরূপ আমি যতটা বুঝিব, যারা ততটা পারিবে না। বৈরাগ্য না থাকিলে কি জ্ঞান হয়; যাহার প্রকৃত জ্ঞান হইয়াছে সে অনাসক্ত।

চলিতে চলিতে এই সব কথা ভাবিতেছি। এমন সময় পথে হঠাৎ রতনকে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। বলিলাম "কি রে রতন যে, এখানে কেন?"

রতন বলিল "আমি দোকান করিয়াছি।"

আমি বলিলাম "ভাল, এই ত উচিত, দোকান কোথায়?"

রতন বলিল "গঙ্গার পোলের কাছে।"

"কিসের দোকান?"

"পান বিড়ির।"

"তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে, কাল দেখা করিব।"

রতন আর কথা না কহিয়া চলিয়া গেল, বুঝিলাম তাহার রাগ এখনও থামার উপায় আছে। যাই হোক, তাহাকে দেখিয়া আনন্দ হইল।

মেসে ফিরিলাম। তখন রাত্রি আটটা। রাত্রি নয়টার সময় যামার সহিত দেখা হইল।

আহারাদির পর দুইজনে একই বিছানায় শয়ন করিলাম। আজ মনে হইল—যামা আমাকে ঠিক ভাগিনেয়ের মত না দেখুন, অন্ততঃ মিত্রের মতও দেখেন। আমি বলিলাম "যামা, গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করিব, বিদ্বান আপনি, উত্তর দিন ত।"

যামা বলিল "আচ্ছা, বল।"

আমি বলিলাম "আপনি ব্রাহ্মণ সন্তান, সেদিন দেখিলাম—হোটেলে বসিয়া নানা অখাদ্য আহার করিলেন। এ সব কেন?"

রামা বলিলেন "আমি অত বাঁধাধরা নিয়ম
ানিতে চাই না।"

আমি বলিলাম "কেন?"

"ঐ সব নিয়মে চলাতেই আমাদের সর্ব্বনাশ
রিয়াছে।"

"নিয়ম মানুষকে সংযত করে, সংযমের কি মূল্য
াই?"

"অন্যায় নিয়ম কেন মানিব? অন্যায় নিয়ম
নিতে যাওয়া কাপুরুষতা।"

"এ ছাত্রনিষ্ঠ বীরের কথা। আপনি কি
াত্রনিষ্ঠ বীর?"

"আমি আমার কোন কাজই অন্যায় মনে করি না।"

"খুব কম লোকই তাহা করিয়া থাকে। তাহা
লে কি জগতের অধিক লোকই ছাত্রনিষ্ঠ?"

তাহা নয়। কে ছাত্রনিষ্ঠ তাহা তাহার কাজ না
খিলে বলা যায় না।

পরোপকার করা ছাত্রসঙ্গত। পরোপকার
ন করিয়াছেন কি?"

পরোপকার কি শুধু তুমিই করিয়াছ?"

না, আমি পরোপকার করি নাই। আপনার
থা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার কথা পাড়িতেছেন
ন? পরের উপকার করিতে পারেন?"

"কেন পারিব না? তবে তাহাদের উপকার
আবশ্যক কি না বুঝিয়া দেখিব।"

"উপকার তাহাদের আবশ্যক, আপনার কাছে
হয়ত তাহা অনাবশ্যক।

"ব্যাপারটা কি ভাল করিয়া বল না।"

"আপনাকে কয়েকজন লোকের উপকার
করিতে হইবে। পারিবেন?"

"পারিব?"

"আমাকে ভুলাইলে চলিবে না, যদি না পারেন
বলুন, আমি অন্য উপায় করি। আপনি পারিলে
বড়ই আনন্দ হয়।"

"আচ্ছা, কি করিতে হইবে?"

"বলুন করিবেন।"

"তাহা কেমন করিয়া বলিব, যদি সাধ্যাতীত
হয়?"

"সাধ্যাতীত নয়।"

"তবে কি করিতে হইবে বল।

আমি উত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না, কেননা
কোন একটা বিশেষ কাজ আমি ঠিক করিয়া
রাখি নাই। বলিলাম সময়ে বলিব। কয়েদী এই-
খানে চুপ করিল।

(ক্রমশঃ)

স্বর্গীয় রাজা স্যার সৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর *

(শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি. এ.)

স্যার্ সৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত বঙ্গে
রতীর সপ্তস্বরা বীণার একগাছি তার ছিন্ন
ইয়া গিয়াছে। অনেক দিন হইতে তাহাতে
িচা ধরিলেও তাহার সেই ক্ষীণ মধুর রসটুকু
ভারতীর সন্তানগণের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে-
ছিল, আশা ছিল বঙ্গে নবজাগরণের দিনে আবার
হয়ত সে সুরের প্রয়োজন হইবে, কিন্তু আজ তাহা
একবারেই নীরব। সে ছিন্ন তার আর যোড়া
লাগিবে না। আবার যদি বাণীর কৃপায় নূতন
তারের সৃষ্টি হয়, তবেই সে স্থান পূর্ণ হইবে, কিন্তু

* "বিলম্বীয়" অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

তাহাতে ঠিক সুরটি পুনরায় বসিবে কি না বলা যায় না, বসিলেও বহু সময়সাপেক্ষ। আমরা যাহা হারাইলাম তাহারই লাগিয়া আক্ষেপ করিতে এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। বর্ত্তমান থাকিতে যাহার অস্তিত্বও উপলব্ধি করি না অবর্ত্তমানে তাহার অভাবটা অনেক সময় মর্ম্মস্থলে আঘাত করে। মনের সে অবস্থা বর্ণন করিয়া বুঝান যায় না। তখন আমরা আগেপিছে চাহিয়া দেখি যাহা চলিয়া গেল, তাহার জন্য একটা প্রসার শূন্যতা, একটা তীব্র বিচ্ছেদ বেদনা অনুভব করিতে থাকি, আমরা শোকে ও দুঃখেই এই ভাবটির সঙ্গে পরিচিত, কিন্তু যে সংসারে 'হাসিকান্না হীরেপান্না মোলে ভাসে' এবং ছায়াতপের মত নিগূঢ় মিশ্রণে সংযুক্ত, সেখানে কবি সুখের অবস্থাতেও এই ভাব লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাই সেলি লিখিয়াছেন—

"We look before and after and pine for what is naught our sincerest laughter with some pain is fraught" এবং Wordsworth বলেন "Tome the meanest flower that blows gives thaughts that lie too de p for tears.

সাধারণ প্রকৃতিতে অভাব বোধই দুঃখ এবং তাহার অভিব্যক্তি শোক। উহার প্রথম আবেগের কষ্ট লাঘব করিবার জন্য আমরা শরীর ও মন দিয়া চেষ্টা করি, ক্রন্দনে সান্ত্বনা আছে, তদপেক্ষা সান্ত্বনা হারানিধির গুণস্মৃতিতে ঐ কাও। তাহাতে শিশু-সুলভ ফিরিয়া পাইবার আশা থাকে না, মনকে চির অভাবের জন্য প্রস্তুত করা হয়। দুঃখকে বরণ করিয়া লওয়া হয়। প্রবলবেগে আঁকড়াইয়া ধরাতে তাহার সহিত যুঝিবার শক্তি বাড়িতে থাকে। ক্রমে মন শান্ত এবং শান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই যুদ্ধ ব্যাপারে কিঞ্চিৎ সুখেরও আভাষ আছে। সেই জন্যই সাধারণতঃ লোকে দুঃখের কথা কহিয়া তৃপ্তি লাভ করে এবং অপরের সহিত ভাগাভাগি করিয়া দুঃখকে উপশম করে। মানুষ সামাজিক জীব সমষ্টি বাঁধিয়া থাকাতেই বল ভরসা এবং আনন্দ, কাজেই দুঃখের সময়, সে ব্যথার ব্যথী খোঁজে এবং সমাজ যে পরিমাণে সজীব থাকে বাঁধিতের বন্ধুবর্গও সেই পরিমাণে সমবেদনা পাইয়া থাকে, প্রাণের একটা লক্ষণ বেদনা অনুভব করা ও আঘাতে সাড়া দেওয়া, প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের অঙ্গ বিশেষ। এবং যে অঙ্গটা বড় কাজের তাহার বিয়োগে সমাজ শরীর সেই পরিমাণে ক্ষতি বোধ করে ও ক্লিষ্ট হয়—সাধারণ মানবের সহিত যোগ রাখিয়া সমাজের পুষ্টি সাধনে সহায়তা করাই ব্যক্তির ধর্ম্ম; এবং যিনি তাহা করেন, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্মঠ অঙ্গের কার্য্য করেন। এমন একজন লোক সৌরিন্দ্রমোহন ছিলেন—তাই আজ আমরা তাঁহার বিয়োগে কাতর হইতেছি, সকল সদনুষ্ঠানে তাঁহার সহানুভূতি ও যোগ ছিল, বিশেষতঃ কলাবিদ্যা সম্বন্ধীয় সকল চেষ্টাতেই তিনি উৎসাহদাতা ও প্রধান সহায়ক ছিলেন। কলিকাতা সমাজের কণ্ঠভূষণের মধ্যে তিনি অন্যতম উজ্জ্বল মণি ছিলেন। তাই কবিবর হেমচন্দ্র তাৎকালিক কলিকাতার আসর বর্ণনায় লিখিয়াছিলেন—

"এগিয়ে এল হাতার পরে গলায় পরে হার
অদ্বিতীয় ভারত মাঝে মিউসিক্ ডাক্তার।"

ইন্দ্রনাথ ও বিদ্বজ্জন সমাগমের বর্ণনায় লিখিয়াছেন "সেখানে মূর্ত্তিমান সঙ্গীত স্বীয় রাজশ্রী বিস্তার করিয়া অধিষ্ঠিত ছিলেন।"

বাস্তবিকই তিনি অসাধারণ এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। সঙ্গীত ও অন্যান্য কলাবিদ্যায়, শিষ্টাচারে, সামাজিকতায়, লোকহিতব্রতে তিনি বাঙ্গলার অন্যতম অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু ঠাকুর পরিবারের নহে, কেবল বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালা দেশের নহে, সমগ্র ভারতের ক্ষতি হইল সন্দেহ নাই। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম যুগের ফল হইলেও, তিনি খাঁটি স্বদেশী ছিলেন। দেশীয় ভাবে ওতপ্রোত

রূপে অনুপ্রাণিত ছিলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকে তাঁহাকে বিমোহিত করে নাই। ভারতের সনাতন-প্রথা, আচার ব্যবহার, শিল্প, কলা, জ্ঞান ও সাধনা তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ ও চির আদরের ছিল বলিয়াই জীবনে সর্ব্বদাই তাহার অনুশীলন করিতেন।

বৈদেশিক ইংরাজী শিক্ষা কোন দিনই তাঁহার মনে সংকীর্ণতা আনে নাই, একদেশদর্শিতাও গ্রহণ করিয়া তুলে নাই বা অপর জাতির এবং ভিন্ন বর্ণীর প্রতি বিদ্বেষ জন্মায় নাই, বরং তাঁহার দেশ-কাল-পাত্র নির্ব্বিচারে সত্যের প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত করিয়াছিল। তাঁহার স্বাভাবিক উদার হৃদয়কে প্রসন্ন করিয়াছিল। সমস্ত ভূখণ্ডের সকল জাতির তিনি কল্পনা সাহায্যে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার বিবিধ গ্রন্থ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। মনও জ্ঞান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত দেখিতে তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল। Berlin এ fifth International congress of Orientalistএ যোগদান করিবার জন্য যখন তিনি নিমন্ত্রিত হন, তখন তিনি উপস্থিত হইতে পারিবেন না বলিয়া এক সঙ্গীতোপহার প্রেরণ করেন, সংস্কৃত শ্লোকমালায় গন্ধর্ব্বরূপকল্পে তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া তাহাতে দেশীয় সুর সংযোজিত করিয়া Continental notation প্রণালীতে তাহার স্বরলিপি প্রস্তুত করিয়া এক সঙ্গীতোপহার প্রেরণ করেন। বলা বাহুল্য শ্লোকগুলি সভায় পঠিত হইয়াছিল. উহাতে তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ ভারতীয় সঙ্গীতের পাঁচজন প্রধান প্রবর্ত্তক (নারদ, ভরত, রম্ভা, অহ, তুম্বুরু) ও তাহাদের সঙ্গীত কলার পাঁচটী প্রধান অঙ্গের ব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রথমেই সংহিতাকার নারদ ভারতীয় সঙ্গীতের মূল সূত্রে সুর যোজনা, রাগরাগিণীর পরিচয় উৎপত্তি. স্বরবিন্যাস ও কণ্ঠসঙ্গীত প্রভৃতির ব্যাখ্যা করেন, তাহার পরেই ভরত স্বীয় নাট্য শাস্ত্র হইতে অভিনয় কলার বৃত্তপট পরিচ্ছদাদি বর্ণন করেন। ভরতের পর রম্ভা নিজ চাতুর্য্যের হাব, ভাব, লাস্য ও নানা আবশ্যকীয় তথ্য জ্ঞাপন করেন, তখন অহ স্বীয় গ্রন্থ হইতে তাল-লয় প্রভৃতি সময়-জ্ঞাপক নিয়ম সকলের আলোচনা করেন, অবশেষে তানপুরার আদি জনক তুম্বুরু যন্ত্র সঙ্গীত ও যন্ত্র নির্ম্মাণ বিষয়ে, এবং বিবিধ যন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন। এই রূপকের মধ্যে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন—

Mighty gatherings which have tended year by year to find the East and the West in friendlier bonds of the union never lead the spirit of the East been in such close and friendly intercourse with the spirit of the west. Never before had such real gems from the famous. Meniers of Indian music such curious details of its different brancher been offered so freely and confidently to the great minds of the west.

বড় বড় সভা সমিতি প্রতি বর্ষে এইরূপ প্রাচ্য ও পশ্চিমের মিলন সংঘটন করাইতেছেন, কিন্তু ইতি পূর্ব্বে আর কখনও প্রাচ্য ও পশ্চিম এরূপ ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিত হয় নাই, ভারতীয় সঙ্গীত কলার খনি হইতে অমূল্যরত্নরাজি—সঙ্গীত শাস্ত্রের বিস্তৃত বিভাগের বিচিত্র বর্ণ সংযোগে এরূপ ভাবে আর কখনও প্রতীচ্যের মনীষিগণের সমক্ষে উপস্থিত করা হয় নাই।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন যে জগতের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে ইহা তিনি দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতেন। এখানকার রাজপুরুষদের সহিত সদ্ভাব ছিল ঘনিষ্ঠতাও করিতেন, পাশ্চাত্য নৃপতি বৃন্দের সহিতও বিদেশীয়ের সহিত তাঁহার পত্র ব্যবহার এবং উপঢৌকনাদি আদান প্রদান ছিল। সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত।

অনুসন্ধিৎসু বিদেশী পর্য্যটক এবং ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমান গায়ক বাদক বা ওস্তাদ কলিকাতায় আসিলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া যাইত না, এরূপ ভাবে বেলাবেলা সত্ত্বেও তিনি নিজের স্বাস্থ্য সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, খাতিরে পড়িয়া কুলধর্য্যাদা বিস্মৃত হন নাই, আচারে নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, শিলাচক্র তবে সুপণ্ডিত ছিলেন, স্বয়ং শালগ্রাম পূজা করিতেন, নিত্য প্রাতে ব্রাহ্মণদের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিতেন, তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক কঠোর প্রক্রিয়ার যোগ সাধন করিয়াছেন। কোনরূপ নিষিদ্ধ খাদ্য না খাইয়া স্বল্পাহারে থাকিয়া কলিকাতার বাসগৃহে ৭৪ বৎসর কাল ধরিয়া আবদ্ধ রহিয়া, কেবল নিয়মের দ্বারা শরীর পরিচালিত করিলে কিরূপে দীর্ঘ জীবন পাওয়া যায়, তিনি তাহা আশ্চর্য্য রূপে দেখাইয়াছেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমী ছিলেন, তাঁহার খর্ব্বাকৃতি ক্ষীণ দেহ দেখিলে সহসা তাঁহাকে দুর্ব্বল বলিয়া মনে হইত, কিন্তু তাঁহার জ্যোতিঃপূর্ণ প্রতিভা-মণ্ডিত মুখশ্রী ও উজ্জ্বল চক্ষু তেজস্বিতার পরিচয় দিত; যাঁহারা তাঁহার সংস্রবে আসিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার প্রখর স্মৃতিশক্তি, নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, সঙ্গীত বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং তাঁহার মিষ্টালাপ, বিনয় ও সৌজন্য ভুলিতে পারিবেন না; ধনে জনে পরিবৃত হইয়া তিনি ভোগ-বিলাসে দিন কাটান নাই। যাহাতে দেশের কল্যাণ ও গৌরব বৃদ্ধি হয় তিনি সেই সকল কার্য্যে সচেষ্ট থাকিতেন। বিদ্যানুশীলন তাঁহার জীবনের একমাত্র আনন্দদায়ক সম্বল ছিল, বাল্যকাল হইতে তাঁহার লেখার সখ ছিল, শৈশবেই ইতিহাস ভূগোলের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকায় তিনি ১৭ বৎসর বয়সে একখানি ইতিহাস ও ভূগোল বৃত্তান্ত পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। শিশু সাহিত্যে ঐ পুস্তক খানি বর্ত্তমানে প্রচলিত Text Book গুলির তুলনায় অনেক উচ্চে স্থান পাইতে পারে, বাল্যকালের এই ইতিহাস ও ভূগোল পরিচয়, তাঁহার প্রবীন বয়সেও লিখিত Victoria gitika ও Victoria Samrajyan নামক পুস্তক সংস্কৃত দেবীপ্যমান। দুইখানিই সংস্কৃত ছন্দে রচিত ও সুরসংযোজিত। প্রথমটিতে ইংলণ্ডের ইতিহাস ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ। দ্বিতীয়টিতে ইংলণ্ডের সাহিত্য তদধীনস্থ দেশ সমূহের এবং উপনিবেশ গুলির কি সম্বন্ধ তাহাই বুঝান হইয়াছে।

Empire dayর অনুষ্ঠানও Salebyর Great Britain এই ভাবেরই পোষকতা করিতেছে। কবিতাগুলি যদিচ সংস্কৃতে লেখা তথাপি তাহাতে প্রত্যেক দেশের বর্ণনায় তদ্দেশীয় জাতির সঙ্গীতের সুর দেওয়া হইয়াছে। আবার Prince-panchasat এ ঠিক ইহার উল্টা ব্যাপার; বিভিন্ন দেশীয় কবিতা ভারতীয় সুরে বসান হইয়াছে ও তাহার ইংরাজী Notation করা হইয়াছে।

তিনি বাল্যকালে যে কলাপ ব্যাকরণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা আজীবন তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁহার শেষ গ্রন্থ গান্ধর্ব্ব কলাপ ব্যাকরণে সঙ্গীতের মূল সূত্র গুলি কলাপের সূত্রের আকারে প্রদান করেন। সংস্কৃত কাব্য ও অলঙ্কার তাঁহার প্রিয় বস্তু ছিল, অই অধিকাংশ পুস্তকে তিনি সংস্কৃত কবিতার প্রয়োগ করিয়াছেন। রূপক রচনায় ও সংস্কৃত উপমা ব্যবহারে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার নিকট প্রত্যেক সুর ও রাগরাগিণী যেন প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উপস্থিত হইত। তাই তাঁহার রূপক গুলি সম্যক ভাবে বুঝিতে গেলে তাঁহার মধুর ভাব ও ভাষার রস গ্রহণ করিতে হইলে সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা প্রয়োজন। বঙ্গ ভাষার পুষ্টিসাধনেও তিনি যত্নবান ছিলেন। জাতীয় সঙ্গীত বিষয়ক নিদর্শন তিনি মুক্তাবলী নামে একখানি নাটিকা প্রণয়ন করেন, ইহা ছাড়া কতকগুলি সুললিত গীতও রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলি এক সময়ে সাধারণো সাদরে গীত হইত। বয়ঃ জীবনে সঙ্গীতের চর্চ্চায় কাল অতিবাহিত

করিলেও তিনি সাহিত্য সেবায় বিরত ছিলেন না। মৌলিক গবেষণা সংগ্রহ, সঙ্কলন ও অনুবাদ, সকল বিষয়ে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গভীর চিন্তা শার্শনিকের মত সকল তথ্যের মূলে অনুসন্ধান ও প্রমাণ দ্বারা তাঁহার সকল রচনায় পূর্ণ প্রকটিত হয়। উপপত্তিও সংস্থাপন তাঁহার সংকলিত সঙ্গীতে সার-গ্রাহ্য এ বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য দেয়। তিনি ধৈর্য্য সহকারে সকল বিষয়ের সূক্ষ্ম বিভাগগুলি প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের ন্যায় সযত্নে বিশ্লেষণ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে ও বুঝাইতে কখনও ক্লান্তি বোধ করেন নাই, পৃথিবীর বহু স্থান হইতে সঙ্গীত ও বাদ্য বিষয়ক যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে তাহাদের মধ্যে অনেক গ্রন্থে তাঁহার অভিমত ও অনুসন্ধানের ফল প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, সঙ্গীত বিষয়ক কোন জটিল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য তিনি সময়ে সময়ে নানা স্থান হইতে অনুরুদ্ধ হইতেন। তিনি প্রকৃত ঐতিহাসিক ছিলেন। অতীতকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া উপস্থিত করিতে তিনি অশেষ যত্ন করিয়াছেন। হিন্দু-সঙ্গীতের পুনরুদ্ধারকল্পে তিনি একা ভারতশাস্ত্র-জলধি মন্থন করিয়াছেন ও যথেষ্ট অধ্যবসায়ের সহিত অনেক লুপ্ত রত্ন উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি বহু পুঁথি ও চিত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া তৎসমুদয়ের প্রচারকল্পে ব্রতী হইয়াছিলেন, কত পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তিকে এবিষয়ে নিযোগ করিয়াছিলেন। যাবতীয় ভারতীয় যন্ত্র সমূহের সমাবেশ করিয়াছিলেন এবং নিজের তত্ত্বাবধারণে কত অপ্রচলিত যন্ত্র কারিকরের দ্বারা প্রস্তুত করাইতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার প্রণীত ম্যানুয়েল নামক গ্রন্থে এই সকল যন্ত্রের গঠন ও বাদন প্রণালী বর্ণিত আছে। প্রাচীনকালে রঙ্গমঞ্চ কিরূপে সজ্জিত হইত ও তাহার কার্য্যপ্রণালী এবং ঘটনাটী সূত্রধরের বিবিধ কর্ত্তব্যের ও সজ্জার বর্ণনা তাঁহার পুস্তকে আছে। আধুনিক যাত্রার ছুড়ির উৎপত্তি কোথায় তাহা তাঁহার 'নৃত্যাঙ্কুর' নামক পুস্তক পাঠে বেশ বোঝা যায়। প্রাচীন ভাস্কর্য্য ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে তাঁহার নৃত্যাঙ্কুর পাঠ করা কর্ত্তব্য।

তাহাতে অঙ্গের ভাবভঙ্গির ও হস্তপদাদির বিবিধ মুদ্রার ও গতির প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা আছে, এবং পুরাকালে স্ত্রীপুরুষ মিলিত হইয়া ও সমষ্টিবদ্ধ হইয়া Group dancing ও figure dancing যেরূপ ভাবে নৃত্যাদি করিতেন তৎসম্বন্ধেও আভাষ পাওয়া যায়। ইংরাজীতে রচিত History of Hindu Music পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণের নিকট বিশেষ আদরের বস্তু হইবে। তিনি যে বিষয়ে হাত দিয়াছেন তাহাতেই প্রতিভার অসাধারণ বল ও ধৈর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অবহৃত পাথর ও শালগ্রাম শিলা স্বয়ং পরীক্ষা করিতে পারিতেন। তিনি নিজের জমিদারীতে খনিজ ব্যাপারে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, তিনি অশ্ব চিকিৎসা বিষয়ে একখানি পুস্তক সংকলন করেন। তাহাতে শাস্ত্রোক্ত ভারতীয় ব্যবস্থারই প্রাধান্য প্রমাণিত হইয়াছে, মুষ্টিযোগ সম্বন্ধেও তাঁহার একখানি পুস্তক আছে। বঙ্গ-সাহিত্যসেবীদিগের মধ্যে এরূপ একনিষ্ঠ সাধকের সংখ্যা অতি বিরল, তাঁহাকে মুশিক্ষার একটি দৃষ্টান্তস্থল বলা যাইতে পারে। কল্পনা সৌন্দর্য্য বোধ, স্বাধীন চিন্তা ও সকল বিষয়ে বিশিষ্টতা প্রদর্শনে তিনি সর্ব্বদা প্রয়াসী ছিলেন। প্রস্তরখণ্ডের উপর দিয়া আমরা জুতা পায় দিয়া চলিয়া যাই, কিন্তু অভিজ্ঞ লোক তাহারই ভিতর হইতে কোনিক প্রস্তর বাহির করেন, তাহাতে ভিত্তি স্থাপনা করেন, তাহাকে কাজে লাগান আবার Michail angelos ন্যায় ভাবুক লোক তাহারই মধ্যে দেব মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিতে পান ও তাহাকে খুঁদিয়া বাহির করেন। মাতৃস্নেহ সকলেই অনুভব করিয়াছে কিন্তু Raphoelই তাহার জগৎ সম্মুখে ধরিয়াছেন। রাস্তায় বসিয়া ঐ ভাবে বিভোর হইয়া একটা পতিত পিপাক ঢাকনার উপর ঐ চিত্র অঙ্কিত করেন। উহাই লোক

প্রসিদ্ধ চিত্র Madonna হয়। যাহারা প্রকৃত মানুষের মত মানুষ তাহারা এমন করিয়াই নিজেদের পথ নিজে বাছিয়া লইয়া আপন হস্তে তাহা গড়িয়া তুলিয়া জগতে বড় হইয়াছেন, এবং যশের মন্দিরে পৌঁছিয়াছেন, আমাদের আলোচ্য জীবনীতেও ইহার ব্যতিক্রম দেখি না, ইহাই প্রকৃত মানুষের জীবন, জীবনেই আনন্দ তাই 'নবীন কবি মৃত সতীশচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন'।

'ঘূঢ় বায় ঐ জেলে ছেলের মতন
জীবন সমুদ্র মাঝে করিয়া ক্ষেপণ
নিজেরে সহসা বহু তুলিয়া ডুবিয়া
আবার আনন্দে উঠে হাসিয়া ভাসিয়া
হাস্য মুখে ফলাফল ফেলে কর্ম্মজালে
নিশ্চয় উঠিবে মৎস্য ধৈর্য্য ধূঢ় ভালে
সে লোক নিশ্চয় অতি ঘোর ভালবাসে
তা ন'লে কি জলে পড়ি ঐরূপ হাসে,
জীবন, জীবন, তাই আনন্দ জীবন।

মাছ না উঠিলেও সে হতাশাস হয় না, জাল ফেলা তার কর্ম্ম সে আবার জাল ফেলিবেই, সৌরিন্দ্রমোহনও তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ধরিতে পারিয়াছিলেন ও তাহার জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতেছিলেন, যে বয়সহকারে বাল্যপাঠে মনোযোগ দিয়াছিলেন, ততোধিক অধ্যবসায়ের সহিত বয়সের সঙ্গে সেঁতার অভ্যাস করিতে লাগিলেন, এবং ইংরাজী শিক্ষকের নিকট Piano ও আনুসঙ্গিক Rotation ও Theory of music শিক্ষা করিলেন। পরিশেষে Father Laforia নিকট শব্দের ক্রিয়া, সুরের স্পন্দন, তাহার তারতম্য প্রভৃতি সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক অংশও শিক্ষা করেন। ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্র আলোচনা কতিপয় ধনাঢ্য ব্যক্তিও মুষ্টিমেয় ওস্তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় তাহার আশু বিলোপের আশঙ্কা করিয়া তিনি তৎপ্রতিকারে দৃঢ়সঙ্কল্প হন ও যাহাতে তাহার বহুল প্রচার ও প্রসার হয় এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর পুনঃস্থাপিত হয় তৎপক্ষে আপনাকে নিয়োজিত করেন। ভারতীয় সঙ্গীতের প্রকৃত সমাদর যাহাতে পাশ্চাত্য সমাজে বিস্তৃত হয়, তজ্জন্য তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞদিগের নিকট তাহার পরিচয় করাইয়া দিলেন, জগতের প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের পাঠাগারে তাহাকে ভূষিত করিয়া উপস্থিত করিলেন। সকল দেশের কৌতুকাগারে যাহাতে তাহার স্থান হয়, সেই জন্য এক প্রস্ত করিয়া ভারতীয় নব্য এবং পুরাতন বাদ্য যন্ত্র উপঢৌকন পাঠাইলেন। নিজের তত্ত্বাবধানে উপযুক্ত শিক্ষকের সাহায্যে স্বদেশে সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। তথায় শাস্ত্রোক্ত সঙ্গীতের শিক্ষায় ব্রতী হইলেন, যাহাতে অল্প বেতনে বা বিনা বেতনে লোকে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে সক্ষম হয়, তাহার নিমিত্ত Bengal Music school এবং Bengal Academy of music প্রতিষ্ঠিত করিলেন ও নিজে তাহার ব্যয় ভার বহন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত সঙ্গীত শিক্ষা বঙ্গ ভাষায় লিখিত হইলেও ইংরাজী স্বরলিপি থাকায় তাহা তাদৃশ সুবোধ্য হয় নাই, তজ্জন্য সৌরিন্দ্রমোহন পুরাতন সংস্কৃত প্রথা অনুসারে ৪র্থ ত্রিকোণ দাত্রিক স্বরলিপি প্রকাশ করিয়া প্রচার করেন, তাঁহারই উৎসাহে পণ্ডিত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী সঙ্গীতসার প্রণয়ন করেন। এই-সময়েই যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা ও হারমোনিয়ম সূত্র প্রকাশিত হয়।

অগ্রজ জ্যোতিন্দ্রমোহনের উৎসাহে তিনি ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সাহচর্য্যে প্রথম একতান বাদনের প্রচলন করেন, এবং দেশীয় যন্ত্রের দ্বারাও যে সুন্দর একতান সঙ্গীত হইতে পারে তাহাও প্রমাণ করেন। এই সময় তিনি স্বরলিপি সংবলিত একতান নায়ক একখানি পুস্তিকারও প্রচার করেন, পূর্ব্বোল্লিখিত সঙ্গীতের পক্ষ অঙ্গই তিনি সমভাবে অনুশীলন করিয়াছিলেন। তিনি বেলগেছিয়ার নাট্যশালায় একজন প্রধান উদ্যোক্তা ও কর্ম্মী ছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে তিনি স্বয়ং অভিনয় করিতেন।

আপন বাড়ীতে বঙ্গীয় নাট্যশালায় 'বুঝলে কিনা' প্রহসন নাটকের যে অভিনয় হয়, তাহাতে তিনি বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্‌যোগে বাঙ্গালায় প্রথম মূকাভিনয় ও মূর্ত্তি প্রদর্শন or Tableux Vuirants ও প্রহেলিকা অভিনয় হয়। ঐ অভিনয় ষড়ঋতু বর্ণন এবং ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীকুলের পুষ্পময়ী মূর্ত্তি প্রদর্শিত হয়। তাঁহার রচিত রসাধিকার যুদ্ধকের বিভিন্ন রসগুলি অভিনেতৃগণের তালয়, সুর ও হাবভাব সঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

ধনের ও সময়ের সদ্ব্যবহার কি করিয়া করিতে হয় তাহা তাঁহার জীবনে নানা ভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। নদী যেমন সাগরে মিলিবার পূর্ব্বে দুই তটের ভূমি উর্ব্বর করিয়া যায়, তাঁহার জীবনস্রোতও দেশদেশকে ভারতীয় সঙ্গীত কলায় উর্ব্বর করিয়া অনন্তে মিশিয়াছে। যে সকল ভূমিচিহ্ন (Land marks) পতিত রহিল তাহার সাহায্যে ভবিষ্যৎ সংগীতগণ কর্ত্তব্যপথ নিরূপণ করিয়া লইতে পারিবেন। যে ভাবের প্রেরণায় তিনি বীণাপাণির অমৃতময়ী প্রেরণায় প্রণোদিত হইয়া ভারতবর্ষে সঙ্গীতকলার যে বিচিত্র মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত করিয়া তাহার অবাধ গতি অব্যাহত রাখিতে পারিলে তাহার স্মৃতির উপযুক্ত সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা করা হইবে। একজন ইংরাজ দার্শনিক বলিয়াছেন, "Mangrous by admiration not by criticism or fault finding" সেই জন্যই তাঁহার গুণাবলীর এতাদৃশ বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিলাম। তাঁহার জীবদ্দশায় জগতের নানা দেশ হইতে বুধমণ্ডলী কর্ত্তৃক তাঁহার গুণের যথেষ্ট আদর হইয়াছিল, তাহা- তাঁহার উপাধি সম্ভারে পূর্ণ প্রকটিত। তাঁহাকে সম্মান করিয়া বিদেশী গুণিগণ আপনাদের গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন ও ও তদ্দ্বারা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, দুঃখের বিষয় কলিকাতা ইউনিভার্সিটির কেলো থাকিয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত চর্চ্চার কোনরূপ বিধিব্যবস্থা করিতে পারেন নাই।

শুনিয়াছি ইউরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে সঙ্গীত শাস্ত্রের অনুশীলনের জন্য উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা আছে, কিন্তু ঐ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত ও পরিচালিত হইলেও কর্ত্তৃপক্ষ ও দেশবাসী সকলেই এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন, ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়। আজকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নানাবিষয়ে অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করিয়া Lecture দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এই সুযোগে সঙ্গীত শাস্ত্রাধ্যাপনার জন্য একটি পদ সৃষ্টি করিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করা যাইতে পারে। সে অনুরোধ যে অসঙ্গত বোধে পরীক্ষিত হইবে এমত বোধ হয় না। এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইলে, সৌরিন্দ্রমোহনের স্মৃতি-রক্ষার জন্য আর দ্বিতীয় ব্যবস্থা করিতে হইবে না, এই সম্বন্ধে আমি বিভিন্ন সঙ্গীত সমাজ একতানবাদ সম্প্রদায়গণকে অনুরোধ করি যে তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া সৌরিন্দ্রমোহনের স্মৃতি নিদর্শন করাইতে, বিশ্ববিদ্যালয় একটি বৃত্তি বা কেদুর ব্যবস্থা করুন।

সঙ্গীত-কলা সম্বন্ধে এখনও মৌলিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের যথেষ্ট ক্ষেত্র রহিয়াছে, বঙ্গদেশের কীর্ত্তন গান ও তাহার বিভিন্ন সুর তাল সম্বন্ধে এখনও কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই, এ বিষয়ে এ দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে নিশ্চয় সুফল প্রদান করিবে।

আট বৎসর পূর্ব্বে যখন কতিপয় যুবক মিলিয়া এই 'মিলনী' সংস্থাপিত করেন, তখন রাজা সৌরিন্দ্র-মোহনকে যথেষ্ট উৎসাহ দান করিয়া ছিলেন। Julius ceasor অভিনয়কালে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অভিনেতৃবর্গের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন, এবং নিজে একটী সঙ্কেত রূপকে 'মিলনী'র উদ্দেশ্য সূচক একটি গান বাঁধিয়া রাগমালায় তাহাতে সুর

যোজনা করিয়া দেন, "অন্যোন্যকং হৃদয়ম্ পরস্পর শরণ রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে তৎপ্রদর্শিত মিয়ং প্রীতিঃ সদাবর্দ্ধতাম্।" আমরা যেন এই কামনা পথে কলাবিদ্যার অনুশীলন করিতে পারি।

বঞ্চিত

(শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়)

আজ তবে বঁধু, ফিরিতে হইল তোমার দুয়ার থেকে
এতদিনকার সঞ্চিত-ব্যথা অন্তরে মোর চেকে।
তুমি জান মোর যত দুঃখ বঁধু,—অজানা কিছুই নাই,
প্রতিদিনকার দহন কেমন পরাণ করিল ছাই।
আজো মনে পড়ে প্রথম প্রভাতে তোমার পরশ পেয়ে
পরাণ-গানের পুলকে আমার যেদিন ছিল ছেয়ে,
স্বপনের মাঝে হেরিনু তোমার সকল-ভুলান' রূপ,
গোপনে হৃদয়ে জ্বলিল সেদিন প্রথম পূজার ধূপ,
সেদিন উষার মিষ্ট কিরণে পাইনু তোমার দিশা—
ঘুরে গেল মোর মোহের কালিমা আঁধার জড়ান' নিশা।
তারপরে ওগো, গেছে কতদিন তোমার স্মৃতিটি ভরা
অমরায় ধারা পেয়েছিল এই আর্ত্ত-জীবন ধরা.
মিলন-সাঁঝের আশায় আমার দিন কেটেছিল সুখে,
বাসর-রাতের মরীচিকা যে গো দেখেছিনু সম্মুখে!
সেদিন জানিনা জন্ম-কাঙ্গালে ফিরাবে অশ্রু দিয়ে,
দুই হাত মোর পূর্ণ করিবে না-চাওয়া রতন দিয়ে!
তবে যাই বঁধু, বিদায় লভিনু মথুরা-পুরীর পথে—
হৃদিবৃন্দাবন শূন্য রহিল জন্ম-দিবস হ'তে।

জাতীয় শিক্ষার গৌরচন্দ্রিকা।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

(শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ)

জাতীয় শিক্ষার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রতিপক্ষ দলের ই সব যুক্তি প্রতিবাদ ও তাহার আনুসঙ্গিক ভুল ান্তি খণ্ডন করাই যথেষ্ট নয়; জাতীয় শিক্ষা অর্থে ামরা কি বুঝি, ভারতে জাতীয় শিক্ষা কোন্ মূল ব (principle) ধরে কি রূপ নেবে, কাজেই বা া কেমনটি হয়ে গড়ে উঠবে বা কোন্ উপায় বলম্বনে জীবনে কোন্ মোড়টুকু ফেরালে তা সার্থক বে তাই আমাদের বুঝে স্থির করতে হবে। ইখানেই প্রকৃত বাধা বিপত্তির আরম্ভ একাজ ইখানেই কঠিন, কারণ শুধু শিক্ষারই নয়, আমাদের ন্ত জীবন-ধারার (cultural life) বহুকাল থেকে আমরা জাতীয় ভাব ও প্রেরণা হারিয়ে বসে ছি। এ পর্য্যন্ত শুধু শিক্ষারই নয়, সকল বিষয়েই ামাদের তেমন স্পষ্টভাবে গভীর ও যথাযথ ভাবে লিয়ে দেখা বা ভাবা হয় নাই, যাতে আমরা সে ারান জাতীয় প্রেরণা ফিরে পেতে পারি এবং সেই ারণেই এ সবের অপরিহার্য্য মূল ভিত্তিই হোক থবা শাখা প্রশাখাই হোক, কোন দিকেই মতের একটা স্পষ্ট ঐক্য বা অনৈক্য কিছুই ফুটে ওঠে নি। ামরা এবিষয়ে খুব খানিকটা ভাবের ঢেউ, একটা স্পষ্ট অপরিণত ধারণা আর সেই ভাবের অনুযায়ী ভেজনা নিয়েই ছুই; আর তাকে রূপ দিতে য়ে বুদ্ধি-জীবি আমাদের চিরকেলে বুদ্ধির পুরাণ াচ, আমাদের অভ্যাস ও খেয়ালের বশে হাতের াছে যা' পেয়েছি তাই দিয়েই গড়তে গেছি। াই তার কোন স্থায়ী ও প্রত্যক্ষ সফলতা তো হয়ই ন, বরঞ্চ হয়েছে যথাসম্ভব গণ্ডগোল ও ব্যর্থতা। প্রথমতঃ আমাদের বোঝা দরকার জাতি-আত্মা াতি-প্রকৃতি জাতির স্বভাব শিক্ষার মধ্যে দিয়ে ামাদের কাছে কিসের সার্থকতা চায়, সেইটি বুঝে এই শিক্ষা-সমস্যার সকল দিকের সহিত সামঞ্জস্য রেখে তার প্রয়োগ করা আবশ্যক। এই অনুসন্ধানে সফলকাম হ'লে আমরা বর্ত্তমান মিথ্যা অন্তঃসার-শূন্য কৃত্রিম শিক্ষার স্থানে একটা কিছু যথার্থ অসার এলোমেলো জিনিস বা একটা নূতন মিথ্যা কৃত্রিমতা না গড়ে ভবিষ্যৎ ভারতের প্রকৃত জীব ও সৃজনীধার ভাবী মনুষ্যত্ব গড়ে তুলতে পারি।

শিক্ষার সম্বন্ধে আমাদের কতগুলি বহুকালের সযত্নপুষ্ট ভ্রান্তি ও কদর্থ আছে, প্রথমে শিক্ষার প্রকৃত অর্থ, মূল লক্ষ্য ও স্বরূপটি তা থেকে পৃথক করে নিতে হবে। কারণ তা' হ'লেই আমাদের শিক্ষার ভিত্তি-স্থাপনা পাকা হয় এবং আমরা কথাটীর প্রকৃত অর্থের ধারণা করে কার্য্যতঃ ফুটিয়ে তুলতে পারি। প্রকৃত শিক্ষা কি, প্রকৃত শিক্ষা কি হওয়া উচিত, তা যদি একবার স্থির হয়, তা হলে জাতীয় শিক্ষার স্বরূপ নির্দ্ধারণ অতিসহজ হয়ে আসে। আমাদের গোড়ার কথা থেকে আরম্ভ করতে গেলে সত্য ও জীবন্ত শিক্ষার অঙ্গস্বরূপ তিনটি জিনিসের উল্লেখ করতে হয়,—প্রথম মানুষ, অর্থাৎ তার অসাধারণত্ব ও সাধারণত্ব নিয়ে ব্যক্তিত্বের ভূমিতে মানুষ, দ্বিতীয়তঃ জাতি এবং সর্ব্বশেষ বিশ্বমানব। এক মাত্র তাই সত্য ও জীবন্ত শিক্ষা যা মানুষের মধ্যে তার সকল অন্তর্নিহিত শক্তি ফুটিয়ে তুলে মানবজীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে পূর্ণ সার্থকতায় পৌঁছে দেয়। যে শিক্ষা তার সঙ্গে তার জাতির জীবন, মন ও আত্মার সম্বন্ধকে নিবিড় করে তোলে এবং শুধু তাই নয়, যে বিশ্বমানবের জীবন মন ও আত্মার সে একটি অঙ্গমাত্র—তার জাতিও যার অন্তিম অঙ্গ হয়েও ভিন্ন, তারই সমগ্র স্বরূপের সঙ্গে সেই ব্যক্তির নিবিড় নাড়ীর যোগ জাগিয়ে তোলে। আমাদের শিক্ষা ঠিক কি

রকম হবে এবং জাতীয় শিক্ষার দ্বারা আমরা কিই বা সাধন করবো তা এই ভাবে মূল তত্ত্বের বৃহৎ ও সমগ্র দর্শনের ফলেই গড়ে উঠবে। জাতির দৃষ্টির এই সমগ্রতা—জাতির ভিত্তির এই বিশালতা আজ কাল অন্যান্য দেশের চেয়ে ভারতেই বেশী দরকার। কারণ এই জীবনের সন্ধিক্ষণে নূতন ভাগ্য গঠনের দিনে এ জাতিকে তার সমস্ত জীবন প্রেরণা ও শক্তিধারাকে —তার ব্যক্তিগত ও জাতিগত আত্মাকে খুঁজে বের করে গড়ে তুলতে সার্থকতার পথে নিয়োগ করতে হবে এবং এই পথে ভারতের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভারত তার হারাণ ধন ফিরে পেয়ে মানব-জাতি পরিবারের মধ্যে নিজের সত্য অধিকার ও পদ গ্রহণ করবে।

মানুষ ও তার জীবন, জাতি ও তার জীবন, বিশ্বমানব এবং সেই মহামানবের জীবন সম্বন্ধে বহু ভিন্ন ভিন্ন ধারণা ও আদর্শ সম্ভব, সেই পার্থক্যগুলি অবলম্বন করে শিক্ষা সম্বন্ধে ও আমাদের আদর্শ ও চেষ্টা একান্তই ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিতে পারে। ভারতেরও নিজস্ব একটি আদর্শ একটী জীবন-স্বপ্ন আছে, শিক্ষার মূলে সেই জাতিগত সত্য সেই চির জীবনের সুখস্বপ্ন রয়েছে কি না, আমাদের সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে, কারণ তাহাই আমাদের শিক্ষাকে প্রকৃত জাতীয় করে তুলবে। ভারত মানুষকে কখনও এ ভাবে দেখে না যেন মানুষ একটি চেতন দেহ— সে জড় প্রকৃতির গড়া যন্ত্রে কতকগুলি প্রাণ-তরঙ্গের রাসনাই যেন খেলছে, যেন সে একটি অহং চেতনা, একটি মন ও বিবেক বুদ্ধি, অথবা মানব নামধেয় পশু—যেন পশু জাতির অন্তর্গত মানব, আবার সেই পশু মানবের মাঝে ভারতবাসী বলে এক জীব সুশিক্ষিত মন ও বিবেক বুদ্ধির নিরঙ্কুশে যেন তার সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা ও জীবন তারই ব্যক্তিগত ও জাতিগত অহংকারের পরিপুষ্টি ও বাসনা ক্ষুধা প্রভৃতির নিবৃত্তির জন্যই ব্যয় করতে হবে। ভারত কখনও মানুষকে বিচার-শক্তিতে শক্তিমান পশু বলে গ্রহণ করে নাই; মানুষকে জড় প্রকৃতির মনোময় সন্তান বলে—চিন্তা ভাব ও ইচ্ছায় অনুপ্রাণিত জড় সত্তা বলে দেখে নাই, সেইজন্য ভারত মানুষের শিক্ষাকেও কখন কেবলমাত্র মনো-বৃত্তির অনুশীলন বলে গ্রহণ করিতে পারে নাই, ভারতের ধারা তা নয় যাতে মানবকে একটি রাজ-নীতিক সামাজিক ও অর্থনীতিক জীব বলে ধরে নিতে পারে; এইরূপ ভাবে বা ধারায় মানুষকে দেখলেই তার শিক্ষাকে সেই শিক্ষা বলে মনে হয়, যে শিক্ষা মানুষকে সমাজ ও রাষ্ট্রের নিপুণ সুশিক্ষিত ও অর্থকরী পুরজনরূপে গঠন করে। এ সকলই বহুমুখী মানবপ্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন দিক (aspects) ভারত এগুলিকেও তার বিশাল আদর্শের অন্তর্গত করে উচ্চ আসনই দিয়েছে; কিন্তু এগুলি বাহিরের জিনিস,—মন, জীবন ও কর্ম যন্ত্রের অঙ্গ বা অভি-ব্যক্তি মাত্র, মানবের প্রকৃত স্বরূপও তো নয়ই, সমগ্র স্বরূপও নয়।

ভারত চিরদিনই দেখেছে—প্রতি মানবের মাঝে তার ব্যক্তিত্বের আধারে একটি প্রস্ফুট আত্মাকে মন ও দেহ কোষে আবৃত সেই ভাগবত সত্তারই অংশ রূপে, জড় প্রকৃতির মাঝে অনন্ত বিশ্বময় আত্মসত্তার একটি জ্ঞানময় স্ফুরণ রূপে, ভারত মানুষের আধারে পৃথক পৃথক রূপে অনুশীলন করছে মন, বুদ্ধি, নীতির মানুষকে, শক্তি কর্ম ও সৌন্দর্যরসের মানুষকে, এমন কি প্রাণ ও জড় দেহ-তরঙ্গের সুখ-পশুত্ব মানুষকেও সে অবহেলা করে নাই; কিন্তু ভারতের চক্ষে এ সকলি আত্মারই শক্তি, এদেরই মধ্যে সে দেখে আত্মারই স্ফুরণ ইহাদেরই পরিপোষণে তারই পুষ্টি; কিন্তু সে সমগ্র অখণ্ড আত্মধন কেবল এই-গুলিতেই নিঃশেষ হয়ে যায় নাই, কারণ অনুশীলনের সর্বোচ্চ স্তরে গিয়ে মানুষকে যে এ সকলের অনেক বড় এক আত্মময় সত্তা বলে পাওয়া যায়; এই আত্ম-

স্বরূপ অধিরোহনেরই বলে ভারত যে মানবের পূর্ণ অভিব্যক্তি—তার চরম ভাগ্যবত্তা—তার পরমার্থ—তার সর্ব্বোচ্চ পুরুষার্থ পেয়েছে। ব্যক্তিকে যেমন, তেমনি ভারত কোন বিশেষ জাতিকেও সে চক্ষে দেখে নাই, যাতে জাতি শুধু জাতীয় অহংকারের সেবায় উৎসর্গিত—জীবন সংগ্রামে সশস্ত্র বূহবদ্ধ রাষ্ট্রচক্র বলে প্রতিভাত হয়। অহঙ্কারের সে লৌহ বর্ম্মে সে মুখসে সে ছদ্মবেশে জাতি পুরুষকে বন্ধনে দূর করে মাত্র; ভারত জাতির মধ্যে দেখেছে—দেশবাসীর সমগ্র জীবনের সত্য-আত্মা রূপে; সেই সত্য-আত্মাই আপন প্রকৃতি, স্বভাব ও স্বধর্ম্ম বিকাশ করে তার বুদ্ধি নীতিশিল্পকলার রসজ্ঞানে, তার শক্তি সমাজ ও রাজনীতিক ধারায় ও জীবনে তাকে রূপ দিয়েছে। তেমনি আমাদের মহামানবত্বের আদর্শ ও ভারতের ধারার অনুযায়ী হওয়া উচিত অর্থাৎ ভারতের সেই সনাতন সত্যদর্শনেরই অনুযায়ী হতে সে মানব জাতির মধ্যে তার জীবনে ও মনে চিরদিন এক উচ্চ আধ্যাত্মিক পরিণামে অনন্তকেই অভিব্যক্ত হতে দেখেছিল। মূল ভাবটি হবে অধ্যাত্মদয়।—সংঘর্ষ ও সমবেদনা এ দুইয়ের ভিতর দিয়েই ভারতের দেশ-আত্মার সেই অখণ্ড একত্বের অভিমুখী গতি পাওয়া যায়। সে গতির মধ্যে ভারতের অন্তর্গত বহু জাতির বাহিত বহু ভিন্ন বিচিত্রতাও হারায় না অথচ অভিজ্ঞতা ক্রমশই বেড়ে চলে; সে গতির মানে ব্যষ্টির শক্তির অনুশীলন ও ক্রম-পরিণতি এবং দেবত্বের অভিমুখী ব্যষ্টির চলা—এই সবটুকুতে জাতি-আত্মার পূর্ণত্বের অনুসন্ধানই ফুটে ওঠে; তবে ব্যষ্টির গতি জাতি-পরিণতিকে ছাড়িয়ে পিছনে ফেলে চলে না, সমষ্টি-জীবনের সুরে সুর বেঁধেই ব্যষ্টির গান বাজে। অবশ্য তর্ক উঠতে পারে, যে, এই কি ব্যষ্টি বা জাতি-পুরুষের প্রকৃত পরিচয়? কিন্তু এই দর্শন এই বিবরণ একবার সত্য বলে ধরে নিলে একথা স্পষ্টই বোঝা যায়, যে তাই প্রকৃত শিক্ষা, যাতে দেহ মন ও আত্মার অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে ব্যষ্টি ও জাতি গড়ে তোলে। এই মূল ভিত্তি এই মুখ্য ও নিয়ামক আদর্শের উপরই জাতীয় শিক্ষার সৌধ রচনা। এ সেই শিক্ষা, যার মূল লক্ষ্য হবে—ব্যষ্টিতে তার আত্মার সংস্রমুখী শক্তি ও সম্ভাবনার প্রকাশ, জাতিতে তার আত্মার ও ধর্ম্মের রক্ষা বলবিধান ও পুষ্টি এবং ব্যষ্টি ও জাতি এই দুয়েরই মহামানবের শক্তিতে জীবনে আত্মার অধিরোহন। এ সেই শিক্ষা—যা মানুষের আত্মার—অন্তঃপুরুষের বোধন ও পরিণতির এই যে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য, তা' কখন হারায় না। (বিজলী)

আমাদের কথা

ইউরোপের জড়বাদীতায়—রবীন্দ্রনাথের শঙ্কা

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইউরোপীয় জাতির জড়বাদিতা ও তাহার পরিণাম দেখিয়া নাকি স্তম্ভিত হইয়াছেন। ফলে ভারতীয় প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার প্রতি তাঁহার ভক্তি বাড়িয়া যাইতেছে। জড়বাদী এবং আত্মবাদীর বাস্তবিক পার্থক্য কোথায় বুঝি না। জড়বাদী হইলেই যে খারাপ হয় এবং আত্মবাদী হইলেই যে ভাল হয় এ বিশ্বাস আজও আমাদের হয় নাই। কিম্বা সমস্ত সমাজের পর জড়বাদীর প্রভাব খারাপ এবং আত্মবাদীর প্রভাব সমূহ মঙ্গলজনক এ বিশ্বাসও নাই। অন্ততঃ তাহা হইলে ভারতীয় হিন্দুদের আজ এ দুর্দ্দশা হইত না। যিনি যাহাই বলুন একথা ধ্রুব সত্য যে ভারতবর্ষে

সম্পূর্ণ জড়বাদী কোন ধর্মই প্রচার হয় নাই। চার্ব্বাকের মত সমাজে স্থান পায় নাই। ইংরাজি শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ও সম্পূর্ণ জড়বাদী নহে। বরং রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতির শিক্ষার ফলে তাহারা আজকাল কিছু বেশী পরিমাণেই আত্মবাদী। ইউরোপে চরিত্রগত অধোগতি কতদূর হইয়াছে আমরা জানি না। আর যতদূরই হইয়া থাক তাহা জড়বাদীতার ফলে কি আত্মবাদীতার ফলে তাহাও জানি না। মানুষের জ্ঞানবিকাশের সাধারণ সহজ স্রোতের পথ রুদ্ধ করিয়া ইউরোপে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচারে যে বিশেষ কোন সুফল ফলিয়াছিল একথা ইতিহাস জোর করিয়া বলিতে পারে না। গ্রীস দেশের sophist দের বিরুদ্ধে যে গালাগালি পাওয়া যায় আজকালকার ঐতিহাসিকের মত সে সম্বন্ধে ভিন্নরূপ হইয়া গিয়াছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Grotc বলেন, "The Sophist are a much cabeminated race. Athens at the close of the Peloponnesian war was not more corrupt than athens in the days of Miltiades and aristeides, and we shall not consider the Sophist as corruptors of athenian morality" তবুও আমরা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কথা পরিষ্কার করিয়া শুনিবার জন্য ব্যগ্র রহিলাম। কারণ তিনি নিজ চোখে যাহা দেখিয়া আসিতেছেন তাহার মূল্য যথেষ্ট।

কিন্তু শুধু মূল্য যথেষ্ট বলিয়া ছাপ মারিয়া দিলেই হইবে না। আমাদের সমাজের প্রস্তুত অবস্থার সহিত তাহার একবার তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে। শুধু বেদান্ত ও গীতার আদেশ দেখাইয়া জড়বাদীকে ছোট করিয়া দিলেই বাহাদুরী হইবে না। সে গুণটী আমাদের ও দেখি ষোল আনার উপর আঠার আনা পরিমাণে আছে। আমাদের চরিত্র কি সমাজের গায়ের জোর কেহ দেখাইলেই আমরা একেবারে বেদান্ত ঘুরিয়া টানাটানি ছুড়িয়া দিই। আমাদের প্রতিমুহূর্ত্তের পারিবারিক এবং সামাজিক ব্যক্তিগত জীবন যাপনের মধ্যে আমাদের কতটা মনুষ্যত্বের হীনতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহার একটা ভাল রকম হিসাব করিয়া তবে তুলনা করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের সে বিষয় সম্যক্ জ্ঞান আছে বলিয়াই আমাদের ধারণা। তাঁহার গল্প এবং কবিতাগুলির মধ্যে অনেক স্থলেই আমরা মনুষ্যত্বের নামে পশুত্বের কোন্ স্তরে যাইয়া পৌঁছিয়াছি তাহা বেশ খোলসা করিয়া দেখান আছে। এবং সেই জন্যই আমরা তাঁহার ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার কথা বিশেষ স্পষ্ট করিয়া জানিতে চাহি।

* * * *

পুলিশবিল পাশ হওয়ায় লোকসান কাহার—

লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের এক বৈঠক শেষ হইল। বড় সুখবর অতিরিক্ত পুলিশবায় মঞ্জুর হইয়াছে। যে সব সভ্যগণ পূর্ণ সভার বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার গুরুমশাইর এক তাড়া খাইয়া পক্ষে মত দিয়াছেন। বোঝা গেল তোমাদের। হে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভ্যগণ, মনে রাখিও 'এক বাঘে শীত যায় না।' আড়াই বৎসর পরে আবার সকলের পায় ধরিয়া খোসামোদ করিয়া ভোট সংগ্রহ করিতে হইবে। তখন কোন্ আত্মসম্ভ্রম জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি তোমাদের ভোট দিতে অগ্রসর হইবে? বলিতে পার তেমন লোকের সংখ্যা এদেশে বড় বেশী নয়। তবে তোমাদের কার্য্যে শুধু আত্মসম্ভ্রম বোধে নয়, স্বার্থেরও ঘা দিতেছে। তোমাদের সকলেই চিনিতেছে কিসের লোভে তোমরা তাহাদের পায় ধরিয়াছিলে, দেশের কাজ করিবার ক্ষমতা তোমাদের কতটুকু। যদি ইংরেজের ঘটে বিন্দুমাত্র বুদ্ধি থাকে তাহা হইলে তাহারা সহজেই বুঝিতে পারিবে যে তোমাদের জন্যই দেশের ননকো-অপারেশনের শক্তি বাড়িয়া যাইতেছে। এ জন্য আমরাও তোমাদের

ধন্যবাদ দিই। এবং প্রস্তুত হইয়া থাক, আগামী বারে শুধু ইংরাজী বর্ণমালার গোটা কয়েক ফাঁকা অক্ষর ছাড়া আর কিছু তোমাদের ভাগ্যে ঘটিবে না, —তাও M. L. C. বাদে। কিন্তু তোমাদের চরম লক্ষ্য বোধ হয় সেই পর্য্যন্তই।

আর তোমাদেরও বলি, ইংরাজ শাসনকর্ত্তাগণ, তোমরা কি ইতিহাসের পাতা খুলিয়াও কখন উল্টাইয়া দেখ নাই? রোমের Pretorian Guards, তুরস্কের Janissies দের কথা কি মনে নাই? পুলিশকে আদরে গোপাল করিয়া ক্রমাগত পুলিশের ক্ষমতা বাড়াইয়া দিয়া গেলে তোমাদের নিজেদের অবস্থারই যে কি হইবে তাহা একবার কি ভাবিয়া দেখিবার ক্ষমতাও তোমাদের নাই। শুধু মাত্র অর্থের লোভে যে ব্যক্তি সমাজের শান্তি-রক্ষকের পদ লয়, তাহাকে বিশ্বাস করা ত দূরের কথা, সমাজ হইতে দূর করিয়া দেওয়া উচিত। হাইকোর্টের রায়ে পুলিশের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা হইলেও, পুলিশের সাক্ষীকে "manufactured and concocted" বলিলেও, তোমরা পুলিশকে শাসন কর নাই। তাহার উপযুক্ত ফল আজ কোথায় পুলিশ বলশেভিজম্ দমন করিবে, না সেই বলশেভিক মত গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মঘট করিতে চায়, আর এমনি অদ্ভুত যে পুলিশের অনেক বড় কর্ত্তা তাহাদের সেই কার্য্য সমর্থন করেন। এই বুদ্ধি লইয়া যাহারা রাজ্য শাসন করে তাহারা যে আমাদের স্বরাজ লাভের চেষ্টায় আপত্তি করিবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি!

• • • •

প্রাচীন আদর্শ কি আবার আসিবে?

দেশের ছোট বড় সকলে মিলিয়া এবার এক-বাক্যে রায় দিয়াছেন যে ইংরাজি শিক্ষাই দেশের সব চাইতে অধিক অনিষ্ট করিয়াছে। কথাগুলি যে ভাবে বলা হইয়াছে তাহাতে বুঝায় এই যে সমাজে যত কিছু পাপ দেখা যাইতেছে সে সবই ইংরাজি শিক্ষার ফলে। তাহা হইলে ইহাও বলা হইতেছে যে ইংরাজি শিক্ষা এদেশে প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে দেশ স্বর্গের উপরে ঠাঁই পাইবার যোগ্য ছিল। বেশ পরিষ্কার ভাবে কাহারও কি কিছু মনে আছে; একবার অতীতের পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখ দেখি তোমরা কোথায় ছিলে, আর আজ তোমরা কোথায়? যে ঘৃণিত পতিত অবস্থা সমাজের বক্ষে পাথর চাপিয়া রাখিয়াছিল তাহা যে ক্ষয় হইয়া শেষ হইয়া আসিয়াছে, তোমরা কি এমনি করিয়া চোখের মাথা খাইয়াছ যে তাহা চাহিয়া দেখিয়াও বুঝিতে পার না! মাত্র ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বের কথা কি কাহারও মনে নাই?—যে পারিবারিক শান্তি ও পবিত্রতার তোমরা বড় বড়াই কর, যখন ঘরে ঘরে বহু বিবাহ ছিল তখন সে কথা কে জোর করিয়া বলিতে পারিত। আমাদের একজন শ্রদ্ধাভাজন মহাপুরুষ একদিন বলিয়াছিলেন—"খৃষ্টান না হইয়া যে হিন্দু আছি, সে কেবল রামমোহন রায় জন্মিয়াছিলেন বলিয়া।"—যে দিন ২ বৎসরের ছেলের ও ৮ মাসের মেয়ের বিবাহ দিতে; সেই ৮ মাসের মেয়ে বিধবা হইলে আবার একাদশীর দিন তার নাকের উপর এক ফোঁটা জলের বেশী দিতে না; তোমার সমাজে যে মায়ের বড় বড়াই কর, সেই মায়েরা যেদিন গঙ্গা-সাগরে সন্তান বিসর্জ্জন দিয়া আসিতেন; যেদিন জোর করিয়া স্বামীর চিতার সহিত যুবতীকে বন্ধন করিয়া পুড়াইয়া জগতে সতীত্বের মহিমা ঘোষণা করিতেন; তোমরা কি সেই দিন ফিরাইয়া আনিতে চাও? ভয় নাই, জগতে এমন শক্তিমান কেহ নাই যে তাহা আবার সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে।

বালকের উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়াই তোমাদের রাগের কারণ বেশী হইয়াছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যে তাহা মানুষের জীবনী শক্তির অস্তিত্বের একটা প্রমাণ মাত্র! যে সমাজে এখনও বৃদ্ধের উচ্ছৃঙ্খলতা পশুকেও লজ্জা দেয়, সে সমাজের লোকে কোন প্রাণে বালকের খেলাকে অপরাধী করিয়া বালককে শাস্তি দিতে অগ্রসর হয়।

বরিশালে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্তকে অনেক ছেলে নাকি এই নন্‌কো-অপারেশন লইয়া গালাগালি পর্য্যন্ত করিয়াছিল। ইহাও নাকি ইংরাজি শিক্ষার ফল। কোন প্রাণে তাঁহারা এ কথা বলেন বুঝিতে পারি না। একজন সারা জীবন সহস্র সৎকার্য্য করিয়া আসিয়া হয় ত বাধ্য হইয়া কন্যাকে একটু রহস্য করিয়া বিবাহ দিতে গেলে সহস্র সমাজ যে তাহাকে একঘরে করিত, এবং এখনও অনেক জায়গায় করিয়া থাকে, সেটা কোন্ শিক্ষার ফলে? একজন স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষের সামান্য ত্রুটীর জন্য তাঁহাকে অপরাধী করা, অথবা বিনা অপরাধে কাহাকেও শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য করান, একটু ভাবিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে তাহা বিলাত হইতে আমদানী করা হয় নাই। এখনও পল্লীগ্রামের মজ্জায় মজ্জায় তাহা জড়াইয়া আছে।

তাঁহার স্কুলটাকে Nationalise করিবার সময় অশ্বিনীবাবু আজকালকার ছেলেদের কয়েকটী বিশেষ দোষের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ব্বে নাকি ব্রজমোহন কলেজের ছেলেদের টেষ্ট পরীক্ষার সময় গার্ড দিবার দরকার হইত না। আর এখন কোন ছেলে ক্লাসের কাহারও নামে নকল করিয়াছে বলিয়া নালিশ করিলে, ক্লাসের সকলে মিলিয়া নালিশকারীকে বয়কট করে, এমন কি মারিবে বলিয়া শাসাইয়া থাকে। অবশ্য অশ্বিনীবাবু ঠিক ইংরাজি শিক্ষাকে ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি ইহার কারণ বলিয়াছেন আমাদের শিক্ষার প্রকৃত আদর্শের অভাব। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ইহার আরও কারণ দেখা যায়। আমরা বহুদিন যাবৎ ইংরাজি শিক্ষাকে নানা ভাবে গালাগালি দিয়া বালকের সামনে উহা একরূপ পাপের কার্য্য বলিয়া ধরিয়া দিয়াছি। যাহা প্রকৃত পক্ষে সমাজের অকল্যাণকর, মনুষ্যত্বের সঙ্কোচকারক, তাহার অনুষ্ঠানে কাহারও কোন অপরাধ হইতে পারে এ ধারণা ছেলেদের আর থাকিতে পারে না। এবং তাহার দরুণ একজন আর একজনকে শাস্তি পাওয়াইবার চেষ্টা করিলে সাধারণ মনুষ্যত্বের অভাব বালকে তাহাকে বয়কট করিবে।

কিন্তু ইংরাজি শিক্ষক কি বাস্তবিকই এত নীচ? নন্‌কো-অপারেশনের দল ত ইহাকে বয়কের বাণী বলিয়া সমাজ হইতে তাড়াইতে চাহেন। ইহার পরিবর্ত্তে কি যে তাঁহারা স্থাপন করিতে চাহেন তাহা এখনও ঠিক বুঝিতে পারি নাই। তবে পশ্চাতের যে কাল্পনিক আদর্শ ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন কেমন যেন মনে হয় তাহা কোন দিনই কল্পনার বাহিরে আসিয়া বাস্তব জগতে ঠাঁই পাইবে না।

স্কেলের বইতে একটী সুন্দর উপমা পড়িয়াছি। আরবের মরুভূমে শ্রান্ত পথিক দূরে জল দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। কিন্তু দূর হইতে যেখানে থই থই করা জল দেখিয়াছিল, আসিয়া দেখে সে জল সেখানে আর নাই। সেখানে পায়ের নীচে তেমনি আগুনের ফুলকির ন্যায় বালুকণা। সামনে বহুদূরে আবার তেমনি সুন্দর জল দেখা যাইতেছে। পিছনে চাহিয়া দেখে যেখান হইতে আসিয়াছে—সেখানেও তেমনি সুন্দর জল। ছুটিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, আর সেই অগ্নীবর্ষী বালুকার উপর দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তোমরাও তেমনি পায়ের নীচে কেবল উত্তপ্ত বালি এবং সম্মুখে ও পশ্চাতে জল দেখিতে পাইতেছ। কেহ বা সেই জল ফিরিয়া যাইতে ডাকিতেছ। কিন্তু বড় সত্য কথা সেখানেও সেই আগুনের হলকা, শান্তিবারি কোথাও মিলিবে না। তোমরা মরীচিকার ন্যায় কাল্পিত আদর্শকে আর ফিরাইয়া আনিতে যাইও না।

* * *

শিক্ষার উদ্দেশ্য কি?

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?—এ সম্বন্ধে অনেক বড় বড় কথা শুনিতে পাওয়া যায়। অনেকেই নানারূপ আদর্শের পথে টানিয়া লইতে চান।

ধর্ম, চরিত্র, জ্ঞান,—কোন্‌টারই দাবী কম নয়। কিন্তু যে শিক্ষার প্রধান অংশ, আর যে জন্য প্রত্যেকেরই অধিকাংশ সময় ও শক্তি ব্যয় হয় সে সম্বন্ধে সকলেই চুপ। যিনি যাহাই বলুন চোখের উপর দেখিতেছি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য সামাজিকতা। আজই বলুন আর দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কথাই বলুন, চিরদিনই মনুষ্যত্ব বিকাশ, অথবা ধর্ম্ম, চরিত্র ও জ্ঞানার্জ্জনের নামে মানুষকে সামাজিক আচার ব্যবহার শিখান হইয়াছে ও হইতেছে। সাধারণ আচার ব্যবহার কৃত্রিমতা বালকে জোর করিয়া পালন করিতে শিখানর জন্য শিক্ষক যত ব্যস্ত, তাহার মানসিক বৃত্তিনিচয়ের সহিত তাহার স্বাধীন মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য কোন দিনই তিনি তত ব্যস্ত নহেন। আজও ইংরাজি শিক্ষার দিনে ছেলের জন্য বিষয়ের উন্নতির পূর্ব্বে তাহার ছিলে উন্নতি কতটা হইতেছে সে বিষয়ে সকলের বেশী নজর। এই জন্যই আমরা দার্শনিক ভাবাপন্ন বালকের কাপড়ের কোঁচাটা একটু শিথিল দেখিলেই তাহাকে অসভ্য বলিয়া মার্কা মারিয়া দিই। একি শুধু আজ! চিরদিনই বাহিরের ভড়ং দিয়া মানুষের আন্তরিকতাকে ছোট করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছ। সমাজ কাহাকে কতটুকু সম্মান করিতে হইবে, কোথায় কাহার পশ্চাতে হাটিতে হইবে, ব্রাহ্মণ বয়সে পুত্রের সমান হইলেও তাহার পায়ের ধূলা লইতে হইবে, নিম্নশ্রেণীর কেহ বয়সে ঠাকুর্দ্দার সমান হইলেও এবং আজীবন অতি বড় ধার্ম্মিকের ন্যায় জীবন যাপন করিয়া আসিলেও তাহাকে পায়ের বুড়াঙ্গুষ্ঠ বাহির করিয়া ধূলি দিতে হইবে, এই সব শিক্ষার জন্য বেশী ব্যগ্র। এবং ইহারই অনেকগুলি আজ পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে সমাজ হইতে উঠিয়া যাইবার মত দেখিয়া তোমরা বড় চটিয়া যাইয়া এ শিক্ষাকে অতি কুশিক্ষা বলিয়া গালাগালি দিতেছ। অবশ্য পাশ্চাত্য শিক্ষাও এ দোষ বর্জ্জিত নহে। একদিন ইমুক আশুতোষ চৌধুরী এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে পাশ্চাত্য দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যাহারা লেখাপড়া করিতে আসে তাহাদের অধিকাংশই আসে সামাজিক জীবন যাপন শিক্ষা করিবার জন্য। অবশ্য একথা বলিতেছি না যে সামাজিক আচার ব্যবহার শিক্ষা করা অন্যায়। কিন্তু সমাজের অনেক ব্যবস্থা আছে যাহাতে সমাজেরই অনিষ্ট হইতেছে। সে গুলিকে মানিয়া লইতে শিক্ষা করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত বলিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ মানুষের জ্ঞানবিকাশের সহিত তাহার স্বতঃ-প্রণোদিত বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা সে অন্যের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতে পারে, তাহা ভিন্ন অন্য কষ্ট কল্পিত আদর্শের ছাঁচে ঢালা ব্যবহার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার ফলে মানুষের চিত্তবৃত্তির স্বাধীন স্ফুরণের পথ রোধ করিয়া তাহার বিকাশের মূলে কুঠারাঘাত করা হয় বলিয়াই মনে হয়।

অনেকের মতে শিক্ষার অনেকগুলি অঙ্গ যুক্তত অনাবশ্যক এবং কষ্টসাধ্য হইলেও, শারীরিক এবং মানসিক সংযম, ইংরাজীতে যাহাকে Discipline বলে, তাহার জন্য বিশেষ দরকারী, সম্পূর্ণ অপরিহার্য্য। অবশ্য এই Discipline এর প্রয়োজনীয়তা তাহার পরীক্ষিত সার্থকতার উপর নির্ভর করে, এবং কেহই বলিতে পারেন না যে প্রকৃতির চিরন্তন প্রথা বাদে কতকগুলি কষ্টকল্পিত নিয়মানুবর্ত্তিতা দ্বারা কেহ কোন দিন সার্ব্বজনীন সাফল্য লাভ করিয়াছেন; অর্দ্ধেক সাফল্য, এমন কি দশমাংশ সাফল্য লাভ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। সাফল্য অর্থে আমরা মানসিক বৃত্তি-নিচয়ের সম্যক বিকাশ বুঝিতেছি। তাঁহাদের সাফল্য যাহা হয় তাহা ভিন্নরূপ। তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য মানুষের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ সেই বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন করিয়া তাহাকে কলে পরিণত করা। ভারতবর্ষেও তাহাই হইয়াছে এবং ইউরোপেও আজ তাহাই হইতেছে। যাঁহারা প্রথম শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাঁহাদের আন্তরিকতার ফলে

মনুষ্য সমাজের অনেক উন্নতির পথ চিরকদ্ধ হইয়া থাকিবে।—একটা মনে রাখিলে অনেক বিষয় সহজ হইয়া যাইবে,—Discipline চরম উদ্দেশ্য নয়, চরম উদ্দেশ্য লাভ করিবার একটা উপায় মাত্র। কিন্তু প্রতি পদেই তোমরা তাহা ভুলিয়া যাও।

অবশ্য সমাজে বাস করিতে হইলে কতকগুলি সামাজিক ব্যবহার শিক্ষা করা মন্দ নয়। আর সে সমাজের সমস্ত রীতিনীতির কারণ ও ইতিহাস জানা ভাল। কিন্তু নিজেকে তাহারই অংশবিশেষ করিয়া লইলে সমাজের প্রকৃত পক্ষে অপকার বই উপকার করা হইবে না।

শিক্ষার মধ্যে আজ কিন্তু সামাজিক আচার ব্যবহারগুলিকে জ্ঞানবিকাশের উপরে ঠাঁই দিয়া, এবং ঐগুলিকে অভ্যস্ত করাই মানুষের চরিত্র-বিকাশের চরম মনে করিয়া, আমরা শিক্ষা জিনিষটাকেই এক অদ্ভুত পদার্থ করিয়া লইয়াছি। এই জন্যই পাশ্চাত্য রীতিনীতির গন্ধ পর্য্যন্ত আমাদের সমাজের কাছে আসিলে আমরা নাক সিঁটকাইতেছি। অবশ্য পাশ্চাত্য রীতিনীতি যে গ্রহণ করা উচিত একথা বলি না। সমাজের উন্নতিমূলক এবং ব্যক্তিগত মনুষ্যত্বের বিকাশের সহায় যাহা হইতে পারে তাহা সমাজে স্থাপন করা, এবং তাহার অপকারী বস্তু সমাজ হইতে দূর করা সর্ব্বথা যুক্তি যুক্ত মনে রাখিতে হইবে, সমস্ত বিষয়ের মূল ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।—

• • •

মাসিক সাহিত্য

বাঙ্গালার মাসিক সাহিত্যের বয়স অনেক হইয়াছে। ৺বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শন পঞ্চাশ বৎসরের উপর হইল বাহির হইয়াছে। ভারতবর্ষের আর কোনও প্রদেশে মাসিক সাহিত্য বয়স কিম্বা প্রচার কিছুতেই এত বড় গর্ব্ব করিতে পারে না। আজ অবশ্য বাজারে বাঙ্গালা মাসিকের ছড়াছড়ি। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা মাসিকের আদর কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। বাঙ্গালার অনেকগুলি মাসিক পত্রিকাই বেশ ভাল ভাবে চলিতেছে, গ্রাহক সংখ্যাও এক একখানি কাগজের দেখাইবার মত বটে। বাঙ্গালার শিক্ষার প্রসার এবং তাহার প্রতি সাধারণের আগ্রহের ইহা একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কাগজগুলিতে জ্ঞাতব্য বিষয়ও আজ কাল অনেক থাকে। এবং বাঙ্গালীর ইহা বাস্তবিকই বলিবার কথা যে এই কাগজের দুর্ম্মূল্যতার দিনেও বাঙ্গালার কোনও কাগজের উঠিয়া যাইবার মত অবস্থা হয় নাই।

প্রবাসী

বৈশাখের 'প্রবাসী' দেখিতে সুন্দর হইয়াছে। ছবিগুলিও বেশ হইয়াছে। ব্যঙ্গ ছবি দুখানিও বেশ মর্ম্মান্তিক। ভিতরের সমস্ত বিষয়গুলির এখানে আমরা সমালোচনা করিতে বসি নাই। তবে এ একটী কথা বলিতে হইবে। প্রবন্ধ, উপন্যাস, অন্যান্য তথা যথেষ্ট আছে। দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জগৎ-প্রসিদ্ধ লোকের কথাও আছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের এ মাসেও একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। প্রফুল্লচন্দ্রের দেখিলাম একটী মুদ্রাদোষ আছে। তিনি বক্তৃতা দিতে গেলেই প্রায়ই হয় কলিকাতার না হয় সমগ্র দেশের একদিনের Dictatorship, চাহিয়া বসেন। তিনি অবশ্যই জানেন যে সে Dictatorship তাঁহাকে যদি দিবার মত কেহ থাকিত তাহা হইলে দিবার আবশ্যকও থাকিত না। ইতিপূর্ব্বে একবার কলিকাতার Dictatorship চাহিয়াছিলেন আইন কলেজ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য। ফলে আশুবাবু তাঁহাকে বেশ একটু ঠেস দিয়াছিলেন। আবার এবার Dictatorship চাহিয়াছেন জমিদারদের অর্থ লইয়া, সাধারণের কার্য্যে দিবার জন্য। কিন্তু বাঙ্গালার জমিদারগণ যে সাধারণের উপকারার্থে কোন কার্য্য এ পর্য্যন্ত করেন নাই একথা আমরা বলিতে পারি না। জমিদারদের মধ্যে এখনও অনেক

অশিক্ষিত ; কিন্তু শিক্ষিত অনেক উকীল ব্যারিষ্টার, যাঁহারা নগদ টাকায় সকল জমিদারী কিনিয়া ফেলিতে পারেন, তাঁহাদের টাকা এপর্য্যন্ত দেশের কতটুকু কাজে লাগিয়াছে। অবশ্য ৺রাসবিহারী এবং ৺তারকনাথ চিরদিন আমাদের মাথায় থাকিবেন। জমিদারদের অপরাধ তাঁহারা বিলাসী। কিন্তু বিলাসের কোন সীমা রেখা আজও টানিতে পারি নাই। অনেকে অবশ্য চরিত্রহীনতায় নিজের সর্ব্বনাশ করিতে করিতে অর্থ উড়ান। কিন্তু তাহা বাদে যাঁহারা অন্যভাবের একটু বাবুগিরি করিয়া থাকেন তাঁহাদের কার্য্যকে একেবারে অন্যায় বলিতে পারি না। তাঁহাদের বিলাসিতার দ্বারা শুধু আমাদের দেশে নয়, জগতের কলাবিদ্যা অনেক ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছে। প্রফুল্লচন্দ্র কি সেটুকুও ত্যাগ করিতে বলেন? মহাত্মা গান্ধীর সহিত ইংরাজী শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি ত একমত নহেন দেখিতে পাই। তবে কি মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় তিনি সকলকে বনে জঙ্গলে যাইয়া ঋষি থাকিতে বলেন? তাহা হইলে তাঁহার Science College এর বাড়ীটার আর আবশ্যক কি? প্রজার রক্ত শুষে' ভোগবিলাসের দিন যে ফুরাইয়া আসিয়াছে সে কথা সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া তার বদলাইয়া আবার 'ভিক্ষার্থী হয়ে তাদের কাছে হাত' বাড়ানর দরকার! জগতে সাম্যের প্রচারের সহিত জমিদারের জমিদারী ভাব যে কমাইতে হইবে একথা ত অতি বড় সত্য, এবং শিক্ষার প্রসারের সহিত প্রজাকে ফাঁকি দেওয়াও যে কমিয়া যাইবে তাহাই বা অস্বীকার করিবে কে? কিন্তু তাহাতে রাজ মানবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সেই সাম্য ও স্বাধীনতার জন্যই জমিদারদিগকে ভিন্ন শ্রেণীতে ফেলিয়া দেওয়া চলে না। দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গলার ভূসম্পত্তির বন্দোবস্ত যেরূপ জটিল, তাহাতে তাহার বহু পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে প্রজামনিবের সম্বন্ধ নির্ণয়ই এখানে কঠিন। বাঙ্গালার জমিদার আর প্রাচীন রাশিয়া ফ্রান্সের জমিদার ঠিক একশ্রেণীর জীব নহেন। এই জন্য আমরা কয়েকটী কথা বলিলাম।

'কষ্টিপাথরের' ভিতর 'সবুজ পত্রের' 'উড়ো চিঠির' কিয়দংশ দেখিলাম। যখন ছাপাইলেন তখন সমস্তটা ছাপাইলেই ভাল করিতেন। প্রবন্ধটী অতি সাবধান। অনেক খাঁটী কথা বড় সহজ কথায় ইহাতে লুকাইয়া দেওয়া আছে। "ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ইংরেজের রাজনীতিতে যতটা আছে, আমাদের সমাজনীতিতে তার চার ভাগের এক ভাগও নেই।

"তাই বল্‌ছি আমাদের স্বাধীনতার জন্য হা-হুতাশ আমাদের ঠোঁটের কথা ;—প্রাণের কথা নয়, আত্মার কথা নয়, অর্থাৎ—Superficial ; তাই আমাদের রাজনৈতিক নেতা বা বক্তাদের মুখে রাজনীতির খৈ ফুটতে থাকে, কিন্তু সমাজের দিকে কেউ অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করলেই অমনি তাঁদের ঠোঁট শুকিয়ে উঠে ও গলা কাঠ হয়ে যায়।

"ওর ফলে আমরা ইংরেজী-হ্যাট-কোট-পরা কোন স্বরাজ লাভ করি আর যাই করি, দেখবে এমন একদিন আসবে যখন ঐ স্বরাজ ভেঙ্গে ফেলে আবার আমাদের নতুন করে গড়তে হবেই। কেন্‌ না বিলাতী স্বরাজের পিছনে আমাদের সামাজিক-মন নেই এবং তার পিছনে আমাদের ব্যষ্টির ধর্ম্ম নেই। সে স্বরাজের পিছনে যা থাকবে সেটা হচ্ছে বিলিতি ধন ও বেশী বুদ্ধি। এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে নিও।"

বাস্তবিকই এটা বিশেষ করিয়া ভাবিবার কথা যে আমাদের স্বরাজের প্রার্থনাটা আমাদের সামাজিক ক্রমবিকাশের ফল নহে। বরং অনেকগুলা বিষয়ে কতকগুলি কথা এমন পরস্পর বিসম্বাদী যে শুনিলে হাসি পায়। 'উড়ো চিঠির' এক জায়গায় আছে—

"আমরা আমাদের দেশকে ঐশ্বর্য্যে সম্পদে গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই—এর মানে দেশের

লোকেরা ধন দৌলত অর্জ্জন ও উপার্জ্জন করবে, তার অর্থ সেটা তারা বর্জ্জন করবে না।

"এখন মানুষ যদি ধনদৌলত যশ গৌরব অর্জ্জন করতে চায় তবে তার জন্য তার চাই সত্য আকাঙ্ক্ষা। মানুষের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যে তার কর্ম্ম-প্রেরণার বিশেষ যোগ আছে সেটাত সবার কাজেই স্পষ্ট।

"সুতরাং দেশবাসীদের সম্মুখ থেকে বৈরাগ্যের আদর্শকে অপসারিত করতে হবে এবং তাদের অন্তরাত্মার বস্তুর বিষয়ের ভোগের আনন্দকে সত্য করে তুলতে হবে। তবেই তাদের কর্ম্ম-প্রেরণার সত্য প্রচেষ্টা নিয়োজিত হবে, সে দিকে আনন্দের ভিতর দিয়ে—কেন না অন্তরাত্মার যে সত্য সেই সত্য আচরণেই মানুষের আনন্দ। আর তবেই তা সফল ও সার্থক হয়ে উঠবে।"

"বেতালের বৈঠকে" অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যের মীমাংসা হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকগুলি প্রশ্ন থাকে নিতান্ত অন্ধ ঘুর্ঘের মত। প্রত্যেক প্রশ্নই যে ছাপাইতে হইবে এবং মীমাংসা করিতে হইবে ইহার অর্থ কি! সে ত দেখি এক Epiphany করিয়া থাকে।

"বাঙ্গালী যুবক ও নন কো অপারেশন—

Anonymous Russiaর দিকে ফেরাই একমাত্র পন্থা বলে টুর্গেনিভ তাঁর "Virgin Soil" এ নির্দ্দেশ করেছেন। 'সাত সমুদ্র তের নদীর' তফাৎ থাকলেও সেদিনকার রাশিয়ার সাথে আজকার ভারতবর্ষের তফাৎ বড় নয়;—কথাটা আমাদের সম্বন্ধেও বেশ খাটে। নন কো অপারেশন সেই 'anonymous India'র দিকে ফেরার ডাক।"

তাহা ত বুঝিলাম। কিন্তু সেই পল্লীতে ফিরিয়া তোমরা কি ভাবে তাহার 'anonymous'র ঘুচাইবে সে সম্বন্ধে কোন Definite Scheme কিছু ঠিক করিয়াছ কি? কোন্ আদর্শে পল্লীবাসীর জীবন গড়িয়া তুলিতে চাও সেটা জানাও বিশেষ দরকার।

এবারকার 'বিবিধ প্রসঙ্গে' প্রবাসীর নিজের কথাই অনেক। সে সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া তাঁহারা যে বলিয়াছেন 'রামমোহনের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর মনের ভাব যেন একটু বেশী মনে হইল।' দিলীপ সিংহের নাম লইয়া হয়ত মহাত্মা গান্ধীর একটা ভুল হইয়া থাকিবে। কিন্তু তিনি যে ব্যক্তিগত ঈর্ষা বিদ্বেষের অনেক উপরে, তাঁহার সহিত মতের পার্থক্য যতই থাক না কেন, এ কথা অন্তরে বদ্ধমূল, কেন যেন কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। তাঁহার মনুষ্যত্ব ও আন্তরিকতাকে কিছুতেই ছোট করিয়া দেখিতে পারি না। 'প্রবাসী' সম্পাদকের ন্যায় লোকের নিকট গান্ধীর প্রতি ওরূপ দোষ আরোপ করা আমরা আশা করি নাই।

ভারতবর্ষ

গত ষোল বৎসর যাবৎ দেশে যে সমস্ত আন্দোলন হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গালা সকলের আগে এবং পঞ্জাব সব চাইতে বেশী উৎপীড়িত। শ্রীমতী সরলা দেবী বাঙ্গলার ঘরের মেয়ে, আর পঞ্জাবীর ঘরের বউ। ১৯১৯ সালের এপ্রেল মাসে পঞ্জাবে যাহা ঘটে, তাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের স্বামীকে ধরিয়া লইয়া জেলে পুরিয়াছিল। অবশ্যই তিনি সে সব কথা এত অল্পদিনে ভুলিয়া যান নাই। তিনি কোন্ প্রাণে বহুমূল্যের একখানি পারশি সাড়ি পরিয়া, একটা সোণার ব্রুচ আঁটিয়া, পারশি ধরণে, বাঁকা সিঁথী কাটিয়া, কপালে এক টিপ পরিয়া, মহাত্মা গান্ধীর স্বরাজের আন্দোলনকে, স্বদেশবাসীর প্রাণের হাহাকারকে, উপহাস করিতে বসিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম না। আন্দোলনটা শুধু গান্ধীর নয়; ইহাতে দেশের অনেক মর্ম্মান্তিক বেদনার দীর্ঘশ্বাস হা-হুতাশ ভাসিয়া উঠিতেছে। এত বড় যাতনাকে যাহারা উপহাস করিতে চায়, তাহাদের মনুষ্যত্ব কতটুকু?

'ভারতবর্ষ' এই ছবিটী ছাপাইয়া এবং তাহার পোষকতায় একটী ধা ড়া প্রবন্ধ লিখিয়া দেশের আন্দোলনের সহায়তা করিলেন না ব্যাঘাত জন্মাইলেন ?

শ্রীমতী সরলাদেবী বড়লোকের ঘরের মেয়ে, বিবাহও করিয়াছেন এক ধনীকে। পঞ্জাবের সোসন্যালের সময় তিনি লাট বেলাটের মেয়েদের সাথে নাচগানের দলে মিশিতেন। তাঁহার স্বামী জেলে যাইবার পরেও তিনি স্বেচ্ছায় সে সভা হইতে দূরে কাটান নাই। মাইকেল ও ডায়ারের পত্নীই বোধ হয় বিদ্রোহীর পত্নীর সহিত মেলামেশা রাখিতে স্বীকৃতা হন। আজ চরকা জিনিষটা তাঁহার 'সোসায়টী ড্রেস নয়' চরকা অবশ্যই তাঁহার 'নাতি' নয়, এবং তাহার 'দোয়ারে হাতী বাঁধা' অবশ্যই 'চরকার দৌলতে' নহে। অমন করিয়া ছবি তুলিয়া বিজ্ঞাপন বাহির করিতে তাঁহার আন্তরিকতার অভাবই প্রমাণ হইয়াছে। ওগো, স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়া অমন করিয়া দরিদ্রের তৃণ শয্যা রচনাকে উপহাস করিও না,—অমন করিয়া মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারিও না।

'চরকা' প্রবন্ধে দেখিলাম তেল, পেট্রোল, চিরুণী, সাবান, বাবুগিরির সমস্ত জিনিষকেই গালাগালি দেওয়া হইয়াছে। এদিকে কিন্তু শ্রীমতী সরলাদেবীর সাইন আনা প্রশংসা করিয়া অমন অদ্ভুত ছবি তুলিয়া বাহির করা হইয়াছে। প্রবন্ধটীতে বিশেষ কোন জ্ঞাতব্য বিষয় নাই। কলকারখানাকে মামুলী ধরণে গালাগালি দেওয়া হইয়াছে। কলকারখানার অবশ্য বহু দোষ আছে, কিন্তু তাই বলিয়া চরকাই আমাদের চরম লক্ষ্য নয়। চরকা একটা conventional, একটা make shift arrangement. চরকার আমাদের সাধনার ধন হাতে তুলিয়া দিবে কি না জানি না। কিন্তু নিরন্ন-পান ব্যক্তির হাতের কাছে এই ক্ষুদ্র কণাটাই রহিয়াছে, তবে বড় ভেলা আসিবে বলিয়া সে অপেক্ষা করিতে পারে না।

'Grasham's Law' বাঙ্গালা করিয়া বেশ বুঝান হইয়াছে। অল্প মূল্যের মুদ্রা ও তাহার অধিক মূল্যের মুদ্রা একই সময় চালাইলে যে মূল্যবান মুদ্রাগুলি ক্রমে অদৃশ্য হয় এটা অর্থনীতির একটা প্রাচীন সত্য। এবং ইহা লইয়া প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টকেই সাবধান হইতে হয়। অর্থনীতি সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য তথ্যের বহু আলোচনা আজকালকার দিনে বাস্তবিকই দরকারী।

অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের 'অরাজক দিল্লী' ঐতিহাসিক গবেষণাকারীদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সময়ের দিল্লীর ইতিহাস বড় গোলমেলে। সে সময়কার অনেক কথা পরিষ্কার ভাবে জানিতে অনেকেরই বিশেষ আগ্রহ হইবে।

অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের 'বিহারে বৌদ্ধ কীর্ত্তি' অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। ভারতবর্ষ এ সমস্ত বিষয় সাধারণকে উপহার দিয়া বাস্তবিক শিক্ষার যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন।

প্রবাসীর 'পঞ্চশস্যের' ন্যায় ভারতবর্ষ 'নিখিল প্রবাহ' ঢালিয়া থাকেন। তবে প্রবাহের সাথে অনেক আবর্জ্জনা ভাসিয়া আসে। বোধ হয় বড় কাগজের ভালে ভোলে অনেক আগাছা গ্রাধিয়া যায়।

সবুজ পত্রের 'উড়োচিঠি' ভারতবর্ষ সম্পূর্ণই ছাপিয়াছেন। এ প্রবন্ধের এখানে আর বিস্তৃত সমালোচনা করিব না। প্রবন্ধটী সকলেই বিশেষ ভাবে পড়িবেন।

শরৎ বাবু শ্রীকান্তের তৃতীয় পর্ব্ব আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার মোহিনী শক্তিসম্পন্ন লেখা সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই। তবে প্রথম দুই পর্ব্বে চরিত্রগুলি যেরূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, এ পর্ব্বে আমরা তাহার পরিণতি দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া রহিলাম।

Printed by P. N. Pal, at the Shastraprachar Press, 5 Chidammudi Lane, and Published by P. N. Pal, 86-3 Scott Lane, Calcutta.

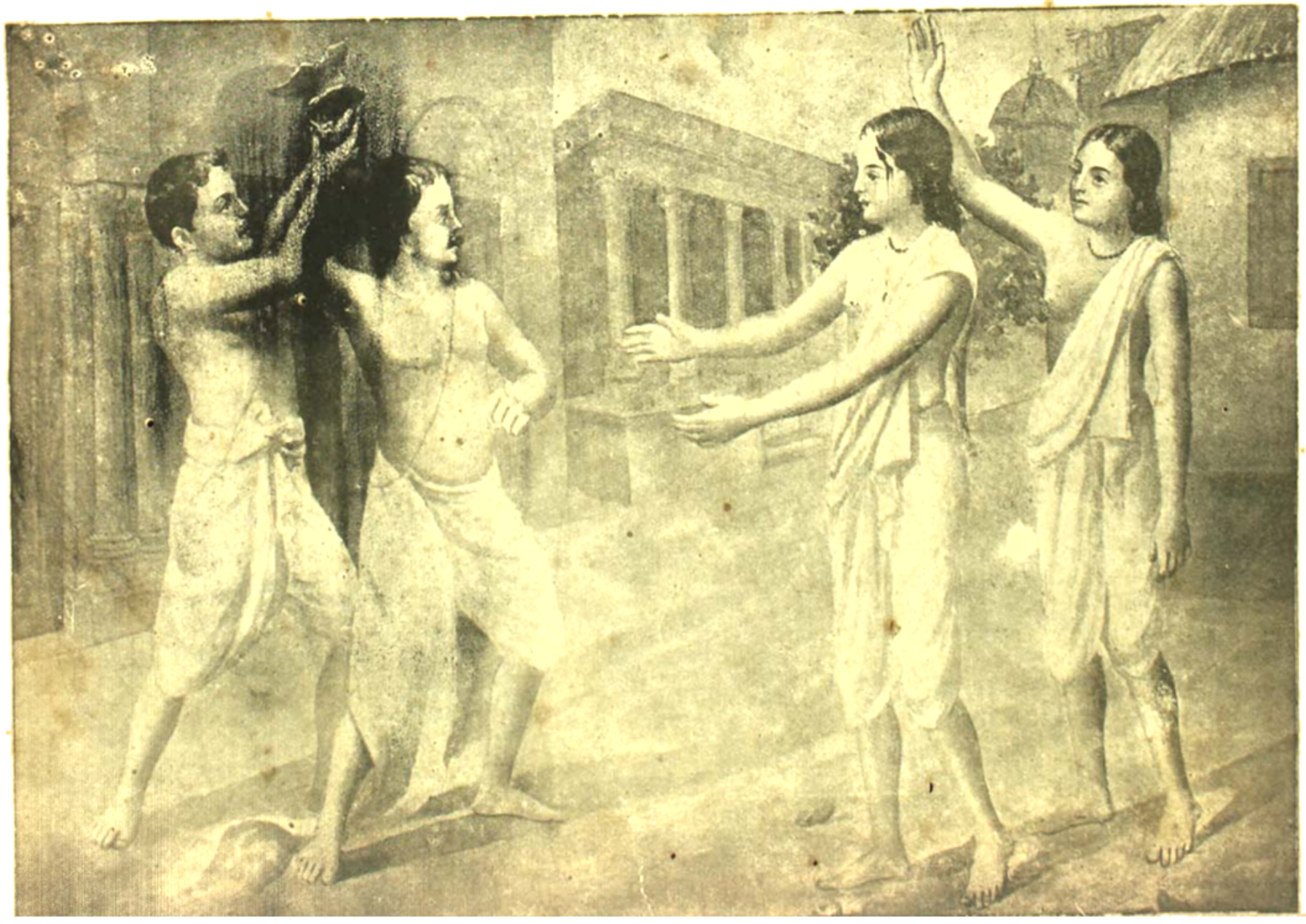

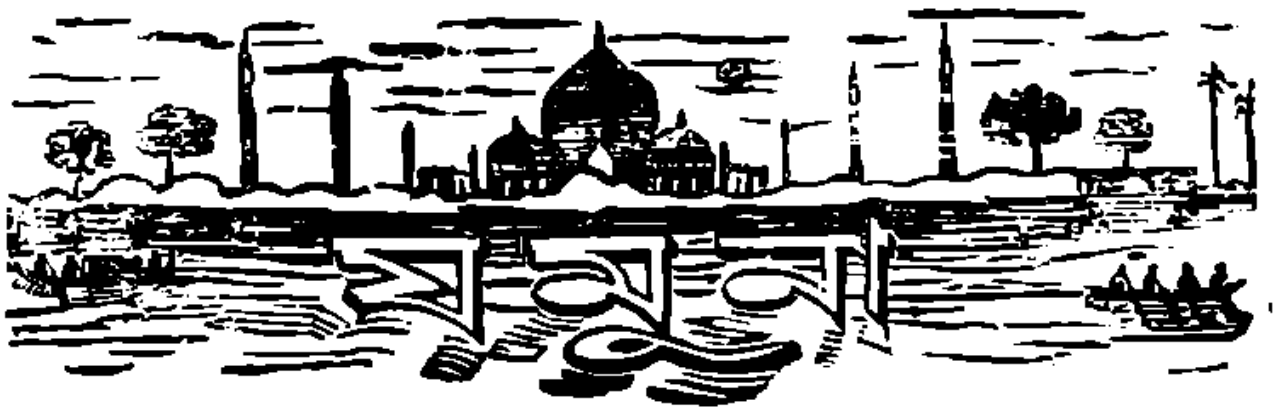

১১শ বর্ষ | আষাঢ়, ১৩২৮ | ৩য় সংখ্যা

বিভ্রম

(শ্রীলীলা দেবী)

ওগো ওগো সখি, দুয়ারে আমার
ভিখারী এসেছে আজ—
নবজলধরবরণকান্তি
পরণে গেরুয়া সাজ ;
করতালি দিয়ে হরিনাম গায়
বলে শুধু হরি হরি,
ভাবে দু'নয়ন ঢুলু ঢুলু করে —
কি যে রূপ মরি মরি !

আহা ! ওগো সখি, রুক্ষ হয়েছে
চাঁচর চিকুর কেশ,
কোথা সে চিকণ নধর নবীন
কোথা সে মোহন বেশ ;
রাধা রাধা বলে' কাঁদে উভরায়
ভূমে যায় গড়াগড়ি,—
ঐ কি রে এলো কৃষ্ণ আমার
ভিখারীর বেশ ধরি !

ওগো চেয়ে দ্যাখ্ ঐ বুকি বুকে
রাধা নাম আছে লেখা,
চরণের তলে বিশ্ব ভুবন
ঐ বুকি যায় দেখা।
যালো তোরা ত্বরা হাতে ধ'রে ওরে
নিয়ে আয় মোর পাশে —
ওগো লো ললিতে, সেই সুবদন
তেমনি মধুর হাসে !

আহা সে যে নারে কহিতে বলিতে
গদ গদ আঁখি জলে,
না লো তোরা তারে দিস্‌নে কো ব্যথা
মিছা উপহাস ছলে,

আহা সখি শ্যাম প্রেমে টলমল
মুখে অনুরাগ সাজ—
রাধার দুয়ারে ছলনা করিয়া
ভিখারী সেজেছে আজ !

কয়েদীর কথা

(বড় গল্প)

(শ্রীসুধাংশুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২৬)

পরদিন আবার সে বলিতে লাগিল :—

সে রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম মামা ঘরে নাই। একজন উড়িয়া চাকর ঘরদুয়ার ঝাঁট দিবার জন্য আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম "কি রে সনাতন, ঝাঁট দিবি ?"

সনাতন বলিল হাঁ'। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সনাতন ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিল। আমি বলিলাম "সনাতন, তোর চাকরী কতদিনের ?"

সনাতন বলিল "এখানেই পাঁচ বৎসর হইল।"

"কয় পুরুষ চাকরী করিতেছিস্ ?"

"দুই পুরুষ।"

"আগে কি করিতিস্ ?"

"চাষ করিতাম।"

"চাকরীর চেয়ে কি চাষবাস ভাল নয় ?"

"না বাবু এখনও আমাদের চাষ আছে।"

"শুধু চাষই কর না ; চাকরী করিবার দরকার কি ?"

"না বাবু চাকরী না করিলে কি চলে ?"

ভাবিলাম চাকরীর একটা নেশা আছে, পরমুখাপেক্ষী হইয়া অন্য শক্তিতে অন্য ভাবনায় অন্য দায়িত্ব লইয়া যেন মোহের ঘোরে একরূপে দিনাতিপাত করা যায়, আমি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

সনাতন ঝাঁট দিয়া চলিয়া গেল। আমি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম বালিসের নীচে যে সিকিটা রাখিয়াছিলাম, তাহা নাই। মামা ট্রামওয়ের কণ্ডাক্টরকে ফাঁকি দিতে পারেন, আমার পয়সা তিনি কখনই না বলিয়া লইবেন না, কেননা তিনি শিক্ষিত, সব চুরিকে তাঁহার নীতিশাস্ত্র প্রশ্রয় দিবে না এ বিশ্বাস আমার ছিল। সনাতনই যে আমার পয়সা চুরি করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ রহিল না। একবারি ভাবিলাম—তাহাকে সাজা দিই, তারপর ভাবিলাম সে গরীব—তাহাকে ক্ষমা করাই আমার উচিত।

তৎক্ষণাৎ সর্দ্দারের কথা মনে পড়িল। বুঝিলাম আমি যে কারণে সনাতনকে সাজা দিতে চাই না, সর্দ্দারও বোধ হয় সেই কারণে রতনকে সাজা দিতে এমন কি তাহার নিকটে আত্মরক্ষা করিতেও

অনিচ্ছুক। আমার কাছে একটা সিকির মূল্য কত-খানি, তাহার নিকটে তাহার সঞ্চিত সব অর্থই সেইরূপ মূল্যবান্। সর্দ্দারের উপর ভক্তি আসিল। ধীরে ধীরে ছাদের উপর উঠিলাম।

তখন মাঘের শেষে বসন্তের বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। নগরের সৌধশ্রেণীর উপর সূর্য্যের কিরণ প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। গাছপালা দুই একটি দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা সহরের হাওয়ায় চির-মলিন হইলেও এখন বসন্তের আভায় ঈষৎ রঞ্জিত হইয়াছে। ছাদের কয়েকটা ছোট ছোট অশ্বত্থ গাছ সতেজ হইয়া উঠিয়াছে। টবের ফুলগাছগুলি ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। মামা কতকগুলি ফুল ছিঁড়িয়া নিকটে জড় করিয়াছেন এবং গুন্ গুন্ করিয়া ইংরাজী কবিতা পাঠ করিতেছেন।

মামা নীচ নামক। ইংরাজী চালচলন অনুকরণ করিতে করিতে তিনি আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। এতদিন ধরিয়া তিনি বাস্তবিক কিরূপ মানুষ তাহা ঠিক করিতে পারি নাই। আজ বুঝিলাম তাঁহার প্রাণ সরস, তিনি সৌন্দর্য্যের উপাসক। সেদিন তাঁহার কবিতার খাতাটা দেখিতেছিলাম। তিনি নিজেও তাঁহার রচিত অনেকগুলি কবিতা আমাকে শুনাইয়াছিলেন। সব গুলিই প্রেমের কবিতা। সব কবিতাতেই তিনি কোন রমণীর প্রতি আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন এইরূপ একটা ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

আমি মামার নিকটে আসিয়া বসিলাম। প্রাণে আর সরসতা নাই, পৃথিবীটা যেন কেমন শুষ্ক স্ফূর্ত্তিহীন বলিয়া মনে হইতেছে। হায়রে প্রেম কোথায়? মানুষের দোষই দেখিয়া আসিতেছি। প্রেমের পরিবর্ত্তে অন্তরে ঘৃণার সঞ্চার হইয়াছে, ভক্তি, স্নেহ, মায়া মমতা আর অন্তরে নাই। কেবলই আপনার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে পরের ভাবনা ভাবিবার অবকাশ পাই নাই; যে সব অন্ত-বৃত্তি পরকে আত্মসমর্পণ করিবার সহায়তা করে, তাহার অস্তিত্বলোপ পাইয়াছে। সেদিনকার বসন্ত প্রভাতে প্রাণটা হঠাৎ কিসের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া বলিলাম "মামা, আপনিত অনেক প্রেমের কবিতা লিখিয়া-ছেন। উচিত কাজ করিতে গেলে প্রেমে কি জলাঞ্জলি দিতে হয় না?"

মামা বলিলেন "না, প্রেমের দ্বারা অনেক উচিত কাজ সুন্দরভাবে করিতে পারা যায়?"

"আবার অনেক উচিত কাজে প্রেম বাধাও দেয়।"

"তা দিক্, তবুও প্রেম বড় উচ্চ জিনিষ।"

"অসামাজিক বা অন্যায় প্রেমকে আপনি প্রশ্রয় দেন কি?"

"প্রকৃত প্রেম অসামাজিক হইলেও শিক্ষিত লোকের কাছে ঘৃণা নয় যেমন রাধাকৃষ্ণের প্রেম।"

"রাধাকৃষ্ণের প্রেম ত লোকের কাছে নিন্দনীয় নয়, কিন্তু সামাজিক প্রেম যে নিন্দনীয়।"

"লোকনিন্দায় কিছু যায় আসে না। তবে শিক্ষিত লোকেরই নিন্দা গ্রাহ্য।"

"না মামা, আপনার কথা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। স্বয়ং রামচন্দ্র যে লোকনিন্দাকে গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই, তাহাকে এত সহজে উড়াইয়া দেওয়া আপনার আমার মত সংসারী লোকের উচিত নয়।"

"রামচন্দ্র কাজটা কি ভাল করিয়াছিলেন?"

"রামচন্দ্র আপনার কাঠগড়ায় দাঁড়াইবার উপযুক্ত নন।"

"রামচন্দ্র প্রাচীন কবির কল্পিত।"

"শুধু কবি নয় ঋষির কল্পিত, সুতরাং সত্য।"

"ওঃ তুমি বড় orthodox.

মামা চুপ করিলেন। আমি ভাবিলাম মামা কেমন লোক? ইনি রামায়ণকে সাধারণ কাব্যগ্রন্থ মনে করেন ধর্ম্মগ্রন্থ মনে করেন

না। কবি ইহার নিকট কবিতা লেখকমাত্র। কবি একজন প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রমণ্ডিত পরকেশ পৈরিকধারী বেদান্তাদিগড় ইংরাজীভাষানভিজ্ঞ মানুষ। আরবকাব্যই আমাই তাঁহার কাছে সভ্যতা এবং ইংরাজী আমাই শিক্ষা। কাম তাঁহার কাছে প্রেম, ক্রোধ পুরুষত্ব, লোভ একটা দোষই নয়,—সকলেরই আছে সুতরাং তাহা নিন্দনীয় নয়, মাৎসর্য্য প্রয়োজনীয়, কেন না তাহা প্রতিযোগিতা আনিয়া দেয়।

মামী পণ্ডিত হইতে পারেন, কিন্তু ইহার জন্য তাঁহার মনুষ্যত্ব বাড়িয়াছে একথা স্বীকার করিতে পারি না। তিনি আপনাকে ধনশ্বী মনে করেন। কলিকাতা তাঁহার জগৎ, এখানকার মানুষই তাহার জগতের অধিবাসী, এখানকার শিক্ষাই উচ্চশিক্ষা এবং এখানকার সভ্যতাই তাঁহার জগতের সভ্যতা। তিনি বুঝিয়াছেন আমরা আমাদের পিতৃপিতামহের চেয়ে জ্ঞানী, অর্থ তাঁহার পরমার্থ, হাততালি তাঁহার বিজয়দুন্দুভি, বাক্য আর লেখনী তাঁহার অস্ত্র, বড় লোকের তোষামোদ করা তাঁহার কৌশল। ইনিই শিক্ষাদাত্রী ভবিষ্যৎকালের মনুষ্য ইঁহারই আদর্শে গঠিত হইতেছে। কয়দিন মামার সঙ্গে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহার চরিত্র যতটা বুঝিয়াছি, তাহা বলিলাম।

মামা চুপ করিয়া বই পড়িতেছিলেন একটা প্রশ্ন হঠাৎ মনে জাগিয়া উঠিল, বলিলাম "মামা, আপনি ত প্রেমিক, জগতে কি ভালবাসেন?"

মামা বলিলেন "যাহা ভালবাসিবার তাহাই"

"যাহা ভালবাসিবার নয়?"

"তাহা ঘৃণা করি।"

"সকলেই ত তাহা করে, আপনার বিশিষ্টতা কোথায়? একটাও ঘৃণ্য জিনিসকে ভালবাসিয়াছেন কি?"

"ঘৃণ্য জিনিষকে ভাল বাসা কখনই উচিত নয়।"

"ঘৃণ্য জিনিসে আসক্তি ভাল নয়, তাহাকে ভালবাসা দোষ হইতে পারে না।"

"আসক্তি ছাড়া ভালবাসা টিকিতে পারে না। আসক্তিবিহীন ভালবাসা বৈরাগ্যের নামান্তর। সন্ন্যাসী কি ভালবাসিতে পারে?"

"ভালবাসা কি তাহা সন্ন্যাসী বৈরাগীই জানে। যীশু জানে, বুদ্ধ চৈতন্য জানে, প্রত্যেক বৈরাগীর হৃদয়ই ভালবাসায় পরিপূর্ণ আপনারা যাহাকে love বলেন, তাহা ভালবাসা নয় আসক্তি।

"আচ্ছা তোমার কথার আর একদিন জবাব দিব। আজ আর সময় নাই কলেজে যাইতে হইবে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মামা উঠিলেন। রৌদ্র তখন প্রখর হইয়া উঠিয়াছে।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় যেন নিস্তব্ধ হইয়াছে। চাকরেরা কাজ সারিয়া যে যাহার বাসায় চলিয়া গিয়াছে। সেদিন বোধ হয় আমি একাই ছিলাম। বহুদূরে একজনদের গৃহের মধ্য হইতে একটা পিঞ্জরাবদ্ধ কোকিল চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল, আমি ভাবিতে লাগিলাম আজ আমার অন্তর আনন্দ বিহীন কেন।

মনে পড়িল বাল্যকাল; তখনকার জগতে যে আলোক দেখিয়াছিলাম তাহা এখন নাই। তারপর সুকৃতিদের বাড়ীতে ও দর্জ্জারের নিকটে যে কয়দিন কাটিয়াছে সে কয়দিনও আনন্দে কাটিয়াছে। যেদিন দর্জ্জারের নিকট হইতে ফিরিয়া সুকৃতির সঙ্গে দেখা করিয়াছি যেদিন সে আমাকে শিবের, ব্রত তেজস্বী হইতে বলিয়াছে, সেইদিন হইতে বিশ্বজগৎ যেন একটা বহ্নিশালার মত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেইদিন হইতে চারিদিক শূন্য, আর পৃথিবীতে ভালবাসার কোন জিনিস দেখিতে পাই না। বুঝিলাম মামার সঙ্গে যাহা তর্ক করিয়াছি তর্কের খাতিরে যে কথা কহিয়াছি তাহা প্রাণ দিয়া অনুভব করি নাই। সত্যসত্যই আসক্তি

বিহীন ভালবাসার অস্তিত্ব নাই। মামাজ্ঞ কথাই ঠিক।

পাশের বাড়ীতে একটি শিশু কাঁদিতেছিল। শিশুর মাতা নানা কথা কহিয়া তাহাকে ভুলাইতেছিলেন, আমি সেই মাতৃকণ্ঠের কলস্বর শুনিতেছিলাম প্রাণ কোথায় কোন্ অগম্য রাজ্যে ছুটিয়া গেল। ভাবিলাম সংসারে স্বর্গ সুখলাভ করা যায়। আমি ও সে সুখ পাইতাম, কিন্তু আপনার দোষে তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি।

বসন্তের অপরাহ্ণ সূর্য্যের সুস্পর্শ লাবণ্যধারা যখন চারিদিকে ক্ষরিত হইতেছিল, তখন উঠিলাম। কলে জল আসিয়াছে। মেথর চাকর কাজ করিতে আসিয়াছে। ঘরের বাহিরে আসিতেই বৃদ্ধা দাসী আমাকে বলিল "আমি আজ তাড়াতাড়ি বাসায় যাইব, বাবুর একখানা চিঠি আছে এই নাও। আমার মেয়ের বড় অসুখ। চুপি চুপি এখানা বাবুকে দিও।"

চিঠিখানি এপিঠ ওপিঠ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। খামটিতে সুগন্ধ আছে। একটা কৌতূহল হইল। ধীরে ধীরে খামটি খুলিয়া চিঠি খানি পড়িলাম। আবার চিঠিখানি পূর্ব্বের মত মুড়িয়া রাখিলাম।

চিঠিখানি পড়িয়া বুঝিলাম মামার একটি প্রণয়িনী আছেন। তিনি পথের ধারে বসিয়া দিবসে পান বিক্রয় করেন এবং রাত্রে মামার মন প্রেমিকদের প্রেমপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করেন। রাত্রি আটটার সময় আজ কোন একটা বিশেষ প্রয়োজনে তিনি মামাকে ডাকিয়াছেন। মামার উপর একটু ঘৃণা আসিল। তারপর ভাবিলাম তাঁহার মত হতভাগ্যের আর অন্য কি পথ থাকিতে পারে।

পত্রখানি মামার টেবিলের উপর রাখিয়া বাহিরে আসিলাম। স্থির করিলাম এই প্রণয়িনীকে একবার দেখিতে হইবে। কলিকাতায় আসিয়াছি, এখানকার রহস্যগুলি যতটা পারি জানিয়া যাই।

মামা বেলা ফিরিয়া বৃদ্ধা ঝিকে ডাক দিলেন। আমি বলিলাম "তাহার মেয়ের অসুখ, সে তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়াছে একখানা পত্র আপনার জন্য রাখিয়া গিয়াছে।"

মামা বলিলেন "কি পত্র দেখি।"

আমি বলিলাম "টেবলের উপর আছে দেখুন।"

পত্রপাঠ করিয়া মামা অন্যমনস্কভাবে ঘরের বাহিরে আসিলেন, আমাকে বলিলেন "একটা সভা আছে, আমার ফিরিতে কিছু বিলম্ব হইবে।"

সন্ধ্যার সময় মামা সাজসজ্জা করিয়া ছড়ি হাতে বাহির হইলেন।

আমি বলিলাম "মামা, আমিও একটু বেড়াইয়া আসি।"

মামা বলিলেন "কোথায় যাইবে?"

আমি বলিলাম "আপনি যেখানে যাইবেন?"

মামা বলিলেন 'মা, আমি সভায় যাইতেছি, সেখানে তোমায় কে চিনিবে?"

"নাইবা চিনিল।"

তাহাতে তোমার অপমান আছে।"

"থাকুক আমার তাহাতে ভয় নাই।"

"সেখানে আমাদের অনেক বড় বড় কথা আলোচনা হবে তুমি কি বুঝিবে?"

"আমি বোবার মত দাঁড়াইয়া থাকিব।"

"লোকে হাসিবে।"

"হাসুক।"

"আমি তোমার অপমান সহ্য করিতে পারিব না?"

"মাইবা সহ্য করিলে।"

"বন্ধু বিচ্ছেদ হোক, ইহাই কি তোমার ইচ্ছা?"

"কখনই নয়, বন্ধুবিচ্ছেদ করিবেন কেন?"

মামা চটিয়া উঠিলেন, বলিলেন "আমি আজ যাওয়া বন্ধ করিলাম।"

আমি বলিলাম "তবে আমিও যাইব না।"

মামা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বলিলেন "তুমি

বসিয়া থাক, আমি শীঘ্রই একটি বন্ধুর সহিত দেখা করিয়া আসিতেছি।"

আমি বলিলাম "আমিও আপনার সহিত যাইব।"

মামা বলিলেন "সে আমার বন্ধু তোমার কেহ নয়।"

আমি বলিলাম "তোমার বন্ধু যে সে আমারও বন্ধু।"

মামা বলিলেন "আমি যাহা চাই তুমিও কি তাহাই চাহিবে?"

আমি বলিলাম "নিশ্চয়ই, আপনার সঙ্গে যখন আমার আত্মীয়তা তখন আপনি যাহা চান্ তাহাই চাহিব।"

মামা বলিলেন "আমি বেশ্যালয়ে যাইব, তুমি যাইবে?"

আমি বলিলাম "কোন আপত্তি নাই।"

"ওঃ তাহা হইলে তুমি দুশ্চরিত্র।"

"তাহা না হইলে আপনার-সহিত বন্ধুত্ব হইবে কেন?"

মামা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন "জান আমি বেশ্যালয়ে যাওয়া ঘৃণা করি।"

আমি বলিলাম "জানি, তবে ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় বোধ হয় যাইতে হয়।"

"না—না—কাহারও মধ্যে যদি প্রকৃত love এর আস্বাদ পাই, তাহা হইলে সেটাকে অস্বীকার করিতে পারি না। তুমি কি জানিতে চাও গণিকার মধ্যেও প্রকৃত প্রেম আছে?"

"প্রকৃত প্রেম কি বুঝি না, তবে বেশ্যালয়ে লোকে যায় কেন, তাহা জানিতে চাই?"

"যায়—আনন্দের জন্য, তুমি কি একটু আমোদ আহ্লাদ করিতে চাও বাবু?"

মামা মৃদু হাসিলেন। আমি বলিলাম "তাই চল মামা। কলিকাতায় আসিলাম। এখানকার রস কিছু গ্রহণ করা উচিত।"

মামা বলিলেন "তবে চল, একথাটা এতদিন বল নাই কেন?"

আমি বলিলাম "মামা, আর একটা খারাপ কাজ করিয়াছি। তোমার গুপ্তচিঠিটা পড়িয়াছি।"

মামা বলিলেন "তাহা বুঝিয়াছি, কাহাকেও কিন্তু একথা বলিস্ নি, লোক নানা প্রকৃতির—নানা লোকে নানা কথা বলিতে পারে?"

আমি বলিলাম "আচ্ছা, এসব কথা কি কখনও কেহ প্রকাশ করিতে পারে?"

এইবার দুই জনে একসঙ্গে চলিলাম। সন্ধ্যার পর বসন্তের বাতাস সর্ব্বাঙ্গে একটা আনন্দের স্ফূর্ত্তি সঞ্চার করিয়া তুলিয়াছিল। কয়দিন মামার সঙ্গে একটু আধটু রহস্যালাপও চলিয়াছিল। সেই জন্য তিনি গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ করিয়া একেবারে আমার ইয়ার হইয়া পড়িতে একটুও দ্বিধা করিলেন না।

প্রশস্ত পথ ছাড়িয়া ক্রমশঃ গলির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম সালঙ্কারা রমণীরা পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। ইহাদের মুখে হাসির অন্ত নাই, সর্ব্বাঙ্গে বিলাসভাব তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছে। পুরুষের উদ্ধত সাত্ত্বিকে সংযত করিবার এমন সুচারু বন্ধন বিশ্বজগতে আর নাই। শুনিলাম তাহাদের কলকণ্ঠের সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে মুগ্ধ না হওয়াই বিচিত্র। মামার দোষ কি? যোগীর সংযমবন্ধনও এখানে শিথিল হইয়া যায়।

ক্রমশঃ বাক্য স্তব্ধ হইয়া গেল। দুই জনে নীরবে চলিতে লাগিলাম। একটি কুটীরের নিকট আসিয়া মামা বলিলেন "এস বাবাজী।"

মামা কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি এই সমাজের চিত্রটা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। এখানে মত্ততা আছে, লালসার কুৎসিত তরঙ্গে এখানকার নরনারী বিক্ষুব্ধ। এখানে গার্হস্থ্য আশ্রমের

সংযম নাই, নিয়ম নাই, কর্ম্ম নাই, আছে কেবল মত্ততা, অনিয়ম ও অকর্ম্ম। এখানে পাশবপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে, যে প্রবৃত্তি মনুষ্যোচিত তাহার পরিতৃপ্তি বোধ হয় এতটা শিথিলতার মধ্যে অসম্ভব।

কিছুক্ষণ বাহিরে দাঁড়াইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম মামা একটি রমনীর সহিত কথা কহিতেছেন। রমনী আমাকে অতি পরিচিতের মত সম্বোধন করিয়া বসিতে বলিল। আমি বসিলাম।

মামার সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া রমনী আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। আমি একবার তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলাম। রমনী সুন্দরী, তাহার বাক্যে ও ভাবভঙ্গীতে অমৃত ক্ষরিত হইতেছে। এত রূপ গৃহস্থ কুটীরের উপযুক্ত নয়, পশুপ্রবৃত্তি উদ্দাম পুরুষের মনকে একত্ব করিবার জন্য এই রমনী উপযুক্ত বৃত্তিই বাছিয়া লইয়াছেন।

রমণী আমার নিকট তাহার স্বভাবসুলভ চাপল্য প্রকাশ করিতে না করিতেই আমি বলিলাম "আমি ভাগিনেয়, মামীমা, আজ আপনাকে দেখিতে আসিলাম।" ব্রাহ্মণসন্তান আমি সেই সৌন্দর্য্যের আধারভূতা রমণীর পদস্পর্শ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলাম না। চিত্রার্পিতার মত সে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর বলিল "তবে বাবা বস, আমি আসিতেছি" রমণী চলিয়া গেল। মামা তাহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন, আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম।

যে বেশ্যা, সেও নিমেষে মাতৃভাব গ্রহণ করিতে পারে। সে যখন আমাকে বসিতে বলিল আমি দেখিলাম তাহার স্নেহদগ্ধ দৃষ্টি ঠিক আমার জননীর মত! হায়! অনেক জিনিষ বুঝিলাম, স্ত্রীচরিত্র বুঝিতে পারিলাম না।

যখন সে ফিরিলাম তখন রাত্রি দশটা। আহারাদির পরে মামাকে বলিলাম "মামা, আমি আপনার ভাগিনেয় পুত্রস্থানীয়, আমাকে উপদেশ দিতে হইবে।"

মামা বলিলেন "হঠাৎ এত গম্ভীর বাবাজী।"

আমি বলিলাম "আপনি সাহসী নির্ভীক—আমার গুরুস্থানীয়, আমাকে উপদেশ দিন্।"

আমি আমাদোড়া আমার ও সুকৃতির কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলাম। তারপর বলিলাম "এখন আমার কর্ত্তব্য কি বলিতে পারেন?"

মামা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন "তোমার উচিত সুকৃতিকে বিবাহ করা।"

"সুকৃতির কি উচিত?"

"তাহারও উচিত তোমাকে বিবাহ করা, এ বিবাহের উদ্যোগ আমিই করিব। প্রথমে এসব বিষয় জানিতাম না, সেই জন্য যখন সে তোমার সহিত নিভৃতে কথা কহিত, তখন আমি বাধা দিতাম।"

সত্য সত্যই মামা নির্ভীক, আমার কথায় কথায় যুক্তি তর্কের বাধা তিনি কোনমতেই গ্রাহ্য করেন না। তিনি পদে পদে ভীরু কাপুরুষের মত সংকুচিত হন্ না; ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তিকে তিনি যে প্রশ্রয় দেন, তাহা নয়। যখন তাহা সর্ব্বথা অধর্ম্ম মনে করেন তখন তাহাকে চরিতার্থ করিতে কিছুমাত্র সংকোচ করেন না। তাঁহার জ্ঞান তাঁহাকে সাহস দিয়াছে, আমার জ্ঞান আমাকে ভীরু করিয়াছে। সাহসই পুরুষত্ব—নিঃসংকোচে যে কাজ করিতে পারা যায়, তাহাতে পাপ নাই, আত্মগ্লানিও নাই—ইহাই আমার বিশ্বাস। এতদিন তাহার সহিত মিলিয়া মিশিয়া বুঝিয়াছি তিনি যাহা ভাল বোঝেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন—আমার মত কেবল এদিক সেদিক ভাবিয়া দীর্ঘসূত্রটা অবলম্বন করেন না।

পরদিন সকালে উঠিয়া বলিলাম "মামা, আজই এখান হইতে চলিয়া যাইব।"

মামা বলিলেন "তিনটার ট্রেণে রওনা হও, আমার সঙ্গে যাইবার সময় দেখা হইবে না। তুমি যাও, আমিও দিদির সঙ্গে শীঘ্রই সাক্ষাৎ করিব।"

আহারাদির পর রাত্রার আয়োজন করিলাম। প্রথমে চলিলাম গঙ্গার দিকে। অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া রতনের দোকানে উপস্থিত হইলাম, বলিলাম "রতন তোর দোকান বন্ধ কর, আমার সঙ্গে চল।"

রতন বলিল "কোথায় ?"

"সন্ধ্যের কাছে"

"আমি যাইব না।"

"তোকে যাইতেই হইবে ?"

"আমি কখনই যাইব না।"

"না যাস্, তোর ক্ষতি হইবে ?"

আমি জানিতাম, রতনকে ভয় দেখাইলে সে জড়সড় হইয়া পড়ে। সেই জন্য বলিলাম "যদি না যাস্, তোকে পুলিশে দিব, জানিস্ তুই ডাকাত ?"

রতন বলিল "কবে যাইবে।"

আমি বলিলাম, আজ—এখনি ওঠ, দোকান বন্ধ কর ?"

রতন উঠিল। আমরা ষ্টেশনের দিকে চলিলাম।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কয়েদী চুপ করিল। আমি বলিলাম "এই খানেই শেষ নাকি ?"

কয়েদী বলিল "হাঁ, আজ এই পর্য্যন্ত।"

(২৭)

পরদিন কয়েদী নিকটে আসিয়া বলিল "দেখুন, কথাগুলা হয়ত ঠিক গুছাইয়া বলিতে পারিতেছি না, বেশ করিয়া বুঝিয়া যান্ — এইবার গল্পের শেষ অংশে আসিতেছি।"

আমি বলিলাম "আপনার ধর্ম্ম কি ? এই কথাটার উত্তর দিন্ ত। আপনি কি যথেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেন।"

কয়েদী বলিল "কখনই নয়, আমি চাই স্বাধীনতা দাসত্ব নয়—প্রভুত্ব। আমি শাস্ত্র মানিতে চাই না, গড়িতে চাই। নরকে যাইতে হয় স্বেচ্ছায় যাইব, যদি মরিতে হয় স্বেচ্ছায় মরিব। ইহাই আমার ইচ্ছা।"

আমি বলিলাম "এইবার গল্প আরম্ভ করুন।"

কয়েদী বলিতে লাগিল—

প্রথমে মনে করিয়াছিলাম—সর্দ্দারের নিকট চলিয়া যাইব, কিন্তু তাহা হইল না। প্রথমে সুকৃতিদের বাড়ীতেই উপস্থিত হইলাম। রতনকে বলিলাম আমার সঙ্গে দিনকতক তুই এখানে থাক্।"

এখানে আসিয়া দেখিলাম আম্রমুকুল, পত্রপুষ্প ও বিহঙ্গ কাকলীতে পূর্ণবসন্তের সাড়া পড়িয়াছে। কিছু আর অর্দ্ধস্ফুট বা অস্ফুট নাই—তাহার যেন কিছু চাপিয়া রাখা অসম্ভব। সারা বৎসর ধরিয়া ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও আকাশ যে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দের মাধুর্য্য সঞ্চয় করিয়াছিল সহসা তাহা তাহাদের অপ্রশস্ত আধার ভেদ করিয়া বিশাল প্রকৃতিতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। রতনকে শয়ন করিতে বলিয়া আমি শয়নাগারে প্রবিষ্ট হইলাম। মনে করিলাম সুকৃতি আমার নিকট আসিবে। কিন্তু আশা বিফল হইল।

পরদিন সে তাহার দৈনিক কাজ সুচারুরূপে করিয়া গেল, কিন্তু আমার সহিত বিন্দুমাত্র একটি কথাও কহিল না। তাহার সহিত নিজে কথা কহিতে চাহিলাম, কিন্তু সুবিধা হইল না।

সারাদিন কাটিয়া গেল। ভাবিলাম—হয়ত সুকৃতির মন আর আমাতে আকৃষ্ট নয়—সে আর আমার সহিত ঘনিষ্ঠতা রাখিতে চায় না। মনে করিলাম—ভালই ত, সে যদি সংযমের পথ অবলম্বন করে তাহাতে ক্ষতি কি ? প্রাণটা হঠাৎ হু হু করিয়া উঠিল। বুঝিলাম তাহার সংযম আমার ততটা প্রিয় নয়।

মনটা বড়ই উদাস হইয়া পড়িল, কেমন অন্যমনস্ক ভাবে দিনটা কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে বাহির হইলাম। প্রকৃতির বসন্ত উৎসবে আমার

প্রাণ কিছুতেই যোগ দিতে চাহিল না। সুকৃতিকে না পাইলে আমার জগৎ মরুভূমির মত।

সন্ধ্যার সময় সেই ঘাটের কাছে বেদীটির উপর বহুদিন পরে আবার বসিলাম। নিকটস্থ মুকুলিত আম্রবৃক্ষটির শাখান্তরাল তখনও ঘটপদের গুঞ্জন ধ্বনি বিলীন হয় নাই। অন্তরের মধ্যে একটা বেদনা গুমরিয়া উঠিতে লাগিল, ভাবিলাম আমি একটা সামান্য তৃণখণ্ড নানাতরঙ্গে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রকৃতির মহাপ্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছি। আমি দুর্ব্বল, পীড়িত, অচেতনপ্রায়, ওগো যদি কেহ থাক আমাকে রক্ষা কর। কে রক্ষা করিবে? যে আমাকে এ প্রবাহে ভাসাইয়া দিয়াছে, সে অথবা তাহারি মত শক্তিশালী কেহ আমাকে রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু কই সে কোথায়?

আবার ধ্বনিত হইল—ভগবান, আমাকে রক্ষা কর। তুমি আছ এই মাত্র শুনিয়াছি, কিন্তু কখনও তোমার পরিচয় পাই নাই। আজ তুমি এস, আমাকে শান্ত কর, আমার ভয়, উদ্বেগ, বিধাদুষ্ট সব ঘুচাইয়া দাও। আজ অজ্ঞের স্বরূপ অনন্ত। তুমি আমার বাক্য ও মনের বিষয়ীভূত হও। আমি তোমার করুণার ভিখারী।

কেহ সে কথা শুনিল না। দেখিলাম—বাসন্তী জ্যোৎস্নার প্রবাহ আকাশে বাতাসে গন্ধ বর্ণের মধ্য দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। এত আনন্দের মধ্যে দুঃখ হতাশাও না মাতিয়া থাকিতে পারে না।

চুপ করিয়া বসিয়া আছি। দেখিলাম—পুষ্করিণীর জল চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এ ঘাটের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—সোপানের উপর সুকৃতি একটি জলপূর্ণ ঘট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিলাম—তাহার জ্যোৎস্নালোকরঞ্জিত অনাবৃতমুখে শ্রমজনিত ঈষৎ মলিনতাও তাহার দেহকান্তির মাধুর্য্য বর্দ্ধিত করিয়াছে।

বসন্তবাতাহত বল্লরীর মত মূর্ত্তিমতী বসন্তশ্রীর মত সে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। আমি তাহাকে ডাকিলাম। প্রথমে তাহাকে ডাকিতে সাহস হয় নাই কেননা মামা আমাকে তাহার সহিত মিশিতে নিষেধ করিয়া আমাকে ভাল করিয়াই আমার নিঃসহায় অবস্থা জানাইয়া দিয়াছেন। তখন সুকৃতিকে পর ভাবিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহার উপর আমাকে শিবের মত তেজস্বী হইতে বলিয়া সে কল্পনারও বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। আজ কিন্তু হঠাৎ প্রাণের মধ্যে আবার পূর্ব্বভাব জাগিয়া উঠিল।

বুঝিলাম তাহার ও আমার মধ্যে ব্যবধান খুবই বেশী। সত্য সত্যই সে পরস্ত্রী, আমিও তাহার কাছে পরপুরুষ; তাহার সহিত আমি যে সম্বন্ধ পাতাইতে চাই তাহা সত্য সত্যই অনুচিত, তবে আমার প্রাণ তাহাকে চায়—সেও আমাকে চাহিয়াছিল—এখনও চায় কি না বলিতে পারি না—বোধ হয় চায়; আর না চাহিলেও তাহাকে চাওয়ান খুবই সহজ।

নিমেষের মধ্যে এই চিন্তা তাড়িতের মত মাথায় খেলিয়া গেল। দেখিলাম সুকৃতি নিকটে আসিয়া অবনতমুখে দাঁড়াইয়াছে। কথা কহিতে পারিলাম না। সুকৃতি বলিল "ডাকিলে কেন?"

আমি বলিলাম "তুমি আর আমার সঙ্গে বেশী কথা কও না কেন?"

সুকৃতি বলিল "কি আর বলিব। তুমিও ত বেশী কথা বল না।"

চুপ করিলাম। বুঝিয়া দেখিলাম সুকৃতির কথাটা মিথ্যা নয়। আমি বলিলাম "দেখ—তুমি কথা না কহিলে আমি কহিতে পারি না। আমি পর, তোমরা আমার অন্নদাতা, আশ্রয়দাতা।"

"এত দিন ত এ ভাব ছিলনা। আজ এরূপ ভাবিতেছ কেন?"

"তুমিই ভাবাইয়াছ।"

সুকৃতি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বলিল "কি বলিতেছ?"

আমি বলিলাম "তুমি এখন আর একরকম হইয়া গিয়াছ।"

সুকৃতি বলিল "না আমি সেই রূপই আছি। তবে এত দিন তুমি একটু গম্ভীর ভাবে আছ দেখিয়া বেশী কথা বলিতে চাই নাই।"

চুপ করিলাম, তারপর বলিলাম "তুমি মিথ্যা কহিতেছ।"

সুকৃতি বলিল "না মিথ্যা নয়।"

"এখনই কি তুমি আমাকে বিবাহ করিতে পার?"

"তুমি যদি বল—পারি।"

"আমি বলিতেছি বিবাহ কর।"

"এই কি আমার প্রশ্নের উত্তর? তোমাকে বিবাহ করাই কি আমার উচিত?"

"এ প্রশ্ন কেন করিতেছ?"

"তুমি আমার কথারই উত্তর দাও না। যদি বল উচিত এখনই তোমাকে বিদায় করিবে।"

ভাবিলাম—সুকৃতি বলে কি? সে অচল, অটল, আর আমি বিক্ষিপ্ত চিত্তে নানা দ্বন্দ্বের ভাবনা অন্তরে সঞ্চয় করিয়াছি। আহত অহংকার ফুরিতা হইয়া উঠিল। আবার একথাও বুঝিলাম আমি যেখানে আকুল হইয়া পড়ি সুকৃতি সেখানে স্থির; আমি যেখানে তর্কের ধূলিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া পথ দেখিতে পাই না, সুকৃতি সেখানে নিশ্চিন্ত ভাবে আপনার স্বভাবের অনুযায়ী কাজ করিয়া যায়, কোথাও কোন বাধাবিঘ্নের অস্তিত্ব থাকে না।

এইবার তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। সারা-বিশ্ব তখন অন্ধকারে সংকুচিত হইয়া আমার নয়ন পথে একখানি মলিন চিত্রপটের মত ম্লানমান হইয়া উঠিল। দেখিলাম—আষাঢ়ের সন্ধ্যামলিন ধরাখানি বসন্তের শস্যলাবণ্যে অভিষিক্ত হইয়া মনোরমা রমণীর মত পড়িয়া আছে। সারাদিক যেন একটি কুঞ্জ; সেই নবীন কুঞ্জে শুধু দুই জন জাগিয়া আছে—তাহার মধ্যে একজন আমি, অন্য জন সুকৃতি।

বলিলাম "সুকৃতি, যদি বলি অনুচিত, তাহা হইলে বিবাহ করিবে কি?"

সুকৃতি বলিল "না, তাহা হইলে বিবাহ করিব না।"

"যদি আমি বলি, অনুচিত, তবুও বিবাহ কর।"

"তাহা তুমি বলিতে পার না।"

"যদি বলি?"

"বিবাহ করিব, বল।"

আমি স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম, সুকৃতি বলিল "চুপ করিয়া রহিলে যে?"

আমি বলিলাম "তোমার কথার কি উত্তর দিব তাহা ভাবিতেছি। একটা কথা হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। উত্তর দাও।"

সুকৃতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল "কি বল।"

সহসা আমার বাক্যের সংকোচ ও জড়তা কোথায় উধাও হইয়া গেল বলিলাম "দেখ সুকৃতি পূর্ব্বের মত আর তুমি সরল নও। আগে তুমি আমার সঙ্গে অবাধে মিশিতে, এখন যেন একটু পর হইয়া পড়িয়াছ।"

সুকৃতি চুপ করিয়া আনত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। বলিলাম "চুপ করিলে যে?"

সুকৃতি বলিল "আমি পর হই নাই, তাহা হইলে পর হইয়াছ তুমি।"

ভাবিলাম সুকৃতি মিথ্যা কথা বলিতেছে, পরক্ষণেই মনে হইল, তাহাতে কপটতা বা মিথ্যার লেশ নাই। সে স্থির ব্যবস্থিতচিত্ত, আমার মত তীক্ষ্ণ, সন্দিগ্ধ নয়। এত দিন সে স্থিরভাবে আপনার কর্ত্তব্যপথে অবিচলিত হইয়া চলিয়াছে—স্বৈরিণী বা অধঃপতিতার প্রবৃত্তি তাহাতে নাই, থাকিলেও কর্ত্তব্য জ্ঞানের প্রভাব তাহার অপেক্ষায় অধিক। আমি কেবলই তাহাকে চাহিতেছি—কামুকের প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিতে চাই না, কিন্তু মাঝে মাঝে

সেটা বড়ই প্রবল হইয়া পড়িতেছে। স্বার্থলোলুপ ও ভোগস্পৃহ হইয়া কেবলই তর্কযুক্তির জালে জড়িত হইতেছি। আমিই পর হইয়াছি, সুকৃতি যেমন ছিল সেই রূপই আছে।

মনে একটু আত্মগ্লানি আসিল, সুকৃতিকে পবিত্র-চিত্ত বলিয়া মনে হইল। স্থির করিলাম তাহার জন্য আর ভাবিবার প্রয়োজন নাই, সে আপনার কর্ত্তব্য আপনি বুঝিয়া লইবে, আমি তাহাকে পথ দেখাইবার কে?

বলিলাম "সুকৃতি একটা কথার উত্তর দাও, আমাকে কি তুমি বিবাহ করিতে রাজী?"

সুকৃতি বলিল "যদি বল, তাহা হইলে রাজী।"

"যদি না বলি?"

"বিবাহ করিব না।"

"তবে পূর্ব্বে অনুরোধ করিয়াছিলে কেন?"

"তুমি যদি বিবাহ করিতে চাও, তবেই বিবাহ করিব বলিয়াছিলাম।"

"যদি বিবাহ করিতে না চাই, তাহা হইলে তুমি কিরূপ থাকিবে?"

যেমন আছি, সেই রূপই থাকিব।

"আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে?"

"পারিব, তবে তুমি আমাকে দেখিও। আমাকে তোমার জিনিস করিয়া লও। আমি স্ত্রীলোক বিচারবুদ্ধি নাই, আমাকে তুমিই চালাইয়া লও।"

"তাহা হইলে বিবাহ আবশ্যক।"

আমি বিবাহ করিতে পারি, নাও করিতে পারি—বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলাম কেবল সমাজের জন্য, লোকনিন্দা বন্ধ করিবার জন্য। আমি ব্রাহ্মণকন্যা—বিধবা তোমার মতে চলিতে হইলে যদি তোমাকে বিবাহ করিতে হয়, তাহাতেও প্রস্তুত আছি। এখন তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব।"

আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। দেখিলাম সুকৃতি ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সেদিন বসন্তের সৌন্দর্য্যসমারোহের মধ্য দিয়া মুক্তির প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে—কোথাও একটুও বাধা বা সংকোচ নাই বলিয়াই মনে হইয়াছিল। এখন দেখিলাম সৌন্দর্য্য আছে সমারোহও আছে, কিন্তু সবই যেন প্রাণহীন। চিন্তারাশির মধ্যে আপনাকে সমাহিত করিলাম।

অনেকক্ষণ ঘাটের কাছে বসিয়া রহিলাম। মনে হইল বিশ্ব যেন শূন্য—হায় রে রসের আনন্দ না পাইলে পৃথিবী যে মরুভূমি হইয়া যায়।

আহারাদির পর শয়ন করিলাম। মুক্ত বাতায়ন দিয়া বাতাস আমার সর্ব্বাঙ্গে সহকারের—মুকুল-প্রবৃত্তির মত একটা আনন্দ সঞ্চারিত করিল। ভাবিলাম—এই শূন্য বিশ্বে ভোগছাড়া মনের তর্পণ হইতে পারে না। প্রাণ চায় আনন্দ। সুকৃতিকে ছাড়িয়া থাকিতে হইলে বিশ্ব আমার নিরানন্দ হইয়া যায়।

শুইয়া আছি। নানা প্রকার কথা মনে আসিতেছে। মনে হইতেছে—এ জগতে প্রেমই সার, প্রেমব্যতীত আনন্দ পাওয়া যায় না। পুরুষ পুরুষে যে প্রেম পুরুষ রমণীতে তাহার অধিকা। পুরুষ-রমণীর প্রেমের মধ্যে কন্যা ভগ্নীরও মাতার প্রতি যে প্রেম, পত্নীপ্রেম তাহার অধিক। যে পত্নী সুখেদুঃখে এক, যাহাকে জীবনের সঙ্গিনী করিতে পারা যায় তাহার প্রতি যে প্রেম তাহার মাধুর্য্য বর্ণনাতীত ভাবিলাম—আমি আমার পথ ধরিয়া কোন্ অনাদি কাল হইতে লক্ষ জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছি—কত সুখদুঃখ কাটিয়া গিয়াছে—যখন আনন্দ পাইয়াছি তখনই কোথাও না কোথাও প্রেমের আকর্ষণ অনুভব করিয়াছি। আরও ছুটিতে হইবে—ছোটার আনন্দ কখনও যে লাভ করি নাই, তাহা নয়, তবে এখন সহসা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, এখন একটু বিশ্রাম চাই, একটু আনন্দ চাই—প্রেম চাই, আমার জীবনদী সুকৃতির জীবনদীতে মিশিতে চায়। তাহাই হোক। একটু যদি আনন্দ পাই কেন সুকৃতিকে বিবাহ করিব না?"

সুকৃতি আমার কামনার শ্রেষ্ঠধন। আমি তাহাকে চাই। আমার সারা প্রাণ তাহার সঙ্গলাভ করিবার জন্য ব্যাকুল। তাহার সহিত নির্জ্জনে আলাপ করা উচিত কি না জানি না, কিন্তু তাহাতে গভীর আনন্দ আছে। যাহা সে আনন্দ অন্তর মোহাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তখন ভয় হয়, অমনই ভগবানের কথা মনে পড়ে।

আজও ডাকিলাম "ভগবান্ কি করিতেছি জানি না, তুমি আমাকে টানাও তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক্—আমাকে নির্ভয় কর।

খোলা জানালার মধ্য দিয়া মাঝে মাঝে বাতাস বহিতেছিল। প্রদীপটি ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়া পড়িয়াছে। সহসা দেখিলাম—কবাট খুলিয়া সুকৃতি ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। আমি উঠিয়া বসিলাম।

কোন কথা না কহিয়া সে এদিকে সেদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কয়দিন তাহাকে বড়ই দূর বলিয়া মনে হইতেছিল, এখন দেখিলাম সে অতি নিকটে। তাহার মুখচোখ দেখিলে মনে হয় যেন সে আমাকে ধরা দিতেই আসিয়াছে। আমি বলিলাম "সুকৃতি, কিছু বলিবার আছে বোধ হয়।"

সুকৃতি কথার উত্তর দিল না মেজের উপর বসিয়া সে বলিল "আমার প্রশ্নের উত্তরটা আজই দাও।"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বলিলাম "এত তাড়াতাড়ি এ উত্তর চাহিতেছ কেন?"

"আর বিলম্ব করা ঠিক নয়, একটা শেষ হইয়া যাক্—অস্থির হইয়া থাকিতে পারি না।"

জানালার মধ্য দিয়া দেখিলাম—দূরে আকাশে নারিকেল শাখার অন্তরালে অর্দ্ধচন্দ্র দীপ্ত রাজহংসের মত মেঘের উপর দিয়া ভাসিয়া চলিতেছে—জ্যোৎস্না আম্রমুকুলের গন্ধে মিলিত হইয়া এক বিচিত্র মায়া রচনা করিয়াছে। জানালার দিক হইতে চক্ষু ফিরাইলাম, হঠাৎ তাহা সুকৃতির চক্ষে নিবদ্ধ হইল। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। মনে হইল মাথার মধ্যে যেন একটা যাদুযন্ত্রের কাজ চলিতেছে দেখিলাম তাহার মুখ প্রশান্ত প্রসন্ন ও গম্ভীর। এই বসন্তরাত্রের গন্ধবর্ণের মধ্যে তাহার মুখখানি এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। অস্পষ্ট জীবালোকে সেই চিন্তার বিষণ্ণ মুখছবি আমার মনে যেন কত যুগযুগান্তের লুপ্ত স্মৃতি জাগাইয়া তুলিল। ভাবিলাম এই বিশ্বজগতে পুরুষরূপী আমি সারা জীবন ধরিয়া যে আনন্দের অনুসন্ধানে ছুটিয়া চলিয়াছি তাহা সহসা আজ রমণীর রূপ ধারণ করিয়াছে, সে রমণী আর কেহ নয় সুকৃতি।

আমি বলিলাম "না সুকৃতি, আর বিলম্ব করা উচিত নয়।"

সুকৃতি বলিল "আমাকে কি করিতে বল। তবে কি বিবাহই ঠিক?"

আমি বলিলাম "সুকৃতি, তুমি কথা কহিতেছ যেন অসাধারণ রমণীর মত। তোমার ভাবভঙ্গী কথাবার্ত্তা বড়ই নূতন, যেন অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়?"

"আমার কাজ কি খুব নূতন বলিয়া মনে হয়।"

"খুব নূতন।"

"নূতন হইবে না কেন? আমি যে কাজ করিতেছি তাহা যে নূতন। কোথায় কবে কে শুনিয়াছে ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা বিবাহ করিতে উদ্যত? আমি নূতন, আমার কাজও নূতন হইবে।"

"তুমি একথা কহিতেছ বৃদ্ধের মত।"

"আমি বৃদ্ধই হইয়াছি—আমার জ্ঞান সাধারণের মত নয় সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী, কয়টা মেয়ে মানুষ ছেলেবেলায় আমার মত স্বাধীন ছিল, কয়টা মেয়েমানুষ আমার মত অনিচ্ছায় বিবাহ করিয়াছে, কয়জন আমার মত অভাগা? আমি এত কথা কহিব না ত কে কহিবে?"

দেখিলাম সুকৃতির অন্তরের ভাব আজ প্রগল্‌ভতা

বাক্যে প্রকাশ পাইতেছে। তাহার বেদনা আজ আমার প্রাণে গুমরিয়া উঠিতে লাগিল। দুইজনে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। বাহিরের সুগন্ধ বাতাস গৃহমধ্যে সুকৃতির প্রাবরণ ও মাথার কাপড় সঞ্চালিত করিয়া ক্ষীণ দীপশিখাটিকে কম্পান্বিত করিয়া তুলিল। আমি গম্ভীর ভাবে বলিলাম "সুকৃতি, তুমি কি আমাকে বিবাহ করিতে চাও?"

সুকৃতি বলিল না।

তবে আমার সঙ্গে এরূপ নির্জ্জনে কথা কহিতে আস কেন।"

"তুমি তাহাই চাও বলিয়া আসি।"

"তোমার নিজের ইচ্ছায় নয়?"

"না, তোমার ইচ্ছায়। আমি নিজে তোমাকে বিবাহ করিতে চাই না, তবে তুমি যদি বিবাহ করিতে চাও আমি অস্বীকার করিতে পারি না; এখন তোমাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি আমাকে বলিয়া দাও আমার কর্ত্তব্য কি?"

"সুকৃতি, তুমি কি সত্য কথা বলিতেছ, সত্যই কি আমার প্রতি তোমার ভালবাসা নাই?"

"তোমার কি সন্দেহ হয়?"

"সন্দেহ হয় না; সেই জন্যই বলিতেছি তোমার কথা মিথ্যা।"

"না আমি যাহা বলিতেছি সবই সত্য।"

"তাহা হইলে আমার জন্যই তুমি আমাকে বিবাহ করিতে চাও তোমার তাহাতে কোনই স্বার্থ নাই?"

সুকৃতি চুপ করিয়া রহিল। আমি বলিলাম "আমার সহিত বিবাহ হইলে তুমি সুখী হওনা কি?"

"হাঁ হই। তবে বিবাহটা কি আমার পক্ষে উচিত? তুমি ছাড়া কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, কাহার কথাই বা বিশ্বাস করিব।"

আমি স্থির ভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম, তারপর বলিলাম, "শুন সুকৃতি আজ তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব।"

সুকৃতি বলিল "বল, শুনিতেছি?"

আমি বলিলাম দেখ সুকৃতি, আমি বুঝিয়াছি তুমি আমাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছ - আমাকে তুমি যেরূপ ভাবিয়াছ আমি সেরূপ নই। আমি দুর্ব্বল, সেদিন আমাকে শিবের মন তেজস্বী হইতে বলিয়াছিলে, তাহা আমি হইতে চাই বটে, কিন্তু তোমার সম্বন্ধে আমি আত্মহারা হইয়া পড়ি। ভগবানের তোমাকে আমাকে লইয়া এ কি বিচিত্র খেলা? তোমার আমার দুজনকারই জীবন শুষ্ক নীরস। সমাজের বন্ধন সাধারণের জন্য, যে বাঁধা থাকিবার উপযুক্ত সেই সমাজকে মানিয়া চলিবে। সমাজের বাঁধন তোমার আমার মত অসাধারণ নরনারীর জন্য নয়। যদি ব্রাহ্মমতে তোমাতে আমাতে বিবাহ হয়, তাহা হইলে তোমার মত আছে কি?"

সুকৃতি চুপ করিয়া রহিল। দেখিলাম তাহার মুখ করুণার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। বলিলাম "আমি তোমাকে চাই—তুমি ছাড়া আমার জীবন মরুভূমি।"

সুকৃতি চুপ করিয়া কিছুক্ষণ পরে অতি ধীরে জিজ্ঞাসা করিল "তাহা হইলে আমি তোমাকে বিবাহ করি ইহাই কি তোমার বাসনা?"

"হাঁ তোমারও কি তাই বাসনা নয়?"

সুকৃতি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার উত্তর কি বুঝিতে পারিলাম না।

আমি বলিলাম "তাহা হইলে তুমি বিবাহে সম্মত আছ?"

সুকৃতি এবারেও কথা কহিল না। আমি বলিলাম "মাকে একবার জিজ্ঞাসা কর। জিজ্ঞাসা করিবে তো?"

সুকৃতি এবার কথা কহিল, বলিল 'জিজ্ঞাসা করিব।"

"মা কি মত দিবেন ?"

"মা আমাকে কোন কাজেই বাধা দেন্ না, সেই জন্যই ত কর্ত্তব্য কি তাহা জানিবার জন্য তোমার কাছে আসিয়াছি। কর্ত্তব্য কি যখন বলিবে আমিও তাহাই করিব। তুমি পুরুষ আপনার পথে ছুটিয়া চলিয়াছ আমাকে লক্ষ্য করিয়া লও, আমি যেন তোমাতে নির্ভর করিয়া সব ভয় ভাবনাকে এড়াইতে পারি।"

আমি বলিলাম বিবাহই তোমার কর্ত্তব্য। দেখিলাম সুকৃতি ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল।

প্রভাতে উঠিয়া রতনকে বলিলাম "তুই বদমায়েসী ছাড়িয়া যে, আমি সর্দ্দারকে বলিয়া তোর একটা বন্দোবস্ত করিব, লক্ষ্মীর মত যাহার স্ত্রী আছে, তাহার আবার দুঃখ কিসের ?"

রতন বলিল "কবে যাইবি ?"

আমি বলিলাম "কাল কিংবা পরশু।"

"আজই চল না।"

"কেন হতভাগা ? লক্ষ্মীর জন্য মন খারাপ হইয়াছে বুঝি ?"

"কাজ তাড়াতাড়ি করাই ভাল।"

"আর সাধু সাজিয়া কাজ নাই, সত্য করিয়া বল লক্ষ্মীকে দেখিবার জন্য তুই ব্যাকুল হইয়াছিস্ কি না।"

রতন চুপ করিয়া রহিল, আমি বলিলাম "যদি সত্য কথা বলিস্, তাহা হইলে আজই যাইব।"

রতন বলিল "হাঁ, লক্ষ্মীকে অনেক দিন দেখি নাই।"

মনটা কেমন করিয়া উঠিল, স্থির করিলাম, আজই বাহির হইব। লক্ষ্মীর জন্য প্রাণটা সহসা ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

ভাবিলাম আমি অভাগা, রমণীর প্রেম কি জানি না। যে জানে সে সুখের জন্য লালায়িত নয়, সুখই তাহাকে পাইবার জন্য লালায়িত। আচ্ছা, রতন আজ থাক্—আমি না হয় কাল যাইব। বলিলাম "রতন, তুই আজ যা' আমি কালই যাইব।"

রতন কথা কহিল না, কিন্তু তাহার মুখ চোখ দেখিয়া বুঝিলাম সে একা যাইতে প্রস্তুত নয়। বলিলাম "তবে চল আজই যাই।"

আর বিলম্ব করা চলে না। তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। মায়ের সঙ্গে প্রথমেই দেখা হইল বলিলাম "মা আমি দিনকতকের জন্য বাহিরে চলিলাম।"

মা বলিলেন "হাঁ বাবা, তুই কি কোথাও স্থির হইতে পারিবি না ?"

আমি বলিলাম "হাঁ মা আমি বড় অস্থির, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন স্থির হইতে পারি।"

মা কাহাকেও কোন বাধা দিতে জানেন না। সুতরাং তাঁহার সহিত বেশী কথা না কহিয়াই সুকৃতির সঙ্গে নির্জ্জনে দেখা করিলাম। বলিলাম "সুকৃতি আমি বাহিরে চলিলাম—সর্দ্দারের সঙ্গে আর একবার দেখা করিব। আর একটা কথা বলিতে চাই ; তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি যাহা দিয়াছি তাহা ঠিক নয়। আমি দিনকয়েকের মধ্যে ফিরিয়া আসি—তারপর উত্তর দিব।"

সুকৃতি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর তুষ্টি হইয়া আমাকে প্রণাম করিল। যখন সে গলবস্ত্র হইয়া নতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল আমি তাহার দিকে বাতুলের মত চাহিয়া রহিলাম—কিছুক্ষণের জন্য বিশ্ব জগতের অস্তিত্ব আমার কাছে লুপ্ত হইয়া গেল। সহসা প্রবুদ্ধ হইয়া বলিলাম "আজ চলি।"

সুকৃতি বলিল "শীঘ্র আসিও।"

তারপর সে আমাকে কিছু টাকা কড়িও আনিয়া দিল। যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত তাহা গ্রহণ করিলাম। তারপর রতনকে লইয়া যখন গৃহ ছাড়িয়া চলিলাম, তখন মনে হইল যে, পূর্ব্বের

স্বাধীনতা কতকটা কিরিয়া পাইয়াছি। আজ এই এই পর্য্যন্ত।"

এই বলিয়া কয়েদী চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল।

আমি বলিলাম "দেখুন, যে সময়ের কথা বলিতেছেন সে সময়ে কি আনন্দ হয় নাই? সুকৃতি যখন আপনাকে অর্থদান করিল তখন কি আনন্দ পান নাই? নিশ্চয়ই পাইয়াছেন। ইহাই আনন্দ। আপনি যে আনন্দের কথা একদিন বলিয়াছিলেন তাহা বড়ই অস্পষ্ট; বড়ই অসার।"

কয়েদী বলিল "তবে শুনুন, তখন যে আনন্দ পাইয়াছিলাম তাহাতে একটা মোহ জড়িত ছিল। তখন একটা বিশিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া এক বিশেষ অবস্থায় যে আনন্দে মুগ্ধ হইয়াছিলাম তাহাকে সংকীর্ণ বলিতেই হইবে। এখন সে অবস্থা ছাড়িয়া দেখিতেছি তখনকার ও এখনকার আনন্দ এক নয়। তখনকার আনন্দ এখন ভোগ করিতে পারি না। অনিত্য আনন্দের কাঙ্গাল হইয়া লাভ কি? সেই জন্য যে আনন্দ স্থায়ী, যে আনন্দে মোহের নেশা নাই আমি সেই বিশুদ্ধ আনন্দের কাঙ্গাল। আপনার কাছে যাহা আনন্দ আমার কাছে তাহা দুঃখের রূপও ধরিতে পারে। আনন্দ নিত্য। আপনার আনন্দ অনিত্য আমারও তাই, কেবল সর্দ্দারের আনন্দ নিত্য। আপনি সে আনন্দের পক্ষপাতী নাও হইতে পারেন। আপনার আনন্দে হয়ত আমি আনন্দিত নাও হইতে পারি। আজ যাই।"

এই বলিয়া কয়েদী প্রস্থান করিল।

সোসিয়ালিজম প্রবর্ত্তক রবার্ট ওয়েন

(শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু এম এ)

যদি গীতার 'সম্ভবামি যুগে যুগে' কথাটির কোন সার্থকতা থাকে তাহা হইলে জগতে যাহারা পরের দুঃখ মোচনের জন্য প্রাণপণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কথা বলিতে হয়। জগতের প্রতি ধর্ম্ম প্রণেতাই এ সম্বন্ধে বাগ্র দেখা যায়; তবে তাঁহারা পেটের অন্নের চাইতে মনের উন্নতি, এবং ইহকালের ব্যবস্থার চাইতে পরকালের জন্যই বেশী ব্যস্ত বলিয়া বোধ হয়। মানুষের ইহজীবনের ভৌতিক শরীরগত নানা দুঃখের কারণ তাঁহাদের মতে একটা আত্মিক অপরাধ। কাহারও মতে তাহা জন্ম জন্মান্তের কার্ম্মবিপাকের দ্বারা দিয়া মুক্তির দিকে লইয়া যাইতেছে। খীশুখৃষ্ট ত এক আদি মানুষের এক মুহূর্ত্তের ভ্রম জনিত সামান্য অপরাধের ফল ভবিষ্যৎ সমগ্র মানববংশকে অভিশপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। আত্মিক অপরাধ যখন ভৌতিক কষ্টের কারণ তখন তাঁহাদের মতে এ কষ্টের হাত হইতে উদ্ধারের পথও আত্মিক। অতি প্রাচীন কাল হইতেই তাঁহারা মানুষকে সেই অজ্ঞাত অপরাধের জন্য অজ্ঞাত শাস্তিদাতার সকাশে কাতর প্রাণে কাঁদিতে উপদেশ দিয়াছেন। কেহ বা সেজন্য শাস্তির মাত্রা বাড়াইয়া শাস্তির ধৈর্য্য কমাইয়া আনিবার পরামর্শ দিয়াছেন। —Slave mentality বলিয়া যে শব্দটী আজ কান ঝালাপালা করিয়া দিতেছে, তাহার মূল কি

এইখানে নয়? ধর্মপ্রণেতারা স্থূল এবং সূক্ষ্ম দার্শনিক ব্যাখ্যার সহিত মানব জীবনের অনন্ত খুঁটিনাটীর অজস্র ব্যাখ্যা করিয়া সাহিত্যের পর সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। মানুষের দুঃখ নিবারণের জন্য তাঁহাদের ব্যবস্থামত ঔষধের অব্যর্থতা সম্বন্ধে তাঁহারা এতদূর অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, যে তাঁহাদের কথা কোথায় যুক্তি সঙ্গত হইল না তাহা স্থির ভাবে ভাবিয়া দেখিবার মত প্রবৃত্তিও তাঁহাদের সব সময়ে ঠিক ছিল বলিয়া আজ মনে হয় না। শুধু ধর্মমতের প্রবল বন্যায় সমগ্রজগতের প্রকৃত আবর্জ্জনা ভাসাইয়া লইবার আগ্রহে তাঁহারা মনস্তত্ত্ব ও মানবজ্ঞানের আপেক্ষিকতার কথা একবার তলাইয়া দেখিবারও অবসর পান নাই। মাঝে মাঝে যে সকল কূট দার্শনিক উঠিয়াছেন, তাঁহারাও এ দারুণ প্রভাবের হাত এড়াইতে পারেন নাই।

হিন্দু দর্শনকারদিগের মধ্যে এক সাংখ্যকার মানুষের সারা জীবনের দুঃখের কথা লইয়া বিশেষ ভাবে চিন্তা করিতে থাকেন। শুধু জগত তত্ত্বের মীমাংসায় তাঁহার দার্শনিক চিন্তা শেষ না করিয়া তিনি এ আধ্যাত্মিক কষ্টের কারণ বাহির করিবার চেষ্টা করেন। তিনি দুঃখকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া লন। কিন্তু আধ্যাত্মিকই হউক আধিদৈবিকই হউক আর আধিভৌতিকই হউক, শরীর ধারণে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী ভিন্ন আর কিছুই তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। তাই আত্মা শরীরের ভিতর থাকিতে দুঃখ ভোগের হাত এড়ান সম্ভব কি না তাঁহার চিন্তাস্রোত সেই মুখে ধাবিত হইল। পতঞ্জলি আবার তাঁহার পর পরই উঠিয়া কতকগুলি আত্মশুদ্ধী প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়া জগতে প্রচার করিলেন যে সেই ভৌতিক শরীর সাধ্য প্রক্রিয়া দ্বারা মানব আত্মা সুখ দুঃখের অতীত হইয়াও এই ভৌতিক শরীরেই বাস করিতে পারিবে। এসব ব্যাপার সম্ভব কি অসম্ভব তাহা লইয়া এখানে আর বিচার করিব না। তবে তাহার পরিণতি আজ সকলের কাছেই পরিচিত। ইহার সহিত আবার যজ্ঞ প্রভৃতি জড়াইয়া ইহাকে ক্রমে সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার উপায় স্বরূপ করিয়া লওয়া হয়। তারপর বৌদ্ধ বিপ্লবের পর দেশে বৌদ্ধ তন্ত্রের সহিত জড়ীভূত যে নূতন হিন্দু ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছে তাহার ফলে ওসব বিষয়ের দার্শনিক অংশ, ধর্ম্মের অংশ প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিয়া প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

বুদ্ধদেবও ভৌতিক কষ্টের প্রতি চাহিয়া সংসার ত্যাগ করেন। কিন্তু তিনিও তাহার আত্মিক কারণ স্থির করিয়া অনেকটা প্রাচীন পথে চলিয়া যান। 'জন্ম জন্মান্তরের পাপের ফল—' একথা পূর্ব্ব হইতেই সমাজে চলিয়া আসিতেছিল। তাঁহার সময় হইতে এ কথাটার জোর বাড়িয়া যায়। আর আজ ইহা সমগ্র ভারতবাসীর জন্মগত সংস্কার স্বরূপ হইয়া দাড়াইয়াছে। কিন্তু বুদ্ধদেব জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মফল ভোগান্তে নির্ব্বাণের মহিমা যতই কীর্ত্তন করিয়া থাকুন কেন, সে নির্ব্বাণের বহু পূর্ব্বে জন্মান্তর হওয়ার আগে ইহজন্মের ব্যবস্থার প্রতি তত মন দিতে পারেন নাই। অথবা ইহার যে কোন ব্যবস্থার আবশ্যক আছে তাহা সে সময়কার ধর্ম্মপ্রণেতাদের ঠিক মনে হইত না। তাই দুর্ভিক্ষ যখন শ্রাবস্তি নগরে 'হাহাকারে জাগিয়া উঠিল', তখন বুদ্ধদেব ভিক্ষার অন্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন।

ফল কথা পার্থিব জীবন যাপনের অনেকটা অংশই ধর্ম্ম প্রনেতাদের খাতা হইতে বাদ পড়িয়াছে। তাই অতি প্রাচীন কাল হইতে ধর্ম্মের পাশে পাশে 'সমাজ' বলিয়া আর একটা জিনিষ গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং তাহার সাধারণ বিধি ব্যবস্থা অধিকাংশই সম্পূর্ণ ভিন্ন হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। ইউরোপে এই ভিত্তির উপর বিরাট রাষ্ট্রীয় শক্তি গড়িয়া উঠিতে থাকে। ভারতে সমাজকে কতকটা ধর্ম্মের

লীলাক্ষেত্র রূপে ধরিয়া রাষ্ট্রীয় শক্তিকে আংশিক ধর্ম্মের, অর্থাৎ কার্য্যত পুরোহিতের অধীন করিয়া, প্রকৃত পক্ষে তাহার শক্তির প্রসারের সীমা মুছিয়া দেওয়া হয়। তাই ইউরোপীয় রাষ্ট্রীয় শক্তি সহস্র অত্যাচারের মধ্য দিয়া বাড়িয়া উঠিয়াও কার্য্যতঃ দেশের সামাজিক আপিস হিসাবে শাসন ব্যবস্থা-রূপে পরিণত হইল; আর ভারতে তাহা বাড়িতে বাড়িতে সমাজকে চাপিয়া, ব্যক্তিগত মানুষকে চাপিয়া মারিয়া সেইকালে সেই অতীতের কোলে নিজেও বোধ হয় 'উধাও হয়ে মিলিয়ে গেল।' যে দিন ভারতে বৈদেশিক রাজত্ব আরম্ভ হইল সেদিন হইতে এদেশের মানুষের পার্থিব জীবন যাপনের ব্যবস্থা সেই সঙ্গে একরূপ বিদেশীয়ের হাতে যাইয়া পড়িল। কিন্তু পার্থিব রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের যে স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা তাহা ভারতবাসীর মন হইতে প্রকৃত পক্ষে মুছিয়া গেল না। তাহারা সমগ্র সমাজের চিন্তার ধারা বদলাইয়া একদিকে যাইয়া পৌঁছিল পরলোকে, আর একদিকে সাধারণ দৈনন্দিন পারিবারিক ব্যবস্থার খুটিনাটী সমস্ত অতীব জটীল করিয়া তুলিতে লাগিল। বিশেষ বাঙ্গলা দেশে জাতি সমস্তারপারিবারিক সম্মান বলিয়া একটা জিনিষ এমন অদ্ভুত ভাবে ইহার সহিত গড়িয়া উঠিল যে সমাজের প্রত্যেক লোকের সমস্ত চিন্তা মাত্র সেই একদিকেই ধাবিত হইয়া, মানুষের সর্ব্ব প্রকার প্রকৃত উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া দিল। এখনও এ জটীল সমস্যার ভিতর হইতে কাহারও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য টানিয়া বাহির করা একরূপ অসম্ভব।

ওদিকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রীয় শক্তি সমাজের উপর প্রভুত্ব করিতে যাইয়া পদে পদে ঠকিয়া শেষে সমাজের উচ্চস্তরের অঙ্গে পরিণত হইল। সে আভিজাত্যের অত্যাচারও একরূপ ফরাসী বিপ্লবে শেষ হইল। পার্লামেন্টী শাসন পদ্ধতি সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িল। কিন্তু আর এক প্রকারের অত্যাচার সমাজের কোন কোন অঙ্গ প্রকাশ করিতে লাগিল। অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপীয় পণ্যের বিশাল বাজারে পরিণত হইল। অজস্র অর্থ অপ্রতিহত বেগে যাইয়া ইউরোপীয় বণিকের সিন্দুকে উঠিতে লাগিল। বিশেষ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নানাবিধ কল কারখানার আবিষ্কারের সহিত এই বেগ সহস্র গুনে বাড়িয়া গেল। এত অর্থে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেশ হইতে দারিদ্র দূর হইল না। অর্থ কয়েকজনের হস্তে জমিয়া যাইতে লাগিল। আর ওদিকে যে কুলী মজুরদের খাটাইয়া এই অর্থ সংগৃহীত হইতেছিল তাহারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া গেল। একথা প্রথমে কেহ লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু ফরাসী যুদ্ধের পরে ক্রমে ইহার পরিমান অনেকের উপলব্ধি হইল।

এসময়ে ইংলণ্ডের বড় বড় সহরে মজুরদের যে অবস্থাছিল তাহা পড়িলে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া ওঠে। মানুষের বাসগৃহ বলিতে যাহা বুঝায় সেরূপ কিছুই তাহাদের ছিল না। বড় বড় সহরে রাস্তা হইতে দূরে এঁদো গলির ভিতর একরূপ মাটির গর্ত্তের ভিতর, দরজাবিহীন জানালাবিহীন এক একটা কুটুরীতে কতকগুলি করিয়া পরিবার একত্র বাস করিত। মেজেতে জল উঠিতেছে, মাটির দেয়াল বাহিয়া জল পড়িতেছে, শীতকালে সেই শীতপ্রধান দেশে ঘরে একটু আগুন নাই, এমনি ভাবে কোন রকম কোনদিন একমুঠা খাইয়া তাহারা জীবন ধারণ করিত। মনুষ্য চরিত্র বলিতে যাহা সহজজ্ঞানে বুঝা যাইতে পারে প্রকৃত পক্ষে তাহার খুব অল্প পরিমানই তাহাদের ভিতর ছিল। অথবা যে অবস্থায় তাহারা বাস করিত তাহাতে চরিত্র রক্ষা না করাই তাহাদের একটা শান্তির উপায়স্বরূপ ছিল। অর্থাৎ সাধারণ গৃহপালিত পশু হইতে তাহাদের অবস্থার বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। মানুষের ঘোড়া গরু দিয়া কাজ করাইয়া যেমন

অর্থোপার্জ্জন করে, কলকারখানার মালিকেরাও তাহাদের দ্বারা সেই ভাবে খাটাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিত।

ভদ্রসমাজের খুব কমলোকেই এসব ব্যাপার সম্যক অবগত ছিলেন। তবে এক এক সময় যখন এই সব অপরিচ্ছন্ন কুলী পল্লীতে সংক্রামক ব্যাধি প্রকাশ পাইত, তখন অনেকে একটু নজর না দিয়া পারিতেন না। কারণ ব্যাধি গুলি সব সময় ছোট বড় মানে না, এবং কুলী পল্লীর এঁদো কুটীর তাহাদের সব সময় ভাল লাগে না। কিন্তু ফলে সেই নির্জ্জীব কুলীগুলির উপর অত্যাচার আরও বাড়িয়া যাইত।

আর একটা ভয়ঙ্কর কথা ছিল এই যে শ্রমজীবিদের সকলেই সম্পূর্ণ নিরক্ষর। ফলে তাহাদের কোনও রূপ বাধন্থা তাহাদের দ্বারা সম্ভবপর ছিল না। তাহারা ধনীদের ও কারখানার মালিকদের হাতে কিরূপ অন্যায় নির্য্যাতন ভোগ করিতেছিল তাহা বুঝিবার ক্ষমতাও তাহাদের ছিল না, প্রতিকার ত দূরের কথা।

এই সময় ইংলণ্ডে poor law প্রভৃতি লইয়া নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হয়। অনেক সহৃদয় লেখক এ সম্বন্ধে লিখিতে আরম্ভ করেন। Dickens তাঁহার Oliver Twistএ এবং Disraeli তাঁহার Sybilএ এই সব অত্যাচার অন্যায়ের কথা দেখাইবার চেষ্টা করেন। ইহাতে অবশ্য সাধারণের দৃষ্টি কতকটা আকৃষ্ট হয় কিন্তু ঠিক মত কোন উপায় কেহই স্থির করিতে পারেন না। রবার্ট ওয়েন (Robert owen) নামে একজন মহাপুরুষ এই সময় একটা প্রতিকারের ব্যবস্থা সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করেন। যদিও আজও জগৎ তাহা সম্পূর্ণ রূপে স্বীকার করিয়া লয় নাই, তবুও তাহার ভিতর সমগ্র মানবজাতির সাম্যের অভাব যে সামাজিক সমস্যা তাহার একটা মীমাংসার চেষ্টা আছে। রবার্ট ওয়েন জগতের সম্মুখে সর্ব্বপ্রথম সোসিয়ালিজম্ (Socialism) হাজির করিলেন।

রবার্ট ওয়েন ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে ওয়েলসের অন্তঃপাতী মাণ্ট গোমারি সায়ারে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের প্রথম ভাগে বহু কষ্টের মধ্য দিয়া তিনি নিজের বুদ্ধি ও কার্য্যকুশলতার বলে ক্রমে নিউ ল্যানার্ক মিলসের অংশীদার ও ম্যানেজার নিযুক্ত হন। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি নিউ ল্যানার্কে আসেন। সেই দিন হইতে তাঁহার জীবনের দ্বিতীয়ভাগ আরম্ভ হয়। তিনি দেখিলেন নিউ ল্যানার্কের তেরশত লোকের ভিতর প্রায় চারি পাঁচ শত কর্পদক হীন ভিক্ষুক কারখানার চারিধারে অতি ঘৃণিত জীবন যাপন করিতেছে। অতি হীন অশ্লীল আমোদ প্রমোদ তাহাদের জীবনের একমাত্র শান্তির অবলম্বন স্বরূপ ছিল। এরূপ একদল লোককে মানুষ মাত্রেই অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। কাহারও হৃদয়ে তাহাদের প্রতি বিন্দুমাত্র করুণার উদ্রেক হয় না। এবং তাহাদিগকে শাসনে রাখিবার জন্য বেত, জেল এবং ফাঁসিকাঠ সর্ব্বদাই ব্যবহারে আনিতে হইত। রবার্ট ওয়েনের অন্তরের বিরাট মনুষ্যত্বটী সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন যে পারি পার্শ্বিক যে অবস্থার ভিতর এই লোকগুলি নারকীয় প্রবৃত্তি পড়িয়া উঠিতেছে, তাহার প্রতিকার অযৌক্তিক ভীতি প্রদর্শন, বেত, জেল বা ফাঁসিকাঠ নহে। তিনি বুঝিলেন যে শুধু পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতির সহিত তাহাদের মনুষ্যত্ব আবার ফুটিয়া উঠিবে।

প্রথমেই তিনি কুলীবালকদিগের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। শৈশব হইতেই যাহাতে তাহারা প্রীতি প্রফুল্ল অন্তরে নাচিয়া গাহিয়া প্রকৃত আনন্দে মনুষ্যত্বটী সজীব করিয়া লইতে পারে সে জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু ইহাতেই সব হইবে বলিয়া তিনি ক্ষান্ত হইবার লোক নহেন। তিনি কারখানার সমস্ত মজুরদের চরিত্রের খতিয়ান তৈয়ার করিলেন, এবং চরিত্র সম্বন্ধে উন্নতি দেখিলে

তাহাদের বেতন বৃদ্ধি ও পুরস্কার দিতে লাগিলেন। তার পর কুলীদের দিয়াই দোকান করাইয়া যাহাতে তাহারা নিত্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সস্তাদরে পায় এবং দোকানের লাভও তাহাদেরই থাকিয়া যায় তাহার কৌশল তাহাদের শিখাইয়া দিলেন। এ হিসাবে বর্ত্তমান Co-operative movement এরও প্রবর্ত্তক তিনি। তিনি এই Co operative সূত্রে তাঁহার মজুরদের যাহাতে আরও উন্নতি হইতে পারে, যাহাতে তাহারা কাজ করিবার আরও সময় পায়, এই উদ্দেশ্যে তাহাদের জন্য এক সাধারণ পাকশালা করিলেন। অল্পমূল্যে সকলেই সেখানে তৈয়ারী খাদ্য পাইতে পারিবে এবং পাক করিবার জন্য অথথা কতকটা সময় কাহারও নষ্ট করিবার দরকার হইবে না।

রবার্ট ওয়েনের নিস্বার্থতা, তাঁহার প্রগাঢ় উদারতা, সমস্ত শ্রমজীবির ভক্তি শ্রদ্ধা এবং অটুট বিশ্বাস অর্জ্জন করিল। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা যখন তুলার রপ্তানি বন্ধ করিল, রবার্ট ওয়েন বাধ্য হইয়া তাঁহার কারখানা বন্ধ রাখিলেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কারখানার কুলীদের মাহিনা বন্ধ করিলেন না। ইহার কিছু পরেই তিনি নিয়ম করিলেন যে কোম্পানীর অংশীদার গণকে শতকরা পাঁচ টাকা হারে লাভ দিয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা সমস্তই কারখানার শ্রমজীবিদের সন্তানগণের শিক্ষা এবং তাহাদের অন্যান্য উন্নতির জন্য ব্যয়িত হইবে।

নিউল্যানার্কের উন্নতি এবং তাহার অদ্ভুত কর্ম্মী ম্যানেজারের কথা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। দেশের শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষগণ লর্ড ডিউক নিউল্যানর্ক মিলস দেখিতে যাইতে লাগিলেন, এবং সকলেই মুক্তকণ্ঠে রবার্টওয়েনের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এখন রবার্টওয়েনের মনে হইল যে উপায়ে নিউল্যানার্কে শান্তি ও পবিত্রতার স্বর্গ রচনা করা সম্ভব হইয়াছে, সেই উপায়েইত সমগ্র জগৎ হইতে দুঃখদৈন্য ও পাপ বিদূরিত হইতে পারে। তাঁহার এই চিন্তাটাই জগতে Socialism সৃষ্টি করিল।

সমগ্র মানবসমাজকে নূতন করিয়া গড়িবার এক প্রবল আকাঙ্খা লইয়া তিনি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে এক নূতন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এইদিন হইতে তাঁহার জীবনের তৃতীয় ভাগ আরম্ভ হইল, এবং মানব সমাজ সমাজগঠনের একটা নূতন ধারা লাভ করিল। তিনি লণ্ডনে আসিয়া Socialism সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রবন্ধাদি লিখিতে লাগিলেন। তাঁহার মতে জগতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিবার কোন আবশ্যক নাই। সমস্ত দেশগুলিকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে বিভক্ত করিতে হইবে। গ্রামের সমগ্র সম্পত্তিতে গ্রামবাসী সকলেরই সমান অধিকার থাকিবে। সকলে সমান ভাবে পরিশ্রম করিবে এবং পরিশ্রমলব্ধ ফল সকলে সমান ভাবে ভোগ করিবে। শিশুরা সব এক ঘরে শুইবে, এবং একই স্কুলে পড়িবে একই সঙ্গে খেলাধূলা করিবে। তিনি কল্পনায় যে অপূর্ব্ব শান্তির স্বর্গ রচনা করিলেন সেখানে শ্রমই আনন্দ এবং একমাত্র শ্রমই অর্থের স্থান পূরণ করিবে। তাঁহার মতে এইরূপ গ্রাম্য সমিতি গঠনই মানুষের সর্ব্বদুঃখনাশের একমাত্র উপায়; ইহারই মোহিনীশক্তিতে মানবসমাজ নূতন জীবন লাভ করিয়া নূতন পথে ধাবিত হইবে।

এ পর্য্যন্ত তাঁহার কথা সকলে বিশেষ আগ্রহভরে শুনিতেছিল। কিন্তু সহসা তিনি ইহার সহিত এক নূতন মত জুড়িয়া দিয়া তাঁহার চারিদিকে বিপদের জাল জড়াইয়া লইলেন। তিনি জগতে প্রচলিত সমস্ত ধর্ম্মমতকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিলেন, এবং প্রচার করিলেন যে মানুষের সর্ব্বদুঃখের মূলীভূত কারণই হইতেছে এই ধর্ম্মগুলি। অবশ্যই তাঁহার নূতন Socialism এর মত এক উদারনীতিক মানবহিতব্রতী ভিন্ন সাধারণ ধনী এবং কারখানার মালিকগণ কখনই বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখেন নাই। এখন তাঁহারা এ মতকে একেবারে দূর করিয়া

দিবার একটা মস্ত ওজর পাইলেন। ফলে রবার্টওয়েন ভয়ানক চটিয়া তাঁহার Socialism সাম্প্রদায়িক সম্পত্তি রচনা প্রভৃতি ভুলিয়া, ধর্ম, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও প্রচলিত বিবাহ প্রথাকে অতি তীব্র ভাষায় গালাগালি দিতে আরম্ভ করিলেন। যাঁহারা রবার্টওয়েনের মত প্রচার দ্বারা জগতের দুঃখদৈন্যের একটা মীমাংসা পাইবেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সরিয়া দাঁড়াইলেন; এবং রবার্টওয়েনের মত কিছুদিনের জন্য চাপা পড়িয়া গেল।

কিন্তু রবার্টওয়েন জগতকে যাহা দান করিয়াছেন তাহা একেবারে ভুলিবার নহে। দিন দিন অর্থ সমস্যা এবং সামাজিক নিকৃষ্টতার ছাপ মারিয়া মানুষের ভিতর বৈষম্যের ফলে যে অত্যাচার তাহার প্রতিকারের জন্য রবার্টওয়েনের মত ধীরে ধীরে জনসমাজে বল সঞ্চার করিয়াছে। আজ রাশিয়ার ভিতর দিয়া তাহার একরুক্ষ বিকট মূর্ত্তি, প্রচণ্ড যষ্টিকাকারে যেন সমগ্র জগৎ তোলপাড় করিয়া দিবার জন্য উত্থিত হইয়াছে। ইহার প্রথম বেগ সহ্য করিবার মত ক্ষমতা খুব কম লোকেরই আছে। অতি বড় জনহিতব্রতী পর্য্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার পরিণাম কি কেহই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। সাধারণ লোকে দূর হইতে ইহার ভিতর পাশবিক অত্যাচারের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছে। কিন্তু আজ জগতে শ্রমজীবি ও তাহার রক্তশিপাসু মালিকের ভিতর, জমিদার ও কৃষকের ভিতর সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার একটা সময় আসিয়াছে। জগতে মনুষ্য সমাজের চিন্তাস্রোত, কার্য্যস্রোত, যে প্রণালীতে চলিয়া আসিয়াছে আজ তাহা বদলাইবার দিন আসিয়াছে। আজ ধর্ম্মের কথা আত্মার কথা এবং পরলোকের কথা কিছুদিনের জন্য বাদ দিয়া, জগতের প্রত্যেকের পেটের ব্যবস্থা না করিলে নয়। সমগ্র লোক সমাজের সমান ভাবে শিক্ষার এবং অন্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা রবার্টওয়েন যে ডাক দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাল করিয়া শুনিয়া বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবার দিন আসিয়াছে।

বিশ্রাম

(কবিতা)

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

১

ঘুমাও তুমি ঘুমাও সখি
আজকে তুমি শ্রান্ত,
ঘোল-যামিনীর দোলায় দুলে'
পরাণ তব ক্লান্ত।
কোজাগরের খেলতে কড়ি
জাগ্‌লে তুমি রাত্রি ধরি,
নিদ্রা-শিথিল হস্ত, সখি,
দান ফেলিছ শ্রান্ত!

২

ক্লান্ত নয়ন আস্‌ছে চুলে'
অবশ তোমার অঙ্গ,
রাত্ত জাগানে' সুখের বাসর
এই যে চল ভঙ্গ;
মরণ মিল অন্ধকারে
আগল এঁটে বন্ধ দ্বারে—
ঘুমাও তুমি, হয়নি রাঙা
পূর্ব্ব গগন প্রান্ত।

০

সাঙ্গ তোমার কৃচ্ছ্র ব্রত,
তোর যে শিবরাত্রি,
ঘুমাও তুমি ঘুমাও ওগো
দীর্ঘপথের যাত্রী।

আকাশ ভেঙে ঘুম নেমেছে,
দোলসাগরের ঢেউ থেমেছে;
ক্ষুব্ধ বুকের ধুক্‌ধুকানি
আজকে অবসান তো।

আশা-হত

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী)

চারিতলের একটি কক্ষে আমরা দুই বন্ধু বাস করিতাম। বন্ধু বড় লোকের ছেলে বেশ সৌখীন, সরল কোমল প্রকৃতির লোক। আমি কোন আশাই মিটাইতে পারিতাম না কাজেই দরিদ্র। আমাদের প্রকৃতি একটু ভিন্ন রকমের হইলেও দু'জনার বন্ধুত্বের পক্ষে কোন অন্তরায় হয় নাই। বন্ধুর কোন বদখেয়াল ছিল না, আমার ছিল। সুধীর কখনো মাদক স্পর্শ করে নাই আমি তাহার একজন তরু উপাসক ছিলাম। সুধীর মাঝে মাঝে বলিত "ভাই ওটা ছেড়ে দেনা।" আমি হাসিয়া বলিতাম "তুমি ওইটা যদি চাড়তে পার।" সুধীর "কি!" বলিতে আমি বলিতাম "ওই চিঠি লেখাটা।"

সুধীর বলিত "ও কি দোষের—তাকে ভালবাসবার আমার অধিকার আছে—সে কর্ত্তব্য তাই করি।" আমাকে উপদেশ দিয়া ভাল করিবার চেষ্টা সুধীরকে ওই খানেই মিটাইতে হইত। সুধীর বুঝিত আমিও বুঝিতাম ওই লালসা আমার জন্য কতটা অমঙ্গল কতটা গ্লানি ভবিষ্যতের গহ্বরে পুঞ্জীভূত করিতেছে। চিত্তকে মাঝে মাঝে সবল করিয়া এ দৌর্ব্বল্য দূর করিতে চাহিতাম,—আকাঙ্ক্ষার প্রবল তাড়নে বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইত। যাহাকে আমার সাক্ষী করিয়া আমি দুঃখ বেদনার সম্মুখে বিস্মৃতির যবনিকা টানিতে চেষ্টা করিতাম ক্ষণিকের জন্য তাহা আমাকে ভুলাইয়া রাখিত, উদ্‌খলতার বিষাদ স্মৃতি ঢাকিয়া ফেলিত. অবসাদে তাহা শতগুণে জ্বালাময় হইয়া উঠিত।

আমি যখন গৃহে বসিয়া ফেনিল রক্তিম উচ্ছ্বাসের জ্বালাময় সাহায্যে মগ্ন থাকিতাম সুধীর তখন তাহার প্রেমময়ী প্রিয়ার চিঠিখানার জন্য চারিবার নীচে চিঠির বাক্স খুঁজিয়া আসিত। আমি আবেশ ঘোরে হাসিতাম। একটা বালিকার প্রেমে ভালবাসায় ও একজন বয়স্ক লোকে এমন ভাবে মাতিয়া যায়! সুধীর কোন কিছু আমার কাছে অপ্রকাশ রাখে নাই, তাহার পত্নীর চিঠি আসিলেই সে আমায় দেখাইত। তখন তাহার মুখের [illegible] চোখের আনন্দের নীরব গর্ব্বিত ভাব হইতে যেন এই কথাটি ফুটিয়া বাহির হইত—"এত ভালবাসা কেউ কখনো পেয়েছে কি?" সেই চিঠি গুলিতে আমি আর কোন রস পাই আর না পাই একটা জিনিস আমার বড় মনে লাগিত—লেখিকার অক্ষর গুলির ভিতর হইতে যেন একটি কোমল নির্ভরশীল প্রাণ তাহারই প্রিয়তমের দিকে একান্তে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। আমি অবিবাহিত যুবক, বিশ্বের সবচেয়ে একটা বড় লোভনীয় জিনিস নারীর প্রেম কেমন জানিবার জন্য প্রাণ তৃষিত হইয়া উঠিত বটে—কিন্তু সুধীরের সঙ্গে তর্ক করিবার প্রলোভনেই হৌক বা

অস্থির চিত্ত কোন কিছুতেই পূর্ণ সুখ পায় না বলিয়াই হোক নানা তর্কে নারীর প্রেম যে কিছুই নহে তাহাই তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতাম। সুধীর হাসিয়া বলিত—"যে যাতে মজেছে তাই!"

নারীর প্রেম আর মাদকের প্রলোভন কিছুতেই আমাদের ভবিষ্যৎ কৃষ্ণবর্ণ করিতে পারিল না। আজ আমি উচ্চ রাজকার্য্যে সমাসীন, সুধীর লেখাপড়া শেষ করিয়া নিজের জমিদারীতে গিয়া বসিয়াছে। আমি অর্থের জন্য বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছি আমারও শ্রম সার্থক, বন্ধু শিক্ষার জন্য বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছে, জানিনা সে বিদ্যার সদ্ব্যবহার কিরূপে করিবে!

আশ্বিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। তখনও আমার নড়িবার কোন লক্ষণ না দেখিয়া সেদিন অপরাহ্নে আফিস হইতে আসিবার পর পত্নী মনোরমা হাস্য মুখে কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমার পাশে উপবেশন করিল। চিরদিনই আরাম-প্রিয় আমি, যেখানে যতটা সম্ভব আয়েস করিয়া থাকাই আমার অভ্যাস। শয্যায় অঙ্গহেলাইয়া দিয়া আরাম উপভোগ করিতেছিলাম।

'বড্ড গরম পড়েছে, ফ্যানটা খুলে দেয়া যাক্,' মনোরমা উঠিয়া ফ্যানটা খুলিয়া আমার হাতখানি হাতে লইয়া হাসিভরা চোখ দুটি আমার চোখের উপর রাখিয়া বলিল "ওগো দিনটা ঠিক করে ফেল না!" আমি হাসিয়া বলিলাম "হচ্ছে।"

"ওই হচ্ছে হচ্ছে তো কতদিন শুনছি, এইবার হচ্ছেটা হইয়ে ফেল না গো, কবে যাবে বল?"

"যেদিন ইচ্ছা।"

মনোরমা আমার দিকে আরো একটু সরিয়া কোমল পরশটুকু আরো সরস করিয়া বলিল "এই বুধবার শুকতাল দিন, সেই দিনই দার্জ্জিলিং মেলে রওনা হওয়া যাক্।"

আমি হতাশ ভাবে বলিলাম 'আজ যে শনিবার।'

"তার কি! এখনো চারিদিন পুরো রয়েছে বল তো আমি সব ঠিক করে ফেলি। তুমি ছুটির বন্দোবস্ত করে নাও।"

আমারও মনে শৈল দর্শনের ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। একে স্থানের মাহাত্ম্য তার উপর সুভাষিণী সঙ্গিনীর আব্দার—অনুরোধ!

জলা পাহাড়ের উপরে আমাদের বাসা। মলও পার্ক হইতে বাসাটা বড় বেশী উঁচুতে, সহরে বাহির হইতে হইলেই বড় বেশী হাঁটিতে হয়, তাই আমি বাসাটি বড় পছন্দ করিলাম না। মনোরমা কিন্তু ভারী খুসী আমার এই অনিচ্ছা খুঁত খুঁত ভাবটা দূর করিবার জন্য সে শত অছিলা খুঁজিত। সর্প গতিতে রেল লাইন গুলি আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে তাহার উপর দিয়া যখন খেলনা ইঞ্জিন খানি অসংখ্য গাড়ী লইয়া প্রাণপণ শক্তিতে ছুটিয়া আসিত মনোরমা আমার হাত ধরিয়া ঘর হইতে টানিয়া আনিয়া দেখাইত "ওগো দেখ দেখ ওরেন আর দম নিতে পাচ্ছেনা, বড্ডো হাঁপিয়ে পড়েছে।" হিমালয়ের বিরাট শৃঙ্গগুলি যখন সূর্য্য কিরণে গলিত রৌপ্য স্তূপের মত বোধ হইত, রাত্রিতে চন্দ্রালোকে কিরণ ফলিত হইয়া যখন রাশি রাশি স্বর্ণ রৌপ্য চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত, মনোরমা সে দৃশ্য দেখিয়া পুলকে অস্থির হইয়া উঠিত। সেই পুলকের অংশ হইতে যাহাতে আমিও বঞ্চিত না হই—সে জন্য সে তাহার কবিত্বের অংশ এই অকবির চিত্তে শতধারায় বর্ষণ করিতে একটুও কার্পণ্য করিত না।

সব চেয়ে প্রিয় ছিল তার কাছে সেই পাহাড়ে ফুলগুলি। কত বিচিত্র বর্ণের পুষ্পরাশি সে জড় করিয়া নানা ভাবে সাজাইত। নিজেও ফুলের অত্যধিক সংস্পর্শে ফুলরাণীর মতই হইয়া উঠিতেছিল। আমি সেই গন্ধহীন বিচিত্র বর্ণের ফুলরাশি দেখিয়া মাঝে মাঝে বলিতাম—"কি গো কবিতা সুন্দরী, শুধুবর্ণ বাহুল্যে কি আর গন্ধহীনার দোষ ঢাকে?"

সুন্দরী আমার মুখের কাছে হাতখানি ঘুরাইয়া

রাঙ্গা ঠোঁটে মধুর হাসি হাসিয়া বলিত—"ঢাকে না তো তুমি আমায় এত ভালবাস কেন?" সুন্দরীর হাতখানি তখন আমার হাতে. চোখের সলাজ হাসি টুকু আমারই চোখের উপর!

"চলনা একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।"

আমি বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিলাম "এত রাত্রে, বড্ডো হিম পড়ছে যে বাইরে!"

"তা হোক সে হিম, ওতে কিছু হবে না, তুমি ওভার কোটটা নিয়ে নাও না।"

তাহার অধৈর্য্য ভাবটা আরও একটু বাড়াইবার ইচ্ছায় সোফার অঙ্গ আরও একটু হেলাইয়া কহিলাম—

তার চেয়ে এই আরামে শুয়ে আছি, সেই ভাল না?"

সে আমার পায়ের কাছে বসিয়া কহিল "না না চল তুমি চল।"

"যাচ্ছি তুমি জামাটা পরে নাও।"

"হয়েছে চল" বলিয়া বাহির হইতেই মনোরমা ম্লান মুখে কহিল "ঐ আবার এসেছেন, মরবার আর সময় পেলে না।"

"জল পড়ছে তার আর কি হবে, এস বসা যাক্।"

হাঁ, তোমার অনিচ্ছা তাইতো এত বাধা এসে জোটে, তুমি যদি ভাল মনে আমার কথা শোন!"

আমি তাহার মনের ভাব বুঝিয়া কহিলাম "তা বেশ জলতো এই খেমে যাবে, তখন যাওয়া যাবে 'খন"। তাহার হৃদয়ের আনন্দ মুখে প্রকাশ হইয়া পড়িল, আমার পাশে বসিয়া এটা ওটা নাড়া চাড়া করিতে লাগিল।

আমি বলিলাম "মিনি একটা গান গাও না, বেশ লাগ্‌বে।

মিনি হাসিয়া বলিল "তা হাসবে না তো আমার গান শুনে?"

"বেশ, তোমার গান শুনে কখনো হেসেছি? আমি যেমন করে তোমার গান শুনি এমন নীরব শ্রোতা তুমি আর পাবে না। তবে নিজে গান গাইতে জানি না কিনা তাই—"

তৎক্ষণ সে হারমোনিয়ামে বেলো করিয়া ধরিল—

"রজনী গো তোর অঙ্গে ফুলের বাস
ফুলের মত হাসিস গো তুই
ফুলের মতই চাস।

•

কোন দেবতার কুঞ্জবনে
ছিলি গো তুই কোন ভুবনে—
কোন রজনী গন্ধা গো তুই
ফেলিস নিঃশ্বাস।"

গান শেষ হইলে হারমোনিয়াম বন্ধ করিয়া কহিল "চল এই বেলা জল খেমে গেছে বেরিয়ে পড়া যাক।"

আমি বলিলাম—"বেড়ে গানটি তো—যে গেয়েছে তার বেশ সৌন্দর্য্য জ্ঞান আছে বটে।"

"হাঁ হাঁ রূপ গন্ধ দুই আছে।" হাত ধরিয়া বলিল "এস চল।"—

উঠিয়া পড়িলাম 'মন' ছাড়াইয়া আমি কহিলাম "অনেকটা নেমে পড়া গেছে, এই বেলা ফেরা যাক।"

"এই আর একটু।"

পোর্টাফিস রোডের ধারে আসিলে আবার জল পড়িতে লাগিল। আমার মুখের বিরক্তি ভাব দেখিয়া মনোরমা কহিল "তাড়াতাড়ি ওষ্টার প্রুফ্‌টা আনার কথা আমার মনে ছিল না, তোমায় বড় কষ্ট দিলুম।"

আমি তাহাকে সাবধানে চলিতে বলিয়া কহিলাম "ওঠা যাক্ কোন্ খানে।" সামনেই একটা বাড়ীর বারান্দায় আমরা উঠিয়া পড়িলাম। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া আমি বলিলাম "কি করা যাবে। রাত্রিও অনেক হয়ে চল্‌ল, অদৃষ্টে ভোগ আছে আজ—"

ঘরের ঘোর ভেঙ্গে ছিল, ঘর হইতে জড়িত কণ্ঠের গান শোনা যাইতেছিল—

"কি বেদনা আমার বুকে
আমারই প্রাণ জানে গো
কি শেল বেঁধে আমার বুকে—"

জড়িত কণ্ঠের বিষাদ রাগিনী যেন অন্তর মথিত করিয়া আসিতেছিল। আমাদের কথা শুনিয়া ভদ্রলোক দোরটা একটু খুলিলেন। আলো বারান্দায় চড়াইয়া পড়িল। ভদ্রলোক বাহিরে আসিয়া সুইচটা টানিয়া দিতে, বারান্দা আলোকিত হইয়া গেল মনোরমা আমার পাশে দাঁড়াইল—ভদ্রলোক 'আপনারা' বলিতেই আমি অবস্থাটা তাহাকে কহিলাম। "তা এখানে কেন, ভিতরে আসুন—"

আমরা দু'জনে দু'জনার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলাম,—যেন বড় চেনা,—অথচ ঠিক মনে হইতে ছিল না কোথায় দেখিয়াছি। টেবিলের উপর একটি গ্লাস, একটি বোতল—সোডার বোতলগুলি ইতঃস্তত: বিক্ষিপ্ত। মনোরমা সঙ্কুচিত ভাবে আমার পাশে বসিয়াছিল। মাঝে মাঝে আমার গা টিপিতেছিল।

ভদ্রলোকটি নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন "কিছু মনে করবেন না, আপনার সঙ্গে উনি আপনার পত্নী বোধ হয়—আপনি কোথায় থাকেন?"

আমি বলিলে তিনি বলিলেন "অপরাধ নেবেন না—আপনার নাম?"

"মনীন্দ্রভূষণ—"

ভদ্রলোক আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন "আর মণি আমায় চিনতে পারলি না, আমি যে সুধীর!"

আমি বলিলাম—"ভাই আমারও তাই ধারনা হয়েছিল, কিন্তু এ অবস্থায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে এ ধারণা ছিল না, তাই ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলুম।"

"অবস্থাই আজ তোমায় এখানে এনে ফেলেছে, নইলে এমন সময় তো দেখা হবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না—তা ভাই তোমার পত্নীর নামটি কি? আমায় দেখে ওঁর লজ্জা করবার কারণ নেই—সেটি তোমার বুঝিয়ে বলা দরকার।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"ইনি তোমায় অনেক-দিনই চেনেন, আমাতে ওতে তোমার কথা প্রায়ই হয়।"

"যাক বাঁচা গেল, টেবিলে এই সমস্ত জিনিষ দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেছ বুঝি? ওঃ যা: ভুলেই গেছি—ঠাণ্ডায় বড্ড ভুগেছ।" এই বলিয়া বন্ধু আমার পানে গ্লাসটি আগাইয়া দিলেন।

আমি বলিলাম "কে কে আছে এখানে, তোমার পত্নী সব ঘুমিয়েছেন বুঝি?"

"তাই কি তোমার বিশ্বাস হয়, তিনি খুবোচ্ছেন আর আমি এখানে জেগে বসে আছি!"

সুধীরের কথার ভাবে আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সুধীরের দৃষ্টি আমার উপরে।

"অবাক হয়ে গেছ বুঝি?"

সুধীর বোতল হইতে আরো খানিকটা ঢালিয়া পান করিল। একটি সিগারেট ধরাইয়া আমার দিকে কেসটি ঠেলিয়া দিয়া নীরবে ধূমপান করিতে লাগিল। তখনও অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে। আমি সুধীরের দিকে চাহিলাম সে আরও একগ্লাস ঢালিয়া পান করিল—মাত্রাটা অতিরিক্ত।

আমার দিকে চাহিয়া বলিল—"আশ্চর্য্য হয়ে গেছ—হবারই কথা। তোমার জীবন দেখতেই পাচ্ছি। আমার কথা জান না বোধ হয়—কিন্তু শোন! সেই একদিন গেছে যখন চিঠির প্রত্যাশায় আকুল আকাঙ্ক্ষায় প্রতীক্ষা করতে দেখিয়া তুমি হাসতে, সে আকাঙ্ক্ষায় দীর্ঘশ্বাস উঠলেও তাতে আশা ছিল। আশায় বাঁধিয়া ঘোরে ঘর বেঁধে ব্যাকুল হ'তাম—আর আজ নিরাশার স্রোতে ভাসছি—তাই বন্ধু তোমার পন্থা অবলম্বন করেছি।

তখন তুমি হাসলেও আজ বোধ হয় সে চিঠির

কাহিনী মনে হলে হাস্‌তে পারবে না। তখন বলিতে সে বালিকা, তার হৃদয়ে কি কথা থাক্‌তে পারে, যার প্রতীক্ষায় আমি দিবানিশি বসে থাক্‌তেম! আজ বোধ হয় তা বলিতে পারবে না। কারণ নিজে পরখ করে দেখেছ তো?

বন্ধু সে আমার নাই—"তাকে আমি হারিয়েছি!"

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। পাশে পত্নীর গায়ে হাত লাগিল। বন্ধু আরও এক গ্লাস ঢালিলেন।

"আশা থাক্‌তে তাহাকে পাওয়ার ভয় সহিত না। আজ আশা হত হয়েও বেঁচে আছি এই অবলম্বনে।" গ্লাসের দিকে অঙ্গুলি ঘুরাইল।

"তোমায় আমায় ছাড়াছাড়ি হবার পর আমি বাড়ী এসে বস্‌লাম। কলকর্ম্ম দেখ্‌তাম। প্রভা তখন আমার সঙ্গের সাথী, দিন যে কোথা দিয়ে যেত কোথায় আস্‌ত কিছু জান্‌তেম না। আজ বোধ হচ্ছে সে একটা স্বপ্ন দেখেছি। জান বন্ধু স্বপ্নের স্মৃতিও অনেক সময় ভুল্‌তে প্রাণ হাহাকার করে উঠে—যদি সে সুখ-স্বপ্ন হয়। আর এ আমার বাস্তব জীবনের স্বপ্ন, জীবনটা যার সঙ্গে একত্র জড়িত হয়ে গিয়েছিল তাহারই কথা।

তার পর একদিন সে আমায় ছেড়ে গেল, কি হ'ল বুঝ্‌লাম না। শুধু মনে হ'ত কি ভাবে দিন যাবে! অসম্ভব বোধ হ'ত। যাহাকে দু'মিনিট নয়নের আড়াল কর্‌লে প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ত, সে চিরজীবনের মত আমায় ছেড়ে গেল, তাহার অভাবে কেমন করে থাকিব! সমস্ত দিনরাত কেমন করে কাটত তা বল্‌তে পারি না—নিজের হৃদয় বুঝ্‌তে পার্‌তেম না। আমার আমি বলে যে একটা কিছু আছে তাহা মনে হত না।

সমস্ত দিন বসে থাকিতাম, তাহারই চিঠিগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌তাম। যে বিছানায় শুইতাম তাহাতেই শুয়ে বালিসে বিছানায় যেন তাহারই অঙ্গসৌরভ অনুভব কর্‌তাম। নয়ন মুদিত করে তাহার স্বপ্ন দেখিতাম। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহার হিজি বিজি জড়িত অক্ষর হইতে পরিষ্কার লেখাগুলি বার বার বক্ষে ধরিতাম। তাহার চুল বাঁধিবার ফিতাটি হইতে—মাথার কাঁটাগুলি পর্য্যন্ত আমার কাছে কত প্রিয়, এই সব জিনিষের মধ্যে নিজেকে জড়াইয়া একটা স্বপ্ন জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকিতে চাহিতাম।

তাহার ফটো কতদিন বকে জড়াইয়া ধরিয়াছি—আরো জোরে-আরো জোরে ধরিলে যেন তৃপ্তি পাইব. এতেও তো তৃপ্তি পাই না,—আরো জোরে, কাঁচ গুঁড়া গুঁড়া হইয়া গেছে। শুধু কাগজ খানি বুকে ঠেকিয়াছে! হায় তাহার জীবন স্মৃতি তো কিছুই নাই, যাহার মধ্যে তাহার পরিপূর্ণ মূর্ত্তি গঠন করিয়া লইতে পারি,—যাহার হাসি মাধুরী মান অভিমান লইয়া আমি থাকিতে পারি। কেহ নাই—তাহার স্মৃতি কিছু সে রাখিয়া যায় নাই। ছেলে হইবার বয়স তাহার পার হইয়া গিয়াছিল,—মা বলিতেন 'বৌমার ছেলে হইল না'—আমি ও সে তাহাতে হাসিতাম। ছেলে পিলের আকাঙ্ক্ষা তো আমাদের ছিল না, আমাদের স্নেহ প্রেমে আমরা দু'জনেই ডুবিয়া থাকিতে চাই—অন্য কাহাকেও তাহার অংশ দিতে আমরা উভয়েই নারাজ ছিলাম। সে ছাড়িয়া গেল, তাহার সুখ হাসি লইয়া সে চলিয়া গেল। না না—বন্ধু, ছাড়িবার সময় নয়ন তাহার অশ্রুতে ভরিয়া গিয়াছিল, আমার হাতে হাত খানি তার এমনি ছিল, তার পর আর কিছু জানি না। আমার উপর পরিপূর্ণ নির্ভর করিয়া আমার হাতে তাহার প্রাণের অঙ্ক ঢালিয়া দিয়া সে সরিয়া পড়িল আমি তাহাকে রাখিতে পারিলাম না।

তার পরে অনেকদিন চলিয়া গেল, সে যেন একটা স্বপন দেখিয়াছি—স্বপন কি চিরদিন সত্যি ভাবে লওয়া যায়! মার অনুরোধ, বন্ধু বান্ধবের অনুরোধ, আবার বিবাহকর। প্রথম না—না—দিন যাইতে লাগিল, নিজের মনও একটা নব সুখের

আশায় প্রলুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল। 'যে গেছে সে তো গেছেই' অবশেষে মত দিলাম। বাহিরে প্রকাশ পাইল মার অনুরোধ, বন্ধু বান্ধবদের অনুরোধে আবার বিবাহ করিতেছি, নিজের মনে বুঝিলাম কি দুর্ব্বল হৃদয় আমার! আবার বিবাহ করিতে যাইতেছি! যে আমার হৃদয় ওন্ধী ছিন্ন করিয়া গিয়াছে, যাহার জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা আমাকেই চালিয়া দিয়াছিল তাহাকে ভুলিয়া আবার নূতন জীবন পত্তন করিতে চলিয়াছি!

জ্যোছনা রাত্রি—আবার আসিয়াছে—আবার কাহার হাতে হাত দিতে কাহার হৃদয় লইয়া খেলিতে চলিলাম। মনটা বড় কেমন কেমন করিতে লাগিল—তখন বন্ধু তোমার কথা মনে পড়িল। 'অপাত্ত নিরাশ হৃদয়কে শান্ত করিবার ঔষধ এক মাত্র তুমি বলেছিলে তাই আবার দ্বিতীয় জীবন পত্তন করিবার রাত্রিতে তাহারই আশ্রয় লইলাম, একটা স্বপ্নে রজনী ভোর হইয়া গেল।—

ফুল শয্যা হইল না—কি সে রাত্রি—ফুলের শয়নে শুইয়া সম্মুখে রূপবতী যোড়শী ভার্য্যা বসিয়া আমার শয্যা কণ্টক উপস্থিত হইল, উঠিলাম আবার পান -কি যে তৃষ্ণা কিছুতেই পিপাসা মেটে না?

সে পিয়াসা আজও মেটে নাই। বন্ধু আমি একা —লোকে যা জানে বলিতেছে—তুমি আমার মরম কথা শুনিলে, জীবন না জানিয়া জীবনের চিতার উপর ফুল রচনা করিতে গিয়াছিলাম—ভস্ম হইয়া গেছে।—

বিদ্যুতের আলো ম্লান হইয়া আসিতেছে—বাহিরে ভীষণ কুয়াশা—বন্ধু সোফায় এলাইয়া পড়িয়াছেন। মনোরমা বাহিরে আসিতে আমার জোরে জড়াইয়া ধরিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—সে দৃষ্টির ব্যাকুলতায় একান্ত নির্ভরতা। আমি তাহার নয়নের উপর আমার নয়ন রাখিলাম।

বৃন্তচ্যুত

(উপন্যাস)

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

(শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী বি. এ.)

(৫)

দুপুর বেলা ছাত হইতে হঠাৎ নামিয়া আসিয়া প্রণয়কে ডাকিয়া শশি বলিল, "দাদা পেনসন্ নিয়ে কলকাতায় না থেকে কোন পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাকলে বেশ হয় না?"

অবাক হইয়া তার মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া প্রণয় বলিল, "এ নূতন খেয়াল আবার কতক্ষণ থেকে মাথায় চাপলো শুনি।"

"এর মধ্যে খেয়ালটা তুই কোথায় পেলি বল্‌ত!"

উত্তরে প্রণয় কি বলিতে যাইতেছিল বাধা দিয়া শশি বলিল, "থাক্ এখন একটা কাজ করতে পারিস!"

"কি কাজ শুনি।"

"আমাদের ছাতে উঠলে যেন বাড়ীর যে ঘরটা সামনে পড়ে না—"

বাধা দিয়ে প্রণয় বলিয়া উঠিল, "আর বলতে হবে না বুঝেছি।"

"ছাই বুঝেছিস,—কি বুঝেচিস বল্‌ত।"

সে কথায় কান না দিয়া প্রসন্ন বলিয়া যাইতে লাগিল, "তাই বলি সময় নেই অসময় নেই, অত ছাতে ওঠা কেন রে বাপু—

প্রসন্ন আরো কি সব বলিতে যাইতেছিল, শশি তাড়িগলায় বলিয়া উঠিল, খবরদার পেসন্নী ও নিয়ে ইয়ারকি দিস্‌নে বলছি—সে আমার মার পেটের ভাই হয়।"

প্রসন্ন থত মত খাইয়া থামিয়া গেল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শশি হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ ভাল কথা কি বলছিলুম, তুই আমার একটা কাজ করতে পারিস।"

"কি কাজ শুনি।"

"ছেলেটিকে গিয়ে আমার কাছে একবার ডেকে আনতে পারিস।"

প্রসন্ন অবাক হইয়া শশির মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

শশি বলিল, "কেন এটা কি তোর কাছে এতই অদ্ভুত ঠেকছে?"

সে বলিল, "তা ঠেকছে বৈ কি বাপু।"

কি ভাবিয়া শশি বলিল, "আচ্ছা তবে থাক্‌গে।"

পরদিন কিন্তু ঠিক সেই সময়টিতে প্রসন্নকে ডাকিয়া শশি আবার বলিল, "তুই একবার যেন বাড়িতে গিয়ে ঐ ছেলেটিকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আয় দেখি।"

প্রসন্ন বলিল, "ন্যাখ্ শশি সত্যি বলতে কি, তোর সবই যেন অনাছিষ্টি; চেনা নেই শোনা নেই হঠাৎ কি বলে গিয়ে দাঁড়াই বলত?

"বলব, আমাদের শশি তোমাকে ডাকছে তুমি এস?"

বিরক্ত ভাবে শশি বলিল, "তা বলতে যাবি কেন?"

"তবে?"

কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া শশি বলিল, খবরদার আমরা বড় বিপদে পড়েছি—না থাক্‌গে ওকথা বলে কাজ নেই,—বলবি আমরা—দূর কর ছাই" তারপর কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া সে আবার বলিল, "আসল কথাটা হচ্ছে কোন রকম করে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া যে আমি তার সঙ্গে গোটা কতক কথা কইতে চাই —বিশেষ দরকার আছে—।"

প্রসন্ন এবার হাসিয়া ফেলিল।

ভারি বিরক্ত হইয়া শশি বলিল, "এটুকু আর বুদ্ধি খাটিয়ে গুছিয়ে বলতে পারবি নে?"

প্রসন্ন বলিল, "তুই-ই বা পারছিস কৈ?"

শশি বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিল, "তোদের দ্বারা যদি একটা কাজ হবার জো আছে।"

(৬)

প্রসন্ন ভাবিয়াছিল এই ইংরেজী—পড়া ছেলেটি না জানি তাকে কত জেরাই করিয়া বসিবে এবং সে জন্য সে প্রস্তুত হইয়াই গিয়াছিল কিন্তু তাহাকে বেশি কথা বলিতে হইল না। সকল কথা না শুনিয়াই সনত বলিল, "তা বেশ এখুনি চলুন না।" তারপর জামা না পরিয়াই এবং পা দুটোকে চটি জোড়ার মধ্যে কোন মতে চালাইয়া দিয়াই সে ভারি ব্যস্ত ভাবে দাঁড়াইয়া উঠিল এবং ফটাস্ ফটাস্ শব্দ করিতে করিতে সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিয়া গেল। পাশের ঘর হইতে একটি ছোকরা জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে ব্যাপার খানা কি?"

সে বলিল, "একটু কাজ আছে ভাই।"

সনতকুমার উঠানে আসিয়া দাঁড়াইতেই শশি মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া বলিল, "ওখানে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, ঘরের ভেতর এসে বসুন না।"

যেন হইতে আসিবার দরুণ সনত যে রকম লজ্জা বোধ করিয়াছিল এই অপরিচিতা স্ত্রীলোকটির সুমুখে দাঁড়াইয়া একমুহূর্তে সে সব কোথায় চলিয়া গেল, সে ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রসন্ন বলিল, "দিদিমণি যে আপনাকে ঘরে যেতে বলছে—শুনতে পাচ্ছেন না।"

সনত প্রসন্নর মুখের পানে একবার তাকাইল তার পর আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল।

শশি বলিল, "তক্তপোষের উপর ভালো করে বসুন না, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন!"

সে লক্ষ্মী ছেলেটির মত তাহাই করিল। এই লাজুক ছেলেটার দুরবস্থা দেখিয়া প্রসন্ন দূর হইতে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল, শশির কিন্তু করুণায় বুকখানা ভরিয়া উঠিতেছিল।

সে বলিল, "এখানে আপনার লজ্জা করবার কোন কারণ নেই, মনে করে নিন না কেন আমি আপনার বড় বোন হই।" তার পর হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, "দেশে আপনার বড় বোন আছেন ত?"

সনত চকিতের মত একবার এই অপরিচিতা স্ত্রীলোকটির পানে চাহিল;—শশি দেখিল তার বড় বড় চোখ দুটি ছল ছল করিতেছে। শশি ভাবিল, দিদির জন্ত হয়ত তার মন কেমন করিতেছে, তাই বলিল, "আপনার দিদি বুঝি আপনাকে খুব ভাল বাসেন?

ভাঙ্গা গলায় সনত বলিল, "হ্যাঁ যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন খুবই ভাল বাসতেন।" তার চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া গোটা গোটা জলের ফোঁটা গুলো কোলের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল।

শশির ইচ্ছা যাইতে লাগিল এক মুহূর্ত্তে সে এই অপরিচিত ছেলেটিকে বুকের মধ্যে টানিয়া লয়।

তার পর আজে বাজে কত কথাই হইল। সনতদের দেশের কথা, তার বাপ মার কথা, তার বড় দুই ভায়ের কথা, তার বৌদিদিদের কথা, এমনি আরো কত কি।

সনত আসিয়াছিল নেহাতই লাজুক ছেলেটির মত কিন্তু দুচার কথার পর সে এমনি জমিয়া গেল এবং হাতমুখ নাড়িয়া এমনি বকিতে আরম্ভ করিল যে বাহির হইতে দেখিয়া কাহারও সন্দেহ করিবার জো ছিল না শশির সহিত তার পরিচয়টা মাত্র একদিনের এবং তাও কয়েক মিনিটের।

যাইবার সময় সনতের হঠাৎ খেয়াল হইল, আসল কথাটা ত শোনা হইল না। সে বলিল, "আপনি কি জন্তে ডেকেছেন তা ত কৈ বল্লেন না।"

একটু হাসিয়া শশি বলিল, "কাল আবার আসছ ত, তখন বলব এখন।" আপনি বলিয়া সম্বোধন করিতে তার নেহাতই বাধ বাধ ঠেকিতেছিল।

সনত চলিয়া গেলে পর শশি শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল; কিন্তু বেশিক্ষণ শুইয়া থাকিতে পারিল না। কলতলায় বসিয়া প্রসন্ন বাসন মাজিতেছিল শশি গিয়া তারি পাশে উপু হইয়া বসিল এবং কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়াই বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা সেসন্নী তুই যখন দেশ ছেড়ে চলে আসিস তখন তোর বয়েস কত।"

সে বলিল, "কুড়ি বছর।"

"তোর ছোট ভাই ছিল?"

"তা ছিল বৈ কি" বলিয়া প্রসন্ন একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল।

"তার জন্তে তোর মন কেমন করে না?"

"তা আবার করে না!" বলিয়া প্রসন্ন আঁচলের খুঁট দিয়া চোখের জল মুছিল।

শশি আবার নিজের বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল; তার মনে হইতে লাগিল, এই যে প্রসন্ন—এ তবু জানে কোথায় তার দেশ ছিল, কে তার বাপ মা, কে তার ভাই বোন, কিন্তু সে?—সে যে তাও জানে না। চোখ বুজিয়া সে যে একটি পরিচিত মুখ ও ভাবিতে পারে না—কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার। আজ মাস্তর কথা তার বার বার করিয়া মনে পড়িতে লাগিল। সেই দুদিনের হাসি কান্না—তার পর কোথায় সব মিলাইয়া গেল।

বালিসটাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া শশি ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

পরদিন সকাল বেলা চান করিয়া উঠিয়া শশি সবে মাত্র রান্না চড়াইয়াছে এমন সময় সনত আসিয়া হাজির হইল।

"আজ আসতে বলেছিলেন, এসেছি, এইবারে সেই কথা বলুন!"

"তোমার বুঝি কাল সারারাত ঘুম হয় নি?—আচ্ছা পাগলা ছেলে ত! বলিয়া শশি সস্নেহ দৃষ্টিতে তার মুখের পানে তাকাইল।

সনত চৌকাঠের উপর উপু হইয়া বসিয়া বলিল, "ঘুম হবে না কেন,—তবু শুনতে ইচ্ছে হয় না।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শশি বলিল, "বলছিলুম কি, তোমাদের দেশে আমার একটা থাকবার জায়গা ঠিক করে দিতে পার? এখানে আমার একটুও মন টিকছে না।"

এক মুহূর্ত্তে সনত লাফাইয়া উঠিল, "এই কথা, তা কাল বল্লেন না কেন—এখুনি দেশে গিয়ে সব বন্দোবস্ত করে আসতুম,—আমাদের বাড়ীতেই ত অনেক ঘর খালি পড়ে রয়েছে, গিয়ে থাকলেই হয়।" সে তারি উৎসাহের সহিত আরো কি বলিতে যাইতেছিল বাধা দিয়া শশি বলিয়া উঠিল, "সে হয় না ভাই; আশে পাশে কোন ছোট খাট বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় না?"

"কেন তাতে দোষ কি; মা শুনলে খুব খুসী হবে। আমার মাকে আপনি চেনেন না তাই ও কথা বলছেন।

ডালের কড়াটা উনান হইতে নামাইয়া শশি বলিল, "তোমাকে যে একবার দেখেছে তোমার মাকে চিনতে তার একটুও দেরি হয় না সনত!"

"তবে আপনার আপত্তিটা কি!"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শশি বলিল, "সব কথা কি বলা যায় ভাই।"

সনত বলিল, তা বেশ, একটা আলাদা বাড়ীই না হয় ঠিক কোরে দোবো।" কথাটা শেষ করিয়াই সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিল।

তার মুখের দিকে চাহিয়া শশি বলিল, "এখুনি উঠছ যে।"

সে বলিল, "দশটার গাড়ী ধরতে হলে আর ত দেরি করলে চলে না।"

অবাক হইয়া শশি বলিল, "সে কি! তুমি আজই দেশে চলেছ নাকি?"

সনত বলিল, "হাঁ।"

"না না অত তাড়াতাড়ি করবার কিছু দরকার নেই।"

সনত বলিল, "দেরি করেই বা ফল কি?"

শশব্যস্তে শশি বলিল, "না না তোমাকে অত ছুটো ছুটি করতে হবে না।"

একটু হাসিয়া সনত বলিল, "ছুটোছুটি করা আমার খুব অভ্যাস আছে;—আপনি দেখুন না, কালই সব ঠিক ঠাক করে ফিরছি।"

কথাটা শেষ করিয়াই সে এক লম্ফে উঠানে গিয়া পড়িল এবং চক্ষের নিমেষে দরজা পার হইয়া চলিয়া গেল।

সনতকে প্রথম যেদিন শশি ডাকিয়া পাঠায় সেদিন সে ভাবিয়াছিল, এই অপরিচিত ছেলেটি প্রথমেই তাকে জিজ্ঞাসা করিবে, বাড়ীতে কোন পুরুষ অভিভাবক নাই কেন? এবং তার উত্তরে কি বলিতে হইবে না হইবে তাহাও সে মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল কিন্তু এই অদ্ভুত ছেলেটি সে সম্বন্ধে একটি কথাও বলিল না।

(৭)

বৈকাল ৫টায় ট্রেণে দেশে পৌঁছিয়া একটা জীর্ণ একতালা বাড়ীর উঠানের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া সনত ডাকিল, "চন্দর দা আছ।"

বছর ৩৫ বয়সের গৌরবর্ণ ছিপ্‌ছিপে একটি লোক বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া

বলিল, "হঠাৎ ছুটি নেই ছাটা নেই দেখে এলি যে বড়!"

একটু হাসিয়া সনত বলিল,—"দরকার না থাকলে কি আর শুধু শুধু এসেছি!"

"তা ভেতরে আয় না, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন!"

দুজনে অপরিচ্ছন্ন একটা জীর্ণ ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সনত বলিল, "ঘরটা একটু পরিষ্কার করিয়ে নিতে পার না চন্দর দা—এ হয়েছে কি! এ ঘরে থাকো কি করে?"

চন্দ্রকান্ত একটু হাসিয়া উত্তর দিল, "আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে কি বলে জানিস, গৃহিণী যে সংসারে নেই, সে সংসার অরণ্য তুল্য—আমার ঘর ত তবু এখন তা হয় নি।

তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িয়া সনত বলিল, সংস্কৃত সাহিত্য এখন রাখ চন্দর দা, কাজের কথা আগে শোন—একটা ছোট খাট বাড়ী এ অঞ্চলে কোথায় পাই বল দেখি।"

"কেন কি হবে!" বলিয়া চন্দ্রকান্ত সনতের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

"আগে বল না কোথায় পাই।"

"কেন না বল্লে আমি বলছি না।"

"বলছি ত দরকার আছে।"

"কি দরকার শুনি!"

মাদুরের একটা কোন খুঁটিতে খুঁটিতে সনত বলিল, "একজনরা থাকবে।"

"কারা থাকবে তাই বল না!"

"সে তুমি চিনবে না চন্দরদা; তারা আমাদের দলের সামনে থাকে।"

"আরে বাপু, নেই বা চিনলুম, তা বলে তাদের চরিত্র শুনতে কিছু দোষ আছে!—আচ্ছা পাগলা তুই।"

"অত শত কে তাদের জিজ্ঞেসা করতে গেছে।"

"নাম ও জানিস না।"

"মেয়ে মানুষকে নাম জিজ্ঞাসা করতে বুঝি পারা যায়।"

"আরে পাগলা, তাদের কর্ত্তারা ত আর মেয়ে-মানুষ নয়।"

বিরক্ত হইয়া সনত বলিল, "তাদের কর্ত্তা আছে বুঝি।"

"তবে!"

"মেয়েটি একলাই সে বাড়ীতে থাকে। তাই ত তাকে দেখে আসবার চেষ্টা করছি।"

"একলা থাকে কি বল্?" বলিয়া চন্দ্রকান্ত অবাক হইয়া সনতের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।"

"হাঁ হাঁ একলা থাকে।"

"বলিস কি রে!" "তার পর কি ভাবিয়া সে বলিয়া উঠিল, "মেয়েটি কি তোর সঙ্গে কথা কয়?"

"তা আর কয় না।"

"তা তুই কোন কথা তাকে জিজ্ঞেসা করিস নি?"

"কি আর জিজ্ঞেসা করবো?"

তার পিঠে হাত বুলাইয়া দিয়া চন্দ্রকান্ত বলিল, "সাধে তোকে এত ভালবাসি সনত।" তার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল, মেয়েটির বয়স কত হবে আন্দাজ।

কিছুক্ষণ ভাবিয়া সনত বলিল, "তা অত বুঝতে পারি না, তবে আমার চেয়ে নিশ্চয়ই বড়।

"কি করে জানলি।"

"আরে, তা না হলে আর আমার সঙ্গে তুমি তুমি বলে কথা কয়।

হাসিয়া চন্দ্রকান্ত বলিল, "তবে নাকি আমাদের সনতের বুদ্ধি নেই।"

"না ঠাট্টা নয় চন্দরদা একটা কিছু ঠিক করে দাও।"

"তাই ত ভাবছি রে পাগলা, বাড়ী কোথায়

পাই ; পুরুষ মানুষ বলে না হয় আমারি একখানা ঘর সাফসুতরো করে দিতুম—তা ত আর হবার যো নেই।"

সনৎ বলিল, "আমাদের বাড়ীতে থাকবার কথা বলেছিলুম, তা রাজি হন্ না যে ?"

"তবে কি করি বল্ দেখি ?"

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—তার পর হঠাৎ এক সময় সনৎ বলিয়া উঠিল, "হয়েছে চন্দরদা,—ঠিক হয়েছে - ঘোষেদের বাড়ীটা ত পড়ে রয়েছে—ঐটে ভাড়া নিলে ত হয়।"

তারা কি ভাড়া দেবে ?"

"নিশ্চয়ই দেবে, দেশে ত তারা আসে না বলেই চলে—বাড়ীটা ত আজ ৪ বৎসর খালি পড়ে রয়েছে —তবু ত দুপয়সা আসবে। ঘোষেরা আবার রাজী হবে না—তুমি বল কি চন্দরদা।

কথাটা ঠিক শেষ হইয়াছে এমন সময় ৭, ৮ বছরের হৃষ্ট পুষ্ট একটি বালক ছুটিতে ছুটিতে ঘরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সনৎকে দেখিয়া লাফাইতে লাফাইতে মহোল্লাসে তার ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি কখন এলে সনুদা ?"

তাকে কোলের উপর টানিয়া লইয়া আদর করিতে করিতে সনৎ বলিল, "এই সবে আসছি, তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলি রে ভুলো।"

সনতের সাটের বোতামগুলো লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে ভুলো বলিল, "বারোয়ারি তলায় সং সাজছে তাই দেখছিলুম।" তার পর হাত মুখ নাড়িয়া সে কত কথাই বলিল ; কোন সংটা কেমন হইয়াছে,—পুতনারাক্ষসীর দাঁতগুলো কত বড় বড়, তীমের গদাটা কি প্রকাণ্ড ইত্যাদি ইত্যাদি। বর্ণনা শেষ করিয়াই সে বলিল, "চল না সনুদা,—দেখতে চল না।"

সে বলিল, "এখন থাক, অন্য সময় যাবো অখন।"

(৮)

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্যের ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাসটা হইতেছে এই :—তার পিতামহ ৺দ্বারিকানাথ ভট্টাচার্য্য বেশ একজন নামজাদা কণক ছিলেন ; কথকতা করিয়া তিনি বেশ দুপয়সা জমাইয়াছিলেন এবং পুত্রকে রিতিমত লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। চন্দ্রকান্তের পিতা ৺মহেশ ভট্টাচার্য্য সকল বিদ্যাই আয়ত্ত করিয়াছিলেন কেবল পয়সা কি করিয়া রাখিতে হয় সে বিদ্যাটা তাঁর একেবারেই জানা ছিল না। তাহাকে অন্ন বিস্তর ঠকাইয়া লয় নাই এমন লোক বোধ হয় ও তল্লাটে একটিও ছিল না। মহেশ চন্দ্রের কিন্তু ধারণা ছিল সেই সকলকে ঠকাইয়াছে কেন না গ্রামের অন্য লোকেরা যখন সংসার চক্রের নিষ্পেষণে দিন রাত আর্ত্তনাদ করিয়া মরিতেছে সে-সময় সেই কেবল ফাঁকি দিয়া নিজেকে চুপে চুপে কখন এই আঁতাকলটার বাহিরে লইয়া আসিয়া পুঁথির স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে দিব্য নিশ্চিন্তভাবে বসাইয়া দিয়া গিয়াছে।

লোকে তাকে আত্মাত্মক বলিত, সে মনে মনে হাসিত আর ভাবিত, "আহা বেচারাদের কি কষ্ট।

মরিবার সময় মহেশচন্দ্র একমাত্র পুত্র চন্দ্রকান্তকে ডাকিয়া বলিল, "তোমার জন্যে এই এক পুঁথি ছাড়া আর কিছুই রেখে যেতে পারলুম না বাবা।"

সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আপনার আশির্ব্বাদ আর ঐ পুঁথিই আমার যথেষ্ট—আপনি সে জন্যে ভাববেন না বাবা।"

অতি শৈশবেই চন্দ্রকান্ত মাকে হারাইয়াছিল—পিতার মৃত্যুর পর সে নেহাতই একা হইয়া পড়িল।

সকলে বলিল, "বিবাহ কর।"

সে বলিল, "উঁহু।"

বাপের রোগ চন্দ্রকান্তে বেশ রিতিমত অর্শাইয়াছিল। সেও দিন রাত পুঁথি হাঁটকাইতে আরম্ভ করিল। সকলে বলিল, "ছোঁড়াটার মাথা

বিগড়োতে বড় বেশি আর বিলম্ব নেই।" কিন্তু পুঁথি হাটকালে ত আর পেট ভরে না—চন্দ্রকান্তের ও পেট ভরিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

এই সময় সৌভাগ্য ক্রমে গ্রাম্য স্কুলের হেড পণ্ডিতের পদ খালি হয় এবং সনতের বাপের সুপারিসে সে উক্ত চাকরিটি সহজেই পাইয়া যায়।

গ্রামের সকলে তাকে ঠিক ভাল না বাসিলেও আহাম্মক বলিয়া মনে মনে একটু দয়া করিত কিন্তু হঠাৎ একদিন সে এমন একটা কাজ করিয়া বসিল যাহাতে গ্রামশুদ্ধ লোকের পিত্ত একই সঙ্গে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে পূজার ছুটিতে কাশী গিয়াছিল ফিরিল একটি ২, ৩ বছরের মোটা সোটা ছেলে লইয়া। পাড়ার সকলে জিজ্ঞাসা করিল, 'এ ছেলে তুমি কোথায় পেলে?"

সে বলিল, "ছেড়া করবার দরকার নেই, আমি আপনা হইতেই সব বলছি" তার পর একটুও দ্বিধা না করিয়া অতি পরিষ্কার কণ্ঠে সে বলিল, "এর মা ছিল কাশীর একজন বেশ্যা, সে হঠাৎ মারা যাওয়াতে, ছেলেটি একবারে নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে—কাজেই আমাকে নিয়ে আসতে হোলো।"

সকলে এক সঙ্গে চিৎকার করিয়া উঠিল, "আরে ছি ছি, এমন গোয়ার গোরেও মানুষে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি।"

সে কিন্তু একটু ও দমিল না,—বলিল, "মানুষ ত বটে।"

দু একজন বলিল, "এতই যদি দয়া হয়ে থাকে ত কলকাতায় কোন অনাথ আশ্রমে খরচ দিয়ে রেখে এলেই ত হয়।"

সে বলিল, "কলকাতার অনাথ আশ্রম ওয়ালারা কি তাকে এতবড় পুণ্যিটা মেরে দেবে, তার চেয়ে নিজের বাড়ীটাকেই একটা ছোট খাট অনাথআশ্রম করে তুল্লেই ত সব দিক বজায় থেকে যায়; এতবড় দাওয়াটা সব সময় ত আর জোটে না ইত্যাদি ইত্যাদি"

সকলে ছি ছি করিতে করিতে যে যার বাড়ী চলিয়া গেল।

কেহ কেহ আবার কথাটাকে আরও পাকাইয়া তুলিল, বলিল, "এর মধ্যে আরো অনেক ব্যাপার আছে যে, ছোঁড়াটার স্বভাব চরিত্র—বুঝলে কি না—।"

সনতের বাপ তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "এ সব কি শুনছি তোমার নামে চন্দর।"

সে ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, "কেন কি অন্যায়টা করেছি বুঝিয়ে দিন।"

চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, "সমাজ মেনে ত চলতে হবে বাবা।"

সে বলিল, "একদম্ই, কিন্তু সমাজই যে নেই।"

চট্টোপাধ্যায় একটু হাসিয়া বলিলেন, "যা থাকে, তৈরি কর!"

সে অম্লান বদনে বলিল, "তারি ত বনেদ খুঁড়ছি জ্যাঠা মশাই।"

বিরক্ত হইয়া চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, "তবে মরগে যাও বাপু—আমি কিছু জানি না।"

সে ধীরে ধীরে একটি নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

পাশে বসিয়াছিলেন বাচস্পতি মশাই তিনি পুরু কাঁচের চশমার ভিতর দিয়া মিট্ মিট্ করিয়া চাহিয়া বলিলেন, "কার সঙ্গে কথা কইছেন চাটুর্য্যে মশাই—ওর পেটে কি একফর্মা বিদ্যে আছে যে বুঝবে।"

পাড়ার সকলে মিলিয়া চন্দর ভট্টাচার্য্যকে একঘরে করিয়া দিল—তার চাকরীটিও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

রেবতীর মা স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমিও ওকে একঘরে করলে নাকি?"

রেবতীর বাপ আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, না ক'রে আর করি কি।"

"কেন?"

"তা না হলে আমাকে পর্যান্ত যে একঘরে করে দেবে।"

"তা ত বোলো কিন্তু ও বেচারা এখন খাবে কি ?"

একটু চিন্তা করিয়া চাটুয্যে বলিলেন, "তা না হয় লুকিয়ে লুকিয়ে মাসে মাসে কিছু সাহায্য করা যাবে এখন।"

সনতের মা অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলিল, "তোমরা তাকে চেন না বলেই ও কথা বলছ—সে না খেতে পেয়ে মরবে, তবু তোমাদের ভিক্ষে নিতে কোন দিন রাজি হবে না—এ আমি আগে থাকতে বলে রাখছি।"

চাটুয্যে বলিল, "ঐ বজ্জাতই ত হয়েছে ওর কাল।"

সনতের মা বলিল, "আমার সনাতন যদি কোন দিন অমন জব্দ করতে শেখে তা হলে গাছতলায় গিয়ে বাস করতেও রাজি আছি।"

মাথা চুলকাইয়া চাটুয্যে বলিলেন—"ছেলে অবশ্য যে মন্দ তা নয়—তবে কিনা—"

বাধা দিয়া সনতের মা বলিয়া উঠিলেন—"মন্দ নয় ? অমন ছেলে কটা দেখেছ বল ত ?

সেই দিনই সন্ধ্যার সময় সনতের মা সনতের হাত ধরিয়া চন্দ্রকান্তের বাড়ীতে গিয়া উঠিল এবং তাহাকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়াই সনতকে তার কোলের-উপর বসাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার সনতকে তোর হাতে সঁপে দিলুম চন্দর—তুই ওকে তোর মতন করে মানুষ করিস।"

চন্দ্রকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া সনতের মার পায়ের ধুলা লইল—চোখ দুটো তার ছল্ ছল্ করিতেছিল।

এ কথা সে কথার পর সনতের মা বলিল, "সব ত বুঝলুম কিন্তু তোর পেট চলবে কি করে ?"

সে একটা শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "ভগবানের রাজত্বে কে আর উপোষ করে আছে জ্যাঠাই মা।"

"কেন তোর জোঠাইমার অন্ন খেলে তোর মনটা কি কিছু খাটো হয়ে যায় ?"

সে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

"উত্তর দিচ্ছিস্ না যে বড়।"

সে বলিল, "তুমি সবই বোঝ জ্যেঠাই-মা, তবে কেন—" তার চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জলের ফোঁটাগুলো কোলের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল।

তার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে সনতের মা বলিলেন—"লক্ষ্মী ছেলে আমার—তোর জ্যাঠাই-মার মনে কষ্ট দিস্ নে।"

পর দিন সকাল বেলা উঠিয়া দাওয়ায় বসিয়া চন্দ্রকান্ত অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পুঁথি পড়িতেছিল, এমন সময় সনত তার উপক্রমণিকা হাতে লইয়া ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল এবং হঠাৎ চন্দ্রকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া দশটাকার দুটো নোট তার পায়ের কাছে নীরবে রাখিয়া দিল।

তাকে আদর করিয়া কাছে টানিয়া লইয়া চন্দ্র বলিল, "এ টাকা তোমাকে কে দিলে সনত ?"

সে বলিল, "মা দিয়েছে—আর বলেছেন আজ থেকে আপনি আমাকে পড়াবেন।"

তার মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া চন্দ্রকান্ত বলিল, "তা তার জন্যে টাকার কি দরকার ভাই !"

সে বলিল, "মা বলে দিয়েছে—আপনাকে ও টাকা নিতেই হবে।"

সে দিন চন্দ্রকান্ত সনতকে অনেকক্ষণ ধরিয়া উপক্রমণিকা পড়াইল এবং পড়া শেষ হইয়া গেলে নোট দুটো তার হাতে দিয়া বলিল, "তুমি তোমার মাকে বোলো চন্দর-দা বলে, টাকা নিয়ে নিজের ভাইকে পড়াতে সে পারবে না।"

কিছুক্ষণ পরে সনতের মা নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মুখখানা অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "জ্যাঠায়ের ভাত খেতে যার অপমান বোধ হয়, এমন দাদার কাছে পড়তে গেলে পয়সা দিয়ে পড়াই তাদের উচিত।"

চন্দ্রকান্ত ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল—একটি কথাও বলিল না। (ক্রমশঃ)

দোল-লীলা

(শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়)

গোয়ালার ঘরে একি কলরোল,
কিসের খেলা রে আজ!
তাই আজি মোরে দেখিতে পাঠাল
ক্রুদ্ধ কংসরাজ।
ছোট লোক তোরা, রীতি নীতি সব
তুচ্ছ হিসাব মতে;
একি এ কাণ্ড করেছিস্, বল্—
বৃন্দাবনের পথে।
কিসার পুঁজি—সে ত সবই জানি—
মানের বালাই নাই;
তাই বলে' কিরে লোক-লজ্জারও
নজর থাকেনা ছাই!
কুলবতী তোরা, গৃহে নিজ পতি,
নাগর লইয়ে খেলা;
কংস-রাজের সীমানার মাঝে
বসালি পীরিতি-মেলা!
রাজার আদেশে এসেছি হেথায়
নিয়ে যাব সব ধরে',
বয়সের ধার ধারিব না আজ,
কারাগার সবা তরে!
কোথা সে তোদের ব্রজের দুলাল,
বসু-দেবকীর ছেলে—
নিজের বালাই বেশি হ'ল যার
জনক-জননী ফেলে'।
একি ও আবার, আমার অঙ্গে
কাণ্ডার পিচকারি—
বয়সের খেলা বনাল, তোদের
সাহসের বলিহারি!
আয় তবে আয়, দেখা যাক্ আজ,
কার কতখানি বল—
গোয়ালার বাড় করিব উজাড়
পাঠাইব রসাতল!
একি হ'ল হায়, কি রাগিণী, বল্,
বাজিল বাঁশির সুরে—
বিকল করিল অন্তর-মন
রাজাদেশ গেল দূরে!
পূর্ণিমা রাতি কি মায়া মেলিল,
স্বপনে ছাইল মোরে;
কঠোর হিয়ার কঠিন পাষাণ
গলিল নয়ন-লোরে!
কোথা গো ব্রজের ব্রজবালা-গুরু,
কোথা গো হৃদয়-রাজ!
নব-অনুরাগে রাঙিয়া উঠিনু
কাগের রঙেতে আজ।
ভেসে যাক্ দূরে রাজার হুকুম,
মথুরা ডুবুক্ জলে—
বন্দিত হিয়া শরণ লভিল
তোমারি চরণ-তলে।

ফেরিওয়ালা

(অধ্যাপক—শ্রীহেমন্তকুমার সরকার এম. এ.)

(১)

হিন্দুস্থানী হইলেও বাংলাদেশে বসবাস করিয়া রামু বাঙালী হইয়া গিয়াছিল—এমন কি বাংলা ভিন্ন অন্য কথাই সে বুঝিত না। মফঃস্বলের এক সহরের একটা গলিতে সে একখানা ঘর ভাড়া লইয়াছিল—সেখানে সে চানাচুর, ঘটর ভাজা, অবাক্ জলপান, ঘুগনী দানা, বাদামের মুড়কি, চিনির আমলিচু প্রভৃতি তৈরি করিয়া বেচিত এবং তাহাতেই তাহার বেশ চলিয়া যাইত।

(২)

সেবার সহরে বড় কলেরা হইল! রামুর রক্ষিতা মেয়েলোকটি একটি দুই বৎসরের শিশু রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিল। সংসারে আর দ্বিতীয় মানুষ ছিল না—কে এই ছেলেকে লালন পালন করিবে ভাবিয়া রামু একটু ভাবিত হইয়া পড়িল। বন্ধুবান্ধব পরামর্শ দিল আর একটা মেয়েলোক রাখিতে, কিম্বা ছেলেটিকে কাহাকেও বিলাইয়া দিতে। অপর লোকে আর কেই বা ছেলের ভার লইবে, কেহই রাজি হইল না—ছেলেটিকে বিলাইয়া দিতেও রামুর মন সরিল না—সে প্রতিজ্ঞা করিল যেমন করিয়াই হোক তাহাকে মানুষ করিতে হইবে।

(৩)

রামু যখন ফেরিতে বাহির হইয়া যায়—ছেলেটিকে ঘরে তালা বন্ধ করিয়া রাখিয়া যায়। ফিরিতে দেরী হইলে ক্ষুধার জ্বালায় অনেক সময় সে কাঁদিয়া পাড়া মাথায় করে—একটি ঘরের ভিতর পড়িয়া চীৎকার করিতে থাকে। পাড়ার লোকে বিরক্ত হয়, কত বকেঝকে—রামু তাহাদের হাতে পায়ে ধরিয়া বুঝাইয়া তাহাদের ছেলেপিলেকে একটু আধটু খাবার দেয়—তাতেই পাড়ার লোক আর কিছু বলে না।

(৪)

শিবু মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। বাবার সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে পাকা ফেরিওয়ালা হইয়াছে। এখন সহর হইতে পাঁউরুটি লইয়া গিয়া পাড়াগাঁয়ে বেচিয়া সে বেশ দু'পয়সা রোজগার করিতেছে। সে যা পায়, বাবাকে আনিয়া দেয়—নিজের যখন যা দরকার হয় বাবার কাছ হইতে চাহিয়া লয়। কেবল পূজা পার্ব্বণের সময় নেশাভাঙ করিবার জন্য কিছু পয়সা সরাইয়া রাখে।

(৫)

আমোদপুরের গোয়ালাদের বিধবা মেয়েটির জ্বর,—অনেক দিন ধরিয়া ভুগিতেছে। শিবু রোজ তাহার বাড়ীতে পাঁউরুটি দিতে যায়—সহর হইতে ঔষধ আনিয়া দেয়। লোকে নানা কথা বলে—নিস্তারিণী তাহাতে কাণ দেয় না, বিপদের দিনে গাঁয়ের কেহ তো তাহার মুখে জল ফোঁটাটি দেয় নাই। শত্রুরা তাহাকে ভোগের দাসী করিতে পারে নাই বলিয়া, আজ সুবিধা পাইয়া অনেক অপবাদই দিল। শিবুর যত্নে নিস্তারিণী মরণের মুখ হইতে ফিরিয়া আসিল—অলক্ষ্যে জীবনদাতার পদে তাহার জীবন নিবেদিত হইয়া গেল।

(৬)

রামু নিস্তারিণীকে পাইয়া বড় খুসী—বৃদ্ধ বয়সে এমন আদর যত্ন পাইবে সে ইহা স্বপ্নেও ভাবে নাই। নিস্তারিণীর সিঁথির সিঁদুর ছয় বৎসর বয়সেই ভাগ্য-বিধাতা মুছিয়া দিয়াছিলেন—সে শিবুকে পাইয়া

সকল দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছিল। দুটো একটা গোরু রাখিয়া নিস্তারিণী দুধের ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিল। যৌবনের শ্রী তাহার সকল অঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে—নিস্তারিণী যে চায়ের দোকানে দুধ যোগান দেয়। সেখানে খরিদ্দার আর ধরে না—যত ভদ্রলোকের ছেলের সেই দোকানে ভিড়—কখন নিস্তারিণী আসিবে, দুধ দিয়া যাইবে, তাহার সঙ্গে একটু আধটু রসিকতা হইবে—এই আশায় সকলে বসিয়া থাকিত। দুধের সব চায়ের দোকানের দুধের যোগান নিস্তারিণীর একচেটে হইয়া গেল।

(৭)

বেশ সুখে সংসার চলিতেছিল—এমন সময় ভয়ঙ্কর মহামারীতে শিবু সংসার অন্ধকার করিয়া লইয়া গেল। রামু ও নিস্তারিণীর শোকের আর অবধি নাই। বাড়ীতে একটা কুরুর ছিল, সে আজ দুই দিন ভাত খায় নাই—গরুগুলির চোখ দিয়াও ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছে। নিস্তারিণী আমিষ আহার ছাড়িয়াছে—নিয়মিত ভাবে অশৌচ পালন করিতেছে—এমন সময় তাহাকেও কালরোগে ধরিল। শিবুর অসুখের সময় সেবাশুশ্রূষা করিয়া তাহার ও রামুর শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এবার কি রামু আর কত করিবে! চায়ের দোকানে সব ছেলে বসিয়া থাকিত তাহাদের অধ্যে অনেকে বন্ধু-সমিতির সভ্য ছিল—রামু তাহাদের খবর দিল। নিস্তারিণীর অসুখ শুনিয়া দলে দলে সকলে দেখিতে আসিল। তাহার গায়ে সেঁক দেওয়া, গা ও পা টিপিয়া দেওয়া—সেবাশুশ্রূষা করার লোকের আর অভাব হইল না।

(৮)

আজ একাদশী নিস্তারিণী জল পর্য্যন্ত মুখে দিবে না—শিবুকে যে সে আজ হারাইয়াছে—ব্রাহ্মণ কায়স্থের বিধবারা জল গ্রহণ করেন না—সেও নিরম্বু উপবাস করিতে চাহিল—ঔষধ পর্য্যন্ত খাইবে না। সেবকগণ তাহার এই বাড়াবাড়ি দেখিয়া অনেক প্রকার গালিগালাজ, এমন কি ধর্ম্মান্তিক ঠাট্টাতামাসা পর্য্যন্ত করিতে লাগিল—অবশেষে বলপ্রয়োগে ঔষধ পথ্যাদি দেওয়া হইল। রাত্রে রোগ বাড়িল—নিস্তারিণী আবল তাবল বকিতে লাগিল—কেবল শিবুর কথা—শেষ পর্য্যন্ত ঐ একই কথা বলিতে বলিতে তাহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া রোধ হইল। নিস্তারিণী শেষ রাত্রে ইহলোক ছাড়িয়া গেল।

(৯)

মড়া ফেলিতে লোক পাওয়া যায় না—অবশেষে ডোমের গাড়ীতে নিস্তারিণীর গতি হইল—অসতী ছিল বলিয়া কেহ তাহার সৎকারে যোগ দেয় নাই।

(১০)

রামু শোকে তাপে পাগল-প্রায় হইয়া গিয়াছে, সে আজ পথের ভিখারী, তাহার জীবনের খুঁটি ভাঙ্গিয়াছে, বেচাকেনা শেষ হইয়াছে, বৃদ্ধ খেয়া-ওয়ালা আজ ওপরের খেয়াঘাটে খেয়ার অপেক্ষায় আনমনা হইয়া বসিয়া আছে, কবে নিস্তার পাইয়া নিস্তারিণী ও শিবুর সঙ্গে আবার গিয়া মিলিত হইবে।

নাম

(শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী)

নাম হয়ে সে নিল বাসা মনের আড়ালে,
যখন খুসী পায় তারে প্রাণ বাহু বাড়ালে ;
দিনের কাজের ফাঁকে ফাঁকে
আঁধার রাতের পাকে পাকে
জড়ান সেই নামের মালা—যায় না ছাড়ালে !

গান হয়ে সে বাজে কানে সুরে ও ছন্দে,
নাসা আমার ভরে' উঠে নামের সুগন্ধে ;
পরশটি তার দেহ বুলায়
দৃষ্টি তারি নয়ন ভুলায়,
জিহ্বা সে নাম-রূপের মধু পিয়ে আনন্দে ।

রূপ যা আছে—ফুটে' উঠে নামের আখরে,
অগ্নিশিখায় স্বর্ণ মিলায় বর্ণ যা' করে' ;
নামের সুধা গন্ধ পিয়ে
গুণ সে উঠে গুনগুনিয়ে ;
নামের বলক উঠে ধরায় রসের সাগরে ।

বুক ভরে' নাম স্মরণ করি, মুখ ভরে' নাম বলি,
কভু ডাকি আলিঙ্গনে কভু কৃতাঞ্জলি ;
সেবায় কভু পুরিয়ে নি সাধ
অভিমানে দিই অপরাধ,
যখন যা চাই—নাই পরিবাদ নাইক ছলাছলি ।

কিরূপ সেরূপ—চক্ষু কভু চায় না জানিতে,
নামের মাঝে নামের বালাই টেনে আনিতে ;
জানি শুধু বুকের মাঝে
সুরে সুরে সারা বাজে—
ব্যথার মত নিবিড় তারি নামের বাঁশীতে ।

তোমরা সহ আর সকলি আমারে দাও নাথ,
ইষ্টের থাকুক সে মোর বক্ষে অবিরাম ;
কার সাথে কার কি সম্বন্ধ,
নাইক কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ;
আমার শুধু আনন্দ তার নামটি অভিরাম !

স্বামীর প্রেম

(গল্প)

(শ্রীমতী খুরসিদ আঁরা বেগম)

১

আজ অম্বিকার কিশোরীমোহনের বাড়ীতে তাঁহার একমাত্র আদরিণী কন্যার বিবাহোপলক্ষে সকলেই আনন্দিত। একমাত্র কন্যার বিবাহ উৎসবে তিনি সমস্ত আত্মীয় স্বজনকে নিজের বাড়ীতে আনাইয়াছেন। আত্মীয় অভ্যাগতের গোলমালে, ছেলেপিলেদের চিত্তের উল্লাসে বাড়ী গম গম করিতেছে। দেউড়িতে দেউড়িতে সানাইয়ের মধুর ধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইতেছে। পাড়াগাঁয়ে ইংরেজী বাজনা খুব একটী নূতন জিনিস, তাই পাড়ার ছেলেপুলেরা দলে দলে সেখানে জমা হইয়া বাজনার মধুর তান উপলব্ধি করিতেছে। কিন্তু যার বিয়ে তার মনে

নই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই" অবস্থা হয়েছে, যেনো জমিদার বাবুর চতুর্দশবর্ষীয়া কন্যা অমিয়া বক্ষের সুসজ্জিত শয়ন প্রকোষ্ঠে মলিন বিষণ্ণ মুখে সিয়া আছে। এমন সময় তাহার সই চারুবালা সি হাসি মুখে আসিয়া তাহাকে এমন মলিন দেখিয়া জ্ঞাসা করিল "একি ভাই! কাল তোমার বিয়ে, রে আজ তুমি এমন গম্ভীর হ'য়ে বসে রয়েছ?" মিয়া সইকে হঠাৎ দেখিয়া খুব সুখী হইল। চোখভরে তাহাকে বসাইয়া বলিল "কখন এলে ই চারু?" এইত এখনই এলুম. "তুই বল্ কেন ন মলিন হ'য়ে আছিস্?" অমিয়া একটী দীর্ঘ-শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "ভাই যার প্রাণে নার আনন্দ আছে, সেই না বিয়েতে সুখী হবে, র যার প্রাণে নিরাশার আগুন অহরহ জলিতেছে, কি করে নিজেকে প্রফুল্ল রাখিতে পারে?" চারু ও অমিয়ার অন্তরঙ্গ বন্ধু, তবুও তাহার কথার উপলব্ধি করিতে পারিল না এবং বলিল ন অমু, তোর প্রাণে নিরাশার কি আছে? ন সুন্দর উপযুক্ত বর পাবি, চিরকাল বাপ মায়ের ছে থাকবি, তোর আবার দুঃখ কিসের?" ন এই প্রশ্নে অমিয়ার পদ্মপলাশ চক্ষু দু'টী ল ভরিয়া উঠিল, সে নিজেকে সামলাইতে না রিয়া প্রিয়তমা অমির স্নেহময় বক্ষে মুখ লুকাইয়া ুল নয়নে কাঁদিতে লাগিল। চারু আদরে তাহার ের জল মুছাইয়া দিয়া কহিল, "ছিঃ অমু, এই দিনে কাঁদতে নেই, লক্ষ্মীটি আমায় বল্‌বি তোর কিসের ব্যথা, আমি তাহ'লে রাগ ব তাই?" অমিয়া তখন ধীরে ধীরে সলজ্জ মুখে জর হৃদয়ের অতি গোপন ব্যথাটী সখীর নিকট করিল। পৃথিবীতে সকলের মনের গোপন অন্ততঃ একজনের কাছেও না বলিয়া া যায় না। যদি নিজের সমবেদনাপূর্ণ একটী ও পাওয়া যায় তাহ'লে হৃদয়ের গুরুভার ক প্রশমিত হয়।

সুনীলচন্দ্র অমিয়ার বাল্যসঙ্গী; ছোটবেলা হইতে তাহারা একসঙ্গে খেলাধূলা ও পড়াশুনা করিয়াছে। তাহাদের বাল্যের প্রণয় ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমে পরিণত হইয়াছিল। তাহারা উভয়ে উভয়কে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত। সুনীল কলিকাতায় থাকিয়া পড়িত কিন্তু তাহার প্রাণটী পাড়াগাঁয়ে জমিদার কিশোরীমোহনের দ্বিতল অট্টালিকার একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে পড়িয়া থাকিত। যখনই ছুটীতে বাড়ী আসিত, তাহার কর্ত্তব্য ছিল অমিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে কলিকাতার আনীত উপহার দ্রব্যগুলি দেওয়া। অমিয়াও সেগুলি সাদরে গ্রহণ করিয়া অতি যত্নের সহিত রাখিয়া ব্যবহার করিত। সুনীল ধনীর সন্তান, তাহার পিতামাতার একান্ত ইচ্ছা একটী টুকটুকে রাঙ্গা বৌ ঘরে আনেন। কিন্তু অমিয়ার পিতার সাথে তাহাদের আদরিণী একমাত্র কন্যাকে একটী দরিদ্র ভদ্রবংশজাত উপযুক্ত সুন্দর জামাতার হস্তে সম্প্রদান করিয়া চিরকাল নিজের কাছে রাখেন। উভয় পরিবারের মতের গোলযোগে এই অগাধ প্রেমপূর্ণ দু'টী প্রাণ চিরতরে বিচ্ছিন্ন হইল। পিতামাতা দেখিয়াও দেখিলেন না।

২

চারু অমিয়ার গোপন হৃদয় ব্যথাটী শুনিয়া অমিয়ার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অত্যন্ত চিন্তিতা হইল। চারু অমির চেয়ে দুই বৎসরের বড়, তাহার আজ দুই বৎসর হইল অমির ভাবি শ্বশুরালয়ের নিকটেই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আজ বহুদিন পরে দুই সখীতে আবার সাক্ষাৎ। চারু অমুর সুন্দর অশ্রুসিক্ত মুখখানি নিজের বুকের উপর টানিয়া বলিল "বোন্, যা হবার হ'য়ে গেছে, যেখানে পিতামাতার অনিচ্ছা সেখানে আমাদের মত পরাধীনাদের কোন কথাই চলতে পারে না, আর যেসময় পিতামাতা সর্ব্বদা ভালবাসার ধনের মঙ্গলই কামনা করেন, তাহাতে সুখী ও সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।" অমিয়া এই কথাতে

আর কোন উত্তর না দিয়া চুপ্ করিয়া বসিন মুখে বসিয়া রহিল। চারুকে অমিয়ার মাতা কি কাজে ডাকিলেন; সে অমুকে "লক্ষ্মী বোন্ মিছে কেঁদে মন খারাপ করিস্‌নে" বলিয়া চলিয়া গেল।

৩

সকাল সাতটা বাজিয়া গিয়াছে, শীতের প্রভাত, সূর্য্যের প্রথম রশ্মি কক্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; কলিকাতার কোন একটী মেসের ছেলেরা কেহ সবে ঘুম হইতে উঠিয়াছে. কেহ বা অনেকক্ষণ উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া অভ্যাসমত পুস্তক হস্তে অধ্যয়ন করিতে বসিয়াছে। সুনীলকুমার সবেমাত্র একটী দুঃস্বপ্ন দেখিয়া চিন্তিতমনে বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে, এমন সময় সহাধ্যায়ি বন্ধু প্রভাত একখানি চিঠি হস্তে প্রবেশ করিয়া বলিল "সুনীল, নে তোর চিঠি, আজ যে উঠ্‌তে এত দেরী, আজ না আমাদের "পিক্‌নিক্" করতে যাওয়ার কথা আছে, যাবি নে?" "দেখি যেতে পারি কিনা—শরীরটে আজ ভালো নেই।" প্রভাত চলিয়া গেল। সুনীল পরিচিত হস্তাক্ষর দেখিয়া চিঠি খুলিল। তাহার ছোট ভগ্নী শুভা লিখেছে "দাদা, তুমি হয় ত শুনে সুখী হবে অমুদির বিয়ে, আমাদের নিমন্ত্রণ হয়েছে, কিশোরী কাকা তোমাকে আস্‌তে বলেছেন, তুমি আস্‌বে না?" পড়িয়া সুনীলের হস্ত হইতে পত্র খসিয়া পড়িল, "একি! বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! তাহার এত সাধের অমিয়া কিনা পরের হইবে? হায় ভগবান! ইহা শুনার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইল না কেন? আমি যে অমিয়াকে নিজের সমস্তখানি প্রাণ দিয়া ভালবাসি, অমুকে না পাইলে বাঁচিব কি করিয়া?" আর অমু! সেই চিরস্নেহময়ী অমু—যে তাহাকে বই জানে না, তাহাকে পাইলে যে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ পায়, সে কি করিয়া তাহাকে ভুলিয়া থাকিবে! তাহার চিন্তাও যে অমুর পাপ। এই সব চিন্তায় সুনীলের মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে যে কি করিবে ঠিক করিতে পারিল না। একবার ভাবিল যাই, যাইয়া চিরদিনের জন্য একবার আমার সর্ব্বসুখের আধার মানস-প্রতিমাকে দেখিয়া আসি। আবার ভাবিল, না সে নিদারুণ দৃশ্য দেখা তার পক্ষে অসম্ভব। তাহার চির আদরের প্রেম-প্রতিমাকে পরের হস্তে সঁপিয়া দেওয়া হইবে তাহা সে সহ্য করিতে পারিবে না। সে সমস্তদিন নিজের ঘরে পড়িয়া রহিল. সতীর্থরা আসিয়া বনভোজনে যাইতে অনুরোধ করিল। বহুকষ্টে সে সব এড়াইয়া নিস্তব্ধভাবে বিছানায় পড়িয়া রহিল। অনেক চিন্তার পর বিবাহে যাওয়াই স্থির করিল, এবং পাত্র পাত্রীর জন্য কিছু উপহার দ্রব্য লইয়া ভারাক্রান্ত মনে তার গ্রামে বাটী উদ্দেশে যাত্রা করিল।

আজ অমিয়াবালার বিবাহ। সমস্তদিন সে একাধারে কাঁদিয়াছে, তাহার অশ্রুরোধ করা সকলের সাধ্যাতীত হইয়াছে। সে কাহাকে একটীবার দেখিবার আশায় ক্ষণে ক্ষণে চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইতেছে, আবার নিরাশ নিপীড়িত হইয়া কাঁদিতেছে। হায় ভগবান! একটীবার আমি সুনীলদাকে দেখ্‌তে পেলে তাঁর সযত্ন-প্রদত্ত উপহারগুলি তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর কাছে জন্মের শোধ বিদায় নিতুম। উঃ! না জানি আজ আমাকে তিনি কি মনে কচ্ছেন! কত কষ্ট হচ্ছে তাঁর প্রাণে—এই নিদারুণ সংবাদ-শুভা নিশ্চয়ই তাঁকে লিখেছে। রাত্রে বিবাহ, বর এসেছে, চারিদিকে ভয়ানক গোলমাল, এমন সময় "অমু কি কচ্ছিস?" বলিতে বলিতে একটী গৌরকান্তি সুদর্শন যুবক অমিয়ার কক্ষে প্রবেশ করিল। সে সেদিন ভোরের ট্রেণে বিবাহ বাড়ীতে এসেছে, কিন্তু সমস্তদিন একবার অমুর কাছে আসিবার অবসর পায় নাই। অমু ব্যস্ত সমস্ত হইয়া "একি সুনীলদা! তুমি কখন এলে" বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। সুনীল সস্নেহে তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল "মিছামিছি কেঁদে কি হবে? তুমি সুখী হও আমার এই কামনা, আমার জন্যে ভেবোনা,

আমি কখনও তোমাকে ভুলবো না ইহা নিশ্চয়ই জেনো।" অমু আর কিছু না বলিয়া উঠিয়া গিয়া সুনীলের প্রদত্ত উপহারগুলি আনিয়া তাহার হাতে দিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কহিল "এসব তুমি ফিরিয়ে নাও, এগুলি রাখার অধিকার আর আমার নাই।" সুনীল ইহাতে বাধা দিয়া কহিল "কেন অমু, আমি কি তোর সুনীলদাদা নই? সেই অধিকারেও তুই আজ এ সব তোর কাছে রাখতে পারবি।"

শুভলগ্নে শুভক্ষণে শুভদৃষ্টি হইয়া গেল। জানি না বিধাতার কোন্ শুভাশীষ সে সময়ে দম্পতীর উপর বর্ষিত হইয়াছিল।

৪

অমিয়া এখন ২।৩টী সন্তানের জননী, প্রেমময় স্বামীর সোহাগে আদরে ছেলেপিলেদের সেবায় সে এখন সর্ব্বদা ব্যস্ত। পিতার মৃত্যু হইয়াছে। বিপুল সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী সে ও তাহার স্বামী। সুনীলের স্মৃতি এখন তাহার দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। পৃথিবীর গতিই এই, একদিন যাহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা হয়, আর একদিন হয়ত তাহার ছায়া মাড়াইতেও ঘৃণা হয়। সুনীলের নামও এখন তাহার মুখে কেহ শুনে না। অমিয়ার স্বামী শিশিরচন্দ্র অত্যন্ত সচ্চরিত্র এবং মিষ্টভাষী, সে অমিয়াকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে, ও তাহারই অগাধ ভালবাসায় ও অপরিমিত সোহাগে দিনে দিনে তিল তিল করিয়া সুনীলের মুখ অমিয়ার হৃদয় হইতে অপসারিত হইয়াছে। এজন্য সে প্রেমময় স্বামীর নিকটে কৃতজ্ঞ।

আজ বহুদিন পরে চারুর সহিত অমিয়ার সাক্ষাৎ। চারু স্বামীর সহিত তাঁহার কার্য্যস্থলে গিয়াছিল। প্রায় তিন বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়াছে। পিত্রালয়ে দুই সখীতে আনন্দ সম্ভাষণের পর অনেকক্ষণ নানা গল্প হইল। শেষে চারু হাসিয়া অমিকে জিজ্ঞাসা করিল "কিলো তোর সুনীলদার খবর কি?" অমু সখীর কথায় ব্যথিতা হইয়া কহিল "আর ভাই সে কথা ব'লে আমাকে লজ্জা দিস্‌নে। সত্যি ভাই, আমার বড় দুঃখ হয় কেন এ ছেলেমানুষী করেছিলুম। এজন্য আমি সর্ব্বদা মনে মনে স্বামীর কাছে ক্ষমা চাই।" বাস্তবিক শিশির ঠাকুরপো তোকে যেরূপ ভালবাসেন, তাহাতে তুই না ভুলে থাকতেই পারবি নে।" অমু ইহাতে অত্যন্ত লজ্জিতা ও বিস্মিতা হইয়া স্মিতহাস্যে অধর রঞ্জিত করিয়া কহিল "বলিস্ কি, উনি কি তোর ঠাকুরপো নাকি? আর ঠিকই বলেছিস ভাই, নইলে বোধ হয় আমি সুনীলদার স্নেহ ভুলতে পারতুম না। যাক এখন তোর খবর কি?" চারু হাসিয়া কহিল "তুই বুঝি জান্‌তিস্‌নি। উনি আর তোর বর যে সম্পর্কে ভাই হয়। আমার আর খবর কি থাকতে পারে? আমরা সুখী মানুষ, সর্ব্বদা একভাবেই থাকি। শুনেছি সুনীলদা বিয়ে করেছেন, বৌ দেখেছিস?" অমু বিরক্ত হইয়া কহিল "আবার সেই কথা?"

"কেন তোর দুঃখে নাকি?" "দূর তা কেন হবে? আর আমিও তাঁর সম্মুখে যাই না, কেমন ক'রে তাঁর মনের কথা জান্‌বো?" "কেন তুই সম্মুখে যাসনে? ঠাকুরপো বারণ করেছে নাকি?" "না আমার লজ্জা করে, আর মা বারণ করেছেন, বাবারও ইচ্ছে ছিল না যে আমি সুনীলদার সম্মুখে যাই। যাক এখন এসব কথা বাদ দিলেই ভাল হয়, ঐ দেখ খোকা উঠেছে।" বলিতে বলিতে উঠিয়া গিয়া পালঙ্কোপরি শায়িত টুকটুকে একটী খোকাকে কোলে লইয়া তাহার সুন্দর সদ্যজাগ্রত রাঙ্গা মুখে অজস্র চুমো দিতে দিতে বলিল "আমার এই সোণার চাঁদরা থাকতে কি কারও কথা মনে আসতে পারে?" এমন সময় তাহাদের কথায় বাধা দিয়া শিশি ঘরে ঢুকিল ও চারুকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কহিল "একি বৌদিদি, তুমি কবে এলে, বেশ ত গল্প জুড়ে দিয়েছ?" এই যে ঠাকুরপো আজই এসেছি, অমু যে আমার সই তা বুঝি জান না?" শিশির বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল "কই

না অমিয়া ত আমাকে কখনও বলে নাই? যাক্ ভালই হয়েছে তোমরা দুই সই, আমরা দুই ভাই।" এই বলিয়া সে খোকাকে কোলে লইয়া চলিয়া গেল।

অমিয়া এতদিন জানিত না যে চারু তাহার স্বামীর বৌদিদি, সে চারুকে জড়াইয়া ধরিয়া কৃত্রিম কোপের সহিত কহিল "তুই কি দুষ্টু ভাই, এতদিন তুই তোদের সম্বন্ধের কথা আমাকে বলিস নি?" চারু হাসিয়া কহিল "বিয়ের সময় যদি বল্‌তুম তা'হলে তোর মনের কথাটী ত আমাকে বল্‌তিস নে।" অমিয়া দুঃখ মিশ্রিত অভিমানে কহিল "বেশ বোন্, তুই কি আমার সই চারু বল? হলিই বা স্বামীর বৌদিদি, আমার ত প্রাণসই!"

ওপারের আলো

(সমালোচনা)

এখানি একটি উপন্যাস; রচয়িতা—প্রবীন সাহিত্যিক রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি এ। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা।

উপন্যাস খানির মধ্যে যে চরিত্রটি আমাদের ভাল লেগেছে এবং যে চরিত্রের ভিতর দিয়ে লেখক তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টির চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছেন সেটি হচ্ছে অনৈক ব্রাহ্মণ-বিধবা যুবতীর চরিত্র।

আমাদের দেশের প্রাচীন মঙ্গল গান এবং কাব্যের মধ্যে যেমন একটা করে ধুয়া থাকতো, যার ভিতর দিয়ে দু-চার কথায় সমস্ত প্রতিপাদ্য বিষয়টার একটা আভাস কেবল নিরবচ্ছিন্ন একটা সুরের মধ্য দিয়ে ভেসে উঠতো, ঠিক তেমনি করে মাঝখান থেকে এই একটিমাত্র চরিত্র খাড়া ক'রে তুলে লেখক সমস্ত বইটার ভিতরে যে রসটা জমে উঠছিল তারি একটি পূর্ণাভাস কেবল মাত্র একটা জমাট সুরের ছোট টুকরোর ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে তুলেছেন।

ধুয়ার সুরটা কানে নিয়ে তখনকার দিনের শ্রোতারা যেমন সেই ভাবে ভাবাপন্ন হয়ে সমস্ত মঙ্গল গানটা আগাগোড়া চুপ করে শুনে যেত—মন্ত্রমুগ্ধের মত,—এই একটি মাত্র চরিত্র এবং তারি বিচ্ছিন্ন জীবনের করুণ সুরটি কানে নিয়ে সমস্ত পুস্তকটিকে ঠিক তেমনি করে, সুরের নেশায় বিভোর হয়ে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়।

গান গাইতে গাইতে হঠাৎ এই যে তান মেরে যাওয়া,- এ বড় সোজা কথা নয়; খুব বড় ওস্তাদ না হলে এ কাজ যার তার দ্বারা হ'তে পারে না।

চরিত্রটি বাস্তবিকই একটা সুর—এবং সেটা সুর বলেই মনস্তত্ত্বের জটিলতার ভিতর দিয়ে তাকে ফুটিয়ে না তুলে সোটাকতক রংএর আঁচড় দিয়ে লেখক তাকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন - এবং তাঁর সে চেষ্টা একেবারেই ব্যর্থ হয় নি।

সাধারণ লেখক হ'লে, এই যায়গায় Psycho-log)র খেলা একটু আধটু না ঢুকিয়ে কখনই স্থির থাকতে পারতেন না; - ফলে সমস্ত জিনিষটার কাব্য নষ্ট হয়ে যেত।

এই যে ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা যুবতীটি,—ইনি ভয়ানক রকম আচার বিচার মেনে চলতেন; গোবর-গোলা জল খেয়ে পেট পরিষ্কার করে ফেলেন বল্লেই হয়। যে সব স্ত্রীলোক অতশত আচার বিচার মেনে চলতে পারতো না, তাদের উপর এঁর ঘৃণার অবধি ছিল না। তাদের তিনি মানুষের মধ্যেই গণ্য করতেন না। এহেন খুঁতখুঁতে

স্ত্রীলোকটির সব চেয়ে যা দেরা জিনিষ তাও হঠাৎ একদিন নষ্ট হয়ে গেল,—তা বাগানের লোকেদের পায়ায় পড়ে। দৈব বিড়ম্বনা আর কাকে বলে। একটি মাত্র আঘাতেই বেচারার জীবনের সমস্ত চিন্তার ধারা এক নিমেষে ঠিক বিপরীত পথে চলতে সুরু করে দিলে। বাইরের এই যে আচার বিচার এ যে কিছুই নয়, একথা তিনি ঐ একটিমাত্র আঘাতেই বুঝে নিলেন। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে —"এ কেমন করে হোলো ?"

"এই যে এক নিমেষে একটা চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটানো হোলো, এর ভিতরকার Psychological step গুলো লেখকের নিশ্চয়ই দেখান উচিত ছিল।"

এ কথার উত্তর দেবার আগে গোটাকতক কথা বলে নিই। প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, এখানে এই চরিত্রটির আমূল পরিবর্ত্তন ঘটানো হয় নি; এক জায়গায় একটা বাধা ছিল, যার জন্যে চরিত্রটি এক-দেশে হয়ে পড়েছিল—সেই বাধাটা সরিয়ে নিতেই চরিত্রটি আপনা আপনি ফুটে উঠলো—একে পরিবর্ত্তন বলে না একে বলে বিকাশ। একদল লোক আছে, যাদের হৃদয় আছে কিন্তু কল্পনা শক্তি একটুও নেই। কথাটা একটু স্পষ্ট করে বলি। আমাদের জনৈক moralist অধ্যাপক একবার পতিতাদের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "ওদের ওপর আমার একটুও সহানুভূতি নেই; এমন কি ওরা যদি চোখের সুমুখে না খেতে পেয়ে মরে যায় ত আমার একটুও কষ্ট হয় না।" এই কথার জবাবে আমার জনৈক বন্ধু বলেছিলেন, "এ থেকে বোঝা যাচ্ছে আপনার কল্পনা শক্তি একটুও নেই।" অধ্যাপক মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রকম ?" বন্ধুবর জবাব দিলেন, "তাদের উপর যে আপনার দয়া আসে না তার কারণ আপনি কল্পনার সাহায্যে নিজেকে ঠিক সেই অবস্থায় নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারছেন না। তা যদি পারতেন তা হলে তাদের উপর দয়া আপনিই আসতো।" Christ যে তাঁর হত্যাকারীদেরও ক্ষমা করে যেতে পেরেছিলেন—সে কেবল এই জন্য যে তিনি কল্পনার সাহায্যে সেই সব অশিক্ষিত অসভ্য লোকদের অবস্থায় নিয়ে গিয়ে নিজেকে মনে মনে ফেলতে পেরেছিলেন। —তাই 'Prophet'রা বিশ্বচরিত্রে কোথাও অসঙ্গতি খুঁজে পান না। অবস্থার তারতম্যের সঙ্গে মানুষের হৃদয়-বৃত্তিরও যে তারতম্য ঘটতে পারে এবং চোখের সুমুখে প্রতিদিন ঘটছে এই যে প্রকাণ্ড সত্য, এটাকে চোখের সুমুখে রেখে মানুষ যদি নিজেকে কল্পনার সাহায্যে জগতের অতি বড় পাষণ্ডের অবস্থায়ও নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারে, তা হলে দেখবে যে সেখানেও ঘৃণা করবার কিছুই নেই,—ও অবস্থায় পড়লে এবং ঠিক ঐ ভাবে ছেলেবেলা থেকে মানুষ হয়ে উঠলে সকলের মনোবৃত্তিই ঐ আকার ধারণ করবে। সকলে যে সর্ব্বজীবে দয়া প্রকাশ করতে পারে না, তার মূলে রয়েছে কল্পনার অভাব। যে সব মানুষ যে যে অবস্থার কল্পনা করতে পারে না, সে সব মানুষ সেই সব অবস্থার উপর কোন দিনও সহানুভূতি আনতে পারে না,—এ একবারে ধ্রুবসত্য। এই জন্যে অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায়, এমন অনেক লোক আছেন যাঁদের মধ্যে দয়া মায়া, সহানুভূতি সবই আছে কিন্তু হয়ত সম্প্রদায় বিশেষের উপর মায়াই নেই। কেন না, উক্ত সম্প্রদায়ের অবস্থাটা তিনি ঠিক কল্পনা করতে পারেন না।

কল্পনার সাহায্যে এঁরা যখন নিজেদের উক্ত অবস্থার মধ্যে নিয়ে যেতে কিছুতেই পারছেন না, তখন একমাত্র উপায় হচ্ছে স্বশরীরে এঁদের উক্ত অবস্থার মধ্যে গিয়ে বসিয়ে দেওয়া। এঁদের দয়া মায়া নেই তাও আর নয়, অভাব কেবল কল্পনা-শক্তির এবং সহানুভূতির। কাজেই এ ছাড়া আর উপায় কি ? এই যে বিধবা স্ত্রীলোকটি—এঁর অবস্থাও ঠিক ঐ রকম। এঁর মধ্যে যে অনেক সদ্‌গুণ

ছিল তা বলাই বাহুল্য। তা না হলে কে কবে এমন করে রাজ্যের যত কঠোরতার ভিতর দিয়ে নিজের পরিপূর্ণ যৌবনকে এমন নির্ম্মল ভাবে টেনে নিয়ে যেতে পারে—প্রকাণ্ড একটা শ্রদ্ধা এবং আত্মনির্ভরতার তেজ বুকের মধ্যে না থাকলে। আসল কথা এঁর মধ্যে সবই ছিল—ছিল না কেবল কল্পনা-শক্তি। এঁর আসল দোষ হচ্ছে এই যে, যে অবস্থার মধ্যে তিনি মানুষ হয়ে উঠেছেন, কল্পনার সাহায্যে তার বাইরের কোন অবস্থার মধ্যে কোন দিন নিজেকে মনে মনে নিয়ে গিয়ে হাজির করতে পারেন নি। এখানে অভাব মনুষ্যত্বের নয়—অভাব কল্পনার। তাই, যে অবস্থার মধ্যে তিনি কল্পনায় নিজেকে নিয়ে যেতে পারছিলেন না, লেখক তাঁকে হাত ধরে একদিন সেই অবস্থার মধ্যে সত্যি সত্যি নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়ে এলেন; ফল হোলো miraculous, হবেই যে! ভিতরে সবই ত ছিল, ছিল না একটা জিনিষ কেবল—তাও লেখক জুগিয়ে দিলেন—কাজেই চরিত্রটি একনিমেষে নিখুঁৎ হয়ে উঠলো। মনস্তত্ত্বের পায়তাড়া না খেলেও লেখক বাজীমাৎ করে দিলেন।

পুস্তকখানির বিশেষত্বই হচ্ছে এই যে মনস্তত্ত্বের নানা জটিলতার ভিতর দিয়ে না গিয়েও লেখক বেশ সহজ এবং সরল ভঙ্গিতে অনেক জটিল চরিত্রের স্বাভাবিক পরিণতি দেখিয়ে গেছেন।

হরদেব নামক জনৈক দুর্ব্বৃত্তের মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটাতে গিয়েও লেখক খুব সংযত ভাবে হাত চালিয়েছেন। কিছু না,—সামান্য দুচারটে ঘটনার উলোট পালোটের ভিতর দিয়ে এই চরিত্রটির স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন তিনি খুব সহজে এঁকে দেখিয়েছেন। মনস্তত্ত্বের দাঁতখিচুনী কোথাও বিকট হয়ে দেখা দেয় নি।

প্রবন্ধ ক্রমেই বড় হয়ে যাচ্ছে, কাজেই ইচ্ছা-সত্ত্বেও বাদ বাকি চরিত্রগুলির সম্বন্ধে বেশী কিছু বলতে পারলুম না।

জমীদার কিশোর রায়ের চরিত্রের ভিতর দিয়ে বেশ একটি শান্ত অথচ মুগ্ধ অন্তঃকরণের ছবি ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে।

কিশোর রায়ের স্ত্রীর চরিত্র একটা ভয়ানক Realistic painting এই চরিত্রটি এমনি Graphic যে তার চলাফেরা, কথাবার্ত্তা, সবের ভিতর দিয়েই সে যেন চোখের সুমুখে এসে দাঁড়ায়, —তার গতিভঙ্গিটি পর্য্যন্ত পাঠকের চোখ এড়ায় না। সে যেন একটা জীবন্ত চঞ্চলতা।

মোটকথা, উপন্যাসখানির মধ্যে পাকা হাতের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এবং এর মধ্যে জানবার ও শেখবার অনেক জিনিষ আছে। ভাষা বেশ অনাবিল এবং ভাব কোথাও আড়ষ্ট হয়ে ওঠে নি। পুস্তক খানি সমজদারদের কাছে নিশ্চয়ই আদর পাবে।

মামলাবাজ মেয়ে

(গল্প)

(শ্রীবিজয়রাজ ঘোষ,)

একটা প্রকাণ্ড তুফানের মত ঝড় আমার জীবনের উপর দিয়া বহিয়া গেল। কাহার দোষে এটা ঘটিল?- আত্মদোষ স্বীকার মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ। বাবাকে দোষী করা আমার কোন মতেই উচিত নয়, বরং তিনি আমার মঙ্গল চিন্তা করিয়া যাহা করিয়াছেন পরিণামে তাহা আমার প্রাণে যে

আনন্দ-ধারা ঢালিয়া দিয়াছে তার জন্য তাঁহাকে আমি তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিতেছি।

আমার দোষ নয়, বাবার দোষ দিলাম না—তবে দোষ দিব কার?—বিধাতার! মানুষ হইয়া তাঁর দোষ দিব কি করিয়া?

যাহার প্রভাবে মানুষ সকল প্রকারের দোষ হইতে মুক্ত হইবার প্রয়াস পায়, আমিও সেই "অদৃষ্টের" দোষ দিয়া আমার এই নির্জ্জীব জীবনের কথা প্রকাশ করিতেছি।

নিজের পক্ষে একটা সন্তোষজনক জবাব খাড়া করিয়া দিয়া, নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করিলেও যৌবনের উদ্দাম লালসাকে পূর্ণভোগে আয়ত্ত করিয়া, রূপ যৌবন লইয়া যাহা করিয়াছি নারী জাতির পক্ষে সেটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ কিনা সে বিচারের ভার ভগবানের উপর।

সংক্রামক ব্যাধির বীজাণু বহনের মত দূষিত শ্বাসের মত, যাহা মানব জীবনের পরিহার্য্য সেই কপটতাকে আশ্রয় করিয়া রূপের পসরা লইয়া যাহা করিয়াছি তাহা অকপটে বলিয়া মুক্তি-কামী হইয়া আমি আপনাদের দ্বারস্থ।

আমি সুন্দরী। কল্পনার তুলিতে তিল তিল করিয়া রূপের উপাদান সংগ্রহ করিয়া আমি নিজেকে নিজে সুন্দরী বলিতেছি না—আমি সত্যি কার মেয়ে মানুষ। গৃহস্থ ঘরের মেয়ে যেমন হয় তার চাইতে সুন্দরী আমায় লোকে বলিয়া থাকে। লোকের কথায় লোকের চক্ষে আমি সুন্দরী।

গ্রামের নাম বাবার নাম বলিয়া বংশ-গৌরব নষ্ট করিব না। আমি যখন নিজের পরিচয় দিতে বসিয়াছি তখন নিজের নামটা বলিয়া দিতেছি। আমার নাম নির্ম্মলা, বাবা আদর করিয়া বুলি বুলি বলিয়া ডাকিতেন। এখন আপনারা আদরে ডাকুন আর অনাদরে নির্ম্মলাই বলুন, আমার আপত্তি নাই।

বাবা নিজেই যত্ন করিয়া বাঙ্গলা ইংরেজী শিক্ষা দিয়া পরে আমাকে সংস্কৃত পড়ান। সংস্কৃত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রের উপদেশ মুখে বলিয়া দিতেন। আমি ন্যায়শাস্ত্রের কূট ধরিয়া কোন কোন দিন বাবার সঙ্গে বেজায় তর্ক আরম্ভ করিতাম, বাবা হাসিতেন। ন্যায়ে উপাধি না পাইলেও, এই ন্যায়টা পড়া যে আমার পক্ষে অন্যায় হইয়াছিল তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই। এই কঠোর তর্কশাস্ত্র আমাকে অতি-মাত্র বাচাল করিয়া তুলিয়াছিল।

কথার কৃপণ হইলে আমি তাহাকে দু চক্ষে দেখিতে পারিতাম না।

বাবা আমাকে বন্ধ্যা করিয়া পিতৃমাতৃহীন একটী এম, এ ডিগ্রীধারীর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য, গৃহ জামাতা রূপে তাহাকে কাছে রাখা। বাবা নিঃস্ব ছিলেন না। নাথরাজ জোত জমার বাবার প্রচুর সম্পত্তি ছিল। এ ছাড়া একটু জমীদারী সম্পত্তি যাহা ছিল, তাহা ঠাকুরদাদা মহাশয় গৃহ-দেবতা শ্রীধরের দেবোত্তর করিয়া যান।

শ্রীধরের পূজা অর্চ্চনা সেই সম্পত্তির আয় হইতে সাধিত হইত।

বিবাহের কিছুদিন পরে বাবার মৃত্যু হইল, সংসারে আমি আর আমার স্বামী। আর চাকর চাকরাণী রাখাল কৃষাণ এরাও আমার সংসারের লোক।

বৃহৎ সংসারের সকল রকম কর্ত্তৃত্বের ভার আমার উপর পড়িল। স্বামী অন্ন তাঁর, বেজায় কথার কৃপণ।

নিঃসহায় অবস্থায় তাঁহার শরণাগত হইয়া তাঁহার নিকট যে উত্তর পাইলাম, তাহাতে আমার মাথা ঘুরিয়া গেল।

এই দুঃসময়ে আর এক উপসর্গ উপস্থিত হইল। গ্রামের জমীদার একাম্বাথ ঘরিপ আরম্ভ করিয়া আমার ভোগবতী পৈত্রিক জমাজমী হইতে আমাকে উচ্ছেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

স্বামীই আমার একমাত্র আশ্রয়, আমি পুনরায় তাঁহার শরণাগত হইয়া তাঁকে বলিলাম। অনেকক্ষণ পরে তিনি উত্তর করিলেন, "ও সকল বিষয়ে তুমি খুব বোঝ, তুমি নিজেই তাহার প্রতিকার কর।"

আমি বলিলাম "আমি যে স্ত্রীলোক।"

তিনিও ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন "বাঙ্গলা দেশে অনেক মেয়ে জমীদার আছে।"

আমি বলিলাম "তুমি থাকতে আমি কাছারি গিয়ে মামলা করব?"

অনেকক্ষণ পরে তিনি উত্তর দিলেন--

"দোষ কি?—তোমার বিষয়।"

"আমার বিষয়—তোমার নয়?"

তিনি নিরুত্তর।

আমার কর্তৃত্বের উপর তাঁহার এই মর্ম্মান্তিক আঘাৎ আমার বাক্‌যন্ত্রকে রুদ্ধ করিয়া দিল; আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম—বিনিময়ে তিনি মৃদু হাসিলেন। এই হাসিতে উপেক্ষার প্রচ্ছন্ন আঘাত ছাড়া আর কিছু অনুমান করার শক্তি আমার রহিল না। আমি মনস্তাপে মূকের মত নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলাম।

যিনি আমার রক্ষক, যিনি আমার স্বামী, বৈদিক মন্ত্রে যার সঙ্গে আমি এক হইয়া গিয়াছি--তার মুখে স্নেহ মমতা শূন্য এই কঠোর উত্তর। তাঁর ও আমার মধ্যে আজ এই মর্ম্মান্তিক ব্যবধান তিনি ঘটাইয়া দিলেন। আমার সংসারের সরল পথ জটিল হইয়া একটা প্রকাণ্ড ধাঁধার সৃষ্টি করিল। যাহার জন্য আমাকে আমার নারী জীবনের লজ্জাশীলতা বিসর্জ্জন দিয়া কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে পড়িয়া আদালতের সীমার মধ্যে যাইতে হইল। কৃপণের দানের মত স্বামীর নিকট যে সাহায্য পাইলাম তাহা আমার বিপুল অভাবের কণাংশ পূরণে সমর্থ হইবে না বুঝিয়া নিজেই ব্যাঙ্ক হইতে দলিল দস্তা বেজের কাগজ বাহির করিয়া মামলা গুলির প্রমাণের পন্থা আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

দিনু গাঙ্গুলীর পুত্র বিভূতিভূষণ গাঙ্গুলী সেইবার ওকালতি পাশ করিয়া বারে যোগদান করিল। মামলা লইয়া আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম। দিনু গাঙ্গুলীর সহিত বাবার খুব ভাবছিল, সেই সূত্রে বিভূতি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী আসিত। বিবাহের পরেও স্বামীর সম্মুখে আমার সঙ্গে দেখা করিয়া গিয়াছে। উপর্য্যুপরি দশবারটা মামলা আমার উপর দায়ের হইয়াছে, আমার কাছারি যাওয়া নিতান্ত দরকার হইয়া উঠিল। দাদাশ্বশুরের আমলের এক অতি বৃদ্ধ কর্ম্মচারি ছিল। সে বেচারা জমা খরচ হিসাব কিতাব লিখিতে পারে। মামলা মোকর্দ্দমার কাঁদর বোঝে না, কাজেই আমাকে গাড়ী করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া আদালত পর্য্যন্ত যাইতে হইল। আদালতের অনতিদূরে এক গাছতলায় আমার গাড়ী থাকে, গাড়ী হইতে আমি কর্ম্মচারীর দ্বারা মামলার তদ্বির করি। আমার নিজের প্রশংসা নিজে করিতেছি না। মামলা মোকর্দ্দমার সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম সন্ধান এবং কাগজ পত্রের শৃঙ্খলা দেখিয়া উকিল মোক্তারগণ আমাকে "মামলাবাজ মেয়ে" এই আখ্যা দিয়াছিল। আমার তদ্বিরের গুণে দশবার বাবুরা উপর্য্যুপরি দু'তিনটা মোকর্দ্দমায় হারিয়া গেলেন।

উকিল মোক্তারের প্রদত্ত আখ্যাটী আমার নারী-সুলভ সরলতা নষ্ট করিল। আর আইন আদালত উকিল দালালের সহিত ব্যবহারে কপটতার অস্ত্রগুলি আমি সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ব করিয়া লইলাম। আমার প্রভুত্বের সীমার মধ্যে আমার শ্রেণ্যবর্গের উপর আমি কঠোর ব্যবহার আরম্ভ করিলাম। আমার স্বামীও সে প্রভাবের ঘাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আমার দুর্ব্বিবার প্রভুত্বের উপর তাঁহার বিন্দুমাত্র লক্ষ্য পড়ে নাই বরং এটা তিনি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া মৃদু হাসিতেন। সেই হাসিকে আমি তাঁহার উপেক্ষা

মনে করিয়া বিরক্ত হইয়া ক্রমাগত বকিয়া যাইতাম, অন্ত তাঁর স্বাভাবিক বাক্যের ক্লপণতা, এবং অসাধারণ ধৈর্য্য তাঁহাকে একেবারে নীরব করিয়া রাখিত।

গ্রাম হইতে আদালত দেড় মাইল ব্যবধান। গাড়ীতে আহার করিয়া কাছারি যাওয়া চলিত। বিভূতিও বাড়ীতে আহার করিয়া সাইকেলে কাছারি যাইত। পথে দেখা হইলে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গেই মামলা সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে চলিত। চলাফেরার মধ্যে বিভূতির মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন যাহা কোন কোন কথার দ্বারা পাইয়াছি; কিন্তু আমার কার্য্যোদ্ধারের পথ রুদ্ধ করিয়া বিভূতির সে ভাবটাকে, সে ইঙ্গিতকে আমি নীরবে সহ্য করিয়া যাইতে লাগিলাম। স্বামী মহাশয় এই সময়ে আর একটা নূতন রকমের অভিনয় আরম্ভ করিলেন। তাহার নীরবতার মধ্যে, সহিষ্ণুতার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন ক্ষমতা আছে তাহা সেদিন ধরা পড়িয়া গেল

শ্রীধরের বাড়ীর ভোগের দুধ গ্রামের বাণীকণ্ঠ যোগান দিত। সেজন্য তাদের জমী দেওয়া আছে। বাণীকণ্ঠের এক বিধবা ভগ্নী, তাহার নাম যোগী। বাণীই দুধ দিয়া যাইত। যোগী যুবতী সুন্দরী, তাহার যৌবনের লালসা মুমূর্ষের শ্বাসের মত ক্ষীণ হইয়াছিল। সংযমী বলিয়া আমরা তাহার প্রশংসা করিতাম। সেদিন দেখি স্বামীর নিকট বসিয়া সে গল্প করিতেছে, স্বামীর লক্ষ্য তাহার দিকে নাই, কিন্তু যোগী তাহার সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া কামনার আগুন জ্বালাইয়া একদৃষ্টে স্বামীর দিকে চাহিয়া আছে।

সেদিন যথাশক্তি নিজেকে সংযত করিয়া আমি নীরবে চলিয়া আসিলাম। অসহ্য জ্বালায় আমার শরীর যেন ভস্মে পরিণত হইবার উপক্রম হইল—কিসের জ্বালা, কেন এ জ্বালা? তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম। যে লক্ষ্যে জীবন-প্রবাহ চলিতেছিল, এই মর্ম্মদাহকর অভিনয়ে আমার সমস্ত আশাকে ব্যর্থ করিয়া দিল।

এইরূপ! এই যৌবন! স্বামের কষ্টিপাথরে যাচাই করা কথা! সমস্ত বৃথা! যার জন্য রূপ—যার জন্য আমি, তিনি অন্ধ, বধির—তিনি সৌন্দর্য্য জ্ঞান বর্জ্জিত—আর এই রূপে মুগ্ধ বিভূতি? তুমি মানুষ, তুমি আমার স্বামী! নিজে যেমন রত্নদম্ভার গৃহ মধ্যে আবদ্ধ করিয়া বাহিরে যাতি আসিয়াছি স্বামীর ব্যবহার বুঝি তদনুরূপ! চুলের রাশি ছড়াইয়া দিয়া সেইখানেই শয়ন করিলাম।

শ্রীধরের বাড়ী যখন সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল তখন উঠিয়া বসিলাম। তিন চারদিন বাড়ীতেই নীরবে কাটাইলাম।

সেদিন একটা বড় মামলার দিন ছিল, এক ঘেয়ে দুঃখ হইতে মনটাকে তফাৎ করিবার জন্য বাধ্য হইয়া মোকদ্দমার তদ্বিরের জন্য কাছারি যাইতে হইল।

কর্ম্মচারিটীকে আগে বিদায় করিয়া রাস্তায় বাহির হইতেই দেখি বিভূতি সাইকেল ছুটাইয়া চলিয়াছে। আমাকে দেখিয়া সে গাড়ীর পাশ ধরিয়া যাইতে লাগিল এবং মামলা সম্বন্ধে এমন একটা কথা প্রকাশ করিল, যাহার উত্তর সেই মুহূর্ত্তে সেখানে দিতে হইবে, আর সে উত্তর দেওয়ার কাগজ পত্র আমার নিকট ছিল। আমার অনিচ্ছা সত্ত্বে বিভূতি সাইকেল গাড়োয়ানের জিম্মা করিয়া আমার গাড়ীতে উঠিল।

যেটার জন্য আজ বিভূতি আমার গাড়ীতে উঠিয়াছে সেটা যে খুব প্রয়োজনীয় নয় তাহা বুঝিয়া লইলাম। সে আজ দুরাকাঙ্খার প্রলোভনে তাহার বিবেক বুদ্ধি দূর করিয়া যে কাজ করিল, আমি তাহাতে পূর্ণবাধা না দিলেও একটু সরিয়া বসিলাম। আমার ব্যবধানের মধ্যে তাহার দায়িত্ব হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে সতর্ক হইতে ইঙ্গিত করিলাম। সে তাহা বুঝিতে পারিল না; গাড়ীচলার ঝাঁকুনির সঙ্গে সে প্রয়োজনের কথা বলিয়া যাইতেছিল, আমি তাহার ব্যবহারের প্রতিবাদ করিবার পূর্ব্বেই সে বলিয়া

বসিল "আমরা দুটীতে যে চলিয়াছি এ চলার শেষ কোথায় বলিতে পার ?"

আমি হাসিয়া অম্লানবদনে বলিলাম "এর শেষ এইখানে, তুমি নেমে যাও।" আমার হাসির মর্ম্ম না বুঝিয়া বিভূতি বলিল "আমি সবই বুঝি নির্ম্মল. তুমি আমাকে পরীক্ষায় ফেলিও না।"

গাড়ী তখন কাছারির সম্মুখে আমার উত্তর করিবার অবসর হইল না। বিভূতি তাহার মানসিক বিকার লইয়া বিদায় হইল।

বিভূতির বিকারের মত ঔষধ দিবার অবস্থা তখন আমার হয় নাই, তাহার হস্তে সমস্ত মামলার মাল মসলাগুলি দিয়াছি কাজেই আমাকে প্রাজ্ঞের মত কাজ উদ্ধারের পথ পরিষ্কার রাখিতে হইল।

আমার নীরবতা আর মৃদু হাসি তাহার বিক্ষুব্ধ প্রাণের আশাকে সঞ্জীব করিয়া সে হাসিতে হাসিতে বার লাইব্রেরির দিকে চলিয়া গেল।

সেদিন আমার মোকদ্দমা হইবে না তাহা আমার কর্ম্মচারি আসিয়া আমাকে জানাইয়া দিল। বিভূতির বিরক্তিকর ব্যবহারে আমার মনটা ভাল ছিল না, আমি সেই মুহূর্ত্তেই বাড়ী ফিরিলাম। বেলা তখন দুটা বাজিল।

বাড়ী আসিয়া দেখি যোগী দুধের পাত্রটি পার্শ্বে রাখিয়া স্বামীর সম্মুখে পা ছড়াইয়া বসিয়া আছে। তাহার বক্ষের বসন স্খলিত, তাহার মোটা মোটা চক্ষু দুইটী স্বামীর দিকে পক্ষীহন্তা শিকারীর মত লক্ষ্য স্থির করিয়া তাহাকে যেন সে নিঃশেষ করিয়া নিজের মধ্যে পুরিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে।—স্বামীও এক লক্ষ্যে কতকগুলো কাগজে গুণ,ভাগ করিয়া যাইতেছেন।

রাগে আমার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল, আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম "যোগীদিদি !"—

যোগী অপরাধিনীর ন্যায় মুখখানা অন্ধকার করিয়া তাহার বক্ষের বসন সামলাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম "ঠিক হচ্ছিল ?" যোগী বলিল, "রায়বাড়ী সরকারবাড়ী মুখুয্যে বাড়ী দুধ দিই, তারই হিসাব হচ্ছিল।"

"বুকের কাপড় খুলে দুধের হিসেব ! তুমি আর দুধ দিতে এস না !"

যোগী নিরুত্তর হইয়া চলিয়া গেল।

মরুভূমির মত যোগীর বিস্তৃত প্রাণে যে অযোগ্য রসের সঞ্চার হইয়াছে, তাহার অকাট্য প্রমাণ যোগী নিজে দিয়া চলিয়া গেল। স্বামী তখনও কাগজ কলম লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন।

সহজ ভাবেই জিজ্ঞাসা করিলাম "কি হচ্ছে।"

তৎপরতার সঙ্গে তিনি উত্তর দিলেন "দুধের হিসাব।"

কি কপটতা কি সত্য গোপনের চেষ্টা—দশটা কথা বলার পর যিনি একটা কথার উত্তর দেন—যিনি কথার কাঙ্গাল. আজ হঠাৎ তাঁর বাক্‌শক্তি বাড়িয়া গেল। রাগে মাথা ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। অতি কষ্টে মনের ভাব গোপন করিয়া সহজ ভাবে বলিলাম,—"এ কি দুধে বাজলার আয় ব্যয়ের হিসাব—বাবা শুণ ভাগে তো আর কাগজে ধরগা নেই।"

স্বামী বলিলেন "হিসাব বোধ যে আমার নেই।"

রাগ আর সহ্য করিতে পারিলাম না। রাগের মাথায় একটা মেয়েলি ছড়া বলিয়া ফেলিলাম—"বলে বুড় পাট কাটে তার বাপে ঘাটী কাটে।"

তাহার নিকট অবস্থান করিতে অসহ্য যাতনা বোধ হইতে লাগিল। কাঁপিতে কাঁপিতে গতিহীন অশ্বের মত শব্দ করিয়া চলিয়া আসিলাম, তিনি মৃদু হাসিলেন। তাঁর গম্ভীর মুখে কোন দিনই এমন হাসির রেখা ফুটে নাই। এই হাসি তীব্র বিদ্যুতের মত আমার শরীরকে নিশ্চল অবসন্ন করিয়া ফেলিল। কি দুর্জ্জয় আঘাত, কি দুঃসহ কষ্ট ! জীবনের উপর দিয়া ভীষণ সংগ্রামের গোলা গুলি চলিয়া যাইতেছে। আপনার বলিয়া প্রাণের অসহ্য বেদনার

কথা খুলিয়া বলিবার লোক নাই—অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলাম—একমনে দুঘণ্টা বসিয়া থাকার পর ঝি আসিয়া বলিল, "মা তোমাই বাবুর এখনও আহার হয় নাই।"

তিনি যত অপরাধীই হৌন, এখানে একাজটা আমার নির্ব্বিবাদে কর্ত্তব্য, তাহা বুঝিয়া স্বামীকে আহার দিতে গেলাম। অন্যদিন তিনি যে ভাবে নীরবে আহার করিয়া যান, আজও তাহাই করিয়া বিদায় হইলেন। সেই নীরব অভিনয়, সেই কৃপণতা।

এই ঘটনার পর আমার কাজের নিয়ম বদলাইয়া কাছারি যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলাম। কর্ম্মচারীকে বলিলাম আপনার যা জানবার থাকে জেনে নিন। বিভূতিকে বলিলাম তোমার যা বলবার আছে বলে যাও এখন হইতে কর্ম্মচারী মোকদ্দমার তদ্বির করিবে। বিভূতি আপত্তি করিল, তার আপত্তির দুটী প্রবল কারণ আমি কাছারি যাওয়া আসার বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম—প্রথম আমার মোকর্দ্দমা করিয়া তাহার পশার জমান দ্বিতীয় আমার গাড়ীর নিকট তাহার যাতায়াতের জন্য বারলাইব্রেরীতে ইঙ্গিতের মধ্যে দিয়া তাহার সমবয়স্ক উকিলের মধ্যে আপনাকে কণ্ঠস্থ করিয়া তোলা; এ দুটীর একটি হাতে থাকিলেও অপরটিতে সম্পূর্ণ বাধা পড়িয়া গেল।

আমি নিষ্কর্ম্মা হইয়া বাড়ীতে থাকিলাম। মামলা মোকদ্দমার ভার লওয়ার পর আর মেয়েলি কাজে বড় একটা প্রবৃত্তি হইতেছে না। বাড়ীতে দু'একখানা পুরাণ পুঁথি পড়িয়া কাটাইতে লাগিলাম।

সে দিন হঠাৎ যোগীর ভাই আসিয়া বলিল "দিদিমণি আর এখানে বাস করা চলে না।"

আমি বলিলাম "কেন?"

"ছুঁড়িকে জামাই বাবু তোমার বাগানের আট-চালায় ডেকে নিয়ে"—আর বলিতে দিলাম না তাহাকে বিদায় করিলাম—লজ্জায় ঘৃণায় অধোবদনে অনেকক্ষণ চিন্তা করিলাম—মানুষ কামনার দাস হইলে তার এত অধোগতি হয়। প্রকাশ্য দিবালোকে যাহা মনে করিতেও লজ্জা হয়, মানুষে তাহা করিতে পারে? যার এমন প্রবৃত্তি—তার উপযুক্ত ব্যবস্থা কি হইতে পারে? আমি শাসন ও বিচারের ভার গ্রহণ করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া সিংহিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া বলিলাম "হাঁ গো যোগীকে যদি তোমার এত ভাল লেগে থাকে, তাকে নিয়ে চলে যাও এসব জেনেশুনে আর ভালো লাগে না—আমার ভাগ্যে যা থাকে তাই হবে।"

তিনি হাসিয়া উঠিলেন একবার কথার অর্দ্ধ উচ্চারণ—"চলে যাব!" আবার হাসিলেন।

গরীব কেরাণীর উপরওয়ালা উপর সাহেবরা যেরূপ বিদ্রূপ প্রকাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ তীব্রস্বরে আমি বলিলাম "অতি পণ্ডিতগুলি অতি মূর্খ হয়।"

স্বামী বলিলেন "একটু স্থির হও!"

আমি স্থির হইব? রাগে ঘৃণায় আমার শরীর কাঁপিতেছিল।

তিনি কি বলিলেন আমার কাণে গেল না আমি সদর্পে ঘরের মধ্যে ঢুকিতে, বড় আনায় আমার প্রতিবিম্ব দেখিলাম।—আমার এইরূপ! ছি, ছি, যোগী তার লক্ষ্য! ঘৃণায় অভিমানে সেই খানে মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম। সূর্য্যের শেষ রশ্মি যখন পশ্চিম আকাশের সীমা রেখার পারে ডুবিয়া তার হেম কিরণচ্ছটা সারা আকাশে বিবিধ রকমের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে, সেই সময় তোলার মা আসিয়া ডাকিল "দিদিমণি ওঠ সন্ধ্যা যে হতে চল্লো।"

আমি উঠিলাম। আমার সন্তাপ নিশ্বাস হরণ করিতে পারে নাই। আমার সেই জ্বালা আবার সেই প্রদাহ।

তোলার মা বলিল "জামাইবাবু খান নি কেন? ভাতবাড়া রয়েছে যে। তখনকার মতন উত্তর দিলাম "না খেয়েছেন পরে খাবেন।" তোলার মা বলিল

"তিনি ঘরে বাইরে কোথাও নাই।" তেমন লোকে অভিমান করিয়া চলিয়া যাইবে তা আমার কল্পনায়ও আসে নাই। কিন্তু সত্যই তিনি কোথায় গিয়া ছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "তুমি ঘুমিয়ে ছিলে বলে আমি যাই নাই, আমার ক্ষিধে পেয়েছে, খেতে দাও।"

(আগামী মাসে সমাপ্য)

আমাদের কথা

মহাত্মা গান্ধী স্বর্গীয় মহাত্মা রামমোহন রায় সম্বন্ধে যে দু-একটি কথা বলিয়াছেন তাহা যে আদবেই সুসঙ্গত হয় নাই সে বিষয়ে আমাদেরও কোন সন্দেহ নাই এবং প্রবাসী তার প্রতিবাদ করিয়া ভাল কাজই করিয়াছেন। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, প্রবাসীর এই যে মহাত্মাদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁদের নামে অপমানসূচক কথা বলেন যাঁরা তাঁদের বিপক্ষে খড়্গ হস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিবার মত এই যে সৎসাহস, এটা কি প্রবাসীর মজ্জাগত? কোন একজন মানুষের পক্ষে মজ্জাগত হচ্ছে সেই জিনিষটা, যা স্থান কাল পাত্র নির্ব্বিশেষে আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে। দয়া যদি কাহারও মজ্জাগত গুণ হয় তাহা হইলে সে গুণটা তাঁর দয়ার পাত্রকে দেখিলেই আপনা হইতে উৎসারিত হইয়া উঠিবেই,—একজনের বেলায় উঠিবে আর একজনের বেলায় উঠিবে না—এমনধারা হইতেই পারে না। অবশ্য এমন ধারাও সময় সময় দেখিতে পাওয়া গিয়াছে; যেমন, কোন কলেজের ব্রাহ্ম-অধ্যক্ষ একবার আমাদের (আমরা তখন তাঁর ছাত্র) মুখের উপর বলিয়াছিলেন, "আমি ব্রাহ্ম student ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করি না।" তিনি ছাত্রদের বিশ্বাস করেন—কিন্তু সব ছাত্রকে নয়—কেবল ব্রাহ্ম যারা, তাদের। আবার, একজন গোসাই ঠাকুর একবার বলিয়াছিলেন, "আমি ভিখারীদের ভিক্ষে দিই—তবে কিনা বৈষ্ণব না হলে দিই না।" উপরোক্ত অধ্যক্ষ মহাশয় ছাত্রদের বিশ্বাস করতেন, কিন্তু ব্রাহ্ম না হলে নয়; আর গোসাইজীর দরিদ্রের উপর দয়া ছিল—তবে কিনা বৈষ্ণব হওয়া চাই। প্রবাসীর মহাত্মা ভক্তি অনেকটা এই ধরণের। এঁরা মহাত্মাদের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে সহ্য করিতে পারেন না কিন্তু হিন্দু-মহাত্মাদের নামে কেহ কিছু বলিলে নিজেদের কাগজে ছাপাইতে পর্য্যন্ত দ্বিধা বোধ করেন না—বলিহারি সৎসাহস!

মহাত্মা গান্ধীর মন্তব্যের বিপক্ষে প্রতিবাদ করিতে গিয়া প্রবাসী একস্থানে লিখিয়াছেন, "যে সব লোক, হইতে পারে, ভ্রম বশতঃ তাঁহাদিগকে ভক্তি করে, অকারণে তাহাদিগকে আঘাত করিবার কি প্রয়োজন ছিল?" খুব ঠিক কথা!—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—কিছুদিন পূর্ব্বে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় যখন, "জাতীয়গঠনের বাধায়" কথা লিখিতে বসিয়া বাঁ করিয়া, কোথাও কিছু নাই, বিবেকানন্দস্বামীকে অযথা অপমান করিয়া বসিলেন তখন এ কথাটাকি প্রবাসীর পরমশ্রদ্ধাভাজন অন্তঃকরণে একবারও জাগিয়ে উঠে নাই যে, তাঁর যারা ভক্ত ("হইতেই পারে, ভ্রমবশতঃ নয়," যাঁরা সত্য সত্যই সজ্ঞানে এবং খুব ভাল করিয়া সকল দিক তলাইয়া দেখিয়া তাঁকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন) তাদের মনে ইহাতে করিয়া কতখানি আঘাত লাগিতে পারে।

স্বামীজীর সমস্ত বই প্রফুল্লচন্দ্র কখনই পড়েন নি। তাহা হইলে কখনই অমন অদ্ভুত মন্তব্য প্রকাশ করিতে সাহস পাইতেন না। বেশ, তিনি না হয় না পড়িয়াই লিখিলেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি প্রবাসী সম্পাদক মহাশয়ও কি পড়েন নি?—যদি না পড়িয়া থাকেন ত প্রবন্ধ ছাপাইবার মত হঠকারিতা তিনি কোন সাহসে করিলেন?

এই যে মহাপুরুষ, যাঁর মধ্যে সঙ্কীর্ণতা এবং সম্প্রদায়িকতা বলিয়া কোন জিনিষই ছিল না, তাঁর নামে এই যে, যা তা বলিয়া নিন্দাপ্রচার করা এবং সেই বিশ্রী প্রবন্ধটা প্রবাসীতে অকপটে প্রকাশ করা ইহার মধ্যে সম্পাদক মহাশয় কি একটুও দোষ দেখিতে পাইলেন না? আর, যত দোষ মহাত্মা গান্ধী করিয়াছেন স্বর্গীয় রামমোহনকে জগতের আর ছ-জন শ্রেষ্ঠ মহাত্মার সহিত তুলনায় খাটো করিয়া? প্রবাসী যে স্বামীজীকে একজন সামান্য শিক্ষিত যুবকের ও নিচে স্থান দিতে একটুকু কুণ্ঠা বোধ করেন নাই—সেটা কি তাঁরা দেখিতে পান না? —এইরূপ সঙ্কীর্ণতা এবং সাম্প্রদায়িকতার ভাব বুকে পুষিয়া যাঁরা মুখে বড় বড় কথা বলেন, তাঁদের হাত হইতে স্বর্গীয় রামমোহন কোন দিন একটা ঝরা-পুষ্পদলও গ্রহণ করিতে পারিবেন; তাঁদের সাম্প্রদায়িক পূজা স্বর্গীয় মহাত্মার চরণে কোন দিনও পৌঁছিতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র।

শান্তি নিকেতনের সর্ব্বাধ্যক্ষকে রবিবাবু যে পত্র লিখিয়াছেন তাহারি এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন, "পঞ্জাবের ঘোর দুর্দ্দিনের সময়ে সমস্ত দেশে আমি ছাড়া আর একজনও একটি কথাও বলে নি।" এ কথার কোন অর্থ খুঁজিয়া পাইলাম না। এই ব্যাপারে কত কর্ম্মী প্রাণপাত করিয়া খাটিয়া মরিলেন, কত স্বার্থত্যাগী কত অত্যাচারকেই না অম্লানবদনে বুক পাতিয়া লইলেন আর তিনি সামান্য একটা উপাধি ত্যাগ করিয়া এবং দু-চারটে বক্তৃতা দিয়াই সমস্ত creditটা একচেটে করিয়া লইতে চান,—বাবে মজা!

তিনি পৃথিবীর কেন, ত্রিভুবনের কবি হোন্ না, তাহাতে ত কেহ কিছু বলিতেছে না, কিন্তু সারা-জীবন ধরিয়া শত অত্যাচার, শত উৎপীড়ন এবং অশেষপ্রকার লাঞ্ছনা গঞ্জনাকে বুকের হার করিয়া যাঁরা দেশের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন সেই সব অক্লান্তকর্ম্মী স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষগণের প্রাপ্য আসনটুকুর দিকেও তিনি যদি শুদ্ধ নয়নে মাঝে মাঝে দৃষ্টিদান করেন তাহা হইলে সেটা নেহাতই বাড়াবাড়ি হইয়া উঠে না কি? মানুষের সহ্য করিবারও ত একটা সীমা আছে। তিনি কবি আছেন থাকুন—সেদিকে তাঁকে ত আমরা প্রতিদিনই পূজা করিতেছি, কিন্তু কর্ম্মীদের জন্যে, স্বার্থত্যাগীদের সেবকদের জন্যে দেশবাসীরা তাদের অন্তরের অন্তস্তলে যে একটুখানি স্থান আলাদা করিয়া রাখিয়া দিয়াছে তাহাও যদি তিনি দখল করিয়া বসিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠেন তাহা হইলে সেটা যে নেহাতই অত্যাচার হইয়া উঠে। সবুজপত্রে "বিবেচনা ও অবিবেচনা" নামক প্রবন্ধের মধ্যে একস্থানে রবিবাবু লিখিয়াছিলেন, "যে লোক কাজের উৎসাহে আছে, তবের উৎসাহে তার প্রয়োজনই থাকে না।"—খুব ঠিক কথা! তাই দেখিতে পাই দেশের জন্য যাঁরা সত্যি সত্যি কাজ করিতেছেন তাঁদের মুখ দিয়া কোন দিন এমন কথা বাহির হইল না যা আত্ম-প্রতিষ্ঠার সাহায্য করিতে পারে।

আর এক স্থানে রবিবাবু লিখিয়াছেন, "এই জন্য নিষ্কর্ম্মা যে, তাহারই অহোরাত্র তবের দরকার হয়।" তা রবিবাবুর ত তবের অভাব নাই—তা সত্ত্বেও কি তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেন না —তাই নিজেই নিজের তব সুরু করিয়া দিয়াছেন?

শিক্ষার সার্ব্বজনীনভাব উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট দেশের লোক চায় কি? এতদিন ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ছিল 'গোলামখানা', আর তাহার শিক্ষাকে লোকে বলিত 'অর্থকরী বিদ্যা'। আজ দেখিতেছি সেখানে যাহারা শিক্ষা পাইয়াছে তাহারা গোলামী পাইতেছে না বলিয়া অসন্তুষ্ট, এবং যে শিক্ষা সেখানে হইতেছে তাহাতে অর্থোপার্জ্জন সম্পূর্ণরূপে হইতেছে না বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে চূড়ান্ত অর্থকরী করিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র। আজ দেশের লোকের কথায় অসামঞ্জস্য লইয়া আর বিচার করিতে চাহি না। তবে প্রার্থনীয় জিনিষটী সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। শিক্ষা জিনিষটী ঠিক কবে কোন সালে কোন সময়ে সহসা জগতে জন্মগ্রহণ করে ইতিহাসে কিছু লেখা নাই। তাহার সর্ব্বপ্রথম উদ্দেশ্য কিছু ছিলাব করিয়া স্থির করা হইয়াছিল কিনা তাহাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে মানুষের মনোভাব আদান প্রদান প্রবৃত্তিই তাহার মূলে। চিত্তবৃত্তির বিকাশ এবং জ্ঞানের উন্মীলন কার্য্যত হইয়া উঠিয়াছে। চরিত্রগত সংযম ও ধর্ম্ম প্রভৃতি নাম দিয়া মানুষের পশুবৃত্তির দমন, সেবে সকলে একরূপ ইহার মূল উদ্দেশ্য ধরিয়া লইয়াছিল। জ্ঞানোন্মেষের ফলে মানুষ জড় জগৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিয়া আজ তড়িৎ শক্তি দ্বারা জগতের একপ্রান্তে বসিয়া অপর প্রান্তের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছে, আর একদিকে সসীমত্বের বন্ধনের ভিতর পূর্ণবিকাশ অসম্ভব বুঝিয়া নিত্য-প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর কল্পনার সাহায্যে আর কতদূর যাওয়া সম্ভব বিচার করিয়া নূতন নূতন দর্শন শাস্ত্র রচনা করিয়া ফেলিতেছে। আজ বহু ব্যাখ্যার দ্বারা ধর্ম্ম, চরিত্র, সমাজ, প্রভৃতি বহু উদ্দেশ্য শিক্ষার মূলে লাগাইয়া দিলেও, শিক্ষার প্রকৃত উদারতার লাঘব হয় নাই। মানুষ জীবন ধারণের জন্য অবশ্য নিত্য নূতন ভাবে জ্ঞানের সাহায্য লইতেছে।—সেটা আপনা হইতে হইয়া যাইতেছে। কিন্তু সেই পেটের দায়কে লেখাপড়ার মূল উদ্দেশ্য স্থির করিয়া শিক্ষাকে একটা ক্ষীণ সঙ্কীর্ণ নালায় পুরিয়া ফেলিও না। জ্ঞানের স্নিগ্ধ নির্ম্মল বায়ুর পথ উন্মুক্ত করিয়া দাও,—সমস্ত সাম্প্রদায়িকতা জাতিগত অন্তরের ক্ষুদ্রতা, সব মুছিয়া যাইবে। ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝি না, কিন্তু সর্ব্ব মানবের মিলনের ক্ষেত্র সেই জ্ঞানের স্নিগ্ধ শুভ্রতা।

শিক্ষার আদর্শ, এবং বৃত্তি ও সাধারণ শিক্ষার সম্বন্ধ।

কতকগুলি যাতনায় পড়িয়া আজ ভারতময় চরকার রব উঠিয়াছে, তাহা বুঝি। কিন্তু সেই যাতনার জন্যই বলি তাহার সহিত শিক্ষার পথ সঙ্কোচ করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। জালিয়ানবাগের প্রত্যেক গুলিটী যে আজও বুকের মধ্যে গুম গুম করিয়া ওঠে তাহার জন্য আমরা শিক্ষার কাছে অনেক ভাবে ঋণী। যদি স্বাধীনভাবে অন্নোপায়ের পথ চরকায় হয় সে ত ভাল কথা। কিন্তু তাই বলিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষা যাহা তাহা বন্ধ করিয়া দিবার আবশ্যক কি, বুঝা কঠিন।

অবশ্য লেখাপড়াই করি, দর্শন আলোচনাই করি, আর কবিতার চর্চ্চাই করি, কিছুদিন পরে অন্নের যোগাড় করিতেই হয়। শুধু মাত্র জ্ঞান ভক্ষণ করিয়া শরীর থাকে না। সেটা হইত প্রাচীন ঋষিদের আমলে। এখন জড় বাষ্পীয় যুগ, এখন ভৌতিক পদার্থ কিছু সংগ্রহ করিয়া মুখে দেওয়া ছাড়া, শুধু আত্মার আস্বাদনে আর চলে না। তাই এ কথাও ভাবিয়া দেখা দরকার বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানানুশীলন ত করিলাম, তার পরে?

উচ্চ জ্ঞানানুশীলন সকলের জন্য হইতে পারে না। Universal Panacea বলিয়া কোন ঔষধ হইতে পারে না। Patent ঔষধে সকলের উপকার হয় না। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যচর্চ্চা গিলিয়া

আসিলেই সকলের দেহ প্রাণ সমান ভাবে এক সঙ্গে থাকে না। যাহার যেদিকে যেরূপ ক্ষমতা থাকে, যেদিকে আগ্রহ থাকে, সেই দিকে যাওয়া যে বিশেষ দরকার, সে বিষয়ে নজর খুব অল্পদিন হইতে আমাদের একটু একটু যাইতেছে। পূর্ব্বে পাশ করিলেই চাকুরী মিলিত, তাই নাম্বাগ্রা প্রপাতের মত বাঙ্গালীর ছেলে অনুরত প্রবাহে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঝাপাইয়া পড়িয়াছে। সে সময় সম্যক জ্ঞানানুশীলন খুব কম লোকেরই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। জ্ঞানানুশীলনটা যাহা হইয়াছিল—তাহা কতকটা আনুষঙ্গিক অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ। আজ দেশের অবস্থা যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেখানে আর জ্ঞানানুশীলনের কথা অনেকের চিন্তা করিবারই অবস্থা নাই,—এখন অন্ন চিন্তাই চমৎকারা। তাই জ্ঞানানুশীলন যাহার পক্ষে দরকার তাহার পক্ষেও উহা অসম্ভব করিয়া তুলিতেই আমরা ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি।

জ্ঞানের প্রথম স্তর প্রত্যেকের পক্ষেই দরকার। মনোভাব প্রকাশের জন্য কথা বলিতে শিক্ষা যেমন দরকার, তাহার আদান প্রদান সমগ্র জগতের সর্ব্বমানবের আয়ত্তে আনিবার জন্য লিখন পঠন শিক্ষাও প্রত্যেকের পক্ষে তেমন দরকার। তার পর জগৎ প্রচলিত সর্ব্ববিষয়ের একটা ধারণা, অন্তত একটা আবছা প্রাথমিক ধারণা প্রত্যেকের হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পর্য্যন্ত তাহা হয় না। এবং এ হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা পাঠশালার প্রাথমিক পরীক্ষার চাইতে বিশেষ উচ্চ স্তরের জিনিষ নয়।

পশুর জ্ঞানে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কোন বিকাশ দেখা যায় না। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার বুদ্ধি সমান থাকে। এই জন্য পশুর বুদ্ধিকে instinct বলা হয়। কিন্তু মানুষের বেলায় তাহা নহে। মানুষের বুদ্ধি ও জ্ঞানার্জ্জনের সহিত মার্জ্জিত ও বিকশিত হইতে থাকে। মানুষের জ্ঞানার্জ্জনের প্রতি মনে হয় একটা স্বাভাবিক আগ্রহ আছে। শিশু জন্মগ্রহণ করিয়া কিছুদিন পর হইতে অন্যের শব্দ অনুকরণ করিবার জন্য একটা ভয়ঙ্কর চেষ্টা করিতে থাকে। কেহ তাহার মুখের কাছে আহ্লাদ করিয়া কোন শব্দ করিলে কান পাতিয়া শুনে, লক্ষ্য করিয়া মুখভঙ্গি দেখে, এবং আঁ ও প্রভৃতি নানা ভাবে তাহা অনুকরণ করিবার চেষ্টা করে। এই যে স্বাভাবিক অনুকরণ প্রবৃত্তি এটা কথা বলিবার আগ্রহের বেলায় যত দেখা যায় এত বোধ হয় আর কিছুতেই দেখা যায় না। ইহা দ্বারা মানুষের মনোভাব আদান প্রদানের দ্বারা জ্ঞানবিকাশের যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছে। যদি স্বাভাবিক অভিব্যক্তির ফলে এই সাধারণ আগ্রহ আরও বাড়িয়া যায়, যদি মানুষের এই আগ্রহ শুধু কথা বলিতে শিখাতে শেষ না হইয়া, লিখন পঠন শেখা পর্য্যন্ত ওঠে, এবং তার পরেও আগ্রহ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে থাকে, তবে এই যে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ, এর শ্রেষ্ঠত্ব আরও কত বাড়িয়া যাইবে!

তাহা যাক বা না যাক, অন্তত সে বিষয়ের মীমাংসার ভার Biologist এবং Evolutionist দের হাতে রাখিয়া দিলেও, মানুষের অন্তত মনুষ্যত্বের জন্যেই শিক্ষার সকল বিভাগের সকল দুয়ার উন্মুক্ত রাখা যে দরকার সে কথা অতি ধ্রুব। সেই জন্যেই প্রাথমিক শিক্ষায় মানুষকে লিখন পঠন শিক্ষা দিয়া তাহাকে কিছুদিন সর্ব্ববিষয়ের একটা ধারণা যাহাতে আসে এরূপ শিক্ষা দিবে। তার পর তাহাকে ধাড়িয়া লইতে দাও সে কিসে তাহার শক্তির পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাইবে। এই ভাবে যদি Primary, Secondary ও College education এর ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে শিক্ষার একটা ধাঁচা স্থির হয়, এবং লোকের ধরণ ধারণ সমস্ত বিষয়ের একটা ব্যবস্থা, কি আবশ্যক তাহার একটা হিসাব হইতে পারে। এখন বিভিন্ন প্রকার অর্থোপার্জ্জনের পন্থাকে যদি এক একটী শিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া ধরা

যায় তাহা হইলে আমরা যে ধাঁড়া বলিলাম সে হিসাবে তাহার আবার বিভাগ করিয়া লইতে হয়। কতটুকু কোন্ অবস্থায় শিক্ষা উচিত এবং শিক্ষা সম্ভব তাহাও বিবেচনা করিয়া ঐ বিভাগ করিতে হয়। তারপর সাধারণ জ্ঞানার্জ্জনের যেমন সীমা-রেখা টানা নাই, অন্নোপার্জ্জনের বেলায় ও তেমন নয়, তাহার অন্নোপার্জ্জনটাই মস্ত সীমা, এবং সেই উদ্দেশ্যটা কতদূর কোন্ ভাবে সিদ্ধ হইবে সে বিবেচনাটাও বাদ দেওয়া চলিবে না। শেষ কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে, বর্ত্তমান স্কুল কলেজ গুলি ইহার কতটুকু সাহায্য করিতে পারিবে, এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বা এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কি,—অর্থাৎ কি ভাবে কোন্ বিভাগ খুলিতে পারিবে। আশুবাবু ত সেনেটহাউসে ৭ই মে তারিখে বাঙ্গালার হেডমাষ্টারদের লইয়া স্কুলে বৃত্তিশিক্ষা সম্বন্ধে এক কনফারেন্স করিয়া সারিয়া দিয়াছেন।

সেনেটহাউসে হেডমাষ্টার্স কনফারেন্স

এক একবার মনে হয়, সেনেটহাউসে হেডমাষ্টার-দের এ কনফারেন্সের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে বোধ হয় ননকোঅপারেশনের প্রচার যথা-সম্ভব বন্ধ করা। "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর তোমাদের রাগ কিসের জন্য? শিল্প-বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হয় না বলিয়া? বেশ এস সকলে, পরামর্শ করিয়া দেখা যাক, কি ভাবে সমগ্র দেশটাকে শিল্প-বিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তোলা যায়। এর জন্য রাগ করিবার দরকার কি?" তাই বাঙ্গালা দেশের পাঁচশত হেডমাষ্টার আসিয়া গোলদিঘী সরগরম করিয়া গেলেন। অনেকেই বোধ হয় মনে করিয়া গেলেন 'কি আনন্দ আজ ভারত ভিতরে ভারত জননী জাগিল রে।'

আমাদের জিজ্ঞাস্য, তাঁহারা পাইলেন কি। প্রথম কথা এরূপ কনফারেন্স এত অল্প সময়ের নোটীসে হওয়া বাস্তবিক পক্ষে আপত্তিজনক। ইহার অনেক বিষয় সম্যকরূপে বিবেচনা করিবার অবসর সকলের ঘটে নাই। তারপর পাঁচ ঘণ্টার সভায় এতবড় বিষয়ের মীমাংসা করিয়া ফেলায় অনেক সন্দেহ আসে। এত তাড়াতাড়ি করিবার এত ব্যস্ত হইবার যথার্থ কারণ কি, ঠিক বুঝা যাইতেছে না বলিয়াই অনেকে অনেক সন্দেহ করিতেছেন। এ সভায় যে সমস্ত প্রস্তাব পাশ হইল তাহা অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন, কেবলমাত্র বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন। এরূপ অবস্থায় এ সভার অধিবেশন একটা তোক বাক্য দেওয়ার অজুহাত ভিন্ন আর কি বলিয়া মনে হইবে!

ম্যাট্রিকুলেশনের পাঠ্য বিষয়ের যে পরিবর্ত্তন সকলে প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা ত Sadler Commission এর Report—এই আছে; তাহার জন্য এতবড় সভা না ডাকিলেও বোধ হয় চলিতে পারিত। আর সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে একটু ছুতোর ও কামারের কাজ শিখিলে ছেলেদের যে কি পুরুষ-পুরুষার্থ লাভ হইবে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসের ছেলের পক্ষে Shorthand expert হওয়া কখনও সম্ভবপর নহে। Type writing ও অন্যান্য বিষয়ে দক্ষ হইলে কোন্ বালক মাসে কত রোজগার করিবেন এবং তাহাতে বর্ত্তমান অন্ন সমস্যার কতটুকু সমাধান হইবে তাহা কেহ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন কি?

কেহ কেহ বলেন যাহা রোজগার করিবে তাহাতেই ক্রমে চলিবে। আমাদের যে চলে না সে ত আমরা বাবুগিরি ও অভাব বাড়াইয়া লইয়াছি বলিয়া। বাবুগিরি ও কৃত্রিম অভাব গুলি কমাইয়া ফেলিতে পারিলেই আমাদের ছেলেরা স্বচ্ছন্দে ছুতোরের কাজ করিয়া ও চরকা ঘুরাইয়া জীবন কাটাইয়া দিতে পারিবে। তাই যদি, তবে ছুতোরের কাজ শেখারই বা দরকার কি? যদি অভাবই কমান সম্ভব হয় তাহা হইলে যে যেখানে থাকিয়া যাহা রোজগার করিতেছে তাহাতেই ত চলিতে

এবং তাহা হইলেই আপত্তিকর জাতিগত এবং দেশগত বৈষম্যের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার আশা করা যায়।

শুধু ষ্টেশনরে ওয়ার্কশপ গুলির কথাই আমরা বলিতেছি না। দেশে স্বদেশী অনেক প্রকার কারখানাই স্থাপিত হইয়াছে। Tata Iron Works বলিতে গেলে সমগ্র জগতের মধ্যে একটা বিরাট ব্যাপার। সেখানে apprentice ত প্রতি বৎসর কম লাগিবে না। তারপর ছোটখাট কত কারখানা আছে, সাবান, চিরুণী, পেন্সিল প্রেসের কালি নানারূপ কেমিকাল ঔষধাদি প্রস্তুত ইত্যাদি। তা ছাড়া কত খনি আছে, যেখানে জাহাজের কারখানা পর্য্যন্ত হইতেছে, ইলেক্ট্রিক ওয়ার্কশপ আছে, গবর্ণমেণ্ট Telegraph Department আছে, এ সমস্ত গুলিরই apprentice সরবরাহের ব্যবস্থা যদি বিশ্ববিদ্যালয় নিজের হাতে গ্রহণ করেন তবে হইলে বাস্তবিকই বিশ্ববিদ্যালয় কি দেশে গাস্তর আনিতে পারে না?

এইরূপ ব্যবস্থা হইলে স্কুলকলেজ হইতে যাহারা Preliminary Scientific Training পাইয়া বাহির হইবে তাহারা শুধু যে তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার সুযোগ পাইবে তাহা নয়, ভবিষ্যতে কাজ-কর্ম করিয়া অর্থোপার্জ্জনের পথ পাইবে, কারণ বেকারীও সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যাইবে। এই সঙ্গে স্কুল কলেজ হইতে স্কলারসিপ দ্বারা তাহাদের আগ্রহ বৃদ্ধি করিয়া সাহায্য করিলে অনেক কাজ করা যাইবে।

এদিকে দেশে যে সমস্ত কারখানা এখনও হয় নাই, তাহা খুলিবার ব্যবস্থা একদিকে যেমন ধনীগণ করিবেন, অন্যদিকে তেমনি Trained লোক পাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। Trained লোক দেশে না পাওয়া গেলে বিদেশ হইতে শিখাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এজন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কিছুকালের জন্য স্কলারসিপের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অবশ্য কয়েকজন Trained হইয়া আসিলে এবং দেশে কারখানাগুলি গড়িয়া উঠিলে আর ঐসব বিষয়ের জন্য বিদেশে যাইবার বিশেষ আবশ্যকতা থাকিবে না। কিন্তু যত দিন তাহা না হইতেছে ততদিন শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নহে যাহারা কারখানা খুলিতে চাহেন তাঁহাদেরও Stipendএর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমাদের এই প্রস্তাবগুলি দেশের প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। প্রত্যেক M. L. C. কে অনুরোধ করি যে আগামী লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের অধিবেশনে এ সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া শিক্ষাসচিবকে এরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য করান। সার আশুতোষকে বলি শুধু স্তোক বাক্যে মাত্র নন-কো-অপারেশন ঠেকাইবার জন্য ব্যস্ত না হইয়া প্রকৃত কাজ যাহাতে হইবে তাহার জন্য চেষ্টা করুন। আর সকলকেই বলি সমস্ত জিনিষটাকে একটা ছেলেখেলায় পরিণত না করিয়া যাহাতে সকলের পেটে দুটী অন্ন যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করুন। সকলকেই 'সবুজ পত্রের' কথায় বলি 'দেশ ধন সম্পদে পূর্ণ হইয়া উঠিবে, তাহার মানে তাহা বর্জ্জন করা নয়, তাহা অর্জ্জন করা।'

Printed by P. N. Pal, at the Shastraprachar Press, 5 Chidammudi Lane, and Published by P. N. Pal, 26-3 Scott Lane, Calcutta.

অপূর্ব্ব, নতিকা ও হিমাংশু

—মণিকাকন

Lakshmibilas Colour Studio & Printing Works.

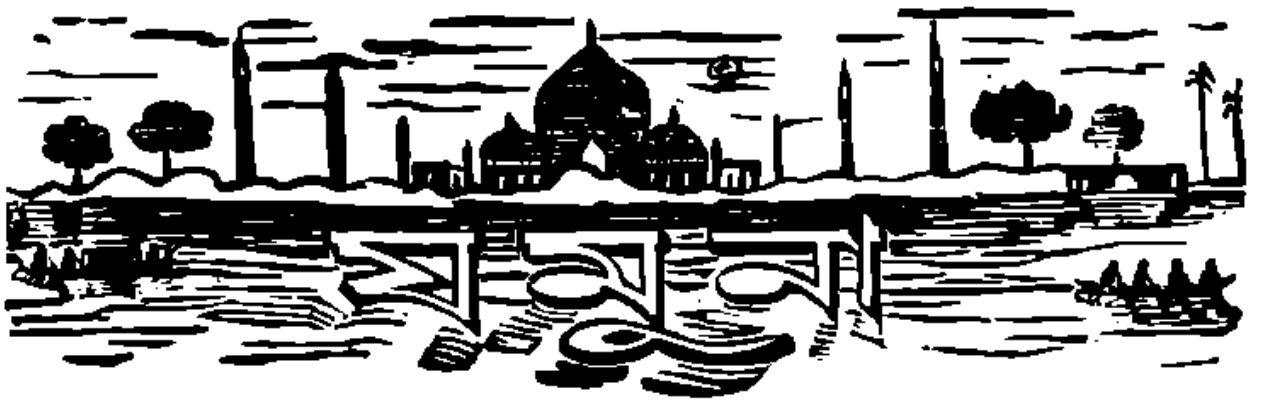

১১শ বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩২৮ | ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ

(শ্রীলীলা দেবী)

সেই তো শ্রাবণ !
সেই তো মেঘের কোলে আঁধার বিজলী দোলে
অভিনব ঘনাগম গুরু গরজন।
সজল জলদ হেরি, মেলিয়া কলাপ মরি !
ধরল কেকার সাথে শিখীর নর্ত্তন !
থেকে থেকে ডাকে দেয়া সুবাস ছড়ায় কেয়া
কেতকীর রেণু মাখি' মধুর পবন।

সেই তো শ্রাবণ !
সেই তো নীপের ডালে কাজরীর তালে তালে
বাঁধা ঝুলনের দোলা প্রেমের দোলন !
ঝর ঝর বারি ধার বিরাম নাহিক তার
মেঘে মেঘে কেঁদে ফেরে যক্ষের ক্রন্দন !
সেই স্নান জোছনায় রসাল পিয়াল ছায়
করে করে প্রাণে প্রাণে রাখীর বন্ধন

সেই তো শ্রাবণ !
সেই কুরুবক তলে বসন্ত আসিবে বলে'
মাধবী লতায় চারা যতনে রোপণ,
সেই ভরা কূলে কূলে প্রেমের উজান তুলে,
হৃদয় যমুনা বয় নয়ন লোভন
কুটজ কুসুম তুলে' বিকচ কদম ছুলে
আজিও রচি যে বসি নানা আভরণ !

সেই তো শ্রাবণ !
চমকে চপলা ঘন বাদল মাতায় বন
সেই দুরু দুরু বুক—আঁধার ভুবন !
সেই তো ত্রিযামা যামী এখনো জাগিয়া স্বামী
সেই থর থর তনু শুনি গরজন !
সেই তো পাগল ঝড়ে বাদল বাজায়ে ফেরে
একাকী আঁধার ঘরে মুদি দুনয়ন !
সেই তো শ্রাবণ !

কয়েদীর কথা

(বড় গল্প)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ.)

(২৭)

পরদিন আমার নির্জ্জন কক্ষটিতে চুপ করিয়া বসিয়া আছি, দেখিলাম দূরে কয়টা গাছ দলে ভরিয়া উঠিয়াছে। ভাবিতেছি আমারও এ জেল-খানায় বসন্ত আসিল নাকি—এ যে বর্ষাকালের প্রারম্ভ—গ্রীষ্মের শেষ। তারপর মনে হইল উহারা জেলখানার গাছ, কয়েদীর মত উহারাও অবারিত আলো ও বাতাসে প্রবৃদ্ধ হইতে পারে না। ইহারা কয়েদীর মতই পাষাণ ও সিমেন্টের বন্ধনে আড়ষ্ট হইয়া আছে—ইহাদের গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত সবই সমান, আমিও ইহাদের মতই কয়েদী।

কয়েদীকে ডাকিলাম। সে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল "অনেক দিন ধরিয়া বকিতেছি, বোধ হয় বিরক্তি আসিতেছে।"

আমি বলিলাম "সে ভাবনা আপনাকে ভাবিতে হইবে না; আপনি গল্প আরম্ভ করুন।"

কয়েদী বলিল "আরম্ভ করিতেছি—জোর হুকুম যে।"

আমি বলিলাম "থাক্ ও সব কথা গল্প বলুন।"

কয়েদী বলিল "অত ব্যস্ত হইলে চলিবে না। আমার সব কথা শুনিতে হইবে।"

আমি বলিলাম "আমারও কাছে এমন একটা সুসংবাদ আছে, যাহা শুনিবার জন্য আপনাকেও আমারই মত ব্যস্ত হইতে হইবে, তখন কিন্তু আমার সব কথা আপনাকে শুনিতে হইবে।"

কয়েদী বলিল "লোভ দেখাইতেছেন নাকি?"

আমি বলিলাম "লোভ নয়, এখন আপনি যাহা সকলের চেয়ে অধিক প্রিয় মনে করেন, তাহা আমি আপনাকে দান করিতে পারি।"

কয়েদী বলিল "যদি পারিতেন তাহা হইলে এতটা আত্মশ্লাঘা থাকিত না—এত আপনার বাহাদুরি দেখাইবারও প্রয়োজন হইত না।"

আমি বলিলাম "আপনার কাছে কোন জিনিস সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়?"

কয়েদী বলিল "তুমিই বলিয়া দাও।"

আমি বলিলাম "আজ সকালে আপনাকে মুক্তি দিবার আদেশ পত্র প্রচারিত হইয়াছে।"

কয়েদী বলিল "ভাই হে সেটা আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় নয়। এক সময়ে মনে হইয়াছিল, সবই প্রিয় তারপর দেখিলাম—কোনটি অধিক প্রিয় কোনটি কম প্রিয়—সর্ব্বাপেক্ষা কোন্ জিনিস যে প্রিয় তাহা বলিতে পারি না।"

আমি বলিলাম "কেন—প্রাণ?"

কয়েদী বলিল "প্রাণও দান করিবার জিনিস—ইচ্ছা করে প্রাণটা অপর কিছুতে সমর্পণ করি।"

আমি বলিলাম "আপনি ভক্তিমান দেখিতেছি।"

কয়েদী বলিল "আমি ভক্তি কি জানি না—শুনুন এইবার গল্প বলি।"

আমি অবহিত হইলাম। কয়েদী বলিতে লাগিল।—

বাসন্তী সন্ধ্যায় সর্দ্দারের কুটীর দ্বারে করাঘাত

করিলাম। লক্ষ্মী দ্বার খুলিয়া দিল। গৃহে প্রবেশ করিয়াই বলিলাম "কি রে দিদি, কেমন আছিস সব ?"

লক্ষ্মী বলিল "ভাল আছি দাদা।"

"রতন এদিকে আয়" বলিয়া আমি মাদুরের উপর বসিয়া পড়িলাম। রতন ধীরে ধীরে আমার কাছে আসিয়া উপবেশন করিল। দেখিলাম লক্ষ্মী রতনকে দেখিয়া মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিল। আমি একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তাহার মুখদর্পণে অন্তরের অনেক নিগূঢ় ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। আজ মনে হইল রতনকে লক্ষ্মীর সম্মুখে আনিয়া আমি ঋণ মুক্ত হইয়াছি।

লক্ষ্মীর সঙ্গে দুই চারিটা কথা কহিয়াই বলিলাম "বাবা কোথায় ?"

লক্ষ্মী বলিল "তিনি পুকুর ঘাটে বসিয়া আছেন।"

আমি ধীরে ধীরে ঘাটের দিকে অগ্রসর হইলাম, বলিলাম, "রতনকে লইয়া আসিয়াছি।"

সর্দ্দার বলিল "কি মতলব ?"

পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া আসিল, বলিয়া ফেলিলাম "আপনি সব কাজেই আমার একটা মতলব আছে, এইরূপ মনে করেন।"

সর্দ্দার হাসিয়া বলিল "কখন সব এলি ?"

আমি বলিলাম "এই আসিতেছি।"

"ভিতরে যা, হাত মুখ ধুইয়া বিশ্রাম কর।"

আমি তাহাই করিলাম। ঘরে হাতমুখ ধুইয়া বসিতেই লক্ষ্মী আমাকে মুড়ি ও কয়েকটা রসকরা জলযোগের জন্য আনিয়া দিল।

জলযোগ শেষ করিয়া আবার বাহিরে আসিলাম। আবার সর্দ্দারের সহিত দেখা করিলাম। তখন প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। রতনকে লক্ষ্মীর কাছে হাজির করিয়া আমার একটা কাজ শেষ করিয়াছি, এখন দ্বিতীয় কাজ—মুক্তির সহিত আমার বিবাহ হওয়া উচিত কি না তাহাই নির্ণয় করা। প্রথম কাজটি শেষ হওয়ায়, দ্বিতীয় কাজটি একা পড়িয়াছে যে মন দ্বিধা বিতর্ক হইয়াছিল তাহা এখন এক হইল। আমি সমস্যার একটা সমাধানের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম।

এমন সময় সর্দ্দার গম্ভীর স্বরে বলিল "তুই ফিরিলি কেন ?"

আমি বলিলাম "রতনকে লইয়া আসিলাম।"

"তাহাকে পাঠাইয়া দিলেও ত চলিত ?"

পাছে না আসে এই ভয়ে সঙ্গে আসিলাম।"

"আসিয়াছ স্বার্থসিদ্ধির জন্য।"

"স্বার্থের অন্বেষণে এখানে আসি নাই, আসিয়াছি কর্ত্তব্যপালনের জন্য।

"ইহাও স্বার্থ।"

"বেশ, স্বার্থছাড়া মানুষ থাকিতে পারে না।"

"তবে আমার কথাটা শুনিয়া রাগিতেছিস্ কেন রে হতভাগা ?"

"রাগি নাই।"

"মিথ্যা বলিতেছিস।"

বুঝিলাম সর্দ্দারের কথাগুলির আঘাতে আমার অহংকার সর্পের মত ফোঁস হইয়া উঠিয়াছে, সেই অহংকারের মোহে অচৈতন্য হইয়া আমি মিথ্যা বলিয়াছি। মনে মনে বলিলাম "ভগবান আমাকে জ্ঞান দাও, তোমার কাছে ভিক্ষা না করিয়া উপায় নাই। যেখানে কেহ নাই সেখানে তুমি আছ। তোমার থাকা ও আমাদের না থাকা একই জিনিস। তুমি আছ, তুমি নাই, তুমি আছ কি না তাহাও বলিতে পারি না। আমি এখনও তোমার অস্তিত্ব প্রাণে মনে অনুভব করিতে পারি নাই। এখনও তুমি আমার কাছে সুদূর, আমার যুক্তি তর্কের জিনিস, তোমাকে ইন্দ্রিয়ের গোচর করিতে চাই। ভগবান, আজ আমি তোমাকে দেখিতে চাই। আজ আর তর্ক যুক্তি চাই না, তুমি প্রত্যক্ষ হও। তোমাকে দেখিয়া অন্তরের সব কালি মুছিয়া ফেলি।"

বলিলাম "হাঁ আমি মিথ্যাই বলিয়াছি। এতক্ষণ

বুঝিতে পারি নাই কিসের মোহে আচ্ছন্ন ছিলাম। আমি স্বার্থসিদ্ধির জন্যই এখানে আসিয়াছি এখন স্বার্থটা কি শুনুন"—

সর্দ্দার বলিল "এখন আর আমি তাহা শুনিতে চাই না।"

আমি তখন অতি বিনীতভাবে বলিলাম "আপনাকে শুনিতেই হইবে।"

সর্দ্দার কিছুতেই সম্মত হইল না। আমি বলিলাম "দেখুন, আপনাকে গুরু বলিয়া মানিয়াছি, আপনি আমাকে শিক্ষা দিন্।"

সর্দ্দার বলিল "তুই শিক্ষিত, আপনাকে গুরু কর। আত্মগুরুর উপদেশ পালন কর।"

আমি বলিলাম আত্মগুরুর সাড়াশব্দ যদি না পাই?"

"একটা সাড়া নিশ্চয়ই পাইবে। তবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত। ব্যস্ত হও কেন?"

"না, আপনার কথা আমার বিশ্বাস হইয়াছে, আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব। আমাকে বুঝাইয়া দিন আমার কি কর্ত্তব্য।"

"নিজে বুঝিয়া দেখ কর্ত্তব্য কি?"

"নিজে বুঝিলে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব কেন?

"কিছু দিন অপেক্ষা কর বুঝিতে পারিবে।"

"এ জীবনে বুঝিব বলিয়া মনে হয় না।"

"না হয় পরজীবনে বুঝিবে, ভাবনা কি? জীবনের কি অন্ত আছে?"

"তাহা নাই, আশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিবার পর মনুষ্য জন্ম।"

"একথা বিশ্বাস করিস্?"

"হাঁ করি।"

"তাহা হইলে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে বিলম্ব হইত না। যাক্ এ সব কথা, এখন তোকে একটা কাজ করিতে বলি।"

"আমি কাজ করিয়া দিব। আপনি আমার সন্দেহ ঘুচাইয়া দিন্।"

"আমি ঘুচাইতে পারি না। নিজে নিজের সন্দেহ না ঘুচাইলে সন্দেহ থাকিয়া যায়। পরের মুখে ঝাল খাইলে চলিবে কি? তুমি যাহা ভাল মনে কর, তাহাই করিয়া যাও। এখন আমার একটা ইচ্ছা আছে, তাহা পূর্ণ করিবে কি?"

"সাধ্য হয় করিব।"

"আমার অর্থাদি যাহা কিছু আছে তাহার সন্ধান তোমাকে দিতে ইচ্ছা করি। এখন তোমার উপর বিশ্বাস আসিয়াছে।"

"কেন? আগে বিশ্বাস হয় নাই, এখনই বা হইল কেন?"

"কারণ আছে, পরে বুঝিবি। এবারেও যখন আমার কাছে আসিয়াছিস, তখন বেশ বোঝা যায় তুই ভীরু বা কাপুরুষ নয়—তোর মনুষ্যত্ব আছে।"

"আপনার কথা ভাল বুঝিলাম না।"

আমার ইচ্ছা—আমার এই অর্থ ডাকাতদের উপকারের জন্য ব্যয় করা হোক্। তবে তুমি যদি অপর কোন উপায়ে ইহার সদ্ব্যয় কর, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই।"

"যদি ঐ অর্থ আত্মসাৎ করা উচিত মনে করি?"

"আত্মসাৎ করিও।"

"কেন এত বিশ্বাস আসিল?"

"সে কথা বলিলে লেখা ফুলিয়া কলাগাছ হইবে।"

"বৃথা অহঙ্কার ভাল নয়; আমার প্রকৃত গুণ যদি থাকে তাহা হইলে অহঙ্কার থাকুক না, সে অহঙ্কার ভাল।"

"অহঙ্কারমাত্রই খারাপ।"

"আত্মসম্মানও কি অহঙ্কার নয়?"

"না, আত্মসম্মান মানুষকে নম্র ও বিনয়ী করে। যে আপনাকে সম্মান করে, সে সকলকেই সম্মান করে। তাহার অহঙ্কার কমিয়া যায়।"

"যাক্, এ সব কথা—এখন যাহা বলি শোন।"

"বলুন।"

"আমার কাছে কিছু টাকা আছে, তাহা আমি তোকেই দিতে চাই—তুই তাহার সদ্ব্যয় করিস। এখন তুইই সে অর্থের মালিক।"

"কত টাকা আছে?"

"পরে বলিব। এখন কাহাকেও সে কথা বলিব না।"

"আমিই যদি মালিক হই, আমাকেই যদি তাহা দান করেন, তবে আমার কাছে সব গোপন করিতেছেন কেন?"

"দেখ, টাকা পরের, আমি তাহার রক্ষক, তোকেও রক্ষকের মত সেই টাকা গ্রহণ করিতে হইবে। আপনার টাকা মনে করিস্ না।"

"পরের টাকা আমি গচ্ছিত রাখিতে চাই না।"

"নিঃস্বার্থ হইয়া টাকাটা কাছে রাখিতে পারিস্ না?"

"না এখনও আমার অর্থের প্রয়োজন আছে। অভাব লইয়া নিঃস্বার্থ থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই।"

"বেশ, আমার কথা মানিয়া তুই সে টাকা গচ্ছিত রাখ্। তার পর কোন একটা ভাল কাজে সে টাকা ব্যয় করিস্।"

"আপনিই তাহা করুন না।"

"কি কাজে ব্যয় করিব তাহা ঠিক করিতে পারি না। আমার ইচ্ছা এমন একটা কাজ এই টাকায় হোক্ যাহাতে এই গ্রামের নীচ জাতি যাহারা চুরি ডাকাতি করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে তাহাদের উপকার হয়।"

"সে ইচ্ছা আপনার হক আমার তত নয়। কাজেই অর্থের সদ্ব্যয় আপনি যেমন করিতে পারিবেন, আমি তেমন পারিব না।"

"আমার দ্বারা সে কাজ এখন হইবে না।"

"তাহা হইলে এখন আপনার সে ইচ্ছা নাই।"

"এখন আমি বুঝিয়াছি— কাহারও উপকার করা আমার হাতে নয়।"

"তাহা হইলে আমি পারিব এ ভরসা করেন কেন?"

"তুই কর্ম্মী—তোরই হাত দিয়ে এ কাজ হইতে পারে।"

"ভগবানই যখন সব করেন, তখন এ কাজ তিনিই করিবেন, আপনার ব্যস্ততার প্রয়োজন কি?"

"তাঁহারই ইচ্ছা—আজ আর থাক্, কাল অন্য কথা হইবে।"

তখন রাত্রি প্রায় দশটা। আকাশে জ্যোৎস্না বিকীর্ণ হইয়াছে। আমি কুটীরের বাহিরে সম্মুখ পথটার উপর পায়চারি করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম -আমি উদ্দেশ্যবিহীন, এক কাজ করিতে গিয়া আর এক কাজে জড়িত হইতেছি। সত্যই কি পৃথিবীতে চেষ্টা করিয়া কিছুই করা যায় না!

জীবনের ঘটনাগুলি একে একে সমালোচনা করিতে বসিলাম। এখানে সম্বন্ধ অনেক, প্রতি ঘটনা আমাকে নানা জিনিসের সঙ্গে সম্বন্ধ করিতেছে। নানা সম্বন্ধ আমাকে আকুল করিয়া তুলিতেছে। একটিকে ছাড়িতে গেলে অন্তর বেদনায় ভরিয়া উঠে।

এই সম্বন্ধগুলিই আমাকে অহরহ ভয় দেখাইতেছে। ইহারাই আমার চিরকালের বন্ধন; আমি এ বন্ধনের অত্যন্তবিনাশ কামনা করি না, ইহারা আমাকে মুক্তির আনন্দ দান করুক; বন্ধন না থাকিলে মুক্তির আনন্দও যে থাকে না।

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। পরদিন সকালে সর্দ্দারকে বলিলাম "দেখিতেছি এখনও আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন না।"

সর্দ্দার বলিল "নাই বা করিলাম, তোমার তাহাতে কি আসে যায়?"

"আমার কোন ক্ষতি নাই আপনি কাল বলিয়াছিলেন আমাকে বিশ্বাস করেন, আজ ওকি কথা বলিলেন?"

আমি মিথ্যাবাদী এই কথাটা বলিতে চাও তো ?"

না, ঠিক সে কথাটা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, তবে আপনার এই সব জটিল কথাগুলি বড়ই বিচলিত করে।"

"বিচলিত হও কেন ?"

দেখিলাম—প্রমাণিত হইল আমার চিত্ত সহজেই বিচলিত হয়। তবুও আপনাকে দুর্ব্বল মানিয়া লইতে পারিলাম না। বলিলাম "আপনার এই সব কথা পরিত্যাগ করা উচিত—লোকের আনন্দ আপনি ভাঙ্গিয়া দেন।"

সর্দ্দার বলিল "যে আনন্দের জন্য তোমার মন লালায়িত, সে আনন্দ ছঃখেই পরিণত হয়।"

আর কথা কহিলাম না। একবার মনে হইল কেবল আনন্দের জন্যই লালায়িত হইয়া বোধ হয় জীবনটাকে ছঃখময় করিয়া তুলিয়াছি। সারাদিন এই চিন্তাটাই অন্তরে আধিপত্য করিল। সন্ধ্যার সময় লক্ষ্মী বলিল "দাদা, তোমাকে খাওয়ার পর বাবা একবার ডাকিয়াছেন।"

আহারাদির পর সর্দ্দারের সহিত দেখা করিলাম। সর্দ্দার তখন অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় একখানা খাটের উপর বসিয়া আছে। আমি যাইতেই সে বলিল "বস্"। আমি উপবেশন করিলাম। সর্দ্দার বলিল "শোন্, টাকা কোথায় আছে বল্।"

আমি বলিলাম "একথা বলিবার পূর্ব্বে আপনাকে কয়েকটি বিষয় শুনাইয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।"

সর্দ্দার বলিল "কি বল্।"

আমি বলিলাম "আমি ধনী নই, আমার অর্থের অভাব আছে—সুতরাং আপনার ধনের অপব্যবহার্ আমার দ্বারা হইবে কি না বুঝিয়া দেখুন। আমাকে বিশ্বাস করা আপনার উচিত নয়।

সর্দ্দার বলিল "আমার বিশ্বাস ঘুচাইবার নয়—কেন তুই বাজে কথা কহিতেছিস্ ?"

আমি বলিলাম "দেখুন, পরের টাকা গচ্ছিত রাখা আমার কাজ নয়। কোথায় কখন তাহা খরচ করিয়া ফেলিব, তারপর বিপদে পড়িতে হইবে।"

সর্দ্দার বলিল "কিছু টাকা গচ্ছিত রাখিবার সাহস নাই, ভয় হয় লোভে পড়িবি। আরে হতভাগা, লোভকে ফাঁকী দিয়া চলিতে চাস্ ? যতদিন তাহাকে ভয় করিবি, জানিস্ ততদিন সে তোকে ধরিতে চেষ্টা করিবে।"

আমি বলিলাম "আপনার টাকা যে আত্মসাৎ করিব এ ভয় আমার নাই; তবুও সাবধান থাকিতে চাই।"

"ভয় না থাকিলে সাবধান হইবে কেন ?"

"বেশ আপনার টাকা আমি গচ্ছিত রাখিব।"

"তাহা হইলে টাকা কোথায় আছে বলি ?"

"বলিতে পারেন—কিন্তু।"

"কিন্তু" কেন ? যাহা বলিবার সব বলিয়া ফেল।"

"টাকা লইয়া কি করিব বলিয়া দিন্।"

"ডাকাতদের উন্নতির জন্য সেই অর্থ ব্যয় করিবে।"

"এ গুরুভার আমি লইতে অক্ষম।"

"কোন স্বার্থ নাই বলিয়া কাজটা গুরুভার মনে হইতেছে।"

"তাহা নয়, কাজটা ভাল, তবে এখন আমার চিন্তার বিষয় অনেক, এখন আমি ডাকাতের ভার লইতে চাই না।"

"যদি কথা না শুনিস্ দূর হইয়া যা।"

"দেখুন, আমি আপনার দাস নই।"

"দাসত্ব তোর মজ্জাগত। সেই জন্য স্বেচ্ছায় একটা নিঃস্বার্থ কাজ করিতে চাস না। স্বার্থ গলা টিপিয়া তোকে এখানে সেখানে ঘোরাইবে তবে তুই কাজ করিবি।"

"যাই হোক, আপনি যাহা বলিবেন তাহাই শুনিতে আমি বাধ্য নই।"

"কখনও আমি তোকে কোন কাজ করিতে উপদেশ দিই নাই। যখনই উপদেশ চাহিয়াছিস্ তখনই বলিয়াছি আপনি যাহা ভাল বুঝিস্ তাহাই কর। মিথ্যা বলিস কেন?"

"এখন আজ্ঞা করিতেছেন কেন?"

"আর করিব না—টাকা তোকে দান করিব, গ্রহণ করিবি?"

সে ক্ষমতা আপনার নাই, আপনারও স্বার্থ আছে যে। আমাকে যদি বিশ্বাসই করেন তাহা হইলে টাকাটা আমাকে দান করিতে পারিতেন, তখন আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতাম। অর্থ যদি আমার হয় তবেই তাহার সদ্ব্যয় আমি করিতে পারি।"

"যদি বাজে খরচ করিস্"—

"আমিই যখন অর্থের মালিক, তখন সে বাজে খরচও আমার কাছে সদ্ব্যয়।"

বেশ আমি তোকে অর্থ দানই করিলাম—দেখিস্ যে কাজে আত্মগ্লানি আছে সে কাজ কখনও করিস্ না।"

"এ উপদেশ না দিলেও মানিয়া চলিতাম।"

"তবে তুই আর আমার উপদেশ প্রার্থনা করিস্ না?"

"না।"

"তবে তোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘুচিয়া আসিয়াছে।"

"ঘুচাইলেই ঘুচিবে।"

"যিনি ঘুচাইবার তিনিই ঘুচাইবেন, স্বার্থ না থাকিলে কোন সম্বন্ধই টিকিতে পারে না।"

এই কথার পর কিছুক্ষণ দুইজনেই নীরবে বসিয়া রহিলাম। তারপর সর্দ্দার আমাকে টাকার কথা বলিতে আরম্ভ করিল। বুঝিলাম—সর্দ্দারের শয়নকক্ষে বালো হাত মাটীর নীচে একটা লৌহ-সিন্দুকের মধ্যে টাকা আছে।

বলিলাম "আপনার কন্যা ও জামাতাকে কি দিবেন?"

"আমার সর্ব্বস্ব তোকে দিলাম—তোর ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিস; কোন উপদেশ আর তোকে দিব না।"

"আমাকে টাকা যে দান করিলেন, তাহার প্রমাণ কি?"

"লেখাপড়া করিয়া দিতে বলিস?"

"তাহা না করিলে যদি কেহ কাড়িয়া লয়?"

"যদি কাড়িয়া লয় বুঝিব এ টাকা তোর হাতে থাকা উচিত নয়। আমি লেখাপড়া করিব না।"

"আপনি আইন অগ্রাহ্য করেন?"

"তোরা আইন মান্ রাজশক্তি মান, আমি যে শক্তিকে মানি তাহা রাজার শক্তির চেয়ে অনেক বেশী। আমি রাজার সাহায্যপ্রার্থী নই। কেহ তাহা প্রার্থনা করুক তাহাও ইচ্ছা করি না; তবে যাহারা রাজশক্তির সাহায্য চায় তাহারা সাহায্যের উপযুক্ত, তাহারা সে সাহায্য গ্রহণ করুক, কেন না রাজা তাহাদের দেবতা; অষ্টসুরেন্দ্রের মাত্রা যাঁহাতে বর্ত্তমান তিনি দেবতাই ত।"

"বেশ, রাজদ্বারে যাওয়া আপনার প্রয়োজন না হইতে পারে, আমি রাজদ্বারে যাইতে চাই।"

"অর্থে তোমার প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য?"

"হাঁ।"

"আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস এত অল্প?"

"কিসে দেখিলেন?"

"চোরডাকাত ভূতাচরের ভয়ে রাজার শরণাপন্ন হইতে চাও, সেই জন্যই একথা বলিতেছি।"

"বেশ, আত্মশক্তির উপর আমার বিশ্বাস অল্প। যাই হোক লেখাপড়া আপনাকে করিতে হইবে।"

"কখনই নয়, রতন হইলে লেখাপড়া করিতাম।"

সর্দ্দারের মুখে একটু হাসির উদয় হইল। হঠাৎ মনে হইল সে আমার সহিত তামাসা করিতেছে,

এসব স্থানের কথা মিথ্যা। ধনপত্র না লিখিয়া দিলে কোন মতেই এসব কথা বিশ্বাস করা যায় না।"

বলিলাম "সব অর্থই যখন আমার, তখন এখনই তাহা আমার হস্তে সমর্পণ করুন।"

সর্দ্দার বলিল "সময়ে তোর হাতেই দিব।"

"আমিই যখন অর্থের মালিক, তখন এখনই আমাকে দেওয়া হোক।"

সর্দ্দার চুপ করিয়া রহিল। আমি বলিলাম "আপনার কথা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।"

এই বলিয়া উঠিলাম। ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম—রতন জাগিয়া আছে। বলিলাম "কিরে সর্দ্দার কি বলে তাহাই শুনিবার জন্ত বসিয়া আছিস্ বুঝি।"

রতন বলিল "বড় মাথা ধরিয়াছে, ভাল ঘুম হইতেছে না।"

রতন দাওয়ার একখানা মাদুরে শয়ন করিয়াছিল। আমি তাহারই কাছে আর একখানা মাদুরে শয়ন করিলাম। আকাশের চাঁদ অস্তাচলে হেলিয়া পড়িতেছিল। ভাবিলাম সর্দ্দারকে যতটা সাধু মনে করিয়াছিলাম, বাস্তবিক সে ততটা নয়।

এতদিন কি করিলাম এই চিন্তাটা আমাকে অধীর করিয়া ফেলিল। বুঝিয়া দেখিলাম সারা জীবন ধরিয়া কেবল কতকগুলি আশা অন্তরে পোষণ করিয়াছি; কোনটাই সফল হয় নাই। কাজই বাড়িয়া চলিতেছে, কোন কাজই শেষ হইতেছে না। এইসব ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

প্রভাতে উঠিয়া সর্দ্দারের সহিত দেখা করিলাম, বলিলাম "দেখুন, আমি চলিয়া যাইব।"

"কবে ফিরিবি?"

"বলিতে পারি না।"

"যাইবার সময় একবার আমার সঙ্গে দেখা করিস্।"

যাইবার উদ্যোগ করিলাম। বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় সর্দ্দারের কাছে আসিয়া বলিলাম "আমি যাইতেছি।"

সর্দ্দার বলিল "আমি তোকে পাঁচ হাজার টাকা দিতেছি তুই টাকাটা ভাল জায়গায় রাখিস।"

"টাকা লইয়া কি করিব?"

"তোর যাহা ইচ্ছা তাই করিস্।"

সর্দ্দার টাকার থলি আমার হাতে দিল। আমি বাহির হইলাম। রতন ও লক্ষ্মী দুজনেই জিজ্ঞাসা করিল "কবে ফিরিবে?"

আমি বলিলাম "বলিতে পারি না।" রতন অন্য প্রশ্ন করিল না। লক্ষ্মী বলিল "না দাদা, কবে আসিবে বল।"

বলিলাম "শীঘ্রই আসিব।"

"পনরো দিনেরমধ্যে?"

আমি বলিলাম "আচ্ছা, চেষ্টা করিব।"

লক্ষ্মী বলিল "বল নিশ্চয় আসিবে।"

আমি বলিলাম "নিশ্চয় আসিব।"

* * *

কয়েদী এই পর্য্যন্ত বলিয়া থামিল।

আমি বলিলাম "গল্পটা কাল নিশ্চয়ই শেষ করিতে হইবে কেন না পরশ্ব সকালে আপনাকে ছাড়িয়া দিবার কথা।"

কয়েদী কহিল "দেখি কি হয়।"

৩০

পরদিন কয়েদী আবার আত্মকথা আরম্ভ করিল:

পথে সুকৃতির কথা ভাবিতে লাগিলাম। উদ্দেশ্যবিহীন জীবন আর ভাল লাগেনা। সর্দ্দার একটা কাজ আমার ঘাড়ে চাপাইবার মতলব করিয়াছে। এখনও সে পূর্ণমাত্রায় আমাকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। আমি কি করিব তাহাও ভাবিলাম।

মনে হইল সুকৃতিকে বিবাহই করিব। তাহাতে বাধাই বা কি? সে যখন সমস্ত শুনিয়াও কোন

আপত্তিই থাকিতে পারে না। বিধবাবিবাহের দোষ কি? দোষই যদি থাকিবে তাহা হইলে বিদ্যাসাগর তাহা সমাজে চালাইবার জন্য এত উদ্যোগী হইবেন কেন? হিন্দু সমাজ কঠোর—অতি কঠোর; সেই জন্যই তাহার এতটা অধঃপতন। আমি সে সমাজের নিয়ম মানিব না।

বাড়ীতে আসিয়া দেখিলাম মামা বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন। চাকরটী ঘরের কোণে তামাক সাজিতেছে।

আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া সুকৃতির অনুসন্ধান করিলাম। সুকৃতি নিকটে আসিল, বলিলাম "সুকৃতি, পাঁচ হাজার টাকা আমার কাছে আছে, তুমি রাখিয়া দাও।"

টাকার থলি তাহার হাতে দিয়া বাহিরে আসিলাম। মামা কিছুক্ষণ পরে বলিলেন "দেখ বাবাজী, তুমি জান আমি বড় স্বাধীনপ্রকৃতির লোক। আমাদের সমাজে যে সব দোষ আসিয়া পড়িয়াছে তাহা আমি ঘুচাইতে চাই। দেখ স্ত্রীস্বাধীনতা, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি সমাজে প্রচলিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক।"

কথা কহিলে মামার মতে মত দিতাম, কিন্তু কথা কহিলাম না। মামা বলিলেন "দেখ বাবাজী, সুকৃতির সহিত ব্রাহ্ম মতে তোমার বিবাহ দিব ঠিক করিয়াছি; দিদিরও মত হইয়াছে।"

এমন সময় ভিতরে মামার ডাক পড়িল। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম—ভাবিলাম, যাহা হইবার হোক্। আমি এই বিপুল সৃষ্টিপ্রবাহে একটি সামান্য তৃণখণ্ড, যাহার পুরুষকারের অস্তিত্ব নাই, নিয়তিই প্রবল। বেহারী হঠাৎ গান ধরিল—

"সকলই তোমারই ইচ্ছা
ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।"

আমি ও মামা যখন একসঙ্গে আহার করিতে বসিলাম, তখন মা নিকটে আসিয়া বসিলেন। মামা বলিলেন "দিদি, পুরুষের যদি দুইবার বিবাহ হওয়া শাস্ত্রসঙ্গত হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকেরও দুইবার বিবাহ হইতে পারে।"

মা বলিলেন "ওসব কথা ভাই আমি বুঝি না। তবে ছেলে মেয়ে যদি রাজী হয়, আমার কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। কর্ত্তা আমাকে কোন কাজে জোর করিয়া বাধা দিতে বার বার নিষেধ করিতেন। আমি তাঁহার কথা সারাজীবন মানিয়া চলিতেছি। তিনি জীবদ্দশায় আমাকে চালাইতেন, এখন তিনি পরলোকে, তবুও তাহার শক্তি আমি আমার অন্তরে অনুভব করিতেছি।"

মামা বলিলেন "আজ সোমবার, তাহা হইলে আগামী রবিবার শুভকার্য্য সম্পন্ন হোক। বিবাহ হইবে কলিকাতায়, কেহ জানিতে পারিবে না।"

তারপর অন্য কথা চলিল। আমি নীরবে আহার করিতে লাগিলাম।

রাত্রে শয়ন করিলাম। অনেকক্ষণ নিদ্রা আসিল না। সুকৃতির কথা কেবলই মনে পড়িতে লাগিল। ভাবিলাম সে একবার নিশ্চয়ই নিভৃতে আমার সহিত দেখা করিবে। ঘড়িতে একটা বাজিল, তবুও সুকৃতি দেখা দিল না। প্রদীপালোক ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল। উঠিয়া বসিলাম। এমন সময় সুকৃতি কক্ষে প্রবেশ করিল। আমি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলাম, তারপর বলিলাম "সুকৃতি, তুমি কিছু কি ঠিক করিয়াছ?"

সুকৃতি বলিল "তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব।"

আমি বলিলাম "দেখ, সুকৃতি, আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি, তোমাকে বিবাহ করা ছাড়া আমার অন্য গতি নাই।"

সুকৃতি বলিল "আমারও অন্য গতি নাই। একবার তুমি বল আমার উচিত তোমাকে বিবাহ করা। তাহা হইলে আর কোন গোলযোগ থাকে না। আমি একটু স্থির হই।"

আমি বলিলাম আমার মতের জন্য তুমি যাও কেন ?"

সুকৃতি বলিল "তুমি যদি বল 'আমার বিবাহ করা উচিত, আমি নিশ্চিন্ত হই।

"কেন ? আমার কথায় এত বিশ্বাস কেন ?"

"আমি তোমাকেই স্বামীর মত দেখিয়াছি ; যাহার সহিত বিবাহ হইয়াছিল তাহাকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই।"

"তোমার বিবাহ করাই উচিত। আগামী রবিবার তোমার সহিত আমার ব্রাহ্মমতে বিবাহ হইবে।"

ব্রাহ্ম মতে কেন ? এ বিবাহ কি হিন্দু মতে হইতে পারে না ?"

"না হিন্দু মতে এ বিবাহ হইতে পারে না।"

"আমি যাহা অধর্ম্ম তাহা করিতে চাই না।"

"ধর্ম্ম যে শুধু হিন্দুসমাজেই আছে, আর ব্রাহ্ম সমাজে নাই, একথা কে বলিল ?"

"যখন বিবাহ করিতেছি, তখন এই সমাজের নিয়মই মানিব। তবে তুমি যদি ব্রাহ্মমতে বিবাহ করিতে বল, আমি কোন কথা কহিব না।"

আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। সুকৃতি বলিল "আমি ধর্ম্ম জানি না সমাজ জানি না ; তুমি আমার দেবতা, আমাকে যাহা উচিত তাহা বল, আমি তাহাতেই রাজী আছি।"

আমি বলিলাম "সুকৃতি, আর গোলযোগে কাজ নাই, তুমি ব্রাহ্মমতেই বিবাহ কর।"

সুকৃতি বলিল "বেশ। তবে আজ যাই।"

সুকৃতি চলিয়া গেল।

বুঝিলাম—সুকৃতি বিবাহ করিতে চায়, কিন্তু ব্রাহ্মমতে নয়, হিন্দুমতে। সে স্বামী কি বস্তু তাহা জানে, কিন্তু যাহার সহিত বিবাহ হইয়াছিল তাহাকে স্বামীর মত দেখিতে পারে নাই। সে ব্রাহ্মকন্যা, বিধবা এ জ্ঞান তাহার আছে ; কোন একটা নিন্দনীয় কার্য্য করিতে সে ইচ্ছুক নয়। আমি পরপুরুষ, আমাতে সে আসক্ত সন্দেহ নাই, কিন্তু সংযম তাহার ভূষণ।"

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া সুকৃতিকে বলিলাম "সুকৃতি, কাল যাহা বলিয়াছি তাহাই ঠিক তো ?"

সুকৃতি আমার দিকে একটু বিস্মিত হইয়া চাহিল, তাহার চক্ষু যেন বলিয়া দিল, "তুমি কি এখন অন্য কথা বলিতে চাও ?"

আমি বলিলাম "তোমার আর ত কিছু বলিবার নাই ?"

সে ধীরে ধীরে বলিল "বলিবার আর কি আছে ?"

আমি বলিলাম "আজ আমি সর্দ্দারের কাছে যাইতেছি, শুক্রবার কলিকাতায় যাইব।"

"এখানে থাকিবে ত ?"

"থাকিব।"

"তোমার টাকা ফেরত দিব ত ?"

"এখন নয়।"

অধিক কথা কহিতে পারিলাম না। বাহিরে আসিলাম। শুনিলাম মামা আজই কলিকাতায় যাইয়া আমার বিবাহের আয়োজন করিবেন। আহারাদির পর বাহিরের ঘরে তাহার সহিত দেখা হইল। তিনি বলিলেন "বাবাজী, তুমি বড় জ্বালাও।"

আমি বলিলাম "মামা, আমি আজ একবার বাহিরে চলিলাম। বৃহস্পতিবার রাত্রে এখানে আসিব।"

মামা বলিলেন "এখন তোমার কোথাও যাওয়া হয় না।"

আমি বলিলাম "মামা, একটি বিশেষ কাজ আছে, আমাকে যাইতেই হইবে।"

মামা বলিলেন "তবে যাও, দেখিও যেন বিলম্ব না হয়। শুক্রবার প্রভাতে কলিকাতায় রওনা হইব।"

দুজনে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। তারপর আমি বলিলাম "মামা, এ বিবাহে কি আপনার একটুও দ্বিধা বোধ হয় না?"

মামা বলিলেন "একটুও না. এ সব বিবাহ প্রচলিত হওয়াই উচিত. তবে যদি সমাজের উন্নতি হয়!"

"সমাজ এসব বিবাহে অসম্মত কেন বলিতে পারেন?"

"অত্যাচার—অত্যাচার—স্ত্রীজাতির প্রতি নিষ্ঠুরতা।"

"জগতে সর্ব্বাপেক্ষা কাম্য ও বরণীয় কি মামা?"

"সুন্দরী স্ত্রী?"

"তাহার প্রতি এ নিষ্ঠুরতা কি স্বাভাবিক?"

"না, তবে কতকগুলা স্ত্রীবিদ্বেষী পুরুষ শাস্ত্রকার কঠোর নিয়ম প্রচলন করিয়া এই নিষ্ঠুরতাকে প্রশ্রয় দিয়াছে।"

"তাহারা নিয়ম প্রণয়ন করিতে পারে, কিন্তু এত লোক সে নিয়ম মানে কেন?"

"মূর্খ অশিক্ষিত লোক—তাহারা বলহীন।"

"মূর্খ অশিক্ষিত লোকত উদ্দামপ্রকৃতিরই হইয়া থাকে। তাহারা নিয়মকে ভাঙিতেই চায়। তারপর দেখুন. সমাজের নিয়মত অনেক। অনেকেই অনেক নিয়ম ভাঙিয়াছে; এ নিয়মটা এখনও ভাঙিতে পারে নাই কেন?"

"এ নিয়ম ভাঙিতে হইলে অধিক বলের প্রয়োজন, এতদিন কেহ তাহা ভাঙিতে পারে নাই। আমি ইহা ভাঙিব।"

"তুমি ভাঙিতে পার, কিন্তু সমাজে তাহা চলিবে কি?"

"দেখাদেখি লোকে শিখিবে।"

"তাহা হইলে ব্রাহ্মমতে বিবাহ দিবার প্রয়োজন কি?"

"বেশ, হিন্দুমতেই দিব। কলিকাতায় যাইব না।"

মামা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন "আমি কলিকাতায় যাওয়া বন্ধ করিলাম এইখানে থাকিয়াই সব বন্দোবস্ত করিব।"

আমি আর অধিকক্ষণ বিলম্ব না করিয়া যাত্রার উদ্যোগ করিলাম। কেন যাইব বুঝিতে পারিলাম না—অথচ কে যেন আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল। সুকৃতির সহিত বিবাহের কথা যখন স্থির ছিল না, তখন কেবলই তাহার চিন্তা আমার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত করিয়া তুলিত; আজ সে কথা যখন স্থির হইয়া আসিল, তখন সুকৃতির চিন্তা কতক পরিমাণে আমাকে ত্যাগ করিল। যখন পথে বাহির হইলাম, তখন দেখিলাম অন্তরে সর্দ্দারের কথাই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে।

পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটা পুষ্করিণীর তীরে দীর্ঘ একটা বটগাছের নীচে বিশ্রাম করিতে বসিলাম। এখানে লোকজন নাই। বটগাছটির উপর নানা পক্ষীর কলরব শুনিতে শুনিতে তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম। বহুকাল পরে হঠাৎ মনে হইল আমি স্বাধীন, আমি মুক্ত, জগতের কোন মলিনতা আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বসন্ত সন্ধ্যার মরুতহিল্লোলে আমার অন্তর হিল্লোলিত হইতে লাগিল; বাহিরের জগৎ ক্রমশঃ অস্পষ্ট, অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

হঠাৎ দেখিলাম সম্মুখে দীর্ঘাকৃতি পঞ্চকেশ বৃদ্ধ দণ্ডায়মান, তাহার বুকে একখানা ছোরা আমূল বিদ্ধ রহিয়াছে। বুঝিলাম, সে সর্দ্দার—সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। বলিলাম "এ কি গুরুজী, বুকে ছোরা কেন?" সর্দ্দার ধীরে ধীরে উত্তর দিল "নিয়তি যে ওজা, নিয়তি।" ডাকাতের সর্দ্দার, তাহার বুকেই ত ছোরা বসা উচিত।"

আমি বলিলাম "কে মারিল?"

সর্দ্দার বলিল "সে কথা শুনিয়া কাজ নাই, এখন তুই আমার এই টাকাগুলা গ্রহণ কর। আমি এতদিন এগুলা রক্ষা করিয়া আসিতেছি। আর

পারি না। আমি তোকেই সব দান করিলাম।"

আমি টাকার থলি তুলিলাম। তারপর চাহিয়া দেখি সর্দার নাই।

উঠিলাম বসিলাম। দেখিলাম টাকার থলি নাই। কি ভয়ানক স্বপ্ন। নানা ভয় উপস্থিত হইল। আমি উঠিয়া তীরবেগে চলিতে লাগিলাম।

রাত্রি বাড়িতে লাগিল। পথে শৃগাল চীৎকার করিয়া উঠিল। জনশূন্য গ্রামাপথ। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম—একটা লোক তীরবেগে আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। মনে কেমন একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল, চীৎকার করিলাম, "কে যায়?"

লোকটা ফিরিয়া চাহিল না। আমার সাড়া পাইয়া সে ছুটিতে আরম্ভ করিল? আমি বিচার বিতর্কের সময় পাইলাম না। দ্রুতবেগে তাহার অনুধাবন করিলাম।

লোকটিকে ধরিলাম। দেখিলাম সে রতন। বলিলাম "রতন, কোথা যাইতেছিস্ এ সময়।"

রতন বলিল "তোরই কাছে যাইতেছি। তুই আমার উপায় কি করিলি?"

আমি বলিলাম "আমি যাইতেছি, ফিরিয়া চল, এত রাত্রে যাওয়া হইবে না।"

রতন বলিল "আমি আজ যাই, তোরই বাড়ীতে যাইব।"

আমি বলিলাম "তোকে আমার সঙ্গে আসিতেই হইবে।"

আমি তাহার হাত ধরিলাম। সে শিহরিয়া উঠিল। বলিলাম "রতন, সর্দার ভাল আছে, সেদিন তাহার জ্বর হইয়াছিল।

রতন চুপ করিয়া রহিল। আমি বলিলাম "উত্তর দিতেছিস্ না কেন? হঠাৎ মনে হইল যাহা স্বপ্নে দেখিয়াছি তাহাই বুঝি সত্য হয়। দেখিলাম সে যেন স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে, বলিলাম "সর্দার, বাঁচিয়া আছে ত?" তবুও রতন উত্তর দিল না। হঠাৎ সর্দারের ক্রোধে কাঁপিয়া উঠিল। রতনই সর্দারকে খুন করিয়াছে স্থির করিয়া আমি সজোরে তাহার মুখে নাসিকার উপর মুষ্টাঘাত করিলাম।

সে একটা কাতরধ্বনি করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল, উঠিল না। আমি তাহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া তীরবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। রাত্রে আকাশের বাতাস আজ গভীর বিষাদের গান গাহিতেছিল, আজকার আকাশের নক্ষত্রগুলি যেন মৃতদেহের সন্নিকটস্থ শ্মশানপ্রদীপ। পৃথিবী যেন প্রেতভূমি, আমিও যেন একটা প্রেত, বাসনার তীব্র প্রেরণায় এদিকে সেদিকে ছুটাছুটি করিতেছি। সেই দিন মনে হইল আমি নিয়তির অধীন—মাঝে মাঝে মনে হয় আমি স্বাধীন, কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা এখনও লাভ করিতে পারি নাই। সত্য সত্যই আমি কয়েদী, আমার প্রকৃত অবস্থাটা জানাইয়া দিবার জন্যই আমাকে এখানে রাখা হইয়াছে। যিনি রাখিয়াছেন তাঁহার বিধান মানিতেই হইবে, তবে আর অনিচ্ছায় মানিয়া লাভ কি? স্বেচ্ছায় সেই বিধান মানিয়া চল, কিছুতে যেন আত্মগ্লানি না আসে, আমি এই নিয়মেই চলিতে চেষ্টা করি।

নিজের কথা কেমন আপনাআপনি বাহির হইয়া পড়ে। এখনও যে অহঙ্কারের সীমা নাই। আমি কর্ত্তা, আমি করিতেছি এই যে কর্তৃত্ব প্রতিপদে কর্ম্মফলের জন্য বাসনা তীব্র করিয়া তুলিতেছে। ওগো কর্ম্মফলের কামনা, তুমি বিদায় লও, তুমিই মানুষের জন্য নূতন বাসনার সৃষ্টি কর। বাসনার তর্পণের জন্যই মানুষ নূতন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। এই কর্ম্মই বন্ধন। এই কর্ম্মই যখন স্বভাব, তখন আমার আনন্দ, যখন কর্ম্ম নাই, তখন আমিও নাই; আমি কর্ম্মত্যাগ করিতে চাই না—লক্ষ জন্ম কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত আছি, আমাকে কিছু যেন আকাঙ্ক্ষা না করিতে হয়, যেন লাভের জন্য কর্ম্ম না করি এই কর্ম্মেই প্রকৃত আনন্দ। এই আনন্দের জন্যই আমি লালায়িত। যখন কিছু লাভ করিতে চাই, তখনই বিচার, বিতর্ক, যখন নিষ্কাম, তখন বিচার নাই, বিতর্কও নাই।

তখনই স্থিরতা, তখনই বিশ্বাস, তখনই ভক্তি, তখন সবই ভাল, সবই সত্য, শিব ও সুন্দর। যখন লাভ লোকসান করিতে বসি তখনই অস্থিরতা সন্দেহ, বিদ্বেষ, তখন সবই মন্দ, সবই অসত্য, অশিব ও কুৎসিত। মনের রাজ্যে যখন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছি, তখনই বণিজ্যে লক্ষ্মীর বসতি হইয়াছে, বণিক রাজছত্র লাভ করিয়াছে, সর্ব্বত্র বণিকেরই প্রাধান্য। বুদ্ধি যখন স্থির তখন লক্ষ্মী পদসেবায় নিরত, ধর্ম্ম রাজছত্র লাভ করিয়াছে, সর্ব্বত্র ধর্ম্মেরই প্রাধান্য।

আর এখন বাজে কথায় প্রয়োজন নাই। আমি যে আনন্দস্বভাব তাহা বেশ তখনও বুঝিতে পারি নাই! ছেলেবেলায় একবার তাহা বুঝিয়াছিলাম, কৈশোরেও সে জ্ঞান ছিল। তারপর সুকৃতির প্রতি আসক্ত হইলাম। আসক্তি হইতে বাসনা, বাসনা হইতেই কর্ম্ম। ছেলেবেলাকার আবেগের আতিশয্যে সুকৃতিকে ছাড়িলাম, কিন্তু কর্ম্মসূত্র ছিন্ন হইল না। আমি যে আনন্দস্বভাব তাহা ভুলিলাম, বুদ্ধি অজ্ঞান তমসায় আচ্ছন্ন হইল। তখনকার কর্ম্মে স্বাধীনতা ছিল না। মনে হইত সব কাজই বাধ্য হইয়া করিতে হইতেছে।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলাম। ভাবিলাম রতনকে প্রহার করিয়া ভাল কাজ করি নাই। ফিরিলাম। গাছের ফাঁক দিয়া চাঁদের আলো মাটীতে পড়িয়াছিল। দেখিলাম রতন নিঃশব্দে পড়িয়া আছে—থাকিয়া থাকিয়া অনুচ্চস্বরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। আমি তাহাকে তুলিলাম, বলিলাম, "রতন, আমি তোকে মারিয়া বড় অন্যায় করিয়াছি, আমাকে মাপ কর।"

রতন গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে হইল যেন এই দুঃখতাপপীড়িত বিশ্বের করুণ ক্রন্দন রতনের বুক বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইতেছে। বলিলাম "কোথায় লাগিয়াছে, এখনও কাঁদিতেছিস্ কেন?" আমার স্নেহ তাহার অন্তরের স্নেহকে আকর্ষণ করিল। রতন আমার পা দুটা জড়াইয়া ধরিল, বলিল "তুই আমাকে খুন কর ভাই। আমি সর্ব্বনাশ করিয়াছি।" চক্ষের সম্মুখে যেন দেখিতে পাইলাম সেই দীর্ঘ-কেশ, বলিষ্ঠ সর্দ্দার দাঁড়াইয়া আছে? তাহার বক্ষে আমূলবিদ্ধ একটি ছুরিকা ও পার্শ্ব দিয়া শোণিত প্রপাত নির্গত হইতেছে। বলিলাম "কি রে রতন সর্দ্দারকে মারিয়াছিস্ নাকি?"

রতন চুপ করিয়া রহিল।

বলিলাম "চুপ করিয়া রহিলি যে?"

রতন আমার পা দুটী জড়াইয়া ধরিল, বলিল "ভাই আমাকে রক্ষা কর। আমি সর্ব্বনাশ করিয়াছি।"

বলিলাম "কি করিয়াছিস্?"

রতন বলিল "আমি সর্দ্দারকে খুন করিয়াছি, আমাকে মারিয়া ফেল, ফাঁসি যাও। আর আমি বাঁচিব না। বাঁচিতেও চাই না। আমাকে রক্ষা কর।"

সেই সময়ে আমিও তাহার কথাটার অর্থ বুঝিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। বুঝিলাম রতন জীবনসম্বন্ধে আর কোন আশা-ভরসা না দেখিয়াই জীবন ত্যাগ করিতে চায়—তবে তাহার বাঁচিবার ইচ্ছা যে একেবারে নাই বলা যায় না। "আমাকে রক্ষা কর" এই কথাটাই বুঝাইয়া দেয় যে মরার চেয়ে বাঁচাকেই সে ভালবাসে।

ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলাম একটা দীপ্ত নক্ষত্র তাহার রশ্মিগুলি আমাদের দিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে। সে যেন এই পৃথিবীর মধ্যে দুইটি মানবকে তাহার বিশেষ আলোচনার বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। মধ্য রাত্রে পথের উপর দুইটি প্রাণী—একজন অপরে আত্ম-সমর্পণ করিতে চায়। এই কামনা ছাড়া তাহার অন্য কোন কামনা নাই। সে আজ তাহার সকল পাপ নিঃসংকোচে প্রকাশ করিয়া তাহার জন্য ক্ষমা বা দণ্ড গ্রহণ করিয়া চিরদাস হইয়া থাকিতে চায়।

সেই শুভ রাত্রে জনশূন্য পথে কাহারও সাড়াশব্দ ছিল না। বসন্তের আকুল উতলা বাতাস আজ মন্ত্রের মত এখানে সেখানে প্রতিহত হইতেছিল। ভাবিলাম—মানুষও অন্ধমত্ত। উদ্দেশ্য ক্ষণিক আসক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আজ এর উদ্দেশ্য কাল তাহার পরিবর্ত্তন; এই পরিবর্ত্তনই জগৎ। যাহা ক্ষণিক পরিবর্ত্তনশীল তাহাকেই চিরস্থায়ী ও নিত্য মনে করিয়া আমরা ভ্রান্ত; আবার যাহা ক্ষণিক, তাহা চিরস্থায়ী নয় মনে করিয়া তাহার অনাদর করাও পাপ, কেন না যতক্ষণ সংসারে আছি ততক্ষণ যতই তাহাকে অনিত্য বলিয়া অনুমান করি না কেন, তাহা আমার কাছে সত্য এবং আমি তাহার নিয়ম মানিয়া চলিতে বাধ্য। আবার বাধ্য হইয়াও কোন কাজ করিতে আমি প্রস্তুত নই। আমি স্বেচ্ছায় সব কাজ করিতে চাই।

আবার রতনের কাতরোক্তি শুনিলাম "আমাকে রক্ষা কর ভাই আমাকে রক্ষা কর।" সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা আমার অন্তরে উদিত হইল, "ভগবানকে ডাকিয়া সাড়া পাই নাই, তুমি আমাকে রক্ষা কর।" আমি ক্রোধ ভুলিলাম, সর্দ্দারের শোক অগ্রাহ্য করিলাম, বলিলাম "রতন, তুই যখন আমার শরণাপন্ন হইয়াছিস্ তোকে রক্ষা করিব। বল্, তোর ভয় কিসের? পুলিশকে ভয় করিস্?

"না।"

"তবে কি পাপের ভয়?"

"হাঁ ভাই, আমি দেবতাকে খুন করিয়াছি।"

"দেবতারা খুন হইবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করেন; তুই অনেক খুন করিয়াছিস্, অনেক পাপ করিয়াছিস্, তোকে সৎপথে আনিবার জন্যই তিনি তোর হাতে প্রাণ দিয়াছেন। তুই ভাল হ', তোর সব চিন্তা কাটিয়া যাইবে।"

রতনকে উপদেশ দিলাম বটে, কিন্তু একথাও মনে হইল যে রতনের চেয়ে ভাল হইয়াও চিন্তার হাত এড়াইতে পারি নাই। হায়! চিন্তার হাত কেমন করিয়া এড়াইব। যতক্ষণ স্বার্থের পিছনে ছুটিতেছি ততক্ষণ চিন্তা থাকিবেই।

হঠাৎ মনে হইল—রতন আমার চেয়ে পাপী নয়। সকলেই আনন্দ চায়। সে আনন্দ পাইবার জন্য সর্দ্দারকে খুন করিয়াছে। আমিও আনন্দের জন্য চুরি ডাকাতি করিয়াছি। তখন বুঝি নাই আনন্দ ও খুনোখুনি দুইটা বিপরীত জিনিস। খুনোখুনি করিয়া প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে, কিন্তু বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করা যায় একথা এখন মনে হয় না।

যাই হউক, সর্দ্দার খুন হইল। যত উদ্দেশ্য লইয়া ছুটাছুটি করিলাম কোনটাই সিদ্ধ হইল না। নিয়তির কার্য্য রোধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই। আমি স্বেচ্ছায় নিয়তির বশ্যতা স্বীকার করিলাম, বলিলাম যাহা করিবার তাহা করিব, আমি কোন বিধি বা কোন নিষেধের বশীভূত নই, নিয়তি যাহা করাইবে তাহাই করিব।

রতনকে বলিলাম "কখন্ খুন করিলি?"

"আজ সন্ধ্যার সময়।"

"কেহ সে কথা জানে?"

"না।"

"কেন খুন করিলি?"

"টাকা পাইলাম না বলিয়া।"

"খুন করিয়া টাকা পাইয়াছিস্?"

"না।"

"লক্ষ্মী খুনের কথা জানে?"

"না, লক্ষ্মী বাড়ীতে নাই। সে তাহার মাসতুতো বোনের বিবাহ দেখিতে গোবিন্দপুরে চলিয়া গিয়াছে।"

"তুই একবার আমার সঙ্গে চল।"

"কোথায়?"

"তোদের বাড়ী।"

"কেন?"

"প্রয়োজন আছে।"

"আমি পারিব না।"

"তবে তুই আমার বাড়ীতে চলিয়া যা। বলিস্ আমি তোকে পাঠাইয়া দিয়াছি।"

এই বলিয়া দুইজনে ছাড়াছাড়ি হইলাম। ভাবিলাম সর্দ্দারের টাকাগুলা আনিতে হইবে, আমার উপর সে যে কাজের ভার দিয়াছে তাহা করতেই হইবে।

তাড়াতাড়ি চলিলাম। সর্দ্দারের গুপ্তধন এখন সংগ্রহ না করিলে হয়ত অপর কেহ তাহা অপহরণ করিবে। অন্ধকার রাত্রি; পথে জনমানব দেখিতে পাইলাম না।

লোকজন আসিবার পূর্ব্বে আমাকে সর্দ্দারের গুপ্তধন লইয়া এ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে, নচেৎ বিপদের সম্ভাবনা।

ক্রমশঃ সর্দ্দারের গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলাম। ভাবিলাম—হয়ত রতন মিথ্যা কথা বলিয়াছে। দ্বারে আঘাত করিয়া দেখিলাম—তাহা উন্মুক্ত; ভিতরে প্রবেশ করিলাম। এ ঘর ও ঘর খুঁজিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না।

অবশেষে সর্দ্দারের কক্ষের নিকট আসিয়া দেখিলাম—দ্বার উন্মুক্ত। দেশলাই আনিয়া দেখিলাম ঘরের মধ্যে একটা প্রদীপ আছে, প্রদীপে একটু তৈল ও সলিতাও রহিয়াছে। প্রদীপ আনিয়া এদিকে সেদিকে ঘুরিলাম। কোথাও হত্যাকাণ্ডের চিহ্ন দেখিলাম না।

তাড়াতাড়ি এঘর সেঘর খুঁজিয়া একখানা সাবল সংগ্রহ করিলাম। সর্দ্দার যে খাটে শয়ন করিত তাহার নীচে মাটী খুঁড়িতে আরম্ভ করিলাম। রাত্রি গভীর হইয়া আসিল। ক্রমশঃ শেষ রাত্রির লক্ষণ দেখা দিল। মনে করিলাম—লোকজন আসিবার পূর্ব্বে আমাকে সর্দ্দারের গুপ্তধন বাহির করিয়া এস্থান ত্যাগ করিতে হইবে, নচেৎ বিপদের সম্ভাবনা।

যখন পূর্ব্বদিকে উষার আলোক দেখা দিল, তখন আমার সাবলটি একটি কঠিন বস্তুতে আহত হইল। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম কঠিন বস্তুটি একটি ঘড়া; আমি তাহা উত্তোলন করিলাম। তারপর তাড়াতাড়ি গর্ত্তটা বন্ধ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। ক্রমশঃ আলোক স্পষ্টতর হইতে লাগিল, আমি ঘড়াটি হাতে করিয়া ক্ষিপ্রপদে বাটীর বাহিরে আসিলাম।

পথে লোকজন ছিল না। কিছু দূর আসিয়া যাহাদের দেখিলাম তাহারা আমাকে কিছুমাত্র সন্দেহ করিল না। আমি একটা পুষ্করিণীর তীরে বসিয়া ঘড়াটা মাজিয়া তাহার উপর একখানি গামছা জড়াইয়া এমন ভাবে সেটিকে মাথায় তুলিয়া লইলাম যে লোকে দেখিলে যেন মনে করে আমি এক-ঘড়া জল লইয়া যাইতেছি।

হঠাৎ একজন লোক জিজ্ঞাসা করিল "কিরে ভজা, যাইতেছিস কোথায়?"

আমি বলিলাম "বাড়ী যাইতেছি?"

"কবে আসিবি?"

"শীঘ্রই আসিব।"

লোকটা আমার পরিচিত। সে অপর কোন প্রশ্ন না করিয়া চলিয়া গেল।

বুঝিলাম আমি যে কাল রাত্রে এখানে ছিলাম তাহার একজন সাক্ষী রহিয়া গেল। যাহাই হোক্ আমি ক্ষিপ্রপদে শ্বশুরালয়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় রৌদ্রদগ্ধ ক্লান্ত শরীরে ঘড়াটা হাতে করিয়া দ্বারে করাঘাত করিলাম।

দ্বার খুলিয়া গেল। আমি যে ঘরে শয়ন করিতাম সে ঘরে খাটের নীচে ঘড়াটা রাখিলাম। তারপর নিভৃতে মুক্তিকে ডাকিয়া আনিবার চেষ্টা করিলাম। চেষ্টা বিফল হইল। তাহার সহিত বিবাহ হইবার কথাটা যেদিন হইতে ঠিক হইয়াছে, সেই দিন হইতেই মুক্তির সহিত নিঃসংকোচে কথা কহিতে পারি নাই, সেই দিন হইতেই কেবল মনে

হইত সে পরস্ত্রী, ব্রাহ্মণকন্যা, বিধবা ; তাহার সহিত নিভৃতে কথা কওয়া আর আমার পক্ষে পূর্ব্বের মত সোজা নয়। পূর্ব্বে ভাবিতাম সে মেয়ে আমার কন্যা, আদরে ভগিনী, যত্নে কুটুম্বিনী, সেবায় দাসী —তাহাকে পত্নীরূপে পাওয়া ভাগ্যের কথা। পত্নী-হীন অভাগা আমি তাহাকে পত্নীরূপে পাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিতাম। অন্যরূপও তখন চোখে পড়িত। এখন সেই পত্নীরূপটা এতই আমাকে ব্যাকুল করিয়াছিল যে আমি তাহার পত্নীরূপ দেখিবার জন্য নিজে তাহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছি। এখন তাহাকে বড় ছোট বলিয়া মনে হইল ; সত্যই ত, যাহার সঙ্গে একাধিক সম্বন্ধ বর্ত্তমান তাহার সঙ্গে শুধু একটি সম্বন্ধ রাখিলে আর তাহাকে পূর্ব্বের মত বড় মনে হয় না।

অপরাহ্নে বলিলাম সুকৃতি আমার খাটের নীচে একটা বড়া আছে, উহার মধ্যে টাকা আছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস, তুমি বড়াটা ভাল জায়গায় রাখিতে পার ?"

সুকৃতি বলিল "উহার মধ্যে কি আছে ঠিক্ জান না ?"

মনে হইল, যেন সে হাসিয়া ফেলিবে, কিন্তু হাসিল না। তাহার সংযমবন্ধন অতি দৃঢ়। আমি বলিলাম "পারত একবার দেখিও ভিতরে কি আছে।"

সুকৃতি বলিল "আজ রাত্রে দেখিব।"

কিছুক্ষণ দুইজনে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তারপর বলিলাম "আমাকে দেখিতেছি না কেন ?"

সুকৃতি বলিল "তিনি কলিকাতায় গিয়াছেন "

"কেন ?"

"বিবাহের পুরোহিত দেখিবার জন্য।"

এখন বুঝিলাম—সুকৃতি আমার মত ভীরু নয় —তাহার বাকো সংকোচ নাই—সে পূর্ব্বের মত এখনও দৃঢ়। তাহার সংযম ও দৃঢ়তা নারীস্বভাবের পক্ষে অত্যধিক—আমার দৃঢ়তা ও সংযম তাহার কাছে হার মানিল। এই বার বুঝিলাম সুকৃতি আমার চেয়েও বড়—সর্ব্ববিষয়ে বড়।

রাত্রে গৃহকার্য্যের শেষে সে আমার গৃহে প্রবেশ করিল। আমি বড়াটা বাহির করিয়া তাহার মুখের আবরণ ভেদ করিয়া দেখিলাম ভিতরে মোহর, সোণা, রূপা মিলিয়া প্রায় ৫০।৬০ হাজার টাকার জিনিস রহিয়াছে।

আমি বলিলাম "সুকৃতি, এ সব তোমাকে রাখিতে হইবে।"

সুকৃতি বলিল "এত টাকা কোথায় পাইলে ?"

আমি বলিলাম "টাকাগুলো আমার।"

সুকৃতি বলিল "এগুলো তুলিয়া রাখি ?"

আমি বলিলাম "হাঁ, রাখিবে বৈ কি ?"

সে রাত্রে আর অন্য কোন কথা হইল না। সুকৃতি টাকা লইয়া চলিয়া গেল। আমি শয়ন করিলাম। কেবলই সর্দ্দারের কথা অন্তরে জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

প্রভাতে উঠিয়া রতনকে বলিলাম "লক্ষ্মীকে এখানে লইয়া আয়।"

রতন বলিল "আটদিন পরে তাহাকে আনিব ; তাহার সঙ্গে এইরূপ কথা আছে।"

কথা কহিলাম না। নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে এদিকে সেদিকে ঘুরিতে লাগিলাম। হঠাৎ মনে হইল—আমি যেন অসাধারণ একটা প্রাণী—পৃথিবীর লোকের মধ্যে আমি একটি স্বতন্ত্র জীব—কেহ আমার আপনার নয়। পূর্ব্বে সকলকে আপনার মনে করিয়া তাহাদের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছিলাম এখন যত আপনাকে চিনিতেছি ততই বুঝিতেছি আমি একা—সৃষ্টির যে রূপ আমি কল্পনা করিয়াছি, তাহাই আমার বিশ্ব, সে বিশ্বের দ্রষ্টা আমি, তাহার সৃষ্টিকর্ত্তাও আমি—আমি যতদিন বিশ্ব ততদিন—আমি যখন নাই বিশ্বও তখন নাই। এ বিশ্বে আমি কাহারও জন্য আসি নাই, সবাই আমার জন্য। ইহাদের মধ্যে আপ-

নাকে হারাইয়া ফেলা কোনমতেই উচিত নয়। দুই লইয়া এই বিপুল সৃষ্টি—এক আমি আর এক এই বিশ্বজগত। কত জীবের সঙ্গে মিলিলাম। কেহ ভ্রাতা, কেহ ভগ্নী, কেহ পিতা, কেহ মাতা, কেহ কুটুম্ব, কেহ আত্মীয়। তাহার পর সকলে যে যাহার পথে সজ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, ছুটিয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে তাহাদের সঙ্গে দেখা হয়—তখনই ভালবাসা, স্নেহমায়া, সংসার, তখনই বন্ধন। সংসারে যতদিন স্নেহ, মায়া; ভালবাসা ততদিন বন্ধনের জ্বালা বুঝিতে পারা যায় না। যখন স্নেহ, মায়া ও ভালবাসার অভাব তখনই বন্ধনটার জ্বালা বুঝিতে পারা যায়। আমি সংসারের বন্ধন ও ভালবাসা দুইই বুঝিয়াছি। দুইই বন্ধন —আমি বাঁধন ছিঁড়িতে চাই; আমি চাই মুক্তি।

রতনকে বলিলাম "রতন সর্দ্দারকে খুন করিলি, টাকাও পাইলি না।"

রতন বলিল "আর ভাই টাকার কাজ নাই।"

বলিলাম "কেন রে সন্ন্যাসী হবি নাকি?"

"পেটের জ্বালা না থাকিলে হইতাম। ভাই দুবেলা দুটি যাহাতে খাইতে পাই, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দে। আমি আর কিছুই চাই না।"

এই কথাগুলা বলিতে বলিতে রতনের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। তাহার মুখের দিকে চাহিলাম—দেখিলাম তাহার আকৃতি পূর্ব্বাপেক্ষা শান্ত। বলিলাম "রতন, সর্দ্দারের সব টাকা আমার কাছে।" রতন আমার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম অনুতাপের অশ্রুজলে তাহার অন্তরের লোভ ক্রোধ হিংসা যেন ধৌত হইয়া গিয়াছে। বলিলাম "টাকার মালিক আমি, দেখিস্ খুন করবি না ত?"

রতন কথা কহিল না। বলিলাম "দেখ রতন সর্দ্দারের টাকা তোরই পাওয়া উচিত। সে টাকা তুইই পাবি।"

রতন বলিল "আমি বড় পাপী; টাকা লইয়া কি করিব, টাকাতে কি পাপ যায়?"

আমি বলিলাম "রতন, তোর পাপ কোথায়?"

রতন বলিল "যে আমাকে মানুষ করিয়াছে, তাহাকেই আমি খুন করিয়াছি।"

এই কথা বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি বলিলাম "খুন করা তোর পাপ নয়। লোভই তোর পাপ; অত লোভ থাকিলে আমিও খুন করিতাম। লোভটা আর তোর আছে কি?"

রতন বলিল "না ভাই, আর লোভ করিব না।"

আমি বলিলাম "যা, আর কখনও দুঃখ আসে না যেন। তোর পাপ নাই, ফূর্ত্তি কর। ভাল হও, পাপ করিয়াছি বলিয়া কাঁদিলে হইবে কি?"

রতন বলিল "তোর কথা শুনিলে আশা হয় ভাই, তুই যাহা বলিবি, তাহাই করিব।"

আমি বলিলাম "আগে লক্ষ্মীকে লইয়া আয়; পরে অন্য কথা হইবে। আজ আমি কলিকাতায় যাইব।"

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মাকে বলিলাম "মা আমি কলিকাতায় চলিলাম।"

মায়ের আমার কিছুতেই অমত নাই। তিনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার স্নেহমাখা মুখ দেখিলে পাষাণহৃদয়ও সরল হইয়া উঠে। তিনি পরের ছেলেকে সহজেই আপনার করিতে পারেন। সেইজন্যই বোধ হয় ভগবান তাঁহাকে পুত্র দান করেন নাই।

সেদিন মাকে দেখিয়া বুঝিলাম—ভগবান্ আছেন তিনিই সর্ব্বকার্য্যে আমাকে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, আমি তাঁহারই কাজ করিয়াছি।

মাকে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলাম। আহারাদির পর কলিকাতায় যাইবার উপক্রম করিতেছি এমন সময় শুনিলাম—মামা আসিয়াছেন।

মামাকে দেখিয়াই বলিলাম "মামা, কলিকাতায় যাইতেছিলাম, আর ত যাওয়া হয় না।"

মামা বলিলেন, "না আর কলিকাতায় যাওয়া হয় না—পরশ তোমার বিবাহ আমি ঠিক করিয়াছি।"

আমি বলিলাম "ব্রাহ্মণ পাইয়াছেন?"

"পাইয়াছি।"

"কত দক্ষিণা লইবে?"

"দক্ষিণাটা কিছু বেশী দিতে হইবে।"

"কত?"

"একশত টাকা।"

"সে ব্রাহ্মণ নয়।"

"নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ"—সর্ব্বেশ্বর স্মৃতিতীর্থের পুত্র।"

"সে লোভী, টাকার লোভে এই বিবাহ সম্পন্ন করিবে।"

"অত দেখিতে গেলে চলে না।

মামা আমি ব্রাহ্মণের পরিচয় বোধ হয় চাহিতাম না। সুকৃতি সে পরিচয় চাহিবে, অতএব আমিও চাহিতেছি।"

"তবে এ বিবাহের আশা ছাড়িয়া দাও।"

"আচ্ছা সুকৃতিকে এসব কথা জানাইয়া দেখুন সে কি বলে। "তাহাকে সব কথা বলিবার প্রয়োজন কি?"

"তাহাকে সব কথা বলিলেই হইবে। তুমি না বল, আমি বলিব। কোন মতে তাহাকে আমি প্রতারণা করিতে চাই না।"

মামা ধীরে ধীরে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

• • • •

এই পর্য্যন্ত বলিয়া করেদী থামিল, বলিল "আজ এই পর্য্যন্ত।

আমি বলিলাম তাহা হইতে পারে না কাল আপনি চলিয়া যাইবেন, আর গল্প শোনা হইবে না।

করেদী বলিল "আচ্ছা তবে শুনুন, আমার কথা শেষ করি।"

পাগল

(শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী)

ওগো পথিক, ঐ ত তোমার সম্মুখে ঐ পথ।
এঁকিয়ে নগর, সেরিয়ে নদী, ছাড়িয়ে পর্ব্বত—
এই পথই ত গেছে বয়ে সুদূর সাগর-তীরে
বেলাভূমির বালির বুকটি চিরে!
এই পথই ত গেছে হোথায় হাটের পাশটি দিয়ে,—
বেচাকেনার হাজার বোঝা নিয়ে—
গরু-ঘাটাটির একটু বাঁয়ে বেঁকে;—
টেরই পাবে দেখে',
আরো অনেক হাটের যাত্রী সেদিক পানে চলে—
কেউ-বা একা কেউ-বা দলে দলে;
—সেথায় তুমি যাচ্ছ বুঝি কাজে?
ওকি পথিক, উত্তর যে দিলে কথার মাঝে!

না-হয় সেথায় নাই-বা গেলে—এই পথেরি ধারে,
একটু আগেই দেখ্‌তে পাবে, কত-না লোক
চল্‌ছে সারে, সারে,
পূজার ডালা সাজিয়ে ফলে-ফুলে
জগন্মাতার জয়ধ্বনি তুলে';
ঘোটেই তোমায় খুঁজে' নিতে হবে না মন্দির—
এত লোকের ভিড়!
ওকি, আবার! সেথাও যেতে নাইক বুঝি মন!
আচ্ছা, শোন'—সোজা চলে' আরো খানিকক্ষণ,
দেখ্‌বে একটা মস্ত বড় বাড়ী—
রাস্তা হ'তে রসি দুয়েক ছাড়ি,

চার ধারে তার কাউয়ের গাছের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা—
চিন্‌তে পারবে, ঘুরছে ফিরছে চেঁচাচ্ছে ছাত্রেরা।
সেইটা তোমার নব্য ন্যায়ের 'বিরাট'-বিদ্যালয়।
—চুপ করে' যে রইলে বড়—সেথাও তবে নয়!
তবে তুমি যাচ্ছ কোথায় আর?
তার পরে ও প্রকাণ্ড মাঠ, পাহাড়তলীর ধার—
সে যে অনেক দূরে—
সন্ধ্যা হয়ে আস্‌বে তোমার মাঠ্‌টা যেতে ঘুরে'!

সেথায় যত ইতর লোকের বাস,—
চাষী, মজুর, ছোট কাজেই ব্যস্ত বারমাস!
কারো ঘরে আপনি খাবার অন্নটুকু নাই—
মাথা গোঁজার মিল্‌বে নাক ঠাঁই।
ওকি! কোথায় চল্লে তাড়াতাড়ি?
সত্যি সেথায় যাবে নাকি! এ যে দেখি
বিষম বাড়াবাড়ি!
আরে, আরে, শোন'—
চল্ল তবু! নিশ্চয়ই এ পাগল হবে কোন!

সোসিয়ালিজ্‌ম্ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

সোসিয়ালিষ্টদের ধারণা-যে তাঁহারা জগতের দুঃখ নিবারণের এক উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। এখনও জগতের কোনও দেশে ইহা তেমন ভাবে খাটাইয়া দেখা হয় নাই বলিয়া তাঁহারা তাঁহাদের পন্থাটী লইয়া আরও বেশী করিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন। বিপক্ষবাদীরা কিন্তু প্রথমেই মত গালাগালি দিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা ইঁহাদের ঈর্ষাপরায়ণ, পরধনলোলুপ আলসের দল প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছেন—

What is a communist? One who hath yearnings
For equal division of unequal earnings.
Idler or bungler, or both, he is willing
To fork out his penny and pocket your shilling.

কিন্তু যে সমস্ত মহর্ষিকল্পলোকের নাম সোসিয়ালিজ্‌মের সহিত সংশ্লিষ্ট তাঁহাদের মহত্বের কথা ভাবিলে একজন সোসিয়ালিষ্ট বা কম্যুনিষ্টকে এত নীচ মনে করিতে অন্তরে ব্যথা বোধ হয়। রিপাব্লিক নামক গ্রন্থে প্রথমে এই মত প্রচার করেন। মনুষ্য-সমাজ বিশ্ব খাঁটী পথ কি তাহা চাহিয়া না দেখিয়া ভ্রান্ত পথে হাঁটিয়া আজ চোখের জলে ভাসিতেছে। সার টমাস মূর তাঁহার ইউটোপিয়া নামক গ্রন্থে জগতে স্বর্গ রচনার কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। রবার্টওয়েন অবশ্য সর্ব্বপ্রথমে ইহার মহৎ আদর্শ সমগ্র জগতের সম্মুখে ধরিয়া তাহার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। এবং সেইজন্য নিজের প্রভূত ধনসম্পত্তি জলের মত ব্যয় করেন। তিনি দরিদ্র ছিলেন না, এবং পরধনলোলুপ হইয়া নিজের ধন উড়াইয়া দেন নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী সোসিয়ালিষ্টদের মধ্যেও অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রাশিয়ার টলষ্টয় ও ক্রোপট্‌কিনের সামনে সমগ্র জগতের মাথা নত হইয়া আসিবে। এতগুলি মহাত্মার নাম যাহার সহিত সংশ্লিষ্ট সে মতটাকে জগতে ভিক্ষুকের দস্যুবৃত্তির ওজর মাত্র বলিয়া ঘৃণায় উড়াইয়া দিতে পারি না।

সোসিয়ালিষ্টদের সাধারণতঃ তিনটী আখ্যা আছে। কম্যুনিষ্ট, সোসিয়ালিষ্ট ও এনার্কিষ্ট (Communist, Socialist, Anarchist) এই তিনটী নামের মধ্যে কার্য্যগত বিশেষ কোন পার্থক্য আছে কিনা বুঝা কঠিন। তবে অর্থ এইরূপ করা যাইতে পারে:—কম্যুনিষ্ট, অর্থাৎ যাহারা ব্যক্তিগত

সম্পত্তি নষ্ট করিয়া সমগ্র কম্যুনিটির একযোগে সম্পত্তির অধিকার চাহে। সোসিয়ালিষ্ট, যাহারা ইহার সহিত সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থা বিবাহাদি সমেত নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহে। আর এনার্কিষ্ট, যাহারা ইহার সহিত আর একটী বাপার চাহে যাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে রাষ্ট্রীয় শক্তির অবসান। তাহাদের মতে জগতে মানুষের জানে যত প্রকার শাসন পদ্ধতি হইতে পারে তাহা করিয়া দেখা হইয়াছে, কিন্তু কই মানুষের দুঃখ কষ্টের ত লাঘব হইল না। এতদিন ধরিয়া শাসন পদ্ধতিকে যে ক্রমে জটীল হইতে জটীলতর করিয়া তোলা হইয়াছে তাহাতে কি ফল হইয়াছে? রকম রকম বিভাগ খুলিয়া অসংখ্য অসংখ্য কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া এ পণ্ডশ্রমের দরকার কি?

বাস্তবিক কিন্তু সোসিয়ালিষ্টদের এ তিন বিভাগের মধ্যে উদ্দেশ্যগত বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। অনেক সময় অনেকে, মত যাহাই থাকুক, আইনের হাত এড়াইবার জন্য এনার্কিষ্ট না হইয়া সোসিয়ালিষ্ট বা কম্যুনিষ্ট হন। অনেকে আবার সোসিয়ালিষ্ট মতের এত বেশী গোঁড়া, যে বর্ত্তমান শাসননীতি ঠিক থাকিতে সোসিয়ালিজম্ প্রবর্ত্তন সম্ভবপর নয় বিবেচনা করিয়া, উত্তেজনার অন্ধ হইয়া কার্য্যত এনার্কিষ্ট হইয়া পড়েন।

সোসিয়ালিষ্টরা সাংখ্যকারের ন্যায় জগতে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া স্থির করিয়া লন নাই। তাঁহারা দুঃখ কষ্টের দুইটী কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন,—(১) অন্ন সমস্যা, (২) নারী সমস্যা। তাঁহাদের মতে জগতের সমস্তপ্রকার দুঃখ কষ্টের মূল মাত্র ঐ দুইটী সমস্যার ভিতর রহিয়াছে। তাঁহারা জগতের সমস্ত শাসক সম্প্রদায়কে ডাকিয়া বলিতেছেন 'যতপ্রকার শাসন পদ্ধতির বিধিব্যবস্থা ত করিয়া দেখিলে, Autocracy, Theocracy, Oligachy, Aristocracy, Democracy সবইত জগতে প্রতিষ্ঠা করিয়া দেখিয়াছ; কিন্তু মানুষের দুঃখ কষ্টের নিরাকরণ হইয়াছে কি? একদিকে অত্যাচার, নিষ্ঠুর মনুষ্যত্বহীন কঠোরতা, আর একদিকে চুরি, জুয়াচুরি, মিথ্যা, প্রতারণা, ডাকাতি, নরহত্যা, লাম্পট্য প্রভৃতি কি কোন রকমে কোনদিন দূর করিতে পারিয়াছ? তাঁহাদের মতে মানুষের জীবনধারণের জন্য যে সব জিনিষের উপর তাহার স্বাভাবিক আকর্ষণ, যে সমস্ত কার্য্য করিতে তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, সে সমস্ত হইতে কৃত্রিম আইনের বলে তাহাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া, তাহার জীবনের শূন্যতা অপূর্ণ রাখিয়া কোনদিনই কোন শাসন পদ্ধতিই তাহাকে পাপ ও অত্যাচার অথবা নির্দ্দয়তার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না।

একথাটী বাস্তবিকই ভাবিয়া দেখিবার। আলেকজান্দার ডুমার 'কাউণ্ট অব মণ্টে ক্রিষ্টো' নামক গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম আবে ফেরারা ও এডমন্দ দাঁতে অন্ধকার করা গৃহ হইতে পলায়নের জন্য এক সুরঙ্গ কাটিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া দ্বিতীয় সুড়ঙ্গ কাটিবার কল্পনা করিতেছেন। অনেক প্ল্যান আঁকিবার পর আবে ফেরারা বলিলেন 'কিন্তু দ্বিতীয় সুড়ঙ্গ যেখানে শেষ হইবে সেখানে যে একজন প্রহরী দাঁড়াইয়া থাকে!

এডমন্দ।—প্রহরীর মাথায়—এক বাড়ি মারিয়া আমরা পলায়ন করিব।

আবে। তাই যদি মনে কর, তবে এত পরিশ্রম করিবারই বা দরকার কি। যে প্রহরী তোমার খাদ্য দিতে আসে তাহার মাথায় এক বাড়ি মারিয়া তাহাকে খুন করিয়া তাহার পোষাক পরিয়াও চলিয়া যাইতে পার।

এডমন্দ।—একথা এতদিন ঠিক—মনে হয় নাই।

আবে। তা নয়। নরহত্যা করা মানুষের নিতান্ত স্বভাববিরুদ্ধ। সমস্ত উপায় ব্যর্থ হইলে, নিতান্ত দায়ে ঠেকিয়া একেবারে শেষ অবলম্বন স্বরূপ ভিন্ন মানুষ ইহা করিতে পারে না।

অবশ্য এখানে আকস্মিক ক্রোধের উত্তেজনায় উন্মত্ততা, ধর্ম্মের ভ্রান্তি, প্রভৃতি ধরা হইতেছে না। আর তাহা হইলেও বুঝিয়া দেখা যায় যে একটা ভীষণ নির্ম্মমতার মূলে একটা তেমনি ভীষণ কারণ থাকা দরকার। Cause of provocation না থাকিলে কেহ কখন পাপে লিপ্ত হইবে না। এখন Cause of provocation এর মধ্যে প্রধান হইতেছে অন্নচিন্তা। জগতের অধিকাংশ চুরি, ডাকাতি, নরহত্যার মূলে যে অন্নচিন্তা তাহা অস্বীকার করা যায় না। এনার্কিষ্টরা বলিবেন,—যতদিন পাপে উত্তেজিত ও প্রলুব্ধ করিবার কারণগুলি দূরীভূত না হইতেছে, ততদিন আইনের ভয়ে কেহ পাপ হইতে বিরত থাকিবে না। যখন একদিকে অনাহারে মৃত্যু আর একদিকে জেল, তখন জেলের ভয়ে কে অনাহারে মরিতে প্রস্তুত হইবে? যদি সকলের পেটে অন্নের ব্যবস্থা করিতে পার তাহা হইলে পুলিশ আর জেলের আবশ্যকতা থাকিবে না।

জগতে অনেক সময় কতকগুলি লোকের ভিতর একটা জন্মগত দুর্বৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ যেমন অন্ধ, কানা, প্রভৃতি শারীরিক অঙ্গহীন অথবা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগকে সেইরূপ মস্তিষ্ক ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তাহাদের জন্য বোধ হয় শিক্ষালয় অথবা চিকিৎসালয় রাখিলেই উপকার হইবে। এখানে তাহাদের কথা বাদ দেওয়া যাইতে পারে। আর যাহাদের পাপ অভ্যাসগত হইয়া গিয়াছে তাহারা প্রথমে আরম্ভ করে কি কারণ বশতঃ, তাহা দেখিয়া তাহাদের শ্রেণীবিভাগ হইতে পারিবে। অতএব তাহাদের কথাও ধরিবার দরকার নাই।

কিন্তু শুধুমাত্র অন্নচিন্তা সমস্ত পাপের মূলে নয়। সোসিয়ালিষ্টরা দ্বিতীয় কারণ ধরিয়াছেন 'নারী সমস্যা।' এই দুইটীই প্রধান কারণ, আর তাঁহাদের মতে ছোট ছোট যে সমস্ত কারণ থাকিতে পারে সে সমস্তই এই দুইটীর অধীন। অতএব মোটামুটি এই দুইটী লইয়া বিচার করিলেই চলিতে পারিবে। 'নারী সমস্যার' মূলে হইতেছে—"Idea of absolute exclusiveness about women". এই Exclusiveness জগতের আদি হইতেই বোধ হয় চলিয়া আসিতেছে। এমন সমাজ ছিল না—বা নাই—যেখানে এই Exclusiveness ছিল না, বা নাই। ইউরোপের সমাজে এই Exclusiveness পুরুষ সম্বন্ধেও খাটে। এসিয়ার সমাজে পুরুষ সম্বন্ধে পূর্ব্বে একেবারেই ছিল না। তবে ইউরোপীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তনের সহিত ইহা আস্তে আস্তে সকল দেশেই গড়িয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষে একরূপ ইহা প্রতিষ্ঠিতই হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

জীব জগতের গঠন প্রণালীর মধ্যে যে নিয়ম বর্ত্তমান তাহাতে, বিশেষ উচ্চশ্রেণীর জীবের, মৈথুন মিলন অপরিহার্য্য, শুধু অবশ্যম্ভাবী নয়। সামাজিক শৃঙ্খলার উদ্দেশ্যে কতকগুলি নিয়ম তৈয়ার করিয়া ইহার স্রোতবেগে বাধা প্রদান সকল দেশে সকল সমাজে সব সময়েই করা হইয়াছে। এই নিয়ম মানুষের হয়ত মাথা খাটাইয়া করিয়াছে, কিন্তু ইহার ধারা ইতর প্রাণীর মধ্যেও কিছু কিছু দেখা যায়। একদিকে যেমন কথা উঠিতে পারে যে এই স্রোতবেগে বাধা প্রদানে সমাজে বিশেষ সুফল ফলে নাই, আর একদিকেও তেমন বলা যাইতে পারে বাধা প্রদানটা ও কৃত্রিম নহে। কিন্তু এই বাধা প্রদানের অকৃত্রিমতা কতটুকু? সামাজিক বলে Exclusiveness দাবী করিলে তাহা সমাজের পক্ষে অবশ্যই মঙ্গলজনক নহে, তাহাতে সমাজের শান্তি থাকিতে পারে না। এই দুইটী বিষয় ঠিক রাখিয়া Exclusiveness একেবারে তুলিয়া দিতে গেলে সার্ব্বজনীন মৈত্রীর যে কল্পনা করা যাইতে পারে তাহার জন্য যে শিক্ষার আবশ্যক তাহার মূলে জগৎপ্রচলিত সমস্ত ধর্ম্ম এবং আপাততঃ মানুষের অন্তঃকরণের বহুমূল সংস্কারের একেবারে উচ্ছেদ সাধন। মহাভারতকার অতি প্রাচীন কালে একটা বিবাহহীন সমাজের যে

উল্লেখ করিয়াছেন তাহার সহিত সোসিয়ালিষ্টদের কল্পিত আদর্শের অবশ্য অনেক পার্থক্য। যখন ভারত কালের সমাজে স্ত্রীলোকের কোন অধিকার ছিল না। পুরুষ যখন যে কোন স্ত্রীলোককে ডাকিলে সে স্ত্রীলোক সেই পুরুষের সহিত যাইতে বাধ্য ছিল। কিন্তু উভয়ের সমানাধিকার বিশিষ্ট যে সার্ব্বজনীন মৈত্রী তাহার কল্পনায় সোসিয়ালিষ্টদের বাহাদুরী আছে বটে। তবে কল্পনার বাহিরে আসিয়া বাস্তবে পরিণত হইবার কোন সম্ভাবনা আছে কি না বলা কঠিন।

'Exclusiveness এর যত দোষই থাক তাহার অভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকিবে না, ফলে মানুষকে কর্ম্মে উত্তেজিত করিবার শক্তি থাকিবে না বলিয়াই বিশ্বাস। Exclusiveness ত্যাগ সমাজত্যাগী সন্ন্যাসীর পথেই সম্ভব, কিন্তু সন্ন্যাসীও সমাজ আছে বলিয়া, নতুবা সন্ন্যাসীর কল্পনা হইতে পারে না। Kropotkin যে Utopiaর আদর্শ জগতের সামনে ধরিয়াছেন তাহা মৌচাকের কল্পনার বড় বেশী উপরে নহে। Instinct এর বলে সেরূপ কাজ হইতে পারে। কিন্তু তেমন ভাবে মৈত্রীকুশলী হইয়া বাস করা মানুষের প্রেরণাসঙ্গত নয়। সেরূপ অবস্থায় ব্যক্তিত্বের পথ বন্ধ করিয়া দিলে তাহার কর্ম্মপ্রেরণার শক্তি কিছুতেই থাকিতে পারে না।

সোসিয়ালিষ্টদের এই সমস্ত ব্যবস্থার প্রধান দোষ হইতেছে এই যে তাঁহারা ভবিষ্যৎ মানবের মনটীকে, চিন্তাশক্তিটীকে একেবারে বাদ দিয়াছেন। আর পরোক্ষভাবে বাদ দিয়াছেন কর্ম্মে উত্তেজনার সেই প্রধান জিনিষটী যাহা শুনিতে অতি খারাপ, অর্থাৎ 'ঘৃণা' hatred. Love ও hatred যে একই সঙ্গে চলে ইহা একটী মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রে প্রতিপন্ন ধ্রুব সত্য। পূর্ণ সার্ব্বজনীন মৈত্রী অতি উপাদেয় সামগ্রী হইতে পারে, কিন্তু হয় তাহা সার্ব্বজনীন ঘৃণার সহিত যুক্ত, নয় তাহা কিছু না। অথবা তাহা মানুষের একটা সম্পূর্ণ নির্জ্জীব অবস্থার দ্যোতক। মানুষের অন্তঃকরণের ব্যক্তিগত প্রেম, ভক্তি, ঈর্ষা, ঘৃণা ও প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা বাদ দিয়া যে সমাজ, তাহা ইট পাথর গাছপালার সমাজ, তাহা বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি বিশিষ্ট মানুষের সমাজ কোন দিনই হইতে পারে না।

অনেক স্থলেই দেখা যায় বিকাশবাদের কোঠায় ফেলিয়া অনেক জিনিষের পরিমান করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। এই হিসাবে দাম্পত্য প্রণয়, কালে সার্ব্বজনীন প্রেমে পরিণত হইবে বলিয়া অনেকে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু দাম্পত্যপ্রণয়ের মূলে যে instinctive sexual exclusiveness সে কথা বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখা উচিত। ইহাতে আমিত্বের প্রসার নাই, আছে আমিত্বের সঙ্কোচ, আমিত্বের অবিসম্বাদিত উপভোগ। এ অবশ্যম্ভাবী। এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে জগতে আজও পর্য্যন্ত এমন কেহ জন্ম গ্রহণ করে নাই যে এই ভোগ হইতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত রাখিতে পারিয়াছে। এখানে সার্ব্বজনীন ভাব আসিতে পারে না। অতএব স্ত্রীপুরুষ উভয়ের স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত রাখিয়া তাহাদের পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশ ঘটিতে দিতে গেলে, তাহাদের ব্যক্তিগত প্রেমে কোন প্রকারেই বাধা দেওয়া যাইতে পারে না। ইহার বিবর্ত্তন সার্ব্বজনীন প্রেম নয়। ইহা যাহা চিরদিন তাহাই থাকিবে। Instinct এর বিকাশ হয় না। ইহা যাহা তাহাতেই জীবের ব্যক্তিত্ব ও আনন্দ। এ আনন্দের বিসর্জ্জনে সমাজের কল্যাণ হইতে পারে না।

সোসিয়ালিজমের আর একটী গোলমাল হইতেছে সমাজকে ব্যক্তির আসনে বসাইয়া, তাহাকে মাত্র একটী অভিব্যক্ত পদার্থ গণ্য করিয়া লইয়া, তাহার বিধি ব্যবস্থার চেষ্টা। জীবদেহের সহিত ইহার বহু তুলনা হইয়া থাকে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ফুলফুল লইয়া একটা বড় ফুলফুল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু যকৃৎ লইয়া একটী বড় যকৃৎ, আবার আণুবীক্ষণিক বহু জীবকোষ লইয়া

এক বৃহৎ জীবদেহ। তাহারা সব একযোগে কাজ করে। আমরা কখনও বুঝিতে পারি না যে একটী মানুষের দেহ বহু লক্ষ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীবকোষের সমষ্টি মাত্র। তাহাদের এই একযোগে কাজ করার দেহে এই অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য সাধনে জীবদেহের প্রকৃত জীবন। যেদিন তাহাদের এ সামঞ্জস্যের অবসান হইবে সেদিন দেহের অবয়ব বাহ্যিক কিছুক্ষণ পূর্ব্ববৎ থাকিলেও তাহার জীবন আর নাই। দেহ তখন মৃত। সেইরূপ সমাজে ব্যক্তির বিশিষ্ট সত্তা লুপ্ত করিয়া, সমাজ দেহের সহিত সব সমান মিলাইয়া সামঞ্জস্য রচনা করিয়া তুলিলে, সমাজের মনোহর মূর্ত্তির সহিত কার্য্যকরী শক্তির, জীবনী শক্তির বিকাশ হইবে। এ সব তুলনা কবিতার জিনিষ হইতে পারে, কিন্তু, জীবনধারণের প্রতি কার্য্যের হিসাবে সমাজ আর ব্যক্তি যে একই মিলনীভূত সামঞ্জস্যের অন্তর্গত এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। অথবা আর এক ভাবে বিচার করিলে চলিতে পারে, ব্যক্তির জন্য সমাজ, সমাজের জন্য ব্যক্তি নহে। কিন্তু জীবদেহের বেলায় জীবদেহের জন্যই জীবকোষ। যদি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, আনন্দ, সুখ, তাহার স্বাধীন স্ফূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিতে হয়, তবে তাহার সমাজে প্রয়োজন কি?

এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া একদিকে যেমন সোসিয়ালিষ্টরা ব্যক্তিত্বের বিলোপ সাধন করিয়া সকলকে একযোগ করিবার জন্য, একযোগে সুখ ভোগ করিবার জন্য, নব utopia গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যগ্র, আর একদিকে তেমন বিগত অর্দ্ধান সাম্রাজ্যের state personality গড়িয়া উঠিতেছিল। সেখানকার দার্শনিকগণ সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য, জাতির উন্নতির জন্য, ব্যক্তির বলিদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কথাটা আবার বলি,—ব্যষ্টি ব্যক্তিই না থাকিল তবে জাতিই বা কোথায়, সাম্রাজ্যই বা কোথায়, সমাজই বা কোথায়?

কম্যুনিষ্টরা তাঁহাদের সমগ্র জগৎকে এজমালি সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া মূলে বিকাশবাদ টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রথমে ছিল পূর্ণ দাসত্ব,—অর্থাৎ বড় বড় জমিদারের জমিতে কতকগুলি লোক ঘোড়া গরুর মত কাজ করিত, যাবহার পাইত ঘোড়া গরুর মত, কোন আকৃতিতে ছিল তাহারা কতকটা মানুষের মত। দ্বিতীয় অবস্থায় হইল serfdom, তখন তাহারা জমিদারের সম্পত্তির অংশমাত্র বলিয়া আর গণ্য নয়। কাজ তাহাদের যাহা ছিল তাহাই থাকিল, কেবল তাহারা লাঙ্গল অথবা ঘোড়া গরু নয়—ইহাই স্বীকার করা হইল। তৃতীয় অবস্থায়—তাহাদের পরিশ্রমের মূল্য দেওয়া হইতে লাগিল, এবং ক্রমে তাহারা যে কাজ করিতে ক্রীতদাসের মত বাধ্য নয় তাহাও স্বীকার করা হইতে লাগিল। অতএব তাহাদের খাটিবার একটা অধিকার, খাটিলে পারিশ্রমিক পাইবার একটা অধিকার, এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ব্যক্তিত্বের দাবি করিবার অধিকার জুটিল। ফলে তাহারা আজ পূর্ব্বতন জমিদারের ন্যায় মানুষ, এবং মত হিসাবে তাহাদের সমান এ দাবি করিয়াছে এবং সমাজও তাহা অজ্ঞাতে স্বীকার করিয়া লইয়াছে এখন চতুর্থ অবস্থার দিন আসিয়াছে, সকলে সর্ব্ব অবস্থায় যে সমান ইহার পূর্ণ বিকাশ হইবে সমান অধিকারে, কার্য্যতঃ সমান সম্পত্তি ভোগে—অর্থাৎ এজমালি সম্পত্তি।

কিন্তু ক্রীতদাসের ক্রমবিকাশে যে free labour এর উৎপত্তি তাহার পরিণতি কি এজমালি সম্পত্তিভোগে? free labourএর গতি যতদূর হইয়াছে তাহা মনে হয় ব্যষ্টি অপেক্ষা ব্যক্তির দিকেই অধিক। Nationalisation of work and factories নামে যে আন্দোলনটী আজকাল উঠিতেছে তাহার উদ্দেশ্য ব্যক্তির বিলোপ সাধন বলিয়া মনে হয় না। তাহার ভিতর নিষ্কর্ম্মা ধনী পুত্রগণের প্রতি একটা আক্রোশ আছে। বাস্তবিকই শ্রমজীবির মাথায় বাস পায় ফেলিয়া উপার্জ্জিত ধন

বড়লোকের ছেলেকে আরাম কেদারায় বসিয়া উপভোগ করিতে দেখিলে অনেকেরই কষ্টবোধ হয়। কিন্তু তাহার প্রতিবিধান ও এলমানি সম্পত্তি বলিয়া মনে হয় না। মানুষ আজ সমাজের শীর্ষস্থান হইতে যে আরামভোগীর দলকে নামাইয়া দিতে চায়, তাহার মানে এ নয় যে তাহারা বাঙ্গালার যৌথ পরিবার গুলির মত এক উনানে অন্ন চড়াইবার জন্য কোন অন্তরের ডাক অনুভব করিয়াছে। বরং তাহার মানে এই যে তাহারা নিজেরা সমাজের সেই স্থানে উঠিয়া বসিতে চাহে। আজ Common interest এর জন্য তাহাদের মধ্যে একযোগে কাজ করিবার যে সাড়া ও শক্তি আসিয়াছে তাহার ফলে সকলের সমান উন্নতির কথাটা প্রবল হইয়া উঠিলেও ভিতরে ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা পুড়িয়া ছাই হইয়া যায় নাই।

Nationalisation of factories সম্বন্ধে আমার এ প্রবন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে বসি নাই, কিম্বা বাঙ্গালার যৌথ পরিবারেরও বিচার করিব না। তবে Kropokin তাঁহার new utopia যে শান্তি আশ্রমের ছবি আঁকিয়াছেন এক্ষেত্রে তাহার বিচার আবশ্যক। তিনি কবিত্বপূর্ণ প্রকৃতির শোভার ভিতর স্ফটিক প্রাসাদে সমগ্র সমাজের বাসস্থান গড়িয়াছেন। সকলে এক সঙ্গে পরিশ্রম করিয়া মাঠে ফসল উৎপন্ন করিতেছে। গৃহে রমণীগণ তাহাদের খাদ্য প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষায় বসিয়া আছে। সকলেই বলিষ্ঠ, কর্মঠ। অভাব, উৎপীড়ন, দুঃখ, মানসিক যাতনা তাহাদের নিকট অজ্ঞাত। সেবায় সকলেই সকলের জন্য ব্যস্ত। পরিশ্রমের চিন্তা নাই;—যদিও পরিশ্রমই বিরল হইয়া যাইবে। এ স্বর্গ-রাজ্যে অর্থ বলিয়া কোন দ্রব্য থাকিবে না। 'লোভ, মোহ' অভিধান হইতে কাটিয়া দেওয়া যাইবে। এখানে ব্যক্তিগত হিসাবে 'আমার' বলিয়া কোন দাবী থাকিবে না।

অনেকগুলি অসম্ভব দ্রব্যের কবিত্বপূর্ণ সমাবেশ ভিন্ন এরূপ আশ্রম গঠন করা যাইতে পারে কি না জানি না। ব্যক্তিগত স্বার্থ না থাকিলে কেহ কখন আত্মপ্রয়োজনাধিক পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। অন্ততঃ মানব প্রকৃতি সেরূপ ভাবে গঠিত নয় বলিয়াই মনে হয়। মানুষকে কার্য্যে নিয়োজিত করিতে হইলে কোনদিনই তাহার 'আমি' টুকু বাদ দেওয়া যাইতে পারে না। তার পর পরিশ্রমের পরিবাণ যত মূল্য না থাকিলে পরিশ্রমের প্রতি কোনই আগ্রহ থাকিতে পারে না। চাল চিত্রের একদল মানুষের মন কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইবে না।

দ্বিতীয় কথা, কার্য্যের বিভাগ করিবে কে? কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে যে কার্য্যে যে সুপারগ তাহাকে সেই কার্য্য করিতে দিতে হয়। কিন্তু যেখানে সব সমানাধিকারে সমান্ ব্যবস্থায় চলিয়া যাইবে, সেখানে বিশেষ বিশেষ কার্য্যের প্রতি ব্যক্তি বিশেষের মানসিক স্ফূর্ত্তি প্রকাশ পাইতে পারে না, কারণ ব্যক্তিত্বই নাই। এইরূপ ভিত্তির উপর শ্রমবিভাগ করিয়া দিলে ভয় হয় তাহা ভারতীয় উন্নতি বিমুখ জাতিভেদের রূপান্তরিত মূর্ত্তিতে পর্য্যবসিত হইবে।

তৃতীয় কথা,—শুধু পারিশ্রমিকের হিসাবের উপর মনুষ্য সমাজ নির্ভর করে না। শুধু অন্নবস্ত্র, কোনও রূপে জীবন ধারণ, জন্ম মৃত্যু বিবাহ, করিয়া দিলেই মানুষ মানুষ হইয়া উঠিবে বলিয়া মনে হয় না। বহু নিয়মবদ্ধ একটা কল পরিচালিত একটা সমাজ গঠন সম্ভব হইতে পারে, এবং তাহা হয়ত টিকিয়া থাকিতেও পারে বহুকাল, কিন্তু তাহার বহুমুখী প্রতিভার স্ফুরণ কোনদিনই হইবে না, আর মানব সমাজ তাহার ফলে পিপীলিকা কিম্বা মধুমক্ষিকার সমাজের চাইতে কিছু উচ্চ স্তরের জিনিষ হইবে না।

চতুর্থ কথা,—শুধু পেটে অন্ন দিলেই মানুষ বাঁচিয়া থাকে না। তাহার অতিরিক্তের জন্যও যদি

দেওয়াইতে হয়। অনেকেই বোধ হয় শুনিয়াছেন অন্ধকার নির্জ্জন কারাগারে কাহাকেও কিছুদিন আটকাইয়া রাখিলে ক্রমে সে পাগল হইয়া যায়। মানুষের স্বাধীন চিত্তবৃত্তির বিকাশ সাধনে বাধা দিয়া তাহার মস্তিষ্ক বিনষ্টী একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়া তাহাকে পশু করিয়া তোলা যাইতে পারে, কিন্তু সেরূপ পশু লইয়া যে সমাজ হইবে তাহা গড়িয়া তুলিতে কাহার প্রাণে চাহিবে বলিতে পারি না। ইংরেজিতে Fine art's বলিতে যে কয়টী জিনিষ বুঝায় সেগুলিতে শারীরিক পরিশ্রম লাগে না এবং কলের সমাজে মানুষকে সেগুলি হইতে সরাইয়া রাখিলে চিত্তবৃত্তি সম্পাদনে বঞ্চিত রাখিলে মানুষ প্রকৃতরূপে মানুষ থাকিবে কি না বুঝিতে পারি না।

পঞ্চম কথা, মানুষ আর পশুতে পার্থক্য যতদূর দেখা গিয়াছে প্রধানত 'বুদ্ধি বৃত্তিতে'। মানুষ বুদ্ধি বৃত্তির নিত্য নূতন নূতন রচনা করিয়া অগ্রসর হইবে। তাহার বুদ্ধির স্ফুরণের পথ রুদ্ধ করিয়া দিলে তাহার কি উপকার হইবে? সমাজকে চিরতরের জন্য একনিয়মে বাঁধিয়া মানুষের কাজ কর্ম্মের দৈনন্দিন ব্যবস্থা, প্রতি খুটিনাটীর routine পূর্ব্ব হইতে তৈয়ার করিয়া তাহাকে সেই ভাবে চলিতে বাধ্য করিলে, তাহার বুদ্ধি খাটানর কোনই আবশ্যক থাকিবে না। ফলে তাহার বুদ্ধির কোন কাজ না থাকায়, বুদ্ধি একেবারে লোপ পাইবে বলিয়াই মনে হয়। এইরূপ কতকটা ভারতীয় সমাজে আস্তে আস্তে হইয়া আসিতেছিল।

ষষ্ঠ কথা,—Man is a competitive animal. মানুষের সর্ব্ব উন্নতির মূলে এই Competition. Competition ভিন্ন মানুষকে আর কিছুতে কার্য্য করিতে একটা তীব্র আগ্রহ আনিয়া দিতে পারে না। Competition এর কারণ হইতেছে মানুষের অন্তঃকরণে ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার লালসা অপরিহার্য্য। এখানে Nietzsche "Will to power" বলিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা ভাবিয়া দেখিবার জিনিষ। "The motive power of all organic life is not the 'Will to live', but the desire to expand, to grow, to appropriate, to gain in power—in short, the 'Will to power'.

Wherever I found a living, there found I the Will to power; and even in the Will of the Servant found I the Will to be master. Neither necessity nor desire, but the love of power, is the demon of mankind. You may give men everything possible—health, food, shelter, enjoyment—but they are and remain unhappy and capricious, for the demon waits and waits and must be satisfied."

নীট্‌শের তীব্র ভাষার ভিতরে যেন একটা জিঘাংসা প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু সে সব কথা বাদ দিয়া ধরিলেও ইহা অস্বীকার করা যায় না যে সমাজের উন্নতি নির্ভর করে ব্যক্তির উন্নতির উপর, এবং ব্যক্তির উন্নতি Competition না থাকিলে হইতে পারে না। এই Competition ও ব্যক্তির উন্নতিতে বাধা দেওয়া যাইতে পারে যদি উন্নতি প্রাপ্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। সে অসম্ভব কথা মানিয়া লইলেও মনে হয় Competition মানুষের জীবন শক্তির মূলে। Competitionএর উচ্ছেদ সাধনে সমগ্র মানব সমাজ ব্যক্তিত্বের অবসানে মৃতবৎ হইয়া যাইবে। বোধ হয় সে সমাজের মানুষই ক্রমে লোপ পাইয়া আসিবে। Competitionএর পথ রুদ্ধ হইলে মানুষের জীবন ধারণই অসম্ভব।

তারপরে একটা কথা এই যে সমস্ত ভাঙ্গিয়া দেওয়া সম্ভব হইলেও মানুষকে 'আমার' বলিয়া কিছু ভোগ করিতে দিতে হইবেই। তাহার স্নেহ মমতার ভিতর একটু পশু থাকিবে, তাহার আশা ভরসার ভিতর একটু নিজস্ব থাকিবে, তাহার ভোগ

লালসাতেও তাহার নিজের ভাগ রাখিতে দিতে হইবে। রাশিয়ার বলশেভিষ্টরা বিপুল বিপ্লবের পর শেষে কৃষকদিগের জমিতে অভিগত স্বত্বভোগের অধিকার স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। সোসিয়ালিজমের ইতিহাসে ইহা একটী মস্ত শিখিবার কথা।

কিন্তু সমস্ত ভুল দোষ লইয়াও সোসিয়ালিজম জগতে অনেক নূতন বিষয় শিখাইয়াছে, মানুষের ধরণার অনেক সংস্কার করিয়াছে। তাহারা মানব সমাজের ভৌগলিক জাতীয়তা ভাঙ্গিয়া গড়িতে চায়, এবং বর্ত্তমান জাতীয়তার বহুদোষ চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। আর একটী জিনিষ দেখাইয়া দিয়াছে মানুষের সমাজগত, জাতিগত এবং ব্যক্তিগত অবশ্যম্ভাবী পরস্পরের অধীনতা। absolute freedom (সম্পূর্ণ স্বাধীনতা) বলিয়া কিছু হইতে পারে না। এবং সেই জন্যই সামাজিক সমবায়ের আবশ্যক, সেই জন্যই সমাজের ভিত্তিতে সোসিয়ালিজম মতবাদের স্থান হওয়া দরকার।

দ্বিতীয় কথা,—শুধুমাত্র Benthamএর utility ও Summum Bonumএর উপর সামাজিক আইন প্রণয়ন আর চলিবে না। অধিকাংশ লোকের শ্রেষ্ঠ কল্যাণের উপর নির্ভর করিয়া একজনেরও অকল্যাণ করা যাইতে পারে না। Majority বলিয়া সমিতি ব্যবস্থা যেরূপ হয় তাহা ত প্রকৃতপক্ষে সমধিক বুদ্ধি বিশিষ্ট একটা Minorityর চালনা মাত্র। চালনা চিরকালই অল্পসংখ্যক লোকে করিবে। তবে তাহাদের দায়ীত্ব জনসঙ্ঘের কাছে অর্থাৎ যে কোন এক জনের কাছে। আর এ চালনার মূলসূত্র এক কথায় কিছু ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া যায় না। এখন হইতে সমাজের আদর্শ হইবে বহুমুখী (Diverse ideals) সংক্ষেপে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে লক্ষ্য থাকিবে rationality ও humanity.

তৃতীয় কথা,—Competitionএর পথ উন্মুক্ত রাখিলেও সমান ভাবে Compete করিবার অবসর দিতে হইবে। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় বড় উদার ভাবে Laissez faire অবলম্বন করিলে নিম্নশ্রেণীর, দুঃস্থ, অর্থাৎ সমাজের অধিকাংশ লোকের প্রতি অবিচার করা হইবে। এক সঙ্গে ছেলেরা খেলার মাঠে যে দৌড়ায় সেও একই স্থান হইতে একই সময়। অবশ্য Competitionএর মূল্য কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

শেষ কথা,—সমাজের শান্তি সামাজিক সমবায় ও সামাজিক আইন প্রণয়নের চরম উদ্দেশ্য হইতে পারে না। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভিত্তিমূলক ব্যক্তিগত বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ও বহুমুখী উন্নতির উপর সমগ্র মানব সমাজের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। শান্তিতে সেই বহুমুখী উন্নতি সাধন সামাজিক ব্যবস্থার মূলে থাকিবে।

ইবসেন বলিয়াছেন—The Spirit of truth and the Spirit of freedom—they are the pillars of Society.

"এক-অনুরোধ"

(শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়)

হে মোর বিরহ-দগ্ধ, সুন্দর শোভন,
বরষ-বাহিত মোর, নয়ন-লোভন!
ভুলে' যাও সব কথা, সব অপরাধ;
জীবন-যাত্রার মাঝে, যদি কোন বাধ
তোমার আশার পরে দেখে থাকি কভু;
তাও আজ ভুলে' যাও, ক্ষমিবার তবু।
কাঙ্গাল আমি যে বঁধু—বারিধির মাঝে,—
ভেবেছিনু কত মণি, মরকত রাজে,

কত সে অতুল শোভা সম্পদ বিভব—
তুলিয়া যে নিতে পারে তারি বুকি সব!
তাবি নাই, বুঝি নাই, অমানিশা কোলে
অকলঙ্ক শশধর কভু নাহি দোলে!
নিভৃতে যৌবন যবে সঞ্চারিল চিতে.
অনন্ত বাসনা রাশি নানা গন্ধে গীতে
উন্মাদ পবন মুখে আবেগেতে ছুটি'
সরলীর হিয়া মাঝে পড়েছিল লুটি';
ভেবেছিনু বসুধার যত সুধা আছে,
আকণ্ঠ করিব পান—অবসর পাছে।
হায় বঁধু! তাই আজ ভাবি মনে মনে,
কোথা সে কল্পনা-কুল? যদি যোগাসনে,
অচপল, অপলক দুই আঁখি দিয়ে,
বিশ্বের ধারণা সব ধ্যান করি নিয়ে
কোথা সে মুক্তির নেশা, নব জাগরণ,
অপরূপ-রস-তলে—সাধিত মরণ!
তাই আজ বলি প্রিয়, ভুলে যাও সব—
অতীতের যত কথা।

নিত্য-অভিনব

আশার ইঙ্গিত মাঝে ভুলে যাও' মোরে।
বলিতে পারিনা আর; নয়নের লোরে
তিতিছে বচন শুধু। শুধু মনে হয়,
কেন আশা করেছিনু? আপনার সম
আপনি বিধান করি' চেয়েছিনু কেন,
অনন্ত মরুর মাঝে মরীচিকা যেন?
বিদায়-বিদীর্ণ বুকে, নিরাশার সাঁঝে,
তুমি কি বুঝিবে মোর কি বেদনা বাজে?
অপযশ, অপবাদ, অপমান তার
তুমি তো জান না বঁধু কি যে ব্যথা তার,
কি অন্তরদাহ! পুরুষ আমি যে হায়!
নির্ব্বাপিত সর্ব্ব যবে রমণীর পায়
বিসর্জ্জন দিয়ে বসি আপন গৌরব—
বিফলে বিলায়ে দিয়ে সকল সৌরভ.
ভিক্ষার ভরাণ' হিয়া নিয়ে ফিরি ঘরে;
শোণিত নয়ন-পথে কেমনে যে ঝরে
তুমি কি জানিবে তাহা?

কেমনে বুঝাই,

প্রাণপণে যাহা চাই, যদি নাহি পাই;
আজন্ম বাঞ্ছিত-ধন—দুরাশার ভাগে,
নয়নের আগে যদি নিয়তই জাগে;
কি বিদ্রোহ বাজি উঠে পুরুষের প্রাণে,
পুরুষ বিহনে তাহা আর কেবা জানে?
তাই বলি ভুলে' যাও। তবু অনুরোধ,
যদি কোন নিশা-শেষে, কভু হয় বোধ
নিরাশার তপ্ত বায়ু; কুণ্ঠিত পরাণে
যদি কোন স্বপনের সুর শোন কাণে!
সেইদিন শুধু বঁধু, এক ফোঁটা জলে,
নিবেদিও অভিমান অতলের তলে;
পুরুষের পদতলে রমণীর হিয়া
নিঃশেষে নিশার শেষে দিও বিসর্জ্জিয়া!

রন্তচ্যুত

(উপন্যাস)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী বি. এ.)

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে শশিমুখী রাস্তার যোগাড় "সব ঠিক করে এসেছি. তাহলে কালই কলিকেতেছিল এমন সময়ে সনৎ আসিয়া হাজির;— চলুন।"

পিঁড়েটাকে তার দিকে আগাইয়া দিয়া— শশী বলিল, "কি ঠিক কর্‌লে শুনি।"

"ইস্তর মত পাকা বাড়ী নয়—ভাড়াও বেশি নয় —১৫ টাকা।"

"তা বেশ হয়েছে।"

তা হলে কাল সকাল ১০টায় গাড়ীতেই যাচ্ছেন?" হাসিয়া শশী বলিল, "এত তাড়াতাড়ি কেন?"

সনৎ বলিল, "না না, কালেই যেতে হবে মাকে আমি বলে এসেছি—সব ঠিক ঠাক করে রাখতে।"

সশব্যস্তে শশী বলিয়া উঠিল, "মাকে আবার খামকা কষ্ট দিতে গেলে কেন ভাই—এ তোমার ভারি অন্যায় কিন্তু।

সনৎ বলিল, "ঘরগুলো সব ছুঁইয়ে টুইয়ে রাখতে হবে ত।"

"ও কাজটা কি আমরা নিজেরাই গিয়ে করতে পারতুম না?—তুমি বড্ড ছেলেমানুষ কিন্তু।

কথাটা শশীর আদবেই ভাল লাগে নাই। এই যে নিজের পরিচয় ভাঁড়াইয়া সমাজের ভিতর সে নীরবে সকলের চোখে ধূলা দিয়া ঢুকিয়া পড়িবার বন্দোবস্ত করিতেছে ইহাই ত যথেষ্ট অত্যাচার তার উপর আবার সনতের মার মতন একজন সম্ভ্রান্ত ঘরের গৃহিণী যে তার জন্য এতটা কোঁচ পোয়াইতে যাইবেন ইহা তাহার কাছে নেহাতই অসুখ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

রাত্রে শয্যায় শুইয়া শশীর মনের মধ্যে নানান ভাবনা আসিয়া জুটিতে লাগিল। যতদিন যাওয়াটা কেবল জল্পনা কল্পনার মধ্যেই ছিল ততদিন তার চিন্তাটা বেশ সুখকর ছিল কিন্তু আজ যখন সেটা কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে তখন আর মন ক্রমাগতই পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। ইহার মধ্যে যে এতখানি ভয়ভাবনা, এতখানি দায়িত্ব থাকিতে পারে শশী তাহা পূর্ব্বে কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই।

কি দুঃসাহসের কাজটাই আজ সে করিতে বসিয়াছে। সনতের মা যখন জিজ্ঞাসা করিবে, সঙ্গে কোন পুরুষ মানুষ নেই কেন? তখন সে কি জবাব দিবে? শশী ডাক দিল, "পেসন্নী ও পেসন্নী, —ঘুমোলি নাকি?"

পাশের ঘর হইতে প্রসন্ন উত্তর দিল, "না, কেন?"

"আয় না—দুটো কথা কই।"

সে আসিতেই শশী বলিল, "আচ্ছা পেসন্নী, তারা যখন জিজ্ঞেস করবে, সঙ্গে পুরুষমানুষ নেই কেন, তখন কি বলবো?"

সে কি বলিল, "কেন সনৎ বাবুকে যে কথা বলতে শিখিয়ে দিয়েছিলুম, সেই কথা বলবি।"

"অত গুলো মিথ্যে কথা একসঙ্গে বলতে যে কেমন কেমন ঠেকে পেসন্নী।"

হাই তুলিয়া, তুড়ি দিয়া প্রসন্ন বলিল,

"তোকে কোন কথা বলতে হবে না আমি, বলবো এখন।"

"তা হলে দুগ্‌গা বলে বেরিয়ে পড়ি কি বলিস্।"

প্রসন্ন বলিল, "তা বৈ কি।"

পরদিন বেলা ৭টা হইতেই সনৎ আসিয়া তাগাদা আরম্ভ করিল এবং মহা-উৎসাহের সহিত মোট-মাঠ সব বাঁধা-বাঁধি সুরু করিয়া দিল। তার পর সাড়ে আটটার সময় সে একটা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী ডাকিয়া আনিল এবং চালের উপর মোট-মাঠ সব তুলিয়া দিয়া নিজে ভিতরে গিয়া বসিল।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল—শশী খড়খড়ির ভিতর দিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। বলিয়া উঠিল "আচ্ছা সনৎ, তোমাদের গ্রামের সবাই যখন জিজ্ঞাসা করবে, "একে?" তখন তুমি কি বলবে?"

সে বলিল, বলবো আমার দিদি হা হা।"

সে বলিল, "আমাকে দিদি বলে পরিচয় দিতে তোমার একটুও লজ্জা করবে না সনৎ?"

সনৎ অবাক হইয়া তার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। এই অদ্ভুৎ প্রশ্নের ভিতর সে প্রবেশ করিতেই পারিল না।

হঠাৎ কথাটাকে উলটাইয়া লইয়া শশী বলিল, "হাজার হোক আমরা হচ্ছি কায়স্থ আর তোমরা হলে ব্রাহ্মণ।"

সনৎ যেন দম ছাড়িয়া বাঁচিল ;—সে বলিল, "তাতে আর কি এসে গেল, তাঁতী গিন্নীকে ও ত আমি মাসী বলে ডাকি।"

শশী কোন উত্তর দিল না, সে আবার পথের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

শশী এবং প্রসন্নকে মেয়েদের গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া সনৎ চলিয়া গেলে পর একটি আধবয়সী স্ত্রীলোক শশীকে জিজ্ঞাসা করিল "হাঁগা বাছা, ওটি বুঝি তোমার ভাই ?"

সে বলিল, "হুঁ।"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "আহা দিব্যি ছেলেটি।"

তার পর ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

শশী বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তার মনে হইতে লাগিল, ঐ যে গাছ পালা, মাঠ ঘাট সব চলার বেগে পিছাইয়া পিছাইয়া পড়িতেছে—উহাদেরি সহিত তার অতীত জীবনটা সমস্ত হাসি কান্না, সুখ দুঃখ লইয়া কখন পিছাইয়া পড়িয়াছে। দূরে দাঁড়াইয়া একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত ভবিষ্যৎ তাকে ডাকিতেছে "আয় আয়।" মুখে তার যে হাসি টুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা টিটকারির কি আনন্দের তা কে জানে!

গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিতেই সনৎ, শশী এবং প্রসন্নকে নামাইয়া লইল এবং প্ল্যাট ফর্ম্মের উপর বৃদ্ধ চাকর বদনকে দেখিয়া বলিল, "গাড়ী এনেছিস্ বদ্না ?"

সে বলিল, "হাঁ।"

সকলে গাড়ীতে গিয়া উঠিল, বেলা তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে—চারিদিকে রৌদ্র একেবারে খাঁ খাঁ করিতেছে। মেটে পথের ধুলা উড়াইয়া গাড়ী চলিতে লাগিল।

শশীর মুখের দিকে চাহিয়া সনৎ হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আপনার কি কোন অসুখ করছে ?"

সে বলিল, "না বিশেষ কিছু না মাথাটা একটু ধরেছে।"

১০

একটা একতালা ছোট বাড়ীর দরজার সুমুখে আসিয়া গাড়ী থামিল। শশী গাড়ী হইতে নামিতেই সনতের মা আসিয়া তার হাত ধরিল বলিল "এস মা এস।"

শশী পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল। "জন্ম এইস্তি হও মা।" বলিয়া সনতের মা তার চিবুক স্পর্শ করিলেন।

শশীর বুকটা ছ্যাঁত্ করিয়া উঠিল।

এই সময় একটি ৭।৮ বছরের হৃষ্ট পুষ্ট ছেলে কোথা হইতে হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া শশীকে টিপ্ করিয়া একটা প্রণাম করিল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

সনতের মা হাসিতে হাসিতে ডাকিলেন "পালালি কেন রে ভুলো—আয় না।" তার পর শশীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওর লজ্জা হয়েছে।"

শশী জিজ্ঞাসা করিল, "ওটি কাদের ছেলে মা ?"

সনতের মা বলিলেন, "সে অনেক কথা মা, আমাদের পাড়ার চন্দর ওকে মানুষ করেছে।"

"কেন ওর কি মা বাপ নেই ?"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সনতের মা বলিলেন, "চন্দর ওকে কাশী থেকে নিয়ে এসেছে—ও সেখানকার এক বৈরাগীর ছেলে।"

শশীর মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত হঠাৎ ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল—সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

তাহার হইয়া প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিল "তা পাড়ার লোকে কিছু বলে না ?"

"তা আবার বলে না, এরি জন্ত চন্দরকে আবার এক ঘরে করে দিয়েছে—।"

এমন সময় হঠাৎ সনৎ কোথা হইতে পলাতক ভুলোকে জোর করিয়া টানিতে টানিতে সেইখানে আনিয়া হাজির করিল এবং শশীর দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল "আপনি ওকে ধরুন ত, খবরদার পালাতে দেবেন না, বড্ড ত ছেলে, ওর আবার লজ্জা !

শশী এক নিমিষে ভুলোকে টানিয়া লইয়া বুকের মধ্যে প্রাণপন শক্তিতে জড়াইয়া ধরিল। তার মনে হইতে লাগিল এই যে এত কাণ্ড করিয়া এত দূরে সে আসিয়াছে সে কেবল এই মাতৃহারা অনাথ বালকটির আকুল আহ্বানে। বুকের মাঝখানটাতে সে এতক্ষণ কেবল অন্ধকারই দেখিতেছিল হঠাৎ যেন তারি মধ্যে সে কোথা হইতে একটা ক্ষীন আলোর রেখা দেখিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তার সমস্ত চিত্ত যেন মরিতে মরিতে হঠাৎ বাঁচিয়া গেল।

অনেক রাত্রে সনতের মা চলিয়া গেলে শশী প্রসন্নকে বলিল, "এমন মানুষ কখন দেখেছিস সেজদী।"

প্রসন্ন বলিল, "ওঁরা কি আর মানুষ শশী ওঁরা হচ্ছেন সাক্ষাৎ দেবতা।"

শশী বলিল, "আর যিনি ঐ ছেলেটিকে মানুষ করছেন তাঁর ছাতিটা কত বড় বল্ দেখি।"

সে বলিল, "সে কথা আর বলতে !"

পরদিন সকাল বেলা উঠিয়া শশী তাঁড়ার ঘরে জিনিষ পত্তর গোছ গাছ করিতেছিল এমন সময় হঠাৎ দ্বারের পাশ হইতে উঁকি মারিয়াই ভুলো ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

শশী ডাকিল, "ও ভোলা নাথ, পালালে কেন, এস না।"

সে ফিরিয়াও তাকাইল না। কিছুক্ষণ পরে সে আবার আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

সে যেন বেশ একটা খেলা পাইয়া গিয়াছে।

শশী এমন ভাব প্রকাশ করিল যেন সে এবার আর তাকে দেখিতেই পায় নাই। ভুলো অনেকক্ষণ এইভাবে দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া থাকিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। শশী তবুও সে দিকে চাহিল না। ভুলো এইবার আরো নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। শশী আর থাকিতে পারিল না; সে হাত বাড়াইয়া হঠাৎ তাকে ধরিয়া ফেলিল এবং বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, "এইবার কোথায় যাবে দুষ্ট ছেলে !"

তার বুকের মধ্যে ছট্ ফট্ করিতে করিতে ভুলো বলিল, "আঃ ছেড়ে দাও না !"

সে তার মুখে চুমার উপর চুমা দিয়া অস্থির করিয়া তুলিয়া বলিল, "কেন ছাড় বো।"

"তা না হলে আর কখনো আসবো না।"

তাকে আরো দৃঢ়ভাবে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া শশী বলিল, "না এসে কেমন থাকতে পারো দেখি দুষ্টু ছেলে।"

সে দিন ভুলোর সহিত শশীর খুব আলাপ হইয়া গেল।

এ কথা সে কথার পর শশী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের কে রেঁধে দেয় ভোলানাথ ?"

সে বলিল, "কে আর রেঁধে দেবে, বাবা নিজেই রাঁধে।" শশী আবার জিজ্ঞাসা করিল, সংসারের কাজকর্মও কি তোমার বাবা নিজেই করেন ?

ছোট্ট ঘাড়টি নাড়িয়া ভুলো বলিল, "বাবাও করে আমিও করি।"

"কুটনো কোটা বাসন মাজা ?"

সে বলিল, "হুঁ।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কি ভাবিয়া শশী আবার বলিল, "তুমি পড়াশুনো কর না ?"

সে বলিল, "বাড়ীতে বাবার কাছে পড়ি।" তারপর কিছুক্ষণ থামিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "ইস্কুলে যেতে আমার খুব ইচ্ছে করে। শশী দেখিল ভুলোর মুখখানি একবারে এতটুকু হইয়া গিয়াছে। তাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া শশী বলিল, "তাতে ত ইস্কুল, তুমি বড় হয়ে কলকাতায় গিয়ে বড় বড় ইস্কুলে পড়বে অখন।"

ভীত হরিণ শিশুর মত শশীর মুখের পানে তাকাইয়া ভুলো বলিল, "সেখানকার ছেলেরা আমার সঙ্গে কথা কইবে ?"

তার গালে নিবিড় ভাবে চুমা খাইয়া শশী বলিল, "কইবে বৈকি ধন্ আমার।"

"এখানকার ছেলেরা ত কয় না।" বলিয়া ভুলো চুপ করিল; তার চোখ দুটি ছল্ ছল্ করিয়া আসিল।

বৈকালের দিকে সনৎ আসিয়া বলিল, "কোন অসুবিধে হচ্ছে না ত শশিদিদি।"

সে বলিল, "তোমরা থাকতে আমার অসুবিধে হবার যো কি ভাই।"

কথাটাকে আর অধিক দূর গড়াইতে না দিয়া সনৎ বলিয়া উঠিল, "আজ ভুলো আসে নি ?"

"এসেছিল বৈকি, এই ত খানিকক্ষণ হোলো উঠে গেল।"

একটা ভাঙ্গা টুলের উপর বসিয়া পড়িয়া সনৎ বলিল, "চন্দর দাদাকে কাল ও জিজ্ঞাসা করছিল, আপনাকে কি ব'লে ও ডাকবে। তা চন্দরদা বল্লেন—তোর ত মা নেই—তুই মা বলেই ডাকিস্।"

শশীর বুকের মধ্যে ছাঁৎ করিয়া উঠিল। কথাটাকে চাপা দিবার জন্ত সে বলিয়া উঠিল, "মা আজ কখন আসবেন সনৎ ?"

সে বলিল, "বোধ হয় সন্ধ্যার সময়।" তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "ও: মা মা আপনার সুখ্যাতি করছে ?"

শশী বলিল, "উনি কার না সুখ্যাতি করেন !"

সনৎ বলিল, "তা বলে অত সুখ্যাতি কারুর করে না।"

নেহাৎ যেন ব্যাজার হইয়া শশী বলিল, "কি বল্লেন শুনি "

"বল্লেন, অমন মেয়ে বড় একটা দেখ যায় না—দেখো শশিদিদি ওমরে যেন ধম আটকে না যায়।"

সলজ্জ ভাবে শশী বলিল, "আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে।"

হাসিতে হাসিতে সনৎ বলিল, "মা ত তবু আলাপ করে দেখেছে—চন্দরদা আমায় না দেখেই—।"

বাধা দিয়া শশী বলিয়া উঠিল, "থাও তোমাকে আর পাগলামী করতে হবে না।"

সনৎ বলিল, "সত্যি বলছি শশিদিদি।"

শশী বলিল, "হাঁ, তাঁর ত আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তাই আমার সুখ্যাতি করতে যাবেন।"

সনৎ বলিল, "না বিশ্বাস কর আর কি বলব !"

শশি বলিল, "চেনা নেই শোনা নেই অমনি শুধু শুধু কেউ কারুর সুখ্যাতি করে না কি।"

সনৎ বলিল, "এই ত আপনি চন্দরদাকে কখন দেখেন নি—কেউ যদি আপনাকে তাঁর সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি সুখ্যাতি করবেন না ?"

শশী চুপ করিয়া রহিল।

সনৎ আবার বলিল, "যার মুখে ভুলোর সমস্ত পরিচয় পেয়েও আপনি কাল যে ভাবে ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন সে কথা যে শুনবে সেই যে সুখ্যাতি করবে।"

শশী বলিল, "এর মধ্যে সুখ্যাতিটার কি পেলে ভাই।"

গম্ভীর হইয়া গিয়া সনৎ বলিল, "এই যে এতবড় গ্রামটা এর মধ্যে কত স্ত্রীলোক ও রয়েছে, কৈ কেউত্ত এমন করে দুলোকে বুকে তুলে নিতে পারলে না দিদি।" তারপর একটু থামিয়া সে আবার বলিল, "চন্দরদা বলে, আপনার মতন স্ত্রীলোক যদি বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে থাকতো তা হলে বাঙ্গলা দেশ ৫০০ বছর এগিয়ে যেতে পারতো।" কথাটা শেষ করিয়া সনৎ আরও গম্ভীর হইয়া গেল। এই ৫০০ বৎসরটা অন্ত কোন উপায়ে লাফাইয়া যাওয়া যায় কিনা; সে বোধ হয় সেই চিন্তাই করিতেছিল।

হঠাৎ শশী বলিয়া উঠিল, "তুমি তোমার চন্দরদাদাকে বোলো সনৎ, তাঁর মতন লোক আমাদের সুখ্যাতি করলে, আমাদের অপরাধী করা হয়।"

সনৎ অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিল, "হুঁ।"

সেদিন রাত্রে শয্যায় শুইয়া অনেক রাত্ত পর্য্যন্ত শশীর চোখে ঘুম আসিল না; তার মনের মধ্যে ক্রমাগতই একটা কথা ভাসিয়া উঠিতে লাগিল, চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য তাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে।

মামলাবাজ মেয়ে

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীদ্বিজরাজ ঘোষ)

কি কঠোর পরিহাস—কি নির্দ্দয়তা! কি আত্মম্ভরিতা! কম্পটতার আবরণে আপনাকে আচ্ছাদিত করিয়া, বাহিরে সাধু সাজার অভিনয়ের উদ্দেশ্য বুঝিলাম—মনের নিষেধ সত্ত্বেও ছুটি ভাঙিয়া আহার করাইলাম কথা কহিলাম না—তিনিও কহিলেন না।

প্রাতে তাঁর একটু গরম জলের প্রয়োজন হইত। সেটা আমিই করিয়া দিতাম। সে দিন আর জল লইবার জন্ত তিনি আসিলেন না। যে সময় আসা উচিত সে সময় অতীত হইল।

তিনি না আসাতে আমার সন্দেহ হইল, ঘরে গিয়া দেখিলাম এবাড়ীর যেওয়া জুতো কাপড় জামা সমস্তই পড়িয়া রহিয়াছে কেবল তাহার এক জোড়া ছেঁড়া চটি আর ক্যাম্বিসের একটা ব্যাগ সেখানে নাই। চলিয়া গিয়াছেন!—সত্যই আমার জন্ত তিনি চলিয়া গিয়াছেন।" আমার কাছে বিদায় হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। মনের গতি কোন দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল, শূন্য ঘরে মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল, বুকে কেমন অনুভবনীয় বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম। সহসা বালিসের উপর আমার নামের একখানা চিঠি দেখিলাম। তাঁরই হাতের লেখা—চিঠি খুলিয়া পড়িলাম "নির্ম্মল! নিজের স্ত্রীকে মুক্ত বাতাসের মধ্যে দিয়া সংসারের সকল বিষয়ে কর্ম্মঠ করাই আমার খেয়াল, সে খেয়ালের জন্ত আমি তোমার বিষয় কর্ম্ম হইতে দূরে ছিলাম। তুমি তোমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। আমি তোমার নিকট অবিশ্বাসী, অকর্ম্মণ্য হইয়া বিদায় লইলাম, তুমি আত্ম রক্ষা করিতে সমর্থা, সেই বিশ্বাসে আমি চলিলাম। তুমি ছায়ের কূট তর্কে পারদর্শিনী—বিচারকের আসনে বসিয়া তুমি ছায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পার নাই, সেটা তোমার হৃদয়ের

দুর্বলতা, আশা করি সে দুর্বলতা তোমার একদিন সংশোধিত হইবে ইতি—" জিতেন

ইলেকট্রীক লাইটের বোতাম টিপিয়া ঘরটা যেন কে অন্ধকার করিয়া দিয়া গেল ; একটা বিপুল বাধা অতিক্রম করিয়া যেন বিষবাষ্পে আমার সমস্ত জ্ঞানকে হরণ করিয়া ফেলিল। চিঠির অক্ষরগুলো গুলির মত আমাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। কি একটা অভাবের তাড়নায় আমাকে অন্নহীন জীবনের মত নির্জ্জীব করিয়া তুলিল, আমি আত্ম-কৃতকর্ম্মের ফলে অস্থির হইয়া পড়িলাম।

তাহার যাওয়ার দিন হইতে এক মাস পূর্ণ হইয়াছে। এই একমাস কি ভাবে কাটিয়া গেল তাহা আমার অনুভব করার শক্তি নাই।

সে দিন বাহিরে বসিয়া আছি, দেখি যোগী মৃতকল্প। তাহার হাড় কখানা আছে মাত্র। সত্যই সে তাঁহাকে ভাল বাসিয়াছিল, আমি তাঁহাকে ভালবাসিতে পারি নাই। বেচারির উপর আমার দয়া হইল। নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "এমন হ'লে কেন যোগী-দিদি ?"

"আর মা।" - যোগী বলিল।

আমি বলিলাম "দিদি" সে উত্তর করিল "মা" যোগীর মতিভ্রম হইয়াছে, স্থির করিয়া বলিলাম—"তুমি মরার মত হ'লে কেন।"

"পোকাগুলোর মত আলো দেখে মরতে গিয়েছিলাম, সত্যই মা সে আগুন! সেই আগুনে পুড়ে পোড়া কাঠের মত হয়েছি।"

"সত্যি কথা বল যোগী-দিদি।"

"বলে কি পাপের প্রায়শ্চিত্তির হবে মা ?"

"বল—হবে।"

"হবে ?"

"হবে- তাই বল মা, তুমি সতী লক্ষ্মী তোমার জিনিষ কেড়ে নিতে গিয়েছিলাম, সে যে দেবতা মা দেবতা। সে যে আমার ছেলে তাই আজ সর্ব্বস্ব খুইয়ে মা বলছি, সে দিন বাগানে আর বলতে পারছি না মা—বড় ঘৃণা, বড় লজ্জা—তার পরে পড়ব মনে করে গিয়েছিলাম বাছা আমায় ছেলে বলে তুমি আমার মা। মায়ের নামে তোমার নাম, মায়ের মত তোমার সব। তাই তোমাকে বলে ফেলি, উনিশ বছর যখন আমার বয়েস, তখন যার কোলে মাথা দিয়ে শুয়েছিলাম, মা আমাকে কোলে করে চলে গেলেন—তার চোখে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠল। এমন সময় আমার ভাই এসে আমাকে হাড়ির খোয়ার করলে।"

আতঙ্কে আমার শরীর কাঁপিয়া উঠিল, আমি দেবতার পূজায় বঞ্চিত হইয়া নাস্তিক সাজিয়া বসিয়াছি, বিচারকের আসনে বসিয়া ভায়ের মাথায় পদাঘাত করিয়াছি। যোগী, সত্যই তুই মা, তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

যোগী চলিয়া গেল। আমার শ্রদ্ধা লইয়া সে মনের ময়লা ধুইয়া চলিয়া গেল, তাকে আমার পরিবারভুক্ত করিয়া লইতে চাহিলাম সে, না—বলিয়া বিদায় লইল। কিন্তু যে সমস্যার সমাধান করিয়া তীব্র আলোকে আমার দূষিত চক্ষু জ্যোতিষ্মান করিয়া গেল—তাহার সেই আলোকচ্ছটায় আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বল জ্বল উঠিল। কপটতার গুরু-আজ কি প্রাণান্তকর শাস্তিভোগ করিতে হইল—আমার আত্মঘাতী ব্যবহারে আমি যে যাতনা পাইলাম অন্ততঃ এ যাতনা পাওয়া আমার পক্ষে উচিৎ, এই বিবেচনা করিয়া তাঁর উদ্দেশে ভক্তি ভরে প্রণাম করিলাম। তাঁর চরণ ধরিয়া মার্জ্জনা চাহিতে প্রাণ ছটফট করিতে লাগিল। কিন্তু কোথায় তিনি ?—মৃত অহঙ্কারে দাতা সাজিয়া কথার ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছিলাম কাহার নিকট ?—মনস্তাপে পুড়িয়া মরিতেছি এমন সময় বিভূতি আসিয়া বলিল, "বিশেষ কাজ আছে একটা কথা বলি শুন।"

আমি—"বলে যাও আমার শরীর ভাল নেই।"

বিভূতি—"একটু বসতে দাও" বলিয়া সে আমার কাছ ঘেঁসিয়া বসিতেছিল।

আমি—সরিয়া গিয়া বলিলাম "যা বলবার থাকে বলে যাও।"

বিভূতি—"তুমি এত কঠিন?"

আমি—"নূতন নয়, তার পর কি বলে যাও।"

বিভূতি—"সত্যি বলব?"

আমি—"বল।"

মূর্খ বিভূতি যাহা বলিল তাহাতে তাহাকে নিতান্ত অনুগ্রহের পাত্র বিবেচনা করিলাম। তার কথাগুলি ঠিক হতাশের আক্ষেপের মত। ভ্রান্তি ধারণায় বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ অনেক ভুল করিয়া বসে, নিজে ভুক্তভোগী হইয়াই বিভূতির ব্যবহার চাপিয়া গিয়াছি, আজ যখন সে তাহার স্পর্দ্ধার পর্দাগুলির উপর উঠিয়া বসিল, আজ যখন অবাধে আমাকে বলিল "নিরু তুমি আমাকে পুড়িয়ে মেরো না।"

আমি মনে মনে হাসিলাম। আদর করিয়া যাঁর নিরুবালার অধিকার, তিনি অনাদরে পায়ে দলিত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, আর বিভূতি নিরু বলিয়া আদর করিতে আসে!

হাসিয়া বলিলাম "বিভূতি বাড়ী যাও।"

বিভূতি হাসি দেখিয়া বুঝিতে পারিল না, পুনশ্চ বলিয়া বসিল—"আমি যে তোমা ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাই না।"

আমি বলিলাম "এতদূর—আর বেশী অগ্রসর হয়ো না বিভূতি, বাড়ী যাও।"

সে জোড় হাত করিয়া পা ধরিতে আসে—দেখিলাম ভদ্রব্যবহারে কাজ হইবে না, গর্জ্জিয়া বলিলাম, "আর একটু সরে এলে তোমায় ফিরে যাওয়ার শক্তি থাকবে না, যেখানে আছ থাক"; সে শুনিল না। ঠাকুর বাড়ীর দরওয়ান মেরাসিংকে ডাকিলাম, মেরাসিং আসিতে না আসিতে বিভূতি বিদায় হইল, যাবার সময় বলিয়া গেল "তোমায় দেখে নেব।"

মামলা মোকদ্দমার কাগজ পত্র তাহার হস্তগত, সেই জন্য তার এই আস্ফালন। সেই দিনই জমীদার বাড়ী লোক পাঠাইয়া, মামলা মিটাইয়া বিভূতির আশার পথ বন্ধ করিয়া দিলাম। বিভূতির এই ঘৃণ্য ব্যবহারের মূলই আমি। আমার বিস্তৃত চক্ষে কখনও জল আসে নাই, আজ কাঁদিয়া শ্রীধরের ঘরে গিয়া পড়িলাম। সে দিন সমস্ত আশা জলাঞ্জলি দিয়া ঠাকুরের নিকট বিদায়ের জন্য অঞ্জলি পুরিয়া ফুল তুলসি লইয়া প্রাণের আবেগে বলিলাম "ঠাকুর এক দিন সর্ব্বস্ব দিয়া সত্যভামা তুলাদণ্ড দম্ভভারাক্রান্ত করিতে পারে নাই একটি মাত্র তুলসি পাতায় সে কাজ সাধিত হইয়াছিল। তোমায় সেই চিরবাঞ্ছিত তুলসি পত্র তোমার পায়ে দিলাম, আমার প্রার্থনা শেষ আকাঙ্ক্ষা শেষ, আমার সর্ব্বস্ব তোমাকে দিয়াছি—আমায় মুক্তি দাও।" চক্ষের জলে পথ বন্ধ হইয়া গেল।

আঁচল পাতিয়া সেইখানে পড়িয়া রহিলাম। রাত কোথা দিয়া চলিয়া গিয়াছে—ভোরে দেখি পাঁচবছরের একটি সুন্দর ছেলে এসে বলছে "মা ওঠ শ্রীধর আমাকে তোমার কাছে এনেছে।" ঘুমের সঙ্গে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, বালকের মুখখানি বুকে আঁকিয়া ঠাকুর ঘরের দুয়ার খুলিয়া দেখি সূর্য্যকিরণ ঠাকুর ঘরের কালোসিমেণ্টের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। স্বয়ম্ভূ বালককে কোলে করিয়া একব্যক্তি বসিয়া আছে, বালক কথার ফোয়ারা তুলিয়া দিয়াছে—প্রশ্নের উপর প্রশ্ন—গতি নাই বিরাম নাই, সাধুরও অনর্গল উত্তর দিয়া যাইতেছে, বুঝিতে পারিতেছি না এটা স্বপ্ন—না জাগরণ—বেশ দেখিয়া বুঝিতে পারি নাই কথার আওয়াজে ধরিয়া ফেলিলাম—যিনি কথার কাঙ্গাল ছিলেন, তিনি আজ সমব্যথাব্যথি পাইয়া কথার ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন, যাহা পাইবার জন্য তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিয়াছি আজ তিনি তাহা অবাধে

বিলাইয়া দিতেছেন, আমি ভিখারিণীর মত বালকের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার উন্মুক্ত ভাণ্ডারের দিকে গিয়া বলিলাম—ছেলেটী কে ?

প্রশ্ন করিয়া প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল—

প্রশ্ন মাত্রেই উত্তর দিলেন—এটী আমার মামাতো ভায়ের ছেলে। এটীকে তিন মাসের রেখে স্ত্রী পুরুষ মারা যায়। আমি বুকে করে মানুষ করেছি।"

তাঁহার প্রতীক্ষা করিলাম না অনুমতির অপেক্ষা করিলাম না, একেবারে বুকে লইয়া আমি বালকের মুখে চুমো দিলমে।

তিনি বলিলেন "দিলু কে রে ?

দিলু হাসিয়া বলিল—মা।—আমার চুমা দিয়া ছেলের নাম জিজ্ঞাসা করিলাম।

তিনি বলিলেন, দিলীপ কুমার" —কি একটা অভাবনীয় ভাবের প্রস্রবনে শীতল হইলাম। দিলীপের মুখ যতবার দেখি ততবার চুমা খাই।

তিনি যে এতদিন পরে আসিয়াছেন দিলীপকে পাইয়া তাহা ভুলিয়া গেলাম।

দিলীপ যখন বলিল "বাবা শ্রীধর কই ?"

তিনি শ্রীধর মূর্ত্তি আঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন।

আমি তাঁর পায়ে হাত দিয়া বলিলাম "তুমি আমায় ক্ষমা কর—"

তিনি আমার হাত ধরিয়া হাসিয়া বলিলেন "সত্য নির্ম্মল, তোমার সত্য নিষ্ঠায় ভগবান বালকের স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে আমার বিশ্বাসকে চূর্ণ করে, আমায় এখানে নিয়ে এসেছেন, কাল প্রাতে বালক স্বপ্নে কেঁদে উঠে বলে "বাবা শ্রীধর কোথায়, সেখানে আমাকে নিয়ে চল সেখানে আমার মা আছেন।"

তাঁর কথায় আমার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। আমি শ্রীধরকে প্রণাম করিলাম। তিনিও প্রণাম করিয়া বলিলেন "আমার প্রসাদ দেবে চল।"

অ-বেলায়

(কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম)

বৃথাই ওগো কেঁদে আমার কাটলো যামিনী !
অ-বেলাতেই পড়্‌লো ঝরে' কোলের কামিনী—
ও সে নিখিল কামিনী ॥
খেলার জীবন কাটিয়ে হেলায়
ভোর না হ'তেই সন্ধ্যে বেলায়
মলিন ছেলে চড়লো ভেলায়
মরণ-গামিনী ।
ওরে আমার অভিমানিনী !
আহা একটু আগে তোমার দ্বারে কেন নামিনি ॥
ঝরার আগে যে কুসুমে দেখেও দেখি নাই
বৃথাই যাওয়ার ছড়িয়ে গেল, ছোট্টবুকের একটু সুরভি,

আজ তারি সেই শুক্‌নো কাঁটা বিঁধ্‌ছে বুকে তাই
সেই সুরভি আকাশ কাঁদায় বাথায়—যেন সাঁজের পুরবী !
জান্‌লেনা সে ব্যথাহতা
পাষাণ হিয়ার গোপন কথা,
বাজের বুকেও কত ব্যথা
কত যামিনী ।
আমার বুকের তলায় রইল জমা সে—
না-কওয়া সে অনেকদিনের অনেক কাহিনী !
আহা ডাক দিলি তুই যখন, তখন কেন থামিনি ?
হে মোর অভিমানিনী !

ক্ষুদিরাম

(চিত্র)

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী)

তার নাম ছিল শশাঙ্ক, তবে সে নাম এখন তাহার জন্ম পত্রিকা ও দু-চার-জন অতি পরিচিত বন্ধু বান্ধবের মাঝেই আবদ্ধ ছিল ; গ্রামের ও দূর দূরান্তরের সকলের কাছেই সে এখন ক্ষুদিরাম নামে পরিচিত। পিতা মাতার দেওয়া সাধের নামটি পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদিরাম নাম সে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে নাই, এবং অন্ধকার রজনীর অসম সাহসীক কার্য্যের ফলেই তাহার এই নাম পরিবর্ত্তন। তখন গ্রামে দু'টি থিয়েটারের মধ্যে খুব রেশারেশি চলিতেছিল. একদল অভিনয় করিতেছিল 'পরশু রামের মাতৃহত্যা' অন্যদল অভিনয় করিতেছিল "হরিশ্চন্দ্র।" শশাঙ্ক দ্বিতীয় দলের লোক ছিল, দলের নেতারা যখন তাহার এতগুণ জানিয়াও তাহাকে 'হিরো' হইতে না দিয়া একটী দূতের ভূমিকা দিলেন, তখন সে মনে মনে নেতাদের মুণ্ডু নখদাতি ছিঁড়িয়া ফেলিবার ইচ্ছা করিলেও মুখে হাসিয়া সেই, পার্টই লইল। দূতের ভূমিকায় তাহাকে দু'টি বা তিনটী লাইন মাত্র ষ্টেজে গিয়া আওড়াইতে হইবে, একটি লাইন 'মহারাজ কি দিব সম্বাদ'—সে এই পার্ট লইয়াই এমন একটা আড়ম্বর ফাঁদিয়া বসিল যে, দশ দেশান্তরের লোক জানিয়া গেল শশাঙ্ক নাটকে পার্ট লইয়াছে। দাড়ি গোঁফ সে নিজের পছন্দ মত যোগার লেজ, কাকের পালক প্রভৃতি দিয়া তৈরী করিয়া লইল, সকলে ভাবিল শশাঙ্কই দলের মধ্যে উৎরিয়া যাইবে। অভিনয়ের দিন শশাঙ্ক যখন দূতের ভূমিকা লইয়া মহারাজকে সংবাদ দিতে দাঁড়াইল তখন তাহার অদ্ভুত বেশ ও বীভৎস চেহারা দেখিয়া সম্মুখে বসা কয়টি ছেলে বলিয়া উঠিল 'ওই শশা—কি বিশ্রী।' শশাঙ্ক মহারাজকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইতেই ছেলেদের ঐ উক্তি শুনিয়া অনাস্তিকে তাহাদের দিকে হাত ওটাইয়া কান মলার ভঙ্গী দেখাইল যে পারে তো

এখনই তাহাদের খাইয়া ফেলে তবু হেঁজে আসিয়াছে এই যা রক্ষা! ছেলেরা ঐ মোহন চেহারার আরো বিকট ভঙ্গী দেখিয়া হাসিয়া খুন, ওদিকে গা'র জ্বালায় শশাঙ্কের আর মহারাজকে সংবাদ দিবার কথা মনে ছিল না, এম্‌টারের জোর গলা শুনিয়া হুঁস হইল,—'মহারাজ'—বলিয়াই আবার ছেলেদের হাসি শুনিয়া তাহার সব শুলাইয়া গেল. সব চুপ—তার পর শশাঙ্কের জিভ মুখ ছাড়িয়া প্রায় সবটা বাহির হইয়া পড়িল—শশাঙ্ক লজ্জা পাইয়াছে,—রাজা তাড়াতাড়ি যা' তা একটা বলিয়া শশাঙ্ককে বাহির করিয়া দিলেন। এদিকে থিয়েটার হইয়া গেল, তখন যার যত ক্রোধ সব ঐ শশাঙ্কের আর হাত জিভ বাহির করার উপর পড়িতে লাগিল, শশাঙ্ক কিছু বলিল না শুধু গস্ গস্ করিতে লাগিল।

অপর দলের লোকেরা শশাঙ্ককে যা' তা বলিয়া ঠাট্টা করিতে আরম্ভ করিল—শশাঙ্ক তাহাদের কাছে নিজের গল্প করিয়াছিল প্রচুর।

সেদিন অন্য দলেরা 'পরশুরাম' অভিনয় করিতেছে, নাটক খুব জমিয়া উঠিয়াছে, রাত্রি দু'টা বাজে—তখন অভিনয় জম-জমাট পরশুরাম কুঠার হস্তে রঙ্গমঞ্চে পদচারণ করিতেছিলেন, দর্শক বৃন্দ তন্ময়—এমন সময় পাশের রাস্তা হইতে বিকট কণ্ঠে চীৎকার হইল 'খলুস-গেলুস, কে কোথায়?' ভয়ে আসর ভাঙ্গিয়া গেল, সকলেই চীৎকার লক্ষ্য করিয়া দৌড়াইল, পাশের রাস্তাটির বড় সুখ্যাতিও ছিল না রাত দ্বিপ্রহরে ও পথে লোক জন চলিতে শঙ্কিত হইত। অনেক মাকি দু' আর গাছে দু'পা ছড়াইয়া হাত রাস্তায় ঝুলাইয়া একটা কালো আকৃতি স্বচক্ষে দেখিয়াছে তাই সকলেই অমঙ্গল আশঙ্কায় দৌড়াইয়া ছিল, আলোতে রাস্তা আলোকিত করিয়া দেখা হইল, অনেকদূর পর্য্যন্ত খোঁজা হইল, কিছুই না পথের পাশে কিছু দূরে একজন ভদ্র লোকের বাড়ী ছিল, তিনি বলিলেন 'এ আর কেহ নয় ক্ষুদিরামের কাজ।' ক্ষুদিরাম কে? তিনি বলিলেন 'ওই যে ঢেরা শুয়োর চুলো ছোকরাটা—সকলেই বুঝিলেন শশাঙ্কের এই কাজ। তবু বলিলেন তিনি বাহিরে এসে ভয়ানক ভাবে লোককে দৌড়াতে দেখে কে যায় কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন উত্তর না দিয়েই সে চলে গেল, তার লম্বা লম্বা পা ফেলা দেখে, মুখের হাঁই কাঁই শুনেই তিনি অনুমান করেছিলেন—এ ক্ষুদিরাম!

সেই দিন হইতে এই অকীর্ত্তির বিশেষত্ব ভরা লোকটি ক্ষুদিরাম আখ্যা পাইল।

ক্ষুদিরাম যখন শুনিল অপর দলের লোকেরা তাহাকে এই বাঁদরামোর শিক্ষা ভাল ভাবে দিবে বলিয়া শাসাইতেছে তখন সেও মধ্যম দলের লোকদের কাছে জানাইয়া দিল 'সে জীবনের ভয় থোড়াই করে. যদি কেহ জীবনের ভয় না কোরে তার সঙ্গে টোকর দিতে আসে সে রাজী আছে। এই বলিয়া সে তাহার 'নেঙ্গা' তলোয়ার খানা বাহির করিয়া দেখাইল। তলোয়ার খানা কতদিনের ইতিহাস তাহার সাক্ষ দিতে পারে—কোন্ এক রাজা এই তরবারিতে কত অপরাধির মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন ক্ষুদিরাম তাহার ফর্দ্দ দিল—এ সে কোথা হইতে পাইয়াছে তাহাও বলিত—কত নিশি অনিদ্রায় শ্মশান জাগরণের চিহ্ন স্বরূপ এ তরবারীর দান, যা হয় জীবন রক্ষার জন্য ক্ষুদিরাম তরবারীর আর একটি গৌরব বৃদ্ধি করিবে! অপর দলেরা আর তাহাকে ঘাঁটাইতে সাহস করিল না।

সংসারে ক্ষুদিরামের আপন বলিতে এক মা আর বড় ভাই আছেন, বড় ভাই দূর দেশে চাকরী করেন, মা এখন গুণধর পুত্রকে লইয়া ঘর করেন। ক্ষুদিরাম প্রায়ই তাহার বড় ভাইটির পত্নী প্রীতির কথা উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিত। সে ইচ্ছামত কিছুই করিতে পারে না অথচ এই পোষ্টাফিসের মারফতেই তাহার দাদার বৌর গহনার বাকস ইস্‌লদহে যাইতেছে। ক্ষুদিরাম এই অবিবেচনায়

লইবার জন্ত একদিন ইনসিওর তাহার তরবারীর আঘাতে খণ্ডিত করিয়া দেখিবার ও করিয়াছে কিন্তু তাহার নেহাৎ অন্তরঙ্গ বন্ধুরা কোইয়াছিল তাই রক্ষা।

সংসারে থাকিতে গেলে বড় 'সিঙ্ক' হইলেও তাহাকে আগে অন্নের কথাটি ভাবিতে হয়। ক্ষুদিরামের ভোজন বিলাসের বলিয়া খ্যাতি ছিল, সকাল বেলায় সের দুই ওজনে ভাতে তার পর দুপুরে বিকেলে যার পাতে হবিষ্যি রাতে নিশাভোজন এ তাহার রীতিমত চাই এর উপর হইলেও ক্ষতি নাই। জমি জমা কিছুই বিশেষ নাই বড় ছেলের অর্থ সাহায্য দু'মাসে ন'মাসে কদাচিৎ সাহায্য, এদিকে দুটি পেট বিধবা যদিও মুখে ও মনে বলিবার চেষ্টা করিতেন 'আহা দুধের বাছা ক্ষুদে ও আর কটা খায়!' কিন্তু সম্মুখে বাইস বছরের বালকের আহার ও ঘরের শূন্য ভাণ্ড দেখিয়া সত্য চোখের সম্মুখে আসিয়া পড়ায় তিনি ত্রাসেই শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ক্ষুদিরাম কুটোটী ভাঙ্গিয়া দু'খানি করিত না যাহাতে নিজ পেট চলিবার কোন সাহায্য হয় তবে অ-কাম সে দিবা নিশি নেজা তলোয়ার লইয়া বনবাস ক্রোশ প্রদক্ষিণ করিয়া আসিত।

মা ছেলেকে কিছু বলিতে পারিতেন না— বুঝাইয়া বলিতে গেলে ছেলে তাহাকে নেজা উঁচাইত, গালি দিলে গৃহত্যাগী হইত। ডাক্তার গিন্নীকে দিয়া, বিধবা মাঝে মাঝে কথাটা পুত্রের সামনে উঠাইতেন, ডাক্তার গিন্নীকে ক্ষুদিরাম একটু মানিত ও বোধ হয়, কারণ প্রায় সকালেই ডাক্তার গিন্নীর রকে বসিয়া তাহাকে কাঠা ভরা মুড়ি ও বিচে কলা চিবাইতে দেখা যাইত। ডাক্তার গিন্নী যখন বলিলেন 'ক্ষুদে বাবা পাটের অফিসেই একটা না হয় কর, তোর চেয়ে কম লেখা পড়া জেনেও তো কত জনে করে খাচ্ছে।' ক্ষুদে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া উঠিয়া গেল, ক্ষুদির ধারণা তাহার মত Original দুনিয়ার দু'টি নাই তাহাকে কিনা ওই ঘরে ভিড়িয়া কোটায় বাচন দাসী করিতে হইবে!

ক্ষুদিরাম গ্রামা মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল, অবশেষে দ্বিতীয় শিক্ষকের উপর একটি আলাময়ী কবিতা লিখিয়া ধরা পড়ায় তাহার পড়া খাস্ত হয়। কবিতাটি শ্লেটের দু'পিটে লিখিটা ক্ষুদে আর একটি বালককে দেখায়। দ্বিতীয় শিক্ষকের হাত নাকি তাহার মহিষের চামের চটির মতই কোমল কঠিন ছিল। চটটা যখন তিনি চটাং চটাং করিয়া পৃষ্ঠে তাহার হাতের পরশ দিতেন ছেলেরা তখন ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িত। তাহার পূর্ব্ব দিন ক্ষুদিরাম এমনি ভাবে চপেটাঘাত সহ্য করিয়াছিল, তাহার পিঠের ও মনের জ্বালা সমস্ত রাতই ছিল তাই সকালে এই গালি ভারাক্রান্ত জ্বালাময়ী কবিতার পর শিক্ষক মহাশয়ের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ক্লাশে যখন কবিতাটি লইয়া আন্দোলন উৎসব চলিয়াছে এমন সময় দ্বিতীয় শিক্ষক আসিয়া হাঁকিলেন 'কিসের গণ্ডোগোল? পুনরায় 'ওকি' বলিয়া গর্জ্জন করিতেই শ্লেট মাটিতে পড়িয়া গেল, হাতে তুলিয়া নিজের নাম ও যা' তা কুৎসা দেখিয়া কাউয়ের ডাল আনিবার হুকুম করিলেন। অবিলম্বে জোড়ায় জোড়ায় কাঁটা ডাল আসিল, ক্ষুদিরামের দেহে আর ধারণের স্থান রহিল না। সেই দিনই ক্ষুদিরাম 'গণ্ডা কুড়ি ঘষেস হোল আর কি হবে পড়ে ছাই' এই বলিয়া স্কুল ছাড়িল। ক্ষুদি তখনও সিঙ্ক নেজা পায় নাই নতুবা হয়তো মাষ্টারের ছিন্ন মুণ্ড তে-মাথার সুটাইতে দেখিতাম।

দু'বেলা খেয়ে পরে চলিতে পারে এমন চলন সই ঘরে জন্ম হইলেও ক্ষুদিরামকে বিশেষ ভাবিতে হইল না, আপন খেয়ালেই চলিতে পারিত, কারণ মনে তার উচ্চাশা বিশেষ কিছু দেখা যায় নাই। শুধু পেটের ক্ষিদে মিটিলেই সে তৃপ্ত হইত।

যখন সে নিতান্তই দেখিল বুড়ো মা তাহার ক্ষিদে মিটাইবার জন্ত দুঃখ সংসারের সামান্ত সকল নিশেষ

করিয়া কিছুতেই তাহার সকালবেলার সামান্য জলে ভাত ও কাটাইয়া উঠিতে পারিলেন না—তাহার প্রধান আশ্রয় সিদ্ধ নেঙ্গা তরকারী মায়ের উপর উঠানেও যখন জলে ভাতের পরিবর্ত্তে মায়ের চোখের জলই শুধু পাইতে লাগিল তখন সে তাহার বাল্য কিশোর যৌবনাশ্রমের আশ্রয় পল্লী ছাড়িতে কৃত সঙ্কল্প হইল। বহু পূর্ব্বেই পল্লীর উপর তাহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছিল. কারণ বাহির হইলেই পথে ঘাটে লোকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত 'কি ক্ষুদি, কি কচ্ছ। কোন কাজ কর্ম্মে লেগে যাও না হে।" বাহিরের লোকের তাহার অবস্থার এতটা মাথা ব্যথা ও অযাচিত উপদেশ ক্ষুদির মোটেই সহ্য হইত না. বাহিরের লোক যাহারা পরের সম্বলহীন অবস্থা দেখিয়া শুধু হাসিতেই পারে তাহাদের কোন কথা তাহার মোটেই সহ্য হইত না। এত দিন এক ভাবে গিয়াছে, ঘরে যাবার ছিল তাহাতেই চলিয়াছে। এখন অভাবে পড়িয়া তাহার মা যার তার কাছে কাঁদুনী গাহিয়া বেড়াইতেছেন, সংসার আর চলে না, মার উপরেই তাহার রাগ হইল বেশী কেন মা তাহাকে হীন করিতেছেন এ ভাবে সকলের কাছে। অথচ ক্ষুদি মাকেও কিছু বলিতে পারিত না কারণ কারণ পেটে না খাইয়া তো তাহার চলিবার উপায় নাই। এই অভাবের তাড়াই যে কাঁদুনী গাহিবার মূল সেও সে বুঝিতে পারিল। ক্ষুদিরাম যে দম্ভ ভরে পথে চলিত. এখন আর তাহা পারিত না—কেহ কিছু বলিলেও সে নীরবে মনের জ্বালা গোপন করিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িত।

আজ সে তাহার চিরদিনের সাথী এই পল্লী ত্যাগ করিবে, এর পথ ঘাট বন জঙ্গল খানা ডোবা- তাহার কত পরিচিত, এই পল্লীর আকাশ বাতাস তাহার কতটা নিজস্ব ছিল আজ সে তাহা বুঝিতে পারিল, বিদায় কালে কতবার তাহার মনে হইতেছিল না চিরদিনের সঙ্গী আমার ব্যথার ব্যথী ইহাকে ছাড়িয়া গেলে শত সুখেও যে আমার শান্তি হইবে না, কিন্তু সে যে হইবার নয়—জীবন সংগ্রামের হাহাকার যে এই পল্লীতেও শতভাবে নির্য্যাতিত করিতেছে। তাহাকে যাইতেই হইবে—পল্লী তাহার স্নিগ্ধ মাধুর্য্য লইয়া তাহাকে টানিবার চেষ্টা করিতেছিল বটে, কিন্তু সেই ক্ষণেই পল্লীবাসী তাহার স্বজাতি মানুষের কুটিল ভ্রূভঙ্গীর কথা স্মরণ করিয়া তাহার চিত্ত বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার উদার উন্মুক্ত হৃদয়ের আনন্দ উল্লাস যেন এই মানুষ গুলির দিকে চাহিলেই মুষড়িয়া যায়, তাহার স্বভাবকে এমন ভাবে বিসর্জ্জন দিয়া তো তাহার থাকিবার জো নাই।

ক্ষুদিরাম কলিকাতা আসিল, সঙ্গে একটি ছোট পুঁটুলি, তাহাতে সাত ভাঁজ কাপড় জড়ান তাহার নেঙ্গাখানি ছেঁড়া একটা কোট শুটি দুই সার্ট খান দুই সেলাই করা কাপড় এই তাহার সম্বল। ক্ষুদি কলিকাতায় আসিয়া তাহার ভাই-র বাসায় উঠিল, তাহার ভাই এখানে চিত্রকরের ব্যবসায় করিতেছেন, এই আট দশ বৎসরের মধ্যে তাহার হিসাবের খাতা খানি খতাইয়া দেখিলে বোঝা যায় জমা অপেক্ষা তাহার খরচই বেশী, লাভের অঙ্ক অপেক্ষা লোকসানই অধিক। সুতরাং বাজার দেনা দাঁড়াইয়া গিয়াছিল অনেক, এখন খরিদ্দারের মধ্যে দেখা যাইত ভোর হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত শুধু পাওনাদার দের আনাগোনা। তাই চিত্রকর বাসায় প্রায়ই অনুপস্থিত থাকিতেন, নূতন ফরমাইস যাহারা দিতে আসিতেন তাহারা চিত্রকারের অনুপস্থিত ও পাওনাদারদের শুধু চিত্রশালার উপরই কড়া চাল শুনিয়া যাইতেন, যাহারা এসব না দেখিয়া উজ্জ্বল সাইন বোর্ড ও বিজ্ঞাপনের মোহে পড়িয়া কিছু দিয়াছিলেন তাহারাও তার গতি দেখিয়া যাহা অগ্রিম প্রণামী দিয়াছিলেন তাহার লোভ ছাড়িয়া যাহাতে আরো বেশী গুচ্ছা না দিতে হয় সেই জন্য সরিয়া পড়িতেছিলেন। চিত্রকর মহাশয়ও যাহাতে

পাওনাদারদের পাওনা গুলি না দিয়া তাহার মূলধন মাল মসলাম গুলি লইয়া সটান হইতে পারেন সেই. ভোগে ছিলেন। এমন সময় কুদিরাম চিত্রশালায় উপস্থিত হইল, তাহার দাদার এই ছোট ভাইটির উপর কোনদিনই বড় সুনজর ছিল না, এখন তাহার 'বাড়তি' সময়ে একজন লোকের খোরাক বৃদ্ধি হওয়াতে ভাইটির উপর তাহার মনের বিতৃষ্ণা আরো বাড়াইয়া দিল। কুদি আসিয়াছিল দাদার কাছে চিত্র বিদ্যা শিখিতে। দাদা তাকে কোন দিন কালি আর তুলিতে হাত দিতে দিতেন না. নিত্য নূতন চাকর বামুন যখন বাবুর হাত মোটেই 'উপুর' হইতে না দেখিয়া সরিতে লাগিল তখন কুদির দাদা এই নিষ্কর্মা বসে-খাওয়া ভাইটিকেই চাকর বামুনের কাজে লাগাইতে লাগিল, একেই কুদির কাজে চিরদিন বিতৃষ্ণা তার উপর এই সবনীচ কাজে তাহার মন মোটেই সরিত না।

তাহার দাদা তাহাকে কখনো 'এ নিজের কাজ করতে অপমান নেই ভাই' এ কথা বলেন নাই, বরঞ্চ বকিতেন 'কাজ করিব না তো তিন বেলা পাতরা মারা আসবে কোত্থেকে!' কুদিও সেই-রকম ভেল দিতে সুরু করিল, সে জলে ভাতে খাইতে ভালবাসিত, রাত্রে রান্না করিয়া ভাই সকালের জন্য জল দিয়া রাখিত, তাহার দাদা দু'দিন খাইয়াই আগুন, একদিন এই লইয়া চিত্রশালার সাজান ঘর খানির মধ্যে বিষম কাণ্ড হইয়া গেল, কুদির বড় ভাই তাহার তুলনায় কোমুন কিছু নয় তাই তিনি যখন কুদিকে পা হইতে ছেঁড়া চটি খুলিয়া চটাপট্ বা কত বসাইলেন তখন কুদি তাহার ভাসা চোখ দু'টি তাদের পানে চাহিল, সে দৃষ্টিতে না ছিল বেদনা না ছিল জল শুধু একটা আগুনের হলকা বাহির হইতেছিল, কুদিকে রোজন সময় কুদি বাটাল লইয়া একটা স্কেচ করিতেছিল, তাই তাহার দাদা, ওই দৃষ্টি দেখিয়াই 'দরোয়ান দরোয়ান' হাঁকিলেন। দরোয়ান আসিলে 'খুন করিবে' বলিয়া তাদের হাতের বাটাল দেখাইলেন, ও তাইকে রাস্তায় বাহির করিয়া দিতে বলিলেন।

দরোয়ানকে দিয়া যে তাহার দাদা তাহাকে এমন নাকাল করিতে পারেন কুদির সে জ্ঞানই ছিল না, সে স্তম্ভিত হইয়া বাটাল হাতে রাখিয়াই বসিয়া পড়িল, দরোয়ান কহিল 'বাবু বাটালি ছোড়িয়ে। সে কথা কুদির কানে গেল না, তখন তাহার দাদা দারোয়ানকে জোর করিয়া অস্ত্র ছিনাইতে বলিলেন। কুদির হাত হতে বাটাল আসিলে সে গুটি হইয়া বসিয়া রহিল, দরোয়ান কিছুতেই তাহার বজ্র মুষ্টি হইতে অস্ত্র বাহির করিতে পারিল না। অবশেষে কুদি দরোয়ানের হাত ছাড়াইয়া বাটালখানি যথাস্থানে রাখিয়া তাহার ছেঁড়া জামা আর নেকড়াখানি লইয়া দিবা দ্বিপ্রহরের বাহির হইয়া পড়িল।

গ্রামের একটি ছেলের মেসে গিয়া পুঁটুলিটি বাক্সের উপর রাখিয়া বিষণ্ণ বদনে বসিল। ছেলেটি এভাবে দ্বিপ্রহরে কুদিকে দেখিয়া ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিল। কুদি সব বলিয়া দু'তিন দিন যাহাতে তাহার আশ্রয়ে থাকিতে পারে তাহাই জানাইল।

ছেলেটি একটু নীরব থাকিয়া বলিল 'তা দু'তিন দিন থাকতে পারে, তবে আমাদেরও পরীক্ষা এসে পড়েছে বেশী দিন থাকা পোষাবে না। কুদি তাহার মনের ভাব বুঝিল যে, সে এখানে থাকিলে তাহার গ্রামবাসী কেও চার্জ পাইবে সে ভরসা মোটেই করিতেছে না। তাই তাহাকে দু'তিন দিনের বেশী আশ্রয় দিবার সামর্থ্য নাই এই কথা জানাইল। কুদি কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া নীচে নামিয়া এক গ্লাস জল খাইয়া কাজের সন্ধানে বাহির হইল। কিন্তু কাজ জুটিবে কোথা হইতে! দাদার আপিসে থাকিয়া আনা-শোনা সূত্রে যে সব আপিসের সঙ্গে তাহার পরিচয় হইয়াছিল একে একে সব জায়গায় ঘুরিল। কোথাও সুবিধা মত কিছু জুটিল না। দু'তিন দিন হাঁটা

হাঁটি করিয়া অবশেষে বন্দরের এক সাহেবের কারখানায় ষাট টাকা বেতনে একটি কাজ জুটিল। ক্ষুদি তো হাতে হাতে স্বর্গ পাইল, সে এত বেশী পাইবে স্বপ্নেও আশা করে নাই। বড় জোর কুড়ি, পঁচিশ হইলেই সে তৃপ্ত হইত। কিন্তু তাহার এই তৃপ্তির মোহ দু'তিন দিন যাইতেই ভাঙ্গিল। একখানা ছবিতে রং মিশাইবার সময় ক্ষুদি একটা রং এমন বেশী লাগাইয়া ফেলিল যে, তাহাতে ছবির সৌন্দর্য্য মোটেই খুলিল না বরঞ্চ বড় বিশ্রী দেখাইতে লাগিল, সাহেব যখন ক্ষুদির কক্ষে প্রবেশ করিলেন তখন একজনে সে সেই জায়গাটি ঠিক করিতেছে, আর দু'চারি মিনিট পরে আসিলেই সাহেব নজরে কিছু পড়িত না। সাহেব দেখিয়াই চটিয়া লাল, তৎক্ষণাৎ ক্ষুদিকে কর্ম্ম হইতে জবাব দিয়া দিলেন। ক্ষুদির মাথায় আকাশ ভাঙ্গিল, সে সাহেবকে বুঝাইতে যাইতেছিল কিন্তু সাহেবের লাল মুখের সাঙ্গ রক্তাভা দেখিয়া আর ওদিকে তাকাইবার সাহস হইল না। চিত্রালয় হইতে বাহির হইয়া ক্ষুদি সোজা পথে চলিল, তাহার মন জ্বালায় পুড়িতেছিল। কি করিবে সে, এখন কোথায় যাইবে! কে এমন বন্ধু আছে যাহার কাছে প্রাণের দুটো কথা কহিয়া জুড়াইবে? অনেক রাত্রে সে গঙ্গার ঘাট হইতে উঠিয়া বাসায় গেল, মেসের ছাত্রেরা সব শুইয়া পড়িয়াছে, তাহার ভাত ঘরে ঢাকা ছিল। ভাত খাইবার সময় তাহার কত কথা মনে পড়িতেছিল আজ এই অন্ন খাইতেছে, কাল হয়তো ইহাও জুটিবে না, কোথায় কি ভাবে থাকিবে কে বলিতে পারে। শুধু এই অন্নের জন্যই তাহার হৃদয়ব্যাপী এই হাহাকার জ্বালা, অথচ ইহাকে ত্যাগ করিবার সামর্থ্যও তাহার নাই—এ কত প্রিয়! খাইয়া উঠিয়া মাথার কাছের জানাটি খুলিয়া সে বসিল ঠাণ্ডা হাওয়া তাহার গায়ে লাগিতে লাগিল, তাহার গ্রামবাসী ছেলেটি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'কি হে ক্ষুদি এতরাত্রে ভাবছ কি? ক্ষুদিরাম তাহার সবকথা বলিল, ছেলেটি সব শুনিয়া ও ক্ষুদিরামের আর কলিকাতায় থাকিবার ইচ্ছা নাই জানিয়া তাহাকে বলিল তাহার এক আত্মীয় জলপাইগুড়ির কোন চা বাগানে বড় কাজ করেন ক্ষুদি যদি সেখায় যায় তার কাজ পাইতে পারে, ছেলেটি কতকটা ক্ষুদির উপকারার্থে কতকটা নিজের ঘাড় হইতে ঝামেলা বিদায় হয় সে জন্য এ প্রস্তাব করিল।

পরদিন মেসের ছাত্রেরা ক্ষুদিরাম বাবুর চাকুরী পাওয়ার খাওয়া আদায় করিতে আসিয়া শুনিল ক্ষুদিরামবাবু কাজ ছাড়িয়া দেশে গিয়াছেন, মেসের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করিয়া যাইতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া গেছেন।

জলপাইগুড়ি আসিয়া ক্ষুদিরাম তাহার গ্রামবাসীর আত্মীয়ের অনুগ্রহে দেবপাড়া বাগানে একটি কাজ পাইল, ত্রিশ টাকা মাসে মাহিয়ানা চাকর বাকর সাত টাকা, ক্ষুদিরাম প্রথম মাসের মাহিয়ানা পাইয়াই মাকে কুড়ি টাকা পাঠাইয়া দিল এই কুড়ি টাকা পাঠান ব্যাপারটি গ্রামময় সেই দিনই রাষ্ট্র হইয়া গেল কারণ ক্ষুদিরাম যে পোষ্টকার্ডখানি লিখিয়াছিল তাহার উপরে শিরোনামে শুধু লেখা ছিল 'মাতাঠাকুরাণী' c/o কিছু নাই। বৈকালে পোষ্টমাষ্টার যখন ডাক কাটেন তখন এই অসাধারণ চিঠিখানি হাতে পাইয়া কোন বাড়ীতে যাইবে তাহা ঠিক করিবার জন্য গ্রামবাসী এক যুবকের হাতে দিলেন, চিঠিখানি দেখিয়া নীচে খসাড়ের নাম পড়িয়া ক্ষুদিরামের বাড়ী বলিল। তাহার পর দিন ক্ষুদির মা টাকা পাইলেন ও ঐ বাড়ীতে তাহার ক্ষুদের চাকরী হইয়াছে সংবাদ দিতে গেলেন। দুই তিন মাস পরে ক্ষুদির আর একখানি চিঠি তাহার মা পাইলেন, মা তাহাকে গুরুদেবের জন্য কিছু প্রণামী পাঠাইতে লিখিয়াছিলেন তাই ক্ষুদি লিখিয়াছে। 'ও সব ব্যাপার আমার দ্বারা হবে না, যদি গুরুদেব আসেন তো এক সন্ধ্যা তাহাকে খাইতে দিও অপর সন্ধ্যা আসন পাতিতে চাহিলে

হাসিল কুসুর বাড়ী দেখাইয়া দিও। চিঠিখানি পড়িয়া সকলে হাসিল।

কুসির মা এখন রায় বাড়ীর বৈকালিক রামায়ণ পাঠের আসরে নিত্য যোগ দেন, রামায়ণ শুনিবার কালে তিনি তেল ও গরম পরিয়া আসেন এসব তাহার কুসি তাহাকে পাঠাইয়াছে। রায়গিন্নিদের সে কাপড় বড় মনে লাগিয়াছে তাই তিনিও এক-খানি কাপড়ের জন্য বড় ধরিয়াছেন। কিন্তু কুসির মার আর কাহারও জন্য কিছু অনুরোধ করিবার সাহস নাই – ওরা গুরুদেব তাহার কথা বলিতেই যখন মুখে অমন লিখিয়াছিল তখন আবার এতে না কি বলিবে।

অবরোধ

কথা-নাট্য

(শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত)

প্রথম দৃশ্য।

[রাজনগর অবরোধে। চল্লিশদিন কাটিয়া গিয়াছে। সৈন্যগণ উপবাস-ক্লিষ্ট। সংক্রামক ব্যাধি পীড়িত। নগরের চতুর্দিকেই পর্ব্বত একদিকে একটী রন্ধ্র পথ। সেই রন্ধ্রপথের মুখে দুইজন প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে। পর্ব্বতের উপর উঠিবার এখানে কোন পথই নাই। নিম্নে সমতল ভূমিতে শিবির শ্রেণী। চারিদিকে মৃতের দুর্গন্ধ। রাত্রি অন্ধকার। মেঘ মেঘে আকাশ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। দূরে পর্ব্বতোপরিস্থিত বিটপী শ্রেণীতে নক্ষত্রমণ্ডলীর ন্যায় খদ্যোত জ্বলিতেছে। কদাচিৎ দুই একটা শৃগাল ডাকিয়া উঠিতেছে। একজন প্রহরী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যেন দুলিতেছে আর মাঝে মাঝে নিজের বাম হাত চাটিতেছে, আর একজন কোমরটা দুমড়াইয়া মুখ বিকৃতি করিতে করিতে ঘুরিতেছে। মাঝে মাঝে একটা দমকা বাতাস বড়ের মত পার্ব্বত্য রন্ধ্র পথে ডাক দিয়া উঠিতেছিল।]

(দূরে যেন কাহার পায়ের দ্রুত চলার শব্দ শোনা গেল)

১ম প্রহরী। (হাঁকাইতে হাঁকাইতে) যায়……কে। কে!

২য় প্রহরী। কোথায় কে! কে!……ও কিষের ভূতটা বুঝি ছুটে পালাচ্ছে রে।

১ম প্রহরী। আরে ওই তুই অমন পেটটা দুমড়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চুলছিস নাকি……

২য় প্রহরী। আরে দূর! আর চলে না—কিষের ভূতটা কি রকম ঝাপট মেরে বেড়াচ্ছে দেখছিস। শোন্, দেখ শোন্, তুই আমার একখানা হাত কষিড়ে ধর, আমি তোর একখানা কামড়ে খাই।

১ম প্রহরী। পেটের দায়ে লড়াই করতে এসে এখন আর পেটের সঙ্গে লড়াই করতে পারা যায় না বাবা! হাঁ……

২য় প্রহরী। অরে তুই বলিস কি শুধু পেটের দায়ে লড়াই করতে এসেছি……হ্যাঃ দেশটা বুঝি কিছু নয়।

১ম প্রহরী। আরে আপনি বাঁচলে বাপের নাম। আপনি আগে বাঁচি তবে বাপ-পিতোমোর তিটে।

(আবার দূরে ও নিকটে পদশব্দ শোনা গেল)

১ম প্রহরী। (কোমর তুলিয়া খাড়া হইয়া) কে যায় রে—কে যায়—সাড়া না দেয় (আঁধারে লণ্ঠন দিয়া আলো ফেলিয়া ঘুরাইয়া দোলাইয়া দেখিয়া) ও ছুলো কুকুরটা।……ও বেটাও কিষের

ভূতের তাড়ায় ছুটে বেড়াচ্ছে। সব কুকুর গুলো শেষ হয়েছে এই তোরা দুটো হলেই বস্—

২য় প্রহরী। অ্যাঁ বলিস্ কি ও যে সেনাপতির কুকুর……ওকে ..…অ্যাঁ!

১ম প্রহরী। কেন গাধা গুলো ঘোড়া গুলো হয়েছে, তিনটে বেয়াল তেরটা কুকুর সব গুলেই যখন পেটায় নমঃ হয়েছে, তখন এই নেলো আর ভুলো ……এই দুটো বাকী; কাল সকালে ত দুটোর একটা জবাই হবে। দেখ এক কাজ করি আয়, রাত্তিরেই সাবড়াই। ওই বরণা তলায় পুড়িয়ে খেয়ে দেব।

২য় প্রহরী। আরে তুই পাগল হলি নাকি?

১ম প্রহরী। সেই তার বাকী—ঝাঁকি মেরে দেখ দিকিন, আমি মরা না জ্যান্ত, দানোয় পাই নি ত? কিরীচের ফালটা পেটে ছুঁইয়ে দেখ—দেখ! দেখ্ নোয়া ছুঁইয়ে ভাখ্!

২য় প্রহরী। দানোয় পায় নি তবে শীঘ্রই পাবি দেখ এই পাহাড়টায় নিজ্জল্ ক্ষিধের ভূত আছে, দেখছিস একগাছা ঘাসের পাতা পর্য্যন্ত নেই। ঘোড়ার ঘাস কুকুরের মাস খেয়েছে আর ঘাস চিবিয়েছে। জিবে তার গণ্ডারে করাত আছে পাহাড়ের ছাল পর্য্যন্ত চেঁচে খেয়ে ফেলেছে বাবা! বাবা ক্ষিধের ভূত কি সোজা ব্যাপার!

১ম প্রহরী। আরে তুই কোস্ কি—ক্ষিধের ভূত কি রে।

২য় প্রহরী। জানিস্ নি বুঝি। সে বেটা সেই যুদ্ধের গোড়া থেকেই আমাদের পেছু নিয়েছে—সব রসদ শেষ করে কুকুর বেয়াল শেষ করেছে সেই ঝাঁকড়া চুলো উকুন নিকিরীতে ভরা ছালে হাড়ে রস নিঙ্ড়ে ছাপটান, পেটে আঁতে আঁত—যে দেখে সেই আঁতকে ওঠে ওপর থেকে পেটের ভেতর আঙুল চালায় আর নাড়ি ভুঁড়ি আঁতাড় গুলো ধরে পাক দেয় আর টানে!…তুই দেখিস নি—

১ম প্রহরী। আচ্ছা কতদিন আর এমন করে চলবে? এই যে শুনছি নদীর ওধার দিয়ে জাহাজ আসছে আমাদের উদ্ধার করতে।

২য় প্রহরী। আসছে, আসছে, অনন্ত কাল ধরেই আসছে—অন্ত না হলে ও আর অনন্তে মিলতে পাচ্ছিনে।

(দূরে ভুঁদা কুকুরটা জোরে ডাকিয়া উঠিল সঙ্গে সঙ্গে দূরে আরো একটা কুকুর ডাকিয়া উঠিল)

১ম প্রহরী। ওই দুটোর ডাকা-ডাকি আরম্ভ করেছে।

২য় প্রহরী। নিজ্জল্ সেই আঁতড়ি ভূতে তাড়া মেরেছে শুনছিস্ নি কি জোরে দৌড়ুচ্ছে…আর পায়ের নলি গুলোর তেল শুখিয়ে গাঁটগুলো শুধু মট্-মট্ করছে!

১ম প্রহরী। দেখ এক কাজ করি আয় নেলোটাকে এক খোঁচা দিয়ে ওই ও ধারে টেনে নি গিয়ে এক চুমুক রক্ত খেয়ে নেওয়া যাক্ কি বলিস অ্যাঁ!……ওরে ভারি চেল্লা পাচ্ছে।

[উর্দ্ধে আকাশে কিসের যেন বায়ুতে সঞ্চরণ শব্দ শোনা গেল…মেঘের অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না]

২য় প্রহরী। ওই শোন ক্ষিধের ভূত শোঁ শোঁ করে চলেছে……

১ম প্রহরী। না না দেখ্ বুঝি পুষ্পক রথ আসছে আমাদের খাবার খাবার নিয়ে।

[অকস্মাৎ আকাশে একটা বুম্ করিয়া শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে লাল অনন্ত গোলা উঠিয়া উর্দ্ধে ফাটিয়া আলো করিয়া তুলিল। সেই আলোকে চকিতের বিদ্যুত চমকের মত বহুদূর অবধি দেখা গেল—শিবিরের পর শিবির শ্রেণী নিঃশব্দে ভূতের মত দাঁড়াইয়া আছে।]

২য় প্রহরী। আচ্ছা সেদিনকার মত যদি এক ঝাঁক বক এই মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায় কি মজাটাই হয়। উঃ হু হু! (পেটটা দুমড়াইয়া বন্দুকের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল।)

১ম প্রহরী। কি হলো আবার।

২য় প্রহরী। আর সেই কিবে-ভূত আঁতড়ি ধরে টান দিচ্ছে রে!

(আবার আকাশে একটা জলন্ত গোলা উর্দ্ধ পথে উঠিয়া সমস্ত আলোকে ভরিয়া দিল আর ঠিক সেই সময়ে রক্ত পথের ধার দিয়া একজন হাবিলদার আসিয়া দাঁড়াইল।)

হাবিলদার। পাহারা!

প্রহরীদ্বয়। হাজির!

হাবিলদার। কি বল তোমরা আর কি পারা যায়? যেমন করে হোক্ বাঁচতেই হবে।

১ম প্রহরী। কি খেয়ে বাঁচব, বাঁচতে ত হবে। আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

হাবিলদার। আমি তাই সৈন্যদের বলছি সকলে মিলে আমরা রক্তের মুখ খুলে দিই হয় তারা আসুক নয় আমরা তাদের কাছে গিয়ে অস্ত্র সমর্পণ করি কি বল।

(যখন ইহারা কথা বলিতেছিল নিঃশব্দে তাহাদের পশ্চাতে কে একজন দাঁড়াইল।)

২য় প্রহরী। তবে এ চল্লিশ দিন শুখিয়ে থাকবার কি দরকার ছিল, আমাদের কি একটা ইজ্জতের দাম নেই।

১ম প্রহরী। আর ইজ্জতে কাজ নি...কাল ভোরে আমরা সব অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে দিই এখুনি আমরা খেতে পাব।

(অন্ধকার হইতে রাজপতাকাবাহী—কেন সেটাই এত, ইজ্জত কিছু না—এখনও ত দুটো কুকুর আছে।)

হাবিলদার। কে তুমি! অন্ধকারে আমার পিছনে!

১ম প্রহরী। (আঁধারে—লণ্ঠনের আলো ফেলিয়া) ও পতাকাবাহী রাজপুত!

রাজপতাকাবাহী। হাঁ আমি রাজপুত পাঠান নই।

হাবিলদার। আমিও পাঠান, তা বলে যা হয় না, হতে পারে না তার জন্যে মরা নিতান্তই বাতুলের কার্য্য!

রাজপতাকাবাহী। হতে পারে, না পারে, ভেবে জগতে কেউ কিছুতো করতে পারে না—তবে যখন আমাদের নিজেদের ভেতর এমন অনৈক্য তখন শত্রু আমাদের ঠিক দুটি দুটি চানা চিবাবার অবসর করে দেবে এই একটা বিশেষ ভরসা দেখতে পাচ্ছি। তবে এটা স্থির আমার প্রাণ থাকতে এ রাজপতাকা আমি সমর্পণ করে দেব না।

(ঘুরে ভুলো ডাকিতে ডাকিতে চলিয়া গেল)

হাবিলদার। ওই ভুলো যাচ্ছে কাল প্রাতে ওকে জবাই করে কালকের দিনটা চলবে কাল ওর পালা। যার যার কুকুর ছিল সবাই দিয়েছে, আমার দুটো ছিল আমি একটা দিয়েছি। কাল সেনাপতির পালা। আর তুমি পতাকা সমর্পণ করবে না—তবে কি আমরা সেই কুকুরের মত একটার পর একটা মরব না খেয়ে খেয়ে—বাঁচতে ত হবে—বাঁচাই ধর্ম্ম।

রাজপতাকাবাহী। বলেন কি তানটের দুর্গজয়ে যখন সেনাপতি পর্ব্বতের উপর থেকে কামানের গোলা লেগে ঘোড়া শুদ্ধ পড়ে অজ্ঞান হন, ভুলো সেই অন্ধকার খাদের ভেতর পোষাক ছিঁড়ে দাঁতে করে কামড়ে জলে ভিজিয়ে তাকে বাঁচায়, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসে আমার এই পতাকার কাছে এসে আমায় ইঙ্গিত করে, সে ভুলোকে কি মানুষ কেটে খেতে পারে।

হাবিলদার। দেখা যাক্ ভোরে কি হয় আমি সকলকে রাজী করেছি, তারা কাল আত্ম সমর্পণ করবে। তুমি না কর তোমার পতাকা নিয়ে বুকে জড়িয়ে মর।

রাজপতাকাবাহী। তাই যেন হয় যদি মরতে হয় রাজপতাকা বুকে জড়িয়েই যেন মরি। কিন্তু আপনি মিথ্যা সৈন্যদের এই অন্যায় পথ, অধর্ম্মের পথ নেবার জন্যে চালনা করতে চান, আপনার

অত্যন্ত অন্যায় এ দিকের আপনার কোন ক্রমেই ভাল নয়।

হাবিলদার। যেন! যেন! যেন হে যেন, কাল ভোরেই দেখা যাবে।

রাজপতাকাবাহী। দেখবেন ভাই দেখবেন,! যদি মৃত্যুও হয়—যুদ্ধে যখন এসেছি তখন মৃত্যুকে দোসর করেই এসেছি—যদি যদি, এই রাজপতাকা বুকে ধরেই মরব সে মৃত্যুতে আমাদের রাজার পরাজয় নয় সে মৃত্যু সম্মানের—সে মৃত্যু অমর!

হাবিলদার। তাল তাল। দেখা যাবে!

রাজপতাকাবাহী। তাই দেখবেন!

(প্রস্থান)

১ম প্রহরী। তাল বল্লে বোঝে না।

২য় প্রহরী। বল্‌ছ বটে—তবে চল্লিশ দিন যখন কাটান গেছে তখন ইজ্জতটা।

১ম প্রহরী। পেটে নেই ভাত তার ওপর আবার এত তাত! আরে বস্ রে!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[প্রভাত হইয়াছে বন মেঘ ভেদ করিয়া সূর্য্য প্রকাশ হইতে চায়, মেঘ আবার তাহাকে ঢাকিয়া ফেলে। মেঘের সূর্য্যে যেন অগ্নির খেলা চলিতেছে। দূর পর্ব্বতের বৃক্ষশীর্ষে মেঘের দল অবস্থানীকে যাবে যবে হইতেছে। দূর বৃক্ষান্তরের অন্তরাল পক্ষীর দল সেই মেঘের অন্তরাল দিয়া উড়িয়া যেন। ধীরে সূর্য্য পর্ব্বতান্তরাল হইতে বাহির হইতেছিল। সম্মুখে বহুদূর বৃক্ষান্তরাল শৈল শ্রেণী ব্যতীত বিরীন মাঠ শুষ্ক, রুক্ষ, কর্কশ, তৃণ বড় পর্য্যন্ত নাই। শিবির শ্রেণীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেনাপতি রাজপতাকাবাহী রাজপুত, ও প্রহরীগণ। দূরে সৈন্যগণ ও হাবিলদার জটলা করিতেছিল। হাবিলদারকে দেখিয়া রাজপতাকাবাহী রাজপুত রাজপতাকা লইয়া সেনাপতির ঠিক পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।]

(সৈন্যগণ ও হাবিলদার অগ্রসর হইল)

সেনাপতি। সৈন্যগণ! বন্ধুগণ! ভাই! আজ আমাদের কোন উপায়ই দেখি না। এখন কি আমরা শত্রুর কাছে মাথা নিচু করে পেটের অন্নে ভিক্ষে মাগব···

রাজপতাকাবাহী। না খেয়ে আমরা শুকিয়ে মরব, তবু রাজপতাকা শত্রু করে সমর্পণ কর্‌ব না এই প্রতীজ্ঞা।

সেনাপতি। এই প্রতীজ্ঞা? এ কি সত্য···

রাজপতাকাবাহী। সেনাপতি মহাশয়! সত্য ভিন্ন এ জীবনে মিথ্যাকে কখন বরতে পারি নি, মিথ্যা কেন বলব। মৃত্যুও একদিন আছেই তবে আপনি যতক্ষণ আমাদের সেনাপতি রূপে জীবিত আছেন—আপনি যদি এ পতাকা দিতে না বলেন—ধূলিত পদলেহনের দাসজনসুলভ পথে যেতে না দেন—ততক্ষণ আমরা দেখব—মৃত্যুকে আমরা ভয় করি না, শত্রুর পায়ে মাথা নোয়াবার আগে, নিজের কাঁধ থেকে মাথা নিজে নেমে যাবে।

সেনাপতি। ভাই! তোমার এ কথায় আমার এ অনশন ক্লিষ্ট বুকখানা যেন ধন্যহাত হয়ে গেল—বন্ধু তুমি! আমায় কোল দাও।

(আলিঙ্গন করিলেন)

ভাই সব! আজ একাদিক্রমে দুই মাস আমরা অবরোধে। বাহিরের কোন সম্বাদ আমরা জানি নে। শুধু জানি সে সিন্ধুবিরা আমাদের রাজনগর অবরোধ করেছে। আমার পায়রাবতও ফিরে আসে নি—সম্ভবতঃ শত্রুর লক্ষ্যে তার বক্ষ দীর্ণ হয়ে গেছে, না হলে সে আমার হয়ত ফিরে আসত। এখন আমাদের বাহিরে হতে কোন সাহায্যের সম্ভাবনা নেই বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না। অতএব তোমরা এখন কি করতে চাও? সকলে শত্রুর কাছে কি আজ সমর্পণ করতে চাও? আমায়

তোমরা আজ যে আদেশ করবে আমি তা দেবতার অনুজ্ঞার মত পালন করব। সত্য কি তোমরা রাজার অবমাননা, আত্মার অবমাননা, দেশ জাতির প্রাণের ভর্ত্তার অবমাননা করে বাঁচতে চাও, না এই মুক্ত আকাশের তলায় মুক্তপ্রাণ বহ্নিসম, সর্ব্বভুক পাবকের মত জ্বলন্ত মূর্ত্তিতে, শত্রুর জলন্ত গোলার মুখে উড়ে যেতে চাও। ইহলোকে পরম প্রীতি, যশ ও পুণ্য লাভ করে পরলোকে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ নিয়ে নিত্য আনন্দলোকে বাস করতে চাও—না অন্ধতম লোকে চিরদাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে চাও।

হাবিলদার। সেনাপতি মহাশয় বাঁচাই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

সেনাপতি। যদি বাঁচার মত বাঁচা হয়, না হলে হেয় হয়ে জীবলোকে বাস মনুষ্যত্বহীন অকর্ম্ম এবং ভারবহ অধর্ম্ম। মানুষ অধর্ম্ম আশ্রয়ে কবে মনুষ্যত্ব পেয়েছে বল—এমন ভাবে মরা-বাঁচা পুরুষের ধর্ম্ম নয়, মানুষেরও ধর্ম্ম নয়।

রাজপতাকাবাহী। এ বাঁচা নয় পলে পলে শুধু মরা। এ ভাবে মরা কাপুরুষের ধর্ম্ম।

হাবিলদার। যেমন করেই হোক, জীবন অত্যন্ত মূল্যবান পদার্থ, তাকে বাঁচাতে পারলে তবে অন্য উপায় হতে পারে।

সেনাপতি। বাঁচবার কোন্ উপায় আছে বল। আজ কয়দিন হোল সব খাদ্যই নিঃশেষ। এক-টুকরো কুকুরের মাংস—দিনান্তে একবার, তাও আজ আর নাই।

হাবিলদার। কেন এখন আমাদের ত' দুটো কুকুর আছে।

সেনাপতি। ও—দুটো! দুটো! ঠিক! তারা আমাদের সেব যাত্রার সহযাত্রী। হাবিলদার! ভুলো! আমায় তিনবার জীবন দিয়েছে।

হাবিলদার। নেলোও আমার বড় আদরের, আমি আমার কেলোকে আমার পালায় দিয়েছি—নেলো সেদিন একটা বড় পাহাড়ে বুনো শেয়াল মুখে করে টেনে এনেছিল। আপনার ভুলো দেখতেই শরীর—সেত একটা শীকারও পারে না। সে দিনকার বুনো শেয়ালটায় আটজনের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়েছিল।

সেনাপতি। নেলোর বদলে ভুলোকে ওঃ—হাবিলদার! ঠিক! সৈন্যগণ আমাকে তোমরা আমার ভুলোর প্রাণ ভিক্ষা দাও। আমি বহু যুদ্ধে তোমাদের চালনা করেছি. বহু দিনের দুঃখ-সুখে তোমরা আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর—তোমরা আমার ভুলোর প্রাণভিক্ষা দাও।

রাজপতাকাবাহী। নিশ্চয়! নিশ্চয়! সেনা-পতির কুকুর ভুলোকে বাদ দিতেই হবে, কি বল ভাই সব!

হাবিলদার। কেন? সেনাপতির কি এমন নূতন শ্রেষ্ঠ অধিকার পেতে পারেন যাতে আমার দুটোকেই দিতে হবে। আজকের পালা ওঁর ওঁকেই আজ সে বলির পশু দিতেই হবে। যখন সকলে সমান ভাবে কষ্ট ভোগ করছি—তখন সমভাবেই ত্যাগ করতে হবে। ওঁর দরদ আছে আমার নাই, আমিও নেলোকে বহু যত্নে পালন করেছি। একটা দিয়েছি। আজ ওঁর পালা!

সেনাপতি। হাবিলদার! আমি একদিন তোমার দুষ্কৃতির জন্যে তোমায় শাস্তি দিয়েছিলাম। তানটের দুর্গজয়ের সময় তুমি দরিদ্র ভিক্ষুকীর উপর অত্যাচার করেছিলে। আজ কি এই দুর্দ্দিনে তাহারই স্মৃতির অসহ্য জ্বালা ও দহন যাতনার প্রতি-শোধ নিতে চাও। প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির চরম চরিতার্থ হবে?

হাবিলদার। আপনি উন্মাদ হয়েছেন। সে মিথ্যা অপবাদ ও অপরাধের শাস্তি ভোগে আমি একটুকও বিচলিত হই নি—সমস্ত সৈন্যের মাঝে আমার সেই দারুণ মর্ম্মান্তিক অপমান আমি ভুলি নি সত্য—কিন্তু আপনার মন কি এতই নীচ

যে এতদিন পরে সেই কথা স্মরণ করে আমাকে নূতন করে আঘাত দিতে চান। জানেন ধরিত্রী সর্ব্বংসহা আমিও তাইও—তাই···

সেনাপতি। তা—হবে—যাক্ থাক্. সে কথা, আর তুলনা। তবে তুলোর প্রাণের মূল্য আমার চেয়েও বেশী—তাকে আমি কি করে দেব—আমার রক্ষা কর। ভাই সব! তোমরা আমায় বলে দাও —কি কর্ত্তব্য?

হাবিলদার। আমরা এতগুলি প্রাণী তবে আজ কি খাব!

সেনাপতি। সে একটা ভাববার কথা বটে, তবে তার বদলে আমাকেই খাও, তোমরা এই নাও আমার রাজপ্রদত্ত তরবারি—তোমরা আমায় বধ কর, বধ কর, সেই তোমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ! তোমরা তৃপ্ত হও, তোমাদের ক্ষুৎ প্রবৃত্তির শেষ নিবৃত্তি হোক্। হে জঠরানল আমাকেই তুমি আহুতি গ্রহণ কর।

হাবিলদার। আপনি সত্যই উন্মাদ হয়েছেন, দেখতে পাচ্ছেন প্রহরীরা ক্ষুধায় আপনার নিজেদের হাত নিজেরা কামড়াচ্ছে।

সেনাপতি। নাও নাও তবে আমার হৃদপিণ্ড নাও...আমায় বধকর, আমায় বধকর। (জানু পাতিয়া বসিলেন।

হাবিলদার। দেখ! দেখ! সৈন্যগণ সেনাপতি একটা কুকুরের জন্যে বাতুল হয়েছেন, অথচ এটা দেখছেন না—যে আমরা সকলেই আর কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে পেটে কিছু না দিতে পারলে বাঁচতে পারছি নে। বাঁচাই ধর্ম্ম এ কথা তিনি বুঝেন না—কি দুর্ভাগ্য!

রাজপতাকাবাহী। এমন করে বাঁচা—না-না চলুন আমরা রক্ত মুখ খুলে শত্রুর ছাউনী আক্রমণ করিগে—দেখছি সম্মুখে মৃত্যু—কি ভয়! যদি মৃত্যু হয়—অক্ষয় স্বর্গ লাভ! রাজার সম্মান, আমার সম্মান দেশ ও জাতির সম্মান, আমার এই পতাকার সম্মান সকলই রক্ষা হবে। আমরা পৃথিবীর জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে নাম লিখে রাখব! জানি আমরা মুষ্টিমেয় তারা অসংখ্য আমরা উপবাস-দুর্ব্বল - তারা সবল,

সেনাপতি। না না—তাই একা তুমি আর আমি—না সৈন্যগণ আমায় তোমরা বধ কর। তোমাদের ধর্ম্ম রক্ষা হোক্—তোমরা বেঁচে থাক।

হাবিলদার। সৈন্যগণ! তোমরা কি এখন এই বাতুলের কথায় কান দেবে? শুধু শুধু মানুষ কখন মানুষকে হত্যা করতে পারে বল তোমরা।

সেনাপতি। সত্যইত! মানুষ কখন মানুষকে হত্যা করতে পারে। সত্যইত মানুষ কখন মানুষকে হত্যা করেছে কি? ঠিক্! ঠিক্! কখন না, শুধু মাত্র স্বার্থের ছুরিখানা নিদ্রিত মনুষ্যত্বের বুকের ভেতর আমূল বসাতে পারে। শুধু ঘোর নিশায় সুপ্ত নগরীকে অগ্নিতে ধ্বংস করতে পারে। বিজয়ের ছলে—সভ্যতার বিকাশ ও সম্প্রসারণ সভ্যতার ছলে মনুষ্যত্বকে দলিত করে ধর্ম্ম করতে পারে। জগতের ধ্যান ধারণা শিল্পকলা জ্ঞানের মূর্ত্ত বিকাশ, শান্তির মঙ্গলময় প্রীতি এই স্বার্থের নখরে দীর্ণ করতে পারে—সৃষ্টির আদিম যুগ হতে মনুষ্যত্বকে ত মানুষে মারে না। মানুষ কি মানুষকে হত্যা করতে পারে! ঠিক্! ঠিক!

হাবিলদার। সৈন্যগণ। শোন এখন কি তোমরা এই প্রলাপীর প্রলাপ গাথা শুনে পেট ভরাবে না সত্যই বাঁচবার উপায় করবে।

সৈন্যগণ। না না আমরা আর কোন কথা শুনব না, খাবার চাই, নয় যাই—শত্রুরা বন্দী যদি করে—সেও উত্তম!

রাজপতাকাবাহী। ধিক্···ধিক্···

সেনাপতি। না-না ঠিক! ঠিক! ওই যাচ্ছেই মনুষ্যত্ব—হাহা হাহা বাঁচাই ধর্ম্ম! যদি বাঁচাই আমার ধর্ম্ম হয় তবে জগতের কোন জীবই মৃত্যুকে ধর্ম্ম বলে গ্রহণ করতে পারে না। ওহো মৃত্যুত'

হয় নয়। নিজেকে জ্যান্ত-বড়া করে বেঁচে থাক সেই শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্ব। তারপর শত্রুর পুরীতে গিয়ে লাভের সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে শত্রুর অজ্ঞাতে তারি পানীয় জলে বিষ প্রয়োগ করে ধর্ম, শাস্ত্র সম্মান উত্তম মনুষ্যত্বে লাভ কর। অথবা রাত্রে অন্ধকারে লুকিয়ে শিছন থেকে বিশ্বোটক ছুঁড়ে ভয়াবহ সৎ-সাহসের দিকবিজয়ী মহিমা প্রচার কর! বাঃ! বাঃ!

সৈন্যগণ! না না আর সওয়া যায় না—চল চল ওটাকে আজ সবাই মিলে জবাই করে নিতেই হবে। আর আমরা ক্ষিধের চোটে দাঁড়াতে পাচ্ছি নে। আগে পেটে কিছু পড়ুক, তারপর শত্রুর কথা ভাবা যাবে। উপোস করে কেউ লড়াই করতে পারে না।

রাজপতাকাবাহী। উপবাস করেই রাজপুত লড়াই করে আসছে। তাই তার গর্ব্ব। সে আর্ত্তের রক্ষার্থেই যুদ্ধ করেছে, যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ করে না।

হাবিলদার। তবে চল বন্ধুগণ! আর ও বাতুলের কথায় কোন কান দিয়ো না চল।

সেনাপতি। কি আমি কি তোমাদের সেনা-পতি নই। অস্ত্র নামাও সৈন্য গণ! হাবিলদার! তুমি বিদ্রোহী, আমি আবার তোমার শাস্তি বিধান করব।—যাও সৈন্যগণ! পাহারা!...না না তোমরা আমায় ক্ষমা কর। আমায় বধ করো আমার ভুলোর প্রাণ দাও! (ভুলো কুকুরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।)

হাবিলদার। চল, চল ভাই-সব, ও বাতুলের কথায় কান দিয়ো না, ছাড়িয়ে টেনে নিয়ে যাও,—যদি কিরি রাজার কাছে যদি এর জন্যে বিশেষ জবাবদিহি করতে হয়—আমি সে জন্য প্রস্তুত—আমি তার জবাব দেবো···তোমরা সকলে এখন আমার আদেশ পালন কর···

সেনাপতি। (ভুলোকে আরো বুকের ভিতর টানিয়া লইলেন, ভুলো গর্জ্জিয়া কাঁদিয়া উঠিল, সকলে মিলিয়া জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া চলিয়া গেল)

হাবিলদার! হাবিলদার! রাজার উপরেও রাজা আছে!

(মাটীতে, সেই কঠিন শীলা পৃষ্ঠে মুখ গুঁজড়াইয়া) আমায় নাও, ভগবান! ভগবান! কেন তুমি আমায় ত্যাগ করলে। আমায় নাও। ওঃ ভুলো! ভুলো!

(নেপথ্যে কুকুরকে হত্যা করার জন্য একটা মরণ চীৎকার উঠিল—সেনাপতি উঠিয়া ছুটিয়া যাইতে কঠিন প্রস্তরের উপরে পড়িয়া গেলেন।)

রাজপতাকাবাহী। প্রভু! প্রভু! কাতর হবেন না, এত কাতর হবেন না!

তৃতীয় দৃশ্য।

[গভীর রাত্রি, মেঘাচ্ছন্নতারা-পটমী-নিশিতমতঃ, দিক্ নিরূপণ হয় না—মাঝে মাঝে শুধু বিজলীর ঝলক ও বজ্রের কড়কড়া। সেনাপতি সেই অন্ধকারে মৃত কুকুর ভুলোর লোমে কাতর হইয়া 'যাদা' করিয়া ফিরিতেছিলেন। ভুলাবশেষ অস্থিগুলা একজায়গায় জড় করা পড়িয়াছিল নেলো সেই হাড় টানিয়া কামড়াইতেছিল। সেনাপতির পায়ে দেখিয়া সে পলাইল।

সেনাপতি। (অন্যমনস্কভাবে) ভুলো আমার কোথায় গেল! ওহো! সব ছিল না?—এই যে সব পড়ে—এই না সব গুলো, না-না এই যে আমার খুলিটা—এই যে কলিজা, আহা হা! কলিজা, আমার কলিজা! ভুলো! ভুলো! আচ্ছা মৃতকে কি আবার জীবন দেওয়া যায়—না—রজনীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী! —এই রক্ত পথে ভূত প্রেত থাকে তারা তমেছি হাহা হিহি করে ছুটে বেড়ায়, ওগো! কে কোথায় আছ—আমার প্রাণ নিয়ে এর প্রাণ দাও! আমার পাপ-

তার হাড়খানা নিয়ে না হয় এর মূর্ত্তি ফিরে যাও! নেই! নেই! কেউ নেই! না-না-না মরাকে কেউ বাঁচাতে পারে না। প্রাণ! প্রাণ! কোন্ খানে, কোন-কোন খবর নেই।

(কড় কড় করিয়া বাজ ডাকিল, বিদ্যুতের আলোকে নিশীথের অন্ধকার আরো ঘন হইয়া উঠিল)

ওই যে কে যেন সাড়া দিলে না! প্রাণ! প্রাণ! রুদ্রকে ডাক দিয়েছি আসবে না! বিশ্ব-প্রাণ বায়ুকে ডাক দিয়েছি জাগাতে হবে, জাগাতে হবে, ভুলো! ভুলো!

চাইনা সম্মান চাইনা যশ, চাই না রাজপতাকা আয়! আয়! ভুলো! ভুলো! আমি অসুর লোক থেকে মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র নিয়ে আসব। প্রাণ! প্রাণ! এই যে ভুলো জেগে উঠেছে!

(ভয়ানক জোরে ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হইল—সেনা পতি উন্মত্তবৎ সেই ঝড়ের সঙ্গে লাফাইয়া উঠিয়া হাহা হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—পরক্ষণেই একটা বন্দুকের গুলি আসিয়া তাঁহার বক্ষে পড়িল, ওঃ বলিয়া সম্মুখে মুখ থুবড়াইয়া পড়িলেন, সব শেষ হইয়া গেল। বৃষ্টি তখন মুষলধারে পড়িতেছে। ঝড়া তখন অট্টহাস্য রত পথে ঘোর রবে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে।

অমলচন্দ্র *

(শ্রীমতী সু—— ——ঘোষ)

অমল অমল!
কোন্ দূর সিন্ধু পারে, আলোকে কি অন্ধকারে,
বাঙ্ময়ীর রত্নাগারে, কোথা আছ বল?
আর কি পাবনা দেখা, অমিয় মাধুরী-মাখা,
সদা জাগে আঁখি আগে, সে মুখ কমল?
প্রাণাধিক ধন!
করি নাই তব যথা উচিত যতন।
মোর বহু পুণ্য ফলে, এ কুটীরে এসেছিলে,
কত সুখী করেছিলে, রে হৃদি রতন!
তুমি রাজা এ গৃহের, তুমি হৃদয়ের,
কোন্ দোষে সবে ছাড়ি করিলে গমন?
করেছি কি অনাদর, এস এস বক্ষোপর,
সহস্র আদর দিয়ে চাহিব মার্জ্জন।
রে বাল গোপাল!
একবার স্বপ্নঘোরে, অথবা সাক্ষাতে মোরে
বল আমি তোরে ছেড়ে রব কতকাল?
তোর মুখ না দেখিয়া, অক্ষত রয়েছে হিয়া,
দেহেতে জীবন আছে, হা নির্দ্দয় কাল!
একা শিশু কার সাথে, চলে গেল কোন্ পথে,
নিশ্চিন্তে বসিয়া আছি, ও মোর দুলাল!
অমল অমল!
কোন্ দোষে শক্তিশেল হানিলি চপল?
তনু তব সুকুমার, কঠোরতা এ ধরার,
সহিল না তাই ফিরে, হইলে শীতল?
মাতৃনাম জপ করে, গভীর মধুর স্বরে,
চলে গেলে মার ক্রোড়ে, নির্ভীক সবল!
পিতৃচিত্র বক্ষে রাখি, দিব্য হাসি মুখে মাখি
কালেরে করিলি জয়, রে পিতৃবৎসল!
হে সুর কুমার!
অমরার ধন তুমি, নহত আমার।
বহু পুণ্যে এসেছিলে, মুখস্মৃতি রেখে গেলে,
পুষ্পপ্রাণ পুষ্প-আয়ু, পুষ্প গন্ধ তার!
এ স্মৃতি হৃদয়ে রাখি, দেখিব সজল-আঁখি,
বিহরিছে স্বর্গোদ্যানে প্রিয় দেবতায়!

---

* দেহিকার দ্বাদশবর্ষীয় বয়স্ক প্রিয়তম পৌত্রের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে রচিত।

হে প্রিয়দর্শন !
ধরণী তোমায় তরে করিছে ক্রন্দন।
স্বজন বান্ধব যারা, ধরায় লুটায় তারা,
আর দেখিবে না সেই মূরতি মোহন !
কত স্নেহ কত খেলা, মধুর প্রেমের লীলা,
শিশুমুখে জ্ঞান ধর্ম্ম কথা সুশোভন।
নিমিষে আসিল চোর হরিল সে রত্ন মোর,
কোথা গেল ? ভেঙ্গে গেল সোণার স্বপন !
হে প্রাণ কুমার !
কোথা আছ একবার দেখা দাও মোরে,
আলোকিত দিব্য প্রান্তে, গোলোকের পথে পথে,
দেবশিশুদের সাথে, কর কি ক্রীড়ন ?
খেলা সেরে খেলা হলে, বৈকুণ্ঠ কমলা কোলে,
আদরে কর কি তুমি অমৃত ভোজন ?
অপরাহ্ণে সখাসনে, বিরহী নন্দন বনে,
ইন্দ্রানী আদরে কণ্ঠে দেন দিব্য হার ?
নিশীথে কৈলাসপুরে, ঘুমাও মায়ের ক্রোড়ে,
মহাশক্তি অঙ্কে শিশু তনু সুকুমার ?
পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট, সকল হয়েছে নষ্ট,
নবরাজা পাইয়াছ রাজ অধিকার ?

আলোচনা

গত আষাঢ়ের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচী মহাশয়ের পত্রের উত্তরে 'প্রবাসী' সম্পাদক মহাশয় অনেক কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর অনেক কথাই আমাদের যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় নাই।

১। প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় দ্বিজেন্দ্রবাবুর পত্রোত্তরে একস্থানে লিখিয়াছেন, "ইহা বোধ হয় নিরপেক্ষ লোক মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে যদি কেহ কপট ভাবে দোকানদারী করিয়া গান্ধীকে শ্রদ্ধা দেখাইতে চায়; তাহা হইলে পুরাপুরি নির্জ্জলা অবিমিশ্র শ্রদ্ধা দেখাইয়া যত আর্থিক লাভ হইবে, কপট শ্রদ্ধার সহিত সমালোচনা তেজাল দিলে তত্টা লাভ হইবে না।" ঠিক কি তাই ? যখন প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় নিজেই লিখিয়াছেন, "সেই (দোকানদারী) বুদ্ধি অনুসারেই, অর্থাৎ লাভালাভ কিসে বেশী হয় তদনুসারেই আমার কার্য্যের সমীচিনতার বিচার হউক।" তখন তাঁহার কথা শিরোধার্য্য করিয়াই বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাক। আমার মনে হয় সমসাময়িক কোন জননায়ক বা দেশনায়ক বা দেশপূজ্য লোক, যাঁকে দেশের সমস্ত আনা তিনপাই লোক শ্রদ্ধা করিয়া থাকে, তাঁর সম্বন্ধে কোন কাগজে অবিমিশ্র শ্রদ্ধা অপেক্ষা মাঝে মাঝে একটু আধটু খোঁচা থাকিলেই কাগজের কাট্‌তি হয় বেশী। লোকে অন্ততঃ রাগ করিয়াও কেনে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এমন দু'একটি সংবাদ পত্রের নামও করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা করিতে ইচ্ছা নাই—প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় "challenge করিলেও না।" তারপর লাভ ছাড়িয়া দিলেও আর একটা লাভ ও আছে। প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় যেমন দ্বিজেন্দ্রবাবুর সহিত একটুখানি রসিকতা করিতে গিয়া বলিয়াছেন "দ্বিজেন্দ্রবাবু সুকৌশলে বা কুকৌশলে বিনিপয়সায় নিজের কবিত্বের বিজ্ঞাপন দিয়া লইয়াছেন।" ঠিক তেমনি করিয়া আমরাও প্রবাসী সম্পাদক মহাশয়ের সহিত একটু খানি রসিকতা করিয়া বলিতে পারি—চতুর লোকেরা যেমন বড় বড় লোককে গাল দিয়া হঠাৎ বিখ্যাত হইয়া উঠিতে চান, প্রবাসী সম্পাদক মহাশয়ও গান্ধীজীকে ধরিয়া তেমনি করিয়া সস্তায় বাজীমাৎ করিবার মতলব করিতেছেন না ত ? — প্রবাসী সম্পাদক মহাশয়ের মার্জ্জিত সুরুচি তাহার

বলিতে গেলে বলিতে হয়, "যাহা হউক, গান্ধী-মহারাজের সান্ত্বনা এই যে ইহাতে করিয়া প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় রাতারাতি যদি বিখ্যাত হইয়া উঠেন, তাহা হইলে এই অনিচ্ছাকৃত নিঃস্বার্থ পরোপকারের পুণ্যফল গান্ধীমহারাজ কিছু পাইতে পারেন।" প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় যখন দেখাইয়াছেন যে দেবদেবী লইয়াও ঠাট্টা চলে, তখন প্রবাসী সম্পাদক মহাশয়ের সহিত (যিনি আর যাই হোন, অন্ততঃ দেবদেবী অপেক্ষা কম শ্রদ্ধার পাত্র) রসিকতা করিয়া বোধ হয় বিশেষ অপরাধ করি নাই—মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থা।

২। তারপর ইস্‌লামিক সভ্যতা যে ইংরেজী সভ্যতার চেয়ে হিন্দুদের উপর অনেক বেশী আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ দেখাইতে গিয়া প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় সভ্যশ্রীয়ের সিদ্ধি, মর্দ্দনীয়া সম্প্রদায় প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে আমাদের খেই হারাইলে চলিবে না। আসল কথাটা কি লইয়া উঠিয়াছিল তাহা দেখিতে হইবে। দ্বিজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, (মহাত্মা গান্ধী যাহা বলিয়াছেন) আমি যাহা বুঝি, তার সারমর্ম্ম এই, "ইংরেজি শিক্ষার ফলে আমাদের মনের গঠন বিকৃত ও অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। আমরা দেশের মর্ম্মস্থানে প্রবেশের পথ চিনতে পারছি না। এই জন্য ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষেরাও লোকের মন ও চরিত্রের উপর তেমন স্থায়ী প্রভাব রাখতে পারছেন না।" আসল কথা, ইংরেজি শিক্ষিত মহাপুরুষগণের সহিত mass এর ঠিক মনের সংযোগ হইতে পারে না; কেন না, mass পড়িয়া থাকে তাহাদের প্রাচীন শিক্ষাদীক্ষা লইয়া আর ইংরেজি শিক্ষিত মহাপুরুষগণ অগ্রসর হইতে থাকেন তাহাদের বিদেশী নূতন শিক্ষাদীক্ষা লইয়া। কাজেই কেহ কাহাকেও ঠিক বুঝিতে পারে না,—ইহাই দ্বিজেন্দ্র বাবুর মতে গান্ধী মহারাজের বক্তব্যের প্রধান উদ্দেশ্য।

ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে গিয়া সম্পাদক মহাশয় এই মতেরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। তিনি দেখাইয়াছেন নানক প্রভৃতির সময় ইসলামিক সভ্যতা আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে পর্য্যন্ত প্রবেশ লাভ করিয়াছিল—অন্যে পরে কা কথা। ইহা হইতে ইহাই বুঝা যায় যে নানক প্রভৃতি মহাপুরুষগণ ও জনসাধারণ সে যুগে একই সভ্যতার মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রবাবুও ত ঠিক এই একই কথা বলিতে চাহিয়াছেন। আর এক স্থানে সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, "সভ্যশ্রীয়ের কথার মত "খৃষ্টিয়ান সেন্ট" বলিয়া কোন কাহিনীর সৃষ্টি হিন্দুদের মধ্যে ইংরেজের আমলে হইয়াছে কি?" হয় নাই-ই ত! এবং হয় নাই বলিয়াই ত বুঝিতে হইবে mass এ সভ্যতাকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করে নাই—গ্রহণ করিয়াছে কেবল খৃষ্টিয়ের শিক্ষিত সম্প্রদায়। রামানন্দবাবু নিজেই ত প্রমাণ করিতেছেন যে ইংরেজ আমলের সভ্যতা আপামর সাধারণে গ্রহণ করিতে পারে নাই—যেমন করিয়াছিল মুসলমান রাজত্বের সময়ে। এবং এই কথাই ত দ্বিজেন্দ্রবাবু অর্থাৎ মহাত্মাজী গোড়া হইতে বলিতে চাহিতেছেন।

আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় এত কষ্ট করিয়া ঐতিহাসিক নজির প্রভৃতি খাড়া করিয়া শেষকালে বিপক্ষদলের সত্যকে এমন ভাবে সপ্রমাণ করিবার জন্য এত প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ করিলেন কেন—এও কি "অনিচ্ছাকৃত নিঃস্বার্থ পরোপকারের পুণ্যফল লাভ করিবার আশায়?" এত কাণ্ড করিয়া শেষ কালে তিনি এইটুকু মাত্র দেখাইলেন যে, ইংরেজের আমলে খৃষ্টান সভ্যতা জনসাধারণের মধ্যে তেমন ভাবে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই, যেমন করিয়াছিল মুসলমান সভ্যতা। তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে (আমাদের মতে নয়, রামানন্দবাবুরই মতে) মহাত্মাজীর পক্ষে সে ছাঁচে ঢালাই করিয়া ধর্ম্মপ্রচার

করা মত আমাদের যুক্তি সঙ্গত নয়! রাজা রামমোহনের উপর ইংরেজি সভ্যতা কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা লইয়া আমরা তর্ক করিতে চাই না। আমরা কেবল দেখাইতে চাই প্রবাসী দ্বিজেন্দ্রবাবুর মত খণ্ডন করিবার জন্য যে সকল যুক্তি এবং তথ্যকে সাক্ষি মানিতে চাহিয়াছেন, সে সকল যুক্তি এবং তথ্য সাক্ষি দিয়াছে বটে, তবে দুঃখের বিষয় প্রবাসীর স্বপক্ষে নয় বিপক্ষে। এরূপ ঘুষখেগো সাক্ষী যে বড় ভয়ানক জীব তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া আমরাও ভবিষ্যতে সাবধান হইয়া যাইব—ইহার জন্যও হয়ত প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় অনিচ্ছাকৃত কিঞ্চিৎ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া লইলেন।

একটা কথা প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় রাগের মাথায় ভুলিয়া গিয়াছেন হয় ত: সেটা হইতেছে এই যে, মুসলমান সভ্যতা শুধু হিন্দুদের উপর প্রভাব বিস্তার করে নাই, হিন্দু সভ্যতাও মুসলমানদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। অর্থাৎ মুসলমান এবং হিন্দুসভ্যতার মধ্যে রীতিমত একটা আদান প্রদান ব্যাপার চলিত। কাজেই ইংরেজী সভ্যতার সহিত মুসলমান সভ্যতার ঠিক তুলনা চলে না। তারপর, প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় আর এক স্থানে লিখিয়াছেন, "দ্বিজেন্দ্রবাবুর চিঠি ও তাহার উত্তর ছাপিতে, ও তাহার উত্তর দিতে আমার প্রতি পৃষ্ঠায় ১৪।১৫ টাকা খরচ হইতেছে।" দ্বিজেন্দ্রবাবু ত এই চিঠির ভিতর দিয়া নিজের কবিত্বের বিজ্ঞাপন দিয়া লইয়াছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—এই যে প্রবাসীর প্রতি পৃষ্ঠা ছাপাইতে কত খরচ হয় তাহার একটা মোটামুটি estimate দেওয়া এটা কিছু কম বিজ্ঞাপন নাকি? মানুষের খুঁত ধরিতে বসিলে অতি সহজেই ধরা যায়। রামানন্দবাবু যেমন দ্বিজেন্দ্রবাবুর কৈফিয়তটাকে আত্ম-বিজ্ঞাপনের একটা কৌশলমাত্র বলিয়া ধরিয়া লইতে একটুও ইতস্তত: করেন নাই, আমরাও রামানন্দবাবুর এই প্রবাসী ছাপাইবার খরচাদির সহিত পাঠকের পরিচয় করাইয়া দিবার চেষ্টাকে ঠিক সেই দিক দিয়া দেখিতে পারি। এবং তাহা হইলে জিনিষটা এই হইয়া দাঁড়ায় যে প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় এই ছিড়িকে তাঁর প্রবাসীর মূল্য বৃদ্ধির একটা কৈফিয়ত দিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রবাসীর প্রতি পৃষ্ঠা ছাপাইতে কত খরচ হয় তাহা পাঠককে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়া তিনি যেন ইহাই বুঝাইতে চাহিতেছেন যে প্রবাসীর মূল্য বৃদ্ধি করার মধ্যে যথেষ্ট আর্থিক কারণ বর্ত্তমান আছে।

জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের যে পত্র ছাপান হইয়াছিল তাহার মধ্যে এক জায়গায় রবিবাবু লিখিয়াছিলেন, "পাঞ্জাবের ঘোর দুর্দ্দিনের সময়ে সমস্ত দেশে আমি ছাড়া আর একজনও একটি কথাও বলে নি।" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটিকে প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় ঘুরাইয়া না লইয়া সহজভাবে গ্রহণ করিতে আমাদের উপদেশ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "চিঠির ভাষা যাহাই হোক আমার যে ধারণা প্রথমে হইয়াছিল তাহা বলাই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়।" কেন না, "তিনি (রবীন্দ্রনাথ) শিশু-সুলভ বড়াই করিবার লোক নহেন।" এ খুব উদার মনের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু গান্ধীজীর বেলায় এ উদারতা তাঁর কোথায় ছিল? একথা বোধ হয় প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় স্বীকার করিবেন যে গান্ধীজীও শিশুসুলভ চপলতা করিবার লোক নন। তবে তিনি রামমোহন সম্বন্ধে যে সকল অসঙ্গত কথা বলিয়াছেন তাহার বিচার করিতে গেলেন কেন? সেখানেও তিনি এই বলিয়া সারিয়া দিলেন না কেন, যে গান্ধীজী শিশু-সুলভ চপলতা করিবার লোক নন? তখন তাঁর এই উদার মহাত্মা-ভক্তি হঠাৎ কেন যে এত শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল তাহা তো বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

রামানন্দ বাবু বলিতে চান রবীন্দ্রনাথের মনের কথা ঠিক ওরূপ নয়। তাহা হইলে বলিতে হয়

রবিবাবুর ভাষা এস্থলে ঠিক তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারে নাই। বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মত লোকও (যিনি রবিবাবুর সহিত একেবারে ঘনিষ্ঠতম সূত্রে আবদ্ধ) যেন রবিবাবুর ভাষা হইতে আমাদের মত খারাপ অর্থটাই গ্রহণ করিয়াছেন, তখন রবিবাবুর পত্রের ভাষা যে আমাদের অর্থই সাধারণতঃ ও স্বভাবতঃ জ্ঞাপন করে, তাহাই বলিয়া মনে হয়। অথচ রামানন্দবাবু বলিতে চান, রবিবাবুর মনের কথা ঠিক তাহা নয়। অর্থাৎ এস্থলে রবিবাবুর ভাষা যে তাঁর মনের ভাবকে প্রকাশ করিতে আদবেই পারে নাই, তাহাই, রামানন্দবাবু আমাদিগকে বুঝাইতে চান। অন্য কোন লোকের সম্বন্ধে এ কথা বলিলে হয় ত বা মানিয়া লইতে পারিতাম, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ কথা বলিলে বাস্তবিকই দুঃখ রাখিবার আর জায়গা থাকে না। রবিবাবুর ভাষা এই সামান্য একটা ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া যে এত দোষ পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে, তাহা চক্ষে কখনও দেখি নাই, কল্পনায়ও কখনও ভাবিতে পারি নাই, কেবল তাঁর একজন ভক্তের নিকট আজ প্রথম শুনিলাম। রবিবাবুর সম্বন্ধে অন্য অনেক কথা হয় ত বা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু প্রকাশ ভঙ্গীর দোষ যে তাঁর হইতে পারে এ কথা আজও বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিলাম না। রবিবাবুকে বাড়াইতে গিয়া প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় তাঁকে যে কি ভয়ানক অপমান করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই। গোঁড়ামী মানুষকে এমনি ভাবেই অন্ধ করিয়া ফেলে।

আমাদের কথা

স্বর্গীয় মহাপ্রাণ গৌরীশঙ্কর মারতিয়া

আসাম চা-বাগানের কুলীদের সাহায্যের জন্য কার্য্য করিতে যাইয়া চাঁদপুরের সুরমল নগরমল ব্রাদার্সের কারবারের ম্যানেজার যুবক গৌরীশঙ্কর মারতিয়া কলেরা রোগীর সেবায় কলেরা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। দেশের এ জাগরণের দিনে তাঁহার আত্মত্যাগ আমাদের আদর্শস্থল হইবে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র তেইশ বৎসর হইয়াছিল। রাজপুতনায় বিনাও নামক স্থানে তাঁহার বাড়ী। গৃহে তাঁহার অন্ধ বৃদ্ধ মাতাপিতা, বিধবা পত্নী এবং দুইটী শিশু-সন্তান আছে। তাঁহার পরিবারবর্গকে আমরা কেবল এই সান্ত্বনা দিতে পারি যে তিনি যথোচিত পুণ্যলাভ করিয়াছেন। এ মহাপ্রাণ যুবকের মৃত্যুতে সকলেই মর্ম্মাহত হইয়াছেন।

চট্টগ্রামে শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজের সম্বর্দ্ধনা

শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ সাহেব চাঁদপুরের কুলীবিভ্রাট ব্যাপারে আমাদের উৎপীড়িত দুঃস্থ দেশবাসীদের সাহায্যের জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি সমগ্র দেশবাসীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাই যখন তিনি কুলীদের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহের জন্য চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন, সেখানকার অধিবাসীবৃন্দ তাঁহাকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিতে ত্রুটী করেন নাই। সভায় তাঁহার গলার মালাটী সাড়ে সাত শত টাকায় বিক্রয় হইয়াছিল; আর তাঁহার গায়ের জামাটী সাড়ে পাঁচশত টাকায়।

কিন্তু শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ সাহেবের একটী উক্তিতে আমরা কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। তাঁহার মতে কোন ইংরাজই নাকি রমণীর প্রতি যথোচিত

করিতে পারে না। আমাদের সম্মুখে যে সমস্ত প্রমাণ আছে তাহাতে এ কথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। আমরা জাতি হিসাবে অতি নীচ হইতে পারি, কিন্তু মানুষ হিসাবে প্রত্যেক ইংরাজই যে খুব বড়, প্রত্যেক ইংরাজই যে এণ্ড্রুজের ন্যায় মহাপ্রাণ কবিকল্প এ কথা স্বীকার করা যায় না। শিয়ালকোটে যে একজন ইংরাজ সৈনিক একজন স্ত্রীলোককে মারিয়াছে, এবং আদালতে তাহাকে বেকসুর খালাস করিয়া সে কথা স্বীকার করিয়াছে, ইহার পরেও কি এণ্ড্রুজ সাহেব তাঁহার কথা জোর করিয়া বলিতে পারেন? এণ্ড্রুজ সাহেব অবশ্যই জানেন যে প্রত্যেক ইংরাজ তাঁহার মত হইলে চাঁদপুরের কুলীদের জন্য কিম্বা দক্ষিণ আফ্রিকার ও ফিজি দ্বীপে তাঁহাকে পরিশ্রম করিয়া বেড়াইতে হইত না।

তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডার

তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে এক কোটী টাকার উপরে উঠিয়াছে। অনেকের সন্দেহ হইয়াছিল, অনেকের আশঙ্কা হইয়াছিল, অনেকে আবার উপহাসও করিয়াছিল। শত্রুর মুখে কালি দিয়া, মিত্রের মুখে হাসি ফুটাইয়া, দেশের আশা শতগুণে বাড়াইয়া টাকা আশাতীতরূপ উঠিয়াছে। মহাত্মার মাহাত্ম্য অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। অনেকে বলেন যে গবর্ণমেণ্ট লোনে এক কথায় পনের কুড়ি কোটী টাকা ওঠে আর তিলক স্বরাজ্য ফণ্ডে এককোটী উঠান কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত গবর্ণমেণ্ট লোন দান নহে, এক কথায় বলিতে গেলে তাহা সম্পত্তি বিশেষ। লোক সাধারণ ধন সম্পদের আকাঙ্খা বশতঃই তাহাতে টাকা দিবে। আর তাহার পিছনে আছে ভয়। আর তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে যে দান তাহা সম্পূর্ণ স্বতঃপ্রণোদিত দান, তাহার ভিতর স্বার্থত্যাগের যে মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা দেশের ভবিষ্যতের জন্য সম্পূর্ণ আশান্বিত হইয়াছি। একবার মনে হইতেছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রাসাদ নির্ম্মাণের জন্য কার্জ্জনের চেষ্টা। তাহাতে বহুকষ্টে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা উঠিয়াছিল। তাহার সহিত তুলনা করিলে স্বরাজ ফণ্ডের এ টাকা উঠাতে দেশের কতবড় বাহাদুরী!—সমস্ত বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া মহাত্মা গান্ধী যে দেশের জন্য অসাধ্য সাধন করিতে পারিয়েন সে কথা আজ যেন অন্তরের ভিতর হইতে বলিয়া দিতেছে।

'মুক্তি ও নির্ব্বাণ' ও শিক্ষার প্রভাব

শব্দের ধাতুগত সূক্ষ্ম অর্থ আবিষ্কার করিয়া অনেকে জাতির মানসিক গতির ধারা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন। বৌদ্ধরা নাকি ননকো-অপারেশনের পথে চলিয়াছিল, প্রমান তাহাদের 'নির্ব্বান'। আর হিন্দু তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরে উঠিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল 'মুক্তির' পথে। দুইটীর মধ্যে পার্থক্য কোথায় তাহা বুঝিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। কবির কল্পনার চসমার ভিতর দিয়া কবির মত হইয়া না দেখিলে যে ইহা বুঝা যাইবে এরূপ মনেও হয় না। কবি জটীল ভাষার সহস্র পাকের ভিতর দিয়া বুদ্ধ দেবের 'নির্ব্বান' বিকৃত করিয়া তুলিতে পারেন, আর সে ভাষার বাহ্যিক চাকচিক্যে নয়ন মনমুগ্ধ করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু মহাত্মা গান্ধী যে বলিয়াছেন বাস্তবিক পক্ষে 'নির্ব্বান' 'মুক্তি' এক, সে কথা কে অস্বীকার করিতে পারে। জীবের জীবন যাপনের চতুর্দ্দিকে যে সহস্র দেওয়ালি গাঁথা, তাহা ভাঙ্গিয়া বাহির হইবার একটা সাধারণ প্রবৃত্তি মানুষের হৃদয়ে চিরদিন বর্ত্তমান। তাহাকে নির্ব্বানই বল আর মুক্তিই বল, মানব চরিত্রের সনাতন ধারা তাহাতে বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হইবে না।

মহাত্মা গান্ধীর একটা কথা ঠিক আমরা বুঝিতে পারি না। সাহিত্য-চর্চ্চা জিনিষটাকে তিনি বড়

ছোট করিয়া দেখিতে চান। তিনি বলিয়াছেন—"The Poet's concern is largely about the Students. He is of opinion that they should not have been called upon to give up government Schools before they had other schools to go to. Here I must differ from him. I have never been able to make afetish of literary training. My experience has proved to my satisfaction that literary training by itself adds not an inch to one's moral height and that character building is independent of literary training."

সাহিত্য শিক্ষা বা সাধারণ লেখাপড়া শিক্ষা মানুষের চরিত্রগঠনে একবিন্দুও সাহায্য করে না, এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু তাহার কোনও প্রভাব নাই এ কথা কিছুতেই বলা যাইতে পারে না। Influence of environment and circumstances জগতে কেহ এড়াইতে পারে না, আর মানবচরিত্র শিক্ষার উপর কিছুমাত্র নির্ভর করে না এ কেমন কথা!—

সম্প্রদায় বিশেষের ভিতর একতার কারণ

ভারতবর্ষে বহু সাম্প্রদায়িক, বহুধর্ম্মবাদী, বহুভাষাভাষী লোকের বাস। আচার ব্যবহার, ক্রিয়া কর্ম্ম, দৈনন্দিন জীবন যাপনের ধরনও বহু প্রকার। স্বার্থও সর্ব্বত্র একরূপ নয়। ইহাদের মধ্যে একতার অভাব বলিয়া অনেকেই অভিযোগ করিয়া থাকেন। একতার অভাবের বহুপ্রকারের কারণও অনেকে দেখাইয়া থাকেন। এবং সেই সেই কারণ বর্ত্তমান থাকাতে ভারতে জাতীয় অভ্যুত্থান ঠিক মত ঘটিয়া উঠিতেছে না বলিয়া অনেকে আপশোষও করিয়া থাকেন। এই কারণগুলি অবশ্য সকলেই যে যুক্তি দ্বারা ধরিয়া দেখাইয়া থাকেন সব ক্ষেত্রে সেরূপ মনে হয় না। অনেক সময় মনে হয় অনেকে যে কারণ দেখাইয়া থাকেন, সে কারণ আবিষ্কারের মূলে তাঁহাদের অন্তরের ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত ঈর্ষা বিদ্বেষ একেবারে লুপ্ত নয়।

প্রথম কথা জাতি শব্দের অর্থ কি? বর্ত্তমানে ইউরোপ প্রচলিত nation শব্দটীর প্রতিশব্দ আমরা করিয়া লইয়াছি 'জাতি'। কিন্তু nation হইতে হইলে যে সমস্ত দেশবাসীর একটা এক ধরণ Homogeniety of the People হওয়া দরকার তাহা যে আমরা 'জাতি' শব্দের সহিত সব সময় বুঝিয়া থাকি এরূপ মনে হয় না। ইউরোপীয় জাতিগুলির ভিতরে যত প্রকারের বিবাদ বিসম্বাদ অনৈক্য বর্ত্তমান থাকুক না কেন, এক একটী জাতির সমস্ত লোকগুলির ভিতর যে একটা একধারা বর্ত্তমান আমরা সেটা যে সব সময় সম্যক উপলব্ধি করিয়া নিজেদের ধারা এক করিবার চেষ্টা করি তাহা মনে হয় না। অনেকে হয় ত ঠিক ইউরোপীয় ধরণে nation গড়িতেই অনিচ্ছুক। কিন্তু শুধুমাত্র একতার জন্যই যে একধারা দরকার তাহা অস্বীকার করা যায় না। একতা একটা পদার্থ নহে। একতা ঠিক স্নেহমমতা প্রভৃতির ন্যায় অন্তরের primary instinct (মূল প্রেরনা) নহে। একতার মূলে থাকিবে এক স্বার্থ, এবং সেই এক স্বার্থ একই ধরণে পালন করিবার অবসর। জাতীয় ও সামাজিক সমবায়, মানুষের সামাজিক সুখশান্তি একতার উপর নির্ভর করে। একতা একই স্বার্থ, একই ধরণে জীবন যাপনের উপর নির্ভর করে। একই ধারা গড়িয়া তোলা সব ক্ষেত্রে প্রথম আবশ্যক।

'প্রবাসী' পত্রিকায় 'বিবিধ প্রসঙ্গে' চট্টগ্রামের হরতাল উপলক্ষে রামানন্দ বাবু পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানদের ভিতর একতার যে সমস্ত কারণ দিয়াছেন তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারিলাম না। যদি একেশ্বরবাদীতা রাষ্ট্রনৈতিক একতা আনয়ন করিতে পারিত তাহা হইলে জগতের অনেক দেশের অনেক

জাতিই আজ ইউরোপের কাছে মাথা হেঁট করিয়া থাকিত না। আমাদের দেশের ব্রাহ্মসম্প্রদায় একেশ্বরবাদী, এবং তাঁহারাও মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতির ন্যায় একযোগে উপাসনাদি করিয়া থাকেন। রাধানন্দবাবু কি বলিতে পারেন যে তাঁহাদের ভিতর রাষ্ট্রনৈতিক মতদ্বৈধতা নাই? এ অনৈক্যের ভিতরও কি এক ভাবের অভাব পরিস্ফুট নহে?—

সাম্প্রদায়িক গণ্ডি মুছিয়া দেওয়া দরকার

আমাদের দেশের বহু সম্প্রদায়িক এবং বহু ধর্ম্মবাদীর মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান দুইটী প্রধান সম্প্রদায়। এই দুইটীর পূর্ণ মিলন যে আমাদের জাতীয় উন্নতির একমাত্র পরিপোষক তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। ইহাদের ভিতর একই ধরণ একই ধারা প্রবর্ত্তন অবশ্য সময় সাপেক্ষ এবং প্রধান প্রতিবন্ধক জাতীয় বিপুল অজ্ঞতা। আর একটী প্রতিবন্ধক বিভিন্নমুখী দুইটী গর্ব্বিত ধর্ম্মবাদ। আবার এই দুইটী জাতির পিছনে যে বহুকালব্যাপী বিরাট ঐতিহাসিক ইতিহাস বর্ত্তমান তাহার কঠিন দেওয়াল ডিনামাইটের শক্তিকে উপহাস করিয়া উন্নত শিরে দণ্ডায়মান। ইহার মূলেও কঠোর গাঁথা অজ্ঞতায়। কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের ভিতর যে শিক্ষিত সমাজ আজ জাতীয় উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর তাঁহারা এ দেওয়ালের বিলোপ সাধনের ব্যবস্থা করেন কই? বহুত আজ তাঁহাদের ডাকে হৃদয়ে মনুষ্যত্বের সাড়া অনুভব করিয়া আমরা এক মুখে হাটিতেছি;—কিন্তু মাঝখান দিয়ে দেওয়ালের ত কোনই পরিবর্ত্তন হইতেছে না। যতদূর নজর চলে দূরে চক্রবাল রেখার প্রান্তে যেখানে সব যেন অনন্তে মিশাইয়া যায়, এ দেওয়াল যেন সেখানেও দুইটীকে পৃথক রাখিয়া উপহাস করিতেছে।

ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিলাম, মূল ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়। কিন্তু আরও বহুবিষয়কে তাহারাই কোটায় ফেলিয়া খিচুড়ি পাকাইয়া সমস্ত বিষয় জটীল করিয়া তুলি কেন? সামাজিক আচার ব্যবহার, নিত্য-নৈমিত্তিক সহস্র খুটিনাটি সমস্ত তার ভিতর সহস্র পার্থক্য থাকিবে কেন? সেগুলির সহিত ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ? সমগ্র ভারতবাসীর রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের সহিত ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িকতা আনিয়া দেওয়ালের গাথুনীতে জোর দিই কেন?—আমরা সর্ব্ব সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে যে রাষ্ট্রনৈতিক সভা, কংগ্রেস, তাহা থাকিতে আবার অল ইণ্ডিয়া মস্‌লেম লীগ করি কেন?—রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনাতেও সাম্প্রদায়িক গণ্ডি আটিয়া রাখা কেন? এখানেও ব্রাহ্মণ শূদ্রে এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করা কি নিষেধ, এখানেও কি হিন্দু মুসলমানে ছোওয়া লাগা পাপের,—এখানেও কি সেই দুরপনেয় সমান জোরে বর্ত্তমান থাকিবে?

Printed by P. N. Pal, at the Shastraprachar Press, 5 Chidammudi Lane, and Published by P. N. Pal, 26-3 Scott Lane, Calcutta.

১১শ বর্ষ | ভাদ্র, ১৩২৮ | ৫ম সংখ্যা

ঝড়

(শ্রীলীলা দেবী)

প্রলয়-নাচন গগন ভুবন কাঁপায়ে তুলেছে ঝড়—
এ যে ঠিক্ তারি পাগল পরশ উন্মাদ অন্তর!
নাহি মানে বাধা, নাহি ভয় ডর—লীলায় রয়েছে মাতি,
সেও যে এমনি শোনেনা বারণ নির্ভীক দিবারাতি!
আকাশের ঐ ঘোর ঘনঘটা চিকুর ঝলদ-জাল—
এ যে তারই দুটী জল-ভরা আঁখি সুনিবিড় সুবিশাল!
গুরু-গুরু-গুরু গরজন আর থেকে থেকে দেয়া হানে,
এ যে তারই সেই না বলা সে বাণী গুমরে যা তার প্রাণে
চপল চপলা চকিত প্রভায় থেকে-থেকে চমকায়,
ওগো এযে তারি চারু চুম্বন, করকারই ব্যথা তায়!
হুহুহুহুহু শন্‌শন্‌শন্ মত্ত মরুৎ বয়—
নদ নদী ফোলে তরু লতা দোলে পাখীদের কথা কয়।
এ যে ঠিক্ তারি উন্মাদ প্রেম লাঞ্ছনা-অপমানজ্ঞানহারা —
এ ঝড় যে তারি অন্তর—ওগো, সেও যে এমনি ধারা।

বঙ্কিম ও বাঙ্গলার প্রাণ

[শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত]

বঙ্কিম একদিন ফরাসী রুষোকে সাম্যাবতার খাড়া করিয়া 'Le Contract Social' সমাজ-বন্ধনের নব বেশ বাঙ্গলার জন্য রচনা করিয়াছিলেন। ইংরাজ বণিক বাঙ্গলায় মানদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে ভাবের আমদানিও করিয়াছিল। মিল-ডার্বিন, স্পেনসর, রুষো, কোম্‌তেও বাঙ্গলার ঘরে ঢুকিয়াছিল। ইংরাজী নবীশ বাঙ্গলা ইহাদের তখনকার দিনে বড় শ্রদ্ধার চোখে দেখিত। বাপের পূর্ব্ব-পুরুষের মত ভাল লাগুক বা না লাগুক, রুষো, কোম্‌তেকে বড় দরদ দিয়া ভাল লাগিয়াছিল। বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার আকাঙ্খা সকল জীবেরই স্বভাব ধর্ম্ম। তাই পরাধীনতার জড়তায় অবসাদগ্রস্ত বাঙ্গালী, রুষো, কোম্‌তেকে একটু কেমন যেন বেশী জড়াইয়া ধরিল। একদিকে Social Contract ও Emile অন্যদিকে Positivism ও Catechism, এই কয় জিনিষের সহিত Earnest Renan রেনাঁর 'খৃষ্টের জীবন রচিত' আসিয়া উপস্থিত হইল। বঙ্কিম যেমন উপন্যাস আমদানী করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সাম্যবাদ খাড়া করিতে ব্যস্ত হইলেন। গ্রন্থের বিপ্লববাদ তাহার ভিতরে বিষের মত ঢালিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, ইউরোপ যেমন আমাদের ঘরের ভিতর ঢুকিয়াছে, তেমনি তাহাকে 'বিষস্য বিষমৌষধম্'। সেই সাম্যকে অবজ্ঞায়িত লৌহ মনে করিয়া সেই ঔষধে সকল বৈষম্যের সাম্য করিয়া নব বলে বলীয়ান করিতে পারিবেন। সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষবাদ চালাইতে গেলেন। প্রাণবন্ত যে প্রাকৃত অপ্রাকৃত ছন্দের মিলন বৈচিত্রে ফুটিয়া আছে; তাহা বুঝিলেন না। তখন হয়ত এটা তাঁহার ঠিক মনেই হয় নাই যে আত্মস্থ প্রকৃতির বৈচিত্র হওয়াই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি, ও জীবনের চরম স্ফূর্ত্তি। মুক্তি ও বন্ধন যে ফুলের মুকুল হইতে ফুটিয়া উঠিবার মত, তখন তাহা বুঝি ধরিতে পারেন নাই। বিচিত্র হওয়ার আনন্দ তিনি বুঝেন নাই।

সাম্যের সে ভুল, তাঁহার পরে ভাঙ্গিয়াছিল। 'All men by birth are equal' জন্ম হইতেই সকল মানুষ সমান, কেহ ছোট বড় নয়। এ ভুল পরে তাহার চোখে পড়িয়াছিল। তাই বুদ্ধ খৃষ্টের মহাসাম্যবাদের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে ফরাসী ভাবুক রুষোর ভাবুকতা ও ভাবতন্ময়তার মসলা মিশাইয়া যে সাম্য গড়িতে গিয়াছিলেন, তাহা আর চলিল না। রঙ বদলাইয়া দিলেন। নকল ছাড়িয়া আসল রূপটী ধরিবার ও খাড়া করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেন। যে সাম্যবাদে ফরাসীদেশে বিরাট সাগরোর্ম্মি উচ্ছলিত বন্যা ও বিপ্লব তুলিয়াছিল, সেই সাম্যবাদ ত্যাগ করিয়া নিজের প্রাণের দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রাণকে মুখোমুখি পরিচয়ের জন্য প্রাণপণ করিলেন। তখন বাহির হইতে অন্তরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলেন। তাই তখন 'বাঙ্গলা আমার' বলিয়া নিজেকে, বাঙ্গালী বলিয়া আকুল ভাবে সান্ধ্যনয়নে অন্ধকার শ্রীহীন নবদ্বীপের প্রহরী-বিহীন শূন্য পুরীর পথে কাঁদিয়াছিলেন। তাই দেখিয়াছিলেন অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, সিংহাসন হইতে শালগ্রাম শীলা ভূলুণ্ঠিত, কেকার অর্দ্ধোত্থিত স্বর স্তব্ধ, শুনিয়াছিলেন পবনে গগনে ছিন্ন বীণার রণরণন্। সেই ক্রন্দনে আজ এই জাগরণের দীপ জ্বলিয়াছে। বালক যেমন ভূমিষ্ঠ হইয়াই কাঁদিয়া উঠে, বাঙ্গলার এই যে নবভাব তাহা বঙ্কিমের ক্রন্দনে প্রথম জীবনের সাক্ষ্য দিয়াছিল। বাঙ্গালী পরের দ্বার হইতে নিজের ঘরের দিকে মুখ ফিরাইল। আজও তাই বাঙ্গলার প্রাণ-

বস্তুর সন্ধানে, বিচিত্র রসের, বিচিত্র রূপের ভিতরে তাহার স্বরূপকে খুঁজিয়া ধরিতে, স্পর্শ করিতে প্রাণ ভরিয়া আপনার করিতে চায়।

বঙ্কিমের ইন্দিরা, বঙ্কিমের বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম, সব জিনিষেই, বাঙ্গলার ঘরের সুখ-দুঃখের কাহিনী,—কাম-প্রেমের কথা, চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়া বিশেষ বিশেষ রূপের মাঝে ধরিয়া, তাহাদের ফুটাইয়া গেছেন। বঙ্কিম বলিয়াছেন রূপে মোহ আছে, সেই মোহ ভাঙ্গিয়া যখন প্রেমের স্তরে দাঁড়াইবে, তখনই মনুষ্যত্ব। সেই মনুষ্যত্ব বুঝাইতেই কোম্‌তের প্রত্যক্ষবাদ ও হিন্দুর গীতা। সেই মনুষ্যত্বকে বুঝাইবার জন্য আদর্শ মূর্ত্তিতে ধরিবার জন্য তিনি বাঙ্গালার সুখ দুঃখকে আপনার সুখদুঃখের মত পঞ্জরে বাসা দিয়াছিলেন। আপনার প্রাণের সঙ্গে বাঙ্গালাকে ভাল বাসিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর নরনারীকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার আখ্যান বস্তুতে পাশ্চাত্য রস ও চরিত্র চিত্রনের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী-মায়া চালান না কেন, তাহাকে তিনি বাঙ্গালী করিয়া গড়িয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ বাদের ভূমি ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই। ভাগবত পুরাণাদি ওলট পালট করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মনুষ্যাবতার মহাকর্ম্মী আদর্শ পুরুষ বলিয়া বাঙ্গলার চোখে নববিগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বঙ্কিম বাঙ্গলার জন্য এই আদর্শ রাখিয়া গেছেন। নিষ্কাম কর্ম্ম ও নিষ্কাম ধর্ম্ম।

কমলাকান্ত হইয়া পতঙ্গ বহ্নিমুখ বিবৃক্ষু হইলেন। দীপের আলোকে নিজের সব পুড়াইলেন—ছাই করিয়া ফেলিলেন—বলিলেন জীবের এই জীবন-দানই শ্রেষ্ঠ সার্থকতা।- তখন আর সে আত্ম-লোলুপতা নাই, পরার্থ জাগিয়াছে। পরের জন্য জীবনের শ্রেষ্ঠ বস্তু প্রাণ মন ধন সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিবার মত স্বাভাবিক বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির উপর দাঁড় করাইলেন। নিজেরও পরিচয় দিলেন—মানুষ এ সংসারে পতঙ্গ বহ্নিমুখ বিবৃক্ষু! এই পতঙ্গ প্রণাপই বঙ্কিমের পরানুরক্তি ঈশ্বরে—ইহাই বঙ্কিমের চরম কথা। এমনি করিয়া বঙ্কিম নগেন্দ্র কুন্দ সূর্য্যমুখি গোবিন্দ ভ্রমর রোহিণী, ইন্দিরা রমার সংসার বিলাসের পর্ব্ব হইতে কাম-প্রেমের যে অপরূপ খেলা তাহার ভিতর দিয়া অনুশীলনের পর্য্যায় "Substance of Religion is Culture" 'অনুশীলনই ধর্ম্ম' বলিয়া পরানুরক্তির ভক্তিবাদে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। শাণ্ডিল্যসূত্রের এই ভক্তিবাদের ভিতর তখন প্রতীচ্যের বিপ্লববাদ একেবারে থামিয়া গেছে। সাম্যের বিপ্লব ভেরী তখন যেন একেবারে মুহ্যমান, কিন্তু কোম্‌তের প্রত্যক্ষবাদ তাহার অঙ্গে অঙ্গে জড়ান। তখন বাঙ্গলার প্রাণের দুয়ারে আসিয়া করাঘাত করিতেছেন, "দ্বার খোল বাঙ্গলা, দ্বার খোল, তোমার আসল ঘরের খবর দাও"। এই অবধি পৌঁছিয়া বঙ্কিম চলিয়া গেলেন। কাম ও প্রেমকে যে পরম রূপান্তরের ভূমিতে দাঁড় করাইয়া পরম ভাগবত বৈষ্ণবশ্রী যে অভিনব লীলায় বাঙ্গলাকে ভাসাইয়া ডুবাইয়া গিয়াছিলেন, সে বৈষ্ণবের প্রেম-মন্ত্র, বঙ্কিম সে সাধন-কথা ধরিতে পারিলেন না। বাঙ্গালায় তিনি এক অভিনব বৈষ্ণবকে আনিলেন। সে বৈষ্ণব লাঠিবাজি করিতে মজবুদ। সে বৈষ্ণব পাশ্চাত্য আদর্শের শাসক-পালক। বিষ্ণুচরণকমল-ভাগবত প্রহ্লাদের মত।

"বিষ্ণাবিষে ভবান্ সত্যমসত্যং বং বিষামৃতে"

এ মর্ম্মকথা কবিলেন না। চণ্ডীদাসের মত প্রেমের 'বিষামৃতে' একত্রে সজ্ঞান ইহা বলিলেন না বটে, কিন্তু যে মন্ত্র লাভ করিলেন তাহাতে বাঙ্গলার সাধনশ্রীর এক নব মূর্ত্তি রচনা হইল -তাহাতে বাঙ্গলা ধন্য হইল, সারা ভারতে সাড়া পড়িল। অবসাদ অবিজড়িত জাতির প্রাণে শক্তিমন্ত্র জাগিল। সে মাতৃমন্ত্রের অধিবাসীতে বাঙ্গলা তাহার জননী জন্মভূমিকে মৃন্ময়ী হইতে চিন্ময়ীরূপে পূজার অর্ঘ্য দান করিল। তখন হইতে বাঙ্গালী প্রাণ লইয়া প্রাণের দরদ দিয়া দুটো ব্যথার কথা বলিবার স্বাদ

পাইল। কিন্তু যে প্রেমে মানুষ ভক্ত ও ভক্তির অঙ্গাঙ্গী সাধনায় মিলিত হয়, কাম যেখানে প্রেমের সার্থকতায় ডুবিয়া মরিয়া বাঁচে, সারা বিশ্বকে এক করিয়া অভিনব লীলা-রসমাধুর্য্যে লীলায়িত হয়, সেখানে তিনি পৌঁছিতে পারেন নাই। বিলাতী Ethics নীতি বিজ্ঞানের নীতিবাদ তাঁহাকে সে বস্তু বুঝিবার অবসর দেয় নাই। অনুশীলনে কোম্‌তের বিশ্বসৃষ্টি ও রীতিনীতি রক্ষার ধারার উপর নারদ পঞ্চরাত্র ও শাণ্ডিল্যসূত্রের মর্ম্মকথা বহু-আয়াসে মিলাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সেই নীতিবাদের উপর আদর্শ মনুষ্যত্ব খাড়া করিয়া গেছেন। যে বৃন্দাবনলীলার মধুর আদর্শের উপর শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন ও ধর্ম্মের চরম স্ফূর্ত্তি সেই বৃন্দাবন লীলাকে একেবারে ত্যাজ্য বলিয়া স্থির করিলেন। যাহা প্রত্যক্ষ ও সাধন সাপেক্ষ, সে বস্তু সবার উপর তুমি করিয়া কত কত কবি যুগে যুগে গান গাইয়া ধন্য হইয়া গেল, তাহা ত্যাজ্য না হইলে আদর্শ মানুষ হয় না বলিয়া প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের বোঝা বাঙ্গলার সাধনার উপর চাপাইলেন। যে সমন্বয় গড়িতে গেলেন, তাহা শুধু অন্বয়েই ব্যর্থ হইল। ও পারের সঙ্গে এ পারের ভাবসাধনা মিলিল না। সেই খানেই বাঙ্গলার প্রাণের মণিকোঠার কথা চাপা রহিয়া গেল। এখন আজ সেই কথাটী না বলিলে, সেই মণিময় দ্বারের চাবিটী না খুলিয়া দিলে, বাঙ্গলার প্রাণকে বুঝিবার তাহাকে প্রাণেপ্রাণে মুখোমুখি করিবার, ধারণা করিবার কোন রসাভাষই পাওয়া যাইবে না। তাই বঙ্কিমকে আশ্রয় করিয়াই বাঙ্গলার প্রাণের কথা বলিতে হইবে!

ভারতবর্ষীয় সমাজ ধর্ম্মের অঙ্গীভূত। ভারতবর্ষীয় রাজনীতি, রাজধর্ম্ম বলিয়া খ্যাত। মহাভারতের কবিকুলশিরোমণি সেই রাজধর্ম্মের কথা শান্তি পর্ব্বে কহিয়া গেছেন! বিশ্ব সৃষ্টিতে ভারতরাজকুলচূড়া একমাত্র সংযমী ভীষ্মই সেই ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা। বাঙ্গলার একমাত্র বঙ্কিম সেই ধর্ম্মরাজ্যের আদর্শকে রূপদান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন! মহাভারতীয় রাজধর্ম্ম সর্ব্বকালোচিত, সর্ব্বদেশীয় কিন্তু তাহার ভিত্তি একমাত্র জ্ঞানের উপর। বাঙ্গলার প্রকৃতি যে তাহা নয়, এইটুকু বঙ্কিমের খুঁত ছিল। বাঙ্গলা প্রেমধর্ম্মের উপর বিশ্ব সৃষ্টির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তাই বঙ্কিম-দৃষ্ট বুদ্ধ চৈতন্যকে অপূর্ণ বলিয়া গেছেন। কিন্তু শত শতাব্দীর পরও প্রতীচ্যের অন্ধকার তমসাবৃত নিশার ঝঞ্ঝারোলের মাঝে, এই ভয়াল মৃত্যু-রণভূমে রাজধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার উপর সেই খৃষ্টের কথাই মহাশূন্যে শান্তির আলোক দিতেছে। উত্তর আসিয়ার বিরাট উদ্বেলিত বিপ্লব বিষানের মাঝে, এখনও সেই অহিংসা পরমধর্ম্ম ধ্বনিত হইতেছে। এখন এই পরাধীনতার ব্যাধিতে পীড়িত ভারত সেই প্রেম-মন্ত্রের সাধনার এক হইতে চাহিতেছে। এ প্রেম ফুল ফোটার মত, অধরের মিলন মাধুর্য্যভরা, বক্ষের তৃষার শান্তির মত বাঙ্গলার ঘাটে মাঠে, আকাশে পাতালে, সেই সুর, সেই সুগন্ধ বিলাইয়া চলিয়াছে। প্রকৃতি প্রেমেই প্রতিষ্ঠিত। বঙ্কিম ইঙ্গ-করাসী নীতিবিদের প্রেম আনিয়া বাঙ্গলার ঘাড়ে চাপাইয়া নূতন বাঙ্গলা গড়িতে চাহিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণকে কর্ম্ম জ্ঞান সন্ন্যাসের সামঞ্জস্যে দাঁড় করাইয়া গেলেন। আদর্শ পুরুষ বলিলেন। ভাবিয়াছিলেন রালপো-লোবা ঘষিচোষা বৈষ্ণব কর্ম্মের কোন ধার ধারে না। এতটুকু বোধ হয় বুঝিলেন না যে 'পরমাণুরক্তি ঈশ্বরে' যদি হয়, প্রেম যদি সর্ব্বভূতে সম হইয়া স্ফুরে সে আশ্রয়ে নব-নব-উন্মেষশালিনী বহুধা বিচিত্রা সৃষ্টিই সম্ভব। সৌন্দর্য্যই সৃষ্টির মূল। যদি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয় সত্য তাহার অঙ্গে অঙ্গে আপনিই জড়াইয়া উঠিবে। সত্যের সঙ্গে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইবে। সমাজ রাজনীতি রাজধর্ম্ম অনুশাসন আপনিই হইবে। বাঙ্গলার বাড়ীর যোগ প্রেমের কোঠায়। বাঙ্গলার প্রাণমণি দীপ সেই মণিকোঠার শ্রীমন্দিরে জ্বলিতেছে। বাঙ্গলার প্রাণ কামকে ফেলিয়া দিয়া প্রেমের প্রতিষ্ঠা করে নাই

সে আত্মেন্দ্রিয়ে প্রীতি-ইচ্ছাকে কাম বলিয়াছে, কৃষ্ণেন্দ্রিয়ে প্রীতি-ইচ্ছাকে প্রেম বলিয়াছে। যখন আত্মেন্দ্রিয় কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের ভোগরসে মজিয়া রসিয়া মিলিয়া যায়—তখনই মণিকোঠার দুয়ার খুলিয়া যায়, বিশ্বের চক্ষের পাতায় জল্ জল্ করিয়া উঠে। বাঙ্গলার সাধনশ্রী সেই প্রেমের উপরই প্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গলা 'জয় রাধে কৃষ্ণ' বলিয়া ভিক্ষা করে। বাঙ্গলার শারী শুক রাধাকৃষ্ণ বলে। বাঙ্গলার সাধ আহ্লাদ আশা সোহাগ রাধা কৃষ্ণের ভাব মাধুর্য্যে বিলসিত। বাঙ্গালীর বংশীর সপ্ত সুরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ওই মধুর কথা গাহিয়া উঠে। বাঙ্গলার সেই সাধনায়—

মূক করিবে করে যা সবার স্মরণে।
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে অন্ধ দেখে তারা গণে॥

যখন সাধনশ্রীর সত্যরূপ ফুটিয়া উঠে তখন প্রেমের প্রকাশনে বিচিত্র সৃষ্টি আপনিই পুষ্পসম মুকুলিত হয়।

এই টুকুর অভাব বঙ্কিম সাহিত্যের সৃষ্টিতে বিরাজিত। তাই বাঙ্গলার মণি মন্দিরের দ্বারে পৌঁছিয়াও তাহার স্বরূপকে আজিও ধরিতে পারি না। প্রাণ লইয়া নকড়া-ছকড়া করিয়া খেলা করি। বৈরাগ্য, প্রেম, জ্ঞান, কর্ম্ম, ত্যাগ, ভোগ, সন্ন্যাস নানা বাঁশীতে টঙ্কার দিই। প্রাণের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় হয় না—বোবার স্বপ্ন দেখার মত, মুখে ফুটিয়া বলিতে পারি না। সাহিত্য ও জীবনে ব্যবধান থাকিয়া যায়, আজিও গড়া হয় না।

বাঙ্গলার প্রাণের পরিচয় চাহিলে, তাহার সমাজ, ধর্ম্ম, সাহিত্য, জাতির ইতিহাস সকল দিক দিয়াই দেখিতে হইবে। সৃষ্টি করিতে হইলে তাহার ধ্যান চাই, শ্রদ্ধা চাই, মমত্ব বোধ চাই তেমনি করিয়া ভালবাসা চাই। তেমনি মমতার তারে এই ধ্যান মণিমালা গাঁথিয়া তুলিতে হইবে, তবে প্রাণে প্রাণে ইহার অনুভূতি আসিবে। আসে ভালবাসিয়া দেখ, নাম রূপের সাধনা কর, সাধন ভক্তি হইতে রতির উদয় হইবে, রতি গাঢ় হইলে প্রেম জন্মিবে প্রেম জন্মিলে সকল রসের খেলা জাগিবে, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব যখন তোমার চিত্ত শতদলে বিকসিত হইবে তখন বাঙ্গলার প্রাণের পরিচয় মিলিবে। আদর্শ পুরুষের কর্ম্ম-সন্ন্যাস যোগের কথা বিচার করিতে চহিবে না। মহাভাব সন্নিধি হইলে তোমার ওই অবসাদগ্রস্ত তৃষার ছিন্ন শীতল হৃদি সরোঃ মনপদ্ম ফুটিয়া উঠিবে। দিকে দিকে তখন আনন্দ! আনন্দ! 'আনন্দের পশু ইমানি ভূতানি'—রাজধর্ম্ম রাজ-নীতি মহামান্য আদর্শপুরুষ সব আপনিই গড়িয়া উঠিবে। কৃষ্ণের মহাভারতীয় ধর্ম্মরাজ্য অধর্ম্মে ছিনিয়া লইয়াছে। বহুবার কালপুরুষ উঠিয়া আকাশের অন্ধকারে ঘুরিয়া গেল, বহু শতাব্দীর পর-পর সপ্তর্ষী মণ্ডলীও ঘুরিয়া ফিরিল, কত কত কুরুক্ষেত্র শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাণী বহন করিয়া আনিল, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেমের ধারা শুখাইল না—কৃষ্ণের বংশী সে মিলন বিরহের রাগিনীতে নিত্যই বাজিতেছে। বাঙ্গলা তাহার সাধনা করিয়াছে। সেই এক ধ্বনির সঙ্গে সারা ভারতই বাঙ্গলার আদর্শে মিলিত।

বঙ্কিম স্বয় যে খিয়াছিলেন, বাঙ্গলার রাজেন্দ্রাণী গঙ্গার অতল গর্ভে ওই ডুবিয়া গেছেন। আজ বাঙ্গলা তুমি সেই পতিত পাবনীর উচ্ছল কলনাদিনী বারিরাশির অতল তলে খুঁজিয়া দেখ, তোমার প্রাণগঙ্গা কোন সাগর সঙ্গমের পথে ছুটিয়াছে, খুঁজিয়া দেখ নিশ্চয়ই তাঁহার সন্ধান মিলিবে। এ মনুষ্য জন্ম সার্থক হইবে। সাগর সেঁচিয়া সেই মহালক্ষ্মীকে তুলিবে, আবার প্রতিষ্ঠা হইবে। 'ওংহি ছর্গে' বলিয়া আবাহন ডাকিবে।

বঙ্কিম লোচন দাসের এই গান—

"এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বস
নয়ন ভরিয়া তোমা দেখি"

তাঁহার মানসী—প্রণয় গোধালিনীকে শুনাইয়া-

ছিলেন, প্রসন্ন বলিয়াছিল "ছি ছি, আমি কি তোমার বঁধু।

"বালাই! তুমি কেন আমার বঁধু হইতে যাইবে, আমার গানে আছে।"

আমার মনে হয় গানে যা আছে, বঙ্কিম তাহা বুঝেন নাই, গানের প্রাণতন্ত্রীর ঝঙ্কার বঙ্কিমে বাজে নাই। তাই আক্ষরিক ভাব গানের উপর চাপাইয়া দিয়াছেন। বঙ্কিমের প্রতিভা বাঙ্গলাকে প্রাণের পরতে পরতে রাখিয়া দেখিত, তাই "আর না বলকুমি' বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। তাই নবদ্বীপের স্বপ্ন, ভবন শিখীর অর্দ্ধোচ্চারিত কেকা। তাই বৃন্দাবন লীলা বাদ দিয়া তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ। বাঙ্গলার নাড়ীর সঙ্গে লোচন-দাসের এ গানের যোগ। তাহার নাভি সরোবর হইতে এই কমল বিকসিত হইয়াছে। ঐ গান সত্য কোটা কমলের মত। বঙ্কিম সে ধারা ধরেন নাই। গানের আধ্যাত্মিকতার দিক ত্যাগ করিয়া যদি শুধু প্রেমের দিক দিয়া বলা যায়, এবং প্রথম সেই দিক দিয়াই ভাবাবাহন করিতে হইবে।

এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বস
নয়ন ভরিয়ে তোমা দেখি

কবি এখানে নিজে বঁধুর প্রেমে আত্মহারা হইয়া, প্রেমিকা রূপে রূপান্তরিত হইয়া গাহিতেছেন, বঁধু! আমার এই আধখানি আঁচলের 'পরে বস, তোমায় নয়ন ভরিয়া মুখোমুখি করিয়া দেখি, দেখিয়াত সাধ মিটে না, তাই নয়ন ভরিয়া দেখি। বিজনে কি পিপাসা যায়! বলিতেই প্রসন্ন গোয়ালার মেয়ে চমকিয়া উঠিয়াছিল।

রন্ধন শালায় যাই তুয়া বঁধু শুন গাই
ধুঁয়ার ছলনে বসে কাঁদি

বৃকভানু রাজনন্দিনী রন্ধন শালায় পাককার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় সখীদের কোন অবগতি কাহার আছে কিনা জানি না—না জানা থাকিলেও, বাঙ্গলা দেশের মেয়ে রন্ধন শালায় রাঁধিতে রাঁধিতে প্রেমের রসাভাবে ধুঁয়ার ছলনে আঁখি জল ঢালে বঁধুর জন্য অন্তরে বাহিরে কুটুকুটু করে—এ কথাটা লোচনের প্রাণ, বাঙ্গালী নারীর অন্তঃপুরের প্রাণের রূপটীকে রূপান্তরের পথায় তুলিয়া প্রাণের রূপ দেখিয়াছে। তিনি ধুঁয়ার ছলনে প্রাণবঁধুর তরে কাঁদিয়া গিয়াছেন। এই যে লুকান প্রেম যাহার বাহিরের রূপ কুয়াসা ঢাকা ঘুমের নিবিড়তায় আবিল, কিন্তু ভিতরে অগ্নি বহ্নিমান, জ্যোতিষ্মান, সেই প্রেমে নিজের প্রাণকে সেই রাধার শ্রীচরণে সরস বিরহ মাধুর্য্য রসে রূপান্তরিত করিয়া কবি গাহিতেছেন—"

তুমি মণি নও মাণিক নও
যে হার করে গলায় পরি,

কিন্তু এইখানে বঙ্কিম বেশ একটু ঠেকিয়াছেন, নিজের ভাবকে ধরা দিয়া ফেলিয়াছেন,—তাঁহার বাঙ্গলার বাকে মণিহার করিয়া বুকে বুকে করিয়া দেশে দেশে ফিরিতে চাহিয়াছেন, তাহা হইলে যবনে তাঁহাকে দলিত করিতে পারিত না। পরাধীন বাঙ্গলার প্রাণে এ রস নূতন—তাই প্রাণকে টলায়—কিন্তু ইহা কি সত্যই গানের প্রাণ

যদি নারী না করিত বিধি:
তুয়া হেন গুন নিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ

কথা শুনি পাইয়া বঙ্কিম প্রাণের তৃষ্ণা মিটাইয়াছেন। সহমরণ অথারোহীর অলীক পদচিহ্ন বাঙ্গলার পাষাণ প্রাণে বড় দাগা দিয়াছিল, তাই এত কাঁদিয়াছেন। তাই আজ আমরাও কাঁদি। সে কান্না আজিও থামে না। এই খানেই যত গোল বাধিয়াছে। প্রেমিকা ধুঁয়ার ছলনে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন, যদি নারী না করিত বিধি—মুসলমান পীড়িত বাঙ্গলার মেয়ে অবরোধেই হাসিত কাঁদিত। শুধু তাহাই নহে ঘরে শুরু পরিপাশ, প্রেম,সমাজ, গৃহ, সকলের ভিতরে থাকিয়াও বাহিরে মুক্ত, তাই বঁধু লইয়া মুক্তির আস্বাদ ভোগ করিবার জন্য এ গীত রচনা তাই এ দুঃখ। আধ আঁচরে

বলাইয়া লোক-লোচনের অগোচরে তোমায় দেখি। বলিতে মুখে জড়তা আসে—কমলাকান্তের অধিকেনের মাত্রায় বঁধু মাতৃরূপে দেখা দিয়াছেন। গানে বঙ্গভূমিতে এমন করিয়া টানিয়া আনা বঙ্কিমের ঠিক সত্যরূপ ফুটান হয় নাই। তথাপি বলিতে হইবে কমলাকান্তের এই ক্রন্দন বঙ্গ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, অতুলা, অনুপম! পড়িলে আঁখি ভরিয়া উঠে। শরীর রোমাঞ্চ হয়।

এ গান জয়দেব গোঁসাইয়ের 'চন্দন চর্চ্চিত নীল কলেবর পীত বসন বনমালীর" মাধুর্য্যভরা কোমলকান্ত পদাবলী নহে। ইহাতে বাঙ্গলার ঘরের কথা আছে, প্রাণের কথা আছে। এ প্রেমের রসমূর্ত্তি রচনা চণ্ডীদাসের পরে বাঙ্গলার সাধনধারার সাথ ভরিয়া দেখিলেই জানা যায়—যে ইহা বাঙ্গলার কোমরস মাধুর্য্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। জয়দেব গোঁসাইয়ের অনুকরণে মহাপ্রভুর সাধন ধারার ভিত্তি নয়,—মহাপ্রভুর জীবনে চণ্ডীদাসের সাধনা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মহাপ্রভুর সাধনটী কাহার অনুকরনে সৃষ্ট নয়, কল্পিত নয়। তাঁহার জীবন, শাস্ত্রজ্ঞান, সংসার ভোগ, তত্ত্বদর্শন, প্রগাঢ় প্রেমের স্তোতনায় পরিস্ফুট ছিল। চৈতন্যযুগ শুধু জয়দেব গোঁসাইয়ের ভাবে অনুপ্রাণিত নয়। তাই বলিতে চাই বাঙ্গলার প্রাণের সত্যরূপ যদি ফুটিয়া উঠিত, তাহা হইলে এ কথা বঙ্কিম কখন বলিতেন না। তাই বাঙ্গলার আদর্শের কথা বুঝাইতে গেয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আনিলেন। ইহাও য়ুরোপীয় খৃষ্ট-জীবন চরিত্রের ভাবেই গঠিত -অলৌকিকত্ব বাদ দিয়া—কৃষ্ণকে পূর্ণ মনুষ্যত্বের উপর স্থাপন করিবার প্রয়াস শুধু মাত্র পরাধীন দেশকে জাগাইবার জন্য, ভাবিয়াছিলেন এই আদর্শে বঙ্গ 'নষ্টমোহ' হইয়া আবার জাগিবে। অর্জ্জুন সারথিকে তাঁহার এই আদর্শে রক্ষা করিয়া বাঙ্গলা কীর্ত্তন ত্যাগ করিয়া ধনুর্ব্বান ধরিবে। কিন্তু ভারত ধর্ম্মের ভিত্তিই যে অলৌকিকত্ব তাহা বুঝেন নাই। অলৌকিকত্ব ভ্রম নয় সত্য।

চারি শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গলার প্রাণের যে সুর যে রূপের স্ফূর্ত্তি মুসলমান অধীনেও লীলায়িত হইয়া আসিতেছিল, সেই সুর অকস্মাৎ বঙ্কিমচন্দ্রে আসিয়া বদলাইল কেন? চণ্ডীদাসের পূর্ব্বে ও পরে বাঙ্গলার কবিগণ বৈষ্ণব যুগের পদ রচয়িতাগণ বাঙ্গলার ধমনিকোঠার খবর রাখিতেন—প্রাণের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় ছিল—সে রূপ তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণের পরতে পরতে রূপান্তর করিয়া লইয়া ছিলেন। বঙ্কিমের দুর্ভাগ্য যে সেই ধারার রসের তরঙ্গে আনাগোনা ভাসা-ভোবা করিয়াও সে রসের স্ফূর্ত্তি তিনি পান নাই। মাতৃভাবের অভাব বাঙ্গলায় নাই। বাঙ্গলার প্রাণের যে সব লীলায়িত মধুর মাতৃভাব তাহা রামপ্রসাদের অমরত্ব লাভ করিয়াছে। তবে এই ইউরোপীয় দেশমাতৃকার রূপের জন্য বাঙ্গলার প্রাণের এক অতি সনাতন প্রবল ধারা—যাহা গৌরীয় বৈষ্ণব ধারা রূপে বিরাজমান—সেই ধারা হইতে বিচ্যুতি ঘটাইতে গেলেন কেন?

দশ-প্রহরণ-ধারিণী যিনি তিনিই বাঙ্গলার মা বলিলেন। বঙ্কিম সেই আদ্যা শক্তিকে নীচে নামাইয়া দেশ মায়ের আসনে বসাইলেন। দেবতা ভাঙ্গিয়া মানুষ গড়িতে গেলেন। দেশমাতৃকা কিন্তু দশপ্রহরণ ধারিণী আদ্যাশক্তির আসনে উঠিল নাই বঙ্কিম সৃষ্টিতে কোথাও সে রূপান্তর হয় নাই। আজিকার এই ইংরাজী দেশাত্ম বোধের দিনে, ইহা প্রতিকটু অপ্রিয় সত্য হইলেও—ইহা সত্য।

বাঙ্গলার প্রাণের এই মাতৃভাবকে মুচড়াইয়া দুমড়াইয়া গামছা নিঙড়ানর মত নিঙড়াইয়া বঙ্কিম এই দেশমাতৃকা মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিলেন। তাহাতে প্রতীচ্য বিদ্যা আলোড়িত শিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গলার নিজের প্রাণের সনাতন সাধনপথে চারি শতাব্দী চলিয়াও—"মা বিরাজ সর্ব্বঘটে" গাহিয়াও—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রলয় ঘূর্ণাবর্ত্ত মধ্যে—'ঘাটে মাঠে বাটে রটনা' করিয়াও উনবিংশের মাঝে আসিয়া এমন অকস্মাৎ আচমকা থামিয়া গেল কেন?

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী শিক্ষিত বাঙ্গলার প্রাণের মূর্ত্তি গড়িতে পারেন নাই। যাহা গড়িয়াছেন তাহা অনুকরণ মাত্র। জাতির জীবনে তাহা যতটুকু কাজ করিবার তাহা করিয়াছে ও করিতেছে। অগ্নি দেবা দিয়াছে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। কিন্তু এই গড়িতে গিয়া, সৃষ্টি করিতে গিয়া যাহা ভাঙ্গিলেন—তাহার স্বভাব কি? বঙ্কিমের তুলিকায় কি বল তাহার ফুটীল —শস্যশ্যামলা, ফুল-কুসুম ধন শোভিতা, জ্যোৎস্না পুলকিতা—ইহা ত শ্রীমদ্ভাগবত; ইহাত জয়দেব হইতে কৃষ্ণকমল—তাহার সঙ্গে কিছু চণ্ডী—আগম বাগীশ হইতে রাম-প্রসাদ বর্ণিতা শক্তিমূর্ত্তি। শাক্ত বৈষ্ণবের দুইধারা একটীও অব্যাহত থাকে নাই। রূপান্তর হয় নাই। বঙ্কিমে বৈষ্ণব মরিয়াছে—শাক্তও বাঁচে নাই।

বঙ্কিম বলিয়াছেন 'আমার গানে আছে'—কিছুত আছেই সত্য। অতবড় শিল্পীর প্রতিভা কে অস্বীকার করিবে। কিন্তু লোচনদাসের গানে যাহা আছে, রামপ্রসাদের গানে যাহা আছে তাহা নাই—ততদূর নাই। মাধুর্য্যে মাতৃত্ব আরোপ সৃষ্টি নহে, শিল্প নহে—লোচনদাসকে হত্যা! দেশের সাধনাকে ইংরাজী ফেরঙ্গ বিষ প্রয়োগে ভাব-সাধনার হত্যা! কিন্তু ভাবুকতা প্রাণময় জীবন্ত বলিয়া প্রতিভাত। ইহা ঘোরতর ব্যভিচারী দুষ্ট, কল্পকলার সৃষ্টিতে রসের ব্যভিচার। ইহা বাঙ্গলার প্রাণের বিকৃতি। প্রকৃতি নয়।

শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ ভুলিয়া বাঙ্গলার সামাজিক অবনতি হয় নাই, কৃষ্ণচরিত্র বাঙ্গলা অবনত করিয়া লয়নাই, মুসলমানী ফেরঙ্গ চাপে পীড়িত বঙ্গ নিজেকে ভুলিয়াছে, তাই মহাভারত ভুলিয়াছে, তাই মহা-ভাবের প্রেম ভুলিয়াছে। জয়দেবেরও দোষ নহে, চণ্ডীদাসেরও দোষ নহে, দোষ স্বকপোল কল্পিত দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতা। 'দেহি পদ পল্লব মুদারম্' বলিয়া প্রেমে যদি সত্যই বাঙ্গলা সেই প্রেমের পায়ে প্রাণের অর্ঘ্য দিতে পারিত তবে আজ তাহার এ পরিণাম হইত না। সেই প্রেমই মহাশক্তির স্তোতক। বাঙ্গলা প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করে যে ওই কয়টী মন্ত্র স্বয়ং কৃষ্ণ নিজে জয়দেব রূপ পরিগ্রহ করিয়া লিখিয়া গেছেন। ইংরাজী শিক্ষিত Rationalistic বুদ্ধিমানের যুগে একথা অবিশ্বাস্য হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গলার প্রাণ তাহা বিশ্বাস করে।

অনুশীলনে বঙ্কিম যে প্রত্যক্ষের উপর আদর্শ-ভাববাদ বুঝাইয়া গেছেন, শ্রীকৃষ্ণে তাহাই রস-রক্ত দিয়া মূর্ত্তি করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। এখানেও সেই দেবত্ব বাদ দিয়া মনুষ্যত্ব। আজ যদি বঙ্কিম বাঁচিয়া থাকিতেন তাহাহইলে সম্ভবতঃ দেখিতে পাইতেন গয়টের ফাউষ্ট ভুলিয়া নিটসের অতিমানুষবাদের জর্ম্মন্যদেশ আপনার অগ্নিতে কেমন জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া গেল। সে Superman এর আভিজাত্য টিকিল না। যীশু অশিক্ষিত ছিলেন, কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রবিদ, এই কথাটাই বঙ্কিম ভুল করিয়াছেন। শিক্ষা কাহাকে বলে, যে জ্ঞান আত্মস্থ স্থিতধী হইয়া প্রাণে প্রাণে প্রেমের জাগ্রত বিগ্রহ শ্রীভগবানের প্রতিষ্ঠা করিল সে কি অশিক্ষিত। বালক যীশু যখন য়াহুদী রাব্বির সহিত তর্ক করিয়া-ছিলেন, তখনকার য়াহুদী আচার্য্যেরা চমকিত হইয়াছিলেন—সে যীশু কি অশিক্ষিত। যাঁহার পায়ের দাগে কত শাস্ত্র কত আচার্য্য সৃষ্ট হইল সে অশিক্ষিত। তাহার পর বুদ্ধ ও চৈতন্য সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ সংসারী ও সন্ন্যাসী—অপূর্ব্ব কিসে। বলিবেন বুদ্ধ ধনুর্ব্বেদে—পরাধীন বাঙ্গলা মুসলমান-শাসন-পীড়িত বাঙ্গলায় চৈতন্যের যুদ্ধের কোন প্রয়োজন ও অবসর হয় নাই। তিনি প্রেমের মন্ত্রে সকলকে এক করিয়াছিলেন। কাজীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ছিলেন, পাজীর বিরুদ্ধেও ধর্ম্ম রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেন যদি প্রয়োজন হইত। কাজী পায়ে পড়িয়াছিল পাজী জগাই-মাধাইও পায়ে পড়িয়াছিল। তবু পায়ে পড়ে নাই প্রেমের মন্ত্রে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গলার প্রাণ এমনি করিয়াই মানুষকে মনুষ্যত্ব দান করিয়াছে। বাঙ্গলার প্রাণে

এমনি করিয়া মানুষকে মনুষ্যত্ব দান করে—

পতিত হেরিয়া বাছিয়া বাছিয়া
যাচিয়া যাচিয়া দেয়।

এমনি করিয়া সে জগতে বৈচিত্র্যের মাঝে প্রেম বৈচিত্র্যে নিজের স্বধর্ম পালন করিবে, বিশ্বমানবের দ্বারে ভিক্ষা দাওগো ব্রজবাসী প্রেম ভিক্ষা দাও বলিয়া ভিক্ষা মাগিবে না। ভিক্ষারও হইবে না, যুদ্ধেও হইবে না।

এই প্রেমের আদর্শ বাঙ্গালার প্রাণের জিনিষ, তাহার আরাধ্য দেবতা। এই মহাভাবের প্রেমের আদর্শ আজ বাঙ্গলার হৃদয়ে জাগরিত করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত পথ নাই, পথ নাই।

খৃষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য ধর্মকে 'ব্যবসায় স্বরূপ' অবলম্বন করেন নাই। বুদ্ধ চৈতন্য খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন একথা যদি বঙ্কিমের শ্রীকৃষ্ণাদর্শ স্থাপিত করিবার অনুরোধে মানিতে হয়, তবে বাঙ্গলার এই যুগ যে কেরল যুগ বলিয়া আখ্যা দিই, তাহাতে অপরাধ হয় না। খৃষ্ট বুদ্ধ চৈতন্য ধর্ম প্রচার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, একথা শুনিলেও পাপ হয়। সন্ন্যাস—প্রকৃত সন্ন্যাস যে কি তাহাও বঙ্কিমের জানা ছিল না, এই আশ্চর্য্য! ইহ সংসারের দুঃখ নিবৃত্তির জন্য যে রাজপুত্র ভিখারী হইল—তাহা ব্যবসায়—ইহা বুঝিবার মত বুদ্ধিও যেন আমার না থাকে। বঙ্গ সাহিত্যে বঙ্কিমের স্থান সম্রাটের শীর্ষে থাকুক, এ ধর্ম্ম কথা বঙ্কিমের মুখে ভাল শোনায় নাই। প্রচার তাঁহারা করেন নাই। মণি যেমন খনির তিমির গর্ভ হইতে বাহিরে আসিলে আপন আলোক আপনি বিকীরণ করে এ তেমনি। 'প্রচার' বঙ্কিম চন্দ্র করিয়াছেন, বুদ্ধ চৈতন্যের ভেরী আপনিই বাজিয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীচৈতন্য ধর্মব্যবসায়ী ছিলেন না, বাঙ্গলার প্রাণ-ধর্ম তাঁহাকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। বাঙ্গলার প্রাণ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছিল বাঙ্গলা প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল—শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।

বুদ্ধি দ্বারা শোধিত শিল্প কল্পকলায় কোন শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে না, কখন প্রাণ ফুটে না।

সে ফুল আপনি ফোটে. তাহারই সৌন্দর্য্য জগতে আনন্দ দান করে। প্রাণের মর্ম দিয়া যে মর্ম্মর শোধিত হয়, তাহাই শিল্পীর প্রাণ—তাহাতেই তাহার প্রাণের প্রতিষ্ঠা হয়।

মহাভারতে আছে নারায়ন নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে স্মরণ করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে। মহাভারতকার শ্রীকৃষ্ণকেই নরোত্তম বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। বঙ্কিম, খৃষ্ট বুদ্ধকে নরোত্তম নয় বলিয়াছেন, কিন্তু তাহারা আদর্শ মনুষ্য নহেন যে হেতু ধর্মকে তাহারা ব্যবসায় রূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

যে প্রাণের সন্ধান পাইয়াছে সেই জানে প্রাণ কোথায়। শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য, খৃষ্ট, শাক্য, চৈতন্য শ্রেষ্ঠ মনুষ্য। কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠতম মনুষ্য বলিয়া আরাধনা করিতে বাঙ্গলায় সকলেই প্রণত। কৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য কেন, তাহাকে কৃষ্ণত্ব ভগবান্ স্বয়ং বলিয়া চিরকালই গ্রহণ করিয়াছে। বরঞ্চ শ্রীবৃন্দাবন লীলার মাধুর্য্য বাদ দিয়া কৃষ্ণকে মনুষ্য গড়িতে বাঙ্গলা রাজী নহে। বাঙ্গলার প্রাণ এই রসধারায় বাঁচিয়া আছে। এই প্রেমেই সে অনন্তগতি। এই প্রাণের জোরেই সে বাঙ্গলা।

গঙ্গা যমুনা সঙ্গমের মত বাঙ্গলার দুইটী ধারা মিলিয়া আছে। ভাব সরস্বতী তাহার অন্তরের অন্তরতমদেশে অন্তরলিপ্তা। দ্বৈত, অদ্বৈত, অচিন্ত দ্বৈতাদ্বৈতের ভাব সাগরে ডুবিয়া গেছে। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ যুগের সরহ কবির ভনিতায় যে কাম ও প্রেমের অচিন্ত ধামের কথা শুনা গিয়াছিল —যুগের পরযুগ ধরিয়া সেই ভাব ফুটিয়া শতদলের মত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনে অচিন্ত দ্বৈতাদ্বৈতের মিলন রস মাধুর্য্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। একদিকে শক্তি, একদিকে নির্ভর, একদিকে জয় অন্যদিকে সর্ব্বস্ব-অর্পণ. একদিকে ভোগ অন্যদিকে ত্যাগ, এই

দুই মিলিয়া আধঅঙ্গ শুভ্র আধঅঙ্গ কৃষ্ণ একদিকে শ্যাম একদিকে শ্যামা, এই মিলাইয়া বাঙ্গলার প্রেম-ধারা চলিয়াছে। এই দুই ধারা সুষুম্নাবেণী স্বয়ম্ভূকে বুকে করিয়া আনন্দের সাগর-সঙ্গমে চলিয়াছে। এই আনন্দ অন্তরের অন্তরে যেখানে ডুবিয়া আছে, সেই খানে বাঙ্গলার প্রাণের নিকেতন। সেইখানে বাঙ্গলা তাহার আত্মস্থ প্রকৃতিতে, স্বভাবে সজাগ। বাঙ্গলা সাধনের দ্বারা সেই প্রেমার মহাভাবে সকল সৃষ্টি এক করিয়াছে। বঙ্কিম এই প্রাণের কথাটী ঠিক বলেন নাই।

বাঙ্গলা বলিয়াছে—

কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর—

যখন বৌদ্ধ যুগে বাঙ্গলা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—

জ্ঞানে কাম না কামে জ্ঞান—

বৈষ্ণব যুগে আসিয়া যুগ যুগ ধরিয়া বাঙ্গালা সাধন করিয়াছে—সে মূলাধারে এ কমল পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালা তাহাকে তখন নির্ম্মল ভাস্কর বলিয়া গাহিয়া উঠিল। রবি কমলের সম্পর্ক তখন মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিল। এই নির্ম্মল ভাস্কর অন্ধতমিস্রাকে আত্মসাৎ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। বাঙ্গলা তাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রেমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বাঙ্গালার বৈশিষ্ট সেইখানে। যে বাঙ্গলার প্রাণ বুঝিবে, জানিবে, সেই দেখিবে কামকে ইন্দ্রিয়গ্রামের সুরের সকল খেলার সার্থকতা ফুটাইয়া প্রেমের রাগিনী গাহিয়াছে। বাঙ্গলার প্রাণ সেই সুরে সিঞ্চিত, তাহারি দ্যোতনায় ছাতিমান। যে সার্ব্বজাতিকতা, যে বিশ্বজনীনতার সুর আজ বাঙ্গলায় বাজিতেছে, যে নির্ব্বিশেষ বিশ্বপ্রেম লইয়া বিগ্রহহীন পূজার আরতি বাঙ্গলার দ্বারে পতাকা তুলিতে চায় কত কত কবি, কত কত ধর্ম্ম যাজক, কত সমাজ নেতা, কত বাগ্মী রাজনৈতিক, বিগ্রহহীন, নাম-রূপহীন পূজার মন্ত্র স্বস্তি পাঠ করিয়া জগতে কোলাহল তুলিতেছে এই জগতের নরনারীকে একতা বন্ধনে বাঁধিতে প্রয়াস করিতেছে—বিশ্বমানব ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের যে যুদ্ধ হইয়াগেল, যে বিপ্লব ঝঞ্ঝার মত কালমেঘ মাথায় করিয়া প্রতি পদক্ষেপে ত্রাস, প্রতি নিঃশ্বাসে মৃত্যুর ভেরী শুনাইতেছে, তাহাকে বাঙ্গালা তাহার বুক দিয়া প্রাণের সিঞ্চিত প্রেমরসধারা দিয়া আবাহন করিবে জোর গলায় গাহিবে।

'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফুরে'

সে বলিবে, তুমিই আমার কৃষ্ণ, তুমি যেরূপেই আইস, আমি তোমার পূজা করিব। সে বলিবে, ধর্ম্ম অধর্ম্ম সব তোমা হইতে, সত্য অসত্য সব তোমা হইতে, আমারই প্রেমের দ্যোতনা তোমায় রাঙ্গাইয়া দিবে।

এই যে একাকী রসের স্ফূর্ত্তি ইহাই বাঙ্গলার প্রাণের কথা। বাঙ্গলা তোমার বিশ্বপ্রেমে ডুবিয়া সার্ব্বজাতিক হয় নাই, সে পথ তাহার নয়। সে পথে সে যাইবে না। পরের ভাব সমুদ্রে মজ্জমান হইয়া বৈশিষ্ট হারাইয়া, আত্মার অস্তিত্ব ভুলিলে প্রেম হয় না। "বৃক্ষইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠতি একঃ" বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ সেই এক দাঁড়াইয়া আছেন, দিকে দিকে আকাশ। আকাশে নানা মেঘের হরিত পীত নীল লোহিত খেলিতেছে, তাহাতে আকাশেরও কিছু নয়। আত্মস্থ প্রেম সহজ ও সরল সে সহজের উপরই বাঙ্গলার প্রাণ। নিজের স্বধর্ম্ম ও স্বভাবের উপরই বাঙ্গলা দাঁড়াইয়া আছে তাহাই তাহার বৈশিষ্ট। এই বৈশিষ্টেই সকল জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা। বঙ্কিম আমাদের সেই প্রাণ মন্থির পথের আগাছা আবর্জ্জনা কাটিয়া সহজ সরল পথ করিবার প্রয়াস করিয়া গেছেন। আমরা তাঁহারই সরণ লইয়া বাঙ্গলার প্রাণের সাক্ষাৎকার লাভ করিব।

বঙ্কিমের প্রতিভায় নিবিড় তমসাচ্ছন্ন রজনীর শেষ মুহূর্ত্তে উষার একটুখানি ক্ষীণোজ্জ্বল হাসির আভাস প্রতিভাত হইয়াছিল। তিনি বলিয়া গেছেন বাঙ্গলা সাহিত্য বাঙ্গলার ভরসা। কিন্তু

নিশার কোলে বঙ্কিম যে উষার হাসির কল্পনা করিয়াছেন। সে হাসি মেঘে ঢাকিল কেন? আজ সাহিত্যের রূপে সত্য ফোটে না কেন? বাঙ্গলার জীবন ও সাহিত্যের সামঞ্জস্য নাই বলিয়া। বাঙ্গলা যদি সত্য তাহার প্রাণের পরিচয় পাইত, তাহা হইলে তাহার সাধন পথ, এমন অবশ্যর ছায়ার উপর ভিত্তিত না। এমন করিয়া স্বধর্ম্ম ভুলিয়া পরানুকরণের চরম পাপঘাত সংস্কারকে বরণ করিত না। সাহিত্যের মূর্ত্তি এমন হইত না।

আমি আজ বলিতেছি, 'বাঙ্গালীর জীবন বাঙ্গালীর ভরসা—যদি প্রাণ মন মুখ এক করিয়া চলিতে পার তবেই তোমার সাহিত্য রচনার ভরসা। যদি জীবনকে তেমনি করিয়া গড়িয়া তুলিতে পার সাহিত্য তোমার পায়ের দাগে দাগে আপনিই ফুটিয়া উঠিবে। চলার বেগেই পায়ের তলে পথ জাগিয়া উঠে।

আজ তুমি বিশ্বের ভাবের পসার যোগাই করিয়া যত ছাঁচই গড়, জীবনে কর্ম্মে, প্রাণ ও মর্ম্মে চিরদিনই এমনি পৃথক থাকিবে। রুষোর সাম্যবাদের বিষ জাতির মর্ম্মকে উপড়াইয়া বিপ্লব বাধাইয়া অকারণাৎ কারণ গড়িয়া একাকার করিবে, তোমার এ বৈশিষ্ট তখন অতল কালিন্দি সলিলের তমোগর্ভে বিলীন হইয়া যাইবে। কাল নিরবধি পৃথিবী বিপুলা. তোমার এই সৃষ্টিচাতুর্য্য জলের লিখনের মত ঝঞ্ঝাবায়ুর প্রহারে কোথায় মিলাইয়া যাইবে।

তাই সকলের দুয়ারে দুয়ারে ফিরিয়া এই নব জাগরণ বাণী শুনিয়া তুলিতে চাই "খোল খোল প্রাণবন্ধু! খোল খোল বন্ধু! তিমির পরিধিপার ভেদ করিয়া রবি পূর্ব্বগগনে রাক্তরাগরেখা অঙ্কিত করিতেছে—ওই শুন তার তূর্য্যধ্বনি—প্রভাত! প্রভাত! প্রভাত!

এই প্রভাতের আলোকে দেখিয়া লও, কি ছিলে, কি হইয়াছ! ধর্ম্মচ্যুত, জাতিচ্যুত, স্বতবৈশিষ্ট বিজাতীয় ব্যভিচারী ভাব দুষ্ট! পাপগ্রস্ত অহল্যার মত পাষাণ স্তূপ হইয়া রহিয়াছ। ধ্যান কর, কামনা কর, সাধনা কর বাঙ্গলা! কবে সেই ইন্দিবর নয়ান নব-দূর্ব্বাদল-শ্যাম শ্রীভগবানের রক্ত কমল পদ স্পর্শে তোমার পাষাণে প্রাণ ফুটিবে।

আজ প্রভাতের আলোয় রেখায় স্পষ্ট করিয়া চাহিয়া দেখ, আপনার ঘরের দিকে চাহিয়া দেখ, যাহাকে ঘর বলিয়া মনে করিতেছ, সে কি তোমার ঘর! ঘরে অন্ন নাই, কটীতে বস্ত্র নাই, তৈল বিনা রুক্ষ কেশ, প্রভাতীন কোটরগত চক্ষু পীতাভা, অস্থি চর্ম্ম কঙ্কালসার, পদশব্দে বুভুক্ষিত শৃগাল কুক্কুরেরাও চকিত চমকে ফিরিয়া চায়। কোথায় তোমার সে মনুষ্যত্ব, কোথায় তুমি সে মানুষ! আজ সারা জগৎ তোমায় ডাক দিয়া বলিতেছে মানুষ! মানুষ হও! সংসার তোমার তুমি তাহাকে হাতে করিয়া গড়িলে গড়িতে পার। ভাঙ্গিলে ভাঙ্গিতে পার। কোথায় সেই প্রেম, কোথায় সেই সাধনা, কোথায় সেই সত্যের জন্য প্রাণ উৎসর্গ। শুধু স্বপ্নের জড় জড়িমা-ঘেরা তন্দ্রামাখা ভাবুকতায় ডুবিয়া আছ। উঠ! জাগ! ছেদিভেদি এই এই তন্দ্রাজড় মোহ মৃত্যুফাঁদ নিজেকে আজন্ম কর স্বপ্নজাল টুটিয়া যাইবে, দেখিবে প্রাণাৎপ্রাণ প্রিয়তম বাঙ্গলা তোমার জীবনের ধারার সঙ্গে সঙ্গেই আজন্ম রূপে রূপে বিচিত্র হইয়া উঠিবে, আবার গাহিবে,

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।

আজ এই আশার বুক বাঁধিয়া আমার বাঙ্গলার দ্বারে দ্বারে বলিতে চাই, যে একমাত্র প্রাণবন্ধুই মানুষের প্রাণকে, জাতির দেশের প্রাণকে তাহার আপনার বিকাশের পথে লইয়া যায়। যে শক্তি যে প্রেম, এ সৃষ্টি গড়িয়া তুলে তাহা অনির্ব্বচনীয়, শ্রীভগবান, যিনি অনন্ত যিনি মহাশক্তির আধার, সারাদেশের হৃদ্দেশে অধিষ্ঠিত, যে শক্তি রূপে গানে

জনসাধারণের প্রাণের প্রকাশে ফুটিয়া উঠে। আমার এই ডাকে বাঙ্গলার প্রাণ জাগিয়া উঠিবে কিনা তাহা আমি বা না জানি, তবু আমি ডাক দিব, তবু আমি বলিব বৈশিষ্ট হারাইও না। আপনাকে আপনার কর, তোমার কল্যাণ তোমারে ঘেরিয়াই জাগিবে।

আমি বাঙ্গালী, বাঙ্গলাকে জাগাইবার প্রাণ আমার আছে, সে মহাপ্রাণের মাঝে সকলের প্রাণের সঙ্গে আমারও প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে। বহুদিনের পরাধীনতা ও জড়তায় জীবনের যে সহজ ধারা তাহার কণ্ঠ রোধ হইয়া গেছে, খাঁচায়-পোরা পাখিরার কণ্ঠ আর আকাশে বায়ুস্তরে সুরের প্লাবন তুলে না। ধর্মের সাত রঙের পাঞ্জাছেপথ্ জাতি জাতিতে বিদ্বেষ, সকলের উপর দারিদ্রের অক্ষমতার ভিক্ষার—যেখানে মনুষ্যত্বের কোন পদার্থই নাই, সেখানে প্রাণকে জাগাইতে হইলে, প্রাণ-মন্দিরে হোম করিতে হয়, তবে এই রুদ্ধ স্রোত শতধা হইয়া ছুটিবে। আমি তাহা করিব তুমি তাহা করিবে, সকলে মিলিয়া এ জড়তার অবসাদ নির্ম্মোক ত্যাগ করিয়া মৃত্যুকে দুঃখকে হিমগিরির বাহিরে দূর করিয়া দিব।

পাঁচে মেলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন

পাঁচে মেলিয়া এই প্রেম লুটিব, পাঁচে বিলাইব, পাঁচে তাহা আস্বাদন করিব। জাগাইবার ভার আমার উপর তোমার উপর। তাই আজ বাঙ্গলার প্রাণের কথা কহিতে, এত সুখ এত দুঃখ, এত হর্ষ, এত বিষাদ। আজি যদি বাঙ্গলার জীবনের গতি ও চলার পথে মোড় ফিরাইয়া দিতে পারি, তবেই সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে পারিব। বঙ্কিমের আকিঞ্চন সার্থক হইবে। তাই আবার ডাক দিয়া বলিতেছি, কে কোথায় বাঙ্গালার সন্তান, উৎকর্ণ উদ্‌গ্রীব হইয়া শুন—

শোন্‌রে মানুষ ভাই।
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

ঘুমে ভাসরূপে, কর্ম্মে অবসরে জনস্রোতে নির্জ্জনে দিবসে নিশীথে ওই একবাণী ধ্বনিয়া উঠিতেছে

সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

অশরীরি ছায়ার মত আমার আশে পাশে বাতাসে ওই ধ্বনি কাঁদিয়া ফিরিতেছে। আমি দেখিতেছি শীর্ণা বিশীর্ণা ছিন্নবাসা কোটর গত চক্ষু জ্যোতিহীনা রেখাঙ্কিত ললাট কালিমা মাখা, রুক্ষ কেশ ছিন্নবীণা হাতে, জলহীন সরোবর অর্দ্ধমৃত মরাল, শুষ্ক মৃণাল চারিধারে খাওনার হাহারোল, অন্নহীন বস্ত্রহীন বৃদ্ধ বালক নারী শুখাইতেছে। খাদ্য নাই কাঁদিতে চায় তাহাও পারে না এই জীবন, হা বঙ্গ! তুমি কি সাহিত্য গড়িবার জন্য ডাক পাড়াপাড়ি করিতেছ, এইত তোমার জীবন! ধ্বনিয়া উঠ ক্রন্দন বিশ্বকে দীর্ণ করিয়া ফেল, কেহ আছে কেহ আছে, কেহ আছে, জীবনের এ দুর্দ্দিন ঘুচিবে, ঘুচিবে, ঘুচিবে!

এনিশা সন্দেহ রবে না রবে না
ঘুচিবে রে ইহ হাহাকার।

একবার মানস চক্ষে এই চিত্রপটে আঁকিয়া দেখ দেখি কোথাও অনাবৃষ্টি কোথাও অতিবৃষ্টি; কোথাও দুর্ম্মদনদ গ্রামের পর গ্রাম ভাসাইয়া লইয়া গেল, মৃতের স্তূপ শৃগাল কুক্কুর সকলেও খাইতে পায় না, কোথাও অনশন, কোথাও উপবাস জনিত আক্ষেপ, কোথাও বা অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ। এ চিত্র হেরিয়া কি বীতিহিকা জাগেনা? তম হইতে তমগূঢ় আঁধারে বুদ্‌বুদের মত উঠিয়া বুদ্‌বুদের মত মিলাইয়া যাইতেছ। কোথায় তোমার প্রাণ, কোথায় দেশের প্রাণ, কোথায় তোমার সাহিত্য সৃষ্টি, যে জীবনের এই কঠিন অগ্নি পরীক্ষার রসদ রচনা করিবে। কোথায় তোমার দারিদ্র জিজ্ঞাসা, যে দারিদ্রের মূলে গিয়া আঘাত করিবে। সেই অগ্নি উদ্গারী বিপ্লবাবী প্রেম কোথায়? তোমার সাহিত্য এত কথায় নির্ম্মম হয় না, কাঠিন্য বাজে না, তোমার

সাহিত্য জীবনকে ত্যাগ করিয়া রঙিন নেশায় ভরপুর। করাসীর তর্জমার অনুকরণ, নয় অরাগ্রস্থ রঘু নন্দনের স্মৃতির নীতি কথায় ব্যস্ত। হায় বঙ্গ নিজের জীবনকে ত্যাগ করিয়া কি বাঙ্গলার প্রাণের খোঁজ পাইবে? আমি কিন্তু এই তিমির ঘন অমানিশার মাঝে দেখিতেছি ওই আলোকের রেখা উষার রক্ত লেখা। শুনিতেছি সেই অমরীরি সঞ্জিবনী বাণী—প্রাণ আছে, প্রাণ আছে, মরে নাই মরিবে না

'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবক' শস্ত্র তাহাকে ছিন্ন করিতে পারে না, পাবক তাহাকে ধ্বস্ত করিয়া পবিত্রতর করিতে পারে না।

আমি বাতাসে তাহার সাড়া পাইয়াছি, আমি দেখিতেছি তাহার রূপের আভাস. সেই নবজাগ্রত জাতির নব মূর্ত্তি! আমি যেন শিরায় শিরায় শোনিতের গতির ধ্বনি শুনিতে পাইতেছি, মৃত্যুর উপর জয়ের উপর, প্লাবনের বারিস্তম্ভের উপর তাহার তালে তালে নৃত্যের ঝঙ্কার শুনিতেছি—বলিতেছে, প্রাণ শতদলে প্রাণ বিগ্রহ বিরাজ করিতেছে, মন্দির দ্বার উন্মুক্ত বাঙ্গলার সন্তান ফিরিয়া দেখ!

নন্দীর অনুশাসন

(শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী)

* * * * * * * দেশে এ'ল দুর্ভিক্ষ—
ক্রন্দনধ্বনি ভরিল অবনী আকাশ অন্তরীক্ষ;
'কন্‌ট্রাক্ট' নয়, ভারি কর্কশ বর্ব্বর হাহাকার
শৈলশৃঙ্গে কাঁপিয়া উঠিল গৌরীর ধরবার;
নন্দীভৃঙ্গী—ঘণ্টা ও শৃঙ্গী অমনি আসিল ছুটি',
বর্ব্বরদলে কহিল হাঁকিয়া রোষে করি ভ্রূকুটি—
চুপ কর্ সব, রাখ্ কলরব, ঢের সহিয়াছি আর না,
বেত্র আঘাতে থামাব এখনি মিথ্যা ও নাকী কান্না;
অন্ন না থাক্, রয়েছে ত জল, তা ছাড়া জংলা মাছে,
ভাল করে' খুঁজে' দেখ্ দেখি, সেথা 'লেবু টেবু' সবি আছে।

বেঁচে গেল যারা, মুছিয়া অশ্রু কোনমতে দিল পাড়ি
অন্নের লাগি অন্য আশায় বেচে-কিনে' ঘর বাড়ী।
দলে দলে চলে মিলিয়া সকলে—এমনি গোঁয়ার তারা,
শুধু ভাই নয়, শিরে বোঝা বয়, কিমে-কিমে করে' সারা
পাখের নাইক, পথ চলে তবু. বলে—পার হব নদী,
কান্নার জোরে কাণ্ডারীদের কড়ি ফাঁকি দেয় যদি!

পায়ঘাটা পাশে মরঘাটা আছে, সেথা পাঠাবার লাগি'
মুখ উঁচায়ে তুফীর দল খাটে সারা রাত জাগি'
তবু যে চাষারা চেঁচায় কেবলি, খাবে যেন গোটা দেশ
আধপেটা খেয়ে উপোস তবু ত হ'লনাক 'অভোস'!

গোলমাল দেখে' মহাক্রোধান্ধ বন্ধ করিতে রব,
হাঁকিল নন্দী—এখনি বন্দী করিব তোদের সব;
কথা যদি তোরা বলিতেই চাস্ গিয়ে দশক্রোশ দূরে,
যাহা খুসি তাই বলিতে পারিস্ চুপি-চুপি মিহি সুরে—
না, না, চুপি-চুপি ফিস্-ফিস্ কথা আরো সে খারাপ ভারি,
একলা-একলা যদি হয়, তবে সায় দিতে তা'য় পারি:
তবে যদি হয় স্ত্রী-এর সঙ্গে, দুজনে নাই আপত্তি,
তার বেশী হ'লে আবদার আর সহিবনা একরত্তি।
শূলের সাথে ত্রিশূল বাঁধিয়া দণ্ডেরে দেব ছাড়ি',
শুঁতায়ে বাহির করিবে তোদের অন্ত্রবিহীন নাড়ী।

যোড় করি' কর জন কত শেষে দাঁড়াল নন্দী কাছে,
কহে 'প্রভু, আজি তোমার চরণে নিবেদন কিছু আছে;
খাইতে শুইতে চলিতে বলিতে সবই যদি হ'ল মানা,
কি করিব মোরা, বলে' দাও শুধু—হয়ে যাক্ তাই জানা।
হাসিতে ভরিয়া গাল দুটি তার, নন্দী কহিল হেঁকে,
'তাসের রাজা' করিনু তোদের, জেনে রাখ্ আজ থেকে;
টেক্কা গোলাম সাহেব ও বিবি নহলা দহলা আটা,
এই হাতে হবে যখন যা' খুসি—'কাটা আর তোর বাঁটা;
চিৎ হয়ে শুধু 'সঙ্কে' রবি' তোরা মোদের খেলার কালে,
নখ চেয়ে দান লিখিয়া দিলাম খাস্ গোলামের ভালে!

কয়েদীর কথা

(বড় গল্প)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ)

(২৭)

কয়েদী বলিতে আরম্ভ করিল।

মামার সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া আমি অন্য মনে এদিকে সেদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ভাবিলাম—বিশ্বজগৎ সত্য সত্যই মায়া—তবে যতক্ষণ না জ্ঞান হয়, ততক্ষণ এ মায়া আমার কাছে সত্য। এই মায়া আমার কল্যাণের জন্য, কেন না ইহার মধ্যে কখন কাঁদিয়া, কখন হাসিয়া, কখন সহ্য করিয়া কখন যুদ্ধ করিয়া আমি মুক্তির পথে চলিয়াছি। যতক্ষণ জ্বালা, ততক্ষণ মুক্তির চেষ্টা। মুক্তের যে বন্ধন, তাহা স্বেচ্ছায় ঘটিয়া থাকে সুতরাং তাহাতে যে জ্বালা তাহা আনন্দই স্বরূপ।

আমি কয়েদী। আপনিও কয়েদী। আমি আমি জেলে আছি; আপনি চাকরীর গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। দুই জনেরই অবস্থা সমান। আমি কাহারও চাকর নই, সেই জন্য জেলের মধ্যে থাকিয়াও আইন মানি না। আমার মনে হয় জেলের আইন আমার জন্য নয়, আমি তাহা গ্রাহ্য করিব কেন? যাহার বিধান আমি মানিয়া চলি—তিনিই আমার রাজা; তাঁহার প্রজা যে তাহার আবার ভাবনা কিসের? আমার রাজা রামচন্দ্র, আমার জন্য তিনি আপনার ভার্য্যাকে নির্দ্দোষ জানিয়াও পরিত্যাগ করিতে পারেন।

কাল এ জেল ছাড়িব। আমার দেবতার মতে আমি এ জেল ছাড়িবার উপযুক্ত হইয়াছি। বিশ্বসংসারের জেল কবে ছাড়িব বলিতে পারেন? যেদিন মৃত্যুকেও তাঁহার আশীষ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব। ইহাই আমার বিশ্বাস।

তখনও রাত কাটিয়া যায় নাই। রাত্রে মামার কক্ষে প্রবেশ করিলাম। মামা আহারাদির পর শায়িত অবস্থায় একখানা বই পড়িতেছিলেন। আমি তাঁহার খাটের এক পাশে বসিয়া বলিলাম, মামা বই ত পড়িলেন অনেক। সত্য করিয়া বলুন বই পড়িয়া কতটা জ্ঞানলাভ করিয়াছেন এবং সে জ্ঞান আপনাকে শিক্ষকতার উপযুক্ত করিয়াছে কি না।

মামা বলিলেন "বাবাজী, সত্য বলিতেছি—বই পড়িয়া জ্ঞান হয় না। তবে ছাত্রদের যে শিক্ষাদান করি, তাহার উপযোগী জ্ঞান বই হইতেই পাওয়া যায়। সে শিক্ষা তাহাদের বর্ত্তমান জগতের অনেক কথা জানিতে সাহায্য করে।"

আমি বলিলাম "সে শিক্ষা কি মানুষকে মানুষ করে না।

মামা বলিলেন "আমরা ছেলে মানুষ পড়িতে চেষ্টা করি না। তাহাদের চিন্তা শক্তিকেও উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করি না। আমাদের উদ্দেশ্য—তাহারা কতকগুলা জিনিস নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মনে রাখিয়া কোন মতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোক।"

আমি বলিলাম "সে শিক্ষা কি তাহার জীবনের পথ অর্থাৎ মনুষ্যত্বের পথ খুঁজিয়া লইতে সহায়তা করে না?"

মামা বলিলেন "আমরা সে ভাবে তাহাদের শিক্ষা দিই না।"

আমি বলিলাম "মামা, আপনারা ছাড়া আমাদের শিক্ষা দিবার আর কেহ নাই। ছেলেদের যদি মানুষ না করেন, তাহা হইলে আপনাদের কর্ম্ম বৃথা, তাহা কেবল সার্থসিদ্ধির জন্য। আপনারা শিক্ষক নন, আপনাদের দৃষ্টি শুধু বৃত্তিটির উপর।"

মামা বলিলেন "আমাদের নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়।"

আমি বলিলাম "আপনাদের নিয়ম তাহা হইলে আপনাদের ও আপনাদের ছাত্রদিগকে মোহ স্বার্থ ও বন্ধনের দিকে লইয়া যায়। মোহাই আপনার ও নিয়মকে ।ule বলুন আপত্তি নাই, নিয়ম বলিবেন না।"

মামা বলিলেন "হাঁ বাবাজী, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য। আমি কয়দিন ধরিয়া ভাবিতেছি কিসে দেশের ছেলেদের মানুষ করা যায়।

আমি বলিলাম "ভদ্র লোকের ছেলেদের মানুষ করিতে হইলে অসাধারণ ক্ষমতা চাই। সে ক্ষমতা সকলের থাকে না। আমার মনে হয়; চোর ডাকাতের শিক্ষার ভার গ্রহণ করা তাহার অপেক্ষা সহজ। আপনি সে ভার অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারেন।"

মামা বলিলেন "তাহাতে যে অন্ন জুটিবে না।"

আমি বলিলাম "যদি জোটে, তাহা হইলে সে ভার লইতে পারেন?"

মামা বলিলেন "তাহা পারি।"

আমি বলিলাম "দেখুন মামা, আমি আপনাকে যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে মনে হয়—আপনি যাহা ঠিক মনে করেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে দ্বিধা করেন না। একটা কাজ আপনাকে করিতেই হইবে। কাজটা যে ভাল তাহাও আপনি স্বীকার করিয়াছেন।"

মামা বলিলেন "তোমার বিবাহের কথা—তাহা ত শেষ করিয়াছি বলিলেও চলে।"

আমি বলিলাম "সে কাজ বড় কঠিন। সুকৃতির সহিত আমার বিবাহটা সমাজসঙ্গত করা আপনার সাধ্য বা উচিত সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

মামা বলিলেন "আমার কিন্তু কোন সন্দেহই নাই অতএব তোমাদের এ বিবাহ আমাকে দিতেই হইবে। সমাজসঙ্গত নাই হোক্। যাহা উচিত তাহা করিতেই হইবে।"

আমি বলিলাম "তাহা হইলে আমাকে কি সমাজ ছাড়িতে উপদেশ দেন?"

মামা বলিলেন "এই অবসর সমাজ ত্যাগ করাই ভাল।"

আমি বলিলাম "না মামা; ত্যাগ করিতে পারিব না। সারা জীবন যে এই সমাজেই বর্দ্ধিত হইয়াছি। স্বার্থের জন্য ইহাকে ছাড়া উচিত কি? ইহার উন্নতি করিতে হইবে। যদি না পারি চেষ্টা করিতে করিতে মরিব। ইহাকে ত্যাগ করিলে উন্নতি সাধন করিতে পারিব না।"

মামা বলিলেন "তবে সমাজের কাছে আত্ম-বলিদান কর।"

আমি বলিলাম "আত্মবলিদান নয়,—স্বার্থ বলিদান।"

মামা বলিলেন "হাঁ বাবাজী, তোমার কথাগুলা ভাবিবার জিনিস।"

উভয়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। আবার বলিলাম "মামা, একটা কাজ আপনি করুন; কতকগুলি পণ্ডিতের উদ্ধার করুন। আমি অর্থের জোগাড় করিব। আপনি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করুন।"

মামা বলিলেন "সব কথা তোমার বিবাহের পর কহিব।

আমি বলিলাম "না মামা, আপনাকে এখনই করিতে হইবে। আপনি কর্ম্মী, যাহা ভাল বোঝেন তাহা করিতেও চেষ্টা করেন। আমি যে কাজ করিতে বলিতেছি তাহা ভাল যদি মনে করেন করুন, যদি ভাল না মনে হয় স্পষ্ট বলুন।"

মামা বলিলেন "যাহা বলিতেছ বাবাজী তাহা নিশ্চয়ই ভাল তবে "

আমি বলিলাম "যাহা ভাল তাহা করিতে সকলেই বাধ্য, 'তবে' ছাড়িয়া দিন্।"

মামা বলিলেন "দেখ তোমার মত লোকের দ্বারা পৃথিবীতে কোন কাজ হয় না।"

আমি বলিলাম "মামা, কাহার কাজ কে করে বলিতে পারেন? সকলে সব কাজ কখনই করিতে পারে না। আমি আমার কাজ করিব, আপনি আপনার কাজ করিবেন। পৃথিবীর কোন কাজ যদি আমার দ্বারা না হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর কাজ আমার নয়। আমায় তিরস্কার করেন কেন?

মামা বলিলেন "রাখিয়া দাও তোমার তর্ক। তুমি কাজে বসিয়া বড়ই সময় নষ্ট কর। কোন কথা এখন শুনিব না।"

আমি কথা কহিলাম না। দেখিলাম মামা যেন বিরক্ত। আমার অন্তরে একটা ভয়ের সঞ্চার হইল তখনই হঠাৎ একটা নূতন চিন্তা আসিয়া জুটিল—ভাবিলাম আমি যে ভয়ের সঙ্গে চিরদিনই যুদ্ধ করি, তয় কিসের? মামা বিরক্ত হইলে আমার কি আসে যায়? তিনি আমার কি ক্ষতি করিতে পারেন? এসব কথা ভাবিলাম বটে, কিন্তু মামার কথার উপর কথা কহিতে পারিলাম না।

মামা বলিলেন "আজ আমারি ঘরে শয়ন কর বাবা।"

ইচ্ছা হইল অনুরোধ লঙ্ঘন করি, কিন্তু ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল না। মামারই আনুগত্য স্বীকার করিতে হইল। আমি নীরবে মামার সুপ্রশস্ত শয্যাটির এক পার্শ্বে শয়ন করিলাম।

মামা বলিলেন "এখন ২।৩ দিন কোন কথা বলিও না। এখন যে কাজে হাত দিয়াছি সর্ব্বাগ্রে তাহা শেষ করা কর্ত্তব্য।"

আমি নিঃশব্দে শয়ন করিলাম। অল্পক্ষণ পরেই মামার নাসিকাধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি কিন্তু ঘুমাইতে পারিলাম না। কেবল মনে হইতে লাগিল কি করিয়াছি—কি করিতেছি এবং কিই বা করিব। সারাদিন ধরিয়া কত দিকে ছুটিলাম—কেন ছুটিলাম? আনন্দের জন্য। আনন্দের জন্য ছুটাছুটি করিলে লাভ হয় শ্রম, তবে আনন্দ কোথায়। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ মনে হইল—মুক্তিকে বিবাহ করিলে হয় ত খুব অল্পের শান্ত হইয়া যায়। চিন্তাটা স্থায়ী হইল না। তন্দ্রার ঘোরে ভাবনাও তরঙ্গ একটি একটি করিয়া আমার চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়া কোথায় ভাসিয়া চলিয়া গেল।

আলোক নিবিয়া গেল। দেখিলাম—অন্ধকার রাশি আলোড়িত করিয়া একটা ছায়ামূর্ত্তি ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম—মূর্ত্তি আমার পরিচিত—তাহার প্রশস্ত বক্ষে একখানা রক্তাক্ত ছুরিকা বিদ্ধ করিয়াছে। ছায়ামূর্ত্তি আমার নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল "ভজা, কি ভাবিতেছিস্?"

যেন তাড়িতস্পর্শে চমকিত হইলাম। একটুও ভীত হইলাম না। স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। মনে হইল যেন আমার দেবতা আমার ভগবান্ এই ছায়া মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে কর্ত্তব্যের অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। কেন যে প্রাণটা এমন হইয়া গেল তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই। প্রাণে কিসের একটা আবেগ আসিল, বলিলাম "প্রভু আর তো পারি না, প্রাণ সদাই হু হু করিতেছে, সংসারপথে পরিশ্রান্ত হইয়াছি, আমাকে বিশ্রাম দাও। আমি পথভ্রান্ত আমাকে পথ দেখাও। এতদিন আপনার মতে চলিয়াছি। লাভ হইয়াছে কেবল শ্রান্তি, আজ আমাকে হাত ধরিয়া অগ্রে লইয়া চল। আমি নির্ভয় হই।"

সর্দ্দার বলিল "এতদিন ভাবিয়াছ নিজের মতে চলিতেছি, বাস্তবিক কিন্তু আমিই তোমাকে

হইয়াছে, তাহাতেও চলিবে, তুই যে আমার

মনে হইল স্বপ্ন দেখিতেছি—সবই আমার কল্পনাকল্পিত। তারপর ভাবিলাম—কল্পনা হইলেও আমার জীবনের উপর এই দৃশ্যের ছাপটি অতি সত্য। এই দৃশ্য আমার নৈরাশ্যের আশা, বিপদের বল, দুঃখের শান্তি; মিথ্যা বলিয়া ইহাকে উড়াইয়া দেওয়া কখনই উচিত নয়।

বলিলাম "প্রভু, সারা জীবন যেন তরঙ্গাহত হইয়া এদিকে সেদিকে ঘুরিতেছি। শরীর মন অবসন্ন যে আনন্দের জন্য এত পরিশ্রম তাহা যে সুদূর হইয়া পড়িল।"

ছায়ামূর্ত্তি বলিল "আনন্দ বাহিরে নয় ভিতরে। স্থির হও, সংসারের এই ছুটাছুটির মধ্যেই আনন্দ পাইবে।"

ছায়ামূর্ত্তি সহসা আন্তর্হিত হইল। ভাবিলাম—যে পথ দিয়া আমি ছুটিয়া চলিয়াছি, সে পথেও বাধা আছে—বিশ্বজগতের নিয়ম অমান্য করিতে আমি সমর্থ নই। কি জানি কেন আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম।

মামা চীৎকার করিলেন "বাবাজী, ব্যাপার কি?"

আমি বলিলাম "কিছুই না।"

মামা পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিলেন।

প্রভাতে উঠিয়া বাহিরের ঘরে আসিলাম। চৈত্র মাসের শেষ। জানালা দিয়া দেখিলাম বৃক্ষের চিক্কণ পত্রগুলি প্রভাতের রৌদ্রে রঞ্জিত হইয়া বাতাসে কাঁপিয়া উঠিতেছে। এমন মধুর প্রভাত বড় একটা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। চারিদিকে আলোছায়ার নর্ত্তন, বিহঙ্গের কাকলী—মুক্তনীল আকাশের নীচে যেন একখানি উৎসবগৃহ আলো ও গানের সমারোহে মণ্ডিত হইয়াছে। চুপ করিয়া অনেকক্ষণ স্থির ভাবে বসিয়া রহিলাম। আমার চারিদিকে যে রম্য উপবন রচিত হইয়াছে তাহার সৌন্দর্য্য এত দিনের ব্যস্ততায় ভাল করিয়া উপভোগ করিতে পারি নাই। আজ সহসা মনে হইল আনন্দের প্রবাহ এতদিন আমার অতি নিকটেই বহিতেছিল অন্ধ আমি তাহার সন্ধান পাই নি। প্রাণ এমন একটা গভীর ভাবে ভরিয়া উঠিল যাহার সহিত সাংসারিক দুঃখ শোকের কোন সংস্রব নাই।

আজ প্রাণের কথা শুনিতে পাইলাম। শুনিলাম প্রাণ বলিতেছে—দেবতা, তুমি আছ, তুমি বাক্য মনের অগোচর হইয়াও আমার অতি নিকটে বর্ত্তমান আছ; তুমি আমাকে আমার পথ দিয়া অতি সাবধানে চালাইয়া লইতেছ। তোমার করুণার অন্ত নাই। তুমি আমাকে রাজার মত, বন্ধুর মত আত্মীয়ের মত পালন করিতেছ। এস আরো নিকটে এস। তুমি আমার জনক, আমার জননী, আমার সখা। ওগো সুদূর, তুমি নিকটে আসিয়াছ, আরো নিকটে এস—তুমি আমাকে শিক্ষা দাও, দীক্ষা দাও। আমি তোমাকেই আমার জীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়া ধারণা করি।

এমন সময় শুনিলাম বেহারী গান ধরিয়াছে:—

আমার যেদিন জনম সেদিন আমি
শিক্ষা পেয়েছি,
এক অক্ষরের মাত্র মায়ের
ভিক্ষা পেয়েছি;
আমার দীক্ষা বিনা বলে না যে
একটি প্রাণের শ্বাস
এই কথাতে গভীর আমার
হয়েছে বিশ্বাস
আমি নীর পেয়েছি, ক্ষীর পেয়েছি,
পরাণ পেয়েছি,
তারি সাথে সাথে মায়ের
দীক্ষা পেয়েছি।

গান শেষ হইলে বলিলাম "বেহারী, গানটা তোমাকে ভাল লাগে?"

বেহারী বলিল "হাঁ দাদা, ভাল লাগে বৈকি?"

অন্য কোন কথা কহিলাম না। কত কি ভাবিতেছি, এমন সময় মামা নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কিছুক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া আমার নিকটে উপবেশন করিলেন।

দুই জনে নীরবে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। বেহারী নিকটে আসিয়া বলিল "কি গো মামাবাবু, বামুনের বাড়ীটাকে খ্রীষ্টানের বাড়ী করিলেন যে? বিধবার বিবাহ কি ভাল?"

মামা বলিলেন "থাম, আর ও কথায় কাজ নাই, তুই চাকর বাকরের মত থাক্ বাবু।"

আমি বলিলাম "মামা, বেহারী আর চাকর নয়, এখন সে বাড়ীর কর্ত্তা। চাকর হইলে আপনার মতের বিরোধী হইত না।"

মামা বলিলেন "ও বড় রকমের চাকর, কেন না একটুও স্বাধীন ভাব এর মধ্যে নাই। বিধবা বিবাহ অন্যায় কখনই নয়। তবে ও ইহার বিরোধী কেন? পৃথিবীর সকল সমাজেই ত বিবাহ প্রচলিত রহিয়াছে।"

আমি বলিলাম "ও নিজে যাহা বোঝে, তাহা ছাড়িয়া পরের অনুকরণ করা ভালবাসে না। ও স্বাধীন। আপনি চাকর কেন না পরের অনুকরণ করা আপনার স্বভাব।"

মামা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন "তবে কি তুমি এ বিবাহের বিরোধী?"

আমি বলিলাম "যতক্ষণ এ বিবাহ ইচ্ছা করি ততক্ষণ বিরোধী কেমন করিয়া বলিব।"

মামা চলিয়া গেলেন। আমি মামা কথা ভাবিতে লাগিলাম। এক একবার মনে হইল কাল আমার বিবাহ, সুকৃতি কাল আমার হইবে।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় মামার সঙ্গে দেখা করিলাম, বলিলাম— মামা আর আমি বিলম্ব করিতে পারি না। শপথ করিয়া বলুন আপনি আমার জন্য একটী কাজ করিবেন।"

মামার মুখ দেখিয়া মনে হইল—তিনি বড়ই চিন্তিত। বলিলাম "এত ভাবনা কিসের?"

মামা বলিলেন "ভাবিতেছি সত্য চাকর কি না।"

আমি বলিলাম, মামা ছেলেবেলা হইতে হিন্দু ধর্ম্মের আপনি কিছুই জানেন না। ইংরাজী পড়িয়াছেন বিদেশীদের আচার ব্যবহার বেশী জানেন। তাহাতেই আপনার শ্রদ্ধা অধিক। কাজেই হিন্দু সমাজের প্রতি একটা ঘৃণা আপনার স্বাভাবিক। সেই ঘৃণার বশে যদি কোন কাজ করেন জানিবেন তাহা আপনার দাসত্বেরই পরিচয় দিবে। কেবল অর্থের জন্য আপনার লেখাপড়া আপনার জ্ঞান ও কর্ম্ম আপনি অর্থের দাস—এই দাসত্বের মধ্যে আপনার উপাধি ও কার্য্য আপনার অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি করিয়াছে। বিবেচনা করুন, আপনি মানুষ, শুধু অর্থ লইয়া থাকিলে চলিবে কেন? একদল অধঃপতিত মানুষ পশুর বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে— আসুন মামা, তাহাদের উদ্ধার করুন। অর্থ চিন্তা ছাড়িয়া আপনার মনুষ্যত্বকে উদ্বুদ্ধ করুন।"

মামা বলিলেন "বেশ, তুমি খুব বক্তৃতা করিতে পার।"

আমি বলিলাম "চলুন, একবার ঠাকুর ঘরে যাই।"

মামা প্রথমটা রাজী হইলেন না, কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা।

দুজনে ঠাকুর ঘরে উপস্থিত হইলাম বলিলাম "মামা আমরা দেবতার ঘরে, আপনি দেবতার নাম গ্রহণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করুন, আমার কথা রাখিবেন।"

মামা বলিলেন "কি কথা?"

"কতকগুলি চোরডাকাতকে সৎপথে আনিতে হইবে।"

"তাহাদের জন্য জেল আছে, ফাঁসিকাঠ আছে, আমার ভাবিবার প্রয়োজন কি?"

"জেল ফাঁসিকাঠ স্বার্থপরের স্বার্থসংরক্ষণের

"তাহাদের ভাবনা ভাবিতে গেলে আমার ভাবনা ভাবিবে কে ?"

"তাহারাই ভাবিবে।"

"আচ্ছা, আমি ভাবিয়া দেখি।"

"ভাবুন, এই বেলারই ভাবিবার উপযুক্ত স্থান।"

"একটু পরে বলিব, চল বাহিরে যাই।"

"কথাটা এখনই বলিয়া যাইতে হইবে। এখনই যদি না বলেন বুঝিব আপনার দ্বারা একাজ হইবে না।"

"নাই হোক—আমার তাহাতে কিছুই যায় আসে না। পতিতোদ্ধার তুমি করিতে থাক—ও কাজটা এখন আমার নয়—আমার এখন অর্থের প্রয়োজন ?"

"দেখুন মামা, কথাটা মিথ্যা বলিতেছেন—আপনি কবি, রসপিপাসু; শুধু অর্থ লইয়া মত্ত হইবার লোক আপনি নন্। প্রাণ যখন রসের অভিমুখী তখন তাহাকে অর্থাসক্তি ছাড়িতেই হইবে। আপনার অর্থাসক্তি এখন স্বভাবতঃ কম অথবা তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া আসিতেছে; সেই জন্যই আপনাকে যে কাজ করিতে বলিতেছি তাহা সময়োপযোগী হইবে।"

মামা বলিলেন "আচ্ছা, আমি ভাবিয়া দেখিব। এখন জিজ্ঞাসা করি তুমি নিজে একাজ করনা আমায় বলিতেছ কেন ?"

আমি বলিলাম "আপনি ছাড়া একাজ আর কেহ করিতে পারে না। আপনি স্বতন্ত্র; যাহা ভাল বোঝেন তাহা করিতে একটুও বিলম্ব করে না। কর্ত্তার সব গুণ আপনাতে বর্ত্তমান।"

মামা বলিলেন "থাক্, আর তোষামোদের প্রয়োজন নাই।"

আমি বলিলাম "মামা, আমি সরল ভাবেই সব কথা আপনাকে বলিতেছি। জানিয়া রাখিবেন আপনাকে যে কাজ করিতে বলিতেছি তাহা সামান্য নয়। তোষামোদে তুলিয়া ও কাজ করা চলে না। আমি আপনাকে স্বেচ্ছায় একাজ করিতে বলি—তোষামোদ অনুরোধ যেন আপনার ইচ্ছাকে অতিক্রম না করে।"

মামা বলিলেন "ঠিক কথা বাবাজী, এখন চল, তোমার কথামত কাজ করিতে এখন আমি ইচ্ছুক নই।"

"কেন ?"

"সময় নাই।"

"কেন সময় নাই ?"

"নানা কাজে ব্যস্ত।"

"কি কাজ ?"

"এখন তোমার বিবাহটা শেষ হোক।"

"বিবাহ ছাড়া আর কোন কাজ আছে ? বর্ষণঃ কথা কহিবেন মামা।"

"এই কাজটাই আমাকে এখন ভাবাইয়াছে।"

"একাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ আছে ?"

"আছে, তবে এই কাজটাই এখন বিশেষ ভাবনার জিনিস।"

"এ কাজ যদি না থাকিত তাহা হইলে আমার কথা মত কাজ এখনই আরম্ভ করিতেন কি ?"

"করিতাম।"

"মামা এখনই আমার কাজে হাত দিন, আমি বিবাহ করিব না।"

মামা কটমট করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন বলিলেন "তুমি কি বিবাহ করিতে চাও না ?"

"বিবাহ অপেক্ষা আমি যে কাজ করিতে বলিতেছি তাহা অধিক প্রয়োজনীয়।"

আমি তোমার কাজে শীঘ্রই হাত দিব; ব্যস্ত হইও না।"

কথা কহিতে কহিতে বাহিরের ঘরে আসিলাম,

দেখিলাম—রতন একপাশে বসিয়া আছে। বলিলাম "রতন, কাল লক্ষ্মী যেন সকালেই এখানে আসে। জানিস্ তো কাল আমার বিবাহ।"

রতন বলিল "বিবাহ? কার সঙ্গে?"

আমি বলিলাম "দিদির সঙ্গে।"

সে বিস্মিতের মত আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমার কথা সে বুঝিল না, বুঝিতে চেষ্টাও করিল না। মনে হইল যেন সে সব কথাটা তামাসা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রতন বলিল "তাহা হইলে এখনই যাই, বিলম্ব করিলে সময়ে ফিরিতে পারিব না।"

আমি বলিলাম "না আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।"

রতন চলিয়া গেল। মামাকে বলিলাম "মামা, আমার একটা বিশেষ কাজ আছে সে। কাজটি শেষ না করিলে আমি সুস্থির হইতে পারিব না। আপনি সে কাজের ভার লইলে আমি নিশ্চিন্ত হই।"

মামা বলিলেন "তোমার কাজের ভার আমি লইব। তবে তোমার বিবাহ শেষ হইয়া যাক্।"

"যদি এ বিবাহ শেষ না হয় তাহা হইলে কি আমার কাজ করিবেন না?"

"কেন শেষ হইবে না? নিশ্চয়ই হইবে। আমি তাহার জন্য দায়ী।"

এই সময় মা আমাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার সহিত কথা কহিয়া দেখিলাম তিনি পূর্ব্বে যেমন ছিলেন এখনও সেইরূপ। বিবাহের কথার পর হইতে বেহারীর ব্যবহার একটু ভিন্ন রকমের হইয়া পড়িতেছে; আর সে আমাকে পূর্ব্বের মত ভালবাসে না। মামা পূর্ব্বে আমার মিত্র ছিলেন না, এখন তিনি মিত্র। সুকৃতিরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে—সে আমার সঙ্গে এখন আর নিঃসংকোচে মেলামেশা করিতে পারেন না। মায়ের কিন্তু একটুও ভাবান্তর নাই।

মায়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া ভাবিলাম একবার সুকৃতির সঙ্গে দেখা করিব। মামা বাহিরে চলিয়া গেলেন। আমি একবার এদিকে সেদিকে চাহিলাম, কিন্তু সুকৃতিকে দেখিতে পাইলাম না।

রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে সুকৃতিকে খুঁজিলাম, কিন্তু পাইলাম না। গৃহের দাসীরাও যখন শয়ন করিল, তখন একবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম দেখিলাম—সুকৃতি আকাশের দিকে চাহিয়া দালানের একপার্শ্বে বসিয়া আছে। আমি ধীরে ধীরে তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলাম, বলিলাম "সুকৃতি, তোমার সঙ্গে আমার গোপনে কয়েকটা কথা আছে।"

সুকৃতি বলিল "কি বল?"

আমি বলিলাম "কাল বিবাহ, সত্য করিয়া বল—তোমার এ বিবাহে কোন অমত আছে কি না।"

সুকৃতি বলিল "আমার মতামতের প্রয়োজন কি? তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাই করিব।"

"ইচ্ছায় না অনিচ্ছায়?"

"তোমার কথা আমাকে মানিতেই হইবে।"

"যদি তোমাকে ভুল কথা বলিয়া থাকি?"

"সেই ভুলই আমার কাছে সত্য?"

"যদি আমার মত পরিবর্ত্তন করি।"

"করিতে পার।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। তারপর বলিলাম "আজ যাই সুকৃতি, আমার অপর কোন কথা নাই।"

আমি ফিরিলাম। সুকৃতির মুখে একটা মাঙ্গল্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সেই জন্য অধিক কথা তাহার সহিত কহিতে পারিলাম না।

অপরাহ্ণেই আকাশে মেঘ দেখা দিয়াছিল। শয়নকক্ষে আসিয়া বাতায়নের নিকটে দাঁড়াইলাম—দেখিলাম আকাশের গায়ে মেঘের দল ভিড় করিয়াছে। কক্ষদ্বার অর্গলরুদ্ধ করিয়া শয়ন

করিলাম। চিন্তার পর চিন্তা। ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম। তারপর দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলাম এবং মামার শয়নকক্ষের দ্বারে করাঘাত করিলাম।

মামা সাড়া দিলেন "কেও?"

আমি বলিলাম "আমি, দ্বার খুলুন।"

দ্বার খুলিয়া মামা বলিলেন "তুমি ঘুমাও নাই?"

আমি বলিলাম "না, আজ আমার চিন্তার অবসান করিতে হইবে। মামা, প্রতিজ্ঞা করুন, আমার কাজ আপনি করিবেন তাহা হইলে নিশ্চিন্ত হই।"

মামা আলোক প্রজ্বলিত করিলেন, বলিলেন "তুমি একটি পাগল—আচ্ছা তুমি কি চাও—বিবাহ না তোমার কাজ?"

"যদি দুই না পাই, একটাও পাইতে পারি?"

"কোনটা? বিবাহ?"

"না—কাজ। এ কাজের ব্যবস্থা না হইলে আমি কোন মতেই সুস্থির হইতে পারিব না।"

"আচ্ছা, তোমার কাজ আমি করিতে পারি। কাল তোমার বিবাহ শেষ হোক্—তোমার কাজে তারপর হাত দিব।"

আমি আর মামার কাছে বসিলাম না—আমার কক্ষে আসিয়া শয়ন করিলাম। তারপর শয্যা হইতে উঠিয়া এদিক-সেদিক ঘুরিলাম। জানালা দিয়া দেখিতে পাইলাম—ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছে—আকাশ ঘনকৃষ্ণ মেঘে সমাচ্ছন্ন। পশ্চিমদিকে কেবল ঝঞ্ঝাবান মেঘপ্রবাহের মধ্যে মাঝে মাঝে পাণ্ডুর অর্দ্ধচন্দ্র বাটিকাক্ষুব্ধ নৌকাটির মত দেখা যাইতেছে।

আম্রবনের মধ্যে হঠাৎ বাতাসের শব্দ শুনিতে পাইলাম। তারপর বৃষ্টি ও মেঘগর্জ্জন। অন্তরের মধ্যে কি একটা আবেগ ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল। সেটা ঠিক আবেগ নয় একটা নিবিড় আনন্দ। আমি বুঝিলাম—আমি আজ বাধাহীন হইয়াছি। মনে পড়িল এ আনন্দ একদিন ঠিক এই অবস্থায় আমার অন্তিত্বে প্রবুদ্ধ হইয়া আমাকে একটা অনির্দ্দিষ্ট পথে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল; তখন যাহা ছাড়িয়া ছিলাম, তাহা সানন্দে ছাড়িতে পারি নাই। কাল আমার বিবাহ; ঠিক এই ঘটনা সেদিনও ঘটিয়াছিল। আজ আবার সেই দিন আসিয়াছে, মনেরও সেই অবস্থাই বর্ত্তমান। ভাবিলাম এইবার এ বাড়ী ছাড়িবার সময় আসিয়াছে।

ঝড় বহিতেছিল। আমি জানালা খুলিয়া প্রকৃতির নৈশতাণ্ডব দেখিতে লাগিলাম। হঠাৎ যেন দেখিতে পাইলাম—একটা উদ্দাম বাতাসকে বাহন করিয়া সর্দ্দারের ছায়ামূর্ত্তিটা আমার সম্মুখ দিয়া তীরের মত চলিয়া গেল, মনে করিলাম যেন সে হাত নাড়িয়া আমাকে আর একটা পথে চালনা করিতে চায়। কান পাতিয়া শুনিলাম ঝড়ের [redacted] মিলাইয়া কে যেন বহুদূর হইতে আমাকে আহ্বান করিতেছে। আমি উঠিলাম। করজোড়ে ঊর্দ্ধমুখে দাঁড়াইয়া মনে মনে বলিলাম ভগবান, সবই তোমার ইচ্ছা; তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক; তুমি যাহা করাইবে তাহাই করিব। তুমি মঙ্গলময় বিধাতা তোমার কার্য্যে কোন দুঃখ নাই। আমাকে চালাইয়া লও।"

এই কথা বলিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলাম। তারপর সকলের সাক্ষাতে পথের উপর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম।

আজ ভয় ছিল না কেহ দেখিতে পায় পাক্। আর আমি ফিরিতে পারি না। জীবনের একটা অঙ্ক শেষ করিয়া অপর একটা অঙ্কের অভিনয়ে মনঃসংযোগ করিয়াছি। কে আমাকে বাধা দিবে। ভগবান আমাকে যে পথে টানিয়াছেন,কে আমাকে সে পথ হইতে ফিরাইয়া আনিতে পারে?

মামা আমার বিবাহের আয়োজন করিয়াছেন। রতন লক্ষ্মীকে আনিতে গিয়াছে, আজ সে আসিবে। লক্ষ্মীর জন্য মন কেমন করিতে লাগিল। সুকৃতির কথা মনে আসিল না। মনে হইল আমি সুকৃতিকে

বিবাহ করিতে যতটা লালায়িত হইয়াছি। সে আমাকে বিবাহ করিবার জন্য ততটা লালায়িত নয়। কেবল সে নির্বিচারে আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চায়। সে বিচার করুক। আমি চলিয়া যাই, তবে সে বিচারের অবসর পাইবে।

কিন্তু তাহার কর্ত্তব্য কি তাহাও নির্দ্ধারিত করিলাম না। সে যখন আমার উপর সব নির্ভর করিয়াছে আমার কর্ত্তব্য তাহাকে উপদেশ দেওয়া—এই ভাবনাটা আমাকে একটু চঞ্চল করিয়া তুলিল।

তখন গ্রাম ছাড়াইয়াছি। বৃষ্টি কমিয়াছে। মনে করিলাম ফিরিয়া যাই।

মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভাবিলাম ফিরিয়া যাওয়াই উচিত; এমন সময় দেখিলাম মামা নিকটে আসিতেছেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া থামিলাম।

মামা নিকটে আসিয়া বলিলেন "তুমি পাগল নাকি? কোথা যাইতেছ?"

আমি বলিলাম "যেদিকে চক্ষু যায়।"

"আজ কি বাড়ী যাইবে না?"

"বাড়ী ছাড়িবার সময় হইয়াছে।"

মামা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "তাহা হইলে এ বিবাহের যোগাড় করিতে বলিলে কেন?"

"একদিনও বলি নাই।"

"তবে যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। তোমার এ ভাব পূর্ব্বে জানিলে এতটা অগ্রসর হইতাম না।"

"আপনার স্বভাব অনুযায়ী কাজ আপনি করিতেছেন। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। দুঃখে কাজ নাই। এখন আমার সঙ্গে আসুন।"

বুঝিলাম—মামা ক্রোধে অধীর হইয়াছেন। বলিলাম "মামা ঐখানে একটা কালীমন্দির আছে। আসুন সেখানে একটু বিশ্রাম করি।"

দুইজনে একটি ভগ্ন কালীমন্দিরের নিকট উপনীত হইলাম। বলিলাম "মামা, ইনি ডাকাতে কালী, এক সময়ে নরবলিও গ্রহণ করিয়াছেন; শুনিতে পাই এখনও এখানে মাঝে মাঝে নরবলি হয়। মামা, ইনি জাগ্রত কালী. এখানে মিথ্যা বলিবেন না। বলুন আপনি আমার কাজ করিবেন কি না। দেখুন, আমার বিবাহ আপনাকে দিতে হইবে না। সে ভাবনা ছাড়িয়া দিন। আমি আপনাকে অর্থ দিব; আপনি আমার ডাকাতদের দুঃখ ও তাপ নিবারণ করুন। আপনি পরিশ্রম করুন। এই যে পাষাণময়ী দেবতা এখানে বর্ত্তমান ইনি ডাকাতদের অর্থ দিয়াছেন, তাহাদের পাপ-প্রবৃত্তিও চরিতার্থ করিয়াছেন—যখন সময় আসিবে, তখন তাহাদের সৎপথেও টানিয়া আনিবেন।"

মামা বলিলেন "চুপ কর, এখন বাড়ী ফিরিয়া চল।"

আমি বলিলাম "মামা, এখানে আমার কিছু সম্পত্তি আছে, আজ আমি যাইব না।"

"তবে কি বিবাহ করিবে না?

"আজ নয়।"

"তাহা হইলে আমি আর বিবাহের ভার লইব না।"

কেহ কি লইতে বলিয়াছিল?"

মামা চুপ করিলেন। তারপর বলিলেন "তবে তুমি যাও, আমিও যাই।"

"বেশ, তাহাই হোক্।"

মামা কিছুক্ষণ এদিকে-সেদিকে ঘুরিলেন. তারপর বলিলেন "যাই", কিন্তু যাইবার জন্য তাহার বিশেষ ব্যস্ততা দেখিলাম না।

আমি বলিলাম "মামা, এখানে একদল ডাকাতের বাস আছে। এখন যাইবেন না, বিপদ ঘটিতে পারে।"

মামা বলিলেন "আমাকে ভয় দেখাইতেছ?"

ভয় দেখানোর চেয়ে ভয় পাওয়াটাই বেশী দোষের। ভয় পান্ কেন?"

মন্দিরে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি আমাদের

আধারাধির জোড়াড় করিয়া দিলেন। আহারের পর মামাকে বলিলাম "মামা, শুনিয়াছি আমার শ্বশুরের কিছু সম্পত্তি এখানে আছে। আমি তাহা উদ্ধার করিব। আমার সহায়তা করিতে হইবে।

মামা বলিলেন "বেশ।"

আমি বলিলাম "তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে।"

মামা বলিলেন "আরে বাবাজী, তোমার বিপদ হয়, আমারও হবে।"

"আমার বিপদ না হইতে পারে, কেননা জানেন ত মামা এক সময় ডাকাতি করিয়া ছ।"

"আমিও বাবাজী তাহাকে প্রশ্রয় দিতে রাজী নই।"

"তাহা জানি, সেই জন্যই ডাকাতের গুরুগিরি করিতে অনুরোধ করি।"

"আচ্ছা, তাহা করিব, এখন বলত, এ কাজ আমাকে করিবার জন্য এত অনুরোধ কেন? নিজেও চেষ্টা করিতে পার ত?"

মামা, তবে বলি শুনুন, আমার দ্বারা ও কাজ হইবে না, মনে হয় আমাকে শীঘ্রই তোমাদের সম্পর্ক ঘুচাইতে হইবে। আমি আমার পথে ছুটিতে ছুটিতে প্রকৃতির রাজ্যে যে আঘাত করিয়াছি, তাহার প্রতিঘাত আমাকে এক কাজে স্থির করিয়া রাখিবে না। আমি খামখেয়ালী লোক, পাগল বলিলেও চলে। আমি চাই আনন্দ। পাতকীর উদ্ধারের যীশুখ্রীষ্টের মত আমার আনন্দ হয় না। আপনি কর্ম্মী একাজে আপনি আনন্দ পাইতে পারেন।

অপরাহ্নে রৌদ্র পড়িয়া আসিল। আমি বলিলাম "মামা, সুকৃতির কাছে কাগজপত্র আছে, তাহাতে সব কথা লেখা আছে, মুখে আর বলিবার প্রয়োজন নাই। তুমি আমার কাজে হাত দাও। ফললাভ হইবে।

মামা বলিলেন "এইবার লোভ দেখাইতেছ, বেশ, আমি তোমার কাজ করিব—তুমি বিবাহ কর।"

"আমি বিবাহ করিব না, বল, তবুও আমার কাজ করিবে।"

"সময়ে উত্তর দিব।"

আমি মামাকে লইয়া কালীমন্দিরে প্রবেশ করিলাম।

সর্দ্দার আমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছিল—এই কালী-মন্দিরে ডাকাতের সঞ্চিত গুপ্তধন আছে। সর্দ্দার যখন ডাকাতদিগের সঙ্গে মিশিল, তখন সর্দ্দার ছিল চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাস গুপ্তধনের সংবাদ সর্দ্দারকে দিয়া যায়। সর্দ্দার আমাকেই গুপ্তধনের উত্তরাধিকারী করিল কেন ভগবান জানেন। যাই হোক আমি সর্দ্দারের উপদেশ মতে গুপ্তধনের উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলাম। বলিলাম "মামা, আপনি বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকুন, আমি মন্দিরের দরজার খিল দিব। যদি কেহ মন্দিরে প্রবেশ করিতে চায় বলিবেন—একটি বন্ধু পূজায় ব্যাপৃত আছেন, সন্ধ্যার পর দ্বার খুলিবেন।"

এই কথা বলিয়া আমি মন্দিরদ্বার রুদ্ধ করিলাম।

দেখিলাম বেদীর উপর শ্মশানকালীর প্রতিমূর্ত্তি। শুনিয়াছি কে একজন সাধক এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। আজকার সন্ধ্যায় এই ভীষণাকার মূর্ত্তিটি যেন জীবন্ত বলিয়া মনে হইল। মূর্ত্তির পশ্চাতে হাত ঘুরে একটা চিহ্ন লক্ষিত করিলাম। তারপর মন্দিরের ভিতর একটা সাবল দেখিতে পাইলাম সাবল দিয়া দুই চারিটি ইষ্টক উঠাইতেই মাটী বাহির হইয়া পড়িল। মাটী খুঁড়িতে আরম্ভ করিলাম। প্রায় পাঁচ হাত খুঁড়িবার পর একটা বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড দৃষ্টি গোচর হইল। প্রস্তর খণ্ড উত্তোলন করিয়া দেখিলাম একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত রহিয়াছে। চাহিয়া দেখিলাম—ভিতরটা গভীর অন্ধকারে পরিপূর্ণ। সাবলটি দৃঢ় করিয়া মুষ্টির

মেঝে প্রোথিত করিলাম। তারপর উলঙ্গ হইয়া কাপড়টার এক প্রান্ত সেই শাবলে বাঁধিয়া অপর প্রান্ত ধরিয়া গর্ত্তের মধ্যে ঝুলিয়া পড়িলাম। পায়ে কর্দ্দমের স্পর্শ অনুভব করিলাম, দুই একটা কঙ্কাল ও মড়ার মাথায় পদদ্বয় আহত হইল। এদিকে—সেদিকে হাতড়াইয়া দুইটি কলস খুঁজিয়া পাইলাম—একে একে দুইটি উপরে তুলিয়া গর্ত্ত পাষাণখণ্ডে আবৃত করিলাম। তার পর মন্দিরের মেঝে পূর্ব্বের মত ইষ্টকখণ্ডে আচ্ছাদিত করিয়া মন্দিরাগার অর্গলমুক্ত করিলাম। তখন সন্ধ্যা হয় হয়—দেখিলাম—মামা বাহিরে দাঁড়াইয়া একটি লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিতেছেন। আমি বাহিরে আসিতেই লোকটা মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিল, মন্দিরে দীপ জ্বালাইয়া শঙ্খধ্বনি করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

আমি মামাকে বলিলাম "মামা, আর বিলম্ব করিলে বিপদ হইবে। আপনি এই কলস দুটি লুকুচিকে দিবেন। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে অর্থ আছে। যাহাদের অর্থ তাহাদের উপকারেই যেন এই অর্থের ব্যয় হয়।"

মামা বলিলেন "তুমি যাইবে না?"

আমি বলিলাম "না?"

মামা বলিলেন "তাহা হইবে না—পথে যদি ডাকাতে সব কাড়িয়া লয়?"

আমি বলিলাম "তবে চল, কিছুদূরে তোমার সঙ্গে অগ্রসর হই?"

উভয়ে চলিলাম। দুইজনে দুইটি কলস হাতে করিয়া চলিলাম। কেহ আমাদের দেখিতে পাইল না। রাত্রি ঘনাইয়া আসিল। আমাদের গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলাম "মামা, আপনি যান—আমি আমার পথ ধরি।"

মামা বলিলেন "তুমি বাবাজী, আমাকে এত বিশ্বাস করিতেছ কেন? জান আমি তোমার সব টাকা চুরি করিতে পারি?"

আমি বলিলাম "চুরি করেন করিবেন, তাহা হইলেও এ টাকায় চোর ডাকাতেরই উপকার হইবে।"

মামা হাসিয়া বলিলেন "না বাবাজী, আমি সে চুরি করিব না—এ কথা তুমি বিশ্বাস করিতে পার?"

এমন সময় সহসা একটা ভীষণ আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম। দুই জনেই ছুটিলাম—দেখিলাম একখানা গোযান একটা বৃক্ষে আহত হইয়াছে—এবং নিকটবর্ত্তী পুরাতন ইঁদারার মধ্যে গাড়োয়ান পতিত হইয়া চীৎকার করিতেছে। চারিদিকে অন্ধকার—কিছুই দেখা যায় না—ইঁদারার জল কতখানি তাহাও বুঝিবার উপায় নাই। বলিলাম "মামা, লোকটাকে বাঁচাইবার উপায় করিতে পারেন?"

মামা বলিলেন "অসম্ভব?"

সহসা অন্তরে দ্বিগুণ বলের সঞ্চার হইল। বলিলাম "অসম্ভবকে সম্ভব করিতে হইবে।"

দুই চারিজন লোক সেখানে জমিয়াছিল—আমি কাহারও মুখপানে না চাহিয়া কূপমধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম তাহার মধ্যে নামিয়া যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। কূপ হইতে জল তুলিবার জন্য খানিকটা রজ্জু একপ্রান্ত নিকটস্থ একটি বৃক্ষে সংলগ্ন, অপর প্রান্ত কূপের মধ্যে পতিত হইয়াছে। আমি সেই রজ্জু অবলম্বন করিয়া নামিতে আরম্ভ করিলাম। কিছু দূরে নামিতে না নামিতেই পুরাতন রজ্জু ছিঁড়িয়া গেল, আমি সশব্দে নীচে পতিত হইলাম।

ইঁদারাটিতে বেশী জল ছিল না। ভিতরটি জঙ্গল ও আগাছায় পরিপূর্ণ। এখন আমি ভাবোন্মত্ত, ভাবিলাম—মরিতে বসিয়াছি, ভয় কিসের? এখন ভয় পাওয়া বৃথা, কেননা এ ভয়ের প্রতীকার নাই। সর্ব্বাঙ্গ যে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে তাহা তখন জানিতে পারি নাই। কূপে আকণ্ঠ জল ও প্রথমে নিমজ্জিত হইয়াছিলাম, পরক্ষণেই মাটীতে

পা দিয়া দাঁড়াইলাম, চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া হাতড়াইতে হাতড়াইতে গাড়োয়ানের বস্ত্র হাতে লাগিল। আমি তাহাকে টানিয়া তুলিলাম দেখিলাম তাহার শরীর নিস্পন্দ। একবার উপর দিকে চাহিলাম, দেখিলাম প্রায় বিশপঁচিশ হাত উপরে দুই চারিজন লোক আলোক লইয়া আমার কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতেছে—আর তাহাদের উপর নীল কৃষ্ণ আকাশের দুইটা দীপ্ত নক্ষত্র যেন কাহার তীব্র নয়নের মত আমার দিকে চাহিয়া আছে। চীৎকার করিয়া বলিলাম "খানিকটা দড়ি ঝুলাইয়া দাও।"

কূপের উপর একটা বটবৃক্ষের শাখা হেলিয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর দিয়া একগাছি দড়ি উপরকার লোকেরা ঝুলাইয়া দিল। আমি সেই দড়িটা ধরিলাম ও দুই জনের শরীরে বন্ধন করিলাম। উপরের লোকেরা দড়ি টানিয়া তুলিল। আমরা কূপের মধ্য হইতে উদ্ধার লাভ করিলাম। উপরে উঠিয়া মনে হইল যেন আমার জীবনীশক্তি লোপ পাইতেছে। কিছুক্ষণ মৃত্তিকার উপর বসিলাম। তারপর অচেতন হইয়া পড়িলাম।

যখন চেতনা হইল—দেখিলাম আমার আশ্রয়দাতার ঘরে শুইয়া আছি। ঘরে ঔষধের শিশি রহিয়াছে। মাথার কাছে সুকৃতি পাখা নাড়িতেছে। মনে হইল, আমি চির শিশু—কখনও জননীর স্নেহ হইতে বঞ্চিত হই নাই।

অল্পক্ষণ পরেই মামা নিকটে আসিলেন। আমি সচেতন হইয়াছি দেখিয়া বলিলেন "বাবাজী, তুমি যে কি লোক তাহা আজ চক্ষে দেখিয়াছি। তুমি যে কাজ আমাকে করিতে বলিবে তাহা আমি করিতে প্রস্তুত।"

আমি বলিলাম "রাত কত?"

মামা বলিলেন "প্রায় চারিটা?"

আমি বলিলাম "আপনি ঘুমাইতে যান্—আমি ভাল আছি।"

মামা চলিয়া গেলেন।

প্রভাতের রৌদ্র বৃক্ষের পল্লবরাজি ধৌত করিয়া নবদুর্ব্বার বনে পুষ্করিণীর সলিলে অবাধে প্রবাহিত হইয়াছে। আমি ঘরে শুইয়া আছি। সর্ব্বাঙ্গে বেদনা। মনে হইতেছে উঠিতে পারিব না। এমন সময় সুকৃতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলাম "সুকৃতি, মামা কোথায়?"

সুকৃতি বলিল "তিনি ঘুমাইতেছেন।"

বেহারী নিকটে ছিল। সুকৃতিকে দেখিয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল। বেহারীর চলিয়া যাওয়া যে কারণেই হোক্ না কেন আমার ভাল লাগিল না। চীৎকার করিয়া ডাকিলাম "বেহারী দা।"

বেহারী উত্তর দিল না। সুকৃতিকে বলিলাম "সুকৃতি, বেহারীকে ডাকিয়া আন।"

সুকৃতি চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে দেখিলাম —বেহারীকে সঙ্গে লইয়া সুকৃতি আসিতেছে।

বেহারী নিকটে আসিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি বলিলাম "বেহারী দাদা, দিদি আমার কাছে আসিতেই তুমি চলিয়া গেলে কেন?"

বেহারী বলিল "দিদি তোমার কাছে থাকিলে আমার আর প্রয়োজন কি?"

বলিলাম, "কেন?"

বেহারী বলিল "দিদির মত কি আর আমি বুড়া মানুষ তোমার যত্ন করিতে পারিব!"

আমি বলিলাম "বেহারী দাদা, তুমি কি আমাকে ঘৃণা কর?"

বেহারী বলিল "না দাদা, এখনও করি না।"

আমি বলিলাম "তবে তুমি চলিয়া যাও।"

বেহারী চলিয়া গেল। আমি নির্লজ্জের মত সুকৃতির দিকে অনিমেষ-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম।

আজ দেখিলাম সে রূপে লক্ষ্মী, বাক্যে সরস্বতী, গাম্ভীর্য্যে ইন্দ্রাণী ও পবিত্রতায় গঙ্গা। আজ তাহার দিকে চাহিয়া বুঝিলাম—আমার কোন আত্মীয়ের

অভাব নাই। তাহাকে দেখিয়া আমি আজ সকল অভাবের বেদনা বিস্মৃত হইলাম। মনে হইল আমার সকল বাসনার নির্ব্বাণ হইয়াছে। আমি যেন শিশু, সুকৃতির সেই মৃত শিশুটি এতদিন আমাতে বর্দ্ধিত হইয়া হঠাৎ আজ জননীর নিকটে উপনীত হইয়াছে। অন্তরের মধ্যে কে যেন বলিয়া উঠিল "ওগো জগজ্জননী, তুমি আজ ধরা দিয়াছ! আমার সব সাধ মিটিয়াছে। আর আমার প্রার্থনার কিছু নাই।"

হঠাৎ সুকৃতি বলিয়া ফেলিল "তুমি অমন করিয়া চাহিয়া আছ কেন?"

আমি বলিলাম "সুকৃতি, তোমাকে এতদিন যেরূপ দেখিয়া আসিতেছি, আজ তোমাকে তাহার অপেক্ষা অনেক বড় মনে হইতেছে। জীবনের পথে তুমিই আমাকে নিরাপদ করিয়াছ। তোমার সংযম, তোমার ভালবাসা, তোমার করুণা আমার উদাস প্রাণকে নিয়ন্ত্রিত ও সরস করিয়াছে। আজ তোমার নিকট হইতে সাধ যায়। ইচ্ছা করে তোমাকে মা বলিয়া সম্বোধন করি।"

সুকৃতি বলিল "তুমি আমার কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিলে মনে পড়ে?"

আমি বলিলাম "সুকৃতি, ইন্দ্রিয়লুব্ধ আমি তোমার কর্ত্তব্য কি স্থির করিতে পারি নাই। আজ তাহা স্থির করিয়াছি।"

"এ মতের আর পরিবর্ত্তন হইবে কি?"

"কখনই নয়"

"তবে কি কর্ত্তব্য বলিয়া দাও।"

এমন সময় মামা ব্যস্তসমস্ত হইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন—বলিলেন "বাহিরে পুলিশ জুটিয়াছে।"

আমি বলিলাম "শোনো সুকৃতি, তুমি ব্রাহ্মণকন্যা বিধবা—চিরব্রহ্মচর্য্যই তোমার কর্ত্তব্য।"

মামা বাহিরে চলিয়া গেলেন। সুকৃতি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, বলিল "তুমি আমার গুরু—আমার দেবতা, রক্ষক। তোমার আদেশ আমি মাথায় তুলিয়া লইব। আমি কি করিব বল।

আমি বলিলাম "সুকৃতি, আমার যাহা কিছু আছে, সবই তোমার। তুমি রতনকে দেখিও। যে ডাকাতের দল আমাকে আশ্রয় দিয়াছিল, তাহাদের উদ্ধারের উপায় করিও। মামা দেব-প্রকৃতি, তিনি তোমার সহায়তা করিবেন।

এমন সময় মামা আবার আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "বাবাজী, পুলিশ তোমার সন্ধান পাইয়াছে, আর রক্ষার উপায় নাই।"

আমি সুকৃতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মায়ের চরণধূলি গ্রহণ করিলাম। তারপর বলিলাম "আজ আমি বিদায় চাহিতেছি। ভগবান্ আজ আমার জন্য কারাগারের ব্যবস্থা করিয়াছেন।"

রতন ও লক্ষ্মী আমাকে জড়াইয়া ধরিল, বলিল "দোষী আমারা, পুলিশ আপনাকে ধরিবে কেন?"

আমি বলিলাম "রতন, সেদিন সর্দ্দারের ঘর হইতে গুপ্ত ধন আনিয়াছি; দু একজন আমাকে সেখানে দেখিয়াছে। নিশ্চয়ই তাহারা সর্দ্দারের হত্যাকাণ্ডে আমার সম্বন্ধ আছে এ কথা রটাইয়াছে। সেই জন্যই পুলিশ আমাকে ধরিতে চায়। এ ঘটনা যে ঘটিবে তাহা আমি জানি।"

রতন বলিল আমি ধরা দিব।"

আমি বলিলাম "চুপ কর, এখন যদি কোন গোলমাল করিস হয়ত আমার ফাঁসি হইয়া যাইবে।"

মামা বলিলেন "পুলিশকে কিছু ঘুস দেওয়া হোক।"

আমি বলিলাম "মামা, আমি ঘুষ দিয়া আপনাকে রক্ষা করিতে চাই না।"

সকলে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমি পুলিশের নিকট আত্ম সমর্পণ করিলাম।

তারপর কি হইল সে কথা শুনিয়া কাজ নাই। কয়েদী আমি। জেলের পর জেলের যাতনা ভোগ করিতেছি। প্রথমে আপনার বাড়ীটা ছিল জেল। সেখান হইতে পালাইয়া সরকারের জেলে আসিলাম।

সে জেল যখনই ছাড়িলাম মুক্তিদের বাড়ী আর একটা জেল নির্শ্মিত হইল। মনে করিয়া ছিলাম—এ জেল হইতে পলাইব না। যেদিন পলাইবার চেষ্টা করিলাম সেদিন বিধাতা আবার আমাকে সরকারের জেলে আবদ্ধ করিলেন। এ জেল হইতে পলাই নাই। সেই জন্য মনে হয় আর জেলখানায় আসিব না। আপনি সংসারকে যতদিন কারাগার মনে করিবেন, ততদিন ইহা কারাগারই থাকিবে। যেদিন বুঝিবেন এটি কারাগার নয় সেই দিনই সংসার-বন্ধনের অবসান। ভালবাসায় মুক্তি, ঘৃণায় পাপ। সংসারক্ষেত্র মানুষের শাসনক্ষেত্র নয়, পরীক্ষা ক্ষেত্র। এখানকার পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হয়, আনন্দ তাহার। ভোগ বিস্মৃতি, অজ্ঞান বা পাপে আনন্দ নাই। যখন আনন্দ চাহিয়াছি তখন তাহা পাই নাই। আনন্দ আমি অনেকটা এই জেলে ভোগ করিয়াছি। সুখ দুঃখ, পাপপুণ্য সত্যমিথ্যা বিধি নিষেধ আমার অন্তরে, বাহিরে নয়। বাহিরের সুখদুঃখ, পাপপুণ্য, সত্য-মিথ্যা, বিধি নিষেধ আমার কাছে কাল্পনিক ও অগ্রাহ্য।

এইখানে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কয়েদী বলিল "আমার কথা আজ শেষ করিলাম।"

আমি বলিলাম "কাল সকালে আপনার মুক্তি-আদেশ-পত্র পাইয়াছি।"

কয়েদী বলিল "এ মুক্তিকে কি মুক্তি বলেন? চোর, ডাকাত, জুয়াচোরের পক্ষে ইহা মুক্তি হইতে পারে। আমি জেলের মধ্যে মুক্তই ছিলাম।

আমি কয়েদীকে আদেশ পত্র দেখাইলাম। বলিল "পত্র আপনার, আমার নয়।"

পরদিন যথা সময়ে কয়েদীকে মুক্ত করিলাম। সে বলিল "আজ আপনার সহিত আমার সম্বন্ধ ঘুচিল। আর দেখা হইবে কিনা বলা যায় না।"

আমি তাহাকে বলিলাম "আপনার আহারাদির ব্যবস্থা কিরূপ হইবে?"

সে উত্তর দিল না। মন্ত্রের মত দুলিতে দুলিতে সিধা পথে চলিয়া গেল। যতক্ষণ না সে দৃষ্টিপথ ছাড়াইয়া গেল ততক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

চিত্রকরের চিত্তবিভ্রম

(শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ)

(১)

গঙ্গানন দাস চিত্রকর। চিত্র শিল্পে বিশেষ কৃতী! সাংসারিক যে অবস্থা এবং আশ্রয়ের সাহায্যে মানুষ বালো বর্দ্ধিত হয়, গঙ্গানন তাহাতে বঞ্চিত ছিল; সুতরাং বিদ্যালয়ের পাঠাভ্যাস তাহার অধিক হয় নাই। প্রিয় দর্শন সদা প্রফুল্ল মুখ গঙ্গানন সকলেরই স্নেহ আকর্ষণ করিত; তাহার আকৃতি যেমন চিত্তাকর্ষক, স্বভাবও তেমনিই প্রীতিপ্রদ ছিল। শান্ত, সরল, বিনয়ী গঙ্গানন যখন কান্ত কৈশোরে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত রাজভ্রাতার নিকট চিত্র শিল্প শিক্ষার্থ বৃত্তি প্রার্থনা করিল, তাহার প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হইল। বৃত্তিলাভ করিয়া গঙ্গানন যখন কি একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে পল্লীজননীর নিকট বিদায় লইয়া রাজধানী কলিকাতায় চিত্রশিক্ষালয়ে প্রবেশ লাভ করিল। তৎপূর্ব্বে চিত্রশিক্ষালয়ে গঙ্গাননের ন্যায় অল্প বয়স্ক বালক বিরল ছিল; সুতরাং চিত্রশালার অধ্যক্ষ হইতে ভৃত্য পর্য্যন্ত সকলেই এই বালকের তরুণ

অকূলের স্থায় সদ্য বিকসিত কমনীয় মূর্ত্তিতে মুগ্ধ হইলেন।

একজন শিক্ষক ছিলেন সৌন্দর্য্য-সেবক; প্রস্ফুটিত পুষ্প, কমনীয় কান্তি, প্রাকৃতিক শোভা, রামধনুর বিচিত্র বর্ণ সম্পদ তাঁহার চিত্তকে সমভাবেই আকৃষ্ট করিত। কিশোর কুমার গজানন স্বীয় স্বাভাবিক মৃদু মধুর চরিত দ্বারা তাঁহার স্নেহের অনেকটা অধিকার করিয়াছিল; তিনি পুত্রনির্ব্বিশেষে গজাননের তত্ত্বাবধারণ করিতেন। সেই শৈশব হইতে যৌবনের কর্ম্মক্লান্ত জীবন পর্য্যন্ত গজানন কখন এই মহানুভবের স্নেহের অন্তরাল হয় নাই। আজ তিনি জীবনের পরপারে,—পার্থিব স্নেহের অতীত লোক হইতে গজাননের প্রতি শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছেন! অক্লান্ত অধ্যবসায় সহকারে গজানন বিদ্যালয়ে এবং গুরুগৃহে চিত্র শিল্পের অনুশীলন করিয়া দিন দিন নিজের কৃতিত্ব যত প্রকাশ করিতে লাগিল; ধীরে ধীরে তাহার যশঃ-সৌরভ নগরে তত বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

চিত্র শিল্পের যে যুগে গজানন চিত্র শিল্প শিক্ষালয়ে অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছিল, অধ্যক্ষের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রভাব খর্ব্ব হইয়া গেল; বৃত্তির কালও অতিক্রম প্রায়। সুতরাং গজানন কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিতে বাধ্য হইল। শিক্ষালয়ে যে অধ্যবসায় এবং অনুশীলন তাহাকে স্বার্থকতার পথে অগ্রসর করিয়াছিল, কর্ম্মজীবনে ফলবতী হয় নাই। বাল্যজীবনের অভাব যৌবনেও তাহাকে ত্যাগ করিতে বিমুখ হইল; তথাপি আত্মীয় স্বজন পরিণয়ের লৌহশৃঙ্খলে তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিল। কর্ম্মজীবনের অবশ্যম্ভাবী প্রত্যাখ্যান, ক্রমবর্দ্ধনশীল অভাবের দারুণ কশাঘাত, মমতাময়ী কিশোর পত্নীর মনোরঞ্জনের বিপুল প্রয়াস তাহাকে পদে পদে আহত করিতে লাগিল। যে আপাতরম্য উচ্চ আশা লইয়া সে শিক্ষালয়ে প্রবেশলাভ করিয়াছিল; যে অকপট উদ্যমের সহিত সে রেখা, বর্ণ, চিত্র সন্নিবেশ, ভাব, চরিত্র প্রাণ প্রতিষ্ঠা তুলিকার বর্ণ বৈচিত্রে আয়ত্ত করিয়াছিল তাহার পরাভব অনুভব করিয়া সে কর্ম্মপীড়িত হইতে লাগিল। শিক্ষাজীবনের আদর্শ যে কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই আয়ত্ত হয় না সে শিক্ষা অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। অভিজ্ঞতা অনায়াসে অথবা সহজলভ্য নাভ করা যায় না। দীর্ঘ শ্রমে, উচ্চ মূল্যে অভিজ্ঞতা ক্রয় করিতে হয়। বাঙ্গালীর কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয় যৌবনের প্রারম্ভে; তাহাও পরাধীন, বন্দী অবস্থায়। সামর্থ থাকুক বা নাই থাকুক, একটি অবোধ বালিকার সমস্ত জীবনের গুরু-ভার মস্তকে লইতে, আমরা বাধ্য হই; ফলে, আয়ের পথ উন্মুক্ত হইতে না হইতেই অভাবের পথ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সুতরাং সুদূর পরাহত সাফল্যকে আয়ত্ত করিবার উপযুক্ত কালের প্রতীক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। কি কেরাণী, কি উকিল, কি ডাক্তার, কি ব্যবসায়ী সকলেই কর্ম্মারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ সাফল্যের আশা মরিচীকায় মুগ্ধ এবং বিড়ম্বিত হইতে হয়। গজাননের ভাগ্যেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কঠোর পরিশ্রমের অনুপযুক্ত মূল্যে চিত্র শিল্পের অনুশীলন তাহার নিকট নিষ্করুণ ভাগ্য দেবতার কর্ম্মফল পরিহাস বলিয়া মনে হইত। গজানন সহিষ্ণু এবং উদ্যমশীল, তাই তাহার অনেক বন্ধুর ন্যায়, তুলি ত্যাগ করিয়া লৌহ মুদ্গরের ব্যবহার দ্বারা তাহাকে জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয় নাই; কিন্তু সহিষ্ণুতারও সীমা আছে। যখন সেই সীমা অতিক্রান্ত প্রায়, তখন সরকারী চাকুরী এক ক্ষীণ সূত্র অবলম্বন করিয়া, গজানন জীবন তরণীকে তীরাভিমুখীন করিতে সমর্থ হইল। শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া এই একটি নির্দ্দিষ্ট, নির্দ্ধারিত গন্তব্য পথের ক্ষুদ্র রেখা অবলম্বন করিতে যৌবনের চঞ্চল অংশ অতিক্রান্ত হইয়া গেল; কন্যার পর কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া জীবনের দায়িত্ব গুরু ভার হইল; সুতরাং জীবনের

যৌবনারম্ভে যে উপভোগের কাল সে কথা মনে করিবারও তাহার অবকাশ ঘটে নাই। ফলে জীবনটা একটি নিতান্ত রুক্ষ ব্যাপারে পরিণত হইল;—কেবল রসবিহীন কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম। গজাননের সৌভাগ্য যে সে সতীর্থরূপে এক দীক্ষাগুরু লাভ করিয়াছিল। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি বলে এই সতীর্থ-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন। যখন গজানন সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে এবং সমাজের কঠোর নিষ্পেষণে শ্রান্ত ক্লান্ত, তখন এই বন্ধু ধর্ম্মানুশীলনের শুভ ফলের নির্দ্দেশ করিয়া গজাননকে সত্য পথের শুভ্রালোক দেখাইয়া দিলেন। সেই আলোকে গজানন গন্তব্য পথে কর্ত্তব্য সাধন করিয়া নিরাপদে শুভ্র কেশলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ধন্য সেই মহাত্মা, যিনি দুঃখের দিনে দৈন্যের দিনে—দুর্ব্বল, মোহান্ধ হৃদয়কে সবল এবং সুস্থ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্য লাভ না করিলে গজাননের জীবনের গতি কোন পথে যাইত কে বলিতে পারে?

(২)

গজাননের হৃদয় ছিল স্নেহপ্রবণ। যাহাদের সহিত সামান্য ঘনিষ্ঠতা জন্মিত, গজানন তাহাদিগকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। যাহাদের সে ভালবাসিত, তাহাদের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখিত হইত। তাহার সহিত পরিচয় হইলে লোকে তাহার প্রতি সহজই আকৃষ্ট হইত। সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষত্ব ছিল তাহার বাক্যবিন্যাসে। যদিও সাধারণ হিসাবে তাহার শিক্ষা সমুন্নত ছিল না, তথাপি বঙ্গভাষার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ হেতু সে তাহার জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

এমন কোন বাঙ্গলা মাসিক পত্র ছিল না যাহা সে পঠিত না। তাহার উদ্যমে তাহাদের আফিসে একটী পাঠাগার সংস্থাপিত হইয়াছিল। সেই পাঠাগার এবং অন্যান্য দুই একটী পারিবারিক পুস্তকালয়ের সাহায্যে বর্ত্তমান এবং তৎপূর্ব্ব যুগের মনিষী লেখক গণের সহিত সে ঘনিষ্ট ভাবে পরিচিত হইয়াছিল। আধুনিক যুগের এক শ্রেণীর পাঠকের ন্যায়, সময় কাটাইবার, অথবা কোন মতে কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য সে পড়িত না; তাহার পাঠের মূলে ছিল জ্ঞান পিপাসা। সে যাহা পড়িত তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিত এবং অর্জ্জিত জ্ঞান দ্বারা জীবনকে সতত উন্নত পথে পরিচালিত করিতে প্রাণপণে যত্ন করিত। সে চেষ্টা নিজের প্রতি সে যেমন প্রয়োগ করিত, অন্যের প্রতি ও তদ্রূপ প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিত, এইখানে ঘটিত বিরোধ।

যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন গজানন যৌবনের প্রান্তসীমা অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থায় পদার্পণ করিয়াছে। সাহিত্য এবং ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া জীবনকে তখন সে একটী নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ গন্তব্য পথের অনতিপ্রশস্ত পরিখার মধ্যে পর্য্যবসিত করিয়াছে, কিন্তু ভালবাসিবার প্রবৃত্তি খর্ব্ব হয় নাই, বরং বিশ্ব সাহিত্য এবং সর্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের সাহায্যে দেশ বাসীকে বিশ্বপ্রেমিক করিবার একটী মোহিনী কল্পনা ক্রমে ক্রমে তাহার হৃদয়কে বিচলিত করিয়া তুলিতেছিল। জীবনের এমন এক বিপুল আকাঙ্খার সময়ে চিত্র শিল্পের সম্ভবে সে এক পরিবারের সহিত পরিচিত হইল, যাহার অধ্যক্ষ ছিলেন এক রমণী। সে রমণী বিদুষী না হইলেও বহু সাহিত্যের সহিত সুপরিচিতা ছিলেন; সঙ্গীতে তিনি ছিলেন সুপারঙ্গমা; চিত্র শিল্পে তাঁহার নিজের কোন কৃতীত্ব ছিল না, কিন্তু চিত্র কলা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা ছিল, তখন লীলা চঞ্চল মনোমুগ্ধ কর। রমণীর বর্ণীয়সী, গাম্ভীর্য্যের নিবিড় ছায়া তাঁহার রূপকে সংবৃত করিয়াছিল, তাহাতে তখন ছিল করুণার কমনীয়তা; —আর ছিল বিষাদের পূর্ণ অভিব্যক্তি। মনোমুগ্ধকর, কিন্তু মোহলেশ শূন্য—সে রূপের তুলনা সচরাচর পাওয়া যায় না। যে রূপে শ্রদ্ধার সহিত

প্রীতি আকর্ষণ করত, অনুরাগের সহিত সম্মান জাগাইয়া দেয়, সংযমের সহিত সৌহার্দ্য বর্দ্ধন করে, সেই রূপ ছিল সেই রমণীর। এখন তিনি জীবনের পরপারে! সেরূপ ইহ জগতের উপযুক্ত ছিল ততদিন, যতদিন তাহাতে ভোগের বাসনা ছিল প্রবল, পুত্র কন্যার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে গাম্ভীর্য্যের নিবিড় ছায়া সম্পাত হইতে না হইতে বিষাদের কালিমা পড়িয়াছিল গাঢ়। সমাজের নির্ম্মম নিয়মের মূলম ভঙ্গ করিতে না পারিয়া স্বীয় যুবতী কন্যাকে অবিবাহিত রাখিতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন; অথচ এমন কোন অভিভাবক ছিল না যাহার উপর নির্ভর করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। যখন এই রূপে বিষাদের কালিমা নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইতেছিল, তখন গজানন তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছিল। রমণীর প্রশান্ত স্বভাব গজাননের স্নেহ প্রবণ হৃদয়কে গ্রাস করিয়াছিল; নিজে প্রৌঢ় না হইলে গজানন অনায়াসে তাঁহাকে জননীর আসনে বসাইতে পারিত; কিন্তু উভয়ের বয়সের সমতা প্রযুক্ত ভ্রাতার স্নেহ এবং ভগ্নীর নির্ভর তাহাদের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সৌহার্দ্যের সৃষ্টি করিয়া ছিল। গজাননের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা এবং তাহার পুত্র কন্যার প্রতি আন্তরিক স্নেহ রমণীর জীবনে এক চরম শান্তি বিধান করিয়াছিল; তাই বোধ হয় গজাননের সহিত পরিচিত হইবার কয়েক বর্ষ মধ্যেই তাহার ইহলীলা সমাপ্ত হইয়া গেল। জননীর জীবিত কালেই গজানন কন্যার শিক্ষকের আসন গ্রহণ করিয়াছিল।

জননীর যে রূপ ছিল, কন্যা তাহা পায় নাই; কন্যাবিভায় সে জননীকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। সুকণ্ঠ সমুচিত সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা যখন স্তরে স্তরে অন্তরীক্ষে বিলীন হইয়া যাইত, গজানন তখন রাগ রাগিনীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ অনুভব করিতে পারিত। কন্যার আসনে বসিয়া মনোরমা গজাননের সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। গজানন তাহাকে কন্যারূপে, মিত্ররূপে, ধাত্রীরূপে ছাত্রীরূপে যখন যেরূপে চিন্তা বা কল্পনা করিত, সেই রূপেই তাহার হৃদয় ভরিয়া যাইত। তাহাকে অন্যের কিছুই ছিল না তথাপি গজাননের তৃপ্তি হইত না। মনোরমার রূপ ছিল না। মাতার রূপ ছিল অসামান্য; কন্যা যেরূপ পাইয়া ছিল তাহা অতি সামান্য, সে রূপের বর্ণনা করা চলে না; কিন্তু গুণ ছিল অসাধারণ। মাতার নিকট সততা, করুণা এবং অনুকম্পা সে প্রচুর লাভ করিয়াছিল। মাতার অপেক্ষা অধিক ছিল তাহার বিদ্যা, কারণ মনোরমা যেখুন কলেজে দ্বৈবেণিকা পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল; পরীক্ষা দিয়াছিল—উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।

মনোরমার শিক্ষা হইয়াছিল অতি চমৎকার। সংযম ছিল তাহার এত অধিক যে সে যে যুবতী একথা কাহাকেও ভাবিবার অবকাশ দিত না। আত্মীয় বান্ধবদের সহিত সে এমন অবাধে, সহজ সরল ভাবে মিলিত, বসিত, হাসিত, গল্প করিত, যে তাহাকে সকলেই অনূঢ়া বালিকা ব্যতীত বিবাহ বয়ঃপ্রাপ্তা যুবতী বলিয়া ধারণা করিতে পারিত না। অনাবিল সরলতার সহিত তাহার এমন গাম্ভীর্য্য ছিল যে তাহাকে জননীর আসন দিতেও কেহ কুণ্ঠিত হইত না। গজানন তাহাকে মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা জ্ঞানে চিত্রবিদ্যা শিখা দিত। তাহার জীবনটীকে একটী অলোকসামান্য আদর্শ করিয়া গড়িবার বাসনা ধীরে ধীরে গজাননকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।

আমাদের আধুনিক যুগের সংস্কার যে কন্যা একাদশ অথবা দ্বাদশে পদার্পণ করিতে না করিতেই —তাহাকে বিবাহ দিয়া শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। কন্যা যে চির কুমারী থাকিয়া জগতের প্রভূত উপকার সাধন করিতে পারে এ সত্য আমরা ভাবিবার ও চেষ্টা করি না। যেমন করিয়া হউক বালিকা কন্যাকে পাত্রস্থ করিয়া শ্বশুরালয়ে যতক্ষণ না আমরা প্রেরণ করিতে পারি ততক্ষণ আমরা সুস্থ

হইতে পারি না। কন্যা বৈশোর অতিক্রম করিতে না করিতে—তাহাকে অবশ্য বিবাহ দিতে হইবে, এই প্রথার ফলে, অনেক সময় অতি শিশু কন্যাকে অতি বৃদ্ধের হস্তে সমর্পণ করিয়া পিতা মাতা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। সে দিন ও সংবাদ পত্রে পড়িয়াছি যে এক সত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ এক একাদশ বর্ষীয়া বালিকার পাণিপীড়ন করিয়াছেন। কতদিনে, অথবা কখন, এই কুপ্রথা নিবারিত হইবে কিনা বলা যায় না। কাল চক্রের আবর্ত্তনের ফলে বহু বিবাহ বিরল হইয়াছে, আশা করি অধিকতর শিক্ষা এবং সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু বালিকার প্রতি সমাজের এবং নির্ম্মম পীড়ন ও অন্তর্হিত হইবে।

সন্তান প্রেমে গজানন পরিণত বয়স্কা অবিবাহিতা স্বাধীন চিত্তবৃত্তি সম্পন্ন সংযত ও সংযমী মনোরমার শিক্ষাভার প্রাপ্ত হইয়া নূতন আদর্শ গড়িয়া তুলিবার এমন সুদুর্লভ সুযোগ উপেক্ষা করিতে পারিল না। সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আর্থিক ও সংসারিক সহস্র ক্ষতি সত্ত্বেও গজানন মনোরমার শিক্ষাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া কায়মনোবাক্যে তাহার সৌকার্য্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইল। শিক্ষক যেমন অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন, ছাত্রী ও তেমনি অধ্যবসায় ও অনুশীলনের দ্বারা আত্মোন্নতির প্রগাঢ় চেষ্টা করিত। উভয়ের ঐকান্তিক চেষ্টা শুভ ফলপ্রদ হইল। প্রাচীন শিক্ষকের নবীন ছাত্রী জ্ঞানভাণ্ডারের অসীম আহরণে অশেষ যত্নের অনুসন্ধানকে জীবনের ব্রত বলিয়া বরণ করিয়া লইল। নবীনে প্রবীণে শ্রদ্ধা এবং স্নেহের এমন এক অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধের সৃষ্টি হইল যাহা কন্যার প্রতি পিতার স্নেহ; পিতার প্রতি পুত্রীর ভক্তি, আদর্শের প্রতি অনুকরণকারীর অনুরাগ এবং প্রিয়জনের প্রতি প্রেমাস্পদের প্রীতি উদ্রেক করিয়া গেল। সে যে কি সুখের—শান্তির—তৃপ্তির ও আনন্দের কাল তাহা প্রজাপতি ব্রহ্মার সহস্র সহস্র মুহূর্ত্তের সমষ্টি হইলেও গজাননের নিকট ক্ষণস্থায়ী বলিয়া অনুমিত হইত।

কাল প্রবাহে জীবনের গতি পরিবর্ত্তনশীল, তাই এক অশুভ মুহূর্ত্তে মনোরমার জননী অসুস্থ হইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। চিকিৎসার ত্রুটী হইল না; কন্যা দিন রাত্রি জননীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিল গজানন আপনার সমস্ত ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োজিত করিয়া মহিলার জীবনপ্রদীপকে পুনরুদ্দীপিত করিবার চেষ্টা করিল। সব বিফল হইল। ইহ জীবনের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া মনোরমার মহিমাময়ী জননী মহাসহিষ শ্রীভগবানের অমৃতময় শ্রীচরণযুগে চির শান্তি লাভ করিলেন।

মনোরমার দ্বিতীয় আশ্রয় স্থান ছিলেন এক মাতুলমা; জননীর অবর্ত্তমানে তিনি মনোরমার অভিভাবক হইলেন। মা যেমন সন্তানের অভিপ্রায় অনুধাবন করিতে পারেন এবং সহস্র অসুবিধা উপেক্ষা করিয়া তাহার প্রশ্রয় দিতে পারেন, অন্য কোন আত্মীয়, যতই স্নেহ প্রবণ হউন, তাহা পারেন না। নিজের সন্তান ব্যতীত অন্যের অভিভাবক হইলে, মহিলারা কোমল প্রবৃত্তি গুলিকে অকস্মাৎ অবশ করিয়া ফেলেন; কারণ আত্ম সন্তানের তত্ত্বাবধারণ স্বাভাবিক, তাহাতে দায়িত্ব গুরুতার বলিয়া অনুভূত হয় না। কিন্তু অন্যের সন্তান, বিশেষতঃ কন্যা সন্তানের ভার অনভ্যাস হেতু কষ্ট বহন করিতে হয়; ফলে, দায়িত্বের গুরুত্বানুযায়ী প্রকৃতিও পক্ষপাতা লাভ করে। সদ্ভাবকে অপসৃত করিয়া অসদ্ভাব তাহার স্থান অধিকার করিয়া তত্ত্ব এবং প্রীতি স্নেহের মূল দৃঢ় না করিয়া অপ্রীতি দ্বারা সেই মূল শিথিল করিয়া দেয়। সচরাচর শ্বশ্রূ ও পুত্রবধূর মধ্যে আবার যে অপ্রীতি দেখিতে পাই এই কর্ত্তৃত্বাভিমান তাহার অন্যতম কারণ। শোকের তীব্রতা মন্দীভূত হইলে, মনোরমা বুঝিল যে তাহার মাসীর এক বিষম ভার হইয়াছে; মাসীও তাঁহার দায়িত্বের গুরুত্ব অতিরিক্ত পরিমানে অনুভব

করিলেন ;—সুতরাং উভয়ের মধ্যে অভিলাষ এক দুরতিক্রম্য ব্যবধান সৃষ্টি করিল। ব্যবধান দিন দিন বিস্তৃত হইতে লাগিল ; বাধাও উভয় পক্ষে উত্তরোত্তর তীব্র ও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। মাসী মনোরমার বিবাহ সমীচিন মনে করিয়া অনুরূপ পাত্রের অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন ; গজানন তাহার মানসী আদর্শ নারীর ক্রমবিকাশের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক সমুপস্থিত দেখিয়া ম্রিয়মান হইল : মনোরমা নিজে আপনাকে এক অভিনব আদর্শের আসন হইতে ভ্রষ্ট অনুভব করিয়া মর্ম্মাহত হইল। পূর্ব্বে যেখানে অনাবিল সুখ, শান্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা ছিল এখন সেখানে কর্ত্তব্য, স্বার্থ এবং অভিমানের ঘোরতর সঙ্ঘর্ষের কুরুক্ষেত্র সৃষ্ট হইল। কর্ত্তব্য স্বার্থশূন্য নহে ; সংস্কারকের আদর্শ-গঠন স্বার্থ শূন্য নহে। আদর্শ নারীর স্থান অধিকার করিবার অভিমানও স্বার্থলেশশূন্য নহে ; সুতরাং এই তিন স্বার্থের জন্য কুরুক্ষেত্রের জন্য হইতে কোন অংশে হীন, অথবা ক্ষীণ হইল না।

স্বার্থ সঙ্ঘর্ষের বহ্নি যখন ধূমায়িত হইতেছিল, এক পরিণয়প্রার্থী যুবক তখন নিজেই নিজের সন্ধান দিলেন। বালো এই যুবক মনোরমার ক্রীড়ার সঙ্গী ছিলেন, প্রীতি ও উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ট জন্মিয়াছিল। প্রীতি অনুরাগে পর্য্যবসিত হইবার পূর্ব্বেই কর্ম্মক্ষেত্রে উভয়কে বিভিন্ন স্থানে লইয়া গেল। প্রেম দর্শনাপেক্ষা অদর্শনে দৃঢ় হয় ;—এক্ষেত্রে বোধ হয় তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল ; কারণ বালিকা যখন উদ্ভিন্নযৌবনা তখন সে এক বিভিন্ন শ্রেণীর সুদর্শন যুবককে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল ; প্রতিদানও পাইয়াছিল। নিষ্ঠুর সমাজের নির্ম্মম নিয়ম এবং নিষ্করুণ বিধাতার নির্দ্দয় বিধান এই প্রেমের সুপরিণতি, অথবা কুপরিণতি, ঘটিবার পূর্ব্বে যুবককে, কর্ম্মব্যাপদেশে কোথায় লইয়া গেল তাহার সন্ধান মিলিল না। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গিয়াছে—কালস্রোতে, ঘটনা-স্রোতে মনোরমা কত যুবকের সহিত পরিচিত হইয়াছে ; কিন্তু যাহার প্রতীক্ষায় সে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত করিয়াছে ; যাহার জন্যে মনোরমার জননী কন্যার বিবাহোদ্যোগে উদ্যমশীল হইতে পারেন নাই—তাহার কোন সন্ধানই কেহ কখন দিতে পারে নাই ;—সে নিজেও দেয় নাই। তথাপি মনোরমার চিত্ত তাহার একনিষ্ঠ সাধক। এখন সে মূর্ত্তির প্রতিচ্ছবি স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তির ছায়ার ন্যায় অস্পষ্ট ; তথাপি সজীব। মাসী এ সন্ধান জানিতেন না সুতরাং বাল্য সঙ্গী যুবকের উপযাচকতায় প্রীত হইয়া তাহার হস্তে মনোরমাকে সমর্পণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

এই যুবকের নাম বিনোদ। বিনোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধীধারী এবং একটী ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ; অতএব উপযুক্ত পাত্র। মনোরমার সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার পর বিনোদ বাল্য সঙ্গিনীর প্রতি প্রীতি দেখাইতে কখন বিরত হয় নাই ; কিন্তু জীবন-স্রোত তাহাকে মনোরমার মন হইতে বহুদূরে লইয়া গিয়াছিল। কৃতী হইবার পূর্ব্বেই বিনোদ অভিভাবক হীন হইয়াছিল। জননীর মৃত্যুর পর সংসারেও তাহার দ্বিতীয় অবলম্বন ছিল না। ছাত্র-জীবন শেষ করিয়া কর্ম্ম জীবনে প্রবিষ্ট হইবার সময় তাহাকে দার পরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। তখন মনোরমাকে পাইবার চেষ্টা সে করিয়াছিল ; কিন্তু মনোরমার জননী সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। মনোরমা তখন বালিকা। বিনোদের জীবনে এখন বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। জীবন, সঙ্গিনী করিয়া যাহাকে লইয়া বিনোদ সংসার সাগরে ভেলা ভাসাইয়াছিল, অল্প দিন হইল তিনি ক্ষুদ্র জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিতে, বিনোদকে একটী পুত্র সন্তান উপহার দিয়া পরপারে চলিয়া গিয়াছেন। বিনোদ এই পুত্রের জন্য বৃত্তান্তটী

গোপন করিয়া মনোরমাকে অপ্রিয় এবং শেষের এক সুদীর্ঘ লিপি লিখিল।

গজানন মনোরমার শিক্ষক এবং বন্ধু, সুতরাং ঐ চিঠির বক্তব্য বিষয় গজাননের অজ্ঞাত রহিল না। ভাবের দাস গজানন এখন আর ভাববিহ্বল নহে; কঠিন নিরাশা তাহাকে কঠোর ও কঠিন করিয়াছে। বিপুল উদ্যমে অপরিমিত আকাঙ্ক্ষা লইয়া সে যে আদর্শ রমণী গড়িতেছিল—কোথা হইতে বিনোদ অকস্মাৎ আসিয়া তাহার সুদৃঢ়ব্যাপী পরিশ্রম পণ্ড করিয়া দিল; সুতরাং সমস্ত আক্রোশ সমস্ত অভিসম্পাৎ পড়িল বিনোদের উপর।

বিবাহের প্রস্তাব হইলে বিবাহ হয় না; তাহার পাত্রাপাত্র, কালাকাল, ফলাফল বিচার করিতে করিতে বহুদিন কাটিয়া যায়; কত অঘটন করিয়া সব বিলম্বান্ত করিয়া দেয়;—অন্ততঃ "চারি হাত এক হইতে" অনেক বিঘ্ন ঘটে। কিন্তু বিনোদ এমন সুযোগ্য সুপাত্র যথাসময়ে উপযাচক হইয়া মনোরমার পাণিপীড়ন করিতে চাহিয়া, বিলম্বের আর কোন সম্ভাবনাই রাখিতে দিল না। সুতরাং বিনোদ সর্ব্বাপেক্ষা দোষী। নির্ম্মম বিচারকের আসনে বসিয়া স্বার্থান্ধ একদেশদর্শী গজানন নির্ব্বিবাদে বিনোদের প্রতি অবিচার করিল। যেখানে স্বার্থ বিচারক এবং সেই স্বার্থের কণ্টক আসামী সেখানে সুবিচারের সম্ভাবনা কোথায়; আশাহত নিষ্করুণ গজানন নির্ম্মম যুক্তির অবতারণা করিয়া মনোরমাকে বুঝাইল, যে প্রণয়ী পুত্র-প্রসবিণী স্ত্রীর মৃত্যুর এক মাসের মধ্যেই এমন ছন্দোবদ্ধে দ্বিতীয় নারীকে প্রণয় বিজ্ঞাপন করিতে পারে তাহার হৃদয় কোথায়? হৃদয় কি এতই সঙ্কীর্ণ এবং স্মৃতি শোষক যে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মৃতের প্রতি প্রীতি বিলুপ্ত করিয়া দেয়? তাহা কখনই হইতে পারে না; সুতরাং বিনোদ হৃদয় হীন; তাহার এমন নির্লজ্জ প্রণয় সম্ভাষণ প্রণয়ের ব্যভিচার—প্রতারণা, শঠতা—এ দুইটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ!

আত্মহারা বালিকা অভিমানের অন্তরালে শ্রেয়ঃ অনুধাবন করিতে পারিল না; আকাশ কুসুমের কল্পনায়—চিরস্থায়ী কীর্ত্তি লাভ করিবার মোহ মদিরায় বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। সুচতুর গজানন বাক্যজাল বিস্তৃত করিয়া সেই বিভ্রম সন্দেহে পরিণত করিল। মনোরমা বুঝিল, বিনোদ ইতি-পূর্ব্বে যখন তাহার প্রগাঢ় প্রণয়ের কোন পরিচয় দেয় নাই, তখন অকস্মাৎ এই প্রণয়ের অভিব্যক্তি ছলনামাত্র। মৃতের প্রতি সম্যক শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শন জন্যও তাহার কিছু দিন অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য ছিল। যখন সে সহধর্ম্মিণী তাহার নাই তখন সে ভণ্ড;—মনুষ্যপদবাচ্য নহে।

মনোরমা তখন গজাননকে কাণ্ডারী হইয়া তাহাকে সেই আসন্ন বিপদ সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিতে অনুনয় করিল। গজানন অভিসন্ধি অনুযায়ী ফললাভ করিয়া পুলকিত হইল। মনোরমার মুখপত্র হইয়া সে মনোরমার অভিভাবিকাকে তর্ক-যুদ্ধে পরাস্ত করিবার বিপুল চেষ্টা করিল; ফলে তাহার বিবাহের বিরুদ্ধ যুক্তিতর্কবাদ এমন তীব্র এবং অসহিষ্ণু হইয়া গেল, যে মনোরমার মাসী গজাননের তর্কজুহেলিকার অভ্যন্তরে তাহার স্বল্প স্বার্থটুকু সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হইলেন। বিচারকের আসন হইতে যে যুক্তিতর্ক ছায়ার একটি বিভ্রান্ত-চিত্ত বালিকাকে গজানন মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, উকিলের আসন হইতে সেই যুক্তি তর্ক যথার্থ বিচারকের নিকট প্রয়োগ করিয়া সে পরাজিত—লাঞ্ছিত হইল! শ্রদ্ধা হারাইয়া অশ্রদ্ধা লাভ করিয়া বাদশবর্ষব্যাপী অকৃত্রিম নিঃস্বার্থ-পরার্থপরায়ণতাকে অযথা স্বার্থের মসী চিহ্নে কলঙ্কিত করিয়া গজানন গৃহে ফিরিল। মনোরমার সহিত গজাননের সেই সাক্ষাৎ শেষ সাক্ষাৎ!

মরণ-বঁধু

(শ্রীযোগীন্দ্র নাথ রায়)

কে আসিছ তরী বেয়ে ওই পার হ'তে,
কাল জলে রেখা টানি – সীমাহীন স্রোতে !
শ্রাবণ-গগণ ভরি
মেঘ কাঁপে থরথরি
বাদল পড়িছে ঝরি
অসীমের পথে—
কে তুমি আসিছ চলি অপরূপ রথে !

তোমারে তো দেখি নাই পরিচিত নহ,
কেন তবে মোর ঘাটে তরীখানি বহ !
কোনদিন কোন ক্ষণে
দেখা নাই তব সনে,
অপলক ও নয়নে
কেন চাহি রহ—
হে মোর অপরিচিত ! কহ মোরে কহ !

তীরের যতই কাছে আস তুমি ধেয়ে—
কি গান ধ্বনিয়া তোল ওগো মোর নেয়ে !
কিছু বুঝি বা, না বুঝি
তবে আমি আঁখি বুঁজি,
কেন এত সোজাসুজি
আস তরী বেয়ে—
ভাষাহীন ওই গানে ফেল মোরে ছেয়ে !

দাঁড়ালে নিকটে আসি ; কি মোহন বেশ !
যত দেখি তত ভুলি—কোথা নাহি শেষ !
কোমল বুকের পরে
অঙ্ক পড়িছে ঝরে,
বুঝেছি গো মোর তরে
এসেছ এ দেশ—
ওগো বঁধু তোমা সনে নাহি দুখ-লেশ।

অন্তরালে

(গল্প)

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র বি এ)

১

আষাঢ়ের বর্ষণ বাহিরে নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝর্ অবিরাম বারিপাত হইতেছে। লার্কুলার রোডের একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর দ্বিতলের লতাপাতা ঘেরা বারান্দার উপরে ইজি চেয়ারে পড়িয়া সুধীন বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। উৎসবের শত প্রফুল্লতা বাড়ীটির ভিতর হইতে যেন উছলিয়া বাহির হইতেছে। বিস্তৃত হলের মধ্যে সহস্র বিদ্যুতালোক জ্বলিতেছে। উজ্জ্বল আলোকে কক্ষের মহার্ঘ আসবাব পত্র উদ্ভাসিত। ব্যারিষ্টার সেন ধনী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ—তাহার পার্টি বরাবরই জমকালো। ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইত আজও অনুষ্ঠানের কোনও ত্রুটী নাই। রাশি রাশি ফুল, বিচিত্র পরিচ্ছদে কত কত রমণী, হাসি, গান সবই প্রচুর। সব ঠেলিয়া সুধীন বাহিরে বসিয়া শ্রান্তদৃষ্টিতে বৃষ্টিপাত দেখিতেছিল। রাস্তার গ্যাস

জলের ধারার মধ্যে মান হইয়া উঠিয়াছে। নিজেকে অলসভাবে এলাইয়া দিয়া বর্ষার এই একঘেয়ে ঢাপা কান্না করুণ রীতি সে বেশ উপভোগ করিতেছিল। অতীতের বিস্মৃত প্রাণ কতস্মৃতি আপনাআপনিই গুমরাইয়া উঠিতেছিল। জলের ভিতর হইতে কোনও তরুণীর কণ্ঠনিঃসৃত বিলাতী সুর ভাসিয়া আসিতেছে; আনমনে মাঝে মাঝে সুধীন তাহাই গুনিতেছে আর মনে মনে হাসিতেছে। সে মস্ত ধনীর ছেলে। কুড়ি বৎসর বয়সে বি, এস্ সি পাস করিয়া বিলাত যায়। সবগুলি ডাক্তারী পরীক্ষা কৃতিত্বের সহিত পাস করিয়া সাত বৎসর পরে সবে বছর খানেক হইল ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহারই মধ্যে তাহার পশারও হইয়াছে বেশ। বিলাতে থাকিতে সে বহু সংকারে বিলাতী সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিল, সেখানকার ভদ্র-সমাজে মিশিবার সুযোগও পাইয়াছিল যথেষ্ট। ভাবুক মন তাহার সকল বস্তুরই স্বরূপ দেখিতে চাহিত। সম্পূর্ণ পরিবর্তন বিমুখ সমাজের সহস্র বন্ধনে বদ্ধ বাঙ্গালী নারীর অস্ফুটন্ত মন তাহার চিত্ত তৃপ্ত করিতে পারে নাই। সে নিতান্ত পরতন্ত্র এই একটা জগতের প্রতি তাহার অসীম সহানুভূতি ছিল। সে আশা করিয়াছিল বিলাতে বাধা বন্ধনহীন সমাজের মধ্যে নারীর যে মন পাইবে তাহার গতি আছে, প্রাণ আছে। স্বাধীনতার আলোয়, উদারতার চওয়ায় সে যে বিকসিত পদ্ম চাহিয়াছিল তাহা সে পায় নাই। সেখানে গতি আছে, প্রাণ আছে, কিন্তু তাহাতে তাহার মন ভরে নাই। যতই মিশিত যতই তাহাদের আরও কাছে যাইত, ততই তাহার মনে হইত সে যাত্রা যেন লক্ষ্যহীন আদর্শহীন—মরীচিকার পশ্চাতে যেন শোভাযাত্রা। সে উদ্দাম চঞ্চলতার শান্তি আসে নাই, অতৃপ্তির যন্ত্রণা বাড়িয়া গিয়াছে মাত্র। বাড়ীতে পার্টীতে নানা স্থানে কত ভাবে সে সেই মেয়েদের অতি নিকটে গিয়াছে, কিন্তু সেই বেদনভরা হাসি চঞ্চলতার কতটা প্রত্যেকেই না ভিতরে আনিয়া ফেলিত। তখন তাহার মনে পড়িত সাগরপারে থাকিবার সেই শান্তপরিতৃপ্ত নারী জগৎ, অমনি আত্মপ্রসাদে মন ভরিয়া যাইত। ফিরিয়া আসিয়া সেই বিলাতী কাঁসানে তৈরী সমাজের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার সে কল্পনা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আলাপে হাসিতে, ভাবে সঙ্গীতে বিলাতী বলিবার জন্য ইহারা যেন বাজী রাখিয়া ছুটিয়াছে, সে গতি সে সঙ্গীততা নাই, অনুকরণের অস্বাভাবিকতার সৌন্দর্য্যটুকুও যেন আর চোখে পড়ে না। পিয়ানোর সুর, নারীর কণ্ঠ আর ধ্বনির মুখরতা এমনিই কত কি তাহার মনে জাগাইয়া তুলিতেছিল।

জুতার খুট্ খুট্ শব্দে চাহিয়া দেখিল মিস্ অমিয়া রায় তাহারই দিকে আসিতেছেন। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে ইহাকে বার তের বছরেরটি দেখিয়া গিয়াছিল। খোলা চুলে ফিতা বেঁধে মাতার হাত ধরিয়া কতবার তাহাদের বাড়ীতে আসিয়াছে। মেঝেতে পা ছড়াইয়া বসিয়া শীকারে বই হইতে বাঘ ভালুকের ছবি দেখিয়া "ওমা এটা কি, বাবাগো আলিপুরের বাঘটার চাইতেও কত বড়।" ইত্যাদি হর্ষমিশ্রিত শঙ্কাধ্বনি করিত আর হাসিত। এখন সেই অমিয়া বিংশতিবর্ষীয়া যুবতী, একহারা মাঝারি চেহারা, ছুটফুটে রং, ফিট্‌ফাট্ সাজ, হাসিখুসী ভাব। সুধীন লক্ষ করিয়াছে প্রায় সব পার্টীতেই অমিয়াকে দেখা যাইত। ইহার চমৎকার গলা, আলাপ সালাপ গল্পগুজব করিবারও বেশ একটা সহজ শক্তি আছে। সব জায়গাতেই সে যেন চোখে না পড়িয়া যায় না। সুধীনের মনে হইত যা কিছু লইয়া সকলের কাছে ইহার এত প্রতিষ্ঠা তাহার অনেক-খানি না থাকিলেই যেন হইত ভাল। অমিয়া নিকটে আসিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রথম প্রথম একটু কেমন কেমন লাগিত কিন্তু সে 'তুমি' সম্বোধনই বজায় রাখিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল "তুমিই গান কচ্ছিলে বুঝি?"

অমিয়া বলিল "তাই বুঝি পালিয়েছেন?"

"না না, আমি ত অনেকক্ষণ এখানে ব'সে আছি।

তোমার ও চেৎকার গলা। আমাদের অমলা ও তোমার একজন মস্ত ভক্ত।"

"তাই নাকি? তাই বোনের কাণ যে একরকম শোনে না এই যা রক্ষে। আচ্ছা বিলাতে এত ক'রে গান টান শিখে এখানে এসে সব ছেড়ে দিলেন যে?" সুধীন কতকটা বিব্রত ভাবে বলিল "কই, না না।"

"হাঁ ও মিসেস সেনও বলছিলেন আপনাকে জোর ক'রেও হারমনিয়াম্ পিয়ানোর কাছে নেওয়া যায় না।"

"না, না। সেকিশী তবে কি জান এই বিলিতি musicটা আমার ঠিক মনে ধরে না, আর ঠিক ওত্ রাখ্ না।"

"তা হলে আমাদের ত—"

"তোমার বেশ হয়। সেদিন আমলাকে শেখাতে যে গানটা গেয়েছিলে সেটা দিব্যি লাগ্ছিল। অমলা আমাকে নেড়ে চেড়ে হাল ছেড়ে দিয়ে এখন তোমাকে পাক্ড়েছে বুঝি!"

"না আমি তাকে কি শেখাবো? তবে খাতির টাতির পাওয়া যাচ্ছে খুব এই যা লাভ। আপনি ত দিশী গানও করেন না?"

"সেকি! এই সেদিন শিবপুরের বাগানে কত গান করলুম। সবাইকে বিরক্ত ক'রে তবে ছাড়ি।"

"সৌভাগ্য আমার, আমি ছিলুম না। ভেতরে মিঃ চাটার্জ্জি ক্রীষ্যাণ্ড ম্যাজিক দেখাচ্ছেন। অলের চাইতে সেটা দেখ্বার নিতান্ত মন্দ জিনিষ না।"

হলে প্রবেশ করিয়া উভয়ে পাশাপাশি দুটো কৌচে বসিল। অন্য ব্যারিষ্টার মিঃ চাটার্জ্জি একটা তীব্র আলোকের সম্মুখে নানা ভাবে হাত ঘুরাইয়া তাহার বিলাতে শেখা ম্যাজিকের কিছু পরিচয় দিতেছেন। দেখুন না দেখুন, সকলেই করতালি দিতেছেন। উৎসাহটা বেশী আসিতেছে তাহার ভবিষ্যৎ পত্নী মিস্ গাঙ্গুলীর তরফ থেকে।

পাঁচ সাত দিন পরে একদিন বিকালে সুধীন পিক্চার হাউসের সম্মুখে তাহার কার হইতে অবতরণ করিল। ভিতরে যাইয়া একটা বক্স্ রিজার্ভ করিয়া গেটের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। বায়স্কোপ আরম্ভ হইবার বেশী বিলম্ব নাই। লোকের ভিড়ে চারিদিক পরিপূর্ণ সাহেব মেম, পার্শি বাঙ্গালী, গাড়ী মোটরে স্থানটি সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই চঞ্চল, আশু আনন্দ উপভোগের আশায় উৎফুল্ল। পর পর, দুই তিনখানা কার আসিয়া দাঁড়াইল। সুধীন দেখিল মিসেস্ ও মিস্ সেন, মিসেস্ ও মিস্ মুখার্জ্জি, ঘোষ, কারফরমা ইত্যাদি সকলে বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড হইতে যেন একজোটেই এই সমারোহ যাত্রা করিয়াছেন। এই সব বর্ষীয়সীদের সঙ্গে এই সব তরুণীদের দেখিলেই সে কেমন দমিয়া যাইত। প্রথম প্রথম সে নিশ্চিন্ত খোলা মনে এদের সঙ্গে বেশ মিশিতে পারিত, আলাপ সালাপে বেশ একটা সহজ ভাব অনুভব করিত। ক্রমে ক্রমে তাহার সে ভাবের উপর একটা সঙ্কোচের আবরণ গাঢ় হইয়া উঠিতেছে। তাঁর বিধবা মায়ের সঙ্গে রাজ্যের যে এত লোকের আলাপ আছে, তাঁর নিঃসঙ্গ জীবন তাহার দীর্ঘ প্রবাসে যখন দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল তখন এঁদের সাহচর্য্যে সে তার যে অনেকটা প্রশমিত হইয়াছিল ইহা ভাবিয়াও সে অনেকটা স্বস্তি বোধ করিত। ক্রমে বুঝিয়াছে ইহাদের অনেকেরই তাহার মাতার পরিচয় হালে এবং যাহাদের বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে ঘনিষ্ঠতা তাহাদের অন্তরেই বেশী, সৌহার্দ্য স্থাপনে তাহারাই ক্রমশঃ অধিক। সে দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল দুদিনের আলাপে সে নিজেও তাহাদের অত স্নেহভাজন হইয়া পড়িল কি করিয়া। ইহাদের আলাপ হয় একটিমাত্র, কন্যার গুণকীর্ত্তন। নিজের কন্যার মত মেয়ে যে সচরাচর দেখা যায় না সে ত সকলেই স্বীকার করেন। লেখাপড়া প্রভৃতিতে

সে যে কত অগ্রসর তাহা সুধীনের অপেক্ষা আর বেশী কে জানিবে ? "তার সঙ্গে বুঝি তোমার আলাপ নেই ? ওমা তাইত ! থাকবেই বা কেমন ক'রে ? তুমি যখন বিলাতে যাও তখন সেও ছোট্টটি। আচ্ছা কাল আমি তাকে নিয়ে আসব।" এমনি ভাবে কত দুর্লভ মেয়ের সঙ্গে তাহার পরিচয় হইয়াছে। তাকে পাকড়াইতে কাহার মেয়ে কত বাহাদুরী তাহা লইয়া এই সব বর্ষীয়সীদের মধ্যে যেন রীতিমত রেষারেষি ; কন্যাগণও দক্ষতার সহিত কত অভিনয় করিয়া যাইত। ক্ষুব্ধ চিত্তে সে ভাবিত এইখানে ইংরাজ বিলেতের উপর টেক্কা দিয়াছে। মিসেস্ সরকার সুধীনকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ভাঙিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন "বাঃ তুমিও যে এসেছ দেখ্‌ছি।" মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন "হাঁরে চারু, সুধীনও যে বায়স্কোপ দেখ্‌তে এসেছেন।" চারু চট্ করিয়া হাতের রুমালখানা দিয়া মুখখানি মুছিয়া হাসি মুখে বলিল "আপনি ত খুব surprise করেছেন।" ততক্ষণে মিসেস্ সেন কন্যা লতিকাকে নিয়ে এসে পৌঁছেছেন "বাঃ রে, সেদিন তুমি না ব'লে ক'য়ে কখন চলে এলে, লতি তোমায় খুঁজে খুঁজে হয়রাণ।" নাকের ডগা দুলিয়ে 'লতি' বলিলেন "ওঁর কত কাজ, যাকে তাকে সময় নষ্ট করতে পারেন না।" সুধীন উভয়কে নমস্কার করিয়া হাসিয়া বলিল "সত্যিই আমার জরুরী কাজ ছিল। আপনারা ব্যস্ত ছিলেন ব'লে বিদেয় নেবার অবসর পাই নি। আমি সে জন্য ভারী দুঃখিত হয়েছি ?" মিসেস্ সরকার বলিলেন "নানা সেকি। চল ভেতরে যাওয়া যাক।" সুধীনের বায়স্কোপ দেখ্‌বার ইচ্ছা অনেক পূর্ব্বে পালিয়েছিল। ইহাদের মধ্যে বসিয়া একটা ঝলমলে অভিনয় করিবার আশঙ্কায় সে শঙ্কিত হইয়া পড়িতেছিল। "আমি বড়ই দুঃখিত যে এমন ফিলমটা আপনাদের সঙ্গে দেখ্‌তে পেলুম না। আমাকে এখুনি ড্র্যাক্টরসের বাড়ী একবার যেতে হবে।" বলিয়া সকলকে হতাশ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

এইবার অমিয়ার কার আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখনও অমিয়া অবতরণ করে নাই। সুধীন পুরাতন অভ্যাস মত ছাট্ উঁচু করিয়া পাশ কাটাইতেছিল। অমিয়া নমস্কার করিয়া বলিল "বায়স্কোপ দেখ্‌তে এসেছেন" "না চৌরঙ্গীতে ড্র্যাক্টরসের ওখানে একটু কাজ আছে।" অমিয়া বলিল "হাতে ওটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন বুঝি ?" সুধীন হাতের দিকে চাহিয়া দেখিল টিকিটখানা দেখা যাইতেছে। এই অকারণ নানা মিথ্যা কৈফিয়তের আশ্রয় লইয়া সে বড় অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। ধরা পড়িয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, হাসিয়া বলিল "না না, আমি আর জানি না। একটু ঘুরে আসি। সোফারকে ঘরে যাইতে আদেশ দিয়া, সোজা ইডেন গার্ডেনে গেল। সেখানে ইংরাজী কন্‌সার্টের সঙ্গে যুদ্ধ দিয়ে দিতে খুব খানিক হাঁটিয়া গৃহে ফিরিল।

৩

খাস বেয়ারা বাক্স বিছানা গুছাইতেছে, সুধীন একখানা কেদারায় বসিয়া আবশ্যক মত উপদেশ দিতেছে এমন সময়ে তাহার মাতা কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "হাঁরে তুই সত্যি সত্যি আজ যাবি নাকি ?

হাসিয়া সুধীন বলিল "খ্যালানে খ্যালানে যাবার বয়স কি আর আছে ?"

না, তুমি বুড়ো হয়েছ। কোথায় যাবি ?

পশ্চিমে।

পশ্চিমে কোথায় ?

তার ঠিক নেই। যখন যেখানে যাবো তখন জানাবো।

কতদিনে ফিরবি ?

তারও ঠিক নেই !

কর্ত্তা পত্তরের কি ক'রে গেলি ?

সে সব ব্যবস্থা ঠিক করেছি।

আমার কি ব্যবস্থা করলি ?

সুধীন বুঝিল জননীর কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছে, সেই পুরাতন

অনুযোগ এখনই উঠিবে। কিনাইবার জন্য বলিল, "তুমি কি রুগী? তা'হলে ত গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করতে হয়।"

"তুই ত তা'হলে বেঁচে যাস্। না, সুধি, এই মস্ত পুরীতে একলা একলা আমার দিন কি ক'রে কাটে একবার ভেবে দেখ্।"

আচ্ছা মা আমি বিলেত থাকতে কি ক'রে ছিলে? ওসব তোমাদের একটা বাজে কথা।

তুই কৃতী হয়ে ফিরে আস্‌বি, বে'থা করবি, এই আশা নিয়ে ছিলুম।

কতবার বল্‌ছি চল না আমার সঙ্গে। তাত তুমি যাবে না।

আমার কি তোর সঙ্গে যখন ইচ্ছে ঘুরে বেড়ান চলে? তারপর আমার স্কুল আছে। তুই ঘুরে আয়, আমি বিয়ের ঠিক করি, তোর দিকে চেয়ে বসে থাক্‌লে যা হবে তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। কালও নতির মা কত বল্‌ছিলেন।

ও সব মেকী মেমসাহেব কি আমার মত লোকের পোষায়! ও সর্ব্বনাশ!

মা হাসিয়া বলিলেন তাহলে খাটি মেমসাহেব একটা বিলেত থেকে নিয়ে এলিই ত পারতি?

তা হলেই তুমি ঠিক্ জব্দ হতে। এলেই বুড়ীর কাশীবাসের ব্যবস্থা ক'রে দিত।

অমলা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া মার কোলে ঝাপাইয়া পড়িয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে সংবাদ দিল "শুনেছ মা, অমিয়াদি ব্যারিষ্টার মুখার্জীকে রিফিউজ করেছে?" সুধীন বিস্মিত নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল "রিফিউজ করেছে! এরই মধ্যে বুলী আওড়াতে আরম্ভ করেছ পাকা মেয়ে কোথাকার।"

এমন একটা খোস খবর দিয়াও দাদার নিকট হইতে উৎসাহের পরিবর্ত্তে ধমক খাইয়া অমলা অনেকটা দমিয়া গেল। তবু সাহস সঞ্চয় ক'রে বলিল "সত্য দাদা। তাঁর মা কত দুঃখ কচ্ছিলেন, অমন বর" "হয়েছে, হয়েছে, সাকাবাগীশ!"

অমলা যেমন ছুটিয়া প্রবেশ করিয়াছিল তেমনি ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। মাতার দিকে চাহিয়া বলিল "শুন্‌লে ত মা, এই সব মেম সাহেবদের হাত থেকে আমায় বাচাও।"

ধীরে ধীরে মা বলিলেন "দেখ্ সুধীন তোর এই খুঁত্‌খুঁতে ভাব, আমি অনেকদিন থেকে লক্ষ্য করছি। সব কিছুর ভেতর থেকে খুঁজে খুঁজে দোষ বের করা তোর একটা স্বভাব হয়ে যাচ্ছে, তা তুই বুঝ্‌তে পারছিস্ নে। তোর বাবা হিন্দুসমাজের সভ্যতার ভেতর সঙ্কীর্ণতা দেখ্‌তে পেতেন। তুই এই সমাজের সভ্যতার ভেতর উচ্ছৃঙ্খলতা খুঁজে বের করিস্। ভুলে যাস যে নিরুক ভাল মন্দ থাকতে পারে না। এই ভাল মন্দ মেশাটা খেয়াল ক'রে তুলিস্‌নে বাবা" এই বলিয়া তিনি যেন কতকটা ক্ষুব্ধ চিত্তে বাহির হইয়া গেলেন। সুধীনও বুঝিতেছিল কথাটা যেন কেমন ভাবে লাগ হইল। যাইবে কি থাকিবে একবার ভাবিল। পরক্ষণে জোর করিয়াই যেন মনের এই দোলায়মান ভাবটাকে অপসারিত করিয়া জিনিষ পত্তর গুছাইতে জোর হুকুম করিয়া অপ্রয়োজনেও রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

॥

শেষ ভাদ্রের বেলাবেলী আকাশ অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে। মেঘের উপরে মেঘ এলাইয়া সূর্য্যের বিশ্ব প্রবেশের পথ একেবারে রুদ্ধ—গাঢ় কালো মেঘ, কোথাও এতটুকু ফাক নাই। এখনও বৃষ্টি পড়ে নাই, কিন্তু চারিদিকে মৌনতা শুরু হইয়া কেমন যেন একটা বিষাদমাখা ভাব ছড়াইয়া দিয়াছে। সুধীন নিজের কক্ষে পোষাক পরিধান করিতেছে, আর জানালা দিয়া মাঝে মাঝে আকাশের পানে চাহিয়া অনমনাভাবে শিষ দিতেছিল। গাড়ী বারান্দার দিকে চাহিয়া দেখিল তার কার দাড়াইয়া আছে—সোফেয়ার ম্যাকিন্টসে দেহ আবৃত করিয়া বিড়ি টানিতেছে আর ঝিমাইতেছে। পার্শ্বে বাহা বসিয়া ঘন ঘন উপরের

দিকে চাহিতেছে—কখন সাহেব আসেন। মধ্যস্থলে স্যুটকেশটি কাত হইয়া পড়িয়া সোফেয়রের সহিত তাহার পার্থক্যটা যেন কোনও রকমে বজায় রাখিয়াছে। জননীর নিকট বিদায় লইয়া, অন্যান্য কামরাগুলি মোটর্‌কে টুকিয়া সুধীন গাড়িতে উঠিল।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে সুধীন এক কোনে বসিয়া অন্যকোনে পা ছড়াইয়া দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার মন ঘুরিয়া ফিরিয়া চিন্তার সেই পুরাতন বিষয়টি চাপিয়া ধরিয়াছিল এই যে একটা বিরাট সমাজের ভিতর সে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে ইহার যেন পরিপূর্ণতা নাই ইহার সহিত যতই তাহার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতেছে ততই কাহারও ব্যবহার বাহিরে, কাহারও বেশীর ধরণ, কাহারও হাসির কুঞ্চন তাহার মনে এমন একটা গভীর রেখাপাত করিয়া দিতেছে যাহা সে শত চেষ্টাতেও মুছিতে পারিতেছে না। কতদিন কত ভাবে সে নারীর সজীবতার মধ্যে তাহার প্রাণের সন্ধান, সত্য পরিচয়ে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ফিরিতেছে, [redacted] স্থানে কত নব নব অবস্থার মধ্যে তাহা পাইবার আশায় উল্লাসিত হইয়া উঠিয়া পরে হতাশায় ব্যথিত হইয়াছে। কতদিন কত বন্ধু বলিয়াছে মিস্ দত্ত, কি মিস্ ঘোষ কি মিসেস্ সরকার এমন মানুষ, এমন শিক্ষা এমন হৃদয় খাঁটী মানুষ, পুরুষ নয়। কত আশা লইয়া গিয়াছে, কিন্তু সরলতা, আন্তরিকতার ভিতরও সে অভিনয় খুঁজিয়া-বাহির করিয়াছে। কাহারও হাসিতে অভিনয়, কাহারও অশ্রুতে বঞ্চনা কাহারও স্নেহ অসম্পূর্ণ। ধৈর্য্য যেন কিছুতেই ঘুচিত না। চারিদিকের এই বিরাট শূন্যতার মধ্যে প্রাণ যেন তাহার হাহাকার করিয়া উঠিত। যে উচ্চ আদর্শ, মহান্ ভাব লইয়া সে নারীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল, তাহার বিন্দুমাত্রও নষ্ট করিতে তাহার জীবনের অনেকখানি মাধুর্য্য তাহারই সঙ্গে বলি দিতে হয়। তাই বিশ্বাস করিত, যতই চলতি হউক না কেন সে পরিচয় মিলিবে, দুনিয়াটা ফাঁকির উপরে ত চলে না! হঠাৎ গাড়ী থামিল হইল, গাড়ী দাঁড়াইয়া। সম্মুখে একদল ঘাঘরাপরা মেয়েরা অবোধ্য ভাষায় কি একটা গান গাইতে গাইতে উৎসবে চলিতেছে।

ষ্টেশনে যখন পৌঁছিয়াছে তখন বৃষ্টি নামিয়াছে। ট্রেন ছাড়িবার বিলম্ব নাই, [redacted] ভিড়, খোলা প্ল্যাটফরমের উপর দিয়া ছত্র করিয়া বাতাস বহিয়া যাইতেছে। কেরীওয়ালারা ছুটাছুটি করিয়া হাঁকিতেছে বরফ, লিমনেড, সরবৎ। প্রথম শ্রেণীর একটি কক্ষের মধ্যে জিনিষ পত্র রাখিয়া দরজা ধরিয়া বেচারা সুধীনের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। কোনও পরিচিতের সহিত সুধীন আলাপে মগ্ন, গাড়ী ছাড়িবার খেয়ালই নাই। ঘণ্টার শব্দে চমকিত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, দরজা আটিয়া দিয়া অন্য স্থানে গেল। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই কিন্তু কক্ষমধ্যে আবছায়া আবছায়া অন্ধকার। এক কক্ষে একটি মেম সাহেব পা ছড়াইয়া অর্দ্ধশায়িত। ছড়ি টুপী যথাস্থানে রাখিতে রাখিতে সুধীন্ লক্ষ্য করিল শ্বেতাঙ্গিনী তাহার দিকে কটাক্ষদৃষ্টিতে চাহিতেছেন, মুখে বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট। সুধীনের মন চট্ করিয়া সাত হাজার মাইল ছুটিয়া বিলেতটা ঘুরিয়া আসিল। সে মনে মনে একটু হাসিয়া অপর বার্থের এক কোণে গুটি সুটি হইয়া বসিল। একটি বাঙ্গালী মেয়ে বলিয়াই মনে হয়। মুখখানি ভাল করিয়া দেখা যাইতেছে না। সুধীন মেম সাহেবকে কালা আদমীর সংস্পর্শ হইতে রেহাই দিয়ে এই বার্থের অন্য কোণেই বসিল। একটা চাপা ত্রস্ত স্বর তাহার কাণে আসিল "আহাহা, ছবিটার ওপর বস্‌লেন। ওটা বোধ হয় ভেঙ্গে গেল।" সুধীন যেন একটা বড় রকম আঘাতে চমকাইয়া উঠিল। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া একটু বিরক্তিপূর্ণস্বরে "দেখ্‌তে পাই নি, বড়ই দুঃখিত হলুম" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আকিয়া বাঁকিয়া মন্থর গতিতে ট্রেন তখন ষ্টেশন ছাড়িতেছে। মাঝে মাঝে বিকট শব্দ

করিয়া [illegible] দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। সুধীন দেখিল কাগজে মোড়া ফিতের বাঁধা একটা ছবির মতই কিসের উপরেই সে বসিয়া পড়িয়াছিল। সেইটির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সে মনে করিতেছিল —ছবিটা তুলিয়া লইয়া রমণী তখনই তাহাকে বসিতে অনুরোধ [illegible] করেন। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল, আশানুরূপ অনুরোধ যখন আসিল না তখন তাহার সমস্ত মন বিষাদ বিরক্তিতে ভরিয়া গিয়াছে। ইহার ত্রুটিটুকু যেন চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবার জন্যই সে সুটকেস্‌টি দুম্ করিয়া মেঝের উপর ফেলিয়া তাহারই উপর বসিয়া পড়িয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। ট্রেণ তখন হু হু করিয়া ছুটিতেছে। উত্তেজিত মস্তিষ্কে সুধীন ভাবিতেছে এই মরীচিকার পিছনে তাহারও এই এমনি উদ্দাম ছুট কবে সমাপ্ত হইবে। কবে, একদিন সে মানিয়া লইতে পারিবে মানুষের প্রধান ও প্রথম সঙ্গীর নিকট যাহা কিছু চাওয়া যায় তাহার সব মেলে না—যতটুকু পাওয়া যায় তাহারই ভিতর হইতে তৃপ্তি কুড়াইয়া লইতে হয়। বিশ্বের এই যে সর্ব্বপ্রধান আদান প্রদান ইহার মধ্যে বড় রকমের কার্পণ্য থাকিবেই। তাহা মানিয়া লইলেই শান্তি —কেননা তাহার যাচাই করিতে যাওয়া, আর জীবনে হাহাকার টানিয়া আনা একই কথা। সহসা উচ্ছলিত হাসির শব্দে চাহিয়া দেখিল অমিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া লুটিয়ুটি হইতেছে। ঘরের আবছায়া অন্ধকার চোখে তখন সহিয়া গিয়াছে। অমিয়ার পরিধানে রঙিন চাকাই শাড়ীর উপরে হাতকাটা জ্যাকেট, পায়ে রেশমী মোজার উপরে উঁচুহিলের বুটজুতো। "My god, তুমি? তা বল্‌তে হয়।" সুধীন একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল। সে ইচ্ছা করিয়াই খুটিনাটি ফ্যাসান্ এটিকেট জানিত না, বাঁধাধরা আড়ষ্ট ভাব ঠেলিয়া স্বাভাবিক সহজ ভাবে চলিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের এই বসাবসির ব্যাপারটা তাহার কাছেও অতি রূঢ় বলিয়া প্রতীয়মান হইল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। অমিয়া তখন হাসিতে হাসিতে বলিতেছে "ডাক্তার সাহেব, চোখের চিকিৎসা করুন, চোখের চিকিৎসা করুন।"

"আঁধারে দেখ্‌তে না পাওয়াটা বুঝি চোখের দোষ?" "এখন দেখে শুনে বলুন" বলিয়া অমিয়া ছবিখানি তুলিয়া লইল। সুটকেস্‌টি পূর্ব্বস্থানে রাখিতে রাখিতে সুধীন বলিল "দেখ্‌তে আর দিলে কই?"

"আপনি বুঝি সিদ্ধান্ত ক'রে নিলেন বল্‌তে না দেওয়াটাই হচ্ছে আমার মতলব। যে ভাবে ছবিটার উপর ঝুঁকেছিলেন"—বলিয়া সেখানি নাড়িয়া চাড়িয়া বলিল "না, ভাই নাই।"

"বাঁচা গেল। আমাকে যেমন অপরাধী ক'রে তুলেছিলেন। ছবিখানা দেখ্‌তে পারি বোধ হয়।" অমিয়া বসিতে বসিতে কি যেন ভাবিয়া লইল। সুধীনের হাত ছবি গ্রহণের নিমিত্ত তখনও প্রসারিত। ঈষৎ লজ্জাবনতমুখে "তা পাবেন বই কি" বলিয়া তাহার হাতে ছবিখানা [illegible] দিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। উদ্দাম প্রকৃতি বাহিরে তখন মাতামাতি করিতেছে। বাতাস আর জল, শুধু বাতাস আর জল।

"বা চমৎকার। এ যে তোমারই ছবি।" অমিয়া কথা বলিল না। ছবিখানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সুধীন খপ্ করিয়া বলিয়া ফেলিল "আচ্ছা এত যত্ন ক'রে নিজের ছবি বাঁধিয়েছ কেন?" ঘরে অনেকখানি ঝাঁঝ ঢালিয়া অমিয়া উত্তর করিল "ঐ যাঃ চমৎকারটুকু শুন্‌ব ব'লে।" সুধীন অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া ব্যস্তভাবে বলিল—"না না—কেন বাধাবে না! বল্‌ছিলুম কি—"অমিয়া অসহিষ্ণু ভাবে একটু জোরের সঙ্গেই বলিল "তবে? আপনার নিজের বস্‌বার ঘরে নানা ভাবের আপনার তিন-খানা ছবি আছে।" নারীজাতি সম্বন্ধে দীর্ঘ ভ্রান্ত অভিজ্ঞতা যখনই অমিয়ার সংস্পর্শে আসিত তখনই

যা যাইত। কিন্তু তাহাতে ক্ষুব্ধ না হইয়া বরং সে যেন একটা তৃপ্তি অনুভব করিত। ছবিটির উপর উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি বুলাইতে বুলাইতে ভাবিতেছিল কি ইহার বিশেষত্ব! তাহার এতদিনকার অভিজ্ঞতার ধারার সঙ্গে কোথায় ইহার বিরোধ বাধে! ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় যাচ্ছ?" অমিয়া নিতান্ত সহজ স্বরে উত্তর করিল "মধুপুরে। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" "এলাহাবাদ।" "হঠাৎ এলাহাবাদ। সেদিনও ত কিছু শুনলুম না?" "বেড়াতে যাবার আবার সময় অসময় কি? সেদিন যাবার কথা ত নিজেই জানতুম না।"

"তাক্তারীতে এরই নাম্বে বৈরাগ্য এল নাকি?"

সুধীন অমিয়ার কথা বলিবার ধরণে আধার গোলে পড়িতেছিল। সে বরাবরই লক্ষ্য করিয়াছে বাইরের এই নকল মেমসাহেবটি নিরিবিলিতে কখন কখন অন্তরের নিতান্ত সহজ, শান্ত, অথচ দীপ্ত মানুষটিকে বাহির করিয়া দিত। সুধীন ঘা করিয়া বলিয়া বসিল "কেন তোমার মত আমার ত এখনও সংসারে বৈরাগ্য আসে নি।" কতকটা রহস্যের সুরেই যেন জিজ্ঞাসা করিল "আমার বৈরাগ্যের পরিচয়টা পেলেন কোথায়?"

অযথার দেওয়া সংবাদটির কথা পুনঃ পুনঃ সুধীনের মনে জাগিতেছিল। তাই সহসা কথাটা বলিয়া ফেলিয়া একটু সঙ্কোচে মরিয়া যাইতেছিল। নিতান্ত অনাবশ্যক অর্থহীন এটিকেটির গণ্ডী পার হইতে সে জোর করিত, কিন্তু তাহারও অসংযত রসনা হইতে অসতর্ক অবসরেও যে এমন কথা বাহির হইয়া পড়িল ইহাতে সে নিজের মনকে কথাঘাত করিতেছিল আর ভাবিতেছিল অমিয়া তাহাকে কি বলিয়াই না মনে করিল। অন্যের সত্য পরিচয় লইবার জন্য নিজেরও সরল পরিচয় দিতে সে উৎসুক; কিন্তু সরলতার নামে এমনি একটা কদর্য্য পরিচয় বাহির হইয়া আসে তখন মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও কেন যে তাহা তাহার মনের চোখে ধরা পড়ে না—এ রহস্য সে আর কিছুতেই বুঝিতে পারে না। ঘুরিয়া ফিরিয়া বোধ হয় তাহার মনে পড়িতেছিল ইহার পূর্ব্বে কতবার এমনিই কত কি সে এই অমিয়াকেই বলিয়া ফেলিয়াছে আর সে তাহা খেয়ালও করে নাই। কথার ধারাটা কেমন ভাবে ঘুরাইবে স্থির করিতে পারিতেছিল না। এমন সময়ে অমিয়ার প্রশ্ন আসিল "কোন্ ষ্টেশন এটা?" সুধীন নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। মনে পড়িল এমনি অবসর আরও কতবার সে ইহারই কাছে পাইয়াছে। চাহিয়া দেখিল সে মুখ তেমনি স্নিগ্ধ, প্রসন্ন হাস্যময়। বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল একটা ষ্টেশনে ধীরে ধীরে গাড়ী প্রবেশ করিতেছে। লজ্জা সঙ্কোচের হাত হইতে সদ্যলব্ধ পরিত্রাণের পরিতৃপ্তিটুকু বাহিরের দিকে চাহিয়া উপভোগ করিতেছিল। বৃষ্টি বেশ জোরে পড়িতেছে। ষ্টেশনে বহু যাত্রী; কেহ ভিজিতেছে, কেহ কোনও রকমে ধন বাঁচাইয়া গাড়ী খুঁজিতে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের সহযাত্রী সেই ইংরাজ রমণী ব্যস্ততার সহিত জিনিষপত্র গুছাইয়া কুলীর হস্তে দিতেছেন। তাহারই ক্ষিপ্র হস্তের ধাক্কায় সেল্‌ফের উপর হইতে অমিয়ার ছবিখানি পড়িয়া যাইতে যাইতে সুধীন ধরিয়া ফেলিল। হাসিয়া অমিয়া বলিল "ছবিটা আর শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছুবে না দেখ্‌ছি।" সুধীন অনাবরণ মুখ ছবিখানার প্রতি প্রীতি প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল, চোখ না তুলিয়াই বলিল "কেন? আচ্ছা আমি এখানার ভার নিচ্ছি, দেখা যাক পৌঁছায় কি না।" অমিয়া তাহারই আনত চক্ষুর দিকে চাহিয়াছিল, দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল কুলীর সাহেব ভিজিতে ভিজিতে সরিয়া গেল। সুধীন উপরের পার্শ্বে সাবধানে ছবিটা রাখিয়া সযত্নে ব্যাকিংটস্ চাপা দিল।

গাড়ী আবার ছুটিতেছে। অমিয়া চুপ চাপ বসিয়া! এই একটু আগেও উভয়ে কত কথা বলিয়াছে, কিন্তু উভয়েই যেন বুঝিয়াছে কি যেন

একটা কথা দুজনের কাছেই অস্পষ্ট রহিয়া গেল। আঁধার কক্ষের নিস্তব্ধতা উভয়ের নীরবতায় যেন আরও গুরু হইয়া উঠিয়াছে। সুধীনের কেবলই কৌতূহল হইতেছিল কেন অমিয়া এখন মধুপুরে যাইতেছে। ছোটবেলা হইতেই ত দেখিতেছে কিন্তু কলিকাতা ছাড়িয়া কখনও সে একলা কোথাও গিয়াছে বলিয়া ত তাহার মনে পড়ে না। হয় ত বা প্রত্যাখ্যান করিবার উত্তেজনা শান্ত করিতে সে একটু নিরিবিলি খুঁজিতেছে—এমনই একটা কৌতূহল অস্পষ্টভাবে তাহার মনের চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কিন্তু অমিয়ার কথার ভিতর হইতে একটুও আলো সে পায় নাই। চিন্তাধারাটা জোর করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া সে আবার নানা কথা তুলিল। অমিয়া 'হাঁ না' বলিয়া জবাব দিল—কথা বলিবার উদ্যম যেন তাহার আর নাই। বাহিরে উদ্দাম প্রকৃতির উন্মত্ত লীলা। খোলা জানালা দিয়া ছড়্ ছড়্ করিয়া জলের ছিট্ আসিয়া গায়ে লাগিতেছে। উঠি উঠি করিয়াও সুধীনের জানালাটা বন্ধ করা হইতেছে না। কেমন যেন একটা অজানা ভাবে মন অবসন্ন। একটা শব্দে চাহিয়া দেখিল পাশের জানালাটা তুলিবার জন্য অমিয়া টানাটানি করিতেছে, শক্তিতে কুলাইতেছে না। একটা হাল্কা রহস্য করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "বুটুদুতো পরলেই ত আর গায়ের জোর বেশী হয় না,—আমি তুলে দিচ্ছি," সঙ্গে সঙ্গে কথাটার কাঁক্ তাহার কাণে বাজিল। অমিয়া উত্তর করিল না, মৃদু হাসিল। সুধীন্ চিনিল ইহা রুক্ষতা মার্জ্জনার সেই পরিচিত হাসি। পাশাপাশি দুজনে বসিয়া এত কাছে তবু নির্ব্বাক। কক্ষের অন্ধকার দুজনের মাঝের অন্তরালটুকু সরাইয়া লইয়া উভয়কে যেন আরও কাছাকাছি টানিয়া আনিয়াছে। নিশ্বাসের শব্দ, চুড়ীর ঠুন্‌ঠান্ শুধু বলিতেছে আড়াল আড়াল। এই অন্ধকার যে আর সহে না! "আলোটা জেলে দি" "তা দিন" বলিয়া অমিয়া শালটা খুলিয়া গায়ে দিল। সুইচ টিপিতেই বিদ্যুতের তীব্র আলোকে কক্ষ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেই আলোকে সুধীন দেখিল অমিয়ার মুখখানি যেন চিন্তাক্লিষ্ট। সুধীনের দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলাইয়া হাসিতে হাসিতে অমিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আমাদের জুতো পরাটা অন্যায়, এ গবেষণা কি এ দেশে ফিরে এসে হ'ল?" সুধীন্ লক্ষ্য করিল এ কথাতে শব্দ আছে সুর নাই, হাসি যেন কাগজের ফুলের হাসি—প্রাণ নাই। কিন্তু তবু একটা প্রসঙ্গ পাইয়া সে একটা স্বস্তি অনুভব করিল। এত কাছে, বলিবার কত আছে তবু কথা নাই—কিছুতেই সে ইহা সহ্য করিতে পারিতেছিল না। উৎসাহের সহিত প্রতিবাদ করিল "আমি ত তা বলি নি। আমি বলিতেছিলুম কি বুটটা কেন—" অমিয়া তেমনি হাসির সহিত বলিল "মাইক্রোস্কোপ্ দিয়ে সূক্ষ্ম বস্তু দেখ্‌তে দেখ্‌তে এখন এই হয়েছে যে শুধু চোখে স্থূল বস্তু ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। আমি ত আগেই বলেছি চোখের চিকিৎসা করুন।" সুধীন অকারণ খানিক হাসিল যেন বড় রকম একটা রহস্য সে উপভোগ করিল। কিন্তু বুঝিল ইহার ভিতর কোথায় যেন লুকান সত্য রহিয়াছে—খুঁজিলে চোখে পড়ে না কিন্তু প্রাণ যেন তাহা অনুভব করিতেছে সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাতার সেই কথা মনে পড়িল—ভাল মন্দ দেখাটা খেয়াল ক'রে তুলিস নে বাবা।—তবে কি সে নিজেই দৃষ্টিহীন!

দম্ দম্ করিয়া ফ্লাট্‌ফরমে গাড়ী ঢুকিয়া ধপ্ করিয়া থামিয়া গেল। "একটু চায়ের ব্যবস্থা দেখি" বলিয়া সুধীন বাহির হইয়া গেল। বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশ দেখা যাইতেছে। বেয়ারার হাতে চা সজ্জা লইয়া সুধীন ফিরিয়া আসিল। অমিয়ার দিকে একটা পেয়ালা বাড়াইয়া দিতেই সে নিতান্ত সলজ্জভাবে বলিল "এখন আর চা খাব না।"

সুধীন্ কতকটা অনুরোধের সুরেই বলিল "ও পেয়ালা ত আমি খাব না।"

"তাই ত, আমার বিশেষ অভ্যাস নেই, যখন তখন চা খেলে কেমন যেন লাগে।"

"তুমি চা খাও না?"

"অভ্যাস নেই।"

বিস্মিত, আনমিতস্বরে "তবে খেও না" বলিয়া নিজের পেয়ালাটার ভিতর ছ চারবার চামচ খানা ঘুরাইয়া কোনও রকমে একটুখানি খাইয়া বেয়ারাকে বিদায় করিল। অমিয়া লজ্জা করিয়া বলিল "আমার সঙ্গে কিছু খাবার ছিল।"

"বেশ ত খাও না।"

অমিয়া টিফিন বাক্স হইতে খাবার তুলিয়া পাত্রাভাবে তাহারই একটা চাকনীতে সেগুলি পরিপাটী করিয়া সাজাইতেছে। হেঁট হইয়া সুধীন দেখিল অমিয়া বুট খুলিয়া দিব্যি সু পরিয়াছে; সে বলিয়া উঠিল "বাঃ এই যে বাসা সু পরেছ। বুটটা কি অপরাধ করল?"

সলাজ মুখে অমিয়া উত্তর করিল "তা, একটু করেছে বই কি?"

"তুমি আমার উপর নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত হয়েছ?"

সে কথার জবাব না দিয়া "এই চাকনীতে ক'রেই খেতে হবে কিন্তু" বলিয়া পাত্রটা তাহার হাতে তুলিয়া দিল। সুধীন্ অভিভূত হইয়া তাহার গতি ভাল উপভোগ করিতেছিল। কাঠের দেয়ালে ঘেরা ক্ষুদ্র এই সংসারে সে কিসের জন্য কোন্ পুণ্য বলে আসিয়া পড়িয়াছে। এখানে কথাতে বাধা নাই, গতিতে সঙ্কোচ নাই, হাসিতে অনাবশ্যকতা নাই। এখানে একজনে বলিতেছে অপরে শুনিতেছে, এ দিতেছে সে খাইতেছে, একের দৃষ্টিতে যাহা ভাল লাগে না অপরে তাহা দূরে সরাইতেছে। সব যেন সরল, মিথ্যা আড়ম্বরহীন। বাহিরের বৃহৎ জগতে কি তাহার সহস্র প্রকার শিকল গুলি পশ্চাতে রাখিয়া ত ত করিয়া তাহারা যেন এক মুক্ত সুখরাজ্যে ছুটিতেছে. আর প্রতি মুহূর্তে হৃদয়ে যেন এতদিনকার সঞ্চিত ধৈর্য্য ঠেলিয়া ফেলিয়া অনন্ত কানায় কানায় ভরিয়া উঠিতেছে। আরও কিছু দিবার জন্য তখনও অমিয়া মেঝেয় বসিয়া। কণ্ঠে সহস্র স্নেহ ঢালিয়া সুধীন জিজ্ঞাসা করিল "তুমি খেলে না?"

"আমি যেয়েই খাবো।"

'মধুপুরের যে অনেক দেরী?"

'আজ আর মধুপুরে যাব না, পরের ষ্টেশনে নাব ব।"

"কম্প নিশ্বাসে সুধীন জিজ্ঞাসা করিল "পরের ষ্টেশনে? রাণীগঞ্জে?"

কুঁজো হইতে জল গড়াইতে গড়াইতে অমিয়া স্থিরকণ্ঠে উত্তর দিল "হাঁ।"

"সে ত এল।"

জলের গ্লাস হাতে দিতে দিতে অমিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল "ভালই ত।"

সুধীন্ বুঝিল এ ক্ষুদ্র যাত্রার সমাপ্তি অতি নিকট।

উভয়েই নীরব। সুধীন্ বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা সাদা মেঘের ভিতর দিয়া কখন বাসন্তীর চাঁদ জ্যোৎস্নায় চারিদিক প্রফুল্ল হাস্যময় করিয়া তুলিয়াছে। দূরের উঁচু নীচু বৃক্ষগুলি সোঁ সোঁ করিয়া পশ্চাতের দিকে ছুটিতেছে। স্থানে স্থানে জলের উপরে চাঁদের আলো ঝিক্‌মিক করিতেছে। মাথার উপরে পূর্ণচন্দ্র গাড়ীর পশ্চাতে উন্মত্তের মত ছুটিয়াছে—আসন্ন কখন দৃষ্টিপথের বাহিরে যায়। সুধীনের পাশের রুদ্ধ কবাট জ্যোৎস্না অজস্রবার স্পর্শ করিতেছিল - অজস্রবার ফিরিয়া যাইতেছিল।

"এই ত এল জিনিষ পত্তর গুছিয়ে নি" বলিয়া পার্শ্বের রুদ্ধ হইতে ভৃত্যকে ডাকিয়া সেগুলি বাঁধিবার উদ্যোগ করিতেছিল। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সুধীন তাহাদের ঘোরাফেরা অনুধাবন করিতেছিল। "ব্যস্ত কেন? এখনও ত একটু দেরী আছে। আমিই সব ও নাবিয়ে দেবো।"

ভৃত্য কি যেন বলিতে যাইতেছিল, অমিয়া বাধা দিয়া তাহাকে বিদায় দিল।

পথের সঙ্গে সঙ্গে কথাও যেন ফুরাইয়া আসিয়াছে। উভয়েই যেন দৃষ্টি লুকাইতেই বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। লাইনের উপর ঘুরে ঘুরে কোথায় কোনও প্রকাণ্ড খোলা মালগাড়ী উপরে কয়লা বোঝাই করিয়া দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া আছে। আশে পাশে এখানে সেখানে বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে কোথাও কোনও বাঙ্গলার আলোকোজ্জ্বল কক্ষ উঁকি মারিয়া সরিয়া যাইতেছে। জ্যোৎস্না প্রচুর আকাশের গায়ে চাঁদনীর ধোয়া উঠিয়া যেন একটা কালো পথ আঁকিয়া গিয়াছে। বহু লাইন, লাল সবুজ বহু আলো দেখিয়া সুধীন বুঝিল গাড়ী রাণীগঞ্জে আসিয়াছে। তেমনি নির্ব্বাক, তেমনি বাহিরের দিকে চাহিয়াই সে বসিয়া রহিল।

ধীরে ধীরে ট্রেণ প্লাটফরমে দাঁড়াইল। ভৃত্য আসিয়া কুলী ডাকিয়া জিনিষ পত্র বাঁধিয়া ছাঁদিয়া নামাইয়া লইল। নির্ব্বাক, আবছায়া দৃষ্টিতে সুধীন দেখিতে লাগিল অমিয়া শাড়ীটা ঝাড়িয়া লইল, চুলটা গুছাইয়া লইল, শালটা ভাল করিয়া গায়ে দিল। নতমুখে কি একটু ভাবিয়া কম্পিতওষ্ঠ করে নিঃশব্দে নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। সুধীন্ উঠিল না, নড়িল না, নমস্কার করিল না। ধীরপদবিক্ষেপে অমিয়া প্লাটফরমের উপর দিয়া চলিতেছে। মাত্র দৃষ্টিটুকু ফিরাইয়া সুধীন্ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। অমিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া ব্রিজের উপর একটু দাঁড়াইল। পশ্চাতের দিকে একবার চাহিল। সুধীনের চক্ষুতে সে চাহনি প্রতিফলিত হইল, এক হইল না। শুভ্র জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে, সেই রজত শুভ্র চন্দ্রালোকে তাহার শালের ফিরোজা, চুলের কালো রং, চুড়ীর ঝিকিমিকি কি যেন বলি বলি করিয়াও বলিল না।

হঠাৎ সুধীন লাফাইয়া উঠিল, ক্ষিপ্রহস্তে ব্যাকিংটস্ সরাইয়া ছবিখানি হাতে করিয়া ছুটিল। অমিয়া তখনও দীর্ঘ ব্রিজ নিঃশেষে ফেলে নাই। ঐ তাহার মাথার ব্রেচ্ শাড়ীর ভিতর হইতে কখনও কখনও ঝলিতেছে। সুধীন দ্রুতপদে তাহার পশ্চাতে যাইয়া গাঢ়স্বরে ডাকিল "অমিয়া!" অমিয়া ফিরিয়া চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বিহ্বলতা আসিয়া তাহাকে নিমেষে কত গ্রস্ত করিয়া গেল। ক্লান্তস্বরে সুধীন্ বলিল "ছবিখানা।" অমিয়ার সর্ব্বশরীর যেন দুলিয়া উঠিল। কণ্ঠস্বরে সমস্ত বেদনা ঢালিয়া ক্ষুব্ধপ্রায় ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "ওটার তার যে আপনি নিলেন?" সুধীন চমকিত হইয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিল — সে মুখ কত ম্লান, বেদনাক্লিষ্ট। ধীরে ধীরে নীচের দিকে চাহিল। উন্মুক্ত অনন্ত আকাশের জ্যোৎস্না তাহার সহিত যেন লুকোচুরী খেলিতেছিল। কোনও কোনও যাত্রীর চিন্দী গান অস্পষ্টভাবে কাণে আসিতেছে। মুখ না তুলিয়াই বুঝিল অমিয়া চলিয়া যাইতেছে। অপেক্ষাকৃত ক্ষীণস্বরে কহিল "এত বড় একটা জিনিষ শুধু আমার মুখের কথাতেই দিয়ে ফেল না অমিয়া।"

অমিয়া যেন প্রস্তুত হইয়াই ছিল এমনই ভাবে উত্তর দিল "অতটা খেয়ালী ত আমি কোনদিনই নই," কুলীকে ইঙ্গিত করিয়া একটু দ্রুতপদেই সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

তাহার পায়ের শব্দে চমকিত হইয়া সুধীন মুখ তুলিয়া দেখিল, অমিয়া সিঁড়ি পার হইয়া গিয়াছে; দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দৃষ্টি ফিরাইতেই বিদ্যুতালোক প্রতিফলিত ছবিখানির উপর পড়িল। সুধীন অন্যমনে ছবিখানা একটু নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিল। ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দে তাড়াতাড়ি প্লাটফর্ম্মে আসিয়া দাঁড়াইতেই বেয়ারা জিজ্ঞাসা করিল জিনিষ পত্র এখানেই নামাইবে কিনা। তখন কলিকাতাগামী ট্রেণ প্লাটফরমে প্রবেশ করিতেছিল, সেই গাড়ী দেখাইয়া বলিল তাহাতেই উঠিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা

যুগবাণী

ঠিক ৬টা বাজিয়া ৬ মিনিট হইলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান হন। অমনি চারিদিক হইতে 'মহাত্মা গান্ধি কী জয়' ও 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উত্থিত হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন—আপনারা দয়া করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিয়া আমার কথা শুনিবেন, আমার কথায় করতালী প্রদান না করিলেই আমার প্রতি সমধিক-সম্মান প্রদর্শন করা হইবে। আমরা সমস্ত বিষয়েই পাশ্চাত্য প্রভাব বর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছি, সুতরাং আপনারা এক্ষেত্রে মনে রাখিবেন যে, করতালি আমাদের দেশের নয়। আমাদের দেশটা সমস্ত জগতের বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছে, আমরা যেন Solitary cell এ আবদ্ধ আছি। সমগ্র জগতের বুকে আজ মুক্তির বেদনা বাজিয়া উঠিয়াছে, এই সর্ব্ব পৃথিবীর মুক্তির সঙ্গে ভারতের মুক্তিও সম্বন্ধযুক্ত।

বর্ত্তমান যুগের সমস্যা কোন দেশ বিশেষের, কোন জাতি বিশেষের সমস্যা নহে, সমগ্র মানব-জাতীর সমস্যা—যাহাতে এই সমগ্র মানব জাতীর সমস্যার সমাধান হইতে পারে, তাহার উপর লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা প্রণালী প্রস্তুত করিতে হইবে। আজ যদি পশ্চিম পীড়িত হয় প্রাচী সুস্থ থাকিবে না। মানব জাতি এক হইয়াছে একথা অত্যন্ত সত্য।

পশ্চিম জয়ী

পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হইয়াছে, আমরা বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি, পশ্চিম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভোগ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে—ভোগ করিতেছেও। বিশ্বকে ভোগ করিবার অধিকার সে কেন পাইয়াছে,—নিশ্চয়ই কোন একটা সত্যের জোরে জ্বরের তাপ তাড়িয়া উঠিলে ক্রোধের তাপও বাড়িয়া উঠে, শুধু ক্রোধের আগুনে জাতীর উন্নতির পথে ইঞ্জিন চলিবে না, যে বিদ্যার জোরে ইঞ্জিন চলে সে বিদ্যাটা দখল করা চাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন বস্তু-বিদ্যায় আমাদের দরকার নাই, কিন্তু দরকার নাই বলিয়া কেহ কোন সত্যকে খাটো করিতে পারে না, যে তাহা করিতে যায় তাহাকে দুঃখ পাইতে হইবে।

বিশ্বের একটা বাহিরের দিক আছে, সে বাহিরটাও নিয়মের বলে চলে, বস্তুবিশ্বের দুর্গম পথে ছুটিয়া চলিবার অধিকার তাহারই আছে, যে এই নিয়ম হাত করিতে পারিয়াছে; পশ্চিম আজ এই নিয়মের জোরে ছুটিয়া চলিয়াছে।

আমরা যদি পশ্চিমের বিদ্যা আয়ত্ত না করিয়া ফাঁকি দিতে চেষ্টা করি, তবে দুঃখ বাড়িবে বই কমিবে না—অপরাধ বাড়িবে।

মানুষ বিদ্রোহী

মানুষের বড় স্বভাব হইতেছে, মানিয়া না লওয়া। মানুষ বিদ্রোহী—মানুষ একেবারেই ভালমানুষ না। মানুষ বিশ্ব ঘটনার উপরে কর্তৃত্ব করে, সে থাকে ঘটরিডার দলে। এই অধিকার লাভ করিবার জন্য মানুষ সাধনা আরম্ভ করিয়াছিল তন্ত্রমন্ত্র লইয়া, আজ বিজ্ঞানের সাধনায় তাহার পরিণতি। পূর্ব্বদেশে যখন ভূতে ওঝা, দৈত্যে দেবতা এবং শত্রুকে বশ করিবার জন্য মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি মন্ত্রের নিয়োগ চলিতেছিল, ঠিক সেই সময় ভল্টেয়ারকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আপনি কি বিশ্বাস করেন যে মন্ত্রদ্বারা এক পাল মেষ বধ করা যাইতে পারে? তিনি তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন মন্ত্র দ্বারা বধ করিতে পারা যায় কিনা

তাহা জানি না—কিন্তু ইহা জানি সেকো বিষই উহার ঔষোধিতবাবস্থা। সেকো বিষের প্রতি এই বিশ্বাস ওদেশে সর্ব্বত্র, উহারা ইচ্ছা করিলে মারিতে পারে—আমরা ইচ্ছা না করিলেও মরিতে পারি।

আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক

দেবতার অধিকার আধ্যাত্মিক মহলে, দৈত্যের আধিভৌতিক মহলে। প্রধান বিদ্যাটাই শুক্রাচার্য্যের হাতে, তাহার নাম সঞ্জীবনী বিদ্যা। ঐ বিদ্যা বিধাতার যথার্থ বিদ্যা। ঐ বিদ্যা লাভ করিবার জন্য কচ যেমন শুক্রাচার্য্যের কাছে গিয়াছিলেন—আমাদিগকে সেইরূপ পশ্চিমের কাছে যাইতে হইবে, নতুবা যে বিদ্যা বাহিরের নিয়ম শিখায় তাহা হইতে বঞ্চিত হইব।

অতীত গৌরব

বস্তুবিদ্যায় একদিন পশ্চিম অপেক্ষা আমরাই অগ্রগামী হইয়াছিলাম, কিন্তু এখন আমরাই উহাদের পিছনে পড়িয়াছি. এখন ঐ বিদ্যাকে বিদ্যা করিতে না পারিলে আমরা পাশ্চাত্যের দস্যুহস্তে চূর্ণ হইয়া যাইব।

পশ্চিমের অভাব

তবে কি পশ্চিমই শান্তিলাভ করিয়াছে, তাহাও নহে, সেখানে ভোগের চেহারা দেখিয়াছি, কিন্তু আনন্দ দেখি নাই, কুবেরের ভাণ্ডার দেখিয়াছি, লক্ষ্মীর পূর্ণকুম্ভ দেখি নাই। লক্ষ্মীর অন্তরের কথা কল্যাণ। সেই কল্যাণের দ্বারা শ্রীলাভ হয়,—কুবেরের অন্তরের কথা সংগ্রহ, সংগ্রহে ধনের বহুলত্ব লাভ হয়। আমেরিকার ভ্রূকুটি-কুটিল, অস্ত্রভেদী অট্টালিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ধন মান হীন ভারতের সন্তান বলিয়াছিল। ভগঃকিম্, ইহাতেই বা কি!

উভয়ের ত্রুটি

ইউরোপ যখন বিজ্ঞানের দ্বারা বিশ্বের দরজা খুলিতে লাগিল সে একথা ভুলিয়া গেল যে বস্তু নিয়মের পশ্চাতে এমন কিছু আছে, যাহার সঙ্গে মানুষের অন্তরের আনন্দময় মিলন আছে।—ইউরোপ আত্মাকে দরাইয়াছে সে একবোঁকা আধ্যাত্মিক—নাস্তি তস্য সুখলেশ সত্যাৎ। বাহিরতা পশ্চিমে অন্তরতমকে বহুদূর করিয়া তুলিয়াছে। এই বাহিরতার লাভ আছে, নানা প্রকার হিতকর্ম্মে সোলআনা লাভ হয়। লাভের লোভে মানুষ মানুষকে খাটি করিতে চেষ্টা করে, ফলে লাভের লোভ মানুষের অন্তরের আত্মিক সত্যকে দুর্ব্বল করে। ধন হয় তখন সমাজের বল, ধনী হয় বলী। ঐ চাষানের উপরে যে উন্নতি তাহাতে আনন্দ নাই। ঐ বাঁধন মানুষের পক্ষে খড়ির বাঁধন -নাড়ির বাঁধন হয় না। আচারের বাহু-বন্ধনে ভারত নির্জ্জীব—যান্ত্রিকের বাহু বন্ধনে ইউরোপ নির্জ্জীব। সত্যকে ছাড়িয়া আনন্দ ভোগ করিবার পন্থা নাই।

সত্যি কি ইহা বাস্তবিক সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি শান্ত উপাসীত—ইহাই সত্য।

ইউরোপ লোভের তাড়নায় সত্যকে ভুলিয়া গিয়াছে। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। ত্যাগের দ্বারাই ভোগ হইবে। ঐক্য মানে করে সত্য, ভেদ-বুদ্ধি ঘটায় ধন।

মিলনের পথে

মনু বলিয়াছেন—যে বিষয়ে নিযুক্ত থাকে, সে যেমন করিয়া নিত্য নিত্য বৈষয়িক সত্যের সন্ধান পায় অন্যে তা পায় না। আজ অবিদ্যার মৃত্যু হইতে বাঁচিবার জন্য অন্তঃপুরের ছাত্র কচকে বৈদ্য পাঠশালার নাম লেখাইতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞান এ ক্ষেত্রে না জানাই বন্ধনের কারণ—জানাই মুক্তি বস্তুবিদ্যা সম্বন্ধেও তাহাই। পশ্চিম মহাদেশ বাহ্যবিশ্বে মায়া-মুক্তির সাধনা করিতেছে। পূর্ব্ব মহাদেশ অন্তরে সাধনা করিতেছে। পূর্ব্ব পশ্চিমকে মিলাইতে হইবে।

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে অমরত্ব লাভ করিতে হইবে। ভেদবুদ্ধি মানুষের একত্বকে দূরে রাখিয়াছিল। সেইটাই মোহ, সেইটাই শোক—এই ভেদবুদ্ধি দূর করিতে হইবে।

শান্তি সেখানে যেখানে মঙ্গল মঙ্গল সেখানে যেখানে ঐক্য। পূর্ব্ব দেশে সেই বিদ্যা নিকেতন, যাহা পূর্ব্ব পশ্চিমের মিলন নিকেতন। বিষয় ক্ষেত্রে মিলন নাই, কিন্তু সত্য লাভের ক্ষেত্রে বাধা নাই। পশ্চিম আজ বলিতেছে ভারতের বাণী কই? এত যাহা শুনিতেছি, আমারই কীর্ত্ত প্রতিধ্বনি। ভারতকে আজ সে বাণী শুনাইতে হইবে ভারতের সে বাণী এই—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতে সর্ব্বভূতেষুচাত্মানম্ ন ততো বিজুগুপ্সতে। সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি করিতে—বাহিরে প্রকাশ করিতে। আমাদের ধন সম্পদ নাই সাধন সম্পদ আছে।

(হিন্দুস্থান)

বৃন্তচ্যুত

(উপন্যাস)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী বি, এ)

পরদিন বৈকাল বেলা শশি গা ধুইয়া ঘাট হইতে ফিরিতেছিল এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে ছুটিতে ছুটিতে ভুলো আসিয়া তার আঁচলের খুঁট ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিয়া উঠিল, "আমার বাবাকে তুমি দেখ নি; ঐ আমার বাবা আসছে।"

ঘোমটাটাকে নাকের ডগা পর্য্যন্ত টানিয়া দিয়া শশি বলিল, "ছি ভুলো অমন করতে নেই।"

চন্দ্রকান্ত সত্যই সেই দিকে আসিতেছিল। সেদিকে বারেক মাত্র চাহিয়াই শশি জড়সড় ভাবে পথের এক পাশ ঘেঁসিয়া সরিয়া দাঁড়াইল এবং চন্দ্রকান্ত যখন তার সুমুখ দিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল তখন ঘোমটার আড়াল হইতে চকিতের মত তার মুখের দিকে একবার চাহিয়া লইল।

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া শশি প্রসন্নকে বলিল, "তুই ভুলোর বাবাকে কখন দেখেছিস পেসন্নী।"

উনানে আগুন ধরাইতে ধরাইতে প্রসন্ন বলিল, "কেন দেখব না!"

"কেমন চেহারা বল দেখি—সুপুরুষ নয়?"

তার মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিয়া প্রসন্ন বলিল, "সুপুরুষ?"

শশি বলিল, "তবে সুপুরুষ আবার কাকে বলে তাত জানি না।"

উনানে বাতাস দিতে দিতে প্রসন্ন বলিল, "হাঁ সুপুরুষ যদি বল ত সনত বাবুর বড় ভাই; যেমন রং তেমনি মুখ তেমনি—"

বাধা দিয়া শশি বলিয়া উঠিল, "তা হতে পারে—কিন্তু ভুলোর বাপই বা কম কি?"

"না বাপু, সুপুরুষ ওকে বলতে পারি না। কেবল রংটাই যা ফরসা, তা না হলে লম্বা, রোগা,—ঠিক যেন বকের মতন।"

বিরক্ত হইয়া শশি বলিয়া উঠিল, "চেহারার ত তুই সবই বুঝিস্ অমন মুখ কখন দেখেছিস ?"

সে বলিল, "কি জানি বাপু, আমার ত একটুও ভালো লাগে না।"

শশি আবার বলিল, "চোখ দুটি কেমন বল দেখি।"

উল্লন ধরান শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রসন্ন বলিল, "শুধু চোখ দুটো ভাল হলেই বুঝি হোলো।"

"তুই বুঝবি নে পেসন্নী", বলিয়া শশি সেখান হইতে চলিয়া গেল।

১২

সনতের বাপ নিরোদ চাটুয্যে আহার করিতে করিতে বলিলেন, "হাঁ গা, সে মেয়েটির সঙ্গে নাকি কোন পুরুষ মানুষ নেই—এ আবার কোন দেশী কাণ্ড !"

পাখা দিয়া মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে সনতের মা বলিল, "তার আর হয়েছেটা কি শুনি !"

"না হবে আর এমন কি, তবে কি না, পাড়ার লোকে ঐ কথা নিয়ে বড্ড বেশি ঘোঁট পাকাচ্ছে কিনা—"

বাধা দিয়া সনতের মা বলিয়া উঠিলেন, "তারা কি বলে শুনি।"

"বলে, সঙ্গে পুরুষমানুষ নেই—বয়সও কাঁচা—এই আর কি।"

"তা তাতে করে দোষটা কি হয়েছে শুনি !"

"দোষ গুণের কথা ত আমি কিছু বলি নি; আমি কেবল জানতে চাই তুমি এর কারণ জান কি ?"

"কিসের কারণ শুনি ?"

"এই একলা থাকার ?"

"তা জানব না কেন !"

"তা সেইটি বল্লেই ত চুকে যায়। আসল কথা, তা হলে ওদের সঙ্গে একটু মিশতে পারি—বুঝলে কি না।"

অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিয়া—সনতের মা বলিল, "তারা আবার মানুষ—তাদের সঙ্গে আবার মিশতে যাবে।"

"আহা, তাদের সঙ্গে না হয় নাই মিশলুম—তবু নিজের শুনতেও ত ইচ্ছে হতে পারে গো।"

সনতের মা বলিল, "না না ঠাট্টা নয়, বেচারার কি কষ্ট বল দেখি; দশবছর বয়সে বিয়ে হয় তার পর তিন মাস না যেতেই স্বামী কোথায় যে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় আর পর্য্যন্ত তার আর কোন খোঁজ খবরই পাওয়া গেল না।"

"বটে—তার পর ?"

"তার পর মেয়েটী বাপের বাড়ীতেই থেকে গেল। কিন্তু এমনি কপাল যে বছর না ঘুরতেই বেচারার বাপ মা দুজনেই মারা গেল।"

দুধের বাটিটার মধ্যে একমুঠো ভাত ফেলিয়া দিয়া সনতের বাপ বলিলেন, "তারি কষ্ট ত; মেয়েটির ভাই টাই কেউ ছিল না বুঝি।"

"না বাপের ঐ একটি মাত্র মেয়ে।"

তার পর ?

"তার পর পেসন্ন বলে যে ঝিটি ওর সঙ্গে এসেছে না—ওই ওকে দেখা শুনা করতে থাকে; শশিকে ও ছেলে বেলা থেকে মানুষ করেছিল।"

একটা ঢেঁকুর তুলিয়া সনতের বাপ বলিলেন, "বটে বেশ মানুষ ত ?

সনতের মা বলিলেন, "শশিকে ও পেটের সন্তানের চেয়েও ভাল বাসে।"

"তাই ত দেখছি—তার পর ?"

"তার পর এমনি করে বছর আষ্টেক কেটে যায়, তার পর হঠাৎ একদিন গ্রামের জমিদারের পাপ নজর মেয়েটির উপর পড়ে।"

"তাইতেই বুঝি দেশছেড়ে পালিয়ে এসেছে।"

সনতের মা বলিলেন, "হুঁ"।

"তা সনতের সঙ্গে ভাব হোলো কি করে !"

"সনত যে মেসে থাকে, মেয়েটি তারি সুমুখের বাড়ীতে ভাড়া থাকতো; তাইতেই আলাপ।"

আর একটা ঢেঁকুর তুলিয়া চাটুয্যে বলিলেন, "তা এত বেশ ভাল কাজই করেছ তোমরা এতে আর হয়েছে কি—আমি কি ছাই এত কথা জানতুম।"

এই যে সব কথা সনতের মা স্বামীর নিকট বলিলেন, এ সমস্তই তিনি প্রসন্নর নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন। শশিকে এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই তিনি করেন নি—তাঁর ভয় পাছে সে মনে কোনরূপ ব্যথা পায়।

সে দিন দুপুর বেলায় মেঝের উপর একটা মাদুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িয়া শশি ভোলাকে বুকের মধ্যে টানিয়া বলিল, "তোর বাপ তোকে খুব ভাল বাসে, নয় রে ভোলা।"

সে ছোট ঘাড়টিকে নাড়িয়া বলিল, "খুব।"

শশি বলিল, "আমি ও তোকে খুব ভালবাসি ভোলা!"

সে বলিল, "তা জানি।"

"কি করে জানলি রে পাগলা!"

সে বলিল, "বাবা যে বল্লে।"

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শশি বলিয়া উঠিল, "তোর বাবা কি করে জানলে রে?"

হাত মুখ নাড়িয়া ভোলা বলিল, "বারে, আমি যে বাবার কাছে তোমার কথা বলেছি।"

"কি বলেছিস তুই শুনি!"

ভোলা বলিল, "বলেছি যে তুমি আমাকে কত আদর কর, কত চুমু খাও।"

"তা শুনে তোর বাপ কি বল্লে।"

"বাবা বল্লে, যে তুমি আমাকে খুব ভালবাস।"

"আর কিছু বল্লেন না।"

"আর বল্লে, তুই ও তাকে খুব ভালবাসিস্ ভোলা।"

শশি বলিল, "আর কিছু বল্লেন?"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া ভোলা বলিয়া উঠিল, "ও পাড়ায় কেমন বায়োস্কোপ হয়েছে যেখানিচ্ছ!"

সে কথা কানে না তুলিয়াই শশি বলিল, কি বল্লেন বল্ না।"

বিরক্ত হইয়া ভোলা বলিল, "জানি না।"

হঠাৎ নিজেকে সামলাইয়া লইয়া শশি বলিল, "খুব ঘুম হয়েছে বুঝি রে!"

ভোলা হাত মুখ নাড়িয়া আরম্ভ করিল, "কলকাতা থেকে কেমন আলো এসেছে", তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "কলকাতায় খুব আলো আছে না মা?"

শশি বলিল, "তুই কলকাতায় যাবি?"

সে বলিল, "তুমি যখন কলকাতায় যাবে আমাকে নিয়ে যেও না!"

"তোর বাবা ছাড়বে কেন?"

সে বলিল, "তুমি নিয়ে গেলে কিছু বলবে না।"

শশি বলিল, "অন্য কেউ নিয়ে গেলে বুঝি ছাড়বেন না।"

সে বলিল, "তা কি ছাড়ে।"

"তবে আমার সঙ্গেই বা ছাড়বেন কেন?"

ভোলা বলিল, "তুমি যে লক্ষ্মী মেয়ে।"

ভোলাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া শশি বলিল, "আমি যে লক্ষ্মী মেয়ে একথা তোকে কে বল্লে রে?"

সে বলিল, "বাবা বল্লে, সনতকাকা বল্লে, দিদিমা বল্লে, সকলে বল্লে।"

শশি বলিল, "তোর বাবার দাঁত পড়েছে আমাকে লক্ষ্মী বলতে।"

ভোলা বলিল, "না ত না।"

শশি বলিল, "তোর বাবা কি বলেছে বল্ ত রে দুষ্টু।"

"বলুব ও লক্ষ্মী মেয়ে বলেছে—আবার কতবার করে বলব!"

আমাদের কথা

মহাত্মা গান্ধীর ভুল স্বীকার

মহাত্মা গান্ধী স্বীকার করিয়াছেন যে লর্ড রেডিংএর সহিত দেখা করিতে যাওয়া এবং আলি ভ্রাতাদের বক্তৃতা যে কিছু দোষাবহ হইয়াছিল তাহা তাঁহাদের স্বীকার করান, তাঁহার পক্ষে একটা রাষ্ট্রনৈতিক ভ্রম (political blunder) হইয়াছে। একথাটা ইংরাজ রাজপুরুষদের মুখে অনেকবার শুনিয়াছি, এবং যখনই শুনিয়াছি তখনই সেটা কানে একটা ভোক বাক্যের মত লাগিয়াছে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর আন্তরিকতায় বিন্দু মাত্র সন্দেহ করিবার কারণ আমরা আজও কিছু খুঁজিয়া পাই নাই। তবে ভুল বলিতে বুঝায় হয় পূর্ব্বে বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না, না হয় ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই একটা ব্যগ্রতায় অস্থির হইয়া বসিয়াছিলেন। বুঝিবার ক্ষমতা মহাত্মা গান্ধীর নাই এ কথা প্রাণে স্বীকার করে না। তবে তিনি যখন নিজে ভুল স্বীকার করিয়াছেন তখন দ্বিতীয় কারণটীই মনে আসে। কিন্তু তাহাতেও একটা বড় দুঃখের কথা আছে। আজ সমগ্র ভারতের পথ প্রদর্শক বলিয়া যাঁহাকে মাথায় তুলিয়া লইয়াছি তাঁহার অস্থিরতা ও বিবেচনার অভাব শোভা পায় না। প্রবল বিশ্বাসের আবেগে যাঁহার পায় সমস্ত ভার অর্পণ করিয়াছি, তাঁহার সামান্য বিবেচনার ভুল উপেক্ষনীয় নহে, তাঁহার দায়ীত্ব কত বড়!

দেশের কথা লইয়া মতভেদ

এবারকার কংগ্রেস কমিটীর নির্ব্বাচন ব্যাপারে অনেকে অনেক প্রকারের আপত্তি উঠাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের কাজ গুলি ঠিক ডিমক্রাসীর নেতার উপযুক্ত হয় নাই। কিন্তু একটা কথা ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে, তিনি কাজের সুবিধার বিষয় চিন্তা করিয়া একটা মত প্রচার করিয়াছিলেন মাত্র, তিনি ত জোর করিয়া কাহাকেও সে মত গ্রহণ করিতে বলেন নাই। এবং এরূপ ভাবে মত প্রকাশ না করাই ত অন্যায় হইবে। অধিকাংশের স্বাধীন মতের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য হইবে, ইহাই ত ডিমক্রাসীর কার্য্যকারী সূত্র।

তবে কথা এই যে অনেকের মধ্যেই Minority অর্থাৎ দলে যারা অল্পসংখ্যক তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য একটা মস্ত ব্যগ্রতা দেখা যাইতেছে। জানি না এ ভাবটী জগতের সমগ্র মানবের সাম্য প্রতিষ্ঠার পথে কি ভাবে দাঁড়াইবে, এবং তাহার সহায় হইবে কি বিঘ্ন জন্মাইবে। Minorityর স্বার্থ বজায় থাকুক, তাহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না, কিন্তু জগতে সকলের স্বার্থ সমান ভাবে সর্ব্বক্ষেত্রে রক্ষিত হওয়া সব সময়ে সম্ভব নহে, সে ক্ষেত্রে Mjorityর স্বার্থ ক্ষুন্ন করা কি সাধারণ তন্ত্রের পরিপোষক হইবে? বাহির চোখে দেখিতে গেলে তাহাতে সমগ্র সমাজের ক্ষতি হইবে বলিয়াই মনে হয়।

এক মাতাল রোজ আপিস হইতে আসিবার সময় মদ খাইয়া প্রায়ই চাদরটী যে কোথায় ফেলিয়া আসিতেন তাহা স্থির থাকিত না। তাঁহার পত্নী রোজ কোথা হইতে চাদর যোগাইবেন! সেদিন অনেক রাগারাগির পর তিনি খুঁজিয়া খুঁজিয়া একটী চাদর বাহির করিয়া অনেক শাসাইয়া দিলেন। স্বামিটীও প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলেন সেদিন আর কোন কারণ বশতঃ চাদর হারাইবেন না। কিন্তু আপিস হইতে ফিরিবার সময় একটু মদ না খাইয়া পারেন না। চাদর যদি হারায় তবে আবার উপায় হইবে কি! শেষে চাদরটী বেশ করিয়া মাথায় বাঁধিয়া মদের দোকানে ঢুকিলেন। আজ জোর হইয়াছে চাদর বাঁধা আছে, তাই মদও একটু চলিল বেশী।

কলে যখন বাড়ী পৌঁছিলেন তখন মাথার চাদরটী কিছু বাঁধা আছে, কিন্তু গায়ের জামা পরণের কাপড় ও পায়ের জুতা যে কোথায় গিয়াছে, তাহার কোনই স্থিরতা নাই; আর মুখে কেবল বলিতেছেন "গিন্নী, আজ চাদর ঠিক আছে।" minority's interest রক্ষা করিতে অত বাস্ত হইলে শেষ কালে শুধু মাত্র চাদর ঠিক রাখিয়া না বসি, ইহাই ভয়।

এদিকে ত চাঁদপুরের কুলী রিত্রাট লইয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একমত নন বলিয়াই মনে হয়। মহাত্মা গান্ধী আত্মক্লেশকারী ধর্ম্মঘটকে (sympathetic strike) অনুচিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দেশবন্ধু ত গোয়ালন্দে আবার তাঁহার ধর্ম্মঘটকারীদের কোলে করিয়া লইলেন। এখন এরূপ মহাপুরুষদের মাঝে যদি মতভেদ হয় তবে সাধারণে কোন পথ ধরিয়া চলিবে। তবে একথা বাস্তবিক সত্য প্রকৃত কার্য্য ক্ষেত্রে অন্যের মতের অপেক্ষা থাকিবে না—তা সে মতদাতা যত বড়ই হউন না কেন। যখন ঘটনাচক্রে মানুষের শরীর মন কিছুর প্রতি তীব্র ভাবে বিদ্রোহী হইয়া উঠে তখন আপনার কার্য্যের পথ সে আপনিই বাহির করিয়া লইবে। এবং পন্থায় বহু দার্শনিক ব্যাখ্যার শৈথিল্য তাহাকে কিছুমাত্র বাধা দিতে পারিবে না মানব সমাজ চিরদিন সেই ভাবেই চলিয়াছে। যেখানে প্রকৃত প্রাণের সাড়া আসে সেই খানেই সভ্যতার বিকাশ, মনুষ্যত্বের প্রস্ফুটন সবই হইয়া থাকে।

জাতিভেদের দাবী

বড় দরিদ্র আমরা, 'দিন আনি দিন খাই' বলিলেও আমাদের অবস্থার সম্যক পরিচয় দেওয়া হইবে না। পেটে অন্ন নাই, আছে ক্ষুধা; দেহে বল নাই, আছে জ্বর; গায়ে জামা নাই, আছে ঘাড়ে কতকগুলি ছেলে মেয়ে পরিবার। উপায় করিবার ক্ষমতা নাই,—উপায় করিবার উপায় নাই। এদিকে কিন্তু সমাজ, সংসার ধর্ম্ম প্রভৃতি আভিধানিক বড় বড় শব্দের দাবী আমাদের পর কিছুমাত্র কম নহে। শাসক সম্প্রদায়ের গাজনা টাক্স প্রভৃতি অনেকগুলি আছে, এবং আমাদিগকে নানাপ্রকারের নূতন নূতন সুবিধা দানের সহিত সেগুলি বাড়িয়াও যাইতেছে। আজ নূতন মিউনিসিপালিটী বসিতেছে, কাল ডিলেক্স ইউনিয়ন বোর্ড, ডিলেক্স সেলফ গবর্ণমেণ্ট কত কি হইতেছে,—আয় নির্দ্ধারণ কত বাড়িয়া যাইতেছে সেজন্য কিছু পয়সা না দিয়া উপায় কি? ওদিকে আবার অশাসক সম্প্রদায়গণ মনুষ্যত্ব, জাতীয়তা, ধর্ম্মপ্রাণতা, প্রকৃতি লেবেল' দ্বারা চাঁদার খাতা লইয়া দরজায় দাঁড়াইয়া;—আমার বাহির হইবার যো কি! আজ বর্দ্ধমানে জলপ্লাবন, কাল পাবনায় কলেরা, পরশু বিহারে প্লেগ;—আজ চাঁদপুরে কুলী রিত্রাট, কাল খুলনায় চর্ভিক্ষ, ওদিকে কংগ্রেস কণ্ড, মেম্বরসিপ, গ্রামা স্কুল, ডাক্তারখানা, খালকাটা, কন্যা বিবাহ, শ্রাদ্ধ,—আবার কত সন্ন্যাসীর মিশন, কত কালীবাড়ী, কোনটা রাখিয়া কোনটা করি। প্রাণ আমাদের আলোড়িত হইয়া উঠে। গৃহে বুভুক্ষিত যতগুলি থাক না কেন, এদিকে কাহারও কথা কাহারও দাবী ঠেলিয়া ফেলিতে পারি না। এক দিকে দেখি জালিয়ান ওয়ালা, আর একদিকে দেখি কি?—

একদিকে গবর্ণমেণ্ট, আর একদিকে আমাদের প্রাচীন সমাজ! দাবী কাহার বেশী সব সময় বুঝিয়া পাই না। গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে শান্তিও আর্থিক উন্নতির ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন বলিয়া দাবী করিতেছেন। আর সমাজ আমাদিগকে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পবিত্রতা দান করিতেছেন বলিয়া অস্বাভাবিক রূপ গর্ব্বিত। কোনটারই সঠিক পরিমান সহজ বোধ্য নহে। তবে সমাজ তাহার নিষ্ক্রিয় অভিভাবকত্ব লইয়া শুধু শাস্তি বিধান করিবার জন্যই বর্ত্তমান। হিন্দুসমাজের গর্ব্ব করিবার কত জিনিষ আছে জানি না, তবে ব্যবস্থা ও দেখিতেছি মানুষকে জীবন ভরিয়া কষ্টভোগ করাইবার। সমাজের জাতিভেদ শ্রেণী বিভাগ সবই বহুপ্রাচীন,

সবতারই চিনীর ঠিক, কোন ফাক নাই.—গেটে গেটে দারোগান দাড়াইয়া। পান থেকে চুন টুকু খসিলে অমনি সমাজের সামাজিক বেওনেট, সে জার্ম্মানীর করাতী বেওনেটের চাইতেও তীক্ষ্ণ, তীব্র, মর্ম্মভেদী।

জাতিভেদ কি, কেন সমাজে প্রচলিত হইল, সে সব কথা চিরদিনই তর্কের বিষয়। শাস্ত্রে ত বহু মত। এ সম্বন্ধে 'সম্মিলনী' পত্রিকার ২০শে আষাঢ় সংখ্যায় 'হিন্দুর জাতিভেদ সমস্যা' সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটী বাহির হইয়াছে তাহা উল্লেখ যোগ্য। প্রবন্ধ লেখক এক স্থলে লিখিয়াছেন।

"জাতি সম্বন্ধে শাস্ত্রের উল্লিখিত অষ্টাদশ প্রকার মত পাঠ করিলে অন্ধের হাতী দেখার কথা, মনে পড়ে। হাতীর একমাত্র আকার কিন্তু অন্ধদের বর্ণনা শুনিলে মনে হয়,—সেটা বহুরূপীর ন্যায় নানা আকৃতি বিশিষ্ট। আমাদের নিকট সকল ঋষিই সমান মান্য। কিন্তু যখন আমরা দেখিতে পাই যে, অন্যান্য বিষয়ে তাহাদের কথায় যেমন পরস্পর ঐক্য আছে, জাতিভেদ সম্বন্ধে সেরূপ নাই, যাঁহার যাহা ইচ্ছা লিখিয়া গিয়াছেন। তখন সন্দেহ আপনা হইতে আসিয়া মনে উপস্থিত হয়। সত্য যখন একটী বই দুটী নহে, তখন আমরা কোনগুলি ছাড়িয়া কোনটী গ্রহণ করিব? মনে হয়, সকল গুলিই ভ্রান্ত ও কাল্পনিক, মন্ত্রের দ্রষ্টা প্রকৃত পক্ষে কেহই নাই। ফলতঃ জ্ঞান সূর্য্য উদিত হইলে সত্য সকলের চক্ষে সমভাবে প্রতিফলিত হয়, অজ্ঞানান্ধকার খুলিতে গেলে, সমুদয় পদার্থই প্রেতের ন্যায় নানাবিধ কাল্পনিক মূর্ত্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

"মহাভারতের মতানুসারে সৃষ্টির প্রথমে জাতিভেদ ছিল না। সমস্ত লোকের সম্মিলনে যে এক বিশাল জাতি গঠিত হইয়াছিল তাহাকে মানব জাতি কহে। পরে ক্রমশঃ গুণ ও কর্ম্মের শ্রেণীবিভাগ হওয়াতে মানুষেরও শ্রেণীবিভাগ অর্থাৎ জাতিভেদ হইয়াছে। রামায়ণ, হরিবংশ, ভাগবতাদি পুরাণের মতেও সমুদয় মানব এক জাতীয়, যেহেতু সকলেই এক পিতামাতার সন্তান। তবে পিতামাতার নাম লইয়া যে সামান্য গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে।.....সিদ্ধান্ত আসিয়া বলিয়া দেয় যে, মানুষ একজনের সন্তান, এজন্য এক জাতীয়।

"এতগুলি শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও অকাট্য যুক্তির পরেও যদি এমন কেহ থাকেন যিনি পুরুষসূক্তের ১২শ মন্ত্রের কেবল স্থূল অর্থের উপর নির্ভর করিয়া জাতিভেদ সমর্থন করিতে চাহেন, তাঁহাকে বক্তব্য এই যে, মন্ত্রটীকে প্রাচীন ও প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও, উহাতে বর্ণ বিশেষের উচ্চনীচতার প্রমাণ হয় না। মানিলাম, বিরাট পুরুষের চারি অঙ্গ হইতে জাতি চতুষ্টয়ের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, অবয়ব বিশেষের উচ্চাচ্চতা আছে কি? যদি থাকে, তাহা লৌকিক, বিরাট পুরুষ অর্থাৎ বিশ্বের অঙ্গের প্রতি তাহা প্রযোজ্য নহে। বিশ্বের সকল অঙ্গই মানুষের নিকট, সমান পবিত্র, এবং তাঁহার চরণেরই গৌরব অধিক। যে পদে পতিতপাবনী সুরধুনীর উৎপত্তি হইয়াছে, যে চরণ অঙ্কে ধারণ করিয়া স্বয়ং লক্ষ্মী সতত সেবা করেন, যোগী ভক্তগণ যে পদের স্বর্গ লালসায় অনুক্ষণ ধ্যানে মগ্ন থাকেন, বিপ্রগণ ভক্তিসহকারে যে চরণে শতচন্দন তুলসী পুষ্প অর্পণ করেন, সেই মহিমামণ্ডিত পদপঙ্কজে যদি শূদ্র জন্মিয়া থাকে, তবে ত উচ্চাসন তাহারই প্রাপ্য। আর যদি মুখ চরণাপেক্ষ শ্রেষ্ঠ অঙ্গই হয়, তাহাতেই বা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব কিসে? উত্তমাঙ্গ শিরে উৎকুন কীটের উদ্ভব, অপেক্ষাকৃত অধমাঙ্গ উদরে রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট বা মহাপুরুষের জন্ম। অপিচ..... তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণের (খ) মন্ত্রে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্ম প্রজাপতির মুখ হইতে ছাগ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় ও মেষ, উরু হইতে বৈশ্য ও গাভী এবং পদে শূদ্র ও অশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। লৌকিক হিসাবে ছাগ অপেক্ষা মেষ শ্রেষ্ঠ, মেষ হইতে গাভী শ্রেষ্ঠ এবং

আর অপেক্ষা অধম শ্রেষ্ঠ। যদি প্রজাপতির চরণে জন্মিয়া অধমশ্রেষ্ঠ জীব এবং মুখে জন্মিয়া ছাগ নিকৃষ্ট প্রাণী হইতে পারে, তবে তাঁহার মুখে জন্মহেতু ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতম আসনের দাবী কিসে?"

কিন্তু এ কথা বলি কারে! মুখে শাস্ত্র শাস্ত্র করিলেও সমাজ ঠিক শাস্ত্রসম্মত নয়। জাতিভেদের মূল শাস্ত্রে নহে, জাতি ভেদের মূল নিজের নিজের অন্তরে। সমাজে সহজে আত্মশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার এমন উপায় আর নাই। মানুষের স্বাভাবিক ঈর্ষা ঘৃণার উপায় হিন্দু জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত নহে। পূর্ব্বপুরুষের মহত্বের লেবেল বুকে আঁটিয়া সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার লোভই ইহার মূল কারণ। ঠিক যেমন অনেক ভাল জিনিষের লেবেল দিয়া জুয়াচোরে নকল মাল চালায়। বর্ত্তমান আইনে বর্ত্তমান ব্রাহ্মণদের নামে জুয়াচুরির নালিশ চলে কি না এটর্ণি বাড়ী পরামর্শ করিয়া দেখিলে হয়!

কথামালার নেকড়ে বাঘ ও মেষ শাবকের গল্পটী মনে পড়ে। বাপের অপরাধের ওজর করিয়া নেকড়ে বাঘ মেষ শাবককে উদরস্থ করিলেন। গল্পটী পড়িয়া পাঁচ বৎসরের বালকেও হাসে, কেবল হাসিবে আর না বোধ হয় এই বিরাট হিন্দু সমাজ। হাসিলে শূদ্র, শূদ্র থাকে না। হাসিলে পিতা চাকর ছিল বলিয়াই পুত্র চাকর থাকিবে না। হাসিলে সমস্ত জাতিভেদ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে।

তবুও জাতিভেদ আছে। সংস্কৃত শিক্ষিতই হউন আর ইংরাজি শিক্ষিতই হউন কেহই জাতিভেদ ত্যাগ করেন নাই, করিবেন এরূপ ভাবও আপাততঃ দেখা যাইতেছে না। অবশ্য এরূপ অবস্থায় থাকিয়া থাকিলেও ততটা আপত্তি ছিল না। কিন্তু যশোর জেলার নড়াইল মহকুমায় এক নবশূদ্র উকীল লইয়া বড় বড় বহুবিবাহকারী কুলীন ব্রাহ্মণ উকীল ও ব্রাহ্মণ সভার সম্পাদক প্রভৃতির যেরূপ মাথা মাথা উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহাদিগকে যে এখনও কেন বহরমপুরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয় নাই তাহা ঠিক ভাবিয়া পাইতেছি না। ইহারা কি ভাবেন বুঝিয়া পাই নাই। মনস্তত্ত্বে আমরা পণ্ডিত নহি। অন্তত ইহাদের মনস্তত্ত্বের হিসাব করিবার ক্ষমতা খুব কম লোকেরই হইবে।

পিতৃপুরুষের গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করা সর্ব্বক্ষেত্রেই যে দোষাবহ, আমরা এরূপ বলি না। কিন্তু শুধুমাত্র সেই সম্বলে সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে গেলে অনেক স্থলেই উপহাসাস্পদ হইতে হয়; অবশ্য কেবল হিন্দুসমাজ বাদে। পিতৃপুরুষের গৌরব রক্ষা করিতে চইলে, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত সম্মান দেখাইতে হইলে কি শুধুমাত্র তাঁহাদের মার্কাটীর অধিকারী হইয়া বসিয়া থাকিলেই হইল? সে গৌরবের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে না পারিলে সে গৌরবের দাবী করা মহাপাপ বলিয়াই মনে হয়। এক উচ্ছৃঙ্খল মূর্খ উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া বহুমূল্যের একখানি শাল দিয়া জুতা মুছিত। আমাদের হিন্দু সমাজের জাতিভেদও আজ সেই অবস্থায় আসিয়া দাড়াইয়াছে। সকলে আজ পৈতৃক আমলের বহুমূল্য শাল দিয়া জুতা মুছিতেছে। পূর্ব্বপুরুষের প্রকৃত গৌরবের এত বড় অবমাননা করিয়া কথায় কথায় পূর্ব্বপুরুষের দোহাই দিতে যাহাদের লজ্জা বোধ হয় না, বেশের জন্য, সমাজের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তির উন্নতির জন্য, তাহাদের শাস্তি হওয়া উচিত।

জাতীয় বৈষম্য

"সিমলার ৬ই তারিখের খবরে প্রকাশ, কোন কোন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা ইউরোপীয়ান স্কুল সমূহে যে সাহায্য প্রদান করা হয়, তাহা কমাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য সিমলায় ইউরোপীয়ান শিক্ষা কনফারেন্সের অধিবেশন হইতেছে। শিক্ষা-সচিব মিঃ সফি, মিঃ সার্প এবং মিঃ রিচিকে সঙ্গে লইয়া অদ্য এই কনফারেন্সে যোগদান করিয়াছিলেন।

"মিঃ সফি বলিয়াছেন—জনসাধারণের সম্বন্ধে

আমি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা হইতে আমার ধারণা হইয়াছে—অধিকাংশ ভারতবাসীরই দৃঢ়বিশ্বাস ভারতের ভবিষ্যৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যে সমস্ত ইউরোপীয়ান এবং এংলোইণ্ডিয়ান ভারতের বাসীন্দা হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যদি দূরত্বের ভাব এবং শ্রেষ্ঠত্বের ভাব পরিহার করিয়া ভারতের অধিবাসীদের সহিত সহযোগ এবং সখ্যভাব জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করেন তবে সমস্ত প্রশ্নেরই মীমাংসা হইয়া যায়। পরস্পরের প্রতি প্রীতির ভাবটাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। আমি আশা করি ভবিষ্যতে অর্থসাহায্য করাইবারও আর চেষ্টা হইবে না।" হিন্দুস্থান, ২৩শে শ্রাবণ।

কিন্তু দূরত্বের ভাব ও শ্রেষ্ঠত্বের ভাব পরিহার করিলে যে বেশী টাকা ইউরোপীয়ান স্কুলগুলিতে যাইবে এরূপ মনে করিতে পারি না। বরং টাকা কম যাওয়াটাই দূরত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ভাব পরিহারের একটা নিদর্শন স্বরূপ হইবে। তাহাদের দূরত্বের ও শ্রেষ্ঠত্বের ভাব পরিহার করিব আমরা না, তাহারা। সেটা যদি তাহাদেরই জিনিষ হয়, ত্যাগ করিবার কার্য্যটাও ত তাহাদেরই বলিয়া মনে হয়। সেক্ষেত্রে ইউরোপীয়ান স্কুলগুলি রাখিয়া অযথা অর্থব্যয়ের আবশ্যক? যদি দূরত্ব দূর হয় তাহা হইলে বাঙ্গালীর স্কুলগুলিতেই ত তাহারা ছেলেদের লেখাপড়া শিখাইতে পারে। ভিন্ন স্কুল রাখিয়া 'সাম্যের দিন সম্মুখে' বলিয়া দরিদ্রের অর্থের অপব্যবহার কোন নীতি সঙ্গত হইবে? বরং ইউরোপীয়ান বালকগণ আমাদের ছেলেদের সহিত একস্কুলে পড়িলে একসঙ্গে মেলামেশা করিলে অদূর ভবিষ্যতে যে একটা প্রীতি সখ্যের ভিতর দিয়া ক্রমে সাম্যের সত্য মূর্ত্তি প্রকট হইবে সে বিষয়ে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? যাঁহারা প্রকৃত সাম্যের প্রার্থী তাঁহাদিগের পক্ষে ইউরোপীয়ান স্কুলে টাকা দিতে মত করা দূরের কথা, ভিন্ন ইউরোপীয়ান স্কুল রাখিতে মত দেওয়াই ত আশ্চর্য্য!

বৈষম্যের যে তীব্র চাপ পথ ঘাট মাঠে প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদিগকে পিষিয়া মারিতেছে তাহার জন্য অপরাধী কে? অবশ্যই আমরা, কারণ আমরাই অনেক বিষয়েই তাহার সহায়তা করিতেছি, এমন কি অর্থ দিয়াও। পথে ঘাটে, রেল ষ্টীমারে, ভারতবাসীর যে অপমান, খরিয়াল শিয়ালকোট প্রভৃতি স্থানে এই সেদিন যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহাও ধরি না। কিন্তু ছুটী অন্নের হরণ আমারই দেশের কর্ম্মক্ষেত্রগুলিতে যে বৈষম্যের দারুণ মূর্ত্তি, যে ভাবে আমাকে দূরে ঠেলিয়া দিতেছে,—আমার যে দাঁড়াইবার স্থান নাই,—আমি কতদিন তাহা সহিয়া থাকিব,—সহস্র অপমানের পরেও কি ছুটী অন্ন মুখে দিতে পারিব না?—যদি তাই হয়, তবে এস, অসহযোগ ব্রতের ন্যায় এক নিরন্নব্রতের আগুন জ্বালিয়া সকলে একসঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়ি।

We learn from a reliable source that the British Indian Steam navigation Company have published a notice dispensing with the services of 71 Indian officers of their staff at Calcutta and are filling the vacant posts by raw inexperienced anglo Indians.

Surendra Naryan Singh

In A. B. Patrika, 10th June.

বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী তাঁহাদের কলিকাতাস্থ ভারতীয় কর্ম্মচারীদিগের সকল হইতে এক নোটীশ দিয়া একাত্তর জনের চাকুরী ছাড়াইয়া দিয়াছেন, এবং তাহাদের স্থান নূতন, কর্ম্মে অনভিজ্ঞ ভারতীয় ইংরাজ দ্বারা পূরণ করিতেছেন।

ইহার পর আবার সেদিন ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ও আউধ রোহিলখণ্ড রেলপথের ইঞ্জিনিয়ার বিভাগের বিজ্ঞাপনে দেখিলাম শুধু ভারতীয় ইংরাজদিগকে লওয়া হইবে।

ইহার পর আর টীকনী চাই কি? দেখিতেছি ইহারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিতেছে না। আগুন আমাদের জ্বালাইতে হইবে না। তীব্র বাগ্রতার বশে ইহারা চিতা সাজাইয়া আগুন হাতে অধীর হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় ও শিক্ষকগণের অবস্থা

মফঃস্বলের এক সুদূর পল্লীগ্রামে দু' চারজন কিছু অবস্থাপন্ন শিক্ষিত অথবা অর্দ্ধশিক্ষিত লোক মিলিয়া একটী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। উদ্দেশ্য,—আপাত দৃষ্টিতে দেখে শিক্ষাবিস্তার, নিঃস্বার্থ পরোপকার। কিন্তু ইহার ভিতর যে 'নাম কেনা', দেশের ভিতর মাতব্বরী করিবার ক্ষমতা বাড়াইয়া লওয়া, আবশ্যকমত কিছু কিছু আর্থিক আনোপকার

লাভ করা প্রভৃতি উদ্দেশ্য একেবারে নাই তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। কার্য্যটী এমন যে ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে গেলে দেশের শত্রুতাসাধন করিবার মত দেখায়। না বলিলেও যেন অনেক সময় ভিতরের অন্তর্যামীটী বড় জোরে জোরে আঘাত করিতে থাকেন।

বিদ্যালয় ত স্থাপিত হইল, এখন শিক্ষক ইহার প্রধান দরকারী জিনিষ। নিকটস্থ গ্রামগুলি হইতে কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য প্রসূত গ্রাজুয়েট ধরিয়া আনিয়া জুড়িয়া দেওয়া হইল। এগুলি সর্ব্ববিষয়েই নিস্ত। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কতকগুলি বড় বড় কথা মুখস্থ করিয়া আসিয়াছে। অনেকে অনেক সময় আদর করিয়া ছোট ছোট ছেলেদের গীতা বা চণ্ডী হইতে ভাল ভাল শ্লোক বাছিয়া মুখস্থ করান। ছেলেগুলি তাহার বিন্দুমাত্র অর্থ না বুঝিয়া কত আহ্লাদে তাহা আবৃত্তি করিয়া বেড়ায়, লোকে শুনিয়াও বাহবা দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন গ্রাজুয়েটগুলির মুখে বার্ক সেক্সপিয়ের গদও তেমনি মধুর লাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় যে শুধু বৃত্তি শিক্ষার অভাব তাহা নহে; এখানে সংসারে প্রতি মুহূর্ত্তের সহস্র কুলীনতার ভিতর দিয়া কেমন করিয়া জীবনযাপন করিতে হয় তাহারও বিন্দুমাত্র শিক্ষা দেওয়া হয় না। এ শিক্ষাকে আমরা Slave mentalityই বলি আর মনুষ্যত্ব বিনাশকারীই বলি, একথা সত্য যে একালের গ্রাজুয়েট ও সেকালের টোলের পণ্ডিতের ভিতর কপটতার অভাব হিসাবে কোনই পার্থক্য নাই।

এমন শিশুপ্রকৃতির কয়েকজন যুবক স্কুল পরিচালনের ভার লইয়া প্রকৃতপক্ষে যে গ্রাম্য রাষ্ট্রনীতির ভিতরে নিজদিগকে জড়াইয়া লইল সে কথা কোনক্রমেই তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তারপর আজকালকার যার তার মুখে প্রতিমুহূর্ত্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিন্দা এবং নিজেদের জ্ঞানের পরিমাণ করিতে দেখিয়া তাহাদের অন্তঃকরণের একটা গর্ব্বে আঘাত অনুভব করে, এবং তাহারা যে কতদূর কাজের লোক, কতদূর উপযুক্ততা লাভ করিয়াছে, তাহাদের মহত্ত্ব কতদূর হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়ে। ফলে তাহাদের শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক কষ্টের একশেষ হইলেও তাহা তাহারা অনেক সময় অগ্রাহ্য করিয়া থাকে। তাহারা স্কুলের পরিচালক, কিন্তু গ্রামের সহিত সম্পর্কও তাহাদের সেই পর্য্যন্ত। গ্রামের সামাজিক সম্মানাদির ক্ষেত্রে তাহারা কেহই নহে, সামান্য কুলীনত্বের যে অবস্থা সমাজের চোখে, তাহাও তাহাদের অনেকের ভাগ্যে নাই। মানুষের সাধারণ জ্ঞানের, সাধারণ প্রবৃত্তি নিচয়ের উপর নির্ভর করিয়া যে স্নেহমমতার প্রতিষ্ঠা, তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাহাদের অগ্রসর হইতে গেলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। অথচ তাহাদিগকে নিত্য বড় বড় কথায় শুনাইয়া দেওয়া হয় যে 'বিদ্যাদান মহাপুণ্যের কাজ; তাহার সহিত অর্থের আকাঙ্ক্ষা করিলে পুণ্য ত দূরের কথা, মহাপাপ হয়।' অথচ এই অন্নহীন পুণ্যের ফলে ইহকালের সর্ব্বসুখ সর্ব্বসম্মান হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখা হইবে।—পরকাল আছে কিনা জানি না, অতএব তাহার বিচার আর করিলাম না।

যাহাদের কাছে শিক্ষার ফলে ছাত্রগণ ভবিষ্যতে সমাজে শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করিবে বলিয়া আশা করা হয়, তাহাদিগের এতাদৃশ অপমানে সমাজে যে কোনরূপ কল্যাণ সম্ভব একথা কিছুতেই মনে হয় না। ধনীর সন্তানগণ অনেক সময় নিজের শিক্ষককে মোসাহেবের অধিক মনে করে না। এমনি হীনতার আবরণে শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে কি করিয়া মনুষ্যত্ব প্রস্ফুটিত হইতে পারে ভাবিয়া পাই না। Slave mentalityর এক মস্ত বড় আবাসভূমি এই শিক্ষকগণের হীনতা হীনতার ভিতর জীবনযাপনের ব্যবস্থা করিয়া রাখা। ক্ষুব্ধ চিত্তে সঙ্কুচিত জীবনের ভার বহন করিয়া, নিত্য অপমানের যাতনা বুকে ধারণ করিয়া কেমন করিয়া যে শিক্ষকগণ ভবিষ্যতের মানুষ গড়িয়া তুলিবে এবং কি করিয়া বালকগণের অন্তঃকরণে মুক্তির হাওয়া বহাইয়া দিবে ভাবিয়া পাই না। ছেলে স্কুলে দিবার সময় ত গালাগালি দিই যে আজকালকার অর্থকরী বিদ্যার জন্য কেবল অর্থ ঢালিতে হয়। অবশ্য বিনাপয়সায় লেখাপড়া শিখাইতে পারিলে ভাল হইত, কিন্তু যদি গবর্ণমেণ্ট শিক্ষার জন্য উপযুক্তরূপ অর্থ সাহায্য না করে, তাহা হইলে কি যাহারা শিক্ষা দিবে তাহাদিগকে না খাইতে দিয়া অপমানিত করিয়া রাখিতে হইবে! এই কথাটী যেন সকলে সর্ব্বক্ষণ মনে রাখেন যে শিক্ষকগণ বিনাপয়সায় কিম্বা অল্পপয়সায় পড়াইতে বাধ্য নহে। বিনাপয়সায় কিম্বা অল্পপয়সায় যে লেখাপড়া শেখে সে সারাজীবন ছাত্রত্ব দর্শক শিক্ষকগণের নিকট উপার্জ্জনের প্রতি পয়সাটীর জন্য ঋণী। শিক্ষককে সামান্য কিছু দানে তাহাদের কোন বাহাদুরীই নাই, কৃতজ্ঞতার নিদর্শনটুকু পর্য্যন্তও নহে। বরং শিক্ষক যে তাহার সমস্ত দাবী করে না ইহাতেই শিক্ষকের অসীম মহত্ত্ব।

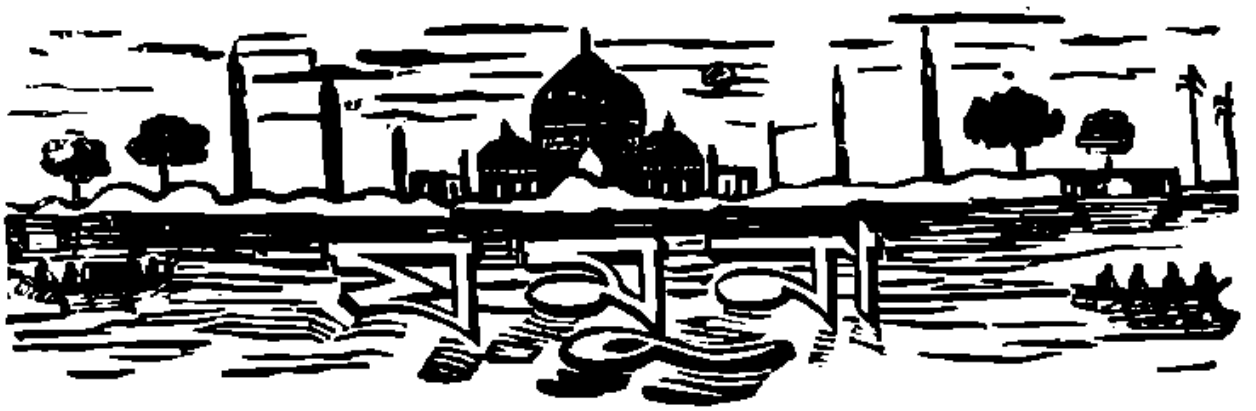

১১শ বর্ষ | আশ্বিন, ১৩২৮ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আগমনী

(শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত)

"বেটীর পাথর-কুচির প্রাণ। ঘোড়া ছুটিয়ে যে এলি, দেখ না আবাগী, পাথরে আগুন ঠিক্‌রে উঠ্‌ছে, আর খুরের ধূলোয় গগন ছেয়ে গেল - এমন ভোর—তাও আঁধার করে দিলি! নীলকমল আঁখি তোমার চোখখাগী! চোখে দেখতে পাও না—না ?"···ওঃ! বাপের বাড়ী আসছেন ট্যাগবগিয়ে - এদিকে যে হুঁ!

রমাই পাগলা চণ্ডীমণ্ডপের সিঁড়ির শেষ ধাপে বসিয়াছিল। অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, দেখিল, পদ্মবন উজাড় করিয়া ফুলের ডালা ভরিয়া পূজার দালানের দিকে মালাকর দৌড়িতেছে। মহা-আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল বলিল, "তাই ত'রে! আবে আজ যে নষ্টী! আরে হা-হা-হা! কই পদ্মে যে ষড় কই রে!" তার পরেই মুখখানা ভার করিল, মাথার ঝাঁকড়া চুল ধরিয়া টানিল, হাতের মুঠায় একগাছা ধানের শীষ উঠিয়া আসিল—হাসিতে হাসিতে বলিল, আরে হাড়ে দুব্বো গজিয়েছে যে রে!" আবার মুখখানা শক্ত করিয়া চোখ দুটী জলজল করিয়া উঠিল বলিল – "বেটীর পাথর-কুচির প্রাণ কিনা!"

রমাইকে সকলে পাগল বলিয়া উপহাস করে কিন্তু একটু স্নেহও করে। রমাই আবোল-তাবোল বকে, কখন কখন দু এক ছিলিম খায়, গঙ্গায় ডুব দেয়, একখানা ছেঁড়া কাপড় জড়ায় –পথে আসিবার সময় বুড়ো শিবতলায় ঢিব্ করিয়া একটা গড় করে, শ্রীগৌরাঙ্গের মন্দির দ্বারে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত

তবে কালীমন্দিরে কালীমূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসে চোখ বোল করিয়া বলে, "রক্তখাকী! কত— কত রক্ত আরে খাবি,রক্ত কি আর আছে," –তারপর কুজরাক্ষসী দুয়ারে আসিয়া উলসন করিয়া বোসে, হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়, ভোগের প্রসাদ-চারিটী কলাপাতাখানা শুদ্ধ খায়, শেষ চালকলাবাঁধের পুরাণো ভিটার চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া শুইয়া থাকে। কখন কখন গভীর রাত্রে যখন নীল আকাশে তারাগুলি আনাগোনা করে - ঘুমুরের মত নীহারিকা ফুটিয়া উঠে, ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত তারাচর নিশীথ নিবিড় আঁধারে গান গায়— রমাইও গান ধরে :—

মনের মানুষ কোন্‌জনা,—
তারে যায় কি লো চেনা ॥
ও সে হাওয়ায় আসে, হাওয়ায় চলে
লুকিয়ে করে খেলা শোনা ॥
ও মন সেইজনা ওলো সেইজনা ॥

আজ প্রাতে রমাই কিছু যেন উন্মনা হইয়া উঠিল। ফুলের বাজরা দেখিয়া রমাই জমিদারবাড়ীর সদর সেউড়ি দিয়া সোজা বরাবর ঠাকুর দালানের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন ঠাকুর সাজান হইয়া গেছে। রমাই তাহা দেখিয়া একটু ফিক করিয়া হাসিল। যিনি চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন তিনি ভাবিলেন, "আবার চণ্ডী অশুদ্ধ হইল নাকি।" রমাই সেদিকে তাকাইল না—প্রতিমার পানে চাহিয়া বলিল "যস্ বাবা যে রক্ষক সেই ভক্ষক। তুই বাঁচাবি না হাড়ের মালা নেড়ে ফুঁয়ার মড়ক জাগিয়ে দিলি। সাধ করে বলি বেটীর পাথর-কুচির প্রাণ, তো বেটীর চোখ পুরুষ পাথর— আহা আবার নাম ধরেছে বেটীর - নগরাজ দুহিতে। পিতে পাহাড় মা পাষাণী, মেয়ে কোথায় নির্ঝরিণী হবে তা নয়—একেবারে পাথর চাকী, ভাঁতার সিয়ে দিলে বাবা। অস্তি কস্তি রাখলে না নিজের দিয়ে নিঙড়ে দিলে।"

চারিদিকেই তখন কল কোলাহলে মুখরিত ও চারায়ে কলরোল কলল—অথচ অচলীভূত—সকলেই হাসমুখ আর চাকের বাদ্য গ্রাম তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে।

রমাই পাগলের হাসি দেখিয়া তন্ময়ার একটু উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন এই পাগলা এখানে কি কর্‌ছিস্ – কি আবোল-তাবোল বকছিস্ চোপ করিস্ নে, যা-যাঃ!

রমাই আরো সপ্রতিভ হইয়া বলিল "আজ্ঞে এই— যেই রক্ষক সেই ভক্ষক। দেখছেন না, ওই সঙ্গে যে পঞ্চভূত এসেছে—ও বেটারা কেবল হামরাই হয়ে সব খেয়ে ফেললে, দেখছেন না আপনি একবার চণ্ডিটা ভাল করে আওড়ান ত – সব বেটারা সরে যাবে। পাগাতে পথ পাবে না।"

তন্ময়ার আরও সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন ভাবিলেন "তাই ত আর কেউ ত বুঝতে, ধরতে পারে নি ত'? এ পাগলা বেটা ও বড় শয়তান।" মুখ খুব গম্ভীর করিয়া দুইবার দাড়ি দুলাইয়া রমাইকে বলিলেন— যা বেটা যা সরে যা—বলিয়া আবার সুর করিয়া শ্রীচণ্ডী পড়িতে লাগিলেন—ঘন গম্ভীরধ্বনিতে বাণী পাঁচ দুকরী ঠাকুরদালানকে ঘেরিয়া ঘেরিয়া বিধুনিত করিয়া তুলিল।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥

চণ্ডীর সেই গম্ভীরধ্বনি শুনিয়া, রমাই সজল নয়নে প্রতিমার পানে চাহিয়া ব্যাকুল ভাবে জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল। মাথা নাড়িয়া গান ধরিল—

দেখতে কিরে এলি উমা সারা বছর পরে।
বাপের ঘরে নেইক অন্ন সবাই হাহা করে ॥
শুন্য মা তোর পরবন,
নেইক অলির গুঞ্জরণ,
শুধু যে মা বাপের মন কেমন কেমন করে।
চোখের দেখা দেখ্‌বে বলে আছি আশা ধরে ॥
বলে লোকে সোণার বাঙ্‌লা,
নেইক সোণা আছে কাঙ্‌লা,

কেউ বলে না ভালবাসি উপবাসী সবাই মরে।
অন্নপূর্ণা দুটি অন্ন দে মা আমার ঘরে পরে॥

গান শুনিয়া জানকীবাবুর একমাত্র কন্যা মহামায়া ছুটিয়া আসিল। সাত বছরের মেয়ে, ঠিক যেন আর একখানি প্রতিমা! মহামায়া মহা আনন্দে করতালি দিয়া নাচিয়া উঠিল—পায়ের ঘুমুর তালে বেতালে বাজিয়া উঠিল রমাই তখনও গাহিতেছিল—

অন্নপূর্ণা দুটি অন্ন দেমা আমায় ঘরে পরে॥

মহামায়া রমাইয়ের নিকটে আসিয়া বলিল "রমাই দাদা—রমাই দাদা আবার গাও না! একটু দূরে শুভ্র কৌষেয় বস্ত্র পরিধান করিয়া জানকীবাবু বসিয়াছিলেন, সোণার গড়গড়ায় তামাক টানিতেছিলেন, তিনি ধমক দিয়া উঠিলেন 'যা-যা আর ও অলুক্ষুণে গান গাহিতে হবে না—আজ আনন্দের দিন—তা না বেটা যত শ্মশান জাগাচ্ছে—যা:—" বলিয়া এক তাড়া দিলেন।

রমাই একটু ফিক্ করিয়া হাসিল মনে মনে বলিল "কি! কেমন বেটী বলিনি যে পাঁচ ভূতের সঙ্গে তোর মুখের এসেছে - ভিখিরী দেখেই চোপরায় হাঁক মেরেছে, বলছে চোপ! আর ওদিকে তাকিয়ে দেখ না, কেমন সাজ ঘরে লাগুটার ধন—শুধু একটা মস্ত হাঁ—পেটে মুখে নাইক রা—বেটী এদিকে যে শ্মশান জাগিয়ে তুলেছে তার ঠিক নেই ঘুঁ। তোর পাথর-কুচির নিকুচি করেছে—যাও!"

রমাই আবার একবার ফিক করিয়া হাসিল।

মহামায়ার কিন্তু এ তাড়না ভাল লাগিল না। সে তাহার পিতাকে শুনাইয়া স্নেহ অভিমানের সুরে জোরে বলিল—"না রমাই দাদা তুমি গাও, রমাই দাদা তুমি যে ছেঁড়া কাপড় পরে রয়েছ, আজ বুঝি ছেঁড়া কাপড় পরতে আছে না রে, ছেঁড়া কাপড় পরে ঠাকুরের কাছে এসে ঠাকুর রাগ করে না, রমাই দাদা!"—

রমাই এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল সে এক একবার শুধু ফিক ফিক করিয়া হাসিতে লাগিল, আর মাথা নাড়িতে লাগিল।

মহামায়া বলিল—"দাঁড়াও রমাই দাদা, আমি মার কাছ থেকে এনে দিচ্ছি—"

মহামায়া যেমন ফিরিয়া বাড়ীর ভিতর দিকে যাইবে, অমনি দেখিল নগ্ন, দীর্ঘ, বুভুক্ষিত এক নারী কটীতে শুধুমাত্র ছিন্ন নারিকেল পত্র চাপা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার সেই কঙ্কাল বিশেষ দেহ আর নগ্ন অঙ্গ দেখিয়া মহামায়া শিহরিয়া উঠিল সে এ বিভীষিকার মূর্ত্তি দেখে নাই। ভয়ে তাহার বুকের ধড়ি পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। সে চীৎকার করিয়া বলিল—"বাবা! বাবা! দেখ কে!" বলিয়া তাহার পিতাকে জড়াইয়া ধরিল।

জানকীনাথ কন্যাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া বলিলেন 'ভয় কি মা'—কে রে কি? সে শুধু অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া দিল "ওই! ওই!"

চীৎকার শুনিয়া লোকজন পাহারা ছুটিয়া আসিল। মহামায়ার তখন ভয়টা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মহামায়া পা টিপিয়া টিপিয়া ভিখারিণীর সম্মুখে আসিয়া সতৃষ্ণ নয়নে তাহার মুখের পানে চাহিল। তাহার দশা দেখিয়া তাহার কান্না পাইল।

মহামায়ার কান্না আসিল। মহামায়া কাঁদিয়া ফেলিল। ফিরিয়া তাহার পিতার নিকটে গিয়া ধরবার করিল তাহাকে কাপড় দেওয়া হউক। জানকীনাথ একবার সেই মূর্ত্তি দূর হইতে দেখিয়া মহাত্রস্ত হইয়া উঠিলেন, হাঁক দিলেন "পাহারা! পাহারা! দূর করে দে! দূর করে দে!"

মহামায়া দেখিল, পিতা তাহার কথা শুনিলেন না, জানকীনাথ আরো রাগিয়া বলিলেন—'এই! কি আপদ! দে দে তাড়িয়ে দে!' মহামায়া ব্যাকুল হইয়া রমাই পাগলার দিকে চাহিল, রমাই তখন ঠাকুর দালানের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। রমাইয়ের চক্ষুতে আর জল নাই, একেবারে শুষ্ক! শূন্য দৃষ্টি একবার করিয়া প্রতিমার মুখের পানে চায়,

আবার সেই বিদেশিনী কাঁপা মূর্ত্তি পানে ফিরায়—উহার বহাইয়ের চক্ষু স্থির হইয়া গেল, যেন প্রলয় উঠিয়াছে।

মহামায়া তাহার পিতাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিল, বলিল 'বাবা, ওকে একখানা কাপড় দাও! ও-বাবা! দাও না!'

জানকীনাথ তবুই পাহারাদের ধমক দিয়া উঠিলেন—'আরে এই পাহারা! কি আপদ সকাল বেলা বহর কার দিন এ কোথা থেকে সব অলুক্ষণে চেহারা এসে বাড়ী হতে লাগল—আরে যেনা ছুঁড়ীটারে দূর করে।"

পাহারা দুইজন আসিল দেখিল;—ফুটোন্মুখ যৌবন, কিশোরী শুধু হাঁকাইতেছে—অপাঙ্গে সে যৌবনের কটাক্ষ নাই, আছে একটা গভীর নিরাশা—বক্ষে সে অনাবৃত লজ্জা ধরিয়া গেছে, শুধু তাহার কপাল খানা পড়িয়া আছে। যৌবনের সে লাবণ্য নাই, আছে শুধু বিরাট হাহাকার।

পাহারা সে মূর্ত্তি দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তাহাকে তাড়া দিতে সাহসও করিল না, তাহার মুখে বাক্যও সরিল না। সে একবার করিয়া সেই নারী মূর্ত্তি দেখে আর চোখের পাতা বন্ধ করে শত চেষ্টাতেও তাড়া দিতে পারিল না।

জানকীনাথ স্বয়ং উঠিলেন। মহামায়া ইতিমধ্যে বাড়ীর ভিতরে গিয়া কোথা হইতে একখানা নূতন কাপড় লইয়া ছুটিয়া আসিল, তাড়াতাড়ি সেই ভিখারিণীর হাতে কাপড় খানি দিল। জানকীনাথ মুখ লাল করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, যা এখন ত' পেয়েছিস্ যা, পূজো হলে খেয়ে যাস্, খবরদার এখানে ঢুকিস নে যা।"

ভিখারিণী কাপড় খানা পাইয়া যেন নারীর স্বাভাবিক লজ্জাকে ফিরিয়া পাইল, দুইহাতে ধরিয়া তাহা অঙ্গে জড়াইতে গেল। পরক্ষণেই সর্পদংশনেও যন্ত্রণাতে মানুষ যেমন চমকিত হয়, কুঞ্চিত ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে তেমনি শিহরিয়া উঠিল, হাতে লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল, চীৎকার করিয়া কহিল—না না এ কাপড় না—এ কাপড় না, আমার ধর্ম্মনাশ করলে—আমার ধর্ম্মনাশ করলে! এ যে বিলাতি কাপড়!...

জানকীনাথ বলিলেন—"কি আপদ আবার কোত্থেকে এক পাগল—আঃ জ্বালিয়ে মারলে। দূর করে দেনা রে!"

মহামায়া কিছু বুঝিল না যেন কেমন হতভম্ব হইয়া রহিল। ভিখারিণী সজোরে কাপড়খানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। ঠাকুর দালানে যেখানে হোমের কাঠ জ্বলিতেছিল, কাপড় খানা সেই জলন্ত অগ্নিতে পড়িয়া দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ পুরোহিত তন্ত্রধার সকলে হৈ হৈ করিয়া উঠিলেন—"কি সর্ব্বনাশ করলে, কোথাকার বন চাঁড়ালের মেয়ে" সকলে উন্মুখ হইয়া অগ্নি হইতে কাপড় খানা সরাইতে গেল, কিন্তু পারিল না, আগুন তখন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ওদিকে পুরোহিত চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! আরে মার বস্ত্র কে অপহরণ করলে, দেবীর বস্ত্র নাই, কি সর্ব্বনাশ ধনধান্যের কটীতে বস্ত্র নাই।" মহামূল্য—মহার্ঘ্য বস্ত্র জানকীনাথ যে নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরাইয়াছেন, সে কি! দেবীর বস্ত্র নাই। পুরোহিত সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ঐ যে দেবীর বস্ত্র, যার বস্ত্র কে আগুনে ফেললে! হায়! হায়! হায়! হায়! অগ্নিকুণ্ডে সব গেল।" সঙ্গে সঙ্গে জলন্ত অগ্নির লেলিহান উর্দ্ধশিখা দেবীর ডাকের গহনা অবধি গ্রাস করিল। সব জ্বলিয়া গেল! দেবী তখনও বিবস্ত্রা। জানকীনাথ কপালে করাঘাত করিয়া উঠিলেন। দিশেহারা পুরোহিত তাড়াতাড়ি ঘট তুলিয়া তাহারই জল অগ্নিতে ঢালিয়া দিলেন। কুণ্ডলীকৃত ধূমে ঠাকুর দালান ধূম্রাকার হইয়া গেল।

দিক দশ যেন হাহা করিয়া উঠিল। 'কি সর্ব্বনাশ হল' বলিয়া মহামায়ার মা আছাড় খাইয়া পড়িলেন।

সকলে মৃৎ-পুত্তলিকার মত নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। আরতি নিভিল। ধূপও অপসারিত হইল। সকলে আড়ষ্ট হইয়া দেখিল, বিবস্ত্রা দেবীর কটিদেশে ভিখারিণীর সেই শুকনা নারিকেল পাতা জড়ান। কিন্তু প্রতিমার মুখ অপূর্ব্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। আর রমাই উন্মত্তের মত তাণ্ডব নৃত্যে নাচিতে নাচিতে গাহিতেছে,

এই সাজে তোর বেশ সেজেছে।
তোর নকল পুড়ে আসল রূপে
কেমন উজল রূপ ফুটেছে॥
মুখো মেরে ন্যাংটা বেড়ায়
লোকে বাসে লজ্জা জড়ায়
সরম ধরম মরম আমার
কৈবে মাটি ভিজে গেছে।
তাদের মায়ের এই সাজেতে
নূতন করে' বেশ সেজেছে॥

যমুনা

(চিত্র)

(শ্রীবিনয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী বি. এ.)

(ক)

ছিল একটী চাকুরী, তাও স্বভাবের দোষে যে দিন খোয়া গেল সত্যই সেদিন ধরণীকে আঁধার দেখিয়াছিলাম। আমার বাড়ী বাঁকুড়া জেলায়, কাজেই বিদ্যার ঘরে যে বেশী জমা দিই নাই তাহা বলাই বাহুল্য। তবু যদি সময়ে দুই একটা পাশ দিতাম—তাতেই বা কি যে এমন চতুর্ভুজ হইতাম তাহা ও বুঝি না। তখন কিন্তু আমার সব চেয়ে ভাবনা ছিল অর্থ, কারণ মাথার উপর বিবাহযোগ্যা ভগিনী তাহার বয়সের চাপে আমাকে পিষিয়া ফেলিবার যোগাড় করিতেছিল। বোধ হয় গ্রহ সুপ্রসন্ন ছিল তাই অল্প দিনের মধ্যেই অর্থাৎ স্ত্রীর গহনা বন্ধকের টাকা ফুরাইবার আগেই, কলিকাতার মোনাগড় কলিয়ারীতে টাইম কিপারের কাজটা মিলিয়া গেল। মাহিয়ানা মাত্র পঁচিশ টাকা হইলে কি হয়। এই টাকাটা হাত খরচের জন্য রাখিয়া ইহার তিনগুণ, চারিগুণ টাকা প্রত্যেক মাসে বাড়ি পাঠান এই কাজের অতি সহজ ও অতি সাধারণ ব্যাপার। তাই মাহিয়ানা কম হইলেও অভিনবত্ব পদের মতই লোভনীয় জিনিষ।

বাড়ীর সবার শুভেচ্ছা বহন করিয়া একদিন আষাঢ়ের সন্ধ্যায় ভিজিতে ভিজিতে কলিয়ারিতে হাজির হইলাম। ছাতিতে মোটেই বৃষ্টি মানে নাই, সমস্ত কাপড় জামা ভিজিয়া গায়ের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। আর এই অতলস্পর্শ জলের মধ্যে আমার বিরহ-কাতর মনটা ও ভিজিয়া ভারী হইয়া কোথায় তলাইয়া গিয়াছে খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। একখানি ছোট খড়ের ঘরের সম্মুখে আসিয়া সঙ্গের কুলীটা হাঁকিল, "যমুনা ইও যমুনা।" বুঝিলাম এই কুটীরখানিই আমার ভাগ্য উজ্জ্বল করিয়া থাকিবে; দেখিয়া আনন্দ অপেক্ষা ভয় হইয়াছিল বেশী, কিন্তু তাহার অপেক্ষা বেশী ভয় হইয়াছিল কুলীর ডাক শুনিয়া। একে ত এই অবিরাম বারিধারার মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি, তাহার মধ্যে এই কলির ভগীরথ যদি যমুনার আবাহন করেন তবে ঐরাবতের মত এই বঙ্গচন্দ্রও নিশ্চয় ভাসিয়া যাইবে। কিন্তু

ঘরটা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল একটা হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক বয়স তাহার বছর কুড়ি।

এই যমুনা। অতি-মলিন বসন পরিহিত, ভোগবিলাস-বর্জ্জিত, শুষ্ক দেহ যমুনা কেমন জিজ্ঞাসুনেত্রে আমার দিকে চাহিল। কুলীটা "সে তুহারা বাবু আয়িয়া" বলিয়া তাহার সাক্ষাতে মোট নামাইয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়া দিল। যমুনা কিছুক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাবুজী কা ঘর কাঁহা?" উত্তরে বলিতে হইল "বাঁকুড়া মিলা"। এটা বেশ বেশী সভ্যতার গণ্ডীর মধ্যের আলাপ; কিন্তু তাই বলিয়া কোন্ কোন্ যাদে কাজ করিয়াছি তাহারও হিসাব চাহিয়া বসিলে আর সহ্য হইল না বলিলাম "দেখো হামার শরীর বহুৎ ঠিক নেহি আছে। কিছুক্ষণ বাদে পুছ কর।" কথায় না স্বরে কিসে কাজ হইল জানি না—যমুনা সন্ত্রস্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল। আমার কেবলি মনে হইতে লাগিল কুলীটা অমন হাসিয়া গেল কেন।

সমস্ত দিনের পরাভবের পর একটা সাধারণ রমণীকে জয় করিয়াও মনটা যেন একটু উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু ঘরে ঢুকিয়াই একটা বিরাট ধাক্কায় আমার সমস্ত উৎসাহ কোথায় উড়িয়া গেল। দেখিলাম একটা ধড়ির খাটিয়া বড় বাড়ীর বৃদ্ধ দারোয়ানের মত পূর্ব্বের সমস্ত সেবার স্মৃতি লইয়া পড়িয়া আছে। বর্ত্তমানে তাহা দ্বারা আর কোন কাজের আশা নাই তবু সে নিজের পদ অপরকে ছাড়িয়া দিতে রাজি নয়। আর সবাই তাহার এ আব্দার সহ্য করিয়া একটুখানি স্থান ছাড়িয়া দিয়াছে। আর এক কোণে একটা জলশূন্য কলসী ভূতপূর্ব্ব গৃহস্বামীর দারুণ তৃষ্ণার গল্প করিয়া সেই সজল দিনে আমার বিস্ময়ের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিল। ঘরের মেঝেটা মাটীর—সদ্যলেপিত গোময় ন্যাতসেঁতে মাটিতে না শুকাইতে পাইয়া একটা অপ্রীতিকর গন্ধে সমস্ত ঘরটা ভরিয়া তুলিতেছিল। হিন্দুর ছেলের একি কদর হইল! জীবন্তে বোধ হয় কখনও এ স্থান হইতে বাহির হইতে পারিব না। সমস্ত ভাবনা ছুটিয়া গেল যমুনার কথায়, সে পা' ধুইবার জল দিয়া ডাকিতে আসিয়াছে। বিদেশে এইটুকু যত্নে আমার মনটা দ্রব হইয়া গেল—নারী-হৃদয়ের এইটুকু সেবা আমার প্রবাসের দুঃখ আরো অসহ্য করিয়া দিয়া চোখ দুটীকে অশ্রুভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল।

তাড়াতাড়ি হাত পা ধুইয়া কাঁকর বহুল ডাল ও চাল অপূর্ব্ব খিচুড়ি তুলিয়া দিলাম। নিকটে বসিয়া যমুনা আমার অপটু হস্তের শত ত্রুটী সংশোধন করিতে করিতে আমায় প্রশ্ন করিতে লাগিল, 'বাবুজি, আপনি অনেক জায়গায় গিয়াছেন, না?' আমি বুঝিতে পারিলাম না এক লক্ষ্মীছাড়া চেহারা ছাড়া অপর কি লক্ষণ দেখিয়া সে এতবড় পরিব্রাজক আখ্যা আমায় দিয়া ফেলিল। তবু এই অযাচিত প্রসংশার মায়া ছাড়াইতে পারিলাম না। একটু গম্ভীর হইয়া স্বীকার করিলাম, "হাঁ দেশ অনেক দেখিয়াছি বটে।" কথাটা বড় মিথ্যা নয়, বাঁকুড়া সহর মামা বাড়ী, মাসী বাড়ী, শ্বশুর বাড়ী ইত্যাদি আত্মীয় বাড়ী এবং সবার শেষ রেলের আফিস এ ঘুরিলে একটা লোক কি পৃথিবীর কম অংশ পরিভ্রমণ করে। আমার কথা শুনিয়া যমুনা বাস্তভাবে কতকটা আগাইয়া আসিল—কি খানিকটা মললা দিতে দিতে হাতের মধ্যেই রাখিয়া বলিল, "বাবুজি তাদের সবার নাম—কি ঘর তা নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে!" ছাপরা জিলায় ঘর তিনটি গাঁও—"তাহার কথা অপেক্ষা মসলাটার দরকার বেশী হইয়াছিল তাই থালা হইতে খানিক হাঁড়িতে ফেলিয়া হাতা দিয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিলাম—"আরে অমন কত হাজার লোকের সঙ্গে আমার আলাপ, তাদের সবার নাম কি ঘর জানা কি আমার পক্ষে সম্ভব। কই ছাপরা জিলায় বাড়ী ত কাউকে জানি না।" রমণী মসলার থালাটা শক্ত করিয়া ধরিয়া খানিকক্ষণ মাটির দিকে চাহিয়া

বসিয়া রহিল, বোধ হইল যেন ঘুম দিতেছে, কিছু পরে "বাবু আমার ভাত জুড়িয়ে গেল" বলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল, পলাবু ঘর ধরাধরা।

(৯)

রঘুবর প্রায় তেইশ বৎসর আগে এই খনিতে কাজ করিতে আসে—সঙ্গে ছিল তার স্ত্রী। তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই খাদে কাজ করিত। বৎসর খানেক পর এক বৎসরের শিশু যমুনা ও স্বামীকে ফেলিয়া রঘুবরের স্ত্রী হজমী বেমারী অর্থাৎ কলেরাতে মারা গেল; রঘুবর আর বিবাহ করে নাই। যমুনাকে বুকে লইয়া দিন কাটাইয়া দিতে লাগিল, নহিলে ইচ্ছা করিলে এদেশে অপর স্ত্রীর অভাব হয়? একদিন ম্যানেজারের সঙ্গে রঘুবরের বচসা হয়—তাহার ফলেই বা অন্য যে কোন কারণে রঘুবর আর খাদ হইতে মেয়ের কাছে আসিতে পারিল না। খনিতে এমন প্রায়ই হইতেছে। দু'চার কি দশজন কুলী যদি দৈবাৎ চাপা পড়িয়া মারা যায় তবে খাতায় তাহাদের পলাতক বলিয়া লিখিয়া দিলেই চলে। বড় জোর পুলিসে পাঁচশত টাকা খরচ। কেই বা তাহার খোঁজ করিয়া দুঃস্থ অনাথ পরিবারের অন্নসংস্থান করিয়া দেয়, কেই বা ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা বন্ধ করিতে প্রয়াস পায়। কুলীদের প্রাণের মূল্যই বা কি আর তাহার প্রয়োজনীয়তাই বা কতটুকু?

পাঁচ বৎসরের শিশু যমুনার আর আপনার জন কেহই রহিল না। আগে তারা এই বাড়ীর পাশে কুঁড়েতে থাকিত, এখন হইতে সে এই পরিবারের এক জন হইয়া গেল। দুঃখে, অযত্নে সে আজ এত বড়টী হইয়াছে, কিন্তু এখনও ঠিক জানে তার বাবা আসিবে, তাই বিবাহ না করিয়া বসিয়া আছে। খাদীর ঘরে গেলে রঘুবর আসিয়া যদি খুঁজিয়া না পায়। এসব খবর আমি খাজাঞ্জী সুরেন বাবুর নিকট হইতে সংগ্রহ করিলাম। কিন্তু যমুনাকে বলি নাই; সে নিয়মিত ভাবে নূতন লোক আসিলেই তাহার কাছে রঘুবরের খবর জানিতে চায় আর নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলে "বাবুরা নেহিন আয়গা ত চিঠ্ঠী ভেঁওত নেই কাঁহে?"

(৯)

আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম যে যমুনা আমার কাছে কাছে থাকে এটা অনেকের পছন্দ নয়। কারণ এই চড়া বাজারে শুধু ভাত কাপড়ে যদি দাসী পাকে তবে সেটা অন্যায় অবিচার, তাই অনেকেই করুণা-পরবশ হইয়া তাহার চোখ খুলিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু যমুনা যাইতে রাজী হয় নাই। সে এই বাড়ীর দাসী এবং আজীবন ইহারই গৃহস্বামীর সেবা করিয়া সে বাপের অপেক্ষা করিবে। কিন্তু তবু এটাও বলি যে পাঁচজনের চোখে কলিকালে এমন ভাবটা বড়ই বিসদৃশ ঠেকে।

সেদিন বেলা সাড়ে এগারটার সময় সকালবেলার কাজ সারিয়া বাসায় ফিরিয়া দেখি রান্নার কোন বন্দোবস্ত নাই, যমুনাও নিরুদ্দিষ্ট। মেজাজ একেবারে তারার শেষ গ্রামে চড়িয়া বসিল। তখন গরমও বেশ পড়িয়াছে, তাই কর্মশ্রান্ত মনটা একেবারে কাঁদিয়া তাতিয়া উঠিল। যমুনা বলিয়া গোটা দুই হাঁক দিয়া লাফাইয়া তার ঘরের দিকে গিয়াই থামিয়া গেলাম, সম্মুখেই যমুনা অসাড় হইয়া মাটিতে পড়িয়া আছে। তাহার সেই বিবর্ণ মুখ ও নিস্পন্দ দেহ দেখিয়া প্রথমেই মনে হইল যমুনাকে কেহ খুন করিয়াছে, আর সেই সঙ্গে আমার বিছুরের খুব কষ্ট সঞ্চিত, পাপ অর্জ্জিত টাকা গুলিও বোধ হয় পলায়ন করিয়াছে। ছুটিয়া ঘরে গেলাম, না তালা ঠিক আছে, জিনিষপত্র কিছুই খোয়া যায় নাই, শুধু যমুনাই আমার সংসারের কক্ষচ্যুত তারকার মত ছুটিয়া পড়িয়া আছে।

বহু শুশ্রূষার পর জ্ঞান হইলে তাহার অসুস্থতার কারণ শুনিলাম। এতদিন অন্য চেষ্টার পর প্রতিবেশী তারকবাবু আজ তাঁহার শক্তিশেল প্রয়োগ করিয়াছেন। যমুনা যদি তাঁহাদের বাড়ী না যায়

তবে আমার এখানেও থাকিতে না থাকে সেই চেষ্টায় তার বাপের নিরুদ্দেশের মিথ্যা খবর বলিয়া দিয়াছে। তেইশ বৎসরে আজ তাহার পিতৃবিয়োগ হইল—রমণী কাঁদিয়া অস্থির হইল—আর তার অপেক্ষা অস্থির হইলাম স্বয়ং আমি! বেলা একটার আগে আবার আফিসে হাজির দিতে হইবে। এখন যদি যমুনা নূতন করিয়া পিতৃশোকের বান বহাইয়া দেয় তবে ম্যানেজার আমার অদৃষ্টে নাই।

তাড়াতাড়ি তাকে একটু জল খাইতে দিয়া—ইচ্ছা করিয়া জোরে জোরে ষ্টেসনস্থকীয় ব্যক্তিবিশেষের আদ্ধা দিয়া যমুনাকে জানাইয়া দিলাম—তাহার বাপের মৃত্যু সংবাদ সর্ব্বৈব মিথ্যা। প্রমাণ চাহে ত আমি মাষ্টার সাহেবের হস্তধৃতী পত্র আনাইয়া দিব। সে উঠিয়া বসুক—আমি দেখিয়া নিতেছি কোন—আবার অমন কথা বলিতে সাহস পায়! প্রথমটা সে আমার কথা বিশ্বাস করিতেই চাহে না—কিন্তু সবারই ত একটা দুর্ব্বলতা আছে। বহুদিনের আশা ভাঙ্গিয়া গেলেও সে সহসা সেটা ছাড়িয়া দিতে চাহে না। সে ইচ্ছা করিয়াই আমার কথা বিশ্বাস করিল—উঠিয়া বসিল। আমারও ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। মাঝে মাঝে মনের মধ্যে একটা খোঁচা অনুভব করিতেছিলাম—কিন্তু 'মে ক্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্' এর নাজির দিয়া মনকে ঠাণ্ডা করিয়া দিলাম—নহিলে আমার এমন বাসাটি চলিয়া যাইবে!

লেখালিখি করিতে করিতে প্রায় দুই মাস কাটিয়া গেল। তাহার পর উপযুক্ত সন্ধান লইয়া পুলিসসাহেব জানাইলেন "খনির খাতা পত্র হইতে যাহা জানা যায় তাহাতে রঘুবর কুণ্ডী যে মারা গিয়াছে তাহা প্রমাণিত হয় না। এরূপ অবস্থায় তাহার জীবিত থাকাই সম্ভব।" এইরূপে কাগজে কলমে মৃত্যুর পরেও তেইশ বৎসর রঘুবর বাঁচিয়া রহিল। যমুনাও আর ক্রাঁদে না। যদি কেহ বলে যে তাহার বাপ মরিয়া গিয়াছে অমনই তাহাকে ধরিয়া আমার কাছে লইয়া আসে। পুলিশসাহেবের চিঠি-খানা আমাকে পড়িয়া শুনাইতে হয়। তখন যমুনা বলে—

"এই দেখ সরকার বলেছে বাবুরা বেঁচে আছে—আর তুমি বলছ সে মরে গেছে। দাও তোমার প্রমাণ কি আছে বার করে—নয়ত এখুনি পুলিশে ধরিয়ে দেব।" আমি রাগে পড়িয়া লোকটাকে উঠাইয়া দেই। এখন আর কেহ রঘুবরের মৃত্যুর খবর তাহাকে শুনাইতে আসে না। যমুনা আবার নূতন লোকের কাছে বাপের খোঁজ লইতে আরম্ভ করিয়াছে।

* * * *

সে দিন পত্রখানি শেষ করিয়া খামে ভরিব এমন সময় যমুনা আমার চা লইয়া আসিল। লেখা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বাবু ওটা কি?" আমার মাথায় কি খেয়াল হইল—বলিয়া ফেলিলাম "তোমার বাপের খবর কাগজে পাঠাইয়া দিতেছি খোঁজ হইবে।" চা রাখিয়া কুলী-দুহিতা দুই হাতে আমার পা জড়াইয়া ধরিল। ঝরঝর করিয়া চোখের জলে পা ভিজাইয়া দিয়া বলিল "বাবু তুমিই আমার মা বাপ। আমার বাবুদাকে আনিয়া দাও ভগবান তোমা (তোমার) ভালো করিবেন।" লজ্জায় ঘৃণায় আমার মরিতে ইচ্ছা করিতেছিল। একটা কোমল, স্নেহশীল হৃদয় লইয়া একি নিষ্ঠুর খেলা করিতেছি! কিন্তু উপায় কি? যা দিন পড়িয়াছে তাহাতে যমুনা চলিয়া গেলে পঁচিশ টাকায় আমার মাস চলিবে না।

ডাকমুন্সীর দুঃখ

(সত্য ঘটনা)

(শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়)

অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় বেড়াইতে বাহির হইয়া দেখি—আমাদের গ্রামা ডাকঘরের বিধাতাপুরুষ নৃপতিনাথ বাবু মান্ধাতার আমলের ঘরলা কোটটি গায়ে দিয়া দুই বগলে ছত্রিশ্রাব্য চট জোড়াটার ভিতর হইতে পদপল্লবের সাড়ে বারআনা বাহির করিয়া, তাঁহার অন্ধকার কোটর হইতে বায়ুসেবনে বহির্গত হইয়াছেন। পাঁচটা হইতে দুইটা পর্য্যন্ত একঘণ্টা তাঁহার ছুটি; ইতিমধ্যে তাঁহার অধীনস্থ ব্রাঞ্চ আফিসগুলি হইতে ডাক আসিলে পুনর্ব্বার তিনি কোটরে প্রবেশপূর্ব্বক দেড়জন ব্রাঞ্চ আফিসের ডাকের ব্যবস্থা করিতে বসিবেন। রাত্রি সাড়ে সাতটায় তাঁহাকে বহির্জগতের ডাক ছাড়িতে হইবে।

আমি বলিলাম, "চলুন মাষ্টারমশায়, পুকুরের বাঁধাঘাটে বসিয়া একটু গল্প-গুজোব করি; এখন ত আপনার ঘণ্টাখানেক অবসর আছে।"

'রিজার্ভ ট্যাঙ্কে'র বাঁধাঘাটে দুইজনে পাশাপাশি বসিয়া গল্প আরম্ভ করিলাম; কিন্তু গল্প তেমন জমিল না। নৃপতিবাবুকে অত্যন্ত বিষণ্ণ ও অন্যমনস্ক বোধ হইল। আমি বলিলাম "আপনাকে এত বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন?—তহবিল মিল করিতে পারেন নাই বুঝি?"

নৃপতিবাবু ম্লান হাসিয়া বলিলেন, "চুলোয় যাক তহবিল। আর বছর দুই কোন রকমে কাটাইতে পারিলে 'পেন্সন' লইয়া ঘরের ছেলে ঘরে গিয়া বাঁচি। এ ঝক্‌মারি আর সহ্য হয় না।"

আমি বলিলাম, "এত বৈরাগ্যের কারণ কি শুনিতে পাইনা? এই ত 'টাইম ফেলে' আপনাদের বেতন আশার অতিরিক্ত বাড়িয়া গিয়াছে। কর্ত্তারা এক আনা মনিঅর্ডার কমিশন উঠাইয়া দিয়া, বুক-পোষ্টের মাশুল দ্বিগুণ করিয়া পার্শ্বেলের মাশুল অপেক্ষাও বাড়াইয়া দিয়া, দুই পয়সার চিঠিতে তিন পয়সা মাশুল বসাইয়া, ভি, পি. পার্শ্বেলে দুই আনা রেজেষ্ট্রী ফি 'কম্‌পল্‌সারি' করিয়াও এক মুরগী তিনবার জবাই করিলেন; আমাদের ঘাড়ে এই সকল দুঃসহ ট্যাক্স বসাইয়া ডাকঘরের পঞ্চাশ টাকার কেরাণীর বেতন একশত টাকা করিয়া দিলেন। ঝক্‌মারি ত আমাদের; আপনাদের ঝক্‌মারি মনে হইবার কোন কারণ দেখিনা। তবে এত বিরসবদন কেন?"

পোষ্টমাষ্টার বলিলেন, "সে কথা পরে বলিতেছি,—কিন্তু এক মুরগী তিনবার জবাই কিরূপে হইল, তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না!"

আমি বলিলাম, "জানিয়া শুনিয়া ফাঁকা সাজিলেন, আচ্ছা, বুঝাইয়া দিতেছি। পূর্ব্বে যখন ভি. পি ডাকে কোন কেতাব পাঠাইতে 'রেজেষ্ট্রী' না করিলেও চলিত, তখন ষোল-তোলা ওজনের একখানি পুস্তক ভি. পি. ডাকে কোন গ্রাহকের নিকট পাঠাইতে পুস্তকের মূল্য ছয় আনা হইলে একখানা ডাকমাশুল ও একখানা মনিঅর্ডার (মূল্য ছয় আনা পাঠাইবার) কমিশন, মোট দুই আনার টিকিট দিলেই চলিত। এখন ভি. পি.তে পুস্তক পাঠাইতে 'রেজেষ্ট্রী' করিতেই হইবে; সুতরাং রেজেষ্ট্রী খরচা দুই আনা দেওয়াই চাই, মুরগী এইরূপে একবার জবাই হইল; তাহার পর উক্ত ষোল তোলা পুস্তকের ডাকমাশুল এক আনা স্থলে এখন দুই আনা

দিতে হইতেছে ; সুতরাং বুকপোষ্ট দ্বিতীয় বার জবাই হইল। তাহার পর সেই বুকপোষ্ট তৃতীয়বার জবাই করিবার উদ্দেশ্যে গ্রাহকের নিকট (উক্ত ছয় আনা মূল্য গ্রেরককে পাঠাইবার জন্য) দুই আনা 'রিমাইণ্ডার কমিশন' আদায় করা হইতেছে। অর্থাৎ যে পুস্তক পূর্ব্বে ভিপি ডাকে দুই আনা ডাকমাশুলেই গ্রাহকের হস্তগত হইত, এখন তাহার জন্য ছয় আনা ট্যাক্স লাগিতেছে। এই হতভাগা দেশের ভাগ্যবান্ প্রজা-বৎসল গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন, কলমের এক আঁচড়ে ডাকে পুস্তক পাঠাইবার ব্যয় তিনগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছে, এরূপ গবর্ণমেণ্ট বোধ হয় পৃথিবীর কোন দেশে নাই ! ডাকবিভাগের কর্ত্তাদের কি চমৎকার মাথা, রেজেষ্ট্রী পার্শ্বেলের ব্যয় অপেক্ষা বুকপোষ্টের মাশুল অধিক ধার্য্য করিয়াছেন ! আমার একজোড়া জুতা ভি. পি পার্শ্বেলে আনাইতে এগার আনা ডাকমাশুল লাগিয়াছে, কিন্তু সেই ওজনের পুস্তক ভি পি ডাকে আনাইতে চৌদ্দ আনা মাশুল লাগিয়াছে। এইরূপ ব্যবসাদারী বুদ্ধি-মাহাত্ম্যে আপনাদের বেতন ডবল হইয়া গেল, আর আপনি বলেন চাকরী করা ঝক্‌মারি !"

নৃপতিবাবু পকেট হইতে একটি বিড়ি বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ পূর্ব্বক দুই একবার খুব উৎসাহ করিয়া বলিলেন, "সাধে কি চাকরী ঝক্‌মারি মনে করিতেছি ! সাড়ে বাইশ বৎসর চাকরী করিলাম আসামের কাছাড় হইতে চাটগাঁ পর্য্যন্ত কোথায় না ঘুরিয়াছি !' কোথায় ঘর সংসার, কোথায় পুত্রকন্যা পরিবার !—'ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে—স্মরণং গোমতী তীরে'—আমাদের অবস্থাও সেইরূপ। চব্বিশ ঘণ্টার চাকরী, রবিবারেও বিশ্রাম নাই। ডাকের কাজ ত আছেই, তার উপর ওয়ার লোন হইতে কুইনাইন পর্য্যন্ত নানান জিনিস বিক্রয় করিয়া দোকানদারীর চূড়ান্ত করিতে হয়, 'সেভিংস ব্যাঙ্কে'র মুহুরীগিরিটা ত 'বোঝার উপর শাকের আঁটি,' কোন্‌দিন চা চিনি গাঁজা আফিং বিক্রয়ের হুকুম বাহির না হইলে বাঁচি ! ভগবান একমুঠা ভাত ছড়াইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন 'যা, খুঁটে খাগে।' দেশ বিদেশে তাহাই খুঁটিয়া খাইতে সাড়ে বাইশ বৎসর কাটিয়া গেল। মনে করিয়াছিলাম—অবসর লইবার আগের দিন কতক বাড়ীর কাছে—নিজের জেলার কোন রেলষ্টেশনের কাছে বদলী হইব। ছেলেরা 'নন্‌কোপারেশন' করিয়া পড়াশুনা ছাড়িয়া দেশের জন্য ভিক্ষার ঝুলি ঘাড়ে লইয়াছে ; ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতেছে ; ব্রাহ্মণী রোগে ভুগিতেছেন ; মেয়াদের অভাবে ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। বাড়ীর কাছাকাছি কোথাও বদলী হইতে পারিলে মধ্যে মধ্যে বাড়ীঘরের তত্ত্বতল্লাস লইতে পারিতাম ; কিন্তু চেষ্টাচরিত্র করিয়া কোন ফল হইল না। অথচ বর্দ্ধমান জেলায় আমার বাড়ীর পাঁচশাত ক্রোশ তফাতের একটি ডাকঘরে মেদিনীপুর হইতে বদলী করিয়া লোক আনা হইল ; যেখানে তাহার যাইবার ইচ্ছা ছিল না, বদলীতে তাহার কোন সুবিধাও হয় নাই ; তাহাকে সেখানে না পাঠাইয়া আমাকে পাঠাইলে আমার বড় উপকার হইত, কিন্তু সাড়ে বাইশ বৎসর চাকরী করিয়াও এতটুকু অনুগ্রহ পাইলাম না ! সাধে ঝক্‌মারি বলিতেছি ?"

আমি বলিলাম, "অনুগ্রহ কি সহজে পাওয়া যায় ? কর্ত্তাদের শ্রীচরণ রীতিমত তৈলাক্ত করিতে পারিলে কার্য্যফল লাভ হয়। বিনা তদবিরে দেবতা প্রসন্ন হন না, আর জ্যান্ত দেবতা উপর ওয়ালারা 'আই হ্যাভ নো অনার' প্রভৃতি বাঁধি বোলে বরদান করিবেন ? কখন না ; 'এ সব দেবতা নহে তেমন' !"

নৃপতিবাবু বলিলেন, "যাহাদের অদৃষ্ট প্রসন্ন—অর্থাৎ উপরওয়ালারা প্রসন্ন, তাহারা চিরদিন দেশের মধ্যে সুবিধামত জায়গায় থাকিতে পায়। আমি চাকরীর অধিকাংশ কাল আসামের জঙ্গলে জঙ্গলে বাঘ ভালুকের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ ও চাকরী

বাঁচাইয়া, দাঁত পড়িলে ও চুল পাকিলে যদি বা বাঙ্গালাদেশে আসিতে পার—কিন্তু বহুদূরবর্ত্তী পর জেলা হইতে আর অব্যাহতি নাই।"

আমি বলিলাম, "বদলীর চেষ্টায় কাহারও তদ্বির করিয়াছিলেন?"

নৃপতিবাবু বলিলেন, "কসুর করি নাই ভাই, কিন্তু সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইয়াছে। যাহাকে ধরিয়াছিলাম—তিনি আমাদের ডিপার্টমেণ্টের কৃষ্ণ বিষ্ণুদের মধ্যে একজন; তিনি কলমের এক খোঁচা দিলেই আমি ডিগ্‌বাজী খাইয়া তিনটা জেলা ডিঙ্গাইয়া নিজের জেলায় গিয়া পড়িতে পারিতাম; কিন্তু কলমের সেই খোঁচাটি আমার ভাগ্যে ঘটিল না; অথচ একদিন আমিই তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলাম।"

নৃপতিবাবুর কথা শুনিয়া আমার কৌতূহল বর্দ্ধিত হইল, আমি বলিলাম, "বটে? সে কিরূপ ব্যাপার?"

নৃপতি বাবু বলিলেন, "সে অনেক দিনের কথা, আমি তখন ডাকঘরের কেরাণী হইয়া আসামে গিয়াছি। আসামের একটি বড় ডাকঘরের কেরাণী হইলাম। সে কোন্ স্থান, সে কথা নাই বলিলাম। স্থানটি পাহাড়ে বটে। যিনি তখন সেখানকার পোষ্টমাষ্টার তিনি আমাদেরই জেলার লোক, তাহার উপর ব্রাহ্মণ। আমার বয়স তখন ছাব্বিশ সাতাশ বৎসর, অটুট স্বাস্থ্য, দেহে শক্তি সামর্থ্যও যথেষ্ট ছিল। পোষ্টমাষ্টার বাবু আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, ঘরের ছেলের মতই দেখিতেন; ব্রাহ্মণীও আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

কিছু দিন যায়, পোষ্টমাষ্টার বাবুর পুত্র শরৎবাবু (এটা কল্পিত নাম) নব্য যুবা, খুব ধারালো ছেলে, সেইবার এম, এ, পরীক্ষা দিয়া গ্রীষ্মাবকাশে বাপের কাছে গিয়াছিলেন। একদিন (সেদিন মহরম) শরৎবাবু আহারাদির পর ডাকঘরসংলগ্ন বাসার একটি কুঠরীতে শুইয়া একখানি কেতাব লইয়া পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িলেন, অপরাহ্ণেও তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই, হঠাৎ কামান নির্ঘোষের মত শব্দ! তাহার পর হুড়হুড় করিয়া পাহাড় কাঁপিয়া উঠিল; সঙ্গে ঘর বাড়ী সমস্তই দুলিতে লাগিল। ঝড়ের সময় পদ্মা নদীতে নৌকার যেরূপ অবস্থা হয়—ঘর বাড়ীগুলির অবস্থাও সেইরূপ হইল! ডাকঘরের কেরাণীরা 'ভূমিকম্প' 'ভূমিকম্প' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে প্রাণ লইয়া ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া খোলা হাতায় আসিয়া দাঁড়াইল। পোষ্টমাষ্টার বাবুও সস্ত্রীক তাড়াতাড়ি বাহিরে পলাইয়া আসিলেন। কম্পের বেগ তখনও প্রবল, আশেপাশে চারিদিকেই ঘরগুলা হুমদাম্ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, ধূলায় চারিদিক অন্ধকার হইয়া গিয়াছে; আহত ভীত নরনারীর শ্রবণভেদী আর্ত্তনাদে কর্ণ বধির হইতেছে; ডাকঘরটি তখন ঝড়ে কলা গাছের মত হেলিতেছে,—এই ভাঙ্গিয়া পড়ে আর কি! স্থানে স্থানে মাটী ফাটিয়া চৌচির হইতেছে, ফাটল দিয়া বগ্‌বগ্ করিয়া গরম জল, কাদা উঠিতেছে; পায়ের নীচে মাটী যেন বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাইতেছে। যেন প্রলয় কাল উপস্থিত!

সহসা পোষ্টমাষ্টার বাবুর ব্রাহ্মণী আর্ত্তনাদ করিয়া বলিলেন, "আমার শরৎ! শরৎ কোথায়? তাহাকে ত দেখিতেছি না!"

পোষ্টমাষ্টার বলিলেন, "তাই ত; সে যে খাওয়া দাওয়ার পর ঘরে শুইয়াছিল; বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কিছুই জানিতে পারে নাই। সর্ব্বনাশ হইল, হা ভগবান্, হা ভগবান্, ছেলেটা এখনই ঘরচাপা পড়িয়া মারা যাইবে! কি করি?" ব্রাহ্মণ শিশুবৎ হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী পাগলিনীর মত হইয়া বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে বলিলেন, "ওগো, তোমরা আমার শরৎকে আনিয়া দাও! তাহাকে বাঁচাও, হায়, হায়, আমার কি সর্ব্বনাশ হইল!"

কিন্তু কেহই তাঁহার অনুরোধ রক্ষার জন্য নিজের

জীবন বিপন্ন করিয়া সেই মৃত্যুগহ্বরে প্রবেশ করিতে সাহসী হইল না ; সকলেই অসহায় ভাবে শূন্য দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর সেই হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আমার মনে থাকিবে। আমি তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া ডাকঘর লক্ষ্য করিয়া দৌড়াইলাম, কিন্তু দৌড়াইতে গিয়া প্রতি পদক্ষেপে আছাড় খাইতে লাগিলাম! মহা ঝঞ্ঝার সময় জাহাজের উপর দিয়া চলিতে গিয়া আরোহীদের অবস্থা যেরূপ হয়, আমারও তখন সেইরূপ অবস্থা! আমি পুনঃ পুনঃ আছাড় খাইতে খাইতে ডাক ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম; টেবিল, চেয়ার, আলমারি, র‍্যাক্ সমস্ত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে; তাহাদের ভিতর দিয়া কোন রকমে পথ করিয়া শরৎ বাবুর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম; তিনি তখনও নিদ্রাভিভূত। শয্যায় চিৎ হইয়া শুইয়া আছেন, বুকের উপর একখানি ইংরাজী কেতাব। এই প্রলয় কাণ্ডের কোন বার্ত্তাই তিনি তখন পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই। তিন চারি মিনিটের মধ্যে এই তুমুল কাণ্ড, তাঁহারই বা দোষ কি?

তখন আর ইতস্ততঃ করিবার সময় ছিল না, দেখিতে দেখিতে ঘরের এক অংশ হুড়মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল! বলিয়াছি আমার শরীরে তখন অসাধারণ বল। আমি শরৎ বাবুকে টানিয়া তুলিয়া কাঁধে ফেলিলাম এবং ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া বিভিন্ন দার পার হইয়া অতি কষ্টে বাহিরে আসিলাম। ডাকঘরের বাহিরে পা দিয়াছি আর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র অট্টালিকাটি ভূমিসাৎ হইল! একখানি ইঁট ছুটিয়া আসিয়া শরৎ বাবুর কপালে লাগিয়া রক্তপাত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনরক্ষা হইল। মায়ের অঞ্চলের নিধিকে মায়ের কোলের কাছে বাঁধাইয়া দিয়া আমি অবসন্ন দেহে ঘুরিয়া পড়িলাম। কয়েক মিনিট পরে সমগ্র নগরটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়া কম্পিতা মেদিনী স্থির হইলেন, কিন্তু সেদিন সমস্ত রাত্রি ভূমিকম্পের জের চলিল! পোষ্টমাষ্টার বাবু ও তাঁহার স্ত্রী, পুত্রের জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, আমার চেষ্টায় তাঁহাদের পুত্রের প্রাণরক্ষা হইল দেখিয়া তাঁহারা প্রাণ খুলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; শরৎ বাবু মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিলেও তাঁহার চক্ষু দুটি যে ভাষা ব্যক্ত করিল, ভাষার সাধ্য নাই তাহা প্রকাশ করে। ভগবান যে আমাকে তাঁহার জীবন রক্ষার উপলক্ষ্য করিয়াছিলেন, এজন্য আমার কিরূপ আনন্দ হইল, কতদূর আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিলাম, অন্যের তাহা বুঝিবার শক্তি নাই।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নৃপতিবাবুর সাহস ও আত্মজীবন তুচ্ছ করিয়া পরোপকারের কাহিনী শ্রবণ করিতেছিলাম; তিনি নীরব হইলে আমার চমক ভাঙ্গিল, আমি বলিলাম, "মাষ্টার মশায়, এযে রীতিমত উপন্যাস! যাহা হউক, সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিতেছে, আপনার ডাক ছাড়িবার সময় হইল; তাহার পর কি হইল বলিয়া যান, নতুবা রস ভঙ্গ হইবে।"

নৃপতি বাবু বলিলেন, "বুড়া পোষ্ট মাষ্টার অনেক দিন মারা গিয়াছেন; কিন্তু ব্রাহ্মণী জীবিত আছেন। শরৎ বাবু এম, এ পাশ করিয়া ডাক বিভাগেই প্রবেশ করিয়াছেন; প্রথমে তিনি সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট হইয়াছিলেন, এখন তিনি বড় সাহেবের আফিসের সর্ব্বেসর্ব্বা বলিলেই হয়। আমাদের উপরওয়ালা।

"এই পৌষ্ট মাষ্টারী চাকরী করিতে করিতে অনেকবার এমন অনেক কাণ্ড ঘটিয়াছে, যখন শরৎ বাবুর সাহায্য প্রার্থনা আবশ্যক মনে হইয়াছিল; কিন্তু আমি কোনদিন কোনরূপ সাহায্য প্রার্থনায় তাঁহার দ্বারস্থ হই নাই। কিন্তু এবার এখান হইতে বদলী হইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও যখন কৃতকার্য্যহইতে পারিলাম না, তখন শরৎ বাবুর সাহায্য গ্রহণের জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইল। ভাবিলাম

তাঁহার নিকট ভাল চাকরীর বা প্রমোশনের জন্য ত দরবার করিব না, কেবল একটু ভাল যায়গায় বদলীর প্রার্থনা; তিনি যদি সত্যই আমার নিকট বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞ থাকেন তাহা হইলে আমার প্রার্থনা শ্রবণমাত্র আমায় সুবিধামত স্থানে বদলীর ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। ইহা তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নহে; আর যদি পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল বাহাদুরের আদেশ ভিন্ন এরূপ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব কি অনধিকার চর্চ্চা হয় তাহা হইলে জীবন রক্ষার জন্য তিনি আমার নিকট কতদূর কৃতজ্ঞ, এবং আমার এই উপকারটুকু করিতে পারিলে তিনি কতদূর সুখী হইবেন এ কথা ঘুণাক্ষরেও যদি তিনি পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের গোচর করেন, তাহা হইলে পোষ্টমাষ্টার জেনারেল আনন্দের সহিত আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন,—এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। কারণ ইহাতে কেহই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না, অথচ আমি উপকৃত হইব। মানুষে ইহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না।

মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া আমি শরৎ বাবুর মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, এবং তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া আমার মনের কথা তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি বলিলেন, "বাবা, এ অতি সামান্য উপকার, শরৎ আমার বড় ভাল ছেলে তুমি তাহার জীবনরক্ষা করিয়াছিলে, এ কথা কি সে ভুলিতে পারে! সে নিশ্চয়ই তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবে; আর আমিও তাহাকে তোমার এই উপকারটুকু করিতে বলিব, তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই সুযোগটুকু সে নিশ্চয়ই ত্যাগ করিবে না।—তাঁহার কথায় আশ্বস্ত হইয়া আমি আফিসে শরৎ বাবুর সহিত দেখা করিতে চলিলাম। কেহ কেহ আমাকে ভয় দেখাইয়া বলিল, "শরৎ বাবু বড় সাহেবী মেজাজের লোক; তুমি সামান্য পোষ্টমাষ্টার, তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করিবেন কিনা সন্দেহ, আর যদি দেখা করেনও তাহা হইলে তোমার দরখাস্ত শুনিলেই চটিয়া যাইবেন, হিতে বিপরীত হইবে। ইহা শুনিয়া আমি ভীত হওয়া দূরের কথা—একটু আমোদই বোধ করিলাম। ইহারা জানে না শরৎ বাবু আমার নিকট কতদূর কৃতজ্ঞ যে একদিন তাঁহার জীবন দিয়াছে - তাহার একটা অকিঞ্চিৎকর প্রার্থনা তিনি অগ্রাহ্য করিবেন, মানুষে কি তাহা পারে? নিতান্ত নরাধমেও বোধ হয় পারে না।

শরৎ বাবু ঘরা করিয়া দেখা করিলেন। তিনি প্রথমে আমাকে চিনিতে পারিলেন না; চিনিতে না পারিবারই কথা। সেই ছাব্বিশ বৎসর বয়সের আমি, আর এই বাহান্ন বৎসর বয়সের পলিতকেশ পক্ক-কেশ, চাকরীর চক্র পেষণে নিষ্পেষিত কঙ্কালসার আমি,—একই ব্যক্তি, এতকাল পরে আমাকে দেখিয়া কে তাহা বিশ্বাস করিবে? যাহা হউক, আমি অগ্রে পরিচয় দিলাম, এবং তাঁহার পিতার অধীনে আসামে ভূমিকম্পের সময় কেরাণীগিরি করিয়াছিলাম —তাহা বলিলাম। আর অধিক কথা বলা সঙ্গত বা আবশ্যক মনে করিলাম না শরৎ বাবু এত বড় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, এক সময় এই চৌদ্দ, কুড়ি টাকা মূল্যের কেরাণী দ্বারা উপকৃত হইয়াছিলেন মনে করিয়া বোধ হয় একটু অসচ্ছন্দতা অনুভব করিলেন আমি তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া interview তাড়াতাড়ি শেষ করাই কর্ত্তব্য মনে করিলাম; তিনি সংক্ষেপে বলিলেন, আমি যেন দরখাস্ত দিই, কিন্তু কতদূর কি হইবে, তাহা তিনি বলিতে পারেন না!

হরি, হরি, মানুষের কৃতজ্ঞতার মূল্য এই! দুঃখে কষ্টে অভিমানে আমার মাথা মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল। আমি এখানে চলিয়া আসিলাম; কিন্তু 'আশা বলবতী রাজন্, শল্য ক্ষেতি পাওবান্!' আশা কানে কানে বলিল, 'দরখাস্ত দিয়াই দেখ না; বড়লোকেরা মুখে অঙ্গীকার করে না বটে, কিন্তু কার্য্যোদ্ধারে বাধা হয় না।'—দুই একজন হিতৈষী বন্ধুর পরামর্শে দরখাস্ত দিলাম এবং আমার কোন আশা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া, যথাসাধ্য বিনয় প্রকাশ করিয়া শরৎ বাবুকে পত্র লিখিলাম—

একদিন যাঁহার জীবনরক্ষা করিয়াছিলাম তিনি কি দু' ছত্র পত্র লিখিয়া আমার ব্যাকুলতা নিবৃত্ত করিতে কুণ্ঠিত হইবেন ?—ক্রমে ৪ই পত্র লিখিলাম, কিন্তু 'কা কস্য পরিবেদনা।'—একটি বন্ধু বলিলেন, 'তুমি সামান্য পোষ্টমাষ্টার,—আর তিনি সার্দ্ধিশ শৈলের উচ্চ চূড়ায় উপবিষ্ট ; তাঁহাকে চিঠি লিখিয়া বিরক্ত করিয়াছ, শেষে ওতার চোটে অস্থির না হও।' কথা মিথ্যা নহে।

আমি বলিলাম, "হাজার বৎসরের পরস্কারের ভিতর দিয়া যাহারা মানুষ হইয়াছে, তাহাদের সহিত স্বাধীন, স্বাবলম্বী, নির্ভিক জাতির তুলনা ? যে নিরাশ্রয় দরিদ্র যুবককে প্রতিপালন করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় পরে ডেপুটী করিয়া দিয়াছিলেন, সেই ডেপুটীর নিকট বিদ্যাসাগর মহাশয়ই একটি অনুপযুক্ত যুবককে পাঠাইয়া একটি মুহুরগিরি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিলে, ডেপুটী পুলব হাসিয়া বলিয়াছিল, 'পরের জন্য উমেদারী করা বুড়ো বয়সে বিদ্যাসাগরের পেশা হয়েছে ! না হে বাপু, এখানে কিছু হবে টবে না।' শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে ইহাই কৃতজ্ঞতার আদর্শ ! আক্ষেপ বৃথা।"

অ-মানুষ

(শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি. এ)

ওগো, আমার হাত ধোরো না, ওগো, তুমি যে হও সরো !
আমার মুখে কেউ চেয়ো না মিছা কেন এ ভুল করো ?
চক্ষে দেখ'—কিসের নেশা ?
সে-রস ত' নয় আঙুর পেষা !
পূজার প্রসাদ আমার লাগি মিথ্যা কেন থালায় ধরো ?
ওগো, আমার হাত ধরো না, প্রেমিক তুমি সরো সরো !

আমার লাগি' কাঁদ্‌ছে বসে' অকূল কালো অন্ধকারে
সব-হারাণো পথের শেষে অন্ধ আকুল হাহাকারে
ঘোম্‌টা-পরা মিথ্যাময়ী,
সেই যে আমার সর্ব্বজয়ী !—
স্তনম-কালে কখন সে যে জড়িয়েছিল কণ্ঠহারে,
একটি চুমায় বন্ধ ক'রে রাখ্‌ল প্রাণের নিশাসটারে !

মিথ্যা কেন গন্ধ-প্রদীপ জ্বালো মিলন-শয়ন-ঘরে,
শুকরিলে বৃথাই তোমার সোহাগ-গাথা কাণের 'পরে,
ভেবেছিলাম হয় ত' এবার
বুঝ্‌ব দরদ প্রেমের সেবার,
কাচের মতন নয়ন-তারায় এবার বুঝি পলক পড়ে।
মিথ্যা আশা !—চাঁদের কিরণ ঠিক্‌রে সেথায় আগুন ঝরে !

আমি তোমের কেউই নই, দেহের আমার নেই যে ছায়া,
আমি যাহার আপন—তারো নেই যে আমার মতন কায়া,
নদীর ধারে ভাঙ্গন বেথায়
ঘরখানি মোর বাঁধ্‌ব সেথায়,
শ্মশান-স্বপন-বিভীষিকায় করবে আদর সে মোর ভায়া !
জনম-জনম এম্‌নি কাটে, ঘুচ্‌ল না ত' ছায়ার মায়া !

আগুনের ঝড়

(কথা নাট্য)

(শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত)

প্রথম দৃশ্য।

(লোকনাথের বাড়ীর অন্তঃপুরের কক্ষ। ঘরের ভিতরে সাধারণ গৃহস্থের গৃহিণীপণা আছে। একদিকের কোণে একটী সিন্দুক, তাহার উপর আলিপনা দেওয়া লক্ষ্মীর চরণ পদ্ম আঁকা। পার্শ্বে কাপড় রাখিবার আল্‌না। ঠিক তাহারই পার্শ্বে একটা মৃন্ময়ী লক্ষ্মীর হাঁড়ি, ছোট আর একখানি আলিপনা-দেওয়া-চৌকীর উপর বসান। ঠিক তাহারই মাথার উপরে দেয়ালে একখানি রাধাকৃষ্ণের পট। চিত্রের চরণরেখার কাছের উপর চন্দন ও তুলসী পত্রের তিনটী করিয়া পাতা সাজান। একধারে একটী ছোট আলমারী, অন্য পাশে একখানা খাট, তাহাতে বিছানা আছে বলিয়া বোধ হইল। খাটখানির কারুকার্য্য খুব সুন্দর, তবে একটু দেখিলে বয়সের, আর পুরাণো বলিয়া চকচকানি কমিয়া গিয়াছে। ঘরের ভিতরে একটী সিকা ঝুলান, তাহাতে কয়েকখানি মাটীর হাঁড়ি, চিত্র-বিচিত্র করা সোঁদির হাঁড়ি। হাঁড়ির ভিতরের মিষ্টগন্ধে দুই তিনটা বোলতা তাহার আশে পাশে ঘুরিতেছে, কিন্তু প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে ভাল দেখিতে পাইতেছে না, শুধু তাহাদের পাখার শব্দ ভয়কম্পিত রবিত হইয়া উঠিতেছে। ঘরের কোণে একটী পিলসুজের উপর কাল মাটীর প্রদীপে রেড়ির তৈলের বাতি জ্বলিতেছে। ঘরে একটা বিড়াল পেটের নীচে পা দুখানা গুটাইয়া শুইয়া আছে। মেনকার মা ও মেনকা উভয়ে বসিয়া পিঠা গড়িতেছিলেন।)

মেনকার-মা। (অন্যমনস্ক ভাবে) যা তাঁর মনে আছে তাই হবে!

মেনকা। জন্ম জন্ম এস—না—

উঁহুঁ—হ্যাঁ মা সে ছড়াটা কি বল্‌তে হয় ব'ল না মা। আমি কেবলই ভুলে যাচ্ছি ওমা বল না মা, কি সে—

জন্ম জন্ম এস পৌষ যেওনা—

মেনকার-মা। আমি বাপু তোর সঙ্গে আর বক্‌র বক্‌র করতে পারি নে হ্যাঁ। দেখ্‌ত রাত কটা হোল। এত দেরী হচ্ছে কেন? আশ্বিন থেকে এত দেরী কোন দিন ত হয় না, যতে! অ, যতে! কটা বেজেছে রে?

(নেপথ্যে যতীন—'আটটা বেজে গেছে মা, বলিতে বলিতে যতীন সেইখানে আসিল)

যতীন। মা বড্ড খিদে পেয়েছে!

মেনকার-মা। আর একটু বোস্ এখুনি ভেজে দিচ্ছি, দাঁড়া বাবা, এই কখানা গড়া হলেই দোব।

মেনকা। মা, বাবা এখন এলনা, আটটা বেজে গেল।

যতীন। বাবা, যজ্ঞেশ্বর দাদার সঙ্গে নরেন-দের বাড়ী গেছে।

(মেনকা পিঠা লইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল।)

মেনকার-মা। হ্যাঁরে যতে! নরেন কি বলে, তোকে কি বললে?

যতীন। আমার মা কিন্তু কেমন কেমন ঠেকল, মুখেত—খুবই ইচ্ছে; কিন্তু দেখ মা! ও আর তেমন আগেকার মত সাদা বলে মনে হয় না।

মেনকার-মা। তোর ওই এক কেমন, তা তার একটু লজ্জা করবে না, বিয়ের কথা, হাজার হোক্, আর নরেন একটু লাজুক বেশী সব কথা কি পরিষ্কার করে বলতে পারে।

যতীন। তোমার এক কথা, আমার কাছে

লজ্জা কি? ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে খেলাধূলো করে এলাম, এতভাব—একসঙ্গে এতদিন পড়াশুনা হোল, আসা যাওয়া খাওয়া খাওয়া, কেবল ওই কথাটার বেলাই যত লজ্জা। আর সেত জানে আমাদের অবস্থা। ছেলেবেলা থেকে মেনাকে দেখে আসছে। আমি অত করে ধরলুম, তা আমাকে একটা স্পষ্ট করে বলতে পারত ত' —তা নয় কেবল গাই-গুই করছে।

মেনকার-মা। তোর ভারি কুচুটে মন।

যতীন। (হাসিয়া) ঠিক্—ঠিক্ বলেছ মা! তোমার ছেলের মন কুচুটে হবে না।

মেনকার-মা। পাজি, আমায় গাল দিলি।

যতীন। তা দেব না, তুমি যদি কুচুটে হও ত তোমার ছেলেও তাই।

মা। তোর এক কথা।

যতীন। সে তুমিই জান, লোকে ত বলে যতের মার মতন মা, কার হয় না।

মা। যা, যা, বকিস নি, তোর জ্বালায় আর পারি নে। চল্ যাবি চল্ পরম, পরম ভেজে দেব অখন, চল্।

(নেপথ্যে লোকনাথের স্বর শোনা গেল, 'যতে অ যতে' বলিয়া চাপা ভাঙ্গা গলায় ডাকিতে ডাকিতে প্রবেশ করিলেন)

লোকনাথ। (হাঁফাইতে হাঁফাইতে) এক গেলাস জল।

(যতীন তাড়াতাড়ি জল আনিতে গেল)

মেনকার-মা। হাঁগা! অমন হাঁফাচ্ছ কেন, কি অসুখ করছে?

(যতীন জল আনিয়া দিল)

লোক। (জল পান করিয়া) আঃ!···আর অন্ছ গিন্নী নরেনের বাপ জহর চায়।

মেনকার-মা। জহর কি?

লোক। হীরে, মুক্তা, জহর, বুঝলে?

মেনকার-মা। হীরে মুক্ত জহর কোথায় পাবো এই যা চেয়েছে তাই কি বলে কি করে যে হবে তার ঠিক নেই।

লোক। কেন সব শেষ করে। যতে নরেন কি বল্লে?

যতীন। সে বলে বাবার ওপর সে কোন কথাই কইতে পারে না। আর যা আমরা দেব সেত মেনারই থাকবে।

লোক। হুঁ!

মেনকার-মা। হাঁগা, তবে কি হবে? মেয়ে ত আর রাখা যায় না। আর অমন ঘর-বর, কত তপিস্তে করলে তবে হয়। দেখতে শুনতে ভালে, মানে, ধনে বিদ্যেয় সব দিক উজোল করা।

লোক। ঠিক্···বলে যাও, বলে যাও, একেবারে দেবীবর হয়ে উঠলে যে।

মেনকার-মা। তোমার সকল তাতে তামাসা।

লোক। তামাসা করব না, মেয়ের বিয়ের বর জুটেছে; তামাসা করব না কি রকম!

মেনকার-মা। হাঁগা তা কাপড়-চোপড় ছাড়।

লোক। হাঁ এইবার কাপড় ফেলেই পালাতে হবে।

মেনকার-মা। কি যে বল তার ঠিক নেই। চল্‌রে যতে···(যাইতে যাইতে) হাঁরে! নরেনের মাকে একবার আমি বলে দেখব।

লোক। সেত আর তোমার মত মেয়ে বিয়োয় নি।

মেনকার-মা। শুন্‌লি যতে! যখন তখন আমার ওই এক খোঁটা, মরলে তবে হাড়-কখানা জুড়োয়।

লোক। মরলেও জ্বালা সঙ্গে যায়, মরলেও জুড়োন নেই গিন্নী, মরলেও জুড়োয় নেই। জ্বালা সঙ্গে সঙ্গে যায়।

যতীন। চল, চল, মা! আমার খিদে পেয়েছে।

(যতীন ও মেনকার-মার প্রস্থান)

লোক। কি লোকনাথ! বাপ্ যে তোমার বড় আদর করে নাম রেখেছিল লোকনাথ, তা লোকের রকম সকমে কি রকম ঠেক্‌ছে। বলি চুপ করে কেন ভায়া, অন্তরা ভাঙছি নিজেই নিজেকে ব্যক্ত কর! না লোকের বালাই আর নিজের ভালাই, সব চাপাদিয়ে নিঃশ্বেস বন্ধ করে বোস আর কি? কেমন? ..বাড়ীখানি সেব করছ ছেলেটা পথে বসুক, তুমি বুড়ো বয়সে নানা স্থানী হও। বাপ পিতমোর আশীর্ব্বাদে, এমন পাতান সংসার, একেবারে জল-জলাট হয়ে উঠবে এখন কেমন? মন্দ কি! বেশ! মেয়ে ত নয় শাপ!

(সুরেন্দ্রের প্রবেশ)

সুরেন্দ্র। বাবা! কি এই আসছেন? কি ঠিক করলেন?

লোক। ঠিক আর কি করব বাবা, মেয়ে পার করতে ত হবে, উপায় যা তা তোমায় ত সবই বলেছি। তোমার ওপরই ভার! কথা একরকম দিয়েইছি, দেখ যেন মান রক্ষে হয়। এখন ত যা করে হোক্ পার হই।

সুরেন্দ্র। তবে আমি এখন যাই।

লোক। হাঁ এস। আমি তবে নিশ্চিন্দি রইলুম।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[রামহরি ঘোষের বৈঠকখানা, প্রকাণ্ড করাস বিছানো, ঘরের দেয়ালে সম্রাটের ছবি, মহারাণী ভিক্টোরীয়ার ছবি, হরিণের শিংশুদ্ধ মাথা দেয়ালের গায়ে লাগান। কড়িতে ষোল পাটের কারবারে গুদাম জালাইয়া যাবার টাকায় কিনেলো বড় প্রকাণ্ড ঝুঁড়ি। বাকটা চ্যাপটা, চক্ষু দুটী ঢাকিয়া ঠেলান দিয়া আলবোলায় তামাক টানিতেছেন। এক এক বার করিয়া কি চিন্তা করিতেছেন, আর একবার করিয়া তামাক টানিতেছেন। আলবোলা বড়, বড়, করিয়া মুখ দিয়া খুব ধীরে অথচ ভরপুর করিয়া ভাসিয়া উঠিতেছে। বিছানার পুরোহিত মহাশয়ের উপর তাহার উপর আজির পাতা, চারিদিকে তাকিয়া সাজান। বিলাতী ছাপা নানাপ্রকারে তৈলচিত্রের ছবি। দুইটা পঙ্খার ডেলে বিজলীর বাতির ঝাড় ঝুলিতেছে। রামহরি বড় মানুষ। মাথায় ঠিক মাঝখানে টাক, ঘিরোলো-ঘিরোলো মতিক্ষুদ্র, ভাল চক্ষুটী আবার একটু বাঁকা। রামহরি ঘোষ উপস্থিত হইলেন।]

রামহরি। প্রাতঃপ্রণাম। আজ্ঞাজ্ঞা হোক্ আসুন!

বিষ্ণু। (হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া) অনন্ত! আহা যে বড় হয়, তার গড়গড়াও ডাকে বড়, বড়, বড়।

রামহরি। হাঁ! হাঁ! বসুন, বসুন। ওরে ঠাকুর মহাশয়ের হুঁকোটা দে যানা রে। এ বেটারা ডাক পাঁড়া-পাড়ি না করলে আর আসবে না। ওরে নিধে! বেটারা কাণের মাথা খেয়েছে ওরে ঠাকুর মশায়ের হুঁকো দে যা।

(নেপথ্য হইতে নিধিরাম, 'আজ্ঞে, যা—আ— আই বসিয়া সাড়া দিল।)

বিষ্ণু। তারপর বাবাজী! আমাদের দাদা-মণির বিবাহের সব এক রকম ঠিক হোল, মা লক্ষ্মী ত এই সাগনের লগ্নেই লক্ষ্মী পিরতিমে ঘরে আনতে চান।

রামহরি। আজ্ঞে ঠিক এখন হয় নি, তবে কথা হচ্ছে, অনেক কথা।

বিষ্ণু। কথা হবে না বল কি বাবাজী বলে লোক কথা না হলে বিয়েই হয় না।

রামহরি। আজ ত' তাঁদের লোক পাঠাবার কথা, লোকনাথের কিন্তু বড় ছোট চোক, দিতে থুতে বড়ই কাতর। আমি ত বলেছি কি জানেন ঠাকুর মশায়।

বিষ্ণু। তা বলবে বৈকি, বলা চাই। লোকনাথ অতি দরিদ্র, তার কি আর আপনার মত লোকের সঙ্গে চলচাল করা সাজে, তবে এই যা বল, যে "কুম্ভানোপি কাঞ্চনো" অমন সুন্দরী, পিরতিমের মত, ঘর আলো করবে।

রামহরি। ঘর ত আলো করবে, কিন্তু তৈল ত চাই! তা আমি বলেছি তিন হাজার টাকা নগদ আর একজুট জড়োয়ার গহনা, আর রূপোর বাসন সামগ্রী। আর কুলশয্যের জিনিষ পত্তর খাট বিছানা সবই দিতে হবে। আমার কি জানেন এই ছেলেটাকে এম, এ, পাশ করতে কোন না দশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। আমি সেটা দেখব না, আর তোমার মেয়েটী এলেই আমার সংসারে একটা কর্ম্ম বেড়ে যাবে তা আমি পুষিয়ে নেব ত।

বিষ্ণু। তা'ত ঠিক, তারার ভুলকি। এ অতি যথার্থ কথাই বটে। পুষিয়ে নেবে না।

(নস্যের ডিবা বাহির করিয়া দুই টাপ নস্য গ্রহণ করিয়া, নাক নাড়িয়া মুখ বিকৃতি করিলেন। নিধিরাম ব্রাহ্মণের হুঁকায় তামাক দিয়া গেল।)

রামহরি। বেটার এতক্ষণে বুঝি নিদ্রাভঙ্গ হোল।

নিধি। আইজ্ঞে, গিন্নীমার দোক্তা আনিতে যাইছিলা।

(প্রস্থান)

বিষ্ণু। (এক টান টানিয়া সজোরে কাসিয়া ও হাঁচিয়া ফেলিলেন) আজ্ঞা তামাকু বাবাজী তবক দিয়ে ওঠে।

রামহরি। আজ্ঞে ও একেবারে খাস বিষ্ণুপুর থেকে লোক মারফত আনা।

(যজ্ঞেশ্বর খুড়োর প্রবেশ। যজ্ঞেশ্বর আকারে একটু বেঁটে-খাট মানুষ, বেশ যেন মোহারা, পিটোপেটা চেহারা, কপালের সামনের চুল টান করিয়া পিছনের দিকে আঁচড়ান। গোঁফ ছাঁটা, শ্যামবর্ণ বড়, কাঁধে চাদর ফেলা।)

রামহরি। এই যে খুড়ো এস, এস, ওরা ত সব এখুনি আসবে। তা আমি ছেলের যে দিতে বলেছি, কি বলো খুড়ো. আমি ত' আর খরচাত করতে বসিনি। আমি পুষিয়ে নেব ত'?

যজ্ঞে। পুষিয়ে নেবে না, পুষিয়ে নেবে না, পুষিয়ে না নিলে পোষ মানবে কেন?

বিষ্ণু। যজ্ঞেশ্বর কথা কয় বেশ।

রামহরি। হাঁ···হাঁ···হাঁ···খুড়ো আমাদের রসিক মানুষ।

যজ্ঞে। আর রস কস সব শুখিয়ে এলয়ে বাপ দশ টাকা মোণ চেলের দর, কোমরে টেনা জোটে না, রসিক হই কোত্থেকে বল বাপ! বলে—

ছেলের দর যা চড়েছে।
(তায়) কাড়া আঁকাড়া সমান করে
কেঁড়ে দিয়েছে॥

ভটচাজ! এখন সব কুচো নৈবিদ্যি বাবা।

রামহরি। তা খুড়ো তোমার ভাবনা কি বল, ছেলে নেই পুলে নেই, তুমিও আছ বেশ, আর খুড়ীও আছে বেশ। আমাদের সংসারে এই পাঁচ জ্বালা, নানান ঝঞ্ঝাট আজ ছেলের বিয়ে, পরশু নাতির অন্নপ্রাশন, অমুকের শ্রাদ্ধ, এত লেগেই আছে।

যজ্ঞেশ্বর। আছে বলে আছে, একেবারে বেচে বেচে আছে, আজ গিন্নীর রূপোর পৈঁচে, পরশু কর্ত্তার সোণার খাড়ু, জড়োয়ার বাউটী, এই জড়াতে জড়াতে একেবারে জড়িয়ে পড়া, বারমাসে তেরো পার্ব্বণ লেগেই আছে—বলে।

ধান দুর্ব্বো ক্ষীরের হাঁড়ি।
লক্ষ্মী ঘোরেন তারি বাড়ি॥

রামহরি। বলো খুড়ো, বলো, এই সেদিন গিন্নী

বরেন, আড়াইশ ভরির চন্দ্রহার চাই, দিতে হোল। এখন নোরোর বউত আর আমার পর নয় গো! তাকেও কোন্ না পঞ্চাশ একশ ভরি দিতে হবে। ছেলের যে একটা রোশনি করতেই হবে, আমার ওই একটা ছেলে, সাধ আহ্লাদ না হলে গিন্নীই বা বলবে কি। বলি গিন্নীর দৌলতেই ত সব।

বিষ্ণু। সে কথা আর মিছা কি। মা লক্ষ্মীর কৃপাতেই সব।

যজ্ঞেশ্বর। মা লক্ষ্মী না হলে কে কৃপা করে বল ভটচায।

রামহরি। তারপর আমার নোরোই বা বলবে কি, যে বাপ-বেটা হাজার হাজার টাকা নিলে আর একটা ধোয়াত আলোও জ্বাললে না। বলো, তোমরা পাঁচজনেই বা কি না বলবে হে! কেমন? কথাটা ঠিক কইছি কিনা আঁ।.....তার ওপর আবার নোক-নকুতো আছে, সংসার ধর্ম্ম করতে গেলেই...

বিষ্ণু। না এ অতি ছাত্য কথা। এসব স্মৃতি সম্মত শাস্ত্র বাক্য, অতীব সঙ্গত কথা, তোমার ভুল কি.. তবে কি না কলিকাল ধর্ম্ম এখন কার পেটে বড় হজম হয় না। যা আমরা এই ক্রিয়া কর্ম্মে নিত্য নৈমিত্তিক নিত্যকর্ম্মপদ্ধতিতে নিত্য করে যা ধরে রেখেছি।

যজ্ঞেশ্বর। ভট্টাচায ঠিক বলেছ, ও ধর্ম্ম কখন কার পেটে হজম হয় না, ও ঠিক যেমন পারা, ফুটে বেরবেই রে বাপ।

ধর্ম্ম এখন চাল কলাতে
গামছায় পুঁটলি বাঁধা।
পোটলা বাঁধা ধর্ম্ম ভাবেন
কেমন গোলক ধাঁধা॥

রামহরি। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তো আমার নোরো অতি সুছেলে, কালেজের জলপানির একটা পয়সাও নিজে কখন নিত না, সব আমাকে এনে দিত। আগাগোড়া পড়ার খরচ সব ওই জলপানির টাকা। ঘর এই বিয়ের টাকা ও আমি যা করব তাই হবে।

বিষ্ণু। আহা তা হবে না, পুত্র নরক হোতে ত্রাণ করে, বলো কি বাবাজী।

যজ্ঞেশ্বর। ওইটে ভটচায আর আমার এযায় হোল না, আমার ত দেখছি নরক ঠাকুর হাঁ করেই রইল।

বিষ্ণু। আরে তার ভয় কি, হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র তারও ব্যবস্থা করেছে, পুত্ররূপে গ্রহণ সম্ভার।

রামহরি। খুড়ো তবে আর কি, আমার পুষ্যিপুত্তুর করে নাও যা, দেখ বাবা এ পেটো-রাম তোমার ঠিক পেটের সন্তান হয়ে বসে যাবে।

যজ্ঞেশ্বর। তা যা বলেছ বাপ, বলে—

জনক পিতা রইল পড়ে
পিণ্ডী পেলে না,

(নরেন্দ্রের প্রবেশ)

নরেন। বাবা! যতীন আর ওস্তাদজী এসেছেন।

রাম। কই, এই যে আসুন—আসুন—আস্তাজ্ঞা হোক্! ওরে বাবুদের তামাক দেরে।

(যতীন ও ওস্তাদজীর প্রবেশ)

বসুন বসুন বস্তেজ্ঞা হোক্।

যজ্ঞেশ্বর। ওস্তাদজী একখানা যাত্রের নাম শুনিয়ে দাও।

(যতীন ও নরেন একটু দূরে দাঁড়াইয়া যাত্রের কাছে আস্তে আস্তে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল)

রামহরি। যতি যোস্ না বাবা! তোরা ঘরের ছেলে।

যতীন। এই যে আমি নোরোর সঙ্গে কথা কইছি।

(সদানন্দ দাদার প্রবেশ)

যজ্ঞেশ্বর। এই যে সদানন্দ দাদা, এস এস, ভালই হোল।

রাম। এই যে সদানন্দ দাদা! আমাদের সদানন্দ পুরুষ!

সদা। ঘোষমহাশয় আনন্দ করব না, বলে সো মড়কে মুচির পার্ব্বণ, লোকের বাড়ীর ছেঁড়া ঢেউয়ের খবর পেলেই সদানন্দ আনন্দে নেচে ওঠে। তা যজ্ঞেশ্বরের ফরমাসটা অমনি অমনি মাঠে মারে যাবে, একখানা হোক্। সেই যে—

ওস্তাদজী। তার আর কি।

নয়েনক- ঘণ্টে বলছে ওর আবার, কলেজের বেলা হয়ে যাবে।

ষতীন। হ্যাঁ বাবার শরীরটে ভাল নয়, তাই তিনি আসতে পারেন না, বল্লেন যে একটা ঠিক খবর নিয়ে আয়, আর ত সময় নেই। আমাদের আবার সব জোগাড় জাগাড় করতে ত হবে

রাম। তোদের বাবা সবই যেন ঘোড়ায় চড়া কায়, আমরা বুড়ো-হাবড়া মানুষ দুটো মায়ের নামও শুনবো না।

যজ্ঞে। আরে ভাইপো! মা বলবার যখন সময় আসবে তখন মা আপনিই বলবে বাবা মায়ে পোয়ে কি বিচ্ছেদ হয় রে বাবা!

বিধু। তারার ভুল কি. সে কথা মিছা নয় যজ্ঞেশ্বর আজা!

সদানন্দ। মায়ে পোয়ে ত বিচ্ছেদ হয় না রে যজ্ঞেশ্বর, কিন্তু মা যে বেটা বিইয়ে বউকে দিয়ে ছেলে করে পর।

যজ্ঞে। দাদা ও সব ভিন গাঁয়ের কথা, এখানে এ গাঁয়ের খবর নিলেই হবে দাদা!

সদানন্দ। তা কি জানি যজ্ঞেশ্বর! ঘতের বাপ ত একটা আস্ত গাধা। দুনিয়ায় এসে কেবল ভূতের বোঝা বয়েই মল।

ষতীন। তা তিনি গরিব ছা-পোষা মানুষ কি করবেন বলুন।

রাম। তা দেখ বাপু কথা আর কি বলব, আমি ত সবই বলেছি, গিন্নীর ইচ্ছে সাধ আহ্লাদ হয়। আর খুড়োর ত সবই জানা কথা, তোমার ঐ এক কথাই বলে আসছি, আমি দোসরা কথা জানিনে, সব খতিয়ে দেখতে গেলে আমারই লোকসান, কেমন কিনা—আর তাঁরে জহরাতের কথা তা সে তাঁর মেয়েই পরুক দেখতে শুনতে সবই তাঁর পক্ষে বেশ।

যজ্ঞে। বেশ—বলে বেশ—

ঠেস দিয়ে গহনা। এও তোদের সহনা।

তা দেখতে গেলে সব দিক দিয়ে তোদেরই ত সুবিধে হোল বৈকি, তোদের মেয়ে খুব সুখেই ঘর করবে।

রাম। আর ফর্দ্দ এমন কি বেশী হয়েছে দশজনে যেমন করে-কারে করছে, আমিও তাই করবো।

ষতীন। বাবার ইচ্ছে ওরির ভেতর এটা করণ কস্তি করে, করে নেবেন।

রাম। তাত করেইছি, নয়েন আমার এই এ পাশ করা, তাতে আমি ত বেশী চাই নি, আর নমস্কারীর ফর্দ্দ তা কাল সকালে পাঠিয়ে দেব।

যজ্ঞে। ষতীন ভায়া! বলি দাদা, তোমাদের ঘরভাগ যেমন মেয়েকে ফাঁকি দিয়েছে, এখনকার বুদ্ধিমান সমাজ জ্যান্ত বাপের আদ্যশ্রাদ্ধ করচে। কেমন বাবা হুঁ...হুঁ···যৌতুক টেনে এনেছে।

সদানন্দ। আপনি কৌতুক করছেন না কি?

যজ্ঞে। তা দাদা যৌতুক এখন কৌতুকই হয়েছে।

ষতীন। ঘোষমহাশয় এ কিন্তু একেবারে গলায়, সেই যাকে বলে ছুরি চালানই হোল।

রাম। আরে কি কথা বলেন রাম রাম····· আমার ছেলে ত এখন বেয়ে করতেই চায় না, তবে নেহাৎ গিন্নীর ইচ্ছে তাই।

ষতীন। তা হলে আমি বাবাকে গিয়ে বলব।

রাম। হ্যাঁ আমার আজই জবাবটা যেন দেওয়া হয়।

ষতীন। যে আজ্ঞে।

সদানন্দ। এইবার লোকনাথ ছেঁড়াপাত পাত-চর্পরে যতে।

ওস্তাদ। আচ্ছা একখানা শুনে যান এক-ছিলিম তামাক খান, করেন কি আপনে।

যতীন। তা হলে আমি এগোই।

সদানন্দ। না আমিও যাই পুচির গন্ধটা বেশ জমে উঠছিল ঘোষজা কিন্তু কসায়ের ছুরি ও আঁতড়ীর গন্ধও যেন পাওয়া যাচ্ছে। চল্‌রে।

(যতীন ও সদানন্দ অগ্রসর হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, নরেনও তাহাদের পিছনে, বাম হাতে নাকের ফুঁপি রগড়াইতে রগড়াইতে চলিল)

বিধু। তা থাক্, হোক বাবা একখানা মায়ের নাম।

ওস্তাদ। তবে নেহাৎই শুনবেন, আচ্ছা। (সুর করিয়া গান ধরিল)

"এ ব্রাত-র কা-কা-ইলি-এ্যা তোমায় যাবো-ও"...

রাম। শুন্‌লে খুড়ো! সদাশালার আক্কেল, আমায় কসাই বলে গেল। শালার দুসন্ধ্যে ভাল করে আঁচান হয় না, শালার লম্বা লম্বা কথা দেখেছ।

যজ্ঞে। ভাল করে দু সন্ধ্যে আঁচালে বাপ অমন্ হয় কি, তবে কি জান বাবাজী ওরা ভিন্ গাঁয়ের লোক, খুড়ো যামনা অনেক দূর থেকে বরাৎ ভিনি-য়ের গন্ধ পায়, পাগল মানুষ, কিছু মনে করনি বাবা, চল্লুম, আমার আবার বাজার যেতে হবে, এ বাজারে ত বাবা আমার কোন কারবার নেই।

রাম। ঠাকুরমশায়! তা হলে ও বেলা একবার পায়ের ধুলো দিবেন, আর একবার বাড়ীর ভেতর না হয় হয়েই যান। যাবে কোথা, আমি কি সহজে হাত ছাড়া করবো, অমন পাত্রী। লোকনাথ ছেলে পাঠিয়ে ভাব বুঝছে। আমি সাজিয়ে গুজিয়ে সংসারটী পেতে বসে আছি, আর তোমার মেয়েটী ঝিব্যি এসে মাছি-খুলো যাবেন কেমন! ..হুঁ!

ওস্তাদজী তা হলে একবার ওবেলা আসবেন নাকি। এমন হয়েছে পোড়া সংসার নিয়ে যে দুটো মায়ের নাম শুনবো তার ফুরসৎটী নেই। কিছু মনে করবেন না।

যজ্ঞে। সে ফুরসৎ আর এ কাটামোয় হবে না বাপ্ ভাইপো! পাঁজিতে শুনি অরন্ধনীয়া কন্যা বলে, কিন্তু পাঁজির ভুল ধরবার আর কেউ নেই, তা হলে বল্‌ত, অরন্ধনীয় পুরমায় বাঙ্গলার উনপঞ্চাশ বিধি, কি বল ভটচায। হা হা..... বলে।

ঘরের বাজার বসেছে,
নিকিয়ে গেছে নিকীরী পাড়া
নিকৃতি বেঁকেছে—
দাম বেজায় চড়েছে।
(সকলের প্রস্থান)

(নরেন ও যতীনের প্রবেশ)

যতীন। নোরো, আমায় আর এখন টেনে বসালি কেন? দশটা বাজে সাড়ে এগারটায় কলেজ।

নরেন। যতে তুই আমার অবস্থা বুঝতে পাচ্ছিস্ নি, বাবাকে আমি কি করে বলি বল্!

যতীন। সে তোর ইচ্ছে. আমার বাপের অবস্থাওত তুই জানিস্। যথা সর্ব্বস্ব ওই ভাঙ্গা বাড়ীখানা। মার যা দু পাঁচখানা ছিল, তা আমার কলেজের খরচায় গেছে, আর কমলার বিয়েতে গেছে। কমলার বর বড় গরীব, তার ভারি কষ্ট তাই বাবা তোর বাপের হাতে পায়ে ধরে দেখলেন্। এ পেটের দায়ের চেয়েও বড়। এ বিয়েতে রেলের চাকরী টুকু ছাড়তে হবে, যা টাকা জমা আছে তবে সেই টাকাটা পাওয়া যাবে। তার ওপর এ বাড়ী বাঁধা না দিলেত' আর অত টাকা যোগাড় হয় না। তুই পাঁচটা পাশ করেছিস, তোর পাঁচ হাজার দর চড়ে গেল।

নরেন। তুইও ত পাঁচটা পাশ করেছিস।

যতীন। আমি যে ছেলে ঠাঙাইবে। তোর ত আর পাঁচন বাড়ী নিয়ে রাখালী করতে হয় না।

নরেন। তা তুই বাবাকে বল না।

যতীন। হ্যাঁ তোকে বলেই পারলুম না, তা আবার তোর বাবাকে। হাঁরে তোকে আমি খাইয়ে না দিলে খেতিস নি তুই আমার কথা ঠেলনি।

নরেন। এ তুই অন্যায় বলছিস্।

যতীন। তুই অন্যায় করছিস, তা বলব না।

নরেন। তুই যদি আমার অবস্থায় পড়তিস্।

যতীন। আর তুই যদি আমার আমার অবস্থায় পড়তিস্ তবে বুঝতিস্। বুড়ো বাপ্ এই বয়সে চাকরী গেলে কি হবে তা জানিস্, রোজগারী নই। বাড়ীখানা বাঁধা পড়বে, তারপর একবছর যেতে না যেতে পথে বসব।

নরেন। এখন যা হয় করে এটা সেরে নে, তার পর আমি যা হয় করব।

যতীন। ঠিক, এখন দুর্গা বলে ঝুলে পড়ি, তার পর আপিসে খালাস করবি, না খুব ওকালতি দিখেছিস্।

নরেন। তবে আর আমি কি করব বল।

যতীন। সেত তোকে হাজার বার বুঝিয়েছি. তুই যদি তোর বাবাকে বলতিস্ তা হলে হয় ত, অনেকটা সুবিধে হোত।

নরেন। তা বাবা আমার পড়ার জন্যে কত ব্যয় করেছেন আমি কি করে বলি—

যতীন। নোরো তুই কি সেই নোরা, তোর বাবার টাকাটা টাকা, আর আমার দীন দুঃখী বাপ, তার মাথার ঘাম-পায়ে ফেলা টাকাটা টাকা নয় খোলায় কুচি না?

নরেন। তুই ঝগড়া করতে এসেছিস বল!

যতীন। তুই যদি মানুষ হতিস্- তবে তোর সঙ্গে না হয় ঝগড়া করতুম্।

নরেন। যদি মানুষই নয় তবে বোন নিয়ে এত সাধা-সাধি কেন?

যতীন। তোর ত আর পেটের বোন নেই, তুই তার দরদ কি বুঝবি বল।

নরেন। আমার বাপের অনেক টাকা দেখেছেন

যতীন। নরেন!

নরেন। তা না ত কি, তোমার বাপ মেয়েকে রাঙা কড় গাছটী দিয়ে বিয়ের করতে পারলে বাঁচেন, আর তোমার জন্যে পাকা বাড়ীখানি রাখেন কেবল, কেন মেয়ে কি অপরাধ করলে……তুমিও যে, সেও সে -একই বস্তু।

যতীন। তাই ত রে—নতুন কথো-পয়াশর এক সঙ্গে সমবয় দেখছি। দেখ্ ছেলে বেলা থেকে এত ভাব, তা না হলে তোকে দুটো কথা বলতুম, তার ওপর তুই এখন বড় মানুষ, আমি গরীব তোকে কোন কথা বলা এখন সাজে না, এখন ত আর মার গহনা বাঁধা দিয়ে দুজনের পরীক্ষার জন্য দিতে পারব না, তোকে আর কি বলব বল্—

নরেন। কেন কি বলবেন বলুন…

যতীন। আমি অতি গরীব নরেন্দ্রবাবু, ক্ষমা করবেন্।

(নেপথ্য হইতে যজ্ঞেশ্বর অগ্রসর হইয়া দ্বারের নিকটে আসিয়া চৌকাঠের উপর পা দিয়া দাঁড়াইয়া)

সদানন্দ। তা হলে বলতুম্ কসাইয়ের ছেলে কখন গোঁসাই হয় না।

নরেন। (রাগে দুলিয়া) নিয়ে! নিয়ে!..

(সদানন্দ ও যতীনের প্রস্থান।)

নরেন। আমার চেয়ে ভাল পাস করেছে বলে দেমাকে আর মাটীতে পা পড়ে না। উনি হলেন আমার বন্ধু। কবে ঘি খেয়েছিলেন, আজও তার গন্ধ বেঁকেন। তোর বোনটা সুন্দরী বলেই বে করতে হবে নাকি? বেটা পেট ভরে খেতে পাস নি তুই টাকার মর্ম বুঝবি কি। আমার বাপের টাকা দেখে সব জিবের ডগায় জল এসেছে। সদা

শালা আবার যখন তখন ফোড়ন দিতে আসে, নিয়ে শালা গেল কোথা, শালাকে বিশ ঘা জুতো দিলে তবে রাগটা যায়। তিন হাজার ত' বাবাই নেবে, তার পর আমার থাকবে কি, আমায় শীগ্‌গিরই হাণ্ডনোটের কারবার খুলতে হবে। বেশত আমিত অরাজী নই। বাড়ী খানা আমায় লিখে দাও আমি স্বচ্ছন্দে তিন হাজার টাকা দিয়ে দেবো বাবাকে শালা কি ছোট লোক, কবে আমার জন্যে চল্লিশটে টাকা দিছল্...তারই খোঁটা দিচ্ছে। ইতর বেটা!

তৃতীয় দৃশ্য

[সদানন্দ বাবার ভাঙ্গা ঘরের সম্মুখ, ইট বাহির করা দেয়াল—তাই তাই দোনা করা সুরকীর চাপ খসিয়া পড়িয়া উঠিয়াছে। দুই একটা কাটলের ভিতর দিয়া ছোট ছোট কাটলে কৃষ্ণকলি ফুলের গাছ, তার দুই চারিটা ফুলও বিরিয়াছে। সদানন্দ পূজায় বসিয়া আছেন, চক্ষু ঈষৎ মেলা হাতের সেবা। বাতাসে তাঁহার আবক্ষ শ্বেত দেবেবা, ও ফুল-মালা। একটা শালিক পাখী মাঝে মাঝে ডাকিতেছে। সদানন্দ ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিলেন]

সদানন্দ। কি ঠাকুর! আজ যে বড় রসিক হয়েছ দেখছি!

(আবার চক্ষু মুদিত করিলেন।)

গায়ত্রী ভুলিয়ে দিচ্ছ। রকম খানা কি বলত'। ভূঃ ভুর্ব স্বঃ সবই তুমি! তবে আবার গায়ত্রী কেন ...না? ওইত, ওই কেমন···না? যো বৈ ভূমা তৎসুখম্-আরে ঠাকুর তুই কই···আরে তুমিত ওই একটুখানি—না হয় তোমার গলায় সোনার পইতে জড়িয়ে তোমার জাত বজায় রেখেছ, এদিকে যে দেশ শুদ্ধ লোকের জাত মারা গেল, বাবা, গাঁয়ের লোককে এক ঘরে করে, তাদের জাত মেরে তোমার জাত বাঁচিয়ে লাভ? না তোমার রক্তের নেশ ধরেছে, সোনা বশা দুইই সমান। তোমার জাত অজাত কি? কিন্তু আমার যে এগুলেও নিস্তারের বেটা পেছুলেও ভেড়ের-ভেড়ে। তোমার ওই সব রূপ-লোটা চক্ষু বন্ধন হেরে আমি শালাত দুনিয়া ভুলে, বসুম। কেন বাবা দুনিয়ার ঝামেলে তুমিই বা যাও কেন, আমায় বা টান কেন বল দেখি। বাজীকরের মত ভুরি ধরে গলায় আশা রসের ঘড়িটী বেঁধে, এ নাচুনি কুঁদুনি করিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? ঝটপ করে বসিয়ে দাও না বাবা। তুমিও রেহাই পাও আমিও রেহাই পাই। ওই যে তোমার সিংহাসন নীল মেঘে বিজলীর ঝলক দিয়ে উঠছে কোটী কোটী চন্দ্র সূর্য্যি তোমার চরণ নখরে ঠিকরে পড়ছে। ওই ঝন্ ঝন্ ঝন্ দুনিয়ার সুখ-দুখ ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে, - আহা! জন্ম-মরণের ঝরণা তোমার গা বয়ে ঝর্ঝর করে ঝরে পড়ছে। থাকি থাকি যেভুল থাকি, বোকা হয়ে যাই, এ কি রঙের খেলা গো! নামের বর্ণে বর্ণে যেন অমৃত ঝরছে!

(নৈবেদ্যের থালা তুলিয়া) তুমিই আমি, আমিই তুমি, খাও খাও, আমি খাও ··কিন্তু এ সব কি কচ্ছো···

বলিতে বলিতে চক্ষু আবার মুদিত হইল — সদানন্দ বসিয়া বসিয়া দুলিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে আবার হাসির মধুর রেখা ফুটীয়া উঠিল। সদানন্দ দুলিতে দুলিতে গাইয়া উঠিলেন।

এই সাধনা যেন রাখি।
তোমার চরণ-পদ্মে তোমায় হয়ে

জন্ম জন্ম পড়ে থাকি
রিপু হয় শুতুর মতন
আসে যায় ফুল ফোটায় কেমন,
(এই) তীরের ছায়া নীরে যেমন
তেমন যেন ডুবে থা'ক ॥
অন্তরে কি রসের খেলা
বাহিরে কি রূপের লীলা
(এই) লীলা কমল প্রাণের পাতায়
ওই পায়ের পাতায় পেতে রাখি

(যজ্ঞেশ্বরের প্রবেশ)

যজ্ঞে। আহা রূপত' কত? ঠুঁটো জগন্নাথ, না হাত না পেট, না মুখ, না মাথা তার মাথায় আবার ঘরে ছাওয়া, দেখ সদা দাদা, তোমার ও ঠাকুর টাকুর ফেলে দাও, বলে দু সন্ধ্যে নৈবিদ্যি তুলসী খাচ্ছেন, কি করলে বাবা তোমায় দেবতা—

সদা। কেনে রে কি হয়েছে' যজ্ঞিশ্বর, অ্যা

যজ্ঞে। আর কি হলো, লোকনাথের বাড়ী গেল, চাকরী গেল আর ওই পেটো-রামের বেটার - সঙ্গে দেখা কি না

সদা। তাইতরে যজ্ঞিশ্বর, বাড়ী গেল, চাকরী গেল, কি রকম

যজ্ঞে। যাও' যাও. ও সব নোড়াচুড়ি গঙ্গায় জলে ফেলে দাও গে···তোমার যেমন কাম কম্ম নেই সদা দাদা, চমুম্—দেখ তোমার ঠুঁটো জগন্নাথেরও নব কলেবর হয়, কিন্তু এ তোমার এমন জগন্নাথ সমাজ এর এ হেন নিমকাট ধুয়ে আর নতুন রঙ কেউ ধরাতে না পারলে আর চলছে না বাবা।

সদা। বলিস, কিরে যজ্ঞিশ্বর, আরে ঠাকুর কি সমাজ ছাড়ারে -

যজ্ঞে। তবে তোমার তফাৎ রইল কোথায়—

সদা। হেঁ হেঁ যজ্ঞিশ্বর, ওই কোন খানতে যে তফাৎ সেইটে যজ্ঞেশ্বর ধরতে পারছি নে রে···ওই ডা বড় গোল—

যজ্ঞে। যাক্ গে,ও তোমার ঠাকুর তোমারই থাক্—

সদা। ওই সে ঠাকুর তোর সঙ্গেও যায় রে যজ্ঞিশ্বর!

যজ্ঞে। তা হলেই সব কায ভণ্ডুল পাকাবে, দাদা, সব কাযের মাথাই খেয়ে বসে। বারণ করে দাও। বারণ করে দাও! আমার সঙ্গে আবার কেন বাবা।

সদা। ও গোপনে যাবেই, রে যজ্ঞিশ্বর, ও ভণ্ডুলে লোক কা'র কথা শুনবে নি কিন্তু!

যজ্ঞে। না শোনে নেই শুনবে।

চতুর্থ দৃশ্য

[বেলা দ্বিপ্রহর যতীনের মা দালানের দ্বারে বসিয়া তরকারি কুটিতেছিলেন। কাছে একটা বিড়াল বসিয়াছিল। যতীনের মা সম্মুখে যজ্ঞেশ্বর খুড়োর স্ত্রী বসিয়াছিলেন।]

যতীন-মা। হাঁারে বেলা! মুকীকে কি ভাত দিয়েছিস্। বেলা হয়ে গেছে মেয়ে, বেরালটা খেতে পায়নি—ছটফট্ করছে। যা মুকী, যা বেলার কাছে যা, ভাত খেবে—যাবো!

(নেপথ্যে বেলা—"আয় মুখী আয়, মোক্ষদা ও মুকী, পোড়ারমুকী আয় বলিয়া ডাকিল।)

যতীন-মা। যা না লো-যা—

(বিড়ালটা একবার হ্যাও করিয়া লেজ তুলিয়া দৌড়াইয়া গেল।) মেয়ে বিইয়ে আমারই শতেক খোয়ার, আমার সে মেয়েও যে ছেলেও সে। একটা মেয়ে কত করে পার করলুম, আবার এই! এইটে হলেই নিশ্চিন্দি। ছেলের বিয়ে দিয়ে টাকা নিতে বললুম,···তা হবে না, ছেলে বললে না—তা বললে সবাই ইতর বলে কি আমারও ইতরম করতে হবে নাকি। যখন নিজের সংসার চালাতে পারবে, তখন দেখে শুনে যা হয় হবে। আর আমি মাগী যে

ই খেয়মুতিটে করে মলুম, তা আমার কি আর কান সাধ যায় না। মা মঙ্গল চণ্ডী যা করবে তাই বে। সবই বরাৎ ঠান্‌দি-সবই বরাৎ।

যজ্ঞে-স্ত্রী। তা বরাৎ ছাড়া আর পথ কই!

(নেপথ্যে 'মা' 'মা' বলিয়া কে ডাকিল।)

যতীন-মা। কেরে কমল এলি, আয়! আয়!

(ছুটিতে ছুটিতে মেনকার সহিত কমলার প্রবেশ)

মেনকা। মা দিদি এয়েছে, দিদি এয়েছে!

(কমলা মাকে প্রণাম করিল, মা কমলার চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিলেন)

যতীন-মা। কেমন আছিস মা, সুরো কেমন আছে, বিন্দি অবিন্দি!

কমলা। দিদি, তুমি কখন আমাদের ওখানে গেলে না।

যজ্ঞে-স্ত্রী। কি করে' যাই'লো ছুঁড়ি, ঘরে ঘুবো ভাতার তার মন যোগাতে যোগাতেই দিনটা গেল

কমলা। দিদির সকল কথাতেই ঠাট্টা।

যতীন-মা। বিন্দি-অ বিন্দি!

বিন্দি। ডাকছো কেনে গো! পাটা ধুব, তবেত' এসব!

কমলা। হ্যাঁ মা ওরা আশীর্ব্বাদে কি দিলে মা? আমায় সে দিন কি' বলে আনলে না মা।

মেনকা। আমি কত বলুম ভাই দিদি! তা মা বললে সময় নেই।

যতীন-মা। ওরা একখানা সিঁথি দিয়েছে। আর আমাদের—হাতের সোনার ঘড়ি আর গলার সোনার বোতাম। তা সেই ঘড়িটাই নাকি জামাইয়ের পছন্দ—প্রায় তিনশ টাকা পড়েছে। যতেত' এদিকে মুখ ভার করে গজ গজ করছে।

কমলা। হ্যাঁ মা তা এত টাকা কোথেকে দেবে।

যতীন-মা। সে আর কি বলব, এই মাথা রাখবার ছাওয়াটুকু রেখে—তারপর মধুসূদনের মনে যা আছে তাই হবে।

কমলা। তা আর কি হবে, আজ কাল ভাল বর বর দেখে দিতে গেলেই টাকা চাই। এখন ত ওর ঘর বর ভাল হোক তারপর.....

যতীন-মা। তাই ভেবেই যা করছি, তারপর...

(যতীনের প্রবেশ)

যতীন। তারপর? তারপর সব আপনিই সোজা হয়ে আসবে, তোমাদের তা কিছু ভাবতে হবে না। কমলি কখন এলি রে।

কমলা। এই এখুনি আসছি দাদা! একবার ত আমাদের বাড়ী গেলে না—

যতীন। তুই খেতে দিস নে—

কমলা। দাদা! আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার তেমনি দিন হয়।

যতীন। কমল! আমি তা বলিনি দিদি! আমার সময় হয় না দেখছিস্‌ত'

কমলা। দাদা! তোমার বোনটী গরিব বলে তাই ও কথা বললে

যতীন। ভগবান কি সবার অবস্থা সমান করে বোন্।...মা ওরা নমস্কারীর ফর্দ্দ দিয়েছে। একশো তেরো খানা।

যতীন-মা। তা ওদের আজ কুটুম্বে বৃহস্পতি—তা সে দিতে হবে।

যতীন। দিতে হবে দিতে হবে, সবই দিতে হবে। যাক, বাবা যা ভাল বুঝছেন তাই হোক্। সে দিন নরেন যে ব্যবহার আমার সঙ্গে করেছে, তা যদি...

কমলা। ওদের কামড় কিন্তু মা বেশী বাপু!

যজ্ঞেশ্বর-স্ত্রী। এক পুরুষে নূতন বড়মানুষ একটু ঝাঁজ বেশী হবে না।

যতীন। এক সঙ্গে খাওয়া-বসা করে এল, এখন বড়মানষী চালছে, না-না শুধু ওরা নয়। তবে নমস্কারী সবই আনবত'?

যতীন-মা। তা আর কি হবে। এখন যা হোক্ করে দু-হাত এক হলে বাঁচি।

যতীন। হ্যাঁরে সুরেন কখন আসবে?

কমলা। রাত্রিতে আস্‌বে।

একটা কাযে সে গেছে।

যতীন। হাঁা এ কদিন এখানে না থাক্‌লে, একলাত' সব পেরে উঠব না।

কমলা। ও ত আস্‌বে।

যতীন। ওই একটা লোক দুদণ্ড কথা কয়েও লোকের প্রাণ জুড়োয়, মাটীর মানুষ! তাই কষ্টও এত। তবে আমি আসিগে। মেনা একটা পান দে!

মেনকা। অ্যাঁ···দিই দাদা!

যতীন। মেনা অমন করে উঠ্‌লি কেন রে। তোর কি অসুখ করেছে নাকি।

মেনকা। না কিছু হয় নি ত।

(মেনকা পান আনিয়া দিল, যতীন পান লইয়া চলিয়া গেল।)

যতীন-মা। ঠানদি! চল একটু গড়াইগে, চল্‌রে—কমলি, আয়!

যজ্ঞে-স্ত্রী। আবার বেলা যাবে, ছিরিটা গড়বার যোগাড় দেখিগে···চল···

[যতীন-মা, কমলা, যজ্ঞেশ্বর স্ত্রী ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। মেনা দাঁড়াইয়া সম্মুখে তাকাইয়া দেখিল, দূরে নরেন্দ্রদের তেতালার ছাদ দেখা যাইতেছে। নীচে ফটকের উপর নহবতের ঘর বাঁধা হইতেছে, তাহার উপর গম্বুজ, গম্বুজে সোনালি কাগজের ফুল লাগান হইতেছে। নহবৎ ওয়ালাদের একজন বাঁশী হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, এখনও বাজায় নাই।)

মেনা। (অন্যমনস্ক ভাবে) টাকার জন্যে, তাই, তবে, তবে··আর আমি ওই তোমার তেতালা বাড়ীর জন্যে বাপের এই ভাঙ্গা কুঁড়ে, বাপ পিতমোর ভিটে তা খুইয়ে দেবো—দাদাকে পথে বসাবো।

বিন্দি অ বিন্দি—অ পোড়ার মুখি!

(নেপথ্যে বিন্দি।) যাইছি লো দিদি, যাইছি লো যাইছি!

মেনা। ছেলে বেলার সেই ফুল ছিঁড়ে বগড়ান মনে পড়েছে, তবে কি আমার সবই ভুল।

(বিন্দুর প্রবেশ।)

বিন্দু। আইছি লো সোনামুখী, আইছি বল·····

তর সইতে নারি বিন্দি

তর সইতে নারি

আখুনি এতো গো সোনামুখী!···

মুখখানায় অমন মেঘলা করলি কেনে দিদি,

বিন্দু। কি লো দিদি, এ্যাখুনি মানের পালা, গো!

(নেপথ্যে লোকনাথ। 'ওরে'···মেনকা কেমন যেন ফ্যালকা মুখ করিয়া নরেনদের বাড়ীর দিকে তাকাইয়া রহিল।)

(মেনকার মার পুনঃ প্রবেশ)

মা। হ্যাঁরে! মেনা, তুই ভাত ফেলে উঠে এয়েছিস কেন, কি হ'য়েছে অসুখ করেছে, অমন করে ফ্যাল্‌কা মুখো হয়ে দাঁড়িয়ে কেন-মা?

(বিন্দির পুনঃ প্রবেশ)

বিন্দি। এই দেখ মা সব ভাত ফেলে উঠে এয়েছে, মাছখানা খায় নাই, পাতের তলে চাপা দে খুয়েছে—আজ তিন দিন ধরে মা এই এমনটা করছে। রোজ রোজ বলে আমার খিধা নাই,—নজর লেগেছে গো মা নজর লেগেছে! তুমি একটা কিছু করতে হয়-মা!

মা। হ্যাঁরে, তোর কি হয়েছে, তুই এমন হয়ে যাচ্ছিস কেন বল্‌ত মা, দিন দিন যেন কেমন শুকিয়ে যাচ্ছিস্, অমন সোন্দর বর, কত আদরের বউ হবি, সোনা গয়না পরবি, তবে অমন কচ্ছিস কেন, আমার কাছে লুকোস কেন কি হয়েছে? (মা বুকের কাছে টানিয়া লইলেন)

মেনকা। (মার বুকে মুখ লুকাইয়া—কাঁদিয়া ফেলিল।)

মা। (মেনকার মাথার চুলের মধ্যে হাত দিয়া) কি হয়েছে মা, অমন কচ্ছিস কেন।

মেনকা। মা এ বিয়ের কাজ নেই—

মা। অ্যাঁ···মেনা।

মেনকা। মা আমার জন্যে বাড়ীখানা নষ্ট করে ও কাজ করো না মা, তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বল'...

মা। কে তোকে বললে—না-না—

মেনা। মা আমি তোমার মেয়ে, আমাকে কোও কেন মা।

মা। না-না তুই ছেলেমানুষ, তুই ওসব কি বুঝি, উনি যা ভাল বুঝেছেন তাই করেছেন।

মেনা। ভালো এতে কি হবে মা!

মা। উপায় নেই। উপায় থাকলে করতেন ।।

মেনা। তবে কাজ নেই—মা।

মা। সবঠিক, লোকের কাছে যে খাওয়াই বেন—তা হয় না মা।

মেনা। না মা কাজ নেই।

মা। আর কেরান যায় না বাছা!

মেনা। না মা এমন করে সব খুইয়ে কাজ ই।

মা। তুই সুখ সচ্ছন্দে ঘরকন্না করবি বলেইত ছি। সেই আমাদের ভাল।

মেনা। তোমরা পথে বসলে কি আমার সচ্ছন্দে হবে বল।

লোক। সে যা হবার তা হবে।

মেনা। নাঁহা কাজ নেই।

(লোকনাথের প্রবেশ)

লোক। গিন্নী সব ব্যবস্থা ঠিক করে এলুম,—ন তাঁর মনে যা আছে তাই হবে।

মা। এদিকে মেয়ের পাগলামি শোন, মেয়ে বিয়ে তে চায় না!

লোক। কি রকম? তারপর? কেন?

মা। আর আমার বরাৎ, অমন ঘর বর, তা যে এমন করে সবাইকে পথে বসিয়ে, আমার ন বিয়ের কাজ নেই।

লোক। এসব কথা তাকে বললে কে?

মা। বলবে আর কে—বল? একথা কি আর ছাপা থাকে।

লোক। বটে, তার মতামত নিয়ে তোমার আমার ব্যবস্থা করতে হবে না কি? ও সব বাজে কথা, এখন যা করে হয় করতেই হবে।

মা। কি জানি বাপু, ও কান্নাকাটি করছে, তখন ও কাজ নেই।

লোক। আশীর্বাদে হয়ে গেল, কাল পাকা হলুদ, পরশু বে, আমি কথা দিইছি, শেষে লোকের কাছে কি খাওয়াই হব—

মা—কি জানি বাপু। কাজ নেই—শেষ কি করতে, কি ..

(যতীনের প্রবেশ)

যতীন। আমিও তাই বলি না হওয়াই ভাল।

লোক। এতক্ষণ ধরে কি দুজনে পরামর্শ করছিলে।

যতীন। না বাবা, আমি দেখতে পাচ্ছি এতে ভাল হবে না।

লোক। তোমার দিব্যদৃষ্টি জন্মেছে তা আমার জানা নেই।

যতীন। এ সহজ বুদ্ধির কথা, একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়।

লোক। আমার সে সহজ বুদ্ধিরও অভাব! তবে যে জন্যে বলছ, তা বুঝতে পারছি, বাড়ীখানা যাবে. এই। বাড়ী সঙ্গে করে আসি নি সঙ্গে যাবেও না। যতক্ষণ আছে, আছে। তোমার সে ভাবনা কেন তুমি পুরুষ মানুষ, আকাশের নীচে মাথা তুলতে ভগবান তোমায় পাঠিয়েছেন, তোমার সে ভাবনা কেন।

যতীন। আমার জন্যে বলিনি। মেনার জন্যেই বলছি। দুজন মন নিয়ে কথা।

লোক। হুঁ! তোমার সঙ্গে কি আবার মনস্তত্ত্বের তর্ক করতে হবে নাকি? কি রকম!—মেনা···

মেনা। বাবা—না—বাবা! (মেনা, একহাতে দিয়া চোখ মুছিয়া নখ খুঁটিতে খুঁটিতে চলিয়া গেল।)

লোক। কি! আমার মুখের ওপর···

(যতীনের মার পুনঃ প্রবেশ)

শুনলে, মেয়ে কি বললে। তারপর···

যতীন-মা। তুমিও যেমন?

লোক। কি! ছেলের দিব্য দৃষ্টি হয়েছে, মেয়ের চোখ খুলে গেছে, সব সবজান্তার অবস্থা, আমার সহজ বুদ্ধিরও অভাব।

যতীন-মা। এই সব অবস্থার জন্যে বলেছে, যতে'ত কদিনই আমায় বকছে। ওরা কি অত বোঝে।

লোক। বোঝে না যদি ত এ পাকামি কেন?

যতীন। আমি ভালই বলছি, এ বিয়ে না-হওয়াই ভাল, নরেন আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে···

লোক। ও তাই! তোমার সঙ্গে মতের মিল হয় নি, বলে, আমি সর্ব্বস্ব খুইয়েও এই বিয়ে দেব, দেখি কেমন না হয়?

যতীন-মা। তুমি কি পাগল হলে।

লোক। হ্যাঁ, বাকি আছি তাও হতে হবে।

যতীন। বাবা তুমি বুঝতে পাচ্ছ না।

লোক। কিছু না। কাল গায়ে হলুদ, আজ বারে কাল বে, সমাজের কাছে, এই বয়সে আমি বেলোয়ার কাজ করি, আর পাড়ার লোক গাল কাৎ করে হাসুক কেমন? আমি কার কথা শুনব না—যাও।

যতীন-মা। তা সব শেষ করে কি।

লোক। হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা সব শেষ হোক্! গিন্নী তুমি বুঝতে পারছ না। গরিব বাপের ছেলে ছেড়ে বলতে ওদের অভিমান হচ্ছে।

যতীন। বাবা তুমি উল্টো বুঝছো।

যতীন-মা। যতে তুই থাম্।

যতীন। যা তোমাদের ইচ্ছে হয় কর।

(কমলা ও মেনকার প্রবেশ)

কমলা। বাবা!

লোক। তুমিও এসেছ বল, তুমিই বা চুপ্ করে থাকো কেন, তুমিও বল কাজ নেই—কাজ নেই।

কমলা। না বাবা! আমি কি বলব, তুমি যা ভাল বুঝছ করছ—

মেনা। না-মা···যা।

(মেনা চলিয়া গেল।)

কমলা। মেনা-মেনা··· (পিছনে ছুটিয়া গেল)।

লোক। কি?···(চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া রহিলেন) এ সব কাণ্ড কারখানা কি?

যতীন। কিন্তু মা! মস্ত ভুল করলে। ভাবলে সর্ব্বস্ব খুইয়ে, টাকা দিয়ে ছেলে কিনলে তা নয়। তারা বড় মানুষ আমরা গরীব। তোমরা ভাবলে ওদের কিনলে, তারা ভাবলে আমাদের কিনে রাখলে। কিন্তু কুকুর বেড়ালের হিসেবে তোমার মেয়েকে এক মুঠো ভাত দেবে। মা বড় মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক করতে নেই। তাদের দয়া পেলে কেনা-গোলাম হতে হয়। যেই তাদের কাছে হাত পেতেছে তারা সেই অসময়ে, সেই ফাঁকে গোলাম বানিয়ে নেয়।

লোক। থাম্ থাম্—তোর বক্তিমে রাখ, আমি কি কখন কার কাছে হাত পেতেছি।

যতীন। এ-তার চেয়েও বেশী। এর পর দেখবে তাদের বারো মাসে তেরো পার্ব্বণে তোমায় গিয়ে আত্মীয়তা করতে হবে, শাক পটল আলু কুমড়ো-কোটা থেকে মাছের আঁশ ফেলতে হবে, তাতেও মন পাবে না আর শুনতে হবে, বা-ঘরের ঘর থেকে মেয়ে এনেছি। ভেবেছ কি এ সব আমি তা হতে দেব, অসম্ভব! ভদ্রাসন গেল যাক, দুঃখু নেই কিন্তু এর পর নরেনের বাড়ীর তকমা পরা

চাপরাসী পর্য্যন্ত চোখ ঠেরে তাকাবে। অসহ্য মা! সে অসহ্য।

লোক। তোমায় সহ্য করতে হবে না, আমায় করতে হবে, আমি যখন মেয়ের বাপ তখন আমি দুনিয়ার জুতো লাথি ঝাঁটা সহ্য করবই, তোমায় করতে হবে না। তোমরা সহ্য করবে কেন?

যতীন। যা তোমার ইচ্ছে হয় করগে—বল্‌লে যখন শুনবে না।

যতীন-মা। কি হবে, এ ছেলে-মেয়ে নিয়ে আমি যে কি করব···তা ভেবে ঠিক করতে পারি নে তোরা খাস না বাপু—

লোক। কেন ছেলে বলেন কাজ নেই, মেয়ে বলেন যে করব না, সমাজ বলেন জাত যাবে, মনু বলেন সাত পুরুষ নরকস্থ, পরাশর বলেন তুষানল, তুমি ঘর তপিস্তে করা বর। পাড়ার লোকে বলছে আমার কপাল ভাল আলো করা জামাই হল, ওদিকে বাস্তু বলেন যাই, যাই, আমি হাঁকাই আর আর বলি কোথায় যাই! কেথায় যাই! তুষানল এমনিই জ্বলে উঠ্‌ছে যখন সই করে দিলুম তখন মনে হল পাঁজরার হাড় ক'খানা খসে গেল আর চারদিকে যেন আগুনের লতা উঠ্‌ল।···ওই ঘরটায় আমি জন্মেছিলুম, বুঝলে, ওই ঘরটায় মা মারা গেছেন ওইটুকু ওই আমার গয়া গঙ্গা বারানসী—উঃ ·····ওই ছুইটুকুতে কোলে মাথা রেখে সেই ঘুম ঘুমোব তাও হোল না—চাক্ষুস দেখছি, না আর হোল না।

যতীন-মা। হ্যাগা এমন করে তবে কাজ নেই··· হে বিপদভঞ্জন কি করলে!

অ কমলি কমলি—দেখি আবার গেল কোথায়?

(প্রস্থান।)

লোক। কি যে একটা ওলট পালট হবে বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি নি। কিন্তু অদেষ্টের পথ ছাড়িয়ে যেতে পারব কি? না পথের বাঁকরে হেঁচটে কর্কটে হুমড়ি খেয়ে পড়বো। উহুঁ—অদেষ্টকে গড়ে তুলবে তুমি, না অদেষ্টকে গড়বে তোমায়। না হে না—একটা আছে ভারা, একটা বড় খেলোয়াড় আছে ভাব কেন? সে বেশ হক চক করে ভাঙ্গা গড়া করে নেয়। তবে ভাবনা কেন···অনেক দিন তার জন্যে দাঁড়িয়ে আছিস লোক। এইবার জমি নিয়ে বোস, সে আস্‌ছে, আস্‌ছে আর ভাবনা কি?

(নেপথ্যে সদানন্দ—লোকনাথ আছিস্?)

কে দাদা—এস! এস!

(সদানন্দের প্রবেশ)

সদা। কিরে লোক! শেষটা এ কি করলি রে ভাই! আমার ত মনটা সোয়াস্তি মানছে না, শুনছি চাকরীটেও ছেড়ে দিলি।

লোক। আর অনেক দিন ত খাটলেম দাদা। যতে মানুষ হয়ে ওঠ্‌ল,—আর ত মেয়ের বের ভাবনা ভাবতে হবে না। সে দুস্তর সাগর আমি পার হয়ে গেলাম, আর কিসের ভাবনা।

সদা। বলি উড়ুপে চড়ে সাগর পার হলি, না বাঁদরা তলা ফুটো ভোঙায় লোণা জলের চুবন খেয়ে খাবি খেতে খেতে, কেমন?

লোক। বলি পার ও' হলুম্।

সদা। কই আমি যে দেখ্‌ছি ভাই [illegible] কাজলা মেঘ আঁজলা ভরে আগুন তুলছে, [illegible] না ডাকে!

লোক। কর্ম্মে অধিকার ফলে নয়।

সদা। আমাকে বঞ্চনা করো না লোকনাথ! এত বড় জাতটা মরে যেতে বসেছে শুধু নিজের কাছে নিজে প্রবঞ্চনা করে। দেখ লোক! সত্যি প্রাণের খেলায় যে খেলুড়ী হয়ে খেলে সে বেশ জমে যায়, সে ঠিক প্রাণের সব মোড় ঘুরে, আরামে মশগুল হয়ে জিরোয়, কিন্তু এই নিয়ে যারা নকড়া ছকড়া করে তার ইহও নেই পরও নেই। মেয়ে সুখে থাকবে বলে এতটা করি আবার বলিস কেনে ফলে নয়।

লোক। দাদা বীজ পুঁতেছি গাছ আবেছি, এখন ফল পাকছে, সে পাকা ফলটী না খেয়ে যাব কি? কথাটা কি জান দাদা অদেষ্টে যা আছে তা হবেই।

সদানন্দ। অদৃষ্ট! অদৃষ্ট।

লোক। এমনি পোড়া অদেষ্ট, মেয়েটা বলে এমন করে' বিয়ের কায নেই।

সদানন্দ। তা তারত ননিবিধার প্রাণ বটে, ছোট মেয়ে হলে কি হয়। সে ঠিকই বলেছে।

লোক। সবই আমার অদৃষ্টের ফল, যখন এগি-য়েছি তখন পেরুতেই হবে।

সদানন্দ। সেত তোর কপালে বুড় বর আমি করব কি? লোকনাথ! পিদ্দীমের বুকের তেল শুকিয়ে এসেছে, বুঝি বা দপ করে নিভে যায়। ওঃ! গেল! গেল! নিভে গেল! এই পোড়া অদেষ্টকে উপড়ে দেশ থেকে টেনে কালা পাণির কাল অন্ধকারে গুঁজড়ে দিতে পারতুম।

লোক। আবার জোয়ারে ভেসে আসবে দাদা, আবার জোয়ারে ভেসে আসবে,আবার সাঁড়াসাঁড়ির বাণ ডাকবে এ সব ভাসিয়ে দেবে।

সদা। কালই তবে গাঙে জলুস কেমন, কালই?

লোক। কালই ফলে ফল ধরবে, দাদা, কালই!

(যতীনের পুনঃ প্রবেশ।)

যতীন। বাবা। শানাইওয়ালারা এসেছে।

লোক। বেশ তাদের বাজাতে বল, কেমন বাজায় শুনে বন্দোবস্ত কর।

(যতীনের প্রস্থান)

সদা। বিয়ের বাঁশী ও বাজালি লোকনাথ কিন্তু! শেষে পোঁ ধরবে কে তাই ভাবছি রে ভাই।

লোক। যে বাঁশী বাজায় আর যে বাঁশী হয়ে যাচ্ছে, সেই পোঁ ধরবে দাদা।

সদা। লোকনাথ! তুই কি বলছিস্—, সে জয়লা থাকলে—

লোক। সদানন্দ দাদা! আনন্দ কর! আনন্দ কর! দাদা! আনন্দ কর! ভয়টাই বা কি! আমার সব জয়লা হয়ে আসছে আমার মেয়ের বিয়ে তুমি আনন্দ করবে না। আনন্দ কর। আনন্দ কর। ওর কি লোকনাথ আবার পথে বসবে তোমরা পাঁচজন লোকে বলবে, মিনসে পয়লা বেয়াকুব। আনন্দ কর দাদা, আনন্দ কর! বড়ো মানুষ হয়েছে গিন্নীর মেয়ের তপিতে কন্যা বড় জুটেছে। লোকনাথের আলো-করা জামাই হোল, আনন্দ কর! আনন্দ কর!

সদানন্দ। আনন্দ করব না, আনন্দ করব বৈ কি! পাকা গাঁথনী ঘিয়ে চাপ্ চাপ্ থান্ মেরে যাচ্ছে, এমন তাণ্ডব হয়েছে দেখে আনন্দ হবেক নি বল কি গো! ভাণ্ডারও একটা রস আছে, জাতটা অনেক গড়ায়-রস ঘড়া-ঘড়া পান করেছে, এখন একবার ভাঙা গড়ায় ঘেলুড়ী হয়ে দেখতে চায়—তা ভাঙ্ক।

লোক। ভাঙবে! ভাঙবে! একবার তাণ্ডব নাচবে না, ভাঙ খেয়ে শিব ভোঁ হয়ে আছে, একবার তাণ্ডবের নাচ নাচ নাচবে না? বল কি দাদা।

সদা। নাচুক্ হবে ডমরু বাজিয়েই নাচুক, উঠুক তবে শ্রীনয়নের ঝড়, তায় যদি নাচের তালে আগুনের ফলক ওঠে। সব পুড়ে ছাই ভস্মগুলো উড়িয়ে দেবার—একবার যদি এই অষ্ট কালীয় নাগ পালের বাঁধন ছিঁড়ে একবার নাচে।

লোক। নাচবে, নাচবে সদানন্দ দাদা, তাণ্ডবের নেশা যখন ভোরপুর জমে আসবে তখন নাচবে। তুমি মিশ কাল কাজলা মেঘে আঁজলা ভরতি আগুন দেখতে পেলে আর ওই আকাশে ডমরু কড়া টান করে বাঁধছে, শুনতে পাচ্ছ না···যখন মহাকালের ডমরু বেজে উঠবে, তখন তুমিও নাচবে, আমিও নাচব অদেষ্টও নাচবে। আসছে, আসছে, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা সমস্ত সৌরজগতটাও নাচবে।

তোমায় ভাবতে হবে না দাদা। শুধু ভাবনা করে অদৃষ্টের লেখা পাবো।

সদানন্দ। পাবি! পাবি! নাচের ঘুর্ণি উঠলেই সোনের ঘরে ঠিক দেখতে পাবি। যার যে সাধনা সে তাই পায়, তোর অদৃষ্টও তোর জন্যে আলগোছ হয়ে রয়েছে ভাবনা কি? নিজের সৃষ্টিকর্ত্তা নিজেই, বেশ গড়ে তোল্ গোড়ে তোল্।

(সদানন্দের প্রস্থান)

লোকনাথ। ভাঙছি, কি গড়ছি, তা বুঝছি নি —চক্ষুহীনের মত অন্ধকারে হাতাওড়ি দিয়ে হাঁতড়ে বেড়াচ্ছি মনে—হচ্ছে ওই! কিন্তু ভুল বুঝি—আলেয়া! কে জানে সে আলোর সন্ধান। যে দীপ জ্বললে সব আঁধার কেটে যাবে, যত জঞ্জাল পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সে দীপ কি এই দীপ!

(যতীনের মার পুনঃ প্রবেশ।)

যতীন-মা। বড় ঠাকুর ছিলেন বলে আসতে পারি নি, হাঁগা, তোমার এ কি কাজ, মেয়েটা কেঁদে অস্থির করছে, ছেলেটা কোঁপাচ্ছে,সবাই বলছে, বাপু এ কাজ নেই, তবু? কাজ নেই বাপু বর চের জুটবে।

লোকনাথ! অমন তপিস্তে করা ত জুটবে না!

যতীন-মা। তা যার যেমন অদেষ্ট, অদেষ্টে যা আছে তাই হবে।

লোক। তাই ত হবে, সেত তাই অমনি গড়ে তুলছে, তোমার ভাবনা কি, সে ঠিক পথ করে নেবে এখন।

যতীন-মা। আমার ভাবনা নয়; সবই আমায় ভাবতে হয়। কি পোড়া অদেষ্ট।

(নেপথ্যে আবার সানই বাজিয়া উঠিল)

লোক। ভাববার কিছু নেই, অদৃষ্টের বাঁশী বেজেছে, সে থামছে না।

যতীন-মা। তোমার ও কথার হেঁয়ালি আমি বুঝতে পারি নি বাপু, আমার অতশত বোঝবার ক্ষমতা নেই। ছেলে মেয়ে এমনি করছে, আমার ডাক ছেড়ে চেঁচাতে ইচ্ছে করছে।

লোক। তা মন্দ কি, ছেলে মেয়ে, ছেলে মেয়ে বলে তুমিও ডাক ছেড়ে চেঁচাও না কেন, তোমার চেঁচানাতে বিয়ের বাঁশী থামছে না।

(নেপথ্য হইতে ডাকিতে ডাকিতে কমলার প্রবেশ)

কমলা। ওমা, মেনা কথায় গেল—তাকে দেখতে পাচ্ছি নি—

যতীন-মা। ওমা কি হবে গো, ওমা হাতে সুতো বাঁধা মেয়ে ওমা কি সর্ব্বনাশ, ওমা কি হলো গো, আঁ…… (উভয়ের দ্রুত প্রস্থান)

লোক। কি হে ভায়া! এ আবার কি রকম, রকম বেরম, এদিকে আলো জ্বালবার সময় হয়ে আসছে। যে আলোয় সব অন্ধকার জ্বলে ওঠে—সে আলো তবে জ্বলল্ কেমন! কি চুপ করে যে—

(সুরেনের প্রবেশ)

সুরেন! বাবা সে প্রাণশঙ্কর ত মহাশঙ্কটে ফেললে বলে আড়াই হাজার টাকার বেশী দিতে চায় না।

লোক। তা উপায়, আমার ত বাবা আর কোন উপায় নেই—সাড়ে তিনহাজার টাকার পাই পয়সা কমে যে কাজ করবে তাত মনে হয় না। তবে হাতে পায়ে ধরে দেখতে হবে। আর কোন উপায় নেই। না হয় একটা স্বত্ব মত বেচে দাও তা হলে টাকাটা উঠ্‌বে।

সুরেন। সে তা করতে চায় না।

লোক। এখন শিরে সংক্রান্তি—তবে থাক, বিয়ে বন্ধ করে দাও, সবাই বারণ করছে, উপায়ও নেই, আমি গড়তে গেলে হবে কি—দাও তবে সব বারণ করে দাও……থাক্ সব চুলোয় যাক্!

সুরেন। বারণ!—আঁজ্ঞে, বারণ, বারণ আর কি করে হয়। না তা আর হয় না—দেখি।

লোক। মেনাটা আবার গেল কোথায়? আঃ এ পোড়া দেশে লোকের মেয়ে হয় কেন?

(সুরেনের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

[গাছের তলে চিঠি হাতে মেনকা। নিকটেই সদানন্দের ভাঙ্গা বাড়ী বনজঙ্গল ও পানা পুকুর। সম্মুখেই ঠাকুর ঘর।]

মেনকা। যখন কেউ আপনার হয় না—তখন তুমিই আপনার হও—না?···এইজন্যে এইজন্যে, না, বুঝতে পেরেছি,—তুমি তোমার বাপের অমতে কোন কায করতে পার না, কিন্তু আমি পারি কেমন? যাক্ কেউ তবে আমার নয়। বাপ নয়, মা নয় ভাই নয়, তোমার 'পরে নির্ভর করলুম, তুমিও আমার আপনার নয়। তবে এ সংসারে আপনার কে,—ঠাকুর! তোমার কাছে ত এত মাথা খুঁড়লুম, তুমিও তাই। তখন আর কেন! ওই এঁদো পুকুরে, কেমন অন্ধকার কাল নীলপানা জল ওতে ডুব দিলে কেমন, (অনামনস্কভাবে খুব হাসিয়া ফেলিল)—হা—হা—ওই ত ওই ওখানে—সব দিক যখন অন্ধকার তখন আর কেন, ও-ত বেশ অন্ধকার! ওই কেমন বেশ ঠাণ্ডা কাল—কেউ নেই, জোনাকীরা আসছে এখন তাদের আলো জ্বালে নি, এই ত সময়, তবে, ডুবি না কেন, এইত কেমন! আচ্ছা তারপর, তারপর অন্ধকার...দূর্ তা কেন, আবার কেমন আলো হবে,—কি পাতলা মেঘের আলো, এখন তোমার চিঠির সব লেখা আর কি পড়া যায়—না যায় না।

(সদানন্দের আলুথালু ভাবে প্রবেশ)

সদানন্দ। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। কি আগুন, বাপ্—সেই ত একখানা রাঙ্গা পুরানো চেলি, তাই তোমায় গেছে তা গেছে, বালাই গেছে আবার কি রকম...উহুঁ··· তোমার দিক-বাস জ্বলেছে না? হুঁ—তা আমি তোমার দিক-বাস কোথায় পাব···তোমার ছেঁড়া ন্যাকড়া ট্যানা যদি পার করে আনাও ত' আমি কি করব! একি—একি! কেরে গাছতলায় কে -মেনা তুই এখানে- কেন রে—(মেনকা কাঁদিয়া ফেলিল) কিরে তোর বিয়ে আর তুই কাঁদছিস্ কেনরে! কিরে? বাপ বকেছে বুঝি, না না চল, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

(মেনকা আরো ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল)

মেনকা। না জেঠা মশায়!

সদানন্দ। বাপ্ গুরুলোক! তার ওপর কি কথা কইতে আছে রে। পাগলী মেয়ে চল্ চল্, কাঁদিস্ নি।

মেনকা। না জেঠামশায় আর যাব না।

সদানন্দ। পাগল মেয়ে, বাড়ী যাবি নি কিরে। চল মা চল চল্।

(যতীনের মা প্রবেশ)

যতীনের মা। ওমা কি হবে মা, কোথা গেল, অ্যাঁ···ত্রিভুবন খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর তুই এখানে কি কচ্ছিস্ মা, ভর সন্ধ্যে বেলা যদি দেবতার দৃষ্টি পড়ে!

সদানন্দ। বউমা, মেয়েটাকে বকুনি মা, নিয়ে যাও, আহা! ও ঠাকুর পেন্নাম করতে এসেছিল, ভয় কি, নিয়ে যাও!

যতীনের মা। (অবগুণ্ঠন টানিয়া) আশীর্ব্বাদ করুন···যেন,

সদানন্দ। তাঁর ইচ্ছে হলেই হবে- তাঁর ইচ্ছাই সব।

(যতীনের মা ও মেনকার প্রস্থান)

সদানন্দ। কি ঠাকুর! অসময়ে ভর সন্ধ্যে বেলা তুলসী দিচ্ছি বলে হাসি যে আর মুখে ধরে না। দেখ ও হাসি আমি কতক চিনি। আচ্ছা! এত বাড়াবাড়ী কেন? রকমটা কি বল দেখি, দিব্যিত সেই পুরোন চেলি জড়িয়ে লজ্জা নিবারণ করে রয়েছে, তবে আর দিক্‌বাস আলা মূর্ত্তি দেখালে কেন, ভেঙে

বল। কি রকম বল ত? রাখবে না? আহা দুধের মেয়ে—তবে কিসের জন্যে এ লক্ষ্মী পৃথিবীতে পড়ে তুলেছিলে, শুধু ভাগ্য—ভাগ্য আর পড়া ছেলে খেলা ছাকরা না? তা তোমার ছাকরা হতে পারে—তোমার জলের খেলায় ঢেউ ওঠে, অনেক ঢেউ ভাঙে, তোমার জলের ঢেউ বলে কি আমার দরদ নেই,-না? তুমি আমার ঠাকুর, আমি তোর কেউ নই? ঢেউ তুলবে আর ভাঙবে! বলি জল! ঢেউ কি তোমার কেউ নয়? দুর্ব্ব মাড়িয়ে গেলে তোমার বুক চড় চড় করে, আর এই মানুষগুলোকে পাথরের নিষ্ঠেন দিয়ে পিষে মারছ। তার কি তোমার একটুও বুক চড় চড় করে না? তোমার না করে আমার করে; কি বলছ, মার চেয়ে বেশিনী, তাকে বলে ডাইনী কেমন?...তা তুমি বল, আমি কিন্তু এ হতে দেব না। কি বলছ তোমার পোষা বেটা অদৃষ্টের ভয় সদানন্দ রাখে না। সে বাদ সাধুক্ সে ভয় আমার নেই।

(একটা টিক্‌টিকী ডাকিয়া উঠিল),

ঠিক্...ঠিক্...ঠিক্ আবার রসিকতাও আছে। এই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী আগুনের দাহন, তবু তোমার এত রস।

(সদানন্দ তাকাইয়া দেখিলেন, আকাশে ঘোর কাল একখণ্ড মেঘ হু হু করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ডাকিয়া উঠিল) ওই যে, তবে তোমারও আয়োজন করতে হয়, বেশ জাঁকিয়ে তুলছ যে,—

(ঘোর ঘোড়ো দমকা হাওয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া ভাঙ্গা ঘরের বালির চাপ খসাইয়া সদানন্দের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিল। সদানন্দ, একটু হটিয়া গেলেন)

কি সব ভেঙে চুরমার করবে এমনি করে, কর, তোমার কাজ তুমি কর, আর আমার কাজ—আমার কাজ আমি করি...বেশ আমার ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেললেই বুঝি আমি শুনবো;—বটে!

(দূরে বরের বাজনা বাজিয়া উঠিল)

ওকি! ওহো! এতক্ষণে বুঝলুম, তবে আর সময় নেই, অদৃষ্ট বড় চাল দিয়েছে, তবে রইল তোমার তুলসী, আজ তোমায় আমায় বোঝা পড়া থাক্

(সদানন্দ যেমনি ফিরিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে যাইবেন, অমনি দেখিলেন এ সর্প কণা তুলিয়া দুলিয়া উঠিয়াছে)

কি খুড়ো, তুমি আবার বুড়োরে দেখে ফণা বিস্তার করছ যে, ওত তোমার চিরকেলে খেলা—পথ ছাড় খুড়ো, তোমার ভয়ে আমি থামব না.....

(বাহির হইয়া গেলেন।)

(তাড়াতাড়ি কমলা ও সুরেনের প্রবেশ।)

কমলা। কি গো! তোমার আবার কি কথা, এতজায়গা থাকতে পুকুর পাড়ে না এলে বুঝি আর কথা হয় না।

সুরেন। প্রেমের কথা একটু আড়ালে গাছের ডালের তলায় না হলে জমে কি?

কমলা। আহা! যত বুড় হচ্ছেন তত যেন বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাচ্ছে, লোকে কি বলবে বল দিকিন!

সুরেন। লোকে কি বলবে সে ভাবনা আমার নেই, লোকে তা ভাবুকগে, এখন বাবা যে টাকার জন্যে আমায় বলেছিলেন, সে টাকাত সব যোগাড় হয় নি, আর এক ঘণ্টার ভেতর টাকা চাই।

কমলা। তা তুমি তবে এ ভার নিলে কেন? এখন উপায়!

সুরেন। উপায় ত আর কিছুই দেখছি নি, প্রাণশঙ্কর বলে ও বাড়ী রেখে আর এক পয়সা বেশী দেওয়া যায় না। এখন হাজার টাকা দরকার।

কমলা। কি সর্ব্বনাশ! আঁ্যা—তবে উপায়?

সুরেন। তাই ভাবছি কমল—কি উপায় করি।

কমলা। (গায়ের গহনা খুলিয়া) তবে এই সব নিয়ে যাও।

সুরেন। ও হায় কমলা, বিপদ ভঞ্জন দিয়াছেন, বিপদভঞ্জনই তা থেকে উদ্ধার করবেন, দেখি কি হয়—তোমার বোন কি আমার বোন নয়।

কমলা। হ্যাগা তবে, কি হবে, অ্যাঁ বিয়ে বুঝি ভেঙে যায়, কি সর্ব্বনাশ।

সুরেন। চুপ চুপ! কেউ যেন না শোনে! আমি যাচ্ছি দেখি—টপাই ভগবান!

কমলা। মধুসূদন কি হবে অ্যাঁ!

ষষ্ঠ দৃশ্য

(বিবাহ সভা, আলোকমালায় সুসজ্জিত। তখন সন্ধ্যা নামিয়াছে। পশ্চিমাকাশে গোধূলীর রক্তরেখা মিলায় নাই। অন্তরায় বেষ্টন উপর দিকের সোনার রেখার মত ধান পড়িয়াছিল, ধারে ধারে শেষ রশ্মির হলকার মেঘ অগ্নি বৃষ্টি হইয়া উঠিতেছিল। সানাই তখন ইমন কল্যাণীতে তান তুলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গানই দিতেছিল। বরবেশে নরেন্দ্র বরের বিছানায় বসিয়া, বরযাত্র ও কন্যাযাত্রের ভিড়ে বাড়ীর উঠান ভরিয়া গেছে। চারিদিকেই গোলমাল হৈ-চৈ। 'তামাক দেরে' 'আসুন! আসুন! আসুন' প্রভৃতি আদর আপ্যায়ন চলিতেছে। বরকর্তা রামহরি ঘোষ, তাহার পার্শ্বচর, বরেন্দ্রের বন্ধুবান্ধব, যজ্ঞেশ্বর, ওভাবতী। হঠাৎ দু চারিটা আলো নিভিয়া গেল।)

(নেপথ্যে) ওরে আলো নিভে গেল যেরে, আলো আন্‌নারে।

১ম বন্ধু। কি হে নরেন, অত গম্ভীর কেন? বাহিরেও' গেলার কাণ্ড বেধেছে।

১ম বন্ধু। ভিতরেও অদর্শনে গেলব কাণ্ড!

১ম বন্ধু। আচ্ছা বর যে অমন প্যাঁচার মত বসে থাকে, এই বাবা প্রথম দেখলুম।

যজ্ঞেশ্বর। ধাৎ, হুঁ, হুঁ, ওটী লক্ষ্মী প্যাঁচা, মা লক্ষ্মীকে বরণ করবার জন্য এসেছেন।

১ম বন্ধু। হাঁ হে যতীন ভায়া গেল কোথায়?

২য় বন্ধু। কি হে নরেন, তোমার যে—'অবাক্ নয়ন গোচর' অবস্থা, তোমার হবু শ্বশুর মহোদয়টী কোন লক্ষ্মী বহনের জোগাড় করতেছেন হে।

১ম বন্ধু। নাহে তোমরা থাম, নরেন এখন পূর্ণিমার অবস্থায় তার সম্মিলনে ব্যস্ত। কিহে 'মধুরং মধুরং বদনং মধুরং'।

২য় বন্ধু। নাহে ও ঠিক 'এখন যোবার স্বপন দেখার মত। আর যেই বদনচন্দ্র দর্শনং অমনি মুকং করোতি বাচালং।

রামহরি। (স্বগত) লোকনাথেরত' দেখা নেই, বলি (জনান্তিকে যজ্ঞেশ্বর) বলি ও পুড়ো, এরা সব করে কি, টাকা কড়িগুলো ডুবাবে নাকি। ডাকনা হে!

যজ্ঞেশ্বর। বাবাজী সব জড়ো হচ্ছে বুঝছ না এই যে আসছে।

রামহরি। তাইত যে দুর্যোগ, এখন ভালয় ভালয় লগ্নটা এখন—

(লোকনাথ জোড় হস্তে সভায় সকলের নিকট আসিলেন।)

লোকনাথ। গরীবের বাড়ী অনুষ্ঠানের ত্রুটী আছেই নিজ গুণে সব মার্জ্জনা করে নেবেন। দেখছেন্‌ত' কি দুর্যোগ।

রামহরি। সেকি—সে কথা আর বলতে। দেখছি বেই মশায় বড় বেশী উতলা হয়ে পড়েছেন, এত ঘরের কথা। সে সব কিছুই আপনাকে ভাবতে হবে না, রূপার থান সামগ্রীগুলি অতি সুন্দরই হয়েছে। তবে গাড়ুটা আর একটু হলেই বাট বেশ কিন্তু, কি বলো পুড়ো।

যজ্ঞেশ্বর। গাড়ুটা একটু কেমন কেমন হয়েইচে, একটা বড় ভুল করেছিস্' লোকনাথ একখানা তাড়ু গড়িয়ে দিলি নি! রাজার বেটা রাজা জামাই করলি লোকনাথ একখানা তাড়ু গড়িয়ে দিলি নি!

মহা ভাবনায় ফেল্‌লি। শেষ করলি।

লোক। সব ভাবনাই ত শেষ করেছি খুড়ো!

রামহরি। বেইমনাষ, যৌতুকের তারটা তবে আনা হোক্—

লোক। এই যে বর অন্তঃপুরে যান।

রামহরি। হাঁ হাঁ হাঁ তাকি হয় সভায় সকলে দেখুন; এ কি কথা হোল!

(যজ্ঞেশ্বর চলিয়া গেল।)

ওস্তাদজী। হাঁ-হাঁ-হাঁ—তাও কি হয়, সভায় করুন; সকলেই আপন্ন হোন, বটেই ত।

[ইতি মধ্যে আবার যজ্ঞেশ্বর ঝড়ের মত পুনঃ প্রবেশ করিল; হাতে একখানি ছবি। ছবিখানা নরেন্দ্রের মাথার উপর দেওয়ালে টাঙাইয়া দিল। ছবিখানা গাঢ়ের ডালে ফ্রেমে-বাঁধা। সকলে উৎসুক হইয়া তাকাইয়া দেখিল। সকলের মাঝে দাঁড়িপাল্লার একধারে বরবেশী চৌপর মাথায় নরেন্দ্র, হাতে একটি সোনার গদা, কোলের কাছে একটি আধমণি ওজনের বাটখারা। তাহাতে ইংরাজী অক্ষরে C. U. লেখা। অন্যধারে পাল্লার থামা, মূল্যায় করিয়া টাকা ঢালা হইতেছে, নরেন্দ্রের পাল্লা আর উপরে উঠিতেছে না। তবুও ওজন বাকি। নরেন্দ্রের বাপ রামহরি ঘোষ মুটার হাতে লোকনাথের মাথায় এক ঘা বসাইয়াদিয়াছেন। লোকনাথের মাথা দু ফাঁক হইতেছে। উপরে দালানের বারান্দায় দাঁড়াইয়া দুইটী স্ত্রীলোক জোড়া শাঁক বাজাইতেছেন। একটু দূরে সদাবন্ধ ছাঁকা হাতে দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতেছেন। রামহরি টাকা গণিতেছিলেন—ছবি দেখিয়া সকলেই যথা কোলাহল করিয়া উঠিতেই, তিনি মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন। আর যজ্ঞেশ্বর খুড়ো অমনই গান ধরিল]

যজ্ঞেশ্বর। এমন দিনে বাজ্‌ল জোড়া শাঁক।
ছেলের বাপের ফস্‌ল কপাল
মেয়ের বাপের কপাল ফাঁক্॥

রামহরি। কি? আমায় দাঁড়িয়ে অপমান, কি কাজ এসব!

নরেন্দ্র। বাবা আমি কিছুতেই বিয়ে করব না।

যজ্ঞেশ্বর। না না কিছুই নয় ভাইপো! বিয়ের রাত্তির একটু আমোদ করছি। ও নরেনের যে, ও একটু ধুলো পরিমাণ। গোধূলি লগ্নে একটু ধুলো লাগবে বৈ কি?

শোন্‌রে ওই শোন্
সানাই কয় কি—
পাঁচটা পাসের জামাই এনে
হাজির করেছি
ভোঁ ভোঁ ভোঁ পোঁ পোঁ পোঁ
জমকে সেছে বিয়ের ঝাঁক্॥

রামহরি। কি, আমি খানদানীর মামলা আনব।

যজ্ঞেশ্বর। ভাইপো! বাবাজী! অবুঝ হয়ো না, বিয়ের আনন্দে একটুখানি রসিকতা, মান কোথায় বাবাজী, এত সবই জল কচুর অবস্থা।

সোণার চাঁদ জামাই মরি
আলো করেছে
সোণার চেয়ে ওজন ভারি
পাল্লা ভরেছে
ওম ওমা ওম্ ওম্ ওমা ওম্
বেজায় শোরে বাজবে ঢাক্॥

নরেন্দ্র। বাবা তুমি বুঝতে পারছ না। কালই আমাদের খাঁসায়তের দাবী দিয়ে চিঠি দিতে হবে, চল—

যজ্ঞেশ্বর। চটো কেন দাদা, আগে আমার গানটা শুনে যাও।

প্রথম দফায় বরতে দাঁড়ি
শেষ করলে ছিটে বাড়ী
রজত মুদ্রা একটী কাঁড়ি
ধামায় ভরে সাজিয়ে রাখ।
দ্বিতীয় দফায় সোণার লাড়ু
এতক কাবার গিন্নীর খাড়ু
তৃতীয় দফায় বাসন কোসন
ভরসা এখন কুমোর চাক্॥

(অকস্মাৎ ঝড়ের মত সদানন্দ ঠাকুর বাগ্রভাবে ছুটিয়া আসিয়া অন্তঃপুরের দিকে যাইতে গেলেন।)

সদানন্দ। এই যে সব আয়োজনই করেছ!

যজ্ঞেশ্বর। আরে সদানন্দ দাদা! কোথা যাও শোন শোন!

সদানন্দ। কি ঠাকুর! শেষ হাত ধরে টেনে রাখবে নাকি? তা পারবে না, আমার কায আমি করব।

(যজ্ঞেশ্বরের হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল)

রামহরি। কি দাঁড়িয়ে অপমান এতবড় আস্পর্দ্ধা —চল—

২য় প্রতিবেশীগণ। বর চলে যাবে কি, ভদ্দর লোকের মেয়ের জাত যাবে—

১ম প্রতিবেশীগণ। একি কথা রামহরি বাবু! ভদ্দর লোকের মেয়ে—

রামহরি। ইতর! ইতর! ভদ্দর লোক! ও আবার ভদ্দর লোক!

যতীন। দেখ মুখ সামলে বাবা! বাবা! — না-না আমি টাকা আনছি।

লোকনাথ। যেতে দিন—তবে দু'চার টাকা কম্···

রামহরি। ও কি রকম কথা—সে কথা ত' আগে ছিল না।

(তাড়াতাড়ি যতীনের প্রবেশ হাতে থালায় নগদ টাকা রাশ করিয়া চালা)

যতীন। এই যে—

(রামহরি টাকা গণিতে লাগিলেন বাহিরে সানাই বাজিতেছিল, ও দোতালার দালানে জোড়া শাঁক বাজিতেছিল।)

যতীন। (জনান্তিকে) বাবা টাকা যে হাজার টাকা কম।

লোকনাথ। সেকি! উপায়, অ্যাঁ সুরো গেল কোথায়! কি করলে সুরো আমার সভার মাঝে

যতীন। সুরেনকে ত সন্ধ্যে থেকে খোঁজ করছি পা ওয়া যাচ্ছে না। সব ভারই'ত তার উপর, সে এ সময়ে—

রামহরি। বেই মশায়, টাকা এতে কত আছে···

লোকনাথ। আজ্ঞে ··অ্যাঁ, অ্যাঁ ··তা সামান্য কিছু কম···

রামহরি। অ্যাঁ কি চালাকি, আমি পেটো রাম' আমার সঙ্গে চালাকি, ও সুরো টুরো বুঝিনে, বটে তাই আগে থাকতে বর বাড়ীর মধ্যে পুরতে চাও না···ছোট লোক, ইতর আমি তখনি জানি, এই যজ্ঞেশ্বর আমায় এই কাণ্ডটা ঘটালে, বটে, জোচ্চুরি···

লোকনাথ। আজ্ঞে, আমি সর্ব্বস্ব দিয়েছি—

রামহরি। জোচ্চোর! জোচ্চোর! সবইত কথার খেলাপ—ওস্তাদজী বর তুলুন,—নোরো ওঠ্।

প্রতিবেশী। তাকি হয়, বর তুলবেন কি?

রামহরি। আমার ছেলের বে, তুমি কোন ভাজা গাঁয়ের মোড়ল হে, তোমায় কে ডেকেছে···

প্রতিবেশী। মশায়ত' সবান্ধবে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন।

রামহরি। রাখ তোমার নিমন্ত্রণ, যজ্ঞেশ্বর! যজ্ঞেশ্বর!

লোকনাথ। (মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন)

যতীন। বাবা! বাবা!

লোকনাথ। জামাই যে আমায় এমন বিপদে ফেলবে, ওঃ সে একবার বলেছিল বটে, তা যা হয় করবে বলে গেল,—

রামহরি। জামাই! জামাই! জামাই এসে জামাই খেবে—জোচ্চোর! যজ্ঞেশ্বর! যজ্ঞেশ্বর! বলি তিন হাজার টাকা নগদ দেবার কথা ছিল না?

লোক। আজ্ঞে হ্যাঁ—তিন হাজার টাকারই কথা ছিল—হবে! অ্যাঁ···সুরো···কি—অ্যাঁ।

যতীন। আপনি স্থির জানি পাট জ্বালিয়ে—দেউলে লিখিয়ে লোকের সর্ব্বনাশ করা—চামার...

(তাড়াতাড়ি সুরেন ও জনৈক প্রতিবেশীর প্রবেশ)

সুরেন। এই নিন টাকা···

লোকনাথ। এতক্ষণ কি করছিলে বাবা—

প্রতিবেশী। আর করছিল কি ? তস্কর সন্তান, যথা সর্ব্বস্ব পাটা বাঁধা দিয়ে, এই ছুটতে ছুটতে আসছেন, এই চামার, এই চামার বেটার জন্যে লোকের জাত যায়, বেটা.. কসাই···বেটা পয়ের

নরেন। আমি তোমার নামে জানহানির মামলা আনব সাবধান্—

প্রতিবেশী। অবধান ! যা আনগে যা চন্দমখোর, —বেটারা আবার কথা কয়—

যজ্ঞেশ্বর। ঘোষরা বলায় গানের আমোদটাই মাটী হচ্ছিল আর কি। যাক্ ! লোকনাথ—ওরে— অ - যতে স্ত্রীআচারের যোগাড় দেখগে ..ততক্ষণ গান চলুক্ !

সপ্তম দৃশ্য।

[মেনকার ঘর। ঘরে সাজান হইয়া গেছে। মেনকার একহাতে একখানা চিঠি, অন্যহাতে কাজল লতা। মেনকা অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে সেই চিঠির দিকে তাকাইয়া, দাঁড়াইয়াছিল। নেপথ্যে বরপক্ষের তখন গান চলিতেছিল। মেনকা জানালার ফাঁক দিয়া বরসভায় টাজান ছবি দেখিল। তাহার চক্ষু ঘোর ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বাহিরে অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিল। মেনকা কান খাড়া করিয়া শুনিতে লাগিল।]

(নেপথ্যে চীৎকার)—কখনই না, এ টাকা ফেরাতেই হবে, কি এমনি করে টাকা নেওয়া, চন্দমখোর, কশাই !

(নেপথ্যে নরেন্দ্র।) বাবা, চুক্তি ভঙ্গের নালিশ রুজু করে দেবো,—দেখনা, আমি কি করি।

নেপথ্যে তখন গান চলিতেছিল।

চতুর্থ দফায় খাট বিছানা
সায় করলে কপনি টেনা
পঞ্চম দফায় বরাভরণ
চড়ক্ গাছে দেবে পাক্ ।

মেনকা। হাঁয়ে, অহর,...অহর ! অহর।

নেপথ্যে গান।

কি কল বানালে মুনিভাররসিটী
গড়তে সোনার পাথর বাটী
ভিটে মাটী করে চাটি
দেশটা করলে পুড়িয়ে খাক্ ।

মেনকা। পুড়িয়ে খাক্ ! ঠিক, জ্বালিয়ে ! জ্বালিয়ে ! এই যে ..তোমায় আমায় বিয়ে না ? অগ্নি স্বাক্ষী ! ধর্ম্ম স্বাক্ষী ! নারায়ণ স্বাক্ষী ! সাত-পুরুষ স্বাক্ষী ! এরি নাম বে, না—ঠিক ! তুমি পুরুষ, আমি মেয়ে ! কে এ মেয়ে পুরুষ গড়লে ! কার সৃষ্টি ? ভগবানের ! অ্যাঁ ভগবান ত' তবে পুরুষ মানুষ ! ঠিক···তাই ! আচ্ছা তবে মেয়ে ভগবান নেই ! অ্যাঁ মেয়ের ভগবান নেই ! যখন এ মেয়ে ভগবান নেই তখন বেঁচে লাভ। ছেলেবেলা থেকে ভাব, ভাল বর ! ভাল বর ! এ তবে কি ? উঃ মেনকা তবে কিছুই নয়, টাকাই সব ! আমি তবে কিছুই না ! যা কিছু না—তা কিছু নাই হোক্ !

(কাজল লতা দূরে ফেলিয়া দিল। রূপার কাজল লতা তখানা টুক্‌রা হইয়া ছিটকাইয়া পড়িয়া গেল)

তুমি অন্ধকার, আমার জন্যে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ! কি বলছ অন্ধকার থেকে সব এসেছে সবই অন্ধকারে যাবে। তা অমন করে আমার মুখের উপর তাকিয়ে হাসছ কেন? পাড়ার লোক তোমরা অত গোল করছ কেন। দেখছ না ওই যে আমার বর কাল ডানা ছড়িয়ে, আমায় বুকে নেবার জন্যে আলগোছ হয়ে রয়েছে। আমার সব দিন গুলোর শেষ রাত্রি ত এসেছে, তবে আর কেন?

[ঘরের কোণে টিনের কালেণ্ডারার কেরোসিন তৈল ছিল যেনকা হুড়্ হুড়্ করিয়া মাথায় ঢালিয়া দিল; যেনকা সেই অন্ধকার পানে চাহিয়া দেখিল, বড়া তাণ্ডব নৃত্যে মাতিয়া উঠিয়াছে। আকাশে পাতালে মেঘের জটা উড়াইয়া অন্ধকার মাতিয়া বেড়াইতেছে। প্রলয়ের ঘোর অট্টহাসি, বজ্রের হাহাকারে আটিয়া পড়িতেছে। যেনকা কাপড়ে অগ্নি লাগাইয়া দিল। সেই ঝড়ের গর্জ্জনের ভিতর 'যেনা' 'যেনা' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে সদানন্দ ছুটিয়া আসিল।]

নেপথ্যে গান।

বাপের পাজরা কাঁকরা করে
আলিয়ে করলে পোড়া খাক্।
ছেলের বাপের কপাল ভাল,
মেয়ের বাপের পুড়ে খাক্॥

(যেনকা তখন ধোঁয়া ও আগুনের মধ্যে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চিঠির পানে চাহিয়া চাহিয়া পড়িয়া গেল—সদানন্দ কোলে টানিয়া লইলেন।)

সদানন্দ। কি করিলি মা।·· ঠাকুর! এই তোমার পুরোন চেলি·· হায়! হায়! হে বিরাট! তাই তোমার বিশ্বাস জলে গিয়েছিল। তুমি অদৃষ্টকে দিয়ে আমায় হারালে, নেই . নেই...ওঃ... তবু তোমার হাসি একটুও টস্‌কায় নি, ধন্যি পাষাণ তোমার প্রাণ! পাষাণ! বল তোমার স্বার্থে কড় তুলতে ইচ্ছে হয় কি না?···না না ঘরী! বুঝিয়ে দিলে যে আমি কিছু নয়।

(নেপথ্যে কমলা) অ যেনা, যেনা, ও ছুটকী! যেনা, ও দিকে অত আগুন কিসের লো!

(কমলা ছুটিয়া আসিল)

কমলা। ওমা শীগ্‌গির এস। ওমা, যেনা কি করেছে দেখ। (চারিদিকে খুব গোল উঠিল। যতীনের মা ছুটিয়া আসিল।

যতীন-মা। ওমা, কি করলি মা, ওমা আমার কি হোল গো!

(আছড়াইয়া পড়িলেন।)

(যজ্ঞেশ্বর, রামহরি, নরেন্দ্র, লোকনাথ ছুটিয়া আসিল।

যজ্ঞেশ্বর। এই যে হেঁ হেঁ কৌতুকটা বেশ জমজমাট হয়ে গেল।

প্রতিবেশী। (রামহরির প্রতি) কসাই মাংস ভাল হয়ে গেছে, এস শুরু করে।

নরেন্দ্র। যতীন, ভাই।

বিন্দি। ওমা কাল খেয়ে! ও দিদি কি কাণ্ড করলি রে!

লোকনাথ। সদানন্দ দাদা, আনন্দ কর! আনন্দ কর! ওই দেখ পোড়া অদেষ্ট পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে, আর নতুন খেলা খেলবে না। মরতে পেরেছ মা! তবে আর কেন হরি বোল দাও, বল হরি, হরি বোল,—

সদানন্দ। চুপ্ গোল কর না আত্মা নিরুদ্দেশে মিশছে।

লোকনাথ। সদানন্দ দাদা! আর শ্মশানে যাবার কোন প্রয়োজন নাই, এই খানে তবে তর্পণ শেষ করি কেমন!

রামহরি। অ নোত্তো ওরে চলে আয় না, ওরে আমার কি ফাঁসাদে পড়ব!

নরেন্দ্র। (যতীনের হাত ধরিয়া) ভাই!

যতীন। আর বন্ধুত্বে কাজ নেই, চের হয়েছে দেখছ না ওই যে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তোমার মত সাথী পড়ুয়া না পেলে পড়া এমন পড়ব কি করে।

নরেন্দ্র। মাপ্ কর ভাই!

রামহরি। নোরো নোরো (নরেনের হাত ধরিয়া টানিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম)

প্রতিবেশী। কি রকম ও টাকার থলে নিয়ে সরছ কোথায়, বটে ছোচ্ছুরির আর জায়গা পাওনি। হাঁ-রে বেটা বেটা, ছেলের বাপ বলে কি তোর চোখে চামড়া নেই অ্যাঁ। অ্যাঁ। আটকুড়ির পুত! তুই লোক ধনে প্রাণে মারা গেল আর তোর টাকা...

নরেন। (হাত ছাড়াইয়া) বাবা তোমার ছেলে বটে, কিন্তু মানুষ, বোধ হয় পাথর হলে ফেটে দুখান হয়ে যেত—উঃ!

রামহরি। অ্যাঁ তা তা—তা আবার সে পাঁচশ টাকা খরচ হয়ে গেল। (প্রতিবেশী রামহরির গলার চাদর ধরিয়া টানাটানি।)

রামহরি। ওরে বাবারে মেরে ফেল্লে রে!

সদানন্দ। চুপ। আত্মা নিঃশব্দে বিশ্লেষে।

অকস্মাৎ কড় কড় কড়াৎ করিয়া বজ্রের ডাক ডাকিয়া উঠিল—

[ঘুরে দেখা গেল, নরেন্দ্রদের বাড়ীর নহবৎখানার কাগজের মশুজ জলিয়া উঠিয়াছে। সেই আগুনের লাল রকমের আভা অন্ধ ঘন-নীল মেঘে, ঘুরন্থিত চাপাগাছের শীর্ষে লাগিয়াছে, নহবৎওয়ালারা দাকাইয়া পলাইতে গিয়া হাতের বাঁশী হাতে করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। চারিদিকে ঘোর প্রলয়ের ধুম ও অগ্নি।]

সদানন্দ। বাজ ডেকেছে, বাজ ডেকেছে, দয়াময়! আগুনের ঝড় উঠুক সব পুড়িয়ে ছাই করে যাও, আবার নতুন করে গড়ুক!

(যবনিকা)

মা'র খেলা

(গল্প)

(শ্রীমতী কিরণবালা দেবী)

আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান ছায়াচ্ছন্ন কক্ষে একাকী মথুরাপ্রসাদ করতলে আপন শীর্ণ গণ্ড স্থাপন করিয়া সম্মুখস্থ শূন্য চণ্ডী-মণ্ডপের পানে একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন। চারি দিকের আঁধার ক্রমে জমাট বাঁধিয়া আসিতেছিল। বুঝিবা শুদ্ধ মথুরাপ্রসাদের হৃদয়ের জমাট বাঁধা আঁধারজাল আজ বাহিরের আঁধার রাশিকে হার মানাইয়াছে। বাতাস অদূরে জমিদার গৃহের নহবৎখানা হইতে কি একটা করুণ রাগিণীকে টানিয়া আনিয়া বৃদ্ধের জীর্ণ বক্ষে লৌহ শলাকার মত বিঁধিতেছিল। সে করুণ মধুর মূর্চ্ছনায় তাঁহার নেত্র পল্লব হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু বর্ষণ হইতেছিল।

দ্বারের অন্তরালে মৃদু পদশব্দ শুনিয়া সহসা তিনি চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "কে—?"

"আমি।"

গৃহিণী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বাহিরের দরজাটি একটু ভেজাইয়া দিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "তবে কি পুজো এবার বন্ধই থাকবে?"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মথুরাপ্রসাদ উত্তর

করিলেন—"আর কত বার ওকথা বলে কষ্ট দেবে, কতবার আর একই কথা শুনবে, দেখে শুনেও কি বোঝনা?" অন্ধকার ঘরের ফাঁক দিয়া এইবার গৃহিণীর করুণ নয়ন দুটী অন্ধকারের দিকে স্থির হইয়া রহিল—তিনি কাতর কণ্ঠে বলিলেন—"কি পাপে এই শাস্তি দিলি মা—আজকের এই আনন্দের দিনে এই কথাটি বন্ধ অন্ধকার ঘর কেমন করে দেখব?" বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া গৃহিণী বলিতে লাগিলেন "সবই দেখছি, শুনছি সবই বুঝছি—কিন্তু মন প্রবোধ মানে কৈ? আর তা ছাড়া ছেলে পুলেরা যে ম্লান মুখে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের যে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না!"

ভগ্নকণ্ঠে গৃহিণী আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন—তাঁহার কথায় বাধা দিয়া মধুরাপ্রসাদ বলিলেন, "কর্ম্মানুযায়ী ফল অনিবার্য্য। সুখে থাকবে বলে বুক-চেরা ধন পরকে দিয়েছিলাম, আজ তোমার সেই ছেলেই—তার কিসের অভাব? গ্রামের জমিদার সে—অথচ সেই তার ভাইদের পানে না চেয়ে তাদেরই গ্রাসাচ্ছাদনের সম্বল জমিটুকু কেড়ে নিলে, তাও তোমার আমার বর্ত্তমানে। আজ তার বাড়ী দুর্গোৎসব আনন্দের হাট, আর আমার—" বৃদ্ধ চুপ করিলেন; কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "দেব দত্তক দিলেও সে ত' তোমার গর্ভের সন্তান—"

গৃহিণী বাধা দিয়া বলিলেন—"সব কথা হয়ত' সে জানে না, তার কানে কি সব কথা পৌঁছয়? দেওয়ান বুজুর্গী যেমন বলে বা করে তাই হয়। সে নিজের ছেলে ত' বটে একবার তার কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলেই আমার মনে হয় সব মিটে যায়।"

বিদ্রূপ ব্যঞ্জকস্বরে কর্ত্তা বলিয়া উঠিলেন—"সে কি কিছু বাকী আছে? পুষ্যির বাপ মায়ের কোন কালে সুখ হয় দেখেছ? তা জেনেও তো গিয়েছিলাম, আমাকে দেখে সে উঠে চলে গেল—তাবল বুঝি টাকাটা বাপ চাইতেই গিয়েছি। যে জন্যে তার কাছে টাকা ধার করা হ'য়েছিল—তাও তার যে না জানা ছিল এমন ও ত' নয়, রমা তারও নিজের ছোট বোন, তার বিয়ের জন্যে টাকাটা ত' সে অমনি দিতে পারতো। কিসের অভাব তার?—

পুত্রের পক্ষ সমর্থন করিয়া গৃহিণী পুনরায় বলিলেন—"সে তুমি নাই কেন বলনা সব কথা সে কখনই জানে না—

"কর্ত্তা গর্জ্জিয়া উঠিলেন "তুমিও না গিয়েছিলে মা'র চোখের জল তার পাষাণ মনকে কি একটুও গলাতে পেরেছিল—তার নাম আর আমার কাছে কোরনা বলেই হয়েছে—সে আমার শত্রু,—পরম শত্রু।"

( )

আজ ষষ্ঠী। সকাল বেলা হইতে জমিদার বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে মহা কলরব। প্রতিমার অঙ্গে ডাকের সাজের গহনা দিয়া সাজানো হইতেছিল। এবার পূজায় একটু বিশেষত্ব আছে;—সারাটা দেশ ব্যাপিয়া স্বদেশী ভাবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে—সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অধিকাংশ পূজা বাড়ীতে প্রতিমার অঙ্গে বিদেশী রাংতার সাজ দেওয়া হয় নাই, মা'কে এবার 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' ও বিলাসিতা বর্জ্জিত স্বদেশী জিনিসে সজ্জিত করা হইয়াছে। জমিদার-বাড়ীতে কিন্তু এ ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে না—বরং যেন অন্য বারের অপেক্ষা এবার পরদেশী সাজসজ্জার আধিক্য অনেক বেশী।

নবীন ও পবিত্র হৃদয়ে কি উৎসাহ, কি আনন্দ! মণ্ডপের সম্মুখে প্রকাণ্ড নাট-মন্দিরে পাড়ার ছেলে মেয়েরা জটলা বাধাইয়াছে। তাহাদের নবীন হৃদয়ে কি উৎসাহ কি আনন্দ সকলেই নির্নিমেষ মনে প্রতিমা দেখিতেছে। কোন ছেলে তাহার সঙ্গীকে বলিতেছে "আচ্ছা বল্ দেখি অসুরের গায়ে জোর বেশী না সিংহের?" আর একজন মহা সমস্যায় পড়িয়াছে—আর বছর কি লক্ষ্মীর পাশে গণেশ ছিল না সরস্বতীর

পাশে? আর একজন বলিতেছে, "আচ্ছা বেচারা মহাদেব এত ছোটই বা কেন? আর মা দুর্গার মাথার উপরে লুকিয়েই বা আছেন কেন?" অপর একটি বালক অনিমেষ নেত্রে প্রকাণ্ড বেলুনওয়ালী ঝাড়ের দিকে চাহিয়া আছে—বোধ করি সে ভাবিতেছে, আহা ঐ রং-বেরংয়ের কলম দুই চারিটা যদি পাইতাম! তাহা হইলে কেমন মজা করিয়া ঐ কাঁচের মধ্যে চোখ দিয়া কত মজার সব জিনিষ দেখিতে পাইতাম। এই বালকবালিকাগুলির অদূরে মণ্ডপের এক কোণে দাঁড়াইয়া দুইটি ছোট মেয়ে গল্প করিতেছিল, একটি জমিদারবাবুর মেয়ে বেলা, অন্যটি মধুরাপ্রসাদের নাতনি সাবিত্রী। মধুরাপ্রসাদের বাড়ী এবার পূজা হইবে না জানিয়া সহানুভূতিসূচক স্বরে বেলা বলিল—"তাই ত ভাই, তোদের টাকা নেই—তা তুই কাঁদিস্ নে। পূজোর ক'দিন তুই রোজ এসে আমাদের বাড়ী পূজো দেখে যাস্, কেমন;" একবার চারিদিকে চাহিয়া সাবিত্রী মৃদুস্বরে বলিল—"তা ভাই হবে না—এই আজ যে এসেছি তাই কত লুকিয়ে।" আশ্চর্য্য হইয়া বেলা বলিল, "সে কি রে—কেন?" সাবিত্রীকে নীরব দেখিয়া বেলা পুনরায় বলিল "তোর মা বুঝি বারণ করে দিয়েছেন?" সম্মতিসূচক ঘাড়টি হেলাইয়া সাবিত্রী বলিল "দাদুও।" "ইস্ ভারি তো তাঁরা, তবে পূজো বন্ধ করেন কেন? তাই বলে বুঝি তুই ঠাকুর দেখ্‌বি না, তুই ভাই ও সব শুনিস্ নি, পালিয়ে আসিস্, বুঝ্‌লি?" এই সময় আরও দুইটি বালকবালিকা তাহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের পায়ের দিকে চাহিয়া সাবিত্রী ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল "ও ভাই দেখ্ ওরা জুতো পায়ে মণ্ডপে উঠেছে, পাপ হবে যে!" ভাই বোন দু'টিকে নিকটে টানিয়া লইয়া বেলা বলিল—"দূর—এতে আবার পাপ কিসের?" সাবিত্রী দুই চোখ বড় করিয়া কহিল "হ্যাগো হ্যা আমি জানি পাপ হয়।" বেলা কহিল, "কি জানি তবে বোধ হয় তোদের হ'তে পারে, আমরা যে ভাই জমিদার।" "ও" বলিয়া বালিকা নীরব হইল। এইবার পূজায় তাহাদের কত সুন্দর সুন্দর কাপড় গহনা হইয়াছে তাহার ইতিহাস বিবৃত করিয়া বলিল—"তোর এবারে কি কাপড় হোল ভাই?" "আমার?" বলিয়া বালিকা থামিল ও কিছুক্ষণ পরে বলিল—"মার' হাতের চরকায় কাটা সুতোয় আমাদের দু'বোনের দু'খানা কাপড় হ'য়েছে, মা শিউলী ফুলের বোঁটার রংয়ে ছুপিয়ে আমাদের জন্যে কুঁচিয়ে রেখেছেন, পূজোর সময় তাই পরে আমরা ঠাকুর দেখ্‌ব।" সমনোন্নতা বালিকার অঞ্চল আকর্ষণ করিয়া বেলা বলিল "দাঁড়া না এখুনি যাবি কি?" "না ভাই—মা বকবেন—" "ইস্ ভারি ত' বকবেন, নিজেরা পূজো করবেন্ না আবার পরের বাড়ী ঠাকুর দেখ্‌তে গেলে বকবেন—তোর দাদুকে বলিস্ নি কেন পূজো কর্ত্তে।" অজ্ঞাতে একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মৃদুস্বরে বালিকা বলিল "সে কি ভাই বলিনি—তা দাদুর সেই এক কথা, মা এবার আমাদের বাড়ী পূজো নিতে আস্‌বেন না।" "হাঁ! তোর দাদু জানে ত ছাই! তুই গিয়ে বল্‌বি যে মাকে আন্‌লেই মা আসেন, বুঝ্‌লি?"

এবার নিজেদের বাড়ীর পূজা বন্ধ হওয়াতে সাবিত্রী বড় মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। কেন পূজা বন্ধ হইল—এই কেন'র পিছনে যে কত গভীর ব্যথার কারণ লুকাইয়া আছে আট বৎসরের বালিকা তাহা কি বুঝিবে? একটা কথা তার বারবার মনে হইতেছিল, বেলা বলিয়াছে, "মাকে আন্‌লেই মা আসেন" সাবিত্রীর চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, মন আনন্দে ও উৎসাহে ভরিয়া গেল। সে এখনই যাইয়া দাদুকে বলিয়া মা দুর্গাকে আনাইবে। পূজার ফুল ত' তাদের বাড়ীতেই আছে, যে রং-বেরংয়ের দোপাটি ফুলের চারা দাদু নিজের হাতে বুনিয়াছিল সে সব গাছ তো এখন ফুলে ভরিয়া গিয়াছে।

বালিকাদের অদূরে থামের পাশে যে বেলার পিতা দাঁড়াইয়া তাহাদের সমস্ত কথোপকথন শুনিতেছেন তাহা বেলা জানিতে পারে নাই। সাবিত্রী চলিয়া যাইবার পর বেলার দৃষ্টি পিতার উপর পড়িতেই সে চঞ্চল হইয়া উঠিল কিন্তু সে দেখিল অন্য দিনের মত সখীর মেয়েদের সঙ্গে গল্প করার জন্য আজ আর তাহার বাবা তাহাকে কিছু বলিলেন না।

(৩)

মাঠে মাঠে হরিৎ শস্যক্ষেত্রের উপর মৃদু ঢেউ খেলাইয়া দিয়া মৃদুমন্দ শেফালির মিষ্ট গন্ধটুকু গায়ে মাখিয়া প্রভাত সমীরণ মধুরাপ্রসাদের আধ ঘুমন্ত ও আধ জাগ্রত চিন্তাকুল মনকে সান্ত্বনা দিবার ছলে যেন তাঁহার ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। এই সময় বালকবালিকাগণের মধুর কলকণ্ঠে ঘরখানি মুখরিত হইয়া উঠিল। "আর কত ঘুমুবে দাদু—আমাদের কলা বৌ চান করান কি হবে না?" প্রভাতস্বপ্ন তিরোহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির আলেখ্যে রচিত স্বপ্নে আগতা দশ আয়ুধধারিণী জগজ্জননীর মূর্ত্তিটিও অন্তর্ধান করিলেন। বিজড়িত কণ্ঠে "মা" উচ্চারণ করিয়া তিনি নেত্র মার্জ্জনা করিয়া বলিলেন—"কটা বেজেছে রে—" সমবেত কণ্ঠে উত্তর হইল—"সাড়ে পাঁচটা।" শরতের নির্ম্মল নীল গগনে উষার কনক কিরণ রেখা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধ মুগ্ধনেত্রে একবার সেদিকে চাহিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া দেখিলেন, মশারীর বাহিরে সাত আটটী বালকবালিকা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—"তোমার কি ঘুম দাদু! ঠিক যেন কুম্ভকর্ণ" সামান্য একটি হুঁ দিয়া মধুরাপ্রসাদ শয্যাত্যাগ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার তাম্বূলকরঙ্কবাহীর দল সড়গড়া, কলিকা ও তামাক টিকার টিন প্রভৃতি লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

"দেখ ত' দাদু" হঠাৎ বালিকা কণ্ঠের কাতর ধ্বনিতে তিনি ফিরিয়া চাহিলেন, দেখিলেন শেফালি গাছের নীচে ক্ষুদ্র শেফালির মতই কোমল তাঁর পৌত্রী সাবিত্রী শেফালি রঙ্গে ছোপান নূতন কাপড়খানিতে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া মৃত্তিকা হইতে ঝরা ফুলগুলি কুড়াইয়া কুড়াইয়া তার ক্ষুদ্র সাজিটি ভরিয়া ফেলিয়াছে। "দেখ ত' দাদু, দাদা সব ফুল নষ্ট করে দিলে।" কণ্ঠস্বরে বিমল বলিল "দাদুকে যে বড় নালিশ করা হ'চ্ছে—কোথায় তোর ফুল নষ্ট করে দিলাম রে মুখপুড়ি!" "না, দিলে না বৈকি—তোমার ছোঁয়া ফুলে বুঝি ঠাকুর-পুজো হয়?" "না তোর ছোঁয়া ফুলেই শুধু হয়—ভারি তো তোর পুজো," এই বলিয়া বিমল আবার সাবিত্রীর ফুলের সাজিটি স্পর্শ করিল। "দেখ না—দাদু - বাসি কাপড়ে আবার ছুঁয়ে দিলে।" "আবার নালিশ! ভারি তো তোর পুজো -ঠাকুর কোথায় তার ঠিক নেই—তার পুজোর ফুল, তবে দাঁড়া।" দাদু "থাক্ থাক্" বলিতে বলিতেই সাজি হইতে মুঠা মুঠা ফুল লইয়া বিমল সাবিত্রীর মাথায় গায়ে ছড়াইয়া দিল। মধুরাপ্রসাদ তাঁহার দুই চক্ষুর সবখানি দৃষ্টি দিয়া শরতের উজ্জ্বল প্রভাতে শেফালি বৃক্ষতলে দণ্ডায়মানা শেফালি-পুষ্পবৃতা ক্ষুদ্র বালিকার কমনীয় দেহলতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার মনে হইল—"তাই ত'! মৃন্ময় আধার ত্যাগ করিয়া কি মা জগজ্জননী আজ বালিকা উমার বেশে তাঁহার গৃহে পূজা লইতে আসিয়াছেন!"

* * * *

বেলা বলিয়াছে "মাকে আন্‌লেই মা আস্‌বেন!" মাকে আনিবার ক্ষমতা তাহার না থাকিলেও সাবিত্রী কাল হইতে এক মনে ত' কত ডাকিতেছে—কিন্তু মা আসিলেন কৈ? সে আজ তার মায়ের সঙ্গে রাত্রি থাকিতে উঠিয়া মণ্ডপঘর পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। সঙ্গিনীগণের সহিত এপাড়া ওপাড়া হইতে রাশি রাশি ফুল তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছে। দাদুর গাম্ভীর্য্য-ভরা মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে কিছু বলিতে সাহস না পাইয়া বালিকা কম্পমনে

পুনরায় চণ্ডীমণ্ডপের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, হঠাৎ সে দেখিল আট দশ জন বাহক একখানি প্রতিমা স্কন্ধে করিয়া তাহাদের বাড়ীর দিকেই আসিতেছে। বালিকা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, "ও দাদা—ও দাদা, ও শান্তি গোরা ত্বরিত পদবিক্ষেপে এদিকে আয়—দেখে যা কে এসেছে! উৎসাহ-চঞ্চল বালক বালিকাদিগের কোলাহলে বাহ্য-জ্ঞান-বিরহিত মধুরাপ্রসাদ অপলক নেত্রে প্রতিমার দিকে চাহিয়া রহিলেন হঠাৎ আপন পদস্পর্শে চমকিয়া উঠিয়া দেখিলেন গ্রামের জমিদার প্রভাতকুমার,—"বাবা, অধম সন্তানকে ক্ষমা করুন।"

উচ্ছ্বসিত স্নেহের আবেগে একরূপ উন্মত্তেরই মত বৃদ্ধ পুত্রকে আপন বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

স্বরূপ মূর্ত্তি

(গল্প)

(শ্রীদক্ষিণারঞ্জন পাল)

সে অনেকদিন আগেকার কথা। তখন সাহেব, ফিরিঙ্গি ও সাহেব বেশধারী বাঙ্গালীকে দেখিলে পথের লোক দশ হাত দূরে সরিয়া যাইত। সেই সময় একদিন রজত ও কৃষ্ণদাস দুই সমপাঠী বন্ধু বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। পথে এক স্থানে জনতা দেখিয়া তাহারা দাঁড়াইয়া পড়িল। এবং সঙ্গে সঙ্গে ভীত কুকুরের মত পলায়নোদ্যত মানুষের ঠেলা খাইতে খাইতে জনতা হইতে অনেকটা দূরে আসিয়া কোন রকমে নিজেদের সাম্‌লাইয়া লইল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য তাহারা বিশেষ উৎসুক হইয়া অনেককে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার উত্তরে হাঁপানর শব্দ, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে 'সাহেব'—'সাহেব' ছাড়া অন্য কিছু কাণে গেল না। যাহা হউক, অতি কষ্টে ধাক্কা খাইতে খাইতে তাহারা ঘটনাস্থলে গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল একজন সাহেব একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোককে যথেচ্ছা কিল চড় লাথি মারিতেছে, আর ভদ্রলোকটী নিঃসহায় ভাবে পথের লোকের দিকে করুণ দৃষ্টিপাত করিয়া নিঃশব্দে ও নির্বিকারে সমস্ত প্রহার হজম করিতেছে। যাহারা ভিড়ের দায়ে নিকটে আসিয়া পড়িতেছিল তাহারা সাহেবের হুমকি শুনিয়া ও রক্তচক্ষু দেখিয়া ফিরে-হারা হইয়া ছুটিতেছে।

কৃষ্ণদাস কহিল, "এই ব্যাপার, মিছে দেরী হ'তে গেল, চল বাড়ী যাই।"

রজত আশ্চর্য্য হইয়া বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "বলিস্ কি রে! ভদ্রলোকটিকে এই অবস্থায় দেখে চলে যাব।"

কৃষ্ণদাস কহিল,—"মারামারি করবি না কি?"

রজত কহিল, "দরকার হয় ক'রব।" এই বলিয়া সে সাহেবের নিকটে অগ্রসর হইয়া ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি ভদ্রলোকটিকে মারিতেছ কেন?"

উত্তর-স্বরূপ সাহেব যা মুখ দিয়া আসিল তাহাই বলিয়া গালি দিল এবং মারিবার জন্য বুট লাথি তুলিল। ইহার ফলে রজত তাহার গলায় হাত দিয়া এমনই ঠেলে ধাক্কা মারিল যে সাহেব পথের ধূলায় গড়াগড়ি খাইল এবং উঠিয়া মা বাড়িয়া কট্‌মট্ করিয়া রজতের দিকে চাহিয়া বেগতিক বুঝিয়া 'পাহারওয়ালা' 'পাহারওয়ালা' বলিয়া হাঁকিতে লাগিল। পাহারওয়ালা নিকটেই কোথায় দাঁড়াইয়াছিল, ডাক শুনিবামাত্র সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া সাহেবকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল

এবং বিনা প্রশ্নে হরতকে থানায় গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল।

পরদিন বিচারালয়ে রজত সমস্ত কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া কুড়ি টাকা জরিমানা দিয়া প্রফুল্লমুখে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

ইহারই দিনকতক পরে রজতের জননী কহিলেন, "তুই বল্‌দিকি? এই সে দিন জরিমানা দিয়ে এলি, আবার সাহেবের সঙ্গে মারামারি কর্‌লি। তোর জন্যে বাবু আমি যে কি কর্‌ব—"

রজত হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা মা ব্যাপারটা কি হয়েছে আগে সব শোন, তারপর দোষ দিতে হয় দিও।"

জননী কহিলেন, "সে যাই হ'ক গে বাবু, মারধোর কেন?"

রজত কহিল, "আচ্ছা মা মারধোর কি সাধ ক'রে করি। কুলিটার যদি চেহারা দেখতে মা! বোধ হয় সবে দেশ থেকে এসেছে, পেট ভরে খেতে পেত না নিশ্চয়, তাই যেমনই রোগা আর পেটটা তেমনই বড়। সাহেব তার মাথায় একটা প্রকাণ্ড ভারি বাক্স তুলে দিয়েছে, সে তা নিতে পারবে না, কাজেই নামিয়ে দিয়েছে, অমনই কিনা তাকে লাথি। মুটেটা মার খেয়ে থর থর করে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বাইতে পড়ে গেল। তার পরেও লাথি চল্‌ল। এ দেখেও কি কেউ চুপ করে থাকতে পারবে, তুমিই বল না মা"

জননী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

রজত প্রসন্নমুখে কহিল, "আমি মা সাহেবকে বোঝাতে গেলাম, সে আমায় এক ঘুষি মারলে, আমি কি মার খেয়ে চুপ করে থাকব? আমিও মারলাম। বল ত মা অন্যায় করেছি?"

জননী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন, "ঐ রোগা লোকটাকে শুধু শুধু অমন করে মারলে, তার প্রাণে কি একটু দয়ামায়া নেইরে? ও'কে রে তোর গালটা যে কেটে গেছে! আহা বাছারে।"

রজত বলিল, "ওতে কি হবে মা, লাগেটাগে নি, বড্ড কিধে পেয়েছে। তোমায় বলতে ভুলে গেছি, এ সাহেবটা মার খেয়ে পুলিস ডাকে নি। আমার পিঠে চাপড়ে চলে গেল।"

তিনবৎসর পরের কথা। রজত এম. এ. পাশ করিয়া ওকালতি পড়িতেছিল, আর কৃষ্ণদাস বার কতক এল. এ. ফেল করিয়া কি করিবে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এমন সময় বাঙ্গালার চারিদিকে বন্দেমাতরম রব উত্থিত হইল এবং দেখিতে দেখিতে দামোদরের বন্যার ন্যায় অতি খরবেগে স্বদেশীতে সমস্ত বাঙ্গলা প্লাবিত হইয়া গেল। কৃষ্ণদাস স্রোতে গা ভাসাইয়া দিল এবং অতি শীঘ্র বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় গদিতে জাঁকিয়া বসিয়া পড়িল এবং তাহার ওজস্বিনী ভাষায় বাঙ্গলার ছাত্রবৃন্দ নাচিতে লাগিল।

অনেকদিন পরে কৃষ্ণদাসের সহিত রজতের সাক্ষাৎ হইল। কৃষ্ণদাসকে দেখিলে আর চেনা যায় না, তাহার পোষাক পরিচ্ছদের এমনই পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে—চোখে সোণার চশমা, পায়ে নাগরা, গায়ে স্বদেশী আদ্ধির লম্বা পাঞ্জাবী, পরণে শান্তিপুরে ধুতী, হাতে ওকের লাঠি।

রজত কহিল, "কি হে কৃষ্ণদাস যে।"

কৃষ্ণদাস মাথাটি পিছনের দিকে ঈষৎ হেলাইয়া রজতের দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "কে রজত, অনেক দিন পরে দেখা, ভাল আছ?"

তাহার মুরুব্বিয়ানা-প্রকাশক কণ্ঠস্বরে রজতের ভারি হাসি পাইল। সে হাসিতে হাসিতে কহিল, "ভাল আছি, আচ্ছা কৃষ্ণদাস সেদিন অনিল ব'লে সেই ছোকরাকে দুটো ঘুষি মেরেছিলাম ব'লে তুমি যে আমায় শুধু শুধু গাল দিলে?"

কৃষ্ণদাস গম্ভীর হইয়া কহিল, "প্রতিবাদ কর উত্তর পাবে।"

রজত কহিল, "সে পরে দেখা যাবে। তুমি আমার ছেলের পক্ষ নিয়ে গাল দিয়েছ কেন তার উত্তর দাও। দেখবার আগে আমায় একবার জিজ্ঞাসা করলে পারতে, ব্যাপারখানা কি ?"

কৃষ্ণদাস কহিল, "জিজ্ঞাসা করবার কোন দরকার মনে করি নি। একটা ট্যাস ফিরিঙ্গির পক্ষ নিয়ে তুমি তারের গায়ে হাত দিয়েছ, তাকে অপমান করেছ, মেরেছ, এর ভেতর ত কোন মিথ্যে নেই—বাস্, আর কিছু শুনতে চাব না।"

রজত আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "বাস্ আর কিছু শুনতে হবে না! আমাকে বলতে দাও। ফিরিঙ্গি বেচারীর বাড়ীতে ভারি বিপদ, তার ছেলের রক্ত-আমাশা হয়েছে শুনে সে ছুটে এসেছে তাকে দেখতে – সঙ্গে তার একটা বাক্স রয়েছে। অনিল বুটের কেবলই বাধা দিচ্ছে তারা যেন কেউ ওর বাক্স না তোলে—ফিরিঙ্গি কাঁদ কাঁদ হ'য়ে অনিলকে কত অনুনয় বিনয় করতে লাগ্‌ল—তবুও তার দয়া হ'ল না, আমি বলতে গেলাম, অমনি অনিল কড়া কথা শুনিয়ে দিলে। আমি নিজে বাক্সটা মাথায় করে পৌঁছতে চাইলাম, তাও সে নিতে দেবে না। এতে মানুষের রাগ হয় না? আমি অনিলকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলাম– কথাবার্ত্তা নেই সে এসেই আমার মুখে এক ঘুষি মেরে দিলে কিন্তু পাল্টা ঘুষি খেয়ে সে দৌড় মারলে—আচ্ছা, এতে আমার দোষটা কি!"

কৃষ্ণদাস কহিল, "দোষ তোমারই সম্পূর্ণ, এই পর্য্যন্ত আমি বলতে পারি। দেখ রজত দেশকে ভালবাসতে শেখ, তা হ'লেই বুঝতে পারবে কত বড় অপরাধ তুমি করেছ। চল্‌লাম, অনেক কাজ আছে, নমস্কার।"

এই ঘটনার মাস দুয়েক পরে রজত ডেপুটিগিরি পাইল। সে পুরাতন ব্যাপার—অর্থাৎ ফিরিঙ্গির পক্ষ লইয়া স্বদেশী ছাত্রকে প্রহার করার ব্যাপারটিতে খুব রঙ দিয়া কৃষ্ণদাস রজতকে যাহা ইচ্ছা তাই লিখিল।

কৃষ্ণদাস স্পষ্ট লিখিল, এই ফিরিঙ্গির পক্ষ সমর্থনের সহিত এই চাকুরী পাওয়ার বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

রজতের এক সহকর্ম্মী কহিল, "দেখ রজত, কৃষ্ণদাসের নামে একখানি উকিলের চিঠি দাও।"

রজত হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বৎসর দুই পরে কোন এক করলার খনির তিন চারিজন বাঙ্গালী যুবক কর্ম্মচারী একদিন সন্ধ্যার সময় খনির সাহেব ম্যানেজারকে একলা পাইয়া খুব প্রহার করে। পুলিশ অনুসন্ধান করিয়া তাদের চালান দেয়। বিচারে প্রকাশ পায় ঐ চারিজন কর্ম্মচারী কাজে ফাঁকি দিত, ম্যানেজার তাহাদের সরকাইয়া দেওয়ার প্রতিশোধ-স্বরূপ তাহারা ঐ পথ অবলম্বন করিয়াছিল রজতের উপর এই মোকদ্দমার বিচারের ভার পড়ে। তিনি প্রত্যেককে পনর দিন করিয়া কারাগারের আদেশ দেন।

কৃষ্ণদাসের কলম প্রস্তুত হইয়াছিল। সে অমনই দীর্ঘ এক প্রবন্ধ লিখিয়া সকলের নিকট রজতকে স্বদেশদ্রোহী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। প্রবন্ধের উপর শিরোনাম লিখিল 'খটিয়াম ডেপুটী।'

রজতের পত্নী কহিল, "এ কি রকমের বন্ধু তুমি তোমায় মিথ্যেমিথ্যি করে গাল দিয়েছে– তুমি কিছু বলবে না?"

রজত হাসিয়া কহিল, "এতে বলবার কি আছে —তোমার দেখছি খুব রাগ হয়েছে।"

তাহার পত্নী কহিল, "তুমি কি যে বল, রাগ হবে না! এ কি রকম অন্যায় কথা, তুমি আরও বড় চাকুরী পাওয়ার লোভে মিথ্যে করে বাঙ্গালীদের শাস্তি দিয়েছ। তোমার কিন্তু ছেলে উড়িয়ে দেওয়া ভারি অন্যায়।"

উত্তরে রজত হাসিয়া কহিল, "আমি ভাল করে বিচুড়ি রাঁধ দেখি?"

ইহারই দিনকতক পরে স্কুলের জনকয়েক ছাত্র

এক পাদরী সাহেবকে প্রহার করিল এবং তাহার সহিত যে মেম ছিল তাহাকেও অপমান করিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হইল না। পাদরী সাহেব অবশ্য কাষ্ঠের পুতুলের মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন না, মেম সাহেবকে অপমানের জন্য তিনিও ছাত্রদের দু'চারিটী ঘুষি মারিয়া ছিলেন। দুই পক্ষই আদালতের দরবারে হইল। বিচারে রজত ছাত্রদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিল এবং পাদরীকে খালাস দিল।

কৃষ্ণদাস সংবাদপত্রের স্তম্ভে গর্জ্জিয়া উঠিল। ঘটনাস্থলের নূতন কীর্ত্তি বীরক কয়েকটী প্রবন্ধ পর পর বাহির হইতে লাগিল। রজতের বন্ধুবান্ধব জ্ঞাতি-স্বজন সকলে মিলিয়া এবার রজতকে ধরিয়া বসিল, মানহানির নালিশ কর। রজত চুপ করিয়া শুনিয়া গেল, আর হাসিল, মানহানির মোকদ্দমা রুজু করিবার কোন আগ্রহ তাহার দেখা গেল না।

ইহার পর কোন একটা সুযোগ পাইলেই কৃষ্ণদাস রজতের কীর্ত্তির উল্লেখ করিতে ছাড়িত না। এমনই ভাবে বৎসর তিন কাটিয়া গেল।

রজত সম্প্রতি যেখানে বদলি হইয়াছিল, সেখানকার ষ্টেশনে এক কাণ্ড হইল। সাহেব ষ্টেশন মাষ্টার ও গার্ড এক বাঙ্গালী ভদ্রলোককে সপরিবারে জোর করিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়া সে রাত্রিটা ষ্টেশনে আটক করিয়া রাখে। পরদিন মামলা রুজু হইল এবং বিচারের ভার পড়িল রজতের উপরে। ভদ্রমহিলাটী আবার কৃষ্ণদাসের বিশেষ আত্মীয়।

একদিন রজত বাহিরের বারান্দায় বসিয়া চা খাইতেছে, এমন সময় কৃষ্ণদাস আসিয়া উপস্থিত। রজত চেয়ার ছাড়িয়া অগ্রসর হইয়া—সহাস্যমুখে কহিল, "এস কৃষ্ণদাস, অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা, ভাল আছ ত ভাই, হঠাৎ এখানে কি মনে করে?"

কৃষ্ণদাস কহিল, "এসেছিলাম একটা কাজে তাই ভাবলাম অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি, তাই দেখা করতে এলাম।"

রজত কহিল, "যাক্ ভাই এতদিন পরে যে মনে পড়েছে, সেই আমার ভাগ্য। আজ কিন্তু খেয়ে দেয়ে এখানে থাকতে হবে।"

কৃষ্ণদাস হাসিয়া কহিল, "আমিও কোন্ এসেই না খেয়ে চলে যাচ্ছি। তোমার বল্‌বার আমি ধার ধারি নাকি!"

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া রজত কহিল। "দেখ ভাই, মোকদ্দমা যতদিন শেষ না হয় ততদিন তুমি আমার এখানে এস না।"

কৃষ্ণদাস উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্রোধভরে কহিল, "তুমি যে এ কথা বল্‌বে, তা আমি আস্‌বার আগেই জান্‌তাম। নেহাত ছাড়লে না তাই এসেছিলাম। বেশ যাতে মোকদ্দমা তোমার কাছে না হয়, তার ব্যবস্থা আমরা করব।"

রজত ধীর ভাবে কহিল, "যা ভাল বোঝ কর।"

কৃষ্ণদাস আর একবার তাহাকে শাসাইয়া চলিয়া গেল।

রজতের পত্নী কহিল, "বেশ বন্ধুটি তোমার।"

কৃষ্ণদাস বড় বড় উকিল দিয়া অনেক চেষ্টা করিল, হাইকোর্ট অবধি লড়িল, কিন্তু বিচারের ভার রজতেরই উপর রহিল। সাহেবদেরও দেশী বিচারকের কাছে আসামী হইয়া দাঁড়াইতে কোন আপত্তি করিল না।

কৃষ্ণদাস বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, "যত বড় উকিল ব্যারিষ্টার যাও না কেন, রজত আসামীদের খালাস দিয়ে বসে আছে. এ আমি হলফ করে বলতে পারি। আর ও অনেক ডেপুটি দেখেছি, চাকরীর উন্নতির জন্যে যে মানুষ নিজেকে এমনই ভাবে বিক্রি করতে পারে এক রজত ছাড়া আর কেউ নেই। চাকরী পেয়েছেই ওই করে।"

রজতের কাণেও একথা উঠিল। সে একটু হাসিল।

উভয়পক্ষের উকিল ব্যারিষ্টারের বক্তৃতা শেষ হইবার পর দিন রায় দিবার দিন।

কৃষ্ণদাস কহিল, "যা রায় দেবে, তা ত জানা আছে, মিছে আর চালাকি করে দিন পেছন কেন?"

পরদিন আদালত-গৃহ লোকে লোকারণ্য! আসামীরা যথাস্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। ফরিয়াদী পক্ষ সুরমনে এক পাশে বসিয়া রহিল। কৃষ্ণদাস রাগ করিয়া আসিল না। রজত খাসমহলে রায় প্রকাশ করিল। সকলে সত্যই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বিচারক আসামীদের প্রতি ছয়মাস করিয়া কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কৃষ্ণদাস এ সংবাদ পাইয়া গম্ভীর হইয়া কহিল, "এর ভেতর নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে, রজতকে ত আর আমার চিন্‌তে বাকি নেই।" ফিরিয়া গিয়া সংবাদপত্রে 'ঘটরামের অবাক্ কাণ্ড' শিরোনামা দিয়া মোকদ্দমার বিস্তৃত বিবরণ মুদ্রিত করিল, বিচারকের সম্বন্ধে একটী কথাও বলিল না।

ইহার পর অনেকদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। একদিন এক সাহেব ইন্‌স্‌পেক্টার মহকুমার স্কুলটী পরিদর্শন করিতে আসেন। রজত স্কুলের সেক্রেটারী ছিল। একটী ছাত্রের খাতার উপর "বন্দেমাতরম্" লেখা দেখিয়া ইন্‌স্‌পেক্টার চটিয়া আগুন হইয়া তাহা টান মারিয়া ক্লাসের বাহিরে ফেলিয়া দিলেন এবং ছাত্রটীর দশ টাকা জরিমানা করিলেন। তাহা ছাড়া আবার হেড মাষ্টারও সেক্রেটারীর নামে দোষারোপ করিতে ছাড়িলেন না।

রজত ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে গিয়া উপর হইতে তাড়া খাইলেন।

মাস খানেক পরে তাহার আত্মীয় বন্ধুরা আসিয়া কহিলেন, "এ কি ছেলেমানুষী করলে, এ কথায় এত বড় চাকুরীটা ছেড়ে দিলে! তোমার যে সব মুরুব্বি সাহেব আছে তাদের হাতে পায়ে ধরে পড়তে।"

রজত কোন উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল। শুধু তাহার ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসি দেখা দিল।

আরও বৎসর দুই কাটিয়া গেল।

তখন ইউরোপের মহাযুদ্ধ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, রজত একদিন হাট হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ কৃষ্ণদাসকে দেখিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

কৃষ্ণদাস আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "কে রজত যে! তুমি এখানে?"

রজত কহিল, "এই ত আমাদের দেশ, তুমি এখানে কি মনে করে?"

কৃষ্ণদাস কহিল, "তুমি এখন ছুটিতে আছ বুঝি?"

রজত হাসিয়া কহিল, "চাকুরী ত অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছি।"

কৃষ্ণদাস অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "বল কি হে? হঠাৎ এ খেয়াল হ'ল যে!"

রজত কহিল, "আগে তুমি এখানে কি মনে করে তাই এখন বলদিকি।"

কৃষ্ণদাস এক গাল হাসিয়া এক হাত দিয়া বন্ধুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "আরে ভাই, আমি এক কাজ নিয়েছি। এই সব চাষাভুষোরা যুদ্ধের যত বাজে খবর শোনে আর তাই বিশ্বাস করে। আমি হাটে হাটে ছবি দেখিয়ে বক্তৃতা দিয়ে যুদ্ধের আসল খবরটা বুঝিয়ে দি। দেখ ভাই এই মাস খানেক ঘুরে আমার একটা বিষয়ে খুব অভিজ্ঞতা জন্মেছে। ভদ্রতা কাকে বলে তা আমাদের দেশের লোক জানে না—সাহেবদের পায়ের কাছে বসে ঢের দিন ধরে তাদের শিখ্‌তে হবে। আমরা বাঙ্গালী গবর্ণমেণ্টের নয়, একেবারে খাস ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীন, আমরা যখন যে সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গেছি, তারা আমাদের কি খাতির যত্নটাই না করেছে। আর দেখ না, তোমাদের গ্রামের

দারোগার কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে বলবেন, আমাদের থাকবার খাবার একটা বন্দোবস্ত করে দিতে, তার উপরে কি না সোজা বলে দিলে, "এখানে আমি জায়গা কোথায় পাব, আপনারা খুঁজে পেতে নিন।" এই বলে নিজের কাজ করতে লাগ্‌ল।"

রজত যেন একটা নূতন জিনিস পাইল। সে উজ্জ্বল মুখে কহিল, "একজন দারোগা এমন কথা বল্‌তে পেরেছে!"

কৃষ্ণদাস কুদ্ধস্বরে কহিল "হাঁ বে। কিন্তু আমাকে ত চেনে না,—মজাটা টের পাইয়ে দেব। যাক্ তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হ'য়েছে। আমাকে অন্য থাকবার জায়গা খুঁজে বেড়াতে হবে না।"

কৃষ্ণদাসের হাতখানি নিজের কাঁধের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া রজত কহিল, "আমার বাড়ী তোমার জায়গা হবে না।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। কৃষ্ণদাস হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পত্রের পরিণাম

[গল্প]

(শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দেবী)

নিশিকান্ত যেসের যে ঘরটিতে থাকিত, তাহার পশ্চিম দিকের জানালাটি খুলিলেই পাশের গৃহস্থ বাড়ীর একটা কক্ষের ভিতরটা সমস্তই দেখা যাইত। তাই নিশিকান্ত সে জানালাটি প্রায়ই খুলিত না।

শেষ আষাঢ়ের এক মেঘাচ্ছন্ন মধ্যাহ্নে নিশিকান্ত তাহার নূতন মোলায়েম ক্যাওড়া কাঠের তক্তপোষের একধারে উঁচু হইয়া বসিয়া কি একটা পরীক্ষার পড়া গিলিবার চেষ্টা করিতেছিল। ধীরে ধীরে দিনের আলো এমনই ম্লান হইয়া আসিল যে চক্ষু টানিয়া টানিয়াও সে অক্ষরগুলি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল না, তাই উঠিয়া পশ্চিমের সেই রুদ্ধ জানালাটি খুলিয়া দিল। ঘরের অন্ধকার অনেকটা দূর হইল। ভিতরে বাতাসের চলাচল হইতে লাগিল, নিশিকান্ত মনে মনে বেশ আরাম বোধ করিল। পাঠ ভুলিয়া সে সূর্য্যহীন ধূসর আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল এবং তাহার সেই মুগ্ধ দৃষ্টি যে কখন আকাশ হইতে পাশের বাড়ীর কক্ষটির ভিতরে নিবদ্ধ হইয়াছিল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই। সেই কক্ষের ভিতর একাকী বসিয়া সরলা তাহার কন্যাটিকে কত রকম করিয়া আদর করিতেছিল। কখনও বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া, কখনও কাঁধের উপর তাহার মুখটি রাখিয়া, কখনও কোলের উপর শোয়াইয়া কত রকমের কথা বলিয়া তাহার সেই ছোট মেয়েটিকে আদরে আব্দার করিয়া ফেলিতেছিল। সরলার নাকটি বেশ টিকোলো, ঠোঁট দু'খানি পাতলা—দুধে-আলতা রঙ, চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা, শুভ্র হাত দু'খানিতে কোন অলঙ্কার ছিল না। সেই নিরাভরণা, কন্যাবৎসলা, স্বভাব-সুন্দরী নারীমূর্ত্তিটীর দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া নিশিকান্ত বসিয়া রহিল। দৃষ্টি তুলিয়া লইবার শক্তিটী পর্য্যন্ত তাহার ছিল না। হঠাৎ সরলার জননীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিয়া চোখ ফিরাইয়া লইল এবং তাড়াতাড়ি আসন ত্যাগ করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে জানালাটি বন্ধ করিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া শয্যার উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল।

সেই অল্পক্ষণের মধ্যে সরলা নিশিকান্তর উপর

এমনই মোহজাল বিস্তার করিল যে যুবক নিশিকান্ত নিজেকে সম্যক হারাইয়া ফেলিল। সরলার কণ্ঠস্বর শুনিলেই সে পশ্চিমের জানালাটি খুলিয়া ফেলিত এবং যতক্ষণ সরলা একাকী থাকিত, ততক্ষণ সে মুগ্ধ-দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিত। সরলার জননী বা অপর কোন আত্মীয়ের আভাস পাইবামাত্র সে সঙ্গে সঙ্গে জানালাটি বন্ধ করিয়া দিত। এমনই করিয়া আত্মপরিজন বিরহ-কাতর প্রবাসী যুবকের দিনগুলা যেন বাতাসের মত স্বচ্ছন্দগতিতে উড়িয়া যাইতে লাগিল।

সেদিন হঠাৎ জানালা খুলিয়া নিশিকান্ত দেখিল সরলা মেঝের উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া নিদ্রা যাইতেছে। তাহার পৃষ্ঠদেশ অনাবৃত, কটিদেশের বস্ত্র শিথিল, শুভ্র হাত দুইখানি স্বল্প-কেশ মস্তকের দুই ধারে প্রস্ফুটিত যুঁইয়ের মালার মত পড়িয়া আছে। পাশে পড়িয়া তাহার সেই মেয়েটিও অসাড়ে ঘুমাইতেছে। ঘরে আর কেহ ছিল না, নিশিকান্ত জানালা বন্ধ করিল না, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিয়া গরাদে ধরিয়া নিঃশব্দে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা যখন সরলার জননী কক্ষমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল, নিশিকান্ত গভীর লজ্জায় অভিভূত হইয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িল এবং অতি সন্তর্পণে হাত বাড়াইয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

রাত্রে তাহার সন্তর্বতী পত্নী নলিনীকে সুদীর্ঘ পত্রখানি লিখিয়া তাহার অর্দ্ধেকের বেশী সে সরলার কথায় পূর্ণ করিয়া দিল। সে কথা বলিতে সুখ, লিখিতে সুখ, এ সুখের প্রলোভন সে রোধ করিতে পারিল না। তাহার সমস্ত অন্তর যে রসে ভরপুর, সে রসের আস্বাদন হইতে সে তাহার পত্নীকে বঞ্চিত করিতে চাহে না। কিন্তু মোহমুগ্ধ নিশিকান্ত বুঝিল না—এই পত্রের ফল কি হইবে?

আর একদিন নিশিকান্ত দেখিল সরলা খুব ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এ চাঞ্চল্যের কারণ কি জানিবার জন্তে সে ব্যগ্র হইয়া পড়িল, কিন্তু ব্যাপার কি তাহা ঠিক বুঝিতে পারিল না। তবে এইটুকু বুঝিল বাড়ীতে ছোটখাট রকমের সমারোহের আয়োজন চলিতেছে। কিন্তু আজ তাহার সরলাকে বেশীক্ষণ দেখিবার সুযোগ ঘটিল না। কেননা প্রায় সব সময় সরলার সঙ্গে কেহ না কেহ ঘোরাফেরা করিতেছিল। নিশিকান্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া জানালা বন্ধ করিতে বাধ্য হইল।

সন্ধ্যার পর মুহুর্মুহু সরলাদের গৃহ হইতে শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া লইতে নিশিকান্তর বেশী বিলম্ব হইল না। সরলার কন্যার বিবাহ। নিশিকান্তর বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল, এই বিবাহের সময় ঐ গৃহে গিয়া উপস্থিত হয় এবং সরলার পার্শ্বে থাকিয়া বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন করিয়া দেয়। তাহার অন্তরের আশা কোরক বদ্ধ হইয়া রহিয়া গেল, আর তাহা ফলপ্রসূ হইল না।

নিশিকান্তর মেসের ও সরলাদের বাড়ীর ছাদ প্রায় এক বলিলেই হয়, মাঝখানে একটা ছোট ব্যবধান মাত্র। সরলা প্রতিদিন বিকালে ছাদে বেড়াইত, নিশিকান্ত তাহা লক্ষ্য করিত কিন্তু মেসের ছেলেদের ছাদে ওঠা নিষিদ্ধ ছিল বলিয়াই নিশিকান্ত প্রলোভন রোধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু সে দিন প্রলোভনেরই জয় হইল। নিশিকান্ত একটা এসেন্স, এক বাক্স সাবান, কতকগুলি খেলনা, এক-খানি কাপড় ও প্রায় দুইসের ভাল সন্দেশ লইয়া চুপি চুপি ছাদে গিয়া উঠিল। সরলা তখন একাকী ছাদে বেড়াইতেছিল। নিশিকান্ত চারিদিকে অতি সন্তর্পণে চোখ ফিরাইয়া লইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া মাঝখানের সেই প্রাচীরের নিকট অগ্রসর হইল। সরলার দৃষ্টি তাহার উপর পড়িতেই সে সেই দ্রব্যগুলি আলিসার উপর রাখিয়া হাসিভরা দৃষ্টিতে সরলার বিস্ময়াপ্লুত মুখের দিকে চাহিল। ইতিপূর্ব্বে কয়েক-বার সরলার সহিত তাহার দৃষ্টির বিনিময় হইয়াছিল।

তাই সরলার নিকট নিশিকান্তর মুখ একেবারে অপরিচিত বলিয়া মনে হইল না। এই ভাবে ছাদের উপর বেশীক্ষণ থাকা অত্যন্ত অন্যায় বিবেচনা করিয়া নিশিকান্ত তাড়াতাড়ি কহিল, "এ সব তোমার স্নেহের বিচার উপহার!" আর বেশী কিছু তাহার বলা হইল না, ছাদে উঠিবার সিঁড়ির ধাপের উপর কাহার পদশব্দ শুনিয়া নিশিকান্ত চকিতে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে সরলাদের বাড়ীর সরকার নিশিকান্তর কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই নিশিকান্তর মুখ শুকাইয়া গেল, বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

সরকার মহাশয় কক্ষে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, তার পর ধীরে ধীরে তক্তপোষের এক ধারে বসিয়া নিশিকান্তর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কাল সন্ধ্যার সময় খাবার, কাপড় চোপড়গুলো আপনিই দিয়েছিলেন?"

নিশিকান্ত অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া উত্তর করিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

সরকার মহাশয় নাকে একটিপ নস্য গুঁজিয়া কহিল, "বটে! আপনি বুঝি বড় লোকের ছেলে? কিন্তু মা ঠাকুরুণ ভারি রাগ করছিলেন!"

নিশিকান্ত কোন উত্তর করিল না, মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিল এবং অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

সরকার মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "মা ঠাকুরাণী এই কথা বলবার জন্যেই আমায় এখানে পাঠিয়েছেন। যা করেছেন করেছেন আর মিথ্যে এরকম পয়সা ব্যয় করবেন না।" এই বলিয়া নমস্কার করিয়া সরকার মহাশয় কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল।

এতক্ষণে নিশিকান্ত যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহার উপহার যে প্রত্যাদিত হয় নাই, ইহাতে সে মনে মনে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিল এবং অন্তরের মধ্যে কে যেন তাহাকে জানাইয়া দিতে লাগিল, এ স্নেহ-তিরস্কার ভিন্ন আর কিছুই নহে। নিশিকান্তর সাহস বাড়িয়া গেল।

দিন দুই পরে সে সরলাদের গৃহের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল এবং সরকার মহাশয়ের সহিত খানিকক্ষণ গল্প করিয়া যেমন ফিরিয়া আসিল। ফিরিবার সময় হঠাৎ উপরের দিকে চোখ তুলিতেই দেখিল, সরলা বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চোখা চোখি হইবামাত্র সে ছুটিয়া কক্ষাভ্যন্তরে পলাইয়া গেল।

নিশিকান্তর সাহস আর এক ধাপ উপরে উঠিল। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই, পশ্চিমের আকাশ সবে মাত্র লাল হইয়া উঠিয়াছে এবং অস্তাচলচূড়াবলম্বী সূর্যের কিরণে ঝকঝক করিতেছে। সরলা ছাদের আলসায় হাত দিয়া দু'খানি থুড়ির পাঁচ দেখিতেছিল। নিশিকান্ত আস্তে আস্তে চুপি চুপি ছাদে উঠিল এবং সরলার মুখের দিকে চাহিয়া এমনই আত্মহারা হইয়া গেল যে নিজেকে আর সংযত করিতে পারিল না। সে বিদ্যুতের মত সরলার হাতখানি স্পর্শ করিল। অকস্মাৎ অজ্ঞাতসারে এই ভাবে স্পর্শ করায় সরলা সভয়ে "মা গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, তার পর নিশিকান্তর দিকে চাহিয়া লজ্জায় মুখখানি রাঙা করিয়া ছুটিয়া নীচে নামিয়া গেল।

তাহার পর দিন হইতে নানারকম চেষ্টা করিয়াও তিন দিন সে সরলার দেখা পাইল না। আশঙ্কায় তাহার সমস্ত অন্তরটা ভরিয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, সরলার বাড়ী গিয়া একবার তাহাকে দেখিয়া আসে। কিন্তু বাড়ীর বহির্দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া সে বিষণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিল। পরিচিত সরকার মহাশয়ের সহিতও তাহার সাক্ষাৎ হইল না। আর যে তাহার সহ্য হয় না, আজ সরলাকে দেখিবার কোন উপায়ই খুঁজিয়া পাইতেছে না। এমনই ভাবে পুরা তিনটা দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। এ কয়দিন নিশিকান্ত কিছুতেই পাঠে মনঃসংযোগ

করিতে পারিল না। কলেজে গিয়াও তাহার শান্তি বোধ হইল না।

সেদিন সকাল সকাল কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সবে মাত্র জামা খুলিয়া তক্তপোষে বসিয়াছে, এমন সময়ে সরলাদের বাড়ীর বৃদ্ধা দাসী আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিবামাত্র নিশিকান্ত আসন ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

দাসী কোনরকম ভূমিকা না করিয়া কহিল, "বাবু বাড়ীতে বড় বিপদ, কেউ নেই, মা ঠাকরুণ আপনাকে একবার ডাকচেন।"

নিশিকান্ত তৎক্ষণাৎ আল্না হইতে জামাটি টানিয়া লইয়া কোন রকমে মাথা গলাইয়া গায়ের উপর ফেলিয়া ক্ষিপ্রপদে দাসীর অনুসরণ করিয়া সরলাদের গৃহে উপস্থিত হইল।

সরলার জননী বাষ্পাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, সরলা অনেক ক্ষণ হঠাৎ অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছে, বাড়ীতে কেউ নেই, তুমি যদি বাবা ডাক্তার—"

নিশিকান্ত ছুটিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

ডাক্তার আসিয়া ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন। সরলার জননীর অনুরোধক্রমে নিশিকান্ত রোগীর সেবার ভার গ্রহণ করিল।

জ্ঞান হইয়া প্রথম যখন সরলা নিশিকান্তকে দেখিল, সে একবার জিজ্ঞাসুনেত্রে জননীর মুখের দিকে চাহিল। তারপর ধীরে ধীরে তাহার শুষ্ক হাতখানি নিশিকান্তর পায়ের উপর রাখিয়া চক্ষু মুদিত করিল। ক্রমেই দিন যাইতে লাগিল সরলা নিশিকান্তর প্রতি এমনই আকৃষ্ট হইয়া পড়িল যে, সে হাতে করিয়া খাওয়াইয়া না দিলে সে ঔষধ বা পথ্য কিছুই খাইত না।

দিন কয়েক পরে তাহার জ্বরটা একটু কম পড়িল। সে জননীর দিকে চাহিয়া কহিল, "আমার খুকী?"

জননী হাসিমুখে কহিলেন, "খুকী ত তোমার কাছেই শুয়ে আছে মা।" সরলা পাশ ফিরিয়া তাহার কন্যাটিকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল. তার পর নিশিকান্তর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমার খুকী।"

• • •

সরলা সুস্থ হইয়া উঠিবার দিন পনের পরে নিশিকান্ত তাহার পত্নীকে লিখিল, "কাল রাত্রিটা যে আমার কি আনন্দে কাটিয়াছে, তাহা তোমায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। সরলা যে আমার হৃদয় কতখানি অধিকার করিয়া বসিয়াছে তাহা নিশ্চয়ই তুমি আমার পূর্ব্ব পত্রগুলি হইতে কতকটা বুঝিয়াছ। কাল সরলা আমায় জড়াইয়া ধরিয়া শুইয়াছিল। সে স্পর্শের যে কি মাদকতা তাহা আমি তোমাকে বলিতে পারি না। আমি সারারাত চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিলাম, ঘুমাইতে পারি নাই। লক্ষ্মী আমার আমার উপর রাগ করিও না,—এবার পূজার ছুটিতে আমার বাড়ী যাওয়া ঘটিয়া উঠিবে না। সরলার শরীর এখনও একেবারে সারে নাই—এ অবস্থায় তাহাকে ফেলিয়া আমি কিছুতেই যাইতে পারিব না—তোমাকে দেখিবার আশা অবধি আমায় ত্যাগ করিতে হইলেও উপায় নাই—এবারটির মত আমায় মাপ কর।"

মেসের অন্যান্য ছেলেরা সকলেই বাড়ী চলিয়া গেল, কেবল নিশিকান্ত একাকী তাহার কক্ষটি অধিকার করিয়া রহিল। আহারের পর সে শয্যায় শুইয়া কি একখানা বই পড়িতেছিল, হঠাৎ কক্ষমধ্যে পদশব্দ শুনিয়া সে উঠিয়া বসিতেই আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, তাহার পিতা গম্ভীর মুখে প্রবেশ করিতেছেন। সে তাড়াতাড়ি তক্তপোষ হইতে নামিয়া অগ্রসর হইয়া পিতাকে প্রণাম করিতে যাইবে এমন সময় বিস্ময় শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়া তাহার জননী ও পত্নী কক্ষমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহার পিতা অত্যন্ত গম্ভীর মুখে কহিলেন, "তোমার বিনিষপত্তর গুছিয়ে নাও, এখনই দেড়টার গাড়ীতে তোমায় বাড়ী যেতে হবে।" নিশিকান্ত

কি বলিতে যাইতেছিল, তিনি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমি কোন কথা শুনতে চাই না, জিনিষ পত্তর এখনই গুছিয়ে ফেল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, দেরী কর না।"

নিশিকান্ত কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল। এরূপ আদেশের কোন অর্থই সে গ্রহণ করিতে পারিল না।

তাহার পিতা ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন, "তবু দাঁড়িয়ে রইলে, গাড়ীর আর বেশী সময় নেই, যার যা পাওনা আছে সব চুকিয়ে দিতে হবে ত! পড়াশুনার আর তোমার দরকার নেই। যা শিখেছ এতেই যথেষ্ট হবে। বাড়ী বসে বিষয় আশয় দেখবে।"

হঠাৎ এমন কি ব্যাপার ঘটিল যে তাহাকে লেখাপড়া ছাড়িয়া বাড়ী গিয়া বসিতে হইবে? সে জননীর দিকে নিঃসহায় দৃষ্টিতে চাহিল। দেখিল, তাঁহার মুখও অত্যন্ত গম্ভীর।

পিতা কহিলেন, "জান ও আমি বাজে কথা বলিনে। তোমাকে কল্‌কাতায় রেখে খুব শিক্ষা হয়েছে। আর দরকার নেই, নাও জিনিষ পত্তর বেঁধে ফেল।"

নিশিকান্ত তাহার পিতার স্বভাব জানিত। যেকারণেই হউক তাঁহার যখন এ খেয়াল হইয়াছে, তখন ইহা তিনি কার্য্যে পরিণত করিবেনই। সে ভয়ে ভয়ে বলিল, "আমি একবার ও-বাড়ী থেকে ঘুরে আসি।"

পিতা আগুন হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "তোমার কোথাও যাবার দরকার নেই। তুমি মনে করেছ কি?"

নিশিকান্ত ভীত হইয়া কহিল, "আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুরে আস্‌ব। না বলে হঠাৎ চলে গেলে সরলার—"

তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া পিতা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "একেবারে অধঃপাতে গেছ,—তোমার মা বল্‌ছিলেন আমার ছেলে কখনও অমন হ'তে পারে না—"

এমন সময় ওবাড়ীর বৃদ্ধা দাসী সরলাকে কোলে করিয়া কক্ষমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়া কি বলিতে গিয়া চুপ করিয়া গেল। একটু পরে নিশিকান্তর দিকে চাহিয়া কহিল, "এই নাও দাদাবাবু তোমার সরলাকে, এমন মেয়ে দেখিনি বাপু, এক দণ্ড বাড়ীতে থাকবে না, কেবল দাদার কাছে যাব, দাদার কাছে যাব।"

ছয় বৎসরের বালিকা সরলা দাসীর কোল হইতে নামিয়া গিয়া ছুটিয়া নিশিকান্তর কোলে গিয়া উঠিল এবং তাহার সেই নিরাভরণ শুভ্র হাত দু'খানি দিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁধে মুখ লুকাইয়া রহিল।

নিশিকান্তর পিতার অত্যন্ত গম্ভীর মুখেও হাসি দেখা দিল এবং জননীর মুখ গর্ব্বে ও আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, আর নলিনী নিজের ভুলে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে চাহিল।

রবি-প্রশস্তি

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী]

রঞ্জিত করি পশ্চিমতট দীপ্ত প্রতিভাজালে
সূর্য্য আজিকে উদিল পূর্ব্ব উদয়গিরির ভালে;
পুণ্য পরশ লভি' আজি তারি জাগ্‌ ও-রে তোরা জাগ
বিশ্ব-লভিতা সেই রবি-করে যে রে যে যজ্ঞভাগ!

[redacted] বাণীর কমল মুদিত মানস সরে
দিক্‌বিগন্ত মুগ্ধ করিয়া ফুটিল যাহার বরে,
অমৃতগন্ধ আনন্দরসে স্নান করি' যে বা লোকে
নবজীবনের দীপ্তি আনিল মৃত্যু-আহত চোখে,
তাহারি মুক্ত মিলনাঙ্গনে জাগ্‌ ও-রে তোরা জাগ্‌,—
বিশ্ববিজয়ী সেই রবি-করে যে রে যে যজ্ঞভাগ।

খণ্ডিত নয় এ মহাযজ্ঞ, অনন্ত অনুরণ,—
এই বিশ্বের লোকে লোকে আজ আলোক-নিমন্ত্রণ ;
শক্তির মোহ মিথ্যার মায়া সবলে করিয়া দূর
ভুবনযাত্রা জীবনযাত্রা বহে আজি ভরপুর ;
আয় রে পূর্ব আয় পশ্চিম, আয় তোরা সবে আয়
বিশ্বভারতী-মন্দির-তলে মিলন-মধুক্ষায় ।
যা-কিছু যাহার কলঙ্ককালি, যাহা 'অচলায়তন,'
সত্য-আলোকে ধুয়ে নে রে সতি' সে দীপ্ত বরিষণ ।
মর্মপুটের ঘণির মুকুর উচ্চে তুলিয়া ধর্—
সবার উর্ধ্বে অমুক্ত সে আজি শাশ্বত ভাস্কর ।

জগৎ সভায় রবি তুমি আজ নহ শুধু আর কবি,
অমৃত প্রতিভা ভাণ্ডার-ভরা তুমি আলো-করা রবি ;
তোমারি প্রভায় উজল সপ্ত সাগর, সাগর-পার,
পূর্বোত্তর দক্ষিণপশ্চিম উদ্ভল চারিধার ;
কুরুক্ষেত্র-কালরাত্রির তমসার অবসানে
তোমারি কিরণ দূর পশ্চিমে নব জাগরণ হানে !
বিশ্ব-সভার মহা-রাজসূয়ে তুমি পুরুষোত্তম,
কর্মের রথী ধর্ম-সারথি জ্ঞানে মানে অনুপম ;
শিশুপাল ছাড়া তোমারে সকলে বরিষ্ঠ সম্মানে
অর্পিছে আজি প্রাণের ভক্তি শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যদানে ।

লহ গুরো লহ আজি এ অর্ঘ্য ঊর্ধ্ব আকাশপথে
যেথা তব মহাবিজয়যাত্রা শুভ্র আলোকরথে ;
চন্দ্র যেথায় অশ্রুভ্র চোখে সাজায় বরণডালা,
কাতারে কাতারে শোভিছে লক্ষ নক্ষত্রের মালা,
জ্যোৎস্না বিছায় অঞ্জলবাস ছায়া-পথখানি পরে,
মেঘেরা মিলিয়া চরণের তলে শঙ্খধ্বনি করে,
সঙ্গীতে মাতি গ্রহেরা ফিরিছে অনুগ্রহের লাগি',
নাচে ছয় ঋতু মোহন নৃত্যে চির দিনরাত জাগি ;
জানি না সেথায় পঁহুছিবে কি না এ ক্ষীণ কণ্ঠস্বর—
জানি শুধু দীন যাত্রী জনের তুমি চিরনির্ভর ।

কেন দীন বলি ? আমারি কণ্ঠে শাশ্বত ভারতী,
সাত কোটি নিজ সন্তান সাথে উন্নত যার মাথা ,
যাহার যশের কীর্তি আজিকে ঘোষিছে জগৎময়,
ভিক্ষুক যে-বা শিক্ষক হয়ে ভুবন করিল জয়—
সে যে সেই রাণী বঙ্গবাণীরই বুক-আলো-করা ধন,
বিশ্বভুবন নন্দিত-করা বন্দিত নন্দন ।
সেই বাণী আজি আমারি কণ্ঠে পাঠায় তাহার বাণী,
অক্ষম হোক্, তবু তোমা তরে গাঁথা এ মালাখানি ;—
পর আজি গলে—দেখুক বিশ্বসাহিত্য-পরিষৎ,
বঙ্গবাণীরই কোলে মোরে আজ ভুবন ভবিষ্যৎ !

—রবীন্দ্র মঙ্গল

চৌধুরী সাহেবের নবাবী চাল।

(নক্সা)

(শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি. এ.)

হিকমত উল্লা খাঁ চৌধুরী নবাব সাহেবের বাপ দাদাদের মধ্যে কে যে কবে নবাব কি বাদশা ছিলেন তা তো কেউই জানে না, বলিতেও পারে না। তবে শোনা যায় যে তাঁরা নাকি বড় বনেদী বংশ। তাঁদের বংশে কে একজন নবাব ছিলেন। সুতরাং তাঁর বংশধর হিকমতউল্লা সাহেব নিজেকে নবাব-জাদা বলেই পরিচয় দেন আর তাঁর চালটাও সেই নবাবী ধরণেরই। তা হলেও আসলে কিন্তু নবাব সাহেবের বড়ই খারাপ অবস্থা। এত খারাপ যে কোন দিন ভাত জোটে কোনদিন জোটে না। যে বাড়ীতে নবাব সাহেব থাকেন সে বাড়ীটাতে অনেক বছর আগে, সে অনেক কয়শত বা কয় হাজার বলতে পারি না পাকা বাড়ী থাকতে পারে—এখন কিন্তু মাত্র এদিক ওদিকে কতকগুলি ইট ছড়ান দেখা

যায়। তাঁর এখনকার বাসের ঘর একটা ছোট খোড়োবাড়ী, ভিতরে ঘরগুলির কি অবস্থা তা কেবল বাতাস আর সূর্য্যিমামা বলতে পারেন, কারণ নবাব সাহেবের বেনামা মহলে তিনি নিজেই খুব কম যেতে পারেন, অন্যের তো কথাই নাই - মেয়ে মানুষের পর্য্যন্ত যাওয়া নিষেধ। সেটা প্যাকাটির বেড়ার দেওয়াল দিয়ে বেশ মজবুত ভাবে ঘেরা। বাহিরে "দেওয়ান আম" বা বৈঠকখানা,—একখানা ছোট ঘর. মধ্যে একখানা তক্তপোষ তার উপর একটা জিনিস পাতা থাকে সেটার সুখের দিনে তার নাম কারপেট দেওয়া যেতে পারতো বোধ হয়। কিন্তু এখন সে ঘিয়ে ভাজা কুকুরের মত লোম শূন্য। নবাব সাহেব একটা ফরসীতে সয়ংপোষ দেওয়া কল্‌কে চাপিয়ে সেই ঘরে বা তার বারান্দায় বসে থাকেন, আর ভুড়ুৎ ভুড়ুৎ কোরে তামাক টান্‌তে থাকেন। তাঁর একটি বাঁদী বা চাকরাণী আছে, দুষ্ট লোকে কেউ কেউ বলে যে সেটা আসলে নবাব সাহেবের বেগম সাহেবা, নবাবী বজায় রাখ্‌তে গিয়ে বাহিরে তিনিই বাঁদী সাজেন, ভিতরে বেগম সাহেবা হন। নবাব সাহেবের 'ছিলিমে' তামাক নাই, নবাব সাহেব হাঁকিলেন "কোই হ্যায়!" আবার নিজেই গম্ভীর ভাবে অদ্ভুত কায়দার সহিত উত্তর দেন "হুজু-উ-উ-র!" আবার নবাবী গলায় "তাবাকু ভর্‌লেআও," পরেই চাকরের গলায়—"যো হুকুম খোদাবন্দ"। তার পর নিজেই কল্‌কেটি নিয়ে তামাক চড়িয়ে ফরসির উপর দিয়া "হুজুর ছিলিম্ তৈয়ার" বলিয়া আবেদন করেন। পরে নবাবী চালে 'যো' বলিয়া তামাক টানিতে আরম্ভ করেন। বাঁদী সময় সময় প্যাকাটির বেড়ার পাশ থেকে বেগম সাহেবার কোনকথা থাকিলে মিহি-গলায় তা জানিয়ে দেয়।

এই রকম খেলা নিয়ে নবাব সাহেব কাল কাটান।

একদিন প্রতিবেশীদের একজনের একখানা দা'র দরকার হয় তিনি সোজাসুজি হিজ্‌হাইনেস সাহেবের কাছে এসে বল্‌লেন চৌধুরী সাহেব, আপনার দা খানা একটু সময়ের জন্য দিলে বড় উপকার হয়।

চৌধুরী সাহেব গম্ভীর ভাবে বলিলেন "দরখাস্ত কর।" লোকটা কিছু বিস্মিত হয়ে বল্‌লো "দরখাস্ত কিসের?" চৌধুরী সাহেব বলিলেন "সব কাজ কায়দা মত তো হওয়া চাই! নবাবী কায়দাই এই রকম যে কেউ কিছু চাইলে দরখাস্ত দিতে হয়।" প্রতিবেশী ভদ্রলোকটি কৌতূহলের বশে একখান দরখাস্ত লিখে এনে দিলেন। চৌধুরী সাহেব আবার যথাসম্ভব গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বল্‌লেন "কলম দোয়াত!" হয় ত চৌধুরী সাহেবের বাড়ীতে ও জিনিস দুটির অস্তিত্বই নাই! ভদ্রলোকটি চট্ করে বাড়ীথেকে দোয়াত কলম এনে দিলেন। চৌধুরী সাহেবের দরখাস্ত খানা পড়িয়া কলমটি হাতে নিয়ে দরখাস্ত খানির মাথায় লিখিলেন "হুকুম হইল যে দা দেওয়া যায়।" এই লিখে দরখাস্তখানি লইয়া উঠিয়া গেলেন এবং ভিতর থেকে দা খানি এনে ভদ্রলোককে দিলেন। ভদ্রলোকটি বলিলেন "এনে তো দিলেন নিজেই, তা এতখানি দেরী করানতে কি লাভ হোলো বলুন দেখি।" একটু হাসিয়া চৌধুরী সাহেব বলিলেন "তা কি হবে, নবাবী চালের খেলাপ কাজ করে নিজ বংশের মুখে কি করে কালি দেওয়া যায়!" ভদ্রলোকও হেসে চলে গেলেন। একদিন চৌধুরী সাহেব চার পাঁচ জন ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে খোস গল্প কচ্ছেন, বেলা প্রায় ১১টা হয়ে গেছে। ইতি মধ্যে ভিতর থেকে তাঁর সেই বাঁদী বাহিরের বেড়ার কাছে এসে চৌধুরী সাহেবকে উদ্দেশ করিয়া বলিল "হুজুর, গোস্তাকি মাপ করবেন, চাউলপটির কুদিরাম বাবু এসে পাথরঘাটায় হুজুরের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা কচ্ছেন, নিমকিদাস বাবুও তাঁর কাছে আছেন, হুজুরের যদি তার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে হয় তবে জল্‌দি

উঠতে আজ্ঞা হয়, নাহলে তিনি এখনি ছুড়ানপুর চলে যাবেন। তাঁর বাঁদী ভিতরে এসে খবর দিলে।"

চৌধুরী সাহেব তাই শুনেই ভদ্রলোকদের সঙ্গে আদাব বন্দেগি কোরে' তখনি উঠে অন্দরে প্রবেশ করলেন। ভদ্রলোকেরাও বাঁদীর হেঁয়ালি গোছের কথাগুলি ভাবতে ভাবতে নিজ নিজ বাড়ীতে চলে গেলেন। পাঠক পাঠিকারা এই হেঁয়ালীর কোন অর্থ বুঝলেন কি? কথাটা এই যে সেদিন চৌধুরী সাহেবের ঘরে চা'ল বাড়ন্ত। হাতেও পয়সা নাই, চাল কিনে আনা হয় নাই। ঘরে চাউলের খুদ কিছু ছিল, সেই খুদ রান্না হয়ে পাথরে চালা হয়েছে, তার দোষের কেবল নুন ('নিমক' উর্দুতে বলে)। খুদের জাউ ঠাণ্ডা হয়ে গেলে খেতে ভাল লাগে না। তাই বাঁদী কৌশলে ঐকথা বলে বুঝিয়ে দিলে যে শীগ্‌গির এসে গরম গরম খুদের জাউ খান, নতুবা জুড়িয়ে গেলে আর খেতে পারবেন না। নবাব বংশের চৌধুরী সাহেব খুদের ভাত খাবেন এটা তো লোকের সামনে কিছুতে বলা যায় না, তা হলে আর নবাবী চাল কি করে বজায় থাকে। সুতরাং চাকরাণী বুদ্ধি কোরে ঐরকম লম্বা চৌড়া কথা বলেছিল। চৌধুরী সাহেব ভিতরের খবর তো জানতেন, আর নবাবী চাল বজায় রাখতে তাঁর আগ্রহও খুব; সুতরাং ঐরূপ হেঁয়ালী বোঝা তাঁর অভ্যাসও ছিল, চট্ কোরে বুঝে নিলেন। চাকরাণীর বুদ্ধিকেও বাহবা দিলেন।

ব্রজ

(শ্রীগোপেন্দ্রনাথ সরকার)

হে ব্রজ তোমার সে সুখ দিবস
হইয়াছে অবসান,
নাহি বাজে শ্যামের মুরলী
গাহে না যমুনা গান।
তিমির বরনা এলে নিশীথিনী
নীল অম্বরা আভীর কামিনী
যায় নাক আর শ্যাম অভিসারে
প্রেমে দুরু দুরু প্রাণ,
হে ব্রজ তোমার সে সুখ দিবস
হইয়াছে অবসান।
ঘরে ঘরে আর গোপ-রমণীর
নয়নী যায় না চুরি,
কোথা ননীচোরা? আঁধার আজি যে
সে বিহনে ব্রজপুরী!
কেহ ত চলে না আর গোচারণে
বাঁশী করে সাজি' রাখাল তুবণে,
'শ্যামলী' 'ধবলী' সে বাঁশী শুনিতে
পাতিয়া রহে না কাণ।
নীরব এবে সে শ্রীকটিতটের
ঘুমুরের ঘুন্দু বোল,
আর না শুনি সে রাঙা চরণের
নূপুরের রুণ্ রোল।
শ্যামের বিহনে নিশি পোহাইলে
ব্রজ চন্দন বাসি হয়ে গেলে,
নাহি ভাসে আর আঁখি জলে রাধা
বিরহে আকুল প্রাণ,
আসে নাক আর রাধা যমুনায়
জল নিতে ছল করি',
হেরিবে বলিয়া নীপ তরু মূলে
নব জলধর হরি।
চন্দ্রা কুঞ্জে যামিয়া রজনী
ফিরিবে বন্ধ নয়নের মণি,

পায়ে ধরাইতে অনুক্ষণে আর
করে নাক রাধা মান।
শ্রীহীন সকলি তোমার বিহনে
হে ব্রজ জীবন হরি।
কোন গ্লানিমা ছেয়ে আছে আজি
ব্রজ আঁধিয়ার করি।

শুনিতে পেয়েছি চিত্ত ব্রজে আমি
তোমার মুরলী হে জীবন স্বামি!
হৃদয় রাধার কাঁদাও না আর,
তৃপ্ত কর সো প্রাণ।
তোমার মিলনে হউক আমার
কামনার অবসান।

ভাল।

(চিত্র)

[শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র বি. এ]

গভীর রাত্রিতে তিনি একা। দূরে গোলাকার একটি নগরের প্রাচীর দেখ্‌তে পেয়ে সেই দিকে অগ্রসর হলেন। কাছে এসে শুন্‌তে পেলেন নগরের ভেতরকার আনন্দের পদশব্দ, পুলকের মৃদু নিঃস্বন অট্টহাসি আর সহস্র বংশীর তীব্র উচ্চ ধ্বনি। তোরণ দ্বারে আঘাত ক'রতেই দ্বারী দ্বার উন্মুক্ত ক'রল।

দেখলেন সম্মুখে এক মর্ম্মর প্রাসাদ, তার পুরো ভাগে মর্ম্মর স্তম্ভ,—সেই স্তম্ভ থেকে মালা দুল্‌ছে, ভিতরে ও বাইরে সুগন্ধি মশাল জ্বল্‌ছে। তিনি প্রাসাদের ভেতর প্রবেশ ক'রলেন। এক এক ক'রে বিচিত্র প্রস্তর-খোচিত কক্ষের পর কক্ষ পার হয়ে ভোজন কক্ষে এসে পৌঁছুলেন। সেখানে দেখ্‌লেন সুকুমার কৌচের ওপর শুয়ে কে একজন —মাথায় তার রক্তগোলাপের মুকুট, অধর তার সুরায় রক্তিম।

ধীরে ধীরে তার পেছনে গিয়ে তার কাঁধের ওপর হাত রেখে বল্‌লেন "এ তোমার কি রকম জীবন?"

যুবক তাঁকে চিন্‌তে পেরে বল্‌লে "আমি এক সময়ে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ছিলেম, তুমি আমাকে সারিয়ে তোল। আমার আর কি রকম জীবন হবে?"

তিনি আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। একটু পরে আর একজনকে দেখ্‌তে পেলেন—তার মুখ ও পরণের বসন রক্তিত, তার পায়ে মুক্তো বসান জরীর জুতো। পেছনে তার বাঘের মত পা টিপে এক যুবক আস্‌ছে—তার পরণে দুই রংএর এক আলখেল্লা। রমণীর মুখখানি প্রতিমার মুখের মতই সুন্দর, যুবকের চোখদুটি লালসায় উজ্জ্বল।

একটু দ্রুত অনুসরণ ক'রে যুবকের হাত ধরে তিনি বল্‌লেন "এ কি! তুমি এই রমণীর পানে অমন ভাবে কেন চাইছ?"

যুবক ফিরে দাঁড়াল। তাঁকে চিন্‌তে পেরে বল্‌লে "আমি এক সময় অন্ধ ছিলুম, তুমিই আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দাও। আর কিসের পানে আমি চাইব!"

দৌড়ে রমণীর রঞ্জিত বসনের প্রান্ত ধরে বল্লেন "এই পাপের পথ ছাড়া চল্‌বার আর কি পথ নেই!" রমণী ঘাড় ফিরিয়ে তাঁকে চিন্‌তে পেরে হেসে বল্লে "তুমিই ত আমার সব পাপ মাপ করেছিলে। এ পথে চলা যে বড় আরামের।"

তখন নগর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। বাইরে গিয়ে দেখ্‌লেন পথের ধারে বসে এক যুবক কাঁদ্‌ছে। কাছে গিয়ে তার লম্বা চুলের গোছা হাতের মাঝে নিয়ে বল্লেন "কাঁদ্‌ছ কেন?" যুবক তার মুখের পানে তাকিয়ে তাঁকে চিন্‌লে, বল্‌লে "আমি যে মরে গিয়েছিলুম, তুমি আমাকে বাঁচাও। আমি কাঁদব না ত কি ক'রব?"

(অস্কার ওয়াইল্ড হইতে)

Printed by P. N. Pal, at the Shastraprachar Press, 5 Chidammudi Lane, and
Published by P. N. Pal, 26-3 Scott Lane, Calcutta.

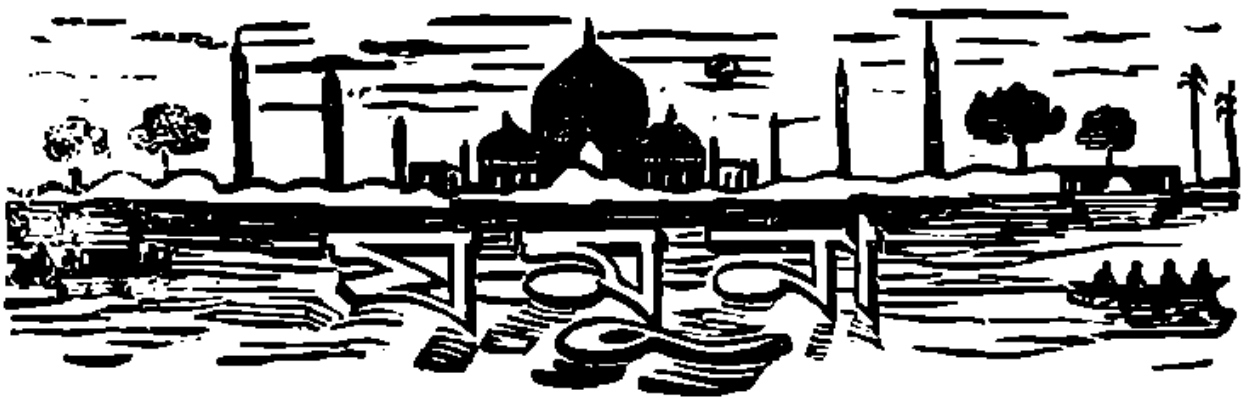

১১শ বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩২৮ | ৭ম সংখ্যা

দেবতত্ত্ব

(অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ)

(মুখবন্ধ)

অনুভূতি সকল জীবেরই আছে। জীবের জীবত্ব ও অনুভূতি নিত্য সম্পৃক্ত। জীবের স্বভাব—সুখকর অনুভূতি যাহা, জীব তাহাই চায়। দুঃখকর অনুভূতি হইতে জীব সর্ব্বথা দূরে থাকিতে চেষ্টা করে। সুখানুভূতি জীবের পক্ষে স্বাভাবিক, দুঃখানুভূতি অস্বাভাবিক,—সুখ বাধা পাইলেই দুঃখানুভূতি হয়। যখন প্রকৃতির কার্য্য অবাধে চলে, তখনই সুখ; প্রকৃতির কার্য্যে বাধা উপস্থিত হইলেই দুঃখ হয়।

সুখ ইষ্ট, দুঃখ অনিষ্ট। ইষ্টানিষ্ট হইতে ধর্ম্মাধর্ম্ম। যাহা স্বাভাবিক তাহাই ধর্ম্ম, যাহা অস্বাভাবিক তাহাই অধর্ম্ম। সুখের দিকে ধাবমান হওয়া জীবের স্বভাব; সুতরাং জীবের তাহা ধর্ম্ম।

আহার, নিদ্রা ও মৈথুন জীব-মাত্রেরই সাধারণ ধর্ম্ম; মানুষ ও ইতর জীবে প্রভেদ এই যে, মানুষকে কতকগুলি অতিরিক্ত ধর্ম্ম পালন করিতে হয়। জীবের ধর্ম্ম স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে। মানুষের প্রকৃতি অনুসারে মানুষের ধর্ম্ম। প্রকৃতিকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না; সুতরাং মানুষ স্বপ্রকৃতি অনুসারে চলিতে বাধ্য। যখন মানুষ নিরন্তরে থাকে, তখন দুঃখ পরিহার করিবার চেষ্টাই তাহার ধর্ম্ম। যাহা মানুষকে সুখ দেয়, যাহা দুঃখ দেয়, মানুষ প্রথমাবস্থায় তাহাকে শক্তিমান্ বলিয়া মনে করে। তাই মানুষ সে অবস্থায় সুখদায়কের উপাসনা করে, দুঃখদায়ককে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিতে চেষ্টা করে। পূজার অর্থ সন্তুষ্ট করা। দুঃখের

নিগ্রহ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাই দুঃখের পূজাই প্রথমে বিহিত হয়।

কারণানুসন্ধান প্রবৃত্তি মানুষেরই আছে, ইতর প্রাণীর নাই। সুখ স্বাভাবিক, প্রকৃতির গতি বাধা না পাইলে, সুখের অভাব হইবে না। কিন্তু দুঃখ হয় কেন? প্রকৃতির গতি বাধা পাইলে তবেই ত দুঃখ। এ বাধা কে দেয়? এমন কোন শক্তি আছে যাহা প্রকৃতির স্রোতে বাধা দেয়। সে শক্তিকে কেহ দেখিতে পায় না, তাহার কোন মূর্ত্তি নাই। কিন্তু মানুষ যাহা আছে বলিয়া জানে, তাহার একটা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লইতে বাধ্য হয়। যাহার মনের যেরূপ গঠন, তাহার কল্পনার গঠন সেইরূপ হয়। নিম্নস্তরের মানুষের কাছে দুঃখ দেবতা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আসে। মানুষ তাহাকে তুষ্ট করিয়া বিদায় করিবার চেষ্টা করে। ধর্ম্মের প্রথমস্তরে ভূত, প্রেত প্রভৃতির পূজা প্রচলিত হয়। সেই সময় মানুষ বৃক্ষাদিতে বা মূর্ত্তিতে এই সকলের পূজা করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় স্তরে মানুষ শুধু দুঃখের পরিহার করিয়া সন্তুষ্ট হয় না। সুখের উপাসনায় তাহার প্রবৃত্তি হয়। প্রকৃতির যে অবিরাম স্রোত, যাহা জীবের সুখের নিদান, তাহারও ত কর্ত্তা আছে। এই অবস্থায় দুই শক্তির অনুভব হয়। প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবাহ একশক্তির কার্য্য, সেই প্রবাহে বাধা প্রদান করা, আর এক শক্তির কার্য্য। এক শক্তি সুখদায়ক ও আর এক শক্তি সুখের প্রতিরোধ করিয়া থাকে।

মানুষের জীবন সুখদুঃখময়। কিন্তু মানুষ চায় সুখ, দুঃখ চায় না। দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টাই জীবন। দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইলেই সুখ হয়। এ সুখদুঃখ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন, সুখ বলিয়া কিছু নাই। আমরা দুঃখের দ্বারা আক্রান্ত হইলে, তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করি, চেষ্টার ফলে দুঃখের অবসানের অবস্থাই সুখ। কেহ বা অনুমান করেন, সুখের যেখানে বাধা সেই খানেই দুঃখ। আবার কেহ কেহ বলেন, সুখ দুঃখে কোন প্রভেদ নাই, সুখ ব্যতীত দুঃখের ও দুঃখ ব্যতীত সুখের অনুভূতি হইতে পারে না, সুতরাং সুখ দুঃখকে ছাড়িয়া থাকে না, দুঃখও সুখকে ছাড়িয়া থাকে না। উহারা উভয়েই মূলে এক জিনিস। সুখের চেষ্টায় ঘুরিয়া আমরা সুখকে পাই না, দুঃখ সুখের চির সঙ্গী।

প্রাচীন কালের মানুষ শক্তি মাত্রকেই দেবতা জ্ঞান করিত। তাহারা সুখের শক্তি ও দুঃখের শক্তি অনুভব করিত। সুতরাং সুখদায়ক ও দুঃখদায়ক উভয়বিধ দেবতা তাহারা কল্পনা করিত। দুঃখের অবসানে সুখ আপনিই আসিয়া পড়ে, সুতরাং দুঃখদায়ক দেবতাদিকেই স্বভাবতঃ তাহারা তুষ্ট করিবার বেশী চেষ্টা করিত। অনেকের মনে ধারণা, দেবতা ও ঈশ্বরের ভাব মানুষের মনে প্রথমে এই ভাবে আসিয়াছিল। পশু পক্ষীও মানুষের মত সুখদুঃখময় জীবন বহন করে। তাহারাও সুখের চেষ্টায় ঘোরে, দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইতে চায়, কিন্তু তাহাদের বিচার-শক্তি ও কল্পনা শক্তি নাই; তাই তাহারা সুখ-দুঃখময় সংসারের চিন্তর হইতে, দেবতা বা ঈশ্বরকে বাহিরা বাহির করিতে পারে না। দুঃখ ও বিপদ্ মূর্ত্তিমান হইয়া মানবের সম্মুখবর্ত্তী হইলে, মানব ভয়ে তাহাদিগকে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদিগের হাত হইতে এড়াইবার জন্য তাহাদিগের তুষ্টির চেষ্টাই তাহাদিগের পূজা। আমরা মানব-সমাজে ইহার লক্ষণ এখনও দেখিতে পাই। মানব শনির পূজা করে, শীতলার পূজা করে, ষষ্ঠীর পূজা করে, অলক্ষীর পূজা করে, আরও কত দুঃখদায়ক দেবদেবীর পূজা করে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আপাততঃ মনে হয়, মানুষ প্রথমে দেবতাদিগকে ভয়েই ভজে, ভক্তিতে নয়। কিন্তু আমরা মানব-জাতির ইতিহাস আরও ভাল করিয়া দেখিলে, আমাদের অন্যরূপ মনে হয়। সকল মানব জাতিই

প্রাচীন কাল হইতে, সর্ব্বশক্তিমান্, পরমমঙ্গলপ্রদ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে, সকল মানব জাতিই পরকালে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। অন্ততঃ ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, পরকালের প্রতি বিশ্বাস মানব বরাবরই করিয়া আসিতেছে। পরকালের বিশ্বাসের সঙ্গে ভয়ের অস্তিত্ব সঙ্গতি থাকিতে পারে না। মানুষ বিচারের আশা না করিয়া, পরকালের ধারণা করিতে পারে না। বঙ্গদেশের ইতিহাসে দেখিতে পাই, বাঙ্গালীরা এক সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত, কিন্তু তাহারা পূজা করিত দুঃখদায়ক দেবতাগণকে। পাহাড়ের উপর, বনে, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর ভয়, সুতরাং তাহারা মনসাকে পাহাড়কে পূজা করিতে বাধ্য হইত; গঙ্গায় হাঙ্গর কুমীরের ভয়, ডুবিয়া মরার ভয়, সুতরাং গঙ্গাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য তাহারা ছাগ ও মেষ গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিত।

ঈশ্বরের সম্বন্ধে জ্ঞান মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। আমি আছি, এই জ্ঞান মানুষের পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, ঈশ্বর আছেন, এই জ্ঞানও তাহার পক্ষে সেইরূপ স্বাভাবিক। বিজ্ঞানের আবির্ভাবের সঙ্গে মানুষের এই দুই জ্ঞানের প্রথম প্রথম কিছু ব্যতিক্রম হয়। মানুষের মনে কোন্ সময় প্রথম মৃত্যুচিন্তা আসিয়া উপনীত হইল, তাহা কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু মানুষ চিরকালই মরিতে চায় না। চৈতন্যের একধারে বিলোপই মৃত্যু, যতক্ষণ চৈতন্য আছে ততক্ষণ কাহাকেও মৃত বলা যায় না। এই চৈতন্যের একেবারে বিলোপ হয়, মানুষ এই ভাব কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। মৃত্যুচিন্তা মানুষকে বড়ই বিহ্বল করিয়া ফেলে। যদি আশা না থাকিত, মানুষের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া পড়িত। মানুষ আশা করে মৃত্যু প্রতীয়মান, মৃত্যু প্রকৃত নহে। বিহ্বল হইলেই আশার বাণী শুনিতে পাওয়া যায়। মানুষ বিহ্বল হয় বলিয়াই মানুষ আশা করে পরকাল আছে। ইতর জীবেরা বিহ্বল হয় না, তাই উহাদের পরকালের চিন্তা নাই। জগৎ বড়ই বৈচিত্র্যময়, বড়ই কৌশলে রচিত; আমরা দেখিতে পাই, যেখানে যেটুকু দরকার, জগতের সেখানে সেটুকু আছে। আশা মানুষের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে ইতর জীব আশার বাণী শুনিতে পায় না। মানুষের জীবনের সঙ্গে আশার এরূপ সম্বন্ধ যে, আশার সহিত একমুহূর্ত্তের বিচ্ছেদও মানুষ সহিতে পারে না। মানুষের যে পরকাল আছে আশাই তাহা প্রথমে মানুষের কাণে কাণে বলিয়া দেয়। মানুষ আপনার মনকে প্রবোধ না দিয়া থাকিতে পারে না, মানুষের স্বভাবই এই।

মানুষ যখন প্রবলের দ্বারা অন্যায়ভাবে পীড়িত হয়, তখন মানুষ আশা করে, একজন ইহার বিচার করিবে। পরকাল ও ঈশ্বরের ধারণা, আশাই মানুষকে আনিয়া দিয়াছে। মানুষ প্রথমেই মূর্ত্তি পূজা করে নাই, প্রাকৃতিক শক্তি সকলকে দেবতা-জ্ঞানে প্রথমেই মানুষ পূজা করিতে শেখে নাই। আধুনিক বিজ্ঞানকেই আমরা বিজ্ঞান বলিয়া মানি, কিন্তু বিজ্ঞান কতকালের তাহা কেহ হিসাব করিয়া বলিতে পারে না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি যত কালের, বিজ্ঞানও ততকালের। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে যাহা পর্য্যবেক্ষণ করে, তাহা হইতে সে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তাহাই তাহার বিজ্ঞান। বুদ্ধিবৃত্তি যত পরিপক্কতা লাভ করে, বিজ্ঞানও তত উন্নত হয়। এক সময় মানুষ যাহার চাঞ্চল্য দেখিত তাহারই প্রাণ আছে বলিয়া মনে করিত। তখন মানুষের কাছে বায়ুর চৈতন্য ছিল; চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রাদিরও চৈতন্য ছিল। তখন মানুষের মনের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহার বিজ্ঞানেরও সেইরূপ অবস্থা ছিল। এখন মানুষের মনের অবস্থার সহিত বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে মাত্র, কিন্তু তখন বিজ্ঞান ছিল না, এখন বিজ্ঞান হইয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে না। যাহা হউক, বিজ্ঞানের আলোচনা করিতে গিয়া, মানুষ ঈশ্বর হইতে তফাৎ হইয়া

পড়িয়াছে। ঈশ্বর যেদিন মানুষকে সৃষ্টি করিলেন, সেইদিন পরকাল ও ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণা মানুষের মনে প্রথিত করিয়া দিলেন।

লোকে বলে আশা মায়াবিনী। আশা মানুষকে প্রবঞ্চনা করে, সত্য কথা বলে না। কিন্তু ঈশ্বর মানুষকে যাহা দিয়াছেন, তাহা তিনি মানুষকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য যেন নাই। ঈশ্বর মানুষকে যাহা দিয়াছেন, মানুষ তাহার অযথা ব্যবহার করে বলিয়াই, মানুষ আপনিই প্রবঞ্চিত হয়। আশা মানবমনের এমন একটা কিছু, যাহা মানবমন হইতে বাদ দিলে মানব মরিয়া যায়। এমন যে জিনিস তাহা কখনই বৃথা সৃষ্ট হয় নাই। মানবমনে আশার কার্য্য আছে, ও কার্য্যের সার্থকতা আছে। পরকাল ও ঈশ্বরের ধারণার জন্যই আশা সৃষ্ট হইয়াছে। আশার আর কোন কাজ নাই।

আমরা আশাকে টানিয়া যখন অন্যদিকে লইয়া যাই, তখনই প্রবঞ্চিত হই। একের কাজ অন্যের দ্বারা হইতে পারে না। মানুষ সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে, সকল বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে, যদি তাহার ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস থাকে। এই জ্বালাযন্ত্রণাময় সংসারে, এই অত্যাচারও মৃত্যুভয়-প্রপীড়িত জগতে, আশাকে বক্ষে ধারণ না করিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। কে সম্পূর্ণ নৈরাশ্যে জীবন ধারণ করিয়াছে? যখন পূর্ণ নৈরাশ্যের উদয় হয়, তখন হয় মানুষ পাগল হইয়া যায়, না হয় সে ঈশ্বরের উপর আত্মসমর্পণ করে। পূর্ণনৈরাশ্যে ঈশ্বর-চিন্তা ব্যতীত মানুষ ঠিক থাকিতে পারে, এমন দেখা যায় না। সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কাহারও শোকে, হয় মানুষ আশায় বাঁচিয়া থাকে, না হয় পাগল হইয়া যায়, না হয় অন্য চিন্তায় শোক প্রশমিত করে।

দেখা গিয়াছে, অত্যন্ত প্রিয়তমের মুমূর্ষু অবস্থা, তথাপি লোক আশা করিতেছে, বাঁচিতে পারে; কিন্তু যেই তাহার আশার অবসান হইবার সময় হয়, সে হয় অল্পকালের জন্য অজ্ঞান হইয়া পড়ে, না হয়, অন্ততঃ কিছু কালের জন্য পাগল হইয়া যায়। পূর্ণ নৈরাশ্যের অবস্থায় মানুষ বাঁচিতে পারে না, তাই প্রকৃতির কৌশলে এইরূপ হয়। যাঁহারা পরকাল বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাসবান্, তাঁহাদের এরূপ হইতে দেখা যায় না।

আমরা তাই সঙ্গত আশা রাখি, পরকাল আছে, ঈশ্বরের বিচার আছে, তাহা না হইলে কে এ দুঃখ জীবন রাখিতে পারিত? ভয় হইতে, দুঃখ হইতে, মানব-মনে ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণা আসিল, ইহা অত্যন্ত কাঁচা কথা। মানব-মনের অভ্যন্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিশ্বাস না থাকিলে, পৃথিবীর কোন ঘটনাই তাহা আনিতে পারে না। ঈশ্বর মানব-মনের অভ্যন্তরে লুকাইয়া আছেন, তাই মানব তাঁহাকে খুঁজিয়া পায়।

পৃথিবীর সকল জাতিই পরকাল ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। পরকাল ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা মানবের প্রকৃতি-সিদ্ধ। মানব যুক্তি অবলম্বন করিতে গিয়া সেই বিশ্বাসকে কতক পরিমাণে হারাইয়া ফেলে। প্রাকৃতিক শক্তি-সকলের সহিত সংঘর্ষে মানুষ যখন আসিল, সীমাবদ্ধ বুদ্ধি লইয়া যখন মনে করিল, ইহারা চৈতন্যময়, ঈশ্বরের স্বরূপ তখন মানুষের নিকট খাট হইয়া পড়িল। মানুষ মনে করিল, ঈশ্বর তাহারই মত প্রকৃতি-বিশিষ্ট।

আমরা যে ভাবে ইতিহাস আলোচনা করি, তাহাতে আপাততঃ মনে হয়, মানব বুঝি সর্ব্বপ্রথমে প্রাকৃতিক শক্তি সকলকে, এক একটী ঈশ্বর বলিয়া মনে ধারণা করিত। তাহাদের মনে ঈশ্বরের সম্বন্ধে অন্য কোনরূপ ধারণা ছিল না, প্রাকৃতিক যে শক্তি তাহাদিগকে নির্য্যাতন করিত, তাহারা তাহাকেই পূজার দ্বারা প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিত। ঈশ্বরের ধারণা যদি মানুষের মনে এইভাবেই আসিয়া থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বর অলীক কল্পনা বই আর কিছুই নয়।

কিন্তু ঈশ্বর অলীক কল্পনা নহেন, তিনি জীবন্ত সত্য। আত্মার সহিত সত্যের সম্বন্ধ নিত্য ও স্বাভাবিক। মানবাত্মার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ মিথ্যার ভিতর দিয়া হয় নাই। যেমন, আত্মা স্বভাবতঃ জানে তাহার মৃত্যু নাই। মৃত্যুর ধারণা মানুষের সংস্কার মাত্র। মানুষের আত্মার মূলে মৃত্যুর ধারণা নাই। অভিজ্ঞতার দ্বারা মৃত্যুর ধারণা মানুষ সংগ্রহ করে। যখন মানুষ অন্য শরীরকে নিস্পন্দ হইতে দেখে, তখন মানুষ মনে করে কোন জীব মরিল। পুনঃ পুনঃ এইরূপ দেখিয়া তাহার ধারণা হইল জীব মাত্রেই মরে। সেও একজন জীব, সুতরাং সেও মরিবে। এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সাধ্য মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীবের নাই। তাই নিজের মৃত্যুর ধারণা ইতর প্রাণীর নাই।

আত্মা স্বভাবতঃ অবিনশ্বর, সুতরাং মৃত্যুর ধারণা আত্মার পক্ষে বিসদৃশ সংস্কার। মানুষ ইহা সহ্য করিতে পারে না। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তাই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি সৃষ্টি করিবার সময়, মানুষের জন্য আশার সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষ সেই আশায় বুক বাঁধিয়া জীবন ধারণ করিতেছে।

যাহা হউক আমরা দেখিয়াছি, দ্বিতীয় স্তরে সুখের উপাসনায় মানুষের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই সুখ নানা প্রকার, দুঃখও নানাপ্রকার। সুখ দুঃখের প্রবর্ত্তক, সুতরাং এক নহে, বহু। ইহাই তৃতীয় স্তরের সিদ্ধান্ত। বেদের সংহিতা-ভাগ এই স্তরের অন্তর্গত। এই স্তরে শক্তিরূপ-কল্পনা প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু শক্তিসকল অনুভূত ও নানা নামে অভিহিত হয়। দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ও সুখ লাভ করিবার জন্য, স্তব স্তুতির আবির্ভাব হয়। সংহিতা-ভাগের মন্ত্রসকল এই স্তব স্তুতি। শক্তির অনুভূতি সহজে হয় না। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাযুক্ত হৃদয়েই শক্তির অনুভূতি হয়। শক্তি-অনুভূতির পূর্ণ উৎকর্ষ সাধিত হইলে, শব্দের সাহায্যে তাহার মন্ত্ররূপে স্ফুরণ হয়। হিন্দুশাস্ত্র মতে শব্দই ব্রহ্ম। শব্দ-ব্রহ্ম হইতে মন্ত্রের উৎপত্তি। যে শক্তি অনুভূত হয়, মন্ত্রে তাহার অভিব্যক্তি হয়।

শক্তির অনুভূতি যখন অস্পষ্ট অবস্থায় ছিল, সূক্ষ্ম ও স্পষ্টভাবে শক্তির ধারণা যখন হয় নাই, তখন এই সকল শক্তির নাম, রূপ ও মূর্ত্তি কল্পনা ও তাহাদিগের পূজা হইত। আদি ধর্ম্ম-বিশ্বাস এই স্তরের।

ক্রমশঃ সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও বিচারের দ্বারা এই বিবিধ শক্তি যে একেরই বিকাশ, ইহা অনুভূত হয়। এক আদ্যাশক্তি আছেন, তাঁহারই অসংখ্য বিভূতি। তখন অনুভূত হয় 'একং সৎ', আর ইহাকে 'বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' এইরূপে অনুলোম বিলোম বিচারে এক হইতে বহুত্বের ও বহুত্ব হইতে একত্বের অনুভূতি হয়। মূলাবস্থায় ইহা একেশ্বরবাদ, সূক্ষ্মাবস্থায় ইহাই ব্রহ্মানুভূতি। স্থূল একেশ্বরবাদ পুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয়।

অসীমের ধারণা সাধারণ ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে অসম্ভব। অসীম ও নিরাকার ব্রহ্মকে সে ধারণায় আনিতে পারে না। যাহাকে ধারণায় আনিতে পারা যায় না, তাহার স্তব স্তুতিও হইতে পারে না; সুতরাং সাধারণ মানবের জন্য মূর্ত্তি কল্পনার প্রয়োজন হয়। মহাপ্রাণ মহর্ষিগণ সাধারণের উপকারের জন্য এরূপ মূর্ত্তি কল্পনা করিলেন, তাহা পূজা ও উপাসনার যোগ্য হইল।

মানুষ মরিলে সব ফুরায় না। দেহের নাশ হয় কিন্তু আত্মা থাকে। সকল দেশের মানব-জাতির বরাবর এই বিশ্বাস। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব, কেহই একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না, তাঁহারা স্থূল জগৎ হইতে সূক্ষ্ম জগতে চলিয়া যান মাত্র। এখানে তাঁহারা থাকিলে, আমরা তাঁহাদিগকে কত যত্ন করি। কিন্তু তাঁহারা ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলে, সম্বন্ধ একেবারে যায় না। তাঁহারা পরলোকে আমাদের সেবা ও ফলপ্রার্থী। আমরা তাঁহাদের সেবায় ত্রুটি করিলে, তাঁহারা অসন্তুষ্ট ও রুষ্ট হইতে পারেন, ও আমাদের অমঙ্গল বিধান

করিতে পারেন। এখানেও সুখেচ্ছা ও দুঃখ পরিহারেচ্ছার ভাব আসিয়া প্রভাব বিস্তার করে। পরলোকগত পুণ্য পুরুষেরা তুষ্ট হইলে অমঙ্গল ও রুষ্ট হইলে মঙ্গল বিধান করিতে পারেন; সুতরাং পূজার দ্বারা তাঁহাদিগের সন্তোষ বিধানের প্রয়োজন হয় না। প্রেতাত্মাকে ধ্যানে আহ্বান করিয়া পূজা করিতে হয়। দৃশ্যজগতের অন্তরালে এক সূক্ষ্ম-জগতের অস্তিত্বের বিশ্বাস অতি আদিম অবস্থা হইতে মানবের আছে। এই বিশ্বাসই, পরকাল, স্বর্গ ও নরক বিশ্বাসের মূলীভূত কারণ।

ঈশ্বর হইতে ছোট এবং মানুষ হইতে বড় কিছুর কল্পনায় দেবতার আবির্ভাব। জগতের সকল জাতিই কোন না কোন আকারে দেবতার কল্পনা করিয়াছে। এই দেবকল্পনার আভাস আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। মানুষ অজ্ঞতা বশতঃই যে দেবতার পূজা করে একথা বলিলে চলিবে না। যখন পৃথিবীর সকল জাতিই দেবতায় বিশ্বাস করে তখন বিষয়টীকে এককথায় উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এ বিষয়ের আলোচনার আবশ্যকতা আছে। দেবতত্ত্বের আলোচনায় দেবতাদের কি কার্য্য তাহা বুঝিতে হইবে।

হিন্দু শাস্ত্রে দেবতাদের নাম আছে, তাহাদের শ্রেণী-বিভাগ আছে, তাহাদের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা আছে। তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করে। প্রত্যেক দেবতার বিশেষত্ব শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

এখন এই যে দেবতা ইঁহাদের কোন মূর্ত্তি আছে কি না। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, তাঁহারা কোন প্রাকৃত দেহ ধারণ করেন না। তবে শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবতা যে লোকের উপাদানের অনুরূপ মূর্ত্তি সেই দেবতার সেইরূপ হইয়া থাকে। বেদে এমন অনেক মন্ত্র আছে যাহাতে দেবতার মূর্ত্তি সূচিত হইয়াছে। বেদান্তও দেবতার মূর্ত্তির কথা বলিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-সূত্রভাষ্যে ইন্দ্রদেবতা সম্পর্কে বলিয়াছেন—"ইন্দ্রনামা কশ্চিদ্‌বিগ্রহবান্ দেবঃ" (১।২।২৯)। আবার তিনি ৩-১—২৭ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, দেবতারা একই সময়ে বহু মূর্ত্তিতে কায়ব্যূহ সৃষ্টি করিয়া একটিত হইয়া থাকেন। দেবতাদের নিজেদের প্রিয় মূর্ত্তি আছে, তবে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে যে কোন মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই—"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপঈয়তে"। জৈমিনি মীমাংসাদর্শনে বলিয়াছেন, "মন্ত্রাত্মিকা দেবতা"। যে দেবতার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আরাধনা করা যায়, দেবতা সেই মন্ত্রের অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। মূর্ত্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।

পাণিনি অতি প্রাচীন বৈয়াকরণ। আজকাল পণ্ডিতগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পাণিনি অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ৮ম শতকে বর্ত্তমান ছিলেন। পাণিনি একটী সূত্র করিয়াছেন—(৫।৩।৯৯)

তাহার অর্থ এই যে, অবিক্রেয় যে "প্রতিকৃতি," যাহা কেবল জীবিকার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহাতে 'কন্' প্রত্যয় হয় না। প্রতিকৃতি শব্দের অর্থ—যাহা কোন মূল মূর্ত্তির আদর্শ। ভাষ্যকারগণ ইহাকে মূর্ত্তি বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, পাণিনির সময় দেবদেবীর মূর্ত্তি ছিল। এ সমস্ত মূর্ত্তি বাজারে বিক্রয় করা হইত না। তবে জীবিকার্থে ব্যবহৃত হইত। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, এই মূর্ত্তিগুলির অধিকারী মূর্ত্তিগুলি নিজের কাছে রাখিয়া, অপরকে প্রদর্শন করিয়া, ভিক্ষাস্বরূপ যাহা পাইত, তদ্দ্বারাই নিজের খরচ চালাইত।

পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট হইতেছে ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ। ইহার ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম অদ্ভুত ব্রাহ্মণ। ইহাতে হাস্যকারী, রোদনশীল, নৃত্যকারী দেবমূর্ত্তির উল্লেখ আছে। এত প্রাচীনকালে মূর্ত্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মত একরূপ নয়। অধ্যাপক Max Müller লিখিয়াছেন—"The religion of the Veda knows no idols.

The worship of Idols in India is a Secondary formation, a later degeneration of the more primitive worship of the ideal gods." (Chips from a German workshop I, 35). Dr Bollenson (Journal of the German Oriental Society. xxii, 587) কিন্তু বৈদিক কালে মূর্ত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—"From the common appellation of the gods as दिवो नरः "Men of the sky", or simply नर (later), 'Men' and from the epithet नृपेशः "having the form of men, R. V. iii, 4, 5. we may conclude that the Indians did not merely in imagination assign human forms to their gods, but also represented them in a Sensible manner."

যাস্কের সময় মূর্ত্তি যে খুব বেশী প্রচলিত ছিল, তাহা তাঁহার নিরুক্ত পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যায়। নিরুক্তে তিনি বলিয়াছেন,—"এখন আমাদের দেবতাদের মূর্ত্তি বিচার করিতে হইবে। সংহিতাতে দেবগণ এক হিসাবে নরাকৃতি। বুদ্ধিমান্ বলিয়া দেবতাদের সম্বোধন ও প্রশংসা করা হয়। দেবগণ মানবের ন্যায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার পর পতঞ্জলি মহাভাষ্যে বিশেষ প্রচলিত মূর্ত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—শিব, স্কন্দ, বিশাখমূর্ত্তি—শিব, স্কন্দ, বিশাখ বলিয়াই উক্ত হইবে, শিবক, স্কন্দক, বিশাখক হইবে না।

রামায়ণ যুগে যে দেবমূর্ত্তি দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ লঙ্কার মন্দিরের উল্লেখ—৬।৩৯, ২১। লঙ্কার প্রতিমা সম্বন্ধে আর এক জায়গায় আছে—প্রতিমাস্থ প্রকম্পন্তে শিখরস্থা হলস্থিত (৬। ১১।২৮)।

মহাভারতে দেবমূর্ত্তির যথেষ্ট উল্লেখ আছে। যেমন হস্তী, অশ্ব, মানব প্রভৃতির প্রস্তরমূর্ত্তির উল্লেখ আছে, তেমনি তীর্থে দেবমূর্ত্তিরও যথেষ্ট উল্লেখ আছে। বনপর্ব্বে আছে (৮৪।১৩৪) জ্যোতিলা দেবীর সহিত বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিলে মিত্র ও বরুণলোক লাভ হয়। ইহাতে মূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছু বুঝায় না। অন্যত্র (১৩।২১।৬১) আছে—শিবমূর্ত্তি দর্শনে লোকে পাপমুক্ত হয়—নন্দীশ্বরস্য মূর্ত্তিং তু দৃষ্ট্বা মুচ্যেত কিল্বিষৈঃ। স্বর্গপ্রস্থে স্বর্গতীর্থে আছে—

"তত্র স্বর্গো নিত্যং আস্তে"—স্বর্গ সেখানে নিত্য উপবেশন করিয়া থাকেন। স্বর্গঃ তত্রাভিসংস্পৃশ্য—স্বর্গকে অভিসংস্পর্শ করিয়া—সন্নিবেশঃ স্থান করাইয়া।

হরিবংশে ধাতু, মৃত্তিকা, দারু, রত্নজাত ও লবণনির্ম্মিত মূর্ত্তির উল্লেখ আছে।

যাহারা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে এবং বহন করিয়া থাকে, মহাভারত ও মনুসংহিতায় তাহাদের নাম দিয়াছেন—দেবলক। এ ছাড়া মন্দির, চৈত্যের ভূরি ভূরি উল্লেখ রামায়ণ মহাভারতে আছে।* কয়েকটী উদাহরণ এই—

"দেবায়তনানি"—রামায়ণ ২।২৬।৩৩

"শ্রীমত্যায়তনে বিষ্ণোঃ"—২।৬।৪

"দেবাগারাণি শূন্যানি ন চ ভাস্তি যথাপুরম্"—২।৭১।৩৯

"দেবায়তনস্থা দেবাঃ"—৬।১১২।১১

আমরা যে সমস্ত প্রমাণের উল্লেখ করিলাম, তাহা হইতে বেশ বলিতে পারা যায় যে, বৈদিক যুগেও মূর্ত্তি অজ্ঞাত ছিল না। আর্য্যরা ঐ সমস্ত দেবমূর্ত্তির পূজাও করিত। প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে দেবমূর্ত্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ যথাসাধ্য উল্লেখ করিয়াছি। এইবার দেখা যাউক, প্রাচীনতম স্থাপত্যে ও শিলালিপিতে দেবমূর্ত্তির উল্লেখ কত প্রাচীন পাওয়া যায়।

দক্ষিণ-ভারতে এ পর্য্যন্ত যতগুলি হিন্দুস্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে প্রাচীনতম নিদর্শন হইতেছে, ভিতরগম্ নামক স্থানের লিঙ্গমূর্ত্তি। মূর্ত্তিতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহার অলঙ্কার প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ইহা Bhaurat স্থাপত্য যুগের নিদর্শন। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে যে লিঙ্গপূজা

হইত, ইহা তাহার একটী প্রমাণ। সম্প্রতি বেসনগরে গরুড়স্তম্ভের উপর একখানি শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে ইহাতে খোদিত আছে যে, Dion-এর পুত্র Heliodos একজন ভাগবত ছিলেন। ইনি গ্রীকরাজ Antialkid-এর রাজত্বকালে তক্ষশিলা হইতে আসিয়া বাসুদেবের গরুড়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করান। Antialkidas-এর সময় ১৭৫ হইতে ১৩৫ পূঃ খৃঃ। শিলালিপিতে বিষ্ণু এই প্রথম বাসুদেব আখ্যায় উল্লিখিত। ইহা হইতে ইহাও স্থির করিতে পারা যায় যে, বাসুদেবের পূজার আরম্ভ দ্বিতীয় পূঃ পূঃ শতকের আগে হয় নাই।

দেবতত্ত্বের মূলতত্ত্বে আর আমরা আর বেশী কিছু বলিব না। ইহার পর আমরা দেবতত্ত্বের এক একটী বিশেষের লইয়া আলোচনা করিব। স্তর-ভেদে দেবতত্ত্বের মূলভেদ আছে। বেদে আমরা কতকগুলি দেবতা দেখিতে পাই। সাধারণতঃ লোকের ধারণা, সেই দেবতাগুলি সমস্তই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। বৈদিক দেবতা পুরোহিত বা ব্রাহ্মণের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। আর্য্যগণ ভারতে আগমন করিবার পূর্ব্বে তাহারা যে সমস্ত দেবতার পূজা করিত, ভারতে আসিয়া তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মর্য্যাদার কিছু কিছু অবস্থান্তর ঘটে। সেই সমস্ত দেবতা বৈদিক যুগের পূর্ব্বে, বৈদিক যুগে এবং পরযুগে কিরূপ অবস্থা লাভ করে, দেবতত্ত্বের তাহাও একটী প্রধান আলোচ্য বিষয়। বৈদিক যুগের পূর্ব্বে কয়েকটী প্রধান দেবতা ছিল। বৈদিক যুগে আসিয়া তাহাদের নাম পরিবর্ত্তিত হইল না বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাদের ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটে। বৈদিক যুগে যে সমস্ত দেবতা পূজিত হইতেছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েকটী দেবতাকে লোকে পরযুগে একেবারে ভুলিয়া গেল। যাহারা রহিল তাহাদের মর্য্যাদার অনেকখানিটারই হানি হইল। হইবার কারণ, বৈদিক যুগে লোকে যাগযজ্ঞ লইয়া এত মাতিয়াছিল যে, দেবতাদের মধ্যে অনেকের খোঁজ খবর লইবার অবকাশ ঘটিত না। যে সমস্ত দেবতাদের তাহারা ভুলিল না, তাহাদের মধ্যে কয়েকটীর মর্য্যাদা খুব বাড়িয়া উঠিল। এ ছাড়া আর একটী নূতন ব্যাপার সম্ঘটিত হইল। কয়েকটী নূতন দেবতা আসিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গণ্ডীতে আশ্রয় লাভ করিল। বৈদিক দেবতাদের অধিকাংশেরই পূজা বন্ধ হইল, তাহারা শুধু নামেই বড় রহিল। এই সময়ে দেবতারা ক্রমশঃ এক একটা কর্ম্মকাণ্ডের বিভাগ ভুড়িয়া বসিতে লাগিলেন। ঋগ্বেদের সময় যে সব দেবের যে বিষয়ে সামান্য সম্বন্ধ ছিল অথবা কিছুই সম্পর্ক ছিল না, এখন হইতে তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে অধিকারী হইয়া দাঁড়াইলেন। ঋগ্বেদের সময় বরুণের জলের সঙ্গে কচিৎ সম্পর্ক ছিল, কিন্তু এখন তিনি সমুদ্রের দেবতা হইলেন। বৈদিক সবিতা ঠিক সূর্য্যের দেবতা ন'ন, কিন্তু পরে তিনি সূর্য্যের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া পড়িলেন। সোম আদৌ ঋগ্বেদে চন্দ্রদেব ছিলেন না, কিন্তু পরে তিনি ঐ পদের অধিকারী হ'ন। যম ও কোথা হইতে হঠাৎ মৃত্যুলোকের অধিপতি হইয়া বসিলেন।

বিষ্ণু, প্রজাপতি ও রুদ্রের সঙ্গে যে সমস্ত বৈদিক দেবতা ব্রাহ্মণ্যযুগে অঙ্গীকৃত হইয়াছিল, তাহাদের নাম—অগ্নি, সবিতা, সোম, বায়ু, বরুণ, যম এবং অশ্বী।

বেদের পরবর্ত্তী যুগে কুমার, গণেশ, কুবের বা বৈশ্রবণ, কাম প্রভৃতি কয়েকজন বড় বড় দেব হইয়াছিলেন। দেবীদিগের মধ্যে লক্ষ্মী বা শ্রী, সরস্বতী, ও গঙ্গার নাম উল্লেখ্য। এছাড়া সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা, ইন্দ্রপত্নী শচী প্রভৃতি ত আছেনই।

দেবতত্ত্বে অসুর, দৈত্য, দানব, নাগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস, প্রভৃতিরও আলোচনা থাকিবে। আর এক শ্রেণীর দেবতা আছেন যাঁহাদের বিষয় বিশেষভাবে আলোচ্য। তাঁহারা নরত্ব হইতে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। *

* কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই প্রবন্ধ রচনাকালে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, গোপীনাথ রাও, বুলফিন প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

বৃন্তচ্যুত

(উপন্যাস)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী বি. এ)

(১২)

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে শশী রাস্তার ধারের জানালাটার কাছে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। চারিদিক নীরব নির্জ্জন। আসন্ন সন্ধ্যার অবসাদটুকু চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—সমস্তই যেন ক্লিষ্টমান। প্রসন্ন আসিয়া বলিল, "আজ আর রান্না চড়াতে হবে না বুঝি ?"

সে বলিল, "আমার আজ আর ক্ষীদে নেই; তোকে পয়সা দিচ্ছি, তুই কিছু কিনে খেয়ে যা।"

প্রসন্ন বলিল, "আমার অত পেটের জ্বালা বয়ে নি ত।"

শশী বলিল, "সত্যি বলছি আমার ক্ষীদে নেই।"

প্রসন্ন বলিল, "এখন না ক্ষীদে থাকে, রাত্তিরে ত পাবে।"

"না তাও পাবে না;—তুই আমার কথা শোন্, পয়সা নিয়ে—"

"আমার পেটে রাক্কাস্ ঢোকে নি ত!"

শশী বলিল, "আমি কি মিথ্যে কথা বলছি, সত্যি আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।"

"কেন কি হ'য়েছে যে খেতে ইচ্ছে করছে না, শুনি। মেয়ে দিন দিন যেন এক রকম হচ্ছেন; না আছে খাওয়া, না আছে পরা, কেন যে বাপু!"

কি ভাবিয়া শশী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা উনুনে আগুন যেগে যা—আমি যাচ্ছি।"

প্রসন্ন বলিল, "রাঁধতে ইচ্ছে না করে, চিঁড়ে, দই কিনে নিয়ে আস্‌ছি, ফলার করবি এখন।"

সে বলিল, "সেই ভালো—আর উঠতে ইচ্ছে করছে না।"

এই সময় বাহির হইতে কে ডাকিল, "ভুলো আছিস্, ভুলো।"

শশী বলিল, "কে ডাকে দেখ দেখি।"

ফিরিয়া আসিয়া প্রসন্ন বলিল, "ভুলোর বাপ ভুলোকে খুঁজতে এসেছে—সে নাকি খেয়ে দেয়ে সেই যে বেরিয়েছে—এখন পর্য্যন্ত ঘরে ফেরে নি।"

ব্যস্তভাবে শশী বলিল, "তুই কি বলি ?"

"বল্‌ব, সে ত কৈ এখানে আসে নি।"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া শশী বলিল, "তিনি কি চলে গেছেন।"

"না, জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন, তোকে কিছু বলে গেছে কি না।"

"কৈ কিছুই ত বলে যায় নি সে—তবে সে গেল কোথায় ?" বলিতে বলিতে শশী প্রসন্নর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দরজার কাছ অবধি আসিয়া হঠাৎ এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল এবং আড়াল হইতে প্রসন্নকে বলিল, "বল্ সে ত আজ এখানে আসেই নি।"

প্রসন্ন তাহাই বলিল।

চিন্তিতভাবে চন্দ্রকান্ত বলিল, "তাই ত, তবে সে গেল কোথায় ?- দেখি যদি বারোয়ারিতলায় থাকে; আজ যাত্রা বসেছে বটে—সেইখানেই বুঝি ত জমে গেছে!"

চন্দ্রকান্ত চলিয়া যাইতেছিল, প্রসন্নকে ডাকিয়া

শশী বলিল, "তাকে পেলে আমাকে যেন খবর দেওয়া হয়।"

চন্দ্রকান্ত কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছিল—প্রসন্ন ডাকিয়া বলিল, "শশী বলছে, পেলে যেন আমাদের খবর দেওয়া হয়।"

দূর হইতে চেঁচাইয়া সে বলিল, "নিশ্চয়ই খবর দোবো; ভুলো ত আর আমার একলার নয়।"

শশী আবার আসিয়া জানালার ধারে বসিল। চারিদিকে তখন সন্ধ্যার শাঁখ বাজিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু সে সকল ছাপাইয়া একটি কথা তার কানের মধ্যে ক্রমাগত আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল, "ভুলো ত আর আমার একলার নয়।" নয়ই ত!—সে যে তা'দের দুজনের; আর ঐ খানেই যে তাদের যোগ-সূত্র। শশী হঠাৎ জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পর নাকাইতে নাকাইতে ভোলা আসিয়া ডাকিল, "মা।"

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শশী বলিয়া উঠিল, "ঘরে আয় রে ভোলা।"

ভোলাকে শয্যার উপর নিজের কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া শশী বলিল, "সারাদিন কোথায় ছিলি রে ছষ্টু!"

সে বলিল, "ও পারে মেলা দেখতে গেছলুম।"

"তা, বলে যেলেই ত হোতো। তোর বাপ আর আমি এদিকে ভেবে মরি—আচ্ছা পাজি ছেলে ত তুই।"

ভোলা হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল; যেন কি বাহাদুরিটাই সে করিয়া ফেলিয়াছে।

শশী বলিল, "তোর বাপ বুঝি তোকে পাঠিয়ে দিলে।"

সে বলিল, "হুঁ।"

"কি বল্লেন।"

"বল্লে, তোর মা ভাবছে—যা; গিয়ে একবার দেখা দিয়ে আয়।" কথাটা শেষ করিয়াই সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "তুমি আমাদের বাড়ীতে গিয়ে থাক না কেন? তা হলে বেশ হয়।"

একটা শুষ্ক হাসি হাসিয়া শশী বলিল, "তোর বাপ থাকতে দেবে কেন?"

"ইস্ দেবে না, আমি বলে এক্ষুণি দেবে।"

শশী বলিল, "তা বলে যেন, সত্যি সত্যি ও কথা বলিস্ নে—আমি তোর সঙ্গে ঠাট্টা করছিলুম।"

ভোলা বলিল, "মা, বলবে না!—নিশ্চয়ই বলবো।"

শশী বলিল, "লক্ষ্মী ছেলে আমার, বলিস্ নে—ও কথা বলতে নেই।"

সে বলিল, "তবে তুমি আমাদের বাড়ীতে চল।"

শশী বলিল, "তাকি হয় রে পাগল?"

সে বলিল, "খুব হয়।" তার পর হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি তোমার কাছে আজ শোবো মা!"

শশী বলিল, "বেশ ত—কিন্তু তোর বাপকে বলে আয়।"

কথাটা শেষ না হইতেই ভুলো হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল।

শশী বলিল, "এখানে এসে খাবি বুঝলি—খবরদার খেয়ে আসিস নে যেন।"

"আচ্ছা" বলিয়া সে হঠাৎ দৌড় দিল।

প্রসন্নকে ডাকিয়া শশী বলিল, "উনুনে আগুন দে সেলাই।"

সে বলিল, "এই না কাজে ছিল না তোর।"

সে বলিল, "ছেলেটাকে খেতে দিতে হবে ত।"

রাত্রে শয্যায় শুইয়া ভোলা বলিল, "আজ মা মজা হয়েছে মা।"

"কি মজা হয়েছে রে?"

"ওপারের বাবুরা আছে না—তাদের সঙ্গে খুব ভাব করে এসেছি।"

তার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে শশী

বলিল, "তা বন্ধু নয়—সমবয়সী বন্ধু বটে, তা কি ভাবটা হোলো শুনি? তারা বুঝি তোকে দেখেই বল্লে, ভোলানাথ বাবু, আপনার সঙ্গে আমরা ভাব করবো!"

"তা কেন বলতে যাবে।"

"তবে?"

"আমিও মেলা দেখ্‌তে গেছি, তারাও মেলা দেখ্‌তে এসেছিল—চক্রবর্ত্তী মশাই ত ভাব করে দিলে।"

হাসিয়া শশী বলিল, "কি বল্লে? যে ইনিই শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য?"

ভারি বিরক্ত হইয়া ভোলা বলিল, "কি বল্লে তা কি আর শুনেছি—তারা সব আস্তে আস্তে কথা কইছিল।"

তার গালে একটা চুমা খাইয়া শশী বলিল, "তার পর?"

"তার পর বাবুরা সব আমার সঙ্গে কত কথাই কইলে।"

"কি বল্লে?"

"বল্লে তোমার বাবা কেমন আছে—তোমার নতুন-মা, তোমাকে ভালবাসে?"

বাধা দিয়া শশী বলিয়া উঠিল, "খবরদার ভোলা মিথ্যে কথা বলিস্ নে।"

রাগিয়া ভোলা বলিল, "আমি অমন মিথ্যে কথা বলি না—বাবা আমাকে বলে দিয়েছে, ক'খন মিথ্যে কথা বলতে নেই।"

অপ্রস্তুতে পড়িয়া গিয়া শশী বলিল, "তারা আর কি বল্লে?"

"বল্লে তোমার বাবা কি তোমার মার সঙ্গে কথা কয়?"

"তুই কি বল্লি?"

"আমি বল্লুম, না।"

আশ্চর্য্য হইয়া শশী জিজ্ঞাসা করিল, "তারা আর কি জিজ্ঞাসা করলে?"

"বল্লে, রাত্তিরে কোন দিন তোমার বাবা তোমার সঙ্গে তোমার মার বাড়ীতে বেড়াতে যায়।"

বাধা দিয়া শশী বলিয়া উঠিল, "ওদের সঙ্গে আর কখনও কথা কস্‌নে ভোলা।"

সে অবাক্ হইয়া বলিল, "তারা খুব ভাল লোক মা, একটুও বকলে না!"

অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া শশী বলিল, "মাই বলুক, তবু কথা কস্‌নে—আমি বারণ করছি—ওরা ভাল লোক নয়, বুঝলি?"

সে বলিল, "আমাকে খুব আদর—"

"তা হোক্ গে—যা বলছি তাই শোন্—বুঝলি?"

সে বলিল, "আচ্ছা।"

(১৩)

পরদিন সন্ধ্যার সময় সনতের মা আসিয়া বলিলেন, "কাল বড় বৌমাকে সাধ দোবো তোমার যাওয়া চাই।"

সে বলিল, "যাবো বৈকি মা।"

"যাবো বৈকি নয়—সকাল থেকে গিয়ে করতে-কম্মাতে হবে, শুধু নেমন্তন্ন রাখতে গেলে চলবে না।"

যাইবার সময় সনতের মা আবার বলিয়া গেলেন, "নিশ্চয়ই যেও—আমি কাল সকালেই পাল্কী পাঠিয়ে দোবো এখন।"

সে বলিল, "না না, আমি হেঁটেই যাবো এখন, এইটুকু পথ বৈ ত নয়।"

পরদিন সকাল বেলা ভোলা আসিয়া বলিল, "তুমি নেমন্তন্ন খেতে যাবে না মা?"

সে বলিল, "যাবো বৈ কি, তুই যাবি নে ভোলা?"

মুখখানা ভার করিয়া ভোলা বলিল, "আমাদের যেতে বল্লে ত যাবো।"

শশীর চমক ভাঙ্গিল, ভোলা এবং ভোলার বাপকে সমাজ যে একঘরে করিয়া দিয়াছে, তাহা

সে জানিত। কিন্তু সনতদের বাড়ীতেও যে তাদের সামাজিকতার দাবী এমন ভাবে উঠিয়া গিয়াছে, তাহা সে জানিত না।

ভোলার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে শশী বলিল, "না নেমন্তন্ন করলে ত বড় বয়েই গেল; আমরা তিনজনে না হয় ঘয়ের ভাতই বেশী করে খাবো, কি বলিস্ ভোলা!"

ভোলা বলিল, "তোমাকে ত নেমন্তন্ন করেছে মা?"

শশী বলিল, "তোমাদের যখন নেমন্তন্ন হয় শুনি, তখন ও-নেমন্তন্নয় আমি কি যেতে পারি রে পাগলা!"

তারপর হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, "সনত কি কলকাতা থেকে আসে নি রে ভোলা!"

ভোলা বলিল, "কাল থেকে সনতদার পরীক্ষা বসেছে, তাই আসতে পারে নি।"

"সে, তা হলে এখন দু'চারদিন আর আসছে না বল্!"

ভোলা বলিল, "সেই আর সোমবারে পরীক্ষা শেষ হবে—তার পর আসবে।"

সনতের মার নিকট হইতে কি আসিয়া যখন বলিল, "কৈ গো দিদিমণি যাবে না?"

সে বলিল, "না বাছা, যেতে পারলুম না।—মাকে বুঝিয়ে বোলো শরীরটা ভাল নেই—কিছু যেন মনে না করেন।"

তারপর কি ভাবিয়া বলিল, "না না কিছু বলতে হবে না—আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।"

দোয়াত কলম লইয়া অনেক ভাবিয়া শশী শেষকালে লিখিল:—

পরমপূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী

শ্রীচরণকমলেষু—

মা যেতে পারলুম না—ক্ষমা করবেন। ভুলো মু যখানি চুণ করে দাঁড়িয়ে থাকবে আর আমি আমোদ ক'রে নেমন্তন্ন খেতে যাবো সেটা যেন কেমন কেমন ঠেকে। আপনার পায়ে পড়ি কিছু মনে করবেন না। আপনি ত সবই বোঝেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিছুক্ষণ পর বি ফিরিয়া আসিয়া শশীর হাতে একখানা পত্র দিল:—

পরম-কল্যাণীয়া

মা, তুমি এলে যত না খুসী হতুম, তার চেয়ে তোমার পত্র পেয়ে ঢের বেশী খুসী হয়েছি। আশীর্ব্বাদ করি, এমনি মন নিয়েই যেন সারা জীবনটা কাটিয়ে যেতে পার। আর কি লিখবো মা। আশীর্ব্বাদ জেনো— ইতি।

রাত্রে শয্যায় শুইয়া একটা কথা বারবার করিয়া শশীর মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিতে লাগিল—ভুলো নিশ্চয়ই তার বাপের নিকট তার এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে না যাওয়ার কথাটা ইতিমধ্যেই প্রচার করিয়া দিয়াছে।—কিন্তু তাতে তার কি?

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে শশী ঘাট হইতে গা ধুইয়া ফিরিতেছিল, এমন সময় পথে একটি লোক তাকে শুনাইয়া শুনাইয়া এমন সব রসিকতা আরম্ভ করিল, যা শুনিয়া তার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া গেল।

পরদিন আবার সেই রসিকতা।

এইরূপে প্রত্যহই সে নীরবে এই অপমান সহ্য করিয়া যাইতে লাগিল—কিন্তু কোন কথা বলিল না।

একদিন রসিকতার মাত্রাটা এমনই অসহ্য রকম চড়িয়া উঠিল যে শশী আর থাকিতে পারিল না। বাড়ী আসিয়াই সে ডাকিল, "পেসন্নী।"

প্রসন্ন আসিতেই সে বলিল, "দেখ্ পেসন্নী, একটা লোক আজ ক'দিন থেকে বড় জ্বালাতন করছে, কি করি বল দেখি।"

সকল কথা শুনিয়া প্রসন্ন বলিল, "একদিন দেখিয়ে দিতে পারিস!—বাবুর চোদ্দ পুরুষের নাম ভুলিয়ে দিয়ে আসি।"

শশী বলিল, "না না ওসবে কাজ নেই, মাকে জানাবো, তিনি যা-ভালো বোঝেন করবেন।"

এই সময় হঠাৎ কোথা হইতে ছুটিতে ছুটিতে তোলা আসিয়া বলিয়া উঠিল, "দাদা শিগ্‌গির এক বার এদিকে এসো।"

শশী বলিল, "কি হয়েছে তাই বল্ না।"

সে বলিল, "এসই না—একটা মজা দেখবে।"

"কি দেখবো বল্ না ছাই।"

সে হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, "সেদিন ওপারের যে বাবুর কথা বলছিলুম না,—সে আমাদের বাড়ীর কাছে ঘুরছে—দেখবে এস না।"

কোন কথা বুঝিতে শশীর বাকি রহিল না। সে অত্যন্ত বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিল—"চুলোয় যাক্‌গে তোর্ বাবু।"

রাত্রে সনতের-মা আসিতেই শশী বলিল, "আজ ক'দিন থেকে একটা লোক বড্ড জ্বালাতন করছে—তার জ্বালায় ঘাটে যাবার যো নেই—এমন সব বিশ্রী কথা—"

"কে আমাকে দেখাতে পার মা।"

"ভুলো বলছিল,—ওপারের জমিদার না কে।"

"ওপারের জমিদার?—তা আশ্চর্য্য নেই,—সে ঐ ধরণের লোকই বটে। বাপ যেমন ভাল লোক ছিল—ছোঁড়াটা তেমনি হাড়হাবাতে হয়ে উঠেছে। যাক্, আমি রতনাকে বল দিচ্ছি, কাল যেখানে হোক এক জায়গায় লুকিয়ে থাকবে অখন; যাঁহাতক তোমার সঙ্গে কথা কইতে আসবে অমনি বেশ ঘুচার-ঘা দিয়ে যেন ছেড়ে দেয়।"

শশী বলিল, "দরকার কি ঝগড়া ঝাঁটিতে মা কাল থেকে একলা ঘাটে না গেলেই হোলো।"

সনতের মা বলিলেন, "তোমরা এদের চেন না মা, তাই ওকথা বলছ। এদের সঙ্গে ভালো মানুষী করেছ কি মাথায় চড়ে বসেছে। আজ শুধু রসিকতা করছে, কাল আরো কিছু করে বসবে।"

পরদিন সন্ধ্যার সময় শশী ঘাট হইতে ফিরিতেছিল, এমন সময় পথের মাঝখানে সেই অপরিচিত বাবুটি এদিক ওদিক চাহিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "বলি হ্যাঁ গা, ওঙ্কর গাঙ্গুলী ছাড়া কি আর এ মুলুকে মোসরা পুরুষ নেই—আমরা কি——"

কথাটা শেষ না হইতেই পশ্চাৎ দিক হইতে কে আসিয়া তার ঘাড় ধরিয়া সজোরে দু তিনটা ঝাঁকুনি মারিয়া অতি কর্কশকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "জমিদার আছেন—নিজের ঘরে আছেন,—এখানে জমর চালাকী খাটবে না।—ফের যদি কোন দিন এদিকে দেখি ত মাথার খুলিটা গুঁড়ো করে তবে ছাড়বো।"

(১৪)

পরদিন হরিশ গাঙ্গুলী তামাক খাইতে খাইতে বলিয়া উঠিল, "শুনেছ মুখুয্যে, কাল কি ব্যাপার হয়ে গেছে।"

মুখুয্যে বলিল, "শুনছিলুম বটে, ওপারের সতীশরায় নাকি কাল খুব অপমান হয়ে গেছে।"

ভট্টাচার্য্য তার হাতে হুঁকাটা দিয়া বলিল, "এমন কত দেখতে হবে, কত শুনতে হবে—হয়েছে কি!"

মুখুয্যে বলিল, "আসল ব্যাপারখানা কি বলুন ত!"

ভট্টাচার্য্য বলিল, "ব্যাপারটা কি জান হে, সতীশ-রায় রোজ রাত্তিরেই ছুঁড়িটার কাছে আসে—সেদিন এখন কি করে রত্না দেখতে পায়। ছুঁড়িটা কি কম ধড়িবাজ—কেমন একচাল চেলে নিলে বল দেখি! যেন কিছুই জানে না। লোকে ভাবলে, না জানি কি সতীলক্ষ্মী। মাঝে থেকে সতীশরায় বেচারা রত্নার হাতে মার খেয়ে মোলো।"

মুখুয্যে গালে হাত দিয়া বলিল, "অবাক্ করলে দেখছি—এদের অসাধ্য কাজ নেই বলুন!"

একটু হাসিয়া ভট্টাচার্য্য বলিল, "তোমরা আজ চিনলে হে,—আমি গোড়া থেকেই বলে আসছি—এর মধ্যে অনেক ব্যাপার আছে—তোমরা তখন আমার কথা শোন নি—এখন বিশ্বাস হচ্ছে ত।"

"কি করে বুঝবো বলুন—আমরা নিজেরা যেমন সাদাসিধে লোক—দুনিয়াটাকেও তেমনি মনে করি কি না।"

হাসিয়া এবং ঘাড় নাড়িয়া ভট্টাচার্য্য বলিল, "তোমরা দেখলেই বা কি আর শুনলেই বা কি; অভিজ্ঞতা চাই যে—সংসারের অভিজ্ঞতা চাই।"

কথাটা শেষ হইতে না হইতেই চক্রবর্ত্তী আসিয়া বলিয়া উঠিল, "শুনেছেন ভটচায্যি মশাই—কাল কি হয়ে গেছে "

একটু হাসিয়া ভট্টাচার্য্য বলিল, "শুনতে যাবো কেন হে, নিজের চক্ষে দেখেছি।"

চক্রবর্ত্তী ভাবিয়া আসিয়াছিল, সচক্ষে দেখার বাহাদুরীটা সে নিজেই লইবে—ভট্টাচার্য্যের কথা শুনিয়া সে ভয়ানক দমিয়া পড়িল।

তার পর ঘোষ, ঘোষ, মিত্তির একে একে সব আসিয়া জুটিতে লাগিল এবং কথাটাকে লইয়া কচলাইতে কচলাইতে একেবারে তিক্ত করিয়া ফেলিল।

বসু বলিল, "তোমরা ভুল শুনেছ, রতনা মারেনি—মেরেছে চন্দর নিজে!"

ঘোষ বলিল, "যাক্ বকো কেন হে—আমি নিজের চক্ষে দেখেছি, রতনা এতবড় এক লাঠি দিয়ে তার মাথায় ঘাঁই করে এক ঘা বসিয়ে দিলে—আর সে কি রক্ত রে বাবা!"

সাতে-পাঁচে ব্যাপারটা দাঁড়াইল এই যে রতনা মেরেছে বটে কিন্তু চন্দরই তাকে নিযুক্ত করিয়াছিল এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাই তার কারণ।

পাড়ায় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে, চন্দ্রকান্ত রতনাকে দিয়া সতীশ রায়ের মাথা কাটাইয়া দিয়াছে। শশীর ইচ্ছা যাইতে লাগিল, মাথা খুঁড়িয়া মরে। এই নির্জ্জন নিষ্কলঙ্ক লোকটির উপর আজ এই যে কলঙ্কের কালিমা ঢালিয়া দিয়া সারাটা গ্রাম তামাসা দেখিতেছে, ইহার জন্য সে-ই কি সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী নয়! কেন সে এখানে আসিল,—কেন সে তার অপরিচ্ছন্ন ময়লা জীবনটা লইয়া এই নির্জ্জন, নিষ্কলঙ্ক, শুভ্র চরিত্রের পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইল। বিছানার উপর উপুড় হইয়া সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিকালের দিকে সনতের মা আসিলে শশী বলিল, "আমি আর এ গ্রামে থাকবো না মা।" শশীর চোখ ছল্ ছল্ করিতেছিল।

তার পিঠে অত্যন্ত স্নেহের সহিত হাত বুলাইয়া দিতে দিতে সনতের মা বলিলেন, "দূর পাগলী—লোকের কথায় কি কান দিতে আছে।"

সে বলিল, "আমার জন্যে শুধু বলছি না মা।"

অত্যন্ত স্নেহের সহিত সনতের মা বলিলেন, "সে কি আর জানি না মা—কিন্তু ওটা তোমার একেবারেই ভুল। যার জন্যে তুমি ভাবছো সে নিন্দা সুখ্যাতির অনেক উঁচুতে।"

সনতের মা চলিয়া গেলে শশী সন্ধ্যার পরই শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল এবং মনে মনে বার বার করিয়া আওড়াইতে লাগিল, "তিনি নিন্দা সুখ্যাতির অনেক উঁচুতে।"

রাত্রে ভোলা আসিয়া বলিল, "তোমাকে কে বকেছে মা!"

সে বলিল, "কৈ ত কেউ বকেনি ধন্ আমার।"

সে বলিল, "তুমি আমার কাছে লুকোবে—আমি বুঝি কিছু জানি না?"

তাকে বুকের মধ্যে লইয়া শশী বলিল, "তোকে এ কথা কে বল্লে রে।"

ভোলা বলিল, "বাবা বল্লে যে।"

"তিনি কি বল্লেন শুনি!"

"বল্লে, তুই আজ তোর মার কাছে গিয়ে শুস্।"

আমি বল্লুম, "কেন বাবা?"

বাবা বল্লে, "তোর মাকে আজ সবাই মিলে বকেছে কি না, তাই।—হাঁ মা, তোমাকে সবাই বকেছে নাকি?"

কি বলিতে গিয়া শশী হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল। অবাক্ হইয়া ভোলা তার মুখের পানে চাহিয়া বলিয়া রহিল।

(১৫)

পরীক্ষা চুকাইয়া দিয়া দেশে ফিরিয়া সকল কথা শুনিয়া সনত একেবারে আগুন হইয়া উঠিল।

চন্দ্রকান্তকে গিয়া সে বলিল, "তোমরা কি কেবল সহ্য করতেই জন্মেছ ?—না, বেশ না চন্দরদা—আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে যাচ্ছে।"

"ও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে এখন" বলিয়া হাসিয়া চন্দ্রকান্ত তার পিঠে আদর করিয়া দুটো চাপড় মারিল।

"না ঠাট্টা নয় চন্দর দা—এ রকম করে তুমি কেন সহ্য করতে যাও।"

"তা কি করতে হবে শুনি ?"

সনত এবার মহা মুস্কিলে পড়িয়া গেল ; সত্যই ত, কি করিতে পারে সে ? লোকের মুখে কে হাত চাপা দিতে যাইবে এবং দিতে গেলেই বা তারা শুনিবে কেন ?

মুখে কিন্তু সে বলিল, "তুমি কিছু না করতে পারো, আমি করবো !"

"কি করবি, তাই শুনি।"

"সে আমার যা মনে হয় তাই করবো।"

"অর্থাৎ ঘরের ভাত বেশী করে খাবি, এই ত !"

বিরক্তভাবে সনত বলিয়া উঠিল, "তোমার ওপর আমার এমনি রাগ হচ্ছে চন্দর দা—খালি মানুষের গাল খেয়ে খেয়ে বেড়াবে।"

অত্যন্ত স্নেহের সহিত তার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে চন্দ্রকান্ত বলিল, "এতে আর দুঃখ করবার কি আছে ভাই।"

"দুঃখ করবার নেই ! তোমার মতন লোক, যে নাকি সকলের মাথার ওপর বসে থাকবে—তাকে নিয়ে কি না সকলে নকড়া ছকড়া ক'রে বেড়াবে।"

অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে চন্দ্রকান্ত বলিল, "আমি যদি সত্যই ওদের মাথার উপর বসে থাকবার উপযুক্ত হয়ে থাকি সনত—তা হলে ওদের মাথার উপর বসে থাকা ত আমার হয়েই গেছে ভাই।"

বিমর্ষভাবে সনত বলিল, "তুমি ঐ বলে মনকে ঠাণ্ডা করগে যাও চন্দর দা—আমি কিন্তু তা পারবো না। তার পর, তুমি না হয় ওকথা বলে কিন্তু শশী দিদি—সে বেচারার কি অবস্থা একবার ভেবে দেখ দেখি।"

"আমি সে কথা ভেবে দেখেছি সনত। তিনি আমাদের চেয়েও শক্ত ! জ্যাঠাইমার মুখে যে রকম শুনলুম, তাতে তাঁর জন্যে দুঃখ করাটাও একটা দাম্ভিকতা।"

সনত কি বলিতেছিল, চন্দ্রকান্তের মুখের দিকে চাহিয়া থামিয়া গেল।—সে মুখের ভাব ভয়ানক গম্ভীর।

সন্ধ্যার সময় ভাতে কাঠি দিতে দিতে চন্দ্রকান্ত ডাকিল, "ভোলা !"

অঙ্ক কষিতে কষিতে পাশের ঘর হইতে ভোলা উত্তর দিল, "কি বাবা !"

"একবার শুনে যা !"

সে আসিয়া বলিল, "কি !"

"তুই আজ সমস্ত দিন কোথায় ছিলি রে !"

সে বলিল, "মার কাছে।"

"তোর মা বুঝি তোকে মতন খুব বকতে পারে।"

সে বলিল "হুঁ।"

"কি কথা হয় তোদের ?"

সে বলিল, "কত কথা, সে কি আর মনে আছে।"

"আমার কথা হয় না !"

"তা আবার হয় না—মা তোমার যা সুখ্যাতি করে—ওরে বাবা।"

"কি বলেন ?"

"তাকি অত মনে আছে ?"

"তবু ।"

অনেক ভাবিয়া এবং অনেক বুদ্ধি খরচ করিয়া শেষ কালে সে বলিল, "বলে তুমি খুব লক্ষ্মী, খুব ভালো, একটুও দুষ্টু নও।"

চন্দ্রকান্ত কোন কথা বলিল না, নীরবে বসিয়া রহিল। তোলা আরো কি সব বলিতে যাইতেছিল, চন্দ্রকান্ত বলিল, "আচ্ছা তুই এখন পড়গে যা।"

রাত্রে শয্যায় শুইয়া শুইয়া চন্দ্রকান্তের নিজের উপর অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ

মমী শিশু

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি. এ)

১

মিশর হ'তে শিশুর মমী মিউজিয়মে আনা,
দেখ্‌তে জোটে অনেক লোক যায় না কেন জানা,
তিনটী হাজার বছর আগে জন্মেছে যে ছেলে,
জন্মদিনের অধিক আদর আজকে যে সে পেলে।

২

যেই বাতাসে যেই মাটীতে জন্ম হ'ল তার,
একেবারে বদ্‌লে গেছে ধরণ নাহি আর।
মাতা-পিতার গভীর পুলক হাস্য-কোলাহল,
অনেক দিবস পরে আবার জাগ্‌লো না কি বল।

৩

যাদুঘরের কর্ত্তা অনেক রটিয়ে বেড়ে বেশে
মমী বালক ভূত হয়েছে ভিন্ দেশেতে এসে
সমস্ত রাত কোঁপায় সে যে মিথ্যা কথা নয়
রাত দুকুরে ঘরের কাছে আস্‌তে লাগে ভয়।

৪

কর্ত্তারা সব রাত দুকুরে ভাঙ্‌লে পরে ঘুম
শুনতে যে পায় ঘরের কাছে নৃত্যগীতের ধুম,
কোথায় মমী ঘরের কাছে ঘুরছে আহা ছেলে
পরীরা সব নাচ্‌ছে ঘিরে মণির কাদুর মেলে।

৫

গোলাপ জলের উৎসে যেথায় কপোত করে স্নান
ঘরের বেবাক ভাঙ্গা পাথর আজ পেয়েছে প্রাণ,
বালক যখন উর্দ্ধপানে হাস্যমুখে চায়,
অতীত চুমা শিশুর গালে গোলাপ হয়ে যায়।

৬

ভোর বেলাতে বালক যখন কোঁপায় অভিমানে
ঘুম-ঘুমান্ত হ'তে তাহার মাতায় ফিরে আনে,
ব্যস্ত হয়ে অম্‌নি আসে যত পরিবার
আদর ক'রে বক্ষে ধ'রে কান্না থামায় তার।

৭

যায় তাহারা চকিত চলে মোরগ ডাকার আগে
আলোক পুলক ওটিয়ে নিয়ে গভীর অনুরাগে,
ঘুম পাড়িয়ে চুপ করিয়ে যায় তাহারে রেখে
সকাল বেলায় আবার কাঁদি কাঠের পুতুল দেখে।

পূজার চাঁদা

(গল্প)

(কুমারী নিহারনলিনী বসু)

(১)

তখনও ভাল করিয়া ভোরের আলো ফুটে নাই। সবে মাত্র প্রভাত হইয়াছে। পথে দুই একটী লোকের যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছে। এই সময়ে কাশীর এক অন্ধকার গলীতে একখানা জীর্ণ পুরাতন ও ভগ্নোন্মুখ বাড়ীতে, বাড়ীর কর্ত্তা মহাজন করালীচরণ চাটুজ্জে একখানা হুক্কুর খাটে বসিয়া হুঁকা টানিতেছিল। করালীর পরিধানে একখানা আট হাত মলিন কাপড়। তাহা করালীর অধিকারে আসার পর কখন রজকগৃহে গিয়াছে কি না, সে বিষয়ে দর্শকের মনে বিশেষ সন্দেহ জন্মাইয়া দেয়। করালী অত্যন্ত খর্ব্বকায়। শরীরের তুলনায় তাহার মস্তকটী অপেক্ষাকৃত ছোট। উদর বৃহৎ। বর্ণ কাল। সর্ব্বাপেক্ষা দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করে করালীচরণের আঁকাল গোঁফ জোড়া টানিতে টানিতে করালী কলিকায় তামাক পুড়াইয়া শেষ করিল। তাহার সম্মুখের এক ঘর হইতে অতিশয় ধূম বাহির হইতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া করালী কহিল, "একটু আগুন দিয়ে যাও না গা। তামাকটা খেয়ে নি।" কেহ উত্তরও দিল না, আগুনও আসিল না। সে আবার কহিল, "অনুর মা একটু আগুন দিয়ে যাও না, বেলা হয়ে যাচ্ছে যে?" এবারও কেহ উত্তর দিল না। বারবার ডাকিয়া উত্তর না পাইয়া করালী বিরক্ত হইয়া উঠিল। তখন সে তাহার স্থূল দেহ ও কলিকা লইয়া সেই ধূমাচ্ছন্ন ঘরের দুয়ারের নিকট আসিয়া বেশ একটু চড়াগলায় কহিল, "বলি গিন্নী কানের মাথা কি খেয়েছ নাকি? একটু আগুনের জন্যে চেঁচিয়ে মরছি তা কি কানে যাচ্ছে না? সমস্ত পাড়াটা—" করালীর কথা এবার শেষ হইতে পাইল না। ঘরের ভিতর হইতে এক ক্ষীণ-কায়া দীর্ঘাঙ্গী গৌরবর্ণা রমণী একটা ঘমকা হাওয়ার মতন বাহির হইয়া আসিয়া করালীর সম্মুখে হাত নাড়িয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "আমি কেন কালা হ'তে গেলাম! কালা হও তুমি! তোমার টাকার রিনি রিনি শব্দ শুনে কুলে উঠা ঘুচে যাক।" করালীর স্ত্রীর নাম জয়কালী, সে অতিশয় মুখরা, তাহার ন্যায় রসনাকে ভয় করিত না এমন সাহসী লোক সে পাড়ায় কেহ ছিল না। তাহার উপর সে কানে যথার্থই কম শুনিত, কিন্তু সে কথা কেহ উল্লেখ করিলে তাহার আর রক্ষা থাকিত না। করালী স্ত্রীর রসনাকে অত্যন্ত ভয় করিত। হঠাৎ রাগের মাথায় অসাবধানে কথাটা তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। জয়কালীর রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি ও দাঁড়াইবার ভঙ্গী দেখিয়া করালীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। সে মুখ কাঁচু-মাচু করিয়া কহিল, "আঁ্যা কখন আমি তোমাকে কালা বল্লাম গা? খালি বল্লাম—বেলা হ'য়ে যাচ্ছে, একটু আগুন দাও চট্ করে তামাকটা খেয়ে নিই।" গর্জ্জিয়া উঠিয়া জয়কালী কহিল, "আবার মিথ্যে কথা, বুড়ো হ'য়ে মরতে চল্লে এখন মিথ্যে বলার অভ্যেস গেল না।" তার পর জয়কালী তাহার ভাষাটা সভ্য করিয়া কহিল, "লোকের গায়ের রক্ত চুলে টাকা জমিয়ে জীবনে কখন পুণ্য কর নি সেখানে গিয়ে তোমার দশা যে কি হবে তা জানি না। এখনও ধর্ম্মে মন দাও, নেহাৎ মিথ্যে কথাটা ছাড়, নইলে তোমার কুম্ভিপাক নরক ছাড়া গতি নেই, তা এ কালী বামনী বলে দিচ্ছে।" করালী জানিত জয়কালীর সহিত

কলহ করিয়া তাহার পক্ষে, শুধু তাহার পক্ষে কেন, কাহারও পক্ষে জয়লাভ করা অসম্ভব। উপরন্তু জয়কালী অধিক রাগিলে তাহার অবস্থা আরও অধিক শোচনীয় হইতে পারে। তাই সে আপন ত্রুটী স্বীকার করিয়া কহিল "আমার ঘাট হয়েচে গিন্নী, এখন একটু আগুন দাও, চট্ করে তামাকটা খেয়ে নি, বাজার অমুকে আন্‌তে হবে।" এবার জয়কালী তাহার কণ্ঠস্বর কোমলতর করিয়া কহিল, "আগুন কি ছাই রয়েচে যে দেব। বাজারের যত ওঁচা জিনিষ পয়সা বাঁচাবার জন্যে আন্‌বে! কি করব? কাঁচা কাঠ কিছুতেই ধরাতে পাচ্চি না। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আমার চোখ গেল। আমার মরণও হয় না। এখন লোকের হাতেও পড়ে ছিলাম। দেখি যদি কয়লা থাকে ত তাই দিচ্চি, ধরিয়ে নাও গে।" বলিয়া সে কএকখণ্ড কয়লা আনিয়া করালীর কলিকায় দিয়া কহিল, "চট্ করে, তামাক খেয়ে নাও গে, বাজারে যেতে হবে।"

তামাক খাইয়া প্রাতঃকালীন কার্য্যাদি সারিয়া করালী আপনার ঘরে ঢুকিল। সেখানে দুয়ার বন্ধ করিয়া হিসাব করিতে লাগিল। জয়কালী আসিয়া রুদ্ধ দ্বারে ধাক্কা দিয়া কহিল, "ওগো হিসাব করা না হয় আজ থাক, মেয়েটাকে কতদিন দেখি নি, মরচি মরচি করে। বাজারটা এনে দিয়ে তাকে নিয়ে এস, তার পর আমায় পিণ্ডি দিও এখন।" ভিতর হইতে করালী কহিল, "রাগ কর না গিন্নী, এই আসচি।" কিছুক্ষণ পরে করালী বাহির হইয়া আসিল ও সেই ঘরের দ্বারে এক প্রকাণ্ড আলীগড়ী তালা লাগাইল। তারপর একখানা ময়লা চাদর কাঁধে ফেলিয়া ও একটা বাঁশের লাঠি লইয়া, জয়কালীকে কহিল, "দাও বাজারের পয়সা।" একটা দুয়ানি করালীর হাতে দিয়া জয়কালী কহিল, "আধ সের আলু ও আধ সের বিঙ্গে আর দু পয়সার পান এন।" দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া করালী কহিল, "সর্ব্বনাশ! আ—আট পয়সার তরকারী!—হায় হায় এমন করে খেলে যে আমাকে শীগ্‌গিরীই রাস্তায় ভিখিরী হ'তে হবে!" ঝঙ্কার দিয়া জয়কালী কহিল, "সাধে কি লোকে শালিক, চাম্‌চিকে, শকুনী, যত অখন্তে নাম রেখেছে! মেয়ে আস্‌বে তার ছেলেরা আস্‌বে, আজ কি আর সেই দু পয়সার তরকারীতে কুলোয়! বলি জমাচ্চ কার জন্যে? সাতটা নেই, ঐ একটা মেয়ে, তাকে এনে যদি দু'দিন দুটো ভালমন্দ জিনিষ তার মুখে দিতে না পারবে, তবে তোমার টাকায় কি হবে?" আজ প্রাতঃকালেই করালীর সহিত জয়কালীর এক পশলা কলহ হইয়া গিয়াছে। এখন কথা বাড়াইলে পাছে জয়কালী আবার সেই পূর্ব্বোক্তার কলহ নূতন করিয়া আরম্ভ করে, এই ভয়ে করালী আর কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। জয়কালীর অভ্যাস একটা নূতন কলহের সুযোগ পাইলে পুরাতন কলহগুলাও আবার তাহার সহিত নূতন করিয়া যোগ করে। করালী তাহার গলী ছাড়াইয়া রাস্তায় যাইতেই একপাল বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী বালক তাহার পিছু লইল। তাহাদের দেখিয়াই করালীর মুখ শুকাইয়া গেল। প্রথমে সে যেন তাহাদের দেখিতে পায় নাই এইরূপ ভাব দেখাইয়া অগ্রসর হইল। কিন্তু করালী নীরবে চলিয়া গেলে ছেলেদের আমোদ সম্পূর্ণ হয় না, তাই তাহাদের মধ্যে একদল হাততালি দিয়া গাহিয়া উঠিল,—

"করালী মামা
সিন্দুক ভরা রূপেয়া ঘরমে,
পেটমে নাই দানা।
জবর ডুক্‌কা মারে
ঘর খান নিকলনে চাহেরে
তব তো খাও লেকে ওবলকা দানা।"

অপর দল গাহিল,—

"তেজারতী কারবার, করালী খুড়র
টাকার গুরু তারে, লোহার সিন্দুক ঘরে
রাতে না ঘুমান পাছে চুরি করে চোর।
আট হাতি সেরেস্তা দিয়ে, বিশাল শহরে চাকা দিয়ে

খরচের ভয়ে উপোস যেন
মাসের মধ্যে কুড়ি দিন।

খুড়ি যদি বলেন আর দুই পয়সার বাজার করে, সারাকাশীটা খুড়র চোখে ধুলে তখন ঘোঁ ঘোঁ করে।"

করালী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। এই ছেলেগুলোকে সে তাহার প্রধান শত্রু মনে করিত। তবেরে···বা বলিয়া তীব্র ভাষায় গালি দিতে দিতে সে তাহার বংশদণ্ড উঠাইয়া বালকগুলাকে তাড়া করিল। চকিতের মধ্যে সেই বিরাট বালক-বাহিনী যেন কোন্ যাদুমন্ত্র বলে অদৃশ্য হইয়া গেল। করালী আর তাহাদের কোন চিহ্নও দেখিতে পাইল না, কিন্তু দূর হইতে তাহাদের সেই হাড়জ্বালান ছড়া আওড়ান তখনও করালীর শ্রুতিগোচর হইতেছিল। ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়া, সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া আপন স্থূল শরীর লইয়া করালী ছুটিতে লাগিল। তখন পথের দুই পার্শ্বে ড্রেন কাটা হইতেছিল, তাহারই মাটী স্তূপাকারে পথের উপর জমা ছিল। ছুটিতে ছুটিতে সেই মাটীর স্তূপ না দেখিয়া তাহাতে ধাক্কা লাগিয়া করালী তাহার স্থূল দেহ লইয়া সেই স্থানে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। তাহার ট্যাঁকে গোঁজা পয়সাগুলা ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আশ পাশ হইতে বাল-কণ্ঠের খিল খিল ধ্বনি শোনা গেল। আর বেচারী করালী রাগে দুঃখে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিবার যোগাড় করিল। বালকদের যার পর নাই শ্রুতিমধুর ভাষায় গালি দিতে দিতে সে উঠিয়া বসিল ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পয়সা কুড়াইতে লাগিল। কিন্তু তাহার কপালের দোষে দুইটা পয়সা যে কোথায় লুকাইল তাহা সে অনেক খুঁজিয়াও বাহির করিতে পারিল না। দুই পয়সার শোকে পাগলের মত হইয়া সে পুনঃপুনঃ যমকে ডাকিয়া বালকগুলাকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। সঙ্গে সঙ্গে বেনারস মিউনিসিপ্যালিটির ও সর্ব্বনাশ কামনা করিল। কারণ তাহারা পথে মাটী জমাইয়া না রাখিলে সে পড়িত না।

কিন্তু যমরাজ আপাততঃ করালীর প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য কোনও আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। বেনারস মিউনিসিপালিটীরও সর্ব্বনাশের কোনও লক্ষণ তখন দেখা গেল না। যাহা হউক দুই পয়সার মায়া ত্যাগ করিয়া করালীকে উঠিতে হইল। ছয় পয়সার বাজার করিয়া সে বাড়ী ফিরিল। পথে প্রতিবেশী হরিনাথের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। হাতে একটা কাপড়ের পোটলা লইয়া হরিনাথ দ্রুত পদে ষ্টেশনের দিকে যাইতেছিলেন, করালীকে দেখিয়া তিনি পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু করালী তাঁহাকে ছাড়িল না। সে তাঁহার নিকট যাইয়া কাতর স্বরে কহিল, "দাদা আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। কে জানত আজ আমার এমন সর্ব্বনাশ হবে।" বিদ্রূপ মিশ্রিত কণ্ঠে হরিনাথ কহিলেন, "আহা কি হ'য়েছে ভাই। গিন্নী মত হ'য়েছেন বুঝি? কি হয়েছিল তাঁর?" স্থূল-বুদ্ধি করালীর বিদ্রূপ বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না। সে কহিল, "অসুখ বিসুখ কিছু হয় নি দাদা সে ভালই আছে। এই হতভাগা ছোড়াগুলার জন্যে আমার বেশে ট্যাঁকা ভার হয়েছে, বেরিয়েছি বাজার করতে হতভাগারা সঙ্গ নিলে, তাদের তাড়া করতে গিয়ে মিউসিপ্যালটী রাস্তায় মাটী জমিয়ে রেখেছে, তাইতে ধাক্কা খেয়ে পেলাম পড়ে, পয়সাগুলা পড়ে গেল। দুটো যে কোথায় গেল তা আর কিছুতেই খুঁজে পেলাম না। আমার মত গরীবের দুপয়সা দুটাকার সমান, আমার অনেক কষ্টের গায়ের রক্ত জল করা পয়সা দাদা," বলিয়া করালী তাহার চাদরের খুটে চোখ মুছিল। সর্ব্বনাশের বিবরণটা শুনিয়া হরিনাথের হাসি চাপিয়া রাখা দায় হইল। তিনি অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া কহিলেন, "বড় দুঃখের কথা। তা যার কপালে যার নোকসান যে দিন লেখা থাকে।" এই বলিয়া তিনি দ্রুত পদে

অগ্রসর হইলেন। করালীর দৃষ্টি পথের বাহিরে আসিয়া তিনি মনে মনে দুর্গানাম জপিতে লাগিলেন। পথে শম্ভুনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শম্ভুনাথ সুধাইলেন, "কি হয়েচে দাদা, অত মন মন দুর্গানাম কেন?" হরিনাথ কহিলেন, "আর দাদা কপালের ভোগ কাটায় কে! কাল সন্ধ্যায় তার শেলাব মেয়েটার বড় অসুখ, যাচ্ছি তাকে দেখতে। ঘণ্টার ট্রেন ধরতে হবে। পথে তোমাদের ঐ চাম্‌চিকেটার সঙ্গে দেখা। অলক্ষণে অযাত্রা, যেটার নাম করলে হাঁড়ি কাটে! এখন মেয়েটাকে গিয়ে ভাল দেখ্‌তে পেলে হয়। তাই দুর্গতিহারিণীর নাম করচি। মা যাতে দয়া করেন। বেটার আবার ছুটো পয়সা, হারিয়েচে। টাকার কুমীর বেটা ছুটো পয়সার শোকে আবার চোখের জল ফেল্‌লে। এত দুঃখেও হেসে মরি।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

(২)

কাশীর মহাজন-টোলায় করালীচরণ বাস করিত। কাশী সহরে তাহার আরও দুই তিনটী বাড়ী ছিল। তাহা ভাড়া খাটিত। জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও করালী তেজারতী করিত। বেশ দুই টাকার সংস্থানও করিয়াছিল, সত্য মিথ্যা জানি না, করালীর প্রতিবেশীরা বলিত তাহার সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ লক্ষ টাকার কম নহে। কিন্তু করালী সকলের নিকট আপনাকে অতি দরিদ্র প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিত। অতিমাত্রায় কৃপণ বলিয়া তাহার দুর্নাম ছিল। কেহ কখনও করালীকে ধনশালি পরিষ্কার কাপড় পড়িতে দেখে নাই। প্রতিদিন বরাদ্দ দুই পয়সার অধিক তরকারী কেনা হইলে রাত্রিতে সে ঘুমাইতে পারিত না। ভিখারী কখনও তাহার দুয়ারে এক মুষ্টি ভিক্ষা পাইত না। পাড়ার কোনও বারয়ারীর কাছে সে এক কড়িও চাঁদা বলিয়া কখনও দেয় নাই। এজন্য প্রতিবেশী যুবক বৃদ্ধ সকলেই তাহার উপর অত্যন্ত চটা ছিল। যুবকেরা তাহার নাম করিত না। তাহার স্থলে শকুনী ও সাইলক্ এই দুই কথা সর্ব্বনাম রূপে ব্যবহার করিত। বৃদ্ধেরা বলিতেন চাম্‌চিকে। কিন্তু প্রবীন ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা তাহাকে মুখের উপর কিছু বলিতে সাহস করিত না। কারণ অসময়ে সকলকেই করালীর নিকট হইতে টাকা ধার করিতে হইত। বালকেরা অত বুঝিত না। করালী পথে বাহির হইলেই তাহারা নানা প্রকার ছড়া আওড়াইয়া তাহার পিছু লইত। করালী তাড়া করিলে মুহূর্ত্তের মধ্যে বেমালুম গায়েব হইয়া পড়িত। অপরাহ্ণ তাহাদের গালি দিয়াই করালীকে নিরস্ত থাকিতে হইত। তাহার প্রতিবেশীরা এরূপও বলিত যে উনানে হাঁড়ি চাপাইয়া করালীর নাম লইলে তাহা নাকি তৎক্ষণাৎ কাটিয়া যাইত। করালী জগতে কএকটা বিষয়কে বড় ভয় করিত। প্রথম তাহার অর্থ অপহরণ, দ্বিতীয় মৃত্যু, তৃতীয় জয়কালীর খর রসনা, চতুর্থ পাড়ার ছোঁড়াগুলা। তাহার একমাত্র মেয়েকে বড় একটা আপন গৃহে আনিত না। কারণ অন্নপূর্ণা আসিলেই তাহার তিনটী পুত্র ও কন্যাটীও আসিত। তাহাতে করালীর খরচ বাড়িয়া যাইত। কাশীতেই অন্নপূর্ণার শ্বশুরালয়। তাহার স্বামী অতুল কোন স্থানীয় সওদাগরী আফিসে মোটা বেতনে কার্য্য করিত। অতুলের পিতা জীবিত নাই। মাতা বর্ত্তমান। অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল। করালীর দৌহিত্রেরাও মাতুলালয়ে থাকিতে চাহিত না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিত, "মামা বড় কৃপণ, আমাদের মোটেই খেতে দেয় না।" করালী শুনিয়া কহিত, "পরের ছেলে কখন আপনার হয় না।" খরচ বাড়িবার ভয়ে কন্যাকে সর্ব্বদা না আনিলেও কন্যার প্রতি তাহার স্নেহ কিছু কম ছিল না। সে প্রায় জামাতার বাটীতে যাইয়া একরাত্র কন্যাকে দেখিয়া আসিত, কিন্তু কখনও তত্ত্বতল্লাস করিত না বলিয়া অতুলের মাতা তাহাকে বিলক্ষণ দশ কথা শুনাইয়া দিত। করালী সে সব

কানে তুলিতে চাহিত না। অন্নকালী এজন্য অনুযোগ করিলে সে কহিত "ওগো মেয়ে ছিলে অমন কত কথা শুনতে হয়। ওতে রাগ করলে কি চলে।" জামাতা অতুল তত্ত্ব-তল্লাস না পাইলেও শ্বশুরের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল না। কারণ সে জানিত শ্বশুরের যাহা আছে যাহা তিনি জমাইতেছেন ভবিষ্যতে সে সমস্ত তাহারই হইবে। এ হেন কৃপণ করালীরও দুইটা গুণ ছিল। প্রথম সে অতিরিক্ত সুদে টাকা ধার দিলেও কাহারও এক পয়সা অন্যায়পূর্ব্বক লইত না। আর দেবতা ও সন্ন্যাসীর প্রতি তাহার ছিল অটল বিশ্বাস। কখনও কখনও তাহাকে কোনও কোনও সাধুর নিকট দুই এক পয়সার সামগ্রী লইয়া যাইতে দেখা গিয়াছে।

(৩)

সে দিন মধ্যাহ্নে আহারাদির পর ঘরের ভিতর একখানা ছেঁড়া মাদুরের উপর আপন বিশাল দেহ ঢালিয়া দিয়া করালীচরণ একটু বিশ্রাম করিতেছিল, নিকটে ভূমিতে অন্নকালী ও কন্যা অন্নপূর্ণা বসিয়াছিল। দুই দিন হইল অন্নপূর্ণা পিত্রালয় আসিয়াছে, তাহার পুত্রেরা ও কন্যাটীও আসিয়াছে। তাহার শাশুড়ী নাতিদের অনেক বুঝাইয়া মাতামহের গৃহে পাঠাইয়াছেন। অন্নকালীর কোলে অন্নপূর্ণার দুই বছরের কন্যা হাসি খেলা করিতেছিল। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ননী সেই ঘরের রাস্তার দিকের জানালায় বসিয়া কি একখানা শিশুপাঠ্য গল্পের বই পড়িতেছিল। দ্বিতীয় পুত্র মণিলাল বাহিরে দালানে গুলিদাণ্ডা খেলিতেছিল। তৃতীয় পুত্র সত্যলাল, তাহার বয়স চার বৎসর মাত্র, সে করালীর নিকটে বসিয়া অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে মাতামহের উদরের উচ্চতা পরীক্ষা করিতেছিল। কথায় কথায় করালী কহিল, "মা অন্ন তোর শাশুড়ীর বাক্যি যন্ত্রণায় আমার আর তোর বাড়ী যাওয়া মুস্কিল হয়েছে। মাগী কেবল আঁচল পেতে বসে আছে, আমার সর্ব্বস্ব লুটবে বলে।" অন্নকালী কহিল, "তা বলবে না। বছরেও একটা টাকার জিনিস দিবেও কখনো তত্ত্ব করবে না। আটুমবাড়ী রোধ শুধু হাতে যেতে লজ্জা করেনা! আবার ওখানে পালা পালা খাবার গিলে এস কোন মুখে?" করালী কহিল, "আমার কি দিতে সাধ, কিন্তু পাই কোথা। গায়ের রক্ত জল করে যা দুটাকা করেছি, তারই সুদে কোন রকমে পেট চলছে। তা ভেঙ্গে ভেঙ্গে বেয়ানকে সন্দেশ খাওয়াসে তা আর কদ্দিন থাকবে। তার পর বুড়ো বয়সে আমার কি দশাটী হবে তাব দেখি। আমার ত আর ছেলে নেই যে বসে বসে ছেলের রোজগার খাব আর বৌর সেবা নেব। আর যা আমার থাকবে তা পরে ত বেয়ানের ঘরেই উঠবে।" অন্নপূর্ণা কহিল, "বাবা তুমি আমার শাশুড়ীর কথা শুন না। ওঁর ঐ রকম বলা অভ্যাস।" সত্য কহিল, "দাদা, তোমার পেট এত উঁচু কেন?" এই বলিয়া সে তাহার ক্ষুদ্র কচি হাত দিয়া করালীর উদর চাপিতে লাগিল। অন্নকালী নাতির প্রশ্ন শুনিয়া হাসিতে লাগিল। সত্য কহিল, "দাদা ঠাকুরমা বলেন তোমার কাছে অনেক গিণী আছে, গিণী কাকে বলে বুঝেচ, গাদা টাকা! গিণীগুলি তোমার এই পেটে আছে না দাদা?" করালী কহিল, "না ভাই ওতে ভাত ডাল আছে।" সত্য কহিল, "তোমার গিণী কোথায় রেখেচ? ঐ লোহার বাক্সতে বুঝি, আমি দুটো গিণী নেব। দাও আমায়।" সর্ব্বনাশ! প্রাণ থাকিতে সত্যকে সে গিণী দিতে পারে। সে কহিল, "গিণী ত আমার নেই ভাই। আমি গরীব, গিণী কোথায় পাব।" সত্য কহিল, "হাঁ আছে; আমার ঠাকুমা বলেচেন, তোমার ঢের গিণী আছে। ঠাকুমা আমায় কত পয়সা দেন। দাও আমাকে দুটো গিণী, নইলে আমি তোমার গোঁফ ছিঁড়ে দেব।" এই বলিয়া সে তাঁহার গোঁফ টানিতে লাগিল। করালী তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "ছাড় ভাই লাগচে যে। আমার যা-কিছু আছে, সে ত তোদেরই। নিজেদের জিনিষ কি নষ্ট করতে আছে।

টাকা নষ্ট করা মহাপাপ। ও বুড়ির কথা তোরা শুনিস্ নি। বুড়ির খালি আমাকে জব্দ করবার ফন্দি, ছেড়ে দাও বড় লাগ্‌চে।" সত্যলাল করালীর গোঁফ ছাড়িয়া দিয়া কহিল, "সব আমাদের, তোমার, তোমার ঐ বড় সিন্দুকটাও। বাঃ ওতে আমরা বেশ লুকোচুরী খেলব।" করালী কহিল, "হাঁ সত্য তোমাদের! আমি মরলে তোমরাই ত সব পাবে। আমার আর কে আছে দাদা।" সত্য কহিল, "তুমি মরলে তোমার সিন্দুক আর গিন্নী আমাদের হবে। তা তুমি কবে মরবে দাদা। কত দেরী আছে তোমার মরবার?" মৃত্যুকে করালীর বড় ভয়, সত্যের কথার উত্তর সে খুঁজিয়া পাইল না। সে অতিশয় করুণ নেত্রে কন্যার দিকে চাহিল। অন্নপূর্ণা পুত্রের দুষ্টতা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার পৃষ্ঠে কয়েকটা চড় বসাইয়া দিয়া কহিল, "হতভাগা ছেলে, বড় বাড় বেড়েছ। মুখের আর আটক্ নেই।" প্রহার খাইয়া সত্যলাল চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। জয়কালী সত্যকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল "অমি তুইও কি ঐ বুড়োর মত ক্ষেপলি নাকি? ছোট ছেলে, কাকে মরা বলে তাইই ও বোঝে না। ওর কাছে মরণের কান্না কাঁদতে গেছেন। বুড়োর আক্কেল দেখ দেখি। সত্যই কি ওর কথায় তুমি এখনি মরচ নাকি। আয় সতু আমার কোলে আয়।"

এই সময়ে করালীর অনৈক খাতক পিয়ারীর মা আসিয়া চারি আনা পয়সা সুদ করালীকে দিয়া গেল। ননীলাল জানালায় বসিয়া দেখিল করালী পয়সাগুলা ট্যাঁকে গুঁজিতেছে। রাস্তা দিয়া গোলাপী-রেওড়ী ওয়ালা হাঁকিয়া যাইতেছিল "কেয়া মজাদার গোলাপী রেওড়ী" ইত্যাদি। ননীলাল ডাকিল, "এই রেওড়ীওয়ালে ইধার আও।" সে করালীর কাছে আসিয়া, কহিল "দাদা দুটো পয়সা দাও। রেওড়ী কিনব।" মিনতির সুরে করালী কহিল, "আমার কাছে ত পয়সা নেই দাদা।" ননীলাল কহিল, "আমি দেখেছি তুমি এক মুঠো পয়সা ট্যাঁকে রেখেছ। নেই বল্লেই হবে। দাও দুটো বের করে। আচ্ছা আমিই নিচ্ছি বের করে।" বিব্রত হইয়া করালী কহিল, "নারে তুই নিস্ নি, দিচ্ছি।" বলিয়া দুইটা পয়সা তাহার হাতে দিয়া বাকি পয়সাগুলা পুনঃপুনঃ গণিয়া আবার ট্যাঁকে রাখিল। পয়সা পাইয়া ননীলাল চলিয়া গেল, দাদা পয়সা লইয়া খাবার কিনিতে গেল দেখিয়া সত্য কহিল "আমিও রেওড়ী কিনব। দাও আমাকে পয়সা?" করালী কহিল "দাদা তুমি ননীর কাছ থেকে রেওড়ী চেয়ে নাও গে।" সত্য কহিল, "না আমি নেব না। আমি নিজে কিনব।" বলিয়া সে কাঁদিবার উপক্রম করিল। এমন বিপদে করালী বহুকাল পড়ে নাই! নিকটেই স্ত্রী কন্যা বসিয়া রহিয়াছে। উহাদের সম্মুখেই সে চারি আনা পয়সা গণিয়া লইয়াছে। নাই বলিবারও উপায় নাই। আবার দিব না বলিলে জয়কালীর গালি খাইতে হইবে, আর কন্যাই বা কি ভাবিবে। এই সব ভাবিয়া করালী একটী পয়সা বাহির করিয়া সত্যকে দিল। সত্য কিন্তু একটা পয়সায় সন্তুষ্ট হইল না, কাঁদিয়া কহিল, "যা রে দাদা দুটো পেলে, আমি কেন একটা নেব। আমিও দুটো নেব।" জয়কালী কহিল, "দাও না ওকে দুটো পয়সা। নিজের নাতি তাকেও প্রাণ ধরে দুটো পয়সা দিতে পারছ না। সাধে কি লোকে চাম্‌চিকে সালিক বলে।" সাইনক কথার নূতন সংস্করণ জয়কালীর মতে সালিক। করালী আর কি করে, নাচার হইয়া সত্যকে আর একটা পয়সা বাহির করিয়া দিল। সত্য যাইতে না যাইতে মণিলাল বাহির হইতে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "দাদা আমাকে দুটো পয়সা দাও। শীগ্‌গীর দাও। রেওড়ীওয়ালা চলে যাচ্ছে।" করালী এবার বিনা আপত্তিতে তাহাকে দুইটা পয়সা দিল। সে দরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু করালীর অদৃষ্টে আরও কতি লেখা ছিল। ছোট

খুকী হাসি দেখিল যে যখন দাদারা পয়সা পাইল তখন ছোট্ট বলিয়া তাহাকে ফাঁকি দেওয়া মহা অন্যায়। ছোট বলিয়া সে বাদ যায় কেন। সে করালীর কাছে যাইয়া আপন কচি হাতটী পাতিয়া কহিল, "দাও আমাকে পয়সা।" করালী কহিল "তুমি পয়সা নিয়ে কি করবে দিদি।" হাসি কহিল "তাপল কিনব।" করালী কি করে, তাহাকেও একটা পয়সা দিল। কিন্তু হাসি পয়সাটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল ও মাটিতে শুইয়া পড়িয়া তাহার কচি ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিয়া কহিল, "আমি এতটা পয়সা নেব না, দাদারা দুটো। আমি এতটা নেব না। গর্জ্জিয়া উঠিয়া জয়কালী কহিল, "বুড়ো মিন্সের রকম দেখ। একটা পয়সার জন্যে কচি ছেলে কাঁদাচ্ছে দেখ না। যেন এক পয়সা দিলে ওঁর ঘরের ভাণ্ডার ফুরিয়ে যাবে।" করালী হাসিকে কাঁদিতে দেখিয়া একটু লজ্জিত হইয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল ও মাটী হইতে পয়সা কুড়াইয়া আর একটা পয়সা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া তাহাকে চুপ করাইল।

সে রাত্রিতে করালীচরণ কিছুতেই ঘুমাইতে পারিল না, সমস্ত রাত্রি বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। জয়কালী কহিল, "কি হয়েছে গা ঘুমচ্চনা কেন?" করালী কহিল, "বিছানায় বড় ছারপোকা হ'য়েছে, বড় কামড়াচ্ছে।" কিন্তু আমরা জানি ছারপোকার দংশন করালীর নিদ্রা না হওয়ার কারণ নহে। সে দিনের দুই আনা পয়সার শোক কৃপণ করালী কিছুতেই ভুলিতে পারিতে ছিল না।

(৪)

পশ্চিমে প্রায় প্রতি দেশে যেখানে অধিক বাঙ্গালীর বাস প্রতিবৎসরই বারোয়ারীর দুর্গাপূজা হয়। এই পূজা আবার বড় সহরে প্রতি পল্লীতেই হইয়া থাকে। কাশীতেও করালীচরণের পল্লীতে প্রতিবৎসরই বারোয়ারীর দুর্গাপূজা হইত। করালীর প্রতিবেশীরা সকলেই আপনাদের ক্ষমতা অনুসারে চাঁদা দিত। দিত না কেবল করালী। অথচ মায়ের প্রসাদ পাইতে যাইতে তাহার কখনও ভুল হইত না। পাড়ার যুবকেরা, যাহাদের প্রতি চাঁদা আদায়ের ভার ছিল, তাহারা প্রতি বছরই করালীর নিকট হইতে শূন্য হাতে ফিরিয়া আসার জন্য তাহার প্রতি হাড়ে হাড়ে চটা ছিল। অথচ না পাইয়াও তাহারা আবার পর বছর তাহার নিকট যাইত। এই যুবকদলের মধ্যে মোহনলাল ছিল পাণ্ডা। সে আবার করালীর জামাতা অতুলের বন্ধু। মোহন মাঝে মাঝে সখের থিয়েটারের অভিনয়ও করিত। এ বৎসর স্থির হইল যে পূজার সময় থিয়েটার হইবে। সুতরাং কিছু অধিক চাঁদা তুলিবার প্রয়োজন। মোহন অতুলকে ধরিয়া বসিল, "ওহে তোমার শ্বশুরকে বলে এবার অন্ততঃ কিছু টাকা পাইয়ে দাও।" অতুল কহিল, "আমি বল্লেই তিনি দেবেন বুঝি! তোমরা ওঁকে চেন ত।" মোহন কহিল, "কে বল্লে দেবে না, আমরা যখন চাঁদা চাইতে যাব তখন তুমি আমাদের সঙ্গে যেও, আর ওঁকে অনুরোধ কর, এবার কিছু বেশী টাকা চাই, তেমন মোটারকম চাঁদা না উঠ্‌লে থিয়েটার হ'য়ে উঠবে না বোধ হয়। আর তোমার শ্বশুর ছাড়া আমাদের পাড়ায় তেমন বেশী টাকা দেবার লোকও আর নেই।" কিন্তু অতুল শ্বশুরকে অনুরোধ করিতে সম্মত হইল না, কহিল, "না ভাই আমি পারব না। আর আমি বল্লে কিছু ফলও হবে না। কাক কথা শোনবার লোক উনি নন। তোমাদের হাঁটাহাঁটিই সার হবে তা আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।" মোহন ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিল "সোজা কথায় বল যে তুমি শ্বশুরকে অনুরোধ করতে চাওনা। কিন্তু দেখে নিও আমি এবার যেমন করে পারি ওঁর কাছ থেকে বেশ মোটা রকম চাঁদা আদায় না করে ছাড়ছি না। তাতে যদি তোমার সাহায্য পাই ভাল।" অতুল কহিল, "তুমি যদি আমায়

করতে পার তাহলে ওঁর কাছে না গিয়ে আড়াল থেকে তোমাকে সাহায্য করতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু উনি যেন টের না পান যে আমি এর মধ্যে আছি।" মোহন কহিল, "না আমি ছাড়া আর কেউ জানবে না। তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেক।" করালী আপন বৈঠকখানা ঘরে এক পাল হিন্দুস্থানী দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বসিয়াছিল। তাহারা সকলেই তাহার খাতক। সেই ঋণ শোধ করিতে আসিয়াছে। কেহ বা সুদ দিতে আসিয়াছে। আবার কেহ বা আরও ঋণ করিতে আসিয়াছে, এইরূপ একটা বেনীয়ার সহিত দুই পয়সা লইয়া করালীর কথা কাটাকাটি চলিতেছিল, এমন সময় মোহন, উপেন, অবিনাশ প্রভৃতি যুবকেরা টাকার খাতা লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাদের দেখিয়া করালীর কাল মুখ আরও কালো হইয়া উঠিল, সে কহিল, "বস তোমরা ঐ চৌকীতে।" মোহন কহিল "আমরা এসেছি আপনার কাছে—" বাধা দিয়া করালী কহিল, "হাঁ হাঁ জানি, তোমরা কি জন্যে এসেছ, কি বছরই ত আস। একটু বস এই লোকগুলাকে বিদেয় করে তোমাদের কথা শুনছি।" অগত্যা মোহনকে নীরব হইতে হইল। প্রায় একঘণ্টা পরে করালীর খাতকের দল বিদায় হইল। এতক্ষণ চুপ করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া থাকা যুবকদের পক্ষে বড় বিরক্তজনক হইয়াছিল। কিন্তু মোহনের ইঙ্গিতে সকলেই চুপ করিয়া রহিল। লোকগুলা বিদায় লইলে মোহন কহিল, "মশায় আমাদের কথাটা যদি শোনেন।" করালী কহিল "তোমরা যদি কি বছরের মত চাঁদা চাইতে এসে থাক তা হ'লে আমি আগেই বলে দিচ্ছি চাঁদা দেবার সাধ্য আমার নেই।" মোহন কহিল, "অন্য বছর না দেন নাই দিয়েছেন। এ বছর আমাদের পূজার সঙ্গে থিয়েটার হবে। কিছু টাকা দিয়ে আপনাকে সাহায্য করতেই হবে।" করালী কহিল, "আমি ত বলেছি আমি কিছু দিতে পারব না, টাকা ধার দিয়ে আমার যা আয় তাতে আমার নিজেরই পেট চলে না। আবার নতুন গরীবের কাছ থেকে চাঁদা চাইতে তোমাদেরও একটু ঘুরা হওয়া উচিত।" মোহন কহিল, "সে কি কথা মশায় আপনি আবার গরীব কোন্ খানটায়। এই কাশী সহরেই ত আপনার তিন খানা বাড়ী ভাড়া খাটছে। আপনি হ'লেন আমাদের পাড়ার মধ্যে বড়লোক। আপনি যদি না দেন ত কে দেবে।" কিন্তু করালী পুনঃপুনঃ আপন দৈন্য জানাইতে লাগিল। যুবকেরাও কিছুতে ছাড়িতে চাহে না। অবশেষে অনেক ভাবিয়া করালী চারি আনা পয়সা দিতে স্বীকৃত হইল। শুনিবামাত্র যুবকেরা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। উপেন কহিল, "থাক আপনাকে আর ও চার আনা দিতে হবে না, আমাদের কিবুড়িও আট আনা দিয়েছে।" অবিনাশ কহিল, "ও চার আনা আপনার ট্যাঁকেই থাক, কেন চার আনা টাকা দিয়ে চার দিন না খেয়ে কতি পুরণ করবেন।" মোহন কহিল, "বড় আশা করে আপনার কাছে এসেছিলাম। আপনি আমাদের এরকম করে ফিরিয়ে দিচ্ছেন এতে আপনার ভাল হবে না এটা জেনে রাখবেন। আজ থেকে চারদিনের মধ্যে যদি আপনার ঐ সিন্দুক-ভরা টাকা চুরি না যায় ত আমি কি বলেছি। চলহে বিছে সময়টা নষ্ট হ'ল।" তাহারা চলিয়া গেল। করালীচরণ হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার টাকার সিন্দুক চুরি, কি ভয়ানক কথা! সে চাদরখানা কাঁধে ফেলিয়া ঘরের তালা বন্ধ করিয়া অরকালীকে ডাকিয়া সদরদরজা বন্ধ করিতে বলিয়া থানায় চলিল। নিকটেই একটা থানা ছিল। দারোগা বাঙ্গালী,—নাম নরেন্দ্রনাথ। দারোগা থানায় বসিয়া আছেন এমন সময় করালী যাইয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "হুজুর গরীবের মাবাপ। হুজুর না বাঁচালে গরীব আজ ধনে প্রাণে মারা যায়।" নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া পা ছাড়াইয়া লইলেন ও

কহিলেন "কে তুমি? কি হ'য়েছে তোমার?" করালী কহিল "হুজুর আমি আপনার দাস করালী-চরণ। অনেক কষ্ট করে ক'টা টাকা জমিয়ে তাই ধার দিয়ে যে সুদ পাই তাইতে কোন রকমে পেটটা চলে যায়। আজ আমি মারা যেতে"—বলিয়া মধ্য পথে থামিয়া করালী ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ তাহাকে ধমক দিয়া কহিলেন "কান্না রাখ। সোজা কথায় বল কি হ'য়েছে। বুড়ো হয়েও ছেলের মত কাঁদতে লজ্জা হচ্ছে না তোমার! তোমার শরীরে আজ আমি মরবার কোন চিহ্ন দেখচি না।" চোখ মুছিয়া করালী কহিল, "দুঃখের কথা বলব কি হুজুর, পাড়া সুদ্ধ লোক আমার দুষমন। আজ কত-গুলা ছোঁড়া এসেছিল চাঁদা চাইতে। বাবুদের নাকি থিয়েটার হবে। তা আমি নিজেই পেট ভরে খেতে পাইনা চাঁদা দেব কোত্থেকে। তবু চার আনা দিতে চাইলাম। ভাবলাম ভদ্রলোকের ছেলেদের অমনি ফেরান ভাল দেখায় না। তা বলব কি তারা তা নিলেনা, উল্টে শাসিয়ে গেছে চারদিনের মধ্যে আমার বাড়ীতে চুরি করবে। সব ডাকাত। এখন আপনি না বাঁচালে এ গরীব মারা যায়।" এই বলিয়া করালী হাতজোড় করিল। নরেন্দ্রনাথ অনেক দিন কাশীতে আছেন। করালীর নাম তিনি উত্তমরূপে জানিতেন। মোহন তাঁহারই ভাগিনা জামাই। তিনি কহিলেন "ক্ষেপেছ এত বড় সহরের মধ্যে বলে করে চুরি! পুলিস কি ঘুমুচ্ছে নাকি। ওরা তোমার ভাঁকা ভয় দেখিয়ে গেছে।" কিন্তু করালী নাছোড়বান্দা, সে কহিল "হুজুর তারা সব ডাকাতের দল, তাঁরা সব পারে। আপনি না বাঁচালে আমার রক্ষা নেই।" নরেন্দ্রনাথ কহিলেন "তুমি তাদের চেন? তাদের নাম জান?" করালী সকলকে চিনিত। সকলকার নাম বলিল। ডাকাতদের নাম শুনিয়া দারোগার মুখে একটা অস্পষ্ট হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "তুমি বাড়ী যাও। আমি একজন কনষ্টবলকে বলে দেব'খন, এ চারদিন রাত্রিতে তোমার ওখানে থাকবে, কিন্তু দিন চার আনা করে দিতে হবে তাকে।"

করালী আবার একটা নূতন ব্যয়ের সম্ভাবনায় ভীত হইয়া কহিল, "হুজুর ও চার আনা কি রোজ আমাকেই দিতে হবে?" নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "নইলে কি আমি দেব?" করালী কহিল, "কিন্তু হুজুর আমি বড় গরীব, চার দিনে একটা টাকা পড়বে যে?" ধমক দিয়া নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "গরীব তা আমি কি করব। তোমার বাড়ী আগলাতে সরকারী কাজ ক্ষতি করে লোক দেওয়া হবে, তার দাম কি আমি দেব? আচ্ছা লোক ত তুমি যে! না দিতে পার চুপ করে বাড়ী যাও। তুমি যখন এত গরীব যে একটা টাকা খরচ করতে পারচ না, তখন তোমার যে কি ছাই চুরি যাবে তা ত আমি বুঝছিনা।" করালী দেখিল শেষে এক টাকার মায়ায় তাহার সর্ব্বস্ব না যায়। তাই সে কহিল, "হুজুর রাগ করবেন না। আমি যেমন করে পারি টাকা দেব। আপনি লোকটাকে পাঠিয়ে দেবেন।" বলিয়া সে ভূমিষ্ঠ হইয়া দারোগাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। ক্রমে চারি দিন গেল, আট দিন গেল, করালীর বাড়ীতে চোর উঁকিও মারিল না। করালী ভাবিল, "ভাগ্যে সেদিন বুদ্ধি খাটিয়ে দারোগার কাছ থিয়েছিলাম। নইলে সর্ব্বনাশ হয়েছিল আর কি!"

(৫)

তখনও তরুণ অরুণের সোনার কিরণে শ্যামলা ধরণী প্লাবিত হয় নাই। দুই একজন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা স্নানে আসিয়াছে মাত্র। আমাদের করালীচরণও স্নানে আসিয়াছে। মাঝে মাঝে করালী গঙ্গাস্নান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিত। স্নান সারিয়া ঘাটে উঠিয়া কাপড় পরিয়া করালী আপন পুরাতন শতছিন্ন নামাবলিখানা গায়ে দিতেছাইয়া দেখে তাহার

কোণে কি বাঁধা রহিয়াছে। খুলিয়া দেখে নদীর কাদা ও পথের আবর্জ্জনা লইয়া কোন হতভাগা তাহার মস্তক খাইতে নামাবলীর কোণে বাঁধিয়া গিয়াছে। রাগে দুঃখে বেচারা প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। হতভাগা ছোঁড়াগুলার ভয়ে সে কাক কোকিল ডাকিবার পূর্ব্বে ঘাটে আসিয়াছে, এত তোরেও তাহারা তাহাকে জ্বালাইতে ছাড়ে নাই। আবার জলে নামিয়া সে নামাবলিখানা কাঁচিয়া লইল। তাহার পর ছোঁড়াগুলাকে উদ্দেশ করিয়া গালিবর্ষণ করিতে লাগিল। এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, "বৎস পুণ্য প্রভাতে কাহাকে গালি দিয়া জিহ্বা কলুষিত করচ?" করালী ফিরিয়া দেখে এক জটাজুটধারী দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর প্রতি তাহার বিশ্বাস চিরকাল। সে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আপন দুঃখের কথা সব বলিয়া ফেলিল। সন্ন্যাসী কহিলেন, "মা তারা তোমার মঙ্গল করুন। বৎস তুমি বড় ভাগ্যবান্। তোমার মত ভাগ্যবানকে এরূপ লাঞ্ছনা করা মহাপাপ। কে সে পাপাত্মা?" করালী কহিল, "প্রভু তাহাকে আমি দেখি নাই, তবে সে আমার শত্রুদের মধ্যে একজন তাতে আর ভুল নেই। আমি বড় গরীব। আমাকে ভাগ্যবান বলছেন কেন?" হাসিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "বৎস যোগবলে সবই জানা যায়। তোমার ললাট আমায় বলে দিচ্ছে যে তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যবান্। কিন্তু সর্ব্বদাই শত্রুদ্বারা বেষ্টিত থাক বলে তোমার মনে চির শান্তি সুখ নাই।" বিস্মিত হইয়া করালী কহিল "প্রভু অনুগ্রহ করে আমার হাতখানা দেখুন ত।" বলিয়া সে আপন ডাইন হাত সন্ন্যাসীর দিকে বাড়াইয়া দিল। সন্ন্যাসী কহিলেন, "বৎস আমি সামুদ্রিক বিদ্যা বড় ভাল জানি না। তবু তোমার মত ভাগ্যবানের হাত দেখতে লোভ হচ্ছে।" বলিয়া তিনি প্রায় পাঁচ মিনিট করালীর হাত উত্তমরূপে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন "তোমার ধনুরাশি, ক্ষত্রিয়-বর্ণ, দেবারিগণ। ভাদ্র মাস তোমার জন্ম হয়। এখন তোমার বয়স ৪২ বৎসর ছ'মাস তিন দিন। কেমন ঠিক কিনা?" আশ্চর্য্য হইয়া করালী কহিল, "হাঁ দেবতা আপনি সর্ব্বজ্ঞ।" সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন "তোমার দুই বিবাহ। প্রথমা স্ত্রী প্রায় ২৫ বছর পূর্ব্বে মারা গেছে। দ্বিতীয়া স্ত্রী জীবিতা। প্রকৃতি অতিশয় কলহ-প্রিয়। আর সে বড় মুখরা। তার দুই সন্তান,—প্রথমটী পুত্র, দ্বিতীয় কন্যা। পুত্রটী জন্মের কএক দিনের মধ্যেই মারা পড়ে। কন্যাটী জীবিতা।" করালী জীবনে অনেক সন্ন্যাসী দেখিয়াছে, কিন্তু এরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতাপন্ন সন্ন্যাসীর কথা কখন শোনে নাই। তাহার কৌতূহল বাড়িয়া চলিল, সে কহিল, "দেবতা আরও কিছু বলুন।" সন্ন্যাসী কহিলেন, "দশদিন পূর্ব্বে তোমার বড় বিপদের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু দৈব বলবান্ থাকাতে তা কেটে গেছে।" রুদ্ধশ্বাসে করালী কহিল, "কিরূপ বিপদ দেব?" সন্ন্যাসী কহিলেন "অনেক কষ্টে আধপেটা খেয়ে তুমি যা সঞ্চয় করেছ তা সব কতক-গুলা দুষ্ট লোকের চুরি করবার কথা ছিল।" বিস্ময়ে করালীর দুই চক্ষু কপালে উঠিল। সে কহিল, "হাঁ মহারাজ আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আমার ভবিষ্যত জীবনের কথাও কিছু বলুন।" সন্ন্যাসী কহিলেন, "তাও বলচি শোন, তোমার প্রতিবেশীরা সকলেই তোমার অমঙ্গল কামনা করে। তোমাকে বিশেষ করে জ্বালাতন করে পাড়ার ছোঁড়ারা।" স্তম্ভিত করালী কহিল, "তাদের জব্দ করবার কি কোন উপায় নাই দেব?" সন্ন্যাসী কহিলেন, "আছে বই কি, ইচ্ছাময়ী তারার ইচ্ছায় কিনা সম্ভব। মায়ের ইচ্ছায় আমি এক কবল দিতে পারি তাহা তুমি ধারণ করলে তোমাকে কেপান দূরে থাক, তোমার সাম্নে আস্তে ছোঁড়ারা ভয় পাবে। কিন্তু শোন, তুমি আজ থেকে এক বছর পরে পূর্ণিমায় প্রায় লক্ষ টাকা গুপ্তধন পাবে।" আনন্দে করালীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কহিল, "আপনার অপার

যহিয়া। দেবতা কত টাকা পাবে তা নিশ্চয় করে জান্‌তে বড় ইচ্ছা হচ্ছে।" সন্ন্যাসী পুনরায় তাহার হাত দেখিয়া কহিলেন, "এক লক্ষ পঁচিশ হাজার। যদি না—"বলিয়া তিনি চুপ করিয়া গেলেন। ব্যস্ত হইয়া করালী কহিল, "যদি কি না—প্রভু?" সন্ন্যাসী কহিলেন, "কিছু নয়, বৎস নিয়তির হাত এড়ান বড় শক্ত। আগে থাকতে শুনে মন খারাপ করে কি হবে?" বলিয়া তিনি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। ভীত হইয়া করালী সন্ন্যাসীর পথ রোধ করিয়া কহিল, "দয়া করে যখন এতটা বল্লেন এটাও বলুন। আমাকে উৎকণ্ঠার মধ্যে রেখে যাবেন না।" সন্ন্যাসী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "না শুনলেই ভাল হত। কিন্তু যখন জেদ করচ শোন। প্রায় ৯মাস পরে তোমার মৃত্যু যোগ আছে।" করালী কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "কিরোগে মৃত্যু হবে প্রভু?" সন্ন্যাসী কহিলেন "রোগে মৃত্যু হলে আর দুঃখ কিসের। জগতের জীব-মাত্রই মরণ-শীল। কিন্তু তোমার মৃত্যু-যোগ সাধারণ নহে। বড় শোচনীয় মৃত্যু। ডাকাতে তোমার সর্ব্বস্ব চুরি করে তোমাকে হত্যা করবে। এই কাঁড়াটা যদি কাটে তাহ'লে ৮২ বছর আয়ু আছে। আর তুমি যদি একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা না পাও তাহলে আমার এতকালের সাধনাই মিথ্যা।" ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে করালী কহিল, "কাড়া কাটাবার কি কোন উপায় নাই দেব?" সন্ন্যাসী কহিলেন, "আছে, কিন্তু তাতে বড় খরচ হবে। আর বড় বেহনত হবে। যোগ্য পুরোহিত দ্বারা মা মহামায়ার পূজা করে তাঁর প্রসাদী ফুল কাছে রাখলে দুই গ্রহের সাধ্য কি তোমার উপরে তার প্রভাব দেখায়।" কাঁদিতে কাঁদিতে করালী কহিল, "প্রভু আমায় রক্ষা করুন। আমার যত দরিদ্রের যা আছে তাই দিয়ে মায়ের প্রসাদ লাভ করতে হবে। খরচের জন্য আপনি ভাববেন না।" সন্ন্যাসী কহিলেন, "বৎস তা যদি করতে পার তবে তোমার আর ভয় থাকে না। কোন তন্ত্রাচারী দ্বিজ দ্বারা মায়ের পূজা করিও, দেখ যেন অনুষ্ঠানের অথবা পূজার কিছু ত্রুটী না হয়। হলে আর রক্ষা থাকবে না। আমি ওসব করতে গেলে আমার সাধনার বড় ব্যাঘাত হবে।" করালী এবার দুই হাতে সন্ন্যাসীর পা জড়াইয়া কহিল, "দেবতা আপনার ন্যায় মহাত্মা আমি কোথায় পাব? আমাকে রক্ষা আপনাকেই করতে হবে। পাড়ার সব লোক আমার শত্রু। তারা আমাকে বাঁচাবার যত্ন না করে উল্টে আমার মরণ যত্ন করবে।" একটু ভাবিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন "আচ্ছা আমিই মায়ের কাছে তোমার জীবন ভিক্ষা করব। তোমার কাতরতা দেখে আমি স্থির থাকতে পারছি না। এই অমাবস্যাতেই করতে হবে?" করালী কহিল, "কত খরচ পড়বে?" "তা আমি না হিসেব করে বলতে পারি না? আজ আর সময় নেই; আমার ধ্যান পূজা এখনও কিছু হয় নাই। শুক্রবারে এইখানে সন্ধ্যার পর আমি আসব। তুমি এস, যা যা চাই সব ঠিক করা যাবে।" বলিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, করালী আবার তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিল, "কই প্রভু, আমাকে দুরাচার ছোঁড়াগুলার হাত থেকে উদ্ধারের উপায় করলেন না?" সন্ন্যাসী আপন ঝুলি হইতে এক টুকরা কাগজ ও পেন্‌সিল বাহির করিয়া তাহাতে করালীর অজানা ভাষায় মন্ত্র লিখিয়া তাহাকে কহিলেন, "এই নাও বৈরীদমন কবচ, একটা তামার মাদুলীতে পুরে লালসুতা দিয়ে বাঁহাতে বেঁধে রেখ। কোন লোক তোমায় কিছু বল্‌তে সাহস করবে না।" করালী কাগজখানা লইয়া তাহার লেখা পড়িতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। একটু পরে চাহিয়া দেখে সন্ন্যাসী নাই। তখন সে কম্পিত হৃদয়ে বাড়ী ফিরিল।

(৬)

বৈরী-দমন কবচের কি আশ্চর্য্য শক্তি! যে দিন হইতে করালী তাহা ধারণ করিয়া পথে বাহির হইতে আরম্ভ করিল সে দিন হইতে দুষ্ট ছোঁড়ার দল

আর তাহাকে ক্ষেপাইত না। বরং তাহাকে দেখিয়া ভীত হইয়া পলাইয়া যাইত। কিন্তু ইহাতে করালী শান্তি পাইল না। সন্ন্যাসীর সেই ভীষণ গণনা সর্ব্বদাই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। করালী দেখিল তিনি তাহার হাত দেখিয়া তাহার অতীত জীবন সম্বন্ধে যাহা বলিলেন তাহা অবিকল মিলিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানও মিলিয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতেও অসাধারণ ক্ষমতা। তাঁহার গণনা শক্তি যে অসাধারণ তাহাতে তাহার আর বিন্দু মাত্র সন্দেহ রহিল না। করালীর মৃত্যু সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে তাহাও নিশ্চয়ই ফলিবে। হায়! হায়! বৃদ্ধ বয়সে তাহাকে কিনা ডাকাতের হাতে মরিতে হইবে। আবার তাহার গায়ের রক্ততুল্য অর্থও ডাকাতে লুটিবে! মৃত্যুর চিন্তায় বেচারী করালী প্রায় পাগল হইয়া উঠিল। আবার ভাবিল যদি কোনও প্রকারে এ যাত্রায় রক্ষা পায় তাহা হইলে তাহার অতুল ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি আর কে আটকায়! না, তাহাকে মায়ের পূজা করিয়া প্রসাদ লাভ করিতেই হইবে। তাহাতে তাহার দশ বার টাকা খরচ পড়ে পড়িবে। জীবন আগে না টাকা আগে। জয়কালী কহিল, "ওগো তুমি আর টাকার মায়া করনা। যাও, বাবার হাতে পায়ে ধরে মায়ের পূজা দিয়ে মার প্রসাদ আনগে। কেন টাকার মায়া করে বুড়ো বয়সে ডাকাতের হাতে প্রাণটা দেবে?" করালী কহিল, "তাই করতে হবে গিন্নী। আমার টাকারি এবার শনি ধরেচে। এই সেদিন পুলিস বেটাকে এক টাকা দিলাম, আবার এ এক বিপদ। কিন্তু এতেও যদি ফাঁড়া না কাটে তখন কি হবে?" জয়কালী কহিল "ওগো অমন কথা মুখে এননা। বাবার অপার মহিমে, বাবার দয়া হ'লেই তুমি রক্ষা পাবে। বাবার উপর সন্দ করনা গো! ওতে মহা পাপ হবে।"

শুক্রবার সন্ধ্যা হইতেই করালী স্নানের ঘাটে যাইয়া দেখিল সন্ন্যাসী তখনও আসেন নাই। সে মাটির উপর বসিয়া আপন অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিল। এমন সময় পশ্চাতে হর হর শব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিল সেই সন্ন্যাসী আসিতেছেন। সে উঠিয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল। সন্ন্যাসী কহিলেন, "জগন্মাতা তোমার রক্ষা করুন। দুষ্ট বালকগুলা আর ত তোমাকে জ্বালাতন দেয় না?"

করালী কহিল "না দেবতা, আপনার অপার মহিমাতে তাদের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আমার মনে তাতে বিন্দু মাত্রও সুখ নেই। আমার সেই ভীষণ মৃত্যু আমি সর্ব্বদাই চোখে দেখচি। প্রভু আমায় রক্ষা করুন।" সন্ন্যাসী কহিলেন, "মায়ের পূজা করে তাঁর প্রসাদ পেলে আর কোন ভয় থাকবে না। মায়ের পূজা করাতে রাজি আছ ত।" করালী কহিল, "হাঁ প্রভু আমি আমার অকাল মৃত্যু হ'তে রক্ষা পাবার জন্যে সব করতে পারি। এখন কি কি চাই অনুগ্রহ করে বলে দিন।" "তা হলে একটু অপেক্ষা কর" বলিয়া সন্ন্যাসী সেই স্থানে ভূমিতে অঙ্গুলি দ্বারা অনেক রেখা টানিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে মুখে অদ্ভুত শব্দ বাহির করিতে লাগিলেন ও আকাশের দিকে চাহিয়া কি যেন দেখিতে লাগিলেন। করালী অপলক নেত্রে তাঁহার কার্য্য দেখিতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে সন্ন্যাসী করালীকে কহিলেন, "দেখ।" করালী দেখিল ভূমির উপর অঙ্গুলির সাহায্যে সন্ন্যাসী এক বৃহৎ ফর্দ্দ লিখিয়াছেন। সে পড়িয়া দেখিল তাহাতে এমন পদার্থের নাম রহিয়াছে যাহা সে জীবনে কখনও দেখে নাই বা শোনে নাই। ফর্দ্দে খরচ সর্ব্বশুদ্ধ ২০০ শত টাকা ধরা হইয়াছে। দেখিয়া ত তাহার চক্ষু স্থির! সে কহিল, "এ যে অনেক টাকা। আমি গরীব এত টাকা কোথায় পাব।" সন্ন্যাসী কহিলেন "তোমার না থাকে, কর না। এ ফর্দ্দ যত কম করে ধরা যায় তা আমি ধরেচি। না হয় অন্য কোনও লোককে দিয়ে করিয়ে দেখ, তারা কি ফর্দ্দ

দেয়। আমাকে তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না তা আমি বুঝেচি। কিন্তু আমি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, অর্থের মূল্য আমার কাছে এই গঙ্গা মৃত্তিকার চেয়ে অধিক নহে। খরচটা তোমার মত লোকের কাছে বড্ড বেশী ঠেকচে, তা আমি বুঝেচি। কিন্তু তোমার ফাঁড়াও ত সোজা নয় বাপু। একে মরণ যোগ—তায় আবার ডাকাতের হাতে।" করালী ভাবিল এত খরচ করিয়া বাঁচিয়া থাকিয়া তাহার কাজ নাই। আবার তখনই তাহার মানসনেত্রে ভীষণ মৃত্যুর চিত্র ভাসিয়া উঠিল। এ ফাঁড়া কাটিলে অতুল ঐশ্বর্য্য পাইবে, তাহাও তখনি মনে পড়িল। সে কহিল, "দেবতা আপনাকে অবিশ্বাস করচি একথা বলে আমায় মহাপাপের ভাগী করবেন না। আমি যেমন করে পারি টাকা এনে আপনাকে দেব। যা দরকার হয় আপনি কিনে নেবেন।" সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমি কিনতে গেলে আমাকে আবার দোকানদারে যেতে হয়। বড় ঝঞ্ঝাট। তুমিই ফর্দ্দ দেখে সব কিনে এন।" করালী কহিল, "আমি ওসব জিনিসের নামও কখন শুনি নি। আমি কিনতে পারব না। দেব, এত যদি দয়া করলেন এটুকুও করুন। কবে মায়ের পূজা হবে?" সন্ন্যাসী কহিলেন, "আজ্ঞা আমিই কিনবার ব্যবস্থা করব। অনুষ্ঠানের ত্রুটী হলে সব পণ্ড হবে।' আগামী সোমবার অমাবস্যা রাত্রিতেই পূজার প্রশস্ত সময়। মণিকর্ণিকার শ্মশানে মহামায়ার পূজা করতে হবে। রাত্রি দুইটার পর পূজার সময়। তোমাকেও থাকতে হবে।" সর্ব্বনাশ শ্মশানে রাত্রি দুইটার সময়ে! করালীর অতিশয় ভূতের ভয় ছিল। সে কহিল, "প্রভু রাত্রিতে ত আমি বাড়ী ছেড়ে থাকতে পারি না। পাড়ার লোক জানতে পারলে আমার সর্ব্বস্ব চুরি করবে। আপনার মত মহাত্মা যখন সব ভার নিলেন তখন আমি না থাকলে কি চলে না?" সন্ন্যাসী একটু ভাবিয়া কহিলেন, "মায়ের পূজার নৈবেদ্যাদি উৎসর্গ তোমাকেই করতে হবে। তা তুমি যেরূপ শক্ত মধ্যে বার কর তাতে কি সাহসেই বা বাড়ী ছেড়ে এস! আবার কবজও তোমার সঙ্গে থাকচে! তা একান্ত না আসতে পার একখানা কাগজে লাল কালীতে মায়ের পূজার খরচের মোট টাকাটা ধরে লিখে দিও, 'এই টাকা মায়ের পূজার জন্য তাঁহার দাস আমি করালীচরণ দিলাম।" তাই আমি উৎসর্গ করব। আর টাকাটা কাল প্রাতেই আমাকে এই স্থানে এসে দিয়ে যেও। আর মঙ্গলবারে মায়ের প্রসাদী ফুল নিয়ে আমি এখানে অপেক্ষা করব তুমি এসে নিয়ে যেও।" রাত্রিতে শ্মশানে যাওয়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া করালীর মনটা কতকটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে কহিল, "আমি কালই টাকা এনে আপনাকে দিয়ে যাব।"

(৭)

সেবার কাশীতে মহাজন-টোলার পূজা বেশ জাঁক জমকের সহিত সম্পন্ন হইল। করালীচরণ মহাষ্টমীর দিন যাইয়া মায়ের প্রসাদ লইয়া আসিল। এক পয়সা চাঁদা না দিলেও প্রসাদ আনিতে সে প্রতি বৎসর যাইত। মায়ের প্রসাদ সকলকার প্রাপ্য বলিয়া বারোয়ারীর কর্ত্তারা কেহ আপত্তি করিতেন না। কিন্তু এবার পূজার বাড়ীর কর্ম্মকর্ত্তাদের সুব্যবহারে করালীচরণ বড় আশ্চর্য্য বোধ করিল। কারণ তাঁহারা সকলেই কি জানি কেন তাহাকে বেশ একটু খাতির করিল, যাহা করালীর ভাগ্যে জীবনে কখনও ঘটে নাই। পূজার ম্যানেজার হরিনাথ কহিলেন, "চাটুজ্জে মশায়, আজ রাত্রিতে ছেলেরা সব তপোবন প্লে করবে। ভারি চমৎকার নাটক। আপনি নিশ্চয় দেখতে আসবেন।" করালী কহিল, "দাদা বুড়ো হাড়ে রাতজাগা সহ্য হয় না।" হরিনাথ কহিলেন, "ওকথা শুনচি না, আপনাকে আসতেই হবে। একটা রাত বৈ ত নয়। আর সমস্তরাত্রি ধরে প্লে হবে তা নয়, রাত দশটার পর থেকে আরম্ভ হবে দুটোয় শেষ হবে।"

রাত্রিতে দশটার সময় থিয়েটার দেখিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া করালী জয়কালীকে কহিল, "দেখ মা, আমি যাচ্ছি পূজাবাড়ীতে থিয়েটার দেখতে। আর কোন বেটা আমার বাড়ীতে চুরি করতে আসবে না,—সব ছুটেছে থিয়েটারে। তবু যদি কিছু হয় তা হলে তুমি খুব জোরে চেঁচিও। কাছেই পূজা বাড়ী আমি শুনতে পাবখ'ন।" জয়কালী কহিল, "তা যেন আমি চেঁচাব, আর তুমি যে শুনতে পাবে তাও ঠিক, কেন না আমার গলায় কেমন জোর তা তুমি বেশ জান। কিন্তু বুড়ো বয়সে তোমার থিয়েটার দেখতে যাওয়া কেন! মায়ের পায়ে দুটো ফুল দিতে ত গেলে না! তুমি বাড়ী আগলাও আমি যাই দেখে আসি।" করালী কহিল, "না না, আমিই যাব। হরিদা অনেক করে বলে দিয়েছেন, না গেলে দুঃখ করবেন।" এই বলিয়া সে জয়কালীকে আর কথা কহিবার অবকাশ মাত্র না দিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। জীবনে এই প্রথম সম্মানের আহ্বান সে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না।

রাত্রি দশটার পর থিয়েটার আরম্ভ হইল। পূজার উঠানে লোকের ভিড়ে পা ফেলিবার স্থান নাই। দুলকায় করালী সেই ভিড়ের মধ্যে বসিয়া ঘামিতেছিল ও মুগ্ধ নেত্রে থিয়েটার দেখিতেছিল। সে জীবনে কখন থিয়েটার দেখে নাই। পুস্তকের কাল্পনিক চিত্রের জীবন্ত অভিনয় দেখিয়া করালীর মন আর এ বাস্তব জগতে ছিল না। দুই ঘণ্টা অভিনয়ের পর দর্শকদের পান ও জল খাইতে দিবার জন্য দশ মিনিট প্লে বন্ধ রহিল। এই সময়ে অনেকে জল খাইতে বাহির হইয়া গেল। আবার অনেকে স্থান বেদখল হইবার ভয়ে উঠিল না। দুই তিনটী ছোকরা সেই সময়ে পূজার চাঁদার ছাপান প্রাপ্তি স্বীকার পত্র ভদ্রলোকদের মধ্যে বিতরণ করিতেছিল। করালীর হাতেও একখানি দিয়া গেল। সে পড়িয়া দেখিল, সর্ব্ব প্রথমে তাহার নাম ও চাঁদার ঘরে দুই শত টাকা রহিয়াছে। পড়িবা মাত্র করালী যেন আকাশ হইতে পড়িল। সে ভাবিয়া পাইল না যে কখন সে চাঁদা দিল। আবার দুই এক টাকা নহে, ২০০৲ দুই শত টাকা। সে ত ছোঁড়াগুলাকে তাড়াইয়াই দিয়াছিল। হয় ত এ অন্য কোন করালীচরণ। কিন্তু তাই বা কেমন করিয়া হয়! ইহারা যে তাহার বাড়ীর নম্বর পর্য্যন্ত জানিয়াছে! এমন সময়ে ভ্রূণ দিন আবার উঠিল। এবারকার দৃশ্য তপোবনে ধ্যানমগ্ন বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্রকে দেখিবামাত্র করালী যেন চাবুক খাইয়া লাফাইয়া উঠিল। তাহার চক্ষু হইতে কাল যবনিকা সরিয়া গেল। সর্ব্বনাশ! এই ত সেই গঙ্গাতীরের সন্ন্যাসী। উঃ—কি জোচ্চোর, তাহার চক্ষে ধূলা দিয়া তাহার টাকা অপহরণ করিয়াছে। করালী আর সে স্থানে বসিতে পারিল না। তাহাকে এককালে যেন শত শত বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল। সে কোনও প্রকারে উঠিয়া দাঁড়াইল। একটু দূরে হরিনাথ বসিয়াছিলেন, তিনি কহিলেন "ওকি চাটুজ্জেমশায়, এখনি উঠচেন যে, আপনার মুখ অমন শুকিয়ে গেল কেন?" করালী কহিল, "আমার শরীর বড় খারাপ বোধ হচ্ছে, আমি আর বসতে পারচি না, বাড়ী চল্লাম।" হরিনাথ কহিলেন "তাই ত হঠাৎ আপনার শরীর অমন খারাপ হ'ল কেন? ওরে কাউকে বল চাটুজ্জেমহাশয়ের সঙ্গে গিয়ে ওঁকে বাড়ী পৌঁছে দিতে আসতে" যন্ত্রণাপূর্ণস্বরে করালী কহিল, "না না কাউকে আমার সঙ্গে যেতে হবে না, এটুকু পথ আমি নিজেই যেতে পারব। আচ্ছা ও লোকটা কে যে বিশ্বামিত্র সেজেছে?" হরিনাথ কহিল, "ওকে চেনেন না? ও যে আমাদের মোহন।" "উচ্ছন্ন যাক, সর্ব্বনাশ হ'ক!" বলিতে বলিতে মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে করালীচরণ সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। বিস্মিত হইয়া হরিনাথ কহিলেন, "ব্যাপার কি? লোকটা হঠাৎ পাগল হল নাকি? মোহনকে গাল দিলে কেন?" তাঁহার পার্শ্বে

বসিয়াছিল উপেন, সে কহিল "মোহনের উপর ওর রাগের ঢের কারণ আছে। উনি কি সহজে আপনাদের ২০০ দু'শ টাকা চাঁদা দিয়েছেন! কত কন্দী করে মোহন এটা আদায় করেছে। এবারে সব-জান্‌তে পারবেন।"

বিচিত্র বিবাহ প্রথা

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী)

'ধরে নিয়ে জোর করে বিয়ে করা' এ সত্যি বিবাহের একটা ধারা নয়, এ শুধু এক বা ততোধিক পত্নী সংগ্রহের উপায় মাত্র। কিন্তু বিবাহ-বিধির সম্যক আলোচনা করিতে গেলে ইহা বাদ দিলে মোটেই চলে না, কারণ সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচনায় ইহার আলোচনা অপরিহার্য্য। বিশ্বের অনেক স্থানেই নারীদিগকে জোর করিয়া ধরিয়া বিবাহ করা বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল, এবং ইহা গৌরবের বিষয় বলিয়াই বিবেচিত হইত। অসভ্য ও অনুন্নত জাতিদিগের মধ্যেই এই প্রথা বিশেষ সাধারণ হইয়া পড়িয়াছিল, কারণ তাহারা বল-প্রকাশে কিছু করাই বাঞ্ছনীয় মনে করিত এবং ইহাদের মধ্যে বালিকা বধও বিশেষ প্রচলিত ছিল।

সমগ্র টাস্‌মেনিয়ায় জোর করিয়া পত্নী সংগ্রহের প্রথাই প্রচলিত ছিল। মেয়েদের জোর করিয়া ধরিয়া পত্নী করা, কিম্বা পুরুষের ইচ্ছানুরূপ যে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইত। বনউইক সত্যি বলিয়াছেন টাসমেনিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়াতে নারী ও পুরুষের পূর্ব্বের যুক্তি অনুসারেই এইরূপ ধর-পাকড় ব্যাপার চলিত। (১) কিন্তু যেরূপ বর্ব্বর ভাবে এই ব্যাপারের অভিনয় হইত তাহাতে পূর্ব্বরাগ কচিৎ হইত কি-না সন্দেহ। অষ্ট্রেলিয়ানরা অন্য জাতির কোন নারীকে ধরিবার ইচ্ছা করিলে চোরের মত তাহাদের তাঁবুর চারিদিকে বেড়ায়, এবং রক্ষক ছাড়া কোন নারীকে দেখিলেই দৌড়িয়া গিয়া লাঠির আঘাতে তাহাকে অজ্ঞান করিয়া তাহার ঘন চুলের রাশি ধরিয়া নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে লইয়া যায়। তারপর নারীর জ্ঞান হইলে সে তাহাকে তাহার দলের দিকে চলিতে বাধ্য করে এবং সেখায় সকলের সম্মুখে তাহার উপর যথেষ্ট অত্যাচার করে—কারণ নারী এখন তাহার সম্পত্তি, গৃহপালিত জন্তুর মত হইয়াছে। (২) মৃতানারীকে বলে আনিতে কোন বেগ পাইতে হয় না, সত্য কথায় তাহাকে প্রায়ই প্রভু বদলাইতে হইতেছে কিন্তু তাহার অবস্থার তো কোন পরিবর্ত্তন নাই।

কখনও কখনও এই 'জোর করে ধরে নেওয়া' কার্য্যে দুই জন নিযুক্ত হয়। তাহারা গভীর রাত্রে নীরবে তাঁবুতে ঢুকিয়া একজন বাহাল বর্ষার অগ্রভাগ দিয়া নারীর কেশ জড়াইয়া ধরে অপর একজন তাহার বর্ষা নারীর বক্ষের উপর ধরিয়া থাকে।

নারী জাগিয়া চীৎকার করিতে সাহস করে না। তাহারা নারীকে বাহির করিয়া লইয়া একটা

---

(১) Daily life and orgin of the Tasmanians, p. 65.

(২) Dumont D'urville, Hist. Univ. desvoy. Vol. xviii. p. 225.—oldfieled, Trans, Ethn soc., Vol. iii. p. 250.

যাহের সহিত বাঁধিয়া পুনরায় অস্ত্র শিকারের জন্য বাহির হয়, তারপর বিজয়ী হইয়া নিজেদের দলে ফিরিয়া যায়। (৩)

বন্দিনীরা ক্বচিৎ বিদ্রোহী হয়, কারণ তাহারা এই বন্ধনে বিশেষ অভ্যস্ত। বাল্যকাল হইতেই তাহারা তাহাদের ভবিতব্যের প্রতীক্ষায় থাকে। অষ্ট্রেলিয়ার সুন্দরী বালিকার ভাগ্য এইরূপ নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া একহস্ত হইতে অপর হস্তে পড়িয়া অতিবাহিত হয়। (৪)

এই ধরিয়া লওয়ার সময় অস্ত্র তাহাদের ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়, তারপর অপর দলের নারী সমাজে নিগ্রহ তো আছেই। কখনও কখনও জন্মভূমি হইতে শতশত মাইল দূরবর্তী স্থানে নারীকে লইয়া যাওয়া হয়। (৫)

এই নির্যাতিত রমণী যে দলভুক্ত, অনেক সময় সেই দল নির্যাতনকারীর প্রতি প্রতিশোধ লয়। পূর্ব্ব হইতেই নিজেদের মধ্যে আলোচনা একটা মীমাংসা হইয়া যায়, এবং নির্যাতনকারী গাছের বাকলের ঢাল হস্তে তাহার আততায়ীদিগের নিকট হইতে প্রায় চল্লিশ গজ দূরে দাঁড়ায়। আততায়ীরা সংখ্যায় জন দশেক হয়, তাহারা সকলেই নির্যাতনকারীর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করে, কিন্তু সেগুলি প্রায়ই ব্যর্থ হয় অথবা অতি মৃদু ভাবে গায় লাগে, তখন অপরাধীর দোষ ক্ষালন হইয়া যায়, এবং সন্ধি স্থাপিত হয়। (৬)

নিউগিনীর পপুয়ানদিগের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত। বাটীতে একাকিনী নারী পাইলেই পুরুষেরা তাহাদের পশুর মত অত্যাচার করিয়া ধরিয়া লইয়া যায়, তার পর দল হইতে যে মত দেওয়া হয় তাহা তাহারা স্বীকার করে। (৭)

ফিজি দ্বীপেও এইরূপ 'জোর করে ধরে' নেওয়ার প্রথা প্রচলিত এবং তাহাই গৌরবের বিষয়। একটা বৈঠক বসে, নির্ব্বাসিত রমণী হয় অপর উত্তরের নিকট পালাইয়া যায় অথবা বশ্যতা স্বীকার করে, তার পর কন্যার পিতামাতাকে একটা ভোজ দিলেই ব্যাপার মিট-মাট হইয়া যায়। (৮)

এইরূপ পশু-আচারের মধ্যে বিবাহের কোন-কিছু দেখা বিবাহ-পন্থী লোকেরই থাকে। এ ধরে নেওয়া বিবাহ করিবার জন্য নয়, শুধু দাসী-পনা করাইবার জন্য। অষ্ট্রেলিয়ানরা যে শুধু এই একমাত্র উপায়েই পত্নী সংগ্রহ করে তা নয়। অনেক সময় আত্মীয়া কিম্বা ভগিনীদিগকে বদল দিয়াও পত্নী সংগ্রহ করে। আবার কোন কোন দুই দলে এইরূপ নিয়ম থাকে নারী সব অপর দলের পুরুষের অধিকারে আসিবে। (৯)

আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যেও এই প্রথা বর্ত্তমান। অন্যান্য জিনিসের মত নারীদিগকেও বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। এইভাবে ডাহোমে হটেনটটস্‌রা প্রায়ই ডাহোমে হটেনটটস্ দিগের পত্নী দিগকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। (১০)

ম্যাডিজস ও টিমানিস প্রভৃতি জাতিদের মধ্যে এরূপ ধরে নিয়ে বিয়েকরার প্রথা নাই। তবে সেখায় কন্যার সম্মতি না লইয়া পিতামাতার নিকট হইতে কন্যা ক্রয়ের ব্যবস্থা বর্ত্তমান, এ একটা ব্যবসায়ে

(৩) Chamber's Journal, p. 22 (October 1861.

(৪) Collins, English colony in New South wales. 362.

(৫) G. Grey, Travels in North western Australia, Vol. ii. p. 249.

(৬) Chamber's Journal, 1864.

(৭) Notices on the Indian Archipelago, p. 90.

(৮) Williams, Fiji and the Fijians Vol. I. p. 174.

(৯) Mc Lennan, Primitive marriage, p. 321.

(১০) Campbell, Hist. Univ. des voy Vol. xxix. p. 343.

মত, কয়েক ভাণ্ড তাড়ি ও কিছু খাবার দ্রব্য বিনিময়ে পত্নী লাভ।

আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এই নিষ্ঠুর প্রথা এখনও প্রচলিত দেখা যায়। টেরা ডেল-ফুয়ো ও কুজিয়ান যুবকেরা একখানা ডেগে, ডিঙ্গি বানাইতে কিম্বা সংগ্রহ করিতে পারিলেই এই নারী হরণ কার্য্যে নিযুক্ত হয়। (১১)

প্যাটাগোনিয়ানরা দেশের পুরুষদিগকে সর্ব্ব যুদ্ধে হরণ করিয়া লইয়া যায়। প্রতিবৎসর বসন্তাগমে ওয়েন-প্যাটাগোনিয়ানরা কুজিয়ানদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের নারী, পালিত পশু, এবং অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যায়। (১২)

আমাজন ও ওরিনিকো তীরবাসীরা ক্রমাগত এইরূপ নারী ধরিতেছে, তাই তাহাদের ভেতর কখনও নারীর অতি-আধিক্য কখনও অতি অল্পতা দেখা যায়। (১৩)

কারিবরা এইভাবে প্রায়ই পত্নী সংগ্রহ করে বলিয়া তাহাদের নারীদের ভাষা পুরুষদের ভাষা হইতে অনেক সময়ই ভিন্ন দেখা যায়। (১৪)

ম্যানডান জাতির মধ্যে এই যুবতী হরণ ব্যাপার লইয়া তাহাদের আত্মীয় স্বজন ও হরণকারীদের মধ্যে একটা ভয়ানক শত্রুতা চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। (১৫)

অসভ্য বর্ব্বর জাতিদিগের মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই এই প্রথা দৃষ্ট হয়। বার্ণস বলেন তাতাররা যুদ্ধে বন্দিনীদের লইয়া তাহাদের পত্নী ভাবে গ্রহণ করে। (১৬)

মনুর ব্যবস্থায়ও এইরূপ প্রাথমিক মিলন রীতিকে অল্পাধিক পরিমাণে দাম্পত্য মিলনের সামিল করা হইয়াছে। কোন যুবতীকে তাহার পিতামাতার গৃহ হইতে আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করিয়া বা পরাজিত করিয়া হরণ করিয়া লইয়া যে বিবাহ তাহাকে আসুরিক বিবাহ কহে। (১৭)

বাইবেলেও এইরূপ নজীর বিস্তৃত আছে। এই ভাবে বেঞ্জামিন জাতিরা জাবেস জিলাদের অধিবাসীদের হত্যা করিয়া তাহাদের চারিশত যুবতী হরণ করিয়া পত্নীর অভাব পূরণ করিয়াছিল। আর একবার বিশ্বেষের কোন ভোজে বেঞ্জামিনরা বহু নারী হরণ করিয়া লইয়া যায়।

ইসরালিটরা মিডিয়ানিটদের সমূলে পুরুষ হত্যা করিয়া তাহাদের শিশু, নারী, পশু আদি সমস্ত লইয়া গিয়াছিল। (১৮)

কিন্তু ঈশ্বরাদিষ্ট মোসেস তাহাদিগকে বিবাহিতা নারী ও বালকদিগকে হত্যা করিয়া শুধু বালিকা ও অবিবাহিতা নারীদিগকে রাখিবার আদেশ দিয়াছিলেন। (১৯)

তিনি ষোড়শ সহস্র অবিবাহিতা নারীর মধ্যে ৩২টী পুরোহিতের জন্য, এবং যে সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য ছিল তাহার পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ দেবতার জন্য রাখিয়া ছিলেন। (২০)

লুণ্ঠিত নারী ও পশু সমান দরে ভেলা পূর্ব্বের আরবদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। (২১)

যুদ্ধে বন্দী করা জগতের সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল। "Duan Eiranash" নামক পুরাতন আইরিস কবিতায় পিক্‌টদিগের গেলদের নিকট হইতে তিনশত নারীর হরণ ব্যাপার বর্ণিত আছে। তাহারা এই ভাবে নারী বর্জ্জিত হইয়া আইরিসদের সহিত মিলিত হইয়াছিল।

(১১) Laing, Hist. Univ. des voy, Vol. xxviii. p. 31.
(১২) Fitzeroy, voy. Beagle, Vol. ii. p. 182.
(১৩) Fitzeroy, loc. Cit., Vol. ii. p. 205.
(১৪) Mc Lannan, loc. Cit., p. 48.
(১৫) Mc Lannan, Primitive marriage p. 71.—Lewis & Clarke, Travels to the Source of the Missouri River, Vol. i. p. 231.
(১৬) Hist. univ. desvoy. vol. xxvii. P. 130

(১৭) Code of Manu, Book iii P. 33.
(১৮) Numbers, Ch. xxxi. Ver. 7—9.
(১৯) Ibid. Ver 15—18.
(২০) Ibid. Ver. 40—47.
(২১) R. Smith, Kinship, Etc.

শিক্ষার মিলনে আধ্যাত্মিকতা ও আধিভৌতিকতা

(আলোচনা)

(শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু এম্‌.এ)

বিগত কয়েক বৎসরের বিশ্বগ্রাসী ইউরোপ বিপ্লবে, শুধু আমাদের নয়, জগতের অনেকেরই ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি সন্দেহ আসিয়াছে। অবশ্য সন্দেহ ১৯১৪ সালে যে প্রথম সূচিত হয় তাহা নহে। খুঁজিতে গেলে রুশো ভল্‌টেয়ারের কালে যাইয়া পৌঁছান যায়। তারপর উনবিংশ শতাব্দীতে সোসিয়ালিজ্‌ম্‌ নামে সমাজে সাম্যপ্রতিষ্ঠার যে নূতন মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছে, তাহার দ্বারাও পাশ্চাত্য সভ্যতার নানারূপ বিশ্লেষণ হইয়াছে। আর একদিকে ডারুইন প্রভৃতি মানবের অন্তঃ প্রকৃতিতে প্রাকৃতিক নিয়ম পরম্পরার ফলাফল ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, এইরূপ ধরণের উপর যে নূতন জীবন সংগ্রামের (Struggle for existence) ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের (Natural Selection) দর্শন ব্যাখ্যা করিলেন, তাহার ভীষণ পরিণতি দেখিলাম জার্ম্মানীর নব আভিজাত্য দার্শনিক (Neo-aristocratic philosopher) নীট্‌শেতে। এদিকে আবার সোসিয়ালিজ্‌ম্‌ সততা ও মানব অন্তর্নিহিত সত্যধর্ম্মের উপর অস্বাভাবিক শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল। রাশিয়ার জগৎপ্রসিদ্ধ ঋষি-কল্প টলষ্টয় ইহার প্রধান পুরোহিত ছিলেন। এই সমস্ত বহু ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ তত্ত্ব অনেকেই কোনদিনই বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখেন নাই,—অনেকে অবসর পান নাই, অনেকে আবশ্যক বোধ করেন নাই ;—আবার অনেকে ধার্ম্মিকতার বশে সমস্ত কথা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আমরা এখানে বসিয়া দু'একখানা পুস্তকের পাতা উল্টাইয়া কিছু কিছু পাঠের আনন্দ লাভ করিয়াছি মাত্র। তখন ভাবি নাই যে এই দুই ভাবের মহাসংঘর্ষে একদিন বেলজিয়ামের বুকের উপর দিয়া রক্তের স্রোত বহিয়া যাইবে। আজ আপাত-দৃষ্টিতে ডিনামাইটের শব্দ ও মেশিনগানের ঝন্‌-ঝনা থামিয়া গেলেও, সোসিয়ালিজ্‌ম্‌ ও ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্‌ এর দ্বন্দ্ব থামে নাই। এখনও ন্যাশানালিজ্‌ম্‌ বলিয়া আর একটী জীব উভয়েরই পদতলে বহুল পরিমাণে বিস্ফোরক পদার্থ জমা করিয়া রাখিতেছে।

'শান্তি শান্তি' বলিয়া জগৎ চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। শান্তি সম্ভব কি না সে বিষয় লইয়া নানা জল্পনা চলিতেছে। ডারুইনের মতাবলম্বিগণ বলিবেন—প্রতিমুহূর্ত্তের সংগ্রাম বিশ্বের নিয়ম। নীট্‌শে ত পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছেন, 'War is a biological necessity'—সংগ্রাম জীবনের জন্যই আবশ্যক। অপর দল বলিবেন 'তাহা নহে—জগতে প্রাচীন কালে লোকে যুদ্ধকেই সমাজের সাধারণ অবস্থা বলিয়া মনে করিত, এবং ওরূপ ভাবে জীবন সংগ্রামের দর্শন দিয়া ব্যাখ্যা করিয়া প্রকৃত পক্ষে তোমরা সেই প্রাচীন কালেই ফিরিয়া যাইতেছ। তোমাদের এরূপ মত-বাদের প্রকৃত কারণ তোমাদের নিজ নিজ অন্তঃকরণের স্বার্থান্ধ দাম্ভিকতা। তোমরা মানব হৃদয়ের মঙ্গলমূর্ত্তি ভগবানের আসন বসাইয়াছ আত্মপ্রভুর প্রতিষ্ঠা। কল্যাণ যাহা তাহা বিসর্জ্জন দিয়া তোমরা সাধনার বস্তু করিয়াছ অতৃপ্ত ভোগলালসা। তাই স্নেহের বাঁধনে যে প্রেমলাভ তাহা তোমাদের ধারণার বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে।'

কিন্তু ইহাও পুরাণ কথা। মানুষ আর যাহাই

লাভ করুক তৃপ্তি বলিয়া কিছু কখনও পায় নাই। তাহার সন্ধান কেহ দিতে পারিলে মানুষ অস্ত্র সব বোধ হয় ছাড়িতে পারে। ইউরোপের সংগ্রামে আমরা বুঝিয়াছি ইউরোপও এ নিয়মের বহির্ভূত নয়। ইউরোপকে 'ভূতের ধর্ম্ম' পাসনে মস্ত বলিয়া গালা গালি দিয়াছি, এবং তাহাই এই বিপ্লবের মূল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি। কিন্তু তবুও বুঝিয়াছি যে ঠিক কারণটা খুঁজিয়া পাই নাই। ভারত কখন তৃপ্তির সন্ধান পাইয়াছিল কি না জানি না। ইউরোপ ও ভারতের পন্থায় পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কোথায় তাহাও ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। অনেকে ইউরোপের জীবনের ধারার দোষ দেখাইয়া থাকেন। অনেকে বলেন ইউরোপ মানুষের জীবনকে ভগবানহীন করিয়া পার্থিব মিথ্যা সুখের আশা মরীচিকায় মুগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে,—এইজন্য তাহাদের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা এবং শিক্ষনীয় বস্তুও দূষণীয়, অতএব ত্যাজ্য।

এ সমস্ত কথাই মীমাংসা সাপেক্ষ। ইহার প্রত্যেকটীর পক্ষে বিপক্ষে অনেক কথা বলিবার আছে। ইহার বহু বিষয়ের অনুসন্ধান আবার প্রকৃত পক্ষে নিজের প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করে। সে প্রত্যক্ষ অবশ্য প্রকৃষ্ট রূপে করিবার ক্ষমতাও থাকা চাই। তাই আমরা রবীন্দ্রনাথের ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার বিষয় জানিবার জন্য আশাপথ চাহিয়া ছিলাম। ভাবিয়াছিলাম যদি বাঙ্গালার বরেণ্য সন্তান এই জগৎ সমস্যার প্রকৃত মীমাংসা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন।

আজ আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই ইংরাজি শিক্ষার বিরুদ্ধে মত খুব জোর গলায় প্রচার করিতেছেন। অবশ্য ইহাও নূতন নহে। সত্য কথা বলিতে কি ইংরাজ রাজত্বের প্রথম দিন হইতে এ মত চলিয়া আসিতেছে। যদিও আজ ভারতের প্রকৃত মঙ্গলকামী পরম নিঃস্বার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ-স্বরূপ অনেকেও এই কথা বলেন। তাহা হইলেও, এক একবার মনে হয়, শিক্ষা যদি জ্ঞান চর্চ্চা হিসাবে হয় তবে তাহার আবার জাতীয়তা কি?—রবীন্দ্রনাথ জগৎ সমস্যার মীমাংসা স্বরূপ প্রচার করিলেন 'শিক্ষার মিলন।' প্রথমেই মনে হইল, যখন 'মিলন' শব্দ ব্যবহার হইল তখন কি বুঝিতে হইবে যে উহার আবার জাতিভেদ আছে!—তবে যদি শিক্ষা অর্থে সাধারণ দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিধি ব্যবস্থা বুঝি, যদি সাধারণ সাম্প্রদায়িক আচার ব্যবহার বুঝি, তাহা হইলে অবশ্য ওরূপ ভাষা ব্যবহার করা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও 'শিক্ষার মিলনে' ঠিক সে মিলনের কথা বলেন নাই। তা যদি না হয় তবে বিশ্ববিদ্যালয়েও ত ক্যান্ট ও সাংখ্য বেদান্ত এক সঙ্গেই পড়া হইয়া থাকে এবং হইবেও।

একখানি বইতে একদিন পড়িতেছিলাম শিক্ষার সংজ্ঞা। লেখক বুঝাইতেছেন যে, শিক্ষা প্রকৃত পক্ষে একপ্রকার অস্ত্র। মানুষ অস্ত্র সংগ্রহ করে মাত্র, কিন্তু মানুষের প্রকৃতির তাহাতে বিশেষ কিছুই আসে যায় না। অস্ত্র যেমন মহামঙ্গল সাধনও করিতে পারে আবার মহা অনিষ্টও করিতে পারে, শিক্ষাও ঠিক তদ্রূপ। ডিনামাইট পাহাড় উড়াইয়া রেলের পথ বসাইয়াছে, পানামা খাল কাটিয়াছে; আবার সেই ডিনামাইট কত বড় বড় দুর্গ প্রাকার ভাঙ্গিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ সংহার করিতেছে। সাধারণ ছুরি, কাঁচি, দা, বটী মানুষের জীবনের নিত্য সহায়; কিন্তু ইহাদের যে কোনটীর দ্বারা আবার মানুষের ইহ জীবনের সকল খেলার শেষ হইয়া যাইতে পারে। তেমনি বিজ্ঞান শাস্ত্র পড়িয়া তুমি মানুষের উপকারও করিতে পার অপকারও করিতে পার; মানুষের জীবন রক্ষাও করিতে পার, মানুষ খুন করিতেও পার। দর্শনশাস্ত্র পড়িয়া কেহ সাধু সংযমী মহাপুরুষ হইতে পারে; আবার কেহ বা দর্শনের কূট তর্কের সাহায্যে চোর, ডাকাত, বদমায়েস লম্পটচূড়ামণি, সবই হইতে পারে। অবশ্য এরূপ ব্যবহারের তারতম্য অনুসারে শিক্ষার গৌরব

কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। অপব্যবহারে লাগাইবে এই ভয়ে কাহাকেও শিক্ষাপ্রাপ্তি হইতে দূরে রাখা কখনও যুক্তিযুক্ত হইবে এরূপ কিছুতেই মনে করিতে পারি না। শিক্ষা চিরদিনই মানবের মহা সম্পদ, তাহার ব্যবহার তাহার হাতে, তাই বলিয়া মানুষকে তাহা হইতে বঞ্চিত করা মনুষ্যত্বের কার্য্য হইবে বলিয়া মনে হয় না।

অবশ্য এ সংজ্ঞায় শিক্ষা মানে জ্ঞানার্জ্জন। আমরাও অনেক স্থলে শিক্ষা এই অর্থে ব্যবহার করিব। রবীন্দ্রনাথও 'শিক্ষার মিলনে' ব্যবহারিক জীবন যাপনের আচার পদ্ধতি 'শিক্ষা' অর্থে ধরেন নাই। তিনি ধরিয়াছেন, যতদূর বোঝা যায়, জীবনের ধারা। পাশ্চাত্যের 'মানব পুথীতে', পাশ্চাত্যের জীবন ধারায় তিনি দেখিয়াছেন 'কুবের ধর্ম'; আর প্রাচ্যে দেখিতেছেন বর্ত্তমানে 'কর্ত্তাভজা'। পাশ্চাত্যের 'কুবের ধর্ম'ও অবশ্য তাহাদের গোড়ার প্রকৃত লক্ষ্য নহে, আর প্রাচ্যের 'কর্ত্তাভজা' তাহাদের প্রকৃত ধারার অপভ্রংশ অবস্থা মাত্র। তিনি অবশ্যই এ উভয়ের মিলনে মানব কল্যাণের সূচনা দেখিতে পান নাই। তিনি চান প্রাচ্যের প্রাচীন আধ্যাত্মিকতা ও পাশ্চাত্যের মূল আধিভৌতিকতার মিলন। যতদূর বুঝিলাম, তিনি এই মিলনে মানবের উন্নতিমূলক প্রকৃত সুখ মিলিবে বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাই তিনি মনে করেন প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার সুখ হাওয়ায় উড়িয়া যাইবে, আর পাশ্চাত্যের আধিভৌতিকতার সুখহীন প্রকাণ্ড অট্টালিকা গড়িয়া উঠিবে। 'তাই সেদিন সেই ভ্রূকুটি-কুটীল অভ্রভেদী ঐশ্বর্য্যের সামনে দাঁড়িয়ে ধনমানহীন ভারতের একটী সন্তান প্রতিদিন ধিক্কারের সঙ্গে বলেছে, তবঃ কিম!' আর সেই 'ধনমানহীন' ভারতে দেখিয়াছেন অন্নের অভাবে যাহারা মরিতেছে তাহাদের পাতকুয়ার কথা বলিলে বলে, 'আজ্ঞে, কর্ত্তার ইচ্ছা হলেই হয়।'—অবশ্য এ দুয়ের মিলন তিনি চাহেন না। তিনি যাহা চান তাহা বোধ হয় প্রাচ্য 'ধর্ম্মপ্রাণ' ও পাশ্চাত্য 'জড়-বিজ্ঞান' এর সংমিশ্রণ।

আমরা এই দুইটী কথার একটু বিচার করিতে চেষ্টা করিব। প্রথম কথা রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিতেছেন তাহাও নূতন নহে। রাস্কিন, কার্লাইল প্রভৃতিও এই ধরণের কথাই বলিয়া গিয়াছেন। শুনিলাম করাসী দেশে একজন অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। যাক, পুরাণ কথা হইলেও তাহা ফেলিয়া দিবার জিনিষ নয়। এখন ভাবিয়া দেখিতে হইবে 'আধ্যাত্মিক' ও 'আধিভৌতিক' বলিতে আমরা কতটুকু কি বুঝি। 'আধ্যাত্মিক' এর সম্যক ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধের ভিতর কোথাও করেন নাই। বল্‌টেয়ারের সেঁকো বিষ প্রয়োগে ভেড়ার পাল মারিবার উপায়, এবং পাশ্চাত্য ভূতের ওঝা ও মারণ উচাটন মন্ত্রের তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইতে মনে হয় যে ভারতবাসীর উক্তপ্রকার মন্ত্রাদির প্রতি বিশ্বাস তিনি আধ্যাত্মিকতা মনে করেন। কিছু পরেই দেখি তিনি বলিতেছেন 'দেবতার অধিকার আধ্যাত্মিক বহলে, আর দৈত্যের অধিকার আধিভৌতিক বহলে। দৈত্য বলচি আমি বিশ্বের সেই শক্তি রূপকে যা সূর্য্য-নক্ষত্র নিয়ে আকাশে তালে তালে চক্রে চক্রে লাটিম ঘুরিয়ে বেড়ায়।' এখানে আধিভৌতিকের একটা অর্থ কতকটা বুঝা গেল। কিন্তু তাহাতে আধ্যাত্মিক যে কি তাহা পরিষ্কার হইল না।

বাস্তবিক আধ্যাত্মিকতা' কি? 'আধ্যাত্মিকতা' ও 'আধিভৌতিকতার' একটা সীমারেখা কেহ টানিয়া দিবেন কি? তাহা হইলে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সকল বিরোধের মহজ সরল মীমাংসা মুহূর্ত্ত মধ্যে হইয়া যায়। যদি মনের উন্নতি, চিন্তা-শক্তির সম্যক উৎকর্ষ সাধন প্রভৃতিকে আধ্যাত্মিকতা বলি তাহা হইলে পাশ্চাত্য জগৎকে বড় ছোট বলিয়া মনে হয় না। যদি ভারতবর্ষে বহু ধর্ম্মাচার্য্যের

আবির্ভাব, এবং বহু জটীল ব্যাখ্যা সমন্বিত বহু প্রকারের ধর্ম্ম প্রচলনের জন্য ভারতবর্ষকে আধ্যাত্মিক মনে করি, তাহা হইলেও ইউরোপ কম যায় না। আর যদি উপনিষদ, ষড় দর্শন প্রভৃতি একদিন ভারতবর্ষে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল বলিয়া আমরা আমাদের দেশ বড় আধ্যাত্মিক ভাবিয়া গৌরব অনুভব করি, তাহা হইলে যেখানে ক্যাণ্ট, হেগেল, কম্‌টে প্রভৃতি জন্মিয়াছিলেন, সেদিনও যেখানে বার্গসঁ জন্মিয়াছেন, সে ইউরোপকেই বা আধ্যাত্মিক মনে করিব না কেন?—বরং এভাবে ধরিতে গেলে ইউরোপকে আজও আধ্যাত্মিক বলিতে হয়।—এ সব ছাড়া মানুষের সামাজিক চরিত্রের কথা এখানে ধরিব না।

আর একভাবে দেখিতে গেলে,—যদি ইউরোপের বড় বড় অট্টালিকার দরুণ তাহাকে আধিভৌতিক বলিতে হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন আসে ভারত যেদিন বড় উন্নত ছিল সেদিন কি কেহ বিলাস ভবন তৈয়ারী করিত না? মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের যে সভার উল্লেখ আছে সেটা কি শুধুমাত্র আধ্যাত্মিকতার একটা উদাহরণ? অজন্তার গুহাও ইরোরার প্রস্তর মন্দিরকে যদি ভগবানের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে বলিয়া আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন স্বরূপ মনে করা যায়, তাহা হইলে রোমের সেণ্ট পিটার্স, রীমস ক্যাথিড্রাল, কোলন ক্যাথিড্রাল প্রভৃতিই বা কি অপরাধ করিল? যদি এরোপ্লেনে চড়াটা পাশ্চাত্যের আধিভৌতিকতার একটা বড় লক্ষণ হয় তাহা হইলে রামায়ণের পুষ্পকরথকে কি মনে করিব? এখানে একটা অন্যায় কথা মনে আসিতেছে.—আজ যে আমেরিকার পঞ্চাশতালা বাড়ীর দিকে চাহিয়া বলিতেছি 'ততঃ কিম্!' সেটা ত কথামালার শৃগালের আঙ্গুর ফল ভক্ষণে অসমর্থ হওয়ার মত নয়?

এই সমস্ত প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজিয়া পাই নাই। রবীন্দ্রনাথও সেগুলি পরিষ্কার করিয়া যেন নাই। বরং অনেক স্থলে উপমার বাহুল্যে জিনিষগুলি আরও জটীল করিয়া তুলিয়াছেন। অনেক সময় মনে হইয়াছে যে আমরা যে আধ্যাত্মিকতা ও আধিভৌতিকতার পার্থক্যের বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক করি তাহার ভিতর কেবল ভাষার মার পাঁচ ভিন্ন আর কিছুই নাই। মনে হয় সাংখ্যকার যে প্রকৃতি পুরুষের অন্যোন্য নিত্য সম্বন্ধের কথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আধ্যাত্মিকতা ও আধিভৌতিকতার সম্বন্ধও তাই। মানুষের কোন কার্য্যই ঐ দুইটীর কোনও একটী বাদে হইতে পারে না। মানুষ সর্ব্বত্রই মানুষ। তাহার সাধারণ প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য আজও পর্য্যন্ত দেশ কাল পাত্র ভেদে পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিচয়ের সংঘাতের ভিতরেও খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে কি না জানি না। দর্শণের বিশ্লেষণে যতদূর বুঝা যায় মানুষ আধিভৌতিকতা বা আধ্যাত্মিকতা ইহাদের কোনটাকেই কোন দিন নিজের ভিতর হইতে বাদ দিতে পারিবে না।

আমেরিকার পঞ্চাশতালা বাড়ীর ভিতর চিদানন্দ নাই। আমরাও কোন দিন সম্যক চিদানন্দ লাভ করিয়াছিলাম কি না বলিতে পারি না। আজ পাশ্চাত্যদেশের যে ধারাকে আধিভৌতিকতা বলিতেছি তাহা ভারতের গৌরবের দিনে এখানে ছিল। যে জিনিষটী পাশ্চাত্যের নাই মনে করা হইতেছে তাহা আমাদের সেই দিনে ছিল কি না তাহার প্রমাণ কি মাত্র তন্ত্রপূজা আর পুরাণাদি? তবে পাশ্চাত্যেরই বা তাহা নাই মনে করা কেন বুঝিলাম না। দুর্দ্দমনীয় অর্থলোভ, অনেকে মনে করেন, পাশ্চাত্যের অন্তঃকরণের কোমল বৃত্তি নিচয়ের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে। তাহাদের স্নেহ মমতা, প্রীতিমূলক প্রকৃত আনন্দ, পরিজন সঙ্গশূন্য সমস্ত লুপ্ত হইয়া হৃদয়ে মাত্র পশু প্রবৃত্তি স্থান পাইয়াছে। আমাদের কি লোভ ছিল না, অথবা আজও কি লোভ নাই? অথবা যদি নূতন করিয়া হইয়া থাকে তাহা কি পাশ্চাত্য শিক্ষারই কুফল? আজ এ প্রশ্ন কাহার

কাছে জিজ্ঞাসা করি, কে মনের সমস্ত আবিলতা দূর করিয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে সমগ্র মানব হৃদয়ের দিকে চাহিয়া আমার এ প্রশ্নের সত্য উত্তর দিবে?

আমাদের যে লোভ ছিল একথা রবীন্দ্রনাথও অস্বীকার করেন নাই। 'গোড়ায় তার বিশ্বাস ছিল জগতে যা যা কিছু ঘটচে এ একটা অদ্ভুত জাদু শক্তির জোরে; অতএব তারও যদি জাদু শক্তি থাকে তবেই শক্তির সঙ্গে অনুকূল শক্তির যোগে সে কর্ত্তৃত্ব লাভ করতে পারবে।' ফলে আমরা জাদু মন্ত্রই বেশী করিয়া শিখিয়া থাকি আর যাহাই করিয়া থাকি, একথা তিনি স্বীকার করিতেছেন যে পার্থিব সুখ সম্পদ আমরাও চাহিয়াছিলাম। প্রকৃত পন্থা ধরি নাই, ফলে পার্থিব সম্পদ লাভে বঞ্চিত হইয়াছি। এমন কি সেই জন্য বলিতে হইবে যে আমাদের আধ্যাত্মিক গৌরব সেই পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে?

মানুষের অন্তঃকরণে সব চাইতে বড় প্রবৃত্তি হইতেছে সমাজে আত্ম প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা। নীট্‌সে ইহাকেই বোধ হয় 'will to power' বলিয়াছেন। এ জিনিষটা কেহ কোন দিন ত্যাগ করিতে পারে নাই, পারিবেও না। যে ভাবেই হউক্ মানুষ ইহা লাভ করিবার উপায় খুঁজিয়া বেড়াইবে। ভ্রান্ত পথে ঘুরিয়া নিজের সর্ব্বনাশের পথই হয় ত পরিষ্কার করিয়া লইবে, তবুও অন্তরে ঐ ভাবই প্রবল। অবশ্য সকলে প্রথমে সহজ সরল উপায় গুলি হাতড়াইয়া দেখে। ডিমোক্রাইট অল্প কেহ প্রথমেই ছুঁড়িতে যায় না। সংসারত্যাগী অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীর মন হইতেও এ প্রবৃত্তি দূরীভূত হয় না। শরীরের একটী জীবকোষেও যতক্ষণ জীবন থাকে ততক্ষণ মানুষ সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিবে। যাহা অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য, তাহার ত্যাগের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় কোন সুফল ফলিবে বলিয়া মনে হয় না। বরং সত্যের খোলা রাস্তায় দাঁড়াইয়া সকলকে প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হইতে দেওয়াই উচিত বলিয়া মনে হয়।

যে সময় ভারতবাসী শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লই, দেখিতে পাই সে সময় তাহাদের দৈনন্দিন কাজ ছিল শুধু মাত্র বংশগত মিথ্যা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করা। দিন দিন পঙ্‌ক্তী আঁকিতে আঁকিতে সমাজের বুকে শুধু আঁক চোক ছাড়া আর কিছুই পড়িল না। হিন্দুদের সামাজিক জাতিভেদ ত শুনিতে পাই বহুকাল হইতে গুণ কর্ম্মের বিভাগের পরিণতিতে বংশে যাইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে তাহার বিচার করিতেছি না। কিন্তু মনে হয় এ কথা সত্য যে দ্বিপ্রহরে আহারান্তে তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়া সমাজকর্ত্তাগণ কাহার সমাজে কোথায় কতটুকু সম্মান লাভের অধিকার, কোথায় কাহার কতটুকু ঠাঁই, কে কতটুকু ফরাসের কোণে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিবে, কাহাকে সমাজ হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে, কাহার ধোপা নাপিত বন্ধ করিতে হইবে, কাহার মুখদর্শন করিলে মহাপাপ হইবে, তাহারই মীমাংসা করিয়া, নিজ নিজ বাড়ীর ভিতরের দিকে মোটেই না চাহিয়া, অথবা নিজ নিজ চরিত্রের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া বড় সুখে দিন কাটাইয়া দিতেন। যদি ইহাকেই আধ্যাত্মিকতা বলা যায় তবে ইউরোপেই বা ইহা নাই বলিব কেন বুঝিয়া পাই না! সেখানেও দেখি ডিউকের আসন, মার্কুইসের আসন, আর্লের আসন, ভাইকাউন্টের আসন, ব্যারনের আসন, ব্যারনেটের আসন, নাইটের আসন সব হিসাব মত বংশ মর্য্যাদার পরিমান ঠিক তুলাদণ্ডে মাপিয়া বংশ পরম্পরায় সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। ইউরোপের অনেক দেশে দেখিলাম বড় ঘরের ছেলে, প্রেমের আবেগে কোন দরিদ্রের কন্যাকে বিবাহ করিলে সন্তানগুলি উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। ইহাই কি আধ্যাত্মিকতা? ইহাই কি আমরা পাশ্চাত্যকে দান করিতে যাইব? ইহারই বিনিময়ে কি তাহার কাছে দাবী করিব তাহার বিজ্ঞান চর্চ্চা?

অথবা যে প্রীতি প্রেম স্নেহ মমতা, যাহাদ্বারা একে অন্যের সহিত মিলিয়া প্রভুর নন্দনকানন সৃজন করে তাহাই কি আমাদের খুব বেশী পরিমানে আছে? আমেরিকার পঞ্চাশতালা অট্টালিকা, আর ছয় হাজার মাইল ব্যাপী টেলিফোন তার কি সত্যই তাহার অন্তরের সৌন্দর্য্য বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে?—একটা দুঃখের কথা অনেকবার মনে হইয়াছে। কুপারের on the r·ceipt of my mother's picture (স্বর্গগতা জননীর প্রতিমূর্ত্তির প্রতি) এর মত কবিতা বাঙ্গালায় পড়ি নাই। জানি না, সংস্কৃত সাহিত্যে কোথাও এমন সরল স্নেহের আবেগ কবিতায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে কি না! শুনিয়াছি পুরাণাদিতে বহু সতীর গল্প আছে। শুনিয়াছি নাকি প্রাচীন ভারতের রমণীগণ স্বামীর জন্য হাসিমুখে আগুনে ঝাঁপ দিতে পারিতেন। কিন্তু শুনি নাই যে কোন জননী সন্তানের জন্য চোখের জলের বেশী কখন কিছু ত্যাগ করিয়াছিলেন। ভিক্টর হিউগোর ল্যা মিজারেবল পুস্তকে পড়িয়াছি ফ্যান্টিন তাহার কন্যার জন্য একরূপ তাহার শরীর টুকুরা টুকুরা করিয়া কাটিয়া দিয়াছিল, তাহার চুল কাটিয়া দিয়াছিল, দাঁত উপড়াইয়া দিয়াছিল। আজও পর্য্যন্ত, ভারতীয় কোন গ্রন্থে এ সহজ আদর্শ মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে কি না জানি না। যদি কেহ বলেন জননীস্নেহ প্রাকৃতিক সাধারণ নিয়মে অবশ্যম্ভাবী, এবং পুস্তকের এর উদ্দেশ্য শিক্ষা দেওয়া; অতএব অবশ্যম্ভাবী স্বাভাবিক বিষয়ের জন্য ব্যগ্র হইবার কোন দরকার নাই। তাহা হইলেও দেখি কৃত্রিম নীতিমূলক চরিত্র মাহাত্ম্যও ইউরোপে কম নয়। ভারতবর্ষে সতীদাহের একটু বাড়াবাড়ি দেখিতে পাই। ইউরোপকে কি শুধু মাত্র সতীদাহের কুপ্রথার দরুণ আধিভৌতিক বলিয়া মার্কা মারিয়া দিব? সেখানে ভ্রাতৃপ্রেম, স্বদেশ প্রেম তাহাদের পুস্তকাদির ভিতর দিয়া যাহা দেখিতে পাই সে ত আমার দেশের চাইতে অনেক বেশী! সাধারণ বৈরাগ্যের ভাব, ধর্ম্মপ্রেম প্রভৃতি পাটিগণিতের হিসাবে মিলাইয়া দেখি নাই। তবে যে বড় বেশী একটা পার্থক্য হইবে এরূপ মনে করিতে পারি না। পারিবারিক পবিত্রতার একটা গর্ব্ব আমরা বড় জোর গলায় করিয়া থাকি। জানি না এ পবিত্রতার অর্থ শুধুমাত্র ঘেরাটোপ কি না। খাওড়ী ননদিনীর গল্প অবশ্য পুরাণের কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বউতে বউতে ঝগড়াও কম দিনকার নয়। তাহা বাদে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মণ্ডিত ভ্রাতৃপ্রেম কি কখনও পারিবারিক জীবনে ফুল হয় না? আর এক দিক দিয়া চাহিয়া দেখিলে মনে হয়, উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে বহুবিবাহ এবং অন্য শ্রেণীর মধ্যে 'তরা'ও মেয়ে বিবাহ কি পবিত্রতার বড় গৌরবময় প্রমান বলিয়া পরিগণিত হইবে! ইউরোপে কি এতটুকু পবিত্রতাও নাই? ইউরোপ আমেরিকার অনেক যায়গায় আজকাল আইন দ্বারা গণিকার ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমাদের স্বর্গের কল্পনাতেও বেশ্যা আছে, যাত্রা কালে গণিকা দর্শন শুভ, দুর্গা পূজায় বেশ্যার দ্বারের মাটী লাগে। ইউরোপ কি এরূপ বহু জটীল ব্যাধ্যা সাপেক্ষ পবিত্রতাও রক্ষা করিতে পারে নাই? এই পবিত্রতাই কি আধ্যাত্মিকতা? আমরা কি ইহারই বিনিময়ে ইউরোপের নিকট দাবী করিব তাহার বিজ্ঞান চর্চ্চা?

জ্ঞান-চর্চ্চা মানুষের জন্মগত সাধারণ অধিকার, এখানে বিনিময়ের কথা তোলেন কেন বুঝিলাম না। বিজ্ঞানের উন্নতি ইউরোপ করিয়াছে, আমিও করিব, জগতের কেহই তাহাতে বাধা দিতেছে না। ইহা সর্ব্বমানবের জিনিষ, ইহাতে কাহারও কোন একচেটীয়া অধিকার নাই। ইহাতে ভিক্ষার কথা কিছু নাই। অথবা জ্ঞান চর্চ্চাকে সাধারণ ধন সম্পদের কোঠায় ফেলিয়া বাস্তবিক জিনিষটাকে আমরা বুঝিতে ভুল করিতেছি। রবীন্দ্রনাথের বড় দুঃখ হইয়াছে যে 'ভারতের বাণী' জগৎকে

শুনাইতে পারিতেছেন না। ইহাতেই বা দুঃখ কি আছে? কোন্ বাণী কাহার নিজস্ব? ব্যাখ্যা করিয়া ও আজকাল সহস্র কথাই অনেকে পুরাণের খাতায় ফেলিয়া দিয়া থাকেন। পাশ্চাত্যের কেহ যদি ভারতের দুয়ারে আড়ি পাতিয়া বলে 'এ ত সব আমারই বাণীর ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, যেন যন্ত্রের মত শোনাচ্ছে।' তাহা হইলে ঠিক একই কথা ব্যাখ্যা করিয়া পাশ্চাত্যকে শুনাইয়া দেওয়া যায়। অথবা এ রেষারিষি কেন? এ অহঙ্কার জ্ঞানের ক্ষেত্রে আবশ্যক নাই, ভালও নহে। ইহার দ্বারাই শিক্ষার আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হয়। যে ভৌগলিক গণ্ডী রবীন্দ্রনাথ ভাঙিয়া ফেলিতে চাহেন, তাহারই গাঁথনী ইহাতে আরও শক্ত হইয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। আর এক ভাবে ভাবিয়া দেখিলে, এখানে রবীন্দ্রনাথ ভারতের বাণী বলিতে কি বুঝাইতে চাহেন তাহা ধরা গেল না। যতদূর মনে হয় তিনি যেন নূতন করিয়া ভারতের একটা বাণী সৃষ্টি করিতে চাহেন। বোলপুরে পাশ্চাত্য দেশ হইতে জন কয়েক ছাত্র ও অধ্যাপক আসিলে সে বাণী ফুটিয়া উঠিবে কি না চিন্তা করিয়া তাহা পাই না। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মিলন, এ মন-গড়া বাণী লইয়া কতদূর সম্ভব, তাহা সেই বাণীটীর মূর্ত্তি গড়িয়া না ওঠা পর্য্যন্ত ঠিক বলিতে পারি না।

এ সমস্ত কথা ছাড়িয়া ধরিলেও, বাস্তবিক ভারতের বাণী কি? শুধু কথার প্যাঁচে 'সম্মান উপেক্ষা করা চলে' না বলিয়া একবারও স্থির ভাবে কেহ কি ভাবিয়া দেখিবেন যে বহু ধর্ম্মবাদী বহু সম্প্রদায়ের নিবাসভূমি ভারতবর্ষে আজও পর্য্যন্ত কোন একটা বিশেষ বাণী গড়িয়া উঠিয়াছে কি না? বহু ভাষা, সাধারণ আচার-ব্যবহার-গত বহু বৈষম্য ও জীবনের ধারার বহু জটীলতার ভিতর ভারতের কোন নিজস্ব বাণী গড়িয়া ওঠা সম্ভব কি না তাহাও একবার ভাবিয়া দেখা দরকার। আবার মনে হয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে এ অহঙ্কার সঙ্কীর্ণতা, মৈত্রভাবেরই পরিচায়ক। শিক্ষা এক, তাহা চিরদিনই এক থাকিবে। তবু হয় পাছে জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের আশায় জগৎকে 'শিক্ষার মিলন' দান করিব বলিয়া গর্ব্ব করিতে যাইয়া সেই শিক্ষার বিরোধই আগে ঘটাইয়া বসি! ইহাকে ভাঙিয়া আবার গড়িবার ক্ষমতাও যদি থাকে, তাহা হইলেও বা তাহাতে বাহাদুরী কি ভাবিয়া পাই না।

যদি মানব সমাজের উপকারার্থে কিছু করিবার থাকে তাহা হইলে, মনে হয়, জীবন-সংগ্রাম সত্য হইলেও, মানবমিলনের কোন সহজ পথ যদি কেহ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন তবে তিনিই মানব-সমাজের সব চাইতে বড় উপকার করিবেন। ভারতবর্ষের দিকে চাহিয়া মনে হয়, যদি কেহ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের বিরোধ সাধনের কোন প্রকৃত পন্থা আবিষ্কার করিতে পারেন তবে, শুধু ভারতের নয়, সমগ্র জগতের মিলনের পথ তিনি পরিষ্কার করিয়া দিয়া মানব সমাজে প্রকৃত আনন্দের ধারা বহাইতে পারিবেন।

মণিকাঞ্চন

(উপন্যাস)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল)

পঞ্চাংশ :—

বিমল ও অপূর্ব্ব দুই সহপাঠী বন্ধু। বিমল, উন্নতমনা বলিষ্ঠ, অপূর্ব্ব, ক্রূর ও দুর্ব্বল। গ্রামের জোরে, লেখাপড়ায় কিছুতেই অপূর্ব্ব বিমলের সহিত পারিয়া উঠিত না বলিয়া সে বিমলকে হিংসা করিত এবং সুবিধা পাইলেই বিমলকে আঘাত করিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু বিমল কোনরূপ প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিত না। সে অপূর্ব্বকে সত্যই ভালবাসিত।

তাহাদের স্কুলের মনোহর পণ্ডিত মহাশয়ের একমাত্র কন্যা মায়া অতি শিশুকাল হইতে অপূর্ব্বর খেলার সাথী ছিল। সে সব সময় অপূর্ব্বর কাছে কাছে থাকিত। কিন্তু বিমল সেই গ্রামে আসিবার পর হইতে সে বিমলেরই বেশী ভক্ত হইয়া পড়িল। ইহাও অপূর্ব্বর হিংসার অন্যতম কারণ।

বিজয়মাধব বাবু কলিকাতার কলেজের অধ্যাপক। বিমলদের গ্রামে তাঁহার শ্বশুর বাড়ী। সে বাড়ীর মালিক এখন তিনিই। বিজয়মাধব বাবু নিজে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রের নাম হিমাংশু ও কন্যার নাম লতিকা। উভয়ে কলিকাতায় স্কুলে পড়ে। ছুটির সময় পিতামাতার সহিত গ্রামে বেড়াইতে আসে।

এখানে আসিয়া অপূর্ব্বর সহিত তাহাদের পরিচয় হয়, এবং লতিকা ও অপূর্ব্বর মধ্যে প্রীতির সঞ্চার হয়। এমন সময় হঠাৎ বিমলের সহিত লতিকার পরিচয় হয় এবং বিমলের পরিচয় পাইয়া লতিকা তাহার উপর আকৃষ্ট হয়। ক্রমে ক্রমে বিমল ও লতিকার মধ্যে ভালবাসা জন্মায়। অপূর্ব্ব তাহা বুঝিতে পারিয়া হিংসায় জ্বলিয়া পুড়িয়া অস্থির হইয়া উঠে। কিন্তু লতিকার পিতা বিজয়মাধব বাবু বিমলকে ভাল চোখে দেখিলেন না। তাহার কারণ বিমলের পিতার সহিত তাঁহার শ্বশুরের বিষয় লইয়া মনোমালিন্য হইয়াছিল এবং বিমলের পিতাকে তিনি ব্রাহ্মবিদ্বেষী বলিয়াই জানিতেন।

অপূর্ব্ব ও বিমল দুইজনে আই-এ পাশ করিয়া কলিকাতার কলেজে বি-এ পড়িতেছিল। লতিকা তখন ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশে পড়ে। বিজয়মাধব বাবুর ইচ্ছা পরীক্ষার পর অপূর্ব্বর সহিত লতিকার বিবাহ দেন। তাই তিনি কন্যাকে বিমলের সহিত বেশী মিশিতে দিতেন না। বিমলও কচিৎ লতিকাদের গৃহে যাইত। একদিন লতিকার একখানি পত্র পাইয়া সে বহুদিন পরে বিজয়মাধব বাবুর গৃহে গিয়া উপস্থিত হয়। বিজয়মাধব বাবু তাহাকে অপমানসূচক কথা বলিয়া বাড়ী ত্যাগ করিতে আদেশ দেন। বিমল রাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার পরই লতিকা কাহাকে কিছু না বলিয়া গৃহত্যাগ করে। পথে বাহির হইয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া বিমলের মেসের দিকে যাইতে যাইতে পথে বিমলকে দেখিতে পায় এবং সেই রাত্রেই বিমলের সহিত কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গ্রামের বাড়ীতে চলিয়া আসে।

হিমাংশু ও অপূর্ব্ব তখন বাজার করিতে বাহির হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া লতিকাকে দেখিতে না পাইয়া তখনই তাহারা দুইজন বিমলের মেসে গিয়া উপস্থিত হয় এবং সেখানে গিয়া জানিতে পারে বিমল ও লতিকা গোপনে গিয়াছে।

পরের দিন সকালের ট্রেণে অপূর্ব্বকে লইয়া হিমাংশু গ্রামের দিকে রওনা হয় এবং সেখানে আসিয়া দেখে লতিকা ও বিমল বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতেছে।

(২)

পরমেশবাবু ব্রাহ্ম। তাঁহার তিনটী কন্যা। বড় উর্ম্মিলার বয়স যখন বয়স ষোল সেই সময় ভবেশের সহিত তাহার প্রথম পরিচয় হয় এবং অতি সহজে একজন আর একজনের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং উহাই স্থির হয় যে ভবেশ দীক্ষা গ্রহণ করিয়া উর্ম্মিলার পাণিগ্রহণ করিবে। ভবেশের পিতা এ সংবাদ পাইয়া পুত্রকে পাঁচার টেলিগ্রাম করিয়া দেশে লইয়া যান এবং তাহাকে একপ্রকার জোর করিয়া মনোহর পণ্ডিত মহাশয়ের কন্যা মায়ার সহিত বিবাহ দেন। ভবেশ তারপর

কলিকাতায় ফিরিয়া আসে। তখন উর্মিলার সহিত তাহার সমস্ত ভ্রমে এমনই জটিল হইয়া উঠিয়াছিল যে উর্মিলাকে বিবাহ করিতে সে স্বাভাবতঃ বাধ্য। অথচ তাহার এ বিবাহের কথা শুনিলে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। তাই তখন তাহার বিবাহের কথা গোপন করিয়া গেল এবং মনে মনে স্থির করিল উর্মিলার সহিত বিবাহ হইবার পর তাহাকে সব কথা খুলিয়া বলিয়া তাহার কাছে ক্ষমা চাহিয়া লইবে। এমন সময় একদিন হিমাংশু বিমলকে লইয়া উর্মিলার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল, বিমলকে দেখিয়া তখনের মুখ শুকাইয়া গেল, কেননা সেই বিবাহের সময় বিমল উপস্থিত ছিল। তখনের প্রাণপণ চেষ্টা হইল যাহাতে বিমলের সহিত উর্মিলা কোনরূপ আলাপ পরিচয় না থাকে। এই লইয়া উর্মিলার সহিত তখনের অনেক বচসা হইয়া যায়।

কিছুদিন পরে পরমেশ বাবু কন্যার বিবাহের দিন স্থির করিয়া তখনকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন। তখনের তখন ভয় হইল। সে যে বিবাহিত তাহা সে পরমেশ বাবুর নিকট প্রকাশ করিতে গেল, কিন্তু পারিল না। যাহা হউক যথাসময়ে উর্মিলার সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল।

এ দিকে যশোহর পতিত মহাশয় বিমলের নিকট সংবাদ পাইলেন যে তখন গোপনে এক ব্রাহ্ম বালিকাকে বিবাহ করিতেছে। তিনি সেইদিনই কন্যা মাধবীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা রওনা হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে পরমেশ বাবুর গৃহে পৌঁছাইয়া তিনি শুনিলেন পূর্ব্ব রাত্রে উর্মিলার সহিত তখনের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পরমেশবাবুর সব শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং পতিত মহাশয় তাড়াতাড়ি কন্যার হাত ধরিয়া বাটী ফিরিলেন।

পরমেশবাবুর গৃহে পতিত মহাশয়ের সহিত তখনের সাক্ষাৎ হয়। তখন তাঁহাকে দেখিয়াই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইবার ভয়ে তখনই পরমেশবাবুর গৃহ ত্যাগ করে এবং বেলে গিয়া আশ্রয় লয়। সারাদিন ভাবিয়া শেষে স্থির করে যে সে একবার পরমেশবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং তাঁহাকে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়া ইহার একটা মীমাংসা করিয়া লইবে। এই সঙ্কল্প করে সে ধীরে ধীরে পরমেশবাবুর গৃহে প্রবেশ করে।

---

(১৩)

বিমল বারান্দা হইতে নামিয়া মাত্র কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় লতিকা দেখিল, ফটকের খানিকটা দূরে অপূর্ব্ব ও হিমাংশু। সে ব্যগ্র হইয়া ডাকিল, "বিমল দাদা।" বিমল ফিরিয়া দাঁড়াইতেই সে সহজ শান্তভাবে কহিল, "আমি বল্লাম বলে আপনি আমায় একলা ফেলে চলে যাচ্ছেন, বেশ লোক ত। ফিরে আসুন। না না আপনার আসতে হবে না, আমি যাচ্ছি। বাগানেই বেড়ান যাক।" এই বলিয়া সে বারান্দা হইতে নামিয়া চঞ্চলপদে বিমলের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। তার পর তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "চলুন বারান্দায় গিয়ে বসি।" এই বলিয়া টানিতে টানিতে তাহাকে বারান্দার উপর লইয়া গেল।

ঠিক সেই সময় অপূর্ব্ব ও হিমাংশু বাগানের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল, এবং লতিকাও বিমলকে তদবস্থায় দেখিয়া ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে বারান্দার দিকে অগ্রসর হইল।

বিমল এতক্ষণ তাহাদের দেখিতে পায় নাই। অদূরে পদশব্দ শুনিয়া চাহিতেই দেখিল, উভয়ে তাহাদের দিকে আসিতেছে।

বিমল লতিকার মুখের দিকে একবার চাহিল। লতিকা বেশ সহজভাবে কহিল, "দাদা আর অপূর্ব্ব বাবু আসছে না, চলুন না আমরা ওদের এগিয়ে নিয়ে আসি। চলুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?" লতিকা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "চলুন।"

লতিকা ও বিমলকে হাত ধরাধরি করিয়া তাহাদের দিকে আসিতে দেখিয়া হিমাংশু আগুন হইয়া উঠিল। অপূর্ব্বও হিংসার বিষে জ্বলিতে লাগিল।

হিমাংশু কহিল, "আগে যা কতক দিয়ে তবে অন্য কাজ।"

অপূর্ব্ব কহিল, "আমরা দু'জন আছ ও একলা, কত জোর ওর গায়ে তা দেখা যাবে।"

উভয়ের এ আকালন কিন্তু বৃথাই হইল। বিমল নিকটে আসিতেই হিমাংশু ও অপূর্ব্ব দাঁড়াইয়া পড়িল, তাহাকে বাধা দিবার কোন চেষ্টা কাহারও দেখা গেল না।

লতিকা হাসিমুখে কহিল, "দাদা, তোমরা বুঝি আমায় খুঁজতে এসেছ? বাবা মা খুব ভাবছেন? তখন রাগ করে চলে এলাম, বলে এলেই ছিল ভাল, তা হ'লে তোমাদের আর এ কষ্ট ভোগ করতে হ'ত না।"

হিমাংশু বিমলের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "নেহাৎ বাবা মা বল্লেন, না হ'লে তোর মত হতভাগা মেয়ের খোঁজ করতে কে এতদূর আসত।"

লতিকা হাসিয়া কহিল, "দাদা দেখ্‌চি রেগে একেবারে আগুন হ'য়ে গেছ! কল্‌কাতায় থাকতে ভাল লাগল না, তাই দেশে বেড়াতে এসেছি—তাতে এত বড় দোষটা কি হ'য়েছে শুনি? কালই আমার চিঠিতে খবর পেতে,—তোমার এত তাড়াতাড়ি আসবার কোন দরকার ছিল না।"

হিমাংশু কহিল, "কত বড় অন্যায় করেচ তা কল্‌কাতায় ফিরে গেলে বুঝতে পারবে। একটা লক্ষ্মীছাড়া বদ্‌মায়েস ছেলের সঙ্গে মিশে তোর যে কতদূর অধঃপতন হ'য়েছে!—"

লতিকা বাধা দিয়া কহিল, "তুমি আমায় যা ইচ্ছে বলে গাল দিতে পার, আমি তাতে কোন কথা বল্‌ব না, কিন্তু তুমি আমার জন্যে আর কাউকে গালাগালি কর না বল্‌ছি।"

হিমাংশু কহিল, "না করবে না। ওর সঙ্গে মিশে অবধিই ত তোর—"

লতিকা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "চুপ কর দাদা। বিমল বাবুকে তোমরা মিথ্যেমিথ্যি দোষ দিও না। তাঁর কোন দোষ নেই। আমার কথায় তিনি দয়া করে আমায় পৌঁছে দিতে এসেছেন। তাঁর কথায় আমি আসি নি। আর তিনি এত নীচ নন্, এটা তুমি জেন দাদা!"

এত বড় তীব্র ও স্পষ্ট কথার কোন উত্তর ছিল না। হিমাংশু স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

লতিকা কহিল, "এখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন দাদা, রেল থেকে এলে হাত মুখ ধুয়ে জিরবে চল!" তার পর বিমলের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "আপনি কিন্তু চলে যাবেন না যেন! আজ এখানে আপনার নেমন্তন্ন। আমি দাসীকে দিয়ে মাকে বলে পাঠাচ্ছি।"

লতিকার এই সরল সহজ ব্যবহারে বিমলের মন তাহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে এতক্ষণ কেন অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া আছে, কেন সে লতিকার মত সহজ সরল ভাবে হিমাংশু ও অপূর্ব্বর সহিত কথা বলিতে পারে নাই, এই কথা মনে করিয়া সে অন্তরের মধ্যে অত্যন্ত লজ্জা বোধ করিল। সত্যই ত লতিকার সহিত চলিয়া আসার মধ্যে তাহার দিক দিয়া কোন অন্যায় হয় নাই। লতিকা ত সে কথা স্পষ্ট করিয়া সকলকে শুনাইয়া দিয়াছে। লতিকার সহিত প্রথম মিশিবার দিন হইতে একটু একটু করিয়া লতিকা যে তাহার হৃদয় কতখানি অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, এই মুহূর্ত্তে সে যেন তাহা স্পষ্ট অনুভব করিয়া ফেলিল। কি করিয়া কেমন করিয়া যে এমন হইল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তবে সে তাহার অন্তরের মধ্যে এমন আনন্দলাভ করিল যাহা তাহার নিকট অপূর্ব্ব অচিন্তনীয় বলিয়া বোধ হইল। সে একবার চকিত দৃষ্টিপাতে লতিকাকে দেখিয়া লইল। তাহার মনে হইল লতিকার মুখ চোখের যেন আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। বিমল কিছু বুঝিতে না পারিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

লতিকার কথার উত্তরে হিমাংশু তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "তোর মত আমি হৃদয়হীন নই যে বাবা

দাব কথা ভুলে এখানে আমোদ করে খেয়ে বেড়াব। ঘণ্টা দুই পরেই কলকাতায় ফেরবার গাড়ী আছে, সেই গাড়ীতে তোকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।"

লতিকা কহিল, "শোন দাদা, আমিও তোমায় স্পষ্ট কথা বল্‌চি, তুমি যদি জোর কর, তা হ'লে আমি কিছুতেই যাব না।"

হিমাংশু ক্রোধে আগুন হইয়া কহিল, "বেশ তবে থাক্ পড়ে! আমরা চল্‌লাম, বাবা এসে এর ব্যবস্থা করবেন।" তার পর তাহার যাহা মুখে আসিল, তাই বলিয়া লতিকাকে গালি দিয়া সে তৎক্ষণাৎ সেস্থান ত্যাগ করিল। লতিকা পাষাণমূর্ত্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

খানিক দূর গিয়া হিমাংশুর রাগের মাত্রাটা যখন কমিয়া আসিল, তখন তাহার মনে হইল লতিকাকে এই ভাবে ফেলিয়া চলিয়া যাওয়াটা ঠিক নহে। বিমলের কাছ হইতে তাহাকে দূরে লইয়া যাওয়াই বিশেষ আবশ্যক কিন্তু লতিকার স্বভাব ত সে জানে! ছেলেবেলা হইতেই সে একগুঁয়ে, তাহাকে ভয় দেখাইয়া জোর করিয়া কোন কাজ করান যাইবে না। তাহাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া ফিরাইয়া লওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। অপূর্ব্ব তাহার সঙ্গে ছিল, সে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, "দেখ ভাই, রাগের মাথায় বড় ভুল করে ফেলেচি—তাকে গালমন্দ না দিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বল্‌লেই ভাল হ'ত—যা'ক যেমন করে হ'ক আমাদের কার্য্যোদ্ধার করতে হবে। বিমলের কাছ থেকে যেমন করে হ'ক তাকে দূরে নিয়ে যেতেই হবে। চল ফিরে যাই।"

অপূর্ব্ব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তা ছাড়া আর উপায় কি! আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে বিমলকে বেশ করে শিক্ষা দিয়ে দি।"

হিমাংশু কহিল, "বিমলের জন্যে আমাদের কিছু ভাবতে হবে না। বাবা তার যে শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন তা ফিরে গিয়ে যখন শুনবে তখন মজাটা বুঝতে পারবে—দু' ঘা মার খেলে ওর আর বেশী কি শাস্তি হবে।"

বিমলকে প্রহার করিবার মত সামর্থ্য যদি তাহাদের থাকিত, তাহা হইলে বোধ করি তাহারা তাহার শাস্তির ন্যূনতা বা আধিক্য সম্বন্ধে কোনরূপ বিচার করিতে যাইত না।

হিমাংশুকে ফিরিতে দেখিয়া লতিকাও মনে মনে আরাম বোধ করিল। তাহার দাদাকে ফিরাইয়া দেওয়াটা যে ভাল হয় নাই, এটা সে একটু পরেই বুঝিতে পারিয়াছিল, অথচ সে কিছুতেই দাদার কাছে নীচু হইতে পারে না! সে প্রশ্নের দৃষ্টিতে বিমলের দিকে চাহিতেই বিশ্বের সমস্ত লজ্জায় সে যেন একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। সে বিমলকে কি বলিতে গিয়া বলিতে পারিল না, দৃষ্টি নত করিয়া রহিল। কিন্তু হিমাংশুকে নিকটে আসিতে দেখিয়া সে অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া কহিল, "আপনি কি আমাদের সঙ্গে ফিরবেন?"

বিমল কহিল, "না, আমি দিন দুই পরে যাব। তাহ'লে আমি এখন যাই!"

লতিকা আর কিছু বলিতে পারিল না। শুধু ব্যথাভরা দৃষ্টিতে বিমলের দিকে চাহিয়া রহিল। বিমলেরও দুই চোখ হঠাৎ ছলছল করিয়া উঠিল। সে দ্রুতপদে সেস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

এমন সময় হিমাংশু নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "লতা, তুই কি সত্যি আমাদের সঙ্গে যাবিনি, বাবা মা কত ভাবচেন বল্‌দিকি।"

লতিকা হাসিয়া কহিল, "তুমিই ত দাদা আমায় রাগ করে ফেলে চলে যাচ্ছিলে। আমি ত যাব না বলিনি। তুমি আমায় জোর করে নিয়ে যেতে পারবে না, আমি শুধু এই কথাই বলেছিলাম।"

হিমাংশু কহিল, "আমার ভুল হ'য়েছিল, স্বীকার করচি, এখন যাবি ত?"

লতিকা কহিল, "বা, যাব না ত কি এখানে একলা পড়ে থাকব নাকি!"

অপূর্ব্ব হিমাংশুর দিকে চাহিয়া কহিল, "তা হ'লে আমি একবার চট্ ক'রে বাড়ী থেকে ঘুরে আসি।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা দুই পরে লতিকা হিমাংশু ও অপূর্ব্বর সহিত কলিকাতায় রওনা হইল।

(১৪)

পরমেশবাবু তাঁহার গৃহিণীকে কহিলেন, "আমাদের সম্মুখে এখন গুরুতর সমস্যা উপস্থিত। কি উপায় করব কিছু ত ভেবে স্থির করতে পারচি না। আমার এখন কর্ত্তব্য কি সে বিষয়ে তোমার কাছে আমি পরামর্শ চাইচি।"

গৃহিণী কহিলেন, "আমিও ত সেই অবধি ভাব্‌চি। আমার মনে হয় এ কথা যাতে বাইরের লোকের কানে না ওঠে প্রথমে তার ব্যবস্থা করা উচিত।"

পরমেশবাবু কহিলেন, "সমাজের লোকে এ কথা জান্‌তে পারলে, আমাদের সমাজের চক্ষে বড় নীচু হ'য়ে যেতে হবে। তারা ত বুঝবে না! ভবেশের মত এ রকম সম্ভ্রান্ত পাত্র পেয়েছি বলে একেই অনেকে আমাদের হিংসে করচে!—এ খবর পেলে তাদের কাছে আমায় অত্যন্ত অপদস্থ হ'তে হবে। বিশেষ করে হরনাথ বাবুকে আমার ভয় বেশী। তাঁর কন্যার সঙ্গে ভবেশের বিয়ে দেবার জন্য তিনি নানাপ্রকার চেষ্টা করেছিলেন, তা ত তুমি সব জান।"

গৃহিণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "সব ত জানি, এখন তাদের মুখ বন্ধ করা যায় কি করে!"

পরমেশবাবু কহিলেন, "সবই করুণাময় জগদীশ্বরের ইচ্ছা। তাই ভাব্‌চি কাল যখন সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা জামাতা ও কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করতে আস্‌বেন, তখন তাঁদের আমি কি কৈফিয়ৎ দেব! ভবেশ ত নিরুদ্দেশ হ'য়েছে—এ বিশ্বাসঘাতকতার পরে সে আমার সম্মুখে আস্‌বে কি প্রকারে? কিন্তু তার উপস্থিত থাকাটাও একান্ত আবশ্যক।"

এমন সময় ছাদের উপর পদশব্দ শুনিয়া পরমেশ বাবু "কে কে" বলিয়া প্রশ্ন করিলেন; কোন উত্তর আসিল না। কিন্তু পদশব্দ ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। পরমেশবাবু বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, ভবেশ চোরের মত দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহাকে দেখিয়াই ভবেশের মুখ একেবারে শুকাইয়া গেল।

পরমেশ কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া অত্যন্ত গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, "এস ভবেশ।" ভবেশ তাঁহার অনুসরণ করিয়া কক্ষমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল।

পরমেশবাবু চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, "আমি তোমায় সরল অন্তঃকরণে আমার কন্যাটীর সঙ্গে মিশতে দিয়েছিলাম, আর তুমি আমার সঙ্গে এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করলে! সমাজের লোকে যখন এ কথা শুন্‌বে তখন আমার কিরূপ লাঞ্ছনা হ'বে তা একবার তুমি মানসনেত্রে অবলোকন কর দেখি।"

গৃহিণী কহিলেন. "দাঁড়িয়ে রইলে কেন ভবেশ, বস!"

ভবেশ দূরের একখানি চেয়ারে বসিয়া কহিল, "এখন আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না—"

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া পরমেশবাবু লাফাইয়া উঠিয়া কহিলেন, "তা হ'লে তুমি বিবাহিত নও? ঐ যে মেয়েটী এসেছিল, ওটী তা হ'লে তোমার পত্নী নয়! করুণাময় জগদীশ্বর, সবই তোমার ইচ্ছা!"

ভবেশ কহিল, "আমি আপনাকে সেই কথা বল্‌বার জন্যেই এসেছি।"

পরমেশবাবু আনন্দে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তা হ'লে ঐ ব্রাহ্মণ জুয়াচুরি ক'রে তোমার কাছ থেকে কিছু আদায় করতে এসেছিল। মা উর্ম্মিলা, মা উর্ম্মিলা! তাই ত বলি ভবেশ—"

পিতার আহ্বানে ঊর্ম্মিলা তাড়াতাড়ি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া ভবেশকে দেখিয়া হঠাৎ পাষাণমূর্ত্তির মত কঠিন হইয়া গেল।

পরমেশবাবু ধীরে ধীরে কন্যার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "সব মিথ্যাকথা মা,—জুয়াচোর ব্রাহ্মণ আমাদের প্রতারণা করে গিয়েছে।"

তাঁহার এই অদ্ভুত ব্যাপারে ভবেশ হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহার বক্তব্য না শুনিয়াই যে পরমেশবাবু এইরূপ সোরগোল বাধাইয়া তুলিবেন ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। বিবাহের পূর্ব্বেও তিনি তাহাকে কথা শেষ করিবার অবসর দেন নাই, এখনও বাধা দিতেছেন। সে কি করিয়া তাঁহাকে সব কথা বুঝাইয়া বলিবে! কিন্তু না বলিলেও উপায় নাই। দারুণ দুশ্চিন্তারাশি মনের মধ্যে চাপিয়া জীবন ধারণ করা যে অসম্ভব।

ঊর্ম্মিলা একটু প্রকৃতিস্থ হইবামাত্র দ্রুত পদে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

পরমেশবাবু কহিলেন, "মায় আমার এখনও অভিমান যায়নি। না যাবারই কথা।"

ভবেশ এবার নিজের মনকে শক্ত করিয়া লইয়া কহিল, "আমি বিবাহিত।"

"তা হ'লে তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ?" বলিয়া পরমেশবাবু হতাশভাবে চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন।

ভবেশ ধীরে ধীরে সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়া কহিল, "এখন আমার কি কর্ত্তব্য তা আপনারাই স্থির করে দিন।"

পরমেশবাবু খানিকক্ষণ মাথায় হাত দিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভবেশ আসিবার পূর্ব্বেও তিনি অনেক চিন্তা করিয়াছিলেন কিন্তু কোন উপায় স্থির করিতে পারেন নাই। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িতেই তিনি যেন কূল পাইলেন। উৎসাহভরে কহিলেন, "তুমি সেই হিন্দুকন্যাকে পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত আছ?"

ভবেশ কহিল, "সে কথা ত আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলেছি। আমি কাগজ-কলমে লিখে দিতেও প্রস্তুত আছি।"

পরমেশবাবু কহিলেন, "এ ছাড়া আর অন্য পথ নাই। আমি এখনই কাগজ-কলম দিচ্ছি তুমি লিখে দাও।" এই বলিয়া তিনি ক্ষিপ্রহস্তে কাগজ কলম ও দোয়াত বাহির করিয়া আনিয়া ভবেশের সম্মুখে রাখিলেন। ভবেশ কোনরূপ ইতঃস্তত না করিয়া তাহার হিন্দু-স্ত্রী ত্যাগের কথা লিখিয়া দিল।

পরমেশবাবু গৃহিণীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি এই কাগজখানা নিয়ে ঊর্ম্মিলা মার কাছে যাও। তাকে শান্ত কর, তাকে অভিমান ত্যাগ করতে উপদেশ দাও। ঊর্ম্মিলা মাকে বুঝিয়ে বল, ভবেশ বাবাজি আমার নির্দ্দোষ, তার হিন্দুপিতার কুসংস্কারের ফলে বাবাজীকে আজ লোকচক্ষে বিশ্বাস-ঘাতক হ'তে হ'য়েছে। সে অন্তরে বিশ্বাসঘাতক নয়।"

ঊর্ম্মিলার জননী কাগজখানি হাতে করিয়া কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীকে কহিলেন, "ঊর্ম্মিলা কিছুতেই—"

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া ঊর্ম্মিলা ঝড়ের মত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা আমি বিশ্বাসঘাতককে কখনও স্বামী বলে গ্রহণ করতে পারব না। একবার ভুল করেছি—আর ভুল করব না।" এই বলিয়াই সে আবার তেমনই ক্ষিপ্রপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হইবার পর পরমেশবাবু কহিলেন, "ঊর্ম্মিলা মা অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে রয়েছে। মা আমার অন্তরে শুদ্ধ কম ব্যথা পায় নি! আজ রাত্রিটা তাকে শান্ত হ'য়ে ভাবতে দাও ভবেশ!" (ক্রমশঃ)

অকূলে

(গল্প) -

(শ্রীমতী লীলা দেবী)

"রাগ! পরাগ! পরী!"

বারবার তিন বার ডাকিবার পর বিরক্তির স্বরে উত্তর আসিল—"কেন?"

—"একবার শুনে যাও তো!"

—"বার বার জ্বালাও কেন সাথী? তোমায় তো ব'লে দিয়েছি যখন-তখন আমায় অমন করে ডেকো না।"

"তবে তুই সেখানে যাবি নে?"

এবার ঘরের ভিতর হইতে আর কোন উত্তর আসিল না। সাথী অর্থাৎ সাক্ষীগোপাল দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িয়া আবার বলিল "একেবারে কত দিনের জন্যে চ'লে যাচ্ছি, তত দিন তুই একলা থাকতে পারবি?"

এবার পরাগরাণী ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। জীবন বসন্তের অপূর্ব্ব শোভায় তাহার সামান্য চূড়ী-পরা হাত দু'খানি ও ডোরা-পেড়ে সাড়ী-পরা সৌর তন্বী তনুটী অপরূপ লাবণ্য-ভরা তারল্য শ্রীতে ঝল্‌মল্‌ করিতেছিল। এই মা-বাপ মরা-মেয়েটি চিরদিন পরের ঘরে মানুষ হইয়া পাতান মা বাপকেই পিতামাতা বলিয়া জানিত। কয় বৎসর হইল সেই পাতান মা বাপের বিয়োগে পরাগের মেহাতুর হৃদয় যথার্থই গুরু শোকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছিল। সাক্ষীগোপাল পরাগদেরই প্রতিবেশী, সেও শৈশবে শুধু যে পিতৃমাতৃহীন তাহাই নয়, আপনার বলিতে তাহার ইহজগতে কেহই ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আর তাহা ছিল না বলিয়াই এই গোপ যুবকের দেহ প্রীতিময় তরুণ হৃদয়টী পাড়া প্রতিবেশী সকলকেই আপনার মত করিয়াই ভালবাসিত। বিশেষতঃ যেদিন হইতে পরাগের পাতান বাপ মা মরিল, সেই দিন হইতে ব্যথা ভরা সমবেদনায় পরাগের ব্যথিত স্নেহহারা জীবনের সমস্ত ভারটুকুই সাক্ষী তাহার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সঙ্গী করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে তো ভালবাসার অভিযোগ কখনই চিরদিন খাটে না, নতুবা বিচিত্র-সুন্দর নয়ন-ভুলান যৌবনের রঙ্গ গোলাপ-রক্ত কেতন উড়াইয়া রাতারাতি পরাগকে রথী করিয়া লইত না। আর সাক্ষীও কৈশোর কাটাইয়া বলিষ্ঠ সুন্দর যুবা হইয়া উঠিত না।

সাক্ষী গোয়ালার ছেলে, পরাগ তাহাদের চেয়ে জাতি কুলে অনেক বড় সুতরাং তাহাদের হিতকর্ম্মী প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল যে পরাগের বিবাহ তাহারই অনুরূপ যোগ্য কায়স্থ কুলে দেওয়া উচিত। বিশেষতঃ পরাগের এক কাকিমা কোথা হইতে হঠাৎ একদিন উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিলেন—তিনি পরাগকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইবেন; তাহার বিবাহের বন্দোবস্ত করার না করিলে তাঁহার জাত মান বজায় থাকা ভার। ইহার অবশ্য একটু কারণ ছিল। সম্প্রতি পরাগের এক খুল্লতাত তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি পরাগের নামে উইল করিয়া গিয়াছেন। সাক্ষী-গোপাল পরাগের চেয়ে ছয় বৎসরের বড় তাহারও নাকে-নোলক-পরা, রাঙা চেলী চাকা, মল ঝম্‌-ঝমান, টুকটুকে একটী সঙ্গিনী করিয়া দিবার জন্য পরাগের কাকিমা উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন কিন্তু সাক্ষীগোপাল জেদ্‌ ধরিয়া বসিল যে সে

কিছুতেই সঙ্গিনী আনিবে না। যেদিন প্রথম সাক্ষীর সহিত পরাগের পরিচয় সে দিনের বসন্ত সায়াহ্নে সাক্ষী বলিয়াছিল—"একলা থাকতে তোর ভয় করে তাই তোকে আমার ঘরে এনেছি—এর বদলে তুই আমায় কি দিবি বল?" পরাগ বলিয়াছিল—"আমার এই নতুন পিতলের তাগা দু'গাছা যা তুমি আমায় কাল কিনে দিয়েছ—তাই দেবো।" হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া পড়িয়া সাক্ষী বলিয়াছিল—"আমারই দেওয়া জিনিষ আমায় দিবি তুই—কি পাগল!"

(২)

পাশের গ্রাম দেবপুরে পরাগের সুখদুঃখের কাকিমার বাড়ী। পাকা দেখার দুই দিন আগেই সাক্ষীগোপাল পরাগকে সেখানে রাখিয়া আসিল। তাহার পর গাঁয়ে হলুদ অবধি নির্বিঘ্নে চুকিয়া গেলেও সাক্ষীগোপাল দেবপুরে পৌঁছিল না দেখিয়া সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কি হইল তাহার? অতঃপর সাক্ষীদের গ্রাম হইতে দেবপুরে গাঁয়ে হলুদের নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়া তারাচাঁদের মা যখন বলিয়া গেল যে পরাগকে দেবপুরে পৌঁছিয়া দেই যে সাক্ষী ফিরিয়া গিয়াছে সেই রাত্র হইতেই সে জ্বরে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। কালীতলার সরি দিদিমা ভাগ্যিস্ দয়া করিয়া এ কয়দিন সেখানে আছে নহিলে তৃষ্ণার জলটুকুও না পাইয়া বুঝি সে হতভাগা ছেলেটার জীবন ফুরাইত। তখন কাকিমার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া এবং পাড়াশুদ্ধ সকলের বিস্ময় ও নিন্দার পাত্র হইয়া হলুদমাখা কাপড়েই পরাগ তাহার 'সাথী'কে দেখিবার জন্য চলিয়া আসিল। যদিও কালীতলার সরি দিদিমা সাক্ষী ভালো হইয়া গেলেও পরাণী থাকা অবধি সাক্ষীর ঘরেই আছেন তথাপি এত গরীবের ঘরে মিত্রদের ভাবী বধূ পরাগের বেশী দিন থাকা আর ভালো দেখায় না একথা কাকিমা বার বার করিয়া জানাইতে লাগিলেন। তাহার উপর বিবাহের দিন নিকটে আসিতেছিল। সেবারের নির্দ্ধারিত দিন তো চলিয়াই গিয়াছে, এবার যদি সেরূপ হয় তাহা হইলে পরাগের কাকিমা এমন একটা অনর্থ করিয়া বসিবেন, তাহাতে পরাগের চিরজীবনই দুঃখানলে জ্বলিয়া যাইতে পারে। এ কথা ভাবিয়া সাক্ষী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। অথচ পরাগকে এত করিয়া বুঝাইয়াও দেবপুরে পাঠাইতে পারিতেছে না। সাক্ষী ভাবিল কেন এমন হইল? ভাবিতে ভাবিতে তাহার সমস্ত বুকখানা কান্নায় ভরিয়া উঠিতেছিল।

(৩)

মেটে ঘরের দাওয়ার দু'ধারে কামিনী ফুলের ঝাঁকড়া গাছ দুটী হাওয়ায় দুলিতেছিল। সাক্ষীগোপাল সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেছিল, যেমন করিয়াই হউক আজই সে পরাগকে দেবপুরে রাখিয়া আসিবে। পরাগকে দেখিয়া সাক্ষীগোপাল তাহার সঙ্কল্প ভুলিল কি না জানি না, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য কথা তাহার মুখে আসিল না। শুধু একরাশ ঝাঁকড়া চুল দু'হাত দিয়া কপালের উপর হইতে সরাইয়া সে বলিল—"আয়!"

পরাগ আসিল। তাহার হাতের রাঙা কলী দু'গাছি নাড়িতে নাড়িতে সাক্ষী বলিল—"পরাগ!"

—"কি?"

—"রাগ!"

—"ঐ তো তোমার দোষ!"

—"কি দোষ পরী?"

—"যাও, আবার সেই?"

—"কি সেই?"

—"ডাকবে তো একনামেই ডাকো না, অত রকম বেরকমের নামের কি দরকার!"

—"দরকার ভিন্ন কি কিছু ক'রতে নেই পরাগ?"

—"না!"

—"তবে তুমি তোমার কাকিমার বাড়ী যাও; এখানে তো থাকবার তোমার দরকার নেই!"

—"যাও তুমি ভারী দুষ্টু !"

—"এর বেলায় দুষ্টু কেন ?"

"আমি গেলে তোমায় দেখ্‌বে কে ?"

—"সে ভাবনায় তোমার দরকার কি পরী ?"

"তা কি হয়, এবার আমার যথেষ্ট শাস্তি হ'য়েছে, আর আমি তোমায় একলা রেখে যাবো না।"

"কি শাস্তি হ'য়েছে ?"

"এই তো আমি ছিলুম না আর কি অসুখই বাধিয়ে ব'সেছিলে, যদি এসে আর না দেখ্‌তে পেতুম।"

বলিতে বলিতে পরাগের কপোল বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সাথীর চোখ দুটিও জলে ভরিয়া গিয়াছিল, তাড়াতাড়ি সে পরাগের হাত দু'খানি ছাড়িয়া দিয়া একটু দূরে সরিয়া বসিয়া বলিল—"তা ব'লে কি তুই চিরদিন এখানে থাক্‌বি ? আজ বাদে কাল বিয়ে যে তোর।"

—"তুমি আগে বিয়ে করো তার পর যাবো।"

এ কথার কোন উত্তর না দিয়া সাক্ষী বলিল—"আমি তো এখানে আর থাক্‌বো না পরাগ! ঘর দোর জমি-জমা সব বেচে ফেলেছি—তোকে দেবপুরে পৌঁছে দিয়ে এসেই একাজ ক'রেছি—"

—"কেন এমন ক'রলে ?"

"এক্‌লাটি এ ঘরে আর কে থাকে বল! পরশু দিনের মধ্যেই এ বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে।"

বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখ দুটি তুলিয়া পরাগ বলিল—"তবে কোথায় থাক্‌বে ?"

"কল্‌কাতায় কাজ পেয়েছি।"

"তবে আমিও কলকাতায় যাবো।"

"পার্‌বি যেতে ?"

"কেন পার্‌বো না ?"

"ঠিক ?"

"ঠিক্ !"

এক গুচ্ছ কাশিনী ফুল তুলিয়া সাক্ষী বলিল—"আয় তোর খোঁপায় পরিয়ে দি !"

—"না গো না ও সবে আর কাজ নেই" বলিয়া পরাগ চলিয়া গেল।

(৪)

ইহার দিন চার বাদে একদিন সকালে উঠিয়া পরাগ বলিল—"আমি যাবো না।" সাক্ষী গোপাল তখন তাহার নবীন যৌবনের নূতন উদ্যমে উৎসাহ-সোৎসুক প্রফুল্লমুখে বাঁশবনের কোণে দাঁড়াইয়া কতকগুলি বাঁশ কাটিয়া ভালো ভালো লাঠি তৈয়ারী করিতেছিল। এগুলি তাহার গ্রামের সকলকে কলিকাতায় যাইবার আগে বিদায় উপহারের জন্য। বিন্দু বিন্দু স্বেদজাল তাহার শ্যামল নধর দেহে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। শ্যামলীর বাহুযুগে ও বক্ষে সে আজ অনেক দিন পরে সখ করিয়া রূপার তাগা ও হার পরিয়া চিকণ কৃষ্ণ কেশ-ভরা মাথার উপর চাঁপা ফুলের মালা বাঁধিয়াছিল—সম্রাটের রাজমুকুটের মতই এই ফুলের বেষ্টনীর দীপ্ত ঔজ্জ্বল্য তাহার মাথায় অধিষ্ঠিত ছিল রাজাধিরাজের গৌরবেই! আর তাহার আঁকা দুটি ভ্রূর মধ্যে ও কপোলে শ্বেত-চন্দনের তিলক পত্র অঙ্কিত ছিল। গোপ গোয়ালার ছেলে ইহাকেই বহুমূল্য সজ্জা মনে করে। পরাগকে অসময়ে বাঁশ বনে দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতেই সে বলিল—"কোথায় যাবি নি ?"

"তোমার সঙ্গে কলকাতায়।"

—"কেন, হঠাৎ মত বদ্‌লাল যে ?"

"অত কথা আমি ব'লতে পারিনে বাপু। আজই আমায় দেবপুরে দিয়ে এসো। শেষে কি আমার জন্যে কাকিমার জাত যাবে না কি !" সাক্ষী বুঝিল, নিশ্চয়ই কালীতলার সরি দিদিমার ঝুড়ি ঝুড়ি অব্যর্থ মন্ত্রোপদেশগুলিই পরাগের মনের এ হেন ভাবান্তর করিয়াছে। সে মুখে কিছুই বলিল না, শুধু তাহার হাত হইতে বাঁশগুলি অবহেলায় মাটীতে পড়িয়া গেল, অনেক যত্নে প্রস্তুত লাঠি গুলিও সেখানেই পড়িয়া রহিল।

—"তবে চলো আজই আমায় রেখে এসো।"

—"বেশ চল্।"

ঠিক্ সেই সময় খঞ্জনী বাজাইতে বাজাইতে এক বৈষ্ণব ভিক্ষার ঝুলী কাঁধে ফেলিয়া তাহাদেরই পাশ দিয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিল—

"কানু কহে রাই ধবলী চরাই
রাখাল বই ত নই
(গোঠে মাঠে ধাই) ধবলী চরাই
প্রেমের কি জানি মুই
রাধানিয়া মতি, কি জানি পীরিতি,
প্রেমের পসরা তুই
(রাধে) তুমি আমার প্রেমের গুরু তুমি
মহাজন, কি করো ভজন
(আমি) জানিনে যে তোমা বই
কানু কহে রাই———"

একটু বিষণ্ণ হাসির সহিত সাক্ষী বলিল—"শুন্ছিস্ রাগ?"

—"তুমি শোন!"

—"কেন, তোর কি ভালো লাগে না?"

—"তোমরাই ওর মর্ম্ম বোঝ!"

—কেন?"

—"তোমরা যে গোপ গো!"

"কালেত বাসুদেব বুঝি ও গান শুন্তে নেই?"

—"তোমার সঙ্গে আর পারিনে বাপু, তুমি ভারী দুষ্টু!"

—"আর তুমি বড় লক্ষ্মী!"

এবার দুজনেই হাসিয়া ফেলিল।

পরাগ কাপড় চোপড় পুঁটুলী করিয়া বাঁধিতেছিল, প্রাঙ্গনের সাম্নে শ্যামী গাই তাহার দিকে করুণ নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া সেই খানেই বসিয়া পড়িল। সাক্ষী আসিয়া বলিল—"তোর হ'য়েছে? কখন যাবি? বেলা যে অনেক হ'ল?"

"এই হ'ল ব'লে!"

পরাগ কিন্তু সাক্ষীর দিকে কিছুতেই মুখ ফিরাইল না। সাক্ষী অনেকবার এধার ওধার ঘুরিয়া ফিরিয়া একটিবার তাহার পরাগের মুখখানি দেখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই যে লক্ষী মেয়েটীর কৃপা হইল না দেখিয়া তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। এবার সে বলিল—"আজ না হয় থাক্ না রাগ! কাল তখন যাস্?"

"না আজই যাবো।"

"তবে তাই, তুই যা বলবি তাই হবে।"

পরাগ বলিল - "আমার এই পুঁটলীটা আর এই খাবার বাঁধা হাঁড়িটা—পথে যদি খিদে পায়।"

পরাগের মুখখানি হঠাৎ দু'হাতে ফিরাইয়া ধরিয়া সাক্ষী বলিল—"একবার মুখখানি এধারে ফেরালে দোষ কি রাগী?"

সবলে সাক্ষীর হাত দুটী ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া রাগিয়া উঠিয়া পরাগ বলিল—"কি করো সাক্ষী! তুমি ভারী দুষ্টু, যাও ব'লে যাও ব'লছি!"

ইহাতেও সাক্ষীর ক্রোধের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। আগের মতই জলভরা চোখে সে বলিল—"ও হাঁড়িটা না নিলেও চ'লতো।"

—"তারপর, পথে খিদে পেলে তখন আমার মাথা চিঁড়ে খেতে আর কি!"

—"না রাগ, তোর মুখ দেখলেই আমার খিদে তেষ্টা মিটে যায় যে!"

পরাগের পক্ষে এবার চোখের জল লুকান অসম্ভব হইয়া পড়িল। কি করিয়া এই মানুষটীকে রাগান যায় তাহা এতক্ষণেও খুঁজিয়া না পাইয়া পরাগ নিজেরই উপর রাগিয়া গেল। এই পাঁচ বৎসর ধরিয়া ক্রমাগতে নিষ্ঠুরতা ও বাক্যাঘাতে বিঁধিয়া বিঁধিয়াও যাহাকে এতটুকুও বিরক্ত করা গেল না সে নিশ্চয়ই অদ্ভুত মানুষ, আর সে দোষ পরাগের নিজেরই, কারণ সেই তো এই অদ্ভুত মানুষের মনটী এমন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে—আর কেহ তো সে মনের ছায়াও মাড়ায় নাই। সাক্ষী যদি তাহার চোখের জল দেখিয়া ফেলে? তাড়াতাড়ি ঘরের

ভিতর যাইতে যাইতে পরাগ বলিল—"আলাতন ক'রলা ব'লছি। সব জিনিষ পত্তর গুছিয়ে নিতে যাও আমার।" বন্ধ দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সাক্ষী ডাকিল—"রাগ! পরাগ! পরী! রাণী আমার!" কিন্তু কোন উত্তর আসিল না।

দেবপুরের গ্রামের নিকটে আসিয়া পরাগ হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া ডাকিল, "সাক্ষী।"

সাক্ষীগোপাল ব্যগ্র হইয়া কহিল, "কিরে পরী।"

পরাগ গাঢ় স্বরে কহিল, "আমার একটা অনুরোধ তোমায় রাখতে হবে?"

সাক্ষী কহিল, "কি অনুরোধ রাণী।"

পরাগ কহিল, "আজই তুমি কল্‌কাতায় চলে যেয়ো না।"

সাক্ষী ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "আর কি করতে এ দেশে থাকব রাণী!"

পরাগ অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া কহিল, "আমার বিয়ের দিন তোমায় থাকতেই হবে, আমি কোন কথা শুনব না। আমার শেষ অনুরোধ বিয়ের সময় তুমি উপস্থিত থেকো।"

সাক্ষী কহিল, "থাকব রাণী, তোর কথা কি ঠেলতে পারি।"

পরাগ হাসিয়া কহিল, "তুমি সব পার!"

* * * * *

বিবাহের দিন সাক্ষী পরাগের কাকিমার বাড়ীর বাহিরে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। তখন দেবপুর গ্রামের সন্ধ্যাদীপগুলি কুটীরে কুটীরে জ্বালিয়া দিয়া পল্লীবধূরা শঙ্খধ্বনি করিতেছে। বর ও বরযাত্রীগণ ইতিপূর্ব্বে বিবাহ-সভায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সন্ধ্যার পরই বিবাহের লগ্ন। এমন সময় সহসা বাড়ীর মধ্যে হইতে নানা কণ্ঠের চীৎকার ধ্বনি উত্থিত হইল। কি যেন বিপদের আশঙ্কায় বাড়ীময় হুড়াহুড়ি ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। সাক্ষীও ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। হঠাৎ তাহার কানে গেল, "পরাগ কেন তুই এমন সর্ব্বনাশ করলি।" সাক্ষী উন্মাদের মত সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিল।

দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া পরাগ ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, "কাছে এস সাক্ষী।"

সাক্ষীগোপাল আজ আর কোন বাধা মানিল না। ছুটিয়া গিয়া পরাগের লুণ্ঠিত দেহের উপর পড়িয়া বলিয়া উঠিল, "রাগ, পরাগ, পরী, রাণী আমার, সত্যই কি তুই আমায় ছেড়ে চল্‌লি।"

পরাগ হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, "না সাক্ষী, যেখানে গেলে আর তোমায় ছাড়তে হবে না সেই খানেই আমি যাচ্ছি। আমি অকূলে পড়ে তাঁর কাছে আশ্রয় চেয়েছিলাম, তিনি আমায় আশ্রয় দিয়েছেন।"

সাক্ষী আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "আমায়ও তোর সঙ্গে নে পরী, আমায় একলা ফেলে যাস্‌নি।"

"তাই এস, শীগ্‌গির করে এস, পায়ের ধূলো দাও সাথী। যে সমাজে আমরা জন্মেচি এখানে তোমার আমার মেলবার কোন পথ নেই। দাও, পায়ের ধূলো দাও, দেরী কর না, দাও।" এই বলিয়া সাক্ষীর পায়ের দিকে হাত বাড়াইয়া হঠাৎ পরাগ স্থির হইয়া গেল।

সাক্ষী চীৎকার করিয়া ডাকিল—"রাগ, পরাগ, পরী, রাণী!" এবার আর কোন উত্তর আসিল না। ক্ষিপ্তের মত অট্টহাস্যে সকলকে ভীত চকিত করিয়া সাক্ষী বলিতে লাগিল "রাগ করবিনে পরী, ঝগড়া করবিনে?"

চিরপবিত্র পরাগের একরাশ যুঁইফুলের মত শুভ্র সুললিত অতি সুন্দর দেহখানি তখন সৌরভবিবর্জ্জিত হইয়া তাহার চিরঈপ্সিত 'সাক্ষীর' কোলের উপর নির্ব্বিবাদে চিরদিনের মত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

দয়ার সাগর

(শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়)

বাঙ্গালার বুক জুড়ে বেজেছিল যেই দিন
বিজয়ার বাঁশি—
দরিদ্র দেশের মাঝে, আঁধারে মিলায়েছিল
কীণতম হাসি।

কাঙ্গালীর ঘরে ঘরে মূর্চ্ছাহত কণ্ঠাগত
অন্নহীন প্রাণ,
মৃত্যুর সম্মুখে আসি, স্বেচ্ছায় চাহিয়াছিল
আত্ম বলিদান।

ক্রন্দনের কলরোলে, দিগন্ত কাঁপিয়া উঠি
দিয়েছিল সাড়া ;
মুমূর্ষুর শেষ শ্বাস— অন্নদার সিংহাসনে
দিয়েছিল নাড়া।

সেদিন, সে দেশ জোড়া মরণের মহাযজ্ঞ
করিতে নিষ্ফল,
কে আসিবে—তাই স্মরি, কেটেছিল সবাকার
প্রতি দণ্ড, পল।

জননীর বক্ষ পরে, নিত্য নির্যাতন পালা
কে করিবে শেষ—
তাই ভাবি দিনযামী আট কোটি বাঙ্গালীর
পড়ে নি নিমেষ।

সহসা বাজিল শঙ্খ, অমরার সুরবালা
গাহে জয়গান,
বাঙ্গালার বুক জুড়ে, হেরিল নিখিল লোক
মূর্ত্ত ভগবান।

দরিদ্র মায়েরে হেরে কাণে কাণে করেছিলে
ভবিষ্যৎ বাণী—
ভয় কি জননী তোর, ও রাঙ্গা চরণ তলে
বিশ্বে দিব আনি।

দুখীদের ঘরে ঘরে প্রচার হইল বার্ত্তা
আর ভয় নাই,
হেরিয়া নিরন্ন প্রাণ, হ'ল আজ ভগবান
আমাদেরি ভাই।

লজ্জার রক্তিম রসে রঞ্জিত হবে না আর
জীবনের পালা ;
বিদ্যা আর অন্ন দানে, সমগ্র ভারত আজ
অতিথির শালা !

বেদনার অবসানে স্বদেশের ভাগ্য পরে
হেরি রাজটীকা,
আঁধার রজনীমাঝে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল
অগ্নিময় শিখা।

সে অনলে ধরণীর হিংসা, দ্বেষ, লাজ, ভয়
হ'য়েছিল ছাই,
যেথায় নয়ন চলে আর্ত্তের উদ্ধার বই
অন্য কিছু নাই

দুখীরে দেবতা জ্ঞানে, ক্ষুধা লজ্জা হেরি তার
পূজা উপচার,
[মুখেই "অহিংসা" নয় ; দয়া বিনা গতি নাই
করিলে প্রচার।

বিদ্যার সাগর তোমা [illegible]'লেছিল যেই জন,
সে বোঝে নি কিছু,
মমতায় গড়া তনু [illegible] দয়ার অধীন তুমি,
আর সব পিছু !

চ'লে গেছ লীলা শেষে, অন্নদার মাতৃকোলে
অমরার ছবি।
একাধারে দুইরূপ পূর্ণিমার স্নেহধারা,
দীপ্ত-কর রবি।

———

আমাদের কথা

নন-কোঅপারেশন ও বিশ্ববিদ্যালয়

দেশ ও দেউলিয়া হইয়াছে। ভারতগবর্ণমেণ্টের অর্থের অনটন। বাঙ্গালারও সেই দশা। তবে অর্থের অনটনে সরকারের কোন কাজ বাধিয়া থাকিবে বলিয়া এখনও শুনিতে পাই নাই। কেবল যাহারা নানাবিধ রোগে ভুগিয়া মরিতেছে, তাহাদের রক্ষার জন্ত আর নিরক্ষর দেশকে একটু শিক্ষিত করিবার জন্ত সরকার কোনও রূপ অর্থ সাহায্য করিতে পারিবেন না,—এই ত বুঝিলাম সহজ কথায় অর্থের অনটন হইবার ফল। এদিকে শিক্ষার কর্ত্তা শিক্ষামন্দিরে দাঁড়াইয়া ভাঁড় উল্টাইয়া দেখাইয়াছেন। তিনি দোষ দিয়াছেন নন-কোঅপারেশন আন্দোলনকে, আর দেশের লোককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় চান কি না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ যে বরাবর ঠিক মত শিক্ষার জন্তই ব্যয় হইয়াছে এ কথা সব সময় মনে করিতে পারি নাই। আশুবাবু নিজে বেশ অবগত আছেন যে অনেক সময় দেশের মতের বিরুদ্ধে বলবার সাধ্য অনেক কাজ তিনি করিয়াছেন। সমালোচক ও আপত্তিকারিগণকে নিতান্ত ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়াছেন। তবে আজ কেন আবার শূন্যভাণ্ড হাতে করিয়া দেশের দুয়ারে উপস্থিত হইতেছেন! দেশের লোককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাহারা বিশ্ববিদ্যালয় চায় কি না?

দু'চার বৎসর পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে এত ছেলে ছিলনা। নন-কোঅপারেশনই হউক আর যে কারণই হউক পঞ্চাশ হাজার ছেলে স্কুলকলেজ ছাড়িয়া যাওয়াতেও যত ছেলে এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, তত ছেলেও আগে ছিল না। তখন ত বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ বেশ চলিয়া যাইত! আজ সহসা কি এমন খরচ বাড়িয়া গেল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেউলিয়া হইতে বসিয়াছে? নন-কোঅপারেশন বাদে সাধারণ ভাবে ভাবিয়া দেখিতে গেলেও মনে হয় এ ভালই হইয়াছে। শিক্ষায় পারদর্শীতার বিষয় লক্ষ্য না রাখিয়া দেশশুদ্ধ সকল ছেলেকেই যে উচ্চশিক্ষা দিলাইয়া পথে দাঁড় করাইতে হইবে এ কেমন কথা? তাহারা যদি দুটী অন্ন মুখে দিবার আর কিছু উপায় করিতে পারে তবে সে কি বড় আহ্লাদের কথা নয়? তাহাতে দেশ যে বিশ্ববিদ্যালয় চাহে না একথা কিসে বুঝা গেল?

লেজিস্লেটিভ কাউনসিল বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব দেখিতে চাহিয়াছিল, কি কারণবশত তাহা অস্বীকার করা হয় বুঝিতে পারিলাম না। হিসাব দেখাইতে অস্বীকার করিয়া আবার দেশের লোকের কাছে ভাণ্ডশূন্য করিয়া দেখানতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তাদিগের সততার বিষয়ে কি দেশের লোকের সন্দেহ আসিতে পারে না?

বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ যে দেশের প্রকৃত আকাঙ্খানুযায়ী স্বাভাবিক নিয়মে উদ্ভূত হইয়াছে এরূপ মনে করিতে পারি না। এদেশের বড় দুর্ভাগ্য অনেক ঈপ্সিত বস্তু আমরা পাই না। আবার অনেক বস্তু আমাদের আবশ্যক না থাকিলেও ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। অথবা রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিতে গেলে 'কর্ত্তভজা' দেশের ভাগ্যে এর অধিক আর কি হইবে? কলুটোলা ষ্ট্রীটের উপর আইন কলেজের গর্ব্বিত ছাত্রাবাসটীর কি দরকার ছিল জানি না। বুঝিতে পারি না বাস্তবিক উহার অভাবে দেশের জ্ঞানের পথ সঙ্কুচিত হইয়া দেশকে মধ্য আফ্রিকায় ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছিল কি না। এখনও ভাবিয়া পাই না যাহারা গ্রাজুয়েট হইয়াছে তাহাদিগকে এমন ভাবে নাবালক শিশুর মত মায়ের কোলের মধ্যে পুরিয়া রাখিয়া কি এমন চরিত্রনীতি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থের অনটন হইয়াছে, আর

অর্থনি দেশবাসীর প্রতি দোষারোপ করিবার ভাবে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে দেশ ইহা চায় কি না। আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, দেশের ছেলেকে পড়িবার সুবিধা কতটুকু করিয়া দেওয়া হইয়াছে? অট্টালিকার উপর অট্টালিকা গড়িয়া তুলিবার পূর্ব্বে সকল ছেলে সামান্য ব্যয়ে এ দরিদ্র দেশে দরিদ্রের মত থাকিয়া শিক্ষা পাইতে পারে এ ব্যবস্থা করিবার জন্য কেহ কোনদিন ব্যস্ত হইয়াছিলেন কি? ছেলে-দের মাসে পঞ্চাশ ষাট টাকা খরচ করিয়া পাঁচতলা বাড়ীতে থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু কোন দরিদ্র সন্তান এক পয়সা ব্যয় না করিয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম বিদ্যালাভ করিতে পারে এরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য কেহ কোন দিন বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাইয়াছেন কি? শুনিয়াছি ইংলণ্ডেও ভাল ছেলের জন্য এরূপ স্কলারসিপের ব্যবস্থা আছে যে তাহাতে তাহার শুধু পড়ার খরচ ও দূরের কথা, অনেক সময় বাড়ীর খরচেরও কিছু চলিয়া যায়। ইহাতে সকলকে ভালছেলে হইবার জন্য উৎসাহিত করা হইতেছে। প্রকৃত প্রতিভাশালী বালককে শিক্ষার সম্পূর্ণ সুযোগ করিয়া দেওয়া হইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে বিদ্যালয়ে যে ছেলে প্রথম স্থান অধিকার করিবে তাহারও যে কয় টাকা ব্যয় করিয়া লেখাপড়া চালাইতে হয়, আর যাহার কোন প্রতিকে গেজেটে নাম ছাপা হইয়াছে তাহারও তাই। দোষের কিছু নাই,—এ পোড়াদেশে কোনদিনই প্রকৃত প্রতিভার বিকাশের জন্য প্রতিযোগীতার পথ উন্মুক্ত করা হয় নাই,—জাতিভেদ তাহার অতি বড় কলঙ্কের ছাপ, অতএব আশুবাবুর আর দোষ কি?

আমাদের এ দরিদ্র দেশে ইংলণ্ডের মত উপযুক্ত ছাত্রকে ছাত্রবৃত্তি দিবার ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাই ইহা বিশ্বাস করি। এক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের কি করা উচিত তাহার সমালোচনা করিলাম না। কিন্তু আমেরিকায় শুনিয়াছি অনেক ব্যবসায় ছেলেরা চাকুরী করিতে করিতেও পড়িতে পারে। শুনিয়াছি সেখানে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের চাকুরী জুটাইয়া দিবার জন্য কমিটী থাকে। আর এখানে?—আত্মনির্ভর হইলে মানুষের চরিত্র প্রকৃতরূপে বিকশিত হয়, সে কথা বোধ হয় ইঁহারা ধারণা করিতে পারেন না, তাই লাইসেন্স হোষ্টেলে ছেলেদিগকে আদুরে গোপাল করিয়া তুলিতেছেন। কিন্তু অল্পচিন্তা চমৎকারা! এরূপ অদ্ভুত ব্যবস্থা কতদিন চলিতে পারে? নন-কো-অপারেশন দেশে শুধু এক কারণে হয় নাই! আশুবাবু পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসের নিত্য সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার পূর্ব্বে একবার ছেলেদের পড়িবার সুবিধা করিয়া দিন,—দেখিতে পাইবেন সহস্র রকমের আন্দোলন সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা কত বাড়িয়া যাইবে। তাঁহার সাধের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের জন্যও তখন টাকার অভাব থাকিবে না।

পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাস গুলির রুটীন এমন ভাবে করা হয় যাহাতে ছেলেরা বি, এল ও এম, এ এক সঙ্গে পড়িতে পারে। আশুবাবু যদি কলেজের ক্লাস রুটীন এমন ভাবে করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন যে ট্রামের কণ্ডাক্টারী করিয়া, অথবা দোকানে খাতা লিখিয়া, অথবা কোন সামান্য চাকুরী করিয়াও ছেলেরা কলেজে পড়িতে পারে, তাহা হইলে দেশে শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে কি অনেক অধিক সাহায্য করা হয় না? আশুবাবু যে বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহাতে প্রকৃত পক্ষে শিক্ষাবিস্তারের সহায়তা না করিয়া ব্যাঘাত জন্মান হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। এত বিলাস সম্ভোগের মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা, এ যে কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ! 'ডেলিনিউজ' বলিয়াছেন 'India has been sacrificed at the altar of efficiency'—ভারতকে শাসন সৌকর্য্যের নামে বলি দেওয়া হইয়াছে। আশুবাবুকেও বলা যায়, 'শিক্ষা সৌকর্য্যের নামে বিশ্ববিদ্যালয়কে বলি দেওয়া হইয়াছে,—দেশের সর্ব্বনাশ সাধন হইয়াছে।'

তারপরে যতদূর দেখিতেছি ও শুনিতেছি তাহাতে এ বিশাল অট্টালিকাও যে শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যার কল্পনায় গড়িয়া উঠিয়াছে এরূপ মনে হয় না। অনেক সময় চাকুরী করিবার লোক রহিয়াছে বলিয়া চাকুরীর সৃষ্টি হয় নাই কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক জিনিষই কি অন্যের মুখ চাহিয়া করা হয় নাই?

আশুবাবুর আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটী প্রধান দোষ শুনিতে পাইতেছি। প্রথম, আজ কালকার পরীক্ষার মর্য্যাদাহানি ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া একটা ভয়ানক নীচ প্রবৃত্তির, পাপের স্রোত বহাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রামদাস খাঁর চাকুরী গিয়াছে সত্য, কিন্তু একই অপরাধে কাহারও কাহারও চাকুরীতে উন্নতি হইয়াছে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। 'প্রবাসীর' সত্য উত্তর কেহ দিতে পারেন নাই। তোষামোদ না কি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্ব বিদ্যার সার হইয়াছে।

দেশের কাছে আশুবাবু যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে দেশের লোকে তাঁহার কাছে কতগুলি প্রশ্ন করিবে। তিনি আজ ১৬ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের একচ্ছত্র সম্রাট রূপে যাহা কিছু করিয়াছেন তাহার হিসাব বুঝিয়া লইবার ন্যায়ত ধর্ম্মত সমস্ত অধিকার দেশের লোকের আছে। শুধু দেশের লোককে ধাপ্পা মারিয়া 'তোমরা বিশ্ববিদ্যালয় চাও না, তোমাদের মতিচ্ছন্ন হইয়াছে,' বলিলে চলিবে না। তিনি লেজিসলেটিভ কাউন্সিলকে হিসাব দেখাইতে কোন ন্যায় ধর্ম্ম অনুসারে অস্বীকার করিয়াছেন দেশবাসী জানিতে চাহিতে পারে। তিনি নন-কো-অপারেটর নহেন, তবে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলকে উপেক্ষা করিলেন কেন!—দেশের লোকের সন্দেহ তাহাতে বড়িয়া গিয়াছে। লেজিসলেটিভ কাউন্সিল হইতে যে অনুসন্ধান সমিতির (Enquiry Committee) প্রস্তাব হইয়াছে তাহার কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দেশের লোকে কথা বলিবে না। অশুবাবুর ও তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষগুণ বিচারের দিন আসিতেছে।

খুলনার দুর্ভিক্ষ

খুলনার দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট দেশবাসীর মুখে অন্ন দিবার জন্য শ্রদ্ধাস্পদ দেশচরিত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র যে কি পরিশ্রম করিতেছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাস্তবিক তাঁহার চেষ্টা না হইলে বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। যে পরিমাণে লোক অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে তাহার সহিত তুলনায় তাঁহারা এ পর্য্যন্ত যতদূর বন্দোবস্ত করিয়া উঠিয়াছেন তাহাও সামান্য। যেরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে কেহই যে অন্নাভাবে মারা যায় নাই এরূপ মনে হয় না। চারিটী লোকের মৃত্যু খবর প্রকাশ হইয়াছিল। কিন্তু খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেট অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়াছেন যে খবর সর্ব্বৈব মিথ্যা,—চারিটী লোক যারা গিয়াছে সত্য, তবে কেহ কলেরায় কেহ ম্যালেরিয়ায়। ইহারও প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে। আমরা দূরে বসিয়া কেবল এইটুকু মনে করিতেছি যে অনাহারে মৃত্যু কেবল ম্যাকসুইনির মত পঞ্চাশত্তর দিন জলবিন্দু স্পর্শ না করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা কিম্বা! অনাহারের জন্য শরীরের অবস্থা খারাপ হইয়া যায় নাকি,—এবং তখন কোন ব্যারাম হইলে কি সেই অনাহার ক্লিষ্ট ব্যক্তির জীবন রক্ষা করা খুব কঠিন হইয়া পড়ে না?—এরূপ মৃত্যুর কারণ কি অন্ততঃ আংশিক ভাবেও অনাহার নয়? এখানে একটা হাসির কথা মনে আসিতেছে। রিফর্ম স্কিমে ত রিজার্ভড ডিপার্টমেণ্ট গবর্ণমেণ্টের নিজের হাতে, আর তাহার মধ্যে পড়িতেছে দুর্ভিক্ষ। আর স্বাস্থ্য-বিভাগ গিয়াছে মন্ত্রীদের হাতে, বর্ত্তমানে সার সুরেন্দ্রনাথ সে বিভাগের কর্ত্তা!

সে কথা থাক্—জগতে বড় বড় দুর্ভিক্ষের সময় দেখা গিয়াছে আনুসঙ্গিক অনেক ব্যাধিরাম আসিয়া জুটিয়াছে। সে গুলিকে সাধারণ ব্যধরাধের খাতায় ফেলিয়া চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না, অনাহারের সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ আছে কি না হিসাব করিয়া দেখিতে হইবে? অনেক সময়েই দেখা গিয়াছে গবর্ণমেণ্ট কোন মৃত্যুকেই অনাহারের ফল বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু সাধারণ লোকে কেমন যেন সে কথা সব সময় মানিয়া লইতে চায় না। এই জন্য মনে হয় ইহার একটা নিরপেক্ষ মীমাংসা হওয়া উচিত।

মোটের উপর খুলনার অবস্থা যাহা বুঝা যাইতেছে তাহাতে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকের সংখ্যা কম নহে এবং দুর্ভিক্ষ কিছুদিন এখন থাকিবে বলিয়াই আশঙ্কা হয়। বাঙ্গালার জমিদারগণ বিশেষ কিছু সাহায্য করেন নাই বলিয়া দোষারোপ শুনা যাইতেছে। যদি সত্য হয় বড় দুঃখের কথা সন্দেহ নাই। দেশের লোক খাইতে না পাইয়া মারা যাইতেছে, এ সময় কোন তর্ক বিতর্ক চলিতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস বাঙ্গালার ধনীসম্প্রদায় শীঘ্রই এ কলঙ্কের ছাপ মুছিয়া ফেলিবেন।

বাঙ্গালায় চরকার প্রচলন কম কেন?

মহাত্মা গান্ধী বাঙ্গলা ঘুরিয়া যাহা দেখিয়া গিয়াছেন তাহাতে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। তিনি বাঙ্গলার ঘরে ঘরে চরকার শব্দ শুনিতে পান নাই। অবশ্য তিনি আশা করেন বাঙ্গালী শীঘ্রই তাহার কলঙ্ক অপনোদন করিবে। অনেকে বলেন, বাঙ্গালী গত ১৬ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে এখন কোন জিনিষ ভাল করিয়া না দেখিয়া শুনিয়া হঠাৎ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে। একথা কতকটা সত্য হইতে পারে, কিন্তু চরকা প্রচলনের কতকগুলি ব্যবস্থা আছে যাহা ঠিক রাষ্ট্রনৈতিক কি অর্থনৈতিক কোন হিসাবেই পড়িবে না। বাঙ্গলার পারিবারিক জীবনের যেরূপ গঠন তাহাতে আমরা জানি অনেক বিধবা দুমুঠা অন্নের হা-হা করিয়া বেড়ান। ঠিক পাটীগণিত ও অর্থশাস্ত্রের একত্রিত হিসাব না করিয়া, বোধ হয় তাহাদের চরকা দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলে অনেকপ্রকারে সাংসারিক ও সামাজিক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। আমাদের মনে হয় কংগ্রেসের প্রচারকগণ ঠিক এমন ভাবে গ্রামে গ্রামে চরকা প্রচারের ব্যবস্থা করেন নাই। তাহা হইলে কিছু সুফল ফলিত বলিয়া বিশ্বাস। অবশ্য কেবল আকাশের দিকে চাহিয়া স্বরাজের দিন গণিলে কোন লাভ হইবে না। এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ পাইলাম না বলিয়া নিষ্কর্ম্ম জড়বৎ হইয়া পড়িয়া থাকিলে চলিবে কেন? উপায় চরকা, তবে যদি ঔষধের পরিমাণ তোমরা কম করিয়া থাক তাহা হইলে চিকিৎসকের দোষ দেওয়া যায় না।

একদিন বাঙ্গালাই ভারতের কাপড় যোগাইত, এমন কি সুদূর ইউরোপ পর্য্যন্ত সে কাপড় সাধিয়া লইয়া যাইত। বাঙ্গালা আজও উর্ব্বরতা হিসাবে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ স্থান। কিন্তু যে কারণেই হউক, লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থা আর বাঙ্গলার হাতে নাই। বাঙ্গালী এ কলঙ্ক কি মাথায় বহিয়া বেড়াইবে? মহাত্মার আশা বাঙ্গালায় অবশ্যই ফলবতী হইবে।

Printed by P. N. Pal, at the Shastraprachar Press, 5 Chidammuji Lane, and
Published by P. N. Pal, 6-3 Scott Lane, Calcutta.

যমুনা

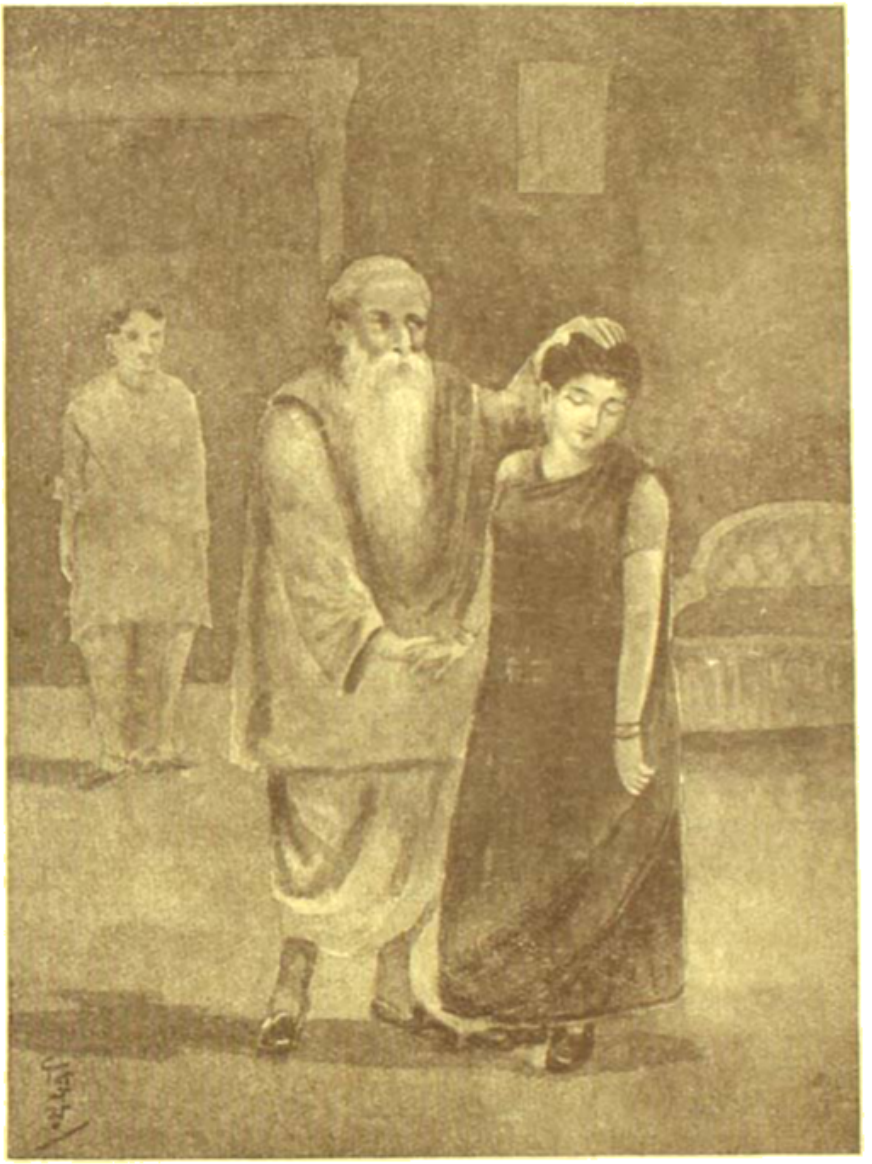

পরমেশবাবু উর্ম্মিলার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন "সব মিথ্যাকথা মা,—জুয়াচোর ব্রাহ্মণ আমাদের প্রতারণা করে গিয়েছে।"

যমুনা কার্ত্তিক ১৩১৮, মণিকাঞ্চন।

১১শ বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ | ৮ম সংখ্যা

চরকা-সঙ্গীত

(শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী)

আরো জোরে ঘোরাও চরকা, আরো সুতা চাই—
তিরিশ কোটি লোকের লজ্জা রাখ্‌তে হবে ভাই ;
ঘোরাও চরকা আপনার মনে একলা নিশীথ রাতে,
ঘোরাও চরকা সবাই মিলে' কর্ম্মপাগল প্রাতে,
ঘোরাও চরকা কর্ম্মের মাঝে কর্ম্মের অবসরে,
ঘোরাও চরকা কর্ম্ম ফেলে' একান্ত অন্তরে ;
শঙ্খ উঠুক্ আকাশ ছেয়ে ঘর্ঘর ঘর্ঘর,
সেই ঘর্ঘরে এক হয়ে যাক্ পর-ঘর ঘর-পর।
চাকায় চাকায় আগুন উঠুক্ হাতে পড়ুক্ ঘাঁটা,
চোখের দৃষ্টি আসুক ফিরে' বাড়ুক্ বুকের পাটা !

একশ' বছর দেখা গেছে উল্টে বয়ের পাতা,
একশ' বছর লেখা গেছে গোলামখানার খাতা,

একশ বচ্ছর, কম বড় নয়, জাতির ইতিহাসে,
ফল যা হ'ল, দেখা গেল—চোখ্ ফেটে জল আসে!
এত বড় প্রকাণ্ড দেশ শস্তে পণ্যে ভরা—
লক্ষ্মী যাহার ভক্তে অন্নে পুষ্ট সকল ধরা,
আজ দেখ তায় আপনার ঘরে নাইক অন্ন কারো,
লজ্জাবস্ত্র, তারো জন্ত পরের দেনা ধারো;
বিজ্ঞ যত বিদ্যাবাগীশ অতিবুদ্ধির দল,
এম্নি করেই সাধের দেশটা পাঠায় রসাতল!

আজ্‌কে তবে বারেক ফিরে' 'জয় মা ভারত' বলে',
একটা বচ্ছর দেখ্ দেখি ভাই নতুন পথে চলে';
যে বল্‌ছে আর যা বল্‌ছে সব পড়া পুঁথির ভাষা,
দুহাত দিয়ে দূর ক'রে দে বুঝি সর্ব্বনাশা;
একটা বচ্ছর কর্ ত দেখি আপ্‌নার ঘরের কাজ,
শোন্ দেখি আজ কি বলেন ঐ গান্ধী-মহারাজ!
সব ছেড়ে আজ ঘোরাও চরকা-চক্র-ঘূর্ণন,
কেটে যাবে সকল আঁধার বাধা ও বন্ধন;
চাকায় চাকায় উঠবে আগুন—হাতে পড়্‌বে ঘাঁটা—
সুতোয় সুতোয় পড়্‌বে ঢাকা দেশযোড়া লজ্জাটা।

একটা বচ্ছর, নয়ক বেশী, দেশের ইতিহাসে,
কেঁদে-কেটেই কাটছে ত তা সন্ধ্যায় বার মাসে
সুতো কেটেই, না হয়, বচ্ছর কাটুক্ এবারকার,
সে সুতো আজ আশার সূত্রে—দেশ জোড়া দরকার।
কর্কায় কর্কায় চর্কার উৎসব করুক সারা দেশ,
শুনুক সরকার পণ এবারকার শুদ্ধ নিনিমেষ;
লাগাও চরকা রাত্রি দিনে তিরিশ কোটি মেলি';
লাগাও চরকা গরুকামী সব ছেঁড়া অকাজ ফেলি',
পরাও খদ্দর ইতর ভদ্দর ঘরদোর সামলাও সব—
স্ত্রীলোক মর্দ্দ লাগাও হর্দ্দম চরকামহোৎসব।

হাঁকছে সর্দ্দার খুব খবরদার, মন দাও চরকার কাজে,
চর্কার আহ্বান চর্কার অভয়গান ঐ শোন্ কানে বাজে;
চর্কার গুণ-গুণ-গুঞ্জন লাগুক কাল্লনিকের কানে,
চর্কার ঝঙ্কার-ওঙ্কার বাজুক অধার্ম্মিকের প্রাণে;

চর্কায় টঙ্কার উঠুক বক্তা রাজনীতিকের মুখে,
চর্কায় মন্তর ভুলাক অন্তর তিরিশ কোটির বুকে ;
ঘর্ঘর ডাকে ঘর-ঘর গুরুক কর্ম্মের নূতন চাকা—
পাকে-পাকে যাক্ খুলে' আজ মোহের বাঁধন ফাঁকা ;
চাকায় চাকায় আগুন উঠুক, হাতে পড়ুক খাঁটা—
চোখের দৃষ্টি আসুক ফিরে, যাচুক্ বুকের পাটা !

দেবতত্ত্ব

[অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ]

দেবতত্ত্বের আলোচনা করিতে গেলে আমাদের সর্ব্বপ্রথমেই বুঝিতে হইবে—দেব বা দেবতা শব্দের অর্থ বা নিরুক্তি কি ? আমরা দেবতার পূজা, অর্চ্চনা করিয়া থাকি, দেবতা বলিতেও একটা কিছু বুঝি ; কিন্তু এখন যাহা বুঝি, বরাবর হয় ত তাহা বুঝিতাম না, আর বুঝিলেও বোঝার মধ্যে অনেক তারতম্য রহিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক হিন্দুর নিকট বেদ স্বতঃ-প্রমাণ, আর বেদের মন্ত্র হিন্দুর সকল প্রমাণের প্রমাণ। শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন, যদি বেদের মন্ত্র বুঝিতে চাও, সর্ব্বাগ্রেই তোমাকে মন্ত্রের ঋষি, দেবতা ও ছন্দঃ বুঝিতে হইবে ; তাহা না বুঝিয়া বেদমন্ত্র পাঠ করিলে, স্বাধ্যায় করিলে, জপ করিলে, হোম, যজ্ঞ বা যজন করিলে তোমাকে পাপভাগী হইতে হইবে। সেই জন্যই মহর্ষি কাত্যায়ন আদেশ করিয়াছেন—

দেব-শব্দের নিরুক্তি

"এতাস্তবিদিত্বা যোঽধীতেঽনুব্রুতে জপতি জুহোতি যজতে যাজয়তে তস্য ব্রহ্ম নির্বীর্য্যং যাতযামং ভবতি।"—সর্ব্বানুক্রমসূত্র।

বৃহদ্দেবতাকার শৌনক ঋষিও বলিয়াছেন, মন্ত্রের দেবতাকে ভাল করিয়া জানিতে হইবে ; যিনি দেবতাকে জানেন, তিনিই মন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া থাকেন। দেবতাকে ঠিক না বুঝিলে কেহ বৈদিক বা লৌকিক কর্ম্মের ফল পায় না।

বেদিতব্যাং দৈবতং হি মন্ত্রে মন্ত্রে প্রযত্নতঃ।
দৈবতজ্ঞো হি মন্ত্রাণাং তদর্থমধিগচ্ছতি ॥২
* * * * *
ন হি কশ্চিদবিজ্ঞায় ঘাথাতথ্যেন দৈবতম্।
লৌকিকানাং বৈদিকানাং কর্ম্মণাং ফলমশ্নুতে ॥৩
—বৃহদ্দেবতা, প্রথমাধ্যায়।

মহর্ষি কাত্যায়ন শুক্লযজুঃসংহিতার অনুক্রমণিকায় এই ঋষি ও দেবতা বলিলে কি বুঝায়, তাহার আভাস দিবার চেষ্টা করিয়া বলিয়াছেন,—যাঁহার বাক্য, তিনি ঋষি। তিনি যাহা বলেন, তাহা দেবতা। সেই বাক্যে যে বস্তু প্রতিপাদ্য হইয়া থাকে, তাহাও দেবতা।

যস্য বাক্যং স ঋষিঃ যা তেনোচ্যতে সা দেবতা।
তেন বাক্যেন প্রতিপাদ্যং যদ্যস্য সা দেবতা ॥"

এই বাক্যে দেবতা বস্তুর ইঙ্গিত আছে বটে, কিন্তু দেবতার ভিতর-বাহিরের কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। বেদে দেবতার কথা আছে, কিন্তু বৈদিক ঋষিগণের দেব সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা ছিল, তাহা বুঝাইবার মত কোন ঋক্ বেদে নাই, তবে বৈদিক সম্প্রদায়বিদ্‌গণের জ্ঞান-পারম্পর্য্যের ধারা নিরুক্ত

কালের সময়েও একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল না, প্রবচন-পরম্পরায় নিরুক্তকার যাস্কের সময়েও কীর্ত্তি-রেখায় সেই ধারা প্রবাহিত হইতেছিল। নিরুক্তকার যাস্ক কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় না। তবে প্রত্নতত্ত্বের অনুগ্রহে এক প্রকার স্থির হইয়াছে যে, যাস্ক আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। সেই সুপ্রাচীন কালে যাস্ক নিরুক্তের দৈবতকাণ্ডে [৭ম অধ্যায়, ৪র্থ পাদ, ১ম খণ্ড (১৫)] দেব-শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন :—

"... ... দেবো দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা যো দেবঃ সা দেবতা ... ..."

মহর্ষি পাণিনির ব্যাকরণের অনেক ভাষ্যকার আছেন। কিন্তু যাস্কবিরচিত নিরুক্তের ভাষ্যকার অতি অল্প।

উগ্র, স্কন্দস্বামী, দেবরাজযজ্বা, দুর্গ প্রভৃতি কয়েকজন নিরুক্ত-ভাষ্যকার আছেন। ইঁহাদের মধ্যে অত্রিগোত্র দেবরাজযজ্বা ও দুর্গাচার্য্যের ভাষ্যই বিশেষভাবে উল্লেখ্য। দেবরাজযজ্বা যাস্কলিখিত নিঘণ্টুর নির্ব্বচনভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি এই বচনের এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন—ঐশ্বর্য্য দান করেন বলিয়া অথবা তেজোময়ত্ব হেতু "দেব" এই নাম হইয়াছে। এইরূপ যে দেব দ্যুস্থানস্থ হ'ন, তিনি দেবতা। অন্যত্র (পঞ্চমাধ্যায় ষষ্ঠ খণ্ডে) ইনি যাস্কের দেব শব্দের এইরূপ অর্থনির্ণয় করিয়াছেন—

'দিবাতি দানার্থো দীপ্ত্যর্থো বা [পচাদ্যচ্ ৩, ৩, ১৩৪)]।' তাঁহার মতে দিব্ ধাতুর দুইটী অর্থ —একটী অর্থ দান আর একটী দীপ্তি। দানার্থ দিব্ ধাতুনিষ্পন্ন দেবসংজ্ঞা বুঝাইতে তিনি বলিয়াছেন যে, ভক্তগণকে যিনি তাহাদের অভিমত দান করিয়া থাকেন, তিনিই 'দেব'—

"দাতারোঽভিমতানাং ভক্তেভ্যঃ"।

অতঃপর দেবশব্দের দীপ্ত্যর্থ সম্বন্ধে বলিয়াছেন —"তৈজসত্বাদ্দীপ্তা বা। দ্যুতের্বাপি বাহুলকাদ্রূপ-সিদ্ধিঃ।' কুল্লুকভট্টও মনুসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায় ১১১ শ্লোকের টীকায় ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—

"দ্যোতনাদ্দেবঃ"

ইহা ছাড়া দেবশব্দের তিনি আরও একটী অর্থ করিয়াছেন। দ্যুঃ বা অন্তরিক্ষ সম্বন্ধী যাঁহারা, তাঁহারা দেব—"দিবঃ সম্বন্ধিনো বা দেবাঃ। দ্যু-স্থানা ইত্যর্থঃ"। এই দেবতার অর্থ "রশ্মি"। 'দেবা রশ্ময় উচ্যন্তে।' এই অর্থের সমর্থনসূচক ঋক্‌সংহিতার বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

"দেবানাং ভদ্রা সুমতির্ঋজূয়তাম্"

(১৷৮৯৷১৷৫৷২)

পাণিনি তাঁহার ধাতুপাঠে 'দিব্' ধাতুর দশটী অর্থ দিয়াছেন। সেই দশটী অর্থ এই,—

১। ক্রীড়া
২। বিজিগীষা
৩। ব্যবহার
৪। দ্যুতি
৫। স্তুতি
৬। মোদ —হর্ষ
৭। মদ
৮। স্বপ্ন—নিদ্রা
৯। কান্তি
১০। গতি

এই দশ প্রকার অর্থযুক্ত 'দিব্' ধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া 'দেব' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। দেব ও দেবতা একই। 'দেব' শব্দের উত্তর 'তল্' প্রত্যয় করিয়া 'দেবতা' শব্দ সাধিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে পাণিনির সূত্র হইতেছে—'দেবাত্তল্'—৪।১।২৭।

আনন্দগিরি * শঙ্করবিরচিত ছান্দোগ্যোপনিষদ-

* আনন্দগিরির টীকায় 'দিব্' ধাতুর দশটী অর্থের সংবাদ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সাধু শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সান্যাল মহাশয় তাঁহার প্রণীত 'মানবতত্ত্ব' গ্রন্থে (৪১০ পৃঃ) প্রথম প্রদান করেন।

ছান্দোগ্যের টীকায় "দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে উভয়ে প্রজাপত্যাস্তদ্ধ দেবা উদ্গীথমাজহ্রুরনেনৈনানতিভবিষ্যাম ইতি—(১।২।১)" এই ছান্দোগ্য-বাক্যের 'দেব' শব্দের অর্থ বুঝাইতে পাণিনির দিব্ ধাতুর দশটী অর্থ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

"দিব্যতের্দ্যোতনার্থো দিব্ ক্রীড়াবিজিগীষা-ব্যবহারদ্যুতিস্তুতিমোদমদস্বপ্নকান্তিগতিষিতি দর্শনাত্তস্য চাদন্তস্য সতি গুণে কর্ত্তরি যথোক্তরূপসিদ্ধিরিত্যর্থঃ।"

বৈদিক ঋষিগণ কোন্ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া 'দেব' শব্দ উচ্চারিত করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার উপায় না থাকিলেও পাণিনির 'দিব্' ধাতুর দশবিধ অর্থসাহায্যে মানবতত্ত্ববিদ্গণের ভাষায় বলিতে পারা যায় যে, "যিনি ক্রীড়া করেন, যাঁহার লীলাকৈবল্যই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ, যিনি অসুরগণের বিজিগীষু, পাপনাশক, যিনি সর্ব্বভূতে বিরাজমান, ব্যাবহারিক জগতে যিনি স্থাবর, জঙ্গম—নানারূপে ব্যবহৃত হয়েন, যিনি দ্যোতনস্বভাব, যাঁহার প্রকাশে নিখিল বস্তু প্রকাশমান, যিনি সকলের স্তুতি-ভাজন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহারই গুণকীর্ত্তন করে, যাঁহারই বিভূতি—ঐশ্বর্য্য খ্যাপন করে, যিনি সর্ব্বত্র গতিশীল, সর্ব্বব্যাপক, যিনি জ্ঞানময়—চৈতন্যস্বরূপ, অখিল-পতির যিনি লক্ষ্যস্থল, তিনি 'দেব'—তিনি 'দেবতা'।

যাস্ক, পাণিনি প্রভৃতির পর কত যুগ কাটিয়া গিয়াছে, কত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া দেবব্যঞ্জক ভাবেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কোথাও বা পরম্পরাগত ভাবের প্রভাবে প্রাচীন অর্থ গৃহীত হইয়াছে, আবার কোন কোন স্থানে কোন কোন বিশেষ অর্থই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আট শত বৎসর পূর্ব্বে সায়নাচার্য্য ঋগ্বেদানুক্রমণীতে বলিয়াছেন, দেবনার্থে 'দিব্' ধাতু হইতে দেবশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; এই জন্যই 'দেব' এইরূপ বলা হইয়া থাকে। দেবন (ক্রীড়া) হেতু দেব হইয়াছে; অতএব দেবগণের দেবত্ব।

'তথা দেবনার্থে দীব্যতি ধাতুনির্দ্দিষ্টো দেব-শব্দ ইত্যেতদাত্মাতে। দেবনাদ্বৈ দেবোঽভূদিতি—তদ্দেবানাং দেবত্বমিতি।'

ঋষি যাস্ক তাঁহার পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মতের অনুবর্ত্তী হইয়া, দেবতাদের সংখ্যা একেবারে কমাইয়া তিন সংখ্যায় পরিণত করিয়াছেন। তিনি বলেন, দেবতা তিনটী পৃথিবী-স্থান-দেবতা অগ্নি অন্তরীক্ষস্থান-দেবতা বায়ু বা ইন্দ্র এবং দ্যুস্থান-দেবতা সূর্য্য।

দেবতার সংখ্যা

'তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তা অগ্নিঃ পৃথিবী-স্থানো বায়ুর্বেন্দ্রো বান্তরিক্ষস্থানঃ সূর্য্যো দ্যুস্থানঃ" —নিরুক্ত, ৭ম অধ্যায়, ২য় পাদ, ১৭শ (৫)।

নিরুক্তকারের এই উক্তির প্রমাণস্বরূপ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৫৮ সূক্তের প্রথম ঋকের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

'সূর্য্যো নো দিবা পাতু বাতো অন্তরিক্ষাৎ।
অগ্নির্নঃ পার্থিবেভ্যঃ।'

মহাভাগ্যহেতু দেবতার একই আত্মা বহু প্রকারে স্তুত হয়। এই জন্যই ইঁহাদের বহু নাম ('মহাভাগ্যা-দ্বৈকৈকস্যা অপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি।"—নিরুক্ত ৭।২।১(৫))

এই ত্রিদেব ব্যতীত বেদে দেখিতে পাওয়া যায়, দেবতার সংখ্যা ৩৩৩৯ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

(ক) আ নো যজ্ঞা ত্রিভিরেকাদশৈরিহ দেবেভির্যাতং মধুপেয়মশ্বিনা।—ঋগ্বেদ ১।৩৪।১১

(খ) ত্রয়স্ত্রিংশাসো হি শাস্তরে দেবা অগ্নে বিজেষাঃ। তাংস্ত্রিরহ্নিষ্য দিবেদিবে ত্রিংশতং বহ।—ঋক্ ১।৪৫।২

(গ) যে দেবাসো দিব্যেকাদশস্থ পৃথিব্যামধ্যেকাদশস্থ। অপ্সুক্ষিতো মহিনৈকাদশস্থ দেবাসো যজ্ঞমিমং জুষধ্বম্। ঋক্—১।১৩৯।১১

(ঘ) যে ত্রিংশতি ত্রয়পরো দেবাসো বর্হিরাসদন্। বিদন্নহ দ্বিতাসনন্। ঋক্ ৮।২৮।১

(ঙ) ইতি স্তুতাসো অসথা বিপাদসো যে স্থ ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ।

অনোর্দেবা অবসাযজ্ঞিয়াসঃ।

(৫) বিশ্বেদেবৈস্ত্রিভিরেকাদশৈরিত্যাদিব'হুত্বোক্তিঃ সত্যাহুবা। কল্প। ৮।৩৫।৩

(৬) তবৈতা দেবাঃ পবমান বিশ্বে বিশ্বে দেবাসস্তর একাদশা স্থঃ। ৯।৯২।৫

শতপথব্রাহ্মণ—৪, ৫, ১, ২ এবং মহাভারত বনপর্ব্ব ১১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১। ঋগ্বেদে ৩০০৯ দেবতার উল্লেখ—

ত্রীণিশতা ত্রী সহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্যন্। ৩।৯।৯

এ সম্বন্ধে শতপথ ব্রাহ্মণ—১১।৬।৩।৪ ও

শাঙ্খায়নশ্রৌতসূত্র—৮।২১।১৪ দ্রষ্টব্য।

বৃহদারণ্যক বা বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণোপনিষদে তৃতীয় অধ্যায় নবম ব্রাহ্মণ) দেবতার সংখ্যা লইয়া একটী আখ্যায়িকা আছে। এই আখ্যায়িকা সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। আপাততঃ, ইহাতে দেবতার কথা যেরূপ আছে, আমরা তাহাই বলিতেছি।

বৈদগ্ধ শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—দেবতার সংখ্যা কত, যাজ্ঞবল্ক্য ?—তিনি উত্তর করিলেন, ৩০৩ এবং ৩০০৩।

ও! তাই—ঠিক করিয়া বলুন, দেবতার সংখ্যা কত ? তিনি বলিলেন—৩৩।

যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতার সংখ্যা কত ?—তিনি বলিলেন—৬।

তাই নাকি ? ঠিক করিয়া বলুন দেবতার সংখ্যা কত ? তিনি বলিলেন—৩।

তাই বুঝি ! ঠিক করিয়া বলুন, দেবতার সংখ্যা কত ? তিনি বলিলেন—"দুই"।

সেকি ? ঠিক করিয়া বলুন, দেবতার সংখ্যা কত ? তিনি বলিলেন—"দেড়"।

বেশ ! ঠিক করিয়া বলুন, দেবতার সংখ্যা কত ? তিনি বলিলেন—"এক"।

৩০৩ এবং ৩০০৩ এই দেবতারা কাহারা ? তিনি বলিলেন, ইহারা দেবতাদিগের শক্তি। বস্তুতঃ দেবতাদের সংখ্যা ৩৩।

ইহারা কাহারা ?

তিনি বলিলেন—ইহারা অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, ইন্দ্র এবং প্রজাপতি। *

বসু কাহারা—অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, আদিত্য, স্বর্গ, চন্দ্র ও নক্ষত্র।

রুদ্র কাহারা ?—মানুষ ও দেবতার মধ্যে যে দশটী প্রাণ বায়ু, তাহাই রুদ্র।

আর আদিত্য ?—বৎসরের দ্বাদশ মাস।

ইন্দ্র ও প্রজাপতি কাহারা ? ইন্দ্র—বজ্র ; প্রজাপতি—গোগণ।

আপনি যে ছয় দেবতার কথা বলিলেন, তাঁহারা কে ?—অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য ও দ্যৌ।

বেশ, তিন দেবতা কাহারা ?—এই তিন লোক, ইহাদের মধ্যেই সমস্ত দেব রহিয়াছেন।

আচ্ছা, দুই দেব কাহারা ?—অন্ন ও প্রাণ।

এইবার বলুন, দেড় দেব কে ?—যিনি এখানে পবমান হইতেছেন (অর্থাৎ বায়ু)।

এক দেব কে ?—প্রাণ।

শতপথ ব্রাহ্মণ উপদেশ করিয়াছেন যে, পূর্ব্বেও দেবতার সংখ্যা যত ছিল, এখনও তাহাই আছে। সংখ্যার ইতরবিশেষ হয় নাই। এই ব্রাহ্মণে এক স্থানে আছে যে, তেত্রিশটী দেবতার একাদশটী স্বর্গে, একাদশটী পৃথিবীতে এবং একাদশটী জলে অবস্থিতি করেন। এই গ্রন্থের অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, বসুগণ, রুদ্রগণ ও আদিত্যগণভেদে দেবতা ত্রিবিধ। আবার শতপথের অপর এক স্থানে ইঁহাদিগকে সপ্তবিধ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এ ছাড়া এই গ্রন্থোদ্ধৃত ৩০টী দেবতার কথা আছে

* শতপথ ব্রাহ্মণেও (১১।৬।৩।৪) এই একই বাক্য পুনরুক্ত হইয়াছে—

"কতমে তে—ত্রয়স্ত্রিংশদিত্যাহো বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যাস্ত একত্রিংশৎ ইন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশা ইতি।"

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। গৃহ্যসূত্রে ৩৩টী দেবতকে ব্রহ্মাত্মজ বলা হইয়াছে। শতপথে উক্ত হইয়াছে যে, দেবতার সংখ্যা পরিবর্ত্তিত হয় না। ত্রিলোকই যে ত্রিদেব, তাহা শতপথ ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক মানিয়া লইয়াছেন।

ঐতরেয় আরণ্যক দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডে দেবতাদের একটী বড় ফিরিস্তি দিয়াছেন, তাহার পরিচয় এইরূপ,—

ভূমা চিন্তা করিলেন,—"লোক-সম্বন্ধে আমি লোকপাল প্রেরণ করিব।" অমনই জল হইতে পুরুষ সৃষ্টি করিলেন।৪।

তিনি পুরুষের উদ্দেশে ধ্যানস্থ হইলেন, অমনই ডিম্বের ন্যায় একটী মুখ বাহির হইল। অতঃপর মুখ হইতে বাক্, বাক্ হইতে অগ্নির প্রাদুর্ভাব হইল। তারপর নাশাছিদ্র উদ্ভূত হইল, তাহা হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে বায়ুর আবির্ভাব হইল।

এইরূপে ক্রমশঃ—

চক্ষু	হইতে	দৃষ্টি,	তাহা	হইতে	আদিত্য
কর্ণ	,,	শ্রবণ,	,,	,,	দিক্
ত্বক্	,,	কেশ,	,,	,,	বৃক্ষ, লতা
হৃদ্	,,	মন,	,,	,,	চন্দ্রমা
নাভি	,,	অপান,	,,		মৃত্যু
লিঙ্গ	,,	বীর্য্য,	,,		জল

উদ্ভূত হইল।

অগ্নি ও ঐ সমস্ত দেবতা সৃষ্ট হইয়া মহাসমুদ্রে পতিত হইল। তখন পরমাত্মা ইহাদিগকে ক্ষুধা তৃষ্ণায় অভিভূত করিলেন।১।

তাহারা ক্ষুৎপিপাসাতুর হইয়া পরমাত্মাকে বলিলেন, আমাদের অবস্থিতি ও আহারের জন্য আমাদিগকে একটী স্থান দিন।

তিনি প্রথমে গাবী, তারপর একটী গৃহ সমানয়ন করিলেন।

তাঁহারা তাহাতে পরিতুষ্ট হইলেন না। তখন তিনি মানুষকে তাঁহাদের নিকট দিলেন, তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—উত্তম।২।

তিনি তখন প্রত্যেককে প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে বলিলেন।৩।

তখন

অগ্নি	বাক্ রূপে	তাঁহার মুখে	প্রবেশ করিলেন।
বায়ু	প্রাণ	নাসিকাগহ্বরে	,,
আদিত্য	দর্শন	চক্ষুতে	
দিক্	শ্রবণ ,,	কর্ণে	
বৃক্ষলতা	কেশ	ত্বকে	
চন্দ্রমা	মন ,,	হৃদয়ে	
মৃত্যু	অপান ,,	নাভিতে	
জল	বীর্য্য ,, ,,	লিঙ্গে	,,

তখন ক্ষুৎ-পিপাসা তাঁহার নিকট থাকিবার স্থান প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন, "ঐ সমস্ত দেবতাই তোমার স্থান, তাহাদের সহিত তোমরা সমস্ত ভোগ কর।৪।

তারপর তিনি স্ত্রীগণকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে বলিলেন। ৩অ-১ কাণ্ড—১।

তারপর দেবতারা জিজ্ঞাসা করিলেন—যাহাকে আমরা আত্মা বলিয়া ধ্যান করি, তিনি কে ?।২।

যাহাদ্বারা আমরা দেখি, শুনি, গন্ধ গ্রহণ করি, কথা কহি, মিষ্ট অমিষ্টের পার্থক্য করি, মন ও হৃদয় হইতে যাহা বাহির হয়, তাহা কি ?

তিনি বলিলেন, এগুলি জ্ঞান বা আত্মার বিভিন্ন নাম মাত্র।৩।

আর জ্ঞান-সম্বলিত সেই আত্মা—ব্রহ্ম। তাহাই ইন্দ্র, তাহাই প্রজাপতি।৪।

এই সমস্ত দেবতা জ্ঞান বা আত্মা হইতে সম্ভূত।

গান্ধী মহারাজ

(শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী)

কে ঐ চলে বিপুল বলে
সমুখ পানে চাহি'—
উদার ধীর অতি গভীর
চোখে পলক নাহি ;
সরল পথে সহজ মতে
সমান ঋজু গতি
ডানে বা বামে কভু না থামে
জানেনা লাভ ক্ষতি ;
ব্যথিত লোকে অভাবে শোকে
সেবিতে সদা মন,
দীনের তরে নয়ন ঝরে
করে পরাণপণ
পরের লাগি' সর্ব্বত্যাগী
ভুলিয়া ভয় লাজ !
কে বা এ জন ? হাঁকে পবন,
গান্ধী মহারাজ !

ভারতবাসী গৃহী ও চাষী
কাহার মুখ চাহি'
নবীন বলে মাতিয়া চলে
আশার গান গাহি',
মজুর কুলি অভাব ভুলি'
কাহার জয়গীতে,
পরাণ মন জীবন পণ
চাহে বা বলি দিতে ;
ধনী ও মানী গুণী ও জ্ঞানী
গরীব গৃহহীন,
কাহার কাছে শরণ যাচে
শুধিতে নারে ঋণ ;
নিখিল লোক মেলিয়া চোখ
নমিছে কারে আজ ?
দেশমাতার কণ্ঠহার
গান্ধী মহারাজ !

পরের 'পরে আশা না ধরে—
নিজেতে নির্ভর,
সুসমাহিত শান্ত চিত
শুদ্ধ কলেবর ;
সরল বাস সহজ ভাষ
সত্যপথকামী,
দেশের হিত কাহার চিত
ভাবিছে দিনযামি ;
বিরোধী ভায়ে মায়ের পায়ে
মিলায়ে নিজ গেহে ;
সবারে ডাকি' মিলন-রাখী
পরা'ল কে বা স্নেহে ;
হিন্দু টানে মুসলমানে
নিজ বুকের মাঝ—
অসাধ্যকে সাধিল ও কে ?
গান্ধী মহারাজ !

অমিলে কে সে মিলায় দেশে
অচলে করে চল,
কাহার চিত শক্তিমিত
অস্ত্র দুর্ব্বল ;
অনহযোগে মৃত্যুরোগে
নিত্য বিধি কার
ফিরায়ে আনে দেশের প্রাণে
বাঁচার অধিকার ;—
যে বাঁচা মানে সকলে জানে
স্বাধীন মত দেশে,
কারার পথে লোহার রথে
যাত্রা যায় হেসে ;
যে বাঁচা মানে বিধাতা জানে
অমৃতলোকমাঝ—
এ বাণী কে সে শিখাল দেশে ?
গান্ধী মহারাজ ।

বৃন্তচ্যুত

(উপন্যাস)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীবিমলাভি চৌধুরী বি. এ.)

(১৬)

সকাল বেলা শশী ভাঁড়ার ঘরে বসিয়া কুটনো কুটিতেছিল। এমন সময় সনত আসিয়া চৌকাঠের উপর উচু হইয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, "কেমন আছ শশী দিদি ?"

"অমনি এক রকম করে দিন কেটে যাচ্ছে—তুমি কেমন আছ সনত ?"

সে বলিল, "আমি ভালই আছি।"

সনত ভাবিয়া আসিয়াছিল, যে মিথ্যা অভিযোগটা সে আজ গ্রামে পা দিয়াই শুনিয়াছে সেটাকে কথার ছলে শশীর নিকট পাড়িবে এবং সে সম্বন্ধে শশীর মনের ভাবটা কোন্ শ্রেণীর সেটাও একবার জানিয়া লইবে, কিন্তু গোড়া পত্তন করিবে সে কি দিয়া তাহাই সে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

শশী বলিল, "কেমন পরীক্ষা দিলে ?"

অন্যমনস্ক ভাবে সনত বলিল, "মন্দ নয়।"

তারপর হঠাৎ চোখ কাণ বুজিয়া সে বলিয়া ফেলিল, "গ্রামের যত ইতর লোকে তোমাদের নামে যে সব কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে—তার জন্যে ওদের আমি সহজে ছাড়ছি না শশী দিদি।"

হেঁট মুখে আলু ছাড়াইতে ছাড়াইতে শশী বলিল, "তাতে করে আমাদের কি ক্ষতি হয়েছে সনত ?"

সনত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।—তার ইচ্ছা হইতে লাগিল—শশীর পা দুটোকে প্রাণপণ বলে মাথার উপর চাপিয়া ধরে।

শশীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাড়ী ফিরিবার সময় সনত বলিল, "তোমাকে কখন নমস্কার করি নি শশীদিদি—আজ—"

সসব্যস্তে শশী চীৎকার করিয়া উঠিল, "মাথা খাও সনত অমন কাজ কোরো না" এবং সনত হেঁট হইবার পূর্ব্বেই সে ছুটিয়া সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

বাড়ী ফিরিবার পথে চক্রবর্ত্তী মশাই ডাকিয়া বলিলেন, "কে ও সনত না !"

সে বলিল, "হাঁ।"

কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া চক্রবর্ত্তী বলিল, "তোমার চন্দ্রধরার গুণের কথা সব শুনেছ ?"

গম্ভীর ভাবে সে বলিল, শুনেছি।"

"আর ঐ ছুঁড়িটার কথা ?"

অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে সনত বলিল, "ভদ্রতার বাইরে যাবেন না চক্রবর্ত্তী-জ্যাঠা।"

চক্রবর্ত্তী ছিটকাইয়া উঠিল, "আমাকে ভদ্রতা শেখাতে এসেছিস্ এতবড় স্পর্দ্ধা তোর—মুখ খসে যাবে না !"

সনত কি বলিতে যাইতেছিল—হঠাৎ কি ভাবিয়া থামিয়া গেল।

• • • •

সনতের বাপ নিরোধ চাটুয্যে পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, "এসব শুনছি কি বল ত ?"

সনতের মা বলিলেন, "শুনছ মাত্র, চোখে ত আর দেখ নি।"

গড়গড়ার নলটা মুখ হইতে খসাইয়া লইয়া নিরোধ চাটুয্যে বলিলেন, "তাত দেখিনি, কিন্তু লোকে যে আমাদের পর্যন্ত ছুঁয়ছে - সেইটেই ত হয়েছে মুস্কিল, তা না হলে যা ইচ্ছে তাই করুক্‌গে না ছাই—আমার কি বল না?"

"তা কি করতে হবে শুনি?"

"করব আর কি মাথামুণ্ড, তবে কি না ওদের সঙ্গে মেলা মেশাটা একটু—"

"কেন অপরাধ!"

"বলি পাঁচজনকে নিয়ে মানিয়ে চলতে হবে ত।"

এই বলিয়া চাটুয্যে মশাই নলটা আবার মুখে তুলিয়া লইলেন।

"কিন্তু পাঁচজনে যদি মিলেমিশে না থাকতে চায় ত আমরা কি করব? আর তাছাড়া ওরা শুধু শুধু একজন নিরীহ স্ত্রীলোকের নামে যে মিথ্যে করে যা তা সব রটিয়ে বেড়াচ্ছে এর জন্যে তুমি কোথায়—"

বাধা দিয়া চাটুয্যে বলিয়া উঠিলেন, "সব ত বুঝলুম! কিন্তু গ্রাম শুদ্ধ লোকের মুখে ত আর হাত চাপা দিতে পারি না।"

"গ্রাম শুদ্ধ লোকের মুখে যখন হাত চাপা দিতে পার না, তখন আমি বলি নিজের কানে হাত চাপা দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

চাটুয্যে বলিলেন, "তুমি ত সোজা কথা বলে খালাস, কিন্তু কথা শুনতে শুনতে আমার যে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠলো।"

সনতের মা বলিলেন, "না শুনলেই পার।"

সন্ধ্যার সময় শশী রান্নাঘরের সুমুখে দাওয়ার উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সারাদিন ধরিয়া বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তাহারি সজলতা, গাছ, পালা, পথ, ঘাট, সমস্তকেই কেমন যেন বিষাদময় করিয়া তুলিয়াছিল। কে জানে কেন শশীর আজ কেবলি কান্না আসিতেছিল। আর মনে হইতেছিল তার এই বিড়ম্বনায় জীবনটা যেন আজিকার এই করুণ আষাঢ় সন্ধ্যারই মত অশ্রুময় এবং বিষাদপূর্ণ, কেবলি কান্না আর কান্না। একদিন সে মনে করিয়াছিল সমাজের বাঁধাধরা এবং গতানুগতিক নিয়ম কানুন গুলোর যে পাকাসড়কটার উপর দিয়ে রাজ্যশুদ্ধ লোক দিনের পরদিন নিশ্চিন্ত ভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহারি আশে পাশের ঐ কাঁটাঝোপ গুলো ভাঙিয়া চলিবার যে বিড়ম্বনা, তাহাই বুঝি তার জীবন যাত্রাটাকে এমন শুষ্ক এবং রসহীন করিয়া তুলিয়াছে, এবং বুঝিবা কোন না কোন উপায়ে সে সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া একটিবার শুধু এই পাকাসড়কের যাত্রীর ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া যাইতে পারিলেই তার জীবনটা আবার সরল এবং সহজ হইয়া পড়িবে।—কিন্তু তাত হৈ হইল না! আজ তার মনে হইতেছিল, এই যে বাঁধাধরা চলা ফেরার পথটা, যার উপর দিয়া চলিতে গেলে চোখের ও দরকার নেই কাণের ও দরকার নেই—দরকার কেবল সোজা চলিয়া যাওয়ার,—ইহারি অভাব কি তার জীবনটাকে প্রতিদিন বিড়ম্বনাময় করিয়া তুলিয়াছিল এবং আজ তার জীবনটা কি সত্য সত্যই সমস্ত অবসান, সমস্ত অসন্তোষকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মুক্তির আনন্দে হাসিতেছে?—কৈ না!—আজও ত তার অন্তরটা তেমনি করিয়াই ভিতরে ভিতরে গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া মরিতেছে।—শান্তি নাই—আর শান্তি নাই!—এখানেও তার শান্তি নাই।—কাঁটা ঝোপের ঐ দুর্গম সঙ্কটপূর্ণ পথটা কাঁটার উপর কাঁটা তার সর্ব্বাঙ্গে ফুটাইয়া দিয়াছে—আজ সে তা অস্বীকার করিতে পারিবে না। তাহার হাতে বাঁচিবার জন্যে সে, পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে যে সোজা পাকা-পথটা, তারি উপর একদিন চোখ কাণ বুজিয়া উঠিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু আজ তার মনে হইতে লাগিল,—ঐ কাঁটা-ভাঙা পথটার আর এক দিকে যে উদাস সবুজ মাঠটা

দিক-হারা পথিকের মত ধম্ ধম্ করিতেছে, তাহারি কাছে গিয়া সে কেন দাঁড়াইল না ;—এই পথ-হারা পথিকটির পথ না-পাওয়ার ইতিহাসটাই যে তার কাছে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ—আজ এতদিন পরে এই আষাঢ় সন্ধ্যার উদাস মোহনা বাতাস সে কথা কেবলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিয়া ফিরিতেছে। শান্তি নাই, তার শান্তি নাই! —এখানে তার একটুকুও শান্তি নাই।

হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া সনৎ হাঁক ডাক সুরু করিয়া দিল—"বড্ড খিদে পেয়েছে শশীদিদি, —আজ আর পেসাদ না পেয়ে উঠছিনা কিন্তু—"

"তা কখনই হতে পারে না সনৎ!—এখানে তোমার খাওয়া কোন মতেই হতে পারে না!—" বলিয়া শশী যেমন চুপ করিয়া বসিয়াছিল তেমনিই বসিয়া রহিল।

"কেন হতে পারে না?—আমি বামুন আর তোমরা শুদ্দুর বলে?—এদিকে কলকাতায় মোহনভোগের রান্না পর্য্যন্ত খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেল, আর দেশে ফিরে এসে যত সাউণ্ডুণ্ডী বুঝি তোমাদের ওপর করতে হবে। না না,ওসব কোন কথা শুনতে চাই না শশীদিদি;—না খেতে দাও ত হাঁড়ি কুড়ি ভেঙ্গে খেয়ে যাবো—এ আমি বলে দিচ্ছি কিন্তু!"

অত্যন্ত করুণ স্বরে শশী বলিল—"সে হয়না সনৎ হয় না।—লোকে কি বলবে ভাই?"

"লোকে?—আমি লোকের ভয় করি না শশী দিদি; অত কথায় কাজ কি.—ও পাড়ার বিন্দীকে তুমি চেন ত? ঐ যে বোষ্টমী মাগী—সে ত এককালে বেশ্যা ছিল, এর চেয়ে আর ছোট জাত কি হবে!—তার ও ঘরে আমি শিরোমণিদাদাকে দেখিয়ে দেখিয়ে দিব্যি করে কলার করে এসেছি।

শশী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—অন্ধকারে কেউ কাহার ত মুখ দেখিতে পাইতেছিল না—শশী তাই আজ বাঁচিয়া গেল।

"সনৎ ডাকিল—"শশী দিদি?"

"কি ভাই!"—

তুমি আজ অমন চুপ করে রয়েছ কেন বল ত?"

হঠাৎ জোর করিয়া হাসিয়া হাসিয়া শশী বলিল, "চুপ করে?—কৈ না!—

"না, সত্যি শশী দিদি, আমি আর তোমার হাতের রান্না না খেয়ে কিছুতেই উঠছি না।"

সে কথার কোন জবাব না দিয়া শশী বলিল, "বিন্দির বাড়ীতে কলার করে একটুও ভাল কাজ করিনি সনৎ।"

"ভাল কাজ করিছি কিনা জানিনা শশীদিদি! তবে, মন্দ কাজ যে একটুও করিনি তা খুব জোর করে বলতে পারি! তুমি ত সব কথা জান না শশীদিদি! ঐ বিন্দি কি চিরকাল অমনি ছিল মনে করেছ? চন্দরদা বলছিল, ঐ বিন্দি এককালে ভজর ঘরের বউ ছিল। বেচারার অপরাধের মধ্যে একদিন ঘাটে গা-ধুতে গেছে এমন সময় বোসেদের ছোটকর্ত্তা —নাকি একলা পেয়ে ওকে কি অপমান করে।—এই আর কোথায় আছে—সমাজের যত কুকুর গুলো কেঁউ কেঁউ করে উঠলো—"ওকে বাড়ী থেকে বার করে দাও।" চন্দরদা বলছিল· বিন্দির স্বামীর সে কি কান্না—সে তাহার স্ত্রীকে নাকি বড্ড ভাল বাসতো!—কিন্তু কি করে?—সমাজের কুকুরগুলো এখুনি ছিঁড়েকুটে খাবে! বিন্দির বাপের ঘর এখান থেকে বেশী দূর নয়।—বেচারা সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই তারাও তাড়িয়ে দিলে। সেখানেও ত ডালকুত্তোর অভাব নেই! শুনেছি বেচারা ৫ দিন উপোস করে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছিল। তার পর পেটের দায়ে—"

অন্ধকারে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া শশী বলিল, "তুমি এখন যাও সনৎ,—আমার শরীরটা বড্ড খারাপ হয়েছে। মাথাটা একেবারে ঘুরে যাচ্ছে,—আর বসতে পারছি না, শুয়ে পড়িগে।—কিছু মনে কোরো না ভাই—কাল আবার এসো!" এই

বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই শশী শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

প্রসন্ন আসিয়া বলিল—"সন্ধ্যে না হতেই শুলি যে বড়?—মাথা ধরেছে বুঝি—খেতে দেতে—"

কথাটাকে শেষ করিতে না দিয়াই শশী বলিয়া উঠিল, "আমাকে জ্বালাস্ নে সেজদা—একটু চুপ করে শুয়ে থাকতে দে—"

"আমি নে বাপু! মেয়ের যেন সবই কেমন ধারা!—" বলিতে বলিতে প্রসন্ন ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া দাওয়ার উপর ঠ্যাং ছড়াইয়া একটা খুটি ঠেস্ দিয়া বসিয়া পড়িল এবং মাঝে মাঝে অস্পষ্ট স্বরে আপন মনে বিড় বিড় করিয়া কি সব বকিয়া যাইতে লাগিল।

শয্যায় শুইয়া শশী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। আজ তার বুকের উপর কে যেন খুব জোরে একটা ঘুসি মারিয়া গিয়াছে এবং তাহারি বেদনা এখন পর্য্যন্ত সমস্ত বুকটাতে যেন ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। আজ কেবলি তার মনে পড়িয়া যাইতেছিল একটি কথা,—কি ভয়ানক অহঙ্কারক সে! যে সমাজের একটুখানি কৃপাকণা পাবার আশায় সে আজ এই কদর্য্য বিশ্রী মুখোসটা মুখে পরিয়া বসিয়াছে—তাহারি ভিতরকার তার যে আসল রূপ, সেটাকে এই সমাজ যে চক্ষে দেখে, তা সে বিন্দির সমস্ত জীবনটা চীৎকার করিয়া আজ তার মুখের গোড়ায় বলিয়া বসিয়া গেল যে! একদিন যদি তার মুখের ঐ মুখোসটা খসিয়া পড়ে তা হলে? উঃ! -নানা সে ঐ বিন্দির চেয়ে একটুও ভালো নয়—এতটুকুও না!

এই মুখোসের পূজা লইয়া সে কতদিন এমন করিয়া থাকিবে!—এ পূজা যে ক্রমাগত অপমান করিয়া আসিতেছে সেই তার নিজের ভিতরের চেহারা খানাকেই বা ঐ মুখোসের তলায় ভরে ঘনিষ্ট হইয়া কাঠের মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। না না ও পুজো চায় না সে—একেবারেই না!—তার মনে হইতে লাগিল, বিন্দির সমস্ত জীবন-ইতিহাসটা আজ যেন প্রেতের মত তার সেই অন্ধকার ঘরময় দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে, আর বলিতেছে—"সে সমাজের দ্বার থেকে তোমারি মত একজন অভাগিনী কুকুরের মত নিষ্ঠুর ভাবে বিতাড়িত হয়ে পথে পথে ঘুরে মরছে,—তারি দুয়ারে তোমার ঐ ভিক্ষাঝুলিটি ঝেলে দাঁড়িয়ে থাকতে তোমার কি একটু ও লজ্জা হচ্ছে না!"—

না না—এ সমাজ তার জন্য নয়! কাঁটা-বনের সেই বাঁকাচোরা রাস্তায় সে আবার ফিরিয়া যাইবে না বটে কিন্তু তার ওপারের ঐ প্রকাণ্ড উদাস মাঠটা ত আছে,—সেইখানেই এবার তাকে যাত্রা সুরু করিতে হইবে।—আর কোথাও না—কোন দিকে না! সে কেন লোকালয়ে ফিরিতে গেল? বিশ্ব দুনিয়াটাত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।—তার জন্য সমাজ না থাক্—দুনিয়াটা আছে ত,—সেখানে সে গেল না কেন?—না না, সমাজের মোহ তার কাটিয়াছে!

হঠাৎ কি ভাবিয়া শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া শশী আলো জ্বালিল এবং দোয়াত কলম লইয়া লিখিতে বসিল——

"আমি বিন্দির মতই একজন অভাগিনী, একথা এতদিন আপনাদের কাছে লুকিয়েছিলুম—ক্ষমা করবেন।"

চিঠি লেখা শেষ করিয়া শশী কি ভাবিয়া হঠাৎ সেটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল এবং আলোটা নিবাইয়া দিয়া আবার শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু সে বেশীক্ষণ শুইয়া থাকিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরেই উঠিয়া আবার আলো জ্বালিল এবং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে পূর্ব্বে যে কয়টা কথা লিখিয়াছিল এবার ও ঠিক তাহাই লিখিল,—একটু বেশী নয়, একটু কমও

নয়। তার পর কি ভাবিয়া ডাক দিল, "পেসন্নী!" বাহির হইতে উত্তর আসিল।

"একবার এদিকে আয়ত!"

ঘরে প্রবেশ করিয়া মুখ খানাকে ভার করিয়া তুলিয়া প্রসন্ন বলিল, "কেন?"

"এই চিঠি খানা তোদের বাপকে গিয়ে দিয়ে আসতে পারিস?"

অবাক হইয়া প্রসন্ন শশীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। একটা শুষ্ক হাসি হাসিয়া শশী বলিল, "তুই আশ্চর্য্য হয়ে গেছিস্ নয় রে পেসন্নী, ভাবছিস —এ আবার কি কাণ্ড!—আমি ত কখন তুলোর বাপকে চিঠি লিখিনি।—হঠাৎ—" কথাটাকে শেষ করিতে না দিয়াই প্রসন্ন বলিয়া উঠিল, "ওসব বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে ঠিক করে বল্‌ত তোর মতলব খানা কি?"

হঠাৎ গম্ভির হইয়া গিয়া শশী বলিল, "বড্ড দরকারী চিঠি,—বাজে কথায় সময় নষ্ট করবার অবসর নেই পেসন্নী!—ঝপ্ করে দিয়েই চলে আয়, —আরো অনেক কাজ বাকি আছে।—দাঁড়িয়ে রইলি যে বড়?"

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া—প্রসন্ন কহিল, "আমি কখনই যাবো না ত;- আগে আমার কাছে সব কথা খুলে বল্‌তবে যাবো।- তার আগে এক পাও যদি নড়ি ত আমার সাতপুরুষের- "

খুব জোরে একটা ধমক দিয়া উঠিয়া শশী বলিয়া উঠিল, "মিথ্যে চটাস্‌নে পেসন্নী!—যা বলছি আগে তাই করে আয়। তা না হলে ভাল হবে না বলছি! —আমাকে চিনিস্ ত?—আমি যখন বলেছি 'এখন বলব না,' তখন—মাথা খুঁড়ে মরলেও আমার মুখ থেকে একটি কথা বার করতে পারবি নে। ঠাট্টা নয় পেসন্নী বড্ড দরকারী চিঠি! যেমি করিস্ নে!"

প্রসন্ন শশীকে বিলক্ষণ চিনিত। সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে চিঠি লইয়া চলিয়া গেল এবং যাইবার সময় সদর দরজাটাকে কপাৎ করিয়া একটা ধাক্কা মারিয়া খুলিয়া হাট করিয়া রাখিয়াই চলিয়া গেল। সেই খোলা দরজা দিয়া শশী দেখিল পথের অন্ধকারের মধ্যে প্রসন্নর অস্পষ্ট মূর্ত্তিটি একটু একটু করিয়া মিলাইয়া যাইতেছে,—ক্রমে আর কিছুই দেখা যায় না - শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার।

শশীর মনে হইতে লাগিল, তার জীবনের অস্পষ্ট একটা আশার মূর্ত্তিও সেই সঙ্গে নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ আজ কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে—তার চিহ্ন পর্য্যন্ত আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হঠাৎ তার মনে হইল, চিঠিটা না পাঠাইলেই বোধ হয় ভাল হইত।—কেন সে যাচিয়া এ ধৈর্য্য প্রকাশ করিতে গেল?—হঠাৎ আর একটা কথা শশীর মনে পড়িয়া গেল, সে এইটুকু মাত্র লিখিয়াছে যে বিশ্বিরই মত সে একজন হতভাগিনী; কিন্তু তার অর্থ যে অন্য রকম হইয়া দাঁড়ায়!—সে ত স্পষ্ট করিয়া একথা লেখে নাই যে অতি শৈশবেই তাকে চুরি করিয়া আনা হইয়াছিল এবং অত প্রলোভনের মধ্যেও আজ পর্য্যন্ত সে নিজেকে নিষ্কলঙ্ক রাখিয়া আসিয়াছে। শশীর মাথা খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল।—এ গ্রামে তার আর থাকা হইতে পারে না,—কখনই না—কিছুতেই না!—এই চিঠি পড়িয়া তুলোর বাবা যদিই বা তাকে ক্ষমা করেন ত সে কেবল দয়ার পাত্রী বলিয়া,—হতভাগিনী বলিয়া —নিরাশ্রয়া বলিয়া।—এই যে এতদিন ধরিয়া নিজের দুর্দ্দমনীয় যৌবনকে সে প্রকৃত বীরের মত জয় করিয়া আসিয়াছে—তাহার বিনিময়ে সে কি আজ শুধু কেবল দয়া আর কৃপাভিক্ষা পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে? তার চেয়ে এতটুকু বেশীও কি সে আশা করিতে পারে না?—না না—এ দয়া ভিক্ষা প্রহণ করিবার মত ধৈর্য্য স্বীকার করিয়া লইতে সে পারিবে না।

প্রসন্ন ফিরিয়া আসিতেই তাকে অন্য কোন কথা বলিতে না দিয়াই শশী হঠাৎ বলিয়া উঠিল—

'এখান থেকে রাত্তিরে কোন গাড়ী ছাড়ে না রে ?"

বিরক্ত হইতে গিয়াও প্রসন্ন বিরক্ত হইতে পারিল না। সে এবার শুধু আশ্চর্য্য হইয়া গেলনা —রীতিমত ভয় পাইল, এবং কোন কথা না বলিয়া অবাক হইয়া শশীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। ব্যাপারটা যে একেবারেই সাদাসিধে নয়, তা সে ইতিপূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল; কিন্তু এখন সে এটাও বুঝিয়া ফেলিল যে ইহার মধ্যে ভয় করিবার কারণও যথেষ্ট আছে। সে ভাবিয়া আসিয়াছিল গাড়ী ফিরিলেই শশী হাঁই হাঁই করিয়া আসিয়া পড়িবে,—তোদার বাপ চিঠি পাইয়া কি বলিল ?—কিন্তু তার কৌতূহল যে কয়মিনিটের মধ্যেই নূতন স্বর সন্ধানে ভিন্নপথ ধরিয়া একবার নির্ব্বিকারে পাবে চলিতে সুরু করিয়া দিয়াছে ইহা প্রসন্নকে কোদিক হইতে যেমন অবাক করিয়া দিয়াছিল পর দিকে তার মনের মধ্যে রীতিমত একটা ভীষণ ভাবনা জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

দৃঢ় কণ্ঠে শশী বলিয়া উঠিল, "হাঁ করে আমার মুখের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না পেসন্নী! সে সময়ও নেই—সব গোছগাছ করে নিতে হবে ত ?"

এবার প্রসন্ন কথা কহিল—তার স্বর উৎকণ্ঠাপূর্ণ —"আমি কিছুই যে বুঝতে পারছি না শশি! চিঠি নিয়ে আসতে বল্লি—চিঠি দিয়ে এলুম—তাও কি নেই—"

বাধা দিয়া শশী বলিয়া উঠিল,—"হাঁ, চিঠি পেয়ে চন্নি কি বল্লেন ?"

"কিছুই না!"

"একটা কথাও না ?"

"না,—কেবল আমি যখন জিজ্ঞাসা করলুম আপনার কি কিছু বলবার আছে—তখন কেবল বল্লেন—"না"—সে কি ভয়ানক গলা শশী—ঠিক যেন মরা মানুষের আওয়াজ।—সত্যি বলছি শশি, আমার বুক কেমন করছে,—তুই সব কথা আমাকে খুলে বল্—তা না হলে সত্যি বলছি—"

অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে শশী বলিল, "আসল কথা আজ আমাদের এ গ্রাম ত্যাগ করে যেতে হবে।"

"কেন ?"

"তা না হলে কাল সকাল হলেই জানা জানি হয়ে যাবে আমরা কে এবং কোথা থেকে এসেছি।"

"অ্যাঁ! বলিস কি!—তা হলে এখানকার লোকে আমাদের খুন করে ফেলবে যে"—প্রসন্নর গলার স্বর কাঁপিতেছিল।

"তাই ত বলছি—আজ রাত্রেই আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে; ঠিক কটায় গাড়ী আসিস্ ?

"তা ত ঠিক জানি না শশি!"

"না জানলেও বিশেষ ক্ষতি নেই।—একটু বেশী রাত হলেই আমরা বেরিয়ে পড়বো,—তার পর ইষ্টিসানে গিয়ে গাড়ীর জন্যে বসে থাকবো।—দুটো হোক, তিনটে হোক—প্রথম যে গাড়ী পাবো তাতেই উঠে পড়বো—কি বলিস্ ?"

"তাই ভালো।" আমি তবে সব গুছিয়ে নিই ?"

"গুছিয়ে নেবার বিশেষ কিছু নেই পেসন্নী,—শুধু কেবল গয়নাগুলো আর নগদ টাকা যা আছে, একটা পুটুলিতে বেঁধে নিলেই চলবে, খুব সাবধান কিন্তু!"

কথা শেষ করিয়াই শশী আপনার ঘরে গিয়া অন্ধকার শয্যায় শুইয়া পড়িল এবং ছোট মেয়ের মত করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কাল সকালে দুলো যখন আসিয়া দেখিবে শূন্য ঘরদোর পড়িয়া রহিয়াছে—এবং মা, মা, বলিয়া গলা ফাটাইয়া ফেলিয়াও সে যখন সাঁড়া পাইবে না,—তখন সেই মা-হারা অনাদৃত বালকটির ছোট্ট বুকখানির মধ্যে —"মাগো!" শশী দুই হাতে আপনার বুকখানাকে চাপিয়া ধরিল।

(ক্রমশঃ)

প্রবাসী

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ)

কাবুলী অনেক দাঁড়ায়ে রয়েছে
বিশ্বনাথের দ্বারে,
মন্দিরে কেহ দেয় না ঢুকিতে
ফিরাইয়া দেয় তারে।
বার বার গিয়া সিংহ দুয়ারে
থামিয়া উঠিছে দেহ,
ধমকি তাহাকে ফিরায়ে দিতেছে
করুণা করে না কেহ।
লভিয়া সেথায় শুধু অপমান
ঘৃণা বিদ্রূপ রাশি,
অন্নপূর্ণা মন্দির দ্বারে
দাঁড়ালো কাবুলী আসি।
সেখানেও হায় পাষনা ঢুকিতে
জোর করে প্রাণপণে
মারিয়া তাহারে ঘুরেতে খেদালো
প্রবল পাণ্ডাগণে।
এবার কাবুলী ফুঁপায়ে ফুঁপায়ে
কাঁদে যে ছেলের মত,
ঘেরিয়া তাহারে চারিদিক হতে
জুটিয়াছে লোক কত!
জিজ্ঞাসে তারে মন্দিরে তব
ঢুকিয়া বল কি কাজ?
হিঁদু মোস্‌লেমে বিরোধ ঘটাবে
মিলনের দিনে আজ।
আবার কাবুলী কাঁদিয়া বলিল
দরশনে কাজ নাই
যাহা আছিল অন্নপূর্ণা
যারেক দেখিয়া যাই।
পিতা জোলে ছেলে নহে ও নূতন
তাহাতে বাজে না ব্যথা,
প্রবাসী তনয়ে এমন করিয়া
কেমনে ভুলিল মাতা।
হায়রে আমার পোষাক দেখিয়া
জননীরও এত ভয়,
হত ভাগ্য মায়ের কাছে ও
দিতে হবে পরিচয়।
দূরে আছি বলে আমি ও ভুলিনি
মাতা করে দিল দূর
বুকজোড়া আশা এমন করিয়া
পলকে হবে কি চূর!
কাবুলে নিবাস আমি যে হিন্দু
বলিয়া ফেড়াব কাকে,
ভাবিয়াছিলাম চুপি চুপি শুধু
দেখা দিয়ে যাব মাকে।
পেয়ে পরিচয় সকলে তাহারে
জড়ায়ে লইল বুকে,
মহা উল্লাসে অন্নপূর্ণা
মন্দির মাঝে চুকে।
দাঁড়ায় কাবুলী করি জোড় কর
পলক পড়েনা চোখে,
হাতটী দোলায়ে কি আরতি করে
বুঝিতে পারে না লোকে,
তাহার চোখের কাতর চাহনী
কত বন্ধনা গাহে,
কত বরষের দুখের কাহিনী
জড়ানো রয়েছে তাহে।
বদনে ভাতিল তৃপ্তির রেখা
ধীরে সে নোয়ালো মাথা,
ভুলালো মায়ের করুণ দৃষ্টি
দূর প্রবাসের ব্যথা।

পরীর বিয়ে

(কুমারী নীহারনলিনী দত্ত)

(১)

সেদিন ইনস্‌পেক্টার যমুনা মিশন স্কুল পরিদর্শন করিয়া চলিয়া গেলে স্কুলে আর ক্লাস বসিল না। ছুটী হইয়া গেল। ছাত্রেরা ছুটী পাইয়া ইন্সপেক্টর সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করিতে করিতে বাড়ী ছুটিল। বিজনকুমার গাঙ্গুলী ঐ স্কুলের জনৈক শিক্ষক। স্কুল বন্ধ হইলে তিনি বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার গৃহিণী মহামায়া মুখ অসম্ভব রকম গম্ভীর করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া বিজনকুমারের বোধ হইল যে তিনি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ক্রন্দন করিতেছিলেন। তিনি পত্নীর মনঃকষ্টের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন না। বোধ হয় তাহার দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতায় কতকটা অনুমান করিয়া থাকিবেন। বিজনকুমারের বাড়ীটি ক্ষুদ্র হইলেও দ্বিতল। তিনি সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে ডাকিলেন "পরি, মা!" একটী বনমোহিনী রূপসী ছুটিয়া আসিয়া কহিল "বাবা কি যে আজ এখুনি এলে?"

বিজনকুমার কহিলেন "আজ ইন্সপেক্টর স্কুল দেখতে এসেছিলেন, তাই তাঁর অনারে ছুটী হয়ে গেল মা।"

পরী বিজনকুমারের কন্যা। তাহার পুরা নাম বিমল। তাহার অসামান্য রূপ দেখিয়া বিজনকুমার তাহাকে পরী বলিয়া ডাকিতেন। ক্রমে উহা ডাক নাম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

পরী কহিল, "রোজ যদি ইন্সপেক্টর আসেন তা হলে বেশ হয়, তুমি শীগ্‌গির বাড়ী আসতে পার।"

কন্যার প্রতি স্নেহদৃষ্টিতে চাহিয়া পিতা কহিলেন "পাগল মেয়ে যারা টাকা দিচ্ছে তারা কি রোজ ছুটী দেয়। যে মা গামছাখানা এনে দে, হাত মুখ ধুয়ে ফেলি।" পরিমল পিতাকে গামছা আনিয়া দিল, তিনি কাপড় ছাড়িয়া হাতমুখ ধুইয়া শয়নকক্ষে যাইয়া বসিলেন। পরী পিতাকে তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল, বিজনকুমার ধূমপান করিতে করিতে কহিলেন, "পরী, আজ আবার কি হয়েছে?"

পরী কহিল "আজ হরির মা আর চারুর পিসী এসেছিল, তারা যাকে কি সব বলে গেছে। তারা চলে গেলে মা খুব কাঁদছিলেন।"

বিজনকুমার বিরক্তিস্বরে বলিয়া উঠিলেন "আঃ, এদের জ্বালায় আর পেরে উঠি না, এদের নিজেদের ঘরে কি কোন কাজ নেই, তাই পরচর্চ্চা নইলে থাকতে পারে না, যাও মা মুখে দেবার কিছু থাকে ত নিয়ে এস আমি এখনি বেরুব।"

পরী নীচে নামিয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে একখানি ছোট কাঁসার রেকাবীতে দুইটী সন্দেশ ও কএক-টুকরা কাটা পেয়ারা লইয়া মহামায়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। স্বামীকে জল খাইতে দিয়া মহামায়া কহিলেন "এখন আবার যাবে কোথা শুনি?"

বিজনকুমার কহিলেন "সহরে যাব সুরেনবাবুর ওখানে।"

মহামায়া কহিলেন "ওখানে গিয়ে আর কোন লাভ নেই, তারা বড়লোক আমাদের ঘরের মেয়ে নেবে না।"

বিজনকুমার কহিলেন, "কিন্তু আমার মেয়ের মতন সুন্দরী হাজারে একটা।"

মহামায়া কহিলেন "তা সত্যি। কিন্তু এখনকার বাজারে মেয়ের রূপের বিচার মেয়ের বাপের যৌতুকের উপর নির্ভর করে, তারা তোমাকে স্তোকবাক্য দিয়ে ভুলিয়ে রেখে ছেলের বিয়ে অন্য স্থানে ঠিক করচে।" সে কি, তুমি কি করে জান্‌লে?"

মহামায়া কহিলেন "হাঁ গো আমি ঠিক বলচি। চারুর মামাত ননদের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেচে, নগদ দুয় হাজার আর চার হাজারের গয়না। মেয়েও সুন্দর, চারুর পিসী এসেছিল সেই বলে গেল।"

বিজনকুমার অতি আক্ষেপপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন "হায়, জগতে দরিদ্র হয়ে জন্মান কি ভয়ানক কষ্ট, উঃ! প্রফুল্ল এখন কলেজ থেকে আসে নি?"

মহামায়া কহিলেন "এসেছিল, সন্তোষ সঙ্গে এসেছিল, তার সঙ্গে কোথায় গেল।"

বিজনকুমার একটু অপ্রসন্নভাবে কহিলেন "আবার সন্তোষ এসেছিল!"

গৃহিণী কিঞ্চিৎ রাগতভাবে কহিলেন "হাঁ এসেছিল! তাতে হয়েছে কি?" তাহার পর একটু ক্রন্দনের সুরে কহিলেন "এই অঘ্রাণে যদি পরীর বিয়ে না দাও ত আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব তা বলে রাখচি। কারুর কাছে আমার আর মুখ দেখাবার যো নেই। যে আসে সেই বলে অত বড় মেয়ে, ঘরে ভাত উঠ্‌চে কি করে। এই আজ এরা এসে কি না বলে গেল। বাপো অত অপমান আমার আর সহ্য হয় না।"

বিজনকুমার বিরক্তিপূর্ণ স্বরে কহিলেন "পাড়ার লোকের কথায় আমাদের অত মাথা ব্যথা কেন? আমার মেয়ে আমি যা ভাল বুঝ্‌ব তাই করব।"

মহামায়া কহিলেন "লোকে কি আর তা বোঝে, আর মেয়েও বড় হচ্ছে, অঘ্রাণে ষোল পেরুবে।"

বিজনকুমার কহিলেন "ষোল পেরুবে বলে ত আমি মেয়েকে জলে ভাসিয়ে দিতে পারি না। সুপাত্র না পেলে বিয়ে দিই কি করে।"

মহামায়া কহিলেন "কেন পাত্র ত হাতেই রয়েচে। অমন হীরের টুক্‌রো ছেলে অমনি পাচ্ছ, তা তোমার মনে ধর্‌চে না। এক দিকে টাকাও খরচ করতে পারবে না। কি যে ধনুভাঙ্গা পণ করেচ! হরির মা বলছিল, একজন উকীল তার মেয়ের সঙ্গে সন্তোষের বিয়ে দেবার চেষ্টা কচ্চে। কিন্তু সে ছেলেবেলা থেকে পরীকে দেখে আসচে, তার ইচ্ছে পরীকে বিয়ে করে। তাই সে রাজী হচ্চে না। কিন্তু মনের কথা কিছু বলা যায় না। শেষে সন্তোষ দস্‌কে গেলে তোমার মেয়েকে রাজপুত্র ত দূরের কথা, কোন কেরাণী-পুত্রও অমনি বিয়ে করবে না। আমার কথা শোন, সন্তোষের সঙ্গেই বিয়ে দাও।"

বিজনকুমার চিন্তিতভাবে কহিলেন "সন্তোষ ছেলে মন্দ নয়, কিন্তু বড় কাল। অমন সুন্দর মেয়েত আমার আর কোথাও কিছু নেই। নিজে মাষ্টারী করে মেসের খরচ চালায়। বিয়ে করে স্ত্রী পরিবার নিয়ে যাবে কোথায়?"

মহামায়া কহিলেন "লটা পাশ করে ওর পয়সা-কড়ি খায় কে। এবার পাশ করতে পারে না বলে, নইলে এই বছরেইত কোর্টে বেরুত। আর নিয়ে যাবার দরকার কি। যত দিন না ওর অবস্থা ভাল হয় পরী আমার কাছেই থাকবে। আর বুড়োর কথা ছেড়ে দাও। বেটাছেলের গুণ থাকলেই হল। একমাত্র মেয়ে আমার সন্তোষের হাতে দিলে মেয়ে আমার কাছে থাকবে।" বিজনকুমার কহিলেন "একেই বলে স্ত্রী-বুদ্ধি। সন্তোষ আসচে বছর পাশ করলেই কি সঙ্গে সঙ্গে টাকা রোজগার করতে পারবে। এখনকার নূতন উকীলদের ত যা দুর্দ্দশা, পরিবার পালন করবার মত টাকা আসতে ওর এখন এক যুগ কেটে যাবে। এখন উকীলদের আর সে কাল নেই। তারপর ওকালতী করতে গেলে পিছনে বল থাকার দরকার, প্রথমেই কিছু পশার হয় না। দু এক বছর অপেক্ষা করতে, সে সময়ে ঘরে অন্ন না থাকলে ব্যস্ত হয়ে যা তা চাকরীতে ঢুকবে আর মেয়েটার জীবন দুঃখে কেটে যাবে। আমি পরীকে এমন ঘরে দিতে চাই যেখানে দিলে আমার কোনও ভাবনা থাকবে না, পরী আমার রাজরাণী হবার যোগ্য, ওকে কি ও ভবঘুরে সন্তোষকে দিতে পারি।"

মহামায়া হতাশভাবে বলিয়া উঠিলেন "তোমার ও কল্পনায় রাজপুত্র এখনকার বিয়ের বাজারে অমনি পাওয়া যায় না। এখন টাকার বাহুল্যই মেয়ের রূপ গুণ। এ তোমার অতি অন্যায় আকাঙ্খা যে লোকে তোমার মেয়ের রূপ দেখে অমনি বিয়ে করবে। কেউ যখন তা করে না তখন তোমার বলায় করতে যাবে কেন তাও তোমার ভাবা উচিত। দোহাই তোমার পায়ে পড়ি, তুমি এমন করে আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট কর না। সত্যেশ হাত ছাড়া হলে পরীর কপালে আর সুপাত্র জুটবে না এটা ঠিক। সত্যেশের হাতেই ওকে দাও। কপালে থাকে ত পরী ওতেই রাজরাণী হবে। আর আমি ওর মায়ের কাছে একরকম প্রতিজ্ঞাবদ্ধই আছি পরীকে সত্যর হাতে দিতে। আমিও দুতার কাছের এ প্রতিজ্ঞা থেকে খালাস পাই। অবশ্যর জন্য ভেব না। যত দিন ওর ভাল পসার না হয় তত দিন পরী আমার কাছেই থাকবে। এদিকে ত মেয়েকে এত ভালবাস, আর দুবছর কাছে রেখে খেতে দিতে হবে ভেবে আঁতকে উঠ্‌ছ।"

বিজনকুমার কহিলেন "আমি যত দিন আছি তত দিন পরীকে কোনও কষ্ট দিতে দেব না, কিন্তু আমি যদি ওদের গুছোবার আগে মারা যাই তখন।"

মহামায়া কহিলেন "ওকি অলক্ষণে কথা গো, আর যদি তাই হয় তাহলে প্রসূন কি তার বোনের ভার কিছুদিনের জন্য নিতে পারবে না। বিশেষতঃ ওর মা সত্যেশ অন্তপ্রাণ। ও সত্যেশকে ঠিক মায়ের পেটের ভায়ের মতনই ভালবাসে। তারও তারি ইচ্ছে পরীর সত্যেশের সঙ্গে বিয়ে হয়। আর দেখ বিদ্যায়, গুণে, চরিত্রে সত্যেশের মত ছেলে কটা আছে। রংটাই যা ময়লা নইলে মুখ চোখে কোথাও খুঁত নেই।"

বিজনকুমার কহিলেন "প্রসূনের ভরসায় আমি মেয়ে রেখে যাব। তুমি ক্ষেপেছ গিন্নী। ওকি কোর্টে বেরিয়েই দ্বাসবিহারী হবে না কি? আর আমার অবর্তমানেও বোনের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করবে তারই বা ঠিক কি, না আমি তাড়াতাড়ি পরীর বিয়ে দিচ্ছি না। পরী মা, আমার চাদরখানা দিয়ে যাও ত।"

বিজনকুমার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মহামায়া পুনরায় কহিলেন "অন্নাশে কিন্তু বিয়ে হওয়া চাই, নইলে" বলিয়া কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

(২)

বিজনকুমারের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। স্কুলে মাষ্টারী ও কয়েকটা প্রাইভেট টিউশনি করিয়া তিনি সংসার চালাইতেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র প্রসূনকুমার খৃষ্টান্ কলেজ হইতে বি এ. পাশ করিয়া আইন পড়িতেছিল। একমাত্র কন্যা পরিমল বিবাহ-যোগ্যা হইয়াছিল। পরিমল পরমাসুন্দরী। প্রতিবেশীবর্গ বর্ণিত পরীর ন্যায় সুন্দরী কন্যা ও অঞ্চলে আর নাই। বিজনকুমার কন্যার বিবাহ দিবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু যেহ পুত্তলী কন্যাকে মনোমত পাত্রে সমর্পণ করিবার মত অর্থ তাঁহার ছিল না, আবার তাঁহার আশাও তাঁহার অবস্থা অপেক্ষা অনেক উচ্চে অবস্থান করিত। তিনি কহিতেন, ধনীর উচ্চ-শিক্ষিত পুত্রের হস্তে তাঁহার পরীরে সমর্পণ করিবেন। কন্যা হীরা জহরতে ভূষিতা দেখিয়া তাঁহার জীবন সার্থক করিবেন। সত্যেশ বিজনকুমারের মৃত প্রতিবেশী অমরেশ রায়ের পুত্র। সত্যেশের জননীর সহিত মহামায়ার প্রগাঢ় সখীত্ব ছিল। পরিমল যখন দুই বৎসরের ও সত্যেশ দশ বৎসরের তখন এক দিন শিশু পরীর অসামান্য রূপ প্রভা মুগ্ধ সত্যেশের জননী হরিপ্রিয়া সখীকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন "মায়া, তোর মেয়ে সত্যই পরী। আমায় একে দিবি ভাই। আমার সত্যেশের সঙ্গে বিয়ে দেব।"

মহামায়া আমন্দের সহিত সখীর প্রস্তাবসম্মতি

দিয়াছিলেন। তখন হইতে তাঁহারা বেয়ান সম্বন্ধ পাতাইয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহাদের এই প্রীতি-মধুর সম্বন্ধ অধিককাল ভোগ করিতে দিলেন না। সত্যেশ এন্‌ট্রান্স পাশ করার ছই মাস পরে হরিপ্রিয়া স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ইহলোকের সেবা পাওনা মিটাইয়া দিলেন। পত্নীর মৃত্যু অমরেশের প্রাণে বড় বাজিল। হরিপ্রিয়ার মৃত্যুর তিন বৎসর পরে সত্যেশকে অনাথ করিয়া তিনি পত্নীর অনুগমন করিলেন। পিতাকে হারাইয়া সত্যেশ চক্ষে জগৎ অন্ধকার দেখিল। সচরাচর দেখা যায় যে যাহাদের উপর সংসারের অনেক ঘাত প্রতিঘাত চলিয়া যায় তাহাদের প্রকৃতি অধিক পরিমাণে আত্মনির্ভরশীল হইয়া পড়ে। সত্যেশের প্রকৃতিও সেইরূপ হইয়াছিল, সে আপনার উপর নির্ভর করিয়া তাহার সৌভাগ্যের বিরুদ্ধে বিধাতার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিতে মনস্থ করিল। কয়েকটা প্রাইভেট টিউসনী করিয়া একবার কেল হইয়া সে বি. এ. পাশ করিল, তাহার পর এক স্কুলে ৪০৲ টাকা মাহিনায় মাষ্টারী জুটাইয়া লইয়া ওকালতী পাশ করিতে মনস্থ করিল। বিজনকুমার এই পিতৃমাতৃহীন যুবককে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিতেন, কিন্তু তাহার হস্তে কন্যা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার আপত্তির কারণ পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনে ব্যক্ত হইয়াছে। সত্যেশকে আপন পুত্র প্রসূনের ন্যায় ভালবাসিতেন। প্রায়ই সত্যেশকে আপনার গৃহে আহার করাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। সত্যেশও তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। প্রসূনকুমার ও সত্যেশনাথ বাল্যকাল হইতে পরস্পরের বন্ধু। তাহাদের মধ্যে প্রণয় এরূপ প্রগাঢ় ছিল যে তাহাদের একদিন যদি পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ না হইত তাহা হইলে উভয়েই অস্থির হইয়া উঠিত। সত্যেশ প্রত্যহ বিজনকুমারের বাড়ী আসিত। যে দিন না আসিতে পারিত সে দিন প্রসূন তাহার বাসায় ছুটিত ও পরদিন মহামায়ার নিকট তাহাকে বিস্তর অনুযোগ শ্রবণ করিতে হইত।

বাল্যকালে পরিমল প্রসূনকুমার ও সত্যেশের নিকট পাঠাভ্যাস করিত। ক্রমে সে বড় হইলে মহামায়া সত্যেশকে জামাতা করিবার জন্য স্বামীকে ধরিয়া বসিলেন। কিন্তু বিজনকুমার সত্যেশের অবস্থা ভাবিয়া তাহাকে কন্যাদান করিতে সম্মত হইলেন না। সত্যেশ বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছিল পরীর সহিত তাহার বিবাহ হইবে, তাহার হৃদয় মধ্যে অনিন্দ্যসুন্দরী কিশোরী পরীর মূর্ত্তি দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাই যখন সে শুনিল বিজনকুমার তাহাকে কন্যা দিতে সম্মত নহেন, তখন তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, সে স্থির করিল তাহাদের বাড়ী আর যাইবে না, কিন্তু প্রসূন তাহার সঙ্কল্প স্থির রাখিতে দিল না। সে তাহাকে জোর করিয়া আপনাদের বাড়ী লইয়া যাইত। মহামায়াও না আসাতে কান্না কাটা করিতেন। সুতরাং সে বাধ্য হইয়া মাঝে মাঝে বিজনকুমারের বাড়ী যাইত বটে, তবে পূর্ব্বের মত প্রত্যহ যাইত না। এদিকে পরীর বয়স বাড়িয়া চলিল। বিজনকুমারের কল্পনাপ্রসূত কোন ধনী উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি তাহার কন্যাকে বিনা পণে বিবাহ করিতে রাজী হইল না। এখনকার দিনে টাকাই কন্যার রূপ। মৌদাচক্রের মহিমায় কৃষ্ণবর্ণ কন্যা পাত্রপক্ষের চক্ষে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা ঠেকে আর তাহার অভাবে সুন্দরীর সৌন্দর্য্যেও নিষ্ঠীবতা লক্ষিত হয়। বিজনকুমারের অর্থ বল ছিল না, তবে তাঁহার আশা ছিল যে কোন ধনী তাহার কন্যার রূপজ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কন্যাকে বিনা পণে গ্রহণ করিবেন। তিনি কিছুতেই বুঝিতে চাহিতেন না যে সমাজে যখন ছোট বড় সকলকেই পণ দিয়া কন্যার বিবাহ দিতেই হইতেছে, তখন তাঁহার বেলা অন্যরূপ হইবে কেন? যাহা হউক, তিনি ক্রমেই আপন সঙ্কল্প সম্বন্ধে হতাশ হইতেছিলেন। ওদিকে মহামায়া সুযোগ পাইলেই স্বামীকে

সন্তোষের জন্য অনুরোধ করিতেন। প্রসূনও মাতার সহিত একমত হইয়াছিল। অবশেষে বিজনকুমারের বিশ্বাসের দৃঢ়তা অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল। মহামায়া ও প্রসূনের অনুরোধে তিনি কহিলেন "যদি এই কার্ত্তিক মাসের মধ্যে সুপাত্র না পাই, তাহলে অগ্রাণে পরীকে সন্তোষের হাতেই দেব।" শুনিয়া গৃহিণী আশ্বস্তা হইলেন। এ সম্বন্ধে স্বামী অপেক্ষা তাঁহার অভিজ্ঞতা ঢের বেশী। তিনি জানিতেন কোন উচ্চশিক্ষিত পাত্র সুধু রূপের আকর্ষণে তাঁহার কন্যাকে বিনা পণে বিবাহ করিবে না। কারণ ধনীগৃহে সুন্দরী কন্যার অভাব নাই। আর প্রসূনকুমার সন্তোষের সহিত তাহার বন্ধুত্বের বন্ধন আত্মীয়তার বন্ধনে সুদৃঢ় হইবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

(৩)

সন্তোষনাথ যে মেসে থাকিত তাহা শুড্‌শেড রোডের উপর অবস্থিত। মেসের মেম্বররা সকলেই বাঙ্গালী ও যুবক। তাহাদের মধ্যে কেহ চাকুরী করিত কেহ বা কলেজে পড়িত। মনীন্দ্র এই মেসের ম্যানেজার। সে স্থানীয় বোর্ড আফিসে ৫০৲ টাকা বেতনে চাকুরি করিত। মেসের মেম্বরদের মধ্যে ভদ্রতা ও সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান ছিল। বিশেষতঃ সন্তোষ সকলকার বিশেষ স্নেহ ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিল। তাহার কারণ সন্তোষের মধুর বিনয়ী প্রকৃতি ও পরোপকার প্রবণতা। একদিন সন্ধ্যার পর ছাত্র পড়াইয়া সন্তোষ মেসে ফিরিতেছিল, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল "মশায়, বলতে পারেন এখানে বাঙ্গালীদের হোটেল আছে কিনা?" সন্তোষ ফিরিয়া দেখিল প্রশ্নকারী এক পরম সুন্দর যুবাপুরুষ। যুবকের চক্ষু সুবর্ণ চশমায় আবৃত, অঙ্গুলীতে হীরকাঙ্গুরীয় সন্ধ্যার ম্লানালোকে নীলাকাশের স্থির নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলিতেছিল। তাহার পরিধানে মূল্যবান পরিচ্ছদ। তাহার মূল্যবান সাজসজ্জা ও মনোহর আকৃতি সন্তোষকে তাহার সম্ভ্রান্ত বংশের জন্মের পরিচয় দিল। কিন্তু যুবক যে সম্ভ্রান্ত বংশজাত এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেও তাহার উচ্চারণ বৈষম্য হইতে সন্তোষ বুঝিল যুবক পূর্ব্ববঙ্গবাসী। সন্তোষ যুবকের প্রশ্নের উত্তরে কহিল "বাঙ্গালী হোটেল নেই, তবে হিন্দুস্থানী হোটেল আছে। আপনি কোত্থেকে আসচেন?"

যুবক উত্তর দিল "উপস্থিত আগ্রা থেকে আসচি মশায়। আমাদের নিবাস ঢাকা জেলায় কনকপুর নগরে। আমি সেখানকার বড় তরফের জমিদার। এখানে এসে আমি বড় বিপদে পড়েচি। আমার পরিচিত কেহই এখানে নেই। আবার গাড়োয়ান বেটারা কেউমেউ করে কি যে বলে তা যদি একবর্ণ বুঝবার যো আছে। বেটাদের বচন নিয়ে যেতে বাঙ্গালী হোটেলে, বেটারা নিয়ে গেল এক ছাতু-খোরের সরাইতে; সেখানে কি বলব মশাই খেতে দিলে গাড়ীর চাকার মত মোটা মোটা রুটি। তাকি খাওয়া বাঙ্গালীর কাজ। আবার তারই দাম বলে একটা টাকা নিলে। বড় বিপদে পড়েচি মশায়, যদি কোনও বাঙ্গালী হোটেলে আমার জন্য স্থান দিতে পারেন, তাহলে আমার বড় উপকার করা হয়।"

সন্তোষের প্রকৃতি চিরকালই পরোপকার-প্রিয়। ভদ্রসন্তান বিদেশে আসিয়া স্থানাভাবে কষ্ট পাইতেছে শুনিয়া তাহার মন করুণায় পূর্ণ হইয়া গেল। সে কহিল "বাঙ্গালী হোটেল নেই। তবে হিন্দুস্থানীদের হোটেল আছে। কিন্তু সেখানকার আহারের ব্যবস্থা আপনার উপস্থিত বাসস্থানের অনুরূপ।"

যুবক হতাশভাবে কহিল "তাইত বড় বিপদে পড়লাম এখানে এসে।" সন্তোষ কহিল "হোটেল নেই কিন্তু মেস আছে, আমিও মেসে থাকি।"

যুবক ভরসা পাইয়া কহিল "মেস আছে! আঃ বাঁচলাম। আপনাদের মেসেই আমার একটু

স্থান করে দেবেন। আমি মাস দুই থাকব। স্বাস্থ্য খারাপ হওয়াতে ডাক্তারের পরামর্শে এখেনে চেঞ্জে এসেছি।"

সত্যেশ কহিল "আমাদের মেসের মেম্বররা সকলে সামান্য অবস্থার লোক, আপনার মত ধনীর" বাধা দিয়া যুবক কহিল "কিছু অসুবিধে হবে না। বাঙ্গালীদের মধ্যে থেকে ভাত খেয়ে বাঙ্গালী কথা বলব। আঃ দুদিন ধরে মেড়ো বেটাদের কচ্‌কচিতে প্রাণ বের হবার উপক্রম হয়েছে।"

সত্যেশ্ কহিল "তাহলে চলুন ম্যানেজারকে বলা যাক। আপনার নাম ত এখনও জানতে পারি নাই।"

যুবক হাসিয়া কহিল "আমার নাম শ্রীনবকিশোর রায়চৌধুরী। আপনার নামও আমি জানতে পারিনি।"

সত্যেশ কহিল "আমার নাম সত্যেশনাথ রায়, চলুন। নবকিশোরকে লইয়া মেসে যাইয়া তাহাকে তথায় স্থান দিবার জন্য সত্যেশ মনীন্দ্রকে অনুরোধ করিল। মনীন্দ্র লোকটা কিছু অতিমাত্রায় পূর্ব্ব-বঙ্গ বিদ্বেষী। সে নবকিশোরের পরিচয় শুনিয়া প্রথমে স্থান নাই বলিয়া আপত্তি করিল, পরে সত্যেশের আগ্রহাতিশয্যে দিতে সম্মত হইল, নবকিশোর সরাই হইতে আপনার দ্রব্যাদি আনিতে গেল। মেসের মেম্বরদের মধ্যে তাহাকে লইয়া হাস্যকৌতুহল চলিতে লাগিল উপেন্দ্র কহিল "বেশ আমরা ছিলাম। আবার বাঙ্গাল কেন জোটালে মনীষা?"

মনীন্দ্র কহিল "সত্যেশের ইচ্ছে দেখে রাজী হলাম, নইলে আমার বড় ইচ্ছে ছিল না।"

হরেন্দ্র কহিল "বাঙ্গাল মনুষ্য নয়।"

অমনি নবীন সুর করিয়া কহিল "বাঙ্গাল ভাল কথায় কাঙ্গাল, গঙ্গা জলের কাঙ্গাল, ভাঙ্গা পথের কাঙ্গাল ইত্যাদি।"

সত্যেশ তাহাদের বিদ্রূপে বিরক্ত হইয়া কহিল কি যে তোমরা বলচ তার ঠিক নেই। বাঙ্গাল হইলে কি লোক মন্দ হবে? এ তোমাদের মস্ত ভুল। আমরা পশ্চিম বঙ্গের লোক, কেবল মুখের আস্ফালন কর্ত্তে জানি। কিন্তু দেশের কাজে প্রাণ দিয়েচে ওরাই। আর—"

শচীন্দ্র কহিল, "ওহে সত্যেশ, তোমার ও বাঙ্গালের স্তুতি থামাও ভাই। আমরা তোমার হঠাৎ প্রাপ্ত বন্ধু-রত্নটী যে খাঁটী তা বলচি না।"

সত্যেশ কহিল "কিন্তু তার সম্বন্ধে এসব বিদ্রূপ করা তোমাদের ভাল হচ্ছে না। শুনলে মনে কষ্ট পাবে। আর দেখ মনীষা, ভদ্রলোক আমাদের দেশের লোক, কেন না পূর্ব্ববঙ্গ বাঙ্গলা দেশ ছাড়া নয়। বিদেশে স্থানাভাবে কষ্ট পাচ্ছিল, তাকে আশ্রয় দিয়ে তুমি খুব ভাল কাজই করেচ।"

মনীন্দ্র কহিল "ওকে আশ্রয় দেওয়ায় যদি কেউ প্রশংসা লাভের যোগ্য হয় তবে সে তুমি। কেন না তোমার আগ্রহ দেখেই আমি রাজী হয়েছি সত্যেশ।" যাহা হউক, এই প্রকারে নবকিশোর সত্যেশদের মেসে স্থান পাইল। সত্যেশের নিকট সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কহিল "ভাগ্যিস্ আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সত্যেশ বাবু, নইলে আমাকে প্রয়াগের গুণ্ডার হাতে প্রাণ হারাতে হত। আপনার এ উপকার আমি জীবনে ভুলব না।"

সত্যেশ আপনার প্রশংসা শুনিতে কোন কালেই ভালবাসিত না, সে অন্য কথা পাড়িল। মেসের অন্যান্য মেম্বররা দিনকয়েক নবকিশোরকে শুনাইয়া শুনাইয়া পূর্ব্ববঙ্গবাসী সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিদ্রূপ-পূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিত। নবকিশোর তাহাদের বিদ্রূপ ভ্রুক্ষেপ করিত না। ক্রমে তাহার অমায়িক ব্যবহারে মেম্বরদের মন হইতে পূর্ব্ববঙ্গ বিদ্বেষ একেবারে দূরীভূত হইল। সকলেই তাহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। তাহারা নবকিশোরকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতেছে দেখিয়া সত্যেশের বুক হইতে যেন বিশ মণ বোঝা নামিয়া গেল, যাহাতে

নবকিশোরের কোন কষ্ট না হয়। নবকিশোর খরচ-পত্রে মুক্তহস্ত ছিল। তাহার অবাধ খরচ-পত্র দেখিয়া তাহার ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ হইল না। তাহার হীরার বোতাম, হীরার আংটি, ঘড়ির মূল্যবান রিষ্ট ওয়াচ, সোনা বাঁধান ছড়ি ও সিগারেটের কেস্ প্রভৃতি সর্ব্বদাই তাহার ঐশ্বর্য্যের কাচা প্রমাণ প্রয়োগ করিত। তাহার উপর তাহার কথা কহিবার শক্তি ছিল অসাধারণ। তাহার সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিলে সে যে উচ্চ শিক্ষিত সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিত না। সে সকলে জানিল যে সে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম এ পাশ করিয়াছিল। নবকিশোর গীতে সুদক্ষ ছিল। মনীন্দ্র প্রভৃতি কয়েকজন তাহার সঙ্গীত শিক্ষা করিতে লাগিল। মোট কথা, নবকিশোরের সহিত কয়েকদিন বাস করিয়া মেসের মেম্বরদের মন হইতে পূর্ব্ববঙ্গ-বিভীষিকা দূর হইয়া গেল।

(৪)

নবকিশোরকে লইয়া ব্যস্ত থাকায় সন্তোষ কয়েক দিন প্রসূনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিল না। একবারে মধ্যাহ্ন আহারের পর তাহারা যখন মনীন্দ্রের ঘরে বসিয়া তাস খেলিতেছিল, তখন প্রসূন সেই কক্ষে প্রবেশ করিল ও সংবাদপত্র পাঠে রত সন্তোষকে দেখিয়া কহিল, "এই যে সন্তোষ, আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি দেশত্যাগী হয়েছ?"

সন্তোষ তাহাকে দেখিয়া লাফাইয়া উঠিল ও কহিল "অত ঠাট্টা কেন—কদিন হাজরী দিতে পারিনি বলে। তার কারণ আমাদের বাসায় এক মহাশয় ব্যক্তির আগমন হয়েছে তাঁর জন্য—"

প্রসূন কহিল "সত্য নাকি। কোথায় তোমাদের তিথি?"

সন্তোষ অদূরে তাসখেলারত নবকিশোরকে দেখাইয়া দিল। নবকিশোরও প্রসূনের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সে দেখিল যে প্রসূনের বর্ণ সদ্য-প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায়, তাহার চক্ষে সোণার ফ্রেম যুক্ত চশমা ছিল। কিন্তু সুবর্ণের নিকট নিষ্প্রভ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল নবকিশোর তাহার দিকে বিস্ময়-মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে দেখিয়া সন্তোষ প্রসূনকে তাহার নিকট পরিচিত করিবার জন্য কহিল "ইনি আমার বন্ধু প্রসূনসুধার। বড় ভাল ছেলে। এখানকার ইউনিভার্সিটি থেকে অনার্সে বি. এ. পাশ করেছেন। বি. এল. পড়বেন ইত্যাদি" তারপর প্রসূনের দিকে চাহিয়া কহিল "ইনি ঢাকার কনকপুরের জমিদার, এম. এ পাশ। খুব বড়লোক। এখানে বেড়াতে এসেছেন ইত্যাদি" কিন্তু সন্তোষের মুখে নবকিশোরের প্রশংসা শুনিয়া প্রসূন তাহার সহিত আলাপ করিবার বিশেষ আগ্রহ দেখাইল না। তাহার কারণ সে পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের বড় সুনজরে দেখিত না।

তাহার ভাব দেখিয়া নবকিশোর মনে মনে হাসিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল "আপনি সন্তোষ বাবুর বন্ধু, তাহলে আমারও বন্ধু, সন্তোষবাবু ও আমি অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু।"

প্রসূন বিরক্ত হইয়া ভাবিল লোকটা কি অসভ্য। কিন্তু কিছুক্ষণ নবকিশোরের সহিত আলাপ করিয়া প্রসূন যখন বিদায় হইল, তখন তাহার মন হইতে নবকিশোরের প্রতি বিরক্ত ভাব আর ছিল না। সে আপনার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই নবকিশোরের গুণে মুগ্ধ হইয়া পড়িল। সে দেখিল নবকিশোরের কথা কহিবার শক্তি অসাধারণ। আর তাহার ন্যায় বিনয়ীও সে খুব কম দেখিয়াছে।

প্রসূন চলিয়া গেলে হরেন্দ্র কহিল "ওহে সন্তোষ, নবকিশোর বাবুর কাছে প্রসূনের সঙ্গে তোমার আসল সম্বন্ধটা লুকান কি ভাল হয়েছে?"

নবকিশোর কহিল "বটে, এঁর সঙ্গে প্রসূন বাবুর কোনও সম্পর্ক আছে না কি?"

শচীন্দ্র কহিল "বড় যে সে সম্পর্ক নহে। প্রসূন সন্তোষের বাল্যবন্ধু ও বটেই, তার উপর আর এক

পাঁচ কথা হবে, প্রফুল্ল সন্তোষের ভাবী বড় সুখী। বুঝতে পাচ্ছেন না প্রফুল্লের বোনের সঙ্গে সন্তোষের বিয়ের ঠিক হয়ে আছে।"

সন্তোষ কহিল "কেন বাজে বকচ শচীন, কোথায় বিয়ের ঠিক?"

হরেন্দ্র কহিল "কেন তোমার বুঝি এখনও ভরসা নেই। কিন্তু আমি বলছি তুমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আজ ত্রাস্তিকের পনরই, এ পনর দিনের মধ্যে কোন রাজপুত্র তোমার প্রতি যোগীতায় অগ্রসর হচ্ছে না।"

নবকিশোর কহিল "এর মধ্যে কি আবার রোমান্সও আছে না কি? সন্তোষবাবু আপনি আমার কাছে আসল কথাটাই লুকালেন। প্রফুল্ল বাবু আপনার ভাবী শ্বশুরী জানতে পারলে কি আমি ওঁকে মিষ্টি মুখ না করিয়ে ছাড়ি। তারপর প্রিয়-বরের রোমান্সের গল্পটা শুনি।"

হরেন্দ্র তখন তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল, তারপর কহিল "আর পনর দিনের মধ্যে কিন্তু বিজন বাবুর কল্পিত পাত্র জুটবে না। তা সন্তোষ বেচারার সর্ব্বদা ভয়, পাছে কেউ এসে ওর কনে কেড়ে নেয়। আমরা এত করে বোঝাই যে কলির রাজপুত্ররা এমন বোকা প্রেমিক নয় যে রূপহীন রূপ দেখে ভুলবে। তা সন্তোষের কিছুতেই প্রত্যয় হয় না।"

নবকিশোর সন্তোষের লজ্জারুণ মুখের দিকে হাসিয়া কহিল "সাবাস সন্তোষ বাবু! আমি ভাবতুম আপনি কেবল ছাত্র আর আইনের বই নিয়েই সময় কাটান, প্রেম ট্রেমের ধার ধারেন না। এখন দেখছি আমার এ বিষয় ভ্রম। আপনার রোমান্সের মতন রোমান্স বিংশ-শতাব্দিতে নেই বল্লেই হয়। তা আবার বাঙ্গালীর জীবনে।"

উপেন্দ্র কহিল "আপনার আর বিবাহের পূর্ব্বে এমন কিছু ঘটেনি নবকিশোর বাবু?"

নবকিশোর কহিল "আমার ওসব চিন্তার অবসর কোথা। আমি অবিবাহিত।"

"সেকি আপনার অত টাকা আপনি বিবাহ করেন নি?" বলিয়া উপেন্দ্র বিস্মিত ভাবে নবকিশোরের মুখের দিকে চাহিল।

নবকিশোর কহিল "না ভাই আমার ওসব দিকে রুচি নেই। সংসারের ঝঞ্ঝাটকে আমি বড় ভয় করি। দেখ না সংসার থাকলে কি এমন নিশ্চিন্ত ভাবে দেশ বেড়াতে পারি। যাক, আমাদের ভাবী বন্ধু পত্নীটি কেমন?"

হরেন্দ্র কহিল "পরিমল ত আমাদের জানা মেয়ে, দেখতে পরমা-সুন্দরী। তাইকে দেখলেন ত। বোনের রূপ আরও ফরসা। বেশ লেখাপড়া শিখেছে, খুব ভাল গাইতে পারে; সন্তোষ নিজেই তাকে শিক্ষা দিয়েছে। তাক নাম পরী, পরী ত, পরীই; মোট কথা, অমন স্ত্রী পাওয়া অনেক জন্মের তপস্যার ফল। এমন একটা দিন তালর তালর কেটে গেলে আমরা বাঁচি, মনের সাধে লুচি সন্দেশ খেয়ে আর সন্তোষ বাঁচুক"—মনীন্দ্র ইতি-মধ্যে বাহিরে গিয়াছিল, সে এই সময় সেই ঘরে পুনরায় প্রবেশ করিয়া দেখিল, সন্তোষের মুখে উত্তেজনার ভাব সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত হইয়াছে।

সে হরেন্দ্রের কথায় বাধা দিয়া কহিল "কি কথা হচ্ছে তোমাদের যে সন্তোষের কালো মুখ লাল হয়ে উঠেছে।"

হরেন্দ্র কহিল "সন্তোষের বিয়ের কথা বৌর কথা নবকিশোর বাবুকে শোনান হচ্ছে।"

মনীন্দ্র নবকিশোরের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল "থাক্ থাক্ একজন ভদ্রলোকের মেয়ের কথা সকলকার কাছে বলা ভাল নয়।"

নবকিশোরের মুখে সে এমন ভাব দেখিয়াছিল যাহা তাহার নিকট ভাল ঠেকে নাই। ওদিকে প্রফুল্ল পিতার নিকট নবকিশোরের প্রশংসা করায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন নবকিশোর কি জাতি?"

প্রফুল্ল কহিল "জাত টাত জিজ্ঞেস করিনি বাবা।"

বিজনকুমার বিরক্ত হইয়া কহিলেন "ঐত তোমাদের এখনকার ছেলেদের দোষ। লোকটার সঙ্গে এতক্ষণ আলাপ করে এলে অথচ তার জাতটা জানতে পারলে না। আমরা হলে এমন হত না।"

পরদিন প্রত্যুষে নবকিশোর দোকান হইতে মিষ্টান্ন আনাইয়া যত্নপূর্বক তাহাকে আহার করাইল। তাহার ব্যবহার মুগ্ধ প্রত্যুষ কহিল "নবকিশোরবাবু, এক দিন আপনাকে আমাদের বাড়ী যেতে হবে। বাবা আপনার সঙ্গে আলাপ করলে খুসী হবেন।"

নবকিশোর কহিল "তার আর কি, যাওয়া যাবে এক দিন সন্তোষ বাবুর সঙ্গে।"

পরদিন সন্তোষ নবকিশোরকে লইয়া বিজনকুমারের বাড়ী গেল। বিজনকুমার নবকিশোরের সুন্দর আকৃতি ও মধুর আচরণে অতিশয় প্রীত হইয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। প্রত্যুষ সন্তোষকে লইয়া অন্তঃপুরে মহামায়ার নিকট গেল। বিজনকুমার নবকিশোরের পরিচয় লইয়া জানিলেন যে সে ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের করণীয় ঘরের পুত্র। উচ্চ শিক্ষিত। দেশে ১০,০০০ হাজার টাকার মোকার জমিদারী আছে। তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারী সেই। বাড়ীতে তাহার এক জ্যেঠা বিধবা ভগিনী ছাড়া আর কেহ নাই। নবকিশোরের পরিচয় শুনিয়া বিজনকুমার ভাবিলেন এইরূপ পাত্রে কন্যা দান করিতে পারিলে তাঁহার জীবন সার্থক হইত। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার বয়স বাড়ীও কি ঢাকায়?" নবকিশোর কহিল "আজ্ঞে এখনও বিবাহ করিনি।" বিজনকুমার আশার উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন "কেন বাবা, রাজ-রাজেশ্বর তুমি বিয়ে করনি কেন?" উত্তরে নবকিশোর কহিল "দেখুন আমাদের অঞ্চলে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকলেও আমার বাবা তার পক্ষপাতী ছিলেন না, আমারও তাই মত। বাবা মারা যাওয়ার পরে মা বড় জেদ করছেন, কিন্তু ও বিবাহ জিনিসটার উপর আমি বড় মায়াজ। বিবাহিত লোকের জীবনে স্বাধীনতা নেই। বিবাহ করার ইচ্ছা আমার মোটেই নেই। বলতে কি আমি এদেশে এসেছি সেই জন্যেই। দিদি আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামের জমিদারের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে আমার মতের অপেক্ষা না করে বিয়ের ঠিক করেছিলেন। আমি তখন কলিকাতায় ছিলুম। দেশে এসে যখন টের পেলুম তখন এজন্যে দিদির সঙ্গে বেশ একটু ঝগড়া হয়ে গেল। একেত আমি বিবাহ বিরোধী, তার উপর শুনলুম একটা কাল ১০ বছরের মেয়ে। মেয়ের বাপের টাকার লোভে দিদি জেদ করতে লাগলেন। আমি কাউকে কিছু না বলে দেশ ছাড়লুম।" নবকিশোরের দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া বিজনকুমার কোনও মতামত প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার মনে দুইটী কথা বার বার উঁকি মারিতেছিল "কাল ১০ বছরের মেয়ে।" তিনি ভাবিতেছিলেন তাঁহার আশা পূর্ণ হইলেও হইতে পারে। পত্নীকে দেখিলে নবকিশোর অপছন্দ করিতে পারিবে না। তাঁহার পত্নী যে ভুবনমোহিনী। তিনি অতিশয় কুণ্ঠিত ভাবে কহিলেন "বাবা, গরীব আমি বলতে সাহস হচ্ছে না, যদি কাল দুপুরে আমার এখানে খাও তাহলে ধন্য হব।"

নবকিশোর কহিল "সে কি আপনি আমার পিতার মত। আপনি আমায় আদেশ করুন, ও রকম কথা বলে আমায় লজ্জা দেবেন না।"

বিজনকুমার কহিলেন পরে সন্তোষ অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিল ও কহিল "উঠুন নবকিশোর বাবু, যাওয়া যাক।" উত্তরে বিজনকুমারের নিকট বিদায় লইল।

(৫)

পরদিন নবকিশোর বিজনকুমারের বাড়ীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেছিল। মণীন্দ্র কহিল "কোথা যাচ্ছেন!"

নবকিশোর কহিল "কাল পথে আমাদের দেশের

ভাবে কহিল "বাবা পরীব আমি, বলতে সাহস হচ্ছে না যদি কাল দুপুরে আমার এখানে খাও তা হলে ধন্য হব।'

নবকিশোর কহিল "সে কি,—আপনি আমার পিতার মত। আপনি আমায় আদেশ করুন, ও রকম কথা বলে আমায় লজ্জা দেবেন না।

বিজনকুমার কহিলেন "নিজ শুনে যা বল বাবা, কাল তোমাকে এখানে তোমার মায়ের হাতের রান্না খেতে হবে।" কিছুক্ষণ পরে সন্তোষ অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিল ও কহিল "উঠুন নবকিশোর বাবু যাওয়া যাক।" উত্তরে বিজনকুমারের নিকট বিদায় লইল।

পরদিন নবকিশোর বিজনকুমারের বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেছিল। মণীন্দ্র কহিল "কোথা যাচ্ছেন?"

নবকিশোর কহিল "কাল পথে আমাদের দেশের একটী লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি আজ খেতে বলেছেন। আজ আর আমায় চাল নেবেন না। এখন আমি যাচ্ছি গঙ্গায় চান করতে। সেখান থেকে তাঁদের ওখানে যাব।" বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। সন্তোষ সেখানে ছিল। তাহার দিকে চাহিয়া বিস্মিত ভাবে মণীন্দ্র কহিল "ব্যাপার কি সন্তোষ? এঁর আবার দেশের লোক কোত্থেকে এল?" সন্তোষও আশ্চর্য্যভাবে কহিল "কি জানি বুঝতে পারিনা কিছু।" প্রথম যখন শুনিল, সন্তোষকে বাদ দিয়া পিতা নবকিশোরকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন তখন সে পিতার প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইল। সে বিরক্তি কতকটা নবকিশোরের উপর ও আসিয়া পড়িল। সেই বা এরূপ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল কেন? সে দিনটা তাহার এক বন্ধু গৃহে কাটাইল, বিজনকুমার ইহাতে কোনও অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না। বরং মনে মনে সন্তুষ্টই হইলেন। মহামায়ার ইচ্ছা ছিল সন্তোষকেও খাইতে বলিয়া পাঠান। কিন্তু স্বামীর অনিচ্ছা বুঝিয়া ক্ষান্ত হইলেন। নবকিশোরকে লইয়া বিজনকুমার আহারে বসিলেন। মহামায়া নানাপ্রকার ব্যঞ্জন যত্ন সহকারে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। লোকাভাবে তিনি স্বয়ং পরিবেশন করিতে লাগিলেন। খাইতে খাইতে বিজনকুমার ডাকিলেন "পরী একটু নুন দিয়ে যা'ও ত মা।" পরী আসিল না। তাহার পরিবর্তে গৃহিণী লবণ লইয়া আসিলেন।

বিজনকুমার কহিলেন "আঃ কি মাছি! পরী কোথা? ডেকে দাওনা, বাতাস করুক।"

মহামায়া কহিলেন "সে পাশ সাজচে। আমি বাতাস করচি" বলিয়া তিনি পাখা লইয়া বসিলেন। বিজনকুমার তাঁহার গেলাসের জল এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া ডাকিলেন "পরী জল দিয়ে যা'ও।" মহামায়ার মুখে অপ্রসন্নতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি এবার আর আপত্তি করিতে পারিলেন না। পরিমল আসিয়া পিতার গেলাসে জল ঢালিয়া দিল। বিজনকুমার কহিলেন "ওগো নবকিশোরকে আর একটু মাংস এনে দাও। পরী তুই একটু বাতাস কর।"

পরীর হাতে পাখা দিয়া মুখ অন্ধকার করিয়া গৃহিণী উঠিয়া গেলেন। মাংস আনিয়া নবকিশোরের বাটিতে ঢালিয়া দিয়া পরীর হাতে শূন্য পাত্র দিয়া মহামায়া কহিলেন "যা পরী বাকী কাটলেট্ গুলো গড়ে ফেলগে যা। আমি হাওয়া করচি।" পরী চলিয়া গেল।

বিজনকুমার কহিলেন "ওকি নবকিশোর, তুমি যে কিছু খাচ্ছ না বাবা?"

নবকিশোর কহিল "খাচ্ছি ত।" কিন্তু সে আর ভাল করিয়া খাইতে পারিল না। পরীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। সে অনেক সুন্দরী দেখিয়াছে কিন্তু পরীর তুলনায় তাহারা উজ্জ্বল নক্ষত্রের নিকট জোনাকী বলিয়া তাহার বোধ হইল। আহারের পর বিজনকুমার নবকিশোরকে লইয়া উপরের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম

করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর তিনি কহিলেন "বাবা আমার মেয়েকে দেখলেত। রূপে গুণে মা আমার রাজরাণী হবার যোগ্য, কিন্তু টাকার অভাবে এমন মেয়েকে সুপাত্রে দিতে পাচ্ছি না এমন মেয়ে হাজারেও একটী পাওয়া যায় কি না সন্দেহ কি বল বাবা।"

নবকিশোর তখন পরিমলের সৌন্দর্য্যের কথাই ভাবিতেছিল, বিজনকুমারের কথার উত্তরে সে অন্য মনস্ক ভাবে উত্তর দিল "হাঁ বেশ মেয়ে।"

বিজনকুমার উৎসাহ পাইয়া কহিলেন "তোমার খাঁজে ভাল শিক্ষিত ছেলে থাকে ত একটু চেষ্টা করে দেখবে বাবা? খাঁই থাকলে চলবে না।—আমি বড় গরীব।

নবকিশোর কহিল "কেন সত্যেশের সঙ্গে ত আপনার মেয়ের বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে শুনেচি।"

বিজনকুমার তাচ্ছিল্য ভাবে কহিলেন "ওঃ সত্যেশ। ও ভবঘুরের সঙ্গে বিয়ে দিতে আমার কান কালেই মত নেই। কেবল গিন্নীর জেদে একটা স্তোকবাক্য দিয়েছি মাত্র। নইলে সত্যেশকে আমি কখনই পরীর যোগ্য মনে করি না। গিন্নীর ওর উপর বড় মায়া হয়ে গেছে। ছেলেবেলা থেকে দেখেছেন কিনা? কিন্তু মেয়েদের কথায় চলে কি সংসার চলে? কথায় আছে ওদের দশহাত কাপড়েও কাছা নেই।

নবকিশোর কহিল "আজ্ঞে সত্যেশ ছেলে মন্দ নয় কিন্তু—" বিজনকুমার কহিলেন "কিন্তু কি বাবা? কিছু দোষ টোষও আছে নাকি?"

নবকিশোর কহিল "বিশেষ কিছু নয়। আপনি ত আর ওকে মেয়ে দিচ্ছেন না। ও কথার দরকার কি?

বিজনকুমার উৎকণ্ঠিত ভাবে কহিলেন "বল বল, তত না ভেবে করেচি। কিন্তু কি জানি শেষে কি হবে।

নবকিশোর কহিল "কিন্তু দেখবেন আমি বলেচি এ কথা যেন কখনও প্রকাশ না হয়। এখানে সত্যেশই আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল, আপনি মেয়ে দেবেন বলেই আপনাকে বলচি।"

বিজনকুমার কহিলেন "সেও কি একটা কথা যে আমি তোমার নাম করব সকলের কাছে। জনপ্রাণী টের পাবে না এ আমি প্রতিজ্ঞা করছি।" তখন নবকিশোর গলা খাট করিয়া কহিল "এমন বিশেষ কিছু নয়,তবে ওর বোধ হয় একটু পাগলামির ছিট আছে, কেননা সেদিন রাত্রে পড়তে পড়তে বই ফেলে দিয়ে ছাতে গিয়ে নাচতে আরম্ভ করেছিল মণীন্দ্র হরেন্দ্র, আমি গিয়ে ধরি, মাথায় জল দিয়ে ঠাণ্ডা করি।"

বিজনকুমার দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন "কি সর্ব্বনাশ! তাগ্যে তুমি বলে! ওর বাপেরও পাগলের ছিট ছিল, তবে নাচত টাচত না। তার পাগলামী ছিল সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দেওয়া। কই হরেন মণীত আমাকে এ কথা বলেনি।

নবকিশোর উত্তর দিল—তারা বন্ধু তার, একথা কি বলে কখন! পাছে সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায় বলে আমাকেই কত করে প্রকাশ করতে নিষেধ করলে। দেখবেন আমার নাম যেন প্রকাশ না পায়।

বিজন কুমার কহিলেন "রামঃ, ক্ষেপেচ তুমি।" তারপর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কাতর স্বরে কহিলেন "উঃ কি বিপদেই পড়লাম! ওদিকে গিন্নীর জেদ, অম্লানে বিয়ে দিতে হবে—এদিকে জেনে শুনে পাগলের হাতে মেয়ে দিই বা কি করে! আমাকে এ দায় থেকে তোমাকেই উদ্ধার করতে হবে নবকিশোর।" "আমাকে?" বলিয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নবকিশোর বিজনকুমারের দিকে চাহিল। বিজনকুমার কহিলেন "হাঁ বাবা তুমিই পরীকে বিয়ে করে আমাকে এ দায় থেকে মুক্তি দাও। আমি দরিদ্র, তোমার যোগ্য মর্য্যাদা দিবার সাধ্য আমার নেই। কিন্তু প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ

করব তাতে তোমার মঙ্গল হবে।" নবকিশোর কহিল "তার জন্য কিছু এসে যাচ্ছে না। আমাদের দেশের জমিদার বার্ষিক ৪০,০০০ হাজার টাকা আয়ের জমিদারী যৌতুক দিতে চেয়েছিলেন তা আমি ফিরেও দেখিনি। বিয়ে করবার ইচ্ছা আমার মোটেই নেই। আর আপনার মেয়ে বিয়ে করা আমার পক্ষে সঙ্গত হবে না। কারণ হাজার হক আমি সন্তোষের কাছ থেকে উপকার নিয়েচি।"

বিজনকুমার কাতরভাবে নবকিশোরের দুইহাত ধরিয়া কহিলেন "বাবা সন্তোষের কথা ছেড়ে দাও; তাকে, আমি এ কথা শোনবার পর কিছুতেই মেয়ে দেব না, কিন্তু অন্যত্রে বিয়ে দিতে না পারলে আমাকে দেশত্যাগী হতে হবে, নয় আত্মহত্যা করতে হবে.—তুমি আমার রক্ষা কর। আমার মেয়ে তোমার অযোগ্য হবে না। আর গরীবের উপকার করলে ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন।"

নবকিশোর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; তার পর কহিল "আপনি অত করে বলে আমার লজ্জা দেবেন না। আপনার উপকার করা সাধ্যাতীত না হলে আমি করব। কিন্তু আপনার মেয়ে বিয়ে করলে আমাকে লোকনিন্দার ভাজন হতে হবে।"

বিজনকুমার ভীতভাবে কহিলেন "কেন?"

নবকিশোর কহিল "আপনার মনগত অভিপ্রায় যাই হ'ক, আপনি মুখে সন্তোষকে মেয়ে দিতে স্বীকার করেছেন, আমি বিবাহ করলে লোকে ভাববে আমিই বুঝি ভাংচি দিলাম আর—সন্তোষই বা কি ভাববে!"

বিজনকুমার যুক্তি দেখাইয়া কহিলেন "এতে তোমার কুণ্ঠিত হবার কারণ নেই, কার্ত্তিকের মধ্যে সুপাত্র না পেলে ওকে দেব বলে ছিলাম। তুমি রাজী হলে এই মাসেই পাকাপাকী করে ফেলি, আর আমি তোমাকে জোর করে বিয়ে করাচ্ছি, তুমি ত নিজে থেকে কত্তে চাওনি। এতে ধর্ম্মের কাছেও তোমার কোন দোষ হবে না। অমত করনা বাবা, আমাকে উদ্ধার কর।"

নবকিশোর কহিল "আচ্ছা আজকে আমি একটু ভাবি, কাল আপনাকে বলব।"

বিজনকুমার কহিলেন "বেশত! কাল আমি তোমার বাসায় গিয়ে যেনে আসব।"

নবকিশোর বাধা দিয়া কহিল "না না, তা যাবেন না। তা হ'লে সবাই সন্দেহ করবে, আমিই বলে যাব যন। ব্যাপারটা এখনই সবাই টের পায় এটা আমার ইচ্ছা নয়।"

কিছুক্ষণ পরে নবকিশোর বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। বিজনকুমার যে কথা নবকিশোরের নিকট গোপন রাখিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন, তাহা গোপন রহিল না। নবকিশোরের প্রতি স্বামীর যত্নাধিক্য দেখিয়া মহামায়ার হৃদয়ে সন্দেহ মাথা তুলিয়াছিল। তিনি দ্বারের অন্তরাল হইতে তাহাদের কথপোকথন সমুদয় শুনিলেন। নবকিশোর চলিয়া যাইবামাত্র ঠিক একটা ঝঞ্ঝা হাওয়ার মতন সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে স্বামীকে কহিলেন "হ্যাগা তোমার কি পঞ্চাশ বছরেই ভীমরতি ধরল না-কি, যে যাকে তাকে মেয়ে দেবার জন্যে খোষামোদ কচ্চ।"

বিজনকুমার বুঝিলেন, গৃহিণী লুকাইয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল না যে কথাটা এত শীঘ্র প্রকাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু মহামায়া যখন জানিতে পারিয়াছেন তখন লুকাইবার চেষ্টা বৃথা ভাবিয়া, তিনি কহিলেন "লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের কথা শোনা হচ্ছিল বুঝি, না? স্ত্রীলোকদের কিছুমাত্র নীতিজ্ঞান নেই।"

মহামায়া রাগিয়া কহিলেন "আমাকে ওসব মাষ্টারী উপদেশ দিতে হবে না। ওসব শোনাওগে তোমার স্কুলের ছেলেদের! আমার কথার উত্তর দাও তুমি ও বাঙ্গালের খোষামোদ করছিলে কেন? আমি কখনই ওকে মেয়ে দেব না, দেব না,

মেয়ের কপালে যাই থাক, সন্তোষ ছাড়া আর কারু সঙ্গে ওর বিয়ে দেব না।"

বিজনকুমার কহিলেন "ছেলে শুনে পাগলের হাতে মেয়ে দিতে পারবে। তুমি বল?"

মহামায়া কহিলেন "কে বলে পাগল! ও নবকিশোরের মিথ্যা কথা। ওকে আমি জন্মের পর থেকে দেখে আসছি। আমার চেয়ে কেউ ওকে বেশী চেনে না। দাঁড়াও, প্রহ্লাদ আসুক, আমি এ কথার সত্যতা জানাচ্ছি।"

বিজনকুমার কহিলেন "সাবধান! নবকিশোর একথা বলেছে কেউ যেন টের না পায়, তা হলে ভাল হবে না বলছি। নবকিশোর রাজী হলে আমি ওকেই মেয়ে দেব, কাজ সাধা হবেনা বাধা দেবে? রূপে গুণে বিদ্যায় ধনে জনে পাত্র আমি কোথায় পাব। ওর আর তোমার ভবিষ্যতের কালপুটে সত্যোষের সঙ্গে আকাশ পাতাল তফাৎ।"

মহামায়া কহিলেন "নবকিশোর এদেশে নূতন এসেছে। ওকে এখানকার কেউ চেনে না। ওর সব কথা যে সত্য তা কি করে জানলে?"

বিজনকুমার কহিলেন "সে সব খবর কি না নিয়েই মেয়ে দেব? ইউনিভারসিটির ক্যালেণ্ডার দেখলেই ওর পাশ সম্বন্ধে জানতে পারব। আর ওর চেহারা আর মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদই ওর ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিচ্ছে। কেন, গিন্নী, সন্তোষের কথা ভেবে দুঃখ করছ? মেয়ে রাজরাণী হবে, এর চেয়ে সুখের আর কি আছে।"

মহামায়া আর কি বলিবেন, তিনি নীরবে চলিয়া গেলেন। প্রহ্লাদ বাড়ী আসিয়া জননীর নিকট সকল কথা শুনিয়া অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। সে কহিল "দাঁড়াও না, আমি ওর মাথা কাটিয়ে দিচ্ছি। ওর বিয়ে করার সাধ জন্মের মত ঘুচিয়ে দিচ্ছি।"

পরদিন সন্ধ্যার পর নবকিশোর আসিলে, বিজন কুমার মহাসমাদরে তাহাকে গ্রহণ করিলেন। নবকিশোর তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া কহিল "দেখুন দিদির ইচ্ছে আমি আমাদের দেশের সেই জমিদারের মেয়ে বিয়ে করি, তিনি এ বিয়েতে কিছুতেই সম্মত হবেন না। বরং টের পেলে বাধা দিতে পারেন। তাই মনে করছি পূর্ব্বে তাঁকে কিছু জানাব না। একেবারে বিয়ে করে দেশে যাব। তখন কিছু আমাদের ফেলতে পারবেন না।"

বিজনকুমার কহিলেন "বেশ ত, তাতে আমার আপত্তি নেই। আমি এদিকে পাকা দেখার বন্দোবস্ত করি।"

নবকিশোর চলিয়া গেলে বিজনকুমার দেখিলেন নবকিশোরের পরিত্যক্ত আসনের উপর তাহার একখানা পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি কৌতূহলী হইয়া পত্রখানা তুলিয়া লইয়া দেখিলেন খোলা খামের উপর পরিষ্কার ইংরাজী অক্ষরে নবকিশোরের পূর্ণনাম ও এ, বে, উপাধী লেখা রহিয়াছে। তিনি তাড়াতাড়ি পত্রখানা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। পত্রখানা এইরূপ—

শ্রীশ্রীদুর্গা

কনকপুর
২২শে কার্ত্তিক।

মহারাজ,

আপনার পত্র পাইয়া অতিশয় অনুগৃহীত হইলাম। অধীনের শতকোটী প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আপনার শরীর কেমন আছে লিখিয়া আমাদের চিন্তা দূর করিবেন। আপনি আর কতদিন ওখানে থাকিবেন?—দিদিরাণী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন? আপনি যে পাঁচশত টাকা চাহিয়াছেন তাহা দিদিরাণীকে জানাইয়াছি। কিন্তু মহারাজ আমার অপরাধ লইবেন না, দিদিরাণী ২০০৲ শতর অধিক পাঠাইতে নিষেধ করিলেন। তিনি বলেন বিদেশে অত টাকা ব্যয় করা সঙ্গত নহে।

অধিক কি লিখিব। এখানকার সমস্ত মঙ্গল জানিবেন। ইতি—

আপনার একান্ত অনুগত সেবক—

শ্রীস্বরঞ্জনারায়ণ শর্ম্মা।

পত্র পড়িয়া বিজনকুমারের মনে যেটুকু দ্বিধা ছিল তাহা মিটিয়া গেল। তিনি নিশ্চিন্ত মনে পুরোহিতের বাড়ীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শিরঃপীড়া।

(শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার)

প্রথম পরিচ্ছেদ

সত্যেন্দ্রনাথ এলাহাবাদে শ্বশুরবাড়ী যাইতেছে। হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়াই একখানি জরুরী তার পাঠাইয়া দিয়া, সত্যেন্দ্র পাঞ্জাব মেলের একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া বসিল।

সত্যেন্দ্র একটু সাহেবী মেজাজের লোক। বাড়ীতে সে কাপড় জামা পরে, কিন্তু পথে ইংরেজী বেশই তাহার মনের মত। আলাপ পরিচয় সে বাংলাতেই করে কিন্তু ইংরেজী কথা কহিতে যে কম ভালবাসে, তা নয়। বাড়ীতে আজকাল সে তামাক (হুঁকা) খাইতেছে, কিন্তু বাড়ীর বাহিরে পাইপ না খাইলে তাহার মুখটা কেমন ফস্ ফস্ করে। বাংলা গল্প উপন্যাস পড়ার অভ্যাস তাহার খুবই আছে, গুরুদাস বাবুর দোকানে তাহার স্থায়ী হুকুম দেওয়া, নূতন উপন্যাস ও গল্পের বহি সবই যায়—কিন্তু সে ইংরেজী মাসিক ও উপন্যাসের বহি লইয়াই এখানে ওখানে যাওয়া আসা করিয়া থাকে।

আজও সে একখানি বিলাতী উপন্যাসের পাতায় চোখ রাখিয়া বসিয়া ছিল। ষ্টেশনের কাছে পাশ্চাত্যে 'এম'-আঁটা বেয়ারা তখনও দাঁড়াইয়াছিল সত্যেন্দ্র হঠাৎ এক সময়ে হাতের ঘড়িটা দেখিয়া, বেয়ারাকে বলিল, আভি দশ মিনিট দের হায়। দৌড় কেলনারসে দো টিন আচ্ছা সিগারেট লাও।

বেয়ারা চলিয়া গেল, পাঁচমিনিট পরেই দুইটি সবুজ রঙের টিন তাহার সম্মুখে রাখিয়া আবার বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। ঢং ঢং করিয়া প্রথম ঘণ্টাও বাজিয়া উঠিল।

সত্যেন্দ্র বেয়ারাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মায়ীজীকে কহ দেনা রোজ তার ভেজনা ওয়াস্তে ছোট বাবুকা খবর দেনে চাই। বুঝা?

প্রভুর হিন্দী ভাষা রামলক্ষণ বেয়ারা অনেকদিন শিখিয়া লইয়াছে, ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, জী হুজুর।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কামরার অন্য একখানা বেঞ্চে একটি সাহেব বসিয়াছিল, সত্যেন্দ্র সেদিকে মন দিল না। বহিখানি খুলিয়া বসিল।

যখন বি এ পাশ করিয়া এম এ ক্লাশে ভর্ত্তি হইতে চলিয়াছিল, পাঠ্যপুস্তকের তালিকাদিও সংগৃহীত হইয়া গিয়াছে ঠিক সেই সময়েই সত্যেন্দ্র বিবাহ করিয়া ফেলিল। মা'ও বলিলেন, আর মেয়েটিও জুটিয়াছিল ভালই এবং শ্বশুরও নামডাকা লোক।

এ-হেন শুভ সংঘটন সত্যেন্দ্র উপেক্ষা করিতে পারিল না। এম-এ ক্লাস ইউনিভার্সিটির মধ্যেই বসিতে লাগিল এবং পাঠ্য পুস্তকগুলির তালিকা কত গোলমালে কোথায় হারাইয়া গেল, খুঁজিয়া

পাওয়া গেল না, সত্যেন্দ্রও এম-এ ক্লাসের বাহিরেই রহিয়া গেল

বিবাহের পর সত্যেন্দ্র এই প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাইতেছে। প্রথমবার এমন অযাচিতভাবে যাওয়াতে তাহার জননী বিশেষ অমতই করিয়া ছিলেন, কিন্তু সাধেবী মেজোমার ছেলের যুক্তি তাঁকে হার মানাইয়াছিল। সত্যেন্দ্র বলিয়াছিল জামাই নিয়ে যাওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল কখন্ জান? যখন সেই গৌরীদানের কাল ছিল। জামাই হইত বালক, নাবুক—তখনই শ্বশুরবাড়ীর লোক আসিয়া হাত ধরিয়া' লইয়া যাইত। এখন সেদিন নাই, মা। এখন ছেলেরা বড় হইয়া বিবাহ করিতেছে, তাহারা ত আর জাকা নহে, পথও চেনে, ঘাটও চেনে, নিজেরাই যাইবে।

সত্যেন্দ্র, অবশ্য অপর পক্ষের বহু বহু সাদর নিমন্ত্রণ পাইয়াছিল এবং প্রত্যেক পত্রের শেষেই স্মারক লিপি সহ "মাথাখাও, আসিও" প্রভৃতিরও অভাব ছিল না, কিন্তু মা'কে, এই নিমন্ত্রণের ইতিহাসটা "বড়" হইয়াও বলিতে তাহার কেমন ঠোঁটে বাধিয়া গেল। সত্যেন্দ্র কয় দিন আগে অপর পক্ষকে চিঠিতে জানাইয়াছে, শীঘ্রই যাইব এবং যাবার যেন তোমাকে দেখিতে পাই।

একথা লিখিবার একটু অর্থ আছে। মাস-খানেক আগে সে একবার হঠাৎ এলাহাবাদে যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। তার খুড়তুতো ভাই ইন্দ্র বেরায়ে সব জজ ছিলেন, তিনি খুব একটা ঘরে সেশে বদলী হইয়া সত্যেন্দ্রকে তার করিয়াছিলেন যাদি এলাহাবাদে পরিবারবর্গকে পঁহুছিয়া দিব যি……দিনে ষ্টেশনে থাকিয়া উহাদের কলিকাতা ইয়া যাইবে।" তিনি জানিতেন সত্যেন্দ্র বলিয়াই যাছে, আর তাহার বৌ-দিদি সব জজ স্বামীকে মন তরলাও দিয়াছিলেন যে, একে আমার নাম, ার ওপর এলাহাবাদ, সত্যে[illegible]রপো পাঁচদিন আগেই আমাদের প্রতীক্ষা করতে থাকবে। কিন্তু তাঁহার এ অভিসন্ধি বিফল হইয়াছিল। এলাহাবাদে পৌঁছিয়া তাঁহারা সত্যেন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন না, পাইলেন একখানা তার—"দেরী হইয়া গেল, চিন্তিত। যাইতেছি।"

যাইবার তাহার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তাহার জননী তাহাকে বলিবর্দ্দের মত ঠেলিয়া ঠুলিয়া পাঠাইলেন, তবুও সত্যেন্দ্র একদিন দেরী করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার রাঙা বৌদি আসিতেছেন, তবুও সত্যেন্দ্র কেন এমন অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে তাহার জননী তাহার কোনই কারণ খুঁজিয়া পাইলেন, না—কিন্তু আমরা কারণটি অবগত আছি এবং এখন তাহা বলিতেও বাধা নাই।

সত্যেন্দ্র দাদার তার পাইবার আগেই সুবালের চিঠি পাইয়াছিল, "জব্বলপুরে আমার মামাতো ভাইয়ের অন্নপ্রাশন, আমি কাল সেখানে যাইতেছি। ৯ দিন পরে ফিরিব। তুমি ন'দিন পরে এলাহাবাদে চিঠি লিখিও। খোকাই তোমার জব্বলপুরে যেন লিখিও না। আমার সবশুদ্ধ ন'টি মামাতো বোন্, তাহারা সবাই আমার চেয়ে বড়, সবাই আসিবে, তোমার চিঠি গেলে আমি মুস্কিলে পড়িব।—আর এই নয়দিনের মধ্যেই সেই প্রিয়তমা বর্জ্জিত নগরেই পড়িল তাহার আহ্বান।

সত্যেন্দ্র অনেক ওজর দেখাইল। ক'দিন মাথায় (!) বেদনায় কষ্ট পাইতেছে তাহাও জানাইল, কিন্তু ডাক্তার নরেশ বাবুর পরামর্শ মত ছই শিশি এস্‌পিরিণ ট্যাবলেট, এক শিশি ব্রোমার লোসন এবং আরো দু'তিনটা ঔষধ লইয়া তাহাকে যাইতে হইয়াছিল।

যাই হোক্ একদিনের দেরীতে রাঙা মামার বা রাঙা বৌ'দির বিশেষ কষ্ট হয় নাই তবে নূতন কর্ম্মস্থলে পৌঁছিয়া প্রথম দিনটিতেই তাঁহাকে কাছারী করিতে হইয়াছিল, এই যা; তাঁহারা ষ্টেশন সন্নিকটে একটি হোটেলেই বাসা বাঁধিয়াছিলেন এবং যে ট্রেণে সত্যেন্দ্রের আসিবার কথা

সেই [redacted] স্বামী স্ত্রীতে প্ল্যাটফরমেই বেড়াইতেছিলেন। তাঁহাদের একমাত্র কন্যা লিলি তাহার ছেড় বছরের মিষ্টি গলায় বগলোগে নূতন ঢেন লাগাইয়া পিছনে পিছনে ঘুরিতেছিল।

রাঙ্গা বৌ'দি বলিলেন, আমরা ভেবেছিলুম সাহেব তার পেয়েই এলাহাবাদে এসে হাজির থাকবেন। হয়ত আমাদের আবার নন্দী মহাশয়ের বাড়ীতেই লোক পাঠাতে হবে সাহেবের খোঁজে।

রাঙ্গা দাদা বলিলেন—জোঠাইমা, হিতেন সব ভালো ত রে?—

সত্যেন্দ্র বলিয়াছিল—হ্যাঁ।

কিন্তু রাঙ্গা বৌ-দি একদিন এলাহাবাদে থাকিয়া কি-কি সব দেখিয়া লইতে চান শুনিয়া সত্যেন্দ্র একেবারে নারাজ হইয়া উঠিল। বলিল, যে শরীর গতিক লইয়া বাহির হইয়াছি, বিদেশে অসুখ বিসুখ করিলে মহামুস্কিল হইবে।

রাঙ্গা বৌ-দি বলিয়াছিলেন—মুস্কিল আর কি হ'বে বল ভাই? নন্দী মহাশয়ের হাঁসপাতালও আছে, নার্সেরও অভাব নেই, মজাই ত হ'বে।

সত্যেন্দ্রর দাদা বলিলেন, না, না কাজ নেই। শরীর খারাপ বলছে যখন। তোমরা ডাউন মেলেই যাও—আমি রাত একটার ট্রেণে রওনা হ'য়ে পড়ি। একদিন ছুটী হাতে ছিল মোটে।

সত্যেন্দ্র ব্রেকফাষ্ট খাইয়া ওয়েটিংরুমে বসিয়া জয়লপুরস্থ প্রিয়তমাকে এলাহাবাদের ঠিকানায় পত্র লিখিল। পত্রের শীর্ষে এলাহাবাদ ওয়েটিং রুমস্, ই, আই আর—এই কথাগুলি খুব বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া নীচে মোটা লাইন কাটিয়া দিল।

অবশ্য নন্দী পরিবার এলাহাবাদে ফিরিয়া উক্ত পত্র পাইলেন। সুবাসের আন্তরিক অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার বড় বোন আভাস চিঠিখানা পড়িয়া হাসির মাত্রা সপ্তমে তুলিয়া বাড়ীময় হৈ চৈ করিয়া তুলিয়াছিল, কেন মরতে গেলি পোড়ারমুখী? বেচারা এল, এসে হতাশ হ'য়ে ফিরে গেল। বোধ হয় গোপনেই কাক মুখে শুনেছে টুনেছে এতদূর আর আসে নি, ওয়েটিংরুমে বসেই চিঠিখানা লিখে চলে গেছে। কেন তুই গেলি রাক্ষুসী? কেন বাবার কাছে থাকলিনে?

সুবাস ঘন্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কহিয়াছিল, এইখানে এসেছিল বুঝি? তোমার যেমন বিদ্যে! চিঠিতেই ত রয়েছে—বিশেষ দরকারে।

আভাস অধিকতর হাস্য করিয়া বলিয়াছিল—তুই বুঝি অত দরকারের—পোড়ারমুখী।

সত্যেন্দ্র কয়েকদিন পূর্ব্বেই আগমনবার্ত্তা জানাইয়াছে, হাওড়া হইতে তার করিতেও সে ভুলে নাই, কিন্তু রবিবার দিন বেলা ৭টার সময় যখন সে নন্দী মহাশয়ের সুবৃহৎ অট্টালিকার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল আভাস আদর অভ্যর্থনা করিয়া, সযত্নে জলযোগ করাইয়া বিমর্ষমুখে কহিল—তোমার চিঠি দেখ ভাই, এই রয়েছে—আমরা রিডায়রেক্ট করব বলে ঠিকানা কেটেও রেখেছি - কাল তোমার তার পেয়ে বাবা তখনই জয়লপুর যান আর কি। তা ঐ জর্জ্জ টাউনে ঘোষ সাহেব ব্যারিষ্টারের অসুখটা বেড়েছে বলে যেতে পারেন না।

সত্যেন্দ্র কেবলমাত্র সেই থামখানার ঠিকানাই পড়িতে পারিল. তাহাও অতি কষ্টে। তাহার স্বহস্তের লেখা কাটিয়া জয়লপুরের ঠিকানা লেখা হইয়াছে, শুধু সুবাসের নামটাই পূর্ব্ব মত আছে।

সত্যেন্দ্রকে নীরব দেখিয়া আভাস ম্লানমুখে কহিল বড় মামীমা এসেছিলেন, জেদ করে নিয়ে গেলেন। আমাদের কারুই ইচ্ছে ছিল না ভাই। না আমার না বাবার। মামীমার জেদ দেখে সুবাস গেল বটে, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলতে পারি, বাবার ইচ্ছে তার এতটুকুও ছিল।

সত্যেন্দ্রর কণ্ঠ ভেদ করিয়া একাক্ষর যুক্ত একটি কথাই উচ্চারিত হইল—হ্যাঁ।

তাহার বড় শালিটী পুনরায় কহিল—আর তা'ও বলি ভাই, মামীমা না হয় জেদই করলেন, তুই যদি

না যাস্, কার সাধ্যি তোকে নিয়ে যায়। কই নিয়ে যাক্ দেখি কেউ আমাদের অমনি তুলিয়ে তাদের বাঁশ বাজাতে। তবে হ্যাঁ, এও বলতে হবে ছাতার জোর্ক্ তেলেমানুষ ত, বুদ্ধিই বা কি আর সুখাস তাদেই বা কি? এই ত মোটে পনেরো···

সত্যেন্দ্র যেন হাসিমুখে কহিল—বাঙ্গালীর মেয়ের পনেরো বছরকে মোটে বলে না, দিদি।

আভাস অন্তরী কাঁচা নয়, সে হাসিটা যে কি তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিল সে তাই যাই বল তুমি। আমি ত ষোল বছরে পড়তে তবে আমার বিয়ে হ'য়েছিল। তার এক বছর পরে শ্বশুর ঘর করতে গেছি।—তাহার বয়স এই উনিশ পার হইয়া কুড়ির কোঠায় পা দিয়াছে।

সত্যেন্দ্র নীরব।

আভাস বলিল—আজই আমরা জব্বলপুরে তার করছি, বাবা আসুন: আজই তারা পাবে, পেয়ে সম্ভবতঃ কালই বেরুবে। দিনের ট্রেণে বোধ করি বেরুবে না, সেখানা গাধা বোট কি না, রাত্রের চাকগাড়ীতে যদি চড়ে, পরশু সকালেই এখানে এসে পৌছুবে।

একমুহূর্ত্ত থামিয়া আবার বলিল—আগে দিনের বেলা বেশ একখানা গাড়ী ছিল ৯টায় চাপলে ..···

সত্যেন্দ্র কি ভাবিতেছিল বলা যায় না, অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ।

স্ত্রিভীক্ষ পক্ষিচেহ্নস্ত।

চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন দেহের ও মনের গঠন স্ত্রী পুরুষের মতই এত নিকট যে একটি বিকৃত হইলে দু'টিরই অবস্থা খারাপ হয়। সত্যেন্দ্রর মন ভালো ছিল না, মধ্যাহ্নকালে সে আবার করিতে বসিয়া কিছুই যাইতে পারিল না। তাহার খাওড়ী, দিদি খাওড়ী কেহই নাই—অদূরে বসিয়া আভাস আর একটী ভেঠতুতো শালী কাননকুমারী অনুযোগ করিতে লাগিল। সত্যেন্দ্র বলিল—রাত্রে ট্রেণের জার্নিতে শরীরটা ভালো নেই।

আহার শেষ হইলে কানন জিজ্ঞাসিল—দিবা-নিদ্রার অভ্যাস আছে না কি?

সত্যেন্দ্র কহিল—না।

আভাস বলিল—দু'রাত্রি গাড়ীতে এসেছ, একটু ঘুমিয়ে নাও ভাই, শরীরটা সুস্থ হ'বে যখন।

কানন বলিল—যা বলে আর কি? দিবানিদ্রায় শরীর খারাপ হয় এ আর কে না জানে কি বলেন সত্যেন বাবু? তার চেয়ে খানিক তাস খেলা যাক্ কি বলেন?

আভাস বলিল—তিনজনে কি তাস খেলবি?

কানন কি বলিতে যাইতেছিল, আভাস বলিয়া উঠিল—পেটাপেটি। আচ্ছা তাই হ'বে এখন আয় ত আমি যাবি যাবি।

কানন বলিল—আমি যে খেয়ে এসেছি বাড়ী থেকে বড়দি। আর তিনজন কেন?·····

আভাস বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ কার্ণলগঞ্জ থেকে কাকন ও যে সত্যেনের সঙ্গে আলাপ করতে আসছে। তুমি তাই ততক্ষণ একটু গড়িয়ে নাও—আমরা এখনি আসছি। ও কানন, শুনে যা।

তাহারা বাহির হইয়া যাইতেছিল, সত্যেন্দ্র বলিল—আমি একবার বেরুচ্ছি, বড়দি এখনই আসব।

এই রোদ্দুরের সময় কোথায় বেরুবে? পাগল না কি, তুমি ভাই?

এখনই আসব। একটি বন্ধু·····

আভাস বলিল—তা'হলে গাড়ী জুততে বলে দিই?

না, না গাড়ীর দরকার নেই। আমি একা একখানা করে নেব। বলিয়া সত্যেন্দ্র ও পাশের দ্বার দিয়া বহির্বাটীতে আসিয়া পড়িল।

চটিজুতা ত্যাগ করিয়া পাম্পশু পায়ে দিয়া সে পথে পড়িয়া হন্ হন্ করিয়া চলিতে লাগিল। পথে পড়িয়া সে আভাসকুমারীর কথাগুলিই ভাবিতেছিল। মাথার উপরে প্রচণ্ড রৌদ্র আর পদ নিম্নে

পাহাড়ের ঘেসের রাস্তা উভয় চাপে পড়িয়া তাহার মন একেবারে ঝি ঝি করিয়া উঠিল। নিজের মনেই বলিল—উঃ কি আত্মীয়তাই দেখাইলেন! আজ তার করিবেন, কাল রওনা হইবে পরশু আসিয়া পৌঁছিবে। খুব আত্মীয়তা হইয়াছে আর কাজ নাই।

একখানা এক্কা খালি ফিরিতেছিল, তাহাকে থামাইয়া সত্যেন্দ্র উঠিয়া পড়িল। হুকুম দিল ডাকঘর।

এক্কা চড়ার অভিজ্ঞতা তাহার ছিল না। থাকিলে সে চড়িত না। প্রথমে তাহার মনে হইল, তাহার সর্ব্বেন্দ্রিয়ে টান ধরিয়াছে এবং আর কিছুক্ষণ পরেই সে অনুভব করিল সামান্য যাহা কিছু সে আহার করিয়া আসিয়াছে তাহারাও অনতিবিলম্বে স্থানচ্যুত হইয়া পড়িবে। এই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই এক্কা চালক রাম রাম শব্দে লাফ্ খাইয়া পড়িল এবং সত্যেন্দ্র নিজে ভূতলে পড়িয়া বিশেষ-রূপই আঘাত প্রাপ্ত হইল। যাই হোক্ এক্কাওয়ালা আশাতিরিক্ত পুরস্কার পাইয়া তখনই একটা জল কলের উদ্দেশে এক্কাসহ চলিয়া গেল। সত্যেন্দ্র একখানি গাড়ীর আশায় বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়াও গাড়ী মিলিল না। অনেক এক্কাচালক অতি দ্রুত ও সুলভে গন্তব্যস্থানে লইয়া যাইবার প্রলোভন দেখাইয়া গিয়াছিল, আর সে কাহার প্রলোভনেই ভুলিল না। রৌদ্রের ঘর্ম্ম দিয়াই পদব্রজে ঘড় ডাক ঘরে হাজির হইল।

সেদিন রবিবার। বিশেষ ভিড় ছিল না। সত্যেন্দ্র টেলিগ্রাফ ফরম লইয়া লিখিল :—

সত্যেন্দ্র মিত্র
C/o নন্দী, আই এম্ এস্
এলাহাবাদ।

ভ্রাতার অসুখ বাড়িয়াছে। এখনই আসিবে।
জননী।

তার বাবু ফরম হাতে লইয়া বলিলেন—একটা লোক দিয়ে পাঠালেই পারতেন। মিথ্যে চৌদ্দটা কথা; আজ আবার রবিবার, এক্সপ্রেস ছাড়া উপায় নাই।

সত্যেন্দ্র বলিল—নেভার মাইণ্ড। তোমার চিন্তা করিবার আবশ্যকতা নাই। চার্জ্জ কত?

টাকা কড়ি মিটাইয়া দিয়া সত্যেন্দ্র জিজ্ঞাসিল—কখন পৌঁছুবে আশা করেন?

তার বাবুটি হিসাব করিয়া বলিলেন—বড় জোর আধ ঘণ্টা। আমরা এর্জ্জ টাউনকে দিব, এর্জ্জ টাউন প্রয়াগ আফিসকে দিবে তাহারা ডেলিভারী করিবে।

সত্যেন্দ্র ডাক ঘরের ঘড়ীর সঙ্গে নিজের হাত ঘড়ীটার সময় মিলাইয়া লইয়া বাহিরে আসিতেই দেখিল, একখানা খালি ট্যাক্সি গাড়ী বিপরীত দিক হইতে আসিতেছে। সাহেবপটির একটা দোকানে গিয়া সে কয়েকটা অনাবশ্যক দ্রব্য কিনিয়া যখন নন্দীসাহেবের ফটকে প্রবেশ করিল—নন্দীসাহেব ও ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অন্য একখানা মোটর হইতে নামিয়া, আদালতে করমর্দ্দন করিলেন।

সত্যেন্দ্র জিজ্ঞাসিল—মিঃ ঘোষের বড় ব্যারাম শুনলাম। কেমন আছেন?

মিঃ জে, সি, ঘোষ মস্ত নামজাদা এডভোকেট। কয়েকটা স্বদেশী মামলায় ইনি বিনাপয়সায় আসামী পক্ষ সমর্থন করিয়া প্রভূত যশঃ এবং উত্তর কালে অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

ডাক্তর নন্দী জিজ্ঞাসিলেন—চেন না-কি তুমি ঘোষ সাহেবকে?

সত্যেন্দ্র বলিল—নাম শুনেছি।

ডাক্তর বলিলেন—অবস্থা বিশেষ ভালো নয়, তবে হতাশার মধ্যে আশাও ত লোক করে। তার পর, তোমাদের কি খবর? সব ভালো?

সত্যেন্দ্র বলিল—ছোট ভাইটির শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না কিছুদিন থেকে। আর সব মঙ্গল।

অন্যান্য কথার পর ডক্টর নন্দী বলিলেন—এখন কিছু দিন আছ ত? শীঘ্রই আমরা শিকারে বেরুব। শিকার তোমার কেমন লাগে সত্যেন্দ্র?

সত্যেন্দ্র বলিলেন—নিজে কখনও করি নি, বন্ধু বান্ধবের কাছে গল্প শুনেছি।

নন্দী বলিলেন এবার নিজেই করে আসবে—চল। বন্দুক ছোড়ার অভ্যাস ত আছে, তা হ'লেই হল।

সত্যেন্দ্র কথা কহিল না; সে টেবিলস্থিত কয়েকখণ্ড মেডিক্যাল জার্ণালের বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা গুলি খুলিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার শ্বশুরমহাশয় প্রকাণ্ড আলবোলায় চারিহস্ত লম্বা নল লাগাইয়া ধূম পান করিতে লাগিলেন।

বেহারা দ্বারটী খুলিয়া মস্ত একটা রূপার কোটা ভরা পান ও জরদার শিশি (বোতল বলিলেও চলে) রাখিয়া দিয়া গেল। ডক্টর সাহেব এক গালে গোটা দশেক পান পুরিয়া খানিক ঊর্দ্ধে চালিয়া বলিলেন—তোমার ছোট ভাইটির কি অসুখ বলে?

সত্যেন্দ্র বলিল—ডাক্তারেরা ম্যালেরিয়াই বলেছেন।

ম্যালেরিয়া! কোথাও বাইরে টাইরে গেছল? না? কলকাতাতেই ছিল? তাই ত!...কি পাচ্ছে ডিঃ-গুপ্ত?

আজ্ঞে না। ডাক্তারী ওষুধ খাচ্ছে পেটেন্ট ঔষধ..

ডিঃ গুপ্ত ঠিক 'পেটেন্ট' নয় হে! ম্যালেরিয়ার অমন ঔষধ আর নেই। আমি যেবার আমেরিকায় যাই—সেখানে অবধি দেখে এসেছি ম্যালেরিয়া রোগীরা চক্ চক্ করে খাচ্ছে। সেখানে এক একটা বোতল কত দামে কিন্তে হয় জান?

সত্যেন্দ্র কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিল না, বলিল আজ্ঞে না।

দশটাকার উপর দাম। কেন, অত দাম দিয়ে লোকে ঐটেই খায় কেন? সেখানে কি সুলভ ঔষধ নেই? তা নয় যে, ম্যালেরিয়ার অমন জিনিষটি আর নেই।

সত্যেন্দ্র কি ভাবিতেছিল বলা যায় না—কিন্তু ডিঃ গুপ্তের ঔষধ বা তাহার দামের ও গুণের তারতম্যে সে আদৌ মনোনিবেশ করিতে পারিতেছিল না। বেহারাটা আবার প্রবেশ করিল। একখানা খামেভরা টেলিগ্রাফ জামাইবাবুর সম্মুখে রাখিয়া দিল। সত্যেন্দ্র টেলিগ্রাফ পাঠ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেই, ডক্টর নন্দী জিজ্ঞাসিলেন—কোথাকার হে?

আজ্ঞে, বাড়ীর—বলিয়া কম্পিতহস্তে টেলিগ্রাফখানি তাঁহার সাম্নে বাড়াইয়া ধরিল। নন্দী সাহেব বামহস্তে সেট ধরিয়া বলিলেন—তাই-ত হে! কি আবার বাড়ল?

কি জানি, কিছু ত বুঝতে পারছিনে।—সে আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

নন্দীসাহেব আবার ধূম পান করিতে লাগিলেন। সত্যেন্দ্র শুষ্কমুখে কহিল—এখান থেকে পাঞ্জাব, বম্বে, দু'টো মেলই পাওয়া যেতে পারে ত?

তা পাওয়া যায় বৈ-কি! তাই ত! এই আজই এলে, আবার

সত্যেন্দ্র বলিল—কিন্তু থাকতেও ত পারি নে।

নন্দীসাহেব বলিলেন—না, না—এ খবর পেয়ে থাকা অসম্ভব। তবে বড় কষ্ট হ'বে—সত্যেন। একটি দিনও বিশ্রাম করতে পেলে না।

সত্যেন্দ্র নতমুখে অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসিল—কখন ট্রেন?

পাঞ্জাব মেল ছাড়ে সন্ধ্যে ৭টায়, বোম্বে মেলের লাগোয়া গাড়ী বুঝি রাত ৪টায়। বেহারা, টাইম্ টেবল লাও জলদি!

সত্যেন্দ্র টেলিগ্রামটি হাতে করিয়া দেখিতে দেখিতে বলিল—পাঞ্জাব মেলেই যাব—পরশু ভোরেই পৌঁছাব।

নন্দী সাহেব বলিলেন—সে ত নিশ্চয়ই। কে? আড়াস? শোন-শোন।

আভাস পিতার আহ্বানে ঘরে ঢুকিতেই নন্দী-সাহেব বলিয়া উঠিলেন—সত্যেনকে আজি যেতে হ'চ্ছে, আভাস! বাড়ী থেকে বেয়ান তার করেছেন, ওর ছোট ভাইটির বড় অসুখ। সন্ধ্যের গাড়ীতেই যাবে, খাওয়া-দাওয়ার, বুঝলে, আভাস?

এক মুহূর্ত্তে আভাসের হাসিমুখানি মসীলিপ্ত হইয়া গেল। সে বিহ্বল নেত্রে সত্যেন্দ্রের হস্তধৃত লাল কাগজটির পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নন্দীসাহেব চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—আমি ডিস্‌পেন্‌সারীর কম্পাউণ্ডারবাবুকে খবর দিয়ে দিই পাঞ্জাব মেলে একটা ফার্ষ্ট ক্লাস বার্থ রিজার্ভ করে আসুক। রোড সাইড্ ষ্টেশনে সেকেণ্ড ক্লাশটা প্রায়ই খালি মেলে না কি না।

আভাস পিতার পানে চাহিয়া কহিল—কি অসুখ?

সত্যেন ত দেখে এসেছিল ম্যালেরিয়া। এখন যে কি দাঁড়াল তা ত বলা ত যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি, নইলে আজই ও পৌঁছুলে—আজই বেয়ান তার করতেন না।

আভাস ম্লানমুখে কহিল—কর্ণেলগঞ্জ থেকে কাকীমা এসেছেন, জর্জ্জটাউনের জ্যাঠাইমাও এলেন এই মাত্র। সত্যেন প্রথম এল, সবাই নিয়ে যাবেন, আমোদ আহ্লাদ করবেন...

ডাক্তার বলিলেন—সে-সব পরে করলেই হ'বে, আভাস!

আভাস বলিল—অসুখ শিছনে নিয়ে এ আসাই বা কেন তবে?

কি বলছ আভাস! ওকি জান্‌ত...

দু'দিন পরে এলেই ত হ'ত—আভাস চলিয়া যাইতেছিল—নন্দীসাহেব ডাকিয়া বলিলেন—তোমার কাকীমা, জ্যেঠিমাকে বুঝিয়ে বল গে আভাস, ওঁরা যেন সত্যেনকে থাকতে জেদ না করেন; মেয়েদের ত জানি কি-না।—তিনি নিজেই ডিস্‌পেন্‌সারীর উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন।

আভাস বলিল—অমন আসা না-ই বা আসতে ভাই? এলে কোথায় দু'দিন আমোদ আহ্লাদ করব, তা নয়!

সত্যেন্দ্র কি একটা রূঢ় কথা বলিতে গিয়া সম্বরণ করিয়া ফেলিল; বলিল—আমি ত আর হাত গুণতে জানি না। তা জান্‌লে দু'দিন পরে আসাই আমার উচিৎ ছিল আর তাই আস্‌তাম-ও।

আভাস বলিল—আজকের দিনটা থেকে কাল যেও—একটিদিন বই ত নয়।

সত্যেন্দ্র বলিল—কি বল্‌ছেন বড় দি?

আভাস যেন ধমক খাইয়া থামিয়া গেল। এক মিনিট পরে বলিল - কি আর বলব বল? যাই, কাকীমাকে...

কাকীমার মেয়ে কাঞ্চন আর জ্যেঠাইমার ছোট মেয়ে কানন এই সময়ে ঘরে ঢুকিয়া বলিল—বেশ লোক ত তুমি বড় দি। আমরা কোথায় হা পিত্যেশ করে বসে আছি, আর তুমি এখানে বেশ গল্প জুড়ে দিয়েছ!

আভাস বলিল—গল্প নয় কানন! সত্যেনের বাড়ী থেকে টেলিগ্রাম এসেছে, ভাইয়ের অসুখ, এখ'নি চল্ল।

কাঞ্চন ও কানন বাথিতমুখে সত্যেন্দ্রের দিকে চাহিতে, সত্যেন্দ্র বলিল—এখনি নয়, সন্ধ্যের গাড়ীতে যাব।

তার ত ভারি দেরি কি-না। পাঁচটা ত বাজে। আর ভাই কানন, খাবার দাবার যোগাড় করতে হ'বে আবার;—বলিয়া মুখখানি অন্ধকার করিয়া চলিয়া গেল।

কাঞ্চন বলিল—আজই যাবেন? আজ থেকে—

সত্যেন্দ্র রসিকতার ভাণ করিয়া বলিল—থেকে লাভই বা কি করব বলুন?

কাঞ্চন সহাস্যে বলিল—ওঃ! তাই বলুন! এ-যে দেখছি বিয়ে করলে ঘর চলে না—তাই হ'য়েছে।

সত্যেন্দ্র ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল—তাই যদি

চলবে করাই বা কেন? আপনারাই কি বলুন, সমস্ত দিন তাস পাশা খেলে, রং রহস্য করে রাত হ'লেই যে যার ঘরে গিয়ে ঢুকবেন···

কাঞ্চন বলিল—কিন্তু ভাই—খুব মন্দির মোর।

কাঞ্চনও সায় দিয়া বলিল—আমার ভাই ও সব চাই। ভয়া বাদর, মাহ ভাদর—ও বটেই, শূন্য মন্দিরও মোর।

আভাসকে আসিতে দেখিয়া কাঞ্চন বলিয়া উঠিল—কি খবর?

সত্যেন, বাবা তোমায় ডাকছেন।

সত্যেন্দ্র চলিয়া গেল। কানন আভাসের গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিম্ন কণ্ঠে কহিল—তাদের অসুখ হ'তেও পারে, তবে ওর বিরহের অসুখটা কম নয় ভাই!

আভাস শুষ্কমুখে কহিল—বিরহ তা হ'বে সব টা!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আভাস ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, আভাস নাই, বালক ভৃত্য নির্জ্জনে এক কোণে বসিয়া একখানি কাপড় চুনোট করিতেছে। আভাস জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে সত্যেন্দ্র স্নানকক্ষে। শুনিয়া আভাস বাহির হইয়া যাইতেছিল, সত্যেন্দ্রর পরিত্যক্ত জামাটি সেখানেই পড়িয়াছিল, পকেট হইতে লাল রঙের টেলিগ্রাফ ফরমটি দেখা যাইতেছে, আভাস কেবল কৌতূহলের বশেই সেখানা বাহির করিয়া লইল। যদি তেমন কিছু জরুরী তলব না থাকে, অন্ততঃ আজিকার রাতটি যাহাতে আটকাইতে পারিবে এই আশাতে সেই টেলিগ্রামটি দেখিতেছিল।

কিন্তু সেখানি পড়িয়া তাহার মুখখানিতে নিরাশা ভরিয়া উঠিল এবং ম্লানমুখ অধিকতর ম্লান হইয়া গেল। আভাস আর একবার হস্তলিখিত লেখাগুলিতে ভালো করিয়া চোখ বুলাইয়া লইয়া রাখিতে যাইবে, হঠাৎ তাহার মুখ চোখ যেন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। স্নানকক্ষে সত্যেনের পদশব্দ শুনিয়া কাগজটা রাখিয়া দিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

এদিকে সত্যেন্দ্রর বিদায়কাল সন্নিকট হইয়া আসিল। ডিস্‌পেন্সারীর কম্পাউণ্ডার একখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট দিয়া গেল। সত্যেন্দ্র অনিচ্ছা-হস্তে বেশ পরিধান করিল; অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত মুকুর সন্নিধানে দাঁড়াইয়া বেশের পারিপাট্য সাধন করিয়া অনিচ্ছাকৃত হাসিতে মুখটি ভরাইয়া লইয়া যখন ওপাশের দ্বার খুলিয়া হলে ঢুকিল, তাহার খুড়-শাশুড়ী, জেঠশাশুড়ী, তাঁহাদের কন্যারা (কানন ও কাঞ্চন) বিরসমুখে দাঁড়াইয়াছিলেন।

সত্যেন্দ্র বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করিতেই তাঁহারা ম্লান-মুখে বলিলেন—হ্যাঁ বাবা, আজই এলে, আজই চল্লে। কোথায় আমরা আশা করে এলুম যে কাল পরশু আমাদের বাড়ী নিয়ে যাব, আমোদ-আহ্লাদ করব, তা যেমন আসা তেমনি যাওয়া!

সত্যেন্দ্রর খুড়শাশুড়ী বলিলেন—এতদূরে যখন এসেই পড়েছ বাবাজী দু'দিন—দু'টি দিন থেকে 'এসো।' দি-বল?

সত্যেন্দ্র বলিল—থাকব বলেই ত এসেছিলুম, কাকীমা! কিন্তু ও-রকম খবর পেয়ে থাকতে ত পারি না। মা-একলা, ভাইটির অসুখ বেড়েছে—থাকবার ত কোনও উপায়ই নেই।

কাঞ্চন বলিল—ইচ্ছে করলে কি আর থাকতে পারেন না! মনে করুন না আজ আপনি টেলিগ্রাম পান-নি। এখনও ত হয়ে থাকে। না হয়, তা ও নয়। সেবার বাবা কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম করলেন, আসছেন, তিনি এসে পৌঁছে গেলেন—তার পরদিন তখন টেলিগ্রাম পৌঁছোল। না-মা?

তাহার মা কি বলিতে যাইতেছিলেন, বেহারা খবর দিল, মোটর হাজির।

সত্যেন্দ্র বাহির হইয়া আসিতেছিল, আভাস

একটা ঘরের দ্বার খুলিয়া ডাকিল, সত্যেন্দ্র, একবার শোন।

সত্যেন্দ্র টুপিটা খুলিয়া ঘরে ঢুকিতেই, আভাস সরিয়া গেল, বোধ হয় বাহির হইয়াই গেল। এবং তাহার পরিবর্ত্তে এক অবগুণ্ঠিতা যৌবনোন্মুখী কিশোরী সত্যেন্দ্রর পায়ের উপর নত হইয়া প্রণাম করিল। সত্যেন্দ্র ভাবিতেছিল, একি অন্যায় বড়দি'র! পরিচয় পর্য্যন্ত করে দিয়ে গেলেন না! কি বলে যে আশীর্ব্বাদ করি? শালীটালী না হয় যদি, তাই বলা ঠিক হ'বে না, আবার না জেনে 'মা' বলাটাও সুযুক্তি নয়।

সত্যেন্দ্র নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

যুবতী যখন প্রণাম করিয়া উঠিল, তখন তাহার অবগুণ্ঠন আপনা হইতেই অপসৃত হইয়া গেছে এবং একখানি তরুণ কোমল মুখ মেঘাক্রান্ত শশধরের মতই বাহির হইয়া, সত্যেন্দ্রর হৃদয় মন অবশন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

সত্যেন্দ্রর মনের ভিতর কি হইতেছিল কে-জানে, মুখে সে একটি কথাও কহিতে পারিল না।

সুবাস কাঁদ-কাঁদস্বরে কহিল—আজই যাচ্ছ? আজকের দিনটা থেকে যাও, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, কাল তখন না হয় এসো।

সত্যেন্দ্র তবুও কথা কহিতে পারিল না।

সুবাস বলিল—থাকবে না?

সত্যেন্দ্র সদুঃখে স্নেহ পূর্ণস্বরে কহিল—তুমি এখানেই ছিলে?

সুবাস প্রথমে প্রশ্নটির অর্থ সম্যক বুঝিতে পারে নাই, তার পর যেন বুঝিয়াছে এমনি ভাবে বলিল—ছিলুম না ত কোথায় ছিলুম? এক মুহূর্ত্ত পরে পুনশ্চ কহিল—দিনের বেলা, এত লোক সব এসেছে আমি কি আসতে পারি!

সত্যেন্দ্র নীরব।

সুবাস একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে চাহিয়া অত্যন্ত করুণকণ্ঠে কহিল—তাই তোমার রাগ হয়েছে? বাড়ীতে ত আর আমি একলা নই যে যা খুসী তাই করব। তোমাদের বাড়ীতে তুমি কর্ত্তা, আর 'মা' ত ভালোমন্দ কিছুতেই নেই, সেখানে ও-সব চলত—এখানে দিদি রয়েছেন, আমার খুড়তুতো জ্যেঠতুতো বোনেরা রয়েছে, আমি কি করব—বল?

প্রথমবারের সেই অষ্টাহ বাসকালের কথা তাহার সবই মনে ছিল, বেচারা তাহারই দোহাই পাড়িল, কিন্তু সত্যেন্দ্র তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিল না। বরং উচ্চকণ্ঠেই কহিল—কি করবে না করবে তুমিই জান! আমি বলব কেমন করে! আমি যাই।

বলিয়া সে প্রস্থানোদ্যত হইল। এবার সুবাসিনী একেবারে ছাপুসনয়নে কাঁদিয়া ফেলিল।

সত্যেন্দ্র ফিরিয়া কহিল—কাঁদ কেন?

সুবাস কথা কহিস না, কাঁদিতে লাগিল।

বাহির হইতে আভাস বলিল—সত্যেন্দ্র, কম্পাউণ্ডার বাবু বলছেন, এখন না বেরুলে গাড়ীর মেল ধরা যাবে না।

সত্যেন্দ্র আরক্তমুখে দ্বার খুলিয়া তাহাকেই খুঁজিতে গেল, দেখিতে পাইল না।

সত্যেন্দ্র রোরুদ্যমানা পত্নীর হাতটি তুলিয়া বলিল—তোমার দিদিই ত যত নষ্টের মূল সুবাস।

সুবাস তাহার রুদ্ধ পরুষকণ্ঠে চমকিয়া মুখ তুলিল, কি একটা প্রশ্ন তাহার কণ্ঠে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল, বলিবার পূর্ব্বেই শুনিল, দিদি বলিতেছে—

আর একটা টেলিগ্রাফ ফরম লিখে দাও না ভাই, পোষ্টাফিসে পাঠিয়ে দিই এখনি।

সঙ্গে সঙ্গেই আভাসের হাস্যোজ্জ্বল মধুর মূর্ত্তি প্রকাশ হইয়া পড়িল। ঘরে ঢুকিয়া সে ঐ কথাটিই পুনর্ব্বার কহিল।

লিখে দাও না ভাই, পোষ্টাফিসে পাঠিয়ে দিই।

সত্যেন্দ্র গম্ভীর হইয়া বলিল—কি বলছেন?

আভাস হাসিল। হাসিয়া ঠিক সাম্নে আসিয়া

দাঁড়াইল। বলিল, কি বল্‌ছি, সে কি আর তুমি বুঝতে পারছ না ভাই। ভয় নেই—আমি যা জেনেছি—জেনেছি। আর কেউ টেরও পাবে না। দাও দাও লিখে দাও, আমি ফরম এনেছি।

সত্যেন্দ্র তাহার প্রসারিত গৌর হস্তের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিল—কি লিখ্‌ব?

লেখ!—

"ভাই একটু ভালো আছে। তাড়াতাড়ি আসিবার দরকার নাই। মা।"

সত্যেন্দ্র গম্ভীর হইয়া বলিল—তার মানে?

আভাস হাসিয়া বলিল—আর কেন ভাই বোকা সাজছ? বের কর ত টেলিগ্রামখানা, দেখি কেমন কলকাতা থেকে আস্‌ছে।

সত্যেন্দ্র টেলিগ্রামখানা বাহির করিয়া বলিল এই দেখুন না, মা লিখ্‌ছেন—মা'র নাম রয়েছে।

আভাস বলিল—তা ত রয়েছে। কিন্তু এ'টা কি মশাই! এখানে এলাহাবাদ—একটা বিশ-মিনিট দেরী কেন? মা কি কলকাতা থেকে এলাহাবাদে এসে টেলিগ্রামটা রওনা করে' গেলেন? না তোমাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যে যদি দেখ যে এখানে নেই ত চটপট টেলিগ্রামটা রওনা করে' বেড়িয়ে পড়বে?—এই কথাই ছিল—বোধ করি।

সত্যেন্দ্র হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

আভাস বলিল—নাও, নাও, দেরী করো না, লিখে দাও ওটা! এখনি পাঠিয়ে দিই আর তুমি একটু 'পড়িমসি' করতে করতেই ডবল বখশিস্ দেয়ে টেলিগ্রাফ পিওনও এসে পড়বে'খন।

সত্যেন্দ্র কলমটি তুলিয়া লইয়া বলিল—বড়দি···

আভাস বোধ করি মানুষ হাঁ করিলে তাহার পেটের কথা অবধি জানিতে পারিত। হাসমুখে কহিল—কিছু ভয় নেই! কেউ জান্‌বে না, তুমি আর আমি! এটা ত ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। বলিয়া সে অবগুণ্ঠিতা সুবাসিনীর অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিল। সুবাসের মিষ্ট করুণ দৃষ্টি অতীব করুণ দেখাইল।

সত্যেন্দ্র টেলিগ্রামটা প্রায় শেষ করিয়াছে, কাকন উঁকি দিয়া বলিল—শীঘ্র করে' যাও বড়দি, এখনি আবার কাকামণি এসে পড়বেন যে!

সত্যেন্দ্র হাসিয়া বলিল—আজ্ঞে আমি আর আপনি, না বড়দি?

কলমখানা সে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, মাথাটা টিপিয়া ধরিয়া বলিল—বড্ড মাথা ব্যথা করছে, বড়দি, দাঁড়াতে পারছি না।

আভাস একগাল হাসিয়া বলিল—সেই ভালো, শির:পীড়া—চমৎকার! বাবা এসে বড় জোর একটা এস্‌পিরিন দেবেন, কিছু ক্ষতি হ'বে না। উত্তম হ'য়েছে।

সত্যেন্দ্র খাটের উপর শুইয়া পড়িল। আভাস বাহির হইতে দ্বারটি বন্ধ করিয়া দিয়া চাকর-বাকরকে সাবধান করিতে লাগিল—জামাইবাবুর বড্ড মাথার অসুখ হ'য়েছে, খবদ্দার! যেন কেউ গোল করিস নে। আর মোটর বাবুকে বল্, গাড়ী তুলে রাখুক, জামাইবাবু আজ যেতে পারবেন না।

সত্যেন্দ্র শির:পীড়ার প্রাবল্যে অত্যন্ত অস্থির হইয়া কি এক বিষমকাণ্ড করিয়া ফেলিল।

জন্মদিনে

যাত্রার কদিন আগে, প্রাণাধিক কাছে মোর এসে,
হাতটি জড়ায়ে হাতে, সুধাইল সুধা হাসি হেসে,
"বল বাবা বল মোরে, কোন্ দ্রব্য দিবে উপহার,
বল না কি দিবে মোরে জন্মদিন আসিলে এবার ?

কহিনু তাহারে আমি, বালকের বক্ষে দূরে টানি',
"তোমার প্রেমের যোগ্য অপূর্ব্ব জিনিষ কোন আনি'
নিশ্চয় জানিও, বৎস, তব করে দিব উপহার,
বিস্মিত হইবে দেখি,— জন্মদিন আসিলে এবার।"

ভাবিয়া না পাই মনে, কাহার সে বাৎসল্য অতুল
ধরণীতে আছে হায়, কোন্ দ্রব্য তা'র সমতুল ?
ছলনা করিয়া মোরে — সত্যভ্রষ্ট করিল এবার
কি দিব তাহারে আমি জন্মদিন এলে পুনর্ব্বার ?

সত্যব্রত পুত্র মোর, পালনার্থে পিতৃপ্রতিজ্ঞার
দেখাইয়া দিলি বুঝি দিতে হবে কিবা উপহার ?
তবে তাই হোক্, বৎস ! ত্রিজগতে নাহি মূল্য যার—
ত্রিদিবে যা চিরদিন দুর্লভ — বাঞ্ছিত দেবতার —
শোকের পবিত্র অশ্রু — নয়নে ঝরিছে অনিবার—
তাই আজি লহ বৎস ! জন্মদিনে তব উপহার

— - --

বঙ্গে তুলার চাষ

[শ্রীনীলরতন সেন গুপ্ত]

কার্পাসের জন্মভূমি।

আহারের জন্য অন্ন ও লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্র মনুষ্যের একান্ত আবশ্যক। জীবন ধারণের আবশ্যকীয় এই দুইটী জিনিষই কৃষিকর্ম্মের উপর নির্ভর করে। ভারতের কৃষকগণ অন্নের জন্য ধান, গম ও যব এবং বস্ত্রের জন্য কার্পাস চাষ করিয়া ভারতবাসীগণের অন্ন-বস্ত্রের অভাব মোচন করিতেছে। বাঙ্গালীদিগের অন্ন ধান্য হইতে উৎপন্ন। পৃথিবী মধ্যে ভারতবর্ষে এবং ভারতমধ্যে আবার বঙ্গদেশে কৃষি শিল্পের আবশ্যকীয় উপাদানগুলি অতি সহজ-

প্রোপা। অতি অল্পায়াসে এখানে এই সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন ও সংগৃহীত হইতে পারে। বঙ্গের কৃষকগণ সামান্য পরিশ্রম করিলেই বঙ্গদেশে এত অধিক ধান্য ও কার্পাস উৎপন্ন করিতে পারে যে, উহা দ্বারা সমগ্র বঙ্গের অন্নবস্ত্রের অভাব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া প্রচুর পরিমাণে ধান্য ও কার্পাস অন্যত্র রপ্তানি হইতে পারে।

ভারতবাসিগণ আজ স্বাবলম্বী হইবার আশায় স্বহস্তে সূত্র নির্ম্মাণপূর্ব্বক বস্ত্রবয়ন করিয়া আপন আপন লজ্জা নিবারণের জন্য উদ্যোগী হইয়াছে। এই বিষয়ে সফলতালাভ করিতে হইলে ভারতীয় কার্পাস চাষের উপরই নির্ভর করিতে হইবে এবং তদ্বিষয়ে অধিক মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে। তাই এখানে কার্পাসের চাষ সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

ভারতের প্রায় প্রতি প্রদেশেই কার্পাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, বেরার, পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে প্রচুর কার্পাস জন্মিয়া থাকে। বঙ্গ, বিহার, ছোটনাগপুর, আসাম, পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ও বঙ্গের পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশেও উৎকৃষ্ট তুলা উৎপন্ন হইয়া থাকে। পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যক্ষেত্রে ও আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে যে তুলা উৎপন্ন হয়, উহা বঙ্গে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই সকল স্থানে উপযুক্তরূপে কার্পাসচাষ করাইলে উহা দ্বারা বাঙ্গালার তুলার অভাব অনায়াসে দূর হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ী, দার্জ্জিলিং, মালদহ, বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান জেলার উচ্চ সমতলক্ষেত্রে কার্পাসের চাষ করাইলে ভাল ফসল পাওয়া যাইতে পারে। ধরিতে গেলে বঙ্গের সকল স্থানেই তুলা জন্মান যাইতে পারে, পূর্ব্বেও জন্মান হইত। নিম্ন-ভূমিতেও আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ক্ষেত্রকার্পাসের (Crop Cotton) চাষ করাইলে পৌষ মাঘ হইতে চৈত্র বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত ফসল পাওয়া যাইতে পারে। উচ্চ ভূমিতে অর্থাৎ যে ভূমিতে বর্ষার জল দাঁড়ায় না, অথবা জোয়ারের জল উঠে না, এইরূপ ভূমিতে এই জাতীয় কার্পাসের চাষ চৈত্র বৈশাখমাসেও করা যাইতে পারে। কার্পাসগাছের গোড়ায় জল উঠিলে, গাছ মরিয়া যায়; সুতরাং সময় ও স্থানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তুলার চাষ করা কর্ত্তব্য। ক্ষেত্র-কার্পাসকে গুল্মকার্পাসও বলা হয়।

উপরোক্ত গুল্মজাতীয় ক্ষেত্রকার্পাস ব্যতীত আর এক প্রকার কার্পাস আছে, উহাকে গাছ কার্পাস (Tree Cotton) বলে। উহা গুল্ম কার্পাস অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়েই শ্রেষ্ঠ। গুল্মকার্পাসের অংশ (আঁশ) প্রায়ই ১ ইঞ্চির অধিক হয় না; কিন্তু গাছ কার্পাসের অংশ ১॥০ ইঞ্চিরও অধিক হইতে দেখা যায়। গাছ কার্পাসের পাকড়া (ফল) গুল্ম-কার্পাসের পাকড়া অপেক্ষা দীর্ঘ। পাকড়া ও অংশ যত শীঘ্র হইবে, তুলাও তত ভাল হইবে। গুল্ম কার্পাস ছয় মাসেই ফল প্রদান করিয়া মরিয়া যায়, কিন্তু গাছ কার্পাসের কোন কোন শ্রেণী ৩।৪ বৎসর, কোন কোন শ্রেণী ৫।৬ বৎসর, কোন কোন শ্রেণী ৭।৮ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে এবং প্রতিবৎসরই ফলদান করিয়া থাকে। গুল্মকার্পাস ৮।১০ ফুট উচ্চ হইয়া থাকে। কিন্তু গাছ কার্পাস ১৫।২০ ফুট উচ্চ হয় এবং উহার শাখা প্রশাখাও বহুদূর বিস্তৃত হয়। কাজেই গুল্ম কার্পাস ২।৩ হাত অন্তর ও গাছ কার্পাস ৫।৬ হাত কি ৭।৮ হাত অন্তর রোপণ করিতে হয়। কেন এক গাছের শাখাপ্রশাখা অন্য গাছে না লাগিতে পারে। প্রতি বাড়ীতে পুকুর পাড়ে, বাগানে ফুল বাগিচার ধারে, ঘরের পেছনে এবং অন্য পতিতভূমিতে গাছ কার্পাসের গাছ ২০।২৫টী করিয়া উঠাইলেই প্রতি গৃহস্থ নিজ নিজ আবশ্যকীয় তুলা বিনাব্যয়েই প্রতিবৎসর পাইতে পারে। এই তুলায় প্রতি গৃহস্থ চরকায় সুতা কাটিয়া লইলে আবশ্যকীয় বস্ত্রের সুতা বিনা মূল্যেই তৈয়ার হইতে পারে। সুতার মূল্য অত্যন্ত অধিক বলিয়াই

কাপড়ের দর এত বেশী। যদি প্রতিগৃহস্থ এই রূপে সূতা প্রস্তুত করিয়া আপনার নিজ নিজ কাপড় বুনিয়া অথবা মজুরী দিয়া বুনাইয়া লয়, তবে অতি অল্পায়াসেও অল্পব্যয়েই বস্ত্রের অভাব দূর হইতে পারে। সামান্য চেষ্টায় যে মহৎকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া প্রতিক্ষণ আমরা অভাবের জ্বালায় দগ্ধ হইতেছি, ইহা কম ক্ষোভের বিষয় নহে।

বীজ নির্ব্বাচন।

কার্পাসের ফলের ভিতরেই তুলা থাকে, ফল পাকিলে তুলা পরিপুষ্ট হয়। যখন ফলের পাকড়া ফাটিয়া যায়, তখন পাকড়াগুলি ভাঙ্গিয়া তুলা বাহির করিয়া লইতে হয়। তুলার ভিতরেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ থাকে। কার্পাসের বীজের রং প্রায়ই কাল; কোন কোনটী কিঞ্চিৎ সাদা। ক্ষেত্র কার্পাসের বীজের গায়ে তুলা জড়ান থাকে বলিয়া উহা উপরে বেশ সাদা দেখায়। কোন কোন গাছ-কার্পাসের বীজ একত্র অনেকগুলি জড়িত হইয়া থাকে, ইহাদের আয়তন দীর্ঘ। আবার কোন কোন জাতীয় বীজ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র; দেখিতে কৃষ্ণকলি তুলের বীজ বা গোলমরিচের মত এবং একটীর গায় একটী জড়ান না লাগিয়া পৃথক্ পৃথক থাকে। ক্ষেত্র কার্পাসের বীজ জিনিং কলে ছড়ান হয় বলিয়া কলের চাপে অনেকটা নষ্ট হইয়া যায় এবং একেবারে নষ্ট না হইলেও জীবনীশক্তি কমিয়া যায়। দেশীয় প্রথানুসারে কেরকী যন্ত্রেও বীজ ছাড়াইয়া লওয়া যাইতে পারে। উহাতে উপরোক্ত দোষ ঘটে না। সুপক্ক ফলের বীজ কেরকী যন্ত্রে ছাড়াইয়া বপনের জন্য যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া দেওয়া উচিত।

বঙ্গীয় গাছ কার্পাসের তুলা অত্যুৎকৃষ্ট। ব্রাহ্মণগণ পৈতার সূতা কাটিবার জন্য আজিও বাড়ীতে উহার গাছ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ বাড়ী হইতে এই বীজ সংগ্রহ করিয়া গৃহস্থগণ আপন আপন বাড়ীতে উচ্চস্থানে সার মিশ্রিত মাটিতে বীজ পুতিয়া অনায়াসে এই গাছ জন্মাইতে পারেন। গাছ উঠাইয়া বা রোপন করিয়া পুরাতন গোবরের সার দিলেও চলিতে পারে।

সুপক্ক ফলের বীজের গায়ে অধিক তুলা জড়ান থাকে না। উহা বেশ শক্ত হইবে এবং উহার আবরণ চক্‌চকে হইবে। সুপক্ক ফলে বীজ ভাঙ্গিলে বা কাটিলে দেখা যাইবে, উহার ভিতর দুইটী পত্র ক্রোড়ক মিশিয়া এক হইয়া আছে। উহা পেষণ করিলে, যত অধিক তৈল বাহির হইবে, বীজ ততই সুস্থ মনে করিতে হইবে। বীজ পুরাতন হইলে, উহা চিবাইলে তিক্ত বোধ হইবে এবং পেষণ করিলে তৈলও কম বাহির হইবে। অধিক পুরাতন বীজ বপন করিলে, গাছ নাও উঠিতে পারে; অথবা উঠিলেও গাছ সুদীর্ঘ ও সতেজ হইবে না। এইরূপ গাছে ফসল ভাল হয় না। সুতরাং বীজ কিনিবার সময় ভাল রূপে পরীক্ষা করা উচিত। ক্ষেত্র কার্পাসের বীজ প্রতি মণ ১০।১২৲ টাকায় বিক্রয় হয়। কিন্তু গাছ কার্পাসের বীজ প্রতি সের ২৲ হইতে ৪৲ টাকা পর্য্যন্ত। এত অধিক মূল্যে গাছ কার্পাসের বীজ খরিদ না করিয়া ব্রাহ্মণ বাড়ী হইতে এই বীজ সংগ্রহ করিয়া কয়েকটী গাছ করা প্রতি গৃহস্থের উচিত।

বীজের উপকারিতা।

কার্পাস বীজে প্রচুর তৈল থাকে। উহা ঘানি কলে পিশিয়া তৈল বাহির করা যায়। অলিভ তৈলের পরিবর্ত্তে এই তৈল ইউরোপে অনেক স্থলে ব্যবহৃত হয়। তজ্জন্য এদেশ হইতে ইউরোপে বীজ আমদানী করা হয়। ঘানিকলে এ দেশেও কার্পাস বীজ হইতে তৈল বাহির করান উচিত। কার্পাস বীজের তৈল গোমহিষাদির উপযোগ পুষ্টিকর খাদ্য। দুগ্ধবতী গাভীকে কার্পাস বীজ খাইতে দিলে খুব বেশী পরিমাণে দুগ্ধ দান করিতে দেখা

গিয়াছে। কার্পাস বীজের খৈল ও উৎকৃষ্ট সাররূপে ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কার্পাস বীজ দ্বারা সিটক প্রস্তুত করা যাইতে পারে এবং উহা বাত রোগের ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কার্পাস বীজ দ্বারা লোকে অনায়াসে তৈল প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে এবং উহা খাদ্য রোগের ঔষধ বলিলেও মনুষ্যগণ ব্যবহার করিতে পারে।

"ষোল চাষে তুলা, তার অর্দ্ধেক মূলা ;
তার অর্দ্ধেক ধান, বিনা চাষে পান।"

খনার এই বাক্যানুসারে তুলার জন্য কিছু বেশী চাষের দরকার বস্তুতঃ ভূমি সুন্দররূপে কর্ষিত না হইলে কার্পাসের চাষের উপযোগী হয় না। ভূমি যত পা'ট হইবে, কার্পাসের শিকড় তত গজাইয়া গাছ বৃদ্ধি পাইবে। গাছ তাড়াতাড়ি বাড়িলে ফসলও তাড়াতাড়ি পাওয়া যাইবে এবং অধিক দিন ফসল দান করিলে জমি পা'ট করিবার সময় উহাতে পুরাতন গোবরের সার দেওয়া উচিত, ইহাতে গাছ তাড়াতাড়ি বাড়িবে।

বপন ও রোপণ।

বর্ষা অন্তে ভাদ্র আশ্বিন মাসে স্বভাবতঃ ভূমি সিক্ত থাকে। তখন ভূমি কর্ষণ করিয়া সহজেই কার্পাসের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত চৈত্র বৈশাখ মাসে ও বৃষ্টি হওয়ার পর ভূমি কর্ষন করিয়া বীজ বপন করা যাইতে পারে। এই সময়ের জন্য যে ভূমি নির্ব্বাচন করা হইবে, উহা উচ্চ ভূমি হওয়া আবশ্যক ; যেন উহাতে বর্ষার জল না উঠিতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তুলা গাছের গোড়ায় জল উঠিলে, গাছ মরিয়া যায়। ভাদ্র, আশ্বিন কি কার্ত্তিক মাসে যে জমীতে বীজ বপন করা হইবে, উহা উচ্চ না হইলেও চলে। কারণ এই সময়ের ফসল জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ব্বেই উঠিয়া যাইবে। মোটের উপর কৃষকগণ যেরূপভাবে পাটের জমি প্রস্তুত করে, সেইরূপ ভাবেই কার্পাসের জমিও প্রস্তুত করিতে পারে। কার্পাসের বীজ বপনও রোপণের প্রণালী নানারূপ :—

(১) জমি প্রস্তুত হইলে ধান কি পাটের ন্যায় বিস্তৃত ভাবে বীজ ছড়াইয়া দিলে গাছ উঠিবে। এইরূপ স্থলে গাছ ১ ফুট পরিমাণ বাড়িলে ক্ষেত্রে নীড় দেওয়া প্রয়োজন হইবে। নীড় দিয়া আগাছা উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। এবং ২ কি ২॥ হাত ঘুরে ঘুরে গাছ রাখিয়া অবশিষ্ট গাছ তুলিয়া ফেলিতে হইবে।

(২) জমি চাষ করিয়া তরকারীর ক্ষেতের ন্যায় ২ কি ২॥ হাত অন্তর এক একটী সারি বাঁধিয়া, উহাতে ২ কি ২॥ হাত অন্তর ২।৩টী করিয়া বীজ ২ ইঞ্চি মাটির নীচে পুতিয়া রাখিতে হয়। ৩।৪টী করিয়াও বীজ পোতা যাইতে পারে। এইরূপ স্থলে মাত্র ২।১টী গাছ যথা স্থানে রাখিয়া বাকীগুলি উঠাইয়া ফেলিতে হয়। কিম্বা অন্যত্র রোপণ করিতে হয়।

(৩) পার্ব্বত্য অঞ্চলে গারো টিপরা প্রভৃতি জাতি ভূমে নানাশস্যের বীজ একত্রে লইয়া একটী গর্ত্তে পুতিয়া রাখে। যখন যে শস্য তুলিবার বা কাটিবার সময় হয়, তখন তাহারা সেই শস্য তুলিয়া বা কাটিয়া লয়। নিম্ন সমতল ভূমিতে এই প্রণালী কার্য্যকরী হইবে না।

(৪) প্রথমতঃ সাধারণ ভাবে চাষ করিয়া একত্রে অনেকগুলি বীজ ফেলিয়া গাছ জন্মান যাইতে পারে। তৎপর জমি প্রস্তুত করিয়া ঐ গাছ তুলিয়া নিয়া ২ কি ২॥ হাত অন্তর রোপণ করা যাইতে পারে।

বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে ২।৩ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া লইলে সহজে গাছ উঠিয়া থাকে। ভূমিতে যথেষ্ট রস থাকিলে জলে না ভিজাইলেও চলে। জমি ও বৃষ্টির অবস্থা বুঝিয়া মাঝে মাঝে জল সিঞ্চন আবশ্যক। বৃষ্টি হইলে জল সেচনের আবশ্যকতা নাই। এই সব বিষয় লিখিয়া উপদেশ দেওয়া অনাবশ্যক ; কারণ বঙ্গের কৃষকগণ স্বভাবতঃ এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ। মোটের উপর পাটের

করিতে যেরূপ শ্রম ও যত্ন আবশ্যক, কার্পাসের জমিতে প্রথমতঃ সেইরূপ করিলেই চলে। তৎপর গাছ বড় হইলে, উহাকে কেবল রক্ষা করিতে হয়; অন্য কোনরূপ শ্রম বা অর্থব্যয়ের আবশ্যক হয় না। গাছ হইতে পাকা পাকড়াগুলি ভাঙ্গিয়া লইলেই তুলা পাওয়া যায়।

সার প্রয়োগ।

স্বভাব উর্ব্বরা বঙ্গভূমিতে অনায়াসে যে পরিমাণ শস্য উৎপাদিত হয়, এইরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বঙ্গীয় ক্ষেত্র নিচয়ে সার প্রয়োগ না করিয়াও কৃষককুল প্রচুর শস্য উৎপাদন করিতেছে। হায়! যেই দেশের মৃত্তিকায় এমন সোণা ফলিতেছে, সেই দেশের অধিবাসীগণ অন্ন বস্ত্রের কাঙ্গাল। তাহারা দারিদ্র্যের তাড়নায় প্রপীড়িত। অভাবের জ্বালায় ছিন্নভিন্ন! বাঙ্গালি, আপন পায় ভর করিয়া দাঁড়াও দেখিবে তোমার সকল অভাব দূর হইয়াছে, সকল জ্বালা ঘুচিয়াছে।

বঙ্গে সার প্রয়োগ ব্যতীত শস্য উৎপাদিত হইলেও সার প্রয়োগের উপকারীতা যে নাই, এমন নহে। কৃষকগণ ধান্য ও পাটের জমিতে মাঝে মাঝে সার প্রয়োগ করিয়া খুব বেশী পরিমাণ ফসল পাইয়া থাকে। কার্পাস ক্ষেত্রেও সার প্রয়োগ করিলে ফসল অধিক হইবে, সন্দেহ নাই সাধারণতঃ গোবরের সারই কার্পাস ক্ষেত্রের পক্ষে যথেষ্ট। তৎসঙ্গে কাঠের ছাই ও পোড়ামাটি ব্যবহার করা যাইতে পারে। সম্ভব হইলে কিছু হাড়ের গুড়া ও ঝিনুক পোড়ান চুণ ২।৩ মাস পচাইয়া সাররূপে ব্যবহার করিলে উৎকৃষ্ট ফসল পাওয়া যাইবে। এই সকল সার শুষ্ক ও কার্পাসের চাষের জন্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

গাছকার্পাসের গাছ বড় হইলে পরেও গোড়ায় গোবরের সার, গৃহ ও উঠানের ঝাট দেওয়া আবর্জ্জনা, ছাগল ও পাখীর বিষ্ঠা, শুষ্ক পত্র ইত্যাদি পরিত্যক্ত জিনিষ সার রূপে দেওয়া যাইতে পারে। ৭।৮ হাত দূরে দূরে ১ হাত দৈর্ঘ্য ১ হাত প্রস্থ ১ হাত গভীর এক একটী গর্ত্ত করিয়া উহাকে গোবরের সারযুক্ত আল্গা মাটি দ্বারা পূর্ণ করিয়া উহাতে এক একটী গাছ কার্পাসের গাছ রোপণ করিলে গাছ সতেজ হইবে, ও তাড়াতাড়ি বাড়িবে। তৎপর গাছ বড় হইলে গোড়ায় উপরের লিখিত সারও দেওয়া যাইতে পারে। গাছ পুরাতন হইলে ফল ছোট হইতে থাকে। তখন ফল প্রদানের পর বর্ষাগমে গাছের পুরাতন ডালগুলির অগ্রভাগ কাটিয়া দিলে যে নূতন ডাল বাহির হইবে, তাহাতে আবার ভাল ফসল হইতে থাকিবে।

উপসংহার।

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত উষ্ণ প্রদেশেই কার্পাসের চাষ করিলে ফসল জন্মিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশেই কার্পাস ভালরূপে জন্মে। যাহা হউক, ভারতের জল বায়ু যে কার্পাস চাষের উপযোগী, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমেরিকায় ও মিশর দেশে প্রচুর পরিমাণে শুষ্ক (ক্ষেত্র) কার্পাস জন্মিয়া থাকে। ভারতের ধারোয়ারের কার্পাস ঐ জাতীয় ও অত্যুৎকৃষ্ট। উক্ত বীজ আনাইয়া বঙ্গে উহার চাষ করাইলেও ভাল তুলা জন্মান যাইতে পারে। ভারতে কাণপুর, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে যে তুলা জন্মে, তাহাও উৎকৃষ্ট।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি হইতে কিছু ধারোয়ারের কার্পাসবীজ সংগ্রহ করা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে উক্ত বীজ ১১ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে স্থিত কংগ্রেস কমিটীর আফিসে রক্ষিত আছে। উক্ত বীজ আরও আনাইয়া দেশে বহুল পরিমাণে তুলার চাষ করান উচিত। অনেক স্থলেই ভাল তুলার অভাবে লোকের সূতা কাটিবার উৎসাহ ও চেষ্টা কমিয়া যাইতেছে। দেশে যত বেশী তুলা উৎপন্ন হইবে, ততই উহা কম মূল্যে পাওয়া যাইবে। তুলার

মূল্য কমিয়া গেলে সূতা ও কাপড়ের মূল্য কমিয়া যাইবে।

বঙ্গের পার্ব্বত্য অঞ্চলে চাষের চাষ দিন দিন বাড়িতেছে। বঙ্গের ধনীলোকগণ ও যৌথ ব্যবসায়ীগণ তুলার চাষের প্রতি মনোযোগ প্রদান করিলে অপেক্ষাকৃত অল্প মূলধনে ও অনায়াসে বহুল পরিমাণে তুলা জন্মাইয়া লাভবান হইতে পারেন। দেশ-প্রাণ কর্ম্ম প্রবণ যুবকবৃন্দ এই বিষয়ে উৎসাহী হইলেও দেশের ও দশের মহান উপকার সাধিত হইতে পারে।

চরকায় সূতাকাটা বর্ত্তমান স্বরাজ সাধনার অঙ্গীভূত বিষয়, কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোক এখনও এই অত্যাবশ্যক বিষয়ে অনভিজ্ঞ। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে। যাহাতে বহুতে সূত্র নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বস্ত্রবয়নে সকলের আগ্রহ জন্মে, তৎপ্রতি চেষ্টিত হওয়া প্রত্যেক দেশহিতৈষী ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

—বাঙ্গলার কথা

বাসনা

প্লেটো হইতে।*

(শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ)

গভীর নিশীথে যবে হেরি, চেয়ে আছ তুমি,
হে প্রাণবল্লভ!
বিস্ময়প্রদীপ্ত নেত্রে, অসংখ্য নক্ষত্রযুত
গগনের পানে;—

সাধ হয় মনে, আমি, পরিহরি নারীরূপ,
মহাকাশে লীন
হয়ে, চেয়ে থাকি, অসংখ্য তারকা আঁখি মেলি,
তোমার সমানে!

আমাদের কথা

বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়া নিরাকরণের উপায়

বাঙ্গালা দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য বহুকাল হইতে বহু প্রকারের আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। ম্যালেরিয়া উৎপত্তির কারণও কতজনে কত প্রকার যে বলিলেন তাহার সংখ্যা করিয়া উঠা কঠিন। কিন্তু তাহাতে কোথাও কোন পল্লীর স্বাস্থ্যশ্রী যে কতটুকু ফিরিয়া আসিয়াছে তাহা আজও পর্য্যন্ত স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। বাঙ্গালার পল্লীগ্রামের যে অবসন্ন ক্লান্ত মূর্ত্তি, অনেকে আবার বলেন যে তাহার কারণ হইতেছে বাঙ্গালীর আজ সহরের প্রতি নজর বেশী পড়িয়াছে কিন্তু তাহাতেই অন্তত স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিবে না, কেন? এ জরাগ্রস্ত পল্লীগুলির বীভৎস মূর্ত্তির ভিতর প্রকৃতির অংশভাবী পরিণামের কারণ কিছু নাই তাহা বলি না, তবে আত্মকৃত অপরাধের চিহ্নও যেন পরিস্ফুট বলিয়া বোধ হয়।

---

* প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্লেটো গ্রীসদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

কিন্তু স্বাভাবিকই হউক আর কাহারও অপরাধের জন্যই হউক, এ অবস্থা আর চলিতে পারে না, পরিবর্ত্তন আবশ্যক। যদি সমস্ত জগতের নিয়মে দেশ একেবারে মরিয়া যায় তাহা হইলে লাভ লোকসান কি হয় তাহা বিবেচনা করিবার দরকার নাই। কিন্তু এই জরাব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় নরকের অধিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়া যে কোন লাভ নাই তাহা সত্য। কারণ অনুসন্ধানও আবশ্যক তাহা বুঝি, কিন্তু বহু চিকিৎসকের সমাবেশ করিয়া রোগ নির্ণয় করিতে করিতে রোগীর এদিকে যদি চলন হইয়া যায় ইহাই ভয়।

সেদিন স্পেনদেশে ইটালীর প্রসিদ্ধ ডাক্তারি অধ্যাপক সেলা বলিয়াছিলেন যে জগতে ম্যালেরিয়া দূরীভূত করিবার জন্য সাধারণতঃ দুইটী পন্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। এক প্রতিষেধকরূপে কুইনিন প্রয়োগ, আর এক মশক ধ্বংস করিয়া ব্যাধির প্রসারে ব্যাঘাৎ দেওয়া। কিন্তু ইহার কোনটীই সম্পূর্ণরূপে সফলতা লাভ করিতে পারে না। তার পর কুইনিনের যেরূপ দাম বাড়িয়া গিয়াছে, এবং জাভার ব্যবসায়ীগণ কেমন জোট করিয়া কুইনিনের দর বাড়াইয়া রাখিতেছে, তাহাতে কুইনিন কোন একটা দেশে সমস্ত লোকের ভিতর প্রতিষেধকরূপে প্রয়োগ করা কার্য্যতঃ একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। তিনি এজন্য আন্তর্জাতিক সভার দৃষ্টি প্রার্থনা করিয়াছেন। আর আশা করেন যে রাসায়নিক আবিষ্কার দ্বারা ইহার উপায় হইয়া যাইতে পারে।

দুঃখের বিষয় তাঁহার কথাগুলি বড় আশাপ্রদ নহে। আমাদের দেশে ত নূতন স্বাস্থ্য সচিব স্যার সুরেন্দ্রনাথ বলিতেছেন যে তিনি অর্থ পাইলেই দশ বৎসরের ভিতর ম্যালেরিয়া তাড়াইয়া দিতে পারিবেন। সেলা সাহেবের কথায় যাহা বুঝায় তাহাতে ত দেখিতেছি যে অর্থ এক কুবেরের ভাণ্ডার খালি করিয়া আনিলেও বাঙ্গালার মত বড় দেশের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে কি না সন্দেহ। তবে উপায়। বাঙ্গালী কি তবে সেই চরমের জন্য প্রস্তুত হইবে?

ইটালীর কাম্পেনিয়া প্রদেশ ও আমেরিকার পানামা যোজক হইতে ম্যালেরিয়া দূরীভূত করিয়া বাস্তবিকই পাশ্চত্য চিকিৎসকগণ বাহাদুরী লইয়াছেন। কিন্তু এ উভয় স্থানেই একযোগে উভয়বিধ প্রথাই অবলম্বিত হইয়াছিল। বাঙ্গলায় মশক নাশের প্রথা এ পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্রও অবলম্বিত হয় নাই বলিলে বোধ হয় কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। তবে কুইনিন ব্যবহার সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে জ্বর হইলে অধিকাংশ রোগীই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু প্রতিষেধকরূপে ইহার ব্যবহার এখনও কোথায়ও হয় নাই। সে সম্বন্ধে লোকের অজ্ঞতা একমাত্র কারণ নহে। কুইনিনের মূল্যও একটা মস্ত বড় প্রতিবন্ধক। আরও বাঙ্গালার দরিদ্রের পক্ষে সুস্থ অবস্থায় অত চিন্তা করিয়া ভবিষ্যৎ ভাবিয়া পয়সা খরচ করা আশা করা যাইতে পারে না। এ ক্ষেত্রে কুইনিন বিতরণের ব্যবস্থা দেশে কতকটা করিলে কিছু সুফল ফলিতে পারিত বোধ হয়। কিন্তু তাহাতেও অজস্র অর্থের দরকার। একে অসুখ হইলেই কুইনিন পাওয়া দুর্ঘট, তার উপর আবার প্রতিষেধক!

গবর্ণমেণ্ট এবার মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা বাঙ্গালার তেইশটী জেলায় কুইনিন বিতরণের জন্য মঞ্জুর করিয়াছেন। বড় দুঃখে বলিতে হয় যে ইহাতে এই জরাব্যাধিগ্রস্ত হতভাগ্য দেশটীকে প্রকৃতপক্ষে মর্ম্মান্তিক উপহাস করা হইয়াছে। স্যার সুরেন্দ্রনাথ আজ স্বাস্থ্য সচিব। তাঁহাকে আর কি বলিব! হতভাগ্য আমরা নিজেদের দুঃখের কথা নিজেদের বুকে চাপিয়া মরি!

বেণ্টলী সাহেব যে বন্যায় দেশ ধুইয়া গেলে দেশে ম্যালেরিয়া কম হইবে বলেন তাহা সত্য বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু তাহার প্রমাণও অর্থ সাপেক্ষ। এ পর্য্যন্ত সে দিকেও কিছুই করা হয় নাই। এ কথা

সত্য যে নিম্ন বঙ্গ পদ্মার মোহনার পলিমাটীতে তৈয়ারী। সকল বড় নদীর মোহনাতেই বহুনদী প্রবাহিত হইয়া থাকে। তবে এ বিষয়ে পদ্মা জগতের মধ্যে সকলের সেরা। নদীর বাহুল্য এতটা জগতে আর কোথাও দেখা যায় না। তবে মোহনার নদীর একটা মস্ত দোষ হইতেছে যে তাহার বড় শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্ত্তন ঘটে। কোনটী শুকাইয়া যাইতেছে, কোনটী ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইয়া পূর্ব্ব পথটীকে দহে পরিণত করিতেছে, কোনটীর মুখে বা বালি পড়িয়া নদীটী মরিয়া শৈবাল পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। এই জন্য নদী মোহনার স্বাস্থ্যের গোলযোগ কিছু না কিছু সর্ব্বত্রই দেখা যায়। পদ্মার মোহনারও এ অসুবিধা খানিকটাই কিছু আছে। তবে বাঙ্গালার বর্ষার নিয়মিত আগমনে প্রতিবৎসর দেশটী বেশ ধুইয়া যাইবার পক্ষে সুবিধা ছিল। কিন্তু গত ষাট বৎসর ধরিয়া আর একটা ভীষণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ ও ফরিদপুর পর্য্যন্ত যে রেল লাইন তৈয়ারী হইয়াছে তাহাতে প্রবল বর্ষার সময় পদ্মার উচ্ছলিত জলে সমস্ত দেশটী ধুইয়া যাইবার বিপক্ষে বিষম বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। অনেকগুলি নদী ইহাতে মরিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু সে নদীগুলির উপর এখন বড় করিয়া পুল করিয়া তাহাদের জীবন ফিরাইয়া আনিলেও আর তখন করিয়া দেশ ধুইয়া যাইবে না। এখন ভিন্ন রূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। নতুবা আর সে স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিতে পারে না।

অর্থের প্রয়োজন স্বীকার করি। সুরেন্দ্রনাথ ত কেবল 'অর্থ দাও ম্যালেরিয়া দূর করিয়া দিব, বলিয়া বড়াইতেছেন। কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিবেন তাহার একটা পরিষ্কার হিসাব প্রকাশ করিবেন কি? তাহা হইলে বোধ হয় অনেকে তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতে পারে। নতুবা বহু প্রকারের আলোচনা ত শুনি, কিন্তু একটা প্রকৃত কার্য্যকারী উপায় আবিষ্কার করিতে কাহাকেও দেখিলাম না।

নোবেল প্রাইজ ও আনাতোল ফ্রান্স

এবার নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন ফরাসী দেশের প্রসিদ্ধ সমালোচক ঔপন্যাসিক আনাতোল ফ্রান্স। ইনি একজন পুস্তক বিক্রেতার সন্তান। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রেল তারিখে ইনি প্যারিস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার পুস্তকের দোকানের একটু বিশেষত্ব ছিল। সেখানে শুধু পুস্তক বিক্রয় হইত না,—লোকে সেখানে বসিয়া পুস্তক পড়িত এবং তাহা লইয়া আলোচনা করিত। এই সাহিত্য চর্চ্চার আবহাওয়ার ভিতর ফ্রান্সের বালজীবন গড়িয়া ওঠে। ইনি প্রথমে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু শেষে বুঝিতে পারেন যে তাঁহার প্রকৃত প্রতিভা সরল প্রাঞ্জল গদ্যের ভিতর দিয়াই সম্যক প্রস্ফুটিত হইতে পারিবে। সহজ চিন্তাকর্ষক অথচ চিন্তাশীল ভাষার ভিতর দিয়া তিনি একটা বিরাট বিশ্বাসহীন হৃদয় লইয়া মনুষ্য চরিত্রের যে সহানুভূতিপূর্ণ সমালোচনা করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। মনুষ্য কল্পিত সর্ব্বশাস্ত্রেই তাঁহার অবিশ্বাস, এমন কি তাঁহার নিজের এই বিশ্বাসহীন অনুসন্ধানের ফলেও তাঁহার বিশ্বাস নাই। কিন্তু এই যে দারুণ দার্শনিক আস্থাহীনতা ইহা নির্ম্মম নহে,—ইহার ভিতর দিয়া যে সহৃদয় মনুষ্যত্বের নির্ম্মল ধারা প্রবাহিত তাহা অতি বড় ভক্তের নিকটও বিস্ময়কর হইবে। মনুষ্য সমাজের প্রকৃত মঙ্গল শুধুমাত্র কয়েকটী বাঁধাধরা ধর্ম্মনীতি বা চরিত্র নীতির দ্বারাই হয় নাই,—অথবা তাহাই মনুষ্য জীবনের একমাত্র লক্ষ্য কিনা বিশেষ সন্দেহের স্থল। গ্রীসের সন্দিগ্ধ ও স্টোরিকদের এক সময় দলে দলে আত্মহত্যা করাতে সমাজ ধ্বংস হয় নাই। ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদিগের কঠোর নিয়ম পালনেও জগৎ পূর্ণ পবিত্রতা লাভ করে নাই। বরং বলা যাইতে পারে জগৎ যেমন ছিল ঠিক তেমনিই আছে। প্রত্যক্ষকে অবহেলা করিয়া অতীন্দ্রিয়ের কল্পনা করিয়া অপ্রত্যক্ষকে পূজা করার

মানুষের কোনও মঙ্গল হইবে কি না তাহাতেও বিশেষ সন্দেহ। এ সমস্ত কথার কোন চরম মীমাংসা হয় নাই। কোন একটা মীমাংসা চরম বলিয়া ধরিয়া লইয়া অন্যকে সে পথে হাঁটিতে বাধ্য করান উচিত কি না বলা যায় না। আনাতোল ফ্রান্স যে কথা জগৎকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা পরিষ্কার রূপে ধরিবার অবস্থা জগতের হইয়াছে কি না ঠিক বলিতে পারি না। যুদ্ধের অবসানে অনেকেই কঠোর ধর্ম্মনীতির পক্ষপাতী। অনেক স্থলে সেই প্রত্যক্ষকে অবহেলা করিয়া আবার কাল্পনিক বস্তুর উপাসনার আবশ্যকতা ব্যাখ্যাত হইতেছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীন অনুশীলনের সময় বোধ হয় এখনও আসে নাই। যেদিন তাহার সূচনা হইবে সেদিন আনাতোল ফ্রান্সের আসন জগতের শীর্ষে স্থাপিত হইবে। আনাতোল ফ্রান্স নোবেল প্রাইজ লব্ধ একলক্ষ বিশহাজার টাকা রাশিয়ার দুর্ভিক্ষ নিবারণ কল্পে দান করিয়াছেন। ইহা কবির অপূর্ব্ব মহত্ত্ব ও সহৃদয়তার পরিচায়ক বটে।

নেশন ও জাতি

ইংরাজি 'নেশন' শব্দের প্রতিশব্দরূপে আমরা 'জাতি' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি,—এবং বোধ হয় ইহাতে 'নেশন' জিনিষটী কি তাহা বুঝিতে আমরা একটু গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছি। আমাদের ভাষাতে 'জাতি' শব্দের যেরূপ ব্যবহার তাহাতে মনে হয় 'জাতি' মানে 'শ্রেণীবিভাগ'। আমরা বাঙ্গালী জাতি বলি ইংরাজ জাতি বলি; আবার হিন্দুজাতি, মুসলমানজাতি, ব্রাহ্মণজাতি, কায়স্থজাতি, মনুষ্যজাতি, গোজাতি, প্রভৃতিও বলি। এরূপ ব্যবহারের ফলে সাধারণত 'ভারতীয় জাতি' বলিতে ইউরোপীয় বা জগতের অন্যান্য স্থানের লোক হইতে স্বতন্ত্র কতকগুলি লোক ভিন্ন আর কিছুই বুঝাইতে পারে না। ইহাতে অন্যের হইতে স্বাতন্ত্র্য বুঝায়; কিন্তু নিজেদের ভিতর 'নেশন' শব্দে যে একই ধারার আবশ্যক বুঝায়, তাহা বুঝা যায় না। ইহাতে সেই জন্য সমস্ত ভারতীয়দের কি ভাবে একই ধারার আবশ্যক তাহা ঠিক উপলব্ধি হইতেছে না। 'নেশন' বলিতে অন্তর্গত সমস্ত লোকগুলির একই ধারা, একই ভাষা, একই ধরণের ধর্ম্ম, একই ধরণের আচার ব্যবহার, একই ধরণের ব্যবহারিক আইনপদ্ধতি উত্তরাধিকার সূত্র বৈবাহিক সম্বন্ধ, একই অতীতের উপর একই ধরণের ভবিষ্যৎগঠন, একই জাতীয় পূর্ব্বপুরুষ হইতে উৎপত্তি প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে একটা এক ধারার আবশ্যক বুঝায়। 'জাতি' শব্দে ঠিক তাহা বুঝায় না, এবং নেশনরূপে জগতে পরিগণিত হইয়া উন্নতি লাভ করিতে গেলে, অর্থাৎ সাধারণ কথায় জগতের সামনে কতকগুলি লোকের একযোগে দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে গেলে, এগুলি আবশ্যক কি না তাহাও আমরা ঠিক মত ভাবিয়া দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

বাঙ্গালায় শিক্ষার ব্যবস্থা ও শিক্ষকের দুরবস্থা

বাঙ্গালার স্কুলমাষ্টারদের কথা ইতিপূর্ব্বে আমরা কিছু বলিয়াছি। তাহাদের দুঃখের সমস্ত দিক খুলিয়া বলিতে হইলে অনেক বিষয়ের অবতারণা করিতে হয়। বঙ্গদেশের স্কুলগুলি Diarchyর অধীন নহে. Trirchyর অধীন। ত্রিবিধ প্রভুর মন যোগাইয়া শিক্ষকগণের দিন কাটে। এক প্রভু, স্কুলকমিটী; দ্বিতীয় প্রভু, ইনেস্পেক্টর; তৃতীয় প্রভু, বিশ্ববিদ্যালয়। তিনজনের কাহারও দাবী কম নহে। এ প্রভুত্ব একাধিপ প্রভুত্ব নহে, প্রত্যেকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে প্রভুত্ব করিতে চাহেন। স্কুল কমিটীর প্রত্যেক মেম্বরই শিক্ষকগণকে নিজের মাহিয়ানা খাওয়া হুকুমের চাকর মনে করেন।—অবশ্য সেক্রেটারীর দাবী তাহার উপরেও কিছু বেশী।—ইনেস্পেক্টর আসিলে সকলেই ভয়ে নিতান্ত জড়সড়, মুখে রা টী সরে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণের মধ্যে তাহার

স্বর্ত্তারা কাগজ কলমে ছাড়া কোন হুকুম চালান না। সে হুকুম সব সময় পালন করা সম্ভব কি অসম্ভব তাহা হয়ত ইহারা বাড়ীর পাঁচ ভাইয়ে বসিয়া স্থির করা যাইতে পারে না, কিন্তু হুকুম দিতেই হইবে। তাঁহাদের আপিসে চিঠি লিখিলে সব সময় নিয়মিত ভাবে উত্তর পাওয়া যায় কি না তাহা দেখিবার অধিকার আর কাহারও থাকিতে পারে না, এবং তাই বলিয়া অপর কাহারও পত্রাদির বিলম্ব মার্জ্জনীয় হইতে পারে না।

সবচাইতে অদ্ভুত ইনেস্পেক্টারের দল। ইঁহারা নিজেদের বাস গবর্ণমেণ্টের অধীন বলিয়া জানেন, অতএব কাহারও নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য নহেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যেও ইঁহারা ভুল ধরিয়া থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি লইয়া কোন স্কুলে কোন ক্লাসে ছেলে ভর্ত্তি করিলে তাহাও ইঁহারা নাকচ করিয়া দিয়া থাকেন। ইঁহারা কোন্ আইন অনুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য তাহা আজও বুঝিতে পারা গেল না। অথবা ইঁহাদের কার্য্য কি, ইঁহাদের আবশ্যক কি, তাহাই বুঝিতে অনেকের মাথা ঘুরিয়া যাইবে। কোন সাহেব ইনেস্পেক্টর হয়ত এক মিলিটারী সার্ট পরিয়া হাটু আলগা করিয়া অত্যন্ত ভাবে এক পল্লীগ্রামস্থ স্কুলে যাইয়া হাজির হইলেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সহিত করমর্দ্দনটুকু পর্য্যন্ত করিতে তাঁহার ঘৃণা বোধ হয়। আলাপ ব্যবহার প্রসিদ্ধ পুলিশের লোকের অধম। ইহা দেখিয়া আমাদের বালকদের ভবিষ্যৎ কি ভাবে বিগড়াইতে পারে তাহা ভাবিবার লোক আছে কি না জানি না। ইহার ফলে যদি বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ভদ্রলোক সম্প্রদায় গুণ্ডায় পরিণত হয় তাহা হইলে কাহাকে দায়ী করিব?

আজও বুঝিতে পারিলাম না যে এই ইনেস্পেক্টরের দল রাখিয়া শিক্ষকগণকে শুধুমাত্র অবমাননা করিয়া আমাদের কি লাভ হইতেছে। শুনিয়াছি —একবার ইটন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ইংলণ্ডেশ্বরকে পর্য্যন্ত মাথা নত করিয়া অভিবাদন করেন নাই। কারণ স্কুলে প্রধান শিক্ষকের চাইতে সম্মানীয় কেহ বালকের নিকট অধিক এ পৃথিবীর উপর থাকিতে পারে না। এ ধারণা আমাদের দেশে কখনও ছিল কিনা ভুলিয়া গিয়াছি। আজ ত সম্পূর্ণ উল্টা ব্যাপারই পরিলক্ষিত হইতেছে। যে ইংরাজের দেশে শিক্ষকের এত বড় সম্মান সেই ইংরাজ ইনেস্পেক্টরদের হাতেই শিক্ষকের সব চাইতে বেশী অবমাননা দেখিতে পাই। লোকে অসহযোগের প্রতি আকৃষ্ট শুধু এক কারণে হইতেছে না। কার্য্যত না পারিলেও মনে হয় যেন লোকের প্রাণে প্রাণে অসহযোগ নীতি ক্রমশ বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে।

ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের পূর্ব্বে ফরাসী দেশে অনেক প্রকার শুল্ক ট্যাক্স ছিল যাহা আদায় করিয়া যে টাকা উঠিত তাহার চাইতে অনেক বেশী টাকা আদায় করিতে লোকজনের মাহিনাদি হিসাবে খরচ হইয়া যাইত। তবুও লোকে সে ট্যাক্সগুলি রাজ্যের জন্য আবশ্যক মনে করিত। যখন উঠাইয়া দেওয়া গেল তখন দেখা গেল লোকসান ত দূরের কথা অনেক বেশী লাভ হইল। আমাদের দেশেরও অনেক ব্যাপারে এই কথাটী বারে বারে মনে পড়ে। ইনেস্পেক্টরের সংখ্যা দিন দিন যেমন বর্ষার কই মাছের মত বাড়িয়া যাইতেছে তাহাতে কি এমন শিক্ষার প্রসার ঘটিতেছে বুঝিয়া পাই না। বরং ও ডিপার্টমেণ্ট একেবারে তুলিয়া দিয়া সেই টাকায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে বোধ হয় কিছু কাজ হইতে পারিত। কিন্তু কেবল তর্ক, দেখিবে কে?—তাহার আগে কি ভাবিয়া দেখা উচিত নয় যে, দেখিবে কি?—যদি ইনেস্পেক্টর গণকে দিতেই সমস্ত টাকা ফুরাইয়া যায় তাহা হইলে ইনেস্পেক্টরদের কাজের মধ্যে বুক ফুলাইয়া ঘুরিয়া বেড়ান আর হুমকি দেওয়া ভিন্ন আর দেখিবার শুনিবার কি কাজ থাকে?—যে কাজ করা হইবে না,

কারণ অর্থের অভাব, তাহার জন্য অর্থ জলে ফেলিয়া মাহিয়ানা দিয়া লোক রাখিবার প্রয়োজন কি? এ অপব্যয়ের জন্য দায়ী কে?—খুলনার দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত মৃতকল্প লোকগুলিরও কিছু অর্থ ইহাতে আছে। স্যর প্রভাস চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করি ইহার উত্তর আছে কি?—এক বৎসর বসিয়া তাঁহারা কি কাজ করিয়াছেন তাহার একটা হিসাব দিবেন কি?

১৯১৯ সালে বাধ্যতা মূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন পাশ হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি সে সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কতটুকু কাজ হইয়াছে?—মোটা মোটা মাহিয়ানা দিয়া লোক রাখিয়া Statistics সংগ্রহ হইতেছে। সে হিসাব আর কিছুতেই ঠিক হয় না তাই কাজ আরম্ভ করা যাইতেছে না। আমরা নিজেরা জানি এ হিসাব গ্রহণের প্রথা এমন অদ্ভুত কোন একস্থানে স্থিরবার তাঁহারা জলাঞ্জলি দিয়া এখনও ছাড়িয়াছেন কি না সন্দেহ। মিউনিসিপালিটির মধ্যে কতজন বালক আছে তাহার একটা কি আধটা ভুল হইলে পাছে বেদ নষ্ট হইয়া যায় এই ভয়েই তাঁহারা অস্থির। অথবা তাঁহাদের বাহাদুরী এবং আলস্যের চাকুরী বজায় রাখিতে হইবে ত। টলষ্টয়ের পুস্তকে পড়িয়াছি যে এই প্রকার রিপোর্ট সংগ্রহ অথচ প্রকৃত কোন কাজ না করা রাশিয়ার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের মহাদোষ ছিল। রিপোর্ট আপিসের আলমারী ভরিয়া যাইত, অজস্র অর্থব্যয় হইয়া যাইত, অথচ কার্য্যত কিছুই হইত না। আজ মনে হয় ইহা আমলাতন্ত্র গবর্ণমেণ্টের একটা বিশেষত্ব, কারণ আমলা রাখা চাইত!—এ সম্বন্ধেও আমরা স্যর প্রভাসচন্দ্রকে কিছু প্রশ্ন করিতে চাই। আমরা আবার বলি, যে বিভাগে কাজ করিবার অর্থের অভাব, সে বিভাগে মাহিয়ানা দিয়া কোন কর্ম্মচারী রাখিবার অধিকার গবর্ণমেণ্টের নাই,—থাকিলে দেশের লোকের নিকট জবাবদিহি করিতে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য।

মণিকাঞ্চন

(উপন্যাস)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৪)

ঊর্ম্মিলা নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। অপমানে ও ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে সে মেঝের উপর আছড়াইয়া পড়িল। বহুক্ষণ পরে সে প্রকৃতিস্থ হইয়া নিজের অবস্থার কথা আর একবার ভাল করিয়া ভাবিবার চেষ্টা করিল। ভবেশের অপরাধ কতখানি তাহাই সে নানারকম করিয়া আলোচনা করিতে লাগিল। রাগের ঝোঁকের বশে যে কথাটা তাহার এতক্ষণ মনে পড়ে নাই, এইবার সেই কথাটা তাহার মনে পড়িল। ভবেশ আর এক বিবাহ করিয়াছে সত্য, কিন্তু সে ত ইচ্ছা করিয়া করে নাই, তাহার পিতা তাহাকে এক-রকম জোর করিয়া বিবাহ দিয়াছেন,—তাহা হইলে সত্যই ত তাহার কোন অপরাধ হয় নাই। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে ঊর্ম্মিলার অন্তরের গ্লানি একেবারে ঘুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে ভবেশকে সে একজন প্রতারক ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারে নাই, এখন সেই ভবেশকেই সে দেবতা বলিয়াই ভাবিতে লাগিল। যে গুলিকে সে অপরাধ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল, এখন সেই গুলিই গুণ হইয়া দাঁড়াইল। যে বিবাহ ব্যাপারটা গোপন করাকে সে অত্যন্ত অন্যায় সহিত বলিয়া মনে করিয়াছিল, এখন তাহার মন বলিল, না—সে ঠিক কাজ করিয়াছে, তাহার মনে ব্যথা বাজিবে বলিয়াই সে গোপন করিয়াছে। ইহাতে তাহার প্রতি ভবেশের গভীর ভালবাসাই সূচিত হইতেছে।

তাহার পর তাহার মনে পড়িল, ভবেশ ত এ কথা জানাইতে গিয়াছিল, সেই ত শোনে নাই। না শুনিয়া ভালই করিয়াছে। শুনিলে হয় ত তখন সে কি একটা কাণ্ড করিয়া বসিত। যতই সে ভাবিতে লাগিল, ততই সে নিজেকেই অপরাধী মনে করিতে লাগিল। এবং এই অপরাধের জন্য ভবেশের নিকট ক্ষমা চাহিবার জন্য তাহার অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা হইল এখনই সে ছুটিয়া গিয়া ভবেশের নিকট ক্ষমা চাহিয়া আসে! কিন্তু সে কোন মুখে যাইবে। এইমাত্র সে যে পিতার আদেশ ও অনুরোধ ঠেলিয়া তাহাকে অপমান করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। নিজের হঠকারিতার জন্য সে তীব্র অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল।

ওদিকে ভবেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেই পরমেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি খেয়ে যাচ্ছ?"

ভবেশ কহিল, "আজ্ঞে।"

পরমেশবাবু কহিলেন, "এখানে তোমার আহারের আয়োজন হচ্ছে—না খেয়ে যেও না।"

ভবেশ কহিল, "আজ আমার বাপ করতে হবে।"

পরমেশবাবু কহিলেন, "আজ তোমার মনটাও অতিশয় চঞ্চল রয়েছে—আহারে অবশ্য তোমার রুচি হবে না। তা যাও, কাল সকালে এস বাবা, তুমি যখন সই করেছ তোমাকে গ্রহণ করতে উর্ম্মিলার মার আমার আর কোন আপত্তি থাকতে পারে না। তার মনও ত কম বিচলিত হয় নি, রাত্রিটা সুস্থ হয়ে নিদ্রা গেলেই কাল প্রাতঃকালে আর মনের কোন খেদ থাকবে না।"

ভবেশ আর এ সব কথা সহ্য করিতে পারিতেছিল না। সে নিঃশব্দে তাপ করিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া একেবারে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

পথে যাইতে যাইতে সে স্থির করিয়া ফেলিল, না হয় সে জেলেই যাইবে, কিন্তু উর্ম্মিলার মুখদর্শন আর সে করিবে না। অবশ্য সে অন্যায় করিয়াছে, তার জন্য তাহার বিবাহিতা স্ত্রী এমনই ব্যবহার করিবে—ইহা যে একেবারেই অসহ্য। আজ যেন কে তাহাকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল, এই শ্রেণীর রমণীরা হিসাব করিয়া ভালবাসে, তাহারা মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া ভালবাসিতে জানে না—তাহাদের হিসাবের এতটুকু এদিক ওদিক হইলে, তাহাদের ভালবাসা আর থাকে না—স্বামীকেও তাহারা অপমানিত লাঞ্ছিত করিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হয় না, কুণ্ঠিত হওয়া দূরের কথা বরং তাহারা আনন্দ অনুভবই করিয়া থাকে! যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে—সে উর্ম্মিলার সহিত আর কোন সংস্রব রাখিবে না। হয়ত উর্ম্মিলার পিতা কন্যাকে বুঝাইয়া সুজাইয়া আপাততঃ ইহার একটা মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু মনের মিল তাহাদের আর কখনও হইবে না, হইতে পারে না। না সে আর ভাবিবে না, হঠাৎ তাহার একটা কথা মনে পড়িল, উর্ম্মিলা যখন তাহাকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, তখন সে ইহার প্রতিশোধ লইবেই, এমন প্রতিশোধ লইবে যে সারাজীবন সে

একটু একটু করিয়া মুগ্ধ হইবে। তাহার জন্য যদি তাহার কায়াদণ্ড ভোগ করিতে হয় তাহাও সে করিবে। এই সঙ্কল্প করিয়া সে ক্ষিপ্রপদে মেসে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাড়াতাড়ি একটী ব্যাগ গুছাইয়া লইয়া তখনই একখানি গাড়ী করিয়া ষ্টেশনাভিমুখে রওনা হইল।

(১৬)

মনোহর পণ্ডিত মহাশয় পরমেশবাবুর গৃহ হইতে ভগ্ন হৃদয়ে বাটী ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা মানদার অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। মানদা স্বামীর ঘর করিতে পাইবে না, হায় অভাগিনী! এই সবেমাত্র তাহার চতুর্দশবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে, সম্মুখে আগন্ত যৌবন, স্বামী জীবিত কিন্তু পরাসক্ত—কি করিয়া কেমন করিয়া সে জীবন কাটাইবে? যদি সে বিধবা হইত তাহা হইলেও ভাল ছিল। তখন তাহার একটা ব্যবস্থা হইত। হায়! তিনি কি উপায় করিবেন কিছুই যে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। কন্যার এই দুরবস্থার কারণ ত তিনিই, কেন ভাল করিয়া অনুসন্ধান না করিয়া একজন প্রতারককে কন্যা সম্প্রদান করিলেন! ইহার কি কোন প্রতিকার নাই! হিন্দু শাস্ত্রে কি কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা নাই? তাঁহার শাস্ত্র সম্বন্ধে যে সামান্য জ্ঞান আছে তাহাতে তিনি বুঝিতেছেন কোন প্রতিকার নাই। পিতার অন্যায়ের ফলভোগ কন্যাকেই করিতেই হইবে। এই কি সত্যই শাস্ত্রের বিধান? বহুদিন তিনি শাস্ত্রগ্রন্থ লইয়া আর কোন আলোচনা করেন নাই; এই বার নূতন উদ্যমে আবার শাস্ত্রের আলোচনায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করিলেন। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল এই গ্রন্থ নিচয় ঘাটিয়া যদি কোন রকমে তাঁহার নিরপরাধা পীড়িতা কন্যার কোন একটা উপায় করিতে পারেন।

পরদিন বিমল আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাহাকে দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। বিমলের বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল,—সে বুঝিল যাহা সে আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহাই ঘটিয়াছে!

পণ্ডিতমহাশয় চোখের জল মুছিয়া ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "আমি যেদিন গিয়ে পৌঁছলাম তার আগের রাত্রেই ভবেশের বিবাহ হ'য়ে গেছে।"

বিমলের মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহারই জন্য মানদার এই অবস্থা হইয়াছে। সে যদি পূর্ব্ব হইতে পণ্ডিতমহাশয়কে সতর্ক করিয়া দিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভবেশ উর্ম্মিলাকে বিবাহ করিতে পারিত না। কিন্তু এযে কল্পনা করিতে পারে নাই যে ভবেশ এত সত্বর এত বড় দুঃসাহসিকতার কাজ করিবে।

পণ্ডিতমহাশয় খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ বাবা তোমরা ত অনেক ইংরাজি বই পড়েছ, বলতে পার এর কি কোন উপায় হয় না।"

বিমল অন্যমনস্কভাবে কহিল "কিসের উপায় পণ্ডিতমহাশয়?"

পণ্ডিতমহাশয় কহিলেন, "এই আমার মানদার, তার ত কোন অপরাধ নেই, সে ত কিছু জানে না, আমিই ত তাকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছি, এখন তোলবার কি কোন উপায় হয় না।"

তাঁহার কথায় বিমলের চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল। অতি কষ্টে তাহা রোধ করিয়া সে কহিল, এক কাজ করলে হয় না?"

পণ্ডিতমহাশয় উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলেন, "কি কাজ বাবা, কি কাজ?"

বিমল ধীরে ধীরে কহিল, "ভবেশকে

ভবেশের নাম করিতেই পণ্ডিতমহাশয় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ও পাষণ্ডের নাম কর না,—ধর্ম্মচ্যুত হৃদয়হীন পশু।"

এমন সময় মানদা আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। বিমল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সেই এক দিনে তাহার কি ভীষণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে,—তাহার সেই সদা প্রফুল্ল মুখখানি একেবারে পাংশু বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

অন্যদিন যে বিমলকে দেখিবামাত্র তাহার মুখখানি হাসিতে ভরিয়া উঠিত, আজ সেই বিমলকে হঠাৎ দেখিয়া তাহার মুখখানি আরও বিবর্ণ হইয়া গেল।

পণ্ডিত মহাশয় কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। এ কষ্ট যে তিনি আর সহ্য করিতে পারেন না! কোন রকমে অন্তরের ব্যথা চাপিয়া বিমলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "মানু এবার কেমন ফুলের বাগান করেছে, তা বুঝি তুমি দেখ নি বিমল?"

এতক্ষণে কথা বলিবার সুযোগ পাইয়া বিমল যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে কহিল, "মানু ত আমায় একবারও সে কথা বল্‌লে না।"

মানদা ধীরে ধীরে কহিল, "তারি ত বাগান গোটাকতক বেলফুলের চারা লাগিয়েছি।"

বিমল কহিল, "তাই আমি দেখ্‌ব।"

মানদা কহিল, "তার আবার কি দেখ্‌বে বিমল দাদা।"

বিমল হাসিয়া কহিল, "আমায় দেখাবে না তাই বল?"

মানদাও এবার হাসিয়া উত্তর করিল, "বেশ ত, দেখবে চল না বিমলদাদা, কিন্তু গাছগুলো সোজা করে লাগান হয় নি বলে আমায় বকবে না ত?"

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন, "ঐ ভয়ে বুঝি মা এতক্ষণ সে কথা লুকুচ্ছিলে, তুমি দেখ বিমল, সত্যি মানু কেমন সুন্দর করে গাছগুলো লাগিয়েছে।"

বিমল উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "চল মানু দেখে আসি।"

ফুলের বাগান দেখিয়া বিমলের সত্যই ভারি আনন্দ হইল। ছোট খানিকটা জায়গায় কতকগুলি বেলফুলের গাছ অতি সুন্দর ভাবে সাজান হইয়াছে। যে সাজাইয়াছে তাহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বিমল প্রশংসমান দৃষ্টিতে মানদার মুখের দিকে চাহিল।

মানদার মুখের সে বিষণ্ণ ভাব অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল। বাগান দেখিয়া বিমল যে খুব খুসী হইয়াছে, তাহার চোখ দেখিয়া মানদা তাহা বুঝিল এবং তৎক্ষণাৎ ঈষৎ হাসিয়া লজ্জায় অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

বাগানটী ঠিক বাড়ীর সাম্‌নেই। তাহার মধ্য দিয়া গ্রামের সদর পথটী ষ্টেসনের দিকে গিয়াছে। ঠিক সেই সময় ভবেশ একটি ব্যাগ হাতে লইয়া সদর পথ ছাড়িয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং বিমল ও মানদা তদবস্থায় দেখিয়া ঝঞ্ঝাহতের ন্যায় আড়ষ্ট স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)

সঙ্কলন

জার্ম্মাণ সেনানায়ক হিন্‌ডেনবার্গের সহিত সাক্ষাৎ

[কয়েক মাস আগে একজন ফরাসী রাজনীতিক জার্ম্মাণ সেনানায়ক হিণ্ডেনবার্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারই কথায় এই সাক্ষাতের বিবরণ আমরা অনুবাদ করিয়া দিলাম।]

হিন্‌ডেন্‌বার্গের বাড়ীর কাছে আসিয়া দেখিলাম বাড়ীটি ধূসর রংএর, সাদাসিধা, আড়ম্বরহীন, ভারি ভারি—ঠিক জার্ম্মানদের মত। বাড়ীতে ঢুকিয়া ঘণ্টা বাজাইতেই নীল পোষাকপরা, ধনগৌফযুক্ত একটি যুবক বাহির হইয়া আসিয়া আমার কার্ড ও পরিচয়-পত্র লইয়া গেল। একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া সে বলিল—"সাহেব জান্‌তে চান আপনি কোন জাতি। ইংরেজ, আমেরিকান, না ওলন্দাজ ?"

আমি বলিলাম—"ফরাসী।"

"ফরাসী ?"—বলিয়া সে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। আমার মনে হইল বুঝি গলাধাক্কা দিয়া সে আমাকে পথ দেখাইয়া দিবে কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন। একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া সে আমাকে প্রভুর কাছে লইয়া চলিল।

ঘরে ঢুকিয়াই দেখিলাম হিন্‌ডেনবার্গ কাগজপত্র ও পুস্তকে পরিপূর্ণ একটি লম্বা টেবিলের ধারে জানালার কাছে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই উঠিলেন এবং অভিবাদন করিয়া বসিতে চেয়ার দিলেন। তাঁহার মাথায় ঘন সাদা চুল ছোট ছোট করিয়া কাটা। চোখের পাতা ভারি ভারি, নীচে হইতে উজ্জ্বল চোখ দুটি জ্বলিতেছিল। মুখের ভাব গম্ভীরশক্তিব্যঞ্জক ও নায়কত্বপূর্ণ; পদক্ষেপ ধীর, কিন্তু ৬৫ বৎসর বয়সের লোকের পক্ষে যথেষ্ট দ্রুত ও কর্ম্মঠ। তাঁহার পিছন দিকের এক কোণে কাইজারের একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি।

দুই চারিটি কথার পরই তিনি বলিলেন—"আমি সংবাদপত্রের লোকদের সঙ্গে কখনো দেখা করি না। আপনাকে সাধারণ লোকের মতই আমি অভ্যর্থনা করছি, কেননা আমার বন্ধুর পরিচয়-পত্র নিয়ে আপনি এসেছেন। আপনার সঙ্গে আমার যে-সব কথাবার্ত্তা হবে তার একটিও সংবাদপত্রে না বেরোয় এই আমার ইচ্ছা।"

তাঁহার সহিত আমার একঘণ্টা ধরিয়া যে-সব আলাপ হইল তা তাঁর ইচ্ছামত প্রকাশ না করিতে পারায় আমি দুঃখিত কিন্তু কিছু কিছু সাধারণকে বলা যাইতে পারে। তিনি বেশ সহজ ও সাধারণ ভাবে কথা কহিতে থাকায় আমার সাহস বাড়িয়া গেল। আমি বলিলাম—"কাগজে কিছু ছাপ্‌তে বারণ করছেন। কিন্তু আমাদের দুই দেশের এখন যে ভীষণ সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে তাতে আপনার মুখ থেকে আমাদের পরস্পরকে বোঝবার সুবিধাজনক কিছু কথা প্রকাশিত হলে লোকের খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। একটি প্রশ্ন কি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি, তার উত্তর প্রকাশ করবো ?"

তিনি বলিলেন—"না।"

আমি বলিলাম—"একটি মাত্র কথা ঠিক আপনি যে রকম বলবেন সেই রকমই ছাপবো।"

দুই মিনিট ইতস্ততঃ করিয়া হিন্‌ডেন্‌বার্গ বলিলেন—"আপনার প্রশ্ন কি শুনি।"

আমি বলিলাম—"যুদ্ধ এখনও ইতিহাসের ঘটনা। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা এমন জটিল যে তার অপক্ষপাত বিচার এখন প্রায় অসম্ভব। এখন ভবিষ্যতই আমাদের ভাববার বিষয়। আপনি কি মনে করেন না যে, জাতিতে জাতিতে যে যুদ্ধ বাধে

তা অনেক সময় পরস্পরকে ভুল বোঝার জন্যে ঘটে থাকে? আমরা পরস্পরকে ভাল রকমে বুঝি না। যদি আমরা পরস্পর পরস্পরকে দেখতে ও বুঝতে পরস্পরের দেশে যাতায়াত করতাম তা হলে তাতে যুদ্ধের সম্ভাবনা কি কিছু কমত না? আল্‌সেস্ ও লোরেন বহুদিন ধরে পরস্পরের মেলবার পথে বাধা-স্বরূপ ছিল। আজ সে বাধা নেই। আপনাদের কাইজার আমাদের দুটো দেশকে এক করতে চেষ্টা করেছিলেন। এখন এই যুদ্ধের রক্ত শুকিয়ে গেলে ভবিষ্যতে আমাদের সম্বন্ধ কিরূপ দাঁড়াবে?"

হিন্‌ডেন্‌বার্গ সমস্ত কথা শুনিয়া ধীরভাবে বলিলেন—"আচ্ছা বেশ, আমি একটা উত্তর দিচ্ছি। মার্শাল জোফ্‌রে যাবে। তারপর দুজনে অনুবাদ করে ফেলবো। আপনার কথার উত্তর এই—যদি আমরা পরস্পরের দেশে গিয়ে পরস্পরকে ভাল করে' বুঝতাম তা হলে সুফল ফলত বটে। কিন্তু ফ্রান্স যতদিন আমাদের প্রতি এই রকম ঘৃণা পোষণ করতে থাকবে ততদিন সে সুযোগ আসবে না। ঘৃণা এখন নামে মাত্র রয়েছে। এখনো আপনারা বিদ্বেষের বশে আমাদের প্রতি যে বিরাগ দেখাচ্ছেন তাতে সুফলের আশা কই? এখনকার যে শান্তি সে ত কথার কথা; মনে মনে আমাদের যুদ্ধ চলছে।"—"স্বরাজ।"

মার্কিণ চক্ষে মহাত্মাজী।

আমেরিকার একখানি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে মোহন্দাস গন্ধী সম্বন্ধে যে উচ্চ অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে সঙ্কলিত হইল :—

একমাত্র নিজ চরিত্র বৈশিষ্ট্যবলে যিনি ত্রিংশত-কোটী লোকের অধিনায়ক হইতে পারেন তিনি আদর্শপুরুষরূপে অভিহিত হইবার যোগ্য। সাধারণতঃ দেখা যায় কোন একটি শ্রেষ্ঠ জাতির যিনি রাজনীতিক নেতা হন, তিনি রাষ্ট্রতন্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ মতাবলম্বী একটি সম্প্রদায়ের সুনির্ব্বাচিত মনোনীত ব্যক্তি এবং অর্থব্যয়ে সাধারণ লোকসমূহকে বশীভূত করিয়া তাহাদের মুখে তাঁহার গুণকীর্ত্তনের দ্বারা তাঁহার জনপ্রিয়তা প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাহা হইলেও তিনি নিজে হয়ত সাধু প্রকৃতি ও প্রকৃতই মহৎ হইতে পারেন, তিনি দেশের মঙ্গলকার্য্য করিতে পারেন—কারণ তাঁহার সাহায্যার্থ রাষ্ট্রীয় শক্তি অপেক্ষায় উদ্যত থাকে, তাঁহার পদমর্য্যাদার প্রভাবে তাঁহার প্রবর্ত্তিত নীতি কার্য্যকরী হইয়া উঠে এবং শাসনতন্ত্র তাঁহার নামের বলে ও অনেক সময়ে তাঁহার অজ্ঞাতসারে এমন কি সম্মতি না লইয়াই কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু এই প্রকারের নেতা আদর্শপুরুষস্থানীয় হইলেও তাহা প্রতিপন্ন করা তাঁহার পক্ষে সুকঠিন। শুধু তাহাই নহে, ইহা তাঁহার পক্ষে বিপজ্জনক। কারণ স্বায়ত্তশাসনাবলম্বী জাতিগণ নেতৃত্বের ততটা পক্ষপাতী নহেন—তাঁহারা কার্য্যসাধিকা শক্তিরই সমাদর করেন।

এই হেতু গান্ধির মত একজন ভারতীয় নেতার সম্বন্ধে আমাদের কি বলিবার আছে। তিনি আপনার মহান্ কর্ম্মাধর্ম্মের অনুরাগে বার্ষিক পনের হাজার ডলার্ (প্রায় পঁচাশ হাজার টাকা) আয়ের ব্যারিষ্টারি কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দরিদ্রজনের মঙ্গলবিধানে তাঁহার সমগ্র ধনসম্পত্তির নিয়োগ করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের জাতিগত অতিশয়তী বিভিন্নতা সংহতিবদ্ধ করিবার জন্য তিনি একাকই সে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

কোন ইংরাজ গভর্ণর গান্ধিকে "একজন বিপজ্জনক ভ্রান্ত সন্ন্যাসী" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু গান্ধির সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত একজন ইংরাজ সংবাদপত্র লেখক তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—'আমি তাঁহাকে যখন ইক্ষুক্ষেত্রে কুলিদিগের হইয়া কার্য্য করিতে এবং কুলিদিগকে সহচর বন্ধুভাবে সম্ভাষণ করিতে দেখিলাম, তখন ইউরোপের আসিসাই নগরের সুবিখ্যাত সাধু ফ্রান্সিস মহোদয়ের কথা আমার স্মরণপথে স্বতঃই উদিত হইয়াছিল।"

গান্ধি ঐশ ভাব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। ভারতবাসী জনগণের প্রতি তাঁহার প্রভাব এরূপ প্রবল যে, এই জনসঙ্ঘের নিকট তাঁহার আবেদন-বাণী অদম্য বৈদ্যুতিক আকর্ষণশক্তির বলে কার্য্য করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের বাহিরে সভ্য-জগতে তাঁহার লিখিত বাক্যগুলি খৃষ্টধর্ম্মানুরাগী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের প্রতি যুক্তিযুদ্ধে আহ্বানস্বরূপ গণ্য এবং পাশ্চাত্য ঈশ্বরবাদী-সম্প্রদায় তাঁহার যুক্তিবাদে কোন ছিদ্র দেখাইতে সম্ভবতঃ সক্ষম হইবেন না।

গান্ধি সমগ্র ভারতে একটি মহাজাতি সংগঠনের কার্য্যে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছেন। এই জাতিগঠন কার্য্য তিনি স্বদেশী ব্রতের সাহায্যে সম্পাদন করিতে চাহেন। তাঁহার এই লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে তাঁহাকে বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। এই সকল বাধা বিঘ্ন এরূপ বিপুল ও প্রবল যে, ইউরোপীয়গণের নিকটে তাহা অনতিক্রমনীয় বলিয়াই বোধ হয়। আমরা এতদিন পর্য্যন্ত এইরূপ বিশ্বাস করিয়া আসিতে ছিলাম যে, বর্ণভেদবশতঃ ভারতবর্ষে চিরদিনই জাতিগত বিচ্ছেদ বিদ্যমান থাকিবে। কিন্তু গান্ধি জাতীয়ভ্রাতৃত্বের এক অভিনব সেতুবন্ধনে ভারত-বাসীদিগের মধ্যে ধর্ম্মগত প্রভেদের প্রাচীরগুলি সংযোজন করিয়া দিতেছেন। পূর্ব্বে আমরা এইরূপ কথা শুনিয়াছিলাম যে, যে দেশের অধিবাসী এত বহুসংখ্যক শ্রেণী ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত, সে দেশের জাতির মধ্যে রাজনীতিক ঐক্য অসম্ভব ব্যাপার। আমরা শুনিয়াছিলাম যে, ভারতবাসীদিগের শিক্ষা-হীনতা ও অসভ্যতা এবং তাহাদের দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষাবস্থাজনিত শোচনীয় দশা তাহাদিগের জাতীয় উন্নতির পথে চির অন্তরায়স্বরূপ থাকিবে।

কিন্তু এখন আমরা দেখিতেছি যে, একজন ব্যক্তির প্রভাববলে এই সকল অনতিক্রমনীয় বাধা একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা বহু শতাব্দীব্যাপী ভারতবর্ষের বিপুল জনসঙ্ঘকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই সভ্যতা তাহাদিগকে যেরূপ অবস্থায় প্রথম দেখিয়াছিল, সেই অবস্থাতেই তাহাদিগকে রাখিয়াছে—অথবা ইহার প্রভাবে তাহাদিগের অধোগতিই হইয়াছে। যে দিকই ধরা যাউক না কেন, পাশ্চাত্যসভ্যতা দীপ্ত ভারতের তিরিশ কোটি লোক যে ভবিষ্যতে কোন দিন আপনাদের দেশে আপনারাই প্রভুর পদে প্রতিষ্ঠিত হইবে—এই আশালোক তাহাদের সম্বন্ধে এক দিনের জন্যও ধরে নাই। কিন্তু এখন আমরা দেখিতেছি যে, ভারতবর্ষের অধিবাসীগণ সংহতিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির জন্য সম্মিলিত উদ্দেশ্যের নৈতিক বল প্রয়োগে সবিশেষ প্রযত্ন করিতেছে।

এই জাতীয় ঐক্যবন্ধন ছাড়া গান্ধি আরও একটি মহৎ কার্য্য করিয়াছেন। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ভাব তিনি জাগরিত করিয়াছেন। আপনার যে আধ্যাত্মিক বলে তিনি বৈদ্যুতিক শক্তির মহাকেন্দ্ররূপে কার্য্য করিতেছেন তাঁহার সেই দানব শক্তির কিয়দংশ তিনি দেশের লক্ষ লক্ষ লোককে দান করিয়াছেন। আমাদের এই বর্ত্তমান যুগে আমাদের মধ্যে এমন একজনও নেতা নাই যিনি শক্তিক্ষেত্রে কোনও স্থানে গান্ধির নিকটবর্ত্তী হইতে পারেন। গান্ধি প্রকৃতির এক অভিনব অভিব্যক্তি। শুদ্ধ একজন ব্যক্তিরও আধ্যাত্মিক শক্তির সীমা যে বাস্তবিকই নাই তাহা জগৎকে দেখাইবার জন্যই বিশ্বের গূঢ় বিধানে এই গান্ধি অভিব্যক্তি।

—"দৈনিক বসুমতী।"

শিক্ষার বিলাসিতা।

আজ সোণার বাঙ্গলা সর্ব্ববিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে। এ কথা মনে ভাবিতেও যে চোখ ফাটিয়া জল আসে! একদিন যে দেশ ধনধান্যে পরিপূর্ণ ছিল, আজ সেই দেশকে অন্নের জন্য রেঙ্গুনের শরণাপন্ন হইতে হয়, দুর্ভিক্ষের সময় অর্থের জন্য ভিন্ন প্রদেশবাসীর দ্বারে গিয়া ভিক্ষার ঝুলি

হাতে করিয়া দাঁড়াইতে হয়! কেন এমন হইল? আমরা যে স্বেচ্ছায় নিজের সমস্ত শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি, ইহাই এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর। আবার আমাদের সেই শক্তি ফিরাইয়া পাইতে হইবে।

ইহার একমাত্র উপায়,—দেশে শিক্ষাবিস্তার করিতে হইবে। আপামর সাধারণের ভিতর শিক্ষাবিস্তার করিতে হইবে। কেরাণী বা স্কুলমাষ্টার তৈয়ারী করা শিক্ষা নয়, যে শিক্ষায় সোণার বাঙ্গলার অধিবাসীরা নিজেদের হারাণ-শক্তি ফিরিয়া পাইতে পারে, সেই শিক্ষা সকলের পাওয়া চাই। সে শিক্ষার জন্য আমাদের পরের মুখ চাহিয়া থাকিলে হইবে না। তবে একটী কথা,—ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে দেশবাসীরা যদি পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিতে পারে, তবেই ইহা সম্ভব হইবে, নচেৎ আমাদের এমনই পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে।

আমাদের দেশে শিক্ষার জন্য যে টাকাটা এখন ব্যয় হয়, তাহার অধিকাংশই বাহিরের জিনিষে ব্যয় হইয়া যায়। গ্রামে যে সমস্ত পাঠশালা আছে, তাহার চলার জন্য যে পরিমাণ টাকার দরকার তাহার অভাব পড়ে, কিন্তু ইন্‌স্‌পেক্টার, সব-ইন্‌স্‌পেক্টারের সংখ্যা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পায় এবং তাহাদের বেতনও কোন দিন বাকী পড়ে না। মার্কমারা কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক আছে, ৬৲ টাকা বেতনের গুরুমহাশয় সেইগুলি ছাত্রদিগকে দিয়া মুখস্থ করাইয়া দিনের কাজ শেষ করেন। তবে পরিদর্শকেরা মাঝে মাঝে দর্শন দিয়া গুরুমহাশয়ের হাজিরা লইয়া প্রস্থান করেন—অর্থাৎ গুরুমহাশয় খাতা-পত্র বেশ দুরস্ত রাখিয়াছেন কিনা তাহা দেখিয়াই পরিদর্শকেরা তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ করেন। কিন্তু তাতা ত আসে, মন্ত্র কি! তারপর ইংরেজী বিদ্যালয়গুলি—সেখানে ছাত্রেরা কিছু শিখে কি না শিখে সে সম্বন্ধে বড় কেহ খবর রাখিবার আবশ্যকতা বোধ করেন না—স্কুল বাড়ীটা বেশ জমকাল হইল কিনা, হোষ্টেলের বাড়ীগুলি বেশ কায়দাদুরস্ত হইয়াছে কিনা, ইহা লইয়াই সকলে ব্যস্ত থাকেন। তাহার ফলে ছাত্রদের মাহিয়ানা ক্রমেই বৃদ্ধি করিতে হয় এবং শিক্ষকদের বেতন কমাইতে হয়। অনশন শিক্ষকের দল তখন নিজেদের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া নানাকাজে এমন কি মদ আফিং বিক্রয়ের কার্য্যেও অঙ্গনিয়োগ করিতে বাধ্য হয়। তাই আমাদের মনে হয় বিদ্যালয়ের অট্টালিকা এবং ছাত্রদের হোষ্টেল নির্ম্মাণে যে টাকাটা ব্যয় হয়, তাহা সত্যই বাজে খরচ, বাবুয়ানার খরচ। যাঁহারা জাতীয় শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও সেই ভুলপথে চলিতেছেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তবে বহু-দিনের সংস্কার ত্যাগ করা সহজ নয়। যাক্, যে কথা বলিতেছিলাম,—আমরা চাই শিক্ষা। শিক্ষার বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া যাহাতে দেশের স্ত্রীপুরুষ সকলে প্রয়োজনীয় শিক্ষা পায়, আমাদের নিজেদের সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পরের মুখ চাহিলে চলিবে না, দেশবাসী দেশ-বাসীকে আন্তরিকতার সহিত ভালবাসিতে শিখিলে আর কাহাকেও পরের মুখ চাহিতে হইবে না,—আহারের জন্য, বস্ত্রের জন্য, শিক্ষার জন্য নিঃসহায়ভাবে কাহারও মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে না। বঙ্গবাসি! তোমাদের অভাব কিসের—তোমরা শুধু একবার শিক্ষার বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া দেশের উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া নিজেদের লুপ্ত শক্তি ফিরাইয়া আন দেখি, দেখিবে তোমাদের ঘরিতে সোণা ফলিবে, তোমাদের গৃহে জরাজীর্ণ রুগ্ন দুর্ব্বল শিশুদের পরিবর্ত্তে সুস্থ সবল সদা-হাস্যমুখ শিশুগণের কল-ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে,—তোমাদের গৃহিণীরাও নষ্টস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবে,—তাহাদের সেবা-যত্নে তোমাদের নিরানন্দ গৃহ বিমল আনন্দে উল্লাসিত হইয়া উঠিবে। "প্রভাকর।"

Printed by P. N. Pal, at the Shastraprachar Press, 5 Chidammudi Lane, and Published by P. N. Pal, 26-3 Scott Lane, Calcutta.

আনন্দা ও বিমলকে একত্রে দেখিয়া ভবেশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

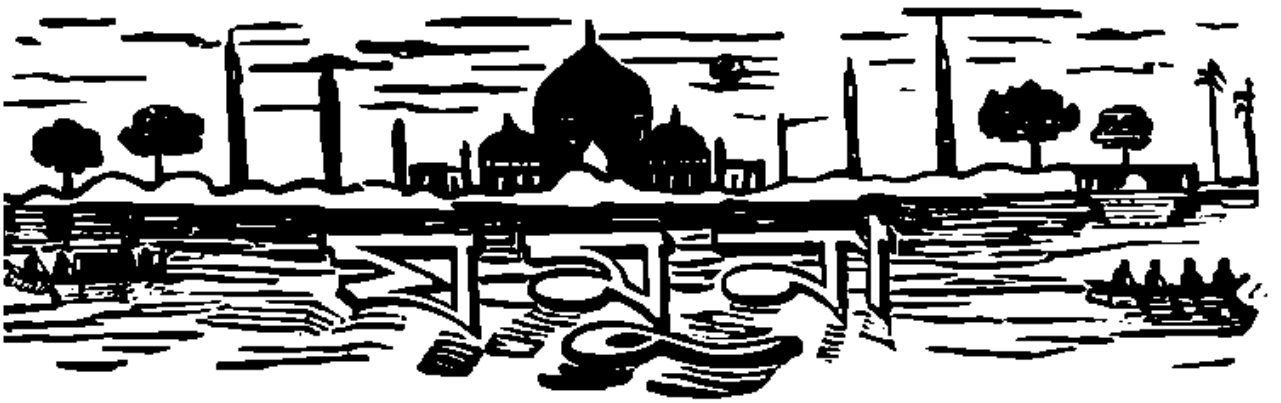

১১শ বর্ষ | পৌষ, ১৩২৮ | ৯ম সংখ্যা

আগন্তুক

(শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী)

পথের বাঁধন কাটব যখন করছি মনে-মনে—
এমন সময় কেরে পথিক, দাঁড়ালি প্রাঙ্গনে।
ছোট্ট তোর ঐ হাত দুখানি চিত্তে লাগায় ভয়,
সকল বাঁধন চাইতে যদি শক্ত বেশীই হয়!
ছুটকুটে ঐ মুখের মাঝে পুটপুটে ঐ আঁখি
মরা-গাঙে আবার ফিরে বান্ ডাকাবে নাকি!

এলি যদি, তোথায় কেন আবার বুকের মাঝে,
রক্ততালে বেথায় আমার মর্ম্মমাদল বাজে;
আয়রে মুগ্ধ শুক্তি-চেরা, আয়রে আমার হীরে,
আয়রে আমার দখিণ হাওয়া বৈতরণীর তীরে;
আয়রে আমার শরৎ-পদ্ম বর্ষা শেষের প্রাতে,
আয়রে আমার সুনের ছিটে বিস্বাদ জিহ্বাতে।

আয়রে আমার ব্যাধিশেষের ফিরিয়ে পাওয়া ক্ষুধা;
আয়রে চৈত্র তৃষ্ণাকালের একটি গেলাস সুধা,
আয়রে আমার চোখের আলো মর্ম্মের নিশ্বাস;
নিরাশ মনের আয়রে আশা, ধর্ম্মের বিশ্বাস
বাঁধিস্ যদি দুহাত দিয়ে ভালো করেই বাঁধ্—
ফিরে' যেন হয়না মনে কেরার অপরাধ।

একটা কিন্তু কড়ার করতে হবে আমার সাথে,
পথ দেখিয়ে যেতে হবে পথের সীমানাতে'।
চোখ দুটি মোর পথের ধূলায় আধেক যেরে আঁধা,
সরল চোখে ঘুচাবি সেই অন্ধকারের বাধা;
সত্যপথের যাত্রী যে তুই সঙ্গে নিয়ে চল্
তোরি আলো আজকে আমার যাত্রার সম্বল।

সেই ভালো, আজ রজনীতে যাত্রা করি চল
যতক্ষণ না মিলায় কানে পথের কোলাহল ;
ধূলিধূসর ধরা-পথের ধূলিটুকুন দেখে
পথটি যেন সীমার তরে যেতে পারি রেখে।
ভাব্‌ছি মনে বাঁধন কাটার কথাটা কি মিছে
পথের রাজা হাস্‌ছে সেকি পথিক জনের পিছে।

বৃন্তচ্যুত

(উপন্যাস)

(শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী এম, এ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রাত তখন প্রায় একটা হইবে। চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ ; কোথাও জাগরণের সাড়াটি পর্য্যন্ত নাই। ধীরে ধীরে শশী এবং প্রসন্ন ষ্টেসনের জনহীন অন্ধকার প্ল্যাটফর্ম্মের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে যতদূর চাওয়া যায় কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার। কেবল দূরে দূরে রেলরাস্তার ধারে ধারে সিগ্‌নেলের লাল বাতিগুলো দানবের রক্ত চোখের মত সেই ভীষণ অন্ধকারের মধ্যেও ঘোলাটে হইয়া ভাসিয়া রহিয়াছে আর সুদূর মাঠের কোন্ এক প্রান্তে কৃষকদের ছোট গ্রামখানি মাঝে মাঝে সেই অন্ধকারের নীলাম্বরীর ঘোমটা সরাইয়া মেটে প্রদীপগুলির সদাজাগ্রত সেই পথহারাণ অন্ধকার মাঠের পানে ফেলিয়া নীরবে চাহিয়া রহিয়াছে—না জানি কোন্ পথহারা পথিকের করুণ প্রতীক্ষায়।

ধীরে ধীরে প্রসন্ন ডাকিল,—"শশী!"

অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে শশী উত্তর দিল,—"কি?"

"কি ভয়ানক অন্ধকার দেখ্‌ছিস্,—একটা লোক ও ত দেখছিনা যে গাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করি,—কি করা যায় বল্‌ত?"

শশী কোন উত্তর দিল না,—দূরের ধূম্রবর্ণ অন্ধকারের দিকে চাহিয়া নিষ্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রসন্ন আবার ডাকিল,—"শুন্‌ছিস্?"

অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে শশী উত্তর দিল, "কি?"

"বলি টিকিট্ কিন্‌তে হবে ত, না এইখানে হাঁ করে চেয়ে থাক্‌লেই হবে?"

নিজেকে সামলাইয়া লইয়া শশী বলিল,—"টিকিট কিন্‌তে হ'বে বৈকি, আর জানতে হবে ক'টার গাড়ী,—ঐ ত টিকিট ঘর দেখা যাচ্ছে, চ না খবরটা নিয়ে আসি।"

সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে টিকিট ঘরের ছোট্ট কাটা জানলাটি দিয়ে একটি ক্ষীণ আলো মিট্‌মিট্ করিয়া দেখা যাইতেছিল, তাহাই লক্ষ্য করিয়া শশী এবং প্রসন্ন ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। টিকিট-ঘরের জানালার নিকটে আসিয়া তারা দেখিল, ঘরের মধ্যে একটি শীর্ণদেহ বৃদ্ধ চেয়ারের পিঠের উপর মাথাটাকে কোন রকমে ঝুলাইয়া দিয়া এবং সাম্‌নের দেবদারুকাঠের ভাঙ্গা টেবিলটার উপর পা দুটোকে যথাসম্ভব তুলিয়া দিয়া বিবিধ নিশ্চিন্তভাবে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে।

প্রসন্ন বলিল,—"কোথাকার টিকিট কিনি বল্ দেখি?" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শশী বলিল, "আগে ক'টার গাড়ী তাই জান্‌ত, তার পর কোথায় যাবো না যাবো তার ঠিক হবে এখন।"

প্রসন্ন ডাকিল, "হাঁগা বাবু, গাড়ী ক'টার সময় আস্‌বে বলতে পার গা ?"

নাসিকাগর্জ্জন ছাড়া অন্য কোনরূপ উত্তর আসিল না। গলাটাকে যথাসম্ভব ঝাঁকালো করিয়া তুলিয়া প্রসন্ন আবার ডাকিল, "শুনছো গা বাবু—বলি ও মশাই—একবার দয়া ক'রে শুদ্ধুই না ছাই!"

লোকটা এবার ধড়মড় করিয়া লাফাইয়া উঠিল, এবং চোখ দুটোকে বারবার কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে বলিল, "কি চাই গা বাছা ?"

গলাটাকে এক নিমিষে কড়ি হইতে কোমলে নামাইয়া লইয়া প্রসন্ন বলিল, "বল্‌তে পারেন গাড়ী আসতে আর কত দেরী ?"

চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া পাশের টেবিলের উপর রক্ষিত একটা গলা-ভাঙ্গা কুঁজো হইতে হাতে করিয়া খানিকটা জল গড়াইয়া লইয়া এবং চোখ দুটো যথা-সম্ভব কচ্‌লাইয়া দুইয়া বৃদ্ধ বলিল, "তোমরা কোথায় যাবে শুনি ?"

বিরক্ত হইয়া প্রসন্ন বলিল, "সে খোঁজে তোমার দরকার কি বাবু, গাড়ী ক'টায় তাই বলে দাও না—ফুরিয়ে যাক্ !"

চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া একটা আঁদ্‌রেল গোছের হাই তুলিয়া বৃদ্ধ বলিল, "কোথায় যাবে না শুন্‌লে কি করে বুঝবো কোন্ গাড়ীর কথা তোমরা বলছ ?"

প্রসন্ন এবার মুস্কিলে পড়িয়া গেল,—শশীর দিকে চাহিয়া সে বলিল, "কোথায় যাবি তাই বল্ না।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শশী বলিল, "বল্ কাশী যাবো!"

প্রসন্ন বলিল, "আমরা কাশী যাবো গো বাবু!"

পরক্ষণেই কিন্তু হঠাৎ কি ভাবিয়া শশী বলিয়া উঠিল, "না না বল্ আমরা বৃন্দাবন যাবো।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি এতক্ষণ অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ছিল, এইবার একটু সোজা হইয়া বসিল এবং চশমার পুরু কাচের ভিতর দিয়া শশীর অবগুণ্ঠিত মুখের দিকে একবার চকিতের দৃষ্টি দিয়া বলিল, "তোমরা যে অবাক্ করলে বাছা!—কোথায় যাবে এখন পর্য্যন্ত তার কিছু ঠিক নেই অথচ ষ্টেশনে এসেছ টিকিট কিন্‌তে।"

প্রসন্ন কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না—চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃদ্ধ আবার বলিল, "এ ত ভাল কথা নয় বাছা, ওকে দেখে ত রীতিমত ভদ্রঘরের মেয়ে বলেই মনে হয়—অথচ সঙ্গে পুরুষ মানুষ দেখছি না—তার পর কোথায় যাবে তারও কিছু ঠিক করনি—ব্যাপারটা যে নেহাতই গোলমেলে ঠেক্‌ছে বাপু।"

হঠাৎ প্রসন্নর মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল—সে বলিল, "চন্দর ভট্টচার্য্যকে চেনেন আপনি ?"

একটু হাসিয়া বৃদ্ধ বলিল, "তা চিনি বৈ কি !"

সোৎসাহে প্রসন্ন বলিয়া উঠিল,—"তারই বাড়ীতে আমরা এতদিন ছিলুম গো বাবু; ওঁর শরীর খারাপ কিনা, তাই তিনি নিজে এসে গাড়ীতে চড়িয়ে দিয়ে যেতে পারলেন না—তা না হলে আর ভাব্‌নাটা কি বাবা!"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বৃদ্ধ বলিল, "তা হ'লে তোমরা বৃন্দাবন যাওয়াই ঠিক্ করলে ?"

প্রসন্ন বলিল, "হুঁ"!

"তা সে গাড়ী আসতে এখন অনেক দেরী—তোমরা ততক্ষণ আমার এই ঘরের এক কোণে ঐ মাদুরটা বিছিয়ে একটু বিশ্রাম কর,—আমি ততক্ষণে ঝপ্ করে একটা কাজ শেষ করে আসি।"

প্রসন্ন এবং শশীকে বসিতে বলিয়া বৃদ্ধ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং যাত্রিদের বসিবার টিনের ছাউনির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া একটা লোহার বেঞ্চের উপর গাঢ়নিদ্রাভিভূত আপাদমস্তক-মুড়ি-দেওয়া একটা লোককে সজোরে এক ঠেলা মারিয়া ডাকিল, "পরাণে!—বলি ও পরাণে, আ মোলো—রে! ব্যাটা একবারে ঘরে ঘুমোচ্ছে দেখ্‌ছি—ওরে ও

হতভাগা, জাপ্‌নারে !— বলি ও পরাণে শুন্‌ছিস্‌— এইবারে বাটা যাব্‌ খেয়ে মরবি বলছি—ওঠ্‌ ওঠ্‌ !"

বড়্‌ বড়্‌ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া লোকটা চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল, "তিনটে বেজে গেছে নাকি কত্তামশাই ?—গাড়ী আসবার আর দেরী কত ?"

"না না তিনটে বাজতে এখন অনেক দেরী আছে—একটা কাজ করতে হবে তোকে, বাঁ করে একবার গাঁয়ের দিকে চলে যেতে পারিস্‌ ?"

"তা পারবো না কেনে কত্তামশাই !"

"চন্দর ভট্টচায্যিকে চিনিস্‌ ত তুই ?"

"সেই গাগ্‌লা বামুন ত—তাকে আবার চিনি না !"

"তাঁকে গিয়ে আমার নাম করে বলবি—শিগ্‌গির যেন একবার ইষ্টিশানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন—বিশেষ দরকার আছে, বুঝ্‌লি—বলবি এখুনি আসতে—যা দৌড়ে যা !"

পরাণকে চন্দ্রভট্টাচার্য্যের নিকট পাঠাইয়া দিয়া বৃদ্ধ আবার নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কাটা-জানালার ধারে ভাঙ্গা চেয়ারখানা দখল করিয়া বসিল।

খোলা দরজার দিকে মুখ করিয়া শশী চুপ করিয়া বসিয়াছিল, বাহিরে যতদূর দেখা যায় কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার। শশীর মনে হইতেছিল তার সুমুখে বাকি জীবনের যে পথটা পড়িয়া রহিয়াছে তাহাও ঠিক এমনই একটা একটানা অন্ধকারের মধ্যে ঢাকা এবং ঠিক এমনই রহস্যময়। তার প্রাণটা হু হু করিয়া উঠিতে লাগিল।

প্রসন্ন ধীরে ধীরে অত্যন্ত অস্পষ্ট স্বরে ডাকিল, "শশী !" ক্ষীণকণ্ঠে শশী উত্তর দিল, "কি ?"

"তুই এত কি ভাবছিস্‌ বল্‌ দেখি ?"

"কৈ কিছুই না ত।" বলিয়া শশী চুপ করিল।

ইহার পর দুজনেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মাঝে কেবল একবার বৃদ্ধ টিকিটমাষ্টার কথা জমাইবার চেষ্টা করিল—"তোমাদের কোন কষ্ট হচ্ছে না-ত বাছা ?"

প্রসন্ন সংক্ষেপে উত্তর দিল, "না।"

সে আবার বলিল, "তোমাদের দেশ কোথায় গা বাছা ?"

প্রসন্ন এবার কোন উত্তর দিল না। সে এমনি ভাবটা দেখাইতে চেষ্টা করিল যেন বৃদ্ধের কথা সে শুনিতেই পায় নাই।

বৃদ্ধ এবার অন্য কথা পাড়িল,—বলিল, "তোমরা বুঝি তীর্থ করতে বেরিয়েছ ?"

প্রসন্ন কেবল বলিল, "হুঁ।"

ইহার পর বৃদ্ধ আরো অনেক কথা জমাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু উত্তরকারিণীর সংক্ষিপ্ত উত্তরে কোন কথাই ঠিক জমিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে হতাশ হইয়া বৃদ্ধ থামিয়া গেল।

শশী চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ; তার মনে হইতেছিল, সেই মৃত্যুর মত নিস্তব্ধ এবং অন্ধকার রজনীর গভীর নীরবতার বুকের মাঝখান দিয়া একটিমাত্র ক্ষীণ এবং করুণস্বর কাঁদিয়া কাঁদিয়া এলো-মেলো-মেঠো হাওয়ার সহিত মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসিতেছে;—সে কান্না ভারি ক্ষীণ, কিন্তু ভারি করুণ এবং বিষাদময়। কে যেন অনেক দূর হইতে কেবলই কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে—"মা ! মা !"—শশীর চোখে জল আসিল; সে সজল কণ্ঠে ডাকিল, "পেসন্নো !"

"কি বলছিস্‌ ?"

"না কিছু না,"—বলিয়া শশী আবার সেই অন্ধকার মাঠের পানে উদাসনয়নে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

প্রসন্ন আবার বলিল, "কি বলছিলি ?"

সে উত্তর দিল, "কিছু না, এমনি দেখ্‌ছিলুম তুই জেগে আছিস্‌ কি না।"

ঘরখানি আবার নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

শশী আবার সেই অন্ধকারের ভিতর নিজের মনটাকে হারাইয়া ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

হঠাৎ দরজার নিকট হইতে কে ডাকিল, "মাষ্টার মশাই!"

অন্যমনস্ক শশী হঠাৎ চমকিত মত সাড়া দিয়া উঠিল;—সে স্বর তার কানে মৃত্যুর আহ্বানের চেয়েও ভীষণ এবং কঠোর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

"ভিতরে আসুন রামুঠাকুর!" বলিয়া বৃদ্ধ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শশব্যস্তে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চন্দ্রকান্ত বলিল, "এত রাত্তিরে হঠাৎ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন যে বড়?—ব্যাপারখানা কি?"

শশীকে হাত দিয়া একটা ঠেলা মারিয়া প্রসন্ন আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল—তার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। শশী এবং প্রসন্নর দিকে আলোটাকে ফিরাইয়া ধরিয়া বৃদ্ধ বলিল, "এই দুটি স্ত্রীলোককে চেনেন কি আপনি?"

সে দিকে একবার মাত্র চাহিয়াই, চন্দ্রকান্ত কিছুক্ষণের জন্য কাঠের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, "চিনি।"

বৃদ্ধ আরো কত কি বলিতে যাইতেছিল, সে কথায় কান না দিয়া চন্দ্রকান্ত ডাকিল,—"প্রসন্ন!" তার গলার স্বর দৃঢ় এবং গম্ভীর।

আড়ষ্ট এবং কম্পিত কণ্ঠে প্রসন্ন উত্তর দিল, "কি!"

তোমার দিদিমণিকে জিজ্ঞাসা কর, আমাকে না বলে এ গ্রাম ত্যাগ করবার অধিকার তাঁকে কে দিয়েছে? তিনি কি ভুলে গেছেন, এ দুনিয়ায় একমাত্র আমিই কেবল তাঁর অভিভাবক! কাল যে চিঠি তিনি আমাকে লিখেছেন, তা দিয়ে তিনি কি নিজেই একথা প্রমাণ করেন নি যে, আজ থেকে ভুলোর মত উনিও আমারি উপর নিজের সমস্ত ভার এবং দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে হাঁফ ছাড়তে চান?—তুমি বলো ওঁকে, আমার আদেশ, এখুনি ওঁকে আমার সঙ্গে যেতে হবে—নিজের বাড়ীতে ফিরে নয়—আমার বাড়ীতে।"

চাপা কান্নার স্বরে ঘোমটার ভিতর হইতে শশী উত্তর দিল, "আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন আপনি,—আপনাকে অনেক কষ্ট দেয়েছি—আর কষ্ট দিতে—"

অত্যন্ত দৃঢ় এবং সংযতকণ্ঠে চন্দ্রকান্ত বলিয়া উঠিল, "বেশী বকবেন না আপনি, আপনার পক্ষে কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ সে ভার কাল থেকে আমার ঘাড়ে পড়েছে—সে ভাবনা আপনার নয়—আমার—বুঝলেন!" এবং অপর কাহাকেও কোন কথা বলিবার সুযোগমাত্র না দিয়াই সে অত্যন্ত গম্ভীর এবং দৃঢ়স্বরে বলিল, "এখন আসুন আমার সঙ্গে—দেরী করবেন না!"

ষ্টেশন ছাড়াইয়া তিনটি অস্পষ্ট মূর্ত্তি গ্রামের অন্ধকারপথে ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

বৃদ্ধ এবং পরাণে অবাক হইয়া সেই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—কাহারও মুখে একটি কথা নাই।

(সমাপ্ত)

পরীর বিয়ে।

(গল্প)

(শেষাংশ)

(কুমারী নীহারনলিনী দত্ত)

বৈকালে আপন আপন কর্ম্মস্থল হইতে ফিরিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া মনীন্দ্র, হরেন্দ্র ও উপেন্দ্র হরেন্দ্রের ঘরে নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেছিল। অন্যান্য সকলে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। নব-কিশোরও তখন বাসায় ছিল না, মনীন্দ্র বলিতেছিল, "আচ্ছা এই নবকিশোর আজ কাল কোথায় যায় বল দেখি। প্রথম ত বলেছিল এখানে ওর কোনও চেনা লোক নেই। কিন্তু এখন যায় কোথা?" হরেন্দ্র কহিল "ব্যতিক বড় ভাল বোধ হচ্ছে না মণিদা, লোকটা এনারকিষ্ট ত নয়?" মনীন্দ্র কহিল "ভগবান জানেন, হয় ত তা হ'বে, ভারত-উদ্ধারের চেষ্টায় ঘুরচে। তাহলে আমাদের বিপদে পড়তে হবে দেখচি?" এমন সময় সত্যেশ আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল, সে ছাত্র পড়াইতে গিয়াছিল, তাহার মুখ বিবর্ণ। উত্তেজনায় তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। মনীন্দ্র কহিল "ব্যাপার কি সত্যেশ, এত শীগ্‌গীর চলে এলে যে, ওকি অসুখ করেচে নাকি?" সত্যেশ কহিল "অসুখ করেনি, বলচি সব, নবকিশোর কোথা?" হরেন্দ্র বলিল "কি জানি কোথা গেছে। তার ভাব বড় ভাল বোধ হচ্ছে না আমাদের।" সত্যেশ তাহার কাঁধের চাদরখানা পার্শ্বস্থিত খাটে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল "তুমি ঠিক বলেছিলে মণিদা, ও লোক ভাল নয়। বিজন বাবুর কাছে আমার নামে লাগিয়ে নিজে তাঁর মেয়েকে বিয়ে কচ্চে। পরম আশীর্ব্বাদ!" অতিবিস্ময়ে তাহাদের প্রথমে কাহারও বাক্য স্ফুরণ হইল না। তার পর প্রায় সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল "বল কি কার কাছে শুনলে?" সত্যেশ কহিল "রাস্তায় প্রহ্লদের সঙ্গে দেখা হ'ল সেই ঘরে। পাছে নব কিশোরের সঙ্গে দেখা হয় এই ভয়ে সে এ বাসায় এল না।" মনীন্দ্র কহিল "কি বলেচে রাস্কেল?" সত্যেশ কহিল "আমি পাগল, রাত্রে উঠে যেই-যেই করে নাচি, তোমরা আমার বন্ধু তাই একথা প্রকাশ হ'তে দাওনি—এই সব।" মনীন্দ্র কহিল "হতভাগা অকৃতজ্ঞ। তুমি না থাকলে এত দিন এখান থেকে কবে ওকে যেতে হ'ত। আমি ত তোমাকে তখনই বলেছিলাম, অচেনা লোকের অত করা ভাল নয়, তোমার যে তখন পরোপকার করবার ইচ্ছেটা অদম্য হয়ে উঠ্‌ল।" হরেন্দ্র কহিল "আমিই সে দিন সত্যেশের বিয়ের কথা ওর কাছে বলেছিলাম, কেনই বা বলেছিলাম। তাই সত্যেশ আমার জন্যই এটা হল। সত্যেশ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল "তোমার দোষ কি হরেন। ও কথা কি লুকান থাকে? রোজ প্রহ্লদ আসত আমার কাছে, টের পেতাই, তবে আমার নামে এত বড় মিথ্যা বদনাম দিলে এতে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।" মনীন্দ্র কহিল "দাঁড়াও আমি আজও ওকে বাসা থেকে তাড়াচ্ছি। তার পর বিজন বাবুর কাছে গিয়ে ওর কথা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তা বলে আসচি। ওর চালাকী বের কচ্চি।" নিরাশভাবে সত্যেশ কহিল "বৃথা মণিদা, প্রহ্লদ বরে নবকিশোরের উপর ওঁর ধ্রুব বিশ্বাস হয়েচে। উনি কারো কথা শুনচেন না, প্রহ্লদ আর যা বোঝাতে কিছু বাকী রাখেন নি।" মনীন্দ্র কহিল "কিন্তু ওকে আমি বাসায় আর রাখছি না।" একটু

ভাবিয়া সত্যেশ কহিল "না মণিদা, তা কর না। ও যেকদিন থাকতে চায় থাক, এখন ওকে তাড়ালে বিজনবাবুর সাহায্যে ওর কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু লোকে ভাববে আমিই ওকে বিষেষ-বশে তাড়িয়েছি। লোকের ঘৃণা আমি সহ্য করতে পারব না, লোকচক্ষে আমাকে হেয় কর না মণি-দা। তুমি আমাকে ভালবাস, আমার মনের অবস্থা বুঝে ওকে ক'দিন থাকতে দাও।" মণীন্দ্র দেখিল সত্যেশ অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। তাহার স্বভাবের সৌম্যর্গে সে তাহাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিত। সে কহিল "তাই হবে সত্য। তোমার অনুরোধে ও পাষণ্ডকে রাখতে রাজী হলাম। কিন্তু আমি আমার সাধ্যমত বিয়েতে বাধা দিতে চেষ্টা করব, এতো তোমার কোন আপত্তি শুনব না। কি বল তোমরা।" হরেন্দ্র প্রভৃতি সকলেই কহিল "নিশ্চয়ই, আমাদেরও তাই মত। নবকিশোর বড়লোক ব'লে কি এমনি করে আমাদের বোকা বানাবে, তা কখন হবে না?" সত্যেশ কহিল "সে বড় লোক, ধনীর ঘরে তার যোগ্য পাত্রীর অভাব নেই, তবে দরিদ্রের এ সুখ-টুকু কেন সে হরণ কচ্ছে।" সত্যেশ চাদর লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মণীন্দ্র কহিল "এখন আবার কোথা যাচ্ছ।" সত্যেশ কহিল "পড়াতে।" মণীন্দ্র কহিল "আজ নাই বা গেলে।" "আজ যেতেই হবে, কাল তার হাপইয়ার্লি একজামিন হবে।" বলিয়া সত্যেশ বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যারপর নবকিশোর বাসায় আসিলে মণীন্দ্র কহিল "মশায় একি শুনচি, সত্যেশের বিয়ে ভাঙিয়ে আপনি নাকি তার কণেকে বিয়ে কচ্ছেন?" নবকিশোর সপ্রতিভভাবে উত্তর দিল "আপনারা সব শুনেছেন দেখচি। কিন্তু আমি ভাঙাইনি, বিজনবাবুর অনুরোধ এড়াতে না পেরে রাজী হয়েছি মাত্র। এতে আমার দোষ কি?" মণীন্দ্র কহিল "বিলক্ষণ, দোষ নেই আবার, বিদেশে সত্যেশই আপনাকে আশ্রয় দিয়েছে! বিজনবাবু যতই বলুন সত্যেশের নির্বাচিতা পাত্রীকে আপনার কখন ও বিবাহ করা উচিত নয়।" নব কিশোর একটু রাগতভাবেই কহিল "বাঃ মশায়, আপনি ত জুলুম করচেন দেখচি। বিজনবাবুরা সত্যেশকে কন্যা দিতে কখনই ইচ্ছা করেন নাই। করলে এত দিন মেয়ে আইবুড়ো রাখতেন না। বাপের এমতে বিয়ের ঠিক কি? আর আশ্রয় আশ্রয় কি কচ্ছেন? আমি কি ভিখারী না কি, যে আশ্রয় ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছিলাম। একটা বাঙ্গালী বাসা খুঁজছিলাম, সত্যেশবাবু তার সন্ধান দিয়েছেন, ব্যস্ এই মাত্র। এতে কৃতজ্ঞতা কোথায় তা ত বুঝচি না। বিজনবাবু সত্যেশকে কখনই মেয়ে দেবেন না। আমি বিবাহ না করি আর কেউ করবে।" মণীন্দ্রও রাগতস্বরে উত্তর দিল "কি করে আর দেবেন। আপনি ত সত্যেশকে পাগল বলে রটিয়ে বেড়াচ্ছেন, পাগলের হাতে কি কেউ মেয়ে দেয়।" নবকিশোর কহিল "সব মিথ্যা, আমি কখনও একথা বলিনি। প্রমথ আমাকে দেখতে পারে না। সেই এসব রটিয়ে বেড়াচ্ছে।" তখন হরেন্দ্র মণীন্দ্র সকলে মিলিয়া তাহাকে বিবাহ না করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিল। কিন্তু নবকিশোর আপনার কথার নড়চড় করিতে স্বীকৃত হইল না।

বারবার সকলের অনুরোধ শুনিয়া সে বিরক্ত হইয়া উঠিল ও কহিল "আমি বিবাহ করি বা না করি তাতে আপনাদের এত শিরঃপীড়া কেন? সত্যেশ কি আপনাদের ইষ্টদেব নাকি?" ইহার পর নবকিশোরের সহিত সকলে কয়েকদিন আর বাক্যালাপ করিল না। কিন্তু মানবচিত্ত মুগ্ধ করিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা নবকিশোরের ছিল। শীঘ্রই সে আবার সকলের সহিত মিটমাট করিয়া লইল। সত্যেশ কখনও তাহার সহিত বাহিরে খারাপ ব্যবহার করিত না। হরেন্দ্র প্রভৃতিও

তাহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ ব্যবহার করিত না। কিন্তু পুত্রের ন্যায় অবাধে তাহার সহিত আর কেহই মিশিত না।

একদিন মণীন্দ্র দেখিল, রাস্তায় দাঁড়াইয়া এক ব্যক্তি তাহাদের বাসার দিকে চাহিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া তাহার বাঙ্গালী বলিয়া বোধ হইল। মণীন্দ্র তাহাকে ওরূপভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে ব্যক্তি পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষায় উত্তর দিল "মশায় এখানে আমাদের মহারাজ এসেছেন কি না বলতে পারেন?" মণীন্দ্র কহিল "না বাবু আমরা গরীব লোক। আমাদের মধ্যে রাজা মহারাজা থাকা সম্ভব নয়।" অপরিচিত কহিল "আপনার এ হোটেলটার নাম?" মণীন্দ্র কহিল "এ হোটেল নয়, মেস, এর নাম হেভেন্।" অপরিচিত সোৎসাহে কহিল "হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিদিরাণী এই হাবুল মেসের বাড়ীই বলছিলেন। আমার কি ভুল হতে পারে মশায়, আমি এদের ওঁদের পুরান লোক। আমাদের মহারাজ নবকিশোর ঠাকুর।" মণীন্দ্র কহিল "ওঃ নবকিশোর! হাঁ সে ত এখানেই আছে। তাকে কি দরকার?" অপরিচিত কহিল "ওঁর স্বাস্থ্য কেমন আছে। দিদিরাণী ভারপরনাই ভাবছেন।" মণীন্দ্র কহিল "সে বেশ ভালই আছে, এই মাসে তার বিয়ে হচ্ছে।" অপরিচিত দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিল "এ বিয়ে কখন কথা।" বলিয়াই সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলায়ন করিল। বিস্মিত মণীন্দ্র তাহাকে কত ডাকিল, সে ফিরিয়াও চাহিল না। মণীন্দ্র হরেন্দ্রপ্রভৃতিকে ঘটনাটা জানাইল। তাহারা কহিল "নবকিশোর তাহলে সত্যই জমিদার, কিন্তু বিবাহ হবে শুনে লোকটা পালাল কেন বোঝা যাচ্ছে না।"

(২)

নবকিশোরের সহিত পরিমলের বিবাহ স্থির হইয়া গেল। দুইদিন পরে আশীর্ব্বাদ হইবে। মহামায়া একবার শেষ চেষ্টা করিবার জন্য স্বামীকে যাইয়া কহিলেন "তুমি যাই বল আমি ও বাঙ্গালের হাতে আমার সোণার পদ্ম পরিকে দেব না। ওদের দেশে গেলে মেয়ে আমার বাঁচবে না।" বিজনকুমার কহিলেন "ঐ ত তোমাদের মহাদোষ—যে বাঙ্গালের নাম শুনলে হিষ্টিরিয়া করে বসবে। কেন ওরা কি মানুষ নয়? ওরাই আসল কাজের মানুষ।" মহামায়া কহিলেন "যাগো, বাঙ্গালের সঙ্গে পরীর বিয়ে। মেয়ে আমার ওদের কথা শুনেই হাঁপিয়ে মরবে। ওগো এখনও ভেবে দেখ।" বিজনকুমার কহিলেন "আমি ভেবেচি তুমি নিজের কাজ করগে, কেন মিছে বকচ। সত্যেশ সত্যেশ করে যে ক্ষেপে উঠ্‌লে, তোমার সত্যেশের সঙ্গে নবকিশোরের যে তুলনাই হয় না। সত্যেশের সঙ্গে বিয়ে দিলে ওর কিছু ভাল মন্দ হলে মেয়ের দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না। তোমার বেটা-বৌয়ের কি রাধুনীর কাজ করে ওর জীবন কাটাতে হবে। আর নবকিশোরের, ঈশ্বর না করুন, সেরকম কিছু হ'লে ওরের কারণ নেই।" মহামায়া কহিলেন "ষাট্‌ষাট্ ওকি অলক্ষণে কথা! শুভ কার্য্যের কথায় অলক্ষণে কথা মুখে আনতে তোমার মুখে একটু বাধল না। যেখানেই বিয়ে হ'ক মেয়ের আমার সিঁথির সিন্দুর হাতের নোয়া বজায় থাকুক।" বিজন কুমার কহিলেন "ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবলেই তোমরা আঁৎকে উঠবে। আমার কি সাধ যে ওরকম হয়। সব ভেবে চিন্তে কাজ করতে হয়। পরী আমার সোণার মেয়ে, অমন মেয়েকে কি সত্যেশের হাতে দিয়ে চিরকাল বাসন মাজা রান্না করবার রাস্তা করে দেব? আমার নিজের ক্ষমতা নেই কিন্তু বড় ইচ্ছে যে পরীকে হীরে মুক্তা পরতে দেখি। সত্যেশের সঙ্গে বিয়ে দিলে হীরে জহরত দূরের কথা গায়ে হলুদের তত্ত্ব পর্য্যন্ত আসবে না।" মহামায়া কহিলেন "হীরা মুক্তার লোভে মেয়েকে অসুখী করবে। হীরে পরলেই

কি মনের সুখ হয়, পরী ছেলেবেলা থেকে শুনে আসচে সত্যেশের সঙ্গে ওর বিয়ে হবে, এ বিয়েতে কি ওই সুখী হবে?" বিজনকুমার ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "নভেল পড়ে পড়ে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে—দেখচি। পরী ছেলেমানুষ তার মতামত কি, সে এসব কি বোঝে? খবরদার তার মাথায় এসব ঢুকিও না বলচি। তাহলে বাড়ীতে যত নভেল আছে সব পুড়িয়ে ফেলব বলচি। আমি তার বাপ, তার যাতে ভাল হয় তাই করবো কারু কথা শুনব না।" মহামায়া কিছুতেই স্বামীর মতের পরিবর্ত্তন করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া কহিলেন "আমার আর মেয়ে নেই। পরীকে সেই তিন দিনের পথ দেশে পাঠিয়ে আমি কি করে থাকব।" বিজন কুমার কহিলেন "থাকতে না পার তুমিও মেয়ের সঙ্গে জামাই বাড়ী যেও।"

বৈকালে মহামায়া রন্ধন-গৃহের রোয়াকে বসিয়া ময়দা মাখিতেছিলেন ও বারবার উৎসুক দৃষ্টিতে দ্বারের দিকে চাহিতেছিলেন। সত্যেশ আর তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসে না। আজ তাহাকে আনিবার জন্য তিনি প্রসূনকে পাঠাইয়াছিলেন। তাই ব্যগ্রহৃদয়ে তাহাদের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে প্রসূনের সহিত সত্যেশ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। মহামায়া কহিলেন, "বাবা সতু, তুমি ত জান এতে আমার কোন হাত নেই, তবে এ দুঃখিনী মায়ের ওপর রাগ করে কেন বাবা?" সত্যেশ কহিল, "মা, মা হারিয়ে আপনার দুঃখ তা বুঝতে পারি নি, আপনার ওপর রাগ করলে আমার আর কে রইল।" মহামায়া কহিলেন, "আমি তোমাকে আপনার করতে পারলুম কৈ বাবা।" মৃতা সখীর নিকট প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারিলেন না ভাবিয়া তাঁহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। সত্যেশ তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিয়া কহিল, "মা কাঁদছেন কেন,—আমি আপনার সেই সত্যেশই আছি মা।" মহামায়া কহিলেন, "তা জানি বাবা, তুমি মানুষ নও দেবতা। মেয়ের কপাল মন্দ তাই এমন দেবতার পায়ে স্থান পেলে না। কিন্তু আমি তোমার মায়ের কাছে সত্যবদ্ধ। স্বর্গ থেকে সে কি মনে করচে?" সত্যেশ কহিল, "মা দেখছেন এতে আপনার কোন দোষ নেই। আপনি ছাড়া আমারও আর কেউ নেই মা। এ কটা দিন আমি আপনার কাছে আসতে পারব না। গোলমাল চুকে গেলে যেমন আসতুম তেমনি আসব। আপনি আমার অবস্থা বুঝে ক্ষমা করুন মা" মহামায়া কহিলেন, "তাই এস বাবা। আশীর্ব্বাদ করি মনে শান্তি পাও। আমাদের দ্বারা তোমার যে অনিষ্ট হয়ে গেল, নারায়ণ যেন তা পূর্ণ মাত্রায় পূরণ করেন। বস বাবা খানকতক লুচি ভেজেছি প্রসূন তুইও দুখানা খেয়ে যা।" সত্যেশ কহিল, "এখন খাবার কেন মা? আমাকে পড়াতে যেতে হবে।" মহামায়া কহিলেন, "আজ তোমাকে কিছু না খাইয়ে ছাড়তে পারব না সতু। কতদিন দেখতে পাব না, একটু বস, দেরী হবে না এই বেগুন কখানা ভেজে দিচ্চি।" প্রসূন কহিল, "বসনা হে, আমিও যাব তোমার সঙ্গে।" মহামায়া লুচি ও বেগুন ভাজিয়া সত্যেশ ও প্রসূনকে খাইতে দিলেন। আহার শেষ হইলে মুখ ধুইয়া প্রসূন ডাকিল, "পরী দুটো পান দিয়ে যা।" মহামায়া কহিলেন "আমি দিচ্ছি।"

তাহারা চলিয়া গেলে মহামায়া সেইখানে বসিয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। সত্যেশ যে ইহাতে কত বড় আঘাত পাইয়াছে সে কথা ভাবিয়া তাঁহার মাতৃহৃদয় সত্যেশের দুঃখে বিদীর্ণ হইতেছিল। পরী আসিয়া কহিল, "মা সন্ধ্যে হল, আলো জ্বালি?" মহামায়া কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "জ্বালগে।" মাতার এই নিশ্বাসের সহিত যে কতখানি বেদনা জড়িত ছিল পরী তাহা বুঝিল। বুঝিয়া বিষণ্ণমুখে চলিয়া যাইতেছিল এমন সময় বাহিরের দ্বারের কড়া নাড়িয়া বিজনকুমার ডাকিলেন "পরী মা, দোর খোল।" পরিমল ফিরিয়া পিতাকে

দ্বার খুলিয়া দিল। বিজনকুমার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "অমন করে বসে আছ যে? তোমার জন্যে দেখচি মেয়ের মঙ্গল হবে না। শুভ কার্য্যে মায়ের এত দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লে কি সন্তানের মঙ্গল হয়। পরের ছেলে সন্তোষের পানে দেখছ, আর নিজের মেয়ের পানে দেখছ না। এমন মাও কোথাও দেখিনি!"

পরদিন সকালবেলা মহামায়া তরকারী কুটিতে ছিলেন। পরিমল মাতার নিকট বসিয়া একটি চুপড়ীতে রঙ্গড়াইয়া রঙ্গড়াইয়া নূতন আলুর খোসা ছাড়াইতেছিল। এমন সময় প্রফুল্ল আসিয়া কহিল, "মা তোমার চাবিটা দাও ত," বলিয়াই তাহার পত্নীর দিকে নজর পড়িল। ভগিনীর দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল সে ভয়ানক রোগা হইয়া গিয়াছে। সে ভাবিল, কি আশ্চর্য্য পত্নীটা এত শুকিয়ে গেছে এতদিন আমার নজরে পড়ে নি। প্রফুল্ল কহিল, "পত্নী তুই এত কাহিল হয়েছিস্ কেন?" পত্নী আশ্চর্য্য হইয়া আপনার শরীরের প্রতি চাহিয়া কহিল, "কোথা রোগা হয়েচি দাদা।" প্রফুল্ল কহিল, "ভয়ানক শুকিয়ে গেছিস্। নিজে রোগা হ'লে নিজে বুঝি টের পাওয়া যায়। তোর চেহারা বড় খারাপ হয়ে গেছে যে। মা, পত্নী বাজালের সঙ্গে বিয়ের ভয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে, ওদের দেশে গেলে ও মারা যাবে।" পরিমল দাদার কথায় লজ্জিতা হইয়া পলাইয়া গেল। মা নীরবে বসিয়া রহিলেন। মাতার নিকট উত্তর না পাইয়া প্রফুল্ল পিতার সন্ধানে উপরে গেল। বিজনকুমার স্কুলের ছাত্রদের এক রাশ পরীক্ষার খাতা দেখিতেছিলেন। প্রফুল্ল বড়ের মতন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কহিল, "পত্নীকে কিছুতেই নবকিশোরের হাতে দেওয়া হবে না। ওদের দেশে গেলে ও মারা যাবে। সন্তোষকে না পছন্দ হয় অন্য পাত্রে দিন।" বিজনকুমার খাতা হইতে দৃষ্টি না উঠাইয়াই বিরক্তিভরে উত্তর দিলেন, "আঃ তোমাদের যা বেটার কি আর কোন কাজ নেই? আমার মেয়ে আমি যা ভাল বুঝব করব। যাও নিজেদের কাজ কর গে।"

পরদিন পরিমলের আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল। মহামায়া কন্যার অমঙ্গল আশঙ্কায় জোর করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া আয়োজন করিতে লাগিলেন, ও বার বার তুলসী তলায় মাথা খুঁড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "হে ঠাকুর পত্নীর আমার মঙ্গল কর। আমার মনব্যথায় পত্নীর যেন অমঙ্গল না হয়।" নবকিশোর আপনার বহুমূল্য অঙ্গুরীর দ্বারা পত্নীকে আশীর্ব্বাদ করিল। বিজনকুমারের একজন প্রতিবেশী আশীর্ব্বাদের সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি নবকিশোরের বিদ্যা ও ধনের পরিচয় পাইয়া ও তাহার সুন্দর আকৃতি দেখিয়া বিজনকুমারের চাষাড়া নির্ব্বাচনের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। হরেন্দ্র ও নবীন অনুরোধে পড়িয়া নবকিশোরের সহিত আসিয়াছিল। আশীর্ব্বাদের সময় প্রফুল্ল কোন মতেই আপনার ঘরের বাহির হইল না। পত্নী ভিতরে আসিতেই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "দেখি বাজালটা কি দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে।" পরিমল অঙ্গুরীয়কটী দাদার হস্তে দিয়া ধীরপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল। প্রফুল্ল তাহা লইয়াই সজোরে উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। বহুমূল্য অঙ্গুরী ধূলায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। মহামায়া তাড়াতাড়ি তাহা তুলিয়া লইয়া ভীত স্বরে কহিলেন, "কি গোঁয়ার ছেলেরে তুই। আশীর্ব্বাদী সোণা কি মাটীতে ফেলতে আছে? উনি টের পেলে কুরুক্ষেত্র করতেন।"

(৮)

১০ই অগ্রহায়ণ পরিমলের সহিত নবকিশোরের বিবাহ হইবে। দেখিতে দেখিতে ১০ই অগ্রহায়ণ আসিয়া পড়িল। রাত্রি দুইটার পর বিবাহের লগ্ন। রাত্রি আটটার পর বরযাত্রী সব লইয়া বাহির হইল। মেসের যুবকরাই বরযাত্রী হইয়াছিল। সন্তোষ তাহাদের বুঝাইয়া রাজী করিয়াছিল। কেবল

সন্তোষ ও মণীন্দ্র বাসায় রহিল। তাহাকে স্বতঃপক্ষ নিমন্ত্রণ করিতে সাহস করে নাই।

আর বরপক্ষ বলিতে স্বয়ং বর, তাহারও এমন সাহস হয় নাই যে তাহাকে বরযাত্রী হইতে বলে। মণীন্দ্র সন্তোষকে অতিশয় ভালবাসিত। সে তাহার মর্ম্মপীড়া অনুভব করিয়া কিছুতেই তাহাকে একলা রাখিয়া গেল না। অন্ধকার ঘরে বসিয়া সন্তোষ আপন অদৃষ্টচিন্তা করিতেছিল। সে ভাবিতেছিল হায় কি করিল তাহার প্রাণ! কৈশোরে মাকে হারাইয়া যে পিতার স্নেহে মায়ের অভাব ভুলিয়াছিল, সে স্নেহময় পিতাও যৌবনের প্রারম্ভে ইহলোক ত্যাগ করিলেন! আবার যাহাকে আপনার করিয়া সুখী হইবার আশা করিয়াছিল সে আজ অন্যের হইবে। জীবনের সুখের আশাদীপটি আজ চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইল। হায়! সরী! তুমি অন্যের হইলেই কি আমি ভুলিতে পারিব। তোমার ও মূর্ত্তি যে আমার হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। তাহাই সম্বল করিয়া আমি জীবন কাটাইব। কতক্ষণ চিন্তামগ্ন ছিল তাহা সে জানিত না। মেসের পাচক আসিয়া তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন করিয়া দিল, "সত্যবাবু খানে আইয়ে।" সন্তোষ কহিল, "আজ আমারা ভুখ্ নেই হ্যায়। হাম নেই খায়গা।" পাচক বহুকালের লোক। সন্তোষের ব্যথার কারণ সে সব জানিত। সন্তোষের উদারচরিত্রের জন্য তাহাকে সে স্নেহ করিত, পাচক স্নেহপূর্ণকণ্ঠে কহিল, "যো কুছ বনে খা লেইয়ে। মণীবাবু বৈঠা হ্যায়।" নিঃসম্পর্কীয় পাচকের এ স্নেহঅনুরোধ সন্তোষ এড়াইতে পারিল না। সে কহিল, "আচ্ছা চল।" পাচক চলিয়া গেল। মণীন্দ্র আসিয়া কহিল, "সন্তোষ যাবে চল।" সন্তোষ কহিল, "যাচ্ছি মণিদা, তুমি কেন গেলে না ওদের সঙ্গে?" মণীন্দ্র হাসিয়া কহিল, "বল কি সন্তোষ! আমি যাব ঐ বেইমানের বরযাত্রী হয়ে লুচি খেতে। অত লোভ আমার নেই। চল তুমি খেতে।"

সন্তোষ ও মণীন্দ্র আহারে বসিতে যাইতেছে এমন সময় বাহিরে গাড়ী থামার শব্দ হইল। ভৃত্য আসিয়া কহিল, "বাবুজি হুঠো গাড়ীমে কই মাজী লোগ আঁয়েছে।" মণীন্দ্র ও সন্তোষ সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল "জেনানা সোয়ারী!" ভৃত্য কহিল, "হাঁ বাবু, জেনানা সোয়ারী!" মণীন্দ্র ও সন্তোষের আর আহারে বসা হইল না। তাহারা উভয়েই এক সঙ্গে বাহির হইয়া ব্যাপার কি জানিতে গেল। তাহারা যাইবামাত্র সম্মুখের গাড়ী হইতে এক ব্যক্তি নামিয়া আসিল ও বলিল, "নবকিশোরবাবুকে ডাকিয়া দাও।" মণীন্দ্র দেখিল, এ সেই লোক, যে কিছু দিন আগে নবকিশোরের খোঁজ লইতেছিল। তার পর প্রশ্নকারীর দিকে চাহিয়া কহিল, "নবকিশোর বাসায় নেই। আজ তার বিবাহ, তিনি বিবাহ করতে গেছেন।" এই বলিয়া সন্তোষ ও মণীন্দ্র চোখ ফিরাইয়া দেখিল, দুইখানা ঠিকাগাড়ী বিছানা পত্র বোঝাই হইয়া রাজপথে দাঁড়াইয়া আছে। পশ্চাতের গাড়ীতে স্ত্রীলোক যাত্রী আছে বলিয়া বোধ হইল। গাড়ীর দোরজানালা বন্ধ ছিল। গাড়ীর পশ্চাতে ও উপরে চালকের পার্শ্বে দুইজন হিন্দুস্থানী দারবান বসিয়াছিল। অপর গাড়ীতে দুইজন বাঙ্গালী ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন নামিয়া আসিয়া মণীন্দ্রের সহিত কথা কহিতেছিল। মণীন্দ্রের কথা শুনিয়া সে ব্যক্তি চীৎকার করিয়া কহিল, "দেওয়ানবাবু নেমে আসুন। সর্ব্বনাশ হতে বসেছে।" গাড়ী হইতে অপর ব্যক্তি নামিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়াই সন্তোষের ধারণা হইল। তিনি মণীন্দ্রকে নমস্কার করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন "কোথায় বিয়ে হচ্ছে। কখন লগ্ন?"

মণীন্দ্র কহিল "মুঠিগঞ্জের বিজনবাবুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে। রাত্রি দুইটায় লগ্ন, কেন মশায় ব্যাপারটা কি?" তিনি উত্তর দিলেন "আমি কনকপুরের মৃত জমিদারের দেওয়ান। আমার নাম অভয়চরণ দে।

নবকিশোরের আমার মৃত প্রভুর জামাতা। তাঁহার একমাত্র কন্যাই তাঁহার বিস্তৃত জমীদারীর উত্তরাধিকারিণী। কিছুদিন পূর্ব্বে রাণীমার সঙ্গে সামান্য মনোমালিন্য হওয়াতে জামাইবাবু কাউকে না বলে চলে আসেন। কোন খবর দিতেন না। কেবল টাকার দরকার হলে খাজাঞ্চিকে লিখতেন। এলাহাবাদের ঠিকানায় যখন টাকা পাঠাতে লিখলেন তখন আমরা বুঝলাম তিনি এলাহাবাদে আছেন। আমি তাঁকে বাড়ী ফেরবার জন্য অনেক বুঝিয়ে চিঠি লিখি, কিন্তু তিনি সে চিঠির উত্তরও দিলেন না, বাড়ীও গেলেন না। শেষে রাণীমা তাঁর বিশ্বাসী পুরাণ লোক হরিহরকে এখানে পাঠান। হরিহর গিয়ে যে খবর দিলে তাতে রাণীমা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। আমরা আর কালবিলম্ব না করে জামাই বাবুকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছি।" মনীন্দ্র ও সন্তোষ রুদ্ধশ্বাসে অভয়চরণের কথা শুনিতেছিল। মনীন্দ্র কহিল "তা হ'লে নবকিশোর বিবাহিত!" অভয়চরণ উত্তর দিলেন, "হাঁ, গাড়ীতে আমার মৃত প্রভুপত্নী রাণীমা, আর নবকিশোরের পত্নী রাণীদিদি রয়েছেন। মশায় অনুগ্রহ করে একটা লোক সঙ্গে দিন। এখনও বিয়ে বন্ধ করা যেতে পারে।" মহিলাদের গাড়ী হইতে ঝি ডাকিল "দেওয়ানবাবু শুনে যান। রাণীমা ডাকচেন।" অভয়বাবু কন্যার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "রাণীমা বলছেন যে আপনারা কেউ অনুগ্রহ করে যদি আমাদের সঙ্গে আসেন তাহলে বড় ভাল হয়।" মনীন্দ্র কহিল "চলুন।" বলিয়া অভয়বাবুর সহিত গাড়ীতে উঠিল। আর সন্তোষ চাকরবাবুদিগকে বিদায় দিয়া আসন পর্য্যন্ত আসিয়া জল ঢালিয়া অন্তর্হীন চিন্তার ক্রোড়ে আপনাকে ছাড়িয়া দিল। সে রাত্রে আর তাহার আহার হইল না। মনীন্দ্র পথে অভয়বাবুকে নবকিশোর সংক্রান্ত সকল কথা জানাইল।

অধিক রাত্রে বিবাহের লগ্ন পড়ায় বিজনকুমার নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের প্রথমে আহার করাইয়া দিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। চন্দ্রাতপাচ্ছাদিত বিস্তৃত সভাস্থলে উচ্চ আসনে বরবেশে নবকিশোর বসিয়াছিল। তাহার মনোহর আকৃতিতে আকৃষ্ট হইয়া সকলেই তাহার প্রশংসা করিতেছিল। প্রসূন আজিকার দিনে আর নিরপেক্ষভাবে থাকিতে পারে নাই। সে ব্যস্তভাবে চারিদিকে তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইতেছিল। এমন সময় বাড়ীর সম্মুখে দুইখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। বিবাহবাড়ী! হয় ত কোন কুটুম্ব আসিল ভাবিয়া কয়েকজন সেই দিকে অগ্রসর হইল; কিন্তু সকলকে বিস্মিত করিয়া মণীন্দ্র অভয়বাবুর সহিত গাড়ী হইতে নামিয়া সভার দিকে অগ্রসর হইল। প্রসূন কহিল "একি মণিদা, তুমি গাড়ী করে এলে যে? সঙ্গে উনি কে?" মণীন্দ্র কহিল "টের পাবে এখুনি।" অভয়বাবু নবকিশোরের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া কহিলেন "জামাইবাবু ও রাণীমা, রাণীদিদি আপনাকে নেবে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এসেছেন। রাস্তায় গাড়ীতে তাঁরা বসে রয়েছেন, উঠুন।" নবকিশোর অভয়চরণকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল, কোনও উত্তর দিতে পারিল না। "জামাইবাবু! সেকি কথা!" সভাস্থ সকলে প্রায় এককণ্ঠে এই একই প্রশ্ন করিল। বিজনকুমার আশ্চর্য্যভাবে কহিলেন "ব্যাপার কি মশায়, আপনি এঁর কে?" অভয়চরণ উত্তর দিলেন "আমি এঁদের দেওয়ান। ইনি আমার মৃত প্রভু কনকপুরের জমিদারের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেছেন। কিছুদিন আগে রাণীমার সঙ্গে ঝগড়া করে আমাদের অজ্ঞাতসারে চলে আসেন। আমরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারি উনি এখানে আছেন। আমরা ওঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব বলে এসেছি। উঠুন জামাইবাবু, আমাদের আজরাত্রেই পাল্কীবেহারা করতে হবে।" নবকিশোরের মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে কোনও উত্তর দিল না, উঠিলও না। "নবকিশোর বিবাহিত, তার স্ত্রী আছে। হায় আমার সর্ব্বনাশ

হ'ল।" বলিয়া বিজনকুমার সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। অন্তঃপুরে এ সংবাদ পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না, মহামায়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ধরেন্দ্র প্রভৃতি সকলে নবকিশোরকে ঘিরিয়া কহিল "একি নবকিশোরবাবু, প্রতারণা করে এক-জনের সর্ব্বনাশ করবার কি দরকার ছিল।" নব কিশোর হতাশভাবে একবার চারিদিকে চাহিয়া অতিকষ্টে কহিল "একে আমি জানি না, এর সব কথা মিথ্যা। এ সব সত্যেনের ষড়যন্ত্র।" নবকিশোরের কথা শুনিয়া দেওয়ান নীরবে সভা হইতে বাহির হইয়া গেলেন ও প্রভু পত্নীর গাড়ীর নিকট যাইয়া কহিলেন "মা জামাইবাবু আমাদের সম্বন্ধ স্বীকার করতে চাচ্ছেন না। এ বিদেশ আমি কি করব মা। আপনি লজ্জা ত্যাগ করে খোকাকে নিয়ে ওঁর কাছে চলুন মা।" গাড়ীর দ্বার খুলিয়া গেল। একদীর্ঘাঙ্গী স্থূলকায়া প্রাচীনা নামিয়া আসিলেন। তাঁহার পশ্চাতে একটী তিন বছরের শিশুকে কোলে লইয়া একজন দাসী নামিল। গাড়ীর পশ্চাৎভাগে উপবিষ্ট দারবান বৃহৎ বংশদণ্ড হস্তে যেন বিবাদের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াই তাহার কর্ত্রীর সহিত চলিল। অপর দারবান গাড়ীর উপর হইতে নামিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কনকপুরের জমিদার-পত্নী নবকিশোরের দিকে অগ্রসর হইলেন। সকলে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। নবকিশোরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তীব্রদৃষ্টিতে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া জমিদার-পত্নী গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন "কিশোর! আমায় চিনতে পারচ?" নবকিশোর নিরুত্তর। তিনি পশ্চাতে চাহিয়া দাসীকে ইঙ্গিত করিলেন। দাসী অগ্রসর হইয়া পুত্রটিকে নবকিশোরের নিকট ছাড়িয়া দিল। ছাড়া পাইবামাত্র শিশু নবকিশোরের ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ডাকিল "বাবা! বাবা!" তুমি আজ মালা পরেচ কেন? এফুল আমি নেব।" বলিয়া নবকিশোরের গলার পুষ্পমালা টানিতে লাগিল, শিশুর আকৃতির সহিত নব-কিশোরের আকৃতির এত সাদৃশ্য ছিল যে কাহারও মনে নবকিশোরের তাহার পিতৃত্বসম্বন্ধে আর সন্দেহ রহিল না। বিজনকুমার জমিদার-গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "নবকিশোর আপনার জামাই, ও নিজে জমিদার নয়?"

জমিদার-পত্নী পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষায় যে উত্তর দিলেন তাহার মর্ম্ম এই, যে নবকিশোর তাঁহার স্বামীর জনৈক কর্ম্মচারীর পুত্র, বাল্যকালে পিতামাতার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার স্বামী তাহাকে মানুষ করেন লেখাপড়া শিখান। তিন চারিটা পাশ করান, উহার সুন্দর চেহারা ও বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাহাকে আপনার একমাত্র কন্যা দান করিয়া গৃহ-জামাতা রাখেন। তাহার পর তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পরই সে তাঁহাদের ও বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব করিতে চাহিল বলিয়া তাঁহার সহিত তাহার কলহ হয়। তাঁহার কন্যাকে গালাগালি দেওয়ায় তিনি একদিন সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে তিরস্কার করেন, তাহাতেই সে পলাইয়া আইসে।' জমিদার-পত্নী নবকিশোরের দিকে চাহিয়া ক্রোধভরে কহিলেন "ওরে নেমকহারাম; আমার অন্নে শরীরের পোষ্টাই করে আজ আমাকে চিনতে পারছিস না, অকৃতজ্ঞ, আমার স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতার মূল্য তুই আজ আমাকে ভাল করেই দিলি, ওঠ এখন ভালয় ভালয় আমার সঙ্গে গাড়ীতে উঠ। তোর বিয়ের সাধ ভালকরেই ঘোচাচ্ছি।" দাসী সঙ্গে সঙ্গে কহিল "ওঠ না জামাইবাবু। ছেলের মুখ দেখেও কি প্রাণে মায়া হচ্ছে না। ধন্যি কঠিন প্রাণ তোমার বাছা।" জমিদারপত্নী নবকিশোরকে তখনও বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কহিলেন "ওরে হতভাগা এখনও বসে আছিস। বিয়ের লোভ ছাড়তে পারছিস্ না। দাঁড়া তুই সহজে উঠবি না, ছট্টু সিং।" ছট্টু সিং অগ্রসর হইয়া সেলাম ঠুকিয়া কহিল "হুকুম মহারাণী!" ছট্টু সিংয়ের নাম শুনিয়া নবকিশোর

কম্পিতপদে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার শিশু পুত্র রাস্তারই দিকে চাহিয়া কহিল "দিদি, বাবাকে যেতে দিস না। বাবা যাচ্ছে। আর দুষ্টুমী করবে না।" নবকিশোর পুত্রকে কোলে লইয়া নীরবে যন্ত্রের অনুসরণ করিল, জমিদারপত্নী অগ্রে তাহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া পরে আপনি উঠিলেন। কোচম্যান গাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া গাড়োয়ান্‌কে কহিলেন "জোর সে চালাও বাবা। গাড়ীবদল করতে হবে।" বলিয়া তিনি সম্মুখের গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। ছুট্ সিং তাহার কর্ত্রীর গাড়ীর পশ্চাতে ও তাহার সহযোগী পুনরায় উপরে উঠিয়া বসিল। গমনশীল গাড়ীর ভিতর হইতে রমণীকণ্ঠের তিরস্কারধ্বনি শ্রুত হইতেছিল "ঘুষে আগুন, বিয়ে করতে এসেছিলেন। আমার মেয়ে কাল, আর উনি সাহেব। ওরে মেরুকাবাম, বাড়ী চল তোর তেজ বের করচি।"

(৯)

সন্তোষ আপন শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতেছিল। তাহার চক্ষে নিদ্রা আসিতেছিল না। নবকিশোরের প্রতারণা ধরা পড়ায় তাহার কিরূপ লাঞ্ছনা হইতেছে তাহাই সে ভাবিতেছিল। আর পত্নীর কথা ভাবিয়া তাহার হৃদয় ভাসিয়া যাইতেছিল। বেতারী কিনা শেষে সন্তোষ পড়িল। এই তাহার অদৃষ্টে ছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বাহিরের দ্বারে পুনঃ পুনঃ আঘাত পড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে কে ডাকিল "সন্তোষ দ্বার খোল।" একি এ যে মণীন্দ্রের কণ্ঠস্বর। তাহারা পৌঁছাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সন্তোষ উঠিয়া নীচে যাইয়া দ্বার খুলিয়া দিল। দ্বার খুলিবামাত্র মণীন্দ্র, হরেন্দ্র, উপেন্দ্র ও তাহাদের পশ্চাতে অপরাধীর ন্যায় শঙ্কিতপদে প্রবেশ করিলেন বিজনকুমার! সন্তোষ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল "একি মণিদা?" মণীন্দ্র তাহার পৃষ্ঠে সজোরে মুষ্টাঘাত করিয়া কহিল "তোমার বিয়ে, নবকিশোরের হাতে মুক্তো বাঁধাই সার।" বিস্মিত সন্তোষ কহিল "সে কি। আমার বিয়ে কি রকম?" মণীন্দ্র কহিল "নবকিশোরের শাশুড়ী তাকে ধরে নিয়ে গেছেন। আর না গেলেও জেনে শুনে কে সতীনে মেয়ে দেয় বল। নাও এখন—" সন্তোষ মুহূর্ত্তে গম্ভীর হইয়া থাকিয়া কহিল "আমি দরিদ্র, আমার পরিবার প্রতিপালনের ক্ষমতা কোথায়? মণিদা আমি বিয়ে করব না। তোমরা অন্যপাত্র দেখগে। বিজনকুমার কম্পিতহৃদয়ে তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। তিনি এইবার অগ্রসর হইয়া দুই হাতে সন্তোষের হাত জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন "সন্তোষ, বাবা আমায় ক্ষমা কর। তোমাকে মনকষ্ট দিয়ে যে পাপ করেছিলাম তার প্রায়শ্চিত্ত আজ আমার হয়ে গেছে। এখন তুমি দয়া না করলে আমার সর্ব্বনাশ হয়। বাবা সন্তোষ, আমার ওপর দয়া না হয়, তোমার মার কথা ভাব, আমার পত্নীর কথা ভাব। তাকে তুমি ছেলেবেলা থেকে স্নেহ কর। সে নির্দ্দোষী বালিকা। আজ তার বিয়ে না হলে সর্ব্বনাশ হবে।" সন্তোষ পত্নীর নাম শুনিয়া বিচলিত হইল। সত্যই ত তাহার দোষ কি! আহা নিরপরাধা বালিকা! অবশেষে পত্নীর প্রতি প্রেম সন্তোষের হৃদয়ের অভিমানকে দূর করিয়া দিল। সে বিজনকুমারের দিকে চাহিয়া ধীরকণ্ঠে কহিল "চলুন।" বিজনকুমার তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন "আজ যেমন তুমি আমায় রক্ষা করলে ঈশ্বর চিরকাল তোমায় এমনি রক্ষা করবেন বাবা।" মণীন্দ্র কহিল "এখন সবে ১২টা। আপনি বাড়ী যান, ও দিকে সব দেখুনগে। আমরা সন্তোষকে সাজিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।"

বিজনকুমার চলিয়া গেলেন। তখন সকলে মিলিয়া মহানন্দে সন্তোষকে সাজাইতে আরম্ভ করিল। যার যা ভাল পরিচ্ছদ ছিল সকলই [redacted] সন্তোষের অঙ্গে উঠিল। তাহার আপত্তি কেহ শুনিল না, আবার বিজনকুমারের গৃহে বাদ্যকরেরা সজোরে বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল। অন্তঃপুর রমণীদের উলুধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া গেল। প্রফুল্ল

মহানন্দে সন্তোষকে গাড়ী হইতে নামাইল। মহামায়া সন্তোষকে জামাতারূপে পাইয়া আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন। আত্মীয়বর্গের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে পরিষদ সন্তোষের গলায় মালা দিল, এত বড় যে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল সেজন্য কেহ বিন্দুমাত্র দুঃখিত হইল না, কেবল বিজনকুমারের মন হইতে তখনও ধনবান জামাতা না পাওয়ার ক্ষোভ সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই। কিন্তু সকলেই তখন আনন্দে মগ্ন। তাঁহার বিষণ্ণতা কেহ লক্ষ্য করিল না। সন্তোষের বন্ধুরা বিবাহ-শেষে খুব পেট ভরিয়া ভোজন করিয়া সোরগোলে রাজপথ মুখরিত করিয়া বাসায় ফিরিল, মণীন্দ্র কহিল "নবকিশোর খুব জব্দ, হয়েচে বাহক।" উপেন্দ্র কহিল "জব্দ বলে জব্দ ঐ মধুরভাষিনী মাতাপুত্রীর হস্তে ওর কি নিগ্রহ কম হবে নাকি?" হরেন্দ্র কহিল "সেই সন্তোষের সঙ্গেই বিয়ে হল, কিন্তু সন্তোষ বেচারা এর জন্যে কি মনঃকষ্টই না পেলে। একদিন ত ও আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছিল।" উপেন্দ্র কহিল "একেই বলে প্রজাপতির কৌতুক।" মণীন্দ্র কহিল "যাহ'ক, শেষটা রক্ষা হয়েচে এই লাভ। সন্তোষ বেচারা এখন ঘুমিয়ে বাঁচবে।" নবীন কহিল "ওকথা বলা মণিদা। নিদ্রাদেবী সন্তোষকে এখন কিছু কালের জন্য নিষ্কৃতি দিচ্ছেন।" সকলে হাসিয়া উঠিল। রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। বাসরঘর হইতে পত্নীর মাদকতুল্য ভগিনী নীলার কণ্ঠনিঃসৃত অমরকবি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত সঙ্গীতধ্বনি শ্রুত হইতেছিল।

ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি
পরমোৎসব রাতি।
রেখেছে কনক মন্দিরে
কমলাসন পাতি।
তুমি এস হৃদে এস এস
হৃদিবল্লভ হৃদয়েশ।
মম অন্তরেতে কর বরিষণ
করুণ-হাস্য ভাতি।

ইত্যাদি।

মহামায়া বাসর-ঘরের দ্বারের বাহির হইতে কহিলেন "নীলা, সন্তুকে একটু ঘুমতে দাও। বাছাকে বেশী বিরক্ত কর না।" নীলা উত্তর দিল, "আজ তোমার কোন কথা খাটবে না মামীমা। তোমার বাছাকে আমরা কাঁদিয়ে তবে ছাড়ব।"

মানসিক টেলীগ্রাফ

প্রথম অধ্যায়

মানসিক টেলীগ্রাফ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রক্রিয়া আমি বিশেষ কৃতকার্য্যতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছি, সেই সম্বন্ধে কিছু বলিব।

মানসিক টেলীগ্রাফ প্রত্যেক আধ্যাত্মিক শিক্ষার মধ্যবর্ত্তী পদার্থ। সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মনোভাব অবগতির জন্য কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম পালন ও কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যের সহিত কার্য্য করিতে হয়।

মানসিক টেলীগ্রাফের সাধারণ অবস্থায় ইহার উন্নতি সহজ সাধিত হইয়া থাকে। ইহার অ[illegible] কৃত জটিল ও উন্নত অবস্থায় এতদূর কৃতকার্য্য করা যায় যে সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী স্থানেও অনবরত সংবাদ পরিচালন করিতে পারা যায়। এই সমস্ত

লোকের আধ্যাত্মিক স্নেহের সাধারণ গতিশক্তি না থাকিলেও উহা বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে।

প্রথম বিবেচ্য বিষয় মানসিক অবস্থার উপযুক্ততা। স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন ও জড়ভাবাপন্ন লোক ইহাতে কখনো কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। সাধারণ অবস্থায় ইহার নিয়মাদি যদিও সহজ, কিন্তু ইহার উন্নতাবস্থায় অতিশয় কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয়।

তৎপরে ছাত্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইবে। টেলিগ্রাফী কার্য্যের ন্যায় ইহাতেও প্রেরক ও গ্রাহক উভয় প্রকার লোকের প্রয়োজন। কেহ বা একাই উভয় কার্য্য করিতে পারে, কেহ কেহ বা একেকটি কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে।

যাহারা দৃঢ় ও নিঃসন্দিগ্ধমনা (Positive) তাহারা উৎকৃষ্ট প্রেরক (transmitters) এবং যাহারা উদাসীন (passive) ও অসম্বাপ্রমাপক (Negative) তাহারা উৎকৃষ্ট গ্রাহক হইতে পারে।

নিঃসন্দিগ্ধমনা লোক সংবাদ প্রেরণ করিবে, এবং অসম্বাপ্রমাপক অবস্থার লোক তাহা গ্রহণ করিবে। যদি উভয়ের ভিতর মানসিক অবস্থার সাদৃশ্য থাকে তবে এই নিয়মের অধীন না থাকিয়া তাহারা প্রেরণ ও গ্রহণ উভয় কার্য্যই করিতে পারে। এবং ইহাই সকল ছাত্রের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

এপ্রিল, আগষ্ট ও ডিসেম্বর মাসে যে সকল লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে নিয়মমত তাহারা অত্যধিক দৃঢ়মনা, জুলাই, নবেম্বর ও মার্চ্চ মাসে যে সকল লোক জন্ম গ্রহণ করে তাহারা উৎকৃষ্ট গ্রাহক (Receivers) হইয়া থাকে। জুন, অক্টোবর ও ফেব্রুয়ারী মাসে যাহারা জন্ম গ্রহণ করে তাহারা প্রেরণ ও গ্রহণ দুই কার্য্যই করিতে পারে।

যখন উভয়ের মধ্যে পরস্পর মনোভাব অবগত হইতে হয় তখন নিম্নপ্রকারের লোক একত্র কার্য্য করিবে,—

এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণকারী জুন ও ফেব্রুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণকারীর সহিত,

মে মাসে জন্মগ্রহণকারী এপ্রিল ও আগষ্ট মাসে জন্মগ্রহণকারীর সহিত,

জুন মাসে জন্মগ্রহণকারী এপ্রিল ও আগষ্ট মাসে জন্মগ্রহণকারীর সহিত,

জুলাই মাসে জন্মগ্রহণকারী মে ও সেপ্টেম্বর মাসে জন্মগ্রহণকারীর সহিত,

আগষ্ট মাসে জন্মগ্রহণকারী জুন ও অক্টোবর মাসে জন্মগ্রহণকারীর সহিত,

সেপ্টেম্বর মাসে জন্মগ্রহণকারী নবেম্বর ও জুলাই মাসে জন্মগ্রহণকারীর সহিত,

অক্টোবর মাসে জন্মগ্রহকারী আগষ্ট ও ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণকারীর সহিত,

নবেম্বর মাসে জন্মগ্রহণকারী সেপ্টেম্বর ও জানুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণকারীর সহিত,

ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণকারী অক্টোবর ও ফেব্রুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণকারীর সহিত,

জানুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণকারী নবেম্বর ও মার্চ্চ মাসে জন্মগ্রহণকারীর সহিত,

ফেব্রুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণকারী এপ্রিল ও মে মাসে জন্মগ্রহণকারীর সহিত,

মার্চ্চ মাসে জন্মগ্রহণকারী জানুয়ারী ও মে জন্মগ্রহণকারীর সহিত,

ইহাও সচরাচর দৃষ্ট হয় যে নিম্নলিখিত লোকের মধ্যে প্রক্রিয়া করিলেও কৃতকার্য্য হওয়া যায়। যাহারা মার্চ্চ, আগষ্ট ও ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যাহারা জানুয়ারী, ডিসেম্বর ও মে মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; যাহারা ফেব্রুয়ারী, জুন ও অক্টোবর মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; যাহারা জুলাই, নবেম্বর এবং মার্চ্চ মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

এই সকল নিয়ম অনিশ্চিত। ব্যবহৃত যন্ত্রের

উপরই অধিক নির্ভর করে। যাহারা এই শক্তির উন্মেষ করিতে ইচ্ছুক তাহাদের পক্ষে উক্ত তালিকা অনুসারে সঙ্গী বাছিয়া লওয়া উচিত। মনে রাখিতে হইবে যে ইহা কেবল প্রক্রিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য। কারণ যাহার প্রতি তুমি মন একাগ্র করিতে ইচ্ছা কর, আমার উপদেশানুসারে চলিলে, তুমি যথাযথ তাহার মানসিক ভাব অবগত হইতে পারিবে। যাহা হউক পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করা যাইবে।

একজনের মনোভাব অন্যের প্রতি চালনা করা এবং অন্য কর্ত্তৃক তাহার গ্রহণ ও বোধগম্য করাই আমাদের উপস্থিত বিষয়ের প্রক্রিয়াসাধনের সূক্ষ্ম এবং কূটপ্রণালী (factor).

এই প্রকার নিয়ম যে চিন্তার বিষয় একটি ছবির ন্যায় দৃষ্ট হইবে। মনে কর তুমি একটি গোলাপের বিষয় ভাবিবে, তখন গোলাপ এই কথাটি না ভাবিয়া গোলাপের আকৃতি মনে মনে ভাবিতে হইবে। আমার প্রদত্ত নিয়মানুসারে যখন তুমি তোমার চিন্তার বিষয় প্রেরণ করিবে তখন গোলাপ এই কথাটি প্রেরণ করিবে না, তোমার মনঃকল্পিত উহার প্রতিমূর্ত্তিই প্রেরণ করিবে। এই ছবি গ্রাহকের মনে যাইয়া অস্বাভাবিক বেগের সহিত আঘাত করিবে। এই চিন্তা (ছবি) বিদ্যুৎ অপেক্ষা দ্রুত আসিয়া উপস্থিত হয় এবং গ্রাহক বুঝিতে পারে যে তুমি একটি গোলাপের বিষয় ভাবিতেছ। এইরূপে সংবাদও যথাযথরূপে প্রেরণ করা যাইতে পারে। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে,—কিরূপে ?

যদি আমার একবন্ধু চিকাগো (Chicago) থাকে এবং আমি ইংলণ্ডে থাকি তবে একটি চিন্তা-শক্তির এতদূর ভ্রমণ কি প্রকারে সম্ভব হয় ? ইহার উত্তর—আলো ও শব্দ যে প্রকারে ব্যোম মণ্ডলে বিচরণ করে।

যে বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে, তাহার উর্দ্ধে কি আছে, যাহাদের চিন্তাশক্তি নাই, তাহাদের পক্ষে উহা নির্ণয় করিতে মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। কেবল ইহা জানিয়া রাখিলেই চলিবে যে অনন্ত ব্রাহ্মাণ্ড (Infinity) ব্যোম মণ্ডলে (Ether) আবৃত রহিয়াছে। বিজ্ঞান হইতে আমরা এই শিক্ষালাভ করিয়াছি যে, চিন্তা হইতে আরম্ভ করিয়া লোকের শরীর, বায়ু, জল, এবং সমুদ্রতীরস্থিত বালুকাকণা সকলই কোটি কোটি পরমাণু সমবায়ে গঠিত।

ব্যোম পরমাণু সমবায়ে গঠিত নহে ; ইহা এক প্রকার তরল পদার্থ, ইহা সর্ব্বস্থান আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার ভিতর দিয়া কোন বস্তু চলিয়া গেলে ইহার সহিত ঘর্ষণে বাধা উৎপাদন করে না এবং ইহা মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাধীন নহে। ইহা এক প্রকার আটা বা চট্‌চটে পদার্থ (jelly like) বলিয়া কথিত হয়। অবৈজ্ঞানিক মতে সাধারণ কথায় এই বলা যায় যে, জলের উপর ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায়, যে কোন মানুষকে ভাসাইয়া লইবার শক্তি ইহার আছে। কাষ্ঠখণ্ড যেরূপ জলের ক্রমিক তরঙ্গাঘাতে চালিত হয়, ব্যোম-মণ্ডলেও সেইরূপ তরঙ্গের গতি আছে। আলো, শব্দ, চিন্তা প্রভৃতি এই অদৃশ্য বস্তুর ভিতর দিয়া গমনাগমন করে এই সকলের বেগ ও কম্পনের সহিত কেবল ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডের বেগ ও কম্পনের পার্থক্য।

এই সর্ব্বজনীন পদার্থটি না থাকিলে মানসিক টেলীগ্রাফ কখনো সম্ভবপর হইত না। পরমাণু যত সূক্ষ্ম হইবে উহা ততই দ্রুত গমনাগমন করিতে পারিবে। কারণ তখন উহা গমনাগমনের জন্য উন্মুক্ত পথ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। চিন্তা যতই একাগ্র হইবে ততই বেগের সহিত প্রধাবিত হইবে। বায়ু মণ্ডলেও অতি অল্প বাধা পাওয়ারই সম্ভাবনা থাকিবে। দুর্ব্বল ও অদৃঢ় চিন্তা বায়ুমণ্ডলে ঘুমের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং গন্তব্য স্থানে পঁহুছিবার বহু পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু একাগ্র চিন্তা একটি তীরের ন্যায় সোজা চলিয়া গন্তব্যস্থানে

উপস্থিত হয়। সুতরাং মানসিক টেলীগ্রাফের দ্বিতীয় নিয়ম একাগ্রতা।

মানসিক টেলীগ্রাফ প্রকৃত তারশূন্য টেলীগ্রাফ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। মস্তিষ্ক, শক্তি অথবা আধ্যাত্মিক অন্তঃকরণের কম্পনীয় যান্ত্রিক ব্যবস্থাই ইহার ব্যবহৃত যন্ত্রাদি।

মনোভাব অবগতি একটি আমোদজনক বিষয়। ইহাতে অধিক কিছু শিক্ষার প্রয়োজন নাই। প্রায় সকলেই মনোভাবঅবগতিবিষয়ে দক্ষ লোকদিগের ও প্রতিযোগিতা করিতে পারে। সময়, ধৈর্য্য ও কথঞ্চিৎ পরিমাণে অনুরাগ এই কয়েকটিই প্রয়োজনীয় সজ্জা। কিন্তু ঐ সকল অতিরিক্তের প্রক্রিয়া সাধন পক্ষেও তোমার শরীর ও মন যতই পবিত্র থাকিবে, ফল ততই উৎকৃষ্ট হইবে। পরিষ্কৃত শরীর অর্থাৎ সর্ব্বদা প্রত্যহ একবার কি দুইবার স্নান, পরিধেয় বস্ত্রে কোন প্রকার দাগ না থাকা, নির্ম্মল অন্তঃকরণ, কোন প্রকার সুরা পান না করা, অতি অল্প পরিমাণে মাংস ভক্ষণ করা, (একেবারে বর্জ্জন করিতে পারিলেই ভাল) প্রয়োজনীয়; মনে কোন প্রকার কুচিন্তার স্থান না দেওয়া, ক্রোধ, হিংসা ও সর্ব্বপ্রকার নির্দ্দয়তা দমনের অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। এই সকলে তোমার মানসিক অথবা আধ্যাত্মিক আকাশমণ্ডলকে মেঘাচ্ছন্ন করিয়া মানসিক-টেলীগ্রাফের সংবাদাদি প্রেরণ ও গ্রহণ বিষয়ে বাধা জন্মায়।

সাধারণ মনোভাব অবগতির প্রক্রিয়ার জন্য দুইটি লোকের প্রয়োজন। যিনি মনোভাব অবগত হইবেন (mind reader) তাঁহাকে অত্যন্ত দৃঢ় মনবিশিষ্ট হইতে হইবে। যে সকল পুরুষ বা স্ত্রীলোক আগষ্ট, এপ্রিল অথবা ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা অধিকদিন শিক্ষা না করিয়াও সহজে অপরের মনে নিজ মনোভাব সঞ্চালিত করিতে পারে। যাহারা জুন, জুলাই (২১শে পর্য্যন্ত) নবেম্বর, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে জন্ম গ্রহণ করে, তাহারা অপরের মনোভাব জ্ঞাত হওয়ার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাদের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য প্রক্রিয়াকারীরূপে অপর একটি লোকের প্রয়োজন। তাহার জন্মমাস আগষ্ট, এপ্রিল, ডিসেম্বর, জানুয়ারী, মে কিম্বা সেপ্টেম্বর মাস হওয়া প্রয়োজনীয়।

যিনি মনোভাব অবগত হইবেন তাঁহাকে চক্ষু বাঁধিয়া, কথাবার্ত্তা শুনিতে না পায় এরূপ স্থানে রাখিয়া দাও। (গৃহের বাহিরে রাখিলেই ভাল) একটি আল্‌পিন যে কোন অবস্থায় গৃহে বা গৃহের বাহিরে যে কোন স্থানে রাখিয়া দাও। যাহারা প্রক্রিয়া দর্শনেচ্ছুক তাহাদের প্রত্যেককেই আল্‌পিনের অবস্থান স্থান জানাইয়া রাখ। বলা বাহুল্য, পূর্ব্ববর্ণিত প্রক্রিয়াকারীকেও জানাইতে হইবে।

তৎপর সেই লোকটিকে গৃহের ভিতর আনয়ন কর এবং প্রক্রিয়াকারীকে তাহার পশ্চাৎ দাঁড়াইতে বল। সে যেন তাহার হস্তদ্বয় এরূপ ভাবে উক্ত লোকটির কপালের পার্শ্বদ্বয়স্থিত রগের অতি নিকটে ন্যস্ত স্থাপন করে, যেন হস্তদ্বয় কোন প্রকারেই তাহার মস্তক স্পর্শ না করে। উপস্থিত সকলেই সেই আল্‌পিনটি ও তাহার লুক্কায়িত স্থান যেন মনে মনে চিন্তা করে। প্রক্রিয়াকারী আল্‌পিনটির চিত্র তাহার মস্তিষ্কে প্রতিফলিত করিবার জন্য সে যেন সোজা ভাবে আল্‌পিনের নিকট চলিয়া যায়, এই মনের ভিতর দৃঢ়তার সহিত অবলম্বন করে। কেহই যেন একটি কথাও উচ্চারণ না করে। কয়েক সেকেণ্ড পরে, যাহা দ্বারা প্রক্রিয়া করা হইতেছে— (Telipathist) সে এদিক্ ওদিক্ চলিতে থাকিবে। কোন্ দিকে যাইবেই তাহাই যেন অবধারণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। তৎপর হঠাৎ রওনা হইয়া দ্রুতপদে, যে স্থানে আল্‌পিন আছে সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইবে। প্রক্রিয়াকারী তাহাকে স্পর্শ করিবে না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, সে যেন পড়িয়া না যায়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

দুই এক সপ্তাহ এই প্রকার অভ্যাস করিলে,

বেকার্যাগনবিশিষ্ট (sensitive) যে কোন লোক এই উপায়ে যতদূর ইচ্ছা দূরবর্ত্তী স্থানে যে কোন বস্তু দেখিতে পারে।

যদিও এই প্রক্রিয়া সামান্য এবং পুরাতন, তথাপি যাহারা নিঃশব্দে মনোভাব পরিচালনের শক্তিলাভে ইচ্ছুক, তাহাদের পক্ষে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষার পথ। ইহা তাহাদের ইন্দ্রিয়াদি প্রখর করে এবং মন একাগ্র করিবার শিক্ষা প্রদান করে।

দর্শকগণ একখানা তাস নির্দ্দিষ্ট করিয়া উহার বিষয় নিজেদের মনে দৃঢ় ধারণা করিলে পর, অপরের মনোভাব জ্ঞাতেচ্ছুক লোকের মনে তাহা পরিচালিত করিতে পারা যায়। মানসিক টেলীগ্রাফের পরীক্ষা সম্বন্ধে এই সকল অতি নগণ্য; উহা তুমি উপেক্ষা করিতেও পার।

কিন্তু তাসের ভিতরও একটি কঠিন প্রক্রিয়া আছে; আমি উহা পরীক্ষা করিয়া অত্যধিক কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছি। যিনি মনোভাব অবগত হইবেন, তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় বাহিরে রাখিয়া, প্রক্রিয়াকারী ভিতরে থাকিয়া প্রথমতঃ এক প্যাক্ (Pack) তাস উত্তমরূপে ভাসাইয়া লইবে। তৎপরে বার্য্য করিবে যে, প্রতি রঙ্গের সাহেব, বিবি, গোলাম এই সমস্ত তাস হইতে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। এখন যিনি মনোভাব অবগত হইবেন, তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় চক্ষুবন্ধাবস্থায় ভিতরে আনিয়া একটি টেবিলের নিকট দণ্ডায়মান করাও এবং তাসগুলি তাহার হস্তে প্রদান কর। প্রক্রিয়াকারী পূর্ব্বের ন্যায় স্পর্শ না করিয়া তাহার হস্তদ্বয় উক্ত ব্যক্তির ভ্রূর মধ্যে স্থাপন করিবে। উপস্থিত সকলেই তাহাদের সমগ্র চিন্তাশক্তি ঐ সকল সাহেব, বিবি প্রভৃতি তাসের উপর স্থাপন করিবে। এই প্রক্রিয়াতে আমি কখনো অকৃতকার্য্য হই নাই। কিন্তু সকলের সমগ্রচিন্তাশক্তি ঐ বিষয়ে স্থাপিত না হইলে প্রক্রিয়া নিষ্ফল হওয়া সম্ভাবনা।

নাম, ব্যাঙ্ক নোটের সংখ্যা প্রভৃতি লিখিয়া একটি এন্‌ভেলাপের (Envelope) ভিতর রাখিয়া তাহা পাঠ করাইতে হইলেও এই নিয়মই অবলম্বনীয়। কিন্তু এই সূক্ষ্ম ও সুকঠিন প্রক্রিয়া করিতে হইলে, প্রক্রিয়াকারীর হস্ত অপর ব্যক্তির কপালের পার্শ্বস্থিত শিরার উপর মৃদুভাবে স্থাপন করা উচিত। তাহাতে চিন্তা সহজে সঞ্চারিত হইতে পারে।

আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রী বহুলোকাকীর্ণ প্রকোষ্ঠ হইতে ১৭।১৭ খানা রুমাল গ্রহণ করিয়া তাহা একত্র বাঁধিয়া তৎপর চক্ষুবন্ধাবস্থায় আমার প্রত্যেককে তাহার নিজ রুমাল প্রত্যর্পণ করিয়াছেন। বহুবন্ধুদের মধ্যে ছয়জনের নিকট হইতে বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা গ্রহণ পূর্ব্বক একখানা কার্পেটের উপর এলোমেলো অবস্থায় রাখিয়া তিনি উক্তরূপে প্রত্যেকের মুদ্রা নির্ভুলরূপে প্রত্যেককে প্রদান করিয়াছেন। এই সমস্ত সাধারণ প্রক্রিয়া ক, খ, গ শ্রেণীর শিক্ষণীয়। এই সকল প্রক্রিয়া অতি সহজে সাধিত হইয়া থাকে এবং এই সকল প্রক্রিয়া আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে চিন্তাশক্তি পরিচালনার অতি সহজ ও রীত্যানুযায়ী কয়েকটি সাধারণ নিয়ম প্রদর্শন করিয়াছি। এই সকল প্রক্রিয়া আমার নিকট নীরস বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু ইহাও সন্দেহশূন্যরূপে শিক্ষা করিতে বহুদিনের আবশ্যক।

পূর্ব্বাধ্যায়ের বর্ণিত প্রক্রিয়া সাধন করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ে অভ্যস্ত হইতে হইবে।

সর্ব্বপ্রথমে বিবেচনা করিতে হইবে যে, আভ্যন্তরিক গ্রাহক (mental receiver) অর্থাৎ মস্তিষ্ক একটি সূক্ষ্ম পরিমাপক যন্ত্র। যে সমস্ত যন্ত্র আলোকতরঙ্গ, শব্দতরঙ্গ ও বর্ণতরঙ্গ পরিমাণ করিতে পারে এবং যে সকল যন্ত্র প্রকৃতি, আকৃতি ও সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী গ্রহাদির বাস্তবীয় প্রকৃতি নিরূপণ করিতে পারে, বিজ্ঞান সেই সকল যন্ত্রকেই সূক্ষ্ম পরিমাপক বলিয়া প্রকাশ করে। চিন্তাশক্তি ধারণ করিতে পারে এরূপ

যন্ত্র বিজ্ঞান অদ্যাপিও আবিষ্কার করিতে পারে নাই। কিন্তু প্রকৃতি প্রত্যেক মনুষ্য-মস্তিষ্কে তাহা নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। কোন অস্বাভাবিক ঘটনা ব্যতীত যখন লোকটি স্বাভাবিক অবস্থা ঠিক রাখিয়া চিন্তা গ্রহণ যোগ্য থাকিবে এবং যখন মন বিপরীত ভাবের কোন মানসিক কার্য্যে ব্যাপৃত না থাকিবে, অধিকন্তু যখন চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থা মনকে অন্যদিকে আকর্ষিত না করিবে তখন মস্তিষ্ক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিন্তনীয় বিষয়টি গ্রহণ করিতে পারিবে। সুতরাং মনের শান্ত অবস্থার একান্ত প্রয়োজন। সোনযোগের ভিতরও মানসিক টেলীগ্রাফের চিন্তনীয় বিষয় গ্রহণ করিতে দেখা গিয়াছে কিন্তু আমি হঠাৎ কোন প্রক্রিয়া না করিয়া পূর্ব্ব হইতে স্থিরীকৃত প্রক্রিয়ার পরীক্ষার বিষয়ই বলিতেছি।

অত্যন্ত নিকটবর্ত্তীস্থানে কার্য্যারম্ভ করা উচিত।

দুইটি বিপরীত আত্মা অর্থাৎ একটি দৃঢ় মন ও অপরটি অদৃঢ় মন বিশিষ্ট আত্মা প্রথমতঃ একই প্রকোষ্ঠে উপবেশন করিবে, তৎপর একই বাড়ীর বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ, তদনন্তর একই সহরে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে, এইরূপে ক্রমে যখন পরিচালন সহজ হইয়া আসিবে, তখন ক্রমান্বয়ে এই দূরত্ব বর্দ্ধিত করিবে। এই সমস্ত প্রক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে ফলবতী করিতে হইলে জীবন ধারণ ও খাদ্যের অবস্থা যতদূর সম্ভব সাদাসিধা রকমের করিতে হইবে। উত্তেজনা যতদূর সম্ভব কমাইতে হইবে। সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্নতা ও পরিষ্কার প্রকোষ্ঠ একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া জ্ঞান করিবে। তাহাকে একখানা আরামদায়ক কেদারায় উপবেশন করাও। তাহার মনকে সর্ব্বপ্রকার চিন্তা হইতে বিমুক্ত করাও। ইহা বড় সহজ কার্য্য নহে —কিন্তু ছাত্রটি যদি প্রক্রিয়া আরম্ভ করিবার কয়েক দিবস পূর্ব্ব হইতে প্রত্যহ এক ঘণ্টাকাল নীরবে উপবেশন করে এবং মন যে পর্য্যন্ত সমস্ত চিন্তনীয় বিষয় চিন্তা না করে তাবৎ তাহাকে সেইরূপভাবেই চলিতে দেয়, তবে কোন বিষয়েই চিন্তা না করা ক্রমে সহজ হইয়া আসিবে।

প্রকৃত পক্ষে আমার ছাত্রগণ উত্তমরূপে অবধারণ করিয়াছে যে, মন স্বাধীনভাবে যে কোন বিষয় ভাবিতে পারে এইরূপ ধারণা করিয়া উপবেশন করাইয়া মনকে শূন্যাবস্থায় রাখা বা একই বিষয়ে একাগ্র করার প্রধান উপায়। মনকে এইরূপ স্বাধীনভাবে রাখিলে কোন বিষয়ে চিন্তা করিবে তাহা অবধারণ করিতে না পারিয়া কোনদিকেই আকৃষ্ট হয় না।

প্রক্রিয়াকারী ও মনোভাব গ্রাহক এই উভয়ের পক্ষেই ইহা অভ্যাস করা দরকার।

উভয় ছাত্রই উপবেশন করিতে পারে। কিন্তু যখন মনোভাবগ্রাহক তাহার মস্তিষ্ক শূন্যাবস্থায় রাখে, কোন বিষয়েই চিন্তা করে না এবং যে সংবাদ প্রেরিত হইবে, তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকে, তখন প্রক্রিয়াকারী তাহার সমস্ত চিন্তাশক্তি যে সংবাদ প্রেরিত তৎপ্রতি বিনিবিষ্ট করিবে। কার্য্য দ্বারা প্রথম আরম্ভ করা উচিত।

দৃঢ়ভাবে চিন্তা কর যে, মনোভাব গ্রাহক উঠিয়া দাঁড়াইবে, জানালার নিকট হাটিয়া যাইবে এবং খড়খড়ি বা যে কোন আবরণ ফেলিয়া দিবে। মনে মনে চিন্তা করিয়া ইহার ফললাভ হইবে না। তুমি উঠিয়া দাঁড়াইবে, হাটিয়া জানালার নিকট যাইবে এবং খড়খড়ি ফেলিয়া দিবে। কতক সময় পর্য্যন্ত মনে মনে উহা ধারণা করিতে পার, কিন্তু তাহাতে কোন লাভ হইবে না। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তোমার মানসপটে তাহার মূর্ত্তি কল্পনা কর—যেন সে তোমার সম্মুখেই একখানা কেদারায় বসিয়া আছে। তৎপর কল্পনা কর, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন নড়িয়া চড়িয়া উঠিল, হস্তদ্বয় যেন কেদারার হাতলের উপর স্থাপন করিল, কয়েক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া যেন উঠিয়া দাঁড়াইল, তৎপর জানালা অভিমুখে অগ্রসর হইল। চক্ষুদ্বয় সর্ব্বদা মুদ্রিত রাখিয়া প্রতি পদক্ষেপে তাহার গমন পর্য্যবেক্ষণ কর, তাহার পদদ্বয়ের গতি পর্য্য-

বেরূপ কর তৎপর কল্পনা কর, সে যেন বাহু উত্তোলন করিল, খড়খড়ি ধারণ করিল এবং তৎপর ফেলিয়া দিল। যতই উজ্জ্বলভাবে এই সকল চিত্র তোমার মস্তিষ্কে আবির্ভূত করিতে পারিবে ততই সর্ব্বাঙ্গীনরূপে এবং অল্পসময়ে সংবাদ পরিচালিত হইবে।

মনকে একখানা মসৃণ পরিষ্কার শ্লেটের ন্যায় শূন্য করাই চিন্তাশক্তি পরিচালিত করিবার গুপ্তরহস্য। কিন্তু ফটোগ্রাফ তুলিতে হইলে যেমন আমাদের একখানা পরিষ্কার শ্লেট থাকে এবং সম্মুখে যাহার চিত্র তুলিতে হইবে তাহার মূর্ত্তি স্থাপিত থাকে, আর অমনি শ্লেটে তাহার চিরস্থায়ী মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া যায়, সেইরূপ একদিকে যেমন মনকে সম্পূর্ণরূপে শূন্য করিতে হইবে, অপর দিকে আবার জীবন্ত উজ্জ্বল চিত্র মানসপটে আবির্ভূত করিতে হইবে। যে সকল মানসিক টেলীগ্রাফকারক কেবল কথা মনে না ভাবিয়া তাহার আকৃতি চিন্তা করে তাহারাই কৃতকার্য্য হইয়া থাকে।

এই সকল প্রক্রিয়ায় কৃতকার্য্য হইলে পর, প্রক্রিয়াকারী মনোভাব গ্রহণ করিতে এবং মনোভাব-গ্রহণকারী মস্তিষ্কে মানসিক চিত্র আবির্ভূত করিতে চেষ্টা করিতে পারে। দিন দিনই প্রক্রিয়ার কাঠিন্য বর্দ্ধিত হইতে পারে। সুতরাং সম্যক নিরূপণের জন্য কৃতকার্য্যের নোট রাখা উচিত। কৃত কার্য্যের সফলতাজনিত আনন্দ উপভোগ অপেক্ষা মানসিক গঠন বিষয়ে ইহা অধিক প্রয়োজনীয়। স্মৃতিশক্তি, পর্য্যালোচনা শক্তি, মন একাগ্র করার শক্তি এবং মানসিকদর্শনশক্তি বিশেষরূপে অভ্যস্ত না হইলে এই প্রকার মানসিক কার্য্য করা অসম্ভব। চিন্তা-শক্তি পরিচালনার পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মাদি কেবল আরম্ভ সময়ের জন্য। উত্তমরূপে কার্য্য পরিচালনার নিয়মাদি পরে লিখিত হইতেছে।

যখন তোমার মনোভাব গ্রহণকারী বাড়ীর যে কোন স্থানে থাকিয়া মনোভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে, তখন তুমি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পার। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় স্থিরভাবে উপবেশন কর। প্রথম আরম্ভ করিবার সময় দ্রব্যবাচক কোন বিশেষ পথ লইয়া আরম্ভ করিবে। তোমার মনোভাব গ্রহণকারী পূর্ব্বের ন্যায় মনকে শূন্যাবস্থায় রাখিবে। মনে মনে একখানা পুস্তকের বিষয় চিন্তা কর। কিন্তু পুস্তকের নাম চিন্তা না করিয়া পুস্তকের আকৃতি চিন্তা করিতে হইবে। তৎপর তোমার মনোভাব গ্রহণকারীকে জিজ্ঞাসা কর সে কিরূপ ভাব অনুভব করিতেছে। সে হয়ত কয়েক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিবে, পরে বলিবে ইহা আয়ত-ক্ষেত্রের ন্যায় কোন পদার্থ—ইহা—ইহা একখানা পুস্তক।

এক সময়ে একটি মাত্র পদার্থের বিষয় চিন্তা করিবে এবং উহার চিত্র মনে যতদূর সম্ভব তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল ভাবে অঙ্কিত করিবে। ইচ্ছা হইলে খুব নিকট-বর্ত্তী স্থানে বসিয়া কার্য্যারম্ভ করিতে পার। এমন কি পরস্পর হাতধরাধরি করিয়াও করিতে পার। আমার মতে এরূপ না করাই ভাল। কিন্তু আমি নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে বলিতেছি, তোমরা যে কার্য্যই কর না কেন, সকল কার্য্যের ভিতরই এই খেয়াল রাখিবে। প্রত্যেক বিষয়ে, প্রত্যেক লোকের প্রতি, এমন কি দৈনিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যের ভিতরও ইহার কার্য্যকারীতা পরীক্ষা করিবে। তুমি যাহা কর, যাহা দেখ বা দেখিয়াছ, তাহার প্রত্যেকেরই মানসিক চিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিবে। এখন দূরবর্ত্তী স্থানে থাকিয়া কার্য্য করার বিষয় বলিতেছি, দুই একটুকু পরিবর্ত্তন ব্যতীত তাহাতেও প্রায় এই নিয়মেই কার্য্য করিতে হয়। প্রথম আরম্ভ-কারীদের পক্ষে অর্দ্ধ মাইলের মধ্যে উপবেশন করা কর্ত্তব্য। প্রক্রিয়াকারী পূর্ব্বের ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনোভাব গ্রহণকারীর চিত্র মানসপটে উজ্জ্বল ভাবে অঙ্কিত করিবে। সেই চিত্র সমান ভাবে উজ্জ্বল রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহার নাম উল্লেখ করিয়া

বলিবে—"জন্ স্মিথ, জন্ স্মিথ, তুমি কি আমার কথা শুনিতে পাইতেছ?—আমি তোমার নিকট শীঘ্রই পত্র লিখিতেছি।"

স্পষ্টরূপে এই বাক্য দুই তিনবার উচ্চারণ করিবে। অর্থ ব্যতিক্রম না করিয়া ইহাপেক্ষা সহজবাক্যও বলিতে পার।

ক্রমে যখন তুমি পরিপক্ক হইবে, তখন ক, খ, গ শ্রেণী পরিত্যাগ করিয়া যতদূর সম্ভব সহজভাবের পূর্ণবাক্য গ্রহণ ও পরিচালন করিতে শিক্ষা করিতে পার। কিন্তু মনে রাখিবে পিয়ানো (piano) শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে যেমন তাহার নোট শিক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

ইচ্ছা শক্তিকে একাগ্র করা এবং ব্যোমমণ্ডলে কম্পনের সাহায্য করাই নাম এবং বাক্য উচ্চৈঃস্বরে বলিবার উদ্দেশ্য।

আধ্যাত্মিক শিক্ষার যদি কোনরূপ সহজ উপায় থাকে তবে পূর্ব্বোক্ত নিয়মাদিই সহজ। সাবধানতার সহিত উহা অভ্যাস করিলে, তুমি চিন্তার আশ্চর্য্যশক্তিতে আভ্যন্তরিক দৃষ্টিলাভ করিতে পারিবে। তখন বুঝিতে পারিবে প্রাচীন সংস্কার কিছুই নয়—চিন্তাশক্তি শৃঙ্খলাবদ্ধ কুকুরের ন্যায় কোন ব্যক্তিগত অস্তিত্বে আবদ্ধ থাকিবার নহে। ইহা সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিতে পারে এবং সহস্র মাইল ব্যবধানে ইহার বাঞ্ছিত বস্তুর সন্ধান জানিতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

আমরা এ পর্য্যন্ত একটি শব্দের প্রেরণ ও গ্রহণ সম্বন্ধে বলিয়াছি। এখন সমস্ত বাক্য প্রেরণ করার বিষয় বলিতেছি। ইহা যদিও অত্যধিক কঠিন কিন্তু একই প্রণালীমতে কার্য্য করিতে হয়। বাক্যটি তোমার নিকট যতদূর সম্ভব সহজবোধ্য করিবে।

পূর্ব্বের ন্যায় নয়ন মুদ্রিত করিয়া স্থিরভাবে উপবেশন কর। সর্ব্বপ্রথমেই তোমার সঙ্গীর মুখ ও আকৃতি স্মরণ কর এবং উহা তোমার স্মৃতিপটে পরিস্ফুটরূপে প্রতিভাত কর। তৎপরে তোমার স্মৃতি পটাঙ্কিত মূর্ত্তির নিকট উচ্চৈঃস্বরে বল। কিন্তু কেবলমাত্র শব্দ উচ্চারণ করিলেই চলিবে না; উহার অর্থাদি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক। প্রথমতঃ একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়নির্দ্দেশক একটি অমিশ্র বাক্য (simple sentence) গ্রহণ কর। গ্রাহক পূর্ব্বে ধারণা করিতে না পারে এরূপ বাক্য লওয়াও মন্দ নহে।

ইচ্ছা হইলে এই বাক্যটি উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ কর—

"রাজা আয়র্লণ্ডে যাইবেন।"

তোমার সহযোগীর সহিত সময়াদির নির্দ্দেশ পূর্ব্বেই ঠিক রাখিবে। যখন বুঝিবে যে, সে তোমার সংবাদ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে, তখন উক্ত বাক্য উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিবে। তৎপরে সহযোগীর মূর্ত্তি হৃদয়পট হইতে মুছিয়া তৎস্থলে রাজার মূর্ত্তি অঙ্কিত কর এবং মনে মনে গাড়ীতে তাঁহার অনুসরণ কর। তাঁহার সঙ্গী হইয়া যাইতেছ এরূপ ধারণা বা চিত্র অঙ্কিত করিও না, তাহাতে বিষয়টি জটিল করিয়া ফেলিবে। আয়র্লণ্ড শব্দটির উপর অধিক জোর প্রদান করিবে এবং এইরূপ ইচ্ছা করিবে যে, তোমার মনোগত ভাব তোমার সহযোগীকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে, ইহা সম্পাদন করিতে তোমার পাঁচ মিনিটের অধিক সময় লাগিবে না। কিন্তু মনে মনে অন্য কোন বিষয় উপস্থিত না হয় তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে।

ইহা কার্য্যের অংশ মাত্র। তুমি নানাবিধ বাক্যই ব্যবহার করিতে পার কিন্তু প্রারম্ভ সময়ে ঐ সকল বাক্য অমিশ্র হওয়া উচিত। মনে কর তুমি একটি নূতন ভাষা শিক্ষা করিতেছ, সুতরাং অভ্যাস ব্যতীত তুমি তাহাতে বাগ্মিতা লাভ করিতে পারিবে না। তুমি যতই উৎসাহপূর্ণ হইবে, ততই সহজে বাক্যের প্রতি তোমার মন নিবদ্ধ করিতে

পারিবে এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে তাহা গৃহীত হইবে।

এখন গ্রহণকারীর অবস্থার বিষয় বলিতেছি। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে একটি সোফায় ও কাগজ নিয়া উপবেশন করিবে। হস্তদ্বারা চক্ষুদ্বয় আবৃত করিয়া, মনকে শূন্য করিয়া স্থিরভাবে উপবিষ্ট থাকিবে; পরে মনে যখন যে ভাবের উদয় হয় তাহা কাগজে লিখিয়া রাখিবে।

অর্থাদি যদিও অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাতে কিছু আসে যায় না, কারণ তুমি যখন অভিজ্ঞতায় অভ্যস্ত হইবে, তখন অর্থাদি এত স্পষ্ট-ভাবে উপলব্ধি হইবে যে তুমি তাহা শ্রবণ করিতেছ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

শব্দ ও বাক্য প্রেরণের কৃতকার্য্যতার সহিত অভ্যাস বন্ধ করিলে চলিবে না। মনোবৃত্তির পরি-চালন করিতেও তোমায় শিক্ষা করিতে হইবে। উহা যদিও আদৌ সহজ নহে কিন্তু অসম্ভব নয়—তাহাও করা যাইতে পারে।

আমার ইহা বলিবার অর্থ এই যে, যদি মনোবৃত্তি কুত্রিম হয়, তবে তাহা গ্রহীতার নিকট সহজ নহে। কিন্তু যদি তাহা প্রকৃত হয়, তবে কিছুই প্রেরণ করা কঠিন নহে। আনন্দ, ভালবাসা, ভয় এবং ক্রোধ এই সকল মনোবৃত্তিগুলি পরিচালন করিতে অভ্যাস কর। ইহাতে তোমার ইচ্ছা একাগ্র করিতে এবং উহার শক্তি বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিবে। মনে রাখিতে হইবে যে, এখন আর শব্দ বা বাক্য প্রেরণ করিতেছ না। পূর্ব্বে অভ্যস্ত না থাকিলে মনোভাব-গ্রহণকারী হয় ত বিস্মিত হইতে পারে। সুতরাং কোন প্রক্রিয়া আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, তাহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত যে, তাহার মনে যে কোন ভাবের উদয় হউক না কেন, সে যেন কিছুতেই আশ্চর্য্যান্বিত না হয়।

এই সমস্ত প্রক্রিয়া কোন পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সময়ে করিতে হইবে। অর্থাৎ উভয় প্রক্রিয়াকারী কোন একটি সময় নির্দ্দেশ করিয়া, সেই নিরূপিত সময়ে উভয়ে উভয়ের চিন্তা, ইহার পরিচালনে নিযুক্ত করিবে।

শব্দ, বাক্য ও চিত্র প্রকৃতি এই উপায়ে যতদূর ইচ্ছা দূরে প্রেরণ করা যাইতে পারে। প্রথম প্রথম পরীক্ষার সময় ইহা বেশী আমোদজনক না হইতে পারে কিন্তু যখন তাহা আয়ত্ত হয়, তখন উহা বড়ই আমোদজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। বহু লোকের মধ্যে যদি কোন প্রয়োজনে কাহাকেও আমার আবশ্যক হইয়াছে; তবে এই মানসিক টেলীগ্রাফের আহ্বানে তাহাকে আহ্বান করিয়াছি এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছি।

পূর্ব্বে নিরূপণ না করিয়াও ইহা করা যাইতে পারে।

চক্ষুদ্বয় আবৃত করিয়া তোমার বাঞ্ছিত লোকের মূর্ত্তি মানসপটে চিত্রিত কর। তৎপর তাহার চক্ষুর দিকে দৃষ্টি করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বল—জন্ স্মিথ্ (অথবা তাহার যে নাম থাকে) আমি তোমাকে ডাকিতেছি, আমার নিকট এস, তুমি কি শুনিতে পাইতেছ?" তিন বার কি চারি বার এই কথা উচ্চারণ করিবে। তৎপরে মনে মনে কল্পনা করিবে—সে যেন তাহার আফিস, বাসা অথবা গাড়ী পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে বা ঘোড়ায় তোমার বাড়ীর দিকে আসিতেছে। প্রতি পদক্ষেপে তাহার গতির অনু-সরণ করিবে এবং যতদূর সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে সে কোন্ অজানা শক্তিদ্বারা আকর্ষিত হইবে। কোন্ শক্তিবলে সে আকর্ষিত হইতেছে, যদিও সে তাহা জানিতে পারিবে না তথাপি উহার আকর্ষণ নিবারণ করিতে পারিবে না।

প্রক্রিয়াকারী ও উক্ত লোকের ভিতর কিয়ৎ-পরিমাণে মনের মিল থাকা আবশ্যক। কিন্তু পূর্ব্বো-লিখিত প্রক্রিয়া প্রবৃত্তিতে উভয়ের ভিতর যে একটা নির্দ্দিষ্ট মানসিক সম্বন্ধের প্রয়োজন, ইহাতে তাহার কোন প্রয়োজন নাই।

কাহারো মূর্ত্তি মনে আবির্ভূত করা কঠিন।

কিন্তু অভ্যাসবলে তাহাও আয়ত্ত হইবে। কেহ কেহ ইহা স্বভাবতঃই করিতে পারে, আর কাহারো নিকট কঠিন বলিয়া বিবেচিত হয়। তাহারা মুখের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক তৎপরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তখনই তাহা মনে মনে দর্শন করিতে চেষ্টা কর। তাহার চক্ষু, নাসিকা, মুখ ও বর্ণ কেমন স্মরণ করিতে থাক। আবার নিকটবর্ত্তী কোন লোকের প্রতি তাকাইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত ভাবে কার্য্য করিয়া যাও।

দৃশ্য, বাড়ী ও প্রাণী সম্বন্ধেও এই উপায়ে চেষ্টা করিবে।

এত শীঘ্র তুমি মানসিক-দৃষ্টি লাভ করিবে যে, তাহাতে তুমি বিস্মিত হইয়া যাইবে। যে কোন সময়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তুমি যে কোন বস্তু বা যে কোন লোককে দর্শন করিতে পারিবে। এই প্রক্রিয়াতে তোমার মনোভাব গ্রহণকারী কোথায় কি করিতেছে তাহার কোন সংবাদের প্রয়োজন হইবে না।

"তুমি তাহাকে ডাকিতেছ।" এই সংবাদ প্রেরণ করিলে, অমনি উহা সোজা ভাবে উহার গন্তব্য স্থানে চলিয়া যেন এবং তোমার চিন্তাশক্তির আকর্ষণে তাহাকে তোমার নিকট আকর্ষিত করিয়া আনিল। তুমি অল্প বিস্তর অভ্যাস করিয়াই দেখিতে পাইবে যে, তোমার পরিচিত লোকের মধ্যে পঞ্চাশ জনই তোমার আদেশ পালন করিবে এবং সম্ভবতঃ শতকরা পঁচাত্তর জন আদেশ পালন করুক আর না করুক, অনুভব করিতে পারিবে।

তুমি সংবাদ গ্রাহককে যে সকল আদেশ করিবে তন্মধ্যে দৈনিক কাগজ, কোন পুস্তক, কয়েকটি পুষ্প প্রভৃতি কোন দ্রব্য আনয়ন করার আদেশই অতি আশ্চর্য্য ও হৃদয়গ্রাহী।

তাহার মূর্ত্তি মনে আবির্ভূত করিয়া নাম ধরিয়া আহ্বান করিয়া বল—"সময় নায়ক সংবাদ পত্র অথবা অন্য কোন কাগজ চাহিতেছি।" কয়েকবার এই প্রক্রিয়া করিলেই ইহার আশ্চর্য্য সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। যে লোক কেবল আহ্বানে উপস্থিত হইবে, কিন্তু কোন দ্রব্য আনিবে না তাহার অপেক্ষা যে কোন দ্রব্য আনিতে আদিষ্ট হইবে। তাহার সহিত তোমার মনের অপেক্ষাকৃত অধিক সমতা থাকার প্রয়োজন।

এই প্রক্রিয়ার সত্যতা সম্বন্ধে আমি আশ্চর্য্য প্রমাণ লাভ করিয়াছি। প্রক্রিয়াকারীদ্বয় উভয়েই এক সময়ে থাকিলে প্রক্রিয়ার ফল ভাল হয়। পথে আসিতে গাড়ী বা অন্য কোন যানের প্রয়োজন হইলে, লোকে আদেশ পালন করিতে স্বভাবতঃই একটু ইতস্ততঃ করিয়া থাকে। একান্তই তাহাকে আসিতে বাধ্য করিতে হইলে, সেই প্রকার দৃঢ় আদেশ প্রদান করিবে কিন্তু পরীক্ষাস্থলে কোন প্রক্রিয়াকারীই এরূপ আদেশ প্রদান করিবে না।

বহুদূরবর্ত্তী স্থানে প্রক্রিয়া করিতে হইলে উপবেশনের নির্দ্দিষ্ট সময় রাখা এবং তখন অপেক্ষাকৃত জটিল সংবাদও প্রেরণ করা যাইতে পারে। ইহাই প্রকৃত অবস্থার মানসিক টেলীগ্রাফ।

নিদ্রিতাবস্থায় মানসিক টেলিগ্রাফ অতি সহজ। প্রাচীন সংস্কার মতে ইহাকেই সত্য স্বপ্ন বলিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রেরিত চিন্তাশক্তির প্রত্যাবর্ত্তন ব্যতীত আর কিছুই নহে।

প্রতারণা করা হইতেছে বলিয়া লোকে আপত্তি করিলে, প্রক্রিয়াকারীর পক্ষে প্রেরিত সংবাদ কোন তৃতীয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

বংশের কলঙ্ক।

(উপন্যাস)

শ্রীসন্তোষকুমার বসু।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ফুটবলের কাপ্তেন।

"হিপ হিপ হুররে," "হিপ হিপ হুররে" "হিপ হিপ হুররে,"—বাঙ্গালী যুবকের দল সবেমাত্র মাঠে ফুটবল খেলার কাপ ম্যাচ জিতিয়া ঘরে ফিরিবার মুখে পূর্ণ উৎসাহে উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি করিতেছে। সেই শতকণ্ঠে উচ্চারিত ভীষণ জয়োল্লাসে গ্রামবাজারের ট্রাম গাড়ী কাঁপিয়া উঠিতেছে। ট্রামে যে স্থানে তিলধারণে; চালকের ও কণ্ডাক্টরের আশে পাশে জায়গা ভরিয়া গিয়াছে, পা-দানিতে বাদুড় ঝুলিতেছে, ফলতঃ প্রথমই বা কি, দ্বিতীয়ই বা কি, উভয় শ্রেণীই আরোহীতে পরিপূর্ণ। প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় দুই বেঞ্চের মধ্যস্থ স্থানে যে সকল যুবক সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যে শালতরুর মত সরল ও উন্নত এবং যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ ও শক্তিমান বলিয়া বোধ হইতেছিল, সেইটীই যুবকদলের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব করিতেছিল, সকলে তাহার ইঙ্গিতেই জয়োল্লাসধ্বনি করিতেছিল। সেই সদা হাস্যানন কুমার যুবকটি মাঝে মাঝে "থ্রি চিয়ার্স ফর দি ইয়ং বলিজিয়ান ক্লাব" বলিয়া মাথার উপর হাত ঘুরাইয়া চীৎকার করিতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সঙ্গী যুবকেরা তিন বার "হিপ হিপ্ হুররে" বলিয়া গগন-মেদিনী কাঁপাইয়া তুলিতেছিল। সেই ভীষণ চীৎকারে ট্রামের নিরীহ আরোহী-গণের প্রাণ চমকিত হইয়া উঠিতেছিল। কেবল প্রথম শ্রেণীর প্রথম দুই বেঞ্চের সিটে উপবিষ্টা দুইটী প্রৌঢ়া মহিলা যুবকদিগের স্ফূর্ত্তি দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলেন; পূর্ব্ববর্ণিত যুবক অর্থাৎ যুবকদলের "কাপ্তেন" মহিলাদ্বয়কে উপবিষ্টা দেখিয়া এই স্থানে ভিড় করিতে দেয় নাই।

মহিলা দুইটীর দেশীয় খৃষ্টানের বেশ ছিল, বোধ হয় তাঁহারা হেদুয়ার পার্শ্বস্থ খৃষ্টান মহিলাবাসের উদ্দেশে যাইতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন অপরাকে মৃদুস্বরে বলিলেন, "ছেলেরা সব জায়গাতেই সমান। কি মধুর ওদের এই বয়েসটা!"

অপরাও মৃদুস্বরে জবাব দিলেন, "তা হবে না,—এখন ওরা পৃথিবীর সব জিনিষই আশার সোণালী চশমায় সুন্দর দেখছে, বড় হ'লে বা সংসারে ঢুকলে ওদের কি আর এই উৎসাহ থাকবে"

প্রথমা বলিলেন, "এমনে কদিনই বা ছেলে, ছেলে থাকে? ফুল ফুটতে না ফুটতেই ঘাড়ে সংসার চাপিয়ে দেওয়া হয়, ফুলের হাসিও শুকিয়ে যায়।"

এই সময়ে তাঁহাদের কথাস্রোতে বাধা পড়িল। কণ্ডাক্টার কর্কশকণ্ঠে টিকিটের দাম চাহিল। ছেলেরা ও অন্যান্য যাত্রীরা টিকিট কিনিল, কিন্তু মহিলা দুইটীর টিকিটের দাম চাহিবামাত্র উভয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দুইখানি টিকিট বাহির করিয়া দেখাইলেন এবং যে টাকা দিয়াছিলেন তাহার প্রাপ্য চেঞ্জ দিতে বলিলেন। কণ্ডাক্টরও আশ্চর্য্যান্বিতের ন্যায় ভাব দেখাইয়া টাকা লওয়ার কথা একেবারে অস্বীকার করিল। তখন এই কথা লইয়া ট্রামে একটা বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইল।

আমাদের পূর্ব্ব-বর্ণিত যুবকটী এতক্ষণ চুপ করি

এই কাণ্ডটী দেখিতেছিল। মহিলাদ্বয়ের সহিত কণ্ডাক্টরের বচসা একটু পাকিয়া উঠিলে পর সেই যুবকটী কণ্ডাক্টরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ওহে কণ্ডাক্টর, এঁদের চেঞ্জ ফিরিয়ে দাও। এঁরা নিশ্চিত টাকা দিয়েছেন, না হ'লে কি মিথ্যা বলছেন?"

কণ্ডাক্টর একটু চড়া মেজাজে বলিল, "আমিই কি মিথ্যা বলছি? টাকা পাইনি, চেঞ্জ দেবো কোথা থেকে?"

"তবে কি বলতে চাও এঁরা মিথ্যে বলছেন? স্পর্দ্ধা ত' তোমার কম না, যাও এখনি চেঞ্জ ফিরিয়ে দাও।"

"কি মশাই, আপনি যে একবারে ডারি লাট সাহেব হ'য়ে এসেছেন দেখছি, আপনার কথাতেই দিতে হবে নাকি?"

যুবকের মনে একটা ভয়ানক উত্তেজনা দেখা দিল, কিন্তু "কাপ্তেন" তাহাদিগকে হস্তসঙ্কেতে নিবৃত্ত করিয়া বলিল,—

"তোমার যেমন বিদ্যেবুদ্ধি সেই মতই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে শিখেছ। যাক্, আমি লাট সাহেব হই বা না হই, তা বলে এটা ঠিক জানি যে এই ভদ্রমহিলারা কখনও একটা টাকার জন্য মিথ্যা বলবেন না।"

প্রথমা মহিলাটী এই সময়ে যুবকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "না বাবা, তা কখনই ব'লব না। চেঞ্জ পরে দিচ্ছি, এখন কাছে নেই, এই ব'লে কণ্ডাক্টর টাকাটা নিয়েছিল।"

কণ্ডাক্টর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "কেন মশাই, আমরা ঘেটে খেতে এসেছি বলেই কি চোর দায়ে ধরা পড়েছি?"

যুবক বলিল, "না, তা বলছি না। তবে এক্ষেত্রে এঁদের কথা অবিশ্বাস করবার কোন কারণ দেখছি না। যা হ'ক, তোমার ক্যাশটা একবার মেলাও দেখি টিকিটের সঙ্গে। হয় ত' ভুলক্রমে টাকা দেওয়ার কথা মনে নাও থাকতে পারে।"

কণ্ডাক্টর উদ্ধতভাবে জবাব দিল, "কেন বল দেখি? ঐ করি আর কি? তোমার জন্যে ট্রাম লেট করাতে হবে না কি?"

যুবক এইবার ক্রুদ্ধ হইল। সে একটু উত্তেজিত-স্বরে বলিল, "তোমার ট্রাম লেট হ'ল বা না হ'ল তাতে বয়ে গেল। তা বলে এই ভদ্রমহিলাদের প্রাপ্য গণ্ডা না দিয়ে যেতে পারছ না।"

যুবক এই বলিয়া বন্ধুদের মধ্যে একজনকে ডাকিয়া বলিল, "সরোজ, ড্রাইভারের পাশে গিয়ে গাড়ীখানা থামা তো, দেখি কেমন চেঞ্জ না দিয়ে যায়।"

তখন ট্রামে একটা বিষম হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

যুবকের দল হৈ হৈ করিয়া চালকের উভয় পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল এবং গাড়ীর গতি রুদ্ধ করিয়া দিল। গাড়ী বন্ধ হওয়াতে আরও দুই তিন খানি গাড়ী পর পর দাঁড়াইয়া গেল। অপর লাইনেরও দুই চারি খানি গাড়ী গোলযোগ দেখিয়া থামিল, পথেও বিস্তর লোক জমায়েৎ হইল। ট্রাম কণ্ডাক্টর, ড্রাইভার ও ইন্‌স্পেক্টরের দল হল্লা করিয়া প্রথমোক্ত ট্রাম গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে লাল পাগড়ীও দর্শন দিল। একটা ভীষণ দাঙ্গার সূত্রপাত হইল।

এই সময়ে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল। যে বর্ষিয়সী মহিলা দুইটীকে লইয়া এত কাণ্ড, তাঁহারা রক্তারক্তির সম্ভাবনা দেখিয়া ভয়ে একবারে পাণ্ডু-বর্ণ হইয়া গেলেন, একজন কাঁদিয়াই ফেলিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অল্পবয়সী দাঁড়াইয়া উঠিয়া পূর্ব্বোক্ত যুবক "কাপ্তেনের" দুটী হাত ধরিয়া ভীতিবিহ্বলস্বরে অশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, তুমি কে তা জানি না, কিন্তু তুমি আমার ছেলের মত—"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না দিয়াই যুবক বিনীত স্বরে (তখন আর তাহার সে রুদ্রমূর্ত্তি নাই)

বলিল, "দেখুন বা, আপনি আমাকে অরুণকুমার ব'লে জানবেন।"

"হাঁ বাবা অরুণকুমার, আমি তোমায় ভুল বলে ছিলুম। এখন বোধ হচ্ছে কণ্ডাক্টর আমায় ঠেস দিয়েছিলই বটে। আর গোলযোগের দরকার নেই, আমরা এই খেনেই না'বব। তোমরা বাবা, আর ঝগড়া বিবাদ ক'র না, এই আমার অনুরোধ। মার অনুরোধ রাখবে না বাবা?" রমণী এই কথা বলিয়া এমন কাতরদৃষ্টিতে অরুণের দিকে চাহিলেন উহাতে যে, অরুণের মন গলিয়া গেল।

অরুণকুমার ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আপনাদের কোনও ভয় নেই, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।" অরুণ এই কথা বলিয়া সঙ্গীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ওরে সরোজ, যে ভ্রাইভারকে ছেড়ে দে, আর স্প্রিংস্তর বা, তুমিও কণ্ডাক্টরকে ছেড়ে দেও, ট্রাম চলুক।"

মহিলাদ্বয় কৃতজ্ঞনয়নে অরুণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষণ হউক, তুমি শান্তি লাভ কর বাবা।"

খৃষ্টান মহিলাদ্বয় নামিয়া গেলে পর ভিড় ভাঙ্গিয়া গেল, আবার ট্রাম চলিল। যুবকেরা আপনাআপনি কথা কহিতে লাগিল, তাহাদের সরল উদার উচ্চ হাস্যরোলে ট্রাম ভরিয়া গেল। কি সুন্দর এই চিন্তাশূন্য নির্ম্মল কলেজ-জীবনটা!

সরোজ নামে সম্বোধিত ফুটফুটে ছেলেটী হাসিতে হাসিতে বলিল, "দেখ, পণ্ডিতেরা বলেছেন, অপ্রিয় সত্য বলবে না, আর সময় বিশেষে মিথ্যা বলাতেও পাপ হয় না। তা কথাটি আজ খুব ফলে গেল।"

রমেশ বলিল, "কি রকম? আজ ফললো কি রকম?"

সরোজ তাহাকে ভেঙচাইয়া বলিল, "কি রকম? রকম আবার কি? এই সামান্য কথাটাও যদি না বুঝতে পারিস, ত' যা আবার ফিফ্‌থ্ ক্লাসে বেঞ্চী পণ্ডিতের কাছে পড়গে যা।"

অরুণ হাসিয়া বলিল, "আহাহা! চটিস কেন সরোজ? ওকে বুঝিয়েই দে না। তোর নয়, ত' আর সবাই কম্পিট ক'রে পাশ করে নি। এই দেখ না আমিও ত গণ্ডমূর্খ, আমাকেও বুঝিয়ে দেনা।"

সরোজ হঠাৎ গম্ভীর হইয়া ভালবাসাখানা কোমল চাহনিতে অরুণকুমারের পানে তাকাইয়া বলিল, "তুই গণ্ডমূর্খ? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তোর মত মূর্খ থেকেই জীবনটা কাটাতে পারি!" সরোজের কথা শুনিয়া আর সকলেই আনন্দ ও গর্ব্বভরে তাহাদের কাপ্তেনের মুখের দিকে তাকাইলে, কেবল রমেশ মুখ বাঁকাইল।

ব্যাপারটা একটু গম্ভীরভাব ধারণ করিল। আত্ম-প্রশংসা কর্ণে পশিবামাত্র অরুণকুমারের মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি বলিল, "নে, নে, এইখানে নামি আয়। কাপটা একবার তিনকড়ি বাবুকে দেখিয়ে যাবি নি?" যুবকের দল হল্লা করিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই? থ্রি চিয়ার্স ফর প্রোফেসার তিনকড়ি বাবু! হিপ হিপ হুররে" !!!

রমেশ মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "বাঃ বেশ ত'! এইখানে নামি, তার পর ক্লাব পর্য্যন্ত হাঁটা পাড়িটা দেবে কে? তোমার মত আর সবাই বণ্ডামার্ক নয়।"

রমেশ বকিয়া যাইতেছিল বটে, কিন্তু ছেলের দল তাহার বাক্যে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কাপ্তেনের মুখের কথা খসিবামাত্র "হিপ হিপ হুররে" রবে আবার গগন মেদিনী কাঁপাইয়া কুপবাপ করিয়া ট্রাম হইতে লাফাইয়া পড়িল; রমেশের অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুইটী যুবক তাহাকে ধরিয়া জোর করিয়া নামাইয়া লইল, ট্রাম চলিয়া গেল। রমেশ ফণীবীর্য্য সর্পের মত অন্তরে গজরাইতে গজরাইতে পাশায় পড়িয়া চলিল, আর অরুণকুমার অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গের সঙ্গে মহানন্দে জয়ধ্বনি করিতে করিতে ফুলের মালায় মোড়া খেলার লম্ব "প্রাইজ কাপটী" উচ্চে ধরিয়া লইয়া অধ্যাপক তিনকড়ি বাবুর বাসার অভিমুখে অগ্রসর হইল।

স্ত্রীজাতীয় পরিচ্ছেদ

ভাই-ভগিনী

"দুয়ো! ধরতে পারলে না!" একটী কামিনীর বাড়ের অন্তরাল হইতে কমনীয় বালক-কণ্ঠে এই কথা উচ্চারিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গের সুধা-ধারার মত সরল তরল শুভ্র হাসির রজতধারা ঝরিয়া পড়িল।

দেবকুমারের মত কমনীয়কান্তি বালকটী! তাহার সর্ব্ব অঙ্গে যেন "সাবলি" মড়াইয়া পড়িতেছে। গাঢ়কৃষ্ণগোলাপগুচ্ছের মত নিবিড়কুঞ্চিত কেশদাম নাচাইতে নাচাইতে সে যখন সারা বাগান ছুটা-ছুটি করিয়া এবং এ গাছের আশ্রয় হইতে ও গাছের আশ্রয়ে, এ ঝোপের আড়াল হইতে ও ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া পড়িয়া তাহার দিদিকে হায়রাণ করিয়া ফেলিল, তখন সে হো হো হাসিয়া হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "দুয়ো, দিদি দুয়ো!" কি সরল সুন্দর সে হাস!

যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বালক এই কথা বলিল, তাহার সেই বেচারা দিদি তখন বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে! ছুটাছুটি করা তাহার অভ্যাস থাকিলেও সে আজ বড়ই ক্লান্ত; ছুট বালকের পশ্চাতে দৌড়াইয়া তাহার শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। সে একটা বড় আমগাছের গায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "দু-ষ্টু, বই-দে-ব-লছি—" আর কথা সরিল না; বালিকা ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে লাগিল।

বালক অমিয়কুমার আবার উচ্চহাসির রোল তুলিয়া বলিল, "ও, দিলুম এই যে! আগে কি ছুবি দেখ্‌তে দিলে বল, না হ'লে বই দোবো না, হুঁ হুঁ!"

বালকের দিদি তাহাকে ছোট হাতের একটী ছোট কিল দেখাইয়া মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, না দিস না দিবি। আমিও তা হলে তোকে শনিবারে খুকু গার্ডেন দেখতে নিয়ে যাব না, কেঁদে গড়িয়ে পড়লেও না।"

বালক ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "ইস, নিয়ে যাবে না বৈ কি? আমি বাবার সঙ্গে যাব।"

"যাস দিকি কেমন দুষ্টু, আমি যেতে দিলে ত'? আমি গাড়ীতে তোকে নিলে ত'?"

ভ্রাতা-ভগিনীর এইরূপ মধুর খেলা ঝগড়া হইত না, এমন দিনই ছিল না। মাত্র আট মাসের শিশু অমিয়কুমারকে অনিলার কোলে দিয়া যখন তাহার গর্ভধারিণী তাঁহার স্বামীর ঘর আঁধার করিয়া কোন এক অজানা দেশে মহাপ্রস্থান করিলেন, তখন অনিলা নিজেই শিশু, পাঁচ বছরের ছুটফুটে মেয়েটী। আর আজ সেই মাতৃহারা শিশু ক্ষুদ্রা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কোলে পালিত পালিত হইয়া এগার বছরে পা দিয়াছে!

পালন পালন অর্থে ধাই বা চাকরাণীর তাড়া করা সেবা নহে, যথার্থ মায়ের মত আন্তরিক স্নেহ যত্ন। জগদীশ্বর স্ত্রীজাতিকে কি এক উপাদানে গঠিত করিয়াছেন, তাই তাহাদের অন্তঃকরণটা স্বভাবতঃই স্নেহপ্রবণ, কোমল; বিশেষতঃ অসহায় অনাথের প্রতি তাহাদের স্নেহ-উৎস স্বতঃই সহস্রধারে উৎসারিত হইয়া উঠে। ভগবানের অপার মহিমায় অতি ক্ষুদ্র স্ত্রী-শিশুর হৃদয়েও এই অতুলনীয় মাতৃস্নেহ আপনিই দেখা দেয়; অতঃই ইহার উন্মেষ, অনুশীলনে ইহার বিকাশ ও বিস্তৃতি। ক্ষুদ্র অনিলার ক্ষুদ্র শিশু-হৃদয়ে শৈশব হইতেই তাই এই মাতৃহারা ছোট ভাইটীকে অবলম্বন করিয়া মাতৃস্নেহের উন্মেষ ও বিকাশ হইয়াছিল।

অবশ্য নিজের হাতে অনিলার কিছুই করিবার আবশ্যক ছিল না, কেন না তাহার ধনবান পিতার গৃহে কিছুরই অভাব ছিল না। ঐশ্বর্য্য সম্পদের যাহা আবশ্যকীয়, তাহা অবসর-প্রাপ্ত সিবিলিয়ান রায়বাহাদুর রামসদয় ঘোষ, সি আই ই মহাশয়ের ঘরে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মজুত ছিল। অগণিত দাসদাসী, প্রয়োজনের অতিরিক্ত যানবাহন, রাজ-প্রাসাদতুল্য বাসিগৃহের আবাসভবন, সিন্দুক ভরা

কোম্পানীর কাগজ, সাত আট খানি ভাড়াটে বাড়ী, ফল কথা আজিকালিকার কালে যাহাকে ভাগ্যবান পুরুষ বলে, অনিলার পিতাতে তাহা। সকল বিষয়েই বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং সকল কাজ অনিলাকে নিজের হাতে কখনও করিতে হইত না বটে, তথাপি তাহার পিতার বিপুল সংসারের যে কার্য্যে তাহার মঙ্গল হস্তস্পর্শ না হইত অথবা লক্ষ্মীর দৃষ্টি না পড়িত, সে কার্য্য সুচারুরূপে বা সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহিত হইত না বলিয়া মনে হইত। সেই কচি বয়স হইতেই যে সে তাহার "গৃহ-হীন" পিতার গৃহে গৃহিণী হইয়াছিল, বিশেষতঃ তাহার ছোট ভাইটীর তত্ত্বাবধানকার্য্যে সে যে যথার্থই তাহার জননীর স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ ছিল না। তাহার অধীনে বেতনভুক বিস্তর দাস দাসী ছিল বটে, কিন্তু আত্মীয়স্বজন ছিল না বলিলেই হয়।

আজ প্রাতে বাগানের এক লতাবিতানের মধ্যস্থ প্রস্তরাসনে বসিয়া যখন অনিলা একমনে একখানি ছবি দেখিতেছিল, তখন অমিয়কুমার চুপি চুপি আসিয়া সেই ছবিখানি দেখিবার চেষ্টা করিলে অনিলা সেখানি বুকের মাঝে লুকাইয়া ফেলিল; অমিয়র মুখ চোখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, যেন সে কতই অপরাধ করিয়াছে! অমিয় দিদির সহিত ধস্তাধস্তি করিয়া যখন কিছুতেই ছবিখানি হস্তগত করিতে পারিল না, তখন সে এক উপায়ে দিদিকে অন্য দিকে মনস্থ করিল। দিদির কোলের উপর একখানি খোলা বই পড়িয়াছিল; ধস্তাধস্তিতে সেই বইখানি ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছিল। দুষ্ট অমিয় বইখানা লইয়া চম্পট দিল, অনিলাও তাহার পিছু পিছু ছুটিল। তখন ভাই-ভগিনীতে সারা বাগানে ছুটাছুটির পালা চলিল। যখন অনিলা পরাস্ত হইয়া এক বৃক্ষে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল এবং বই ফিরাইয়া দিবার নিমিত্ত তাহাকে কাকুতি-মিনতি ও তত্ত্ব প্রদর্শন করিল, তখন দুষ্ট অমিয় মিটি-মিটি হাসিয়া বলিল যে, ছবিখানা তাহাকে একবার দেখাইলেই সে এখনই বই ফিরাইয়া দিবে। তাহার পর অনিলা যখন আপিসপুরের বাগানে লইয়া যাইবে না বলিয়া ভয় দেখাইল, তখন অমিয় বলিল, "না নিয়ে গেলে ত কলাটী, আমি কাপ্তেন দাদার সঙ্গে যাব। আমি যখন যা বলব কাপ্তেন দাদা তখনই তাই করবে, জান ত।"

অনিলা এ কথার জবাব দিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে দেখিল, কিছুদূরে একটা ঝোপের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একটী মনুষ্যমূর্ত্তি তাহার দিকে অনিমেষনয়নে তাকাইয়া আছে। সে লোকটী অপর কেহ নহে, আমাদের পূর্ব্বপরিচিত অরুণকুমারের বন্ধু সরোজনাথ এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সরোজনাথ বাগানে অমিয়কে খুঁজিতে আসিয়া চারিদিক ঘুরিয়া শেষে যে অবস্থায় তাঁহাকে ও তাহার দিদিকে দেখিল, তাহাতে তাহার দিদির উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইবার আর তাহার সামর্থ্য রহিল না। সে সেই স্থানেই দাঁড়াইল এবং বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে পলকহীন দৃষ্টিতে সেই মূর্ত্তিমতী সুবর্ণপ্রতিমার পানে চাহিয়া রহিল।

এই সরোজনাথ কতদিন অনিলাকে দেখিয়াছে। সরোজনাথের পিতা ৺ বৈদ্যনাথ মিত্র, রায় বাহাদুর রামনরেশের বাল্যবন্ধু ও স্বগ্রামবাসী ছিলেন। বাল্যে সরোজনাথ পিতৃ-মাতৃহীন হইয়াছিল। ধনবান রাম-নরেশ বাবু যখন কলিকাতায় বসিয়া শুনিলেন যে, দেশে বৈদ্যনাথের অনাথ বালক অন্নাভাবে এবং যত্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে, তখন তিনি তাহাকে তাঁহার কলিকাতার বাসায় আনাইলেন। সরোজের জ্ঞাতিবর্গ প্রথমে তাঁহার হাতে বিলাত-ফেরত সিবি-লিয়ানের ঘরে সরোজনাথকে পাঠাইতে সম্মত হয় নাই। কিন্তু টাকার লোভ বড় লোভ। বোধ হয় ধনবান সিবিলিয়ানের নিকট মোচড় দিয়া তাঁহাদের অর্থ আদায়ের অভিসন্ধি ছিল; বিশেষতঃ একটা মল-গ্রহ পোষণের ভার হইতে অব্যাহতি পাওয়াও তাঁহা-

ছের একটী কন্যা নাই ছিল না। ফলে সরোজনাথ বাল্য হইতেই রামসদয় বাবুর গৃহে অত্যন্ত যত্নের সহিত লালিত পালিত হইতে লাগিল। সরোজের প্রতি স্নেহের অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রথমতঃ সরোজনাথ বন্ধু পুত্র; দ্বিতীয়তঃ রামসদয় বাবুর দুইটী শিশুর অকাল মৃত্যু হওয়াতে কর্ত্তা গৃহিণী নিঃসন্তান ছিলেন; তৃতীয়তঃ সরোজনাথ কমনীয়-কান্তি ছিল; চতুর্থতঃ সরোজনাথ অতি মধুরস্বভাব সুশীল শান্ত বালক ছিল; পরন্তু তাহার ন্যায় তীক্ষ্ণ মেধাবী বালক সচরাচর দেখা যাইত না। সুতরাং এত গুণ বিদ্যমানে সরোজনাথ যে তাঁহাদের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সরোজনাথ ধনবানের পুত্রের ন্যায় লালিত পালিত হইতে লাগিল। তাহার জন্য স্বতন্ত্র দাসদাসী, প্রাইভেট টিউটার, ফুল যাতায়াতের গাড়ীঘোড়া ইত্যাদি নিযুক্ত হইল। রামসদয় বাবু যখন যেখানে কর্ম্ম করিতেন, সরোজনাথকে প্রথম প্রথম সেখানে পরিবারের সঙ্গে লইয়া যাইতেন। কিন্তু সরোজ লেখাপড়া আরম্ভ করিলে তিনি পরিবারবর্গকে তাঁহার ভবানীপুরের বন্ধু কালীশঙ্করের হেফাজতে কলিকাতায় রাখিয়া দিতেন; সরোজ কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করিত। নানাস্থানে কোর্ট জরিপতি করিবার পর যখন তিনি হাইকোর্টের জজ হইলেন,তখন কলিকাতায় স্থিতস্থিত হইলেন। বালিগঞ্জে জমি কিনিয়া মনের মত অট্টালিকা বাগান ও পুষ্করিণী প্রস্তুত করাইলেন। তখন তাঁহার কন্যা অনিলা দশ বৎসরের ও পুত্র অমিয়কুমার পাঁচ বৎসরের হইয়াছে। আপনাদের পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া তাঁহাদের সরোজনাথের প্রতি স্নেহের কখনও হ্রাস হয় নাই। সরোজ নাথ লেখাপড়ায় চিরদিনই বুদ্ধিমান ছিল। সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিল। তাহার পর সে এফ, এ, ও বি, এ, পরীক্ষাতেও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিল। তাহার এই কৃতিত্বে রামসদয় বাবুর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সেবার সরোজনাথ প্রবেশিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, সেবার যমেশচন্দ্র দে নামক একটী দরিদ্র কায়স্থ-সন্তান তাহার সঙ্গে পরীক্ষায় পাশ হইল। সে সরোজনাথের সহিত এক ক্লাসে পড়িত, তাহার সহিত রামসদয়বাবুর জানাশুনা ছিল। রামসদয় বাবু যমেশকে স্বীয় পুত্রকন্যার প্রাইভেট টিউটর নিযুক্ত করিলেন। সে আজ চারি বৎসরের কথা। তৎপূর্ব্বে তাঁহার পুত্রকন্যার শিক্ষার ভার সরোজনাথ কাহাকেও লইতে দেয় নাই। কিন্তু যখন সরোজনাথ প্রবেশিকা পাশ করিল, তখন রামসদয় বাবু তাহার কালেজের পড়ার ক্ষতি হইবে বলিয়া কিছুতেই সময় নষ্ট করিতে দিলেন না। তাই "রামসদনে" (রায় বাহাদুর রামসদয়ের গৃহে) যমেশের চাকুরী হইল। যমেশ তদবধি তাঁহার পুত্রকন্যার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিল। পরন্তু রামসদয় বাবু পুত্রকন্যার ইংরেজী বলা কহা ও আদবকায়দা শিখিবার নিমিত্ত মাসিক একশত টাকা বেতনে মিস ব্রুক নাম্নী এক উচ্চশিক্ষিতা ইংরেজ-মহিলাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেতার ও বীণ শিখাইবার জন্য অনিলার একজন গুণী ওস্তাদও নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া সরোজ যাহার কাছে দিনে অন্ততঃ একবার পড়িতে না বসিলে অনিলার বা অমিয়কুমারের পড়া মুখস্থ হইত না।

এ হেন সরোজকুমার যে অনিলাকে অহরহ দেখিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? তাহারা দুজনে ভাই-বোনের মত ছেলেবেলা হইতে লালিত পালিত হইয়াছে, কাজেই ভাই বোনের মত তাহাদের ব্যবহার, ভাই বোনের মত তাহাদের মাখামাখি। কিন্তু আজ হঠাৎ সরোজের মনে একটা নূতন ভাবের উদয় হইল; এ ভাবটা কি তাহা সে নিজেও ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। সে যখন দূর হইতে আস্তা আস্তা বিস্রস্তকুন্তলা অনিলাকে দেখিল, তখন কি জানি কেন তাহার মাথাটা ঘুরিয়া গেল।

কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলটা বড়ই ভীষণ, এই বয়সে নারীর সৌন্দর্য্য অতুলনীয়, মুনিমনোহর। এমনেই অনিলা ভুবনমোহিনী, তাহার উপর নবীন যৌবনোদ্গমে বর্ষাবারিস্ফীতা সুন্দরী তটিনীর মত তাহার সারা অঙ্গে অপরূপ রূপ লহরী খেলিয়া বেড়াইতেছে। ছুটাছুটি করিয়া তাহার কমলদল তুল্য গোলাপী গণ্ড আরও আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে, সর্পশিশুর মত কুণ্ডলীকৃত অলকগুচ্ছ চোখে মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, মুখখানি তাহার মধ্য দিয়া মেঘে ঢাকা চাঁদের মত দেখাইতেছে। সরোজকুমার মুগ্ধনেত্রে দেখিল, তাহার সর্ব্ব অঙ্গ দিয়া যেন স্বর্গের লাবণ্য গড়াইয়া পড়িতেছে! কতক্ষণ তাহার মনে এই বিকার উপস্থিত হইয়াছে, কতক্ষণ সে এমনই ভাবে মুগ্ধ হইয়া অনিলাকে দেখিতেছে, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই। যখন অমিয়কুমার দৌড়িয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া নাড়া দিয়া ডাক দিল, তখন সে স্বপ্নরাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিল।

"দেখ না সরোজ দা, দিদি দুষ্টু আমায় আলিপুরের বাগানে নিয়ে যাবে না বল্‌ছে। তুমি বল না সরোজ দা."—বালক অমিয় প্রথমেই এই নালিশ উপস্থিত করিল।

তাহার "দুষ্টু" দিদিও সরল শিশুর মত ছুটিয়া আসিয়া সরোজ দাদার অপর হস্ত ধারণ করিয়া বলিল, "না, সরোজ দা, অমি দুষ্টু নই, ও আমার বই কেড়ে নিয়ে পালিয়েছে। ওকে বক না,সরোজদা, ওর হাত থেকে বইখানা কেড়ে দাও না, সরোজদা।"

সরোজনাথ কোনও কথা বলিবে কি, তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া একটা তড়িৎপ্রবাহ বহিয়া গেল। এমন ত' কতবার অনিলার করের সহিত তাহার করস্পর্শ হইয়াছে, কিন্তু এমন ভাব ত' কখনও তাহার মনে হয় নাই! আজ অনিলার করস্পর্শে তাহার সুপ্ত মনোভাব জাগিয়া উঠিল কেন? আজ যে চক্ষে সে অনিলাকে দেখিতেছে, সে চক্ষে ত' সে কখনও তাহাকে দেখে নাই। এতদিন সে ত' অনিলাকে অন্তরের অগাধ অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহ বিলাইয়া আসিয়াছে, আজ ত' তাহার মন অনিলাকে সেই পবিত্র ভাবের ভালবাসা দিতে চাহিতেছে না। আজ যে ভাবের ভালবাসা হইতে বহুগুণ অধিক ভালবাসায় তাহার মন অনিলাকে আপনার করিয়া লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে! পথের ভিখারী সে, তাহার এই রাজভোগের স্বপ্ন কেন?

"বা সরোজ দা, বেশ চুপটী করে দাঁড়িয়ে রইলে যে? অমির কিনা, তাই কিছু বলা হ'ল না। আচ্ছা যাও, আমি তোমার সঙ্গে কথা ক'ব না।" অভিমানিনী অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

অনিলার অনুযোগে সরোজনাথের দিবা-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সে তখন প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। সে হাসিয়া বলিল, "এই পাগলী খেপ্‌লো! কি হয়েছে আগে সবটা শুনি, তবে ত' বিচার ক'রব."

তখন অনিলা ও অমিয় আপন আপন পক্ষের কথা এক সঙ্গেই বলিয়া যাইতে লাগিল। কথার পিঠে কথা পড়িতে লাগিল, কাজেই সে কথার বিশ্লেষণ বুঝে কাহার সাধ্য? সরোজনাথ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "হাঁ হাঁ, সব বুঝেছি, এখন চল দিকি, আজ কি আর পড়তে শুনতে হবে না? এতটা বেলা হ'ল, রমেশ এসে কতক্ষণ বসে রয়েছে। শুনলুম কাল বিকেলেও দিদ ক্রক এসে এমনই ফিরে গেছেন। কেন, তোমাদের পড়াশুনোর আজকাল এত ঢা-ঢিলি কেন?"

কৃত্রিম কোপের সহিত অনিলা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "বারে, যত দোষ আমাদের বেলা! আর মশাই যে কাল বিকেল থেকে ফুটবলে যেতে রাত্তির দশটার ভেতর বাড়ী এলেন না,—"

এই সময়ে অমিয়কুমার তাহার কথায় বাধা দিয়া মহান্ আগ্রহের সহিত বলিয়া উঠিল, "হাঁ সরোজ দা,

কাল খেলায় কি হ'ল? তোমরা 'কাপ' পেয়েছ? 'কাপ্তেন দাদা' কটা গোল দিলে? বল না, সরোজ দা।"

শিশুর সরল প্রশ্নের ভঙ্গিতে সরোজনাথ মহান্ আনন্দ উপভোগ করিল বটে, কিন্তু কি জানি কেন, অনিলা তাহার হর্ষোৎফুল্ল মুখখানি নামাইয়া লইয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিল এবং একটা সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপ কুঁড়ি ছিঁড়িয়া লইয়া নখে খুঁটিতে লাগিল। সরোজনাথের দিকে লক্ষ্য ছিল না। ফুটবল ও "কাপ্তেন দাদার" কথা উঠিবামাত্র সরোজনাথের মুখখানা যেন প্রভাতের শিশিরসিক্ত গোলাপের মত হাসিয়া উঠিল, সে যেন শতমুখ হইয়া ফুটবল খেলার ও 'কাপ্তেন দাদার' কেরামতির কথা কহিতে লাগিল, "আরে কাল ত' ভাই আসতে রাত হ'ল। কাপ নিতে ক্লাবে রাত দশটা পর্য্যন্ত কত আমোদ হ'ল। ক্লাব কি এখানে? কোথায় বালিগঞ্জ, আর কোথায় নেবুবাগান?"

বালক অমিয় অধিকতর আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "বল না, সরোজ দা, কাপ্তেন দাদা কেমন খেল্‌লে।"

সরোজনাথ অত্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিতে লাগিল, "ওঃ সে কি খেলা! তুই ত' দেখলি নে। অরুণটা যেন একলা একশ' হয়ে খেলতে লাগ্‌লো। আমাদের ত' হার হয়েছিলই, শেষেই মিড্‌লসেক্স দুটো গোল দিলে। তাগ্যে অরুণ ব্যাক থেকে ফরওয়ার্ডে গেল। কি খেলাই খেল্‌লে,—একলা 'ড্রিব্‌ল্' ক'রে তিন তিনটে গোল দিলে! সাহেবরাও হাততালি দিতে লাগ্‌লো। সকলে বল্‌ছে, পুরাণো ডেল্‌হাউসির লিন্‌জে ছাড়া এমন খেলা কেউ দেখাতে পারে নি।"

বলিতে বলিতে আনন্দে গর্ব্বে সরোজনাথের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল। অমিয় হর্ষে হাততালি দিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "থ্রি চিয়ার্স ফর কাপ্তেন দাদা, হিপ হিপ হুররে!" অনিলা কোনও কথা না বলিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল; কিন্তু কেহ যদি তখন তাহার মুখখানি লুকাইয়া দেখিত তাহা হইলে সে স্পষ্টই বুঝিত যে, অনিলার মুখেচোখে দুরন্ত আহ্লাদ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। প্রকাশ্যে অনিলা বলিল, "ওঃ বড্ড বাহাদুরিই সব হয়েছে, যেন রঘু দিগ্বিজয় ক'রে ঘরে ফিরে এলেন আর কি!"

সরোজ হাসিয়া বলিল, "অনিলার ঐ কেমন এক রোগ, অন্যের একটু সুখ্যাতি করবার যো নেই। তা এতে মাষ্টারটীও ছাড়ী হতে কম যান না। মাষ্টারের কাছে এই বিদ্যেটীও শেখা হচ্ছে বুঝি?"

অমিয় বলিল "কে মাষ্টার মশাই? হাঁ, ঠিক বলেছ সরোজ দা। সেদিন আমাদের পড়াতে পড়াতে কাপ্তেনদার কত দোষের কথা বল্‌লেন। দিদি চুপ করতে বল্‌লে ব'লে তবে অন্য কথা পাড়লেন।"

অনিলা একটু ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, "এ্যাঁ অমি, মাষ্টার মহাশয়ের অসাক্ষাতে তাঁর নিন্দে করছ? এই বুঝি শিখছ?"

"আমি বুঝি নিন্দে করছি, আমি ত' যা হয়েছিল তাই বলছি। সত্যি কথা বল্‌লে বুঝি নিন্দে করা হ'ল?"

"না, সত্যি কথা বলায় নিন্দে হয় না। তবে সত্যি কথাটা যার সম্বন্ধে বল্‌ছ, তার সাক্ষাতে বল্‌লেই ঠিক হয়।"

সরোজনাথ অবাক হইয়া বালক-বালিকার উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিতেছিল। সবটা শুনিয়া অনিলার প্রতি শ্রদ্ধায় তাহার অন্তর পূর্ণ হইয়া গেল, তাহার হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন ভালবাসা শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু সে সেইভাব গোপন করিয়া বলিল, "যাক্, ওসব কথা পরে হবে, এখন চল, পড়বে চল। এত বেলা হ'ল, পড়তে যাওনি শুনে কাকাবাবু রাগ করবেন।" সরোজ প্রতিপালক রামসদয় বাবুকে কাকাবাবু বলিয়া সম্বোধন করিত।

বাটীর দিকে যাইতে যাইতে অনিলা বলিল,

"আর বাবা বুঝি তোমার উপর রাগ করবেন না? কাল যে বাবা ব'লে দিয়েছিলেন, 'ম্যাচ' খেলে সব এই খে'নে এসে আমোদ আহ্লাদ ক'রবে, তা তোমরা এলে না কেন?"

সরোজ বলিল, "বাঃ তা কি করে হবে? আমি ত কালই বলে গিয়েছিলুম, ক্লাব রাজী হবে না। কাল তাইত' আমরা সব দল বেঁধে নেবুবাগানে ক্লাবে গিয়েছিলুম। আমাদের ক্লাবের নিয়ম, কাপ জিতলে আগে ক্লাব ঘরে কাপ নিয়ে গিয়ে পুজো না দিয়ে কোথাও কাপ নিয়ে যেতে পাবো না।"

বালক অমিয় এই সময়ে বলিয়া উঠিল, "হাঁ সরোজ দা, কাপ্তেন দাদা কখন আসবে? আমি শনিবারে কাপ্তেনদার সঙ্গে আলিপুরের বাগানে যাব, দিদি আমায় নিয়ে যাবে না বলছে।"

সরোজ হাসিয়া বলিল, "বোকা ছেলে কোথাকার! আমরা সবাই যাব, তোকে কি আর না নিয়ে যাব? ও তোকে ভয় দেখাচ্ছে তোর দিদি।"

অমিয় নাছোড়বান্দা, বলিল, "না গো না, সত্যি নিয়ে যাবে না, ওর বই কেড়ে নিয়েছি কিনা।"

সরোজ, "কেন, বই কেড়ে নিলি কেন? দিদিকে ভয় করিস না?"

অমিয়, "বারে, তাই বুঝি! ও কেন আমায় লুকিয়ে ছবি দেখছিল?"

সরোজ, "ছবি? কিসের ছবি?"

অনিলার মুখ শুকাইল, কি জানি কেন তাহার হাতখানি অতি সন্তর্পণে বুকের মাঝে লুক্কায়িত ছবির প্রতি প্রসারিত হইল; সে দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল। সরোজনাথ অমিয়কুমারের হাত ধরিয়া তাহার পশ্চাদনুসরণ করিতে করিতে হাসিয়া বলিল, "তাতে কি হয়েছে, আমি অমি তোকে কত ছবি এনে দেবো এখন। দিদি নাই বা দিলে, বয়ে গেল।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আলালের ঘরের দুলাল

দুইটী খানসামা পা টিপিয়া অতি সন্তর্পণে দ্বিতলস্থ শয়নকক্ষের দ্বার সান্নিধ্যে একবার অগ্রসর হইতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ সেই ভাবেই যে দিক দিয়া আসিয়াছিল সেই দিকেই অতি সন্তর্পণে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। তাহাদের এই কেতা-মাফিক অগ্রগমন ও পশ্চাদাবর্ত্তন কার্য্য যেন রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের মতই অনুষ্ঠিত হইতেছিল।

দুই তিন বার এইরূপ গতায়াতের পর যখন তাহারা দালান ছাড়িয়া উন্মুক্ত ছাদে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহাদের মধ্যে চুপি চুপি কথা চলিল: যে বয়োকনিষ্ঠ সে বলিল, "হাক্ গে, কি করি এখন বল দেখি? দাদাবাবুকে তুলতে পারবো না, বাবা। কি জানি, ঘুম ভাঙ্গালে যদি সে দিনকার মত ঘাড়টা ধরে এই তে-তালার আলসের বাইরে ঝুলিয়ে ধরে!"

বয়োজ্যেষ্ঠ খানসামা হারাধন বলিল, "তবে কি করবি? নীচে গিয়ে কর্ত্তাবাবুকে জবাব দিবি কি?"

কনিষ্ঠ বলিল, "বলব, ডাকাডাকিতে দাদাবাবুর ঘুম ভাঙ্গলো না, আর কি?"

হারাধন মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "তোর যেমন বুদ্ধি, গঙ্গা! কায়েত হ'লে হবে কি, সাধে কি বলে ছোঁড়ার বুদ্ধি! এখনও গোঁফ ভাঙ্গেনি। কর্ত্তাবাবুকে ঐ কথা বল, আর চাকরিটা যাক্! এমন সুখের জায়গা আর পাবি কোথায়?"

গঙ্গা বলিল, "তবে কি করি বল দেখি?"

হারাধন বলিল, "তার চেয়ে দাদাবাবুকে তোল। দাদাবাবু আর কি করবে? বড় জোর না হয় একটু আধটু অন্তর-টপুনি দেবে, না হয় একটু ভয় দেখাবে, কিন্তু তার পর বকশিসের কথাটা মনে ভাব দেখি। ঘঁ, ঘঁ, এক গাল হেসে ফেল্‌লি যে!"

গঙ্গা হাসিতে হাসিতে বলিল, "যা বলিছিস্ ভাই, এমন মনিব কারুর কখনও হবে না। সেদিন

আলুসের ধারে ঝুলিয়ে ধরবার পরে কত দিয়েছিল জানিস ?"

হারাধন, "না, কত ? দু টাকা ?"

গঙ্গা, "দু টাকা ! আরে দুটাকা ত' মাথার টাই খোলেই পাই। সে দিন দশ টাকা পেয়েছিলুম জানিস ।"

হারাধন, "মাইরি, তোর কি বরাত, গঙ্গা ! কত্তাবাবুও দেয় বটে, কিন্তু এমনধারা দিল-দরিয়া না—"

গঙ্গা ত্রস্তভাবে বলিল, "চুপ, চুপ, দাদাবাবুর গলার আওয়াজ পাচ্ছি, বোধ হয় আড়ামোড়া ভাঙছে। তুই দাঁড়া, আমি ডাকি গে ।"

হারাধন সরিয়া পড়িল, গঙ্গা আবার শয়নকক্ষের দ্বার অভিমুখে অগ্রসর হইল। দ্বার-সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া যখন সে শুনিল তাহার প্রভু নিদ্রাভঙ্গের পর আলস্য ত্যাগ করিতেছে, তখন সে ভরসা পাইয়া ডাকিল, 'দাদাবাবু, দাদাবাবু !'

ভিতর হইতে জবাব আসিল, "কে রে ?"

গঙ্গা ভয়ে ভয়ে বলিল, "আজ্ঞে,আমি গঙ্গা ।"

"গঙ্গা ? এত ভোরে কেন রে ?"

"তোর কি দাদাবাবু ? চারিদিক রোদে কুরুক্ষেত্র হয়ে উঠ্‌লো, এখনও তোর ? কত্তাবাবু এর মধ্যে ঘুরে এলেন, তোমারে কতবার ডেকেছেন !"

খটাস্ করিয়া দ্বার খুলিয়া গেল, চোখ মুছিতে মুছিতে একটী যুবক দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই যুবক আর কেহ নহে, আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত ফুটবলের কাপ্তেন অরুণকুমার। বাতায়ন-পথে সূর্য্যকিরণ আসিয়া ঘরে খেলা করিতেছে, চারিদিক বস্তুতঃই সূর্য্যকিরণে হাসিতেছে, অথচ অরুণকুমারের বিস্মিত দৃষ্টিতে যেন অকালে শর্ব্বরী প্রভাত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। অরুণকুমার একবার ছাদে আসিয়া, একবার কক্ষমধ্যে বাতায়ন-পথ দিয়া, সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত বহির্জ্জগৎ দেখিয়া লইল। সৃষ্টি কি স্বপ্নময় ! অরুণকুমারের নবীন হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ সুযোগের হয় না কেন !

বৃহৎ মেহগিনি কাঠের ড্রেসিং-টেবিলের মাথার উপর সুদৃশ্য ইংলিশ ক্লক টিক্‌টিক্ বাজিতেছিল। অরুণকুমার ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল বেলা প্রায় ন' দশটা ! আঃ সর্ব্বনাশ ! এত বেলা হইয়া গিয়াছে ! কিন্তু ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? এখন ত' অনেক দিনই হয়। তবে আর কর্ত্তা ডাকিয়াছেন এই যা। তাতেই বা কি ? এ দুনিয়ায় অরুণকুমারের সুখময় জীবনের একটানা স্রোতে বাধা দিবার ত' কেহই নাই। অরুণের অভাব নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, লক্ষ্য নাই, উদ্দেশ্য নাই ; কেমন বাধাহীন, প্রতিবন্ধকহীন, নিরবচ্ছিন্ন জীবন প্রবাহ !

অরুণকুমার পেয়ারের খানসামাকে ডাকিয়া বলিল, "গঙ্গা ! বাবুকে বল্‌গে যা, আমি এখনই যাচ্ছি। বাবার কাছে আর কেউ আছে দেখে এসেছিস ?"

গঙ্গা তাহার আরাধ্য প্রভুর বাথরুমে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রাতঃকৃত্যের যোগাড় করিয়া দিতেছিল, তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিল, "আজ্ঞে, বালিগঞ্জের বুড়ো বাবু এসেছিলেন, তিনি চলে গেছেন ।"

অরুণকুমার এতক্ষণ অন্যমনস্কভাবে বৃহৎ দর্পণে প্রতিফলিত আপনার দেহের প্রতিবিম্ব দেখিতেছিল। গঙ্গার এই কথাটি শুনিয়া চমকিত হইয়া তাহার দিকে ফিরিয়া সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসিল, "কে বালিগঞ্জের বড় কাকা ? তিনি এত সকালে এসেছিলেন কেন ? যাক্, তুই যা। আর দেখ, ওস্তাগ্‌নী এসেছিল কি ? ফিরিয়ে দিয়েছিস্ বোধ হয় ?"

গঙ্গা বলিল, "না দাদাবাবু, আমি ফিরিয়ে দিই নি। তিনি আপনিই বেলা হ'ল ব'লে চলে গেছে। বলে গেছে, যদি বিকেলে দরকার হয়, খবর দেবে।"

অরুণ বাথরুমে প্রবেশ করিয়া মুখ চোখ প্রক্ষালন

করিতে করিতে বলিল, "না, খবর দেওয়ার দরকার নেই। আজ আর কুন্তি ক'রব না তাতেই ক'রব।"

গঙ্গা কর্ত্তাবাবুর বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কর্ত্তাবাবুর মুখখানি বর্ষার বারিভরা মেঘের মত আঁধার ও গম্ভীর, কর্ত্তাবাবু আসনে না বসিয়া ঘরে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতেছেন। দেখিয়াই তবে গঙ্গার প্রাণ উড়িয়া গেল, সে কর্ত্তার এমনধারা ভাব অতি অল্প দিনই দেখিয়াছে।

গঙ্গাকে দেখিয়া কর্ত্তাবাবু একটু রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "কিরে বেটা নবাবপুত্তুর, এতক্ষণে বার হ'ল বুঝি। যেমন বাবু তেমনই চাকর জুটেছে!" পুত্রের উপর ক্রোধটা পুত্রের খানসামার উপরে নিপতিত হইল। বেচারা গঙ্গা তাঁহার ঘূর্ণায়মান আরক্ত চক্ষু দেখিয়া চোখ নামাইয়া লইল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আজ্ঞে, দাদাবাবু এই এলেন ব'লে।" গঙ্গা এই কথা কয়টী বলিতে বলিতেই ছুট দিল।

বকুলবাগানের প্রসিদ্ধ পাটের মহাজন ক্রোড়পতি ধনী কালীশঙ্কর দত্তের মেজাজের কথা কৈ না জানে? শুধু কি পাটের মহাজন? কালীশঙ্করবাবুর আসামে চা-বাগান ছিল। তিনি আসামে এক কাঠের কারবারের অংশীদারও হইয়াছেন। কালীশঙ্করবাবু স্বনামধন্য পুরুষ। অতি সামান্য পয়সা হইতে নিজের কৃতিত্বের ফলে (অবশ্য ভগবানের দয়ায় কি না, তাহা এখনকার ভাগ্যবান পুরুষরা বড় একটা মানিতে চাহেন না) তিনি আজ ক্রোড়-পতি। তাঁহার পিতা কল্যাণপুরের শিবশঙ্কর দত্ত বনেদী বড় ঘরের ছেলে হইলেও দরিদ্র ছিলেন; কিন্তু তিনি ভাগ্যান্বেষণে কলিকাতায় আসিয়া কালেক্টারীতে এক কাজ জুটাইয়া লইয়াছিলেন। চাকুরী করিয়া তাঁহার চাকুরীতে ঘৃণা জন্মিয়াছিল, তাই পুত্র সসম্মানে বি, এ, পাশ করিবার পর তিনি তাহাকে এক বড় সাহেব দালালের কাছে পাটের কাজ শিখিতে দিয়াছিলেন। তাঁহার দেশের লোকে নাসিকা কুঞ্চিত করিল বটে, কিন্তু তিনি তাহাতে বিচলিত হইলেন না। তাঁহার দারিদ্র্যের দিনে দেশের লোক তাঁহাকে দেখেন নাই, আজ তাঁহার পুত্র দালালি শিখিতে যাইতেছে বলিয়া তাঁহারা উপদেশের ছলে তিরস্কার করিতে আসেন কেন? তিনি যে কত সই সুপারিস করিয়া,তাঁহার মনিব কালেক্টর সাহেবের চিঠি লইয়া ছেলের এই কাজটী যোগাড় করিয়া-ছিলেন, তাহা তাহারা কি জানে? দেশের লোকের বুলি হইল, "ছেলে এত লেখাপড়া শিখিল, বিদ্বান হইল, কোথায় লাঠ ঘণ্ডরে বড় কেরাণী হইবে, না দালালি? দালালি ত' ছোট লোকে করে। ও দোকানদার মুদী আর দালাল একই ঘরের লোক।" তাহার পর তিনি তাঁর বড় আদরের কালীশঙ্করকে মানুষ হইতে দেখিলেন, কালীশঙ্করের ঘরের গাড়ী চড়িয়া নিত্য গঙ্গাস্নান করিবার সুযোগ পাইলেন, এবং কালীশঙ্করের বাসায় দেশ হইতে আগত তাঁহার দেশের লোককে বিনা আপত্তিতে অন্ন ধ্বংস করিয়া সেই "ছোট লোক দালালের" গুণগান করিয়া যাইতে দেখিলেন, কালীশঙ্করের পুত্রকে বুকে করিয়া এই ধরাতেই স্বর্গসুখ উপভোগ করিলেন। শিবশঙ্কর কেবল দুইটী শোক পাইয়াছিলেন, তাঁহার সুখে দুঃখে অংশভাগিনী সহধর্ম্মিণী কালীশঙ্করকে তাঁহার কোলে দিয়াই স্বর্গে গমন করিলেন; তাহার পর যখন কালীশঙ্করকে তিনি বুকে পিঠে মানুষ করিয়া বিবাহ দিলেন এবং যখন সেই ঘরের লক্ষ্মী, ক্ষুদ্র বধূটী তাঁহার ক্রোড়ে একটী দেবকুমারের ন্যায় সুন্দর হৃষ্ট-পুষ্ট পৌত্রকে দিয়া শাশুড়ীর ন্যায় অকালে স্বর্গে গমন করিলেন, তখন কালীশঙ্করের স্থির বিশ্বাস হইল যে, তাঁহার বংশের স্ত্রী-ভাগ্যে নিশ্চিতই বিধাতার অভিসম্পাত আছে।

তাহার পর ভবানীপুরের বকুলবাগানে পুত্রের রাজপ্রাসাদতুল্য অট্টালিকার কতক অংশ নির্ম্মিত হইল। বড় আদরের নাতী অরুণকুমার পাঁচ বছরেরটী

হইল, শিবশঙ্কর এই পৃথিবী হইতে ছুটি লইয়া কোন এক অজানা দেশে প্রস্থান করিলেন।

সে আজ প্রায় ষোল বৎসরের কথা। পুত্র যখন দুই বৎসরের তখন কালীশঙ্কর পুত্রকে তাহার পিতামহের ক্রোড়ে অর্পণ করিয়া বিদেশে গিয়াছিলেন। পাটের দালালি করা অপেক্ষা স্বয়ং পাটের মহাজন হইবার ইচ্ছা কয় বৎসর যাবৎ তাঁহার মনে বলবতী হইয়াছিল। আবার যে-সে মহাজন নহে, বিলাতী, মার্কিণ বা বোম্বাইওয়ালার মত ক্রোড়পতি মহাজন না হইতে পারিলে তাঁহার বাঙ্গালী জীবনে ধিক্। কিন্তু সেই মতের মহাজন হইতে হইলে কূপমণ্ডূকত্ব ঘুচাইয়া একবার বাহিরে ব্যবসায়ের জগৎটা দেখিয়া লওয়া আবশ্যক। কালীশঙ্কর এই সকল কথা মনের মাঝে তোলপাড় করিয়া প্রথমে বোম্বাই ও পরে বোম্বাই হইতে বিলাত যাত্রা করিলেন; সেখানে ডাইনডের ডণ্ডী সহরে পাটের কারবার দেখিয়া ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও জর্ম্মাণীতে পাটের কাজে শিক্ষালাভ করিতে এবং বিদেশী মহাজনগণের সহিত পরিচিত হইতে গেলেন। এইরূপে প্রায় আট মাস কাল বিদেশে ঘুরিয়া তিনি দেশে ফিরিলেন এবং পাটের আড়তদারী আরম্ভ করিয়া দিলেন। অচিরে তিনি অতুল ধনশালী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার রাজপ্রাসাদতুল্য অট্টালিকা উঠিল, মোটর গাড়ী হইল; এই রাজধানীর এমন সাহেব মাড়োয়ারি সওদাগর বা বাঙ্গালী রহিল না যে তিনি কোন না কোন সূত্রে একবার তাঁহার বকুলবাগানের বাড়ীতে পদার্পণ করিলেন না।

কালীশঙ্কর বাবুর ভোগ বিলাস বা ঐশ্বর্য্যসম্পদের অথবা যশোমানের কিছুই অভাব ছিল না। যে পয়সা এখন জগতের মত কর্ম্মতার চাবিকাঠি, সেই পয়সার যাহা হইতে পারে, তাহার অভাব কালীশঙ্করের হইবে কেন? কেবল একটা বিষয়ে কালীশঙ্করের মনের সুখ ছিল না। তাঁহার গৃহ থাকিতেও তিনি গৃহশূন্য। তাঁহার অসংখ্য ভৃত্যপরিজন উদ্দেশ্যের তাঁবেদার থাকিতেও তাঁহাকে লক্ষ্মীহীন গৃহে লক্ষ্মী-ছাড়ার মত থাকিতে হইত। বিবাহের কথা পাড়িতে কেহ সাহস করিল না, কেন না সকলেই তাঁহার মনোভাব জানিত। গৃহলক্ষ্মীর কোমল করস্পর্শের অভাবে তাঁহার গৃহে প্রায় সকল কাজেই একটা বিশৃঙ্খলা এবং কঠোরতা আত্মপ্রকাশ করিত। এই হেতু অন্তরে তিনি অতি কোমল, অতি স্নেহশীল ও অতি দয়ালু হইলেও তাঁহার বাহিরটা বড় কর্কশ হইয়া উঠিয়াছিল, তাই ইদানীন্তন কেহ সহজে তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইত না। এমন যে নয়নানন্দ একমাত্র সন্তান অরুণ, সেই অরুণের প্রতি স্নেহে তাঁহার সমস্ত অন্তরটা আচ্ছন্ন থাকিলেও সেই স্নেহটা সদাই প্রচ্ছন্ন থাকিত, বাহিরে কদাচিৎ প্রকাশ পাইত।

কিন্তু একজনের কাছে তাঁহার কোনও আড়িদুরি খাটিত না, সে অনিলাবালা। এই মেয়েটির সাহচর্য্যে আসিলেই তাঁহার কর্কশতার আবরণটা আপনিই খুলিয়া পড়িয়া যাইত। একবার সে তাহার সুধাকণ্ঠে বীণানিন্দিত স্বরে 'জেঠামণি' বলিয়া ডাকিলে তিনি জগৎসংসার ভুলিয়া যাইতেন, তাঁহার কোনও আবদার অভিমান তাঁহার নিকট অপূর্ণ থাকিত না, তাহার মুখের কথাটি খসিতে না খসিতে তিনি তাহা পালন করিতেন। এই মেয়েটী তাঁহার বড় আদরের। তিনি অনেক সময়ে বুঝিতে পারিতেন না, তিনি কাহাকে অতি ভালবাসেন,—নিজের পুত্রকে, না অভিন্নহৃদয় বাল্যসুহৃদ রামসদয়ের এই ভুবন-ভুলানো মেয়েটীকে। কালীশঙ্কর রামসদয়ের সহিত বাল্যকাল হইতে একসঙ্গে পড়িয়াছেন, খেলাধূলা করিয়াছেন এবং কতকটা তাঁহারই পরামর্শে বিলাতে ও য়ুরোপে গিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিখিয়া আসিয়াছিলেন। যখন কালীশঙ্করের পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তখন রামসদয় নিজেই উপযাচক হইয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁহার কন্যাসন্তান হইলে তাহার সহিত ঐ পুত্রের বিবাহ দিতে হইবে। কালীশঙ্কর সানন্দে এ প্রস্তাবে

াত হন। কিন্তু এই সঙ্কল্পের কথা তাঁহারা পনাদের অন্তরের মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন, ছাকেও জানিতে দেন নাই। তাহার পর যখন ার্থই রামসদয়ের একটি কন্যা হইল, তখন কথা কল্পনা পাকাপাকিই হইয়া গেল। কলতঃ কালী-র সেই টুকটুকে ফুটফুটে মেয়েটীকে নিঃসন্দেহে পন গৃহের ভবিষ্যৎ গৃহলক্ষ্মী স্থির করিয়া তাহাকে ন্যকাল হইতেই কন্যার অধিক স্নেহাদর করিতেন। হারই জন্য অনিলা তাঁহার এতখানি হৃদয় জুড়িয়া য়াছে।

আজ তাই যখন তিনি সেই অনিলার পের মুখে একটা কঠোর কর্কশ কথা শুনিলেন, খন তিনি ক্রোধে ক্ষোভে একেবারে শিশুপ্রায় ইয়া উঠিলেন। সে কথা তাঁহার অকৃতি, আলস-রায়ণ, বিলাসী, বালকোচিত খেলাধূলায় নেশাতেই তাহার পুত্র সম্বন্ধে। পুত্র ত' মাথার ঘাম পায়ে ফলিয়া পয়সা রোজগার করে নাই, সে পয়সার মর্ম ঝিবে কি? টাকা চাহিবার আগেই যে টাকা পায়, াসনা মনে জাগিবার পূর্ব্বেই যাহার বাসনার পূর্ণ হয়, া কষ্ট করিয়া লেখাপড়া শিখিতে বা রোজগার রিতে চেষ্টা করিবে কেন? তাহার মত বয়সে তিনি ত ই, এ, পাশ করিয়া রোজগার করিতে শিখিয়াছেন। ত্য বটে, বাল্যে তাহার গর্ভধারিণীর নিকট তাহার শিক্ষার কোন সুযোগ হয় নাই। মায়ের কোলে ালকের শিক্ষার হাতে খড়ি না হইলে শিক্ষা সম্পূর্ণ য় না একথা ঠিক। তিনিও ত' বাল্যে জননীর কালে বসিয়া শিক্ষার হাতে খড়ির সুযোগ পান াই। তবে অরুণই বা এমন হয় কেন? না, আজ াবাকে রীতিমত কড়া কথা শুনিতে হইবে?

এই সময়ে কালীশঙ্কর বাবুর চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল, তিনি উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন সোপানে পুত্রের পায়ের জুতার আওয়াজ হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট আওয়াজ শুনিয়া বুঝিলেন, অভ্যাস-ত অরুণ তাহার প্রকাণ্ড পোষা কুকুরটা সঙ্গে লইয়া নামিতেছে এমন ভাবে পরগোস হরিণ, কুকুর বিড়াল বা পাখিরা দলবদ্ধ লইয়া তিনি অরুণকে অনেক দিন খেলা করিতে দেখিয়াছেন। সেই সকল দৃশ্য তাঁহার মানসপটে উদয় হইল, অমনই তিনি আপনাআপনিই হাসিয়া ফেলিলেন। কিন্তু এখন গম্ভীর হওয়া নিতান্ত আবশ্যক মনে করিয়া তিনি একখানা চেয়ারে বসিয়া মুখে সংবাদপত্র ঢাকা দিলেন।

অরুণকুমার ঘরে প্রবেশ করিয়াই একেবারে পিতার চেয়ারের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। যখন দেখিল, তিনি কাগজের আড়াল হইতে মুখ নামাইতেছেন না অথবা তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছেন না, তখন আপনিই জিজ্ঞাসিল, "আমায় কি ডেকেছেন?"

কালীশঙ্কর বাবু কাগজ হইতে চোখ না নামাইয়াই বলিলেন, "হাঁ ডেকেছি, বস, কথা আছে।"

অরুণ একখানা চেয়ারে বসিল, "বিউটীও" (কুকুরটা) তাহার পদতলে শুইয়া পড়িল। অরুণ মাথা হেঁট করিয়া বিউটীর গায় হাত বুলাইতে লাগিল। কালীশঙ্কর বাবু সেই অবসরে একবার চকিতে চোখ তুলিয়া পুত্রকে দেখিয়া লইলেন। পুত্রের প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র বিপুল আনন্দে গর্ব্বে তাঁহার মুখখানা হাসিয়া উঠিল। কত গম্ভীর, কত কঠিন, কত নির্দ্দয়, কত স্নেহহীন হইয়া পুত্রকে ভর্ৎসনা করিবেন বলিয়া তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া-ছিলেন, কিন্তু একবার অরুণের দিকে তাকাইবা মাত্র তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞা বিপুলস্নেহপ্রবাহের প্রাবল্যে বালির বাঁধের মত কোথায় ভাসিয়া গেল, সর্ব্বশরীর স্নেহরসাপ্লুত হইয়া হর্ষকণ্টকিত হইয়া উঠিল, চোখদুটী আনন্দ রসে ভরিয়া উঠিল। এই তাঁহার একমাত্র পুত্র, তাঁহার জীবন-সঙ্গিনীর অনাবিল প্রণয়ের অমূল্যদান! আজ যদি তাঁহার সেই জীবনতোষিণী প্রেমময়ী পত্নী এই মর জগতে থাকিতেন, তাহা হইলে এই প্রাণাধিক পুত্রের কত

আদর, কত যত্ন হইত! এই পুত্র যে তাঁহার বক্ষের পঞ্জর হইত! কি সুন্দর সরলতা মাখা হাসি হাসি মুখ! কি চমৎকার ছাঁচে ঢালা দেহ! কি মনোমুগ্ধকর কমনীয় কান্তি! যেন বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টিকৌশলে এই বালকের মুখে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তাহার সহধর্ম্মিণীর অপরূপ রূপলাবণ্য আবার সজীব হইয়া উঠিয়াছে। বাটীর ভৃত্যপরিজন যেন তাহার কেনা গোলাম, স্বজনবর্গ যেন তাহার আজ্ঞাবহ ইঙ্গিতচালিত ক্রীতা। বেতনভুক কর্ম্মচারী, পালিত পশুপক্ষী যেন তাহার ভক্ত অনুরক্ত প্রজা, এমন নিষ্কলঙ্ক চাঁদে কেন লোকে কলঙ্ক দিয়া তাঁহার মনে বেদনা দেয়! তাঁহার অরুণকুমারের নামে কলঙ্ক দূরে পলাইয়া যায়, তবে নিত্য তাহার নামে নালিশ শুনিতে হয় কেন? না, কঠিন হইতে হইবে, না হইলে এ ছেলে ঠাণ্ডা হইবে না, মানুষের মত হইয়া সংসার-সংগ্রামে প্রবেশ করিতে পারিবে না, চিরদিন বালকেরই মত খেলাধূলা করিয়া কাটাইয়া দিবে।

মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া কালীশঙ্কর বাবু যতদূর সম্ভব গলা ভারী করিয়া বলিলেন, "কি সব শুনতে পাচ্ছি, কান যে ঝালাপালা হয়ে উঠ্‌লো।"

অরুণ মুখ না তুলিয়াই কুকুরকে আদর করিতে করিতে বলিল, "কি, বলুন।"

কালীশঙ্কর বাবু বলিলেন, "এই তোমার নামে নানা কথা ওঠে কেন?"

অরুণ এইবার মুখ তুলিয়া বিস্মিতভাবে বলিল,—"আমার নামে কথা? কি কথা?"

কালী।—এই ধর না, কাল ট্রামগাড়ীতে কি কাণ্ড বাধিয়েছিলে। মার ধর, পুলীশ হাঙ্গামা কি ভাল? এতে যে আমারই মুখ পুড়ে যায়।

অরুণ উত্তরোত্তর বিস্মিত হইয়া বলিল, "মার ধর, পুলীশ হাঙ্গামা? এ কি বলছেন আপনি? আপনি নিশ্চয়ই ভুল শুনেছেন।"

কালী বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "না ভুল শুনি নি। যারা তোমার দলে ছিল, তারাই বলছে।"

অরুণ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বেশ, আমার দলে ত' সরোজ ছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, তার কথা ত' আপনি বিশ্বাস করবেন। তা ছাড়া, আমি যখন বলছি, কোনও দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় নি, তখন তাই বিশ্বাস করুন। দোষ যখন যা করেছি, কখনও তা অস্বীকার করি নি।"

গর্ব্বে ও আনন্দে কালীশঙ্কর বাবুর হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি জানিতেন, তাঁহার পুত্রের আর যাহা অপরাধ থাকুক, সে কাপুরুষ বা মিথ্যাবাদী নহে। সে মিথ্যা কথা কখনও বলে নাই, মিথ্যা কহা তাহার স্বভাবের একবারে বিরুদ্ধ। মিথ্যায় তাঁহারও যেমন ঘৃণা, তাঁহার পুত্রেরও তাই। তাঁহার পুত্র যে কখনও নিজের দোষ ঢাকিবার জন্য মিথ্যার আশ্রয় লইবে না, এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল। তিনি প্রসন্নমনে নেত্রে পুত্রের মুখপানে তাকাইয়া বলিলেন,—"ভাল। সে দিন থিয়েটার দেখতে গিয়ে মারামারি করে এসেছিলে কেন?"

অরুণ বিনীতভাবে বলিল, "মারামারি করিনি। দুটী আদাবদেশীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে সিটের জন্য ঝগড়া ক'রে অনেকগুলি বাঙ্গালীর ছেলে তাঁদের উপর মারধর অত্যাচার করছিলো ব'লে তাঁদের দিকে হয়েছিলুম্। সরোজও তাতে ছিল। সে অন্যায় অত্যাচার দেখলে আপনিও চুপ ক'রে থাকতে পারতেন না।"

এ ঘটনার কথা ইতঃপূর্ব্বে কালীশঙ্কর বাবু সরোজের মুখে শুনিয়াছিলেন। রামসদয় বাবুর বালিগঞ্জের বাটীতে বসিয়া এই কথা হয়। সরোজ সভয়ে হইয়া অরুণের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়াছিল, তখন তিনি, রামসদয় বাবু, অনিলা ও অমিয় অবাক হইয়া শুনিয়াছিলেন। পুত্রের সেই মহত্বের কথা শুনিতে শুনিতে সে সময়ে তাঁহার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আজও সেই কথা মনে

পড়িল। কিন্তু তিনি হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া কঠোরতার ভাণ করিয়া বলিলেন, "প্রায়ই ত' এমন সব কথা শুনতে পাই। মোটর এমন জোরে চালাও, ঘুড়ি এমন জোরে হাঁকাও যে, রাস্তার লোকের পিলে চম্‌কে যাও। ফুটবল খেলে, কুস্তি ল'ড়ে, জিমনাষ্টিক ক'রে, এথলেটিক স্পোর্টে বাজী মেরে কেবল সময় নষ্ট করছ, লেখাপড়া কিছুই হ'ল না। দেখ দেখি, কাল রাত্রে দশটার পর বাড়ী এসে, আজ বেলা দশটার সময় ঘুম থেকে উঠলে। এরকম অলস অকর্ম্মণ্য হ'য়ে জীবনটা বিফল করছ। এটা কি ভাল?"

অরুণ।—আচ্ছা, সরোজ ও ত' সব খেলা খেলে, কিন্তু তার মত ভাল ছেলে কে আছে? প্রতিবারে পরীক্ষায় সেকেণ্ড হচ্ছে। আমার বুদ্ধি নেই, তাই বিদ্যে হচ্ছে না। কিন্তু খেলার দোষ দেবেন না।

কালীশঙ্কর।—বুদ্ধি নেই বল্‌লে শুনবো না। আসল কথা, তোমার মন নেই, চেষ্টা নেই, কেবল হো হো ক'রে সময় কাটানই তোমার উদ্দেশ্য। তোমার অভাব নেই ব'লে যে লেখাপড়া করতে হবে না, এমন কিছু কথা নেই। লেখাপড়া লেখাপড়ার মতই করা উচিত। টেনে বুনে ম্যাট্রিক পাশ করেই যদি সব বিদ্যে শেষ হয়ে গেলো। আর দেখ দেখি, সরোজ,রমেশকে। এই তোমারই বয়েসের ত', ওরা এম্, এ, পড়ছে। তোমারও কি ইচ্ছে করে না?

অরুণ।—ও ল্যাঙ্গোয়েজ (ভাষা) ছাড়া আর কিছু আমার ভাল লাগে না। মেথেমেটিকসে মাথা গুলিয়ে যায়। আমি বাড়ীতে ভাল ক'রে ল্যাঙ্গোয়েজ শিখবো।

কালী।—বেশ ত', তাই কর না। যা হয় একটা মন দিয়ে কর। মিছে কলেজ যাওয়া আমার কল কি? না হয়, আমার সঙ্গে কাজ দেখো, সংসারে ঢোক, মানুষ হও। এমন ক'রে কেবল খেলাধূলো নিয়ে থাকলে পরে কাজকে যাদু ব'লে ভয় হবে।

অরুণ।—ওঃ কাজ! কাজ আমি খুব করতে পারবো, আপনি আমায় ভার দিয়ে দেখুন না?

কালীশঙ্কর বাবু হাসিয়া ফেলিলেন। অরুণ যা কায করিতে পারিবে, তাহা তিনি ভালই জানিতেন। যে একদণ্ড আমোদ আহ্লাদ খেলাধূলা বা বাবুয়ানা না হইলে থাকিতে পারে না, সে করিবে কায! যে বাবুয়ানাটী ছাড়া পরিশ্রম কাহাকে বলে জানে না, আজন্ম যে বিলাসে সুখে লালিতপালিত, যাহার মুখের কথা খসিতে না খসিতে পঞ্চাশটা দাসদাসী তাহার সেবার জন্য সর্ব্বদা মোতায়েন, যাহার ভোগবিলাস চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত মাসের ছয় সর্ব্বদা অর্থ ব্যয়িত হয়, সে মনস্থির করিয়া আফিসে গিয়া কাজে বসিবে! কথাটা মনে পড়িতেই কালীশঙ্কর বাবু আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। এই ছেলেটীর লেখাপড়ার জন্য তিনি মাসিক পাঁচশত টাকা ব্যয় করিয়া সাহেব ও বাঙ্গালী প্রফেসারকে প্রাইভেট টিউটররূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কোনও দিনই দণ্ড স্থির হইয়া বসিয়া পাঠাভ্যাস করিতে পারে নাই,—সে করিবে কাজ!

কালীশঙ্কর বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সেও বেশী দিন না, আমি আর ক'দিন? আমি কি বুড়ো বয়সে আর খাটতে পারি, কাজে যে তোমায় শীঘ্রই বসতে হবে, এটা ঠিক।"

অরুণ এইবারে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পিতার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহার হাতের উপর হাত রাখিয়া হঠাৎ বিষাদজড়িত কণ্ঠে বলিল, "ও কথা বলছেন কেন, বাবা? আমি ওভাবে কাজে বসতে চাই নি।" অরুণের চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল।

কালীশঙ্কর বাবু সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "এই দেখ পাগল কেঁদে ফেল্‌লে। ওরে, তোর বাবা শিগ্‌গীর মরছে না, ভয় নেই।" তাহার পর গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তবে বাপ কারও চিরদিন থাকে না। তাই বল্‌ছিলুম,

একটু একটু কাজ অভ্যাস করতে। আমার এই বিপুল কারবার তুমি বই কে দেখবে বাবা? একটু লেখাপড়া না শিখলে, একটু হিসেব পত্র রাখতে না জানলে, লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে অভ্যস্ত না হলে ব্যবসায় বা কারবার চলে না। আমি তোমায় এই বয়সে সব আমোদ আহ্লাদ ছেড়ে একেবারে খোসী হ'তে বলি নি। তবে একেবারে "গে লোথারিও" (আদুরে) হ'লে "প্র্যাক্‌টিকাল ম্যান" (কাজের লোক) হওয়া যায় না। এই দেখ না, হিসেব পত্রে মাথা ঘামাও না ব'লে, হিসেব পত্রের বোঝাটা বুড়ো বাপের ঘাড়ে ফেলে দিয়েছ ব'লে, তোমার নিজের খাতে খরচটা মাসে মাসে কত বেড়ে যাচ্ছে।"

অরুণ অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসিল, "খরচ বেশী হচ্ছে? কত বেড়েছে?"

কালীশঙ্কর বাবু হাসিয়া বলিলেন, "সে যতই হ'ক, তাতে তোমার ভয় নেই। তবে খেলা ধূলোয় আর ধানখররাতে যত হয়েছে, সাজপোষাক বাবুয়ানায় তার অর্দ্ধেকও হয় নি, এইতে আমি সন্তুষ্ট। কিন্তু তোমার বড়কাকা বল্‌ছিলেন, ইদানীং তোমার "এন্টারটেন্‌মেন্ট" (বন্ধুদের প্রীতিভোজ) দেওয়াটা বড় বাড়াবাড়ি রকমের হচ্ছে। শুনলুম তোমাদের ক্লাব "টাগ অব ওয়ারে" (দড়ী টানাটানিতে) কলেজে কাষ্ট হয়েছে ব'লে তুমি ছ'শ টাকার ভোজ দিয়েছ।"

অরুণকুমার ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আমাদের ক্লাবের কথা তিনি জানলেন কি ক'রে?"

কালীশঙ্কর বলিলেন, "তা জানি নি। আজও তিনি তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা বলে গেলেন। দেখ, আমার মনে একটা বড় সন্দেহ হচ্ছে। নিশ্চয়ই তোমার ক্লাবে তোমার কেউ শত্রু আছে, সেই তোমার বড় কাকার কাণ ভারী করেছে। কে ব'লেছে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বল্‌তে চান না, বলেন 'আমি শুনেছি'। এটা ভাল কথা না।"

অরুণ বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে বলিল, "ক্লাবে আমার শত্রু? কৈ কেউ ত নেই।"

কালীশঙ্কর বলিলেন, "সে কি তোমায় জানতে দেবে যে সে তোমার শত্রু! বিষকুম্ভ পয়োমুখ লোকের ত' অভাব নেই। সরোজ রামদয়ালের বাড়ী থাকে বটে -"

অরুণ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "সরোজ? বরং আমার ডান হাতকে বিশ্বাস ক'রব না, তবু সরোজকে ক'রব। সরোজের মত ছেলে কখনও হয় নি, হবে না, হতে পারে না। সরোজ আমার নামে মিথ্যা বল্‌বে?"

কালীশঙ্কর বাবু বিস্মিত হইলেন। তিনি জানিতেন অরুণ ও সরোজ অতিবয়স্য, তাহা হইলেও অরুণ যে সরোজকে এত ভালবাসে তাহা জানিতেন না। তিনি বলিলেন, "না, না, সরোজ বলেছে, এমন কথা কেউ বল্‌বে না। কিন্তু একজন যে বলেছে, তাতে সন্দেহ নেই। একটা কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ তোমার শত্রুতা করছে, এটে আমার ধ্রুব বিশ্বাস হচ্ছে। তুমি একটু সাবধানে থেকো, আর নজর রেখো। যাক্, তুমি কি ও বেলা বালিগঞ্জে যাবে? যদি যাও, বড় কাকাকে সব ব'লে ঠাণ্ডা করে এস। হাঁ, দেখ, কেনেডি সাহেব তোমায় একবার দেখতে চেয়েছেন। মনে করছি, তোমায় আপিসে না নিয়ে গিয়ে তাঁকে বাড়ীতে একদিন নিমন্ত্রণ করি, কি বল?"

অরুণ বলিল, "তাই করুন। কেনেডি সাহেব এখানে এসেছেন কেন?"

কালীশঙ্কর বলিলেন, "সে অনেক কথা, এর পর একদিন ব'লব। এখন বেলা হয়েছে, যাও চান করগে। আমায় একবার বেরুতে হবে।"

যতক্ষণ অরুণ দৃষ্টির বহির্ভূত না হইল, ততক্ষণ কালীশঙ্কর স্নেহপূর্ণনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর কক্ষে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; তাঁহার ললাটে গভীর চিন্তা-

রেখা প্রকটিত হইয়া উঠিল। তাহার চক্ষে তাহার পুত্র সর্ব্বগুণোপেত, কিন্তু সকলের পক্ষে ত' নহে। সকলে ত' তাহার সহিত অহরহ বসবাসে তাহার অনাবিল শুভ্র পবিত্র সরল স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের পরিচয় পায় নাই। সংসারে লোকে পুরুষের কার্য্য দেখিয়া তাহার মূল্য অবধারণ করিয়া থাকে। সে হিসাবে সরোজের সহিত তাহার পুত্রের তুলনা হইতে পারে না। সরোজ রূপবান ও গুণবান। তাহার ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছেলে আজি কালিকার দিনে দেখিতে পাওয়া যায় না। পরন্তু সে ঈশ্বর-দত্ত যে রূপ গুণ পাইয়াছে, তাহার পর মানুষের দয়ায় সে ধনবানও হইবে, কেন না রামসদয় তাহার অতুল ঐশ্বর্য্য স্বীয় পুত্রকন্যা ও সরোজের মধ্যে তুল্য হিসাবে বণ্টন করিয়া দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট সেই গুপ্তকথা ব্যক্ত করিয়াছেন। এখন সরোজের উপর রামসদয়ের যেরূপ ভালবাসার টান, তাহাতে কেবল বিষয় আশয় ব্যতীত আরও কত কি হয় ত' রামসদয় তাহাকে দিয়া যাইতে পারেন।

"আরও কত কি",—এই কথাটা মনে পড়িতে তাঁহার প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। যে সোণার পুতলী অনিলাকে তিনি এখনই ভাবী পুত্রবধূ-বোধে পুত্রাধিক ভালবাসেন, যদি রামসদয় সরোজের প্রতি স্নেহাধিক্যবশতঃ সরোজের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করেন! ওরে বাপরে, তাহা হইলে কালীশঙ্কর মর মাটিয়া মরিয়া যাইবে। তাহার বড় আশার ছাই পড়িবে! তাহার সযত্নরোপিত চির-পোষিত আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরেই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে! এ দুঃখ রাখিবার কি স্থান আছে!

কিন্তু নির্ব্বোধ বালক অরুণকুমার যে নিজের পায়ে নিজে কুঠার হানিতেছে। সরোজ যতই গুণগ্রামে সকলকে—বিশেষতঃ রামসদয়কে—মুগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে, তাঁহার নির্ব্বোধ বালক ততই নিত্যনূতন কাণ্ড বাধাইয়া তেমনই,অন্ততঃ রামসদয়ের নিকট,গুণহীন ও অনিলার অযোগ্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। বিশেষতঃ তাহার দোষ না থাকিলেও তাহার কোনও গুপ্তশত্রু তাহার এই সর্ব্বনাশসাধন করিতেছে। রামসদয়ের মন অরুণকুমারের উপর বিরূপ না হইলে রামসদয় আজিকালি অরুণের নামে যাহা শুনেন তাহাই বিশ্বাস করেন কেন? পরন্তু অরুণের সহিত অনিলার বিবাহের কথা পড়িলেই আজিকালি রামসদয় অন্য কথার অবতারণা করেন কেন? ফলকথা, বুদ্ধিমান বিষয়ী কালীশঙ্কর বুঝিলেন, অরুণের হস্ত হইতে জিতের পাশা খসিয়া পড়িতেছে, আর সরোজ সেই পাশা উঠাইয়া লইতেছে। নির্ব্বোধ বালক! সে ত' হাসিয়া আমোদ করিয়া কাল কাটাইতেছে, সে ত বুঝিতেছে না, তাহার পিতা কত যত্নে তাহার জন্য যে সুখ-সৌধের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, সেই সৌধ-ধ্বংসের আয়োজন সে স্বহস্তেই করিতেছে। অনিলার মত ত্রিভুবন-সুন্দরী গুণবতী বধূর লক্ষ্মী তাহার পিতা আর কোথায় পাইবে, তাহা ত' একবার সে ভাবিয়া দেখে না। সরোজ তাহাকে বিদ্যায় পরাজিত করিয়াছে, হায় যেন সংসারের সার সুখ সর্ব্বসুলক্ষণা গুণবতী স্ত্রীরত্ন লাভেও সে তোমায় পরাস্ত করিতে না পারে!

(ক্রমশঃ)

মর্ম্মব্যথা।

(শ্রীমতী খুরসিদজাহাঁ বেগম)

"আমার কপালে বিধি এই কি লিখিলে
লম্পটের কারাগারে আনি ধরি সলিলে।
পলে পলে অত্যাচার, সহিতে না পারি আর
তুমি যে ধরার্থী আধার, নিদয় কেন হইলে।"

কলিকাতার একটী প্রশস্ত দ্বিতল অট্টালিকার ছাদের উপর বসিয়া দুইটী যুবতী কথোপকথনে মগ্ন। তাহাদের কথা শুনিবার পূর্ব্বে তাহাদের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ইহারা দু'জনেই এই বাড়ীর বধূ। বড় বধূ সরলা কলিকাতারই প্রসিদ্ধ জমিদার মনোমোহন বাবুর একমাত্র কন্যা। সরলা সুন্দরী, দেখিতে যেমন সুন্দর, তাহার মনটী তদপেক্ষা সুন্দর। ছোট বধূ মলিনাকে সে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে, তাহারা দু'টী ভগ্নী যেন একবৃন্তে দু'টী ফুল। মলিনা পিতৃহীনা কিন্তু অদৃষ্টগুণে সে এক দিনের তরেও তাহা অনুভব করে নাই, কারণ তাহার স্নেহময়ী মাতা ও স্নেহময় মামারা তাহাকে নিমিষের তরে বুঝিতে দেন নাই যে সে পিতৃহীনা। মলিনার পায় ফুশাঙ্কুর বিঁধিলে তাঁহাদের বুকে শেল বিঁধিয়াছে।

মলিনার বড় মামা অপূর্ব্বচরণ তাহাকে কন্যাধিক স্নেহ করিতেন, পিতৃহীনা হওয়ার পর হইতে তিনি মলিনাকে অত্যধিক স্নেহযত্নে মানুষ করিয়াছিলেন। তাঁহার যথাসাধ্য প্রয়োগ করিয়া তাহাকে সর্ব্বরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহাদের একান্ত কামনা ও চিন্তা ছিল মলিনা উপযুক্তা শিক্ষিতা হইয়া সৎপাত্রে পড়ে, এবং সর্ব্বসুখে সুখী হয়, সে যেন একদিনের তরেও পিতার অভাব অনুভব না করে। ক্রমে মলিনা যৌবনে পদার্পণ করিল। অমূল্য বাবু ও মলিনার মাতা অন্নপূর্ণা দেবী বর খুঁজিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদের একান্ত চেষ্টার ফলে সৌভাগ্যবশতঃ কি দুর্ভাগ্যবশতঃ মলিনার বর মিলিল। কলিকাতার প্রসিদ্ধ জমিদার আনন্দ-বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র যোগেশচন্দ্রের সহিত মহা সমারোহে মলিনার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহে প্রায় ১৬।১৭ হাজার টাকা খরচ হইল। মলিনা ইতিপূর্ব্বে কখনও মা ও মামাদেরকে ছাড়িয়া কোথায়ও যায় নাই বিদায়কালে সে অত্যন্ত কাঁদিল। প্রাণসমা কন্যাকে বিদায় করিতে মাতারও হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল, কেবল মলিনার অমঙ্গল আশঙ্কায় ও তাহার ভাবী সুখ আশায় তিনি স্থিরচিত্তে তাহাকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া জামাতার হাতে সঁপিয়া দিলেন। "বাবা, আমাদের আদরিনী মলিনাকে আজ তোমার হাতে দিলুম, তুমি যত্নে রেখো।"

অমূল্যবাবু অত্যন্ত বৃদ্ধচেতা পুরুষ, কেহ কখনও তাঁহার নয়নে অশ্রু দেখে নাই, কিন্তু মলিনার বিদায় সময়ে তাঁহারও চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িল, তিনি মলিনাকে বুকে ধরিয়া অজস্র উপদেশ দিয়া অশ্রু-বিগলিত স্বরে কহিলেন "আমার ঘরের লক্ষ্মী মা জননী আজ যাও তোমার নূতন সংসারে, শ্বশুরকে আমার মত ভক্তি কোরো, ভাসুরকে সম্মান কোরো, জা'কে ভগ্নিতুল্য ভালবেসো।"

মলিনা শ্বশুর-গৃহে আসিয়া প্রথম প্রথম মাতার ও মামার জন্যে কাঁদিত, ক্রমে সরলার অফুরন্ত স্নেহে আদরে, স্বামীর যত্নে সোহাগে মাতুলালয়ের মধুর স্মৃতি ভুলিয়া শ্বশুর গৃহেই ডুবিয়া গেল। আনন্দ বাবুও এই নম্র প্রকৃতির মেয়েটিকে স্নেহের চক্ষেই দেখিলেন। শ্বশুরালয়ে কিছুদিন থাকার পর, অমূল্যবাবু আসিয়া কন্যা জামাতাকে লইয়া গেলেন।

বহুদিন পরে মলিনা বাল্যক্রীড়াভূমি মাতুলালয়ে আসিয়া স্নেহময়ী মাতার ও মামীমাদের স্নেহময় ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাঁহারাও বহুদিনপর আদরিণী স্নেহের পুত্তলিকে বুকে পাইয়া অসীম আনন্দ উপভোগ করিলেন। কি করিয়া কন্যা জামাতাকে খাওয়াইবেন, কেমন করিয়া তাহাদেরকে সুখে রাখিবেন তাহাই তাঁহাদের চেষ্টা ও যত্ন হইল। এতদিন পর মলিনাকে পাইয়া তাহার বাল্যসঙ্গিনীরা নিরতিশয় আনন্দিতা হইল। মলিনাও সমস্ত দিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া তাহাদের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত করিত। কিছুদিন এই ভাবে কাটার পর আনন্দ বাবু আসিয়া পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া যাইতে চাহিলেন। যাইবার সময় জানি না কেন মলিনার প্রাণ কোন্ অজ্ঞাত অমঙ্গল আশঙ্কায় কাঁদিয়া উঠিল, মাতা, মাসী ও মামীমাদের চরণে প্রণত হইয়া "আমাকে আশীর্ব্বাদ কোরো যেন সুখী হ'তে পারি, আমার কেন মনটা বড্ড খারাপ লাগ্‌ছে, জানি না অদৃষ্টে কি আছে," বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। "ছিঃ মা অলুক্ষণে কথা বল্‌তে নেই, তুমি আমাদের বুক-চেরা ধন, ভগবান তোমাকে সুখে রাখুন," এই বলিয়া তাহারা মলিনাকে বিদায় দিলেন। হায়! সত্যই সেবার কি কুক্ষণে সে শ্বশুর-গৃহে পদার্পণ করিল।

(২)

চারপর চার বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। ধীরে ধীরে জমিদার-তনয়ের গুণ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম প্রথম যোগেশ মলিনাকে লুকাইয়া মদ খাইত, সুরার বন্ধুদের সহিত আড্ডা দিত, কিন্তু ক্রমে আর মলিনাকে সে ভয় করিত না। মলিনা অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির এবং ধৈর্য্যশীলা মেয়ে। উহার মধ্যে সে অনেকবার কামিনীপুরে গিয়াছে, অমূল্য বাবু এবং অন্নপূর্ণা দেবী প্রত্যেক বারেই লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলেন তাঁহাদের আদরিণী জীবন-সর্ব্বস্ব বালনা যেন আর পূর্ব্বের আনন্দময়ী মলিনা নাই। দিন দিনই বিষণ্ণ হইয়া যাইতেছে। তাঁহারা ইহাতে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিতেন "মা বল্ তোর কিসের দুঃখ, কেন তুই দিন দিন মলিন হয়ে শুকিয়ে যাচ্ছিস্?"

তাহাতে মলিনা কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া উত্তর দিত "তোমরা পাগল হয়েছ না তোমাদের চোখ খারাপ হয়েছে এমন কথা বল্‌ছ, শুধু শুধু কেন আমি বিষণ্ণ হতে যাব?"

এইভাবে আরও কিছুদিন গেল। ক্রমে অমূল্য বাবু লোকপরম্পরায় তাহার অতি আদরের জামাতার গুণ সকল শুনিতে পাইয়া মর্ম্মাহত হইতে লাগিলেন। হায়! তাঁহাদের এত যত্নের ও এত সোহাগের মলিনা, তার অদৃষ্টে এই ছিল? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মলিনাকে একবার আনার কর্ত্তব্য মনে করিলেন; তৎক্ষণাৎ বেহাইকে চিঠি লিখিলেন ও লোক পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন।

মলিনা আসিল, কিন্তু এমনি ধৈর্য্যশীলা মেয়ে যে অমূল্য বাবু ও তাঁহার দিদি কিছুতেই তাহার মুখ হইতে শুনিতে পারিলেন না যে জামাই অসচ্চরিত্র ও ও অত্যাচারী। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিত "লোকে হিংসে ক'রে বলে আর তাই তোমরা বিশ্বাস কর?"

একদিন সরলা ও মলিনা বসিয়া কথপোকথন করিতেছিল।

সরলা "ভাই, আর এসব দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় না, লোকের প্রাণে আর কত সয়? তোর ভাসুরও বল্‌ছিলেন যে যোগেনের এত বাড়াবাড়ী আর সহ্য হয় না, এর একটা প্রতিকার করা উচিত।"

মলিনা। "দিদি, আজ চার বৎসর এমনি করে লুকিয়ে সহ্য করেছি, সত্য বলতে কি আমারও আর সহ্য হয় না। প্রতিকারই বা কি করব, বাবা একটুও লক্ষ্য করেন না।"

সরলা। "বোন, বাবার কথা আর বলিস্ নে, হায়! আজ যদি মা থাকতেন তাহ'লে সাধ্য কি ঠাকুর পো'র তোর সঙ্গে এমন কুব্যবহার করে?"

মলিনা। "সেটা ও অভাগীর অদৃষ্ট, নইলে মাই বা চলে যাবেন কেন? আর বাবাই বা এমন উদাসীন হবেন কেন?"

সরলা। "বাবা উদাসীন নন্ ভাই, তিনি ছেলেকে ভয় করেন, দাতালকে সবাই ভয় করে, বোন, সে কি কখনও হাঁসে থাকে যে শাসন মানবে? এক উপায় আছে তুই কিছুদিন গিয়ে কামিনীপুর থাক্। দেখ্ তা'তে যদি ও সংশোধিত হয়। তোর টাকা না পেলেই ও ভালো হ'বে। তুই ত' টাকা দিয়ে ওর মুখ বাড়িয়ে দিয়েছিস্।"

মলিনা। "দিদি সে কথা আর বোলো না, না দিয়ে আর করি কি? সাধে কি দেই? তোমরা কি তা জান না?"

সরলা। "সে ত বুঝি বোন, এক উপায় আছে যে তুই চ'লে যা।"

মলিনা। "বাবাবাবুকে চিঠি লিখেছি, তিনি লোক পাঠালেই যাব। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যে'তে সত্যি বড্ড কষ্ট হবে, শুধু তোমাদের অকৃত্রিম স্নেহে আদরে আমি এতদিন এত অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছি।"

সরলা এই কথায় ছলছল-নেত্রে মলিনাকে কোলের নিকট টানিয়া লইয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "বোন, আমাদের সমস্তখানি স্নেহ দিয়েও যদি তোকে এতটুকু সুখী করতে পারতুম, তাহ'লে কি তোকে ছেড়ে দিই? কিন্তু ভাই তা যে হবার নয়। আমাদের স্নেহে কি স্বামীর অনাদর ভুলা যায়?"

মলিনা। "দিদি, স্বামীর অনাদর সহ্য করা যায় এবং এতদিন করেছি কিন্তু অত্যাচার ও লোক-সমাজে লজ্জা আর সহ্য করতে পারি না।"

সরলা। "ভাই, স্বামীর অনাদরই কি রমণীর পক্ষে সহজ কষ্ট, পৃথিবীতে আমাদের স্বামী ছাড়া আছে আর কি, আমরা আজন্মের স্নেহনীড় ছেড়ে এসেছি শুধু একজনের ভালোবাসার আশায়, কিন্তু যদি তাহাও আমাদের অদৃষ্টে না জুটে, তাহ'লে বাঁচ্‌ব কি নিয়ে?" মলিনা কহিল "দিদি সহজে কি আমি স্বামীর ঘর ছেড়ে তোমাদের ছেড়ে চ'লে যে'তে চাচ্ছি, ভগবানই জানেন আমার বুকের ভেতর কি অসহ্য যাতনা হচ্ছে।" এই বলিয়া মলিনা চুপ করিল আর কিছু বলিতে পারিল না। সরলার বুকের ভিতর মুখ লুকিয়া অজস্র ধারে কাঁদিতে লাগিল। হায়রে আমাদের পোড়া সমাজ, এই সমাজে নিত্য নূতন কত শত সংসার এইরূপে জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে তাহা কয়জন খবর রাখেন? কত কত সতীসাধ্বী অবলা এই নরক যাতনায় নিষ্ঠুর স্বামীর নির্দ্দয় ব্যবহারে ধড়ফড়িয়া মরিতেছে, সে সংবাদ কয়জন সমাজ-হিতৈষী জানেন! আমাদের দেশে স্নেহময় পিতা মাতা বড়লোকের আদরে মূর্খ ছেলের হস্তে প্রাণপ্রিয়া সরলা কন্যাকে সঁপিয়া অতি বিশ্বাসে বসিয়া থাকেন, মেয়ে বুঝি খুব সুখী হইল, কিন্তু হায় একটু তলাইয়া খোঁজ করিয়া দেখেন না যে কয়টী হতভাগ্য জীবন এমনই বিফলে যাইতেছে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কামিনীপুর অত্যন্ত ম্যালেরিয়া প্রধান গ্রাম, অমূল্যবাবু কিছুদিন হইতে শারীরিক অসুস্থতা ভোগ করিতেছেন। এমনই সময়ে একদিন তাঁহার প্রাণাধিকা মলিনার একখানি চিঠি তাঁহাকে ব্যস্তহস্ত করিয়া দিল। মলিনা লিখিয়াছে,—

"শতকোটী প্রণামান্তে নিবেদন, বাবা, আজ আপনাকে নিজের দুঃখের কাহিনী লিখতে বসেছি, এখন আর না বলিয়া থাকতে পারি না, তাই এতদিন পর আপনাদের স্নেহময় প্রাণে আঘাত দিতে বসলুম। বাবা, বিবাহের পর একদিনের তরেও সুখী হই নাই, কিন্তু আমি পিতৃহীনা, সুখী হইব বলিয়া আপনারা অনেক চেষ্টায়, অনেক খরচ করে এখানে

বিয়ে দিয়েছিলেন, এ অবস্থায় আপনাদের প্রাণে আঘাত লাগবে বলে এতদিন জানাই নাই। যতদিন পেরেছি, মুখ বুজে সহ্য করেছি। আপনারা আমার অবস্থার সব কথা লোকপরম্পরায় শুনেছেন কিন্তু আমার প্রাণ ফেটে গেলেও তাহা আপনাদের বিশ্বাস করতে দিই নি। আজ আর বেশী কি লিখব, মাকাতে সমস্ত বলব, এখন রক্ষা পাবার এক উপায় আছে, আমাকে নিয়ে যান। আর একটী কাতর বিনতি আপনার শ্রীচরণে যে আমার এ দুঃখ-কাহিনী পরম স্নেহময়ী জননীকে জানাবেন না, তাঁর প্রাণে এ পিতৃহীনা দুখিনীর জন্যে কষ্ট দিবেন না, আপনাকেও বলতাম না যদি সইতে পারতাম।"

চিঠি পাইয়া অমূল্যবাবু যার পর নাই মর্ম্মাহত হইলেন, কিন্তু মলিনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারলেন না। দিদিকে ডাকিয়া চিঠিখানি তাঁহার দিকে ফেলিয়া দিলেন। অন্নপূর্ণা দেবী বুদ্ধিমতী এবং অত্যন্ত স্থির বুদ্ধিসম্পন্না। চিঠিখানি পড়িয়া তাঁহার প্রাণ একমাত্র কন্যার দুঃখে কাটিয়া গেলেও স্থির ভাবে বলিলেন, "ভাই সবই আমাদের অদৃষ্টের দোষ, নইলে যা'কে এত স্নেহে বিয়ে দিলাম তার কেন এত দুর্গতি হবে, যাক এখন কি ঠিক করেছ?"

অমূল্য। "দিদি, আমি এই মর্ম্মান্তিক সংবাদে মুহ্যমান হয়েছি, ও যোগেনকে আমি প্রাণতুল্য ভালোবাসতাম, কতদিন মলিনাকে বলেছি যে 'আমি বুঝি তোর চেয়ে জামাইকে বেশী ভালোবাসি' আর সেই স্নেহের এই প্রতিদান। যাক এখন মলিনাকে আনান সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। তুমি দেওয়ান-জীকে ডেকে তার বন্দোবস্ত কর।"

অন্নপূর্ণা। "আমি তা করছি, তুমি শুধু বেহাইকে একখানি চিঠি লিখে দেও।"

যথাসময়ে দেওয়ানজী মলিনাকে আনিতে গেলেন, যোগেন সঙ্গে আসিবে স্থির হইল। বিদায়-কালে মলিনা শ্বশুর শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া সরলার নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় লইল।—"দিদি, হয় ত এই আমাদের শেষ দেখা, কেমন ক'রে যে তোমাকে ছেড়ে থাকব জানি না।"

সরলা মলিনাকে প্রাণাপেক্ষা ভালোবাসে, মলিনার সুখের জন্যে সে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিতা হয় না, এমনি তাহাদের ঐকান্তিক ভালোবাসা সমস্তদিনে উভয় উভয়কে দুই এক ঘণ্টাও ছাড়িয়া থাকিতে কাতরা হয়, এই অবস্থায় তাহারা উভয়কে ছাড়িতে কতদূর মর্ম্মান্তিক কষ্ট অনুভব করিতেছিল তাহা অন্তর্যামী জানেন। সরলা সাদরে ছোটবউর মুখ চুম্বন করিয়া ছল ছল নেত্রে বলিল "বোন, আশীর্ব্বাদ করি তোর হাতের নোয়া সিঁথির সিঁদুর বজায় থাক, তুই সুখী হ' আবার আমার বুকে ফিরে এসে শ্বশুর গৃহ আলো কর।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অমূল্যবাবু পীড়িত ছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্নেহের পুতলি মলিনার অবস্থা দেখিয়া ও যোগেনের ব্যবহারে আরও ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। মলিনা স্বামীর কোন কার্য্যে কখনও এতটুকু ত্রুটী করিত না তবুও যোগেন বিনা কারণে অভদ্রোচিত ভাষায় গালাগালি করে, যখন মদে চুর হইয়া থাকে, তখন ভদ্রঘরের ছেলে হইয়া বড়লোকের মেয়ে মলিনার সোনার অঙ্গে হাত তুলিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। এসব অন্নপূর্ণা দেবীরও চোখ এড়াইল না, তাদের এত আদরের জামাতার এরূপ অধঃপতন দেখিয়া সকলে মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া গেলেন।

অবশেষে যোগেন চলিয়া গেল। হায় এই বুঝি মলিনার শেষ স্বামী দর্শন, এবার সে পণ করিয়াই আসিয়াছিল স্বামী সংশোধিত না হইলে আর শ্বশুর-গৃহে ফিরিবে না, এইরূপ অধঃপতিত স্বামী যে আর সংশোধিত হইবে, সে আশাও যে তাহার ছিল না।

লোকের উপর যখন বিপদ আসে, চারিদিক হইতে এক সঙ্গে আসে, ইহাও বিধাতার অপূর্ণ

খেলা। অমূল্য বাবু ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া শেষে সকলরূপ চিকিৎসা ব্যর্থ করিয়া একদিন মলিনার মস্তকে বজ্রাঘাত ও পরিবার পরিজনকে কাঁদাইয়া জন্মের শোধ চলিয়া গেলেন।"

মলিনা ও অন্নপূর্ণা দেবী এই শোকে অত্যধিক ব্যাকুলা হইলেন। অন্নপূর্ণা তাঁহার এই ভাইটীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। মলিনারও এই দুঃসময়ে তাহার স্নেহময় আশ্রয়স্থল মামার বুক্টা বুকে অনেক বাজিল। সে পিতৃহীনা হইয়াও এই মামাদের অফুরন্ত স্নেহে কখনও পিতার অভাব বুঝে নাই, আজ এই বিপদের দিনে ভগবান তাকে পিতার অভাব অনুভব করার জন্যেই পিতৃতুল্য মামাকে তুলিয়া লইলেন। সবই সেই কল্যাণময়ের লীলা!

মলিনার শ্বশুরালয় হইতে আসার পর সুখে দুঃখে একটী বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে প্রথম প্রথম আনন্দবাবু দু'একবার বধূকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু যখন অন্নপূর্ণা দেবী ও মলিনার ছোটমামা ফণীন্দ্রবাবু জামাতা সংশোধন না হওয়া পর্য্যন্ত কেমন করিয়া মলিনাকে পাঠাইবেন জিজ্ঞাসা করিলেন তখন হইতে আনন্দবাবু নিজ পুত্রের অবস্থা দেখিয়া বধূকে আনিবার আশা ত্যাগ করিলেন।

একবৎসর মলিনার সরলার সহিত দেখা হয় নাই, তবে তাহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই পত্র ব্যবহার হইত, সরলার পত্রে ও কলিকাতার অন্যান্য অনেক লোকের মুখে মলিনা সর্ব্বদা যোগেশের সংবাদ লইত। কিন্তু তাহার দুরদৃষ্টবশতঃ একটী দিনের তরেও শুনিতে পাইল না যে সে চলিয়া আসাতে যোগেশের এতটুকু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, বরং মলিনা চলিয়া আসাতে তাহার সুযোগ আরও বেশী হইয়াছে। এই সব সংবাদ শুনিয়া শুনিয়া মলিনা মরমে মরিয়া যাইত এবং দিন দিন পুনঃ শ্বশুরালয় যাওয়ার আশা ত্যাগ করিতেছিল। হায়! এই অল্প বয়সেই তাহার জীবনের সব সাধ আহ্লাদ ফুরাইয়া গেল, পৃথিবীতে সে শুধু দুঃখ ভোগ করিতেই আসিয়াছিল।

নারীজাতির পৃথিবীতে তিনটীই আশ্রয়স্থল, তিনটী প্রাণের পবিত্র স্নেহ তাহাদিগকে আবরিয়া রাখে, শৈশবে পিতার স্নেহ, যৌবনে স্বামীর ভালোবাসা, এবং বৃদ্ধা বয়সে উপযুক্ত পুত্রের ভক্তি। কিন্তু হতভাগিনী মলিনা তিনটীতেই চিরতরে বঞ্চিতা। দু'বৎসর বয়সে পিতৃহীনা হইয়াছিল, অবশেষে পিতৃতুল্য মামাকেও অকালে হারাইল, বিবাহ হইয়া একদিনের তরেও স্বামীর ভালোবাসা কি জিনিষ বুঝে নাই, সন্তান ত বিধাতা দেনই নাই।

এরকম দুঃখিনীদের ভগবান কেন সৃষ্টি করেন, তাহা তিনিই জানেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

একদিন মলিনার সই বীণা তাহাকে যোগেশ সম্বন্ধে অনেক কথা বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল, অতঃপর বলিল "আচ্ছা ভাই তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কি কিছু করা যায় না?"

মলিনা। "বোন, তা কি সম্ভব, একটী গান আছে জানিস্ ত। 'নিজে না বুঝিলে তারে বুঝান যায়।' তোমাকে আর বলব কি, চারিটা বৎসরে কি কম বুঝিয়েছি? কিছুতেই ভুলবার নয়। তুমি জিজ্ঞেস করছিলে না তিনি কত দিন ঘর ছাড়া, আমি এখানে আসার আগে পূর্ণ দুটী বৎসর তিনি বাড়ী ছাড়া। বলতে বুক ফেটে যায়, প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা তিনি চ'লে যেতেন, আর তাঁর রাত্রের আহার আমাকে নিজ হাতে রেঁধে সেই পাপপুরীতে পাপীয়সীর খাওয়ার জন্যে পাঠাতে হয়েছে। যদি কোন দিন উনিবে বিষ হয়েছে তাহ'লে প্রাণে আর রক্ষা থাকত না। বুঝতেই পার কি ভীষণ মনকষ্টে অহোরাত্র দিন কাটিয়েছি। উঃ যদি দিদি না থাকতেন তাহ'লে বুঝি পাগল হয়ে যেতুম, শুধু তাঁরই স্নেহমাখা প্রবোধ বাক্যে বেঁচেছিলুম।"

বীণা অত্যন্ত ব্যথিত স্বরে কহিল "আচ্ছা ভাই সেবারে যখন তোর টাইফয়েড হয়েছিল, তখনও কি বাড়ী থেকে সেবা যত্ন করতেন না ?"

মলিনা। "হায়রে অদৃষ্ট! তা'হলে ত বুঝ্‌তুম যে আমার চৌদ্দপুরুষের ভাগ্য। আমার জন্যে তাঁর প্রাণে কিছুমাত্র মায়া মমতা আছে। আমি জ্বরে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে থাকতুম, কিন্তু তাতেও একটী দিনের তরে রাত্রে বাড়ীতে থাকতেন না। তার ওপরেও যদি সময় মত তাঁর খাওয়া দাওয়া না পেয়েছেন তাহ'লে ভয়ানক কাণ্ড। বোন তখন দুঃখে প্রাণ ফেটে গেছে, আকুল প্রাণে ভগবানকে বলেছি আর যেন ভালো না হই, কিন্তু অদৃষ্টে আরও ভোগ ছিল ব'লেই ভালো হলুম। সে সময়ে যদি আমার মা ও ভাসুর না থাকতেন তাহলে না জানি আরও কত দুর্গতি হ'ত। তাঁরা দেবতার মত আহার নিদ্রা ছেড়ে এই পোড়াকপালীর সেবা যত্ন করেছেন। বোন, দুঃখের কথা বলতে বসলে সব মনে পড়ে যায়, একবার তিনি কঠিন পীড়িত হয়েছিলেন, হাজার হোক তিনি খারাপ হোন্ শত রকমে আমাকে জ্বালান, তবুও তিনি আমার স্বামী, হ্যাঁ তাঁর সেই অসুখের সময় দিবারাত্র আহার নিদ্রা ছেড়ে চার পাঁচ দিন পর্য্যন্ত তাঁর সেবা করলুম। সেই তাঁর বৎসরাধিক কাল পরে বাড়ীতে রাত্রি যাপন। যাক তার পরে যেদিন দিনের বেলা একটু ভালো থাকতেন সেই দিনই বৈঠকখানাতে সমস্ত দিন আমোদ আহ্লাদের চূড়ান্ত হোত, আর আমাকে তার সব সাজসরঞ্জাম জোগাতে হত। আবার সন্ধ্যাবেলা যখন শরীর খারাপ হো'ত তখন ভিতরে আসতেন, আমাকে আবার হাসিমুখে সাম্‌নে গিয়ে সেবার জন্য প্রস্তুত হ'তে হয়েছে। বলত বোন কোন্ প্রাণে হাসি আসে মুখে ?"

বীণা। "সত্যি মলিনা তোর ভাগ্যে এত দুঃখ ভোগ ছিল তা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি, মনে করেছিলাম যে তোর খুব বড় লোকের ঘরে বিয়ে হ'য়ে খুবই ভালো হ'ল।"

মলিনা। "এটাই ত আমাদের বুঝবার ভুল, যাক এখন মনে স্থির সঙ্কল্প করেছি আর সে অসহ্য যন্ত্রণা সইতে যাব না, যে রকমে হো'ক মা, মামাদের কাছেই পড়ে থাকব।"

বীণা। "তোর মামা মামীমারা ত তোকে খুবই স্নেহ করেন কিন্তু ভাই স্বামীর ভালোবাসা না পেলে যে জীবন বৃথা। তোর এই অল্প বয়সে জীবন এমন বিফলে চ'লে যাচ্ছে এটা কি কম আক্ষেপের বিষয় ? ভগবান করুন যোগেশ মানুষ হো'ক তার বিমল ভালোবাসায় আবার তুই খুসী হ'।"

মলিনা। "সে আশা আর নাই বোন, এখন মনে স্থির করেছি যে—"

"আর না খেলিব আমি সংসারে খেলা লো,
কাঁদিতে দিয়েছে বিধি সতত কাঁদিব লো,
আর না তাহার কথা আমারে বলিস্ লো।"

তিনি ভালো থাকুন, সুখে থাকুন আমি এই চাই। এই চার বৎসর যে ভীষণ মর্ম্মযন্ত্রণা আমি সহ্য করেছি, তা ভগবান না করুন যে আমার অতি বড় শত্রুও পায়। এখন মনে করেছি দিদিও বলেছেন, কিছু টাকা দিয়ে এখন একটী আশ্রম খুলব যাতে আমার মত স্বামীর অত্যাচারে পীড়িতা হতভাগিনী ভগিনীদের ও অনাথা বিধবাদের সৎশিক্ষা দিয়ে সমাজের কাজের জন্যে তৈরী করব। নিজে তাহার তত্ত্বাবধান করে ভগবানের নাম জীবনের সম্বল করে এই হতভাগ্য জীবন কাটিয়ে দিব, দিদি আমাকে খুব সাহায্য করবেন। ভগবান আমার সহায় হউন্,—

"তারত শ্মশান মাঝে আমিয়ে দুঃখিনী বালা,
দুঃখের মূরতী করি বিধি মোরে পাঠাইলা।
না বুঝিলাম ভালোবাসা, নাহি সুখ, নাহি আশা,
কারে কব এ দুর্দ্দশা কে বুঝিবে মর্ম্ম জ্বালা।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাস্তবিক আমাদের দেশে বাঙ্গালীর প্রতি ঘরে ঘরে এইরূপ নিত্যনূতন ঘটনা ঘটিতেছে, ও কত নিরাশ্রয়া অনাথা নির্দ্দোষী বালিকার জীবন চিরতরে বিফল হইয়া যাইতেছে। আমি আমার এই অক্ষম লেখনীর সাহায্যে একটী ছোট খাটো দৃষ্টান্ত প্রিয় পাঠক পাঠিকার সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। আশা করি যে এই মর্ম্মব্যথা পড়িয়া আমাদের দেশের স্নেহময় পিতা ও অভিভাবকেরা তাঁহাদের যুক্তকোড়া ধনের ধন, স্নেহের পুত্তলিগুলিকে কোন অর্থ লোভিয়া মূর্খ গোঁয়ার জামাতার হস্তে অর্পণ না করেন। যদি একটী অবলা ভগিনীরও কিছুমাত্র উপকার হয় তাহা হইলে আমার এই অক্ষম লেখনীর অসীম সাহসিকতা সার্থক লাভ করিবে। আমার ভাষার মাধুর্য্য নাই, শুধু একটী হতভাগা জীবনের করুণকাহিনী যা তা ভাষা দিয়া লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি, পাঠকবর্গের নিকট সবিনয় নিবেদন ত্রুটী লইবেন না।

"ভারত নারীর দশা ভাবিতে প্রাণ বিদরে,
দেখে বিবাহ মূরতী দু'নয়নে অশ্রু ঝরে।
রূপে গুণে অতুলনা, যত ভারত ললনা
দলিত কুসুম সম অনাদরে অত্যাচরে।
ভারত যুবকগণ, কর কর দরশন,
জননী ভগিনীগণ, ভাসিছে দুঃখসাগরে।
গৃহ লক্ষ্মীরূপা যারা, মৃত প্রায় আছে তাঁরা,
তাই এত পাপ তাপ, ভারতের ঘরে ঘরে।
অবলার যত্ন বিনা, ভারতের এ যাতনা
ঘুচিবে না ঘুচিবে না শত যুগ যুগান্তরে॥"

Printed by P. N. Pal, at the Shastrapracher Press, 5 Chidammudi Lane, and
Published by P. N. Pal, 26-3 Scott Lane, Calcutta.

Book No.....
LIBRARY.

বিপ্র ও শৈব্যা।

Engraved & Printed by—Lakshmibilas Press.

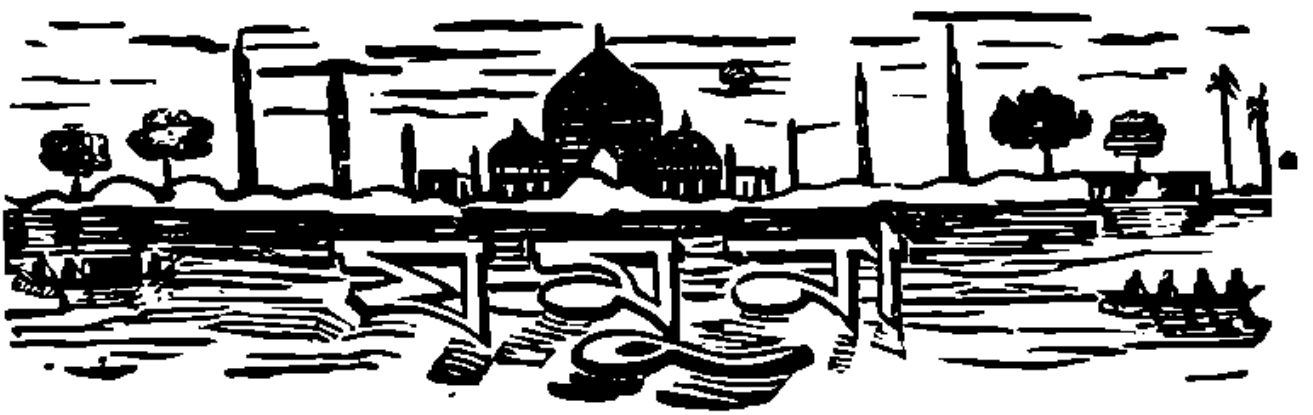

১১শ বর্ষ | মাঘ, ১৩২৮ | ১০ম সংখ্যা

বাণী-আবাহন

(শ্রীলীলাদেবী)

বিন্নীঝনিকৃত ঝীবাটে হে
কল্লোলিনী কল পল্লী ঘাটে হে
নিকুঞ্জ মঞ্জরী মল্লী পাটে হে
জাগো মাগো শতদলবাসিনী

মৃত্যু জর্জ্জর বনগিরি নদ্ম
সুন্দর সুর অজ্ঞান অন্ধ
কুঞ্চিত শঙ্কিত বঞ্চিত বন্ধ
জাগো মা সরস্বতী তারিণী

অবিদ্যা কলুষিত নিপীড়িত কাম্য
সৌধ বিচিত্র নগর সুরম্য
ছেদ খেদ নির্ব্বেদ নাই শুভ সাম্য
জাগো মাগো শতশুভকারিণী

জল শুষ্ক পুষ্প বিশুষ্ক শীর্ণ
শুষ্ক তরঙ্গ নির্ঝর জীর্ণ
বিস্মিত বর্জ্জিত ক্ষোভিত জীর্ণ
জাগো পদ্মা বিদ্যা হে যোগিনী

শত শত ষোল কলা সুবিমল চন্দ্রে
নিন্দিত যে আনন্দ অতুলন ছন্দে
বিস্মৃত বিশ্ব যেই গীতানন্দে
মণিময় বিক্রম ধারিণী

ঝঙ্কার ঝঙ্কার টঙ্কার সে বাণী
গম্ভীর সুমধুর ওঙ্কার নাদিনী
হে হংসবাহিনী হে বিশ্ববাসিনী
জাগো মাগো অপরূপা কামিনী!

বংশের কলঙ্ক।

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সাবিত্রীর উপাখ্যান।

রামসদয়বাবু ছেলেদের পড়ার ঘরে আসিয়াছেন। এমন যে তিনি আসেন না তাহা নহে, তবে আজ যে সময়ে আসিয়াছেন, এমন সময়ে প্রায় আসেন না। আর একটা নূতনত্ব এই যে, আজ তাঁহার হাতে একখানি মহাভারত! তাঁহার হাতে মহাভারত যেন অনেকটা ভূতের মুখে রাম নামের মত। ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল বটে, কিন্তু তিনি বহুদিন যাবৎ ঐ সকল সাহিত্যচর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়া তাঁহার পক্ষে রামায়ণ মহাভারতের সম্পর্ক বড় একটা ছিল না। আজ কয় দিন যাবৎ কোনও বন্ধুর সহিত তাঁহার আর্য্যমহিলাদের সম্বন্ধে বিষম তর্ক হইতেছিল। তিনি তাঁহার মতের সপক্ষে কোন যুক্তিপ্রমাণ দিতে না পারিয়া হারিয়া যান। যৌবনে যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতেন তখন তিনি তাঁহাদের সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকে মহিমময়ী আর্য্যমহিলাগণের কয়েকটা চরিত্রচিত্র দেখিয়াছিলেন। তাঁহাদের আচার ব্যবহার, চালচলন এবং কথাবার্ত্তার ভঙ্গী অনুভব করিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, প্রাচীনকালের আর্য্যমহিলারা শিক্ষিতা বিদুষী এবং কুললক্ষ্মীস্বরূপা ছিলেন। সেই সকল

কথা অস্পষ্ট ছায়ার ন্যায় তাঁহার মনের একটা অংশ অধিকার করিয়া থাকিত। তাঁহার তার্কিক বন্ধুর ধারণা ইহার বিপরীত; তাঁহার মতে আর্যমহিলারা এখনকার মত কেবলমাত্র ঘরকন্না লইয়াই থাকিতেন, শিক্ষার সঙ্গে তাঁহাদের কোনও সম্পর্কই ছিল না। ঘোর তর্কবিতর্কের পর যখন যুক্তিতর্কের অভাবে তাঁহার পরাজয় ঘটিল, তখন তিনি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার মতপোষক প্রমাণ সংগ্রহে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তাঁহার মনে পড়িল, আর্যমহিলার আদর্শ সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী। এই সকল প্রাতঃস্মরণীয়া আর্যকুললক্ষ্মীরা কি ভাবে জীবনযাপন করিতেন? লাইব্রেরীর সংস্কৃত পুস্তকের আলমারিরায় খুঁজিতে খুঁজিতে প্রথমেই মহাভারতখানা হাতে ঠেকিল। কাজেই ঐখানা লইয়া সরাসর তিনি ছেলেদের পড়ার ঘরে আসিলেন। সেখানে রমেশ তখন অনিলা ও অমিয়কে পড়াইতেছিল; সরোজ বাড়ী ছিল না।

পাঠের সময়ে কর্তাকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। অনিলা চিরদিনই বাপের আদুরে মেয়ে, তাহার উপর সংসারে "গৃহিণী"; কাজেই তাহার ন্যায় চঞ্চলা স্বেচ্ছাপরায়ণা বালিকা যে পিতাকে দেখিয়া বই ফেলিয়া ছুটিয়া গিয়া তাঁহার হস্ত হইতে পুস্তকখানি কাড়িয়া লইয়া বলিবে, "কি বই ওখানা বাবা, আমি প'ড়ব।" ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? রামসদয় বাবু মনে মনে কিঞ্চিন্মাত্র বিরক্ত না হইলেও বাহিরে বিরক্তির ভাণ করিয়া বলিলেন, "আহা হা, কি করিস নিলা, তোর কি সব তাতেই দরকার? যে, বই যে। যা, আজ তোদের ছুটি, রমেনকে এখন একটু দরকার আছে। সরোজ বাড়ী থাকলে অবশ্য তোদের ক্ষতি করতে আসতুম না।"

ছুটির কথা কর্ণকুহরে পশিবামাত্র অমিয় একটা উৎকট হর্ষধ্বনি করিয়া 'আয় দিদি' বলিয়া একলম্ফে ঘরের বাহির হইয়া গেল; কিন্তু অনিলা এক পাও নড়িল না, সে গম্ভীরভাবে একখানি চেয়ারে বসিয়া রহিল। তাহার ভাব দেখিয়া রামসদয়বাবু বিস্মিত হইলেন। চসমাটা কপালের উপর তুলিয়া ধরিয়া অনিলার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "নিলা (অনিলাকে আরও একজন 'নিলা বলিয়া ডাকিত, তাহার কথা পরে হইবে) তুই বসে রইলি যে, খেলতে যাবি নি?"

অনিলা বলিল, "না, আমি শুনবো।"

রামসদয়বাবু বলিলেন, "পাগলী কোথাকার, তুই কি শুনবি? তোর ভাল লাগবে না। এ সব মহাভারতের কথা।"

অনিলা বলিল, "আমি মহাভারত রামায়ণের কথা খুব ভালবাসি। স্কুলে আমরা কত পড়েছি বাবা। শুনবে মহাভারতের কথা?—'আসীন্নাজা নলো নাম বীরসেনো সুতো বলী।' এটা নলোপাখ্যানের গোড়া। আরও শুনবে—'ততঃস্নুষা মহারাজ কৈকেয়ী বাক্যমব্রবীৎ। পপাত সহসা ভূমৌ নিশ্চেষ্টশ্চ তবত্তদা।' মাষ্টার মশাই কি আর সরোজদাই কি, কেউ রামায়ণ মহাভারত মুখস্থ বলতে পারে না। হাঃ হাঃ।"

সরলা বালিকা পাখীর মত আরও কত কি বলিয়া যাইত, কিন্তু রমেশ তাহার বাক্যস্রোতে বাধা দিয়া বলিল, "অনিলা, কি ছেলেমানুষী করছ, থাম। হাঁ, আমায় কি করতে হবে বলুন।" শেষ কথাটা যে কর্তাকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত হইল, ইহা বলাই বাহুল্য।

কর্তা বলিলেন, "না, এমন কিছু নয়, এই বই-খানা থেকে সীতা, সাবিত্রী বা দময়ন্তীর উপাখ্যানটা প'ড়ে শুনাতে হবে। বুড়ো মানুষ, কোথায় কি আছে, খুঁজে বারকরতে পারি নি।"

রমেশ মহা ফাঁপরে পড়িল। সে লেখাপড়া করে বটে, সংস্কৃত বাঙ্গালা জানে বটে, কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের কোথায় কি আছে, তাহা সে জানিবে কিরূপে? ক্লাসের টেক্সট্ বুকে যতটুকু আছে, তাহার

বেশী সে বড় একটা কোন বিষয়ের খোঁজ রাখিত না। এখন এত বড় প্রকাণ্ড মহাভারত সমুদ্রের কোথায় মন্থন করিয়া সে ঐ সব উপাখ্যান পাইবে? অনিলা তাহার বিপদ দেখিয়া ব্যস্তচিত্তে বলিল, "মাষ্টারমশাই, সাবিত্রী আর দময়ন্তীর উপাখ্যান বনপর্ব্বের সূচি দেখলেই পাবেন এখন। তবে রামসীতার গল্প মহাভারতে আছে বটে, কিন্তু সে ছোট, মূল বাল্মিকীর রামায়ণে সীতার কথা ভাল আছে।"

রামলালবাবু বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে অনিলার পানে তাকাইলেন। আনন্দে গর্ব্বে তাঁহার বক্ষঃস্থল স্ফীত হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল যেন তিনি সেই অতীত যুগের ভারতের মহিমময়ী আর্য্যমহিলার সাকার বিগ্রহকে নয়নগোচর করিতেছেন। অনিলা তাঁহার কেবল সরস্বতী নহে, সে তাঁহার গৃহের লক্ষ্মীও বটে। লোকজনের আহারাদির ব্যবস্থা করিতে, দেবতা অতিথি অভ্যাগতের সেবা করিতে, সংসারের আর্ত্তপীড়িতের শুশ্রূষা করিতে, দাসদাসী ও আত্মীয়-পরিজনকে নানা উপায়ে তুষ্ট ও অনুগত করিয়া সংসারের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে, নিত্য সংসারের আবশ্যকাদির প্রতি খরদৃষ্টি রাখিয়া সংসারের স্বচ্ছলতা বিধান করিতে এই বালিকাবয়সে তাঁহার অনিলা ত' সেই অতীত ভারতের গৌরবময়ী মহিয়সী আর্য্যনারীরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছে। প্রকাশ্যে বলিলেন, "এত কোথায় শিখলি মা? তোর দাদার বা মাষ্টারমশায়ের কাছে যে নয়, তা জানি। তারা পাসের উপর পাস করেছে বটে, কিন্তু দেশের সাহিত্যের ধার ধারে না। ঐ বড় জোর, ক্লাসের টেক্সট্ বুক পর্য্যন্ত ওদের বিদ্যের দৌড়। হাঁ, সাহিত্যের চর্চ্চা করে বটে অরুণ, তা সংস্কৃতই কি, ইংরেজীই কি। অন্য বিষয়ে যা হ'ক, মেঘদূত, কুমার, রঘু, প্যারাডাইজ লষ্ট গড় গড় মুখস্ত ব'লে যেতে পারে।

অনিলা টেবিলের উপর হইতে হঠাৎ একখানি বই লইয়া পাঠে মনঃসংযোগ দিল, সে কোনও কথা কহিল না। রমেশের চক্ষুর দৃষ্টি অনিলার উপরেই ছিল। কি জানি কেন রমেশের ক্ষুদ্র মিটমিটে চোখ দুটী অনিলাকে পুস্তকের আড়ালে মুখ লুকাইতে দেখিয়াই অকস্মাৎ ধক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; সেই মার্জ্জার চক্ষুতে তখন যেন জগতের সমস্ত শয়তানি, ক্রূরতা কঠোরতা এবং হিংসানল একসঙ্গে প্রতিভাত হইল; কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর নরহত্যা-বাসনা দৃষ্টি আর কেহ লক্ষ্য করিল না। মুহূর্ত্তমাত্র সেই দৃষ্টিটা রমেশের চোখের কোণে অবস্থান করিল, তৎপরেই রমেশ বেশ প্রকৃতিস্থের মত সহজ সরলকণ্ঠে বলিল, "হাঁ, অরুণের ওসব খুব আসে। শুনেছি কলেজে পাঠ-কালেও অরুণের হাতে বাজে বই থাকে। রেনল্ডের 'মিষ্ট্রীজ. বোকাসিয়োর 'ডেকামেরণ', বাইরণের 'ডন জুয়ান', জোলার 'নানা' আর 'নানাস ডটার' ইত্যাদি যে সকল বই প্রোফেসাররা পড়তে বারণ করেন, সেই সকল বই ওর কাছে রাত দিন পাবেন।"

অনিলা কেতাব হইতে চোখ নামাইয়া রমেশের দিকে চাহিল। তাহার চোখ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল বটে, কিন্তু কেহ তাহা দেখিতে পাইল না। সে রমেশকে কিছু না বলিয়া পিতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "সাবিত্রীর উপাখ্যানটা পড়বে বাবা? মাষ্টারমশায়ের ও সব ভাল লাগে না। উনি পরের নামে অনেক শোনা কথা বলেন বটে কিন্তু নিজের কথা চেপে রাখেন।"

রমেশ ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "কি রকম?"

অনিলাও সমান ওজনে বলিল, "রকম আবার কি? আপনি যা করেন তা সকলের কাছে বলে বেড়ান কি? তবে পরে কি করলে না করলে তা নিয়ে এত নাড়া চাড়া করেন কেন? এটা কি ভাল?"

রমেশ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "দেখ, ছেলে মুখে বুড়ো কথা ভাল শোনায় না। আবার কি

বলা না বলা কর্ত্তব্য, তা আমি জানি আমায় ত শেখাতে হবে না—"

রমেশ আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু এই সময়ে রামসদয় বাবু বলিয়া উঠিলেন, "আহা হাঃ, কি ছেলেমানুষের মত ঝগড়া করছ রমেশ, যেতে দাওনা। স্ত্রীর সঙ্গে আবার তর্ক, হাঃ হাঃ হাঃ। নাও, সাবিত্রীর উপাখ্যানটা পড় দেখি।"

রমেশ।—সর্ব্বনাশ! সবটা পড়ে যেতে হবে নাকি?

রামসদয়।—না, না, সবটা না, যেটুকু মূল গল্প, সেইটে বলে যাও।

রমেশ তখন মহাভারত হইতে পড়িতে লাগিল :—অশ্বপতি নামে এক ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা ছিলেন। সাবিত্রী দেবীর বরে তাঁহার এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা জন্মিল, তাহার নাম রাখিলেন তিনি সাবিত্রী। কন্যা সাবিত্রী মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। পরে তাঁহার যৌবনকাল উপস্থিত হইলে সেই রূপগুণযুতা তেজঃপুঞ্জকলেবরা সাবিত্রীকে দেখিয়া কেহই তাঁহার পাণিপ্রার্থী হইতে সাহসী হইল না। তখন রাজা অশ্বপতি কন্যাকে বলিলেন, 'মা! তোমার সম্প্রদান-কাল উপস্থিত, অথচ কেহ তোমায় বরণ করিতে সাহসী হইতেছে না, আমার নিকট তোমাকে প্রার্থনাও করিতেছে না। অতএব তুমি স্বয়ং আপনার গুণ-সদৃশ স্বামী অন্বেষণ কর।

রামসদয় বাবু সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "কি, কি বল্‌লেন? রাজা যুবতী কন্যাকে বল্‌লেন তুমি আপনার গুণ-সদৃশ স্বামী খুঁজে নেও?' বহুৎ আচ্ছা। এ হ'তে আর্য্যমহিলার শিক্ষার প্রমাণ আর কি থাকতে পারে? রাজা ত' বল্‌লে পারতেন, তোমার রূপবান বর খুঁজে নাও, কেন না তিনি জানতেন 'কন্যা বরয়তে রূপম্।' কিন্তু তা না ব'লে বল্‌লেন কি না, তোমার যেমন গুণরাশি বিদ্যমান, অর্থাৎ তুমি যেমন আচার বিনয় বিদ্যা আদিতে শিক্ষিতা, সেইরূপ বিদ্বান, শিক্ষিত, শিষ্টাচার সম্পন্ন গুণবান বরকে তুমি খুঁজে নেও।' যদি সাবিত্রী যৌবনশালিনী এবং শিক্ষিতা না হবেন, তা হ'লে রাজা তাঁর উপর এত বড় একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেবেন কেন? বাপ! বিবাহ কি একটা সহজ ব্যাপার যার উপর সারা জীবনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নির্ভর করছে? যাক তার পর?"

রমেশ।—রাজা অশ্বপতি আরও বল্‌লেন যে, খুঁজতে খুঁজতে যে পুরুষ তোমার মনোমত বলে বিবেচিত হবেন, তাঁর কথা আমায় এসে বোলো, আমি বিবেচনা ক'রে তোমায় সম্প্রদান ক'রব। সাবিত্রী অবশ্য পিতার কথায় অত্যন্ত লজ্জা বোধ করলেন; কিন্তু তা হ'লেও পিতার আদেশ পালনের জন্য বরান্বেষণে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে বিশ্বস্ত বৃদ্ধ মন্ত্রী ও অনুচর চললেন।

রামসদয়।—ঠিক, রাজার মেয়ের এইরকম ভাবেই যাওয়া উচিত। তার পর?

রমেশ।—তার পর সাবিত্রী নানা দেশ দেশান্তর, তীর্থ, আশ্রম ইত্যাদি ঘুরে মন্ত্রিগণের সঙ্গে রাজের নিকট ফিরে এলেন। তখন সেখানে ত্রিকালজ্ঞ ঋষি নারদ বসে ছিলেন। সাবিত্রী তাঁদের চরণবন্দনা ক'রে জিজ্ঞাসিত হয়ে বল্‌লেন যে শাল্বদেশে দ্যুমৎসেন নামে রাজার পুত্র সত্যবানই তাঁর মনোনীত স্বামী। কিছুকাল রাজত্বের পরে দ্যুমৎসেন অন্ধ হয়ে পড়েন। সেই সময় তাঁর একমাত্র পুত্র সত্যবান বালক। সেই সুযোগে এক প্রতিবেশী পূর্ব্বশত্রু তাঁকে রাজ্যচ্যুত করে। তিনি পত্নী ও বালক পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে বনবাসী হইয়েছেন।

রামসদয়।—রাজা কি বল্‌লেন?

রমেশ।—রাজা কন্যার মুখে এই কথা শুনে দেবর্ষি নারদকে সত্যবান সম্বন্ধে পরিচয় দিতে বল্‌লেন। নারদের সর্ব্বত্র গতিবিধি ছিল, বিশেষতঃ তিনি যোগবলে অতীত, বর্ত্তমান, ও ভবিষ্যতের সব কথাই জানতে পারতেন।

রামসদয়।—হাঁ, তা জানি। তার পর?

রমেশ।—নারদ বল্‌লেন, পাত্রটী খুব ভাল। রূপে গুণে কুলে, শীলে অমন পাত্র পাওয়া অনেক সৌভাগ্যের কথা। কেবল একটা দোষ আছে পাত্রের, সেটা সাংঘাতিক, সে দোষ অতি যত্নের দ্বারাও অতিক্রম করা দুঃসাধ্য।

রামসদয়।—কি রকম?

রমেশ।—সে দোষটী এই যে আজ হ'তে এক বৎসর পূর্ণ হ'লে সত্যবানের মৃত্যু হ'বে।

রামসদয়।—সর্ব্বনাশ!

রমেশ।—রাজা শুনে একবারে মরে পড়লেন। কন্যাকে বল্‌লেন, 'সাবিত্রি! সত্যবানের সঙ্গে তোমার বিবাহ হ'তে পারে না। তার চাইতে গুণ থাকলেও যখন তার আয়ু নেই, তখন তোমায় আমি জেনে শুনে তার হাতে দিতে পারি নি। তুমি সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করার সঙ্কল্প ত্যাগ করে অন্য পতি গ্রহণ কর। আমি কিছুতেই সত্যবানের হাতে তোমায় দিব না।'

রামসদয়।—তাতে সাবিত্রী কি বল্‌লেন?

রমেশ। সাবিত্রী বল্‌লেন, "অংশ অর্থাৎ পৈত্রিক বিষয়ের বিভাগ নির্ণয় করে ওটী, সেই ওটী একবার ফেলতে হয়। লোকে কন্যাকে একবার প্রদান করে, 'দান করলুম' এ কথাও একবার বলে, এই তিন বিষয় এক এক, বারই হয়ে থাকে। অতএব আমি একবার যাঁকে পতি ব'লে মনে মনে বরণ করেছি, তিনি দীর্ঘায়ু হউন বা অল্পায়ু হউন, গুণবান হউন বা নির্গুণ হউন, আমি তাঁকে ভিন্ন অপর কাকেও আর পতিত্বে বরণ করতে পারবো না। এখন অপরকে মনে স্থান দিলে আমি ব্যভিচারিণী হব। যেমন লোকে মনে মনে কোনও বিষয় নিশ্চয় ক'রে পরে বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করে এবং শেষে কর্ম্মের দ্বারা তার অনুষ্ঠান ক'রে থাকে, অতএব উপস্থিত বিষয়ে আমার মনই প্রমাণ।"

রামসদয় বাবু পরম তৃপ্তির ভাব প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বস্! আর শোনবার দরকার নেই, এই যথেষ্ট। এঁা, এই আমাদের আর্য্যমহিলার আদর্শ, আর মুখ্যু রাস্কেলরা বলে কিনা, আগেকার আর্য্য-মহিলারা এখনকার মেয়েছেলেদের মত ঘেনঘেনে পেনপেনে দাসী বাঁদীর সামিল ছিল? সিম্‌প্লি এবসার্ড (যা নয় তাই)? ফুলিশ (ভাহা মুখুমি)! ওঃ কি তেজ, কি গাম্ভীর্য্য, কি দৃঢ়তা, কি নারীত্ব-মর্য্যাদা-জ্ঞান, অথচ কি লজ্জা, কি সরলতা, কি বিনয়, কি অদ্ভুত পতিপরায়ণতা! এমন চরিত্রের সামনে মাথা আপনি নুয়ে আসবে না? যমের কাছ থেকে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে নেওয়ার চিত্রটা নাই বা ধরলুম, কেবল এই গোড়াকার চিত্রটা দেখ দেখি? 'যাঁকে মনে মনে একবার পতি বলে বরণ করেছি তাঁকে ছেড়ে অপরকে মনে স্থান দিলেও ব্যভিচারিণী হ'ব,—' এত বড় কথা কেবল এদেশের আর্য্যমহিলাই বল্‌তে পেরেছে। তা না হ'লে তারা হাসতে হাসতে অসহব্রত পালন করতে পারে? তাব দেখি রমেশ, তখনকারকালে আর্য্যমহিলারা কি উচ্চ শিক্ষাই পেতেন!"

রমেশ। উচ্চশিক্ষার কথাটা এই উপাখ্যানে কোথায় এল?

রামসদয় বাবু সাশ্চর্য্যে বলিয়া উঠিলেন, "এঁা, বল কি রমেশ? তুমি একটা এডুকেটেড ম্যান (শিক্ষিত) হ'য়ে বলছ কি না যে সাবিত্রীর উচ্চশিক্ষার প্রমাণ এই গল্পে কোথায়? ওঃ! তা হলে তুমি সাবিত্রী-উপাখ্যানের স্পিরিটে (ভিতরকার জানটাতে) এণ্টার (প্রবেশ) করতে পার নি।"

রমেশ বিরক্ত হইয়া বলিল "কেন? এর আবার বোঝাটা শক্ত কি? সাবিত্রী সতী ছিল এইটে জানা যায়, কিন্তু উচ্চশিক্ষা পেয়েছিল, তার প্রমাণ কি?"

রামসদয় বাবু হর্ষভরে বলিলেন, "উচ্চশিক্ষা পান নি? তিনি পুঁথির তাড়া বগলে ক'রে টোলে গিয়ে বসেছিলেন, এমন কথা উপাখ্যানের কোনও খানে নেই বটে, কিন্তু তা ব'লে তুমি যতটুকু প'ড়ে শোনালে,

তার মধ্যেই তাঁর উচ্চশিক্ষা পাওয়ার সম্বন্ধে যুক্তি যুড়ি প্রমাণ আছে।"

রমেশ।—কি রকম?

রামসদয় বাবু বলিলেন, "এই ধর না, রাজা অশ্বপতির সাবিত্রীকে পতিনির্ব্বাচনের আজ্ঞাদানের কথাটা। রাজা জানতেন, তাঁর কন্যা উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে, সে কখনও পতি নির্ব্বাচনে ভুল করবে না, তাই তার উপর অত বড় একটা ভার দিয়েছিলেন।"

রমেশ।—ওটা ত আপনি মন থেকে টেনে বুনে বলছেন।

রামসদয়।—মন থেকে তার আন্‌বো না ত' কি বন থেকে আন্‌বো? ইংরেজীতেই ত' পড়েছ, 'লজিকাল ইনফারেন্স' (ন্যায়যুক্তিসঙ্গত ধারণা) ব'লে একটা কথা আছে। চাক্ষুষের প্রমাণের উপর যে সকল জিনিষেরই অস্তিত্ব নির্ভর করে এমন কথা নেই, অনুমান বলেও ত' একটা কথা আছে। তোমার প্রফেসারকে তুমি কখনও স্কুল কলেজে পড়তে দেখ নি, অথচ তিনি তোমাদের এম, এ, ক্লাসে পড়াচ্ছেন দেখছ; তখন তিনি যে এম, এ, ক্লাসে পড়াবার উপযুক্ত বিদ্যা অর্জ্জন করেছেন, সেটা তোমায় অনুমান করে নিতে হবে। সেই রকম সাবিত্রীর শিক্ষার সম্বন্ধে উপাখ্যানে কোনও স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ না থাকলেও তার কার্য্যকলাপ দেখে সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা করে নিতে হবে।

রমেশ।—বেশ, আর কোনও প্রমাণ আছে?

রামসদয়।—নেই? ঢের আছে। যখন সাবিত্রীর বাপ সাবিত্রীকে সত্যবানের পাণিগ্রহণের বাসনা ছাড়তে বল্‌লেন, তখন সাবিত্রী কি বলেছিলেন? ঐ যে অংশ অর্থাৎ পৈত্রিক বিষয়ের ভাগ নির্দ্দেশ করার ওটা দেদার কথা, ওটা আর কন্যাকে একবার দেওয়ার কথা সাবিত্রী জানলেন কি ক'রে? ও সব যে স্মৃতি শাস্ত্রের কথা। শিক্ষা না হ'লে সাবিত্রীর ও সব কথা জানবার সম্ভাবনা ছিল না। তা হলেই বুঝতে হবে সাবিত্রী টোলে না পড়লেও বাপ মার কাছে এবং মুনি ঋষিদের মুখের উপদেশে রীতিমত শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

অনিলা এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া কথা শুনিতেছিল। সে এইবার কথা কহিল, বলিল, "কেন বাবা, সীতাও ত' কত জায়গায় বলেছেন, 'আমি পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনবর্গের নিকট এই শিক্ষা পেয়েছি,' 'আমি ব্রাহ্মণ ও ঋষি তপস্বীদের মুখে শুনেছি।"

রামসদয় বাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন "হাঁ মা, তাই বটে। তা, সীতা সাবিত্রী আমাদের দেশের আদর্শ আর্য্যনারী, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারলে আমাদের মেয়েছেলেরা সংসারের লক্ষ্মী হ'তে পারে, ধন্য হতে পারে। তাঁরা যেমন শিক্ষিতা হয়েছিলেন, সেই রকম সব ঘরে হ'ক। নারীর উন্নতি না হ'লে দেশে সুসন্তান জন্মাবে কেমন ক'রে?"

অনিলা আবার বলিল, "আর বাবা, সাবিত্রীর উপাখ্যানের শেষটা কি চমৎকার! সাবিত্রী যমের সঙ্গে কেমন উত্তর প্রত্যুত্তর করেছিলেন, মনে আছে ত'?"

রামসদয় বাবু বলিলেন, "মনে নেই? মনে সবই আছে, তবে একবার চান্‌কে নিলুম। খুব বেশীরকমের শিক্ষিতা না হ'লে যমের সঙ্গে সাবিত্রী কি অমন কথাবার্ত্তা কইতে পারতেন, কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করে নিতে পারতেন? বলে কি না, শিক্ষিতা ছিল না—"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে বাহিরে একটা গোল উঠিল, অনেকের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। সকলে চমকিয়া উঠিয়া ঘরের বাহির হইতে না হইতে একটা ভৃত্য দৌড়াইয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে যাহা বলিল, তাহাতে সকলেরই

প্রাণ উড়িয়া গেল, রামসদয় বাবুর মুখখানা ভয়ে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, অনিলা 'ও মা গো!' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কথাটা এই যে, তাঁহারা যখন গভীর আলাপে নিমগ্ন, সেই সময়ে দুষ্ট অমিয় ছুটি পাইয়া ঘরের বাহিরে গিয়া এক কাণ্ড বাধাইয়াছে। বাগানের ধিলে জুমুল ফুল ফুটিত; বহুদিন হইতে অমিয়কুমারের ঐ ফুলের উপর লোভ পড়িয়াছিল। তাহার "কাপ্তেন দাদা" কতদিন সাঁতার কাটিয়া তাহাকে ফুল তুলিয়া দিয়াছে। এখন দুষ্ট অমিয় অল্প স্বল্প সাঁতার কাটিতে শিখিয়াছে; কাজেই এখন তাহার আর অপরের সাহায্যের আবশ্যক কি? সে আজ তাই নিজেই সকলের অজ্ঞাতে জলে নামিয়াছে এবং সাঁতার দিয়া ফুল তুলিতেছে। কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তন কালেই যত গোল বাধিল; তাহার হাত পা তাহার আজ্ঞা মানিল না। হাত পা বশে থাকিল না, পরন্তু তাহার দেহ এলাইয়া পড়িল; সে একবার ডুবিতে ও একবার ভাসিতে লাগিল; শেষে তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল।

আর একটু হইলেই আজ রামসদয়ের সর্ব্বনাশ হইত, তাঁহার ঘরে এতক্ষণ কান্নার রোল উঠিত। দৈবক্রমে সেই সময়ে একটা মালী আঁকসী লইয়া সেই দিকে ফল পাড়িতে আসিতেছিল। সে ঐ ব্যাপার দেখিয়া একবারে চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই সময়ে একজন লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া এক লম্ফে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং সুকৌশলী সন্তরণকারীর ন্যায় অতি ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হইয়া নিমজ্জমান অমিয়কুমারকে ধরিয়া ফেলিল। সে অরুণকুমার। বড় কাকার সহিত দেখা করাই তাহার মূল উদ্দেশ্য, কিন্তু যখনই সে বড় কাকার বাড়িগঞ্জের বাটীতে আসিত, তখনই সে অমিয়কুমারের জন্য কিছু না কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিত। অমিয়কে সে সহোদরাধিক স্নেহ করিত, বালক অমিয়ও পৃথিবীর মধ্যে এক "দিদি" ছাড়া আর সকলের চেয়ে "কাপ্তেন দাদাকে" বেশী ভালবাসিত, এমন কি পিতার অপেক্ষাও সে তাহার "কাপ্তেন দাদাকে" প্রীতির চক্ষে দেখিত। আজ অরুণকুমার তাহার জন্য একটা প্রকাণ্ড খেলার বাঘ আনিয়াছিল। বাঘটার পেটের কলে দম দিলে বাঘ হাঁটে, ডাকে, লেজ নাড়ে।

অরুণকুমার যখন গেটে তাহার রেলি কার্ট হইতে নামিয়া জিজ্ঞাসাবাদে জানিল, অমিয় বাগানের দিকে ছুটিয়া খেলা করিতে গিয়াছে, সেও অমনই গৃহে প্রবেশ না করিয়া বাগানের দিকে চলিল। তাহার মুখে চোখে হাসি খেলিয়া বেড়াইতেছিল। এই বাঘটা পাইলে অমিয় কুমারের মুখে কি আনন্দ ফুটিয়া উঠিবে এবং অমিয় কুমার কি সুধার হাসির উৎস ছুটাইয়া তাহার অঙ্কে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া গলা জড়াইয়া ধরিবে, তাহা ভাবিয়া অরুণকুমারের হৃদয় ভবিষ্যৎ সুখের কল্পনায় বিভোর হইয়া উঠিল। সে খুব লম্বা পা ফেলিয়া বাগানে প্রবেশ করিল। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়াই সে মালীর পরিত্রাহি চীৎকার শুনিতে পাইল। তখনই তাহার সকল সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল, একটা বিষম আতঙ্কে তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল—যদি কাহারও কোন অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে!

অরুণকুমার সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া হাওয়ার মত ছুটিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিল। সে একবার মাত্র অমিয়র মাথাটা জলের উপর ভাসিয়া উঠিতে দেখিয়াছিল। অমনই সে খেলার বাঘটা ফেলিয়া দিয়া জামা জুতা সমেত জলে ঝম্পপ্রদান করিল এবং অত্যল্প সময়ের মধ্যে অমিয়কে লইয়া ঘাটে উঠিল।

যখন রামসদয় বাবু ও অনিলা উদ্ভ্রান্তচিত্তে প্রাণটী হাতে লইয়া দ্রুতপদে বাগানে প্রবেশ করিলেন এবং ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ করিয়া বাগানে উপস্থিত হইল, তখন অরুণ অমিয়কুমারের দেহখানি সযত্নে অঙ্কে ধরিয়া

তাঁহাদের দিকেই অগ্রসর হইতেছিল; তাহার দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশাগ্রভাগ জলাক্ত হইয়া মুখের উপর পড়িয়া মুখের অনেকটা অংশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু সে কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া প্রগাঢ় স্নেহভরে অমিয়কুমারের মুখের দিকে তাকাইয়া হাসি হাসি মুখে বলিতেছিল, "ভয় কিরে অমি! আর ভয় নেই, এই দেখ্ না, আমার কোলে রয়েছিস। তোর জন্যে কত বড় বাঘ এনেছি!"

রামসদয় বাবু তাহার হাতখানি ধরিয়া তাহাকে কি বলিতে গেলেন, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠের স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, চক্ষুদুটী জলে ভরিয়া উঠিল, শরীর ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অরুণ বিস্মিত হইয়া নয়ন উত্তোলন করিতেই দেখিল, রামসদয় বাবুর দৃষ্টি তাহার দিকে নীরব কৃতজ্ঞতার পূর্ণ অঞ্জলি প্রদান করিতেছে। কিন্তু রামসদয় বাবুর পশ্চাতে দুটি ঝলমল-ঝলমল চক্ষুস নীলোৎপল নয়ন কি এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাবাবেশে আচ্ছন্ন হইয়া তাহার পানে সন্নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিয়াছে, অরুণকুমার তাহা দেখিতে পাইল না। সে দৃষ্টি আর একজন লক্ষ্য করিল, সে রমেশচন্দ্র; তাহার মুখখানা অমাবস্যার রাত্রির মত কাল, আঁধার হইয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিষের বিষ।

কর্ত্তা-বাড়ীর আঁস্তাকুড়ের পাশে এক একটা কুকুর থাকে, তারা মনে করে, যেন সেই আঁস্তাকুড়ে গেরস্ত বা কৈলুবে,তাতে তার সম্পূর্ণ অধিকার। সে গেরস্ত বাড়ীর কেউ না, অথচ গেরস্ত দয়া ক'রে আঁস্তাকুড়ে তাকে থাকতে দেয়। সেই অধিকারের বলে গেরস্তর সব জিনিষেই তার অধিকার আছে ব'লে সে মনে করে, আর সেই নিজের কল্পিত অধিকারের দাবীতে আর কোনও কুকুরকে আঁস্তাকুড়ের ত্রিসীমানায় আসতে দেখলে দাঁত খিচিয়ে উঠে।

ভগবানের চিড়িয়াখানা এই দুনিয়ায় রকম বে-রকমের জীব আছে বটে, কিন্তু সকল শ্রেণীর জীবের মধ্যেই এই আঁস্তাকুড়ে কুকুরে বৃত্তির অস্তিত্ব আছে। মানুষ যখন সৃষ্টি-ছাড়া জীব নয়, তখন মানুষের মধ্যেও যে এই জীবের প্রাদুর্ভাব থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

রমেশ এই শ্রেণীর জীব। অরুণকুমারের উপর তাহার দুর্দ্দমনীয় ক্রোধ। অথচ রমেশ নিজেই জানে না, কেন অরুণকুমারকে দেখিলেই তাহার দাঁত খিঁচাইয়া তাড়াইতে ইচ্ছা করে। সাপকে জিজ্ঞাসা কর, সে কেন কামড়ায়, সে বলিতে পারিবে না। সাপ কামড়ায়, কারণ তাহার কামড়ানই স্বভাব। অরুণকুমারের উপর তাহার জাত-ক্রোধ হইবার কারণ কিছুই নাই, এ কথা সে নিজেই জানে, অথচ সে দারুণ ক্রোধ ও হিংসার বশে অরুণের বিপক্ষে বিষের বিষ উদ্গিরণ করে কেন? এটা কি তাহার স্বভাব? কে জানে।

অরুণের হিংসা না করিয়া অরুণকে তাহার ভাইয়ের মত ভালবাসিবারই কথা, কেন না অরুণ তাহার যাহা করিয়াছে, তাহা তাহার আপনার সহোদর ভাই থাকিলে করিত কিনা সন্দেহ। যখন সে ডায়মণ্ডহারবার সাব-ডিবিসনের এক নগণ্য গ্রামের মাইনর স্কুল হইতে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পাইয়া কলিকাতায় আসিয়া হিন্দু স্কুলে প্রবেশ লাভ করিল, তখন সে তাহাদের শ্রেণীতে কয়েকটী সতীর্থের সহিত পরিচিত হইল, অরুণ ও সরোজ তাহাদের মধ্যে প্রধান। আর ইহাদের সহিত পরিচিত না হইয়া থাকিবার যো ছিল না, কেন না সেই বয়স হইতেই অরুণ অর্থে সামর্থ্যে ক্রীড়া-কৌতুকে ক্লাসের "কাপ্তেন" হইয়াছিল। তাহাকে চিনিত না বা ভালবাসিত না, হিন্দু স্কুলে এমন মাষ্টার বা ছাত্র ছিল না। অরুণকুমার যখন রমেশের মুখে শুনিল, রমেশের জলপানীর কয়টী টাকাই তাহার সম্বল, সে তাহার এক জ্ঞাতির বাড়ী ছেলে খাড়ে করিয়া, বাজার হাট

করিয়া দুই বেলা সাহেব গজল মিশ্রিত দুমুঠা ভাত পায়, তখন সে তাহার ওপর আপত্তি না শুনিয়া তাহাকে নিজের বাটীতে লইয়া আসিল। তাহার পরম স্নেহময় পিতা তাহার কোনও সাধে বাধা দিতেন না, কাজেই রমেশ তাহার বাটীতে তাহারই মত পরম আদরে যত্নে এবং সুখে বিলাসে লালিত পালিত হইতে লাগিল। সরোজও গরীবের ছেলে, অথচ বড়মানুষের ছেলের মত লালিত পালিত হইয়াছিল কিন্তু সরোজ নানা সুখ ও ভোগ বিলাসের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকিলেও একদিনের জন্য আপনার অবস্থা বিস্মৃত হয় নাই। তাই সে বৎসর বৎসর সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে লাগিল এবং আত্মতৃপ্তি, আত্মসন্তোষ ও আত্মশান্তির ফলে নিজেও পরম সুখী হইল ও সকলকেই নিজের মধুর স্বভাবে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। রমেশের কিন্তু 'চাল' বিগড়াইয়া গেল। যতই সে বড়মানুষের ছেলের ন্যায় লালিত হইতে লাগিল, ততই তাহার বিলাস ভোগ বাসনা দিন দিন ঘৃতাহুত হুতাশনের ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তাহার দেহের ও বেশের পারিপাট্য সাধনে যত সময় যাইতে লাগিল, লেখা-পড়ায় ততটা সময় করিতে লাগিল। এই জন্য যদিও সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে পাশ হইল, তথাপি বৃত্তি পাইল না।

কিন্তু এ বিষয়ে তাহার অরুণের প্রতি হিংসা করিবার কোনও কারণ ছিল না বরং সরোজের উপর তাহার হিংসা হইবার কথা। অরুণ উপর্য্যুপরি দুই বার ফেল হইল। তাহার পর যে বৎসর সরোজ ও রমেশ দুই আর্টস পাশ হইল, সেই বৎসর সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। তাহার নম্বর জানাইয়া দেখা গেল সে ইংরেজীতে সপ্তম স্থান এবং সংস্কৃতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। তবে গণিতে ও ইতিহাস-ভূগোলে অতি কষ্টে হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে পাশ করিয়াছে। এজন্য সে বৃত্তি পাইল না, মাত্র প্রথম শ্রেণীতে পাশ হইল। সে যে দুইবার ফেল হইয়াছিল, সে দুইবার গণিতই তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, কিন্তু সাহিত্যে তাহার 'কম্পিটিশনের' নম্বর ছিল। তাহার উপর অরুণ দুর্দ্ধান্ত, অকর্ম্মণ্য, অলস, আরাম-প্রয়াসী ও ক্রীড়াপরায়ণ বলিয়া তাহার অখ্যাতি ছিল; সে হিসাবেও অরুণের প্রতি হিংসা না হইয়া সরোজের প্রতি হওয়া সম্ভব। সরোজ উদার ও সরল হইলেও তীক্ষ্ণধী ও লোকচরিত্রাভিজ্ঞ ছিল। অরুণের স্বভাব ছিল ইহার বিপরীত, সে কাহারও গুণাগুণ বিচার করিত না, প্রথম আলাপের পরেই সে নিতান্ত অপরিচিতকেও আপনার বলিয়া মনে করিত। রমেশকে তাই একবার বাটীতে আনিয়াই সে তাহার মত ভালবাসিতে আরম্ভ করিল, রমেশ যে তাহার প্রতি ভালবাসা ছাড়া অন্য কোন মনোবৃত্তি পোষণ করিতে পারে, এ ধারণাই তাহার কখনও হয় নাই। সরোজ কিন্তু লোক চিনিত, সে দুই চারিদিন ব্যবহারের পরই রমেশকে চিনিল; বুঝিল কত সঙ্কীর্ণ, কত খল, কত কপট তাহার মন। রমেশ যে অরুণের সঙ্গে পেটে একখানা মুখে একখানা ব্যবহার করে, তাহা বুঝিয়া লইতে সরোজের বাকি রহিল না। সে সেই জন্য রমেশকে আন্তরিক ঘৃণা করিত এবং কাজেও যখন তখন রমেশকে তাহা দেখাইত। রমেশ এ জন্য তাহাকে ভয় করিত বটে, কিন্তু হিংসা করিত না। আর একজন রমেশকে চিনিতেন, তিনি কালীশঙ্কর বাবু। তিনি পুত্রের মুখ চাহিয়া রমেশকে প্রকাশ্যে কিছু বলিতেন না বটে, কিন্তু মনে মনে তাহাকে পুত্রের অহিতকারী বলিয়া জানিতেন এবং সেইজন্য তাহার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। রমেশ বুদ্ধিমান হইলেও তাঁহার অসন্তোষের কথা ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারে নাই।

সরোজের প্রতি রমেশের হিংসা না হইবার কারণ ছিল। সরোজ বড়মানুষের ঘরে লালিত-পালিত হইলেও নিজে তাহারই মত গরীবের ছেলে, সুতরাং তাহার মত লোকের সরোজের প্রতি হিংসা না হইবারই কথা। কিন্তু অরুণের কথা স্বতন্ত্র;

স্বাস্থ্য, রূপ, ঐশ্বর্য্য শক্তি এ চারিটীর মধ্যে সব কটাই ভগবান অরুণকে অকাতরে বণ্টন করিয়াছেন। তাহার বিদ্যার অভাব, এ কথা সত্য ; সে অলস, বিলাসী, অকর্ম্মণ্য ও ক্রীড়াপরায়ণ, এ কথাও সত্য ; কিন্তু যে সকল গুণ থাকিলে মানুষ মানুষের মন মুগ্ধ করে, অরুণের মধ্যে তাহা যে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল, তাহা রমেশ হাড়ে হাড়ে বুঝিত। অরুণের মত প্রিয়পাত্র ছেলেদের কে ? সে এদিকে কুড়েমি করিয়া বিছানায় শুইয়া থাকে বটে, কিন্তু যখন আবশ্যক হয়, তখন সে দশটা অরুণ হয়। কেন তাহার এত কমনীয়তা, কেন তাহার এত স্বাস্থ্য, এত শক্তি, এত ঐশ্বর্য্য সম্পদ ? কিসে রমেশ অরুণের চেয়ে ছোট ? তবে রমেশই বা পরের অনুগ্রহভিখারী প্রাইভেট টিউটার কেন, আর ঐ অরুণই বা ক্রোরপতির একমাত্র সন্তান কেন ?

স্বাস্থ্য, ঐশ্বর্য্য, শক্তির কথা যদি না ধরা যায়, তাহা হইলে রূপে গুণে সরোজের সমকক্ষ কে ? সরোজের সারা অঙ্গে রমণীর কমনীয় রূপ-লাবণ্য খেলিয়া বেড়ায়। আর অরুণের ?—সব যেন গোঁয়ার-গোবিন্দ মরদানা ভাব। মুখে তার হাসিটা লাগিয়া আছে বটে, কিন্তু সে হাসিটা লোকদেখানো হাসি, যেন লোককে জানাচ্ছে, সে কত ভাল, কত সরল ! আর গুণে সরোজের নখের যোগ্যও সে নয়। সরোজের মত লেখাপড়ায় ভাল কে আছে ? শুধু লেখাপড়া ? কোন গুণে অরুণ সরোজের পাশে দাঁড়াইতে পারে ? দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা ডানপিটেগিরি চাও, অরুণের কাছে পাইবে। অলসতা, বিলাসিতা, অকর্ম্মণ্যতা চাও, অরুণের কাছে পাইবে। অরুণের পাল্লায় পড়ে ভাল ছেলেরাও অধঃপাতে যাইতেছে ! কেবল ফুটবল, ক্রিকেট, স্পোর্ট, এমেচার থিয়েটার আর পিকনিক পার্টি নিয়ে আছে। লেখাপড়ায় মা সরস্বতী ! দু দুবার কেল ক'রে কেঁদে ককিয়ে প্রবেশিকাটা পাশ করেছে বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। তারা আরও পাশ করলে, অথচ অরুণ সেই কাট আর্টসই ঘস্‌ড়াচ্ছে।

তবে ওর কি গুণ দেখে ছেলেরা ভুলে আছে ? অরুণ যা ব'লবে তাই করবে। কেন বল দেখি ? কেন, সরোজ কি কেউ নয় ? অথচ কি আশ্চর্য্য, এই সরোজটাও অরুণের তোষামোদ করে। মূর্খ ! এখনও শত্রুকে চিনিতে পার নাই ! ব্যাধের মায়া-জালে যেমন লুব্ধ পক্ষী আপনিই ধরা দেয়, সরোজটাও তেমনই অরুণের মায়াজালে আপনাকে ধরা দিতেছে। হায় ! হায় ! অরুণকে কেউ চিনিল না। সরোজ সাবধান। অরুণ তোমায় মুগ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হইবে না, সে আরও অনেককে মুগ্ধ করিয়া তোমার সুখের ঘরে আগুন জ্বালিয়া দিবে !

অরুণের অপরাধ অনেক। প্রথম অপরাধ,—সে তাহাকে পথের ধূলা হইতে তুলিয়া আনিয়া ঘরে স্থান দিয়াছে। দ্বিতীয় অপরাধ,—সে তাহাকে সহোদরাধিক স্নেহাদরে রাখিয়াছে। তৃতীয় অপরাধ, সে অন্যত্র থাকিয়া লেখাপড়া করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে সে তাহার বড়কাকা রামসদয় বাবুর বাটীতে চাকুরী করিয়া দিয়াছে, এখনও অর্থে সামর্থ্যে তাহাকে নিত্য সাহায্য করিতেছে।

পৃথিবীতে এক একটা জীব থাকে, যাহারা সকলের চেয়ে আপনাকে ভালবাসে। তাদের কেউ উপকার করলে বা আদর যত্ন করলে, তারা মনে করে, অপরের ঐ কাজের মূলে কিছু স্বার্থ লুকিয়ে আছে। এটা তারা না মনে করে থাকতে পারে না, তাদের নিজের মন দিয়েই তারা পরকে বুঝে থাকে, তার বেশী তাদের মনটা দৌড়তে পারে না। সুতরাং রমেশ বুঝিত, অরুণ তাহার হইয়া যাহাই করুক না কেন, সকলই তাহার কোনও গুপ্ত অভি-সন্ধি সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত করিতেছে। অথচ সেই গুপ্ত অভিসন্ধিটা কি, তাহা রমেশকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিতে পারিবে না, এমনই আশ্চর্য্য !

আশ্চর্য্য ! অরুণ এমনই ব্যবহার করে, যেন এই

পৃথিবীটা তাহারই জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, সে পৃথিবীর জন্য সৃষ্ট হয় নাই। এই পৃথিবীর সকলেই যেন তাহার কত কালের আপনার, তাই সে সকলের কাছেই মিষ্ট কথার, মিষ্ট ব্যবহারের প্রত্যাশা করে। অরুণ সকলের কাছে কাজের আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু নিজে কর্ম্মে অপরাঙ্মুখ, অলসের সেরা, বসিয়া আছে ত' বসিয়াই আছে, ঘুমাইতেছে ত' ঘুমাইতেছেই। সংসারের কোন্ কাজে সে লাগে? অথচ, কি আশ্চর্য্য, সকলেই তার বশ, সকলেই তার কথায় উঠে বসে। কি মোহিনী যাদুই জানে সে! তা না হ'লে এমন যে সরোজ—যার পাদোদক খেলে অরুণের কত গোজন্ম উদ্ধার হয়ে যায়—সেই সরোজটাও যেন তার কত কালের কেনা গোলাম! বাপরে! সরোজের কাছে অরুণের বিপক্ষে একটা কথা বল দেখি—

না, এ যেন হরি-হর! এত প্রণয় কিসের? এমন কি কেউ নাই যে সরোজের চোখ ফুটিয়ে দেয়? এমন কি কিছু নাই, যা নিয়ে এই দুজনের ভালবাসার বাঁধন খসিয়ে দিতে পারা যায়? আছে, আছে, নিশ্চয় আছে, যা নিয়ে সুন্দ উপসুন্দের যুদ্ধ হয়েছিল, যাহ'তে ট্রয় ধ্বংস হয়েছিল, যার উপলক্ষে লঙ্কা ছারেখারে গিয়েছিল, আজও পৃথীবীতে সেই সর্ব্বনাশের কারণ বর্ত্তমান রয়েছে। যতদিন জগতে এই কারণ বিদ্যমান থাকবে, ততদিন বন্ধুবিচ্ছেদের ভাবনা কি? অন্ততঃ একবার বেরে দেখ্‌তে ক্ষতি কি? সরোজের সঙ্গে বিচ্ছেদ হ'লে বাছাধনের আর ছেলে মহলে "কাপ্তেনি" করতে হবে না।

রমেশ তাহার ভবানীপুরের মেস-বাটীর কক্ষে বসিয়া এই সকল কথা ভাবিতে ছিল। অকস্মাৎ তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। মেস-বাটীর পার্শ্বস্থ খোলার বাড়ীতে হঠাৎ কান্নার রোল উঠিল।

রমেশ নামিয়া আসিল। খোলার বাড়ীর দোকানের সামনে আসিয়া দেখিল, সেখানে লোকের ভিড় হইয়াছে। বাধা-নেড়া কপি-কুঁড়োজালি-আঁটা এক বাবাজী খুব হাত মুখ নাড়িয়া বক্তৃতা করিতেছিল। লোকটা বলিতেছিল, "আরে মশাই, আমি কি জানি! এই সবে মসীঘাট হ'তেক্ এসে তোমাকটী সেজে কল্‌কেয় ফুঁ পেড়েছিক্—"

একজন কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মসী ঘাটটী কি, বাবাজী?"

বাবাজী কৃত্রিম কোপের সহিত বলিল, "মুখ্‌খুকে আর বোঝাবেক কত? মসী মসী! মসী জান নি? যা দিয়ে ল্যাপড়ি কর গো তোমরা, তাই গো তাই। ঐ সেই ঘাটে গিয়েছিলুম গো সোঁকালোয়।"

লোকটা হাসিয়া বলিল, "ওঃ তাই বল, কালী-ঘাট! তোমার ও কালী ভাষা বুঝবে কে বল!"

ভিড়ের ভিতর হইতে রুদ্রাক্ষের মালা গলায় বৈষ্ণবিক বসনধারী একজন লোক বলিয়া উঠিল, "ওরে বাপরে! এ ভিটকিলিমি দেখে যে আর বাঁচিনি। যার নাম নিতেও জিবে গোকা পড়ে না কি? কালীঘাট না ব'লে মসীঘাট বল্‌লে বুঝি বৈকুণ্ঠের রথ নেমে আসবে নিয়ে যেতে?"

বাবাজী মহা ক্রুদ্ধ হইয়া খড়ম ঠক ঠক করিয়া একবারে যেই যেই নাচিয়া উঠিলেন। ব্যাপার হাতাহাতিতে পরিণত হয় দেখিয়া পাড়ার দুই চারিজন মাতব্বর লোক মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিলেন। একজন বলিলেন, "আরে যেতে দাও না, কৈলেস খুড়ো! আসল কথাটাই চাপা প'ড়লো, বাজে কথা নিয়ে কাটাকাটি আরম্ভ ক'রে দিলে"

"বাজে কথা?—"

কৈলেস খুড়ো আরও কত কি বলিতে যাইতে-ছিল; কিন্তু চারিদিক হইতেই বাধা পড়াতে চুপ করিয়া গেল। বাবাজী তখন আসর সরগরম করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আরে বল কেনে গো? আমি কতেক দিন বলেছি, মুড়ি-মসী মাসী গো! ও পুবে কুলপী-অলাকে বিশেস কোরো নি গো, তা শুনলেক

কি ? বলে, ও দিনে মিশিবতোল, রেতে কুলপী, ও গাঁট-হরা না হয়ে যাবেক কি ?"

একজন বিস্মিত হইয়া বলিল, "গাঁট-হরা কি ?" কৈলাস খুড়ো সামলাইতে না পারিয়া ভীষণ ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন, "গাঁট-হরা ওর শ্রাদ্ধ ! গাঁট-কাটা কি গাঁট-মারা বল্‌লে যে ওর গৌরাঙ্গের গায়ে ফোস্কা পড়বে !"

বাবাজী "গাঁট-কাটা" কথাটা শুনিবামাত্র কাণে আঙুল দিয়াছিলেন। কয়েকজন শ্রোতা বিরক্ত হইয়া বলিল, "দেখ, কৈলেশ খুড়ো, তোমার সহ্য না হয়, এখান থেকে চলে যাও। বাবাজী যা বলে মনঃক্ষুণ্ণ হয় বল্‌তে যাও না, ব্যাপারটা কি শুন্‌তে পেলেই হ'ল।"

কৈলাস খুড়ো তখনও নরম হয় নাই। মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি, হারামজাদ কি ! কাটা যারা মুখে উচ্চারণও করবার যো নাই ! হাঃ তোর নেড়ার নিয়ে কিছু করেছে !"

কতকগুলি লোক এইবার যথার্থই ক্রুদ্ধ হইয়া কৈলাস খুড়োকে টানিয়া পশ্চাতে সরাইয়া দিল। বাবাজী আবার অনুরোধে উপরোধে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "মুড়ী-অলী মাসীকে কতেক দিন বলেছি, কুমী ওয়ালারে ঘরকে জায়গা দিও নি—

ভিড়ের পশ্চাৎ হইতে কৈলাস খুড়া বলিল, "না, তা দেবে কেন, কেবল তোমারে একখানা ঘর দিবে, আর তুমি দালালী করে মুড়ী-অলীর বাড়ৈবংশের রোজগারটা সপাসপ্ মজা মেরে খাও।"

"তবে রে বেল্লিক-বেটা !" বলিয়া বাবাজী খড়ম তুলিয়া কৈলাসকে তাড়া করিলেন। সকলে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল, কৈলাসও গা-ঢাকা দিল। কেহ কেহ বলিল, "কর কি বাবাজী, ঐ গোঁয়ার মুখ্‌খুর কথায় রাগ করে ? এখনই যে রক্তগঙ্গা হয়েছিল !"

রক্তের নাম কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করিবামাত্র বাবাজী দুই হাতে কাণ চাকিয়া লম্বা জিব বাহির করিয়া দন্ত-নিপীড়িত করিলেন (জীব কাটিলেন)

এই সময়ে রমেশ অগ্রসর হইয়া বলিল, "না, আপনারা পাঁচজনে মিছে গোলযোগ করে বাবাজীকে আসল কথাটা বলতে দিলেন না দেখছি। আজ্ঞা, বাবাজী, যে কুলপী-অলার কথা বলছিলে, সে কি ঐ ভজহরি ?" যাকে আমাদের অরুণ এনে এপাড়ায় বসায় ?"

বাবাজীর দৃষ্টি রমেশের উপর পড়িবামাত্র চোখে চোখে টেলিগ্রাফ হইয়া গেল। বাবাজী একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ গো বাবু, ঐ তোমাদের ভজহরিই বটেক। তোমরা ছেলেবাবুরা কুলপী খাবেক বলে কোলাকে ছোড়ে ওরে ভবানীপুরে এনে বাঁসা দিলেক। তোমাদের বড়বাড়ীর ঐ যে আলালের ঘরের দুলাল গো, যেনার নিত্যি তিন চার ট্যাকার কুলপী না হইলে চলেনিক গো।"

রমেশ বলিল, "হাঁ, অরুণ নেয় বটে সকলকে খাওয়াবার জন্যে। তাতে কি হয়েছে ? কুমী-অলা কি করবে না করবে, তা জেনে কি অরুণ ওকে এখানে এনে বসবাস করিয়েছে ?"

বাবাজী বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া জবাব দিলেন, জানতো কি না জানতো, তাকে জানেক বাপু ! এখন মাসী ত' মলেক্। যথাসর্ব্বস্ব নিলেক গো ! "পাঁচ সাতজনে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল যথাসর্ব্বস্ব, এ্যাঁ যথাসর্ব্বস্ব ! বল কি বাবাজী ! বাবাজী বলিতে লাগিলেন, "আজ্ঞা ! মাসীর পেটারীটীতে গো গোটা পয়সাটী কেও রেখে যায়নিক গো, রেখে যায়নিক ! মাসীর ক্ষুদকুঁড়েটীক ঐ আম কাঠের পেটারীর অন্দরে রাখতোক গো। গোটা কদিন ধরে মাসীর অর গো, আমিও কদিন যজমান ঘরে ঘুরতেছিক গো। বেটা কুলপী-অলা দোকান-পাট খুলবেক ব'লে পরামর্শ করে মুড়কি বাসাতা গড়তে লেগে গেলেক গো ! ওঃ সে দরদ দেখেক কে গো। কালরাত্তে সবাই

নিস্তব্ধি হলেক পেটাই নিয়ে চম্পট! হাঃ তোর কুলপী-অলার মুখে ঝাংটা।" একজন হাসিয়া বলিল, "তবে যে শুনেছি, কুলপী অলাই মুড়ী অলীর লোক ছিল।"

বাবাজী বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "লোক ছিল না, উয়ার মাথা ছিল! বড়বাড়ীর দুলাল বাবুটী উয়ারে এখানে ঠাঁই কইরে না দিলে মুড়ীঅলীর সাথে উয়ার সম্পর্ক কি? যত লষ্টের গোড়া ঐ ছোঁড়া বটেক, ছোঁড়া লাটের গুরু, জাননি বাবু?"

কথাটা বলিবার সময় বাবাজীর চোখ মুখ দিয়া যেন বিদ্বেষ ও ধিক্কারের বহ্নি নির্গত হইতে লাগিল। জনতা সভয়ে চারিদিকে চাহিতে লাগিল, একে একে অনেকে দোকান ছাড়িয়া চলিয়া গেল। যাহার নামে নিন্দা হইতেছে, সে যে সে লোক নহে, এই অঞ্চলের যিনি মস্তক স্বরূপ, তাঁহার একমাত্র পুত্র; বিশেষতঃ সেই পুত্রও সাধারণ বাঙ্গালীর ছেলের মত নহে। তাহার নিন্দাকালে সে যদি ঘটনাস্থলে দৈব-ক্রমে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রক্ষা নাই। তাহার শক্তির পরিচয় জানে না, এমন লোক বসুলবাগানে নাই। এই দোকান হইতে বেশী দূর নহে, এই গলীটার মোড়েই তাহাদের বড় বাড়ী, সেখান হইতে হঠাৎ এখানে আসিয়া পড়াও আশ্চর্য্য নহে। কাজেই শ্রোতৃবৃন্দ মহান অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। অনেকে ভয়ে স্থান ত্যাগ করিল। বিশেষতঃ এ পাড়ার এমন লোক নাই যে কোনও না কোনও প্রকারে বড়বাড়ীর নিকট উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে। অনেকে তাই বিরক্ত হইয়াও চলিয়া গেল। যে দুই চারিজন রহিল, রমেশ তাহাদের শুনাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "বাবাজীর এ সব কথা বলা অন্যায়। বেশ ত, যদিই অরুণ কুলপী অলাকে এখানে এনে থাকে, তাতে বিশেষ কি ক্ষতি হয়েছে? বলুক, মুড়ী-অলীর সর্ব্বস্ব নিয়ে সে চম্পট দিয়েছে। এখন সে নিয়েছে কি আর কেউ নিয়েছে, তার প্রমাণ কি? এ বাড়ীতে বাইরের লোকেরও ত যাতায়াতের কামাই ছিল না। আমরা বেশে বসে সবই দেখতে পাই।

বাবাজী চোখ ঘুরাইয়া বলিলেন, "সেই গাঁটছরা যদি না দিবেক, ত' পালালেক কেনে? আরে পালিয়ে যাবি কুথাকে! এ কোম্পানীর মুলুক বটে, কোম্পানীর মুলুক! পুলীশ ক্যাশ কোরবো নি? অমনি ছাড়বেক? মুড়ী-অলীর পয়সা, অমনি হজম করবে বটেক? সোজা আঙ্গুলে ঘি না বেরুলে বাঁকা আঙ্গুল আছেক জানোনি বাবু! পয়সা ত না বাবু এক এক খানি বুকের পাঁজরা গো। যে এনে বাঁসা দিয়েছেক সেই দিবেক, ছাড়বো না কি?"

বাবাজী কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে এই ভাবের নানা কথা বলিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ চোখ তুলিয়া চাহিতে দেখিলেন, দোকান ফাঁক, কেহ কোথাও নাই। সকলেই চলিয়া গিয়াছে, কেবল রমেশ বেঞ্চের দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। বাবাজী চক্ষুর নিমেষে রমেশকে ডাকিলেন। রমেশ একবার এদিক ওদিক চাহিয়া সুড়ুক করিয়া দোকান-ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। (ক্রমশঃ)

নারী প্রতিভা।

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী)

ভিক্টোরিয়া ক্রস।

ইংরেজী উপন্যাস পাঠকদিগের নিকট ভিক্টোরিয়া ক্রসের নাম অপরিচিত নহে। যদিও ভি, সি এই সাঙ্কেতিক নামেই ইনি সমাজে পরিচিত কিন্তু ইহার প্রকৃত নাম ভিক্টোরিয়া ক্রস নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাঁর রচিত পুস্তক সমূহ কেহ কেহ নিজের প্রণীত বলিয়া দাবী করিয়াছেন।

এই খ্যাতনামা লেখিকা এক জন ইংরেজ কর্ণেলের কন্যা এবং ট্রাফেলগারবিজয়ী নেলসনের এক জন বিখ্যাত সেনানীর প্রপৌত্রী। ইহাঁর পূর্ব্ব পুরুষগণ জলে ও স্থলে বহু যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

অতি শৈশব হইতে ইনি কঠোর পরিশ্রম এবং অসীম অধ্যবসায় সহকারে শিক্ষা কার্য্যে লিপ্ত হন। বহু ভাষাবিদ্ ইনি, সংস্কৃত, আরবী, পারসি, হিন্দুস্থানী, বহু ভাষাতেই দক্ষ। প্রাচ্য দর্শন ধর্ম্ম ইত্যাদিতেও ইহাঁর জ্ঞান অসীম। ইনি নারীর চেয়ে বেশীর ভাগ পুরুষের ধারাতেই শিক্ষিত হন, কুড়ি বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষায় এতদূর অগ্রসর হন যে, লণ্ডনের যে কোনো গ্রাজুয়েটের পক্ষেও তাহা গৌরবের বিষয়।

ইহাঁর উপন্যাসের ভাব এবং ভাষা দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া যাই—এমন সুন্দর ভাষা এমন চমৎকার বর্ণন ভঙ্গী! ভাল প্রকাশক্ষমতা কতকটা আপনা হইতেই জন্মে, কিন্তু অপরাপর ভাষার উপর ইহাঁর অধিকারও এমন সুন্দর ইংরেজী লেখার পক্ষে কতকটা সহায়তা করিয়াছিল, এমন ধারণা করা যাইতে পারে।

'ক্লাসিক' ভাষা সমূহ যে তাঁহাকে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লইবারই উপযুক্ত করিয়াছিল তাহা নহে—কিন্তু ইহার গুণে তিনি হোমার, হিরোডোটাস্, পিণ্ডার, প্লেটো প্রভৃতির গ্রন্থও কুড়ি বৎসর বয়সেই পাঠের ও অর্থ পরিগ্রহ করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন।

শুধু সাহিত্যিক বলিয়াই ভিক্টোরিয়া ক্রস বিখ্যাত নহেন, সঙ্গীতেও ইহাঁর বেশ নাম আছে। পিয়ানো ও ও অন্যান্য যন্ত্রের ইনি একজন ওস্তাদ। সাঁতরান ঘোড়দৌড় বাইস খেলা এবং নৃত্যেও ইনি যথেষ্ট আনন্দ পাইয়া থাকেন আদৌ ক্লান্ত না হইয়া ১৫।২০ মাইল স্কন্ধে ভ্রমণ করিতে পারেন, বহুদিন আমেরিকার বন প্রদেশে চৌদ্দ ঘণ্টার উপরেও অশ্ব পৃষ্ঠে কাটাইয়াছেন।

নানাজাতির ভাষা ও চরিত্রের জ্ঞান লাভ করিবার জন্য ইনি বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, আমেরিকা ও মেক্সিকো বাস করিয়াছেন। আগ্নেয় গিরিতে আরোহণ করিয়াছেন। অলেস্তার নিশীথ সূর্য্যালোক দর্শন করিয়াছেন, এটনা হইতে প্রথম সূর্য্যোদয় প্রাণ ভরিয়া দেখিয়াছেন, সুদান ভ্রমণ করিয়াছেন, বহুদিন কনষ্টান্টিনোপলে বাস করিয়াছেন। মৃত-সাগরে স্নান ও অশ্বতরে পর্ব্বত বহুবার আরোহণ করিয়াছেন। ইনি ভারত ভ্রমণ করিয়াছেন, পম্পির ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, ভিসুবিয়াসের অগ্নি-লীলা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

ইহাঁর কোন কোন চরিত্র সৃষ্টি আমাদের কাছে অতি অস্বাভাবিক ও অতিরঞ্জিত বোধ হয়; কিন্তু এত দেশ ভ্রমণ যিনি করিয়াছেন, এত অধিক সংখ্যক লোকের সঙ্গে যিনি মিশিয়াছেন—তাঁহার নিকট সে

র চরিত্র হয়তো অতি সাধারণ—বিন্দুমাত্রও অতি-রঞ্জিত নহে, অস্বাভাবিক বলি আমরা ; আমাদের চোখে সাধারণ বলিয়াই।

'Anna Lombard' নামক পুস্তক রচনা করিয়া নি সাধারণে সুপরিচিত হন। প্রকাশকেরা প্রথমে ই পুস্তক প্রকাশে আপত্তি করেন—পরে ইনি পুস্তক নি প্রকাশ করেন। সমালোচকেরা পুস্তকখানি ন্দা বলিয়া উড়াইয়া দেন, কিন্তু ইহাতে ভীত না ইয়া লেখিকা সমস্ত কাগজে পুস্তকের বিজ্ঞাপন

পরে এই পুস্তক পাঁচ লক্ষ খণ্ড বিক্রয় হইয়া ছ—লেখিকার সৌভাগ্যের উদয় হয়।

সেই হইতে নিন্দা বা স্তুতি কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ করিয়া ইনি পুস্তক রচনা করিয়া যাইতেছেন।

সারা বার্ণার্ড।

ফরাসী জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান "Cross of the eg on of Honor" জীবনের শেষ ভাগে অতি ত্রাঙ্কসরাণী সারা বার্ণার্ড লাভ করিয়াছেন। এই ান সারা পাইতে পারেন কিনা ইহা লইয়া তর্ক ইলে অধিকাংশই তাঁহার স্বপক্ষে মত দেন, ভিনেত্রীরাণীর এই সম্মানে গৌরবান্বিতা হইবার রূপ যথেষ্ট আছে - ইনি অধ্যাপক বা উচ্চ রাজ পদাধারী হিসাবে এ সম্মান পাইতেছেন না, অভিনেত্রী াবে এ সম্মান লাভ করিলেন। প্রায় এক শতাব্দী ে আন্দোলন চলিতেছে রঙ্গালয়ের অভিনেতারা সম্মান পাইতে পারেন কিনা! Comedie rancaise's Mme. Bartet যদিও এ সম্মান লাভ রিয়াছেন কিন্তু তিনি অভিনেত্রী বলিয়া নহেন—ঁতালয়ের শিক্ষয়ত্রী বলিয়া। রঙ্গালয়ের বিরুদ্ধে ইরূপ ধারণা সারা বর্ণার্ড কর্ত্তৃক অপসারিত হইল।

'Le Temps' নামক কাগজের লেখক লিতেছেন "কুধারণা ফ্রান্সে বহুদিন হয় চলে আসছে -সেই ফ্রান্সে সারার বিজয় অপূর্ব্ব। আমরা এখন লোক, সেই ধারণা গুলির বিপক্ষে যত রকম বা কিছু করতে পারা যায় তা করি, পরে আমরাই আবার অতিরিক্ত ভক্তর মতো—সে গুলি রাখতে চেষ্টা করি। প্রতিভা, বুদ্ধি—এই সবেতেই যে সারা বিখ্যাত তাই নয়, এর উপরেও তাঁর কিছু আছে—সেটি তার ব্যক্তিত্ব—প্রকৃতির একটা উচ্ছ্বাস তিনি।"

পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা লেখক লিখিয়াছেন —লেখক তখন স্কুলে পড়িতেন, স্কুলের রচনার বিষয় ছিল—সেই সময়কার নামজাদা লোকের চরিত্র চিত্র কবিতায় অঙ্কন।"

"সে অনেকদিন পূর্ব্বের কথা, তখনও সারা বার্ণার্ডের মতো নামজাদা সাধারণের চোখে কেহ ছিল না, তিনি লিখিতেন, ছবি আঁকিতেন—তখন সবে মাত্র তাঁর "The memoirs of a chair." বের হয়েছে। তখনই উপকথার মতো তাঁর কাহিনী মুখে মুখে চলিত। তাঁর অযোধ্যা জীবন সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত কথা শোনা যেত। শোনা যেত তাঁর বসবার ঘরের আসবাব পত্রের মধ্যে সর্ব্ব প্রধানই ছিল একটি শবাধার। একদিন নাকি আমোদচ্ছলে তিনি একটি বেড়ালকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিলেন—অবশ্য এ আমার বলা অনাবশ্যক -এই সব গুজবের মধ্যে সত্য কতখানি ছিল পাঠকই ধারণা করে নেবেন। যাক্ আমি তো এই সব গুজব অবলম্বন করেই ল্যাটিনে একটা কবিতা লিখে ফেললুম—যা হোক—সৌভাগ্য ক্রমে, সে সব পদ্য ব্রোঞ্জের স্তম্ভের মতোই স্থায়ী হয়েছে।"

আজ কালও সারার সম্বন্ধে নানা উপকথা লোক মুখে শোনা যায় এগুলি তত অতিরঞ্জিত, উচ্ছল নয়, তাঁর উপস্থিতিতেই একটা সারা পড়ে যায় - দর্শকেরা সব মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে যায়—যখন আমরা তাঁকে দেখি না—নয়নের আড়ালে থাকেন, কল্পনায় —মনের দ্বারে সেই স্বামী মূর্ত্তি বড় ঘন ঘন দেখি তখন।

গম্ভীর লোকেরা যাঁরা সব জিনিসেই আবশ্যকীয় কিছু দেখতে পান—তাঁরা বলেন তিনি বিশেষ কিছু দেননি ফরাসীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সম্পদ্ ভাষা—লালিত্য বোঝাতে। যাক্ সে সব কথা—তাঁকে আমরা ফরাসী ভাষার দূত বলেই যে অভিবাদন করি তা নয়।

তিনি অনেক দূরদেশ থেকে ফিরে আসছেন। আমাদের মনে হয় আমরাও সেখায় ছিলাম সে দেশের মনোরাজ্য জয় করে এসেছেন তিনি।

New York Tribune-এর লেখক বলিতেছেন—"ফ্রান্সের জন্য সারা যা করেছেন এই তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান কর্তব্য—ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশ যত প্রচারক পাঠিয়েছেন, সারাই তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সারা আমাদের এখানে এসেছিলেন তাঁর পূর্ণ খ্যাতির সময়ে—তখন আমাদেরও উচ্চ আশা, কল্পনা, ব্যবসায়, টাকা ও রাজনীতির অনেক উর্দ্ধে উত্থিত। রঙ্গালয়ের বিষয় আমরা সামান্যই জানিতাম, তিনিই আমাদের শেখান। ফরাসী ভাষা, নাটকীয় ভাবে সামান্যই জানিতাম, তিনি আধুনিক ও পৌরাণিক ফরাসী রঙ্গের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেন। আমরা Corneille Racine, Hugo, Dumas, Sardou ইঁহাদের শুধু নামই জানিতাম—তিনি এঁদের জীবন্ত প্রতাক্ষ দেখিয়ে দেন। ফ্রান্স ও আমেরিকার মধ্যে তিনি জ্ঞান ও বুদ্ধির একটা সৌহার্দ্য স্থাপন করে যান। ফরাসী ভাষা কত সুন্দর হতে পারে এই প্রথম শুনলাম, বলবার কায়দা, ভাষার তরঙ্গ উচ্ছ্বাস, ভঙ্গী, স্বর বিজ্ঞানের মূর্ত্তিমতী রাণী ইনি। নিজের বিশেষত্বে, স্বাতন্ত্র্যে ইনি জগৎ মুগ্ধ করিতে পারেন, ইনি স্বয়ংই যেন ফরাসী ললিতকলা।

তিনি আমাদের ফরাসী সাহিত্যের রত্নরাজি পড়িতে প্রলুব্ধ করেন, আবার ছুটে গিয়ে তাতে জীবন সঞ্চার দেখি—তখন ভাবি শুধু পড়ে কত বঞ্চিত ছিলাম আমরা!

একি যেসে জন্য যত কাজ করা নয়। অন্য কোন ফরাসী নারী কি পুরুষ এমন কাজ করিয়াছেন কি? সারাকে জগদ্বিখ্যাত 'Lady of [illegible]' দিতে ফরাসী জাতি এতদিনও ইতস্তঃ করিতেছিল—এইবার অভিনেত্রী রাণীকে সম্মানিত করিয়া নিজেরাও সম্মানিত হইল।

• • • •

ভারতের নারী-সমাজ আজ গৃহ কোণ ছাড়িয়া সমাজে ও দেশের কাজে স্থান লাভের জন্য উৎসুক হইয়াছেন অন্যান্য দেশের নারীরা যেমন নানা কার্য্যে নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিয়া, বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া দেশের ও সমাজের কার্য্যে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতেছেন, ভারতীয় নারী-সমাজও তেমনি প্রতিষ্ঠালাভের জন্য ব্যাকুল। তাই এ সময়ে বিভিন্ন-দেশীয়া কয়িষ্ঠা মহিলা নেত্রীদিগের পরিচয় ভারতীয় পাঠিকাদিগের ভাল লাগিবে বলি। যমুনার পাঠিকাদিগকে আমরা বিদেশীয় মহিলা নেত্রীদিগের পরিচয় দিতেছি।

ব্যারনেস্ শ্রিপেনবার্গ :—ফিনল্যাণ্ড নারী স্বাধীনতার দেশ। ফিনল্যাণ্ডে নানা কার্য্যে মহিলাদিগের যেমন কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় জগতের আর কোন দেশের নারী সমাজে তেমন পাওয়া যায় না। এমন কোন কাজ নাই যাহা সে দেশীয় নারীরা না করিতেছে। হেলসিংফোর্সে নানা বাড়ীওয়ালী, মুদিওয়ালী, ছাতাওয়ালী, বুকিং ক্লার্ক হইতে আপিসের বড় বড় কার্য্যে পর্য্যন্ত বহু নারী বিরাজ করিতেছেন। ব্যাঙ্কে, সরকারী আপিসে, সওদাগরী আপিসে এ সব জায়গায় তো নারীরা নিজ কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছেনই, তা ছাড়া ফিনল্যাণ্ডের মহাসভায় পর্য্যন্ত ইঁহারা নিজেদের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া নারীরা যে কার্য্যভার পাইলে সর্ব্ব কার্য্যেই যোগ্য জগৎসমক্ষে তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন। ব্যারনেস শ্রিপেনবার্গ নিজ দেশীয় রাজকীয় মহাসভার সভ্য হইয়া তাহার বিচক্ষণতায় ও কার্য্যাবলীতে বিখ্যাত হইয়াছেন।

এই নারীর চেহারাতে এমন একটা বিশেষত্ব

আছে বলা যেখিলেই সাধারণ নারী হইতে ইহার পার্থক্য বেশ বোঝা যায়। ইহার পিতা বারেন ব্রিশেনবার্গও ফিনল্যাণ্ডের মহাসভার সভ্য ছিলেন। অল্প বয়স হইতেই সাহিত্যের দিকে ইহার খুব ঝোঁক ছিল। চব্বিশ পঁচিশ বৎসর বয়সের সময়েই ইনি পাঁচ সাত খানা উপন্যাস লিখিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। কিন্তু ১৮৮৭ খৃঃ হইতে দেশীয় নারীদিগের আন্দোলনে ইনি বিশেষ ভাবে যোগ দেন ও তাহাতে লিপ্ত হইয়া পড়েন। এই সময়েই ইনি নানা দেশীয় নারী সমাজের অবস্থা স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ জন্য ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি বেশ ভ্রমণে বহির্গত হন। নানা দেশ ঘুরিয়া তথাকার সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভাবে বুঝিয়া নিজদেশের সঙ্গে তাহার তুলনা করিয়া কি ভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইবেন তাহা স্থির করেন। এই দেশ ভ্রমণের সময়েই ১৮৮৮ খ্রীঃ ওয়াশিংটনে মহিলা আন্তর্জাতিক মহাসভা গঠিত হয়, ইনিও তাহার প্রতিষ্ঠাতাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইনি নিজ দেশের নারী সমাজের সভানেত্রী হন। ইহার পর ইনি 'Koti ja yhteiskunta' অর্থাৎ 'গৃহ ও সমাজ' নামে নারীদিগের জন্য সর্ব্বপ্রথম একখানি কাগজ বাহির করেন। এই কাগজে নারীদিগের অধিকার, কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের কথাই শুধু আলোচিত হয়। ইনি এখনও সে কাগজের সম্পাদিকা আছেন। ফিনল্যাণ্ডের নারী সমাজের উন্নতির জন্য ইনি যে সমস্ত কার্য্য করিতেছেন তাহার পরিচয় ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া চলে না। তথাকার নারী-সমাজই তাঁহার প্রাণ—তাহার উন্নতিই ব্রিশেনবার্গের জীবনের মূলমন্ত্র। ১৯০৬ খ্রীঃ বহু আন্দোলনের ফলে নারীদিগের তথাকার রাজকীয় মহাসভায় প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয়। সেই সময় হইতে যে পর্য্যন্ত ফিনল্যাণ্ডের রাজকীয় মহাসভা তার কর্ত্তৃক উচ্ছেদ না হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত ইনিই মহিলাদিগের পক্ষ হইতে মহাসভায় সভ্য হওয়ার অধিকার পাইয়া আসিয়াছিলেন।

মিস্ ক্রিষ্টীন ম্যাকমিলান : এম-এ বি এস সি (ডক্ টোটিয়া)। ডক্ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মহিলা গ্রাজুয়েটদিগের নিবেদন শুনাইতে লর্ড মহাসভার সম্মুখে বক্তৃতা দিয়া সাধারণে ইনি ডক্ টোটিয়া নামে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছেন। সেবার অবশ্য লর্ড মহাসভার সম্মুখে দাঁড়াইতে ইনি কলেজের ডিপ্লোমা-প্রাপ্তির টুপি ও গাউন পরিয়া যান নাই সাধারণ বেশেই গিয়াছিলেন। ইঁহার সুন্দর শান্ত মূর্ত্তি, সংযত ব্যবহার, সাদা সরল বলিবার অপূর্ব্ব কায়দায় সমাগত সভ্যগণ সকলেই মন দিয়া ইঁহার বক্তব্য শুনিয়াছিলেন। পূর্ণ সাড়ে তিন ঘণ্টা মিস ম্যাকমিলান বক্তৃতা করিয়াছিলেন, ইঁহার যুক্তি ও তর্কের সারবত্তায় বক্তৃতা সময়ে কেহ একটি প্রশ্ন বা তর্ক উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই। লণ্ডনের বিরাট মহানগরীর আইনের অধীশ্বরগণের সম্মুখে বক্তৃতা করিতে একবারও ইঁহার বক্তব্যের গুটপালট, পুনরুক্তি বা শুধু উচ্ছ্বাস বাহুল্য উচ্ছ্বসিত হইয়া যায় নাই।

এই বক্তৃতার বিষয় এই ছিল যে ডক্ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ হইতে পার্লিয়ামেণ্ট সমূহে যে সভ্য প্রেরিত হইত, তাহার সম্বন্ধে নারীদিগের ভোট দেওয়ার কোন অধিকার ছিল না; সেই অধিকার প্রাপ্তির জন্যেই এই আবেদন। এবং এই আবেদনের মুখ-পাত্র হইয়াই কুমারী ম্যাকমিলান লর্ড মহাসভার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

১৮৯২ খ্রীঃ ডক্ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে নারীদিগকে গ্রাজুয়েট হইবার অধিকার দেওয়া হয়। এই অধিকার অনুসারে নারীরা এক ভোট দেওয়ার অধিকার ছাড়া আর সব বিষয়েই সকল গ্রাজুয়েটদিগের সমান অধিকারই পাইতেছিলেন।

ডক্ টোটিয়ার বক্তৃতা হৃদয়গ্রাহী হইলেও কতকগুলি আইনের ফাঁকে তাঁহার ইচ্ছা লর্ড সভা

কর্ত্তৃক কার্য্যে পরিণত হইল না। এ কার্য্যে বিফল মনোরথ হইলেও ইহাতে তাঁহার নাম দেশ বিখ্যাত হইয়া পড়িল ইনি এখনও বিলাতের নারী সমস্যা বিষয়ক বহু আন্দোলনের নেত্রী এবং নারীদিগের ভোট্য অধিকার যাহাতে তাহারা পায় সে জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন।

মিসেস্ ষ্টারেট এলডারসন, এম ডি (প্রথম লেডী মেয়র) ১৯০৮ খ্রীঃ ৯ই নবেম্বর তারিখে এলদিবার্গের মেয়র নির্ব্বাচন সভায় জগতের প্রথম নারী মেয়র নির্ব্বাচিত হন সে সহরের সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতনামা অধিবাসী মিসেস্ ষ্টারেট এলডারসন। এই অসাধারণ অপূর্ব্ব নির্ব্বাচনে সহরবাসী সকলেই পরম খুসী মনে হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিল। এমন সর্ব্বগুণান্বিতা মহিলা প্রতিনিধি পাইয়া জনসভা আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিল। লণ্ডন স্কুল বোর্ড সভার সভ্য হইয়া ইনি কার্য্যদক্ষতায় যেরূপ সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এ কার্য্যে দেশবাসীর নিকট তদপেক্ষাও সুনাম লাভ করিয়াছেন।

এলদিবার্গ মিসেস এলডারসনের জন্মভূমি নয়, ইঁহার দু বৎসর বয়সের সময় ইঁহার পিতা নিউর্ন ষ্টারেট লণ্ডন হইতে এই সহরে আগমন করিয়া দু'তিন বৎসর মধ্যেই সহরের সর্ব্বজনমান্য হইয়া পড়েন। এবং কিছু দিন পরেই মেয়র নির্ব্বাচিত হন। ইহার পর ষ্টারেটের ভ্রাতা স্বামী অনেকেই এই সম্মানের পদ অধিকার করেন। এলদিবার্গের বিচিত্র সৌন্দর্য্য ইঁহাদের বংশের নিকট বহু বিষয়ে ঋণী। প্রথম মেয়রের অপূর্ব্ব সম্মান ছাড়াও আরও নানা কারণেই ইঁহার খ্যাতি আছে। ব্রিটিশ রাজ্যের প্রথম পাশ করা মহিলা ডাক্তারই ইনি। ইনি যে ভাবে মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিয়া ডিগ্রী লইয়া বাহির হন সেও ব্রিটিশ রাজ্যের নারী জাগরণের এক স্মরণীয় অধ্যায়।

১৮৬৬ খ্রীঃ কুমারী এমিলিডেভিসের সঙ্গে ইনি লণ্ডনই ষ্কুল বোর্ডের নিকট নারী জাগরণসভার প্রথম আর্জ্জি পেশ করেন। ইঁহার ভগ্নী ষ্টারেট ফসেট এল এল ডি, এবং ইঁহার কন্যা ফিলিপা ফসেট্ যিনি রাংলার হইয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন ইঁহাদিগের নামও এই সঙ্গে উল্লেখ যোগ্য।

ডাক্তার এ্যানাশ—আমেরিকার বিখ্যাত বক্তা, ইওরোপের আরও নানা প্রাদেশিক সহরে বক্তৃতা দিয়া ইনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। সুবক্তৃতার সহজ প্রবাহ তেজ, রস রসিকতায় ইঁহার বক্তৃতা সমুজ্জ্বল। ধর্ম্মভাব প্রচার এবং সামাজিক উন্নতি ও সমাজের সংশোধনই ইঁহার বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয়। সহজ সরল ভাষায় জোরের সঙ্গে নিজের হৃদয়ের কথা প্রকাশ করিতে পারেন বলিয়াই সকলে ইঁহার বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়।

ডাক্তার এ্যানার ইংরেজ পিতা এবং স্কচ্ মাতার গর্ভে জন্ম হয়। চার বৎসর বয়সে ইনি আমেরিকায় যান। পোনের বৎসর বয়সে ইনি বোষ্টন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন ও পরে তথা হইতে ডিগ্রী লইয়া বাহির হন। কিছু দিন স্কুলে ও গীর্জ্জায় কাজ করিয়া পরে নারী জাগরণ সভার সভ্য হইয়া নারী সমাজের উন্নতি বিধায়ক কার্য্যে মন দেন এবং এই বিষয় লইয়া নানা স্থানে সভা করিয়া বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। প্রথম প্রথম এই সমিতির কার্য্য লোকে মোটেই পছন্দ করিত না বরং সাধারণে বিদ্বেষ ভাবই পোষণ করিত। পরে ইঁহারই চেষ্টায় আমেরিকার জাতীয় নারী জাগরণী সভার প্রতিষ্ঠা হয় এবং যাঁহারা ইহাদিগের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতেন, পরে তাঁহারাই ইহাদিগের কার্য্যাবলী দর্শনে ইহাদের সহায় হইয়া দাঁড়ান। নিজের চেষ্টায় এই নারী আজ আমেরিকার নারী সমাজের একজন নেত্রী হইয়াছেন।

আমার গর্ব্ব।

[শ্রীলীলা দেবী]

(ছোট গল্প)

আমি তখন কলিকাতায় ইউনিভার্সিটিতে ম-ক্লাসে পড়ি। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী আসতে হ'ল। বাড়ী অবশ্যে জন্মভূমি নয়, পিতার কর্ম্মস্থান ডেরাডুন উপত্যকা। এখানেই প্রায় দশ বারো বৎসর হ'তে চ'লো Forest Survey Department-এর বিশিষ্ট উচ্চ বিভাগে বাবার কাজ। এখানে এত বৎসর সংসার পেতে এই আমাদের বাড়ী ঘর দোর হ'য়ে প'ড়েছে ব'লেও অত্যুক্তি হয় না—অন্ততঃ বাবা মার কাছে। কারণ ছুটীর অবকাশ ভিন্ন আমার সঙ্গে এদেশের পরিচয় তত ঘনিষ্ঠ নয়, কলিকাতার Hostel থেকে পড়াশুনা করিতে হয়।

গ্রীষ্মকাল। দূর উচ্চে মসুরী পাহাড়ের আলোক-মালা দেখা যাচ্ছিল, তারই কোলে পুষ্পপত্রময় ডেরাডুনের খুব্ত সহর—ঘন প্রাচল বনানীর স্নেহ-ছায়ায়, পুষ্পপত্রের বাস্ত্র বেষ্টনে, চাঁদের আলোয় মূর্চ্ছনায়, ঠিক্ যেন একখানি স্বপ্নরাজ্যের কুহকমন্ত্রময় অঙ্কিত শোভা। বেড়াতে বেড়াতে নদীর তীরে এসে পড়া গেল—সেখানে দুই ধারে উচ্চ জঙ্গল, অজস্র উপলখণ্ড চতুর্দ্দিকে ছড়ান, বর্ষাকালে নদীটি দুই কূল ছাপিয়ে খরস্রোতে ব'য়ে যায়। গ্রীষ্মের উত্তাপে শুকিয়ে অনেক দূর চড়া প'ড়ে গেছে। নদীর উপকূলে ছোট গ্রাম, কতকগুলি পাহাড়ীর আবাস কুটীর। একটী পাহাড়ী যুবক নদীতে জল নিতে এসেছিল। তার আকৃতি কি বলিষ্ঠ সুন্দর! তার মুখে পাহাড়ীয়ত্বের দৃঢ়তা ও সরলতা, অবয়বে স্বাস্থ্য ও বলের সম্পূর্ণ রাজত্ব! আর তার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ আননশ্রীর উপর ঘন কালো চক্ষু দুটী ও কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদাম, স্বভাবতঃই তার দিকে আমাদের আকৃষ্ট হ'তে হ'ল। এক এক বারে দুই দুই কলসী ক'রে জল তুলে প্রায় ১০ মিনিটের ভিতর ২০।২৫ কলসী জল প্রতিবেশী সকলের ঘরে আনন্দের সঙ্গে ব'য়ে দিচ্ছিল আর মাঝে মাঝে পাহাড়ী ভাষায় গা'চ্ছিল—"যাদের যুদ্ধ করা পেশা—হাড়ভাঙ্গা খাটুনি যাদের বংশগত অভ্যাস—তারা চুপ ক'রে থাকতে পারে না ভাই—নিজের কাজ না থাকলে পরের কাজ বেচে ক'রে দেয়।" পরিশ্রমে তার শিরা উপশিরা সকল স্ফীত হ'য়ে মুখ ও ললাট রক্তাভ হ'য়ে উঠেছিল। আমাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও না ক'রে জল তুলতে তুলতে সে আপন মনে শীষ দিয়ে গান জুড়ে দিলে। তার এই তাচ্ছিল্য আমার মোটেই ভালো লাগ্‌লো না—সে বড় অসভ্য বর্ব্বর, আমরা যে দয়া ক'রে তার দিকে এতক্ষণ চেয়ে আছি এতেই কি তার কৃতজ্ঞ হ'য়ে নিজেকে ধন্য মনে করা উচিৎ ছিল না? তাতো দূরের কথা সে একবার আমাদের দিকে চেয়েও দেখলে না। তবুও এই ল'ক্ষ্মণের সভ্য ভব্য অভাব পাণ্ডিত্যশালী এই নবীন যুবা ঐ সামান্য ছেলেটার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার জন্যে কম উৎগ্রীব হ'য়ে উঠ্‌ল না। যত বারই মনে করি কোথাকার একটা অসভ্য বুনো, ও কি আমার বন্ধু হবার যোগ্য না কি? ততবারই তার সেই সরল বীরত্বপূর্ণ বলিষ্ঠ চেহারা আমার সম্ভ্রম ও সম্মানই আকর্ষণ ক'রছিল। কলিকাতায় থাকতে একদিন আমাদের সমীর্ঘ মহলে স্বদেশী বিষয় নিয়ে আলোচনা হ'তে হ'তে করুণা ঠকির ব'লেছিল—"তা যাই বলো বুনোদের বা পাহাড়ীদের অন্তরে যে দৃঢ়তা ও নিষ্ঠীকতা আছে আমাদের বাঙ্গলা দেশের এই জানীয় মহলেও তা খুব কম।" তার কথায় বিপক্ষে আমরা ক'জন

তর্ক তুলে তাকে পরাস্ত ক'রে তবে সেদিন ছেড়েছিলুম। যে বাঙ্গলার প্রতাপাদিত্য ও বিক্রমাদিত্যের জন্ম সে দেশে বীর নেই—আর আছে বন জঙ্গলে, পর্ব্বতে! শিক্ষায় মানুষ দেবতা হয়, সে শিক্ষা যাদের নেই তাদের পাশবিক আস্ফালন অহঙ্কারের অন্ধতা ভিন্ন আর কি হ'তে পারে? আজ কার্য্যতঃ পার্ব্বতীয় যুবকের তাচ্ছিল্য আমাকে বিষম বিরক্ত ক'রে তুলেছিল। মা ব'ল্লেন "আহা! কি সুন্দর ছেলেটী, দেখলে মায়া হয় ওকে একবার ডাকনা বিনয়!" তাকে ডাকলুম, বিরক্তি ও আগ্রহ এ দুটোই আমার ডাকের সঙ্গে জড়িত ছিল। সৈনিক প্রথানুযায়ী কুর্ণিস ক'রে হাসিমুখে সে ব'ল্লে—"আমার আজ খুব ভাগ্য, বাবু!" পরিচয়ে জানা গেলো সে গুরখা সৈন্য শ্রেণীভুক্ত। বিগত মহা যুদ্ধের সময় সে মেসোপোটেমিয়াতেও গিয়েছিল। কামানের আওয়াজে তার বুকে আঘাত লাগায় তাকে কাজ থেকে অবসর দেওয়া হ'য়েছে। সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীও ব'লতে পারে। মা তাকে আবার জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"তোমার বাপ মা আছে তো?" সজল চোখে সে ব'ল্লে—"না, তাঁরা অনেক দিন মারা গিয়েছেন।" মা ব'ল্লেন—"তবে এখানে তোমার আপনার লোক কে আছে? বিয়ে করেছ?" একটু হেসে সে ব'ল্লে—"না, বিয়ে হয়নি। এখানে আমার ঘরে আমি একলা। আর প্রতিবেশীরাই সব আমার আপনার লোক।" মা তাকে আমাদের বাড়ী যাবার জন্যে অনুরোধ ক'রলেন, বাড়ীর ঠিকানা বাবা বাতলে দিলেন। আমি চুপ ক'রে অন্য দিকে চেয়েছিলুম—মনে হ'ল সে আমার কাছ থেকেও নিমন্ত্রণ চায়! যুবকের নাম জুম্মা—বাবা মার সনির্ব্বন্ধ নিমন্ত্রণে আমাদের বাড়ী যাবার জন্যে সে প্রতিশ্রুত হ'ল।

২

তিন চার দিন কেটে গেছে জুম্মা একদিনও আসেনি আমি কিন্তু জুম্মাকে ভুলতে পারিনি। তার অকৃত্রিম সরলতাপূর্ণ মনোজ্ঞ চেহারা সর্ব্বদাই মনের মধ্যে জেগে আছে। কি জানি কেন তাকে সব বিষয়ে পরাস্ত ক'রে দিয়ে পরাজয়ের ক্ষুব্ধতা তার উন্নত তেজস্বী মুখের উপর যেমন এঁকে দিতে ইচ্ছে ক'রছিল, তেমনি ইচ্ছে ক'রছিল তাকে একান্ত আপনার ক'রে পাবার জন্যে কিন্তু নিজের মনে আমি বেশ বুঝতে পারছিলুম এ দু'টোতেই তাকে বন্ধুতা জানান হবে! সেদিন সন্ধ্যায় মার সঙ্গে বাগানে ব'সে আছি। আমাদের আশ্রিতা এক পাহাড়িনীর মেয়ে হেনা মার পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। হেনার মা আমাদের খুব অনুগত, গৃহস্থের বধূর মত ভদ্র ও মৃদুস্বভাব। তার কাছে তার স্বামীর গল্প আমরা শুনতুম। তার স্বামীও গুরখা সৈন্যভুক্ত ছিল। কোন এক যুদ্ধের সময় তার মৃত্যু হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর বেচারী স্ত্রীলোক শিশু মেয়েটিকে নিয়ে অকূল পাথারে পড়ে। যে পেন্‌সন্ পেতো সে টাকায় তাদের খাওয়া পরার কষ্ট হ'তে লাগ্‌লো। শেষে মা তাদের দুঃখ শুনে গৃহে আশ্রয় দেন। তারা আমাদের এক রকম আশ্রিতাই ছিল, কারণ বেতন হিসাবে কখন তারা কিছু নিত না—যখন যা দরকার হ'তো চেয়ে নিতো। কনভেণ্টে পড়িয়ে শুনিয়ে মা হেনাকে এমন ক'রে তৈরী ক'রে ছিলেন—যে তার বেশভূষা কথাবার্ত্তা দেখে, তাকে আর পাহাড়ী ব'লে মনে করবার যো ছিল না। একেবারে পুরো একটি বাঙ্গালীর মেয়ে। ষোল পেরিয়ে হেনা, এখন সতেরোয় প'ড়েছে, পাহাড়ী প্রদেশের জল হাওয়ার গুণে তার শরীর সুন্দর সবল পরিপুষ্ট—মুখের লাবণ্য দীপ্তিতে অটুট স্বাস্থ্যের চিহ্ন। হেনার রঙ গোলাপের পাঁপড়ির মত মনোরম যথার্থই সে সুন্দরী! আমি বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে ছিলুম, তার নিটোল রক্তিম কপোলে যৌবনের অভিনব উল্লাস খেলে যাচ্ছিল। হঠাৎ ব্যস্ত হ'য়ে মা ব'ল্লেন—"আচ্ছা তো বিনয়, সেই পাহাড়ী ছেলেটা

আস্‌ছে না ?' আমি ফিরে দেখি সত্যিই তো সেই তো আস্‌ছে। ফুষাকে আমরা চৌকীতে ব'সতে বলায় সে রাজী হ'ল না যাদের উপর ব'সে প'ড়ে সে ব'লে—"আপনারা বড় লোক আমি গরীব, আপনাদের সঙ্গে এক জায়গায় বসবার অধিকার আমার নেই।" তার এ কথার উত্তরে আমাদের চুপ ক'রতে হ'ল। আমাদের সঙ্গে কথা কইলেও ফুষার দৃষ্টি ও মন হেনার রূপসাগরের তুফান তোড়ে ভেসে গিয়েছিল! ফুষার মুখের কঠোর ভাব মুহূর্ত্ত সঙ্কুচিত দৃষ্টি কেমন ক'রে পলকের মধ্যে কোমল মাধুর্য্যে, চঞ্চল কৃতার্থে, ভ'রে উঠ্‌লো কে জানে! হেনার মুখেও পূর্ব্ব রাগের লক্ষণ তার ব্রীড়ারক্তিম গোপনে আনত চক্ষুতে স্পষ্টই ফুটে উঠেছিল। আমার বুকের ভিতরটা একটা আচম্‌কা ধাক্কায় দুলে উঠ্‌লো। কোথাকার জঙ্গলী এক গোঁয়ার যুবক তাকে কি এতই ভালো দেখ্‌তে—আর আমি বুঝি—? যাক্ এদের গলায় জোর ক'রে ফুলের মালা দিলেই বা কি হবে, তা কখন সাজে না। ফুষার একান্ত ধ্যান ভেঙ্গে দিয়ে আমি ব'ল্লুম "এ আমাদের পাহাড়ী ঘাসীর মেয়ে, এর বাপও ফৌজী সৈন্য ছিল।" ফুষা সচকিত ভাবে ব'লে উঠ্‌লো—"তাই নাকি, ঠিক্ বাঙ্গালীর মত দাড়ি রেখেছে।" ব'লেই সে হেসে ফেল্লে। অন্যমনস্কতার সে হেসে ঠাট্টার সুরে আমি ব'ল্লুম—"বাঙ্গালীর মত কাপড় আজ কাল অনেকেই প'রছে—কিন্তু বাঙ্গালীর মত হওয়া বড় শক্ত!" আঘাতপ্রাপ্ত তার চোখ দুটো জ্বলে উঠ্‌লো—তেজের সঙ্গে সে বল্লে "বাঙ্গালীর মত হ'তেই বা কে চায় বাবু—যাদের না আছে বল, না আছে সাহস—বাঙ্গালী মানে তো পৌরুষের কথা নয়।" তার এই কথায় জ্বলে উঠে আমি ব'ল্লুম—"পশুর মত একজন আর এক জনকে বধ করাই বুঝি তোমরা সাহসের কাজ মনে কর? বাঙ্গালী সে বল চায় না—বাঙ্গালীর যা আছে তোমাদের নেই ব'লেই তোমাদের হিংসে!"

"হিংসে! হিংসের কথা কেন ব'লছেন বাবু—আমরা সবাই ভাইয়ের সন্তান! একের ভালোতে অপরের সুখী হওয়াই উচিৎ।" দেখলুম ফুষার মনের ভাব আমাদের প্রতি কতটা হীন কতটা অবনত! তারপর দিন বিকেলে আবার ফুষা এসে উপস্থিত। আমি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার নানা অছিলা খুঁজছিলুম। কিন্তু সেই বন্য যুবকটীর, কলহাস্যমুখর গিরিনির্ঝরের মত অবাধ, ও নব প্রকৃতির বনবিহারী বাতাসের মত উদাস, অন্তরটীকে আঁকড়িয়া ধরা যেন দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল।

৩

আমাদের বাড়ীতে ফুষার যাতায়াত এখন অবাধ ও স্বচ্ছন্দ। রান্নাঘরের রোয়াকের উপর ব'সে হেনার মার সঙ্গে ফুষা কথা কইছিল। আমি কাছে গিয়ে ব'ল্লুম—"এই গরম ঘরের ধোঁয়ায় কেন? বাগানে চলো।" তাড়াতাড়ি খাড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ফুষা ব'ল্লে "হেনার মার সঙ্গে সুখ দুঃখের কথা হ'চ্ছিল বাবু!"

মুখের সিগারেটটা নামিয়ে আমি ব'ল্লুম "তা আমায় দেখে উঠে দাঁড়াচ্ছ কেন? আমি তো তোমাদের কাপ্তেনও নই, সুবাদারও নই।"

—"না বাবু ও কথা বলবেন না! আপনি হ'লেন মনিব!"

—"কি রকম? তুমি এখানে চাকরী কর না কি?"

হেনা ও তার মার দিকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে সে ব'লে—"বাবু, আমি নাই করি। এরা তো করে—আমরা যে জাত ভাই!"

বুকের ভিতর আবার একটা তীক্ষ্ণ শেল বিঁধ্‌ল—শুষ্ক হাসি হেসে ব'ল্লুম—"তোমার বাহাদুরী খুব কিন্তু! এখানে তুমি আমাদের বাঙ্গালী বলে কাপুরুষ ভাবো—আবার মনিব ব'লে মুখের কথা দিয়ে অনেক উঁচুতে বসিয়ে রেখেছ—এ বড় মজা নয় ফুষা!" একটু ক্ষুণ্ণ ভাবে ফুষা ব'লে—"তা কি ক'রব বাবু, আপনারা মনে প্রাণে সত্যিই আমাদের চেয়ে অনেক

উঁচুতে কাজেই আমাদের সম্মানের পাত্র অথচ প্রাণের ভিতরটা, অন্তরের অন্তরে—হয়তো বা আমাদের মত গরীবও আপনাদের মত বড় লোকের চাইতে অনেক অংশে বড় এমনও কোথাও দেখা যায়। সেখানে আমাদের আত্মম্ভর আপনিই জেগে ওঠে!"

—"বাঃ তোমার তো খুব কথা কইবার শক্তি আছে? এমন সুন্দর যে কথা কইতে পারে তাকে কিছুতেই আমি বন্ধু না করে ছাড়ছি না।" এই ব'লে সস্নেহে তার লৌহকঠিন সুগঠিত বাহুতে হাত রাখবামাত্র—সচকিত বিস্ময়ে সে সরে দাঁড়িয়ে আবার এক সেলাম ঠুকে ব'লে—"আপনার দয়া কখনো ভুলব না বাবু, কিন্তু তা হয় না কখন! আকাশ আর পাতালের প্রভেদ কখন অভেদ হয় না, আর তেলে জলে কখন মিশে না বাবু!"

ফুয়ার এই নিষ্ঠুর প্রত্যাখানে আমার অহঙ্কারে বিষম আঘাত লাগ্‌লো। আমার অজ্ঞাতেই চক্ষু পল্লব অকাল জলদোদয়ের মত সজল হ'য়ে উঠ্‌লো। বিরক্তিস্বরে ব'ল্লুম—"সে তোমার ইচ্ছে! তোমার কিন্তু ঐ বাবু-বাবু ভাল লাগে না ফুয়া!" ফিরে চ'লে আস্‌ছি যখন তখন হেনা ও তার মায়ের কৃপাপূর্ণ দৃষ্টির প্রতি নজর প'ড়ল—লজ্জায় আমার মাথাটা যেন কাটা গেলো! একটা অশিক্ষিত বন্দুক ঘাড়ে কয়া সেপায়ের কাছে বন্ধুত্বের দাবী করে এত বড় একটা সভ্য জীব প্রত্যাখিত হ'ল—এটা কোন্ প্রাণে সহ্য যায়?

হেনার সঙ্গে ফুয়ার নিভৃত আলাপও আজকাল বেশ জমে উঠেছে। আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এ অভিজ্ঞতা-টুকু এড়িয়ে যায়নি। এমন কি তাদের পরস্পরের অনুরক্তিটুকু আমাদের সকলের চোখে বেশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ছিল! এক দিন কথায় ফুয়া ব'ল্লে—"আচ্ছা আপনার বাবাতো পেন্‌সন্ নিয়ে ওমাসে চ'লে যাচ্ছেন—আরতো তাঁরা এখানে আসবেন না?" আমি কিছু বলবার আগেই একটু হেসে মা ব'ল্লেন —"আর কি জন্যে আসবে বাছা—এখান নিয়ে। দেখে গিয়ে শুছিয়ে ব'সব—ওর একটি বিয়ে দিয়ে বৌ আন্‌বো, এমনি তো সাধ আছে—এখন ঈশ্বরের ইচ্ছে!"

ফুয়া ব'ল্লে—"তা'হ'লে ওদের কি ক'রবেন? আপনার পাহাড়ী দিদির আর তার মেয়ের?" একটু উত্তেজিত হ'য়ে আমায় ব'লতে হ'ল "ওরাও আমাদের সঙ্গে কলকাতায় যাবে!"

কথাটা শুনে ফুয়ার মুখখানা প্রথমে লাল হ'য়ে পরক্ষণে বিবর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো। তার মুখের দিকে চেয়ে তাড়াতাড়ি মা ব'ল্লেন "না না সে ওদের ইচ্ছে, যদি যেতে চায় যাবে।" নিষ্প্রভ মুখে বিষণ্ণ হাসির রেখা টেনে ফুয়া ব'ল্লে—"ওরা ব'লছিল, এত দিন আপনার নিমক্ খেয়েছে, এখন যদি না যায় সেটা কি ভাল দেখাবে!" হাসতে হাসতে মা ব'ল্লেন—"তা ব'লে কি নিজের দেশ ছেড়ে ওরা যাবে!" রাগের চোটে আমার ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছিল, ব'ল্লুম "কেন যাবে না ওরা? কিসের জন্যে? ফুয়ার এমন কি ধনরত্ন আছে যে চিরদিন বসিয়ে ওদের খেতে দেবে? আর যদিই বা দিতে পারে, তা'হ'লেই বা আমাদের এত বৎসরের দাবী, ফুয়ার দু'দিনের দাবীতে নষ্ট হ'তে পারে না—" নিশ্চয়! হেনা নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গী হবে তাতে আর ভুল নেই।

মা ব'ল্লেন "আমি হেনার মাকে ব'লেছি যে মেয়ের বিয়ে থাওয়া দিয়ে মেয়ে জামাই নিয়ে তুমি কলকাতায় চলো। হেনার উপর আমাদের একটা টান পড়ে গেছে, আমাদের কাছে আমরা ওকে রাখতে চাই। তা ওর মায়ের মত আছে। ওর মা ব'ল্লে হেনার বিয়ের জন্যেই দেশে থাকা, বিয়ে হ'য়ে গেলে মেয়ে জামাই শুদ্ধ আপনাদের কাছে থাক্‌বো, তার চেয়ে সুখের বিষয় আর কি আছে!" গর্বিত আনন্দে বুকটা ফুলিয়ে আমি ব'ল্লুম "সেই তো বেশ হবে মা!" এবারে ফুয়ার মুখখানা একে-

যাবে কালী হ'য়ে গেল—তার স্বাধীন বৃত্তি যে কিছুতেই তুতোর অধীনতা স্বীকার ক'রে থাকতে পারবে না, এটা আমি ভালো ক'রেই জেনেছিলুম। একটু রুক্ষস্বরে আমার দিকে চেয়ে তুম্বা ব'লে—আপনারই ধর্ম্মটি হেনার উপর বেশী টান আমী থাকতে হেনা ঝাঁপিগিরি ক'রতে যাবে কেন?" আমি উত্তর দেওয়ার আগেই ঝগড়ার পূর্ব্বলক্ষণ দেখে ভীত ভাবে মা ব'লে উঠ্‌লেন—"না না তুল বুঝছ তুমি তুম্বা—ঝাঁপিগিরি ওরা কোন কালেই করে নি, এখনও ক'রবে না আমাদের কাছে থাকতো এই পর্য্যন্ত!" মার কথায় শান্ত হ'য়ে মুখ নীচু ক'রে তুম্বা ব'লে—"তা না, এইটা অধীনতাই বা হেনার স্বামী যে সে সহ্য ক'রবে কেন?" মা ব'লেন—"তা ঠিক্, যদি ধরো হেনার স্বপ্রকল অবস্থা সম্পন্ন কোন পাহাড়ী ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয় তাহ'লে সে কি আর হেনাকে আমাদের কাছে এভাবে থাকতে দেবে?—তবে স্বামীর যদি মত হয় সেতো আলাদা কথা।" মায়ের দিকে চেয়ে উপহাসের হাসি হেসে আমি ব'লে ফেলুম—"তুম্বার মনের কথা তুমি ধ'রতেই পারলে না মা। ধরো তুম্বাই হেনার স্বামী—তুম্বার অবস্থা কি তেমন ভালো না তা নয়—তবু তুম্বার মত এক জাত অহঙ্কারের লাগ যার আছে সে কি আর স্ত্রীকে তোমার আমার সঙ্গে রাখবে? তাতে তার মানের হানি হবে যে!" একটু হেসে মা ব'লেন—"তা যদি হয় সে তো খুবই ভালো। আমাদের হেনা যদি তুম্বার মতো ভালো ছেলের হাতে পড়ে তার চেয়ে সুখের আর কি আছে। আহা! হেনার মা সেই কচি মেয়ে বিয়ে বিধবা হ'য়েছিল, সেও তাহলে মেয়ের জীবনে সুখী হবে।"

(৪)

তুম্বার সঙ্গে হেনার বিয়ের সব ঠিক্ ঠাক্ হ'য়েও হ'ল না। তুম্বা যা পেন্‌সন্ পায় তাতে তার, হেনার ও হেনার মায়ের খাওয়া পরার খরচ কুলান অসম্ভব! তুম্বা কাঁদো কাঁদো হয়ে হেনার মাকে ব'লে—তার নিজের তো কাজ করবার ক্ষমতা নেই, কারণ জ্বরোগের দরুণ মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক দিন যদি তাকে কামাই করতে হয় তাহ'লে তো চাকরী থেকে সাহেবরা বরখাস্ত দিবেই। তাই হেনা যদি ওয়াল্‌টার সাহেবের মেয়ের কাছে কাজ করে তাহলে অনায়াসে মাসে ২০।২৫ টাকা উপায় ক'রতে পারে। সেই টাকায় মিলিয়ে তিন জনের খাওয়া পরা অনায়াসে চ'লে যেতে পারে। এ কথায় অসম্মত হ'য়ে বিরক্ত-হেনার মা ব'লে—হেনা যদি সেই চাকরীই ক'রবে তবে বিনয়ের মার কাছে মেয়ের মত মায়ের সঙ্গে থাকতে এতে তোমার আপত্তি কেন?" গম্ভীরমুখে তুম্বা ব'লে—"বিনয়ের চোখের দৃষ্টি আমার ভালো লাগে না—ওদের সঙ্গে হেনাকে নিয়ে তুমি যদি কলকাতায় যাও—তাহ'লে অন্য জামাই খুঁজে নাও—আমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত!" তারী রেগে গিয়ে হেনার মা চীৎকার ক'রে ব'লে—"তাই যেন আমার মেয়ে না হয় আইবুড়ই থাকবে তা ব'লে এমন ভালো লোকের আশ্রয় ছেড়ে, আমি কোন সাহেবের বুটের তলায় আশ্রয় দিতে পারবো না। আজ বারো বৎসর হ'তে চ'ল্লো ওদের দেখে আসছি, কোলে পিঠে ক'রে বিনয়কে মানুষ ক'রলুম—সে বিনয় ভাল ছেলে নয়—তার চোখের দৃষ্টি খারাপ—তাকে সন্দেহের চোখে দেখা—এত বড় আস্পর্দ্ধা! অমন জামাই আমার কাজ নেই!" মায়ের এই রোষের অন্তরালে কতটা যে স্নেহাভিমান জড়িত আছে সেটুকু হেনা বুঝেছিল—কিন্তু তুম্বার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ-মুখের দিকে চেয়ে হেনা পাথরের মূর্ত্তির মত অচল হ'য়ে রইল—আর যদি তুম্বা না আসে? যদি—আর কেন—নিশ্চয়ই তুম্বা আর কখনও এ বাড়ী-মুখো হবে না—তুম্বা সে ছেলে নয়! আর তারাও তো আজ বাদে কাল নিজের দেশ ছেড়ে চিরদিনের মত অজানা বিদেশে চলে যাচ্ছে—এ জন্মে আর কখনও হয় তো তুম্বার সঙ্গে দেখা হবে না। বাগানের মেঘে মত আবছায়া গাছের নীচে বেদীর ওপর

আড়ালে একটা ঢিপির উপর ব'সে এতক্ষণের বুকে জমা কান্নার উৎস খুলে দিয়ে হেনা তার সমস্ত আঁচলটা ভিজিয়ে ফেল্লে। তবুও কান্নার শেষ নেই —তার সেই ফুলে ফুলে কান্নার কাতর আর্ত্তনাদ আমরুল গাছের পেছনে দাঁড়িয়ে আমি আর কিছুতেই সহ্য ক'রতে পারলুম না।

পা টিপে টিপে তার খুব কাছে এসে ব'লুম—"কেন অত কাঁদছ হেনা?"

এমন ভাবে ধরা পড়ায় হেনার মুখ লজ্জায় গাঢ় রক্তিম হ'য়ে উঠ্‌লো। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছে সে ব'ল্লে—"ওস্তু মাথা ধ'রেছে—তাই—"

—আমি হেসে ব'লুম—"এ মাথা ধরার কান্না নয় হেনা, এ বিরহের কান্না!" আমিই তার দুঃখের হেতু এই ভেবে হেনার চখে পলকের জন্যে বিদ্বেষের আগুন জ্বলে উঠে আবার তখনি তা নিমে গেল। গম্ভীরমুখে সে ব'ল্লে—"আপনারা আমাদের মনিব—আমাদের সঙ্গে কি ঠাট্টা করা শোভা পায়?"

—"আমিই তো তোমার দুঃখের মূল, আমার উপর তোমার বিষম একটা আক্রোশ জন্মেছে না হেনা?" হেনা আর সেখানে দাঁড়াল না যাবার সময় ব'লে গেল—"আপনারা আমাদের আশ্রয়দাতা অন্নদাতা, আপনাদের উপর ওরকম মনের ভাব আশা আমাদের পক্ষে অধর্ম্ম!"

প্রেমে প'ড়েও হেনা তার বিবেক বুদ্ধি হারাল না, রাগের মাথাতেও ঘোর বিদ্বেষ, কর্ত্তব্যের খাতিরে মাথা তুলতে পারলে না—মনে হ'ল হেনার শিক্ষা সার্থক! তার বিদ্যা ধন্য!

জুম্মা আর আমাদের বাড়ী আসেনি, এধারে আমাদের কলকাতায় রওনা হবার দিনও এগিয়ে আসছিল। হেনার মার সাদা প্রফুল্ল শান্ত মুখ অসম্ভব গম্ভীর ও চঞ্চল হ'য়ে প'ড়ছিল। জুম্মার উপর তার যথেষ্ট টান হ'য়েছিল এই কিছু দিনে, তা ছাড়া ভাবী জামাতৃপদে বরণ করবে স্থির ক'রে জুম্মাকে সে পরম স্নেহের পাত্র না ক'রে পারে নি। শেষে কর্ত্তব্যের অনুরোধে জুম্মাকে ধমক দিতে গিয়ে চিরদিনের মত সে তার সঙ্গে সম্বন্ধচ্যুত হ'তে হ'বে একথা হেনার মা স্বপ্নেও ভাবেনি। আর হেনা—তার কথা না ব'লেও চলে, শীতকালের পুষ্প লতার মত সে দিন দিন শুখিয়ে ম্লান হ'য়ে যাচ্ছিল—জুম্মার চির বিরহের আশঙ্কায়! এ সব দেখে শুনে আমার মনও যে স্থির ছিল তা নয়—কিন্তু সে পরের কথা। সেদিন জুম্মাদের বাড়ীর ওপারে ঘন জঙ্গলের কোণ থেকে এক বাঘ বেরিয়েছিল, জুম্মা তাকে মেরে ফেলে সহর শুদ্ধলোকের প্রশংসার ও ভালবাসার পাত্র হয়ে উঠেছিল। এই বাঘ মারার খবর আমাদের বাড়ীতে ও পৌঁছেছিল ঠিক। শুনলুম সেদিন সকালে সেই বাঘটা নিয়ে জুম্মা সাহেবদের বাড়ী বাড়ী দেখিয়ে এসেছে, শুধু আমাদের এখানে আসেনি। বাঘ মারার কথা শুনে হেনার চক্ষের দৃষ্টি এমন একটা মিশ্রিত প্রগাঢ় ভক্তিভরে উঠ্‌লো যে তাই দেখে মনে হ'ল, এ ব্রহ্মাণ্ডের এমন কি আছে যার বিনিময়ে ঐ দৃষ্টির দাবী ক'রতে পারা যায়? বাঘ মারার ক্ষমতা না থাকলেও ওর চেয়েও প্রবল কোন শত্রুকে বধ ক'রলেও তো সেই সম্মান পেতে পারা যায়? সেই থেকে জুম্মার উপর হেনার শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল! দেবতার মত হেনা তাকে প্রেম পূজার অর্ঘ্য নিত্যই অর্পণ ক'রত।

যাবার আগের দিন আমি বল্লুম—"ওদের আর কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কাজ নেই মা!" একটু হেসে মা ব'ল্লেন-"আমিও তাই ভাব্‌ছিলুম। এখানে থাকলে জুম্মার সঙ্গে হেনার বিয়ে দিতে পারবে, আহা তারা কত সুখী হবে! কিন্তু বলে খাবার টাকা পাবে কোথায়?" অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আমি বল্লুম—প্রত্যেক মাসে হেনার মার নামে ২০ টাকা করে পাঠিয়ে দেবো, তাহ'লে আর ওদের কোন কষ্ট হবে না।" একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে মা ব'ল্লেন—"তা তুই দিতে পারবি তো? ঠিক্ তো?"

—"ঠিক্ নয়তো কি তোমায় বেঠিক্ ব'লছি!"

—"কোথা-থেকে এ টাকা পাবি শুনি?"

—"দু'জায়গায় টিউশনারি করলেই মাসে ৫০ টাকা অনায়াসে পেতে পারব।"

—"সময় পাবি কখন? নতুন ওকালতী পাশ দিয়েছিস্. আদালতে যেতে হবে তো?"

—"কেন, সন্ধ্যাবেলা—সকাল বেলা তো আছে, একটু খাটলেই হবে।"

—তবে আমি হেপার মাকে এ খবর বলিগে, শুনলে তারা খুবই সুখী হবে।"

—হাঁ তুমি ওদের বলো গিয়ে। ওরা আমাদের যথেষ্ট করেছে, আমরা ওদের কাছে চিরদিনই ঋণী থাকবো। তবু টাকা দিয়ে যৎসামান্য শোধ দেওয়া।"

এ কথা হেপা শুনবার পর তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। জিনিষ পত্র প্যাক্ করা, যাবার বন্দোবস্ত আমাকেই করতে হ'ছিল—পরদিন ভোর ছটার ট্রেণে এতদিনের ডেরাডুণ ছাড়তে হবে রাত্রির থাকতেই আমরা বিছনা ছেড়ে উঠ্লুম। মুখ হাত ধুয়ে বিছানা পত্র বাঁধাবাঁধি হচ্ছে এমন সময় মা বল্লেন—চা.।.. নে বিনয়, আমাদের সকলের খাওয়া হ'য়ে গেল, আর দশ মিনিট সময় আছে।" গাড়ীতে জিনিষ পত্র ওঠাতে ওঠাতে আমি ব'ল্লুম—"এইখানেই চা. পাঠিয়ে দাও, আমার খাবার সময় নেই। একটু পরেই এক পেয়ালা গরম চা ও খাবার সাজিয়ে নিয়ে হেপা এসে দাঁড়াল—চোখে চোখে হ'তেই দেখি, সেদিন যাব মায়ার কথা শুনে সুষমার প্রতি অন্তরতরে যে অর্ঘ্য তার কালো চোখের তারায় ভ'রে উঠেছিল আজ ঠিক্ তেমনি অর্ঘ্যই—যা আমার একান্ত বাঞ্ছিত ছিল তাই হেপার চোখ ছাপিয়ে বিপুল ধারায় ভ'রে উঠেছে। মা এসে প'ড়লেন তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠ্তে হ'ল। আমাদের গাড়ী গলির মোড় ছাড়িয়ে যখন ষ্টেশনের বড় রাস্তায় পড়েছে—তখনও দেখা গেল—হেপা তেমনি ভাবেই বাগানের ধারে মেদীর বেড়ায় ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

* * * *

কলকাতায় এসে অবধি এই ক'দিন বিষম ঝঞ্ঝাটে মেতে আছি সেদিন বাড়ী ফিরতে একটু রাত হয়েছিল। এক এক লাফে সিঁড়ি পেরিয়ে ঘরে ঢুকতেই মা বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে বল্লেন "ও বিনয়! এত দিন পরে কে এসেছে দ্যাখ্ আজ।" মার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার পিঠের উপর সস্নেহে হাত রেখে কে ডাক্লে—বন্ধু!"

বিস্ময়ে ও কৌতূহলে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্লো—ফিরে দেখি সুষমা—দু'হাতে তার হাত দু'ট চেপে ধ'রে ব'লে ফেল্লুম—"এতদিনে বন্ধু হবার যোগ্য হ'য়েছি?" একটু হেসে সুষমা ব'ল্লে—"তোমার অকৃত্রিম ভালবাসা উপেক্ষা ক'রেছি।"

তারপরে দুই বন্ধুতে আহারে বসা গেল, মা নিজে হাতে পরিবেশন ক'রলেন শেষে হাস্তে হাস্তে সুষমা ব'ল্লে—"অত ক'রে কেন জিগেস্ ক'রছেন মা? হেপা আর হেপার মাকে সশরীরে আপনার পায়ের তলায় শিগ্গিই এনে পৌঁছে দেবো, তখন নিজেই তাদের সব জিগেস্ ক'রে নেবেন।" আঁচলে চোখ মুছে মা ব'ল্লেন "তাই আনো বাবা কিন্তু তোমাকেও তাদের সঙ্গে এখানে থাকতে হবে—শুধু হেপার স্বামী ব'লে নয়—আমার ছেলে ব'লে। আবেগ ঝাড়ম্বরে সুষমা ব'ল্লে—"সে আর আপনাকে ব'লতে হবে না মা। আমার বন্ধুকে ছেড়ে আমি কি আর কোথাও যেতে পারি।" আর বেশী কথা বার্ত্তা সে রাত্রে হ'ল না। বিছানায় গিয়ে শুয়েছি সুষমা এসে হঠাৎ আমার ঘরে ঢুকে ব'ল্লে—"একটা কথা আছে বন্ধু!" আমি তার হাত ধ'রে ব'ল্লুম—"কি কথা?" আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে সুষমা ব'ল্লে—"যাকে ভালোবাস তাকে তো ছেড়ে এলেই, আমার তার উপর তার প্রতিদ্বন্দ্বীর

সুবিধের জন্য টাকা পাঠানর ব্যবস্থা—এতটা মহত্ব যে মানুষের হ'তে পারে তা জানাছিল না বন্ধু !"

ঘুমোবার ভাণ করে চোখ বুঁজেই ব'লুম—"এই আমাদের গর্ব্ব ঘুমা—বাঙালীকে চাজার ভীরু কাপুরুষ ভাবো—কিন্তু অন্তরের প্রবল শত্রুকে বশ ক'রতে সে জানে !"

আরো আস্তে আস্তে ঘুমা ব'লে—চিরকুমার থাকবে কি?"

"হ্যাঁ ভাই—এইটুকুই' আমাদের গৌরব !"

পরশ-পূজা

(কাজী নজরুল ইস্‌লাম)

(গান)

আমি এ দেশ হ'তে বিদায় যেদিন নেবো প্রিয়তম,
আর কাঁদবে এ বুক সঙ্গীহারা কপোতিনী সম,
তখন মুকুর পাশে একলা যেহে
আমারি এই সকল দেহে
চুমবো আমি চুমবো নিজেই অসীম স্নেহে গো
আহা পরশ তোমার জাগ্‌ছে যে গো এই সে দেহে মম
কম সরম হরষ সম ॥
তখন তুমি নাইবা প্রিয় নাইবা ব'লে কাছে,
জান্‌ব আমার এই সে দেহে এই সে দেহে গো—
তোমার বাহুর বুকের পরশ-ছোঁওয়ার কাঁপন লেগে আছে,
অধীর মদির পুলক নাচে !
তখন নাইবা আমার রইল মনে
কোন্‌খানে মোর স্নেহের বনে
জড়িয়েছিল লতার মতন আলিঙ্গনে গো !
আমি চুমোয় চুমোয় ডুবাবো এই সকল স্নেহ মম
ঘন শ্রাবণ-প্লাবন সম।
আমি এ দেশ হ'তে বিদায় যেদিন নেব প্রিয়তম ॥

কবিবর গিরিশচন্দ্র ও তাঁহার নাট্য-প্রতিভা।*

(স্বর্গীয় কালিদাস মিত্র এম, এ)

১। উপক্রমণিকা।

বাঙ্গালার সাহিত্যজগতের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কক্ষচ্যুত হইয়া অনন্তের পথে বিলীন হইয়াছে। বঙ্গরঙ্গমঞ্চের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা নটকুলশেখর গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষা ও নাট্যসাহিত্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া দিব্যধামে গমন করিয়াছেন। ১৩১৮ সালের ২৭শে মাঘ বাঙ্গালীর জাতীয় দুর্দ্দিন, বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় শোচনীয় দিন। ঐ দিনে বাঙ্গালীর গিরিশ, বাঙ্গালার জাতীয় কবি, অদ্বিতীয় নট ও নাট্যকার, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের চরণাশ্রিত ভক্ত, প্রেমিক ও কবি গিরিশচন্দ্র সমগ্র বাঙ্গালী জাতি, বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালীর সমাজকে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত ও অসহ্য শোকে মুহ্যমান করিয়া সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা শীঘ্র পূর্ণ হইবার নহে।

গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালাদেশে সাধারণ রঙ্গালয়ের আদি প্রতিষ্ঠাতাদিগের মধ্যে অন্যতম। নাট্যকার রূপে তাঁহার অমর লেখনী অপূর্ব্ব গ্রন্থরাজী প্রসব করিয়া বঙ্গভাষাকে অলঙ্কৃতা করিয়াছেন। নটরূপে তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা নাট্যজগৎকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। নাট্যমঞ্চের অধ্যক্ষতায় আমরা গিরিশ চন্দ্রকে আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ নাট্যশিল্পী ও আদর্শ কর্ম্মবীররূপে দেখিতে পাই। রামকৃষ্ণ-চরণাশ্রয়ে আসিয়া গিরিশচন্দ্র ধর্ম্মজগতেও এক সুপ্রতিষ্ঠিত আসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কাব্যই কবিপ্রতিভার কীর্ত্তিস্তম্ভ। কবির স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার্থ স্মারক-স্তম্ভ উত্তোলন করা হউক আর না হউক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না; কবির কালজয়ী প্রতিভাই তাঁহাকে চির-অমরতা প্রদান করিয়া থাকে। গিরিশচন্দ্র নাট্যকার ও কবি। তাঁহার কবিত্বের নির্ঝর নির্ঝর সাহিত্যের এই বিশেষ শাখা অবলম্বনে স্বতঃ প্রবাহিত।

কি গানে, কি কবিতায়, কি উপন্যাসে ও প্রবন্ধে, কি নাটকাদিতে সর্ব্ববিষয়েই গিরিশ-চন্দ্রের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। তবে, নাট্যসাহিত্যের দিক্ দিয়াই তাঁহার ব্যক্তিত্ব, তাঁহার বিশেষত্ব সম্পূর্ণ বিকসিত হইয়াছিল। তাই তাঁহার নাট্যপ্রতিভার পরিচয় লইতে হইলে তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী ও তাহাদিগের অন্তর্নিহিত মর্ম্ম দিয়াই তাঁহার প্রতিভার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে।

২। গিরিশচন্দ্রের কবিত্বশক্তি।

তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা সাহিত্যের কোনও এক বিশেষ অংশেই যে একেবারে আবদ্ধ ছিল তাহা নহে। যদিও তিনি নাট্যকাররূপেই বাঙ্গালা-সাহিত্যের আসরে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন, তথাপি সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও তাঁহার প্রতিভার স্ফুরণ পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার কবিতাগুলি সংগৃহীত হইয়া সম্প্রতি "প্রতি-ধ্বনি" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। কি ভাব-সম্পদে, কি ভাষা-সৌকর্য্যে ইহা এক উচ্চশ্রেণীর খণ্ডকাব্য। এরূপ সরল, হৃদয়গ্রাহী রচনা গিরিশ-চন্দ্রের খাঁটি কবিত্বের নিদর্শন। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সমালোচক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এই

---

* কবিবরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই লিখিত।

গ্রন্থের ভূমিকায় যথার্থই লিখিয়াছেন, "গিরিশচন্দ্রের নাটকে তাঁহার শক্তির পরিচয়, তাঁহার কবিতায় তাঁহার হৃদয়ের পরিচয়,—তাঁহার বোধবেদনার পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতায় কবির মনের ভাব ফুটিয়া উঠে, কবিতার ভিতর দিয়া কবির বোধবেদনাকে বুঝা যায়, নাটকে তেমন যায় না। নাটক কতকটা কৃত্রিম। কবি গিরিশচন্দ্রকে সম্যক্ বুঝিতে হইলে তাঁহার নাটকও দেখিতে হইবে, তাঁহার কবিতা-গুলিও পড়িতে হইবে।"

বাল্যে পিতামাতার বিয়োগ ও যৌবনে পত্নী ও পুত্র দ্বারা ব্যথিত-হৃদয় গিরিশচন্দ্রের কবিত্বে নিরাশার বাণী অতিমাত্রায় ধ্বনিত হইলেও, আশার মধুময়ী বাণীও শুনা যায়। ঐহিক আশা ও আকাঙ্ক্ষার চরমে পারত্রিক আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি, দুঃখের পর শান্তি এই কবিতাগুলির প্রতিপাদ্য বিষয়। বহুদর্শী সমালোচক অক্ষয়চন্দ্রের মতে, কবি তাঁহার 'যন্ত্রমাঝে নৃত্যকারী ক্ষুদ্র চাতকের'ই মত কালজয়ী হইয়াছেন। তাঁহার কবিতার ভাবসৌন্দর্য্য ও ছন্দোমাধুর্য্য অপরূপ ও উপভোগ্য। তাঁহার 'কল্পনা' কবিতায় স্বর্গ নরক, প্রেম, ধ্যান, দয়া, ক্ষমা এবং ষড়্‌রিপুর যে সজীব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে তাহাতেই তাঁহার নাটকীয় চিত্রাঙ্কনশক্তির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। Collinsএর 'The Passions' কবিতা হইতে ইহা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে। ধুতুরা, চাতক, কোকিল, আঁধার, শৈশবসাথী, গোলেমা, হল্‌দি-ঘাটের যুদ্ধ, নবমী, স্মৃতি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাসবিধবা, ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি অনেকগুলি উচ্চশ্রেণীর কবিতা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কবিতাগুলি উৎকট কামনার বিজৃম্ভন নহে; পুষ্পপেলব শয্যায় নারীর বক্ষ-উপাধানে সংরুদ্ধগুলির কোমল-হৃদয় কবির প্রেম-প্রলাপ নহে। কবিতাগুলি সংখ্যায় অল্প হইলেও প্রাণময়ী, প্রকৃত কবিতা নামের যোগ্য। এই কবিতাগুলির মধ্য দিয়া গিরিশচন্দ্রের বিশেষত্ব—তাঁহার নিজত্ব (individuality) ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার হৃদয়, তাঁহার কর্ম্মজীবনের নিয়ন্তা সেই হৃদয়ের পরিচয় ব্যতীত তাঁহার নাট্যপ্রতিভা, তাঁহার কবিত্ব, তাঁহার আপনার বলিতে যাহা কিছু, তাহার কিছুই বুঝিতে পারা সম্ভব নহে। বিরাট্ শোকাগ্নির চারিদিকে বসিয়া গিরিশচন্দ্র মহা-তাপসের মত যে উগ্র সাধনায় রত হইয়াছিলেন, তাঁহার 'শঙ্করাচার্য্য' ও 'তপোবলে' সেই তপস্যা সিদ্ধ হইয়াছে। স্বদেশ, বঙ্গসাহিত্য, সমগ্র বাঙ্গালী জাতি ও বঙ্গীয় নাট্যশালাকে গৌরবান্বিত করিয়া তিনি স্বীয় তপস্যার্জ্জিত অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন।

কি অনুবাদে কি উদ্ভাবনীশক্তিতে সর্ব্ববিষয়েই তিনি স্বীয় প্রতিভার অপূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করিয়া বঙ্গভাষা, ও বঙ্গীয় সুধীসমাজকে চিরকৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাই তাঁহার শোকে বঙ্গজননী আজ মুহ্যমানা। বঙ্গসমাজ তাঁহার ন্যায় প্রকৃত হিতৈষী ও সংস্কারককে হারাইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়।

৩। সমালোচক গিরিশচন্দ্র।

ম্যাক্‌বেথ অভিনয় ও মেঘনাদ বধ অভিনয়ের প্রস্তাবনায়, কবিতার মধ্য দিয়া গিরিশচন্দ্রের সমা-লোচনীশক্তির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে তিনি বিভিন্নশ্রেণীর দর্শকের রুচি ও তৃপ্তির পরিচয় দিয়াছেন। কবি, চিত্রকর, সৌন্দর্য্যবিলাসী, নাট্য-কলাভিজ্ঞ, সঙ্গীতপ্রিয় এবং তরল প্রকৃতি মোহমুগ্ধ দর্শকগণের রুচি ও তৃপ্তির বিভিন্নতা প্রদর্শন করিয়া কবি গিরিশচন্দ্র নিপুণ সমালোচকের ন্যায় নিরপেক্ষতা প্রদর্শনে ত্রুটী করেন নাই।

উত্তরকালে গদ্য রচনার মধ্য দিয়া তাঁহার এই সমালোচন-শক্তি স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল। তাঁহার কয়েকটী উত্তম প্রবন্ধ, বিশেষতঃ নট, নাট্যকার ও নাট্যশালা বিষয়ক কয়েকটী জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ সুলিখিত, চিন্তাশীল আলোচনা তাঁহার গবেষণা ও ধীশক্তির পরিচয় দেয়। ইহার মধ্যে 'অভিনয় ও

অভিনেতা' (নাট্যমন্দির ১ম বর্ষ), কবিবর রজনীকান্ত (ঐ), নাট্যমন্দির, নাট্যকার, নটের আবেদন, নাট্যশিল্পী দর্পণদাস, বহুরূপী বিদ্যা, রঙ্গালয় প্রভৃতি নূতন প্রকাশিত কয়েকটী প্রবন্ধ ও সৌখীনিক নাটক, নৃত্য প্রভৃতি পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধগুলি তাঁহার গদ্য রচনার সূক্ষ্ম সমালোচনশক্তির পরিচয় দেয়। এই সকল প্রবন্ধে শিক্ষা করিবার, চিন্তা করিবার, অনুধাবন করিবার, যথেষ্ট উপাদান আছে। এগুলি যেমন তাঁহার নাটকীয় প্রতিভার একদিক আলোকিত করে, তেমনি আবার তাঁহার সূক্ষ্ম মানসিক শক্তি ও অসাধারণ বিশ্লেষণ-ক্ষমতাও প্রকাশ করে। এই সমালোচনশক্তির অধিকারী হইয়া তিনি নিপুণতা সহকারে ঘটনা-স্রোতের আবর্ত্তে নিপতিত নরনারীর হৃদয় ও কার্য্যাবলীর যথাযথ বিশ্লেষণ করিয়া, তাঁহার নাটকগুলিতে অপূর্ব্ব মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। রঞ্জন্-রশ্মির (Rontgen ray) সহায়তায় যেরূপ অদৃশ্য বস্তুও দিপথারূঢ় হয়, গিরিশচন্দ্রের তীব্র জ্ঞানদৃষ্টিতেও সেইরূপ নরনারীর হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন ঘটনা-স্রোতের মধ্য দিয়া বিভিন্ন প্রকৃতির নরনারীর মনোভাব কিরূপ বিভিন্ন আকার ধারণ করে ও কিরূপে অনুষ্ঠিত কার্য্যসমূহে সেই সেই ভাবের অভিব্যক্তি সূচিত হয়, তাহা গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলী পাঠ বা রঙ্গালয়ে অভিনয় সন্দর্শন করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে। ইহাও তাঁহার সুনিপুণ সমালোচন-শক্তির পরিচায়ক মাত্র।

৪। গিরিশচন্দ্রের গদ্য-রচনা।

খণ্ডকবিতা ও সমালোচন প্রবন্ধের ন্যায় উপন্যাস, ছোটগল্প ও অন্যান্য সুললিত গদ্য রচনায়ও তাঁহার অল্প কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। 'পাষণ্ডবিদ্রোহের ঘটনাবলম্বনে লিখিত উপন্যাস 'হরা' ও 'হারা বিশ্বনাথ, বাজাল, বড় বউ, পুজার তত্ত্ব ও নাট্যমন্দিরে নূতন প্রকাশিত নীলা প্রভৃতি কয়েকটী ছোট গল্প এ বিষয়ের সাক্ষ্য। এই সকল গল্প নানা রসের আধার। করুণ, হাস্য, শান্ত, রুদ্র প্রভৃতি নানা রস এই সকল গল্পে ও উপন্যাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে। কৌতূহল-প্রবৃত্তি উদ্দীপিত রাখিতে গল্পগুলি কম সহায়তা করে না। চরিত্র-বিকাশে ও ঘটনা-পরম্পরার বৈচিত্র্যসাধনে গিরিশ চন্দ্রের নাটকীয় শক্তির স্পন্দন ও এগুলিতে বেশ অনুভূত হয়। তাঁহার পাখী গাও, গরুড়, ঈশ্বজ্ঞান, বিবেকানন্দের সাধন প্রভৃতি নানা বিষয়ক প্রবন্ধ নানাদিক্ হইতে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়া থাকে। কি সমাজ কি স্বদেশ, কি স্বধর্ম্ম সকল দিকেই তাঁহার লক্ষ্য ছিল; এবং এই তিনটীর উন্নতির জন্য তিনি চিন্তা করিতেন। চিন্তার ফলও আমরা বহুবার তাঁহার লেখনীমুখে পাইয়াছি।

৫। গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে ও তাঁহার রচনায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐশীশক্তির প্রভাব।

গিরিশচন্দ্র প্রেমিক ও কবি। তাঁহার নাটকা-দিতে স্বদেশ, সমাজ ও স্বজাতি-প্রীতি পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। সমাজের দুঃখে বিগলিত-হৃদয় গিরিশচন্দ্র সমাজের হিতসাধনার জন্য স্বীয় লেখনী অবিরাম চালনা করিয়া আসিয়াছেন। দেব-দ্বিজে ভক্তি, নারীজাতির প্রতি সম্মান, হিন্দু সমাজ ও হিন্দু আচার নীতির রক্ষণশীলতার যথেষ্ট পরিচয় তাঁহার কবিতা ও নাটকাদিতে পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণাশ্রয়ে আসিয়া তাঁহার এবং অমাদের বিশ্বাস, স্বতঃ-প্রেম-প্রবণ হৃদয়ে নূতন প্রেমের উৎস ছুটিয়া উঠে। স্বদেশ, সমাজ ও জনসাধারণের সংকীর্ণ গণ্ডী হইতে তাঁহার প্রেম উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রদেশে উন্নীত হইয়া, পরব্রহ্মের ঐশী শক্তিতে বিলীন হইয়াছে। ইহা তাঁহার জীবনে রামকৃষ্ণদেবের প্রভাব-বিকাশের

কল। গিরিশচন্দ্রের সৃষ্ট নাটকাবলীতেও ঐ শক্তির বিকাশ লক্ষিত হয়

৬। নানা রসাবতারণায় গিরিশচন্দ্র।

সর্ব্বরসের অবতারণায় তাঁহার সমান ক্ষমতা ছিল। কি করুণ, কি শান্ত, কি রুদ্রবীর রসের অবতারণায়, তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। হাস্য ও অদ্ভুতরস বর্ণনায় ও তাঁহার যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখা যায়। তিনি "মেকীর" যম ছিলেন। তাঁহার প্রহসনাবলী ও অন্যান্য নাটকীয় চরিত্র সমালোচনাকালে আমরা ইহা বিশদভাবে দেখাইবার প্রয়াস পাইব। সমাজ ও স্বদেশের উন্নতির জন্য, সমাজবৃক্ষে সদ্যোজাত পরভৃৎগুলি উৎপাটন করিবার জন্য তিনি অনেক সময় তীব্র-কটু ঔষধের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি কখনও ব্যক্তিগতভাবে কাহাকেও আক্রমণ করেন নাই। ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব।

তাঁহার করুণ-রসাত্মক নাটকের অভিনয় দর্শনে যেমন অশ্রুসংবরণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে; সেইরূপ তাঁহার হাস্যরসপূর্ণ নাটকাদির অভিনয় দর্শনে আবার হাসিয়া হাসিয়া লুটিয়া পড়িতে হয়। স্বদেশ ও সমাজের দুঃখে তীব্রজ্বালাময়ী লইয়া তিনি যে সকল ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক লিখিয়াছেন, সেগুলি পাঠে বা তাহাদের অভিনয় দর্শনে উত্তেজিত হন না এরূপ লোক বিরল। তাঁহার তেজী নিনাদ যেমন দেশের নরনারীকে কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, সেইরূপ তাঁহার বাঙ্গের কষাঘাত, দেশবাসীর কর্ম্মক্লিষ্ট ব্যথিত হৃদয়কে শান্তি প্রদান করিয়াছে। একদিকে তিনি যেমন যুবকযুবতীর হৃদয়ে সাময়িক লালসাময়ী উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছেন অন্যদিকে, আবার শান্ত-করুণ-গম্ভীর রসের অবতারণা করিয়া, উচ্চ ধর্ম্মভাবের বিকাশ সাধনে শান্তিপথাবলম্বী মুমুক্ষু সুধীজনের মনোহরণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে নির্ব্বাণের পন্থা, মুক্তির সোপান দেখাইয়া দিয়াছেন।

তাঁহার নাট্যকাব্যাদির মত শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষার অলঙ্কার। মাইকেলের পর বোধ হয় কাব্যে এরূপ শুদ্ধ গম্ভীর ভাষা আর কাহারও রচনায় পরিলক্ষিত হয় নাই। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রে ভাষার তীব্র ঝঙ্কার আছে। উহা মাদকতার ঘোরে হৃদয়মন আচ্ছন্ন করে সত্য, কিন্তু তাহা চরমে বৈরাগ্যের অবসাদ আনিয়া দেয়; গিরিশচন্দ্রের হৃদয়োন্মাদিনী কবিত্বশক্তি মদ্যকর যাতাদের মত ক্ষণিক উপভোগ্য নহে, উহা নিপুণ কর্ম্মবীর বহুদর্শী সেনাপতির রণক্ষেত্রে তূর্য্যনিনাদের মত। ইহাতে ভূয়োদর্শন, সময়ানুসারে কার্য্যকারিতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আবার মধুর বঙ্কারে প্রাণ মাতাইতে তিনি প্রাচীনকবি জয়দেব হইতে; বর্ত্তমান রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত কাহারও তুলনায় হীন নহেন। বাঙ্গালার দুরদৃষ্ট-ক্রমে এ দেশের প্রতীচ্য-ভাববিমুগ্ধ শিক্ষিত-সমাজ কবিকে সম্যক্ সমাদর প্রদান করেন নাই; কেননা তিনি নটরূপে চিরকাল সাধারণ রঙ্গমঞ্চে জীবনযাপন করিয়াছেন। কিন্তু সেক্সপীয়র মলিয়ার গ্যারিক্ শেরিডান্ প্রভৃতির নামে বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজ আনন্দে বিহ্বল হন! কিন্তু ঐ সকল প্রতীচ্য দেশ-গৌরব নাট্যকারগণের অনেকেই ত রঙ্গালয় সংশ্লিষ্ট ছিলেন? তাঁহার মধ্যে কয়জন গিরিশচন্দ্রের মত এরূপ সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছেন? গিরিশচন্দ্র নাট্যরচনায় যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন অভিনয়ে, বিজ্ঞান ও কলাসম্মত নাট্য-সৌকর্য্যসাধনে, নাট্যাচার্য্যরূপে শিক্ষা প্রদান করিয়া ও বাঙ্গালার নাট্যশালা গঠনের সহায়তাকল্পে একাধারে যে প্রভূত শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা অল্পক্ষেত্রেই দৃষ্ট হয়। এই শিলার্ পেটে-র্যাসিনে মুগ্ধ প্রতীচ্য-ভাবরস-গ্রাহী শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বীয় গৃহকোণে ফুলিয়াও কিরিয়া

চাহেন না! যদি চাহিতেন, তবে তাঁহারা দেখিতে পাইতেন যে, জননী বঙ্গভাষা নিতান্তই দীনা নন; ভাষা ও ভাব সম্পদে তিনি প্রতীচীরাণী য়ুরোপসুন্দরীর বিশ্ববিজয়ী সৌন্দর্য্যের নিকট দাঁড়াইবার একেবারেই অযোগ্যা নন। যাঁহার নিজের সন্তানগণ ভুলিয়া মাতার পানে ফিরিয়া চাহে না, তিনি ভয়ে ভয়ে, লাজরক্তিম মহিমামণ্ডিত মস্তকটিকে সঙ্কুচিত ভাবে সাহিত্যের বিরাট্ আসরে অবতীর্ণা না হইয়া কি করেন? তাঁহার সন্তানেরা আজ যদি মাতার গৌরব রক্ষার্থে প্রয়াসী হইতেন তাহা হইলে তাঁহারাও বলিতেন,—বিশ্বয় সহকারে বলিতে বাধ্য হইতেন, "হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন!" যদি 'শঙ্করাচার্য্যের' মত নাটক আর্য্যাণ, ফরাসী, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হইত, তবে সেক্সপীয়র প্রভৃতির ন্যায় গিরিশচন্দ্রের প্রতিভাও বোধ হয় বিশ্ববিজয়ী হইতে পারিত!

। গিরিশচন্দ্র ও বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজ ।

গিরিশচন্দ্র পতিতা নারী সংশ্লিষ্ট রঙ্গালয়ের সম্পর্কে ছিলেন বলিয়া কি তিনি পতিত, ঘৃণিত ও অনাদৃত? কিন্তু যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি, হিন্দুবিধবাও পুরুষদিগকে লালসার তাড়নায় প্রধর্ষণাভিপ্রায়ে উন্মাদের মত ইতস্ততঃ ধাবমান, ভ্রান্ত, ইতি-কর্ত্তব্যজ্ঞান-শূন্য, প্রাচ্য ভাবভাব বিশিষ্ট পরুষ জীবরূপে চিত্রিত করিয়া বঙ্গভাষা ও হিন্দু-প্রধান ভারতীয় আর্য্যভাবকে বিকৃতরূপে ঠিক নভেল গল্প ও কবিতার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারা একবার গিরিশচন্দ্রের নাটকা-বলী অপক্ষপাতমনে পাঠ করুন, দেখিবেন নারীর কি মহিমমণ্ডিত মূর্ত্তি, সতীত্বের কি কমনীয় চিত্র, সঙ্গে সঙ্গে পুরুষত্ব, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি কি তীব্র প্রেম উহার ছত্রে ছত্রে বিরাজিত!

গিরিশচন্দ্র ভণ্ডামী ভালবাসিতেন না, তাই ভণ্ডামীর বিপক্ষে অনেক সময়ে তাঁহাকে তীব্র কশা চালনা করিতে হইয়াছিল। কবির গভীর মর্ম্মবেদনার তীব্রজ্বালাপ্রসূত এই সুদৃঢ় কশাঘাতের মধ্যে হয়'ত এমন কিছু থাকিতে পারে যাহা বর্ত্তমান শিক্ষিত সুক্ষ্মদৃষ্টিপরায়ণ 'শুচিবাই'গ্রস্ত সাহিত্যসমাজের চক্ষে নিন্দনীয়! কিন্তু সেই একদেশদর্শী সমাজকে জিজ্ঞাসা করা যায় কি, মনোহর আবরণে আপাত মধুর-লালসা-বিভ্রমময়ী যে সকল রচনা উক্ত সমাজের হিতৈষণায় প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে প্রপীড়িত ও সমাজের ভয়াবহ শোচনীয় পরিণামের কারণ হইয়া উঠিতেছে, সে সকলের বিরুদ্ধে বলিবার কি কিছুই নাই? অনেক লিখিলে অনেক দোষ থাকা সম্ভব। গিরিশচন্দ্রের রচনা যে দোষশূন্য একথা আমরা বলিতেছি না। সেক্সপীয়র, মোলেয়ার, শিলার, গেটে, র‍্যাসিনে প্রভৃতিতেও দোষ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু যতদিন ইংরাজী, ফরাসী ও আর্য্যাণ সাহিত্য বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন ঐ সকল নাট্যকার ও কবির নাম অমর হইয়া থাকিবে।

বর্ত্তমান বাঙ্গালাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল পর্য্যন্ত যাঁহারাই অনেক লিখিয়াছেন তাঁহাদের রচনায় অল্পবিস্তর দোষ অপরিহার্য্যভাবে রহিয়া গিয়াছে। তাই বলিয়া বঙ্কিমের ন্যায় দুই শত অনুসন্ধান সাহিত্যিকের একমাত্র ব্রত নয়। তাঁহারা যে সকল উচ্চ ভাব-সম্পদে বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, যে সকল নূতন চিন্তার সুরধুনী সমাজে ও সাহিত্যে অশেষ হিতকল্পে প্রবাহিত করিয়াছেন, যে সৎশিক্ষা প্রচারদ্বারা সমাজ ও স্বদেশের উন্নতিসাধন করিয়াছেন, সে গুলি প্রদর্শন করাই প্রকৃত সমালোচকের মুখ্য কর্ম্ম। তবে যে একেবারেই দোষ প্রদর্শন অবিধেয় তাহা নহে। সমালোচকের কার্য্য নিরপেক্ষ ও গুরু দায়িত্ব পূর্ণ।

সেক্সপীয়রও তাঁহার জীবিত কালে ইংলণ্ডের তদানীন্তন (Puritan) 'শুচিবাইগ্রস্ত' শিক্ষিত সমাজে সম্যক্ আদর পান নাই। কিন্তু এক্ষণে

সেক্সপীয়রের গৌরব জগদ্ব্যাপী। গিরিশচন্দ্রও শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট অনাবৃত থাকিবেন না-থাকিতে পারেন না। আজ যদি গিরিশচন্দ্র বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ না করিয়া সুদূর প্রতীচ্যভূখণ্ডে, ইংলণ্ড বা ফরাসীদেশে জন্মগ্রহণ করিতেন, তবে স্বভাষা তাঁহার প্রতিভাময়ী রচনার অভাবে হীনা থাকিলেও তাঁহার নাম বোধ হয় এত দিনে ভারতের প্রতীচ্যভাব-বিমুগ্ধ শিক্ষিত সমাজের মুখে মুখে ফিরিত। কবি ঈশ্বর গুপ্ত মনোদুঃখে বলিয়াছেন,

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া!"

বঙ্কিমচন্দ্র ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন, "এখনকার কয়জন লোকে ইহা বুঝে? ঈশ্বর গুপ্তের কথায় বা কাজেও তাই ছিল। তিনি বিদেশের ঠাকুরদিগের প্রতি ফিরিয়াও চাহিতেন না, দেশের কুকুর লইয়াও আদর করিতেন।" ঈশ্বর গুপ্ত ডিগ্রীধারী বিশ্ববিদ্যালয়-কেরৎ শিক্ষিত ছিলেন না। তাঁহার মতন সরল খাঁটীলোক ও বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ে আকাশ পাতাল পার্থক্য।

৮। গিরিশচন্দ্র—গ্যারিক্—সেক্সপীয়ার।

গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালার গ্যারিক্ বলিয়া কখন কখন উল্লিখিত হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার অভিনয় উৎকর্ষের পরিচয় দিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে। গ্যারিক্ ইংলণ্ডের একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন, সুতরাং গিরিশচন্দ্রের নাম তাঁহার নামের সহিত এক সূত্রে গ্রথিত হইলে হয়ত গিরিশচন্দ্রের মহিমার পরিচায়ক হইতে পারে, কিন্তু আমাদিগের মতে গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালীর গিরিশচন্দ্রই ছিলেন। শিক্ষিত-সমাজে তিনি অবজ্ঞাত হউন, তিনি সাধারণের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছেন; দেশ ও সমাজকে তিনি ভুলেন নাই, দেশ ও সমাজ তাঁহাকে কখনও ভুলিবে না।

যদি বৈদেশিক—সাহিত্য ও নাট্যরথিগণের সহিতই তুলনা করিতে হয়, তবে শুধু গ্যারিক কেন সেক্সপীয়ারের সহিতই কি গিরীশচন্দ্রের তুলনা করা যায় না? গিরিশচন্দ্রের ন্যায় এত অধিক, বিভিন্ন রসে পরিপূর্ণ, বিরুদ্ধ ভাবনিচয়ের ক্রীড়াভূমি ও আদর্শ পরিকল্পনার সমাবেশে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর নাটক, গীতিনাট্য, প্রহসন প্রভৃতি সেক্সপীয়ারই কি রচনা করিয়াছেন? মাননীয়া ভারতী সম্পাদিকা গিরিশ-চন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে লিখিয়াছিলেন "গিরিশচন্দ্র নাটক প্রহসন গীতিনাট্যে প্রায় একশত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাহার কোন একখানি অপরখানির সমান নহে, পরন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন।" ইহা কি কম কৃতিত্বের পরিচায়ক। সুশিক্ষিতা ভারতী-সম্পাদিকা গিরিশচন্দ্রের যে প্রকৃত নাটকীয় কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়াছেন তাহা সাধারণে এইরূপ সারবান্ সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া স্বীয় গুণগ্রাহিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার মন্তব্য নিতান্ত মূল্যহীন নহে। (সেক্সপীয়ারের অনেক নাটকেই তাঁহার পূর্ব্বরচিত নাটকাবলীর ছায়া পড়িয়াছে।) তাঁহার অনেক নাটকের চরিত্র সমাবেশ ও ঘটনা পারম্পর্য্য প্রায় একবিধ। অধিকন্তু, তিনি স্বীয় নাটকাবলীর জন্য তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক প্রাচীন সাহিত্যিকের নিকট ঋণী। গিরিশচন্দ্রে এরূপ নাটকীয় চরিত্রাবলীর একবিধ সমাবেশ প্রায়ই লক্ষিত হয় না। তাঁহার নাটকে অনৈসর্গিক ঘটনা সমাবেশ বিরল। পৌরাণিক নাটকাদি রচনায় গিরিশচন্দ্র রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি, ভারতের চিরপ্রসিদ্ধ সনাতন ভাব-কোষাগারের নিকট ঋণী হইলেও ঐ সকল পৌরাণিক নাটকাবলীতেও তাঁহার যথেষ্ট মৌলিকত্ব, তাঁহার নিজস্ব বলিতে অনেক কিনিসই বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। (সেক্স-পীয়ার যেমন কোনও প্রাচীন গল্পের ভাবের সহিত নিজ কল্পনা শক্তি মিশাইয়া অপূর্ব্ব নাটকাবলী রচনা করিতেন, গিরিশচন্দ্রও সেইরূপ পৌরাণিক ও

প্রচলিত উপাখ্যানাবলীর উপরে স্বীয় কল্পনার যাদুদণ্ড-আঘাতে মাংস, শোণিত প্রভৃতি আরোপ করিয়া তাহাকে অপূর্ব্ব প্রাণময়ী প্রতিমায় পরিণত করিতেন। সেক্সপীয়র সামাজিক নাটক রচনা করেন নাই। তাঁহার 'ট্র্যাজেডী' বা বিয়োগান্ত ও 'কমেডী' বা মিলনান্ত নাটকাবলীতেই বিশেষ প্রতিপত্তি। কিন্তু কি পৌরাণিক, কি ধর্ম্মমূলক, কি ঐতিহাসিক, কি সামাজিক সর্ব্ববিধ রচনায় গিরিশচন্দ্রের সিংহস্তের পরিচয় পাওয়া যায়। হ্যামলেটের দার্শনিকত্ব (philosophy) অনেককে বিমুগ্ধ করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহাদের নিকট সানুনয় অনুরোধ করিতেছি একবার গিরিশচন্দ্রের "শঙ্করাচার্য্যের" পরিচয় লউন। সেক্সপীয়রের 'ম্যাক্‌বেথ্', 'জুলিয়াস্ সীজার' প্রভৃতির তুলনায় গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম' কি এতই হীনপ্রভ? পক্ষান্তরে গিরিশের 'বিল্বমঙ্গল' 'নসীরাম', 'চৈতন্য লীলা', 'তপোবল' 'বুদ্ধদেব চরিত', প্রভৃতি অনন্য উচ্চাঙ্গের নাটকের ন্যায় ধর্ম্ম-জ্যোতিঃ বিভাসিত নাটক সেক্সপীয়র কয়খানি লিখিয়াছেন? প্রতীচ্য ভূখণ্ডে গ্রহসম-সম্রাট্ ভলেয়ারের নিকট গিরিশচন্দ্র কি আদৌ দাঁড়াইবার অযোগ্য? "শঙ্করাচার্য্যের মত গ্রন্থ যে নাট্য-সাহিত্যে সম্ভব ইহা ইতিপূর্ব্বে কে ধারণা করিয়াছিল? ইউরোপে Dowden, Brandes প্রভৃতি মনীষিগণ সেক্সপীয়রের প্রতিভার সমালোচনা করিয়া তাঁহাকে লোক-সমাজে, বিশ্বমানবের মাঝে যতিষ্ঠভাবে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; এ দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে এখনও ডাউডেন্-ব্রাণ্ডেসের ন্যায় সমালোচক জন্মগ্রহণ করেন নাই, সচেৎ সেক্সপীয়রের ন্যায় গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা সমালোচনায় ডাউডেনের Shakespeare—His mind and art এর ন্যায় পাঁচখানি বিরাট্ গ্রন্থ রচিত হইতে পারিত।

৯। ধর্ম্মবিশ্বাস ও কল্পনাশক্তি।

গিরিশচন্দ্র বহুভাবের আধার ছিলেন। পরস্পর বিরুদ্ধমান ঘটনাবলী ও ভাবরাজীর আবর্ত্তে, বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া গিরিশচন্দ্রের 'ব্যক্তিত্ব' গঠিত হইয়াছিল। তাঁহার যাহা 'নিজস্ব' তাহা একটী মূল কেন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল। সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি যাহা তাঁহার রচনাকে অনুরঞ্জিত করিয়াছে, যাহা তাঁহার ভাববিকাশে একান্ত সহায়ক, তাহা এই ধরিত্রীর আধ্যাত্মিকতে নূতন জিনিস নহে। ইহা ভারতের চিরন্তন নিজস্ব সম্পত্তি। বৈদেশিক চিন্তপদ্ধতিসমূহের মধ্যে ইহা খুঁজিয়া পাইবে না। কঠোর তপস্যা-নিরত, মুনি ঋষি অধ্যুষিত, বৈরিকচীর-পরিহিত এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ভারত সেই শক্তির জন্মভূমি। সেই শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়াই ভারতবর্ষ বৈদেশিক আক্রমণের ও বৈদিক সভ্যতার প্রবল বিলাস-বিভ্রমময়ী আক্রমণের বিপক্ষে আপনার জাতীয়ত্ব, আপনার স্বকীয়ত্ব এতদিন বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। বলিতে হইবে কি যে সেই শক্তি, সেই ত্রিসকোটী হৃদয়ের অটুট বন্ধন, সেই নরপ্রভাতের শোণিত-বহা ধমনী, তাহার হৃদয়ের স্পন্দন ধর্ম্মই আমাদের লক্ষীভূত বিষয়।

গিরিশচন্দ্রের নিত্যনূতন সৃষ্টি-পটীয়সী কল্পনা দেশ-কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা ও গতানুগতিকতা হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্নপথগা করিতে পারিয়াছে। তাঁহার নাটকীয় প্রতিভা প্রকৃতিসুন্দরীর করস্থত যন্ত্র মুকুর। জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য্য তাহাতে প্রতিফলিত হইত। তাই গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা অবলীলাক্রমে একই সময়ে স্বর্গ মর্ত্ত্য নরকের, দেব মানব দানবের বহিঃপ্রকৃতির অন্তঃপ্রকৃতির অপূর্ব্ব স্বরূপচিত্র পাশাপাশি অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাঁহার প্রতিভা স্বভাবজ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিতা, তাহাতে কৃত্রিম প্রসাধনের লেশ মাত্র নাই। গিরিশচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রগুলি নিপুণ চিত্রকরের তুলিকা সম্পাতে আলোও ছায়ায় মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সমৃদ্ধির

অধিকারী, সম্পূর্ণ সজীব। তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা কবিগুরু বাল্মীকি ও মহাভারতের কবি বেদব্যাসের সৃষ্ট চরিত্রেও নূতনত্ব ও মৌলিকত্ব আনয়নে সমর্থ হইয়াছে।

১০। গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালাকবি ও নাট্যকারগণ।

মধুসূদন ইদানীন্তন যুগের বাঙ্গালাসাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান কবি। শর্ম্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী ও পদ্মাবতী নামক তিনখানি নাটক ও দুইখানি প্রহসন রচনা করিয়া তিনি তদানীন্তন শিশু বঙ্গ-নাট্যশালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা-কল্পে সহায়তা করেন। এই নাটক কয়খানি "ইংরেজী ধরণে" লিখিত, অর্থাৎ উহাতে সংস্কৃত নাটকানুযায়ী নান্দী, প্রস্তাবনা প্রভৃতির আড়ম্বর নাই। ইতিপূর্ব্বে নাটুকে রামনারায়ণ "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" নামে সংস্কৃতানুসারী একখানি নাটক রচনা করেন। রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় ইহার পর আরও ছয়খানি নাটক প্রণয়ন করেন, তাহার সকলগুলিই সংস্কৃতানুসারী। আজকাল দেখা যায় সমুদয় বাঙ্গালা নাটকই "ইংরেজীধরণী"। সুতরাং মধুসূদনকে বাঙ্গালাভাষায় "ইংরেজীধরণী" নাটকের প্রথম প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। মাইকেলের প্রহসনদ্বয়ও বাঙ্গালাসাহিত্যে অপূর্ব্ব বস্তু। ইহাতে তিনি সমাজে দোষপ্রদর্শন ও সংস্কারের যে পন্থা উদ্ভাবন করেন তাহা পরে, তাঁহার পন্থানুসারী প্রহসনকারগণের নিকট আদর্শস্থানীয় হইয়াছিল।

বেদনাদবধে ও বীরাঙ্গনায় মাইকেল যে গুরু-গম্ভীর ভাষায় অবতারণা করিয়াছেন নাটকে সেরূপ করেন নাই। তাঁহার নাটকের ভাষা সাধারণতঃ গদ্য, তরল ও কাব্যের তুলনায় কথঞ্চিৎ নিষ্প্রভ।

মাইকেলের কবিজীবন আদৌ ইংরাজী ভাষায় আরম্ভ হয়। পরে, তিনি নিজের ভ্রম বুঝিয়া বাঙ্গালাভাষার সেবাব্রত গ্রহণ করেন। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন, বাঙ্গালাভাষাকে ভালবাসিতেন, কিন্তু বাঙ্গালীর ভাবে তিনি সর্ব্বথা অনুপ্রাণিত ছিলেন না; প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে তিনি অনাস্থাবান্ ছিলেন তাই তাঁহার প্রধান কাব্য মেঘনাদবধ অধার্ম্মিক অত্যাচারী-ব্রাহ্মণগণের পক্ষাবলম্বনে বিরচিত। অবশ্য কবিরা বিদ্রোহী, এরূপ স্বেচ্ছাচার তাঁহাদের পক্ষে দোষাবহ নয়। কবির ধর্ম্মবিশ্বাসই যে তাঁহার কবিত্বের একমাত্র 'মাপকাঠি' তাহাও নহে। তিনি যে নূতন ছন্দ, নূতন ভাব ও নূতন ভাষাসম্পদে বাঙ্গালাভাষাকে অলঙ্কৃতা করিয়াছেন তাহা তাঁহাকে চির-অমরত্ব প্রদান করিয়াছে।

মধুসূদনের পর হেমচন্দ্র, সাহিত্যসম্রাট্ ও শ্রেষ্ঠ সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক বাঙ্গালার শূন্য কবি-সিংহাসনের অধিকারী নির্ব্বাচিত হন। নির্ব্বাচন অন্যায্য পাত্রে ন্যস্ত হয় নাই। মধুসূদনের শিষ্য ও ভক্ত হেমচন্দ্র সর্ব্বতোভাবে মধুসূদনের অনুসরণ না করিলেও, তিনি তাঁহার কবিত্ব সবিশেষ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় যথার্থই দেখাইয়াছেন, "কবি যেমন আর একজন কবিকে আয়ত্ত করেন, আমরা তেমন পাই না।" হেমচন্দ্র মাইকেলের কবিত্ব নিজস্ব করিলেও তাঁহার নিজের individuality বা স্বকীয়ত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার অমর বীরকাব্য "বৃত্রসংহার" ভাষালৌন্দর্য্যে মাইকেল অপেক্ষা হীন হইলেও, উচ্চতর ভাব ও মহান্ আদর্শের পরিচায়ক। অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তৎপ্রণীত "কবি হেমচন্দ্র" গ্রন্থে মাইকেল ও হেমচন্দ্রের তুলনায় কাব্য-জগতে হেমচন্দ্রের যথার্থ স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এমনকি বর্ত্তমান কালে রবীন্দ্রনাথের কবিতাও শুধু শিক্ষিত সমাজের

সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। হাটে মাঠে ঘাটে বাটে তাঁহাদের কবিপ্রতিভার পরিচয় পৌঁছে নাই। সভ্যতার অন্তঃপুরে তাঁহাদের প্রতিভার কিরূপ সমাদর। বাঙ্গালার অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত গ্রাম্যসমাজে তাঁহাদের অপেক্ষা গিরিশচন্দ্রের রচনা অধিকতর প্রসার বিস্তার-ক্ষেত্রে কি করিয়া সমর্থ হইয়াছে তাহা আমরা ক্রমশঃ দেখাইতেছি। লোক-শিক্ষা বা mass education এ গিরিশচন্দ্রের লেখনী তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবি ও নাট্যকারগণ অপেক্ষা সফলতা লাভ করিয়াছে।

স্বধর্ম্মে আস্থাবান্ না হইয়া কোন দেশের কোন কবিই জাতীয়-কবি নামে অভিহিত হইতে পারেন না। এই স্বধর্ম্ম-বিশ্বাস ও আস্থা হেমচন্দ্রের পরিণত বয়সের রচনায় পরিলক্ষিত হইয়াছিল। পূর্ব্বকার রচিত কবিতায় ততদূর হয় নাই। 'বৃত্রসংহার' কবির পরিণত বয়সের ফল। তাহাতে তিনি ব্রতের কঠোর সংযম ও তপস্যা, দধীচির পরহিতে দেহত্যাগ প্রভৃতি দেবোচিত কার্য্য-কলাপে ও তাহার সার্থকতাস্বরূপ বৃত্রের-তথা অধর্ম্মের পরাজয় প্রদর্শনে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। কিন্তু এই বৃত্রসংহার কবির ধর্ম্মবিশ্বাসের কথঞ্চিৎ বিকাশ হইলেও, ইহা কবির জীবনে কখনও স্থায়িত্বলাভ করে নাই। আকাঙ্ক্ষার আলায় সকাম সাধনা ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিত্তি নহে। অক্ষয়চন্দ্র দেখাইয়াছেন 'বৃত্রসংহার' কাব্যের নায়ক বিদ্রূপিত ইন্দ্র আমাদের আদর্শ নহেন, দেখাইয়াছেন ঐ কাব্যে কেবল আকাঙ্ক্ষার জ্বালা। এই জ্বালাময়ী কবিতায় কোথাই আমরা স্বধর্ম্ম শিক্ষার উপাদান বড় বেশী পাই না।

হেমচন্দ্রের পরবর্ত্তী কবি নবীনচন্দ্রে এই ভাব ক্রমশঃ দূর হইয়া প্রকৃত জাতীয়তার উচ্চস্বরে উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। 'পলাশীর যুদ্ধে' নবীনচন্দ্রকে হেমবাবুর অনুরূপ কবিরূপে দেখিতে পাই। নবীন চন্দ্রের পরবর্ত্তী কাব্যগুলিতে এই প্রকার জাতীয়তার বিস্তৃতি হইয়া ক্রমশঃ সার্ব্বজনিক উদার নীতিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাই তাঁহার কবিতার ক্রমে, রৈবতক কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, অমিতাভ ও অমৃতাভ বা চৈতন্য-লীলার উত্তরোত্তর কবির জাতীয় প্রেম ঘনীভূত হইতে দেখা যায়। তাঁহার 'কাব্য মহাভারত' শান্তিরসের পুণ্যপ্রস্রবণ। কিন্তু নবীনচন্দ্র 'পলাশীর যুদ্ধে'র কবি বলিয়া বিখ্যাত। আমরা কথায় কথায় নবীনচন্দ্রকে বাঙ্গালার Byron বলিয়া উল্লেখ করিয়া গর্ব্বানুভব করি, কিন্তু রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসে যে মহতী শিক্ষার উদার ও সার্ব্বজনিক প্রীতি, বুদ্ধ ও চৈতন্যলীলায় যে উচ্চ আদর্শ প্রেম পরিলক্ষিত হয় বায়রণের জ্বালাময়ী কবিতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায় কি?

এ সকল সত্ত্বেও নবীনচন্দ্র শিক্ষিত বাঙ্গালার কবিই রহিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কবিতা অশিক্ষিত বা অল্প-শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। এ বিষয়ে প্রধান অগ্রণী গিরিশচন্দ্র। গিরিশচন্দ্র তাঁহার পৌরাণিক ও উপাখ্যানমূলক নাটকাবলীতে, তাঁহার সরস, সতেজ, সরল প্রহসন গুলিতে বাঙ্গালার সর্ব্বসাধারণেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত গীতাবলী হাটে মাঠে, ঘাটে, পল্লীযুবতী ও কৃষকবধূগণের মুখেও শ্রুত হয়। বিষয়ের গুরুত্ব বা তারল্যের তারতম্যানুসারে তাঁহার ভাষা গম্ভীর উদাত্ত বা তরল। তাঁহার রচনায় যেমন মাইকেল হেমচন্দ্রের মেঘগর্জ্জনও শ্রুত হয়, সেইরূপ জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির মধুর কাব্যনিক্কণও শুনা যায়।

বর্ত্তমান শিক্ষিতসমাজ রবীন্দ্রনাথকে যে মর্য্যাদা প্রদানে কাতর নন, তাহার কতটুকু গিরিশচন্দ্রকে তাঁহারা দিতে প্রস্তুত। আমরা রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অবমাননা করিতেছি না, আমরা জানি যে তিনি স্বগৌরবে, কৃতিত্বের সহিত স্বীয় উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের প্রতিভাও কোন কোন বিষয়ে তাঁহার

অপেক্ষা ন্যূন নহে, ইহা নিঃসন্দেহভাবে বলিতে পারি। যে গীতিরচনায় ও কবিত্বে রবীন্দ্রনাথের ভিত্তি, গিরিশচন্দ্রের কবিতা ও সঙ্গীত সে সকলের তুলনায় নিতান্ত হীনপ্রভ নহে। নাট্যপ্রতিভায় গিরিশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রের ঔপন্যাসিকত্ব ও কবিত্বের বিকাশ ও স্ফুটতা তাঁহার রচিত নাটকাদিতেই পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত। বিভিন্নরসের চরিত্রচিত্রণে, অবস্থাভেদে নরনারী-চরিত্রের মানসিক বিশ্লেষণ ও অভিব্যক্তিতে তিনি যে নিপুণতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাহার তুলনা প্রতীচ্যসাহিত্য-গৌরব সেক্সপীয়ার ও প্রাচ্যসাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমের সহিতই দেওয়া যাইতে পারে।

১১। সাহিত্যে ভণ্ডামী।

বর্ত্তমান বাঙ্গালীর সাহিত্য ও জাতীয়-জীবন আলোচনা করিতে গিয়া প্রধান সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্র দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন যে, "আমরা ক্রমেই ভণ্ড হইতেছি। ধর্ম্মে ও সমাজে ভণ্ডামী, রাজনীতি ও সাহিত্যে ভণ্ডামী, লেখায় ও ভাষায় ভণ্ডামী। ভণ্ডামী আমাদের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। পেঁচ দিয়া না বলিলে কোন কথাই আমাদের বাহাদুরী দেখানই হয় না।"

কথাটা খুবই সত্য, বর্ত্তমান সাহিত্য ও সমাজে, রাজনীতি ও ধর্ম্মে এ ভণ্ডামীর যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যক্ষেত্রের যে দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায়, দেখিতে পাওয়া যায়, কেমন এক আবছায়া ভাব বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক বা মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ-ঘটিত উপন্যাসগুলির ভাষা, ভাব, বর্ণনা-ভঙ্গী ও উদ্দেশ্য সবই কেমন প্যাঁচালো,—উদ্দেশ্যহীন, ও সীমাহীন। সমস্ত রচনাই যেন এক কুহেলিকার আবরণে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া বাধাহীন গতিতে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলায় সাহিত্য ও সমাজে বিচরণ করিতেছে। এরূপ বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ প্রকৃত সাহসী ও প্রকৃত সাহিত্য-প্রেমিক কে আছেন যিনি এই ভণ্ড সাহিত্য সমাজের অবনতির অবাধ-গতির পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারেন?

ধর্ম্মে ও সমাজেও ভণ্ডামী পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। গিরিশচন্দ্র এই ত্রিবিধ ভণ্ডামীরই যম ছিলেন। তাঁহার রচনায় বর্ণনা ভঙ্গীতে ভাবে ও ভাষায় ভণ্ডামীর লেশমাত্র নাই। স্বধর্ম্ম ও সমাজের সংরক্ষণার্থে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে চিরকাল ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বীরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। তিনিই এই জাতিগত, বর্ত্তমান বাঙ্গালীর এই মজ্জাগত ভণ্ডামী বিদূরিত করিয়া সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম্মকে সুসংস্কৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার চেষ্টার ফল ভবিষ্যযুগের বাঙ্গালী জীবনে, উত্তর কালের বাঙ্গালা সাহিত্যে, সমাজে ও ধর্ম্মে নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে সন্দেহ নাই। যে শক্তিবীজ (potentiality) তাঁহার রচনায় ও কর্ম্মময় জীবনে অবসাদ আসিতে দেয় নাই, তাহা কি নিষ্ফল যাইবে?

(ক্রমশঃ)

শিব-সুন্দর

(শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়)

( )

কে তুমি কিশোর বীর বিজয়ীর বেশে আসি
দাঁড়াইলে আজ,
প্রশান্ত নয়ন তব কোন দুঃখ নাহি যেন,
দীপ্ত মুখ সাজ।
কত যুগ যুগান্তের বিস্মৃত বাসনা দিয়ে
তনুখানি গড়া—
মস্তকে ধরেছ কত মুমূর্ষুর শেষ শ্বাস
আশীর্ব্বাদে ভরা!
কত দুঃখ অন্তহীন অসহায় অন্ধ প্রাণী
তব পথ চাহি,
মুদিয়াছে আঁখি তারা কম্পিত অধরে তব
জয় গান গাহি।
রক্তিম নয়নে তব জ্বলিতেছে অতীতের
হোমানল শিখা,—
প্রশস্ত ললাট পরে লিখিতেছি যুগান্তের
নববাণী লিখা!
মস্তকে মুকুট নাহি আছে শুধু কপালের
কল্যাণ কামনা,
প্রণামি তোমারে বীর কত কত পরে আজ
সফল সাধনা।

অন্তরের অন্ত হ'তে তোমারে প্রণাম করি
হে কিশোর বীর,
ঘুচাও লজ্জার আলা দুঃখ-দৈন্য হাহাকার
নয়নের নীর।
ঘন ঘোর অমানিশা আঁধারিল সারা দেশ
কত বর্ষ ধরি,

প্রতি দণ্ড প্রতি পল বিষেছিল মহাকাল
কলঙ্কেতে ভরি।
কলঙ্কের অন্ধ পরে ত্রিশ কোটি নরনারী
বেঁচেছিল প্রাণে—
সর্ব্ব গর্ব্ব বিসর্জ্জিয়া কোন ব্রত সাধিবারে—
দেবতাই জানে।
অমৃতের পুত্র তারা ভুলেছিল সেই বাণী,
তাই বুঝি হায়,
বিলম্বের প'ড়ে ছিল অত্যাচারে নত পায়া
দুর্ব্বলের পায়।
দুর্ব্বল-দলিত-পথে স'য়েছিল সব শোক
শত-সহস্র গ্লানি,
প্রণমি তোমারে বীর আ'জ সেই সব কথা
মিথ্যা ব'লে মানি।

(৩)

প্রণমি তিলোত্তমা বীর, কোথে তব নাই অগ্নি
খড়্গ নাহি করে,
কাহারেও কণ্ঠ তুলি এসে আজ অবতরি
দেবতার ঘরে।
চিত্তের মন্দির মাঝে অলিন্দেতে সেই শিখা
সেই অগ্নি জেলে,
উজলিয়া দশ দিশি দেবতার দীপ্তানলে
এলে তুমি মেলে।
বিরাট বিশ্বের মাঝে বিনাশের মন্ত্র পাঠ
কর নাই তুমি
জননীর অশ্রু হতে মেহ হাতে মুছাইলে
আমাদের তুমি
কাঞ্চন-কেতনে তব লেখা আছে যুগান্তের
শিবনাম গান,
তৃষার্ত্ত নয়নে তাই পড়িতেছি নির্নিমেষ
ত্রিশ কোটি প্রাণ।
দুর্ব্বলের রক্ত দিয়া ভরিছে অন্ধকারে
ভরে লক্ষ-ধারা

অতীতের অত্যাচার ক্ষুব্ধ, ক্ষুব্ধ করে তারে
কেঁপে কেঁপে সারা।

(৪)

এসগো কিশোর বীর মহাকাল সিংহ শিশু
এস হাত ধরি,
যত কিছু মিথ্যা ভয় মিথ্যা বিধা দ্বন্দ্ব যত
যাক্ অপসরি।
কর-ধৃত-কোদণ্ডেতে কোন কাজ নাহি আজ
এস শূন্য হাতে,
কলঙ্কিত ধরাভূমি মুছরি উঠিবে তব
স্মিত-আঁখি-পাতে।
আমাদের বক্ষ মাঝে যে-ধন লুকান আছে
তোমার ইঙ্গিতে
বিকশি উঠিবে তাহা নানা বর্ণে নানা গীতে
মোহন ভঙ্গিতে।
সভয়ে পালাবে যত অত্যাচারে শিক্ষাদল
শৃগালের প্রায়,
নয়তো লুটাবে বীর দেবতার শুভাশীষে
তব রাঙ্গা পায়।
এস জননীর শিশু অতীতের আশা এস
এস হে কুমার,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে কহ মিথ্যা ভয় দুর্বলের
কলঙ্কের ভার।

ত্রিশ কোটি নর নারী যুক্ত-করে চেয়ে রবে
তব মুখ পানে,
অমিবে আত্মার শিখা দেশ-পাত্র-নির্ব্বিচারে
অলক্ষিত প্রাণে।
শক্তি-পাঠ থেমে যাবে বিশ্বমাঝে শান্তি বাজে
দেবতার বরে,
বিকশিবে অমলিন অস্ত্র হীন রক্ত হীন
তব যুদ্ধ করে।

ললাটে ভাতিবে বিভা শত সূর্য্যরশ্মি সম
পরিপূর্ণ তেজে,
চৌদিকে আনন্দ রোল মন্দিরেতে শঙ্খ ঘণ্টা
উঠিবে গো বেজে।
জননীর সুধাধার উৎসারি উঠিবে পুনঃ
তব মুখ চাহি,
বসন্তের বৈতালিক কলকণ্ঠে জয়গান
উঠিবে গো গাহি।
ধরণী সফল হবে সৃষ্টির নূতন রূপ
উঠিবে বিকশি,
তোমার বিজয় স্মৃতি চিরকাল উজলিবে
সূর্য্য-তারা-শশী

উন্মাদ-কল্পনা

(গল্প)

(শ্রীমতী প্রতিভা দেবী)

পাহাড়ের কোলে ঝরণার কাছটিতে, যে তার রংয়ের তুলি নিয়ে নিঝুম মেরে বসে থাকৃত। তার নাম ছিল কি না, কেউ আবিষ্কার করবার চেষ্টামাত্র না করেই, তার নামকরণ করে দিলে উন্মাদ! তার চক্ষের দৃষ্টিটা সর্ব্বদাই যেন আশাতুরের মত চম্‌কে চম্‌কে উঠতো, তা দেখে সকলে ভাবতো, তবে কি লোকটা কার প্রতীক্ষায় বসে দিনের পর দিন কাটাচ্ছে। না হয়ত সে একটা নিশ্চল পাষাণের স্তূপ।

ঋতুর পর ঋতু এসে উন্মাদের চক্ষের সম্মুখে ফুটে উঠে আবার জলবুদ্‌বুদের মত লীন হ'য়ে যায়, তাতে এই নীরব মানুষটীর কোনই ভাব বৈলক্ষণ ঘটতে দেখা যেত না।

কেবল সেদিন যখন বসন্ত তার ডালা-ভরা ফুল ছড়াতে ছড়াতে পাহাড়ের কোলে নেমে এসে, নীহারসিক্ত গোলাপের আরক্তিম কপোল মলয় হিল্লোলে দুলিয়ে, সাদা জ্যোৎস্নায় তার মুখখানি তুলে ধরলে, সেদিন উন্মাদ তুলি ফেলে, ব্যথিতের মত দুহাতে বুক চেপে পাদপ শ্রেণীর উপর লুটিয়ে পড়লো। আর তার অন্তর-ভরা ব্যর্থতা, বাধা-প্রাপ্ত জলরাশির মত পাহাড়ের কোলে আছড়ে পড়ে অব্যক্ত যাতনায় কেঁদে উঠলো। ওগো আমার কল্পনার রাণী আর কতকাল, কতকাল আর ব্যর্থ প্রতীক্ষায় থাকবো!

ভোরের ছায়ায় উন্মাদ তার পরিত্যক্ত আসন-খানিতে এসে বসলো। তার দৃষ্টি আজ হতাশায় ভরা। পার্শ্বেই পুষ্পবিতান, প্রণয় স্পর্শে নববধূর মত শিউরে উঠলো। উন্মাদ চম্‌কে সেই দিকে চাইতেই, তার দৃষ্টি পুলকে উজ্জ্বল হয়ে উঠে আর নিজের স্থানে ফিরে এল না। কল্পনা তখন ফুল-ভরা

গাছের তলায়. তার নম্র লতার মত, বিহ্বল ভাবে তার দিকে চেয়ে আছে। সেই থেকে তাদের পরিচয়। কত দিনের পর দিন চলে গেল। গাছের হাল্কা বাতাস ভারি হয়ে উঠলো. দু একটা উৎসুক পূর্ণ দৃষ্টি অযাচিত ভাবে প্রশ্ন করে যায়. এই ঐশ্বর্য্যের কোলে লালিতা পালিতা ধনীর কন্যার সহিত তাহার মত চির দরিদ্রের কি সম্বন্ধ। এ প্রশ্নের মীমাংসার পরিবর্ত্তে, দিনে দিনে বর্দ্ধিত করেই কল্পনা তার ডালা হাতে করে এসে দাঁড়াত। আর উন্মাদের,—কোথায় গেল তার ব্যাকুল বেদনা-ভরা দৃষ্টি, কোথায় গেল তার অনের গতির সহিত পলমুহূর্ত্ত গোণা। সে এখন দীন পূজারীর মত তার দিকে পলকহীন ভাবে চেয়ে থাকে। মুখ দিয়ে তার একটা কথাও বেরোতে চায় না, সব যেন বাহিরের দর্শনে পুলকে স্তব্ধ হয়ে গেছে। শুধু চোখ দুটি তার ছুটি হাত অর্ঘ-নৈবেদ্যের সম্ভার নিয়ে, তার কাছে লুটিয়ে পড়ে বলে,—তুমি কে—তুমি কে আনন্দী না কল্পনা?

গ্রীষ্মের নিদাঘ নিশ্বাসে আকাশ বাতাস ছেয়ে গেল। উন্মাদ বিস্ময় ভাবে তার লতাবিতানটার দিকে চাইলে। সেখানে সে দেখলে শত বসন্তের আবির্ভাব। নবকিশলয়-শোভিত বৃক্ষের নিম্নে, সদ্য ফোটা ফুলটী হিল্লোলে কাঁপছে। বর্ষার আগমন সে দেখতে পেলে না, দেখলে কেবল গাঢ় নীল আকাশের কোলে, সুন্দরীর স্বচ্ছ নীল চক্ষের অশ্রু-কণাতে হাজার কুসুম ফুটে তার রক্ত কমল চরণে লুটিয়ে পড়েছে। চোখ দুটি তার কৃতজ্ঞতায় ভ'রে উঠলো, আমার সাধনা, তোমার স্পর্শে সুন্দর আমার যে সার্থকতায় ভরে গেল। একদিন সে এসে দেখলে তার পুষ্প-বিতান শুকিয়ে গেছে, বসন্তের রাণীর ডালা আজ খালি। আর তার উজ্জ্বল আঁখি দুটি উত্তাপে দগ্ধ লতার মত মাটির দিকে নুয়ে পড়েছে। তার ছোঁয়াচে পাহাড়ের কোলটাও গাম্ভীর্য্যে ভরে উঠেছে। নির্ঝরিণীও আজ তাহার মিলন সুখর গীতি থামিয়ে, চির বিরহ বিধুরার মত করুণ নয়নে আকাশ বাতাস ছেয়ে ফেলছে। চিত্রশিল্পীর আর ছবি আঁকা হোল না। তার সমস্ত বাঁধন টুটে গেল। সে বিস্ময়াভিভূতের মত তার কমলের মত হাতখানা চেপে ধরলে। সে স্পর্শে ফুলটি শিউরে উঠ্‌লো; তার নয়ন-জাত শিশিরকণার মত দুই বিন্দু অশ্রু উন্মাদের হাতে এসে পড়ে তাকে কাঁপিয়ে তুল্লো। পরে অজস্র করুণধারার ন্যায় তাকে অভিষিক্ত করে ধরণীর জলে মিশে গেল।

সেই সঙ্গে কোন নিবিড় রুদ্ধ কক্ষ হ'তে একটা অজানা ধ্বনি উঠে নীরবে পাহাড়ের গায়ে লেগে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। বিদায় 'বিদায় বন্ধু! সে ধ্বনি নিস্তব্ধ কানন মুখরিত করে যখন ফিরে এল, সে কি শুষ্ক-গম্ভীর পর্ব্বত, সে কি চিরপাষাণ নিকেতনে দৈত্যের হুঙ্কার, শত শত বজ্র যেন এক সঙ্গে ডেকে উঠলো "কল্পনা"। সে ডাকে ভীতা হরিণী তার লতার বাঁধন ছিঁড়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো। আর একটা ডাকে সে তড়িৎলতার মত নিমেষে লতার কোলে মিলিয়ে গেল।

সেই থেকে প্রত্যেক মুহূর্ত্তটি পর্য্যন্ত উন্মাদের কাছে তাদের আগমন সংবাদ জানিয়ে দেয়। বিদায় নেওয়া ত সে আর দেখতে পায়না, সমস্ত পাহাড়ের কোলে অনুপরমাণুটি পর্য্যন্ত যখন তার দিকে সহানুভূতিমাখা দৃষ্টিতে চেয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে তখন সে ভাবে "একি? -কবে সে উর্ব্বশীর বাহু বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে, চির এক মেয়ে নিদাঘে পীড়িত, ঝড়ের ঝাপটে ছিন্নভিন্ন, হিমানী বর্ষণে মরমুত জগতে নেমে এসেছে। দু হাতে চোখ মলে সে বলে, মলে যাও, তোমরা, আমি কি অন্ধ অন্ধ? তাই বুঝি সে স্বপ্নে জ্যোৎস্নায় বেশে এসে, পলকের মধ্যে তাকে অভিষিক্ত করে। আবার চকিতে-অজানা রাজ্যে মিলিয়ে গেল।"

রাত্রি দ্বিপ্রহরে বিনিদ্র নয়নে, তিমুকের মত

দ্বারে দ্বারে কেঁদে বলেছে, "তাকে তোমরা কেউ দেখেছ? "আমার মানসীকে?" উপহাসের অট্টহাসিতে তার ভাঙা বুকখানা আলোড়িত করে সকলে বলে, লোকটা একেবারে ক্ষেপে গেছে। কেউ বা বলে তোর পাগলাম শোনবার অপর্যাপ্ত সময় আমাদের নেই।

কত দীর্ঘ দিনের পর একজন দয়া করে তার সংবাদ বলে দিলে। "ওরে, ও উন্মাদ, সে যে নেই। মিছে খুঁজচিস্।"

রেঙ্গুনের বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার নিখিলনাথ এইমাত্র দপ্তর থেকে বেরিয়ে, গ্রামের পথে আস্‌তে আঁধার-টাকে তার বড় জমাট বলেই মনে হোল। হিমে তার গুভার কোট্‌টার ওপর কে যেন বরফ জল ঢেলে দিয়েছে এমনি বোধ হচ্ছিলো। তারি আওতায় বুকটাও তার থেকে থেকে কাঁপছিলো। প্রতি-পদক্ষেপে নির্জ্জন প্রান্তর ধ্বনিত করে সে তাড়া-তাড়ি একটা সিগার ধরিয়ে নিয়ে গান জুড়ে দিলে। এই আধঘণ্টা আগে তা'দের ক্লাবে সকলে একবাক্যে বলেছে, নিখিল বড় সুখী, মানুষটা স্ফূর্তিবাজও যথেষ্ট। কিন্তু আজ এই ঘনায়মান অন্ধকারে করুণকণ্ঠে সে যে গানটা গাইছিলো, তাতে বোধ হয় যেন তার অন্তর ভরা ব্যথা। গানের একটি লাইনই সে বার বার আবৃত্তি কচ্ছিলো, "বারি বারি করি জনম গোঙায়িনু না মিলিল বিন্দু দু চারি।"

সম্মুখেই বাড়ীর ফটোক খোলা। নিখিল ভেতরে গিয়ে ফটোক বন্ধ করে, দীর্ঘ কম্বু সাড়ে ছ ফুট শরীরটাকে টেনিয়ে, দু এক পা যেতে না যেতে, অন্ধকারে কিসের সঙ্গে তার ভীষণ সংঘর্ষণ হ'য়ে গেল। সেই সঙ্গে মানব কণ্ঠের একটা আর্ত্তোক্তি ও শোনা গেল। নিখিল, চোর বিবেচনায়, তাড়া-তাড়ি ফ্লেশলাই জেলে, ভীষণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে—কে তুমি! পূর্ব্ববৎ নিস্তব্ধ, আলোকের সাহায্যে সে পাশের দিকে চাইতেই, দেখলে একটা ক্ষীণকায় লোক পথে গাছের সারির নীচে বসে হাঁপাচ্ছে। আলোক সম্পর্শনে লোকটি অতিকষ্টে বল্লে—আমি পথহারা পথিক। নিখিলের কণ্ঠের তীক্ষ্ণতা তখনো যায়নি, সে তেমনি উদ্ধত স্বরে উপহাসের ভঙ্গিমায় বল্লে পথ হারিয়ে ফেলেছ কি রকম? একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল দয়া করে আজকে রাতটা আমাকে এখানে কাটাতে দিন। নিখিল একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ ক'রে, পরে গম্ভীরকণ্ঠে বল্লে-আচ্ছা, থাকতে পার।

লোকটার থাকবার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে ব্যস্ত-ভাবে কোটের বোতাম খুলতে খুলতে নিখিল তার শোবার ঘরে ঢুকে প'ড়্‌লো। ঘরখানি সামরিক কায়দায় সুসজ্জিত। বাগানের দিকে জানলাটা খোলা. কাছেই সোফার ওপর কল্পনা বসে বাহিরের ভীষণ অন্ধকারের তাণ্ডব লীলা দেখছিলো।

তার মনে হচ্ছিলো, ঠিক এক বৎসর হ'ল এক অখিলের সাথে এক অজানা জায়গায়, সে চলে এসেছে। তারপর আর তার ভাববার কিছু নেই। অনাবিল স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মুক্তবিহঙ্গিনীকে যে মানুষটী পিঞ্জরাবদ্ধ করে উন্মাদ ভালবাসায় মৃণ্ময় পরিয়ে নিয়ত তাকে কাছে টান্‌তে চেষ্টা কচ্ছে, তার ভালবাসার প্রতিদান সে যে আজ অবধি দিতে পারেনি। যখনি বিবেককে সংযত করে ঋণ পরিশোধের উপায় নিদ্ধারণ কত্তে যায়! কোন সুদূ-রের কিনার থেকে বাতাসের কানে চিরপরিচিতের স্বরের ধ্বনির সহিত, কাহার আকুল বেদনা-মাখা দৃষ্টি এসে, তাকে সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির কথা মনে করে দেয়। তখন তাঁর নীরব কণ্ঠ ব্যাথিতার মত বলে উঠে—"নির্দ্দয়, ওগো নিষ্ঠুর দয়া করে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও।"

নিখিল ঘরে ঢুকে স্ত্রীর কাছে এগিয়ে এসে জমাট বরফের মত হাতখানা তার কপালে রেখে স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্লে আজ তা হ'লে ভাল আছ, জ্বরটা আসেনি। বাতাসভরে কাঁপা বেতকরবীর মত কল্পনা

চম্‌কে স্বামীর হাতখানা চেপে ধল্লে। আবার পলক না ফেল্‌তে হাত দুখানি সরিয়ে নিয়ে ম্লান মুখখানি অধিকতর ম্লান করে নির্জীবের মত বসে রইলো।

নিখিল জানালা খোলা দেখে স্ত্রীর দিকে ফিরে তর্ৎসনাপূর্ণ কণ্ঠে বল্লে—"ডাক্তার এই ঠাণ্ডায় জানালা খুলে রেখেছ, গায়ে র‍্যাপার নেই কেন? দাঁড়াও জানালাটা বন্ধ করে দিই।" মৃদুস্বরে উত্তর এলো—'না না আমার কিছু হবে না।" "উঃ হুঁ, বুঝতে পাচ্ছনা ঠাণ্ডা লেগে ঝাঁ করে বুকে সর্দ্দি বসতে পারে।"

নিখিল ধড়াস্ করে জানালাটা বন্ধ ক'রে, শ্রান্ত ভাবে স্ত্রীর সোফার একপ্রান্তে বসে প'ড়ল। তার ভারে স্প্রীংয়ের সোফা কেঁপে উঠতেই, কল্পনা অত্যন্ত সংকুচিত ভাবে একপাশে সরে গেল। নিখিল ব্যস্ত ভাবে বল্লে,—"আমার মনে ছিল না, তুমি যেমন বসেছিলে বোস, আমি উঠছি।" উত্তরের প্রত্যাশা না করেই সে ঘুরে একখানা চেয়ারে বসে প'ড়ল, একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসে তার পাষাণের মত বুকখানা, একবার কেঁপে উঠে নীরবে মিলিয়ে গেল।

ভোরের বেলায় শয্যা থেকে উঠেই, নিখিল পথহারার সন্ধানে গেল। দরজার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে সে পথহারাকে উদ্দেশ করে বল্লে 'ওহে'—উত্তরের পরিবর্ত্তে দরজার সাম্‌নে দুটি মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টি এসে যেন জোর করে তার গলা চেপে ধল্লে। প্রশ্ন আর করা হোল না। চিরদরিদ্র নিখিল নিজের অপ্রাপ্ত পরিশ্রমে ভাগ্যলক্ষ্মীকে মুষ্টিগত করে, বড় একটা অকেজো মানুষকে দেখতে পারত না। তার এক-কথা, খাট খাও। তা হলে কাহারও অভাব থাকবে না। এই একত্র সহযোগে শ্রমের সার্থকতায়, হয়ত একদিন এই ভারতবর্ষ মহাদেশটা আমেরিকার সমকক্ষ হ'তে পারবে! এই উপদেশটা সে সকলকেই দেয়। আজ সেই কথাটা জানাতে এসে সে বিষম বাধা পেলে। নিজের প্রদীপ্ত কণ্ঠ কখন যে সমবেদনার ভরে সহানুভূতিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, সেটা লক্ষ করবার সময় ছিল না। নিখিল প্রশ্ন করে "তোমার নাম কি।" "উন্মাদ"—আমার কাছে কি তোমার কিছু প্রার্থনা আছে? "আমি আশ্রয়হীন, আশ্রয় চাই।" "কিছু কাজ জান?"—"খুব সামান্য রকমের? জানি ছবি আঁকতে।" "অতি সুন্দর আমি একজন চিত্রশিল্পী খুঁজছিলাম। তুমি মানুষের আকৃতি আঁকতে পার।"—"পারি।"

"উন্মাদ তুমি চিরদিন এখানে থাকতে পার", বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

টেবিলটার পাশে দাঁড়িয়ে নিখিল বল্লে "কল্পনা! আজ আবার তোমার চোখটা ছলছল কচ্ছে কেন। জ্বর এসেছে বোধ হয়। অনুমতি দাওতো একবার দেখতে পারি? বুকের কোন যন্ত্রণা বোধ কচ্ছ না ত?" নিখিল কল্পনার কাছে এগিয়ে আসতেই, কল্পনা তার ব্যথাভরা চোখ দুটি তুলে উদাস কণ্ঠে বল্লে, "না না আমার কিছু দরকার নেই। আমার যত্ন করে কি হবে।" "আবার ওই কথা বোলছ", বলে নিখিল কল্পনার হাত দুখানি হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে, কোমলকণ্ঠে বল্লে, "কেন এমন বিমর্ষ হয়ে পোড়ছ, এতে অসুখটা বেড়ে যেতে পারে, একটা গল্প শুনবে?" কল্পনা উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নিখিল বল্‌তে আরম্ভ করে, বলার সঙ্গে তার শুভ্র কপোলে আবিরের ছোপ ফুটে উঠলো। হাতখানিও যেন একটু কেঁপে উঠলো, কিন্তু সে বলেই চল্লো, "জান যেদিন আমার ফুলদণ্ডে সেদিন আমি ভারি অবাক হ'য়ে গেলাম? চিরটা কাল লোহা লক্কড়ের মধ্যে বাস। ফুলগুলোর সৌন্দর্য্য বড় একটা জানতাম না, সেদিন দেখি আমার ইস্পাতের ওপর, সরু কোটা একরাশ যুঁই। তা দেখে, যুক্তপ্রদেশ যেমন খাদ্য দেখলে লাফিয়ে উঠে, আকণ্ঠ পিপাসাতুর একবিন্দু জল দেখলে যেমন উন্মাদ হ'য়ে যায়, আমার দশা কতকটা তাই হয়েছিলো। আমি অবুঝ আনাড়ির মত তোমায় স্পর্শ করে গেলাম, তুমি আমায় সে অবসরটুকু না দিয়ে ম্লান মেকালির মত

বিছানায় লুটিয়ে প'ড়লে।" হাঃ হাঃ হাঃ একটা উদাস হাসিতে ঘরখানি কাঁপিয়ে সে বল্লে, "সেই থেকে ফুলের মত সঙ্কে মুড়ে করে রাখলে। তুলতে অবসর দিলে না।" ক্ষীণকণ্ঠে কষ্টে উচ্চারিত হ'ল—দয়া, দয়া তাই জন্যে যে আমি যেতে চাই"—প্রথম কথাটা এতই অস্পষ্ট যে নিখিলের কাছ অবধি পৌঁছাল না। কেবল শেষ কথাটা সে শুনতে পেলে। বাণাহত কুরঙ্গের মত নিখিল নিজের হাতখানি সরিয়ে নিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বল্লে—আর আমার কথা একটু ভাবলে না কল্পনা? আমি কোনদিন কোন দাবি, কোন অভাব তো তোমার কাছে জানাই নি তবু—তবু—। নিখিলের মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। কল্পনা টলতে টলতে স্বামীর পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে জড়িতকণ্ঠে বল্লে ক্ষমা—ক্ষমা, এজন্মের মত মার্জ্জনা!

• • • •

উন্মাদ! ছবি কতখানি আঁকলে দেখি? উন্মাদ উঠে গিয়ে একখানি কল্পনার ফটো, আর তারি হাতে আঁকা ছবি একখানি এনে নিখিলের হাতে দিলে। নিখিল আঁকা ছবিখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে মৃদু হেসে বল্লে, "মুখখানি যেন বড় বিমর্ষ করে ফেলেছ বন্ধু, ফটোতেত অতটা নেই।" "ফটোখানা খারাপ হয়ে গিয়েছে সেজন্য ঠিক বুঝতে পারিনি।" "এক কাজ করলে হয়, সজীব মূর্ত্তি দেখে দোষটুকু সংশোধন করে নিতে পার!" নিখিল উঠে গিয়ে, উন্মাদের হাত ধরে কল্পনার ঘরের দিকে নিয়ে গিয়ে একটা দরজার পর্দা ঈষৎ উন্মুক্ত করে, বল্লে "এইখান থেকে তুমি ওইটুকু শেষ করে নাও। কিন্তু খুব সাবধান, অনেকদিন পর বোধ হয় একটু শান্তি পেয়েছে, সেই জন্যে ওর মুখে আজ প্রীতির ভাব ফুটে উঠেছে। ঘুমটা না ভেঙ্গে যায় সেটা লক্ষ্য রেখ। উন্মাদ বন্ধু; এতদিন আমি তোমায় বলে এসেছিলাম ফটোখানি আমার অপরিচিতা, শুধু সৌন্দর্য্য বোধে আমি তোমায় আঁকতে দিয়াছিলাম, কিন্তু তা নয়। ও আমার স্ত্রী, ছবি আঁকতে ভারি অমত, তাই লুকিয়ে লুকিয়ে কাজটা সারতে চাই। অমতে হচ্ছে দেখলে, মনে একটু কষ্ট পেতে পারে, বুক খারাপ, সামান্য আঘাতে কখন কি হয় বলা যায় না।"

"ও কি উন্মাদ! অমন কাঁপছ কেন? যদি তেমন কষ্ট হয় ত এখন থাক। আমি একটা জরুরি কাজ সেরে আসি।" বলে নিখিল চলে গেল।

উন্মাদ অতিকষ্টে তুলি হাতে করে পর্দার ফাঁক থেকে কল্পনার ঘুমে-ঢলে-পড়া রজনীগন্ধা ফুলের মত মুখখানি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করছিলো, হঠাৎ কল্পনা জেগে উঠে, মর্ম্মভেদি আর্ত্তনাদ করে দুহাতে বুকটা চেপে ধরলে। উন্মাদ তার অসমাপ্ত ছবির উপর তুলির টান দেবে বোলে আর একবার চাইতেই, তুলি তার হাত থেকে কেঁপে পড়ে গেল। উন্মাদ, উন্মাদের মত পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লো। নিমেষের জন্য উভয়ের দৃষ্টি এক হ'তে না হ'তে বাদলা দিনে ভাঙ্গা জ্যোৎস্নার মত পলকের মধ্যে কল্পনার মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে, মাথাটি তার ছাত কুসুমের মত মেঝেতে লুটিয়ে পোড়লো। অপর দরজার পর্দা সরে গেল। নিখিল বিস্মিত ভাবে ডাকলে, কল্পনা, কল্পনা, অমন করে শুয়ে কেন! কালকের অপরাধের জন্য আমাকে কি ক্ষমা করবে না?

কিন্তু কেহই তাহার কথার প্রত্যুত্তর দিল না।

সঙ্কলন

ভারতীয় শিল্পোন্নতির ব্যাঘাত।

অন্যান্য দেশের তুলনায় বৃটিশ সাম্রাজ্যজাত শিল্প-সামগ্রী যদি ভারতে স্বল্প হারে মাশুল দিয়া প্রবেশ লাভ করে, তাহাতে ভারতীয় শিল্পোন্নতির ব্যাঘাত হইবে। অদ্য আমরা দুই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিব। ইতিমধ্যে যাহারা আর্থিক কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাঁহাদিগের কেহই প্রায় স্পষ্টরূপে নিম্নহারে মাশুলে বৃটিশসাম্রাজ্য জাত শিল্প সামগ্রী আমদানীর পক্ষ সমর্থন করেন নাই। দিল্লীর বস্ত্র-ব্যবসায়ীদিগের সভার প্রতিনিধি মিঃ চীরালাল এইরূপ অল্প হারে মাশুল গ্রহণের প্রতিবাদ করিয়াছেন। কানপুরস্থ যুক্তপ্রদেশ ব্যবসায়ী সভার সহকারী সম্পাদক মিঃ চোপরা বলিয়াছেন, যাহাতে ভারতীয় শিল্পের উন্নতি সাধিত হয়, কেবল তাহারই প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিদেশজাত দ্রব্যের উপর মাশুল গ্রহণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই জন্য তিনি এক পরামর্শ-সমিতি সংগঠনের প্রস্তাব করেন। সেই সমিতি প্রত্যেক শিল্পের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক তাহার কিরূপ সহায়তা প্রয়োজন, সরকারকে সে বিষয় পরামর্শ দিবেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে তিনি কৌশলে অল্পহারে মাশুল গ্রহণের প্রতিবাদ করিয়াছেন। একমাত্র কানপুর রিসার্চ ইনিষ্টিটিউটের প্রিন্সিপাল ডাক্তার ওয়াটসন বলিয়াছেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশের নিকট ভারতের যে রাজনৈতিক ঋণ আছে, Imperial Preference বা সাম্রাজ্যজাত সামগ্রীর উপর অল্প হারে মাশুল গ্রহণ দ্বারা তাহা পরিশোধ হইতে পারে। ডাক্তার ওয়াটসন কি অভিপ্রায়ে এই কথা বলিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই এবং গ্রেটবৃটেন ব্যতীত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্য দেশের নিকট ভারত কিরূপ রাজনৈতিক বাধ্যতায় আবদ্ধ তাহাও আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। কিন্তু তিনিও স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতীয় শিল্পের এক্ষণে যেরূপ হীনাবস্থা, তাহাতে তাহার পক্ষে অত্যুন্নত বিদেশীয় শিল্পের সহিত সমানভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অসম্ভব। কেবল তাহাই নহে, তিনি আরও বলিয়াছেন, নিম্নহারে মাশুল গ্রহণের ব্যবস্থা হইলে ভারতের ধাতুসংক্রান্ত শিল্প ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি ব্যবসায়ের উন্নতিতে বাধা পড়িবে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যুদ্ধ হেতু বৃটিশশিল্পের যে ক্ষতি হইয়াছে, প্রধানতঃ তাহার পূরণের জন্যই বৃটিশ রাজনীতিকগণ এই Imperial Preference নীতির পক্ষপাতী হইয়াছেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশের সহিত একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন অন্যতম উদ্দেশ্য। কারণ এই নীতি অনুসারে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশ পরস্পরের শিল্প সামগ্রীর আদান প্রদান অন্য দেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অবাধে সম্পন্ন করিতে পারিবে ও তদ্দ্বারা নিজ নিজ দেশের সামগ্রী বিক্রয়ের বিশেষ সুবিধা ভোগ করিবে। ইহাতে অন্যান্য বৃটিশ শাসিত দেশের যথেষ্ট উপকার যে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভারতের যে সমূহ ক্ষতি হইবে, তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে।

অনেকেই অবগত আছেন, আমরা এদেশে বিদেশ হইতে যে সকল সামগ্রী আমদানী করি, তাহার শতকরা ৬৫ ভাগ গ্রেট বৃটেন ও আয়ার্লণ্ড হইতে আমদানী হয়। ১৯১৩।১৪ সালে তথা হইতে ভারতে ১১৭।০ কোটী টাকার পণ্য আমদানী হইয়াছিল। আর ৭৭টি বিভিন্ন দেশ হইতে ৬৫ কোটী টাকার জিনিষ আমদানী হয়। গ্রেট বৃটেন হইতে

এদেশে এক্ষণে প্রায় ৬০ কোটি টাকার কার্পাস বস্ত্র আমদানী হয়। তথা হইতে যে সকল সামগ্রী আমদানী হয় তাহার কোনটিই কাঁচা মাল অর্থাৎ পণ্যের উপকরণ নহে। তথা হইতে যে সকল শিল্প সামগ্রী আমদানী হয়, তাহার অধিকাংশেরই উপকরণ এদেশে আছে। কার্পাস বা পশমী বলুন, আর ছুরি কাঁচি প্রভৃতি লোহালক্কড়ের জিনিষই বলুন, আর সাবান গন্ধ দ্রব্য প্রভৃতি বিলাসদ্রব্যসামগ্রীই বলুন, সকলেরই উপকরণ এদেশে উৎপন্ন হয়। এক্ষণে আমাদের দেশের শিল্প সামগ্রীর উন্নতির জন্য এদেশে ইংলণ্ডজাত সামগ্রী যাহাতে অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়, তাহাই ত করা প্রয়োজন। তাহা করিতে হইলে তাহার উপর উক্ত হারে মাশুল গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু Imperial Preference প্রবর্ত্তিত হইলে তাহা অল্প মাশুলে এদেশে আসিবে সুতরাং এখানকার অপেক্ষা স্থলভে বিক্রয় হইবে এবং তাহার ফলে তাহার আমদানী বাড়িবে। পক্ষান্তরে এ দেশের নবজাত শিল্প তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অসমর্থ হইয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহাতে সকলেই সহজে বুঝিবেন যে, এই নূতন preference নীতি আমাদিগের শিল্পের পক্ষে কিরূপ সর্ব্বনাশকর হইবে।

এদিকে আবার এই নীতিতে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের কিরূপ ক্ষতি হইবে, তাহাও আমরা দেখাইতেছি। এদেশ হইতে যে সকল সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী হয়, গ্রেট বৃটেনে তাহার সিকি অংশ চালান যায়। য়ুরোপের অন্যান্য দেশে এক তৃতীয়াংশে যায়। আর এসিয়ার বিভিন্ন দেশে সাত ভাগের এক ভাগ প্রেরিত হয়। ১৯১৩।১৪ সালে ইংলণ্ডে রপ্তানী হইয়াছিল ৩ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সামগ্রী, অন্যান্য য়ুরোপীয় দেশে যায় ৫ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সামগ্রী, আর এসিয়ার বিভিন্ন দেশে যায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের জিনিষ, এক্ষণে যদি আমরা উল্লিখিত দেশ সকলের আমদানী জিনিষের উপর বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশের সামগ্রী অপেক্ষা অধিক মাশুল লই, অথবা সেই সকল দেশে যে সকল সামগ্রী এদেশ হইতে রপ্তানী হয়, তাহার উপরও যদি ঐরূপ অধিক হারে মাশুল লই, তাহা হইলে তাহারা কি তাহার প্রতিশোধ লইবে না? তাহারা কি ভারতের পাট বা তিসি সরিষা প্রভৃতি সামগ্রীর উপর অধিক মাশুল বসাইবে না? এরূপ হইলে সেই সকল দেশে ভারতের কৃষি ও শিল্পজাত সামগ্রীর কাটতি সহজেই হ্রাস হইবে এবং তথায় ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইবে। কেহ কেহ বলেন, পাট পালা ইত্যাদি সামগ্রী একমাত্র ভারতেই উৎপন্ন হয়, সুতরাং বিদেশীয়দিগকে ঐ সকল সামগ্রী লইতেই হইবে, কিন্তু সকলের মনে রাখা উচিত, জিনিষ দুর্ম্মূল্য হইলে সাধারণতঃ লোকে তাহা অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। তাহার পর কে বলিতে পারে, ভারতের পাট দুর্ম্মূল্য হইলে অন্য দেশ উদ্ভিদসূত্র প্রস্তুতে মনোযোগী হইবে না? আর সোহুন, প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য আমেরিকা রুষিয়া প্রভৃতি দেশে জন্মে, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতের ঐ সকল কৃষিজাত সামগ্রীর ব্যবসা মন্দা পড়িবে এবং তাহার ফলে ভারতীয় কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সুতরাং এই নূতন নীতি শিল্পোন্নতির পক্ষে যেমন ক্ষতিকর হইবে, কাঁচা মালের ব্যবসায়েরও সেইরূপ ক্ষতি সাধন করিবে।

"বসুমতী—"

ভূমির উৎপাদিকা শক্তি

(শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত)

দেশের অবস্থা যে দিন দিন হীন হইতে হীনতর হইতেছে তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার ক্ষমতা নাই। দেশের সাধারণ প্রজার বিশেষতঃ দেশের কৃষককুলের অবস্থা ক্রমেই অবনত হইতেছে। দেশের এইরূপ অবনতির বহুবিধ কারণ আছে। তন্মধ্যে প্রধান কারণ আমাদের দেশের কর্ষণোপযোগী ভূমির উৎপাদিকা শক্তির ক্রমিক হ্রাস। পূর্ব্বে

আমাদের দেশের জমিতে যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইত, এক্ষণে আর সে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয় না।

পূর্ব্বে এ দেশে বিঘায় ৫।১৬ মণ ধান্য; ৪।৫ মণ তিল, মসিনা, সরিষা; ১০।১২ মণ ছোলা, মুগ, অড়হর ৩০।৪০ মণ ইক্ষুগুড়; ২০।২২ মণ হরিদ্রা, শুঁঠ; ১০।১২ মণ লঙ্কা, পাট, কার্পাস ইত্যাদি জন্মিত। এক বিঘা তরকারীর জমিতে ২৫।৩০ টাকা ও এক বিঘা পাটের জমীতে ১০০৲ টাকা উৎপন্ন হইত। এক্ষণে সুবৃষ্টির বৎসরেও আর সেরূপ ফসল জন্মে না। যদি খুব বেশী জন্মে তো উহার অর্দ্ধেক অপেক্ষাও কম। অধিকন্তু এক্ষণে সকল বৎসরে সমানভাবে সুবৃষ্টি হইতে দেখা যায় না। কোনও বৎসরে অতিবৃষ্টি, কোন বৎসরে অনাবৃষ্টি এবং কোনও বৎসরে ফসল সকল হাজিয়া পচিয়া নষ্ট হয়, অনাবৃষ্টি ও বিপৃঙ্খল বৃষ্টির বৎসরে শস্য সকল শুষ্ক বা অন্যবিধ প্রকারে নষ্ট হইয়া যায়। বৃষ্টি বিপৃঙ্খল ব্যতীত ভূমির উৎপাদিকা শক্তির ক্রমশঃ হ্রাসও এদেশের শস্য অল্পতার অন্যতম কারণ।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি নাশের প্রধান কারণ কি। সাধারণতঃ সকলেই বিশেষতঃ কৃষক মাত্রেই অবগত আছেন যে এক ক্ষেত্রে প্রথম বৎসর যেরূপ ফসল উৎপন্ন হয়, তার পরবৎসর অর্থাৎ দ্বিতীয় বৎসর তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং বৎসরের পর যতই বৎসর যাইতে থাকে, উত্তরোত্তর উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ক্রমে অল্প হইতে অল্পতর হইয়া যায়। বহুকাল এইরূপভাবে অবস্থান করিলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। ভূমির এইরূপে উৎপাদিকা শক্তি কেন নাশ হয় তাহা সকলেরই বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

ভূগর্ভে একটি আন্তরিক শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই আন্তরিক শক্তি নানা প্রক্রিয়া দ্বারা বাহিরে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। ভূগর্ভে একটি কোনও বৃক্ষের বীজ বপন করিলে এবং তাহাতে নিয়মিত জল সেচন করিলে মৃত্তিকা, জল, বায়ু ও বীজের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাবে ভূমির আন্তরিক শক্তি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তখন ভূগর্ভস্থ আন্তরিক শক্তির কিয়দংশ বাহিরে প্রকাশিত হইয়াছে বেশ বুঝিতে পারা যায়। আমরা বৃক্ষ ও তৎসম্বন্ধিত ফল পুষ্প আহরণ করিলাম, তাহাতেই আমাদের ভূমির অন্তর্নিহিত শক্তির কিয়দংশ আহরণ করা হইল। এইরূপে আমরা কোনও এক ভূখণ্ড হইতে যত শস্যাদি গ্রহণ করিব, ঐ সকল শস্যাদির সহিত ভূমির অন্তর্নিহিত উৎপাদিকা শক্তিরও তত হ্রাস হইবে। ফলকথা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি ফলপুষ্পে পরিণত হইয়া মানবের সেবায় নিযুক্ত হয়। ভূমির এই অন্তর্নিহিত শক্তি পটাশ, ফস্ফরিক এসিড প্রভৃতি দ্রব্যে আবদ্ধ থাকে। আবাদ করিতে করিতে ভূমি হইতে ক্রমে উক্ত পটাশ প্রভৃতির হ্রাস হয়, এবং তাহাতেই ভূমি ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আমরা ভূমি হইতে যে শক্তিটুকু উপরোক্ত প্রকারে গ্রহণ করি তাহা আমাদের ঋণস্বরূপ গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। অর্থাৎ যেমন ঋণ করিলে তাহা প্রত্যর্পণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য, সেইরূপে আমরা আমাদের মাতৃস্বরূপিনী পৃথিবীর নিকট হইতে যে শক্তিটুকু ফল শস্যরূপে ঋণ গ্রহণ করি তাহাও পৃথিবীকে প্রত্যর্পণ করা উচিত।

এই ঋণ পরিশোধ করিবার সহজ উপায় এই যে আমরা ভূমি হইতে যে পরিমাণ উহার শক্তি গ্রহণ করি তাহার পূরণ জন্য ভূমিতে সেই পরিমাণ সার দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রতি বৎসর শস্যাদি প্রদান করিয়া ভূমির যে সারভাগের ক্ষয় হয়, সার প্রদান করিয়া ভূমির সেই ক্ষয়ের পূরণ করিলেই উৎপাদিকা শক্তি সমতা রক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব আমাদের সকলেরই ভূমিতে উপযুক্ত পরিমাণ সার দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি আমরা আলস্য পরবশ হইয়া ভূমিতে সার দিতে বিরত থাকি এবং প্রতিবৎসরই ভূমি হইতে শস্য উৎপন্ন করিয়া উহার উৎপাদিকা শক্তির অপহরণ করি তাহা হইলে আমরা প্রকৃতই ভয়ঙ্কর

কার্য্য করিবে এবং চৌর্য্যবৃত্তির অবশ্যম্ভাবী ভয় তাহা-দিগকে ভোগ করিতে হইবে। যদি আমরা জমিতে উৎকৃষ্টরূপে উপযুক্ত পরিমাণ সার না দিই তাহা হইলে জমির উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশঃ নাশ হইয়া স্বভাবত উর্ব্বরা জমীও একেবারে অনুর্ব্বরা জমীতে পরিণত হইয়া যাইবে। যে জমীতে পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল, সারের অভাবে তাহাও মরুভূমিতে পরিণত হইবে। অতএব পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইয়া জমীতে উপযুক্ত পরিমাণ সার প্রদান করিয়া উৎপাদিকা শক্তির সমতা রক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

উদ্ভিজ্জগণের উৎপত্তি, পোষণ এবং পূর্ণাবস্থা প্রাপ্তির বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য মৃত্তিকা, জল, বায়ু, আলোক ও উত্তাপের বিশেষ আবশ্যক, কারণ উদ্ভিদগণ ঐ সকল দ্রব্য হইতে উপাদান সকল গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের জীবন রক্ষা ও পুষ্টিসাধন করে। কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণ অধিক আছে তাহা স্থির করিয়া যদি উহা তাদৃশ পরিমাণবিশিষ্ট মৃত্তিকায় রোপণ করা যায় তাহা হইলে উহা সতেজ ও পরি-পুষ্ট হয়, কিন্তু পুনঃ পুনঃ বৃক্ষ রোপণ করাইতে সেই ভূমির পরমাণু শূন্য হইয়া পড়ে, তখন আর উহার বৃক্ষের আবশ্যকীয় উপাদান যোগাইবার ক্ষমতা থাকে না, সেই জন্য ভূমিতে বৃক্ষাদি রোপণ করিলে তাহা নিস্তেজ হইয়া যায় এবং হয়ত শেষে মরিয়া যায়। এই কারণেই ভূমিতে সার দেওয়া কর্ত্তব্য।

উদ্ভিদ মাত্রেই পটাশ, ম্যাগ্নেশীয়া, চূণ, ফস্ফরিক এসিড ও যবক্ষারজান হইতে উপযুক্ত উপাদান গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হয়। মৃত্তিকাতে এই কয়টী পদার্থ আছে। যখন এই কয়টী পদার্থের অভাব হয় তখনই উদ্ভিদগণ উপাদান প্রাপ্ত হয় না, কাজেই নিস্তেজ হইতে থাকে। এইরূপ কোন্ পদার্থের অভাব হইলে সার দ্বারা তাহা পূরণ করিতে হয়। খৈল, পশুপক্ষী প্রভৃতির মল-মূত্র, অস্থিচূর্ণ, জল, পচা পাতা প্রভৃতি দ্রব্য অতি উত্তম সার। ইহাদের প্রত্যেকই উদ্ভিদের পুষ্টিকর, কারণ পটাশ, ম্যাগ্নেসিয়া প্রভৃতি যাহা কিছু উদ্ভিদের পক্ষে উপকারী তাহা ইহাতে প্রচুর পরিমাণে আছে।

খৈল প্রায় সকল উদ্ভিদের পক্ষে উপকারী। মৃত্তিকায় যে সকল উদ্ভিদ পোষণকারী পদার্থ আছে, খৈলেও তাহাই আছে। খৈল দিলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি জন্মে এবং সকল প্রকার উদ্ভিদের প্রভূত উপকার হয়। সর্ষপ ও তিসির খৈল অপেক্ষা শোত, রেড়ী ও কার্পাস বীজের খৈল অধিক উপকারী। খৈল তরল করিয়া জলে গুলিয়া দিলেই ভাল হয়। চূর্ণ করিয়াও দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তত উপকার দর্শে না। তরল সারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহাতে খুব শীঘ্র উপকার দর্শে ও মন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে। খৈলে যবক্ষার জান, ম্যাগ্নেশিয়া, ফস্ফরিক এসিড অ্যালবুমেন প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ পোষণকারী যে সমস্ত পদার্থ আছে, তাহা অস্থি চূর্ণস্থিত ঐ সকল পদার্থের সমতুল্য, এবং গুয়েনো, মনুষ্যমল প্রভৃতি সারস্থিত ঐ সকল পদার্থ অপেক্ষা ন্যূন। খৈল উৎকৃষ্ট সার সন্দেহ নাই কিন্তু উহার একটি মহৎ দোষ এই যে মৃত্তিকা হইতে বায়ু প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া দেয় এবং তাহাতে উদ্ভিদের অনিষ্ট হইতে পারে। সুতরাং গাছের গোড়া মধ্যে মধ্যে খুঁড়িয়া দেওয়া উচিত। এইরূপভাবে গোড়া খুঁড়িয়া দিলে খৈল শীঘ্র পচিয়া মৃত্তিকা সংযুক্ত হইয়া যায় ও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে। খৈলে যে তৈল থাকে তাহা সারের পক্ষে তাদৃশ উপযোগী নহে। উহাতে অঙ্কুরোৎ-পাদিকা শক্তি বিনষ্ট করে। অতএব উত্তমরূপে নিষ্পীড়িত খৈল ব্যবহার করা উচিত। শুদ্ধ খৈল সাররূপে ব্যবহার না করিয়া তাহার সহিত অস্থিচূর্ণ, গোবর, চূণ প্রভৃতি মিশাইয়া ব্যবহার করিলে অধিক উপকার পাওয়া যাইতে পারে।

চূণ আঁটাল অথবা অতিশয় শুষ্ক ভূমিতে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফললাভ করা যায়। ইহা কঠিন এবং আঁটাল মৃত্তিকা শিথিল ও সচ্ছিদ্র করিয়া দেয়,

ও উদ্ভিদের মূল প্রসারণের উপযোগী করে। ইহা এবং উদ্ভিদ সকলের মূল ও সর্ব্বপ্রকার অনিষ্টকর খনিজ পদার্থের ক্ষয় সাধন করে। মৃত্তিকাস্থ অম্ল সকল নষ্ট করিয়া লৌহ ঘটিত পদার্থ সকলকে কোমল করিয়া দেয়, এবং মৃত্তিকাস্থ রস লাঘব করিয়া উদ্ভিদ পোষণোপযোগী পদার্থ সকলকে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী করিয়া দেয়।

অস্থিচূর্ণ প্রয়োগেও বিশেষ ফললাভ করা যায়। ইহা চূর্ণের ন্যায় মৃত্তিকাকে শিথিল ও সচ্ছিদ্র করিয়া, খনিজ পদার্থাদি বিনষ্ট করিয়া উর্ব্বরা করে। গোবর এদেশে সারস্বরূপে বহুকাল যাবৎ ব্যবহৃত হইতেছে, ইহা উৎকৃষ্ট সার। কিন্তু মনুষ্য, অশ্ব, মেষ শূকর প্রভৃতি প্রাণীর মলমূত্রও উৎকৃষ্ট সার হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে মনুষ্যের মল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কারণ ইহাতে যবক্ষারজান প্রচুর পরিমাণে আছে। যবক্ষারজান একটী প্রধান উদ্ভিদ পোষণোপযোগী পদার্থ। অনেক স্থলে কৃষকেরা ইহা যত্নপূর্ব্বক নিজ নিজ ক্ষেত্রে ফেলিয়া থাকে। মল ক্ষেত্রের মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইলে মৃত্তিকা খুব তেজশালী ও উৎপাদিকা শক্তিবিশিষ্ট হয়।

জন্তুর চর্ম্ম, মাংস, নাড়ীভূড়ি, মৎস্য প্রভৃতিও উত্তম সার। ঐ সকল মৃত্তিকাস্থ পুতিয়া রাখিলে পচিয়া মৃত্তিকাবৎ হইলে গাছের গোড়ায় দিতে হয়, এই সার দিলে পোকায় গাছের অনিষ্ট করিতে পারে না। সর্ব্ব প্রকার জন্তুর প্রস্রাব কিছুদিন পচাইয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায়, তবে যে কোন সারই হউক না কেন অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত নহে, তাহাতে অপকার হইতে পারে। শীতকালেই সার দিবার প্রশস্ত সময়। "সন্ধিসনী—"

খেজুর গুড় ও চিনি তৈয়ারী প্রণালী।

আমাদের এতদঞ্চলে প্রচুর খেজুর গুড় তৈয়ারী হয়, কিন্তু চিনি তৈয়ারী প্রণালী সাধারণে জানে না। সম্প্রতি বঙ্গীয় শিল্পবিভাগের মাননীয় ডাইরেক্টার মহোদয় "ভাল খেজুর গুড় ও দোআঁশা চিনি তৈয়ারী করিবার উপায়" শীর্ষক যে বিবরণী বাহির করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"তাড়ীর সঙ্গে নানা রকম জীবাণু সকল সর্ব্বদা উড়িয়া বেড়ায়। খেজুরের রস খুব সাবধানে রাখিতে না পারিলে ঐ সকল জীবাণু তাহার উপর পড়িয়া অনেক ক্ষতি করিয়া দেয়। এজন্য রস হইতে ভাল গুড় পাওয়া যায় না এবং চিনির ভাগ কম হয়। কয়েকটি উপায়ে এই ক্ষতি বন্ধ করা যাইতে পারে।

১। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলা রসের কলসী ঝুলাইবার আগে গাছের কাটা অংশ পরিষ্কার জল দিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে। ফরমালিন্ নামক আরকের কয়েক ফোঁটা ঐ জলের সঙ্গে মিশাইয়া লইতে পারিলে আরও ভাল হয়। ডাক্তারখানায় খোঁজ করিলে এই আরক পাওয়া যাইবে।

২। রসের কলসী আগুনে তাতাইয়া লইবার যে নিয়ম আছে, তাহা না করিয়া কলসীর ভিতর ভাগ মাঝে মাঝে চুণ লেপিয়া লইলে, খুব ভাল ফল পাওয়া যাইবে। এমন কি এরূপ কলসীতে দিনের বেলার ওলা রস জড় থাকিলে তাহা হইতেও ভাল গুড় করিতে পারা যাইবে।

৩। গাছে কলসী ঝুলাইবার সময় তাহার মুখ যতটা সম্ভব সরা বা আর কিছু দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া দরকার। কেবল রস হইতে কলসীতে চুন পড়িবার জন্য একটু গর্ত্ত রাখিলেই যথেষ্ট।

৪। রস জাল দিবার পোহার কড়াই সকল খুব পরিষ্কার রাখিতে হইবে। কোন রকম পোড়া গুড় বা চিনি তাহার গায়ে লাগিয়া থাকিলে জাল দেওয়া রসের রং কাল হইয়া যায়।

৫। রস জাল দিবার সময় আল করিয়া তেঁতুল গোলা জল তাহার উপর ছিটাইয়া দিলে খেজুর গুড়

দেখিতে ঠিক কাঁচা সোনার মত হইবে। কয়েকদিন অভ্যাস করিলেই বুঝা যাইবে কোন রসে কতটা তেঁতুল জল দেওয়া দরকার।

৬। পাটা সেওলা দিয়া চিনি পরিষ্কার করিতে অনেক সময় লাগে। আজকাল এই কাজের জন্য একরকম কল পাওয়া যায় তাহাতে হাড়ের কয়লা ইত্যাদি কিছু ব্যবহার না করিয়াও অতি শীঘ্র ও অতি সহজে পরিষ্কার চিনি বাহির করা যায়। একজন খওসারির পক্ষে এই কল কেনা দুঃসাধ্য হইলেও পাঁচজনে মিলিয়া সমবায়বদ্ধ ভাবে কিনিলে সকলেরই বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ কলিকাতায় ৮৭এ পার্ক ষ্ট্রীটে ডিরেক্টর অফ্ ইণ্ডাষ্ট্রীর নিকট লিখিলে জানা যাইবে।

নাহার—

ব্যর্থ-প্রয়াস।

[গল্প]

(শ্রীমতী নৃসিংহবাসী দেবী)

নিশীথের জীবনটা যে সে সাধারণ লোকের মত জড়িত অপরিচ্ছিন্ন জীবন করিয়া তুলিবে না, এই কল্পনাটা তার চিরকাল প্রবল ভাবেই মাথায় ঘুরিত।

তাই সে অল্প বয়সেই বিপুল উদ্যমে 'বি এল' পাশ করিয়া দেশের ও দশের হিতে জীবনটাকে সার্থক করিবার অভিপ্রায়ে সহসা স্বেচ্ছাসেবক সাজিয়া বসিল।

এই ভাবে সে তাহার জীবনটাকে ব্যর্থ করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া তাহার পিতা হরশঙ্কর বার অজস্র তিরস্কার করিলেন,—মাতা অশ্রু প্রবাহে তাহার প্রতিরোধের চেষ্টা করিলেন, ফলে কিন্তু সে তরুকাণ্ডের মতই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে লাগিল। আর মুগ্ধ হইতে লাগিল বন্ধুবর্গের অজস্র প্রশংসায়।

আলোক আঁধার মাখিয়া দিন গুলি কিন্তু পথ চলিতে একদিনও একটু ভুল করিল না। ধীরে ধীরে এমনি করিয়া একে একে ছয় মাস কাল সাগরে মিলাইয়া গেল।

এমন সময় তাহার জননী স্বর্গারোহণ করিলে, সে সর্ব্বপ্রথম অন্তরের মধ্যে অভাব বোধ করিল। চন্দ্রহীন অন্ধকার রাত্রির উচ্ছৃঙ্খল সমীরণের মতই তার সমস্ত ভিতরটা ব্যাকুল হইয়া আর্ত্তস্বরে হাহাকার করিয়া উঠিল।

রহিলেন—শোকাক্রান্ত অবসন্ন শ্রান্ত প্রৌঢ় পিতা। কিন্তু তিনিও আর পত্নীহীন সংসারে থাকিতে অসম্মত। দু'চার দিনের ভিতরেই শেষের সম্বল সঞ্চয় করিবার আশায় তিনিও তীর্থ পর্য্যটনে যাইতে মনস্থ করিলেন।

যখন যাইবার সময় উপস্থিত হইল তখন নিশীথকে ম্লানমুখে কাছে দাঁড়াইতে দেখিয়া গাঢ় স্বরে বলিলেন "তোমার বাড়ী, তোমার সব তুমি এখন যাইচ্ছে করতে পার নিশীথ! তুমি উপযুক্ত হয়েছ, আর ত তোমাকে আমার বলবার কিছু নেই, আর ক্ষমতাও নেই।"

বলিতে বলিতে তাঁহার উভয় চোখ শ্রাবণের নদীর মতই অশ্রুতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি নিশীথের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন।

পিতার এই অভিমান পূর্ণ হতাশ কণ্ঠস্বর নিশীথের পাঁজরার ভিতর ঝন ঝন করিয়া বাজিয়া

উঠিল। সে একটু বিচলিত হইল, পরে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "কি করবো আমি।"

"কি করবে তাত অনেকবার বলেছি নিশীথ। কথা ত রাখনি তুমি, যদি সংসারী হতে, হয় ত বা সেবার লোভে দুদিন মায়ের কাছে ফিরে আসতে হতো, কিন্তু আর বোধ হয় তা হবে না।"

বলিয়াই অভিমানী পিতা গাড়ীর উপর উঠিয়া পড়িলেন, নিশীথের চোখের উপর দিয়া হাউই বাজীর মতই গাড়ী খানি চলিয়া গেল।

নিশীথ স্বপ্নাচ্ছন্নের মত অনেকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিল,—সে কি সত্যই তার পিতার কাছে, স্বর্গগতা জননীর কাছে, অপরাধী।

কিন্তু এই যে দেশবাসী সহোদর প্রতিম কত শত নরনারীর আর্ত্তনাদ, কত লাঞ্ছনা, কত দুরবস্থা, কত ব্যাধি, কত দৈন্য কাতরতা সে কি ইহাদের কিছুই করিবে না?

সে কি এতই নিশ্চল হইয়া রহিবে? জগতের সঙ্গে তার প্রসারিত স্পন্দন ভরা বুক এতটুকু সহানুভূতা জানাইতেও কি অক্ষম হইয়া থাকিবে! তবে সে আপনাকে মানুষ বলিয়া কি করিয়া জন-সমাজে পরিচিত করিবে?

না না সে তাহা পারিবে না! তবু তাহার পুনঃপুনঃ মনে পড়িতে লাগিল, অভিমানী পিতার হতাশ অশ্রুতে পরিপূর্ণ কাতর চোখ দুটী, কাণে বাজিতে লাগিল অন্তরীক্ষ বাসিনী পুণ্যবতী মাতার অনুযোগ ও আদেশ বাহী স্নেহের সুর।

সে নিজের অন্তরের মধ্যে অজস্র যুক্তি তর্ক পুঞ্জীভূত করিল, কিন্তু কিছুরই মীমাংসা করিতে পারিল না। অবশেষে সে সহসা বিক্ষিপ্ত চিত্তে ষ্টেশন ত্যাগ করিল।

সঙ্গে আসিয়াছিল তাহার পিতামহের আমলের প্রাচীন ভৃত্য রামচরণ,—তাহাকে এই ভাবে যাইতে দেখিয়া সে উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল "খোকাবাবু!"

কিন্তু বহু কণ্ঠের মিশ্র কোলাহলের মধ্যে তাহার কণ্ঠস্বর ডুবিয়া গেল। তাহার খোকাবাবুর উত্তর তাহার কাণে পৌঁছিল না। স্রোতের গতিকে যতই বাধা দাও বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইতে চায় না নিশীথের অন্তরাত্মাও তেমনি সহস্র বাধা স্বত্বেও সংকল্প ত্যাগ করিল না,—সে আরো দৃঢ় ভাবে দেশের হিতে, দশের কাজে লিপ্ত হইল।

রামচরণ প্রভুর যাহা কিছু নিজের বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিল। দশ দিন, পনর দিন পরে নিশীথ যখন বাড়ীতে আসিত, তখন সে তিরস্কার, অনুযোগ, মিনতি কিছুই করিতে বাকী রাখিত না, তথাপি তাহাকে ফিরাইতে পারিল না।

ক্রমে ক্রমে আরো ছয়মাস কাটিল,—সেদিন নিশীথ বাড়ী আসিতেই রামচরণ একখান চিঠি আনিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল "খোকাবাবু! তুমি পরের রোগের সেবা করে বেড়াচ্ছ—আর তোমার বাবার যে বৈদ্যনাথে এসে ঘর ঘর অবস্থা হয়েছে, তার খোঁজ রাখ না; তুমি না রাখ আমি থাকতে পারবো না,—তোমার চাবি কুলুপ এই সব রইল!"

এই বলিয়া তার সমস্ত বোঝা আজ রামচরণ নিশীথের পায়ের কাছে রাখিয়া দিল। নিশীথ সবেমাত্র বাড়ীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আজ সে নিজেকে এই ভৃত্যের কাছে বিষম অপরাধী মনে করিল।

সে ব্যথিত ভাবে বলিল "আমি ত খবর পাইনি।"

রামচরণ উষ্ণ হইয়া বলিল "খবর এমনি পাচ্ছ। তোমরা বুড়ো বাবা বিদেশে বেড়াচ্ছে আর তুমি যা ইচ্ছে তাই করছো,—কোন সকালে চিঠি এসেচে, বলেই আছি খোকা বাবু এলে বয়, তা রাত নটা বাজিয়ে দিলে, যা খুসী করগে আমি এই দশটার গাড়ীতেই বাবুর কাছে যাচ্ছি!"

নিশীথ কোন উত্তর না দিয়া চিঠিখানা কুড়াইয়া লইয়া পড়িল, তারপর অপরাধীর মতই বলিল "আমাকে নিয়ে যাবে না!"

হর্ষে রামচরণের চোখ দুটী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল বলিল "বাবে তুমি!"

"আমি ত যাব না বলিনি, আমি ত খবর পাইনি বাবার অসুখ! আমি জানলে পাঁচটার ট্রেনেই যে যেতাম।"

"তবে এস আর দাঁড়িও না।" নিশীথের হাত ধরিয়া ঘরের বাহির করিয়া রামচরণ দুয়ারে ধূপ ধূপ লাগাইতে নিযুক্ত হইল।

যখন তাহারা বৈদ্যনাথে পঁহুছিল, তখন হরশঙ্কর বাবু জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া ছিলেন। মাথার নিকটে একটী বালিকা বসিয়া সন্তর্পণে জলের পটী দিতেছিল, কিছু দূরে চেয়ারে ডাক্তার বাবু বসিয়া একখানি সংবাদ পত্রে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

[এই ডাক্তারটী হরশঙ্করের বালাবন্ধু। নিশীথ ইঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছে, এবারও দরজায় পা দিতেই ডাক্তার বাবু কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া বলিলেন "এই যে নিশীথ! এসেছ—সমস্ত রাত কাল ইনি কেবল তোমার নাম করেছেন—এই বিদেশে, বাসার পরের মাথায় ভার দিয়ে রোগীর যত্ন ঠিক হয় কি?—তাই আমিও কাল হ'তে সমস্ত ডাক অগ্রাহ্য করে এখানেই বসে আছি।"

এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সসম্মানে হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া নিশীথ বলিল "সৌভাগ্য যে আপনি এখানে আছেন, নইলে বাবার কত কষ্টই যে হোত বলা যায় না।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন "না আমি কোন কষ্টই হ'তে দিইনি। ঐ দেখ আমার ভাইঝিটীকে পর্য্যন্ত তাঁর সেবায় নিযুক্ত করে রেখেছি, সেজন্য তোমার ভাবনার কোন কারণ নেই, তবে সন্তান স্নেহ কি না, তিনি তোমার জন্যে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।"

নিশীথ পিতার কাছে বসিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু সে এই বালিকাকে দেখিয়া আর না বসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার পদস্পর্শ করিল।

এতগুলি কথোপকথনে হরশঙ্করের তন্দ্রা ছুটিয়া গিয়াছিল, তিনি এইবার চাহিয়া বলিলেন "এসেছ নিশীথ! ভেবেছিলাম তুমি বাড়ীনেই তাই রামচরণকেই আসতে বলেছিলাম।"

বলিয়া তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। নিশীথ বুঝিল এটা তাঁর অভিমানের সুর—কিন্তু সেটুকু প্রকাশ না করিয়া বলিল "রামচরণও এসেছে।"

"এসেছে কইসে? সে আসবে তা আমি জানি"—

বলিয়া অসমাপ্ত কথায় হরশঙ্কর চুপ করিলেন।

এই কথায় নিশীথের অন্তরে বেদনা লাগিল। তার পিতা রামচরণের উপর যতটা বিশ্বাস করেন, তার সম্বন্ধে তিনি সে বিশ্বাসও রাখেন না! তথাপি চুপ করিয়া রহিল, সত্যই যে সে পিতার কথা মত চলে নাই।

এই সময় রামচরণ তার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরে বলিল "বাবু! তোমার অসুখ শুনে চিরকালের রামচরণ কি নিশ্চিন্ত থাকতে পারে?"

প্রায় পনর দিন পরে যখন হরশঙ্কর কতকটা সুস্থ হইলেন, তখন একদিন নিশীথ তাঁহাকে বলিল "বাবা এখন দিন কতক বাড়ী চলুন!"

তখন প্রায় সন্ধ্যা—স্নিগ্ধ বাতাস ধীরে ধীরে বহিয়া বেশ একটু নূতন ভাবের শান্তি ঘোষণা করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। সেই স্নিগ্ধ বাতাসে আপনার রোগক্লিষ্ট দেহে স্বস্তি অনুভব করিয়া, চোখ বুঁজিয়া হরশঙ্কর বাবু শুইয়া ছিলেন। পুত্রের এই অনুরোধে একবার সস্নেহে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া উদাসীন কণ্ঠে উত্তর দিলেন—

"কার কাছে যাব নিশীথ?"

নিশীথ একথার কোন উত্তর পাইল না - নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তিনি বলিলেন "বলেছিত সেবার প্রলোভনে হয়ত কখন বাড়ী যেতাম, কিন্তু সে কথা তুমি ত রাখবে না, তোমার ইচ্ছে নয় যে আবার বাড়ী ফিরি।"

নিশীথ ব্যথিত হইল। সত্যই ত, এই যে তার স্নেহময় পিতা, তাঁহারও সে বেদনার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সত্যই ত। তিনি কোথায় যাবেন! একটু স্থির থাকিয়া উত্তর দিল "আর আপনার অমতে যাব না।"

"সত্যি বলছো!" উচ্ছ্বসিত আনন্দে হরশঙ্কর চেয়ার উপর উঠিয়া বসিলেন,—পিতার এই আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া নিশীথ বলিল "আর নিজের সুখ খুঁজবো না আপনি যাতে সুখী হন তাই করবো।"

হরশঙ্কর আনন্দের ভরে পুত্রের মাথাটা নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন "আশীর্ব্বাদ করছি, তুমিও সুখী হবে।"

পিতার এই স্নেহাশীর্ব্বাদ মাথায় করিয়া নিশীথ উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই সময়ে একবাটী গরম দুধ লইয়া আসিয়া বলিল জ্যাঠামশাই, দুধটুকু আপনি এক্ষুনি খেয়ে ফেলুন, ডাক্তার বলে দিলেন।"

বালিকার হাত হইতে সস্নেহে দুধের বাটী লইয়া তিনি বলিলেন "খাই মা।"

তারপর নিশীথকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "এইটীকেই মা বলে আমার বড় তৃপ্তি বোধ হয়।"

নিশীথ পিতার ইঙ্গিত বুঝিয়া কটাক্ষে একবার চাহিয়া মুখ নত করিল। হরশঙ্করও দুধটুকু শেষ করিয়া বালিকাকে বিদায় দিলেন।

প্রকৃতপক্ষে নিশীথের চোখেও কদিন হইতে এই বালিকার ধীরপ্রকৃতি বালিকাকে বেশ লাগিতেছিল। নিজের ভিতরকার চিত্রটী সে যেন এই বালিকার মধ্যেই পাইয়াছিল। নিশীথ যখন সেবা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িত, তখন এই বালিকাই তাহাকে বিশ্রামের অনুরোধ করিয়া পাশে আসিয়া বসিত। এই বিনিময়টা এতদিন সে সকল উদার হৃদয় স্নেহাসেবকদের নিকটে পাইয়াছে। সেই সহানুভূতি যে নারীর মধ্যে বিশেষতঃ একটি কিশোরী বালিকার মধ্যে এত সুন্দর ভাবে থাকিতে পারে, তাহা অনুভব করিয়া নিজেও বেশ একটু বিস্মিত হইল। তাই সে পিতার অনুরোধে আপত্তির কিছু খুঁজিয়া পাইল না।

হরশঙ্কর বলিলেন—"ডাক্তারবাবু বিখ্যাত হলেও ধনী নন্। কারণ তিনি বেশীর ভাগ চিকিৎসা করেন দানে ও দয়ায়—কাজেই অর্থাভাবের দরুণ তিনি কন্যাস্থানীয়া চপলাকে আজ ও পাত্রস্থা করে উঠতে পারেন নি। বিশেষ আমার তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ হচ্ছে এই।"

নিশীথ নীরবে ঘাড় নাড়িয়া তাহা স্বীকার করিয়া লইল,—পরে ধীরে ধীরে গৃহের বাহির হইয়া পড়িল।

কথাটা দু'চার দিনের মধ্যেই পাকা হয়ে দাঁড়াইল। ডাক্তারবাবুর আনন্দ অতিরিক্ত। তিনি যখন একমুখ হাসি লইয়া বলিলেন "শঙ্কর! চপলাকে যে আমি এমন সৎ পাত্রে দিতে পারবো তাত আমি একদিনও ভাবি নি।"

তখন হরশঙ্করবাবু সমানভাবে হাসিয়া বলিলেন "তোমার সৌভাগ্যের চাইতে আমার আরো বেশী। নিশীথ যে আমার কথা রাখবে, এ আমার কাছে আকাশকুসুম বলেই মনে হচ্ছিল।"

তারপর সহসা তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া, আকাশের উদারহৃদয়ে চোখ রাখিয়া নীরব হইলেন। অতীতের স্মৃতি একখানি যেন তাঁহার চোখের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, এই সুখ কল্পনার মধ্যেও তাঁর অন্তঃকরণ একটা করুণ বেদনায় ভরিয়া উঠিল। কালগর্ভে লয় প্রাপ্ত একটি চিত্র তাঁহাকে উন্মনা করিয়া তুলিল। সে নিশীথের জননীর! "হায় আজ যদি সে থাকিত!" সহসা আবার তাঁহার ব্যথিত নিশ্বাস বহিয়া পড়িল। একটু চমকিয়া চাহিয়া দেখিলেন ডাক্তারবাবু চলিয়াগিয়াছেন।

তার পর আরো তিন বৎসর কাটিয়াছে।—হরশঙ্কর পুত্র পুত্রবধূ লইয়া বেশ সংসারী হইয়াছেন।—নিশীথের

একটু ছেলেও হইয়াছে; হরশঙ্করের ব্যথিত জীবন আবার বেশ শান্তিতে কাটিতেছে।

কিন্তু এত করিয়া ও তিনি একটি কাজ কিছুতেই করিতে পারেন নাই, সেটী নিশীথকে স্থির করিয়া গৃহেরাখা। সে এখনো সেইভাবে দেশের জন্য ছুটাছুটী করিয়া বেড়ায়। হয়ত দুই মাস অমনি করিয়া কাটাইয়া দশদিন মাত্র বাড়ীতে থাকে।

টাকা খরচ করিয়া কাঠের কারবার খুলিয়া দিলেন, তাহা ও সে নিত্য দেখা শুনার ধার দিয়াও যায় না।—যখন আসে তখন কর্ম্মচারীর কাছ হইতে হিসাব লয়, আবার তাহার মাথাতেই ভার দিয়া হয় ছুর্ভিক্ষে, নয় জল প্লাবনে, নয়ত মহামারীতে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

এবার পাঁচ ছয় দিন হইল নিশীথ আসিয়াছে'—তখন বর্ষাকাল, জল প্লাবনে দেশ ভাসিতেছে, সুতরাং কালই সে বাহির হইবে তাহা চপলা বিলক্ষণ জানিত।

নিশীথ যখন আপনার ঘরে বর্ষার স্নিগ্ধ বাতাসের জন্য সম্মুখে জানালা অর্দ্ধ বন্ধ রাখিয়া একাগ্রচিত্তে কি একখানা বই পড়িতেছিল, সেই সময়ে সে ধীরে ধীরে তাহার পায়ের কাছে দাঁড়াইল।

নিশীথ বই হইতে চোখ তুলিয়া বলিল "কি মনে করে?" চপলা মৃদু ভাবে বলিল "কাল যাবে?"

"কেন বল দেখি! এখোজ ত তুমি কখনো করনি?" বলিয়া সকৌতুকে নিশীথ তাহার দিকে চাহিল।

"না, কাল তুমি যেও না, কি জানি ভাল লাগছে না, আমার বড় জ্বর হয়েছে।"

বিস্মিত ভাবে নিশীথ বলিল "সত্যি, দেখি।"

চপলার গায়ে হাত দিয়া নিশীথ দেখিল সত্যই বেশ রীতিমত জ্বর। এ রহস্য ও নয় তাহাকে বাড়ী রাখিবার কন্দিও নয়। তখন একটু নীরব থাকিয়া বলিল "চোখের উপর জ্বরটা দেখে আর যাই কি করে।"

কিন্তু একদিন, দুই দিন তিন দিন, ক্রমশ চিকিৎসা ও সেবা সবই নিষ্ফল হইয়া যাইতে লাগিল, রোগ বৃদ্ধির পথেই ছুটিল।

শেষে এগার দিনের দিন উষার পবিত্র বায়ুতে চপলা তাহার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। শ্বশুর স্বামী ও তাহার ছয়মাসের পুত্রের আকর্ষণ, কিছুতেই তাহাকে ফিরাইতে সক্ষম হইল না।

হরশঙ্কর শিশুর মতই কাঁদিয়া উঠিলেন। নিশীথ কিছুই করিল না, শুধু গম্ভীর মুখে মৃতের শেষ কাজ করিয়া ফিরিয়া আসিল। যতক্ষণ সে ফিরিয়া আসে নাই, ততক্ষণ হরশঙ্কর বড়ই উদ্বিগ্ন ছিলেন। কিন্তু নিশীথ যখন ফিরিয়া আসিয়া সিক্ত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বলিল "বাক বন্ধন মুক্তি" তখন [redacted] অনেকটা সাহস পাইলেন।

একে একে আরো পনর দিন কাটিল।—শিশু বিজয় পিতামহের স্নেহে একরূপ পরিচারিকার যত্নে মানুষ হইতে লাগিল। নিশীথের দু এক জন বন্ধু আসিয়া তাহাকে জলপ্লাবনে যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিল,

কিন্তু নিশীথ এবার গেল না, কেবল গাঢ়স্বরে বলিল "না নয়, মাপ কর ভাই!"

হরশঙ্কর সমস্তই লক্ষ্য করিলেন। অতবড় উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলচিত্ত নিশীথ যে কোন মন্ত্রে গৃহকোন অবলম্বন করিল তাহা বুঝিতে তাঁহার বাকী রহিল না।

সেদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নিশীথের ঘরে আলোক দেখিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া গৃহদ্বারে আঘাত করিলেন,—দেখিলেন অর্গল মুক্ত। নিশীথ বিছানার উপরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; মাথার কাছে কত গুলি রং তুলি, ও চাকনি দেওয়া কি একটা রহিয়াছে। অতি সন্তর্পণে চাকনিটা তুলিলেন দেখিলেন একখানি চিত্র।

নিশীথ যে ছোট বেলায় খুব ভাল রকম চিত্র বিদ্যা জানিত, ও ছবি আঁকিয়া প্রদর্শনীতে মেডেল পাইয়াছিল তাহা তিনি জানিতেন, কিন্তু

সেই বিশ্ব যে আজ তাহার শোকের সাধনা হইয়া দাঁড়াইবে তাহাত কোন দিন ভাবেন নাই। হায়! অনন্ত অদৃষ্ট! বেদনায় তাঁহারও অন্তর ভরিয়া উঠিল নিশীথ যে কতখানি প্রাণ দিয়া এই গভীর রাত্রিতে লোক নেত্রের অগোচরে তার প্রিয়তমাকে ধরিয়া রাখিতে চায়, তাহা অনুভব করিয়া হরনন্দরের চোখে জল আসিল। অথচ এমন দিন গিয়াছে—যখন ছেলের বিবাহ দিয়া আসিয়া নিজেই কতবার ভাবিয়াছেন "নিশীথ স্ত্রীর সম্বন্ধে বড় অবিবেচক।" কিন্তু পাষাণের তলায় এ গুপ্ত উৎসের কথা আগে কে জানিত! "এতও দাহী বুকি তিনিই!" হরনন্দর শিহরিয়া উঠিলেন। নিশীথের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন তাহার রুদ্ধ নেত্রের পার্শ্বদিয়া বাধিত অশ্রু ঝরিয়া উপাধান সিক্ত করিতেছে।

অযোধ্যার বেগম।

ষ্টারথিয়েটরে ষ্টারের অন্যতম নাট্যকার শ্রীযুক্ত অমরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'অযোধ্যার বেগম' নামে একখানি ঐতিহাসিক নাটক অভিনীত হইতেছে। গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাসেমের পরে বাঙ্গালার নাট্যশালায় বাঙ্গালায় ইংরেজ আগমনের প্রারম্ভকালের যুগপরিবর্ত্তনকারী ঘটনাবলী লইয়া তেমন উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নাটক বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত আর হয় নাই, না হইবার কারণও হইয়াছে অনেক। বাঙ্গলার শেষ ভাগ্যাহত নবাব মীরকাসেমের নিজ রাজ্য হারাইয়া অযোধ্যার নবাব সুজাদ্দৌলার নিকট আশ্রয় লাভ হইতে এ নাট্যের আরম্ভ, নাট্য শেষ হইয়াছে 'অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়' এই কবিবাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া কাসেমের শেষ আশ্রয় রোহিলা রাজ্যের ধ্বংসে। দুর্ভাগ্য নবাব কাসেমআলীকে বেঙ্গলী নবাব সুজাদ্দৌলা নিজ রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন—তখন নবাবকে আশ্রয় দিলেন ক্ষুদ্র রোহিলারাজ্যের আশ্রিত যৎসামান্য সম্ভ্রান্ত হাফেজরহমত ও তাহার পৌত্র ফৈজুদ্দৌলা, অভাগা বাঙ্গালার নবাবকে আশ্রয় দিয়া রোহিলারাও তাহাদের রাজ্য সম্পদ হারাইল।

অযোধ্যার বেগমকে কেন্দ্র করিয়াই নাট্যের কতকগুলি বিচিত্র ঘটনা ও চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছে আর নাট্যের সকল চরিত্রের মধ্যে ভাস্বর ও তেজস্বীত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে এই মহিমময়ী অযোধ্যার বেগমের চিত্র ও রোহিলা সর্দ্দার হাফেজরহমতের চরিত্র। সাহিত্যে, সংসারে, জাতীয় জীবন গঠনে এ দুইটি চরিত্রের যথেষ্ট মূল্য ও সার্থকতা আছে। ক্ষীণপ্রাণ নবাবের প্রতি করুণায় চিত্ত আপনা হইতেই এলাইয়া পড়ে। বিলাসী খেয়ালী বীর সুজাদ্দৌলার চরিত্রের ভাল দিক ও মন্দ দিক দুই নাট্যকার সুকৌশলে অঙ্কিত করিয়াছেন, অত্যাচার প্রপীড়িতা নারী ছায়ার চরিত্রও সুন্দর। বেদনায় ও জ্বালায় আকুল পাগলিনা ছায়ার প্রতি দর্শকের সহানুভূতি আপনা হইতেই জাগিয়া উঠে। ছায়ার ভ্রাতা লছমীপ্রসাদ, মীরকাসেমের বৃদ্ধ সহচর, রোহিলা সর্দ্দারের হিন্দু দেওয়ান, সুজাদ্দৌলার দুই পুত্র ইহাদের চরিত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, ইহাতে দেখিবার ও শিখিবার বহু জিনিষ আছে। ফৈজুদ্দৌলার চরিত্রও সুন্দর।

অভিনয়েও বহিখানি জমিয়াছে ভাল। অযোধ্যার বেগমের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন অভিনেত্রী রাণী শ্রীমতী তারাসুন্দরী। এই সংখ্যার 'নারী প্রতিভায়' সারাবার্ণাডের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে আমাদের মনে হয় অভিনেত্রী রাণী তারাসুন্দরী সম্বন্ধেও সে কথাগুলি প্রযোজ্য। সত্যই যেন ইনি স্বর-বিন্যাসের মূর্ত্তিমতী রাণী। অন্যান্য চরিত্রগুলির অভিনয়ও সুন্দর হইয়াছে।

সনাতনীতি ও বেদনীতিতে প্রাজ্ঞনাট্যকার নাটকীয় চরিত্রে এমন অনেক কথা বলিয়াছেন যাহা শুধু রঙ্গমঞ্চকে আনন্দ দিয়াই দিয়া হইতে উবিয়া যায় না—দু'দণ্ড ভাবিবার, মনের কিঞ্চিৎ খোরাকও যেন তাহা মিলাইয়া দেয়। নাট্যের দৃশ্য পটও সুন্দর হইয়াছে পাঠকেরা অযোধ্যার বেগম পড়িলে ও অভিনয় দেখিলে বাংলার সেই বিরাট পরিবর্ত্তনের যুগের একখানি করুণ ছবি চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইবেন। ইহাতে অশ্রু আছে, বেদনা আছে—আর সেই সঙ্গে নিজেকে উন্নত করিবার শিক্ষাও আছে।

Printed by P. N. Pal, at the Shastraprachar Press, 5 Chidammuli Lane, and Published by P. N Pal, 26-3 Scott Lane, Calcutta.

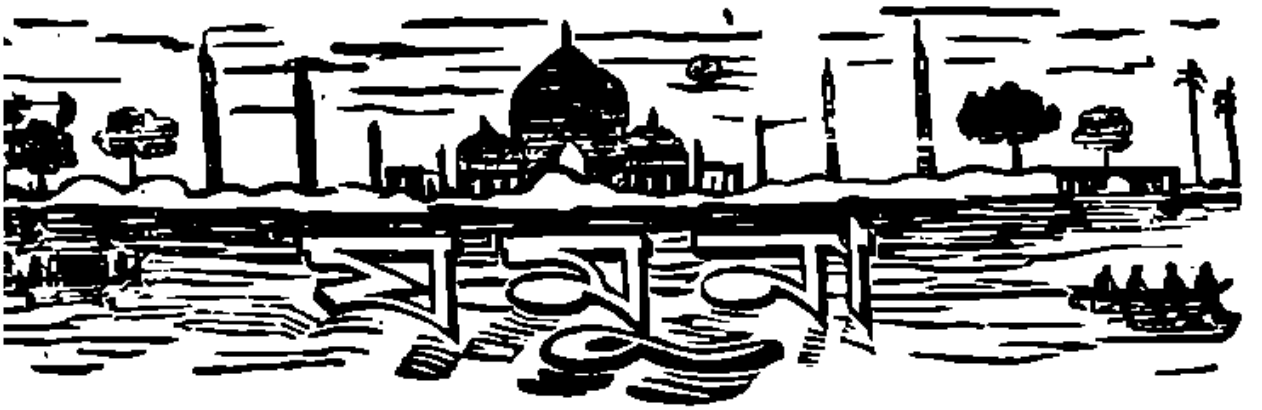

১১শ বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩২৮ | ১১শ সংখ্যা

পল্লী-বসন্ত

(শ্রীলীলা দেবী)

বসন্ত আজি দুয়ারে তোমার
ওগো নির্জ্জন বনানি
তোমা তরে সে যে নব সম্ভার
ভরিয়া এনেছে দু'পাণি।
কিবা সুবিমল নীল নভোতল
পুষ্পিত তরু কুঞ্জ সে দল
মধু মদে রাঙা হে রাণি!
বসন্ত আজি দুয়ারে তোমার
ওগো নির্জ্জন বনানি!

যুঁথি জাতি বেল চামেলীর কলি
কুরুবক আর করবী,
কূজন মধুর কুঞ্জ কানন
গীত মুখরিত অটবী।
সহকারে বেড়ি উঠে মঞ্জরী
মত্ত ভৃঙ্গ উঠে গুঞ্জরি,
স্নিগ্ধ মলয় সুরভি,
যুঁথি জাতি বেল চামেলীর কলি
কুরুবক আর করবী।

কুসুম বিতানে নব তৃণদল
হে চির তরুণি ভাবিনি!
করতোয়া কল পদপল্লব
চর্চ্চিত দিবা যামিনী।
পারুল বকুল চম্পক ফুল
বাহুতে বক্ষে কণ্ঠে দোদুল,
হে কবি-কাম্য-কামিনি
কুসুম বিতানে নব তৃণদল
হে চির তরুণি ভাবিনি!

বংশের কলঙ্ক

উপন্যাস

(শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অনুযোগ

"পেয়ারা দিচ্ছি তোকে, কিন্তু তুই আমায় কি দিবি বল্?" অরুণকুমার রামসদয়ের বাগানে পেয়ারা গাছে চড়িতে চড়িতে এই কথা বলিল, গাছের তলে অমিয়কুমার গাল-ভরা হাসি লইয়া পেয়ারার প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া রহিল। অরুণ পেয়ারা পাড়িয়া দুই চারিটা নিজে খাইল, বাকি নীচে ফেলিয়া দিল। অমিয় যেগুলা লুফিতে পারিল সেইগুলার বেলা অরুণের বাহবা পাইল; আবার যেগুলার বেলা অসমর্থ হইল, সে গুলার বেলা ছড়ো পাইল। এমন ভাবের বালকোচিত খেলাধূলায় অরুণ চিরাভ্যস্ত ছিল। রামসদয় বাবু প্রায়শঃ বলিতেন, অরুণ কখনও যুবক হইবে না, গম্ভীর ও কাজের লোক হইতে শিখিবে না।

আজ অরুণ সন্ধ্যার প্রাক্কালে বালিগঞ্জের কাকা-বাবুর বাটীতে বেড়াইতে আসিয়া দেখিল, রামসদয় বাবু কন্যা ও সরোজনাথকে লইয়া অপরাহ্ণে কলিকাতার পুস্তকালয়ে অনিলার জন্য কয়েকখানি বই খরিদ করিতে গিয়াছেন, বাটীতে অমিয় একাকী রহিয়াছে। অমিয় যাইবার জন্য জিদ করিয়াছিল, কিন্তু সেই জলে ভোবার দিন হইতে তাহার শরীরটা ভাল ছিল না বলিয়া ডাক্তার তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাই তাহাকে লইয়া যাওয়া হয় নাই। তাহার দিদি তাহাকে ভাল ভাল খেলানা আনিয়া দিবে বলিয়া অনেক করিয়া ভুলাইয়া ঘরসম্পর্কীয়া আত্মীয়াদের ও দাসদাসীদের হেফাজতে রাখিয়া গিয়াছে। অরুণ আসিবামাত্র অমিয় এক লম্ফে শয্যাত্যাগ করিয়া ডাকাতের মত চীৎকার করিয়া আনন্দে বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, অরুণও তাহাকে স্নেহভরে বুকে চাপিয়া ধরিল। তাহার পর তাহাকে লইয়া সে বাগানে ছুটাছুটি করিতে গেল, কাহারও নিষেধ শুনিল না, বলিল, "ওঃ ডাক্তাররা কিছু জানে না, ছুটোছুটি করলেই সব সেরে যাবে'খন।"

বাগানে আসিয়া ছুটাছুটির পর অরুণ ক্লান্ত অমিয়কে লইয়া একটা লতাবিতানের মধ্যে বসিল এবং পকেট হইতে তাহার জন্য নানা খেলনা ও খাবার বাহির করিয়া দিল। বস্তুতঃ অরুণের সান্নিধ্যের কেমন একটা গুণ ছিল, অমিয় সেই সান্নিধ্যে বা সংস্পর্শে আসিলে তাহার সকল দুঃখ অবসাদের অবসান হইত এবং তাহার স্থানে চিত্ত-প্রফুল্লতা দেখা দিত। এই জন্যই হয় ত' অরুণের নিকট থাকিলে তাহার অসুখ সারিয়া যাইত। চিত্ত-প্রফুল্লতার কেমন একটা সংক্রামক গুণ আছে। অরুণ এদিকে যতই অকর্মণ্য, অলস ও ক্রীড়াপরায়ণ হউক না, তাহার একটী গুণ এই ছিল যে, কেহ কখনও তাহাকে বিরসবদন হইতে দেখে নাই। প্রায় সকল অবস্থাতেই তাহার চিত্ত প্রফুল্ল থাকিত, এই জন্য তাহার মুখে চোখে সদাই হাসি লাগিয়া থাকিত। বালক অমিয়কুমারও অরুণের সংসর্গে পড়িয়া ঐরূপ হইত।

অমিয় লজেন্স চুষিতে চুষিতে বলিল, "কাপ্তেন

, এ ভাল লাগছে না। তুমি পেয়ারা পেড়ে খাও, ড পেয়ারা খেতে ইচ্ছে করছে।"

অরুণ হাসিয়া বলিল, "তা দিচ্ছি, কিন্তু তুই মায় কি দিবি বল্?"

অরুণ গাছে চড়িয়া পেয়ারা পাড়িতে লাগিল। মিয় বলিল, "তোমায় দেবো? আচ্ছা, দিদি লেটে যে সিংহবাহিনী বুনেছে, সেইখানা তোমায় বো।"

অরুণের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল; সে বলিল, কান খানা রে? এখানা কবে বুনেছে?"

"ঐ কালীদমনখানা বোনা হচ্ছিল দেখেছো ? সেখানা শেষ করে এখানা ধরেছে, প্রায় শেষ য়ে এল।"

অরুণ গাছ হইতে নামিয়া আসিয়া অমিয়কুমারের ার্শ্বে উপবেশন করিল এবং পেয়ারা চিবাইতে চিবাইতে বলিল—

"হাঁরে অমি! সত্যি বলছিস দিবি?"

"মিথ্যে কখনও বলি?"

"না, তা বলিস নি বটে। কি চমৎকার তোর দিদি বোনে!"

"যারে! শুধু বুঝি বোনে? সেলাইটা বুঝি ভুলে গেল? কেমন সিল্কের পাঞ্জাবী সেলাই করে দিয়েছে, দেখেছ ত'?"

"হাঁ, দেখেছি। হাঁরে—"

"আচ্ছা, কাপ্তেন দা! দিদি কি আর জন্মে রুরী ছিল? হাঃ হাঃ হাঃ। শুধু দরজী না, ামুনীও ছিল।"

"কেন বল দেখি?"

"কেন? দিদির হাতের রান্না খাওনি? সেদিন জেঠামণি রাধাবল্লভী খেয়ে বল্লেন, কখনও এমন ান নি। হাঁ কাপ্তেন দা, দিদি এখন এখন তোমার উপর এত রেগে রয়েছে কেন?"

অরুণের মুখের হাসি অন্তর্ধান করিল, বালকের মুখে এই কথা শুনিবামাত্র তাহার মুখে চিন্তারেখা ফুটিয়া উঠিল। সে উৎকণ্ঠিতস্বরে জিজ্ঞাসিল, "কেন রে, রেগে রয়েছে কেন রে?"

"হাঁ রেগে রয়েছে আমি ঠিক বুঝতে পারি, দিদি কখন রাগে, কখন হাসে।"

"কেন বল্ দিকি? আমি কি করেছি যে রেগে থাকবে?"

"কি জানি কেন। তবে সেদিন কথা হচ্ছিল, তোমাদের থিয়েটার নিয়ে। তুমি নেশা করে কাদের ঘাড়ে সিন্ ফেলে দিয়েছিলে?"

অরুণ হাসিয়া বলিল, "আমি নেশা করেছিলুম? যাক্, এ গল্প কে বল্লে?"

"তা জানি নি। তবে জেঠামণিতে আর বাবাতে ঐ কথা হচ্ছিল, আমরা সেখানে ছিলুম।"

"সরোজ ছিল না?"

"না, সরোজ দা তখন তোমাদের ক্লাবে গিয়েছিল। কাপ্তেন দা, তোমার দুটী পায় পড়ি, তুমি নেশা কোরো না। নেশা নাকি ছোটলোকে করে?"

অরুণ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "তুইও যেমন পাগল! আমি কি নেশা করি? তবে ভদ্রলোকে নেশা করে না, এমন কথা বল্তে পারি নি।"

"তবে লোকেদের ঘাড়ে সিন ফেলে দিলে কেন?"

"নেশাও করি নি, সিনও ফেলি নি, ও কথা কোত্থেকে উঠ্লো জানি নি।"

"দেখ, দেখ, কাপ্তেন দা, ঐ বকুল গাছের ডালে কাদের একটা চন্না এসে বস্লো, পায়ে শেকল বাঁধা রয়েছে। ওটাকে ধর না, কাপ্তেন দা।"

"পাগল! গাছে উঠ্লেই ওটা উড়ে পালাবে, ওকে কি ধরা যায়?"

"না, না, ধরা যায়। তুমি ধরে যাও না। ঁ, হুঁ, তুমি গাছে উঠবার ভয়ে বল্ছ উড়ে পালাবে।"

অরুণ আর কিছু না বলিয়া মৃদু হাসিয়া বকুল গাছে চড়িল এবং অতি সন্তর্পণে পাখীর দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার সঙ্কেতানুসারে অমিয় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল এবং নির্নিমেষ-নয়নে পাখীর দিকে চাহিয়া রহিল।

অরুণ পাখিটাকে ধরিয়াছে, পাখিটাও ক্যাঁ ক্যাঁ করিয়া ডানা ঝাড়া দিয়াছে, অমিয় দুই হাত জোড় করিয়া ঊর্দ্ধমুখে হর্ষবিস্ফারিতনয়নে পাখীর পানে হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে, এমন সময় হঠাৎ কমনীয় কণ্ঠে ডাক পড়িল, "অমি!" অরুণ ও অমিয় সেই ডাকে চমকিয়া উঠিল, পাখীটা অরুণের কবল হইতে মুক্তি পাইয়া আকাশে উড়িয়া গেল।

যে ডাকিল, সে অনিলা। সে গাড়ী হইতে নামিয়া অমিয়কুমারের খেলার দ্রব্যগুলি লইয়া এক দৌড়ে ঘরে আসিয়া দেখিল, অমিয় সেখানে নাই। অমিয় বাগানে গিয়াছে এই কথাটি মাত্র শুনিয়াই সে আর কাহারও অপেক্ষা না করিয়া এক ছুটে বাগানে আসিল। এদিক ওদিক খুঁজিয়া সে যখন অমিয়কে দেখিতে পাইল, তখন তাহাকে ভয়ানক রকমের বকুনি শুনাইয়া দিবে বলিয়া ডাকিল, "অমি!"

অনিলার দৃষ্টি অমিয়কুমারের উপরে ছিল। কিন্তু যখন পাখীটা ঝট পট শব্দ করিয়া আকাশে উড়িয়া গেল, তখন সে ঊর্দ্ধমুখে চাহিবামাত্র গাছের ডালে অরুণকে দেখিল। অরুণকুমারকে সেই অবস্থায় গাছের ডালে দেখিয়া অনিলার ক্রোধের ভাব কোথায় অন্তর্ধান করিল, সে কিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। অরুণকুমার নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় কাচুমাচু মুখে গাছের ডাল হইতে নামিয়া আসিল। ভিতরের চাপা হাসিতে অনিলার মুখ বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইলেও যথাসাধ্য হাসি দমন করিয়া অমিয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কি বলে দিয়েছিলেন ডাক্তার বাবু? একটী কথাও শুনতে নেই? দুষ্টু কোথাকার, যা, ডোকে কিছু দেবো না, যা এনেছি সব পাড়ার ছেলেদের বিলিয়ে দেবো।"

অমিয় উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু অরুণ তাহার মুখের কথায় বাধা দিয়া বলিল, "অমিয় কিছু দোষ নেই, নিলা। ও ঘরে শুয়েছিল, আমিই ওকে বাগানে এনেছি। দোষ আমারই।"

অনিলা অমিয় মাথায় হাত রাখিয়া অমিয় দিকে চাহিয়াই বলিল, "কেন আনলেন? যদি কিছু অপকার হয়, তা হ'লে ডাক্তারবাবুকে কি জবাব দেবেন?"

অরুণ কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। আজ বৎসরাধিক যাবৎ সে দেখিতেছে, অনিলা তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করে না। আগে সে তাহাকে দেখিলেই ছুটিয়া আসিয়া হাত ধরিয়া অমিয়কুমারেরই মত কত আবদার অভিমান করিত, সমবয়সের মত তাহাকেও দাদা বলিয়া ডাকিত, তুমি বলিয়া সম্বোধন করিত, আর আজ এক বৎসর যাবৎ এ কি ভাব? সে তাহাকে সম্বোধন করিয়া ত' কথাই কহে না, জিজ্ঞাসা করিলে কথার উত্তর দেয় মাত্র। আবদার অভিমান ত' করেই না, পরন্তু নিতান্ত পরের মত তাহাকে "আপনি, মহাশয়" বলিয়া কথা কয়। এখন প্রায় সকল বিষয়েই সে তাহার উপর বিরাগ, অসন্তোষ ও ক্রোধের ভাব দেখায়। কি জানি কেন এমন হইল!

এখন অনিলার প্রশ্ন শুনিয়া অরুণ ক্ষুণ্ণচিত্তে জবাব দিল, "ডাক্তারবাবু এসে জিজ্ঞাসা করলে তাঁর জবাব তাঁকে দেব। তবে তুমি জিজ্ঞাসা কর যদি, তা হলে আমার জবাব এই যে, ডাক্তারবাবুকে ডেকে আমি আনাই নে আপনার, কাজেই তার যা'তে অপকার হয়, তা আমি করি নি।"

অনিলা কোন জবাব দিল না, তাহার নির্নিমিষ নয়ন-পল্লবও মনোভাব কিছুই ব্যক্ত করিল না। সে কেবল অমিয়কুমারের হাত ধরিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল, অরুণও তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিল।

অমিয় হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে দিদির হাত ধরিয়া চলিল। যাইতে যাইতে সে বলিল, "কি এনেছ দিদি? এই দেখ, কাপ্তেনদা কত কি দিয়েছে। জান দিদি, কাপ্তেনদা আমায় পেয়ারা পেড়ে দিয়েছে। এত পেয়ারা খেতে ইচ্ছে হয়েছিলো তোমায় কি ব'লব! আবার আমার জন্যে চয়না ধরতে বকুলগাছের ঐ আগ ডালে উঠেছিলো। না, কাপ্তেন দা?"

অমিয় এই কথা বলিয়া অরুণের দিকে চাহিবামাত্র "ইস্!" করিয়া উঠিল। সে দৌড়িয়া অরুণের নিকটস্থ হইয়া অরুণের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ভীত স্বরে বলিল, "ও কি হয়েছে কাপ্তেন দা! হাত দিয়ে হু হু করে রক্ত পড়ছে যে। চয়নাটা কামড়ে দিয়েছে বুঝি? ও দিদি, ও দিদি, দেখ না রুমালটা রাঙ্গা হয়ে উঠেছে।"

অরুণকুমার যত হাত লুকাইবার চেষ্টা করে আর চোখের ইসারা করিয়া অমিয়কে চুপ করিতে বলে, অমিয় ততই উৎকণ্ঠিত হইয়া দিদিকে ডাকে। হঠাৎ অনিলার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সেও চকিত-নেত্রে অরুণের হাতের দিকে তাকাইয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "কি হয়েছে, সত্যিই পাখী হাত কেটে দিয়েছে? আসুন না ভিতরে, জল-পটী দিলে সেরে যাবে এখন।" অনিলা দ্রুতপদে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল।

অরুণ হাসিয়া বলিল, "দূর, ও কিছু নয়। দেখি অমি, কি খেলনা এনেছে তোর জন্যে?"

হল-ঘরে রামসদয় বাবু সরোজনাথের সঙ্গে বাজার হইতে আনীত দ্রব্যাদি গোছগাছ করিতে-ছিলেন। মানুষের পদশব্দে চমকিত হইয়া চোখ তুলিয়া চাহিতেই তিনি অনিলাদের দেখিতে পাই-লেন। অমনই তিনি হর্ষভরে বলিয়া উঠিলেন, "এই যে নিলা, এই যে অমি! আমি বলি কোথায় গেল।" এই অবধি বলা হইলে পর যেমন তাঁহার দৃষ্টি অরুণের উপর নিপতিত হইয়াছে, অমনই তাঁহার বাক্যস্রোত রুদ্ধ হইল, মুখমণ্ডল গম্ভীরভাব ধারণ করিল। সরোজ অরুণকে দেখিবাই এক গাল হাসিয়া এক লম্ফে তাহার নিকটস্থ হইল এবং তাহাকে একবারে জড়াইয়া ধরিয়া হর্ষভরে বলিয়া উঠিল, "কি জান রেখেছিস্ কাল তুই ভাই! ভাগ্যে তুই ছিলি! না হলে মাতাল গোরাগুলো কি অত্যাচারই ক'রত।" রামসদয় ও অনিলার বিস্ফারিতনেত্র সরোজের উপর নিপতিত হইল। সরোজের এই অকপট আন্তরিক প্রশংসাবাদে অরুণের মুখচোখ লাল হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি বলিল, "হাঁরে, কি আনলি দেখি? ওটা কি—মোটর কার? বেশ ত'! দেখ্ দেখ্, অমি! কেমন কল টিপলে ঘর ঘর ক'রে সারা টেবিলময় ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়।"

এই সময়ে অনিলা জল-পটী আনিল, সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃষ্টি অরুণের হাতের দিকে পড়িল। অরুণ হাতের অবস্থা গোপন করিবার চেষ্টা করিলেও রক্তের ধারা লুকাইতে পারিল না। রামসদয় বাবু ও সরোজ উভয়ে ব্যস্ত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সকল কথাই অমিয়ের মুখে শুনিলেন। সরোজ সমবেদনা জানাইল, অনুযোগও করিল, কিন্তু রামসদয় বাবু হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিলেন, "দেখ, অনেক দিন থেকে একটা কথা ব'লব বলে মনে করছি। কথাটা অবশ্য আমার বলবার অধিকার আছে বলেই বলছি, কেন না বাবাজী কালীশঙ্করের পুত্র।"

সকলে চমকিত হইল, কেবল বিস্মিত হইল না অরুণ নিজে। সেও বড় কাকার সহিত এই ভাবের-একটা আলাপের জন্য কয়েকদিন হইতে প্রস্তুত হইয়াছিল। সেদিন অমিয়কে জল হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া সে কথা পাড়িতে পারে নাই। সে পিতার প্রমুখাৎ তাহার সম্বন্ধে রামসদয় বাবুর মনোভাব অবগত হইয়া ঐ সম্বন্ধে একটা নিঃসন্দেহ বোঝাপাড়া

করিতেই আসিয়া ছিল। সুতরাং আজ রামসদয় বাবু স্বয়ং উপযাচক হইয়া কথা পাড়িতেই সে বলিল, "কি বলতে চান বলুন। যখন আমায় লক্ষ্য করেই কথাটা পাড়লেন, তখন সম্ভবতঃ কথাটা আমারই সম্বন্ধে।"

"হাঁ, তোমারই সম্বন্ধে। দেখ অরুণ! তুমি আমার পুত্রের সমান, সুতরাং তোমার ভাল [illegible] দেখা আমার কর্ত্তব্য ব'লে মনে করি। তোমার পিতা স্নেহবশতঃ তোমার দোষ অপরাধ নিয়ত ক্ষমা ঘৃণা করলেও আমি পারি নি। তাই বলছি, চিরকালটা কি এমনই ক'রে কাটাবে মনে করেছ?"

অনিলা ও সরোজ অমিয় কুমারের খেলনার জিনিষ সাজাইতেছিল, প্রশ্নের ভঙ্গী শুনিয়া চমকিয়া দাঁড়াইল। তাহারা এমন ভাবে রামসদয় বাবুকে কখনও প্রশ্ন করিতে শুনে নাই।

অরুণ বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া সরল অকপট ভয়লেশহীন কণ্ঠে বলিল, "কি ভাবে কাল কাটাচ্ছি বলুন। আমি কি কোন মন্দ কাজ করেছি?"

"একটা? এমন হ'শ মন্দ কাজ করেছ।"

অরুণ চমকিত হইল, অনিলা এটা ওটা সেটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল, সরোজের মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে হঠাৎ অগ্রসর হইয়া অরুণের হাতখানা নিজের বাহু মধ্যে ধারণ করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "অরুণ মন্দ কাজ করেছে, এ আমি চোখে দেখলেও বিশ্বাস করতে পারিনি। এই সবে কাল—"

রামসদয় বাবু বাধা দিয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "থাম সরোজ, তোমার সঙ্গে কথা হচ্ছে না। তোমার শুনতে ইচ্ছে না হয়, এখান থেকে চলে যাও। আমি কাউকে আমার কথার প্রতিবাদ করতে দেব না।"

সরোজ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, "আপনার কথার প্রতিবাদ করব, এমন স্পর্দ্ধা আমার নাই। তবে বলছিলুম এই যে ফুটবল খেলতে বা থিয়েটার করতে মন্দ কাজ করা হয়, এটা আমি বুঝতে পারি নি। রামসদয় বাবু বলিলেন, "তুমি বুঝতে না পার তাতে এসে যায় না। এখন ঘরে থেকে চলে যাবে, না চুপ করে বসে শুনবে?"

পিতার অংসোপরি হস্তার্পণ করিয়া অনিলা এই সময়ে বলিল, "বাবা তুমি রেগে যাচ্ছ কেন? সরোজ দা ত ঠাট্টা ছলে কথা কচ্ছে।" রামসদয় বাবুর মুখ লাল হইয়া উঠিল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কে রেগেছে, আমি? আমার মত ঠাণ্ডা মেজাজে তোমরা কখা কও দেখি।"

অরুণ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "আঃ সরোজ, তুই চুপ কর না। দোষ করলে আমায় বকবেন না? এতে কথা কাটাকাটি করিস কেন!"

রামসদয় বাবু আবার বলিতে লাগিলেন, "এই আজ গাছে উঠে পাখী ধরতে গিয়ে হাতটাকে জখম ক'রে ফেল্লে, এ ছেলে মানুষী করবার কি তোমার বয়েস আছে? সংসারে ঢোকবার সময় হ'ল, বাপকে ত' একটু বিশ্রাম দিতে হয়, সে কি চিরদিনই খাটবে, আর তুমি খেলাধূলো ক'রে কাটিয়ে দেবে?"

অরুণ বিনীতভাবে বলিল, "না, তা করা উচিত নয়। তবে আমায় কাজে লাগিয়ে দিন না? দেখুন না চেষ্টা করে, আমিও চেষ্টা করি।"

সরোজ হর্ষভরে উত্তেজিতস্বরে বলিল, "ওঃ অরুণ কাজ করতে পারে না? কালেজের থিয়েটারের দিন কুলি পাওয়া যায় না, আমরাও সব ষ্টেজ খাটাচ্ছিলুম। অরুণ সেই প্রকাণ্ড সাজের বাক্সটা গাড়ী থেকে একলা নামিয়ে ঘাড়ে করে ষ্টেজে নিয়ে গেল। ও আবার কাজ পারে না! বাঃ।"

রামসদয় বাবু সরোজের কাজের আইডিয়া দেখিয়া আর গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না, হাসিয়া ফেলিলেন। তাঁহার হাসিতে সকলেই যোগদান করিল। সুযোগ পাইয়া অমিয়কুমার বলিয়া উঠিল. "কাপ্তেন দাদা ফুটবলে কাষ্ট, ক্রিকেটে কাষ্ট, জিমনাষ্টিকে কাষ্ট, সুইমিংয়ে কাষ্ট, রোয়িংয়ে কাষ্ট,—"

সকলে হো হো হাসিয়া ফেলিল, কক্ষের গাম্ভীর্য্য একবারে ভঙ্গ হইয়া গেল। অনিলাও হাসি চাপিতে না পারিয়া মুখ ফিরাইয়া অন্যত্র ব্যাপৃত রহিবার ভাণ করিল। কিন্তু ক্ষণ পরে রামসদয় বাবু একটু কঠিন হইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "না, তামাসা না, যথার্থই বলছি অরুণ এখন থেকে মানুষের মত মানুষ হতে চেষ্টা কর। ভাল কথা, সরোজ তোমাদের এমেচার থিয়েটারের কথা বলছিল না এইমাত্র? তা শুনলুম, সেদিন সিন ঘাড়ে ফেলে দিয়ে দুটো লোককে খুন করবার যোগাড় করেছিলে? লোকে বলে, তুমি সে দিন নেশাভাঙ্গ না কি করেছিলে?"

অরুণ জবাব দিবার পূর্ব্বেই সরোজ অভিমানাহত স্বরে বলিল, "অরুণ নেশাভাঙ্গ করেছিল? এ সব মিথ্যে কথা রটায় কে? আপনি এসব কথা বিশ্বাস করেন, এই দুঃখু।"

অরুণ বলিল, "বয়ফ লেমনেড খেলে যদি নেশা করা হয়, তা হলে নেশা করেছিলুম, না হলে করি নি।"

সরোজ তাহার কথা শেষ হইতে না দিয়া বলিল, "আর সিনের নীচে চাপা পড়া মানুষকে টেনে বার করে প্রাণ দেওয়াকে যদি সিন চাপা দেওয়া বলেন, তাহলে অরুণ সিন চাপা দিয়েছিল! আপনি বলছেন কি! এই সেদিন চোখের সামনে কি করে অমিয়কে জল—"

অরুণ অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া অনিলাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তোমার হাতে ওটা কি'নিলা? বাঃ ব্যাট খানা বেশ ত'! আমি খেল্‌বি, আমার সঙ্গে?"

রামসদয় বাবু হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, খেলবার ঝুটিটি বেশ পেয়েছ বটে!"

অনিলা তাহাতে সায় দিয়া বলিল, "বিশেষ যখন ডাক্তার বাবু সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছেন।"

সরোজ ও অরুণ এইবার বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। রামসদয় বাবু ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ অরুণ, ছেলেমানুষি পাগলামি গুলো ছেড়ে দিয়ে একটু একটু ক'রে কাজে ঢুকতে শেখ। অবশ্য লেখাপড়া যদি ঠিক ক'রে যেতে, তা হলে বলতুম না। কিন্তু পড়বোও না, অথচ নিষ্কর্ম্মা হয়ে খেলাধূলোয় কাল কাটাব, এটাও ভাল না। জানইতো ইংরেজীতে বলে 'অলসতা যত দুষ্কর্ম্মের প্রসূতী!' তোমাদের মত বয়সে আমরা যথেষ্ট সংসারী হতে শিখেছি।"

অরুণ মাথা হেঁট করিয়া জবাব দিল, "যে আজ্ঞা।"

রামসদয় বাবু আবার বলিলেন, "যে আজ্ঞা না। শুধু ঐ কথাটা বলে কাটিয়ে দিলে চলবে না। আজকাল দেখতে পাই, আমাদের দেশের ছেলেরা একবারে বাবু হয়ে পড়েছে। সহজে যদি কোনও রূপে তাদের পেটের গর্ত্তটি ভরে, তা হলে তারা তার উপযুক্ত পরিশ্রম ছাড়া আর অধিক কিছু করতে চায় না। এই জন্যে নির্ভাবনার বাঁধা চাকুরী ছাড়া তাদের আর কিছুতে মন বসে না। যাতে শ্রমের দরকার, যাতে মাথার দরকার, যাতে দেশের নূতন ধনাগমের উপায় হয়, তাতে তারা যেঁষে না। তাই তাদের হাত থেকে পূর্ব্বেকার বেনিয়ানি, সিপ সরকারী, মুচ্ছুদ্দিগিরি প্রভৃতি খসে পড়ছে। ফলে মাড়োয়ারি, কচ্ছি, গুজরাটী, সিন্ধি, ভাটিয়া সব ব্যবসায়ের প্রবেশ-পথ গুলো দখল করে বসছে। তোমার বাপের পয়সা আছে স্বীকার করি; তোমার পয়সা উপায়ের আবশ্যক নেই, এ কথাও স্বীকার করি। কিন্তু তা হলেও তুমিও ত মানুষ! মানুষ হয়ে মানুষের মত হবে না কেন, বাপের পয়সায় খাবে কেন? বরং বাপের পয়সা বাড়িয়ে নিজের রোজগারে দেশের মঙ্গল সাধন কর। কত কাজ রয়েছে।"

অরুণ আবার বিনীতস্বরে বলিল, "মা, বাপের পয়সায় খেয়ে জীবন কাটান উচিত নয় বটে।"

রামসদয় বাবুর বক্তৃতাস্রোতের বিরাম নাই।

তিনি বলিলেন, "শুধু খাওয়া নয়, বাপের পয়সায় বাবুয়ানি। এই দেখ দেখি বাপু, তোমাদের কালেজের থিয়েটারে এবৎসর তুমি দুহাজার টাকার পোষাক করে দিয়েছ। বল দেখি, টাকাটা কোথা থেকে এসেছে? তোমার বাপ কি মাথার ঘাম পায় ফেলে এই পয়সাটী উপায় করে নি? তুমি খরচ করলে, কিন্তু দোকানদার বিল দেবে তোমার বাবার হাতে। তোমার বাপ অবশ্য তার আলাদের ঘরের দুলালের জন্য অম্লানবদনে সে টাকাটা দিয়ে দেবে; কিন্তু বল দেখি, এ পয়সাটা এমন ভাবে খরচ করা কি তোমার উচিত হয়েছে? যা হয় সয় তাই করা উচিত নয় কি? দেখব, যখন নিজে পয়সা উপায় করবে, তখন কেমন এই ভাবে বাজে কাজে সেই পয়সাটা উড়িয়ে দেও!"

সরোজ হঠাৎ বলিল, "আর অরুণ যখন পৃথিবীর গরীব দুঃখীর জন্যে—"

অরুণ বাধা দিয়া বলিল, "দেখুন বড়কাকা, ওটা বাজে বলছেন, কিন্তু আপনি যদি হতেন তা হলে পোষাকটা না দিয়ে থাকতে পারতেন না। না দিলে থিয়েটারই মাটী হয়ে যেতো। পোষাকটা পেয়ে ক্লাবের আহ্লাদ যদি দেখতেন!"

রামসদয় বাবু হাসিয়া ফেলিলেন, অনিলাও লুকাইয়া হাসিল। রামসদয় বাবু ভাবিলেন কাকেই বা বোঝাচ্ছেন! ইনকরিজিবল্ (শোধরাবার নয়)! অনিলা মনে মনে কি বলিল তা সেই জানে। কেবল সরোজ অরুণের কথাটা ভাল ভাবে লইয়া বলিল, "পাঁচশোবার! অরুণ পোষাক দিয়ে ক্লাবের কি উপকার করেছিলো, তা আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না। তখন ক্লাবের হাতে একটী পয়সা ছিল না, পার্মানেন্ট ষ্টেজ করতেই সব টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিলো, অথচ স্বয়ং সভাপতি আসছেন দেখতে, পোষাক না জুটলে দাঁড়িয়ে অপমান হ'তে হ'ত আর কি!"

রামসদয় বাবু বলিলেন, "থাম, থাম, তোমায় আর ওকালতি করতে হবে না। যত হয়েছে বাবুর দল! কেবল থিয়েটার, ফুটবল, ক্রিকেট নিয়েই আছে! এতে কার কি উপকার হচ্ছে? কাজের ত' একটাও না। দেখে এলো দেখি মাড়োয়ারী গুজরাটীদের। বাবু হ'বার আগে কি পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার ক'রে ওরা পয়সা উপায় করে! কোথায় দার্জ্জিলিঙ্গের ভুটিয়াবস্তি, সেখানে বাঙ্গালীর দিনের বেলা যেতে ভয় করে, তার ভিতরে গিয়ে মাড়োয়ারীর ছেলে মুদিখানা করেছে, কাপড়ের দোকান করেছে। কোথায় ময়ূরভঞ্জের কাণা জঙ্গল, বাঘ ভালুক স্বচ্ছন্দে দিনের বেলা চরে বেড়াচ্ছে, সেখানে গিয়ে মাড়োয়ারীর ছেলে খটী করেছে, সেখান থেকে ঘরতুকি, মোম, মধু চালান দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করছে। আর আমাদের ছেলেরা? কেবল পাশের উপর পাশ করে সেই বিদ্যের অপব্যবহার করছে। তারা লেখাপড়া শিখছে কেবল উকীল মোক্তার হয়ে দেশের লোকেরই অর্থ শোষণ করতে, বেশ আরামে চেয়ারে বসে পাখার বাতাস খেয়ে কলম পিস্‌তে। কি ক'রে সেই বিদ্যে খাটিয়ে বাইরের পয়সা দেশে এনে পুরতে হয়, কি ক'রে দেশকে বড় করতে হয়, দশের কাছে গণ্য মান্য করতে হয়, তা তারা একবারও ভাবে না। ভাব্‌বেই বা কি ক'রে? কেবল খেলাধূলো বা কেবল লেখাপড়া নিয়ে থাকলে ওদিকে ভাববার সময় হবে কখন? দেশে দুচার জন শুধু বিদ্যে নিয়ে থাকুক, কিন্তু তা ব'লে সকলেই তা করলে চলবে কেন?"

সরোজ। এই আপনি অরুণকে লেখাপড়া করে না ব'লে কত কি বলেন, আবার বলছেন লেখাপড়া নিয়ে থাকলে চলবে কি করে! বাঃ!

রামসদয়।—ঠিকই বলেছি, কিছু ভুল বলি নি। দেখ, আজ কাল যে সব জাত পৃথিবীর মধ্যে [illegible] স্বাধীন, ধনবান, শক্তিমান ও গরীয়ান ব'লে গণ্য, তাদের মধ্যেও লেখাপড়া বা খেলাধূলোর আদর

যাছে বটে, কিন্তু সে দুটো তারা means to an end (মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের উপায়) ব'লে গণ্য করে, মুখ্য উদ্দেশ্য ব'লে ধরে না। তারা ধনার্জ্জনকেই মুখ্য উদ্দেশ্য ব'লে ধরে।"

অনিলা এইবার কথা কহিল, সে বলিল, "এ কথায় তোমার সঙ্গে শুবিধের মতের মিল হচ্ছে না, বাবা। মহাভারতের সভাপর্ব্বে ভীষ্ম শিশুপালের কটুনিন্দার জবাব দিতে গিয়ে বলেছিলেন 'ব্রাহ্মণদের মধ্যে জ্ঞানবৃদ্ধ লোকে সকলের পূজো পান; সেইরূপ ক্ষত্রিয়দের মধ্যে শক্তিমান পুরুষ, বৈশ্যদের মধ্যে ধনবান লোক, আর শূদ্রদের মধ্যে বয়সে বড় লোক সকলের পূজো পেয়ে থাকেন।' কিন্তু তুমি যা ব'লছ, তাতে দেখছি কেবল বৈশ্যদেরই পূজো পাবার কথা, আর সবাই ভেসে যাক্! বাঃ! জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য কি কেবল পয়সা রোজগার করা? এ আদর্শ আমাদের দেশে কোনও কালে ছিল না।"

অরুণ ও সরোজ উভয়ে অবাক হইয়া অনিলার কথা শুনিতেছিল, অমিয় বিশেষ কিছু বুঝিতে না পারিয়া সকলের মুখের দিকে ক্যাল্ ক্যাল্ চাহিয়া দেখিতেছিল। রামসদয় বাবু কথাটা শুনিয়া বলিলেন, "দূর পাগলি! উদ্দেশ্য আর আদর্শে আকাশ পাতাল তফাৎ, তা কি জানিস নি? আদর্শ আমাদের সাত্ত্বিক জীবনযাপন করা, আর উদ্দেশ্য ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় অন্বেষণ করা। তবে সংসারী হয়ে পুত্রপরিবার নিয়ে সংসারে থাকতে হলে এই আদর্শ ও উদ্দেশ্য মনে রেখেও জীবনসংগ্রামে জয়ী হবার জন্যে অনেক পরিশ্রম অনেক কষ্ট সহ্য করে ধনার্জ্জন করতে হয়, না হ'লে অবনত ও পরের মুখাপেক্ষী হতে হয়।"

সরোজ বলিল, "আপনাদের ও সব বড় বড় তর্ক আমাদের পক্ষে বোঝা কঠিন। তবে অনিলা যা বললে, তাতে মনে হয়, আমাদের দেশের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের শিক্ষা ভিন্নরূপ হ'লেও আপনি আমাদের দেশে খাঁটি বৈশ্য-মুনসটা রাখতে চান, আর সব উঠে গেলেও ক্ষতি নেই, কেমন, না?"

রামসদয় বাবু ঈষৎ উষ্ণ হইয়া বলিলেন, "বাঃ আমি কি তাই বলেছি? তোমরা যদি বুঝতে না পেরে আমার কথার অনর্থ কর, তার জন্যে কি আমি দোষী? ধর, তোমরা যাকে বৈশ্য মুখ ব'লে এত ঠাট্টা করছ, সেই মুনসই না হয় পৃথিবীতে এসেছে। যাকে ঐহিক উন্নতি ব'লে জান, সেই উন্নতিতে যে সব জাত আজ অগ্রণী, তারা কি ভাবে জীবনযাপন করছে? অবশ্য পারমার্থিক উন্নতির কথা ধরছি না, তা গোড়াতেই বলে দিয়েছি। তাতে যাঁরা উন্নতিলাভ করেছেন, তাঁরা এদেশেই কি আর বিদেশেই কি, সংসারের সুখ দুঃখ নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামান না। বেশীরভাগ লোকই ঐহিক উন্নতির চেষ্টায় ঘুরে থাকে। সে উন্নতির সংগ্রামে আমরা কোথায় পড়ে আছি? প্রথমে ধর, জ্ঞানের কথা। ভীষ্ম বলেছিলেন, ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁরা জ্ঞান বৃদ্ধ তাঁরা জগতের পূজো পেয়ে থাকেন। এখানে জ্ঞান অর্থে ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া ঐহিক লেখাপড়াটাকেও ধরতে হবে। আচ্ছা, এই জ্ঞানার্জ্জনে বা জ্ঞানের সদ্ব্যবহারে আমরা কতটা অগ্রসর হচ্ছি?"

অনিলা বলিল, "কেন, এদেশের লোকে কি লেখাপড়াতে উন্নতিলাভ করছে না?"

রামসদয় বাবু বলিলেন, "বিন্দুমাত্রও না। একটা স্যার জগদীশ বা একটা স্যার প্রফুল্লতে দেশের জ্ঞানার্জ্জনের পরিচয় পাওয়া যায় না। এই রকম শত শত লোক চাই। আবার তাঁদের জ্ঞানের সদ্ব্যবহারের জন্যে একটা টাটার কি একটা স্যার রাসবিহারীর ধন ভাণ্ডার মুক্ত হ'লে চলে না, এই রকম শত শত টাটা রাসবিহারী চাই। উন্নতিশীল জাতিদের দেশে দেখ, শত শত ওয়াটস, ফ্যারাডে, এডিসন জন্মাচ্ছে। জ্ঞানের বলে তাঁরা জগতের কত উপকার সাধন করেছেন ও করছেন, তা ত' দেখতেই পাচ্ছ। জীন আর ইলেকট্রিসিটির দ্বারা

তাঁরা দূরকে নিকট করছেন, মানুষকে সভ্য করছেন। নিত্য নতুন আবিষ্কার হচ্ছে, আজ টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, কাল গ্রামোফোন বায়স্কোপ, পরশু রেল মোটর, কত কি সৃষ্টি হচ্ছে। এ সবে কত কোটী কোটী লোকের অন্নসংস্থান হচ্ছে, তার খবর রাখ কি ?"

সরোজ বলিল, "হাঁ, তা সত্যি বটে, কিন্তু ওদের দেশের সর্ব্বনেশে লেখার ক্যাপিটালের ঝগড়া বা সোস্যালিস্‌ম্ নিহিলিস্‌ম্ হ'তে আমাদের দেশ অব্যাহতি পেয়েছে তো। তাই ঢের লাভ।"

রামসদয় বাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "নাও, হচ্ছিল কি কথা, এনে ফেল্লে কি! হাঁ, কি বলছিলুম ? বিজ্ঞানের সাহায্যে শুধু যাতায়াতের বা ব্যবসার বাণিজ্যের সুবিধে হয় নি, সব তাতেই হয়েছে। কোনটা রেখে কোনটা ব'লব ? কৃষি, খনি, কারিগরি, শিল্প, ভেষজ, অস্ত্র চিকিৎসা, সেবা-শুশ্রূষা, বিদ্যাশিক্ষা, সঙ্গীত, আমোদপ্রমোদ,—কিসে বিজ্ঞানের মঙ্গল হস্তস্পর্শ না হয়েছে ? আর তাতে জগতের কত উপকার হয়েছে! আমাদের ছেলেদের সেইভাবে লেখাপড়া শিখে বিজ্ঞানের সদ্ব্যবহার করবার সুযোগ দেওয়া হয় কি ?"

সরোজ বলিল, "সেটা কার দোষ ? ছেলেদের দোষ কি ?"

রামসদয় বাবু বলিলেন, "না, তা বলি নি। এ বিষয়ে তাদের দোষ দিতে পারি নি। সুযোগ ও সুবিধা না পেলে তারা কি ক'রে শিখবে ? কিন্তু ছেলেদের যে একেবারে দোষ নেই, তা বলতে পারি নি। একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি। অরুণ বোধ হয় জান, নেত্যকে ? তোমাদের বাড়ীতে যে দিন কতক ছিল গো। তোমার বাপ সই সুপারিস ক'রে সেই বুধু ছেলেকে জন কিংয়ের বাড়ী সেড্‌এপ্রেন্টিস ক'রে দিয়েছিল। জান তু' তখানে কিরিঙ্গি ভিন্ন নেয় না। কেবল তোমার বাপের খাতিরে সাহেবরা নেত্যকে নিয়েছিল। কিন্তু দুচারদিন কোটপ্যাণ্ট এঁটে জাহাজের ডীন পাতের উপর দেয়েক বসাতে গিয়ে নেত্যর জিব বেরিয়ে গেল, হাতুড়ি পিটে গোপালের হাতে ফোস্কা পড়ল, সে পালিয়ে আসতে পথ পেল না। তার পরে তোমার বাপ তাকে এক ফুট প্রেসে ১৫৲ টাকা মাহিনার সরকারি ক'রে দিয়েছে। তাতে সে মহা আনন্দে আছে, পম্প শু পরছে, আদ্ধির পাঞ্জাবী প'রে ছড়ি ঘুরিয়ে সন্ধ্যার পর হাওয়া খেতে বেরুচ্ছে; মরবার সময়ে মেরে কেটে মাহিনা বেড়ে টাকা বাট হ'তে পারে; অথচ জন কিংয়ের বাড়ী টিকে থাকতে পারলে তার কালে সাত আটশো বা হাজার টাকা মাহিনা হ'তে পারত। আসল কথা কি জান, আমাদের ছেলেরা খাটতে চায় না, কষ্ট সহ্য করতে চায় না। তা না হ'লে আজ সব জাত তাদের পেছিয়ে রেখে আগে চলে যাচ্ছে কেন ?"

অরুণ বলিল, "লেখাপড়ায় কম্পিটিশনে ত' পারে না। আসুক না আমাদের সরোজের সঙ্গে, হাঁ!"

সরোজ ও অনিলা তাহার কথার ভঙ্গী শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল; কিন্তু রামসদয় বাবু গম্ভীর হইয়া জবাব দিলেন, "ও পুঁথিগত লেখাপড়া নিয়ে তোমরা ঘুরে খেয়ো, মাড়োয়ারী গুজরাটী কাটিয়ারা মুখ্যু থেকেও গাড়ী জুড়ি হাঁকিয়ে বেড়াক।"

এই সময়ে বালক অমিয় হো হো হাসিয়া বলিল, "ওঃ কাপ্তেনদার যেন গাড়ী জুড়ী নেই! হোঃ হোঃ হোঃ! কাপ্তেনদা, কাল তোমার সেই টাট্টু ঘোড়াটা আনবে, আমি চ'ড়ব ? ঐ যে ঘোড়াটা তোমার রেলিকার্টে জোত ?"

অরুণের উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই রামসদয় বাবু বলিলেন, "হাঁ, তোমার অরুণদার গাড়ী জুড়ীর অভাব নেই বটে, কিন্তু সে ওর নিজের নয়, বাপের। তোমার কাপ্তেনদা যদি নিজের চেষ্টায় নিজের গাড়ী জুড়ি করতে পারে, তবে ওকে ব'লব বাহাদুর। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে দেখ গে,

গাণের অভাব বিষয় সম্পত্তি থাকলেও ছেলেকে মানুষ করবার জন্যে ওরা ছেলেদের পৃথিবী ভ্রমণের কষ্ট উপভোগ করায়, একটা না একটা বৃত্তিতে অভ্যস্ত করায়, অন্ততঃ সামরিক বা নৌ-বিভাগে রণশিক্ষা করতে দেয়, শোবার ঘরে বা বৈঠকখানায় ভুঁড়ি উঁচু ক'রে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আরাম উপভোগ করবার সুযোগ ক'রে দেয় না। শুধু তাই? ওদের দেশে বি, এ, এম, এ, পাশ ক'রে বিদ্যে শেষ করে না, ঐখান থেকে বরং ওদের বিদ্যে আরম্ভ হয়, অর্থাৎ সংসারে ঢোকবার উপযোগী নূতন ধনাগমের উপায় উদ্ভাবনের শিক্ষা দেওয়া হয় কাজেই তাতে ওদের ভিতরে এত জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি, আর আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে।"

অনিলা বলিল, "আমাদের দেশে এক সময়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের যে উন্নতি হ'য়ে গিয়েছিল, তা ওদের দেশে লক্ষ বছরেও হবে না। বাবা তুমি বেশী লো'ড়ো না, কেবল রামায়ণ মহাভারত সবটা পড়, তা হ'লেই বুঝতে পারবে।"

রামসদয় বাবু বলিলেন, "ওরে পাগলি! তা বুঝি রে, তা বুঝি। তবে এখন যা দিন কাল পড়েছে, তাতে কেবল অতীত নিয়ে আঁকড়ে বসে থাকলে চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কথাও ভাবতে হবে, না হ'লে প্রাচীনকালে গ্রীক বা রোমানদের মত আমাদের সত্যি সত্যিই মরা খাত হ'তে হবে। ভগবান আমাদের এই বাঙ্গালী জাতটাকে বিদ্যে দিয়েছেন, তবে আমরাই আমাদের আলস্য ও বিলাস পরায়ণতার জন্যে তার সদ্ব্যবহার করতে পারছি না, এটা কি কম দুঃখু!"

সরোজ বলিল, "তা হ'লে আপনার ইচ্ছে কি অরুণ ফাষ্ট আর্ট না প'ড়ে কোন একটা কাজে বা ব্যবসায়ে ঢোকে?"

রামসদয় বাবু বলিলেন, "লেখাপড়া যদি ঠিক করত, তা হলে আমার কোন কথা ছিল না। কিন্তু যখন ওর কেবল খেলা-ধূলোয় বা আমোদ-প্রমোদে মন, তখন ওর যে কোন একটা কাজে বস্‌লেই ভাল হয়। এখন তোমাদের সংসারে ঢুকে মানুষ হবার সময় হয়েছে, এটা ত' বুঝতে পার ত?"

সরোজ হাসিতে হাসিতে বলিল, "আচ্ছা, ভীষ্ম ত' এও বলেছিলেন যে, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে যাঁরা শক্তিমান পুরুষ, তাঁরাই জগতের লোকের পূজা পেয়ে থাকেন। তা' সে হিসেবে অরুণের ত' সকলের কাছে পূজো পাওয়া উচিত, কেননা ওর তুল্য শক্তিমান ছেলেদের ভিতরে কেহ নেই। কি বলেন?" এই কথাটা শুনিয়া অরুণের মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, অনিলাও কি জানি কেন হর্ষোৎফুল্ল মুখখানি নামাইয়া লইল।

রামসদয় বাবু জবাব দিলেন, "দেখ ও কথাও আমি পাঁচশ বার মানি। পুরুষ শক্তিমান না হ'লে, সে পুরুষকে উন্নতিশীল জাতির দেশে পুরুষ ব'লেই মানে না। এই দেখ না, তোমরা ওদের বৈশ্য ব'লে তামাসা করছিলে, কিন্তু ওদের দেশে ধনের ও জ্ঞানের যেমন আদর, তেমনই শক্তির আদর। ওদের মত বীর জাতি এখন জগতে আর কোথায় আছে? শুধু বীর? সাহসী, নির্ভীক, শক্তিমান। কাজেই বুঝে দেখ ওরা কেবল বৈশ্য নয়, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ও বটে, কেন না ওরাই জ্ঞান বিজ্ঞানের ও শক্তির আরাধনা ও সদ্ব্যবহার করে। তবে ওরা শূদ্র নয় বটে, কেন না ওরা স্বাধীন। ঐ শূদ্রত্বটা আমরা একচেটে করে নিয়েছি, কেবল মুখে ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বের বড়াই করি মাত্র। তাই আমাদের ছেলেরা পরমুখাপেক্ষী, পরসেবাপরায়ণ। তারা আত্মনির্ভরশীল হতে পারে না, আপনার পরের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে শেখে না। তাই তারা ক্রমে জগতের মধ্যে সব চেয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে।"

অনিলা বলিয়া উঠিল, "আর আগে এই আমাদের দেশ কি ছিল!" বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

রামসদয় বাবু বলিলেন, "তা আর বলতে!

আজ কোথায় সেই পরহিতে রত ঋষিরা, কোথায় সেই কইসহিষ্ণু প্রজারঞ্জক শ্রীরাম লক্ষ্মণ, ভীষ্মার্জ্জুন, নল হরিশ্চন্দ্র, শিবি দাতাকর্ণ! আর কি ভারতে সে যুগ ফিরে আসবে। সেই প্রাচীন যুগের উদারতা গিয়ে এখন অবশ্য সঙ্কীর্ণতার যুগ এসেছে। কেবল স্বার্থের গণ্ডী দিতে শিখ্‌ছে দেশের লোক। কেবল নিজের হতে সঙ্কীর্ণতার হতে শিখ্‌ছে দেশের লোক। তাই দেশে মানুষ খুব কম জন্মাচ্ছে।"

অরুণ সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "কেন, গান্ধি?"

রামসদয় বাবু বলিলেন, "হাঁ, গান্ধি। ও কথা মানি। কিন্তু ও রকম কটা গান্ধি আছে?"

সরোজ চকিতে একবার অরুণের দিকে তাকাইয়া বলিল, "খুঁজলে যে পাওয়া যায় না, তা নয়। যেমন গ্রের 'জিনেজ হ্যামডেন', তেমনই আমাদেরও 'নকর কুণ্ডুর' মত যথার্থ মানুষ যে নেই, তা কেউ বলতে পারে না। বেশী দূর যেতে হবে না, এই আমাদেরও মধ্যে খুঁজলে মানুষ পেতে পারেন, অন্ততঃ এক আধটা মানুষের কথা আমিই জানি। তবে অবসর না হ'লে, তারা ধরা দেয় না। ছাই চাকা আগুনের মত তাদের মনের তেজ বাইরের ছেলেমানুষির আবরণে চাপা থাকে, যখন দরকার হয় তখন সেই তেজের আপনিই বিকাশ হয়।"

রামসদয় বাবু। কি রকম?

সরোজ। আমাদের মধ্যে এমন ছেলে আছে, যারা স্বভাবতঃই অলস, অকর্ম্মণ্য, পরনির্ভরশীল। অথচ কোন বিপদ থেকে কাউকে উদ্ধার করতে হ'লে দেখবেন, তারাই আবার একা একশজন হ'য়ে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আর্ত্তকে ত্রাণ করে। বাস্তবিক কাজের সময় তাদের এক মূর্ত্তি দেখি।

রামসদয়। কই, এমন ধারা ছেলে ত' আজকাল দেখি নি।

সরোজ। দেখেন নি, এমন কথা বলবেন না। তবে কাজের মহত্বটাকে ছোট চোখে দেখাই মানুষের স্বভাব। তাই মানুষ দেখেও দেখে না। পাহাড়টা দূর থেকে যেমন গুরুগম্ভীর দেখায়, কাছে তেমন দেখায় কি?

সরোজের কথাটা শুনিয়া কি জানি কেন, স্বতঃই রামসদয় বাবুর দৃষ্টি অরুণের উপর নিপতিত হইল। অনিমার দৃষ্টিও চকিতে সেই দিকে নিপতিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অবনমিত ও লুক্কায়িত হইল। অথচ যাহার দিকে দৃষ্টি, সেই অরুণকুমার তাহা ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিল না, সে তখন অমিয়কুমারের খেলার মোটরকার লইয়া ঘর দিতেছিল। রামসদয় বাবু ক্ষণেক অরুণের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাঁহার চোখের ও মুখের কাঠিন্য দূর হইল, তাহার স্থানে একটা পরম প্রসন্নতার ভাব দেখা দিল। বোধ হয় সেই সময়ে তাঁহার একটা আধটা অতীত ঘটনার কথা মনে পড়িতেছিল, তাহার মধ্যে অমিয়কুমারের জন্ম নিমজ্জনের কথা একটা। কিন্তু তিনি সেই ভাব কাহাকেও জানিতে না দিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তা থাকতে পারে তোমাদের ভেতরে মানুষ, সে ত' ভাল কথা। কিন্তু তোমাদের সকলের সেই রকম মানুষ হবার চেষ্টা করা উচিত। বিশেষতঃ অরুণের। ভগবান ওর এত সুবিধা দিয়েছেন মানুষ হবার, অথচ ওর ছেলেমানুষি আজও গেল না। দেখ অরুণ, ঐ কিট এষ্টারমেণ্ট বা ম্যাচ ফ্যাচগুলো ছেড়ে দাও। ওতে অত মন দিলে আর কখনও কাজে মন লাগবে না। এই কথাটা বলবার জন্যে কদিন তোমায় খুঁজছি। দেখা পেয়েছি বটে, কিন্তু উপযুক্ত অবসর পাই নি। আজ তাই এত কথা বল্‌লুম। তুমি আমায় বাপের মত দেখ ব'লেই বল্‌লুম, মনে রাগ কোরো না।"

অরুণ বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিল, "রাগ ক'রব? কেন, রাগ ক'রব কেন?"

সরোজ বলিল, "না, না, রাগ করবি কেন? রাগের কথা ত' উনি কিছু বলেন নি। এখন আয়,

একবার এখানকার নতুন লাইব্রেরীটা দেখে আসি। চাঁদা তুলে বেশ লাইব্রেরীটা করেছে!"

অনিলা কৃত্রিম কোপের সহিত বলিল, "যা-রে যা! সরোজ দা ত' বেশ লোক! না খেয়ে বুঝি কোথাও বেরুতে আছে? এস কিছু খাবে দাবে এস।"

রামসদয় বাবু সস্নেহদৃষ্টিতে অনিলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা লক্ষ্মীর আমার কিছু এড়াবার যো নেই। তাই তো বলি, না খাইয়ে মা লক্ষ্মী যেতে দেবে?" তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অনিলা ভিতরের দিকে আহারের যোগাড় করিতে গিয়াছিল, অমিয় তাহার পশ্চাৎ লইয়াছিল। রামসদয় বাবু, সরোজ ও অরুণকে লইয়া আহারের চেষ্টায় গেলেন। (ক্রমশঃ)

কবিবর গিরিশচন্দ্র ও তাঁহার নাট্য-প্রতিভা।

(কালিদাস মিত্র এম্. এ)

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

১২। নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের স্থান।

সাহিত্য একটি প্রবাহ। ইহার উৎপত্তি, গতি ও পরিণতি বিষয়ে বর্ত্তমান সাহিত্যসেবীগণের ঔদাসীন্য ইহার শ্রীবৃদ্ধিপক্ষে বিষম অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নাট্যসাহিত্য ইহারই এক শাখা। এই শাখারও সম্যক্ আলোচনা করিতে হইবে। সংস্কার দ্বারা ইহার দোষাংশ বর্জ্জন করিয়া ইহাকে সাহিত্যের আসরে সাদরে স্থান দিতে হইবে। গিরিশ চন্দ্র সেই বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের জনক না হইলেও প্রধান পরিপোষক। বর্ত্তমান বঙ্গীয় নাট্যশালা তাঁহারই প্রতিভা-প্রসূত সন্তান। গিরিশচন্দ্রের স্থান স্থায়ী-সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মে।

এই প্রসঙ্গে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যে আর দুইজন যশস্বী নাট্যকারের প্রতিভার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। ইহাদের একজন দীনবন্ধু মিত্র, অপরজন মনোমোহন বসু।

দীনবন্ধুর নাটক ও প্রহসনাবলীর ভিত্তি প্রায়ই সামযিক ঘটনাবলী বা উপাখ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার 'নীল দর্পণ' নাটক উত্তেজনাময়ী রচনা হইলেও সাময়িক ঘটনার উপর মাত্র স্থাপিত বলিয়া উহা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। 'সধবার একাদশী', 'জামাই বারিক' ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' দীনবন্ধুর সাময়িক সমাজচিত্র হাস্যরসের অনন্তধ্বনি। বাস্তবিক, দীনবন্ধু মিত্রের নাটকাদিতে dramatic art খুব অল্প হইলেও, হাস্যরসের প্রাচুর্য্য যথেষ্টই পরিলক্ষিত হয়। ফলতঃ দীনবন্ধু প্রহসনকার ও হাস্যরসিক কবি বলিয়া যতটা প্রতিষ্ঠিলাভ করিয়াছেন নাট্যকার বলিয়া ততটা যশোভাজন হইতে পারেন নাই।

দীনবন্ধুর সহিত গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। পাইকপাড়া রাজবাটীতে যখন মহাসমারোহে মাইকেলের 'রত্নাবলী', 'শর্ম্মিষ্ঠা', 'কৃষ্ণকুমারী' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় চলিতেছিল, তখন কিশোর-বয়স্ক গিরিশচন্দ্রের মনে উক্ত রাজবাটীর অভিনয় দর্শন লালসার পরিবর্ত্তে, ঐরূপ একটি থিয়েটার করিবার বাসনা হইয়াছিল। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' অভিনয়ার্থ গিরিশচন্দ্রের নেতৃত্বে বাগবাজারে এক নাট্যসম্প্রদায় গঠিত হয়। গিরিশচন্দ্র 'নিমচাঁদের'

অংশে রঙ্গমঞ্চে প্রথম অবতীর্ণ হন; তাঁহার অপূর্ব্ব অভিনয় দর্শনে দেশের সুধীগণ ও স্বয়ং গ্রন্থকার দীনবন্ধু গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেন। আত্মপ্রবোধে গিরিশচন্দ্র এই নাটক অভিনয়ে কয়েকটী স্বরচিত সঙ্গীতও সন্নিবিষ্ট করেন।

প্রথম হইতেই আমরা দেখিতে পাই নাট্যকাররূপে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের পূর্ব্বে, নটরূপে গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা বাঙ্গালাদেশে বিকীর্ণ হইয়াছিল। নাটক রচনার পূর্ব্বে তিনি সঙ্গীত রচনায় তাঁহার ভবিষ্য সাহিত্যাচর্চ্চার দ্বার উন্মুক্ত করেন।

"সধবার একাদশী" অভিনয়ের পর গিরিশচন্দ্রের স্থাপিত দল "লীলাবতী" অভিনয় করেন। গিরিশচন্দ্র ইহাতে "ললিতে"র অংশ গ্রহণ করেন। এই সময় সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র ও সুপ্রসিদ্ধ "সাধারণী"-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের শিক্ষাবিধানে চুঁচুড়ায় "লীলাবতী" নাটকের অভিনয় চলিতেছিল। গিরিশচন্দ্রের নাট্যসম্প্রদায় কর্ত্তৃক "লীলাবতী" অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া দীনবন্ধু বাবু বলেন, "এবার চিঠী লিখ্‌বো, ভয়ো বঙ্কিম!" আর গিরিশবাবুকে বলেন,—"আমার কবিতা যে এমন করিয়া পড়া যায়, তাহা আমি জানিতাম না; Take this compliment at least."

"সধবার একাদশী" অভিনয় দর্শনে শ্রীযুক্ত নারদা চরণ মিত্র মহাশয় মুগ্ধ হইয়া ১৩১২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শনে "দীনবন্ধু মিত্র" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেন; —"বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাঙ্গালার মধ্যবয়সের নাটকের সৃষ্টিকর্ত্তা; কবিবর গিরীশচন্দ্র সেদিন বলা—নিমচাঁদ। "সধবার একাদশী" পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম; কিন্তু সেদিনের অভিনয় বিশেষতঃ নিমচাঁদের অভিনয় দেখিয়া আনন্দে আপ্লুত হইলাম। বয়োবৃদ্ধিবশতঃ ক্রমশঃ অনেক জিনিস ভুলিয়াছি, আর ও কত ভুলিব, কিন্তু, সে রাত্রের নিমচাঁদের অভিনয় বোধ হয় কখনও ভুলিব না।"

আর একজন নাট্যকারের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব। ইনি গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক নাম, মনোমোহন বসু। ইনি অনেকগুলি ভাল ভাল নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে "সতী"; "হরিশ্চন্দ্র" ও "প্রণয়পরীক্ষা" সবিশেষ উল্লেখযোগ্য; কিন্তু গিরিশচন্দ্রের ভাস্বর প্রতিভার "আগুতা"য় তাঁহার নাটকীয় প্রতিভার যথার্থ পরিচয় অনেকেই পান নাই। মনোমোহন গিরিশচন্দ্রের মত নানা বিষয়ে ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে অধিক পরিমাণে নাটক রচনা করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি সঙ্গীত রচয়িতা, হাফ্ আখড়াই ও পাঁচালীকার নামে সমধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্রের সৃষ্টিশক্তি অতুলনীয়। তাঁহার সৃষ্ট দেব মানব যক্ষ ও রক্ষোপরিবার যেরূপ অসংখ্য, সেইরূপ বিচিত্র। অনুভূতির সহিত কল্পনার সমাবেশে চরিত্র সৃষ্টি করিয়া তিনি আপনার মানসী প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতেন। মনোবৃত্তির বিবিধ দ্বন্দ্ব, পুণ্য ও পাপের সংঘর্ষ, ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত ও এই সকলের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দেখাইতে গিরিশচন্দ্রের ক্ষমতা অসীম ছিল। বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্র একচ্ছত্র সম্রাট্‌রূপে অপ্রতিহতভাবে সাম্রাজ্য পরিচালনা করিয়া পূর্ণগৌরবে মৃত গিয়াছেন।

১৩। জীবন-বৃত্ত ও নাট্য-প্রতিভার ক্রমঃবিকাশ।

গিরিশচন্দ্রের কর্ম্মময় বিচিত্র জীবন তাঁহার নাট্যপ্রতিভা বিকাশের পক্ষে যে আনুকূল্য করিয়াছিল তাহাই এ প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে।

গিরিশচন্দ্র সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশের সন্তান। যদিও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ছিলেন না, তথাপি তাঁহার ন্যায় সুবিধান্ বাঙ্গালাদেশে অল্পই জন্মিয়াছে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ইংরাজী কবিতার বাঙ্গালায় পদ্যানুবাদ তাঁহার প্রথম সাহিত্যিক প্রচেষ্টা। তিনি চিরজীবন একজন কঠোর সাধনারত অধ্যয়নশীল ছাত্র ছিলেন। তাঁহার ন্যায়

সম্প্রদায়ের সমস্ত্রধার পাঠক খুব অল্পই দেখা যায়।

বালো খুল্লপিতামহীর নিকট রামায়ণ, মহাভারত পুরাণাদি হইতে গল্প শুনিয়া তাঁহার তরুণ হৃদয়ে ধর্মানুরাগ ও ভক্তিরসের সঞ্চার হয়; এবং ইহাই গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে কাব্যরস-বিকাশের প্রথম সূত্রপাত।

একদিন বাগবাজারে এক হাফ্ আখ্‌ড়াই ধরণের সামান্য পরিচ্ছদধারী কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্মানসহকৃত সম্বর্দ্ধনা দেখিয়া গিরিশচন্দ্রের কবি-যশঃ-আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয়। তিনি ঈশ্বর গুপ্তকে অন্তরে গুরুরূপে মনোনীত করিয়া একলব্যের ন্যায় সাহিত্যসাধনায় রত হন; কিন্তু দুঃখের বিষয় তৎকাল রচিত একটি কবিতা বা একখানি গীত ও তিনি রক্ষা করেন নাই।

নাট্যসম্প্রদায় গঠনের পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্র কতিপয় বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া বাগবাজারে এক অবৈতনিক যাত্রা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে এই সম্প্রদায় কর্ত্তৃক মাইকেলের "শর্ম্মিষ্ঠা" নাটক অভিনীত হয়। গিরিশবাবু এই নাটকে যাত্রার উপযোগী কয়েকটী স্বরচিত সঙ্গীত যোগ করিয়া দেন। এই সময় সাধারণে তাঁহার রচিত গীতাবলীর প্রথম পরিচয় লাভ করে।

ইহার পরই বাগবাজারে গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাট্য-সম্প্রদায় সংগঠন ও "সধবার একাদশী" অভিনয় হয়। এ বিষয় পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। বাস্তবিক, গিরিশচন্দ্র যদি অবস্থাচক্রে পড়িয়া বিদ্যাভ্যাসের প্রচলিত পথ ত্যাগ করিতে বাধ্য না হইতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালার নাট্যশালা স্থাপয়িতাদিগের অন্যতম রূপে ও বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের পালকরূপে, সাহিত্যের আসরে তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম কি না সন্দেহ।

মাইকেলের "কৃষ্ণকুমারী" নাটকে গিরিশচন্দ্র "ভীমসিংহে"র অংশে অভিনয় করিয়া যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর প্রপৌত্র নাটোরাধিপতি মহারাজ রামকৃষ্ণ রায় স্বহস্তে আপনার রাজপরিচ্ছদে তাঁহাকে সজ্জিত করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

অতঃপর গিরিশচন্দ্র ক্রেষ্ট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য বঙ্কিমের "মৃণালিনী" নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করেন; এবং 'মাইমি', 'হাতেব চিকিৎসালয়', প্রভৃতি কয়েকটী সরস, নক্সা প্যান্টোমাইম ও অভিনয়ার্থে রচনা করেন। ইহার পর তিনি মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ', নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ', বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ', 'দুর্গেশ নন্দিনী' প্রভৃতি নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করেন। ইহাতে গিরিশচন্দ্রের অন্য কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। কোনও উপন্যাস বা কাব্যের,—বিশেষতঃ যে উপন্যাস বা কাব্য ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে জটিল, সেরূপ পুস্তকের নাটকাকারে পরিবর্ত্তন নাট্যকারের নিপুণ হস্তের পরিচয় জ্ঞাপন করে। গিরিশচন্দ্রের নাটকীয় প্রতিভা এই পথেই প্রথমে আত্মবিকাশ করিয়াছিল।

তাঁহার প্রথম মৌলিক রচনা পুরাণ ও ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে গৃহীত। "আগমনী", "অকালবোধন' ও 'দোল-লীলা" নামক তিনখানি পৌরাণিক গীতিনাট্যেই তিনি সুললিত গীতরচয়িতারূপে সাধারণের নিকট পরিচিত হন। সঙ্গীত রচনা যে তাঁহার নাট্যপ্রতিভা বিকাশের সহায়তা করিয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। গিরিশচন্দ্রের গান বাঙ্গালায় অমর হইয়া থাকিবে। এ গুলি খাঁটী বাঙ্গালীর প্রাণ-খোলা গান। ইহাতে বাঙ্গালাদেশের কবির, প্রেমিকের, নিরাশের, সুখীর, দুঃখীর, ব্যথিতের, বিপন্নের, সাধকের, ভক্তের, ধর্ম্মোন্মাদের হৃদয় উচ্ছ্বাস, হৃদয়ের স্পন্দন, অনুভব করা যায়।

স্ত্রীবিয়োগ-বিধুর-হৃদয়ে গিরিশচন্দ্র যে সকল কবিতা রচনা করেন তাহার কতিপয়, তদীয় অন্যান্য কবিতার সহিত একত্রে "প্রতিধ্বনি" নামে নূতন প্রকাশিত হইয়াছে। 'প্রতিধ্বনি' ও গিরিশচন্দ্রের কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি।

এই সকল কবিতার ভাব যেমন উচ্চ, ভাষাও সেইরূপ সহজ ও হৃদয়গ্রাহী। ইহা কবির মর্ম্মভেদী করুণ সঙ্গীত—দারুণ মর্ম্মব্যথায় ব্যথিত হৃদয়তন্ত্রীর ঝঙ্কারের প্রতিধ্বনি। এরূপে গিরিশচন্দ্রের কবি-জীবন আরম্ভ হয়। ইহা হইতেই তাঁহার নাট্য প্রতিভা স্ফুরণ ও উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকে।

থিয়েটারের কাজে প্রথম বেতনভোগী হইবার সময় তিনি শুধু নাট্যানুরাগবশতঃই যেরূপ স্বার্থত্যাগ করেন, তাহা প্রকৃতই বিরল। তিনি এ সময় পার্কার কোম্পানীর আফিসে পঁচিশটাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেছিলেন। উহা পরিত্যাগ করিয়া মাত্র একশতটাকা বেতনে তিনি ন্যাশন্যাল্ থিয়াটারের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন। ইহা তাঁহার নাট্যানুরাগের এক জলন্ত নিদর্শন এই সময় হইতেই তিনি মৌলিক নাটকাদি রচনায় উত্তরোত্তর বঙ্গসাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

১৪। গিরিশচন্দ্রের নাটকের ক্রমঃবিকাশ।

গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলীর ক্রমঃ বিভাগ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পৌরাণিক ও ধর্ম্মমূলক নাটক এবং গীতিনাট্যাবলীতে তাঁহার প্রতিভার আদি স্ফুরণ। বাল্যজীবনের শিক্ষায় তাঁহার হৃদয়ে যে ধর্ম্মভাবের বীজ উপ্ত হয়, তাঁহার পৌরাণিক নাটকাবলী তাহারই প্রথম ফল। পৌরাণিক নাটকাবলীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মধুর গীতিনাট্য এবং বিদ্রূপাত্মক প্রহসন গুলিও রচিত হইতেছিল। তাঁহার প্রথম নাটক 'রাবণ বধ' সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, গিরিশচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া এক পত্র লেখেন। এই সময় গিরিশচন্দ্র, মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তের "মাধবী কঙ্কণ" নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করেন। "আগমনী" গীতিনাট্যে যে পৌরাণিক নাটকাবলী আরম্ভ হয়, তাহা "চৈতন্যলীলা" 'বিল্বমঙ্গল' 'নিমাই সন্ন্যাস' পর্য্যবসিত হয়। এই "চৈতন্যলীলা" অভিনয়দর্শনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বাটিয়া আসিয়া গিরিশচন্দ্রকে পদাশ্রয় দেন। এই ঘটনা হইতেই গিরিশচন্দ্রের ধর্ম্মভাবের নব-বিবর্ত্তন। এই পরিবর্ত্তনজাত ফল তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া পাঠকবর্গকে মধুর রসের আস্বাদ দিয়া থাকে।

ইহার 'প্রফুল্ল' ও 'হারানিধি' নাটকাভিনয় সহ তাঁহার সামাজিক নাটকাবলীর সূচনা। ঐ সঙ্গে সঙ্গে 'চণ্ড' নাটকে তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকাবলীর ভিত্তির প্রথম ইষ্টক সংস্থাপিত হয়।

গিরিশচন্দ্রের নাটক গুলি প্রধানতঃ পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। পৌরাণিক ও ধর্ম্মমূলক রচনায় যে শক্তির উন্মেষ, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকে তাহার পরিপুষ্টি এবং পুনরায় পৌরাণিক ও ধর্ম্মমূলক নাটকে তাহার সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণ পরিণতি লক্ষিত হয়।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মিনার্ভা থিয়েটার প্রথম সংস্থাপিত হইলে গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা এক নূতনবেশে সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত হয়। মহাকবি সেক্সপীয়রের ম্যাক্‌বেথ্ নাটকের বঙ্গানুবাদ করিয়া গিরিশচন্দ্র মিনার্ভায় অভিনয় আরম্ভ করেন। এই নাটকে ডাইনীর (witch) এর ভাষার বঙ্গানুবাদে গিরিশচন্দ্র যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা অতুলনীয়। সেক্সপীয়রের মাত্র একখানি নাটক তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন; এবং এই একমাত্র রচনায় তিনি যে একজন বড় সেক্সপীয়রের সমজদার রসজ্ঞ (scholar) ছিলেন তাহার পরিচয় বঙ্গীয় সুধীসমাজকে প্রদান করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে গীতিনাট্য, পৌরাণিক ও ধর্ম্মমূলক নাটক ('অশোক', 'করমেতী বাঈ') প্রভৃতি ও প্রহসনাদিও চলিতেছিল।

সাময়িক ঘটনাবলীর (যথা, 'হীরক জুবিলী', 'বুয়ার্‌যুদ্ধ অবসান', 'কংগ্রেস', 'ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু' প্রভৃতির) উপরও তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার নাটকাবলীর এই কয়টী পর্য্যায় বিভাগ করিয়া আমরা একে একে প্রত্যেক বিভাগের সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

বঙ্গীয় রঙ্গালয়গুলির জন্য গিরিশচন্দ্র প্রায় শতাধিক নাটক, গীতিনাট্য, প্রহসন, পঞ্চরং প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার নিত্যনূতন উদ্ভাবনী শক্তির বলে কোনও একটী রচনা অন্যের অনুরূপ হইতে পারে নাই। প্রত্যেকটিতেই যথেষ্ট মৌলিকতা ও অভিনবত্ব সংরক্ষিত হইয়াছে। ইহা তাঁহার অসামান্য কল্পনা-কুশলী নাট্য-প্রতিভার অভ্রান্ত নিদর্শন।

১৫। পৌরাণিক নাটকাবলী।

পৌরাণিক নাটক ও গীতিনাট্যাবলীতেই গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার আদি বিকাশ। বাল্য-জীবনের শিক্ষায় তাঁহার যে ধর্মভাবের বীজ উপ্ত হয়, তাঁহার পৌরাণিক নাটকাবলী তাহারই প্রথম ফল। 'রাবণ বধ' তাঁহার প্রথম রচিত নাটক; কিন্তু ইহারও পূর্ব্বে গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটারের অধ্যক্ষতাকালে তিনি 'আগমনী', 'অকালবোধন' প্রভৃতি ক্ষুদ্র গীতিনাট্য প্রণয়ন করেন। 'আগমনী' গীতিনাট্যে জগন্মাতা আদ্যাশক্তির চিন্ময়ী প্রকৃতির বোধন-গীতি গাহিয়া সাধক গিরিশচন্দ্র নাট্যব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'তপোবলে' সেই আজীবন একনিষ্ঠ নাট্যব্রত সাধনার মোক্ষফল লাভ হইয়াছে। শক্তিময়ীর অপূর্ব্ব শক্তির আবাহন-গীতি গাহিয়া গিরিশচন্দ্র কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সন্তানের সে আহ্বান মাতার কর্ণে পৌঁছিয়াছে। তিনি তাঁহার প্রিয় সাধক গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে শক্তি-রূপে অধিষ্ঠিতা হইয়া বীণাপাণির স্বর্ণকমলের পাপড়ি খসাইয়া তাঁহাকে অভীষ্ট বরদান করিয়াছেন। কীর্ত্তিদেবী স্বয়ং তাঁহার শিরে যশের মুকুট পরাইয়া দিয়াছেন। বঙ্গভাষা তাঁহার সন্তানের এই গৌরবে আপনাকে কৃতার্থম্মন্যা বিবেচনা করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্র সর্ব্বশুদ্ধ ঊনবিংশতি খানি পৌরাণিক নাটক রচনা করেন। তন্মধ্যে রামায়ণ হইতে ছয়খানির, মহাভারত হইতে ছয়খানির, শ্রীমদ্ভাগবত কবিকঙ্কণের চণ্ডী ও পুরাণাদি হইতে অবশিষ্ট সাতখানি নাটকের উপাখ্যান ভাগ গ্রহণ করিয়া নিজের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী অপূর্ব্ব প্রতিভার বলে, প্রত্যেক খানিতে এক অপূর্ব্ব সজীবতা আনয়ন করিয়াছেন, এক অপরূপ জীবনীশক্তি প্রদান করিয়াছেন।

উপাদান সংগ্রহের জন্য ভারতের প্রাচীন কবি-ভাণ্ডার হইতে ঋণ গ্রহণ করিলেও গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব বলিতে অনেক জিনিসই এই সকল নাটকে দৃষ্ট হয়। সাধারণ নাটক রচয়িতার ন্যায় তিনি গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাইয়া দেন নাই। তাঁহার প্রত্যেক শ্রেণীর নাটকেই তাঁহার 'ব্যক্তিত্ব'—তাঁহার 'স্বকীয়ত্ব' নানাদিক্ হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কৃত্তিবাস, কাশীদাস, মুকুন্দরাম ও ঘনরামের পর বাঙ্গালার ধর্ম্মজীবনে এরূপ একটানা স্রোত প্রবাহিত করিতে বোধ হয় গিরিশচন্দ্র ব্যতীত আর কোনও কবিই সমর্থ হন নাই। গিরিশচন্দ্র এইরূপে তাঁহার পৌরাণিক নাটকাবলীর মধ্য দিয়া রামায়ণ, মহাভারত পুরাণাদি গ্রন্থকে সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়া তুলিতেছিলেন। এই সকল নাটকাবলী লোকশিক্ষার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। বাঙ্গালার আধুনিক ধর্ম্ম-জীবন সংগঠনে গিরিশচন্দ্রের নাট্য-প্রতিভার যথেষ্ট শক্তি পরিচয় পাওয়া যায়।

১৬। রামায়ণ হইতে গৃহীত পৌরাণিক নাটকাবলী।

বাঙ্গালীর চির-আদরের ধন, অশিক্ষিত পর্ণ-কুটীরবাসী সামান্য পল্লীজীবী হইতে শিক্ষিত ও ধনী, আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেরই তুল্য আদরণীয় 'রামায়ণ' গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র 'রাবণ বধ', 'সীতার বনবাস', 'সীতাহরণ', 'রামের বনবাস', 'সীতার বিবাহ' ও 'লক্ষ্মণ বর্জ্জন' এই ছয় খানি নাটক রচনা করেন। 'রাবণ বধ'ই তাঁহার রচিত প্রথম নাটক। এই নাটকে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ ভাঙ্গিয়া এক নূতন ছন্দের প্রচলন করেন। দেখা যায়, ঐ ছন্দে

আবৃত্তি করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ও উহা অল্পশিক্ষিত অভিনেতা অভিনেত্রীর দ্বারা সহজেই আয়ত্ত হয়। ঐ ছন্দের অভিনয়ে dramatic effect বর্দ্ধিত বৈ হ্রাস হয় না। প্রথমে এই ছন্দঃ-প্রচলনের জন্য গিরিশচন্দ্রকে অনেকেই আক্রমণ করেন; কিন্তু কালে এই গৈরিশ-ছন্দে অভিনীত নাটকগুলির সর্ব্বাধিক আদর এই ছন্দে অভিনয়ের বিশেষত্বের পরিচয় দিয়াছিল।

'রাবণ বধ' নাটকে রাবণের সমরসজ্জা, রামচন্দ্রের দুর্গাপূজা, হনুমানের দ্বারা গন্ধমাদনে রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ, রাবণ বধ ও সীতার অগ্নি-পরীক্ষা বিবৃত হইয়াছে। এই নাটকের চরিত্রগুলি নাট্যকারের নিপুণ তুলিকায় সতেজ, সজীব ও প্রোজ্জ্বল। তাঁহার স্বর্গমর্ত্ত্য আলোড়নকারী কল্পনা ক্ষণে আমাদিগকে লঙ্কার মহাহবের বৃত্ত হইতে হিমশালয়ের সুখ সমৃদ্ধি ও নৃত্যগীত বিলাসোপভোগের মধ্যে লইয়া যায়। দু একটি মাত্র নিপুণ রেখা-সম্পাতে তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ কাব্যোদ্যানের চরিত্র-কুসুমগুলি এরূপ বিকসিত করিয়াছেন যে, তাহার মনোহারিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রাবণ বধ নাটকে 'কৈবেছি আপন দোষে, বেজেছে মায়ের প্রাণে' ও 'মা আমার ভক্ত বই আর জানে না' প্রভৃতি ভক্তি-রসাশ্রিত মধুর গান ভক্তের চির আদরের জিনিস।

তাঁহার 'সীতার বনবাস' করুণ দৃশ্য কাব্য। ইহাতে কবি সহানুভূতির অশ্রুতে আপনার হৃদয় গলাইয়া সেই অনুভূতির উপাদানে 'সীতা' ও 'লক্ষ্মণ' চরিত্র গঠিত করিয়াছেন। চিরদুঃখিনী সীতার দুঃখে সহানুভূতি সূচক অশ্রুপাত না করিয়া কোন্ পাষাণ প্রাণ স্থির থাকিতে পারে? বীর-হৃদয় লক্ষ্মণের একদিকে ভ্রাতৃ-আজ্ঞা পালনরূপ কঠোর কর্ত্তব্য, মাতৃসমা ভ্রাতৃবধূ সীতাদেবীর নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞাপালন, এবং অন্যদিকে জানকীর প্রতি লক্ষ্মণের অগাধ ভক্তি, ও সেই সতী সাধ্বীর অকলঙ্ক নির্ম্মল ঐকান্তিক আস্থা এই উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান হৃদয়-ভাব কবি কি নিপুণতা সহকারেই প্রকাশ করিয়াছেন। আদর্শ রাজা ও প্রজারঞ্জক রামচন্দ্র প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা সহধর্ম্মিনী সীতার বর্জ্জনে যে অপূর্ব্ব আত্মবলির নিদর্শন দিয়াছেন, তাহা গিরিশচন্দ্রের তুলিকার অতুলনীয় সংস্পর্শে সমধিক উজ্জ্বল হইয়াছে। লব ও কুশের রামায়ণ গান বড়ই সুললিত, হৃদয়গ্রাহী করুণ রসের অনন্ত উৎস। সীতার পাতাল-প্রবেশে এই করুণ নাটকের উপসংহার।

'লক্ষ্মণ বর্জ্জন' নাটকে দুর্ব্বাসা ও কাল-পুরুষের কৌশলে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রিয় অনুজ লক্ষ্মণের বর্জ্জন ও লক্ষ্মণের সরযূসলিল-সমাধি বর্ণিত হইয়াছে। 'সীতাহরণে' হওকারণ্য হইতে লঙ্কেশ্বর রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ ব্যাপার বর্ণিত। 'রামের বনবাস' ও 'সীতার বিবাহ' নাটকদ্বয়ের নাম হইতেই বিষয় অনুসূচিত হইতেছে। গিরিশচন্দ্র যেন কোন্ যাদুবলে স্বীয় কুহকদণ্ডের আঘাতে সেই সুদূর ত্রেতাযুগের বিস্মৃতির আবরণ ভেদ করিয়া তাহার চেতনাহীন সুপ্ত অধিবাসিগণকে জীবন দান করিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট রাজপরিবারের পার্শ্বে চণ্ডাল, রাক্ষস, বানর ও অন্যান্য অনার্য্য পরিবারের মিলন ও সঙ্ঘটন সূচিত করিতেছে। 'রামের বনবাসে' গুহকচণ্ডাল, চণ্ডালিনী ও চণ্ডাল অনুচরগণের ভক্তি-প্রবণ হৃদয় অনেক ভক্তের হৃদয়েও ভক্তি রসের সঞ্চার করিয়া থাকে।

১৭। মহাভারত হইতে গৃহীত পৌরাণিক নাটকাবলী।

'মহাভারত' অবলম্বনে গিরিশচন্দ্র 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'অভিমন্যুবধ', 'নল দময়ন্তী', 'বভ্রুবাহন', 'জনা' ও 'পাণ্ডব গৌরব' এই ছয়খানি নাটক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচনা করেন।

পাণ্ডবগণের বিরাট রাজগৃহে ছদ্মবেশে অবস্থিতি, কীচক বধ ও উত্তর গো-গৃ হরণ এই কয়টী বিষয় লইয়া পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস নাটক বিরচিত।

কুরুক্ষেত্র মহাসমরে সপ্তরথি-বেষ্টিত অভিমন্যুর নিধন-বৃত্তান্তই 'অভিমন্যু বধ' নাটকে বিবৃত হইয়াছে।

'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকে উত্তরার মুখে "ফুল বাসে, হেম উষা হাসে" প্রভৃতি সঙ্গীতে লাবণ্যময়ী উষারাণীর প্রথম কনক-কিরণ-স্নাত চিত্র-খানি কি সুন্দর! কি উজ্জ্বল! এইরূপ একখানি সঙ্গীতে বা একটী বক্তৃতাংশে একখানি পরিস্ফুট চিত্র পাঠকের কল্পনানেত্র-সম্মুখে ধারণ করিয়া কবি স্বীয় চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার অপূর্ব্ব পরিচয় দিয়াছেন। উক্ত দুইখানি নাটকেই বীরত্ব ও মহত্ত্বের পার্শ্বেই নীচ প্রকৃতির লীলাখেলা বিপরীত বৈষম্য দ্বারা নাটকীয় সৌন্দর্য্য উৎপাদনে সহায়তা করিয়াছে।

ন্যাশন্যাল থিয়েটারের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যখন গিরিশ বাবু,—ষ্টার থিয়েটার নামক নূতন রঙ্গা-লয় প্রতিষ্ঠা করেন, তখন উক্ত থিয়েটারে তাঁহার যে যে নাটক অভিনীত হয় তন্মধ্যে 'নলদময়ন্তী' ও 'বৃষকেতু' অন্যতম।

'নলদময়ন্তী' নাটকে দেববালাগণের মুখে "হায়রে হায় প্রেমিক যে জন, সে কেন চায় ভালবাসা?" ও "প্রাণে যার সয়না ব্যথা, সে কেন কয় প্রেমের কথা" ইত্যাদি গীতে কবি প্রেমের যে অপূর্ব্ব দার্শনিক তত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহা Wordsworth বা Shelley র philosophy of Love হইতে কি কোনও অংশে ন্যূন? কবি দেখাইয়াছেন স্বার্থত্যাগই প্রেমের অভিব্যক্তি; প্রেম আপনা বিলাইয়া দিয়াই বিভোর, প্রেমিক যাচিয়া প্রেমের মোহন ফাঁসে ধরা দেয়, ও ধরা দিয়া স্বর্গসুখ বোধ করে; প্রেমিক-হৃদয় অপরকে ফাঁসে বাঁধিতে চাহে না। 'চায় না প্রেম কেনা বেচা, ভালবেসো পুরায় আশা;' যে প্রাণ সমর্পণ করিতে জানে তাহার আবার বিচ্ছেদের ভয় কি? সে'ত সর্ব্বদাই মিলনের পূর্ণানন্দ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া থাকে।

এই নাটকে বিভিন্ন ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়া, পুষ্করের ষড়যন্ত্র ও কলির বিরোধ সত্ত্বেও শেষে নল ও দময়ন্তীর মিলন, তথা অধর্ম্মের পরাজয়ে ধর্ম্মের অভ্যুত্থান দেখাইয়া কবি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

'বৃষকেতু' নাটকে কর্ণ ও তদীয় পত্নী পদ্মাবতীর অপূর্ব্ব আতিথেয়তা ও ভগবানে অচলা ভক্তি এবং তাঁহার চরণে ঐকান্তিক বিশ্বাস আপামর সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করে। কর্ণ বীরপুরুষ, তাঁহাতে দৃঢ়তা সম্ভব, কিন্তু পদ্মাবতী কোমল প্রাণা নারী। জননী হইয়া তিনি যে অসীম বিশ্বাসে, ভগবচ্চরণে একান্ত নির্ভরশীল হইয়া হাসিমুখে স্বহস্তে পুত্রপ্রাণ বলি দিলেন সেরূপ একাগ্র নির্ভরতা আদর্শস্থানীয়।

মিনার্ভায় নাট্যাচার্য্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া গিরিশচন্দ্র 'জনা' নাটকের অভিনয় করেন। বীর-রমণী জনার চরিত্র অতীব সুন্দর! প্রবীরের সৌর্য্য, বীর্য্য ও শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে সংঘটিত তাঁহার অকালমৃত্যু সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করে। কৈলাসে হরহরি মিলন সংগীতে কবি নিজের অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মভাবের পরিচয় দিয়াছেন। বিদূষকের ধর্ম্মপ্রাণ, সরলহৃদয় কবির আপন হৃদয়ের ছবি। 'পাণ্ডব গৌরবে' এই বিদূষকেরই জীবন্ত মূর্ত্তি duplicate রূপে আমরা কঞ্চুকীর দেখা পাই। শ্রীকৃষ্ণের আগমনে নীলধ্বজের রাজ্যে বালকগণের মধুর কৃষ্ণলীলা অভিনয় অশান্তির ব্যাত্যাবিক্ষোভের পর প্রকৃতি শান্ত মূর্ত্তি দেখাইয়া দেয়। পুত্ররূপ ঐহিক সর্ব্বস্বত্যাগে নীলধ্বজ ভগবৎপাদপদ্ম রূপ পারমার্থিক কামাবস্তু লাভ করিয়াছিলেন। পুত্রশোকাতুরা জননী জনা কিন্তু নারায়ণের এ মহিমা বুঝিতে পারেন নাই। একমাত্র প্রিয়পুত্র শোকে তিনি বিবশা, পাগলিনী হইয়াছিলেন। দলিতা ফণিনীর মর্ম্মভেদী তীব্র হৃদয় জ্বালার অমিত উচ্ছ্বাস 'চলে জনা প্রতিবিধিৎসিতে,' এখনও যেন কর্ণে বাজিতেছে। অভাগিনী মাতা জাহ্নবী-সলিলে ঝাঁপ দিয়া চিরশান্তি লাভ করিলেন। জনার ছায় দৃপ্তা

সিংহিনী-প্রকৃতি নারী. প্রতি হিংসার জ্বালাময়ী অগ্নিবর্ষী নারীচিত্র অঙ্কই লক্ষিত হয়।

ক্ল্যাসিকে 'পাণ্ডব গৌরব' অভিনয় গিরিশচন্দ্রের এক অক্ষয় গৌরব-গাথা। শ্রীকৃষ্ণকে দণ্ডীরাজের অপূর্ব্ব-মায়া অশ্বিনী প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন, দণ্ডীর বিরুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের সমরাভিযান, পাণ্ডবঘরণী সুভদ্রা দেবীর দণ্ডীকে অভয়দান, একশত পক্ষ পাণ্ডব-ভ্রাতার সমরে নারায়ণের সৈন্যাপত্যে চালিত দেবগণের বিপক্ষে মহাসমর, ভক্তের সহিত ভগবানের দ্বৈরথ যুদ্ধ, দুর্ব্বাসার শাপে অশ্বিনীরূপী উর্ব্বশীর অষ্টাঙ্গ সম্মিলনে মুক্তি ইহাই এই নাটকের বর্ণিত বিষয়।

এই নাটকে ভীম, শ্রীকৃষ্ণ, কঞ্চুকী ও সুভদ্রা চরিত্র কবির নিপুণ তুলিকায় উজ্জ্বল! কঞ্চুকীর হাস্য-রসের মধ্যে মধ্যে আবিলতা থাকিলেও, উহা তাঁহার চরিত্রের উপর ভাসমান মলামাত্র। তাঁহার হৃদয়ে যে অনাবিল ভক্তিরসের একটানা স্রোত ওর্ ওর্ বেগে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা মলাস্তরে ক্ষমিতে দেয় না। আশ্রিত রক্ষা রূপ ক্ষত্রধর্ম্ম পালনার্থ কৃষ্ণ-ভক্ত, কৃষ্ণের চরণে সমর্পিত প্রাণমন ভীম, তাঁহার আরাধ্য দেবতা কৃষ্ণের বিপক্ষেই কুলগৌরব রক্ষার্থ —পাণ্ডবের গৌরব-বর্দ্ধনার্থ দণ্ডায়মান!

কঞ্চুকীর ভক্তিপ্রবণ হৃদয় আঁধার বনপথে আলোক দেখিতে পাইতেছে। বিশ্বাসের বর্ত্তিকা জ্বালাইয়া কঞ্চুকী সুভদ্রাকে লইয়া গহন বনে যার আরাধনায় চলিয়াছে! সুভদ্রার মনে সন্দেহের ঘোর রহিয়াছে তাই তিনি আলোক দেখিতে পাইতেছেন না। এ দৃশ্যটি বড় সুন্দর!

ভদ্রাদেবীর ক্ষত্রধর্ম্মী-জনোচিত আশ্রিত-পালন-ব্রত ও অষ্টবজ্রের সংযোগে উর্ব্বশীর শাপ-বিমোচন সমস্যার ঐকান্তিক প্রয়াস শুধু পাণ্ডবের কেন ভারতের গৌরব কথা! ভদ্রা দেবীর চরিত্রাঙ্কনে গিরিশচন্দ্র যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা তাঁহার অর্জ্জিত গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের সমুদয় পৌরাণিক নাটকের মধ্যে "পাণ্ডবগৌরব" স্বগৌরবে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

১৮। শ্রীমদ্ভাগবত ও পুরাণাদি হইতে গৃহীত পৌরাণিক নাটকাবলী।

এই শ্রেণীর সাতখানি নাটকের মধ্যে 'দক্ষযজ্ঞ,' 'ধ্রুবচরিত্র', 'প্রীবৎসচিন্তা', 'কমলেকামিনী', 'প্রহ্লাদ-চরিত্র ও 'প্রভাসযজ্ঞ' এই ছয়খানি তাঁর রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়। মিনার্ভায় নূতন অভিনীত, গিরিশচন্দ্রের শেষ রচনা 'তপোবল'ই তাঁহার সর্ব্বশেষ পৌরাণিক নাটক। তাঁরে যেন তখন পৌরাণিক নাটকেরই যুগ চলিতেছিল। তখনকার দর্শকদের রুচি এত সুমার্জ্জিত হয় নাই! তাই তাহারা উপর্য্যুপরি পৌরাণিক নাটকাবলীর অভিনয় দর্শনে অতৃপ্তি বা বিরক্তি বোধ করিতেন না। রঙ্গমঞ্চ তখন সমাজে এক নূতন প্রবাহের মুখ খুলিয়া দিয়াছিল। ধর্ম্ম-পিপাসু হিন্দুসমাজ তখন রঙ্গালয়-নিঃসৃত ধর্ম্মের পূত নির্ঝর হইতে অঞ্জলি পুরিয়া নির্ম্মল বারি পান করিতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই। তখন বঙ্গের অনেক কৃতী সন্তান, অনেক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-সজ্জন, অনেক পরম বৈষ্ণব বারনারী সংস্পৃষ্ট রাঙ্গালয়ে আসিতেন শুধু ধর্ম্মের মহিমা দর্শন করিতে শুধু ধর্ম্মের প্রবল আকর্ষণে, দেশে তখন ধর্ম্মের স্রোত বহিয়াছিল। কত অধার্ম্মিকের হৃদয়েও মৃত অথবা সুপ্তধর্ম্মভাব জাগ্রৎ ও পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল। বস্তু গিরিশচন্দ্র একমাত্র তোমার কৃষক-লেখনী বলে যে, বিরাট্ সংস্কার (Reformation) আনিয়াছিল তাহা প্রতীচ্য খৃষ্টের Church Reformation হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে। বরং য়ুরোপে Church Reformation (খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সংস্কার) রক্তপাত, প্রাণাহুতি ও অত্যাচারের মধ্যদিয়া পথ করিয়া লইয়াছিল, গিরিশচন্দ্রের অমর-লেখনী বিনা আয়াসে সমাজে ধর্ম্মের স্বচ্ছস্রোত-মুখ হইতে নাস্তিকতা ও সন্দেহের পাষাণ সরাইয়া দিয়া দেশে

ধর্ম্মের পূত মন্দাকিনী প্রবাহিত করিয়াছিল!
এক যুগই গিয়াছে।

'দক্ষযজ্ঞ'নাটকে দশমহাবিদ্যার আবির্ভাব 'নলদময়ন্তী' নাটকে কমল-কোরক প্রস্ফুটিত হইয়া অপ্সরাদিগের প্রকাশ প্রভৃতি কতিপয় বৈজ্ঞানিক শিরোভাবিত দৃশ্য সংযোজনায় গিরিশচন্দ্র তদানীন্তন রঙ্গমঞ্চের সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছিলেন।

'দক্ষযজ্ঞ' নাটকে মহাদেব ও সতীর আদর্শ প্রণয়-বন্ধন অতীব অনুপম। প্রস্থতির "নাচে বাহু তুলে, ভোলা ভাবে ভুলে" ইত্যাদি সংগীতে প্রেমে আত্মহারা স্বয়ম্ভু মহেশের যেন আলেখ্য নিবদ্ধবৎ ফুটিয়াছেন।

"ধ্রুবচরিত্রে"র ন্যায় একাগ্র ভক্তি-রসাত্মক নাটক বঙ্গসাহিত্যে বিরল। এই নাটকে ধ্রুব ও সুনীতির চরিত্র সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করে। বনমাঝে নারদকে দেখিয়া বিষ্ণুজ্ঞানে ধ্রুব অভিমানভরে গাহিতেছে,—

"তুমি কি নিঠুর এমন।
কাঁদি বনে বনে, হ'ল কি হে মনে,
নিয়েছি চরণে শরণ"—

তখন অভিমানকাতর একাগ্রচিত্ত ভক্ত-হৃদয়ের কি সুন্দর একখানি চিত্র নয়ন-সমক্ষে উদ্ভাসিত হয়। এই নাটকের অন্তর্গত "আয় রে আয় হরি ব'লে বাহু তুলে নেচে আয়" একখানি সর্ব্বজনপ্রিয় সঙ্গীত, বৈষ্ণব ভিখারীদের মধুরতার তালে গীত হইতে শুনা যায়। ধ্রুব পরীক্ষা করিতেছেন, ডাকিলেই হরি সাড়া দেন কি না। ভক্তবৎসল হরি ডাকিবামাত্রই উদয় হইতেছেন। এই স্থানটী এত সুন্দর যে আমরা সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাবার লোভ সংবরণ করিতে পারি-তেছি না। ধ্রুব গাহিতেছে,—

"নাচ বনমালী, দিব করতালি
শুনিব নূপুর বাজিবে পায়।
হরি ব'লে ধ্রুব নেচে চলে,
হরি ব'লে ধ্রুবপ্রাণ জুড়ায়।
(কৈ ঠাকুর!)
নাচ হরি, হেরি নয়ন ভরি,
পরাণ ভরি ডাকি হরি হরি,
ধ্রুব ভালবাসে, পীতবাসে
প্রাণ দেখিতে ধায়।
(কৈ ঠাকুর!)
বাঁকা শিখিপাখা, দুটি নয়ন বাঁকা,
কিবা অলকা তিলকা রেখা;
পায় পায়, বাঁকা ভাম দাঁড়ায়
ধ্রুব ও দুটি চরণ চায়॥
(কৈ ঠাকুর!)

সমুদয় গীতটী প্রেমময় ভক্তবৎসল ভগবানের উদ্দেশে ভক্তের সমস্ত হৃদয়ের অনুরঞ্জন। ভক্ত, স্বীয় প্রাণারামে ভগবানের দর্শনে আনন্দ আবেশে ভক্তি-উছল নেত্রে গাহিতেছে। আবার ভক্তবৎসল ক্ষণিক অদর্শনে কাতর হইয়া লোমাঞ্চকর স্বরে ডাকিতেছে, "কৈ ঠাকুর!" এরূপ ডাকের মত ডাকে কি ঠাকুর না দেখা দিয়া থাকিতে পারেন?

'শ্রীবৎসচিন্তা'র নানারূপ ঘটনার সমাবেশের উপর শ্রীবৎস ও চিন্তার প্রতি কমলার কৃপার পূর্ণবিকাশ ও শনির পরাজয় বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের অন্তর্গত 'বাতুল' চরিত্রটি কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। রাজা ও রাণীর দুঃখে কাতর-হৃদয়, সুখে দুঃখে তাঁহাদের অনুগামী, তাঁহাদের সৌভাগ্য ও সুদিন ফিরাইতে একান্ত প্রয়াসী, এই অর্দ্ধ-দার্শনিক, অর্দ্ধহাস্য-রসিক বিদূষক প্রকৃতির (half a philosopher and half a fool) চরিত্রটী কবির কয়েকটী মাত্র নিপুণ রেখাপাতে সমুজ্জ্বল। কবি এই নাটকে দেখাইয়াছেন যে দুঃখের পর সুখ নিয়তির অবশ্যম্ভাবী চক্রনেমি পরিবর্ত্তনের ফল। দুঃখের সময় ধীর ভাবে দুঃখকে সহ্য করাই প্রকৃত বীরত্ব ও মনুষ্যত্ব।

'কমলে কামিনী' শ্রীমন্ত সওদাগর ও কালীদহে কমলে কামিনীর উপাখ্যান হইতে বিরচিত। ইহাতে খুল্লনার ভক্তি-প্রবণ হৃদয় ও নানা বিপদের মধ্য দিয়া চণ্ডীর দয়ায় শ্রীমন্তের মুক্তি যেন উজ্জ্বলবর্ণে

চিত্রিত। এখনও বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে বৈষ্ণব ভিখারীরা খঞ্জনী বা বেহালা বাজাইয়া এই সকল পৌরাণিক নাটকের গানগুলি গাহিয়া বেড়ায়।

যাত্রায়, গানে, কথকতায়, পাঁচালীতে এই সকল চির-মধুর পৌরাণিক কাহিনী বাঙ্গালার জন-সমাজকে চিরপ্রবুদ্ধ, চিরস্নাত করিয়া রাখিয়া আসিতেছিল। গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা সেই চিরপরিচিত ভাব-রাজীকে সুবর্ণ-মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল।

'প্রহ্লাদ চরিত্রে' ভক্ত প্রহ্লাদের ভক্তির পরীক্ষা স্বরূপে শতনির্যাতনের পর, ভক্তবৎসল হরি ভক্তের প্রতি দয়া করিলেন।

'প্রভাস যজ্ঞে' একান্তসখ্যবৎসল রাখালবালকগণ, বিরহিণী শ্রীরাধা ও কৃষ্ণহারা যশোদার করুণ সঙ্গীত সকলেরই হৃদয় গলাইয়া দেয়। শত বৎসর কৃষ্ণহারা বিরহিণী ভগ্নচিত্তা রাধিকা আকুলভাবে নিজের বিরহবিধুর হৃদয়-ব্যথা সখীগণকে জানাইয়া গাহিতেছেন :—

এখন ও এ প্রাণ আছে সই।
এলে সখি, দেখা হোতো, কালা এল কৈ?"

শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে ব্যাকুল রাখালবালকগণের মুখে

"এস হে কানাই, কোথা আছ ভাই
ঘরেরে রাখাল, দেখনা, দেখনা।
আয়রে গোপাল, ব্রজের রাখাল,
তোমা বিনা আর কিছু তো জানে না।"

ইত্যাদি সঙ্গীত কৃষ্ণগত-প্রাণ সখ্যবাৎসল্যের পরিচায়ক রাখাল বালকেরা গাহিতেছে তাহারা তাহাদের কানুর জন্য হাতে বনফল, চোখে জল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কানু, একবার আসিয়া দেখিয়া যাও। এখন কি ধেনুগণও আর তৃণ স্পর্শ করে না, ভোজন ত' দূরের কথা। তোমার বিহনে তাহারাও আঁখিজলে ভাসে, কাতরে হাম্বারবে তোমায় ডাকে ও দূর যমুনার পানে তাকাইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তুমি এত নিষ্ঠুর যে আমাদের হৃদয় ব্যথা বুঝ না?

প্রভাসে আসিয়া দ্বারিকাস্থিত প্রত্যাখ্যাত রাখাল বালকগণ অশ্রুসজল নেত্রে গাহিতেছে, "প্রভাসে তোর রাখাল ঘরে কোথা রাখালরাজা ভাই। আয়রে তোরে দেখে মরি, এদ'রে এস কানাই।" তাহারা শুধু একবার চোখে দেখার পিয়াসী গোধনও প্রাণের কানাইকে দেখিবার জন্য ঝরঝর ধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে, এবং আকুল উদাসনেত্রে পথপানে চাহিয়া হাম্বারবে ডাকিতেছে।

কি ঐকান্তিক বিশ্বাস ও গভীর প্রেমদৃঢ়তায় স্থাপনপূর্ব্বক ললিতাকে সম্বোধন করিয়া বিরহিণী শ্রীরাধা গাহিতেছেন :—

"কেমনে বল সজনি, আশা দিব বিসর্জ্জন।
আসি ব'লে সে গিয়েছে, আশায় আছে এ
জীবন॥
আমা বিনা সে কি জানে
ভুলেছে সে, প্রাণ কি মানে,
প্রাণ রেখেছি যতনে, নাথ ব'লে কৃষ্ণধন।
সে যদি মরমো আমার
কে আর বল' আছে রাধার?
এমন কি হয়—সে আমার পর,
স'পেছি তায় প্রাণ মন॥"

বস্তুতঃ "প্রভাসযজ্ঞ" নাটক করুণ, স্নেহ, ভক্তি ও প্রেমরসের পূত প্রস্রবণ!

(ক্রমশঃ)

মরু-পথে

(বড় গল্প)

[শ্রীপতিমোহন ঘোষ]

১

বাউরী পাড়ায় এতদিন বড় একটা গোলমাল ছিল না। নমঃশূদ্রের দলেই কেহ কেহ মাঝে মাঝে আপনাদের ক্ষত্রিয় সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া পৈতা লইতেছিল, এবং এইটাই ছিল তখনকার দিনে গ্রামবাসীদের প্রধান আলোচনার বিষয়।

সহসা বাউরী পাড়ায় দলকেও যে এমন ধারা ক্ষুতে পাইয়া বসিবে তাহা কেহ ভাবে নাই, তাহাদের কাজ ছিল লোকের পাল্কী বহা, নয় কৃষাণী খাটা, নিজস্ব জমি জায়গা তাহাদের কোনকালে কাহার ছিল না, তাহা করিতে কাহারও প্রবৃত্তি দেখা যায় নাই। তাহাদের মেয়েদের দলেরও কাজ ছিল কৃষক বাড়ীতে ধানভানা এবং মাঠে গোবর কুড়ানো কাহার কাহার দু'চারটা ছাগল শূকরও ছিল। তাহাও ঐ না থাকার মধ্যে—মাঝে মাঝে তাহাদের দেশের সম্পন্ন গৃহস্থদের তাহার জন্য যে মূল্য যোগাইতে হইত তাহাতে তাহাদের নাভিশ্বাস উপস্থিত হইত বলিলে অন্যায় হইবে না। দু পাঁচ গ্রামের নিমন্ত্রিত আসিয়া দিবারাত্র পাছুই মদে পাড়া সরগরম করিয়া রাখিত। তাহার পর একদিন নিশাবসানে হয় কাহারও ধন চুরি—নয় কোন অবলার মনোচুরি করিয়া এমন বেমালুম অন্তর্ধান হইত যে তাহাদের পাত্তাই পাওয়া যাইত না। তাহা ছাড়া পুরুষ দলের দিনের আহারই ছিল পাছুই মদ, মেয়ের দলেও অনেকে ঐ পাছুই খাতে নাম লিখাইয়াছিল কিন্তু অনেকের সব দিন তাহা জুটিয়া উঠিত না।

শিক্ষা দীক্ষা বলিয়া কোন ব্যাপার ইহাদের মনের গায়ে কোন্ দিন দাগ কাটিয়া যাইতে পারে নাই। এবং এই অনুপাতে আদিমযুগের একদল আপকোরা সংস্করণ রূপে ইহাদের ষ্টাণ্ডার্ড করিয়া চালানো যাইতে পারে। কারণ ইহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ আছে, নিকা আছে, সাঙা আছে, এবং স্ত্রী স্বাধীনতা যে অতিমাত্রায় আছে তাহা খুলিয়া বলাই বাহুল্য। তবু এই অধমের দল গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু ও সম্পন্ন লোকের পায়ের তলায় পড়িয়া থাকিত। এবং নেশা ছুটিয়া গেলে যখন দেখিত ভাণ্ডারে আর কিছু নাই, তখন বড় বাবু মেজ বাবু ছোট বাবুর পা ধরিতেও ইতস্ততঃ করিত না। তাহাদের ছেলেরাও পিতৃ পিতামহানুক্রমেই চলিয়া আসিতেছিল।

সহসা কোথা হইতে কে একদিন আসিয়া এই আত্মবিস্মৃত সুপ্ত জাতিটার কর্ণে মন্ত্র বাজাইয়াদিল। লোকটা বুঝি ইহাদেরই কোন কুটুম্ব হয়। জামাই সম্পর্কে সে এখানে আসিয়াছিল এবং কয়েকদিন থাকিয়া দেশের হাল গতিক দেখিয়া স্পষ্টই একদিন তাহাদিগকে জাগিয়া উঠিতে বলিল। বংশী সর্দ্দার তাহাদের বলিয়াছিল হবে তোরা পলায়ে থাকনে, একবার বুক ফুলিয়ে সামনে রুখে দাঁড়া!—দেখবি তোদের আর ছাগল পণ্ড যাবে না। তোদের তখন দর বাড়বে। ফলও হইল মন্দ না। সর্দ্দার মজুরীর লোভে অনেকে চাষ বাসের জমাও কারী ঐ জাতিটার হাতে দিয়া ফেলিয়াছিল, তাহারই ফলে যখন তাহারা ধর্ম্মঘট বনাম কাজে কামাই করিতে লাগিল তখন সকলের চমক ভাঙ্গিল। এবং ধরবার

হইল মেজ বাবুর চণ্ডীমণ্ডপে মেজ বাবু চণ্ডীপ্রসন্ন রায়ের তখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। চণ্ডী বাবু সকলকেই ডাকাইলেন, সকলেই প্রায় আসিল, আসিল না কেবল শীতল খাউরীর ছেলে গোবিন্দ—আর মধুর পুত্র বলাই। যৌবন তাহাদের দুজনকার জীবনের উপর দিয়া কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ উন্মত্ততা লইয়া ছুটিয়া যাইতেছিল। তাহাদের তখন কাহাকেও গ্রাহ্য করিবারও মন নয়, তবে পিতৃপিতামহের ধর্ম্মে যাই হোক দিন কতক মতি স্বাকার করিয়াছিল।

শীতল শুদ্ধ গোবিন্দকে অনুযোগ করিল "যা হারা বড় লোকদের কথায় অমত করতে নাই।"

গোবিন্দ তাহাদের বংশীর কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল, আমাদের নইলে যখন চলবে না তখন আমাদের মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হোক মধু পুত্র বলাইও ঐ কথা বলিল, যদি মাইনে উপর করে দাও তবেই কাজে বেরুব নইলে নয়।

শুভ দূত যাইয়া মেজ বাবুর কর্ণে এই দুঃসংবাদ প্রদান করিল। মেজ বাবু খানিক গভীর ভাবনা চিন্তার পর বলিলেন, আচ্ছা আর সবাই কাজ করতে রাজী আছে?

কেহ নয়ে কেহ তর্কিতে নিবেদন করিল হাঁ বাকী সকলে কাজ করিতে রাজী আছে। একদিনে কাজ বন্ধাই করিয়া তাহারা গ্রামের অনেক নিরীহ ভদ্র লোকদেরও কম ক্ষতি করে নাই, যে কারণে এই অবসরে নিরীহ ভদ্রলোকেরা শুদ্ধও বিষ বাণ প্রয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না। চারিদিকে নানা জল্পনা কল্পনা চলিতে লাগিল। দাদাঠাকুর রামলোচন চক্রবর্ত্তী কলিশেষে সব যে একবর্ণ হইয়া যাইবে, সত্যনারায়ণের পাঁচালী হইতে তাহার বিশদ প্রমাণ তুলিয়া বর্ণনা করিতে লাগিলেন। গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বণিতা স্থির নেত্রে তাহা শুনিতে লাগিল। এ দিকে গোবিন্দ আর বলাই তাহাদের কোন দিকে ভ্রূক্ষেপই নাই। তাহারা দিব্য টেরি কাটিয়া সেজি চড়াইয়া সিধুর টয়া পরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কোন দিন নিতান্ত প্রয়োজনে নদীর ধার দিয়া কিছু মাছ ধরিয়া আনে। উভয়েরই মা বাপ আছে সে জন্য উভয়েরই পেটের ভাবনার চিন্তাটা নাই। মাঝে মাঝে বংশীও আসিয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যায়, তাহারা আবার দল পাকাইবার চেষ্টায় রহিল।

(২)

শুভ দূত মেজ বাবু সকাশে নিবেদন করিল, রাজ্যপাট আপনাদের সব যায় প্রভু, দিন থাকিতে ব্যবস্থা করুন।

শুভ দূত আর কেহ নহে গোবিন্দরই বুড়া মকিন্দ, মকিন্দর এই বয়সে তিনবার বিবাহ, সেই কারণে সে অনেকগুলি ছেলে পুলের পিতা হইয়া পড়িয়াছিল, আবার শেষ পক্ষের যে স্ত্রীটি সম্প্রতি তাহার ঘর করিতেছেন তিনি আবার তাঁহার পূর্ব্বস্বামীর দুটি বালকের জীব আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, সুতরাং মকিন্দকে একটু বেশী করিয়াই খোসামোদ পনা রাখিল করিতে হয়, তাহা ছাড়া সে কথায় কথায় শীতলের কথা তুলিয়া বলে যাহার একটা ছেলে তার ভাবনাই বা কি চিন্তাই বা কি।—

আসল কথা তাহার ভাইএর সংসার কি ভাইএর ছেলের উপর বেশ আস্থা ছিল না। তাহার শেষ পক্ষের স্ত্রী মালতীও তাহাকে প্রতিদিন বলিতেছে যদি সে কইখানিতে যায় তবে সেখানে সুখ সৌভাগ্যের অন্ত থাকিবে না তবে গ্রামের লোকের অনেক দেনা আছে, দেনাগুলা শোধ করিয়া না দিলে কেহ চলিয়া যাইবার পথই দিবে না।

মেজবাবু তাঁহার বিশাল বপুর উপর স্থাপিত ক্ষুদ্র মস্তিষ্কটি খানিক এধার ওধার তীব্র সঞ্চালিত করিয়া শুধু ছোট একটু "হুঁ" বলিয়া আর কিছুই বলিলেন না। প্রায় সেদিনকার মত কথাটা রহিল।

ইহার কয়েকদিন পরে একদিন মেজবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁরে এই চার পাঁচ মাস ওরা আছে কি ক'রে?

মকিম জোড়হাত করিয়া বলিল—"আজ্ঞে হুজুর কি ক'রে বলব বলুন, যখন একত্তারে ছেলাম—তখন সব জান্তাম—এখন ত জানিনে।"

মেজবাবু বিষম গ্রাম ভারী চালে স্বরটা একটু কড়া করিয়া বলিলেন—"কোথায় খাদ ও খাটারা তা তুই কিছুই জানিস্‌নে?"

মকিম ভয়ে থতমত খাইয়া বলিল—"আজ্ঞে তা জানি বই কি হুজুর—আপনার এটো কাঁটাতেই ওর নাম কি—"

মেজবাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, পয়সা কড়ি ঐ শেতলাটাই আনে টানে, সেই ত উপায়ে?

"আজ্ঞে হাঁ" বলিয়া খানিক বসিয়া থাকিল তারপর তামাকুর অনুসন্ধানে উঠিয়া গেল।

মেজবাবু তাঁহার গোমস্তা ইন্দির‌কে একটা ডাক দিলেন, ইন্দির তাহার খাতা পত্রের কাজ সারিয়া কৃষকদের জন্য মাঠে ভাত লইয়া যাইবার আয়োজন করিতেছিল। তাহাকে গোমস্তাগিরিতে ভর্ত্তি হইয়া অবধি এই অতিরিক্ত কাউএর কাজগুলিও সারিয়া যাইতে হয়। কেহ তাহার জন্য তাহাকে কোন দিন ক্ষুণ্ণ হইতে দেখে নাই। যে হেতু ভদ্রলোকের ছেলের গ্রামে বসিয়া ১০ টাকা মাহিনায় কাজ জুটিয়াছে এই যথেষ্ট, কিন্তু দুঃখের বিষয় বেচারা বাপ মায়ের অনেক পয়সা জলে দিয়া এণ্ট্রান্স অবধি পাস হইয়াছিল।

মেজবাবু তাহাকে মাঠে ভাত দেওয়ার কাজ সারিয়া ভিন্‌গ্রামের থানার দারোগার কাছে যাইতে বলিল এবং কোন কাজ কর্ম্ম না করিয়া কোন ছোট লোকের ছেলে শুদ্ধ যদি ঘরে বসিয়া বসিয়া খায়—তাহার জন্য কোন প্রকার জবাবদিহি চলিতে পারে কি না জানিয়া আসিতে বলিল—যদি যুক্তিযুক্ত কারণ দর্শাইতে না পারিলে কোন প্রকার সাজা থাকে তাহা হইলে দারোগা মহাশয়ের কাছে অসঙ্কোচে গোবিন্দ ও বলাইয়ের নাম বলিতে বলিলেন।

ইন্দির যে আজ্ঞে বলিয়া চাদরটিকে কাঁধে ফেলাইয়া এবং তাহার আয়নাটিকে গামছা দিয়া হাত ঝুলাইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

পথে যাইতে যাইতে এই রকম অকারণে পরের বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করার কথা তাহার যে কোন প্রকার চিত্ত বিক্ষোভ ঘটিয়াছিল তাহা সঠিক বলিতে পারি না কিন্তু সে অনেকবার অনেক স্থলেই ঠকিয়া এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল যে নিঃসঙ্কোচে সুবোধের মত প্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়া যাওয়াই তাহার পরম কর্ত্তব্য; কোন প্রকার উচ্চ বাচ্য করিতে গেলেই তাহাকে অপমানের বিষে বিষণ্ণ হইতে হইবে। এই রকম অভ্যাস যোগে সাধিতে সাধিতে প্রভুর আদেশ পালনই তাহার পরম ধর্ম্মের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল এবং এ যাবৎ তাহাকে কেহ কোন দিন প্রভুর কথার উপর টু শব্দটি করিতে দেখে নাই—তাহা যতই কেন বিবেক বিরুদ্ধ আদেশ হউক—!!

ইহার দিন কয়েক পরে গ্রামের মধ্যে একদিন পুলিশের লাল পাগড়ী দেখা গেল, দারোগা মহাশয়ও স্বয়ং আসিয়া মেজবাবুর চণ্ডীমণ্ডপ হইতে গোবিন্দ ও বলাইকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

সেই দিন আবার বংশী তাহাদের ওখানে আসিয়াছিল। নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিলে যে সমস্ত মতলব মানুষের ঘাড়ের উপর চাপে তাহারও অনেক গুলাতে তাহারা আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, এবং বড় রকমের একটা ডাকাতি করিতে পারিলে তাহাদের অনেকগুলা দিন যে পরম আরামে নিশ্চিন্তে কাটিয়া যাইতে পারিবে এ কথাটা তাহাদের কল্পনাহীন বিচারবুদ্ধি হীন মস্তিষ্কে স্থান পাইয়াছিল।

কিন্তু "ছাদে লক্ষী লক্ষী হইল ছাড়া" তাহাদের কথাবার্ত্তা শেষ হইতে না হইতে যমের পেয়াদার মত গ্রামের চৌকীদার রসরা ... তাহাদের দারোগার আদেশের কথা জানাইল।

তাহারা দুই জনেই বংশীর মুখের দিকে চাহিল, বংশী ওস্তাদ লোক, সেই মুহূর্ত্তেই তাহাদের প্রায়

হইতে সরিয়া পড়িবার মতলব দিবে মনে করিয়াছিল—কিন্তু চৌকীদারের সামনে ও শীতল আসিয়া পাড়ায় বলিল, যাবে বৈকি, দারোগা দশাইএর হুকুম না গেলে হয়?

কিন্তু তাহার বুকটা দমিয়া গেল। শীতলকে বলিল—তুমিও শুদ্ধ যাও গো খুড়ো, দেখে এসো, আমার বোধ হয় দারোগা দশ আইনের কথা পাড়বে।

গোবিন্দর মা দোক্তা খাইতেছিল, দোক্তাটা প্রায় না মুখে দিয়াই ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ জামাই দশ আইনে কি হয়?

প্রথমটা বংশী নিজের অজ্ঞতার প্রচার করিয়া দশ আইনের সম্বন্ধে কিছুই জানে না এইরূপ বলিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু গোবিন্দর মা আহ্লাদীর বার বার পীড়া-পীড়িতে দশ আইনের ব্যাখ্যা করিতে হইল। এবং এই ব্যাখ্যায় উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ যে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল- তাহা তাহাদের মুখের ভাবের রেখাতেই স্পষ্ট অনুমান করা যায়।

সর্ব্বাপেক্ষা আঘাত বাজিল আহ্লাদির ও তাহার হবুবো জগতবল্লভীকে।

জগতএর সহিত যদিও গোবিন্দর এখনও সাঙাটা পুরা পাকা হয় নাই, কথামাত্র চলিতেছিল তবু সে পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসের ছেলেটাকে ধুপ করিয়া মাটিতে নামাইয়া দিয়া চুলগুলা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল "ওরে বাসরে কেউ বসে খেলে কারও সহ্যি হয় না এমনি অরাজুরি হলো?"

আহ্লাদি জগতের কথায় কর্ণপাত না করিয়া এ বিষয়ের কোথাও ভুল আছে কিনা খুঁজিতে পাড়ায় বাহির হইয়া গেল।

পল্লীর অন্যান্য জনগণও খুব সন্ত্রস্তচিত্তে এই একটি বিবাহার্থিনী অবলার ও আহ্লাদীর দুরবস্থাটা বেশ মনোযোগ দিয়াই বুঝিয়া যাইতে লাগিল।

জগতবল্লভীর খুড় শাশুড়ী মকিন্দর বৌ ঘাসতী বলিল, তাখ্ জগত এতটা চলাচলি করিস্ নে—এখনও তোদের সাঙ্গা হয় নি।

জগত চোক পাকাইয়া জবাব দিল "তা না হোক্‌গে গো—তোমায় কেউ সাধতে ডাকেনি, তোমরাই শালা পরামর্শ ক'রে যে এতখানি করচো তা ভগবান ছির সুদ্ধি স্পষ্ট দেখতে পাচ্চেন।"

ঘাসতী অবাক হইয়া গেল। অথচ সামান্য কারণে একজনকে দোষী সাব্যস্ত করা ইহাদের চিরাচরিত প্রথা—তুমুল একটা ঝগড়ার আভাষ সেই সন্ধ্যা বেলাতেই বাউরী পাড়াটায় প্রবল ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণের মত চারিদিক নিঝুম করিয়া রাখিল।

(৩)

গোবিন্দ আর বলাই সেই যে গেল রাত্রে আর তাহাদের বাড়ী ঢুকিতে হইল না—জীবিকানির্ব্বাহের সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে না পারায় অগত্যা তাহাদিগকে থানা ঘরেই আশ্রয় লইতে হইল।

অবশ্য এ আশ্রয়টা যে তাহাদের ভাগ্যদেবীর দুর্গতি পূর্ব্ব আশ্রয় হইতে বেশী আরামদায়ক ছিল না তাহা স্পষ্টই বলিতে পারা যায়।

গোবিন্দ থানায় আসিবার সময় অনেকখানি রোষকষায়িত দৃষ্টিতেই মেজবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া আসিয়াছিল "ধন্যি গো বাবু আপনার ধর্ম্মাধর্ম্মকে ধনি যেই।"

ধর্ম্মাধর্ম্ম যে কিছুই নাই সে কথাটা গোবিন্দ বলিবার ঢের আগেই দেশের লোক সে অপবাদটা মেজবাবুকে দিয়াছিল,—কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ করিবার ছিল না—'যে হেতু দুর্গাপূজার সময় বার্ষিক খরচের যে খতিয়ান খানা খোলা আছে তাহাতে তাঁহার বিবেক যথেষ্ট তাজা আছে, তাহাতে সকল ধর্ম্মাধর্ম্মের মূলে যদি অর্থই পরমার্থ হয় তবে তাহা শ্রীশ্রী৺মহামায়ার পূজার শতেকের অধিক ব্যয় হইয়া থাকে, তাহা ছাড়া পাল-পরব ব্রত নিয়মেও তাঁহার যথেষ্ট দান খয়রাত আছে, এই চন্দ্র গ্রহণের দিনে তিনি নগদ সওয়া পাঁচ টাকার চাউল খয়রাৎ

ধরিয়া ফেলিয়াছেন। এ নাগাইদ যাবৎ যে পাপটা তাঁহাকে অর্শিয়াছিল, তাহা হ'লে ছিল বড় দানটা-তেই শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন খালি নৌকা বোঝাই হইতে অনেক বিলম্ব।

সে কারণ আমিনের বেলায় শীতলের ঢালায় রকম কাকুতি মিনতি সত্ত্বেও দারোগাকে একটু অনুরোধ করিতে পারিলেন না।

দিন দুয়েক পরে আসামী সদরে চালান হইল। গ্রাম ময় একটা সোর গোল পড়িয়া গেল। এবং বাউরী পাড়ার যে কাণ্ডটা হইতে লাগিল তাহা আর ভাষার ছন্দে না গাঁথিয়া দেওয়াই ভাল। তাহারা কাহাকেও দোষী স্থির করিতে না পারিয়া পরস্পর পরস্পরে তুমুল বাগ যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল।

এই ঝগড়া করিবার জন্য মকিন্দর আর সেদিন কাজে যাওয়া হইল না।

ইহার পর ছোটবাবু গ্রামান্তর হইতে বাড়ী আসিলেন। শীতল এখন তাঁহার পায়ে হাতে গিয়া পড়িল, সকল গ্রামেই দু-একটা দল আছে, শীতলের সুবুদ্ধি যে সে দলপতিকে চিনিতে পারিয়াছিল, কিন্তু ছোটবাবু অর্থবলে তত্টা বলী নয়, সে কারণ আমিনের বেলায় স্বয়ং দাঁড়াইতে পারিলেন না—তবে যথেষ্ট তদ্বির করিতে লাগিলেন। কয়েকদিন নিজের রাহা খরচ পর্য্যন্ত নিজের পকেট হইতে খরচ করিয়া ফেলিলেন, এবং অভাগাদলকে অসীম ভরসা দিয়া বলিতে লাগিলেন "তোদের কিছুমাত্র ভয় নাই।"

ঘরের ঘটী বাটী ও সর্ব্বস্ব বোয়াইয়াও তবু কিন্তু গোবিন্দ ও বলাইকে উদ্ধার করিতে পারা গেল না। গোবিন্দর মার একটা ভাল গাই ছিল, বেচারী প্রাণের দায়ে সেটাকে শুদ্ধ বেচিয়া টাকা করিল এবং সে টাকা উকীল মোক্তারের পায়ে খরচ করিল, তবু তাহাদের খোলাসা করিতে পারিল না—গোবিন্দর তিনমাস ও বলাইএর ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হইল।

ছোটবাবু শীতলকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন "আপীলেরও উপায় নেই, শীতল কি করবি তবে এর শোধ আমাদের তুলতে হবে।"

শীতল মাথায় হাত দিয়া একবারে বসিয়া পড়িল।

নানারকম বামলা মকর্দ্দমায় উভয় ভ্রাতার মুখ দেখা-দেখি পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল, উপস্থিত এই মামলার ছুতায় সে বহি আবার ঘাউ ঘাই খুলিয়া উঠিল। অনেকে আশা করিতে লাগিল শীঘ্রই একটা প্রলয় বাধিয়া দুই ভাইএর যে শেষ বিষয়টুকু আছে তাহাও উবিয়া যাইবে। ফলে কিন্তু শরতের মেঘের মত শুধু নিষ্ফল গর্জ্জনই শোনা যাইতে লাগিল, বহু বিহারী ভৈরব যাহাদের পাড়াগাঁয়ে থাকিয়া মিথ্যা সাক্ষী দেওয়াই ব্যবসায় তাহারা শুধু কল্পনানেত্রে রণ-পয়োধির লহরী মালা গণিতে লাগিল। তাহারা চুকাইয়া বসিয়াছিল, কিন্তু দেখা গেল মেজ বাবুর মামলার দিকটায় তিড়িং-বিড়িং বেশ ঝা-চোছ নাই, তবু রসাতল এতদিনেই প্রয়োগ হইতে লাগিল—সেটা যে কে প্রয়োগ করে এবং কোথা হইতে যে শব্দভেদী উত্থিত হইয়া মর্ম্ম ছেদ করে—যাহাদের কখন পাড়াগাঁয়ে বাসের সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে তাহাদের ভিন্ন অন্য কাহা-কেও বুঝাইতে পারিব না এবং সে বিদ্যাও আমার নাই।

মাস তিনেকের পরে গোবিন্দ যখন জেলখানা হইতে ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল ঘরের চালে এক বস্তি খড় নাই, ছোট রাঁধিবার জন্য যে চালাখানা ছিল সেটার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হইতে বসিয়াছে আর তাহার আদরের জগতবরণী রোগে পড়িয়া আধখানা হইয়া গিয়াছে, কেমন কাল মেঘের মত চুলের রাশ ছিল—সেগুলা কোথায় রুক্ষ হইয়া উড়িয়া গিয়াছে; তাহার ছেলেটারও অধরে হাসি নাই।

গোবিন্দর চোখ দিয়া জল আসিতেছিল, তাহা মাকে দেখিয়া সে জল কোথায় শুকাইয়া গেল, অভাগিনী মা শ্মশানের একটা কঙ্কালের মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া আসিতেছিল—এই দেহ লইয়া তাহাকে ভাত

বাঁচিবার আসন খুঁজিতে বাহির হইতে হয়, তাহার হাতেরও বলা উচিত। তবে পড়শীরা বলিতে লাগিল এ দিন করিয়াছে বটে কপাল—শুধু স্বামী খাওয়া বলিয়া নয়—বলাইএর মার পর্যন্ত ভাত রাঁধিয়া দিয়াছে, নিতান্ত আপনার জনেও এতটা পারে না।

কিন্তু বলিবার সাধ্যে গোবিন্দর কুলাইতে ছিল না। পাড়ার লোক চারিধারে ভিড় করিয়া বসিয়াছিল, শুধু দীর্ঘশ্বাসই পড়িতে লাগিল—সে এমন মর্ম্ম ভেদী দীর্ঘশ্বাস যে—সে শ্বাস যদি ভৈরবরূপ কি নাগীরথীর রূপ ধরিয়া বাহির হইত তবে তাহাতে একটা বড় উথিত হইত এবং সে ঝড়ে ঈশ্বরের আসন পর্য্যন্ত টলিয়া উঠিয়া পৃথিবীকে কাঁপাইয়া দিত। এ নিতান্ত পর জন-চারী গো-বেচারা গোবিন্দর দীর্ঘশ্বাস—কাজেই তার আসে পাশের লোকগুলা পর্য্যন্ত স্থির হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

এদিকে আবদ্ধ বলাইএর মার কান্নাটা আকাশ কাঁপাইয়া একলোক হইতে আর একলোকে প্রতিধ্বনিত করিয়া ছুটিয়া যাইতে লাগিল। বলাইএর মাকে সান্ত্বনা দিবার মত কিছুমাত্র সবল সে করিয়া আনে নাই, তাই ছেলের ভাল ভাতের কথাটা মাকে তাহার—যাহা নয় তাহারও অনেক খানি মিথ্যা যোগ করিয়া বলিয়া গেল। বলাইএর মা তাহাতে কি সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? কেবলই বলাই কি খাইতে ভালবাসিত, সেই কথা গুলা লোকের কাছে চোখের জল দিয়া আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিল।

গোবিন্দ বলাইএর দুঃখে যতটা না হউক বলাইএর মার দুঃখে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। গুনিল কয়দিন যাবৎ বেচারী মার একবারে আহার পর্য্যন্ত জুটে নাই তারপর তার মা, অগত, এরা তাহাকে দুটো নাকে ভাত দিয়া আসিতেছিল।

গোবিন্দ ঠিক করিল আর নয় এখন তাহাকে বাঁচিবার রাস্তা—সিধা রাস্তা ধরিতে হইবে বংশীর বাঁশীতে স্বর্গসুখের সন্ধানে বাহির হইবে না। এই কয়দিন জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়াও বাঁশীকে একবারে নিমন্ত্রণ করিল না।

পরের বাড়ী কুষাণী করিয়া খাটিয়া খাইবার আশা তাহার গিয়াছিল—যেহেতু মানুষ নাকি এই জেল ফেরতের ধরণ তাহাকে যথেষ্ট সন্দেহের চক্ষেই দেখিতেছিল এবং তাহার তেজস্বী হৃদয়টাও ছিল বিষম রোখা, অন্ততঃ বাবু কেরাণী কুলের মত নয়। অনুগ্রহ দৃষ্টি কি বিষ দৃষ্টির অপমান হইতে আপনাকে ষোল আনা রেহাই দিতে নিজের গতরকেই অড়াইয়া ধরিল। দেহের উপরেও সে বিশ্বাস তাহার ছিল। যদিও জেলের খুব খাঁটা অনেকখানি তাহাকে কাহিল করিয়া দিয়াছিল তবু অটল ধৈর্য্যে আসখানা ঘাড়াইয়া লইয়া নদী পথে বাহির হইয়া পড়িল।

অনেক কষ্টে শীতল আসখানা বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল, ব্রজ সামন্ত নগদ পাঁচ টাকা দিয়া বাঁধা রাখিতে চাহিয়াছিল, শুধু আল্লাহিই ওটা দেয় নাই। স্বামীর হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছিল, অগত তাহার বড় নাদাটার ভিতরে ওখানা পুরিয়া রাখিয়াছিল।

প্রথম দিনেই যথেষ্ট মাছ ধরিয়া আনিয়া গোবিন্দ বুক ফুলাইয়া তাহার—মাকে বাবকে জগৎকে এবং বলাইএর মাকে পর্য্যন্ত আশ্বাস দিল তোমাদের কোন ভয় নাই, যতক্ষণ আমার হাতে জাল আছে ততক্ষণ তোমাদের বিন্দুমাত্র চিন্তা করিবার নাই।

(৪)

দুঃখের রাত্রি যখন প্রভাত হয় সুখের সকাল বেলাতেই তখন পাখীর কলগীতি ভ্রমরের গুঞ্জন আপনি ফুলের বনের পাশে মাতিয়া উঠে। জীবনকে তখন খুঁজিয়া পাখিয়া আহরণ করাই হইল প্রকৃতির কার্য্য, তাহার জন্য তাহার ভাণ্ডারের কত গীতি গন্ধ বর্ণ বৈচিত্রের বিচিত্র সমারোহ। মানুষও সৃষ্টির বাইরে নয়, তাই পড়শীরা জগতের দিকে কাণ্ডীরা গোবিন্দর চারিধারে ওঠি একটা গানের

ঘুরা জাগাইয়া রাখিল। এমন কি সন্ধ্যাবেলায় মধু খাইতে খাইতে শীতলও শুনিল, কিন্তু শীতল উপযুক্ত পুত্রের কথার উপরে কথা কহিতে চাহে না, পুত্র যখন বলিল—বলাই আসিলে তবে বিবাহ হইবে তখন বলাই আসা পর্য্যন্ত ব্যাপারটা মুলতুবী রাখিতে কাহারও আপত্তি হইল না।

মকিন্দর বৌ মালতী সে কিন্তু লোকের কাছে কেবলি বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, জগতের অন্যত্র কোথাও লোক ঠিক করিয়া লওয়া উচিত। যেহেতু গোবিন্দকে মোটে বিশ্বাস করা চলে না, সে জেল খেটত—জাগী, আসামী বদমাইস ইত্যাদি।

জগত কোন কথাই কাণে করিল না। এক লক্ষ্যে সেই পরম দিনটির জন্য গোবিন্দের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু এমনি অদৃষ্টের পরিহাস ফুল ফুটিতে ফুটিতে আর ফুটিয়া উঠিল না—।

একদিন থানা হইতে খবর আসিল যে জেলের মধ্যে বলাই মারা গিয়াছে। তাহার নিউমোনিয়া হইয়াছিল, সে কারণ বাঁচে নাই। বলাইএর মা "উঃ বাবারে" বলিয়া সেই যে শুইল আর উঠিল না। দিন কয়েকপরে তাহাকে শ্মশানে দাহ করিয়া একটা কথা কেবলি গোবিন্দর মনের মধ্যে ঘুর পাক খাইতে লাগিল—এই যে বলাই মরিল তাহার জন্য—দায়ী কে?

অবশ্য কথাটার কতক অংশ বংশীই তাহার প্রাণে আগুনের রেখায় জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছিল। তখন কথাটায় তত তত্ত্ব করে নাই এখন প্রতিদিনই গোবিন্দকে এই কথাটার সম্মুখে দাঁড়াইতে হয়।

ভগবান, ঈশ্বর, দেবতা—এসব বালাই কোন দিন গোবিন্দর ছিল না, এখন থাকিয়া থাকিয়া তাহার ঈশ্বরের দরবারে ছুটিয়া যাইতে ইচ্ছা করে, মনে করে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া আইসে তত বড় ঈশ্বরটাকে যে মনের দুয়ারে ঠেলিয়া দিলে তাহার জন্য দায়ী কে?

কোন বিদ্যাও ছিল না, সাধ্যিও ছিল না। এবং কোন প্রকার কাণ্ড জ্ঞানও তাহার ছিল না। নিজের অতি দুঃখে কখন সাদা কথায় ঈশ্বর আদি বলিতে হয় তাই বলিয়াছে এমন ধারা প্রাণপূর্ণ আবেগে কিছু বলে নাই। বলাই যে তাহার দেহের আধখানা ছিল, সুখের দিনে দুঃখের দিনে তাহারা গলা জড়াজড়ি করিয়া এত বড়টি হইয়া উঠিয়াছিল সে বাঁচিয়া থাকিতে যে কথাটা তাহার মধ্যে কোনি দিন হয় নাই তাহার মরণের পরে রক্তের রেখায় রেখায় সেই কথাটা আগুনের অক্ষরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সে ছিল তাহার ভাই বন্ধু—সব। সে তাহার জন্য জেলে গিয়াছিল, সেই শুধু কিছু পাইল না—হায় বন্ধু! যখন বুকটা খুব জ্বালা করিয়া উঠে তখন বংশীর শেখানো প্রতিহিংসা কথাটা মনে বাড়িয়া অনেকটা তৃপ্তি পায়। কিন্তু সে এই সংসারে কত, টুকুই বা—আর প্রতিশোধ তুলিতে কি অস্ত্রই তাহার আছে?

তাহার উপর জগত প্রায় প্রতিদিনই ভয় দেখায় ওগো তুমি অসমসাহসী কিছু করতে যেও না, বন্ধু কিছু চিরকাল কারও থাকে না, একদিন আমাদের সবাইকে যেতে হবে। ধর্ম্ম আছেন।

সত্যই ধর্ম্ম আছেন, কিনা জানিবার জন্য ছোট বাবুর দুয়ারে গিয়া উপস্থিত হইল। যেদিন ছোট বাবু তখন আহ্নিকে বসিয়াছেন, অনেকক্ষণ ধরিয়া অপেক্ষা করিল তখনও ছোট বাবু উঠিলেন না।

গিন্নী একবার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া গেলেন কিরে গোবিন্দ বিয়ে থা করলি?

গোবিন্দ না—গো বলিয়া অন্যদিকে মুখটা ফিরাইয়া লইয়া উঠিয়া গেল। কাজেও তাহার মন বসিল না। আবার ফিরিয়া আসিয়া ছোট বাবুর দুয়ারে উপস্থিত হইল।

ছোট বাবু এখন আহ্নিক সেরে ভাত খাইয়া নিজেই তামাক সাজিবার উপক্রম করিতেছিলেন।

গোবিন্দ "রাম রাম" বলিয়া একটা নমস্কার ঠুকিয়া কলিকার আগুনটা সেই করিয়া দিতেছে

বলিয়া ছোট বাবুর হাত হইতে কলিকাটা চাহিয়া লইল।

ছোট বাবু ইতাবসরে হুকাটাও ঠিক করিয়া লইয়া গোবিন্দর জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন।

গোবিন্দ ধুয়াশীতি ঝাড়িয়া কলিকাটার টান দিয়া ছোট বাবুর সম্মুখে নামাইয়া দিল।

ছোট বাবুর জাতি সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিল, সেই জন্য কলিকাটা মাটিতে সে নামাইয়া দিয়াছিল, ছোট বাবু কলিকাটি আপনার হুকায় চড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন "কি খবর গোবিন্দ।"

গোবিন্দ কলিকার মলা হাতটা মাথায় ঝাড়িয়া হাতের আঁকরা চুলগুলাকে মাথার উপর আঁকাইয়া লইয়া বলিল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম যে ছোট বাবু যে জগতে ধর্ম আছেন কিনা!

ছোট বাবু প্রথমটা ত হাসিয়া উঠিলেন এ সব শ্লাসের লোক কখন যে ধর্ম লইয়া মাথা ঘামাইতে ইচ্ছা করে—এটা তাঁহার এত বৎসরের অভিজ্ঞতাতেও কখন ধরা পড়ে নাই। তবু তাঁহার হাসিবার প্রবৃত্তিটাকে হাসিতে উড়াইয়াও দিলেন না। সকৌতুক মৃদু হাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বল দেখি গোবিন্দ।"

গোবিন্দ বলিল—আমার দরকার আছে, বলিয়া খানিক চুপ থাকিয়া আবার বলিল, আপনার বড় দাদা মেজ বাবুর যে অর্থ নাই তা আমি জানি। অর্থ না থাকলে মানুষের দিন চলে কি না দেখুন এইটে আবার বুঝিয়ে বলুন। আপনাদের মেজবাবুর কিন্তু এদিকে দিন দিন উন্নতি ছাড়া অবনতি নাই। লোকে তাঁহাকে বলে ধনে পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর! তবু ওঁকে পড়তেই হবে। ওঁদের কথা সেই জন্য আমার কর্তব্যের মধ্যে নয়। ধরুন আমি যদি কোন অধর্ম করি—আমার বাপ মা ত কোন কালে কারও কাঁচা রাস্তায় পা দেয় নাই। আমি যদি অধর্ম করি আমার পাপ অর্শাবে কি? বাবু এই জন্যের ত এই শাস্তি সব চেয়ে ভয় লাগে ঐ বাবাটাকে তাই বলুন,

কেউ কেউ নাকি বলছে জগতে ধর্ম নেই—অধর্ম নেই, এক ধর্ম আছে কেড়ে নেওয়া—তাই বলে আমি তারও কেড়ে নিতেও চাইনে, আবার ধরুন আজকালকার ধর্ম নাকি পাপে, লোকও বলছে—

যে করবে পাপ সে হবে সাত বেটার বাপ

যে করবে পুণ্য তার কাঁদতে যাবে জন্ম—সত্য কি তাই?

ছোটবাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া তামাক টানিলেন তার পর বলিলেন, একদিন এস গোবিন্দ, আমি বুঝি তার পর বলবো।

গোবিন্দের কিন্তু মাথায় আগুন জলিতেছিল, ঠিক ইহার দিন তিনেক পরে আসিয়া আবার তাহার প্রশ্নের উত্তর চাহিয়া বসিল।

ছোটবাবু বলিলেন দেখ গোবিন্দ ধর্মের কালভেদ আছে, এককালে যা ধর্ম ছিল তাই হয় ত এখন অধর্ম—আবার এককালে যা অধর্ম—তাই এখন ধর্ম নামে চলে যাচ্ছে, তবে বাইরেতে যা দেখা যাচ্ছে ধর্মের আর এক নাম মাত্র আছে বোঝাবার। ঘোর কলি এখন ঐ যা এঁচে কেড়ে নেওয়াই ধর্ম! ভিটে, খাড়া করা গরীবদের গ্রাম হ'তে তাড়িয়ে দেওয়া এগুলাও বড়লোকদের একটা ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে, আগে ওতে বড়লোকেরা ভয় পেত। এখন দেখছি ও ত বেশ সয়ে গেছে, এই সেদিন ও বাড়ীর বড়বাবু একঘর নমঃশূদ্রকে গ্রাম হইতে তাড়িয়ে দিলে—এমন করে তাড়িয়ে দিলে যে বাচ্চাগুলোদের চারিটি রাঁধা ভাত তাও খেতে দিলে না, একবারে ভিটে হ'তে গ্রাম হ'তে তাড়িয়ে দিলে পাওনা শতখানেক টাকা—তা নমঃশূদ্রেরা বাবা বেটার এ নাগাদ খেটে এসেছে দশ বৎসর হবে। তবু একশ টাকার আর শেষ হল না, অবশেষে ভিটে ছাড়া করে রেহাই দিলে, আইন চোখ বোজা—আইন কি এই সব চোখ মিলে তাকিয়ে দেখে না মানুষের আর্তনাদ শুনতে পায়। আর হচ্ছেও তাই

কে তোদেরও প্রাণে আজ ধর্ম্ম অধর্ম্মের কথা াগচে।

কথা শেষ না হইতেই গোবিন্দ হয়েছে বাবু লিয়া উঠিয়া পড়িল।

ছোটবাবু বলিলেন যোস্ যোস্ গোবিন্দ আর এক ছিলিম তামাক খেয়ে যা, এখনও তোদের ানের বেলা হয় নি।"

তা হয়নি বাবু সত্যি, কিন্তু এখনও কিছু খাইও নি, জাল টেঁড়িয়ে ওমনি জালখানা ফেলিয়েই চলে এসেছি, কি বলব বাবু বলাই এর মার শশাটা দিয়ে যখন ঘুরে আসি তখন আর আমাতে আমি থাকি না।

ছোটবাবু তাহার একটি শিষ্য করিতে পারিয়াছেন মনে করিয়া তাহাকে উৎসাহ দিয়া প্রতিদিনই তাঁহার এই চণ্ডীমণ্ডপে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিলেন, ইহাও বলিয়া দিলেন গ্রামের আর কোথাও ধর্ম্ম তত্ত্ব কথা নেই, যা এইখানেই আছে।

গোবিন্দ আর একটা প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

(৫)

গোবিন্দ তাহাদের পাড়ায় প্রবেশ করিতেই দেখিল বংশী একটা বংশী হাতে করিয়া বেশ নিশ্চিন্তে জগতের ঘরের দাবায় বসিয়া বাজাইতেছে আর জগতের ছেলেটা ঐ বাঁশীর রবে আকৃষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত অতি যত্নে আহরিত মুড়ী মুড়কীগুলিকেও বিস্মৃত হইয়া বসিয়াছে, গোবিন্দকে দেখিয়াই মকিন্দর একটি মেয়ে সেও বাঁশীর রবে তাহার একটি এক বৎসরের শিশু ভ্রাতাকে কোলে করিয়া আসিয়াছিল অতি মৃদুকণ্ঠে জগতের পুত্রকে বলিল, ওরে পচা তোর বাবা আসবে, গোবিন্দ যে পচার মার নির্দ্ধারিত স্বামী সে কথা পাড়ার ছেলে মেয়ে সকলেই বলিয়া রাখিয়াছিল—এ জানাটাও ইহাদের মধ্যে আদৌ মিষ্ট নহে।

গোবিন্দ একেবারেই আসিয়া বলিল, "পেয়েছি রে।"

বংশী বলিল, "কি?"

গোবিন্দ বলিল, "যা তুমি বলতে পারো নাই, বলিয়া বংশীকে শুদ্ধ ডাকিয়া লইয়া দুটা শুকনা মুড়কি চিবাইতে গেল।

জলটল খাওয়া হইলে একটু সুস্থ হইবার পর গোবিন্দ বলিল, "আমি আজ ছোট বাবুর কাছে গিয়াছিলাম ভাই, গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম যে ছোট বাবু ধর্ম্ম আছে কিনা বলুন। তিনি বল্লেন, "নেই"। যদিও আছে, তা বড়লোকের ঘরে এক রকম আর গরীবের ঘরে আর এক রকম। বড়লোকের পাপ করলে সাজা নেই, কেড়ে নিলে দণ্ড নেই, কাউকে মিথ্যে হত্যে উচ্ছেদ করলে শাস্তি নেই, যেহেতু টাকা পয়সা আইন পুলীশ সব তাঁদের হাতে আর যত সাজা আমাদের বেলায়; আমরা চুরি না করলেও চোর, আর যারা দিনে ডাকাতি করে তারা সাধু! কিন্তু আমরাও মন্ত্র পেয়েছি। সে মন্ত্র হচ্ছে কথে দাঁড়ানো।"

বংশী বলিল, "আমি ত বলেইছি ভাই বাঁশী বাজিয়ে এ মথুরায় বাঘ ডাকাতে হবে।"

গোবিন্দ বলিল, "কি বাঁশী বাজাবি? তোর বাঁশের বাঁশীতে কিছুই নেই, আমি জানি তা কোথায় আছে" বলিয়া গোবিন্দ তাহার ঘরের মাচা হইতে একগাছা মোটা বাঁশের লাঠি বাহির করিয়া সে গাছটায় হাত বুলাইয়া ধূলা ঝাড়িয়া বলিল, "শক্তি যদি কোথাও থাকে, ভূত ছাড়াবার কামরূপ কামিখ্যের মন্ত্রি যন্ত্র যদি কোথাও থাকে তা এই লাঠির ভেতরেই আছে।" গোবিন্দ বাঁশখানা ভক্তিভরে একবার নিজের কপালে ঠেকাইয়া লইল।

বংশী বলিল, "ভাই সত্য বটে ঐ মহামায়ার মাত্র আমাদের ভূলোকে চলবে না। দিবারাত্রি জপ করতে হবে। আর আমার জাতভাইদের ডেকে বলতে হবে তোরা আপনাদের যা ঠাউরেছিস সত্যিই

তোরা তা বোস্—একবার মদ, ভাঙ, সিদ্ধির নেশা-গুলো ছেড়ে দিয়ে খাড়া দাঁড়াতে পারেই হলো—ওরে আমাদের নইলে দুনিয়া একদণ্ড চলবে না এ জানি, নিশ্চয় জানি।"

জগতও অন্তরালে দাঁড়াইয়া বংশীর এই মনোমোহন মন্ত্র শুনিতেছিল; যখন তাহাদের কথাবার্ত্তা শেষ হইল তখন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "দেখিতেছি মানুষের সর্ব্বনাশ করিতে বংশীর জোড়া নেই।"

ইহার পর গোবিন্দর এই মদ মদের ও তাড়ির রসে রসিত হইয়া ক্রমেই গাঢ়িয়া উঠিতে লাগিল—গোবিন্দ ফেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া একদিন মদ সেবন করে নাই, এখন সে তাড়ির ভক্ত হইয়া উঠিতেছে।

তাহার মা তাহাকে সাদী করাইবার কথা শুনাইলে বলে দাঁড়া সাদী ত হয়েই গেছে শুধু দুমটুনিকে দু' গেলাস মদ খাওয়ানো আর বাবা পঞ্চানন্দর তলায় দু'জনায় গাঁটছড়া বেঁধে দাঁড়ালেই হ'ল। আর পুরুত যকিন্দ খুড়ো ত ঘরের লোক।

জগৎ হতাশ হইয়া ভাবে, তার অদৃষ্টে গোবিন্দর হাঁড়িতে হয় ত চাল দিবার ব্যবস্থা নাই। বিধাতা-পুরুষ সে কলম লিখিতে ভুলিয়াছেন। পল্লীরা তাহাকে নূতন আর একটার জন্য চেষ্টা দেখিতে পরামর্শ দিতে লাগিল; কেহ কেহ জানাইল, একজন বড়ক গোয়ালার ছেলেও তাহার পাণি প্রার্থী আছে, যদি তুমি রাজী হও, তাহা হইলে সে নিজের জাতি ত্যাগ করিয়াও বাউরী হইবে। তাহার নিটোল রূপটীও অনেকের মন ভুলাইয়াছিল।

জগত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের মুখে অগ্নি সৎকার করিয়া গোবিন্দর চিন্তায় নিজে আঁধার ঘরেই পড়িয়া থাকিবে এই বাসনা জানাইল, তবু অন্য পথে পা বাড়াইবে না। কিছুতে না।

(আগামী বারে সমাপ্য)

বাসনা

(শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়)

(১)

ওগো, তুমি শুধু, নির্ব্বাক্ চেয়ে রও।
চুম্বন-ক্ষত-রঞ্জিত-মুখ আকাশের মত হও॥
উৎসব-শেষ বাসরের চিতে
বিদায়ের ব্যথা বহে চারিভিতে
তারি সাথে সাথে মিলনের কথা মোর কাণে
কাণে কও।
ওই, মৌন-সুন্দর আকাশের মত, শুধু চাহিয়া রও॥

(২)

ওই, শ্যামল মেঘের মত।
নীল-অম্বরে উড়াও তোমার কেতন লক্ষ-শত॥
ক্ষণে-ক্ষণে ঘুরে গুরু-গুরু রবে,
আহ্বান মোরে মত্ত-আহবে—
দুরু-দুরু মোর কাঁপিবে চিত্তে জড়-বাসনা যত।
দূর হ'তে শুধু চেয়ে রবে তুমি অস্ত-তারাসমত॥

ওই, প্রভাতের মত ধীরে।
নিশায় স্বপন অবসান-শেষে, এসগো নয়ন-নীরে॥
নির্ব্বাণ-দীপ, নির্জ্জন গেহে
রহিও আমার অন্তর-স্নেহে
মত্ত রজনীর গোপন-কথাটি বার-বার ব'লে ফিরে।
অরুণের মত, তরুণ-বেদনা, দেখাব পরাণ চিরে॥

(৪)

ওই, রজনীর মত চুপে।
এস গো তোমার শঙ্কা-হরণ, মৃত্যু-মোহন রূপে॥
তটিনীর মত নৃত্য-ললিলা
হিমের মত শুভ্র-শীতল-লীলা —
চির-বিশ্রাম লভিবে তোমার অন্ধ-হিয়ার কূপে।
সকল চেতনা জড়ায়ে আসিবে নীরবে ঘুমের ঘূপে॥

(৫)

সেই, অজানা সাগর তীরে
যেথা চলিয়াছে লক্ষ-যাত্রী, অলক্ষ্য-কোন্-নীড়ে।
নিখিলের চির-গোপন কাহিনী
কল্লোলে যথা শিকর-বাহিনী
মহাকাল যথা জীবের পশরা বহিছে আপন শিরে।
শব-শঙ্কার সমাধান-তীরে, ল'য়ে যেও মোরে ধীরে॥

—•••—

বাঘের ভয়

(গল্প)

(শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার)

প্রথম পরিচ্ছেদ

ব্যাপারটা চলিতেছিল বেশ!

সুবাস সত্যেন্দ্রকে পত্র লিখিয়াছিল, বাবার ইচ্ছা তুমি আসিয়া লইয়া যাও। জানই ত বাবার কিরকম সময়াভাব, আর আমাদের কেই বা আছে। প্রিয়তম, তুমি আসিয়া আমাকে লইয়া যাইও। পত্রের নীচে রাগ করিয়া যে কথাটি তুমি লিখিয়াছ তাহা পড়িয়া আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। আমি যাইতে অনিচ্ছুক! না প্রিয়তম, আমি সর্ব্বদাই তোমার কাছে যাইবার কামনা করিতেছি। কিন্তু আমার বয়সের মেয়েদের স্বাধীনতা কেমন, তুমি ত জানই। তুমি কবে আসিবে লিখিও।

সত্যেন্দ্র জবাব দিল, বার বার এক কথা আমি তোমাকে লিখিতে লজ্জাবোধ করিতেছি। আমি যাইতে পারিব না। তুমি ওখানকার কাহারও সঙ্গে আসিবার চেষ্টা করিও।

সুবাস চিঠিখানা পড়িয়া বিষণ্ণমলিনমুখে বাক্স বন্ধ করিতেছে, আভাস ঘরে ঢুকিয়া বলিল— সত্যেনের চিঠি এসেছে যে?

এসেছে।

কি লিখেছে, আস্‌বে? না? কেন?

সুবাস পত্রখানা বাহির করিয়া আভাসের সামনে ধরিতেই, আভাস এক নিঃশ্বাসে পাঠ করিয়া ফেলিল। "হুঁ" বলিয়া পত্রটি ফিরাইয়া দিল।

দেখ, সুবাস, তুই লেখ ওকে যে তুমি না এলে যাবার কোনই উপায় নেই। একবার একটি দিনের জন্যে এসে নিয়ে যাও। এখানে অন্য কেউ নেই, "কাহারো" সঙ্গে যাবার উপায়ও নেই, তুমিই ভরসা। তুমি যদি না এস, অগত্যা আমাকে এখানে থাকতে হ'বে।

আমি অত কথা লিখতে পারবো না, ছাই! আর কি-বারই ত লিখ্‌ছে আসবে না, কতবার আমি ঐ এক কথাই বল্‌ব?

বল্‌বি নে ত! বেশ ত—থাক্‌ না।

যা বল্লে আর কি! ওদিকে শাশুড়ী কত রাগ করছেন, তাঁর কত কষ্ট হ'চ্ছে···

আভাস গালে হাত দিয়া ভ্রূভঙ্গি করিয়া কহিল —ওমা এ্যা-ত! বলি শাশুড়ীকে সেই বে'র সময় ক'টি দিন ত দেখেছিস্, তা'তেই এই!

সুবাস সপ্রতিভ ভাবে বলিল—দেখ্‌লেই বা কটা দিন, শাশুড়ী ত ! তেমন শাশুড়ী পেলে বর্ত্তে যেতে !

আভাস হাসিয়া বলিল—বটে ! সেই যে কথায় বলে, যার সঙ্গে ঘর করিনি, সে বড় ঘরণী, আর যার হাতে খাই নি, সে বড়, হাঁদুনী—তোর যে দেখি তাই হ'ল পোড়ারমুখী !

সুবাস হাসিতে লাগিল।

আভাস পুনরায় কহিল—তা অতই যদি শাশুড়ীর দিকে ঝোল টানা, তার ছেলেটি কেন এসে নিয়ে যান না।

বার বার প্রিয়জনের নিন্দায় বেচারীর মনটি দমিয়া গিয়াছিল। মুখখানি গম্ভীর করিয়া সুবাস বলিল—আর আস্‌বেন না।

"আর আসবেন না"—মানে ?

আহা ! কিছুই যেন জানেন না ?

কি জানি লো ?

সুবাস বলিল—আমাকেও কতবার চিঠিতেই লিখেছে, বড়দি থাকতে আস্‌বে না।

এ কথায় এক মুহূর্ত্তের জন্য আভাসের প্রফুল্ল মুখখানি মেঘে ঢাকা আকাশের মত মলিন হইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তেই সে ভাব দূর করিয়া আভাস উচ্ছলকণ্ঠে কহিল—লিখেছে বুঝি ?

সুবাস মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তেমনি করিয়া কহিল হ্যাঁ।

কৈ, এ কথা ত তুই আমায় বলিস্ নি ? কবে এল, সে সব চিঠি ?

অনেক দিন—তুমি তখন প্রয়াগে ছিলে।

আছে সে চিঠি কখানা ? দেখি ?

সুবাস মুখ তুলিয়া দেখিল, আভাস মৃদুমৃদু হাসিতেছে, কহিল—দেখে কি হ'বে ? বদ্মাস ত !

দেখি না !

সুবাস বাক্সটি খুলিয়া একতাড়া পত্র বাহির করিয়া বাহিতে লাগিল।

খামের উপর ক্রমিক নম্বর দেওয়া পত্রগুলির মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া ৩১ নম্বরের খানি তুলিয়া লইয়া, খুলিয়া একাংশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল এই দেখ।

আভাস পত্রখানা টানিয়া লইয়া বলিল—ছাড় না, পোড়ারমুখী ! আমি ত আর খেয়ে ফেলছিনে।

আভাস পড়িল :—

* * * * *

"আসিয়া দেখিলাম, হিতেনের অসুখ খুব বাড়িয়াছে। তিনচারজন ডাক্তার দিনরাত থাকিয়া চিকিৎসা করিতেছেন। যার আহার নিদ্রা বন্ধ। ভাগ্যে সেই দিনই তোমাদের এখান হইতে চলিয়া আসিয়াছিলাম, নইলে যে কি বিপদ ঘটিত কে বলিতে পারে।

"তবুও বড়দি আমার রাঙাবৌদিকে আমি মিথ্যা টেলিগ্রাম দেখাইয়া চলিয়া আসিতে চাহিয়াছিলাম ইত্যাদি লিখিয়া আমাকে অপ্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রাঙাবৌ-দি সে চিঠি মা ও আর আর গুরুজনের নিকটে পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। তাঁহার দোষ কি ? বড়-দি ত স্পষ্টই লিখিয়াছেন, সত্যেনের মাতাঠাকুরাণী ঐ টেলিগ্রামের বিন্দু বিসর্গও জানেন না আমি জানি। সত্যেন্দ্রকে আমরা রঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলাম যে তাহার স্ত্রী এখানে নাই, হঠাৎ মামার বাড়ী গিয়াছে, তাই সত্যেন্দ্র আর এক মিনিটও আমাদের এখানে থাকিতে চাহিল না।

"আর একবার সত্যেন্দ্র অমনি এলাহাবাদে আসিয়া ষ্টেশনে কাটাইয়া ফিরিয়া গেল, সুবাস সত্যসত্যই সেবার মামারবাড়ী গিয়াছিল—আমি ও বাবা বাড়ীতে আছি—জানিয়াও সত্যেন্দ্র একবার দেখা পর্য্যন্ত করিল না—এই জন্যই আমরা তাহাকে একটুখানি রহস্য করিবার .....

সুবাস বলিয়া উঠিল—আর পড়ে কি হবে ?

আভাস বলিল—দাঁড়া না—

সে পড়িতে লাগিল.....

"এসব কথা আলোচনা করিয়া বেড়াইবার বড়দির

কি দরকার ছিল? আমায় লজ্জা দেওয়াই ত তাঁহার উদ্দেশ্য—স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। তা বেশ, আমাকে লজ্জিত করিয়া তিনি যথেষ্টই আমোদ পাইয়াছেন, কিন্তু আর কখনও তাঁহার সে সুযোগ মিলিবে না—জানিও।"

আভাস পত্রের শেষাংশে চক্ষু বুলাইয়া পত্রখানি ফেরৎ দিল। সে কি বলিতে যাইতেছিল, হিরণ ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল—বৌ-দি!

আভাস বলিল—এ কে গো? ঠাকুরপো যে? কি মনে করে—হঠাৎ?

হিরণ বলিল—সেই যে আমাদের ক্লাবে তুমি চাঁদা দেবে বলেছিলে! খাতা এনেছি।—হিরণ একখানা চতুষ্কোণ খাতা বাহির করিল।

আভাস বলিল—কবে তোমাদের থিয়েটার, ঠাকুরপো?

শনিবারে। বড়দা' একশ' টাকা দিয়েছেন। হিরণ খাতা খুলিয়া দেখাইল।

হিরণ আভাসের কনিষ্ঠ দেবর। বয়স চৌদ্দ পনেরো হইবে। তরুণ ঢল ঢল চেহারাটি। খুলে পড়ে।

আভাস বলিল—তবে আমার কাছে আবার এসেছ কেন, ঠাকুরপো? তবল আদায় করার মতলব?

হিরণ হাসিয়া কহিল—বাঃ রে! তুমি যে দেবে বলেছিলে! আমি সকলকে বলে রেখেছি।

তা বেশ ত। বলে যেমন রেখেছ, ১০০ টাকা তেমনি পেয়েও গেছ।

আমি যে তোমার নাম করে বলে রেখেছি, বৌ-দি।—হিরণের মুখখানি ম্লান হইয়া আসিতেছিল।

আভাস বলিল, আচ্ছা আচ্ছা, আমিও কিছু দেখ'খন।

হিরণ অভয় পাইয়া বলিল আজই দিতে হ'বে বৌ-দি। আজ আমাদের চাঁদা আদায়ের শেষ দিন।

আভাস হাসিয়া বলিল—তা বেশ, একান্তই না ছাড় লিখে নাও, আমার নামে দু'শো টাকা।

হিরণ অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

আভাস অঞ্চল প্রান্তের গেরো খুলিয়া টাকা দুইটী বাহির করিতেছে, হিরণ বলিয়া উঠিল, দুটাকা?

হাঁ গো!

হিরণ আর কথা কহিল না, তবে খাতা খুলিয়া লিখিবার আগ্রহও তাহার দেখা গেল না।

আভাস হাসিয়া বলিল—সে ও কিছু বলে রেখেছ না কি আগে থাকতে?

রেখেছিই ত!

কি বলেছ?

হিরণ বলিল—পঞ্চাশ টাকা?

ও বাবা! পঞ্চাশ!—একটু পরে আভাস যেন পূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসিল তোমাদের থিয়েটারে ত টিকিট বিক্রী করবে, ঠাকুরপো, তবু এত চাঁদা আদায় করছ কেন?

হিরণ বলিল—আমরা অনাথ আশ্রমের সাহায্য করে অভিনয় করছি। টিকিট বিক্রীর টাকা থেকে একটি পয়সাও খরচ না করে, সেটা সমস্তই আশ্রমকে দান করব। আর চাঁদায় যা উঠ্‌বে তা থেকে দরকারী খরচ গুলো করে সে টাকাও আশ্রমকে দেব। তুমি ত জান বৌদি, ঐ আশ্রমে এত অনাথ আতুর আছে যে দশ হাজার টাকা দিতে পারলে তবে তাদের কতক মতক দুঃখ ঘোচে। সবাই বড় বড় কাজে হাজার হাজার টাকা দেয়, ছোট কাজে কেউ দিতে চায় না। দেখ না সমস্ত সহর ঘুরে, বড় বড় লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়েও দেড়টি হাজার টাকা মোটে তুলতে পেরেছি। আর ঐ লাট সাহেবের বৌটী একটা অনাথ আশ্রম করছে তা'তে সব মেম্ টেম্ থাকবে তারই জন্যে আমাদের বাঁড়ুয্যে সাহেব একেবারে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলেন। অবশ্য সেও ভাল কাজ, দিন, ভালই; কিন্তু নিজের দেশের, দেশবাসীর স্থাপিত ও পরিচালিত আশ্রমে তিনি দশটি টাকার বেশী কিছুতে দিলেন না।

তা রাখ্‌বে বোধ হয়।

তবে আমার কি! আর তার ও খরচপত্র কিছুই হবে না। তবে দেরী করে কাজ নেই ঠাকুর পো। আমি বরাবর দেখেছি, দেরী করলেই কোন-না-কোন কারণে অনেক সময় কাজ পণ্ড হ'য়ে যায়।

হিরণ হাসিল।

আভাস বলিল—তুমি খেয়ে-দেয়েই বেরোবে—তার মত নিয়ে আমায় বলে যাবে। তোমার মুখে শুনলে তবে আমি সাড়ী রিজার্ভ, টেলিগ্রাম করব। আর সুবাসি ও সব গুছিয়ে গাছিয়ে নেবে।

সুবাস আসিয়া পড়িয়াছিল। সে হিরণের দিকে চাহিয়া হাসি হাসি মুখে বলিল—এই যে 'ছায়া' এখন এলে?

হিরণ বলিল—আর ছায়া নয়, এখন হিরণ্ময়…

না, না আমরা তোমাকে ছায়া বলেই ডাকব। কি বল বড় দিদি?

তাই ডাকিস্—বলিয়া আভাস দেবরের পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

সুবাস বলিল—আর তোমাদের থিয়েটার হ'বে না? তোমার 'ছায়া' দেখ্‌তে সত্যি আমার লোভ হচ্ছে।

আভাস বলিল—আমার কিন্তু সব চেয়ে মুরাকে বেশী মনে পড়ছে।

সুবাস বলিল—হ্যাঁ, মুরাও বেশ।

আভাস হাসিয়া বলিল—কলকাতায় গিয়ে দেখ্‌বি?

ও—সেই জন্যে বুঝি হিরণ কলকাতা যাচ্ছে? বাবা এই মাত্র আমাকে ডেকে বল্লেন বটে। কলকাতায় গিয়ে আবার 'ছায়া' সাজবে হিরণ?

হিরণ কি বলিতেছিল……আভাস তৎপূর্ব্বেই কহিল—কলকাতায় গিয়ে ও কেন সাজবে? কলকাতার থিয়েটারে ত 'চন্দ্রগুপ্ত' দেয় হয়। বরের সঙ্গে তাই দেখ্‌বি।

সুবাস আর কথা কহিল না।

আভাস বলিল—তোর সব গুছিয়ে গাছিয়ে নে সুবাস। আমরা হয়ত কালই যেতে।

কালই?

আহ্লাদ যে ধরে না লো!—যেমিস্, যেন সত্যিই নেচে ফেলিস্ নে।

সুবাস কৃত্রিম কোপের সহিত কহিল—নাচতে হয় তুমি নাচ!—বলিয়া সে হাসিয়া বাহির হইয়া গেল।

কিরকমের ভেতর আমাকে খবর দেওয়া চাই, ঠাকুরপো।—নিম্নকণ্ঠে এই কয়টি কথা বলিয়া আভাস কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আভাসের স্বামী প্রোফেসর জীবনকৃষ্ণ বাবু সেই রাত্রেই শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলেন। আভাস তাঁহাকে সকল কথাই কহিল।

জীবনকৃষ্ণ বাবু কহিলেন—দেরী কর না, কিন্তু। হিরণের আবার পরীক্ষা আস্‌ছে। একেই ত পড়া শুনো করে না বল্লেই হয়, তার উপর কলকাতায় গিয়ে বসে থাক্‌লে পরীক্ষা যা দেবে—সে আর কহতব্য নয়।

আভাস বলিল—না গো, না, দেরী হ'বে না। আমরা সাত দিনের দিন এসে পৌঁছব। কাল বুধবার, কিরে মঙ্গলবারের দুপুরবেলা ঠিক আমাদের দেখ্‌তে পাবে।

অধ্যাপক মহাশয় চশমার ভিতরে মিটি মিটি চাহিয়া কহিলেন—অত দিন বাঁধাবাঁধির দরকার নেই, অনেক দিনের পর কাকীমাদের ওখানে যাচ্ছে, দু'দিন থেকে আসাই ত উচিৎ, তবে ঐ হিরণটার জন্যেই বলা। দেখ্‌ছই ত, থিয়েটার করে, অভিনেত্রী করেই কাটাচ্ছেন, না পড়া, না কিছু। এখানে থাকলে যাও বা ভয়ে ভয়েও একটু-আধটু কেতাব পত্তর খোলে…

তাই হ'বে গো ঠাকুর মশাই, তাই হ'বে।

অধ্যাপক মহাশয় আর কিছুই বলিলেন না। এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই দি'া নাসিকাধ্বনি করিতে লাগিলেন। লোকে বলিত, আভাসের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কটা দ্বিতীয়পক্ষের স্বামী স্ত্রীর মত। কেহ কেহ "মত" কথাটি লোপ করিয়া কহিত—উনি ত দ্বিতীয় পক্ষেই ডকটর নন্দীর বড় মেয়েটিকে বিবাহ করিয়াছেন। বাড়ীর চাকর বাকরও নাকি এই কথারই সমর্থন করিত। কিন্তু আমরা জানি এই সন্দেহ নিতান্ত অসত্য এবং অমূলক। জীবন কৃষ্ণ একটু বেশী বয়সে—এমনই বা কি বেশী, সাতাশ বৎসর বয়সে—বিবাহ করিয়াছিলেন।

প্রত্যুষেই সাজ্ সাজ্ রব পড়িয়া গেল। সত্যেন্দ্রকে টেলিগ্রাম গেল, একটি বিশেষ আত্মীয় পরিবারের সহিত সুবাসকে পাঠাইতেছি। ষ্টেশনে তুমি অতি অবশ্য এক্সপ্রেসের সময় উপস্থিত থাকিয়া নামাইয়া লইও। তোমার থাকা চাই-ই। নন্দী।" সুবাস বলিয়াছিল, আত্মীয় পরিবার কেন? তোমার নাম দিলেই ত হয়।

আভাস বলিল—আমার ওপর একেই তোর বড়ের কত গুনজর। আমি যাচ্ছি শুন্‌লে ষ্টেশনেই আস্‌বে না।

ডক্টর নন্দী নেপালের রাজবংশীয়দের বাড়ীতে না-ঘুরিয়া-আসিলে নয় বলিয়াই একবার আধঘণ্টার জন্য বাহির হইয়াছিলেন, এইমাত্র ফিরিয়াছেন। ফিরিয়াই ডাক্তার খানার কম্পাউণ্ডার বাবুকে জিজ্ঞাসিলেন—গাড়ী রিজার্ভ করে' এসেছেন?

রিজার্ভ হইয়া গেছে শুনিয়া," অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া ডাকিলেন—ও আভাস, এদিকে কতদূর কি হল বল দেখি?

আভাস প্রায় সমস্তই হইয়াছে, বলিল। ডক্টর নন্দী সুবাসকে ডাকিয়া অত্যন্ত স্নেহ কোমলকণ্ঠে কহিলেন—এখন থাকতে বলে রাখছি, দু'মাস পরেই কিন্তু আস্‌তে হবে। প্রথমবার তোকে ছেড়ে আমি বেশী দিন থাকতে পারব না কিন্তু,—তোর খাশুড়ীকে বলে রাখিস্।

আভাস সহাস্যনেত্রে কহিল—কা'কে ছেড়েই বা তুমি থাকতে পার, বাবা!

ঠিক বলেছ মা। কাউকে ছেড়েই আমি থাকতে পারি না, বড় কষ্ট হয়, আভাস।—বড় কষ্ট হয়।

কথার শেষভাগ যেন গলার মধ্যে ভিজিয়া বাহির হইল।

আভাস তাড়াতাড়ি বলিল—আমি-ও ওর খাশুড়ীকে বলে আসব, বাবা।

ডক্টর নন্দী নিঃশব্দে সুবাসের মুখের পানে চাহিয়া বাহির হইয়া গেলেন। সুবাসের মুখখানি নিষ্প্রভ, মলিন হইয়া গেল।

আভাস তাহাকে প্রকৃল্ল করার উদ্দেশ্যে কহিল, কলকাতায় এতক্ষণ একজন টাইম-টেবল মুখস্থ করছে।

কে আবার টাইম-টেবল মুখস্থ করছে—বলিয়া ফেলিয়াই সে লজ্জায় জড় সড় হইয়া উঠিল।

তোর বর, আবার কে?

হিরণ দূর হইতে ডাকিল—বৌ-দি!

এইখানে এস ঠাকুরপো। কি?

গোটা দশ টাকা চাই।

চল-দিচ্ছি! তোমার কাপড় জামা সব এনেছ ঠাকুরপো?

এনেছি। দেখ বৌ-দি, দিনকতক তাই মনের সাধে থিয়েটার দেখ্‌ব।

তা দেখবে বৈ-কি! থিয়েটার দেখ্‌বে না? এদিকে তোমার হবে তোমার দাদা এগজামিন দিন্।

এগজামিনের কথায় হিরণের সমস্ত উৎসাহ নিবিয়া গেল; পাংশুমুখ নত করিয়া লইল।

আভাস বলিল—ভয় নেই ঠাকুরপো, থিয়েটার দেখার সখ তোমার বৌ-দিটিরও বড় কম নয়।

তবুও হিরণের মুখের মলিনতা ঘুচিল না। সে দৃঢ় অথচ মৃদুস্বরে কহিল—আমি যাব না।

আভাস হেসে করিয়া কহিল—ওঃ, পুরুষের রাগ দেখ না।

রাগ নয়, আমি যাব না। আমার এগজামিন।

সে হ'বে, হবে। তোমার দাদার গল্প শোন নি বুঝি। কি রকম তাস খেলে, খিয়েটার দেখে দিন কাটিয়েও বরাবর ফার্ষ্ট সেকেণ্ড হতেন, শোন নি বুঝি? ও ঘরে চল, বলছি। টাকাও ওখানে আছে এস।—আভাস সস্নেহে হিরণের হাত ধরিয়া ও ঘরে চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক্সপ্রেস ট্রেন অনেকগুলি ছোট ছোট ষ্টেশন বাদ দিয়া, মাঝে মাঝে থামিতেছে। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই আবার গর্জ্জন করিয়া ছুটিতেছে। গ্রাণ্ড কর্ড লাইনে প্রবেশ করিতেই গাড়ীখানার এঞ্জিন যেন কিছু শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। গতিবেগও হ্রাস হইয়াছিল, আর মধ্যে মধ্যে একটা যেন গাঢ় দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দও শুনা যাইতেছিল।

ক্রমে সোন্ নদীর উপর দিয়া গাড়ীখানা ছুটিতে লাগিল—মাথার উপরে ঘাদশীর চন্দ্র মাঝে মাঝে দৈকত মধ্যে জলের ধারগুলির উপর ছায়া ফেলিতে ফেলিতে সমানবেগেই ছুটিতেছে, সুবাস বলিল—সাদা সাদা ওগুলো কি দিদি, জল নয়?

না—ও বালির চড়া।

গাড়ী একটা ষ্টেশনে থামিতেই সুবাস শুইয়া পড়িয়া কহিল—এইবারে ঘুমুই দিদি?

আভাস স্নেহস্বরে জিজ্ঞাসিল—বড্ড ঘুম পেয়েছে, সুবাস?

কেন?

না—তাই বলছি।—এই কথা গুলির আরও যেন অনেকখানি তাহার কণ্ঠমধ্যে অব্যক্ত রহিয়া গেল। সুবাস কৌতূহলান্বিত হইয়া বলিল—সারারাত কি জেগে থাকব?

আভাস কহিল—না, বড্ড যদি ঘুম পেয়ে থাকে ঘুমো। নাহ'লে···

কি?

আর না গল্প করি। আমার গাড়ীতে ঘুম হয় না একটু যেন ভয় হয়, আর গাটা কেমন ছম্ ছম্ করে।

সুবাস উঠিয়া বসিয়া বলিল -তবে হিরণকে কেন এখানে ডাক না।

না, না। তার সঙ্গে তার বন্ধু রয়েছে। বন্ধুকে ফেলে কি তার এখানে আসা উচিৎ? তুই ঘুমো, ছেলে মানুষ, তার উপর কাল থেকে আবার জাগতে হ'বে ত!—সে হাসিয়া ফেলিল।

হয় হবে—বলিয়া সুবাস চাদরখানা টানিয়া মুড়ি দিল।

আভাস বলিল—নে নে আজকের হাঙ্গামা ঘুমিয়ে নে। কাল ও আর নিষ্কৃতি নেই। ঘুম পেয়েছে বলেও ছাড়বে না..

সুবাস উঠিয়া পড়িল। বলিল—হ'ল ত? আর যদি আমি রাত্রে আর শুই ত কি বলছি।

তখন সুবাস উঠিয়া তোরঙ্গ খুলিল। তন্মধ্য হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী বাহির করিয়া পড়িতে বসিয়া গেল। শেষে উভয়েই একসঙ্গে সুর করিয়া কবিতার পর কবিতা পড়িয়া রাত্রি শেষ করিল।

ভোর হইতেই হিরণ আসিয়া চায়ের খবর লইল। আভাস রাগ করিয়া বলিল—বেশ লোক ত তুমি ঠাকুরপো, সারারাত্তির আমরা যে দু'টি ছেলে মানুষ অবলা এখানে 'একলা' পড়ে আছি, একবার বুঝি খোঁজও নিতে নেই?

সে যখন কার্য্য শেষ করিয়া বাহিরে যাইবে পোষ মেখিবার উপক্রম করিতেছিল, গাড়ীর মৃদু-গতি হইল অল্পক্ষণ পরেই হিরণ আসিয়া—প্রস্থান করিল।

নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতেই চা আসিল; যথাসময়ে সেই নিষিদ্ধ ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ [illegible]পরম শান্তীর থাল খাইয়া, মধ্যাহ্নে সুবাস বলিল—দিনের বেলা ত আর গা ছম্ ছম্ করবে না, আমি একটু ঘুমুই।

আভাস বলিল—ঘুমো। আমি ততক্ষণ চিত্রা-দোটা শেষ করে ফেলি।

তবে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়, দিদি। আমিও ঘুমি।

আভাস পড়িতে লাগিল। সুবাস পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নিদ্রাভিভূত হইল। আভাস চিত্রাবলী শেষ করিয়া মুখ-ও তুলিল, গাড়ীও বর্দ্ধমানে থামিল।

হিরণ আসিতেই বলিল—আর দেরী কর না ঠাকুরপো। তৈরী হ'য়ে নাও গে। গাড়ীর দোর জানেলা বন্ধ করে কিন্তু সেজে শুজো—বুঝলে?

হিরণ বলিল—গাড়ী ত মাঝে কোথাও থামছে না, খোলা থাকলেই বা কি! একেবারে সেই শিলুয়া। সেইখানে টিকিট নেবে, তখন সন্ধ্যেও হ'য়ে আসবে।...সুবাস উঠে পড়বে না ত, বৌ-দি?

কিছু ভয় নেই। সারারাত কাল ঘুমোতে দিই নি। এই মাত্র ঘুমিয়েছে, আর যে ওর ঘুম, তিন-চার ঘণ্টা ত বটেই, বেশীও হ'তে পারে। তুমি কিন্তু খুব সাবধান, কেদে টেদে কেল না যেন!

না—বলিয়া হিরণ হাসিয়া চলিয়া গেল।

আভাস আপন মনে হাসিতে হাসিতে আবার গ্রন্থটি তুলিয়া লইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আলোকমালা সজ্জিত হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই সত্যেন্দ্র-সাহেব ছড়িটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে একেবারে ইহাদের কামরার সম্মুখীন হইল। আভাসকে হাসিতে দেখিয়াই সত্যেন্দ্রর হাসিমুখ কি রকম যেন হইয়া গেল। সে একটা ঢোক গিলিয়া কাছে আসিতেই অবগুণ্ঠিতা বধূটি নামিয়া পড়িল।

আভাস গাড়ীর ভিতর হইতেই জিজ্ঞাসিল—বাড়ীর সব খবর ভালো ত?

ভালো—বলিয়া সত্যেন্দ্র অবগুণ্ঠিতাকে কহিল—চল।

তখনি ফিরিয়া কহিল—বড়-দি কি আমাদের ওখানেই আস্‌বেন?

আর থাক্—ভাই, খুব হ'য়েছে।

সত্যেন্দ্র লজ্জারক্ত মুখে কহিল—আস্‌বেন না?

আমার দেওর সঙ্গে আছেন আমরা—কাঙীমার বাড়ীতেই উঠ্‌ব। তবে তোমাদের বাড়ীও একবার যেতে হবে বৈ-কি। মা'র সঙ্গে দেখা করে আস্‌ব।

সত্যেন্দ্র এ-দিকে ফিরিয়া দেখিল, কে দুইটা সাহেব মড়্ মড়্ করিয়া সেই দিকেই আসিতেছে, আর অবগুণ্ঠিতা বধূটি একেবারে জড়ের মত আড়ষ্ট হইয়া গেছে। সত্যেন্দ্র ক্ষিপ্রপদে নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল—এস, ঐ সামনেই গাড়ী আছে।

সত্যেন্দ্রের সহিস্ ততক্ষণে বাক্স-পেঁটরা গাড়ীর চালে তুলিয়া ফেলিয়াছিল।

সত্যেন্দ্র সাহেবী সমাজের লোক, গাড়ীর দ্বার বন্ধ করা কুরুচি মনে করে। হাওড়ার পুলের আলোকে বধূর দিকে চাহিয়া কহিল—আর কেন, ঘোমটা খোল-না!

বধূ ঘোমটা খুলিল না, মাথা আরও নীচু করিয়া বসিল।

সত্যেন্দ্র মনে মনে বিরক্ত হইল বটে, প্রকাশ করিল না। আর সত্য কথা বলিতে কি, এই নূতনত্বের অভিনয় তাহার একটু ভালই লাগিল। তবে বুদ্ধি করিয়া দ্বার দুইটি টানিয়া দিয়া, বধূর হাত ধরিয়া কহিল—হ'য়েছে ত—এইবার খোল!

বধূ কাঁদিয়া উঠিল।

সত্যেন্দ্র বিস্মিত হইল, অধিক বিরক্ত হইয়া কহিল—কাঁদ কেন?

ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ শুনিয়া সত্যেন্দ্র বধূকে একটু জোরে টানিয়া এধারে আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—কাঁদ কেন, সুবাস?

কাঁদিতে কাঁদিতে বধূ কহিল—আমি সুবাস নই।

সত্যেন্দ্র হাতটা হঠাৎ ছাড়িয়া দিতেই বধূ ধপাস্ করিয়া পড়িয়া গেল।

সত্যেন্দ্র সেদিকে লক্ষ্য করিল না, বলিল—তবে তুমি কে?

আমি ছায়া।

ছায়া! ছায়া ছায়া! কে?

সত্যেন্দ্র উন্মাদের মত দ্বার খুলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—গাড়ী করো, গাড়ী করো।

গাড়ী থামিল। সত্যেন্দ্র নামিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসিল—তুমি আমার সঙ্গে এলে কেন?

সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—আমি বুঝি এলুম। তুমি আমায় ঘরে নিয়ে এলে।

সত্যেন্দ্র অধর দংশন করিয়া মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। এ-কি বিপদ ঘটিল? কাহার স্ত্রীকে আপনার বলিয়া সে আনিয়া বসিল? বড়-দি'রই বা কি কাণ্ড, তিনিও ত কিছু বলিলেন না। আর মেয়েটি—সেও ত দিব্য গাড়ীতে উঠিয়া বসিল?

সত্যেন্দ্র জিজ্ঞাসিল—তোমার সঙ্গে কে ছিল?

মেয়েটি মাথা নত করিয়া দুঁপাইতেছিল, কথা বলিল না। সত্যেন্দ্র বুঝিল, মেয়েটির স্বামী ছিল সঙ্গে।

জিজ্ঞাসিল—তোমার শ্বশুর বাড়ীর ঠিকানা জান?

না।

সত্যেন্দ্র ভাবিয়া কূলকিনারা পাইতেছিল না। হঠাৎ একটা উপায় তাহার মনে পড়িয়া গেল; বলিল—দেখুন, এক কাজ করা চলতে পারে। আপনাকে নিয়ে কোন একটা থানায় নাম-ধাম লিখিয়ে··

মেয়েটি সভয় কণ্ঠে কহিল—থানায়?

তা'তে আর কি হয়েছে? আপনার স্বামী ষ্টেশনে আপনাকে না পেয়ে ত নিশ্চয়ই থানায় খবর টবর দেবেন, আমরা যদি আগে থাকতেই লিখিয়ে রাখি তাঁরই সুবিধে হবে। আপনি তাঁর নাম, আর যা হ'য়েছে সব লিখিয়ে দেবেন, আমিও আমার বাড়ীর ঠিকানা দেব—তিনি অনায়াসে আপনাকে নিয়ে যেতে পারবেন।

মেয়েটি কি ভাবিল, পরে কহিল—থানায় কি লেখাতে হ'বে? আপনি নিয়ে চলে এসেছেন, হাত ধরে' টেনে গাড়ীতে তুলেছেন···

সত্যেন্দ্র ভয়ার্ত্তস্বরে কহিল—না, না, ভুল হয়েছে তাই লেখাবেন। এমন আকছার ত হয়।

ভুল ত নয়। আপনি যেন শুনেই···তাই, থানাতেই চলুন।

এ কথা শুনিয়া সত্যেন্দ্রের হাত পা অবশ হইয়া গেল। মেয়েটি যেরূপ বলিতেছে ঐরূপ লিখাইলেই ত বিপদ! পুলিশ বলিবে, আমার বদ অভিসন্ধিই ছিল, একলে ভয় পাইয়া থানায় লইয়া আসিয়াছি।

ইত্যবসরে দুই চারিজন পথচারী ব্যক্তি গাড়ীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহা দেখিয়া সত্যেন্দ্র খট্ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে কিয়দ্দূর চলিয়া একটা নিরিবিলি স্থানে আসিয়া পুনরায় দ্বার খুলিল।

মেয়েটি মুখ বাড়াইয়া বলিল—থানা এসেছে? বৈ, একজন পুলিশ ডাকুন—তাকে বলি।

কি বল্‌বেন?

বল্‌ব—আপনি আমাকে...

সত্যেন্দ্র বলিল—সত্যি বল্‌ছি আপনাকে, আমাদের দু'জনেরই ভুলে এরকমটা হ'য়েছে।

আপনার কি করে ভুল হ'বে? আপনি আপনার স্ত্রী চেনেন না?

সত্যেন্দ্রের ইচ্ছা হইল, প্রশ্ন করে—তাহার স্বামীটি তাহার পরিচিত কিনা?—কিন্তু এ প্রশ্ন সে করিতে পারিল না, অথবা করিল না। বলিল—আমার বড় শালীর সাম্নে গিয়ে আপনাকে মেয়ে দাঁড়াতে দেখেই আমার মনে হ'ল আপনিই সুধা।

বেশ, তাই বল্‌বেন আপনি থানায়—বলিয়া মেয়েটি নামিতে উদ্যত হইল।

সত্যেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া কহিল—না, না, এটা থানা নয়। থানা এখান থেকে অনেকদূর।

আপনার মিছে কথা। আমি জানি, কলকাতার মোড়ে মোড়ে পুলিশ থাকে, আর রাস্তায় রাস্তায় থানা···

রাস্তায় রাস্তায় নয়, তবে মধ্যে মধ্যে আছে বটে। আপনি কি সত্যিই থানায় যেতে চান?

মেয়েটি কি যেন ভাবিয়া লইল। সত্যেন্দ্রের করুণ কণ্ঠস্বরে বোধ করি তাহার একটু দয়াও হইতেছিল, বলিল - নইলে কি করব বলুন?

আমার বাড়ীতে কেন চলুন না। আজকের রাতটা কেটে যাক্—কাল সকালে যা হয় করা যাবে। যাবেন?

আপনার বাড়ীতে?

হ্যাঁ। আমার বাড়ী হ'লেও সেখানে আমার মা আছেন, এতক্ষণে আমার স্ত্রীও পৌঁছেচেন।

মেয়েটি—জিজ্ঞাসিল আপনার স্ত্রী কি করে পৌঁছুবেন? তিনি ত হাওড়াতেই তাহ'লে পড়ে আছেন···

না। আমার শালী আর তাঁর দেওর যখন আছেন, কোন ভয় নেই। তাঁরা এতক্ষণ বাড়ী পৌঁছে গেছেন—নিশ্চয়ই।

তাই জেনেই বুঝি আপনি তাঁদের স্বচ্ছে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আর একজনের···

বারবার আপনি কেন ঐকথা বলছেন। একটা অন্যায় কাজ হ'য়ে গেছে, তার জন্য যথেষ্টই মনঃপীড়া পাচ্ছি, তার ওপর আপনি ওরকম করে বলবেন না।

মেয়েটি এক মিনিট চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর কহিল—আমার শ্বশুর বাড়ীতে খবর দিতে পারবেন?

সত্যেন্দ্র উল্লসিত হইয়া কহিল—পারবেন কি বলছেন। কালকেই সব ক'খানা খবরের কাগজে ছাপিয়ে দেব—একটা না একটা তাঁদের নজরে পড়বেই। আরও এক কাজ করা যেতে পারে, আপনার বাপের বাড়ীতেও টেলিগ্রাম করে দেব—কি বলেন?

মেয়েটি বলিল, আচ্ছা।

তবে আপনি বসুন। আমি উপরে যাচ্ছি—আমার বাড়ীতেই আজকের রাতটা কাটিয়ে ফেলবেন।

কিন্তু

সত্যেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিল—কি বলছেন?

আমার হাত ধরেছেন, একথা কাকেও বলবেন না ত?

সত্যেন্দ্রের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িতেছিল। মেয়েটি তখনই বলিয়া উঠিল—আপনি ত আর মেয়ে ধরেন নি! কি বলেন?

সে আর কি বলিবে? একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বহস্তে দ্বার বন্ধ করিয়া কোচবাক্সে উঠিয়া বসিল।

সত্যেন্দ্রের অট্টালিকার সম্মুখে গাড়ী থামিতেই দ্বারবান কহিল—ছোটাবাবু আপ্‌কো ঢুঁড়নে গয়া। মাজিজী লোক ত সব আগেয়া, হুজুর।

সত্যেন্দ্র 'আচ্ছা' বলিয়া নামিয়া আসিল। স্বহস্তে গাড়ীর দ্বার খুলিয়া বলিল—আসুন।

মেয়েটি দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া নামিয়া সত্যেন্দ্রকে অনুসরণ করিয়া চলিল।

আভাস সত্যেন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়া কহিল—এ আবার কে ভাই?

সত্যেন্দ্রের বিষাক্ত রসনা বিষ উদ্গীরণ করিতে যাইতেছিল, তাহার জননী আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—এই বুঝি নিয়ে ভোরা পুরুষ মানুষ!

আমার দোষ কি! উনি গাড়ী থেকে আমার সঙ্গে কথা কইলেন, আমি একে নিয়ে আসছি দেখলেনও, অথচ কথাটি বল্লেন না।

তা ত হ'বেই। কতকাল পরে দেখা, না কথা, না বার্ত্তা, হন্ হন্ করে চলেই এলেন। আমি ভাবলুম, আরও বুঝি কেউ সেই গাড়ীতেই এসেছে, তাকে

রেখে আমাদের নামিয়ে নেবে, ও-মা, হাঁ করে দাঁড়িয়েই আছি, কোথায় কে !

সত্যেন্দ্র-জননী সহাস্যে কহিলেন—তোকেও বলি বাছা, তুইও ত চোখ্ বুজে ছিলি নে···

সত্যেন্দ্র প্রতিবাদ করিয়া কহিল—'চোখ্ বুজে ছিলি নে !' বোনটা দেওয়া থাকলে লোক চেনা যায় ?

আভাস বলিল—সে ত হ'ল। এখন এ কা'কে নিয়ে এলে, কি বৃত্তান্ত, পুলিস্ টুলিস্···

সত্যেন্দ্রের মুখ চোখ ফ্যাকাসে হইয়া আসিতেছিল, তাহা দেখিয়া তাহার জননী বলিয়া উঠিলেন—নে বাছা আভাস, তুই আর ওকে ভয় দেখাস্ নে। একেই বাছার আমার মুখ চোখ বসে গেছে। যা সত্য, কাপড় চোপড় ছাড়গে।

সত্যেন্দ্র বলিল—কাল সকালেই এর জন্ত খোঁজ খবর করতে হ'বে। যত হাঙ্গামা ! বড়দির জন্তই ত। উনি যদি একটা কথা বলেন···

আভাস বলিল—বড়দি'রই অপরাধ ! বড়দি করে কি একটা ঠাট্টা করেছিল, বাবুর তাই একেবারে মর্ম্মান্তিক হ'ল—বাবু আর আমাদের নামই করেন না। বড়দি থাকতে এলাহাবাদেই যাবেন না। বড় দি'র মুখদর্শনও করবেন না। আজ যদি বড়দি না থাকত, সুবালটকে যে হাওড়ার হাটে কাপড় কেনা করে' ফেলতো সবাই মিলে। তার কি !

সত্যেন্দ্র মুখখানা হাঁড়ী করিয়া খিড়কিতে উঠিয়া গেল। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে বলিল—মা, ওঁর যেন কোন কষ্ট না হয়, দেখো।

আভাস অবশ্যম্ভাবীর হাত ধরিয়া ফেলিল—আর নয়, চট্ করে ও সব ফেড়ে ফেল, ঠাকুরপো। মোটর দাঁড়িয়ে আছে। এখনি বেরিয়ে পড়তে হ'বে। দেরী হ'লে কাকাবাবুরা আবার ভাববেন।···আপনি কিন্তু আর কিছু ভাববেন না, না। আপনার দু'টি পায়ে পড়ি।

পরদিন মেয়েটিকে কোথাও দেখিতে পাওয়া গেল না। পুলিসের পরওয়ানার ভয়ে সত্যেন্দ্র সাত আট দিন বাড়ীর বাহির হওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল।

সত্যেন্দ্রের বন্ধুবান্ধব যে আসিল, সেই শুনিল, সত্যেন্দ্র হাওয়া খাইতে পশ্চিম গিয়াছে। সুবাস আসিয়াছে, এ সংবাদও বন্ধুবান্ধব জানিতে পারিল এবং তাহারা সেইদিনের সভায় সত্যেন্দ্রকে একটা মস্ত সাধু-সন্ন্যাসীর প্রাপ্য সম্মান দিতেও কার্পণ্য করিল না।

কিন্তু সাতদিনের দিন, বড়দি, অর্থাৎ আভাস হিরণকে সঙ্গে লইয়া বিদায় লইতে আসিলেন, সেই রাত্রেই এলাহাবাদে ফিরিবেন।

হিরণ বিদায়কালে গাড়ীতে উঠিবার সময় সত্যেন্দ্রকে নমস্কার করিয়া কহিল—এবারকার মত পুলিসকেস্‌টা করলাম না, দাদাই, কিন্তু একটু সাবধান হ'য়ে মেয়ে ছেলের হাত ধরবেন। ফ্যাসাদ হ'তে কতক্ষণ বলুন ?

আভাসের সে সময়কার হাসির অর্থ বুঝিতেও সত্যেন্দ্রের বিলম্ব হইল না। যেখানে বাঘের ভয় সেই স্থানেই যে ঠিক সন্ধ্যা হয়—বহুকালের এই চলিত কথাটা তাহার হাড়ে হাড়ে বিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

সঙ্কলন

বস্ত্র-সমস্যা

(আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়)

চরকা ও তাঁত

বাংলায় কিছু কিছু চরকা চলিতেছে। যে স্থানে ভাল কাজ হইতেছে সেখানে চরকার সুতায় কাপড় প্রস্তুত হইয়া কলিকাতায় কিছু কিছু কার্পাসও বিক্রয়ের জন্য আসিতেছে। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, বরিশাল এই বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চরকা চলার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্ন উঠিতেছে যে, সুতা দিয়া কি করিব—তাঁতি কই যে বুনিব। ইতিমধ্যে কোন কোনও স্থল হইতে সংবাদ পাইতেছি যে গ্রামে এতটা সুতা হইয়াছে কিন্তু সুতার ক্রেতা নাই। কলিকাতা জিনিষের কেনা বেচার প্রধান কেন্দ্র বলিয়া অনেকে কলিকাতায় চরকার সুতা বিক্রয়ের বাজার খুঁজিতেছেন। কিন্তু কলিকাতায় চরকার সুতার চাহিদা নাই বলিলেই চলে। যাঁহারা গ্রামে বসিয়া সুতা কাটিতেছেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য জোলা দ্বারা ঐ সুতায় কাপড় বুনিয়া লওয়া। কাপড় করিয়া কলিকাতায় পাঠাইলে তাহা পড়িতে পাইবে না। যাঁহারা গ্রামে সুতা কাটিতেছেন তাঁহাদের নিজ গ্রামে না হউক নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে যে জোলা পাইবেন তাহার সন্দেহ নাই। ১০ নম্বর মিলের সুতায় টান, ও চরকার সুতায় পড়েন দিয়া কাপড় বুনিয়া লওয়ার চেষ্টা করিবেন। অবশ্য দুই দিকে চরকার সুতা দেওয়াই কর্ত্তব্য কিন্তু যে পর্য্যন্ত সুতা কাটায় হাত না পাকিতেছে ততদিন একদিকে মিল ও একদিকে চরকার সুতায় বুনিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। ভরসা করি অল্প দিনই এই রূপ একদিকে মিলের সুতা ব্যবহার করিতে হইবে। যাহাতে গ্রামে গ্রামে জোলা বসে তাহারও চেষ্টা করিতে হইবে। জোলাদের কারবারের সহিত আমাদের মধ্যবিত্ত ও ভদ্রসম্প্রদায়ের সম্পর্ক খুব কম কেননা তাহারা মোটা কাপড় বোনে। আর তাঁতিরা সাধারণতঃ মিহি কাপড় বোনে। চরকার সুতা লইয়া তাঁতির নিকট যাওয়া বিড়ম্বনা। তাঁতিরা মিহি কাপড় বুনিয়া হাত এমন করিয়াছে যে মোটা সুতায় কাজ করিতে চাহে না। তাহা ছাড়া আরও একটা প্রধান কথা এই যে মিহি কাপড় বুনিয়া তাঁতিরা অধিক মূল্যে বিক্রয় করে। দুই টাকার সুতায় যে কাপড় হইবে তাহা তাঁতি ছয় টাকায় বিক্রয় করিবে। কিন্তু দুই টাকার চরকার সুতায় বুনিলে তাহার মজুরি মিহি সুতার অর্দ্ধেকও হইবে না। সেই জন্য যে তাঁতি মিহি সুতা বুনিতেছে তাহাকে দিয়া মোটা সুতার কাপড় করিয়া লওয়া যাইবে না। কিন্তু জোলারা মোটা কাপড়ই বুনিতেছে। তাহারা একখানা কাপড় বুনিয়া এক টাকা পাঁচ সিকা পাইলেই সন্তুষ্ট। সে একদিনে একখানা কাপড় বুনিতে পারে। অবশ্য স্ত্রী ও ছেলে মেয়ের সাহায্য লইয়াই একদিনে একখানা কাপড় বুনিতে পারে। আর এক টাকা পাঁচ সিকা এক পরিবারে উপার্জ্জন করা তাহার পক্ষে পরম লাভ। তাহা হইলেও প্রয়োজন মত চরকার সুতা বুনিয়া উঠিতে পারা যাইতেছে না। তাহার হেতু যোগাযোগের অভাব। একখানা কাপড়ে ৩০ তোলা চরকার সুতা উহারাও মূল্য ধরুন বারো আনা (২৲ সের হিসাব) এই দেড় টাকা সুতার দাম আর মজুরি পাঁচ সিকা, ইহাতে মোট দুই টাকা বারো আনায় যে কাপড় জন্মাইবে তাহা

আজকালের বাজারে ৯০ ৩৷০ টাকায় বিক্রয় হইবে। আর যদি সূতাকাটার তুশা ও মজুরি না ধরা যায় তবে মিলের বারো আনা সূতা জোলার পাঁচসিকা মজুরি এই দুই টাকাতে গৃহস্থের একখানা কাপড় হইবে, সে কত স্থায়ী ও কি জিনিষ, যিনি ব্যবহার করিতেছেন তিনিই জানেন।

অনেক গ্রামেই দেখিবেন কাপড় বুনিয়া পোষায় না বলিয়া জোলারা অন্য কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে—কেহ দিন মজুরি করিতেছে কেহ বিদেশে চাকরি করিতেছে। ইহাতে বড় সামাজিক ক্ষতি হইতেছে। জোলার স্ত্রী কন্যারা যে উপার্জ্জন করিত তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। বরিশালের খালিসাকোটা অঞ্চলে যাহাদের বাড়ী তাঁহারা জানেন তাঁতীর স্ত্রী কাপড় জোনার কতটা সাহায্য করে। ঐ তাঁতীকে ওখানে "যুগী" বলে—উহারা হিন্দু। বরিশালের চাষারা এখনও মিলের সূতার মোটা কাপড় পরে। উহা লম্বায় ও চওড়ায় ছোট। যুগী-দের কাপড় বলিয়া উহা পরিচিত। ঐ জিনিষ মিলওয়ালারা এখনও গ্রামে পাঠায় নাই কাজেই বরিশালের চাষীর অন্ন এই যুগীরা এখনও বয়ন কর্ম্মে-জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিতেছে। উহাদের মেয়েদের ঘর বাঁট দেওয়া, রান্না করা, বাসন মাজা যেমন নিত্য কর্ম্ম ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন হয়, তেমনি সূতার কতকগুলি কাজও নিত্যকর্ম্ম মধ্যে গণ্য। মেয়েরা সকালে উঠিয়াই সূতা ভিজায় ও পূর্ব্বদিনের সূতার জল বদলায়। তারপর বেলা ৯।১০ টা পর্য্যন্ত মাড় দেয়। স্নান ও খাওয়ার পর সমস্ত দুপুর ও বৈকাল পর্য্যন্ত কেহবা নাটায়, সূতা রৌদ্রে দেয় ও নলী পোরে, সূতা টানা হাঁটা করে। এই কর্ম্মে কেবল মেয়েরা নয় ছেলেপুলে ও বুড়োরাও যোগ দেয়। বাড়ীর কর্ম্মঠ পুরুষ তাঁতে বসিয়া বোনে আর হাটে কাপড় বিক্রয় করিয়া নিজের প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনিয়া আনে। সকাল হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাহারা এই কাজ করে। এই করিয়া একখানি তাঁতে মাসিক ৩০।৩৫ টাকা রোজগার করে। খুব কষ্টের রোজগার সন্দেহ নাই—কেননা এক জনের পরিশ্রমে নহে—বাড়ীর সকলের শ্রমে ঐ টাকাটা উঠে। কিন্তু জোলা যুগীরা তাই বা সব যায়গায় পায় কোথায়? পাইলে বাড়ী ছাড়িয়া সহরে চাকরীর জন্য ছুটিত না। এখন যুগীজোলাদিগকে তাঁতে বসান একটা বড় কাজ। আর যে সব যুবকেরা কলিকাতায় বা অন্য সহরে চাকরীর জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদিগকে আমি বলি গ্রামে ফিরিয়া যাও। ভাই বোন স্ত্রী সকলে মিলিয়া খাটিয়া ঐ যুগী জোলার মত মাসে ৩০।৩৫ টাকাই রোজগার কর। আমার নিকট পুনঃ পুনঃ বি, এ পাশ বি. এ ফেল চাকরে, ঐ ৩০৲ টাকার চাকরির জন্যই ঘুরিয়া বেড়ায়। কেহ বা বলে আপনার অমুক কারখানায় বিনা মাহিনায় শিক্ষানবিশি কাজ দিন, পরে কর্ম্ম শিখিলে ২৫।৩০ যাহা হয় বেতন দিবেন। তাঁহাদিগকে যদি বলি, তাঁতের কাজ কর—তখনি যত রকম অসুবিধা আরম্ভ হয়। টাকা নাই, মূলধন নাই, কিছু জানি না ইত্যাদি কতই না করিত অসুবিধা বাহির হয়। একটা তাঁত কিনিতে ৩০।৪০ টাকা লাগে। আর সর্ব্বসাকুল্যে শতখানেক টাকা মূলধন লাগে তাহাই নাই; যোগাড় করিতেপারে না—আর যে ধন্য তাহার অঙ্গে—৮ টাকার জুতা তারপর মোটা ৮।১০ টাকা মূল্যের কোট ও ২০।৩০ টাকার আলোয়ান গায়ে দিয়া আছে। সে ঐ শতেক টাকা সংগ্রহ করিতে পারে না? মিছে কথা; ইচ্ছা নাই তাই পারে না। যদি মর্য্যাদা জ্ঞান থাকে, তবে আমি বলি ও-সাজ খুলিয়া ফেল। নিজে উপার্জ্জন করিয়া ওগুলি পরিও। এখন শুধু গায়ে তাঁতি যুগি জোলার বাড়ী গিয়া বিনা মাহিনায় দিন কতক এপ্রেন্টিশি কর—মানুষ হইবে। "বসুমতী"

সহরে চরকা

সহরের অনেক স্থানে সূতা কাটা আরম্ভ হইয়াছে। চরকার আলোচনা শুনিয়া ও দেশ সেবার

ইচ্ছুক হইয়া অনেকে চরকায় সুতা কাটিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সুতায় কি হইবে।

চরকায় মধ্যবিত্ত লোকের যেমন সাংসারিক সাহায্য হইবে, উহা তেমনি একটা সৌখীন সামগ্রী বটে। চরকায় সূক্ষ্ম সুতা কাটা একটা উচ্চদরের আর্ট। কিন্তু কেবল সুতা কাটিয়া এই সখের তৃপ্তি হয় না, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারোপযোগী জিনিষ তৈয়ারী করিতে পারিলেই সখ মিটে। সকলের পক্ষে ঘরে তাঁত বসাইয়া এই সখ মিটাইবার সুযোগ নাই। আসামের প্রতি গৃহে ছোট ছোট তাঁত আছে। ধনী বা দরিদ্র সকল ঘরের মেয়েরাই তাঁতে কাপড় বুনেন। ইহাতে মজুরী বা দরের হিসাব আসে না। বাড়ীর বাগানে যে তরকারী হয় বা পুকুরে যে মাছ ধরা হয়, তাহাতে ব্যয় কত পড়িল তাহা বর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। বাগানের তরকারী বলিয়া বা পুকুরের মাছ বলিয়া তাহার একটা বিশেষ মূল্য আছে। যাঁহাদের ফুল বাগানের সখ আছে, মূল্য হিসাবে তাঁহারা ত একটি পয়সাও তুলিতে পারেন না কিন্তু ফুল বাগিচায় মাতিয়া আছেন, এমন লোকেরও ত অভাব নাই। আমি বলি, চরকা এবং তাঁতও আর দশটা সৌখিন জিনিষের মতই চলিতে পারে। বাগায় কপির চাষ করিয়া অনেকে উপার্জ্জন করিতেছেন। পয়সা দিলেই কেনা যায়, তবু সুবিধা পাইলেই বাড়ীর বাগানে একটু তরকারী জন্মাইবার সখ কর্ত্তা ও গিন্নীর সমান। পয়সা দিয়া কেনা যায় বলিয়াই উহা অবজ্ঞেয় নহে। তেমনি চরকায় দরিদ্রেরা উপার্জ্জন করে বলিয়াই উহা অবজ্ঞেয় নহে। এত দিন চরকার চর্চ্চা ছিল না বলিয়াই চরকা বা তাঁতে সখ মিটাইবার কথা কেহ ভাবেন নাই। একটি বড় দরকারী জিনিষ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহার পুনরুদ্ধার হইয়াছে। এক্ষণে দরিদ্র উহাতে জীবিকা উপার্জ্জন করিবেন, মধ্যবিত্ত সাংসারিক ব্যয় কমাইতে পারিবেন, আর যাঁহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল তাঁহারা সখ মিটাইতে পারিবেন।

ভাবিয়া দেখুন, আমাদের মেয়েরা লেস্ বুনিতে, কার্পেট বুনিতে কত সময় যাপন করেন। সেটা কিছু মন্দ কাজ নয়। কিন্তু তার সঙ্গে চরকাটাও ধরিতে পারেন আর চরকায় কাটা সুতা বাড়ীতে বুনিয়া গামছা, আসন, টাকুনী ইত্যাদি তৈয়ারী করিয়া কতই না আনন্দ পাইবেন। তাই বলিতেছিলাম, আসামের ভদ্রলোকের তাঁত চালাইবার অভ্যাস থাকায় তাঁহারা চরকায় সুতা কাটিয়া পুরাপুরি সখ মিটাইতে পারেন। কিন্তু বাঙ্গালী মেয়েদের সে সুবিধা নাই, কেন না তাঁতটা আমাদের মেয়েদের মধ্যে কোন কালেই বড় একটা চলিত ছিল না। এখন যুবকদের কাজ তাঁতে লাগিয়া পড়া। অনেকের হয়ত তাঁত বুনিবার সখ আছে, কিন্তু এত অর্থ নাই যে, বাড়ীতে সমস্ত সরঞ্জাম কিনিয়া একটী তাঁত বসান। এ স্থলে পাড়ার কয়েকজন একত্র হইয়া একটী করিয়া তাঁত বসাইতে পারেন। আন্দাজ দুই শত টাকা হইলে মাঝ সরঞ্জাম একখানা তাঁত বসান যায়। প্রথম প্রথম একটু বেশী সময় দিতে হইবে। তাঁতের সরঞ্জাম যোগাড় করা এবং এমন লোক ঠিক করা দরকার যে, ঐ কাজে সাহায্য করিবে এবং দরকার হইলে বুনিতেও পারিবে। তাঁত বসাইবার কিছু দিন পরে কাপড় বোনা আরম্ভ হইলে হয়ত দেখা যাইবে যে, বুনিবার খরচ বেশী পড়িতেছে। কিন্তু লাগিয়া থাকিলে এটাও ঠিক যে, ঘরে বা নিজেদের সমিতিতে কাপড় বুনিয়া বরাবর লোকসান যাইবে না।

যাঁহাদের শীকারের সখ আছে, তাঁহারা যখন শীকার করিতে বাহির হন, তখন যেন এক রাজসূয় যজ্ঞের যোগাড় আরম্ভ হয়। আবশ্যকীয় এটা সেটা সংগ্রহ করিয়া শীকার দলের লোকেরা কত আনন্দ পান। হয় ত দশ বারো টাকা ব্যয় করিয়া চড়ুইভাতি ও শীকারের ব্যাপার মিটাইয়া যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন সঙ্গে ৪টা কি ৫টা পাখী, যার মূল্য দুই কি আড়াই টাকা। সখ মিটাইতে লোকে খরচ গ্রাহ্য করে না। কিন্তু চরকা ও তাঁতের সখ

ঠিক এ রকমের নয়। উহাতে শিকারের মত এত মানসিক উত্তেজনা নাই। তাহা হইলেও অন্ততঃ ইহাকে ওইকারী বাগানের সঙ্গে সহিত তুলনা করিতে পারা যায়। কালোপযোগী বীজকেলা, নিড়ান, ফসল তোলা লাগিয়াই আছে। বর্ষের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত মালীর কাজের শেষ নাই। একই জমিতে ভিন্ন ভিন্ন সার দিয়া কেমন ফল হয় তাহা দেখার জন্য গৃহস্থ উৎকণ্ঠা ও আনন্দ অনুভব করেন। যন্ত্র কার্য্যেও তেমনি সূতায় ভিন্ন ভিন্ন রং ফলাইয়া, রকমারি পাড় তৈরী করিয়া বা টুইল ইত্যাদি জটিল বয়ন কার্য্য করিয়া সখ মিটান যায়—তাঁতিরও কাজের অভাব হয় না। আমার ইচ্ছা হয় দেখি যে, পাড়ার সাদ্ধ্য বৈঠকগুলিতে হাজা উলীয় না মারিয়া কার বাড়ীতে কত সূতা হয়, কার চরকা ভাল, কে বেশী সূতা কাটেন ইত্যাদি আলোচনা হইতেছে। সেকালের ধরণের টানা হাঁটাই সুবিধা না ফ্রামের উপর ঘুরাইয়া টানা করা মোটের উপর ভাল; "বোয়া" করাই ভাল, না প্রতিবারে "বোয়া" বাঁধাই ভাল, এইরূপ আলোচনা, বাংলা দেশের জড়তা দূর করিবে। স্পোর্টে যে বাঙ্গালীর সখ নাই তাহাও নহে। যখন বাগানের খেলার দিনে বাঙ্গালীর ভিড়ে মাঠে স্থান হয় না। আমি বলি এই স্পোর্টিং ভাবটা আরো বাড়াইয়া চরকা তাঁতে প্রয়োগ কর। খেল, সাঁতরাও, লাফাও, বাইচ দেও, সঙ্গে, সঙ্গে চরকা তাঁতটাও কর—তবেই উহার মর্ম্ম বুঝিবে।

পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা করিতে বা স্কুলের পুরস্কার বিতরণ করিতে আমাকে কৃপা করিয়া কেহ কেহ ডাকেন, আমি উহাতে আনন্দ পাই, তৃপ্ত হই। "চরকা" ও "তাঁতি" সমিতির প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণে কবে আমাকে ডাকিবে সেই আশা আজ করিতেছি।

সেদিন ভবানীপুরে জাতীয় বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে আমাকে ডাকিয়াছিলেন। সেখানে দেখিলাম ছেলেরা সুন্দর সূতা কাটিতেছে। কাহাকেও উক্ত সময়ে পূজা নিরত দেখিলে মনে যে ভাব আইসে ঐ শিশুদের সূতা কাটা দেখিয়াও আমার মনে সেই ভাবই উদয় হইয়াছিল। আর দেখিলাম দুইটি যুবক তাঁত চালাইতেছেন, কি তাঁহাদের অনায়াস ও দ্রুত মাকু চালান! ফুস্‌কাস্ শব্দ করিয়া মাকু বিদ্যুৎবেগে যাতায়াত করিতেছে আর ভিন খানি রীড কেমন তালে তালে উঠিতেছে নামিতেছে! যুবকের দেহ ভঙ্গীই বা কি নয়নানন্দকর। বসন্তকাল আসিয়া পড়িয়াছে। বর্ষ শেষের আর দেরী নাই। বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই কি সহরের পল্লীতে পল্লীতে তাঁত বসিয়া যাইবে না? বাংলার যুবকগণ যাঁহাদিগকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াও তৃপ্ত হই না—তাঁহারাই আমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন। আমি জানি যুবকেরা তাঁতের প্রতিষ্ঠা করিলেই ছোট ছোট তাঁত আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবে। বাংলার মেয়েরা আমাদের মেয়েদের মতই তাঁত লইবেন। এই কলিকাতা সহরে এমন বিস্তর অবিবাহিত পরিবার এবং অনাথ ও বিধবা আছেন যাঁহারা চরকায় সূতা কাটিয়া বেশ দু-পয়সা রোজগার করিতে পারেন, এই বিষয়ে পরে বলিব।

—"বসুমতী"।

আমাদের কথা

সভ্যতা ও স্বাধীনতায় নারীর স্থান

সদ্যপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত পৌষ মাসের নব্যভারতে 'স্বরাজ-সাধনায় নারী' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। নারীকে পরাধীন করিয়া রাখা অন্যায় স্বীকার করি কিন্তু নারীকে পরাধীন করিয়া রাখা যে জাতীয় পরাধীনতার অন্যতম কারণ তাঁহার এ কথাটী আমরা ঠিক স্বীকার করিতে পারি নাই। হিন্দু সমাজে নারীর অবস্থা যে বিশেষ সুখকর কোন দিনই ছিল না এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু তাহাই যে হিন্দু পরাধীনতার একটী প্রধান কারণ ইহা অতীতের ইতিহাস উল্টাইয়া ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার Sociology র বিস্তারও যে জাতীয় স্বাধীনতার ভিত্তিতে নারীর স্বাধীনতার প্রয়োজন সুস্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যাত আছে এরূপ মনে হয় না। তার পর একটা বিশেষ ভাবিবার বিষয় এই যে, স্বাধীনতার দাবী ইহার ঠিক পরিমাণ কি? জগতে মানুষের পূর্ণস্বরাজ কখনও হইতে পারে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। অতএব স্বাধীনতার, বিশেষ নারী স্বাধীনতার একটা সীমারেখা হয় কি না, এবং হইলে তাহা কোথায়, কতদূরে? পাশ্চাত্য স্বাধীন জাতিদের সহিত তুলনায় আমাদের নারীরা অনেক পরাধীন তাহা স্বীকার করি। কিন্তু পাশ্চাত্য নারীরাই কি পূর্ণ স্বাধীন? স্বাধীনতার অর্থ লইয়াও অনেক সময় বিশেষ গোল বাধিয়া যায়। স্বাধীনতা অর্থে উচ্ছৃঙ্খলতা পর্য্যন্ত বুঝিব কি না তাহা ভাবিয়া পাই না। অনেক সময় মনে হইয়াছে সভ্যতা ও স্বাধীনতা বলিয়া যে দুইটা জিনিষ বর্ত্তমান জগৎকে তোলপাড় করিতেছে তাহা ইতিপূর্ব্বে কেহই সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করেন নাই,—দুইটাই আমাদিগের নিকট নূতন। দুইটাই অনেকে আকাঙ্খনীয় বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে দুইটার ভিতরে অনেক স্থলে পরস্পর বিসম্বাদী অনেকগুলি ব্যাপার পরিস্ফুট হইয়া পড়িবে। যে Liberty র মূর্ত্তি লইয়া ফরাসী দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়াছিল,—যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রবল বন্যা সমস্ত দেশে সম্প্রদায় বিশেষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাধা তুলিয়া দাঁড়াইয়া নূতন অত্যাচারের সৃজন করিয়াছিল,—সভ্যতার সহস্র নিয়মে বাঁধা দৈনন্দিন জীবন যাপনের সহস্র বিধি ব্যবস্থার সহিত কি তাহা সম্পূর্ণভাবে মিলিয়া যাইবে? অথবা ইবসেনের Pillars of Society বা Doll's house এর মনস্তত্ত্ব ঘটিত চরিত্র ধর্ম্মের মুক্তির স্রোতে সামাজিক ব্যবস্থা ভাসাইয়া দিলে সাধারণ মানুষের জীবন যাপনে সহস্র অনাবিল শান্তি কি স্থির ভাবে বিরাজ করিবে? ইহার মধ্যে কোনটা চাই তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। যদি সামাজিক আচার ব্যবহারের অতি ক্ষুদ্র ব্যাপারটীও সম্যক নিয়মে বাঁধিয়া মানুষের জীবন যাপন অতি জটীল ব্যাপারে পরিণত করিয়া মানুষকে কলে পরিণত করাই সভ্যতা হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীর চাইতে সভ্য জগতে কে? আর যদি ব্যক্তিগত পূর্ণ স্বাধীনতার উন্মেষের উপর সভ্যতা নির্ভর করে তাহা হইলে বাঘ ভালুক। অন্ততঃ পক্ষে যাহাদিগকে বন্যের আখ্যা দিয়া রাখা হইয়াছে তাহাদিগকে কি অতি সভ্য বলিব না? স্বাধীনতার অর্থ উপলব্ধি করিতে পারি নাই। সভ্যতা শব্দটী বোধ হয় আরও জটীল। বোধ হয় মানুষের উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার উপর সভ্যতা নির্ভর করে, কেবল অগ্রসর থামিলেই সে মৃত, তা সে যত উপরেই উঠিয়া থাকুক না কেন, সে আর সভ্য নহে;—এ

পথের কোন সীমা রেখা নাই। আবার ইহার মধ্যে উন্নতির অর্থ লইয়া আর এক গোল উপস্থিত হইবে। ইহাতে মানব সমাজের একতার আদর্শ সূচিত হইবে কি না জানি না। ব্যক্তিগত পূর্ণ স্বাধীনতা মানব সমাজে ছড়াইয়া দিলে সে আদর্শ দূরে সরিয়া যে যাইবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে! আবার হয়ত ধর্মবেত্তাগণ বা জর্মাণ দার্শনিক নীটশে প্রভৃতি বলিবেন, মানুষের উপরের অতিমানুষিক অবস্থা লাভ করাই চরম উন্নতি। তাহার জন্য মানসিক এমন কি শারীরিক দাসত্বও আবশ্যক হইলে দূষণীয় হইবে না। জানি না এই বহু মতবাদের কোনটী সত্য, কোন পথ গ্রহণীয়।

দ্বিতীয় কথা,—কোন একটী মত অভ্রান্ত সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইলেই কি সমাজে গৃহীত হয়? আজও পর্য্যন্ত ইতিহাস ইহার বিরুদ্ধ সাক্ষ্যই দিয়া আসিতেছে। আর সামাজিক আচার ব্যবহার তাহা যত দূষণীয়ই হউক না কেন, তাহার দ্বারা সমাজের যত ক্ষতিই হইয়া থাকুক না কেন, তাহার কলাফল বুঝিতে পারিলেও সমাজ তাহা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিয়াছে এরূপ উদাহরণ ইতিহাস দিতে পারে না। জগতের কোন দেশে কোন আচার ব্যবহারই এ পর্য্যন্ত মূলতঃ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। ইউরোপে স্ত্রী স্বাধীনতা আজ যাহা দেখিতেছি কোন দিন তাহা অপেক্ষা বিশেষ কিছু কম ছিল তাহা মনে হয় না। শরৎবাবু বর্ব্বরকে ছাড়া এই নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ইটালী যখন অষ্ট্রীয়ার অধীন ছিল এবং গ্রীস যখন তুর্কীর অধীন ছিল, মনে হয় তখনও ঐ দুই দেশে অন্ততঃ শরৎবাবু যতটুকু স্ত্রী স্বাধীনতা চান তাহা ছিল। ইউরোপে স্ত্রীলোকের সামাজিক অধিকারেরও সেই প্রাচীন রোমীয় যুগ হইতে এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তখন ইউরোপে বহু বিবাহ হইত না, স্ত্রীলোকের সাধারণ সম্মান বহুল পরিমাণে ছিল, সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল, এবং স্ত্রী শিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্য ধরা যায় না, কারণ সে সময় কোন দেশেই পুরুষের শিক্ষার ব্যবস্থাই তেমন ভাবে গড়িয়া উঠে নাই। ইদানীং কালে কেবল দেখিতেছি ইংলণ্ডে এই সেদিন স্ত্রীলোকের ভোট দিবার অধিকার হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও সামাজিক আচার ব্যবহার ধারণাদির বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এদিকে আমাদের দেশে আমরা প্রাচীন কালের যত প্রকার সুখকর ব্যবস্থার কথাই কল্পনা করিয়া লই না কেন, সমাজে বরাবর বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল তাহা সন্দেহ করিবার উপায় নাই। পাশ্চাত্য সংঘর্ষের একমাত্র সুফল দেখিতেছি এই জিনিষটা সমাজ হইতে বেশ পরিষ্কাররূপে উঠিয়া যাইতেছে। মানুষের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের সহিত এমন করিয়া এত বড় সামাজিক পরিবর্ত্তন জগতে আর কোন দেশে আর কখন হইয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু ইহা হইতেও মনে হয় না যে ভারতীয় নারী তাহার অন্যান্য ধারণা বদলাইয়া ফেলিয়া সামাজিক আদর্শ সম্পূর্ণ নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিবে।

সভ্যতা ও স্বাধীনতার প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি না করিয়া তাহার অস্পষ্ট আদর্শে কিছু গড়িয়া তুলিবার জন্য অনেক সময় আমরা অনেক জিনিষ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে ব্যগ্র হইয়া উঠি। নারীর অবস্থার উন্নতি স্বাধীনতার মূলসূত্রের সহিত মিলাইয়া করিতে হইলে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও স্বাধীনতা ও প্রাচীন ভারতীয় সাধনা ও সামাজিক কঠিন নিগড় এ সব গুলির সূক্ষ্ম বিচার করিয়া বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক অগ্রসর হওয়াই উচিত বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্য স্বাধীনতা জিনিষটা আমরা আজও বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

পরাধীনতায় সভ্যতা ও উৎকর্ষ—ইটালী।

১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমান সৈন্য কনষ্টানটিনোপল্ অধিকার করে, ইউরোপে তুরস্ক সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়

এবং গ্রীস মুসলমানের অধীন হয়। তাহার ফলে অনেক গ্রীক জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক জার্ম্মাণী ও ইটালীতে বসবাস করিতে চলিয়া যায়। যাইবার সময় তাহারা প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণের হস্তলিখিত বহু পুঁথি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। পশ্চিম ইউরোপ এ পর্য্যন্ত খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বাঁধা নিয়মে নিজেকে দাসত্বের চরমে টানিয়া আনিয়া মানুষের সহজলব্ধ শ্রেষ্ঠ সম্পদ জ্ঞানকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া বসিয়াছিল। প্রাচীন গ্রীসের এ দার্শনিক পুঁথিগুলি পশ্চিম ইউরোপের গতি ফিরাইয়া দিল, ইউরোপে নূতন করিয়া জ্ঞান-চর্চ্চা আরম্ভ হইল,—বর্ত্তমান ইউরোপের ভিত্তি গাথা হইল। জ্ঞান-চর্চ্চা ও স্বাধীন চিন্তা প্রসারের ব্যগ্রতায় ইটালীতে ও জার্ম্মাণীতে এই সময় যে আন্দোলন আরম্ভ হইল ইংরাজিতে তাহার নাম Renascence ইহার ফল মার্টিনলুথার ও প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম, ইহার ফল বেকনের Inductive Logic,—ইহার ফল বর্ত্তমান ইউরোপের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ও বিশেষ ভাবে বিজ্ঞান দর্শনের বিস্ময়কর উৎকর্ষ।

কিন্তু এই যে বর্ত্তমান ইউরোপের আশ্চর্য্য মূর্ত্তি, ইহার জন্ম হইয়াছিল যে ইটালীতে সে ইটালী ছিল পরাধীন দেশ। ইংরাজীতে যাহাকে Culture বলে, জার্ম্মানীতে যাহাকে Kultur বলে, বাঙ্গালায় যাহার নাম হইতে পারে—মানুষের জ্ঞান-বিকাশ ও শিল্প কলার উৎকর্ষ সাধন;—ইটালী সেই পরাধীন অবস্থায় ইউরোপীয় স্বাধীন দেশগুলি অপেক্ষা তাহা অনেক বেশী পরিমাণে লাভ করিয়াছিল। ইটালীর সমাজ অন্যান্য দেশের সমাজের আদর্শ হইয়া পড়িয়াছিল, ইটালীর লোকের সহিত আলাপ ব্যবহার করিতে পারা অনেকে ভাগ্য বলিয়া মনে করিত, ইটালী ভ্রমণ করিতে না পারিলে লোকে শিক্ষাই হইল না বলিয়া মনে করিত। ইটালীর চিত্র বিদ্যায় মানুষের মানসিক বৃত্তি-নিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছিল, ইটালীর ভাস্কর্য্যে পাথরের মূর্ত্তি জীবন্তের হাসি কান্নায় সকলকে মোহিত করিয়াছিল, ইটালীর কবি আজও ইউরোপে প্রতি পল্লীতে বাস বাল্মীকির স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু যে ইটালীতে মানব মন এমন সম্পদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল সে ইটালী ছিল পরাধীন। ইটালীর উদাহরণ জগতে এক চমকপ্রদ জিনিষ। অনেক সময় মনে হয় পরাধীনতা বোধ হয় মানসিক বিকাশে বাধা দিতে পারে না, নতুবা ইটালীতে এমন ঘটনা সম্ভবপর হইল কি করিয়া? কিন্তু যদি তাহাও সম্ভব হয়, যদি বাহ্যিক ও মানসিক সর্ব্ব সম্পদই এমন কি অতি সহজে লাভ করা যায়, তাহা হইলেও পরাধীনতা স্বীকার্য্য কি?

প্রাচ্যদেশ।

আর একটী অদ্ভুত উদাহরণ পারস্য দেশ। প্রাচীন আরব জাতিকে একটী সাম্যবাদী উন্নতিশীল বিশাল জাতিতে পরিণত করেন মহম্মদ। প্রাচীন আরবগণ ভয়ানক যুদ্ধপ্রিয় ছিল। আরব জাতি বহু সম্প্রদায়ে বহুদলে বিভক্ত ছিল। বিভিন্ন দলের ভিতর চিরযুদ্ধ লাগিয়াছিল। আরবগণ ইহাতেই গৌরব অনুভব করিত। যেদিন সেই মহাপুরুষের একতার বিষাণ বাজিয়া উঠিল, সেদিন হইতে আরবগণ তাহাদের সাম্প্রদায়িক কলহ মিটাইয়া তাহাদের সমর-প্রিয়তা পরদেশ জয়ে, ভিন্নদেশ-বাসীকে মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে নিয়োগ করিল। কিছুদিন পরে তাহারা পারস্য দেশ জয় করে। ইহার পর হইতে একটা নূতন ব্যাপারের আবির্ভাব হইল। পারসীকগণ সাধারণ আচার ব্যবহার, উৎকর্ষ, Culture এ আরবগণ হইতে অনেক উন্নত জাতি। তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ ভদ্রতা সামাজিকতা, তাহাদের আলাপ ব্যবহার ভাষার কবিত্বময়তা মাধুর্য্য আরবগণকে মোহিত করিল। ফলে পারস্যের Culture আরবে প্রচলিত হইল। পারস্য পোষাক আরবের পোষাক হইল, পারস্য দরবারের অনুকরণে বাগ্দাদের দরবার গঠিত

হইল, পারস্যের আলাপ ব্যবহার, আচার পদ্ধতি, সামাজিকতা সমস্তই আরবে ছাড়িয়া চলিয়া গেল,—এমন কি পারস্য ভাষা বাগ্দাদের দরবারে রাজভাষা বলিয়া গৃহীত হইল। জগতে সর্ব্বত্র বিজেতার শিকাই পরাজিতকে মাথা পাতিয়া লইতে দেখা যায়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে পারস্য বিজিত হইয়াও সভ্যতার উৎকর্ষের বলে মানসিক সম্পদে বিজেতাকে জয় করিয়া আরবের উপর আপন সভ্যতা বিস্তার করিয়া ফেলিল। জগতে এ উদাহরণ আর দেখা যায় না। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ইহা জগতের সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না। ইহাতে জাতীয় শারীরিক শক্তির অভাব সত্ত্বেও শ্রেষ্ঠতর আচার ব্যবহার সামাজিকতা ও মানসিক উৎকর্ষের দ্বারা বিজেতার উপর প্রভুত্ব সম্ভব, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। পারসীকগণ এইরূপ ভাবে স্বীয় সভ্যতার প্রাবল্যে আরবীয় সভ্যতাকে নিজ অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া জগতের মুসলমানের গৌরবময় ইতিহাসের সৃজন করিয়াছে। প্রাচীন গ্রীস নগরীর বিপুল বৈভব ও নিষ্ঠ বিচিত্রতা করডোভার বিদ্যবিদ্যালয় ও গ্রানাডার অলহাম্বরা হইতে আগ্রার তাজমহল পর্য্যন্ত বিজয় গর্ব্বে মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পারসীক সুফি ধর্ম্মই জগতে মুসলমান ফকিরের ত্যাগের মহিমায় প্রাণোন্মাদকর গৌরভ ছড়াইয়া দিয়াছে। আলোচনা করিলে মনে হয়, কে বলে পরাধীন জাতির জাতীয় গৌরব অসম্ভব? তবুও প্রাণ হইতে একটা কিন্তু কিছুতেই যায় না।

আমরা কি চাই।

আসল কথা আমরা চাই কি? আমরা সভ্যতা চাই না, স্বাধীনতা চাই,—ধর্ম্ম ও শৃঙ্খলার সহিত সাধারণের দাসসুলভ অধীনতা মাথা পাতিয়া লওয়া চাই, না উন্নতি বিমুখ সাধারণ জনসঙ্ঘের আত্ম-কর্তৃত্ব-নামে প্রভুত্বের হাতে দেশের ও সমাজের ভাগ্য সমর্পিত করা চাই?—আবার আর এক দিক আছে,—সতীর অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী ও প্রাসাদে বিলাস লালসার কোলে লালিত হোগী, এ দুইটীর প্রথমটী প্রার্থনীয় হইতে পারে। কিন্তু মানুষের বিপুল কর্ম্ম ইচ্ছা পরিপূরণের সহিত বিশ্ববিজ্ঞানের বিকাশে পার্থিব একটা বিরাট চাঞ্চল্য ইহার পরিবর্ত্তে কি শুধু মাত্র শান্তি ও পরমার্থ লাভের নামে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সতীর আসনের প্রশ্রয় প্রার্থনীয়? কেহ কেহ ইহার একটা সহজ উত্তর দিয়া থাকেন,—"আমরা ও সব কিছুই চাই না, অথবা কালকি চাহিব তাহা এখনও ভাবিবার অবসর পাই নাই। আজ চাহি শুধু বাঁচিয়া থাকিতে।" ইহাতে অন্তত আমাদের আপাততঃ কাজের একটা দাঁড়া পাওয়া যায়। কারণ এখানে 'বাঁচিয়া থাকা' ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদের হিসাবে অসীম করিয়া না ধরিলে মোটামুটী শুধু মাত্র বাঁচিয়া থাকার একটা সীমা রেখা করা যায়। আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায়, নারীর পরাধীনতায়, ও জাতীয় দাসত্বে অন্তত সে সীমা রেখাও যদি ভাঙ্গিয়া যাইয়া থাকে তাহা হইলে এ কথা বিবেচনা করিবার সময় বাস্তবিক আর নাই। আগে 'মাথার বাড়ী ঠেকান' অবশ্য দরকার। কিন্তু আমার মনে হয় এই বাঁচিয়া থাকার আবশ্যক জাতির হইতে ব্যক্তিগত হইয়া পড়িয়াছে। এখন কেহ সকলের অবস্থা একত্রে না ধরিয়া কাজ করিতেছে। কেহ বা পেটের দায়ে নিজের স্নেহের বন্ধন পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া শারীরিক দাসত্বের চরম মাথায় তুলিয়া লইতেছে। আবার কেহ বা সেই পেটের দায়েই সকলকে কোলে তুলিয়া লইয়া অন্তত চোখের জলে অন্তরের ব্যাথা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে। অথবা মনে হয় সামাজিক স্নেহ মমতা মানুষের অন্তঃকরণের শ্রেষ্ঠ সম্পদ শারীরিক উৎপীড়নের ও ক্লেশের সম্মুখে সঙ্কুচিত হইয়া আসে। পদ্মায় যখন নৌকা ডোবে তখন জননীও কোলের সন্তান ছাড়িয়া দিয়া থাকেন। আকস্মিক

প্রবল বিপদের সম্মুখে পশু মূলভ আত্মরক্ষার সাধারণ সহজ প্রেরনাই প্রভুত্ব করিয়া থাকে। তাই মনে হয় আমাদের হীন ব্যক্তিগত স্বার্থ চিন্তা আমাদের যে কোন দিন জাতির একত্ব বোধ হয় নাই তাহারই অন্যতম কুফল। তাই পারিপার্শ্বিক অবস্থা হিসাবে আজ যে শুধু ব্যক্তিগত বাঁচিয়া থাকা, একমাত্র প্রার্থনীয় হইয়াছে তাহা নহে, আমাদের জাতীয় জ্ঞানেন্মেষের অভাব হেতু চারিদিক চাহিয়া দেখিলেও কিছু দূর পর্য্যন্ত তাহার বেশী আর কিছু পাই না। অথবা আজ যে অবস্থা তাহাতে বোধ হয় আগে বাঁচিলে তবে জাতি ? তবুও একটা কিন্তু যায় না। বাঁচিবার ও বোধ হয় রকমফের আছে।

লেজিস-লেটিভ কাউন্সিলরগণের কর্ত্তব্য

মেকলের বহিতে পড়িয়াছিলাম যে ভাল আইনজ্ঞ হইলেই যে আইনের মূলসূত্র ভাল বিচার করিতে সক্ষম হয় তাহা নহে। যাঁহারা আদালতে দাঁড়াইয়া কোন মোকর্দ্দমার সূক্ষ্মতত্ত্ব ২ঘণ্টে দিনের পর দিন বক্তৃতা দিয়া যাইতে পারেন, তাঁহাদের অনেককেই পার্লামেণ্টে ঢুকিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। কথাটা ভাবিবার বটে। আমাদের নিজেদের দেশেও আজ কতকটা ইহা দেখিতে পাইতেছি। অন্য দেশের কিছুই জানি না, অতএব তাহাদের বিচার করিবার অধিকারও আমাদের নাই। আমাদের দেশের অবস্থার আলোচনা করিয়া দেখিব। তাহাতে সাধারণ সূত্রের একটী মীমাংসা হইতে পারে। আমাদের দেশে লেজিস লেটিভ কাউনসিল হইয়াছে। তাহাতে দেশের অধিকার কি বাড়িয়াছে, স্বাতন্ত্র্য স্বরাজের দুয়ার কতটা উন্মুক্ত হইয়াছে, তাহার বিচার করিব না। তবে এ কথা সকলেই জানেন অনেক উপযুক্ত শিক্ষিত ব্যক্তি অসহযোগ পন্থাবলম্বন করিয়া কাউনসিল বর্জ্জন করিলেও অনেক আইনজ্ঞ বিচক্ষণ উকীল ব্যারিষ্টার ও শিক্ষিত ব্যক্তি যে কাউনসিলে গিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের অনেকে সুন্দর লম্বা লম্বা বক্তৃতাও করিতেছেন। অবশ্য তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। জগতে ছাপা খানার কল্যানে ও শিক্ষার বিস্তারে ভাষার সাহায্যে ভাবের যে মুক্তি ঘটিয়াছে তাহাতে বাঁধাবুলীতে কোন বিষয় বিশেষ রূপে না বুঝিয়া বক্তৃতা দেওয়াতেও বিশেষ বিস্ময়কর কিছুই নাই। যদি বক্তৃতাই আইন সভার চরম লক্ষ্য হইত তাহা হইলে বড় দুঃখে বলিতে হয় আমাদের স্কুলের ছেলেদের যে ডিবেটিং ক্লাব গুলি আছে, তাহা থাকিতে আর এ রিফর্ম্মড্ ও আইন সভার কি এমন আবশ্যক ছিল।

স্বাধীনতা ও শাসক শাসিতের সম্পর্ক স্থিরভাবে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা অবশ্য আমাদের হয় নাই, এবং এ অবস্থায় হওয়াও সম্ভব নয় বলিয়াই মনে হয়। মহাত্মা গান্ধি যে বলিয়াছেন যে স্বরাজ লাভ বিনা স্বরাজ কাহাকেও বুঝাইয়া দেওয়া যায় না, এ কথার ভিতর একটা গভীর সত্য নিহিত আছে বলিয়াই মনে হয়। একদিন একটী ছাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "জন্মান্ধের কি দেখিতে না পাওয়ায় কোন দুঃখ নাই ?" শিক্ষক উত্তর করিয়াছিলেন, "দুঃখ অবশ্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু জন্মান্ধের সে দুঃখের অনুভূতি হয় না। কারণ মানুষের জ্ঞান আপেক্ষিক। অন্য কিছুর সহিত স্বাভাবিক তুলনা না হইলে আমরা কিছুই জানিতে পারি না। কেহ বুঝাইয়া দিলেও আমরা তাহা ধরিতে পারিব না। আমাদের মাথার প্রায় তিনশ বাতাস বহিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু আমরা কি কখনও তাহা অনুভব করিতে পারি ? আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে হিসাব করিয়া অঙ্ক কসিয়া বাতাসের চাপ বাহির করিয়াছি। কিন্তু জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তের তরেও আমরা সে চাপের বাহিরে যাইতে পারি না। এই জন্য তাহার মনস্তত্ত্ব ঘটিত আপেক্ষিক বিচার আমরা কখনও করিতে পারি না। তাই হিসাবে তাহার পরিমাণ স্থির করিতে পারিলেও, আমরা কখনও তাহা অনুভব

এবং অসহযোগ আন্দোলনের বিপিনচন্দ্র ইহাও তুলনার বস্তু। আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার অনেক অপ্রিয় সত্যকথা বলিয়াছেন, তাহা হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, সর্ব্বাংশেই পাঠকবর্গের বিচারাধীন।

স্বাইপ্রণেতা মহাত্মা গান্ধি—মূল্য ৵০ আনা।

মহাত্মা গান্ধির রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস অতি সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-তত্ত্ব রাজনীতিক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধির নূতন আবিষ্কার। বর্ত্তমান আন্দোলনের এক ও অদ্বিতীয় নেতা মহাত্মা গান্ধির অনুপম নূতনত্ব, গ্রন্থকার অতি দক্ষতার সহিত ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন।

আমরা স্থানাভাবে সত্যেন্দ্রবাবুর পুস্তকগুলির সমালোচনা করিবার অবসর পাইলাম না। গ্রন্থকার বাঙ্গালা সাহিত্যে অপরিচিত নহেন। তাঁহার ওজস্বী লিখনভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রচুর পরিমাণেই আছে। হয়তো অনেকের সহিত গ্রন্থকারের মত মিলিবে না, তথাপি এরূপ নির্ভীক সমালোচনার ভঙ্গীকে আমরা প্রশংসা করি।

রক্তপ্রেম—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মূল্য ৷৵০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হইতে আহম্মদাবাদ অধিবেশন পর্য্যন্ত, কংগ্রেসী আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই পুস্তকে রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে।

প্রথা কি প্রথা ?—আমরা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত বিদ্যাবিনোদ M. R. A. S (London) প্রণীত শিক্ষাবিকৃতির খাঁটি নকল—"প্রথা কি প্রথা ?" নামক সচিত্র সামাজিক উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। গ্রন্থখানির ভাব, ভাষা ও রচনাপ্রণালী অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে। আশা করি, ইহা সর্ব্বত্রই সমাদৃত হইবে।

কুললক্ষ্মী—শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১৷০।

রামানুজ—শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১৲।

বিশ্বসংহিতা—শ্রীরামবন্ধুদেব প্রণীত প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ৵০ এক আনা।

Printed by P. N. Pal, at the Shastraprachar Press, 5 Chidammudi Lane, and Published by P. N. Pal, 26-3 Scott Lane, Calcutta.

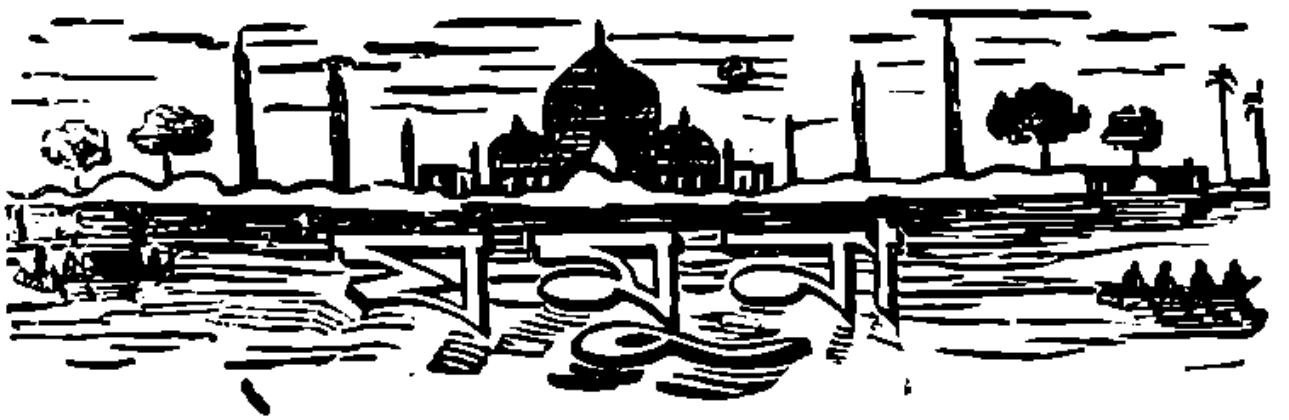

১১শ বর্ষ | চৈত্র, ১৩২৮ | ১২শ সংখ্যা

দেবতত্ত্ব

(অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ)

আমরা ত্রিদেবের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। দেবতা তিনটী ; অগ্নি পৃথিবীস্থান, বায়ু বা ইন্দ্র অন্তরিক্ষস্থান এবং সূর্য্য দ্যুস্থান-দেবতা। ইহার দ্বারা ত্রিদেবের লোক-বিভাগ নির্ণীত হইল। এইরূপ ইঁহাদের সবন, ঋতু, ছন্দঃ, স্তোম, সাম, কর্ম্ম, স্ত্রী ও দেবগণের বিভাগ আছে। এই বিভাগের শাস্ত্রীয় নাম "ভক্তি"। ইঁহাদের প্রত্যেকের আবার "সংস্তবিক দেব"ও আছেন। ত্রিদেবের বিভাগাদি কিরূপ, তাহা বলা যাইতেছে।

অগ্নির লোক—পৃথিবী

"ত্রীণি জ্যোতিংষ্যত্মাস্তান্যগ্নিরেব পৃথিব্যাঃ"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৪।৪।৭) .

সবন—প্রাতঃকাল

অয়ত্বে বসুভ্যঃ প্রাতঃ সবনে "—ঐ, ব্রা (৩।২।২)

ঋতু—শরৎ ও বসন্ত

ছন্দঃ—গায়ত্রী, অনুষ্টপ

স্তোম—ত্রিবৃৎ, একবিংশ

সাম—রথন্তর, বৈরাজ

কর্ম্ম—রথির্বহন

দেবাবাহন

দার্ষ্টিবিধায়ক

সংস্তবিক দেব,—কণ্ব, সোম, বরুণ, পর্জ্জন্য, ঋতুগণ

ইন্দ্রের লোক—অন্তরিক্ষ

সবন—মধ্যন্দিন

ঋতু—গ্রীষ্ম, হেমন্ত

ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ, পঙ্‌ক্তি

স্তোম—পঞ্চদশ, ত্রিণব

সাম—বৃহৎ, শাক্বর

কর্ম্ম—রসানুপ্রদান

বৃত্রবধ

বলকৃতি

সংস্তবিক দেব – অগ্নি, সোম, বরুণ,
পুষা বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, পর্জন্য,
রুদ্র, বিষ্ণু, বায়ু, বরুণসহ মিত্র,
পুষা সহ সোম, রুদ্র সহ সোম,
অগ্নি সহ পুষা, বায়ুযুক্ত পর্জন্য।

সূর্য্যের লোক—দ্যৌ
সবন—তৃতীয় কাল
ঋতু—বর্ষা, শিশির
ছন্দঃ—জগতী, অতিচ্ছন্দাঃ
স্তোম—সপ্তদশ, ত্রয়স্ত্রিংশ
সাম—বৈরূপ, বৈরাজ

সূর্য্যের কর্ম—রসাদান
রসধারণ
প্রবর্হিত

সংস্তবিক দেব – চন্দ্রমা, বায়ু
সংবৎসর

অগ্নির সহচারী দেবগণ অথবা পৃথিবীস্থান-দেবতা বলিলে ৫টী দেবতা বুঝাইত। যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে ইঁহাদের নাম এইরূপ দিয়াছেন, –

অগ্নিঃ, জাতবেদাঃ, বৈশ্বানরঃ।

ত্রিবৃদ্বোধাঃ, ইড়ঃ, তনূনপাৎ, নরাশংসঃ, ইলঃ, বর্হিঃ, দ্বারঃ, উষাসানক্তা, দেব্যাহোতারাঃ, তিস্রো-দেব্যঃ, ত্বষ্টা, বনস্পতিঃ, স্বাহাকৃতয়ঃ।

অশ্বঃ, শকুনিঃ, মণ্ডূকাঃ, অজাঃ, শ্রোবাণঃ, নারাশংসঃ, রথঃ, দুন্দুভিঃ, ইষুধিঃ, হরিণ্যঃ, ঔতীবরঃ, ধনুঃ, জ্যা, ইষুঃ, অশ্বাজনী, উলূখলম্, মুষলঃ দ্রুঘণঃ, পিতুঃ, নখঃ, আপঃ, ওষধয়ঃ, রাত্রিঃ, অরণ্যানী, শ্রদ্ধা, পৃথিবী, অপ্‌বা, অন্নাদী, উলূখলমুষলে, হবির্ধানে, দ্যাবাপৃথিবী, বিপাট্‌ছুতুদ্রী, আত্মা, গৃহপতিঃ, দেবীজোষ্ট্রী, দেবীউর্জাহুতি।

অতঃপর অন্তরিক্ষস্থান দেবতাগণের নাম নিরুক্তকার এইরূপ দিয়াছেন,

বায়ুঃ, বরুণঃ, রুদ্রঃ, ইন্দ্রঃ, পর্জন্যঃ, বৃহস্পতিঃ, ব্রহ্মণস্পতিঃ, ব্রহ্মণস্পতিঃ, বাস্তোষ্পতি, বাচস্পতিঃ, অপাংনপাৎ, হয়ঃ, মিত্রঃ, কঃ, সরস্বান্, বিশ্বকর্ম্মা, তার্ক্ষ্যঃ, মনুষ্যঃ, ঋষিক্রা, সবিতা, ত্বষ্টা, বাতঃ অগ্নিঃ, বেনঃ, অনুমতিঃ, ধাতঃ, ইন্দুঃ, প্রজাপতিঃ অহিঃ, অহির্বুধ্নঃ, সুপর্ণঃ, পুরূরবা ॥ ৩২ ॥

অশ্বিনৌ, উষাঃ, সূর্য্যা, বৃষাকপায়ী, সরণ্যূঃ, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগঃ। দ্যুস্থান-দেবতাগণ বলিলে নিম্ন-লিখিত দেবতাকে বুঝায়—সূর্য্যঃ, পুষা, বিষ্ণুঃ, বিশ্বানরঃ, বরুণঃ, কেশী, কেশিনঃ, বৃষাকপিঃ, অজঃ, অজএকপাৎ, পৃথিবী, সমুদ্রঃ, ধাতৃ, অর্যমা, মনুঃ, আদিত্যাঃ, সপ্তঋষয়ঃ, দেবাঃ, বিশ্বেদেবাঃ, সাধ্যাঃ, বসবঃ, বাজিনঃ, দেব পত্নো, দেবপত্নী।

নিঘণ্টুতে প্রথমতঃ অগ্নি হইতে আরম্ভ করিয়া দেবপত্নী পর্য্যন্ত দেবলোকের একটী ক্রমিক তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। তারপর নিঘণ্টুর শেষে নিম্ন-লিখিত শ্লোক দ্বারা দেবতাদিগের গণ নিরূপিত হইয়াছে। তদনুসারে আমরা উপরে গণ বিভাগ করিয়া দিয়াছি। নিঘণ্টুর শ্লোক এই'—

অগ্ন্যাদিদেবী উর্ব্বাদ্যন্তাঃ ক্ষিতিগতো গণঃ।
বায়াদয়ো ভগান্তাঃ স্যুরন্তরিক্ষদ্যুদেবতাঃ।
সূর্য্যাদিদেবপত্ন্যন্তা দ্যুস্থান-দেবতা ইতি ॥ ৩ ॥

প্রথমেই আমরা পৃথিবীস্থান-দেব অগ্নি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অগ্নিদেব যজ্ঞাগ্নির অধিষ্ঠাতৃদেব। যজ্ঞক্রিয়া ব্রাহ্মণ-যুগে খুবই বাড়িয়া উঠিয়াছিল এবং ইহার সার্থকতাও সেই সময়ে বিশেষ ভাবে অনুভূত হইয়াছিল। সেই সময়ে সকল কাজেই যজ্ঞের ধুম দেখা যাইত। এই যজ্ঞ সম্বন্ধে শাস্ত্রে নানা কথা আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ উপদেশ করিয়াছেন,—প্রজাপতি কামনা করিলেন, তিনি বহু হইবেন। তিনি তাই তপশ্চরণ করিলেন। তপ করিয়া তিনি আপনার অঙ্গে যজ্ঞস্বরূপ এই দ্বাদশাহ দেখিতে পাইলেন এবং নিজ অঙ্গ হইতেই তিনি তাহা দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিলেন। তিনি তাহা আহরণ করিয়া তাহাতেই যজন করিলেন।

প্রজাপতিরকাময়ত প্রজায়েয় ভূয়াংস্যামিতি স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বেদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ ঋচোযজূংষি সামানি ছন্দাংসি যজ্ঞান্ মনুষ্যান্ পশূন্ তমাত্মন এবাগ্নেঽসৃজত প্রাণেভ্যশ্চ যদিদং কিঞ্চ তমাত্মন এবাগ্নেঽসৃজত তমাহরত্তেনাযজত।

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে আছে,—প্রজাপতি ইচ্ছা করিলেন—তিনি বহু হইবেন। তিনি অমনই এই অগ্নিষ্টোম দর্শন করিলেন। তাহা আহরণ করিয়া, তৎসাহায্যে এই সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করিলেন।

প্রজাপতিরকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি স এতমগ্নিষ্টোমমপশ্যত্তমাহরত্তেনেষ্ট্বা প্রজা অসৃজত।

প্রজাপতির যজ্ঞ সৃষ্টি করার কথা বহুস্থানেই আছে। তৈত্তিরীয় সংহিতার "প্রজাপতিঃ যজ্ঞং অসৃজত" প্রভৃতি বচন দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

একাকার।

(শ্রীলীলা দেবী)

ওগো প্রভু মোর ওগো প্রিয় মোর,
ওগো ক্রন্দন হাসি,
হে রাজা আমার হে ভিখারী মোর,
আমার হৃদয়-বাসী।
ওগো সুধা মোর মদির তরল,
ওগো অতি তীব্র গরল,
কুটিল আবার সহজ সরল,
নিদয় দয়াল স্বামী।

তুমিই পিপাসা তুমিই আবার,
বারি হ'য়ে এলো নামি।
ওগো আনন্দ বেদন আমার,
ওগো বন্ধন মুক্তি অপার,
জীবন মরণ করি একাকার
বাজিছে তোমার বাঁশী।
ওগো প্রভু মোর চির প্রাণ চোর
আমার হৃদয়-বাসী!

বংশের কলঙ্ক

(উপন্যাস)

(শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু)

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরামর্শ।

"কেমন দেখলেন?"

"বেশ। ঠিক আমার মনের মত। বাস্তবিক, কালীশঙ্কর বাবু, আমি এ দেশে অনেক দিন কাটিয়েছি, কিন্তু তোমাদের ঘরে এমন ছেলে দেখিনি।"

"কি রকম? আমার ছেলে বলে বলছেন?"

"কালীশঙ্কর, তোমরা আজও ইংরেজকে চিন্‌লে না, এই বড় দুঃখু! তোমার মন রাখবার জন্যে মিথ্যা ব'লে তোমার ছেলেকে বাড়াবো, এমন জাত আমরা নই।"

কথোপকথনের ভঙ্গী দেখিয়াই বুঝিতেছেন, কেনেডি সাহেব ও কালীশঙ্কর বাবুর কথাবার্ত্ত

চলিতেছে; স্থান "দত্ত কেনেডি" কোম্পানীর আফিস, কাল অপরাহ্ণ। এই কেনেডি সাহেবের সহিত কালীশঙ্কর বাবুর বহুদিনের আলাপ। যখন এই কেনেডি সাহেব কলিকাতার একই ষ্টক ব্রুট মার্চ্চেণ্টের আফিসে দুই হাজার টাকা বেতনে মেনেজার রূপে নিযুক্ত ছিলেন এবং কালীশঙ্কর বাবু সবে নিজে দালালী করিতে শিখিতেছেন, তখন হইতে কার্য্যসূত্রে উভয়ের আলাপ। তাহার পর উভয়ে পরামর্শ করিয়া যখন নিজেরা "দত্ত কেনেডি" নামে কারবার খুলিলেন এবং ইউরোপ যাত্রা করিয়া ব্যবসায়ের বিস্তার করিলেন, তখন কেনেডি সাহেব বিলাতে থাকিয়া ও কালীশঙ্কর বাবু দেশে ফিরিয়া ব্যবসায়ের স্বার্থ দেখিতে লাগিলেন।

একটা বিষয়ে উভয়ের অত্যন্ত মনের মিল হইয়াছিল। উভয়েই ভাগ্যপরায়ণ ও ধর্ম্মভীরু, কাজেই ব্যবসায়ের দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। শেষে কেনেডি সার খেতাব পাইয়া নাইট হইলেন। কালীশঙ্করেরও রাজা উপাধি পাইবার সুযোগ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি উপাধিকে ঘৃণা করিতেন বলিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া উহা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা বলিয়া লাট দরবারে অথবা সম্ভ্রান্ত দেশী বা বিদেশী সমাজে তাঁহার "রাজা"র অপেক্ষা কম সম্মান ছিল ছিল না। উভয়ে পরস্পর হইতে বহুদূরে থাকিলেও তাঁহাদের পত্রাদি আদান প্রদান চলিত বলিয়া সৌহার্দ্যের কিছুই ব্যতিক্রম হয় নাই।

সম্প্রতি "দত্ত কেনেডি" কোম্পানীর একটা নূতন কারবার খুলিবার নিমিত্ত কেনেডি সাহেব এ দেশে আসিয়াছেন। এ বিষয়ে কালীশঙ্কর বাবুর সহিত সাক্ষাতে পরামর্শ করিবার আবশ্যকতা ছিল। সেই সূত্রে-উভয়ের মধ্যে স্ব স্ব পারিবারিক কথার অবতারণা হয়। কেনেডি সাহেব বিবাহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পত্নী প্রসবকালে প্রাণত্যাগ করেন। তদবধি তিনি আর বিবাহ করেন নাই। যখন তিনি শুনিলেন, কালীশঙ্করের পুত্র বড় হইয়াছে এবং খেলা ধূলা লইয়া আছে, তখন তিনি তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সেই সূত্রে কালীশঙ্কর বাবুর বাড়ী তাঁহার নিমন্ত্রণ হইল; সেখানে তিনি অরুণকুমারকে দেখিলেন। আজ তাই অরুণের সম্বন্ধেই তাঁহাদের কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

সাহেবের কথা শুনিয়া কালীশঙ্কর বাবু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না, আমি এমন কথা মনেও স্থান দিই না। তবে লোকে বলে, অরুণ অকর্ম্মণ্য, অলস, বিলাসী ও আরামপরায়ণ, তাই বলছিলুম।"

সাহেব বলিলেন, "তা হ'তে পারে। আমি অবশ্য বলছি না যে আমি ওর সব দিকটাই দেখেছি বা বুঝেছি। তবে ওর একটা দিক যা দেখেছি, তাতেই বলছি, ওর মত ছেলে তোমাদের মধ্যে বিরল।"

"কি দেখেছেন?"

"কি দেখেছি? দেখেছি ওর সরল উদার বালকের মত নিষ্পাপ নির্ম্মল মন। আর দেখেছি ওর সহজ সরল সত্য কথা বলার স্বভাব। সব চেয়ে যেটা আশ্চর্য্য, সেটা ওর সাহস, শক্তি ও নির্ভীকতা।"

"সেটা আপনি জানলেন কি ক'রে?"

"ওর সঙ্গে কথা ক'য়েই সব জানতে পেরেছি। তা ছাড়া আফিসেই ওর সম্বন্ধে অদ্ভুত গল্পও অনেক শুনেছি। একদিন মাঠে ফুটবল ম্যাচে গোরাদের সঙ্গে ঝগড়া হয়, শুনলুম তোমার পুত্র তাদের মধ্যে একটার সঙ্গে বক্সিং ক'রে তাকে হারিয়ে দিয়ে দলের ছেলেদের বাঁচিয়ে দেয় আর গোরাদের কাছেও হাততালি পায়। তোমাদের দেশের ছেলে সাহস ক'রে গোরার সঙ্গে বক্সিং করে, এটা বড় সোজা কথা নয়।"

পুত্রের প্রশংসাবাদে পুত্রবৎসল কালীশঙ্করের চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল। তিনি তাড়াতাড়ি সেই দুর্ব্বলতা গোপন করিয়া বলিলেন, "হাঁ, এসব

বিষয়ে অরুণ যে অগ্রণী, তা আমি নিজেও জানি। বিপদে আপদে প'ড়লে লোককে প্রাণ দিয়ে উদ্ধার করা, সকলের আগে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়া, গরীব দুঃখীকে সাহায্য দান করা,—এ সব বিষয়ে অরুণের জুড়ি খুঁজে পাই নে। আবার এদিকে এত দুর্দান্ত যে বলা যায় না।"

"কি রকম?"

এই দেখুন না, ওর চাকরবাকর যদি কথা শুনতে একটু দেরী করলে, তাহলে তাদের ঘাড় ধরে একবারে শূন্যে তুলবে না হয় তাদের উপর কুকুর লেলিয়ে দেবে, অন্ততঃ সিঁড়ি দ'তে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবার ভয় দেখাবে। অথচ জানবেন, ও সবই ওর মিছে ভয় দেখান, ও সামান্য একটা নিরীহ ফড়িঙ্‌কেও মারতে মনে ব্যথা পায়। আবার ভয় দেখাবার পরে চাকরবাকরকে এত বক্সিস দেয় যে, তারা স্বপ্নেও তা কখনও আশা করে না। এইজন্যে ওর চাকরবাকর বা ওর পালিত পাখী ও পশু ওর এত বশ যে তা বলা যায় না। আমার বোধ হয়, অরুণ যেখান দিয়ে চলে যায়, তারা সেই জায়গাটাকেও পুজো করে।"

সাহেব হাসিয়া টেবিলের উপর প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন—"ক্যাপিটাল! স্প্লেনডিড ফেলো (সাবাস্ ছেলে)। এই রকম ছেলেই চাই।"

কালীশঙ্কর বাবু বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিলেন, "বলেন কি আপনি? এর জন্যে আমাদের সমাজে ওর কত দুর্নাম। ডানপিটে হতচ্ছাড়া ছেলে ত এদেরই বলে। আর অলস অকর্মণ্য। বেলা দশটা অবধি ঘুমুবে, কোনও কাজে পাঁচ মিনিট মন দিয়ে বসতে পারবে না, খেলা-ধুলোয় মেতে থাকলে আহার নিদ্রা ভুলে যাবে। এমন ছেলেকে আপনি বলেন সাবাস ছেলে!"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ভুল বুঝ্‌ছো, কালীশঙ্কর। ছেলে সকল দেশেই সমান। যে বয়সের যা, তা হতে না দিয়ে তোমরা তোমাদের ছেলেদের ছেলে বয়সেই অতিরিক্ত গম্ভীর ও কাজের লোক বানাতে যাও, তাইতেই তোমাদের 'কেলিয়োরের' সংখ্যা বাড়ছে, তোমাদের দেশে প্রকৃত মানুষ তৈরী হচ্ছে না। ছেলের স্কুল ছুটতে না ছুটতে তাদের ঘাড়ে স্ত্রীপুত্র ও সংসার চাপিয়ে দেও, তাইতে সেই পাষাণ-ভারে তারা বাড়তে পায় না, ছোট থেকেই চলে যায়, বড় হতে পারে না। শুধু তাই? ঐ পাষাণ-ভারের উপরেও লেখাপড়ার ভীষণ চাপ। একটু খেলো না, একটু শরীর দেখো না, চোখ দেখো না, মন দেখো না, কেবল পড়। স্কুল কলেজের পাশ করাই যেন তোমাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। চোখ যাক্, স্বাস্থ্য যাক্, মন ভেঙ্গে পড়ুক, পরমায়ু ক্ষয় হ'ক, কুছ পরোয়া নেই, পাশ করা চাইই। এ ধারণা যতদিন তোমাদের দেশ থেকে না উঠে যাবে, ততদিন তোমাদের জাতির মঙ্গল নেই।"

কালীশঙ্করবাবু পূর্ব্ববৎ বিস্মিতভাবে বলিলেন, "তবে কি ছেলেরা অলস অকর্ম্মণ্য হ'য়ে বসে থাকবে, আর বাপপিতামহের অধঃপতন করবে?"

"এমন কথা কখনও বলি নি। আমাদের দেশেও লেখাপড়ার আদর আছে, তা'বলে কালেজের পাশের এত আদর নেই। কালেজের পাশ না হ'লে কি ছেলে মানুষ হ'তে পারে না? আমাদের দেশেও ছেলে কলেজে পাশ করে, কিন্তু প্রকৃত কাজে ঢোকবার প্রথম সোপান মাত্র। সুতরাং যারা পাশ না ক'রে প্রথম থেকেই সেই সোপানে পা দেবার চেষ্টা পায়, তারাও কাজের লোক হয়, প্রকৃত মানুষ হয়, দেশের ও দশের উপকার করে। এই যে তোমার ছেলে এখন কেবল খেলাধুলো নিয়ে আছে, দেখবে পরে যখন ও কাজে ঢুকবে, তখন ও কি মানুষ হবে। ওর ভিতরে এমন মেটিরিয়াল (উপাদান) আছে, যাতে কালে ওর অলসতা, অকর্ম্মণ্যতা, বিলাস ও ক্রীড়াপরায়ণতা কোথায় ভেসে যাবে!"

"আপনি একথা বলছেন, কিন্তু আমার আর আর বন্ধুরা একথা বলেন না।"

"কে বলেন না, রায় বাহাদুর নাকি?" সাহেব রামসদয়বাবুকে রায় বাহাদুর বলিতেন।

"ধরুন তিনিই। তিনি আমায় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু তিনিই বলেন, "অঙ্গদ আর শোধরাবে না, ঐ অলস অকর্মণ্যই থেকে যাবে; চিরকাল খেলাধুলো নিয়েই থাকবে, ব্যবসায় বাণিজ্য সব মাটি করবে।"

"অল বস্ এত নন্সেন্স (সব বাজে কথা)! আচ্ছা, কালীশঙ্কর, তোমার ছেলেকে আমায় দাও, দেখ আমি ওকে থেকে কি মানুষ গ'ড়ে তুলি। এর পরে বল্‌বে ওকে দেখে বুঝে কেনেডি যা বলেছিলো তাই ঠিক।"

কালীশঙ্করবাবু হাসিয়া বলিলেন, "ওকে নিয়ে আপনি কি করবেন—পাঁচমিনিট যে চুপ ক'রে বসে একটা কাজ করতে পারে না? দৌড় ঝাঁপ করতে বলুন, ও খুব পারবে, কিন্তু ছুটো জায়গা ঠিক করতে বলুন, খেমে ত্রিখণ্ডিত হবে।"

"বেশ আমি তাই চাই। আমি আপিসের জন্যে কেরাণী একাউণ্টাণ্ট চাইছি না, আমি চাইছি মানুষ, যে মানুষ নিজের নিজত্ব বেখিয়ে একটা আফিস শাসন করতে পারে, বিশৃঙ্খলার মাঝে শৃঙ্খলা আনতে পারে।"

"কোন আফিসে বিশৃঙ্খলা দেখলেন?"

"আমাদের এখনকার বা বিলাতের আফিসের কথা বলছি না, আসামে যে নূতন কারবার খুলছি, সেই আফিসের কথা বলছি।"

"ও: সেলডন্ ব্রাদারের সিবাং স মিল কোম্পানীর কথা বলছেন— যেটার স্বত্ব আমরা সেদিন কিনলুম?"

"হাঁ। শুনেছো ত' সেখানকার ব্যাপার? পুরাণো মালিকের কর্ম্মচারীদের আমরা রেখে দিলুম বটে, কিন্তু আমাদের এজেন্টকে কেউ আমল দিচ্ছে না। এজেন্ট পুরুষোত্তম ঠাকুরের চিঠি পড়েছো ত'?"

"হাঁ পড়েছি। শুনেছি, পুরাণো কর্ম্মচারীদের মধ্যে একজন কর্ত্তা হয়ে এই গোলযোগ ঘটিয়েছে।"

"সেও পুরুষোত্তমের স্বজাতি, মারাঠী। ওখানকার কুলী প্রায়ই মারাঠি গুজরাটী যা মিলে, কাজেই মারাঠী গুজরাটী সর্দ্দার যেট না রাখলে কাজের সুবিধে হয় না।"

"কেন, আসামী কুলী পাওয়া যায় না?"

"আসামী কুলী? হাঃ হাঃ হাঃ। একত' ওখানে আসামীর বাসই অল্প, তাছাড়া আসামীরা কুলী হতে চায় না। নাগা খাসীয়া অত দূরে যেতে চায় না, সে একেবারে আরব দেশের সীমানায় কিনা। তবে দুপাঁচজন কোল বাউরি আছে বটে।"

"তা, আরব কুলীও ত' পাওয়া যেতে পারে।"

"আরব মিসমিরা জঙ্গলী আধা স্বাধীন জাত। তারা এখনও মানুষ মেরে বেড়ায়, তাদের কুলী ক'রে খাটাবে কে? তা হলে মিলিটারী পুলীশ বন্দোবস্ত ক'রে আরব কুলী রাখতে হয়।"

"তা হলে কি করবেন ঠিক করছেন?"

"ঠিক করেছিলুম আমি নিজেই যাব। কিন্তু তোমার ছেলের কথা শুনে আপাততঃ আমার যাওয়া স্থগিত রাখলুম। তাকেই সেখানে পাঠাব, দেখি সে সেই বিদ্রোহী মারাঠীকে শাসনে এনে সেখানে শৃঙ্খলা আনতে পারে কিনা।"

এই কথা বলিয়া সাহেব কালীশঙ্করবাবুর মুখের পানে তাকাইলেন। দেখিলেন, তাঁহার মুখখানি মুহূর্ত্তের জন্য ম্লান হইয়া গেল, চোখে একটা অস্পষ্ট ভীতির চিহ্ন দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল। সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "কি ভাবছ? ছেলে বিপদের মুখে যাবে ব'লে ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল? অথচ ছেলে মানুষ হ'ল না ব'লে দুঃখু করছ! এ তোমাদের কেমন ভাব? একমাত্র সন্তান, বিশেষতঃ মা-হারা,—ভয় হবার কথা বটে। কিন্তু এমন ভয় মনে পোষণ করলে তোমাদের দেশের ভবিষ্যৎ আশাভরসাস্বরূপ এই সব ছেলে মানুষ হবে কি ক'রে? আমি

তোমাদের পুরাণ ইতিহাস কিছু কিছু পড়েছি। তোমাদের দেশে সেই পুরাণের কালে লোকে ত' এমন ছিল না। বেশী কথা কি, এই নূতন যুগেও তোমাদের দেশে রাজপুতদেরও এমন ভাব ছিল না। তোমাদের মনের দৃঢ়তার বড়ই অভাব হয়ে পড়েছে, এই হচ্ছে আসল কথা।"

"না, না, তা নয়। ছেলে যদি প্রকৃত মানুষ হয়, তা হলে তার জন্যে আমি মন দৃঢ় করতে প্রস্তুত আছি। তবে কি জানেন, চিরকাল সুখে লালিত পালিত, তা থেকে একেবারে কঠোর কষ্ট ও বিপদ-সঙ্কুল কাজের মুখে ফেলে দেওয়া—"

"আমি বলছি, আমি ভবিষ্যৎবাণী ক'রে রাখছি, তাতে তোমার ছেলে জয়ী হবে, বিপদ তার কিছু করতে পারবে না, সে বিপদেই পরম আনোদ পাবে। আমি এই মাসেই অরুণকে আসাম পাঠাতে চাই, তুমি কি বল?"

কালীশঙ্করবাবু চোক গিলিয়া বলিলেন, "আচ্ছা ভেবে দেখি, একবার রামসদয়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেখি।"

সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কালীশঙ্কর! আমাদের দেশের কোনও সম্ভ্রান্ত বড়লোক ছেলের জন্যে এমন অফার (প্রস্তাব) পেলে কত আনন্দ করত। দেখ, তোমার কোন ভাবনা নেই। তোমার ছেলের যাতে কোনও বিপদ না হয়, তার ব্যবস্থা আমি ক'রব, আমি নিজেও তার পর যাব। আমি শুধু ওর হাতে ভার দিয়ে দেখব, ও কেমন ম্যানেজ (ব্যবস্থা) করে। সঙ্গে বন্দুক রিভলভার থাকবে, ভয় কি? জঙ্গলী দেশে ফায়ার-আরম (আগ্নেয়াস্ত্র)কে সকলে ভয় করে। তবে আর ভেবে দেখার আবশ্যক কি, পরামর্শ করবারই বা দরকার কি?"

কালীশঙ্করবাবু তবুও আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "তা হ'ক, কিন্তু তা হলেও বাল্যবন্ধুর মতটা নেওয়াও তো আবশ্যক; বিশেষতঃ যখন ভবিষ্যতে রামসদয়েরও অরুণের উপর একটা দাবী থাকবে।"

সাহেব কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "দাবী থাকবে কি রকম?"

কালীশঙ্করবাবু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "ওহো! ওকথাটা যে আপনাকে জানান হয় নি। কথাটা কি জানেন, রামসদয়ের মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিবাহ ওদের বাল্যকাল থেকে ঠিক হয়ে আছে।"

সাহেব পরম সন্তোষের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "বেশ, বেশ। কোন মেয়েটী? সেদিন রায় বাহাদুরের বাড়ী নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়ে যাকে দেখে এলুম? কালীশঙ্কর! আমি এতে বড় সন্তুষ্ট হলুম! এমন সুন্দরী মেয়ে আমি দেখিনি বল্লেই হয়। সুশ্রী মেয়ে তোমাদের দেশে ঢের আছে, কিন্তু এত গৌরবর্ণ বড় একটা দেখতে পাই পাইনে। আর কেমন নম্র ধীর শান্ত স্বভাব! আমি কেবল সামান্য ক্ষণের জন্য দেখেছিলুম, কিন্তু একবারও তাকে মুখ তুলে কথা কইতে দেখিনি। এই বুড়ো সাহেব অজানা অপরিচিত ব'লে তাকেও এত লজ্জা! সত্যি বলছি কালীশঙ্কর, তুমি আমার মনে বড় আনন্দ দিয়েছ এই খবরটা দিয়ে। বড় সুন্দর ম্যাচ (মিলন) হবে ও দুটীর।"

কালীশঙ্কর আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "আপনার নিকট সকল বিষয়ে কৃতজ্ঞ। সেই যৌবনকাল হ'তেই আপনি আমায় ঠিক নিজের ভাইয়ের মত দেখে আসছেন। এখন আবার আমার এই দুরন্ত ছেলেটারও প্রতি আপনার টান দেখছি। আপনি আমায় অশেষ ঋণপাশে বেঁধে ফেলেন।"

বলিতে বলিতে কালীশঙ্করের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সাহেব বলিলেন, "কালীশঙ্কর! পুত্রস্নেহ কি তা কখনও জানিনি বা অনুভব করিনি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এক দিন মাত্র তোমার পুত্রের সঙ্গে কথা ক'য়ে তাকে আমার নিজের পুত্র মনে ক'রে ভালবাসতে ইচ্ছে

করেছে। কালী! এই তোমার হাত ধ'রে বলছি, অরুণ যেমন তোমার, তেমনই আমারও।"

কালীশঙ্কর বাবু বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তিনি সাহেবকে কখনও এমন ভাবাবেশে অবশ হইতে দেখেন নাই। সাহেবের চোখ ছল ছল করিতেছিল, সাহেবের কণ্ঠ বস্তুতঃই বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। কালীশঙ্করবাবু পরম কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সাহেবের হাত দুটী ধরিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তিনি মুখে কিছু না বলিলেও সাহেব তাঁহার নীরব ভক্তিশ্রদ্ধার কথা বুঝিতে পারিলেন।

সাহেব আবার বলিলেন, "কালীশঙ্কর! যখন জানছ আমি তোমার অরুণকে স্নেহ করি, তখন এও জেনো যে তাকে আমি ইচ্ছে ক'রে বিপদের মুখে ফেলে দিতে পারি নি। যথার্থ বলছি, সে ঠিক আমার মনের মত ছেলে। তাকে আমি নিশ্চয় মানুষ ক'রে তুলবো, তুমি আমার হাতে তার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক। তোমাদের বাঙ্গালীদের বড় দোষ তোমরা ছেলেকে ঘরের কোণে পুরে রেখে কেবল পুষ্ পুতু কর, বাইরের জগৎ তাদের দেখতে না দিলে তারা মানুষ হবে কি ক'রে?"

কালীশঙ্করবাবু হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ বাঙ্গালীর অনেক দোষ, তা সেই মেকলে সাহেব থেকে এ যাবৎ অনেক সাহেবই ব'লে আসছেন।"

সাহেব উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, "ওটা ভুল বুঝেছ, কালীশঙ্কর! মেকলের মত সাহেবেরা যেমন দরের লোকের সহিত মেলামেশা করেছিলেন, তেমনই তাঁদের ধারণা হয়েছিল। তা না হলে বুঝে দেখ না, টমির চাঁদে হ'ল কি জাত, আর তাকে বাঙ্গালী বলে না জেনেও তারা সারা বাঙ্গালী জাতটাকে গাল দিয়ে গিয়েছেন। এমন কাণার মত আমি সকল লোকের দোষ দেখতে ভাল বাসি না। তোমাদের বাঙ্গালী জাতের অনেক গুণ, আমি এদেশে বহুদিন বাস ক'রে তা জেনেছি। তোমাদের মেধো তীক্ষ্ণ এবং চরিত্রবান লোকের অভাব নেই। বাঙ্গালী পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী, শান্তশিষ্ট, ধর্মভীরু ও গৃহধর্মশীল। কিন্তু বাঙ্গালীর দুটী মহৎ দোষ।"

কালীশঙ্করবাবু জিজ্ঞাসিলেন, "কি, কি?"

সাহেব বলিলেন, "এক তাদের সাহসের অভাব, আর এক একতার অভাব। তোমরা পরস্পর মিলিত হ'তে পার না, তোমরা সকলে সকলের সাহায্য করতে চাও না, তোমরা সমবায়বদ্ধ হ'য়ে কোন কাজ করতে পার না। এতে যে কেবল তোমাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অবিশ্বাসই মূল কারণ, তাতে সন্দেহ নেই। তবে এতেও তোমাদের সাহসের অভাবও একটা গৌণ কারণ। আমাদের খৃষ্টান মিশনারি সোসাইটী গুলো দেখেছ? এই সব সোসাইটী সংঘবদ্ধ ভাবে কত বড় বড় বিরাট কাণ্ডের অনুষ্ঠান করেছে! দুঃখ এই যে তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ব্যক্তিরাও কোনও বিশেষত্বের পরিচয় দিতে পাচ্ছেন না, তাঁরাও গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। দেশের আশা ভরসাস্থল এই সব যুবকের যদি চিন্তার স্বাতন্ত্র্য না থাকে, যদি তাঁরাও সংঘবদ্ধভাবে কাজ করতে অসমর্থ হন, তা হলে তোমাদের দেশের মঙ্গল কোথা? কিন্তু দেশের যুবকবৃন্দকে যদি কেবল ঘরের কোণে বসিয়ে রাখা হয়, বাইরের জগতে ছেড়ে দিয়ে পাঁচটা ভূয়োদর্শন লাভ করতে না দেওয়া হয়, তা হলে তারা পাঁচজনের সঙ্গে মেলা মেশার সুযোগই বা পায় কোথায়, পাঁচজনকে নিয়ে কাজ করবার প্রবৃত্তিই বা তাদের জাগে কোথা হতে?"

কালীশঙ্করবাবু হাসিয়া বলিলেন, "বেশ, আপনি বুঝি আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবারের কথাটা ভুলে গেলেন। এমন পাঁচজনকে নিয়ে ঘর করার দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখাতে পারেন?"

সাহেব বলিলেন, "না, তা পারিনি। কিন্তু এখন ত' শুনেছি তোমাদের মধ্যে ও প্রথাটা

উঠেই যাচ্ছে, যাও বা কোথাও আছে, সেখানে নিত্য ঝগড়া কিচিকিচি। আর যদিও থাকে, সেটা ঘরোয়া ব্যাপার সম্পর্কে আছে, বাইরের জগতের সম্পর্কে নাই। সেই উদার অনন্ত জগতে কেবল একটা পরিবার নয়, অসংখ্য পরিবার বাস করছে। তাদের মধ্যে সকলে সাধ্যমতভাবে কাজ করতে শিখলে শিক্ষা বল, স্বাস্থ্য বল, ব্যবসায় বল, বাণিজ্য বল,—সকল বিষয়েই জাতির উন্নতি হয়। এ শিক্ষার হাতেখড়ি দেব বলেই অরুণকে আসামে পাঠাতে চাচ্ছি। সেখানে গিয়ে পাঁচজনকে নিয়ে অরুণ কাজ করতে শিখুক। এতে অমত করোনা। আজ এই পর্য্যন্ত থাক, অনেক কথা হয়েছে, এর পর আর এক দিন যা হয় একটা স্থির করা যাবে, কি বল?"

অতঃপর উভয়ের মধ্যে ব্যবসায় সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ চলিল। সাহেব প্রায় সন্ধ্যার প্রাককালে হোটেলে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন যে আগামী কল্য অরুণকে লইয়া রমেশ থিয়েটার দেখিতে যাইবেন এবং সেই স্থানে আসাম হইতে আগত কয়েকটী চা-কর সাহেবের সঙ্গে তাহার আলাপ করাইয়া দিবেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ষড়যন্ত্রের সূচনা।

বাবাজীর সহিত রমেশচন্দ্রের কি পরামর্শ হইল তাঁহা কাকে বকে টের পাইল কিনা জানি না, তবে মুড়িওলি যে সে পরামর্শের অংশভাগিনী হইল, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই, কেন না সেই পরামর্শ কালে যদি কেহ মুড়িওলির দোকান ঘরের ছেঁচা বেড়া ভেদ করিয়া ভিতরে দৃষ্টি চালাইতে পারিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত, বাবাজী ও রমেশের সঙ্গে মুড়িওলিও ঘোর গভীর আলাপে নিময় রহিয়াছে। সে পরামর্শের সব কথাগুলা জানিতে না পারিলেও শেষ কয়টা কথা অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে হইয়াছিল বলিয়া শুনিতে পাইবার সুযোগ ছিল।

উঠিবার সময়ে মুড়িওলি বলিল, "সে যদি রাজী না হয়? সে এক বগ্‌গা মেয়ে, লেখাপড়া জানে, সে কি আমার কথা শুনবে?"

রমেশ বলিল, "তুমি রাজী আছ ত? তা হলেই হ'ল। তাকে রাজী করাবার ভার আমার উপরেই রইল। আর এদিকে বাবাজী বাইরের লোক সাক্ষী দেবার জন্যে যোগাড় ক'রে রাখবে। কি বল?"

বাবাজী রমেশের কথায় সায় দিয়া বলিলেন, "বাবু ঠিকই বল্‌ছেন বটেক। রাজী হবেক নি কেনে? টাকা, টাকা, রজতকাঞ্চন গো। টাকায় বাঘের দুধ মেলেক গো।"

মুড়ি-ওলী বলিল, "তা কেমনে হবে? বাবু নিজের ধন পরকে দিবে?"

বাবাজী হাসিয়া বলিলেন, "আর মাসী! তোর বেমনি বুদ্ধি। রাই রাজা ছিল বটেক, এখন রাই যে কুব্জার হাতে আপনি বেচে রাজদণ্ড দিতেছেগো। এতে তোর আমার কথা কি গো?" বাবাজী এই কথা বলিয়া কীর্ত্তনের সুরে বলিলেন:—

"তখন কত আদর ছিল,
গোপিনী রাজরাণী হ'ল,
কদমতলায় রাখাল রাজার পাশে।,
(এখন) কোথা সে কপট কালা,
চূড়া ধড়া বনমালা
ধূলায় ফেলে ধায় কুব্জার আশে॥"

কীর্ত্তনের সুরে পদকয়টী আবৃত্তি করিয়া বাবাজী গান গাহিতে গাহিতে রমেশের পানে চাহিয়া ফিক ফিক করিয়া হাসিতে লাগিলেন। রমেশ মনে মনে চটিলেও চুপ করিয়া রহিল, না হইলে তাহার কার্য্যোদ্ধার হয় না, আর তা ছাড়া চটিলেও উপায় নাই, সে যে বাবাজী ও

মুড়িগুলির খোঁয়াড়ে বাঁধা; কেন, তাহা পরেই প্রকাশ পাইবে।

উত্তরার কাণে মুড়ি-গুলি বলিল, "তা হ'লে রাতে যেমনি আস বাবু, তেমনই আসবে, তোমার মনকে তুমি বুঝিয়ে ঠিক কোরো।"

গভীর রাত্রি, যেন বাড়ীর সকলে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। পাড়ায় কোথাও কাহারও সাড়া শব্দ নাই। ক্বচিৎ কোথা হইতে দুই একটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। বড় রাস্তায় ক্বচিৎ কখনও এক আধখানা ছক্কর গাড়ীর ঘ্যাড় ঘ্যাড় আওয়াজ বাতাসে ছড়াইয়া পড়িতেছে। গলির মোড়ে ঘাটির পাহারাওয়ালা সাহেব বড়-বাড়ীর (কালীবক্স বাবুর বাড়ীর) রোয়াকে অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিতেছে। চারিদিকে একটা নিস্তব্ধতার ও ছমছমানির ভাব বিরাজ করিতেছে। শ্রীমান রমেশচন্দ্র কিন্তু প্রকৃতির সেই নিদারুণ নীরবতার মাঝে সুপ্ত বা নিশ্চেষ্ট ছিল না। ধীরে—অতি ধীরে—সন্তর্পণে—অতি সন্তর্পণে—চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া—ভীত চকিত নেত্রে যেন চারিদিকের ঘনান্ধকার ভেদ করিবার নিমিত্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া—একটী একটী করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া রমেশচন্দ্র নীচে নামিতেছে। নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসেই সে চমকিয়া উঠিতেছে, চাঁদের কিরণে নিজের কায়ার ছায়াপাত দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছে। মেসের যে স্থানটায় কল-পায়খানা, সেইখানে একটা ছোট খরজা, সেটা দিয়া মর্দ্দমা বুহান সরু গলিতে যাওয়া যায়, ঐ পথ দিয়া মেথর-বৌ মেস সাফ করিতে আসে। রমেশচন্দ্র ঠিক চোরের মত চারিদিকে ভীত চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে সেই ছোট খরজা দিয়া সংকীর্ণ গলি পথে নিষ্ক্রান্ত হইল। গলির একপার্শ্বে মেস-বাড়ী, অপর পার্শ্বে মুড়ি-গুলির খোলার বাড়ী। রমেশচন্দ্র খোলার বাড়ীর খিড়কীর দ্বারে মৃদু মৃদু আঘাত করিল। মুহূর্ত্ত পরেই নিঃশব্দে দরজার খিল খুলিয়া গেল। রমেশচন্দ্র ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র দ্বার অর্গলবদ্ধ হইল এবং একটী রমণী তাহার হাত ধরিয়া একটা ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। এতক্ষণে রমেশচন্দ্র হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

রমণী ঘরে প্রবেশ করিয়া ঘরের দ্বারও অর্গলবদ্ধ করিয়া দিল এবং ঘরের আলোক উজ্জ্বল করিয়া দিল, তাহার পর রমেশের পার্শ্বে আসিয়া শয্যার উপর বসিয়া রমেশের কণ্ঠলগ্না হইয়া হাবভাব ও বিলোল কটাক্ষে রমেশকে মুগ্ধ করিয়া বলিল, "কি, বাবুর এতদিনে বার হ'ল? আমি ত মনে করেছিলুম, ভুলেই গেলে। কেন এখন আর রোজ রোজ আস না কেন? কি অপরাধ করেছি আমি?"

রমণী উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী যুবতী, তাহার বিশেষ কোন সৌন্দর্য্য না থাকিলেও কেমন একটা কোমলতা ও কমনীয়তা তাহার দেহলাবণ্যকে বেষ্টন করিয়াছিল। যদি সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকের মত একটী একটী করিয়া তাহার দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমালোচনা কর, তাহা হইলে তাহার অনেক খুঁত বাহির হইয়া পড়িবে; কিন্তু মোটের উপর এমন একটা আল্গা শ্রী তাহার দেহলতাটীকে জড়াইয়া ছিল, যাহাতে তাহাকে দেখিলেই তাহার উপর মায়া পড়ে।

রমেশচন্দ্র সাদরে তাহাকে হৃদয়ে লইয়া আদর করিয়া বলিল, "তোমায় ভুলে যাব, গিরি? সে এ জীবন থাকতে নয়। তবে এখন ঘন ঘন আসতে পারিনি কেন, তা ত' তুমি জান। যখন কালীঘাটে ছিলে, তখন স্বতন্ত্র কথা।"

গিরিবালা আদরে গলিয়া গিয়া বলিল, "জানি। তবে এখানে আসলে কেন? সেখানে ত' বেশ ছিলাম।"

রমেশ তাহার চিবুকখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "কেন, এখানে এসে কি অসুখে আছ? কাছে আছ বলেই কি এত অসুখ?"

গিরিবালা বলিল, "অসুখে আছি? তোমায় কি

বন্ধন কি সুখে আছি। তবে সেখানে যেমন দুজনে নির্ভয়ে ছিলুম, এখানে কি তাই আছি? রাতদিন ভয় ভয়, লুকো-চুরি যাওয়া আসা।"

"তা হয় না, গিরি। এখানে তেমন ক'রে যাওয়া আসা হ'তে পারে না, এটা আমার পাড়া। তবে এখানে আনলুম কেন? জান ত' কেন এনেছি। তোমার ত' শক্তের দিন ঘনিয়ে আসছে, এ সময়ে কাছে না রেখে কি দূরে রাখতে পারি? যাক্, একবার বার করনা, একটু খাই, গা গতোর ব্যথা করছে।"

গিরিবালা মুচকিয়া হাসিয়া ধীর মন্থরগমনে কক্ষমধ্যস্থ একটী ক্ষুদ্র গ্লাসকেসের সন্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া তন্মধ্য হইতে বোতল ও গেলাস বাহির করিয়া আনিল। তখন রমেশ ও গিরিবালার মধ্যে দুই এক পেলাস চলিল। একটু নেশা জমিয়া আসিলে রমেশ হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "বাইরি গিরি। কি চমৎকার তোর চাহনি! ইচ্ছে করলে ঐ চাহনির ফাঁদে ফেলতে পারিস নি, এমন লোকত' দেখতে পাই নি।"

গিরিবালা সোহাগ করিয়া বলিল, "যাও যাও, ফাঁদে ফেলতে হয় তুমি কেল গে, তোমাকে ফাঁদে ফেললেই আমার যথেষ্ট।"

"না, তামাসা না, গিরি। সত্যি পারবি আমার মত আর একজনকে ফাঁদে ফেলতে? এটা কিছু না, এ আমার একটা খেয়াল।"

গিরিবালা ঐ কথাটা তামাসা বলিয়া বুঝিয়াই তামাসাচ্ছলে বলিল, "এর জন্যে ভাবনা কি? বল না কাকে ফাঁদে ফেলতে হবে, যমকে?"

তখন রমেশচন্দ্র গিরিবালার কাণের নিকট মুখ লইয়া গিয়া অনুচ্চস্বরে একটা নাম উচ্চারণ করিল। সে নাম শুনিয়া গিরিবালা বিস্মিত হইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "কাকে—"

রমেশ তাহার মুখে হাত চাপিয়া ঈষৎ ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "চুপ। রাক্ষসের মত চেঁচিও না, যা বলি মন দিয়ে শুনে যাও।"

অতঃপর অতি অনুচ্চস্বরে উভয়ের মধ্যে সলাপরামর্শ চলিল, রমেশচন্দ্র বুঝাইতে লাগিল, গিরিবালা কাঠ হইয়া শুনিয়া গেল। কথা শুনিতে শুনিতে তাহার মুখে নানা ভাব প্রকটিত হইয়া উঠিল তন্মধ্যে ভয় ও বিস্ময়ই প্রধান। কথা শেষ হইলে ভয়ে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সে ভীতি-বিহ্বল স্বরে বলিল, "না, না, আমি পারব না, আমার দ্বারা এমন কাজ হবে না—"

রমেশচন্দ্র তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই কঠোর স্বরে বলিল, "জান, কার সঙ্গে কথা কচ্ছ?"

গিরিবালাও দৃঢ়স্বরে বলিল, "জানি। যে আমায় পথের ধুলো থেকে তুলে এনে চরণে ঠাঁই দিয়েছে তার সঙ্গেই কথা কচ্ছি।"

"তাই বুঝি তার একটা অনুরোধ রাখতে স্বীকার করছ না?"

"তোমার অনুরোধ? আমার প্রাণ দিতে বললে এখনই দেবো। কিন্তু"

"কিন্তু কি? এতে কিন্তু বললে শুনবো না, তোমায় করতেই হবে, কেমন শুনলে?"

গিরিবালা কিছুক্ষণ নীরবে রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "নিরীহ নির্দ্দোষের এই সর্ব্বনাশ করলে যে মহাপাপ হবে।"

রমেশ বিষম বিকট বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, "ওঃ তারি ধর্ম্মজ্ঞান যে! যখন ফিরি-ওয়ালার মত বাজারের পথে দাঁড়িয়ে রূপ বেচে খাচ্ছিলি, তখন ত' এত ধর্ম্মজ্ঞান হয় নি!"

গিরিবালার চোখ দিয়া জল ঝরিল। সে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিল, "তুমিও ত' হাতে গড়ে মানুষ ক'রে সেই নরকের কীটকে শিখিয়েছ পাপের পথ ছেড়ে দিতে। এখন তার ধর্ম্মজ্ঞান দেখে আশ্চর্য্য হচ্ছ কেন? তুমিই আমার গুরু, তুমিই আমার শিক্ষক, তুমিই আমার সব!"

রমেশের বুকের মাঝে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে সে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বিরক্তির সহিত বলিল, "না, সব সহ্য করা যায়, এ খিয়েটারী চঙের একটাও শুনলে হাড় জ্ব'লে যায়!"

ক্ষণকাল নীরব থাকিবার পর রমেশ আবার বলিল, " "গিরি! তুমিই আমার সর্ব্বস্ব, তোমার জন্যে আমি ঘর সংসার ত্যাগ করেছি। তোমায় যা করতে বলছি, তাতে তোমার মন্দ হ'লে করতে ব'লব কেন? নিশ্চয় জেন, এতে আমার একটা মঙ্গল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে ব'লেই করতে বলছি; আর আমার মঙ্গলেই তোমার মঙ্গল, কেমন না?"

গিরিবালাও এইবার চলিয়া পড়িল। তখন পাপী ও পাপীর উপর নির্ভরশীলা পাপিনীর মধ্যে ঘোর পাপের পরামর্শ চলিল। সে গভীর ষড়যন্ত্রের কথা সবটা না শুনা গেলেও মাঝে মাঝে "কুলপী-ওলা," "চুরি," "অরুণকুমার," ইত্যাদি কয়টা কথা বেশ বুঝা গেল। শেষে রমেশ বলিল, "তোর কোন ভয় নেই, গিরি। সাক্ষী ঢের জোটাব। আপাততঃ মুড়ী-ওলী মাসী আর বাবাজীত' আছেই, পরে আবশ্যক হ'লে মেসেরই কত বাবু সাক্ষী দেবে। ছোট কথা, তোর পক্ষে যেন কোন ত্রুটি না হয়।"

সেই গভীর রাত্রিতে গিরিবালার ঘরে মস্ত মন্ত্রণা সভা বসিল। রমেশ, গিরিবালা, মুড়িওলী ও বাবাজী সেই সভার সভ্য। কত মন্ত্রণা, কত যুক্তি, কত তর্ক হইল। প্রায় রাত্রি শেষ হয় হয়, এমন সময়ে রমেশ আবার চোরের মত মেসে ফিরিয়া আসিল। কবাটের অর্গল বন্ধ করিয়া শয্যার উপরে বসিয়া রমেশচন্দ্র দন্তে দন্ত নিষ্পীড়িত করিয়া আপনার মনে বলিয়া উঠিল, "এইবার, অরুণ, এইবার! বুঝবো এবার যদি আপনাকে কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষে করতে পার, তা হ'লে বুঝবো তুমি বাহাদুর। ধার্ম্মিক! এতদিনে তোমার মরণের কলকাঠি টিপেছি, দেখি, কে তোমায় রক্ষা করে।" ক্রমশঃ

ব্যথার ব্যথী।

(গল্প)

(শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ)

আমার বিবাহের সময় শ্বশুরবাড়ী গিয়ে মাত্র পাঁচ ছয় দিন ছিলাম। তখন আমার বয়স চৌদ্দ বছর। একে বিয়ের কনে, তারপর অতি অল্প দিনই সেখানে ছিলাম, তাই সেখানকার সকলকে ভাল করিয়া চিনিয়া উঠিতেই পারি নাই, জানা তো দূরের কথা। বাড়ীতে শ্বশুর ছিলেন না, তিনি বহুদিন স্বর্গে গিয়াছেন। শাশুড়ী আছেন, তাঁকে অবশ্য চিনেছিলাম আর যে যে দিন ছিলাম তিনি আমাকে ঠিক মায়ের মত আদর যত্নই করেছিলেন কিন্তু সেই অল্প কয়দিনের মধ্যেই আমি বুঝে নিয়েছিলাম যে তাঁর প্রকৃতিটা কিছু উগ্র। সহজেই তিনি রেগে ওঠেন, আর রাগ হলে রাগের পাত্রটির উপর তো যথেষ্ট গালিবর্ষণ করেই থাকেন, নিরপরাধীরাও সময় সময় নিস্তার পান না। তবে সে রাগটা কতকটা খড়ের আগুনের মত, যেমন দপ কোরে জ্বলে ওঠে, তেমনই ঠাণ্ডা হয়ে যেতেও বড় বেশী সময় লাগে না। আর ঠিক খড়ের আগুনের মতই তা নিবে গেলে আগুনের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও থাকে না, যা ছাই থাকে তাও সামান্য

বাতাসেই উড়ে যায়। জন্ম হয়ে থেকে স্বামীটা কালো করেনা।

তবে সে রাগ হলে সময় সময় এত ভয়ানক হয় যে সকলেই সর্ব্বদা শশব্যস্ত থাকেন যে তাঁর রাগের কোন কারণ না ঘটিতে পারে। তাঁর রাগকে বাড়ীর সকলেই বড় ভয় করে। সে ছেলে হতে বুড়োরা পর্য্যন্ত। যা হোক্, তাঁর সে রাগের তাত আমাকে সেবার একটুও লাগে নাই। আমি তাঁর অনাবিল স্নেহধারা লাভ হইয়া সে অজানা অচেনা পরের বাড়ীতে ও অনেকটা মায়ের কোল ছাড়া হওয়ার কষ্ট ভুলে ছিলাম। তাঁর আর ছেলে ছিল না, এক মেয়ে ছিল সে আমার প্রায় সমবয়সী। তার একবছর হোলো বিয়ে হয়েছে। এই বিবাহ উপলক্ষে সেও এসেছিল এবং আমি যে কয়দিন ছিলাম সে কয়দিন প্রায় সর্ব্বদাই সে আমার কাছে থাকতো আর না না রকম গল্প শুনিয়ে আমার মনোরঞ্জন কর্ত্তে চেষ্টা কোরতো। তার চেহারাটি বড় মিষ্টি ছিল। নাম ছিল অমিয় বালা।

আর সে বাড়ীতে আমার খুড় শ্বশুর, খুড় শাশুড়ী আর তাঁর দুই ছেলে, তিন মেয়ে। তাঁরা এক অন্নেই ছিলেন। আমার শ্বশুরের স্বর্গারোহণের পর হইতে খুড় শ্বশুরমহাশয়ই সংসারের সব দেখা শুনা কর্ত্তেন; যাহা সামান্য জমীদারী ছিল তাহার তদ্বির তদারক করা, নিজ খাবার মোত জমা দেখা শুনা করা, তার ফসল সব ঠিকমত পাওয়ার ব্যবস্থা করা এ সবই তিনি কর্ত্তেন। পূর্ব্বে তিনি সরকারী চাকরী কর্ত্তেন তাতে মাসে ৩০০৲ বেতন পেতেন; তাঁর দাদার মৃত্যুর পর চাকরীতে পেন্সন নিয়ে বাড়ীতে বসেন। এখন তাঁর বয়স ৬০ বৎসর হবে। তাঁর বড় ছেলে আমার স্বামীর প্রায় ৮।১০ বছরের বড়। ছোট ছেলের বয়স আমার বিয়ের সময়ে ১৭। ১৮ বছর হবে। আমার স্বামীর চেয়ে চার বছরের ছোট। বিয়ের রাত্রে তাঁকে আমি চোকেও দেখিনি অর্থাৎ তিনি কখন কখন আমার কাছে নূতন বৌদিদি বলে এলেও আমি ঘোমটার মধ্যে ও লজ্জায় এত জড়সড় হইয়া যেতাম যে গোপনেও তাঁর চেহারাটা দেখে নিতে পারিনি। লোকে তাঁকে নাম ধরে ডাকলে জেনেছিলাম যে তাঁর নাম দীনেশ। ডাক নাম তুনু। তা ছাড়া তাঁর বিষয়ে যে কয়দিন আর কিছু বিশেষ জানতে পাইনি তবে স্বামী একদিন কথা প্রসঙ্গে তাঁর স্বভাবের বড়ই প্রশংসা করেছিলেন তাই শুনেছিলাম।

তাঁর স্বভাব যে কত ভাল, তাঁর মন যে কত উদার সে পরিচয় আমি পরে পেয়েছিলাম। তাই বলবার জন্যই আজ এতকাল পরে নিজে প্রৌঢ়ত্বের দ্বারে এসে এই প্রস্তাব উপস্থিত কচ্ছি।

তাঁর বড় ভাইয়ের স্ত্রীকেও দেখেছিলাম। তিনি সাদাসিদা মানুষ। তখন তাঁর দু তিনটি ছেলে মেয়ে হয়েছে। একটি ছেলে ত আমার কোলেই অনেক সময় থাকতো। তিনি বললে "চারু, তুই অচেনা লোক হলেও তোর কাছে তো খোকা বেশ থাকে। তোকে বেশ চিনে নিয়েছে দেখ্‌ছি, ঠাকুরপো ওকে বড় ভালবাসে কিনা; তাই তার বৌ বলে খোকাও তোকে ওরি মধ্যে ভালবেসে ফেলেছে?" আমি একটু হেসে খোকাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু দিলাম; সে খল্‌খল করে হেসে আমার কাণের জড়োয়া দুল ধরে এমনি টান দিলে যে আমার কাণের ছিদ্রের পাশে একটু কেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়্‌লো, সে রক্তে তার হাতটা লাল হয়ে গেল। দিদি আস্তে আস্তে "দুষ্টু ছেলে, করলে কি! বলে তাকে ধমক দিয়ে আমার কাণের শুশ্রূষাতে ব্যস্ত হলেন। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলি নাই, ইঙ্গিতে অনেক নিবারণ করতে চেষ্টা করলাম কিন্তু তা কে শোনে! সামান্য একটু রক্ত পড়ার জন্য তিনি এমন একটা হুলুস্থুল বাধিয়ে তুললেন, যে আমাকে বুঝি হত্যাই করে ফেলেছে। খোকা ব্যাপার খানা কি হোলে বুঝতে না পেরে মায়ের ধমক খেয়ে খোঁট ফুলিয়ে ফুলিয়ে কাঁদছিল আর আমার মুখের দিকে চেয়ে

ছেড়ে যেতে ছিল। আমি তাকে কোলে নিয়ে উঠে পড়লাম। দিদির জলপটি, নেকড়া, সব ব্যর্থ হয় দেখে তিনি আমাকে স্নেহের ভৎর্সনা করেন। আমি একটু হেসে ঘরে চলে গেলাম। আমার সঙ্গে যে বাড়ীর দাসীটি এসেছিল সেও দিদিকে বললে "দিদি ঠাকরুণ, কেন ব্যস্ত হোচ্ছো গো! আমার দিদিমণির তো তেমন কিছু লাগেনি! এত লোক জানাজানি কোরে সবাইকে কেন ব্যস্ত করা!"

যা হোক্। সেবার তো এমনি স্নেহ মমতার মধ্য দিয়া কয়েক দিন কাটাইয়া পিত্রালয়ে ফিরে এলাম। এই কয়দিনেই স্বামীর নিকট যে স্নেহ, যে আদর পেয়েছিলাম তাতেই হৃদয় আমার কূলে কূলে ভরে উঠেছিল, তাই পিত্রালয়ে আসা কালে তাঁকে ছেড়ে আসতে আমার চোখের জল বাধন মানছিল না, বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকি পড়ছিলো। কেবল লোক লজ্জার ভয়ে বহু চেষ্টায় চোখের জলকে বাহিরে আসতে দিইনি।

তারপর বাড়ীতে এসে আমার বড় অসুখ হয়। সে অসুখ ক্রমে এত বেড়ে উঠেছিল যে আমাকে প্রায় ছমাস শয্যাগত থাকতে হয়। একটু ভাল হলে ডাক্তারের পরামর্শ মত বাবা আমাকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য হাজারিবাগে লইয়া যান। সেখানে ছয়মাস থাকিয়া যখন শরীর বেশ ভাল হইল তখন বাড়ী দিকে আসি। এইসব কারণে এক বৎসরের উপর আমার শ্বশুর বাড়ীতে আর যাওয়া হয় নাই। শেষে শাশুড়ী ঠাকুরাণীর ভাগাদায় একদিন শুভ দিন দেখে বাবা আমাকে শ্বশুর বাড়ীতে রেখে গেলেন। তখন আমার বয়স ষোল বছর। আমার শ্বশুরবাড়ী নদীয়া জেলার মধ্যে কোন বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে। নানা কারণে সে গ্রামের নাম গোপন রাখিলাম।

(২)

আমি যখন শ্বশুরবাড়ী এলাম সেটা ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি। আমার খুড়তুতো দেবর দীনেশ I.A. পরীক্ষা দিয়া বাড়ী এসেছেন। আমার পাল্কী বাড়ীতে গিয়ে নামতেই তিনি নিজেই খুব জোরে জোরে শাঁখ বাজিয়ে "ঘরের লক্ষ্মী ঘরে এলেন অনেক কালের পরে" ইত্যাদি এক আবাহন কবিতা পাঠ করে আমাকে বরণ করে' ঘরে তুলতে প্রবৃত্ত হলেন। দুই শাশুড়ী হাসিমুখে "বুড়ো হলি তবু ছেলে মানুষি গেল নারে ভুলু" এই বলে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে আমাকে স্নেহে আদরে নামিয়ে নিয়েই দুজনে দুগালে চুমো দিলেন, সেই চুমোর মধ্য দিয়ে তাঁদের হৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহামৃতধারা যেন আমার শিরায় শিরায় সঞ্চালিত হয়ে আমার দেহখানিকে পুলকাবিষ্ট করে দিল, আর হৃদয়ের মধ্যে কি যে একটা আনন্দের স্পন্দন বৈদ্যুতিক প্রবাহের মত ছুটে গেল তা আমি বলে বুঝাতে পারবো না। ঠাকুরপোটি এসে পায়ের গোড়ায় টিপকোরে একটি প্রণাম করলেন; তারপর মুখ তুলে বললেন "কই, সোণার দোয়াত কলমের আশীর্ব্বাদও পেলাম না, টুকটুকে একটা বৌর আশাও দিলেন না, প্রণাম কি তবে মাঠেই মারা গেল নাকি বৌদি!" খুড়ী-শাশুড়ী হেসে বললেন "ভুলোটা যে কি বলে তার ঠিক নাই। ও মনে মনে তোকে কত আশীর্ব্বাদ করেছে তা জানিস্! বড় কোরে না বললে আর বুঝি হয় না!" ঠাকুরপোও হেসে বললে "তা বড় কোরে না বললে বুঝবো কেমন করে! উনি বুঝি আমার সঙ্গে কথাটথা বলবেন না?" আমার শাশুড়ী বললেন „এই তো সবে এলো, এখনো ঘরেই ঢোকে নাই, এখনই কথা বলবার না বলবার ভাঁটালি চুকিয়ে নিতে ব্যস্ত হচ্ছিস্! যা, যা, বেচারা এত পথ এসেছে, এখন চোখেমুখে জল দিয়ে কিছু খেয়ে সুস্থ তো হোক্।" এই বলে তিনি "চল মা, ঘরে উঠবে চল" বলে আমার কাঁধের উপর হাত দিয়ে ঘরে নিয়ে ঘরে তুললেন।

ঠাকুরপোও বাহিরে চলে গেলেন।

আমার শ্বশুরবাড়ী আসবার পর ৪।৬ দিন কেটে গেছে। আমি বিশেষ সতর্কতা সহকারে

শাশুড়ীদের মনযোগাইয়া চলিতে সাধ্য মত চেষ্টা করিতেছি। সংসারে কাজ কর্ম্মের মধ্যে আমাকে তাঁরা বড় যেতে দিতেন না তথাপি আমি সুবিধা মত তাঁদের কাজের সাহায্য করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিতাম। ঘরদোর ঝাঁট দেওয়া, বিছানা করা, পান সাজা, কুটনো কোটা, প্রভৃতি কাজ আমি করিতাম, ছোট ছেলে পিলেদের খাওয়ান, নাওয়ান, জামা টামা পরান, আর কোলেরটিকে কোলে করে কি বসিয়ে রেখে তাকে শান্ত করা এসবও করিতাম। কোলের ছেলেটি প্রথম প্রথম আমার কাছে ঘাঁসে নাই। তারপর বেশ ঠিক কোরে নিয়েছিলাম। আমার স্বামী সে সময় কলিকাতাতে ছিলেন, সেই জন্য মনটা বড়ই অশান্ত ছিল; প্রথম বারে আসিয়া যে ঘরটিতে আমরা ছিলাম সেই ঘরের সেই সময়কার ৫।৬ দিনকার পরম সুখের স্মৃতি আমাকে পাগল করিয়া তুলিত। সে ঘরের বাতাসের মধ্য হইতে তাঁর সেই চুপে চুপে চাপা গলার স্নেহমাখা আদরের কথা গুলি যেন আমি শুনিতে পাইতাম; তাঁর গায়ের মধু মাখা সুগন্ধ যেন সে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল, প্রতি নিশ্বাসে আমি তা উপভোগ কর্ত্তাম।

ঠাকুরপো আমার মনের দুঃখ বুঝিতেন, তিনি আমাকে ভুলিয়ে রাখবার জন্য ভাল ভাল বই সব এনে দিতেন। আমাদের সে সময়ে আজকাল কার মত এত সব উপন্যাস আর গল্পের বই হয় নাই, যেগুলি ছিল তা প্রায় ভাল বই। আর ঠাকুরপো যা বই এনে দিতেন, সেগুলির মধ্যে কোনরকম অসামাজিক কথা কি উৎকট প্রেমলীলাদি থাকিত না। আমি সেগুলি পড়ে বেশ আমোদ পেতাম। ঠাকুরপোর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিবার জন্য তিনি খুব আগ্রহ প্রকাশ কর্ত্তেন। আমার নিজেরও ইচ্ছা কম ছিল না। কিন্তু বাড়ীতে গুরুজনেরা যেন সেটা পছন্দ করিতেন না সেইকারণে এবং আরও নানা কারণে আমি সে ইচ্ছাটা দমন করিয়া রাখাই ভাল মনে করেছিলাম। ঠাকুরপোও তাতে যে রাগ করেছেন কি বিরক্ত হয়েছেন তা বুঝতে পারি নাই।

কখন কখন ভাল ভাল ফুল এনে তিনি আমাকে দিয়ে যেতেন, আর তার মাথা গেঁথে তাঁর দাদার আপিসের আসায় যেন রেখে দিই, আর যেন "তুকাল কমল মালা, বঁধু এলো কই" বলে নিজে নিজেই মনে মনে গান করি তাই বলে যেতেন। সত্যি, সুগন্ধ ফুলগুলি পেয়ে আমার মনটা তাঁর জন্য আরও বেশী কাতর হয়ে পোড়তো আর সেগুলিকে ঘরে কোরে রাখতে ভাল লাগতো না ঘরের টেবিলের উপরই তারা অযত্নে পড়ে থেকে শুকিয়ে যেত; আমি তুলে ফেলেও দিতাম না।

তাঁর পত্র সপ্তাহে দু এক খানা পাইতামই। সেইগুলিই আমার সম্বল ছিল, আর কতদিনে তিনি আসবেন রোজই সেইদিন গুনতাম। তার যে এখনো অনেক দেরী। প্রায় দুই মাস। কলেজ বন্ধ হবে তবে তো! আমার শ্বশুরবাড়ী পাকা দোতালা কোঠা ঘর। উপরের ঘরেই আমরা থাকিতাম। আমার স্বামীর ঘরেই আমি সারাদিন থাকিতাম, রাত্রিতে খুড়তুতো ছোট ননদটিকে কাছে নিয়ে শাশুড়ী যে ঘরে থাকেন সেই ঘরে থাকতাম। শাশুড়ী নিজ কাজ সেরে আসিলে তাঁর একটু সেবা শুশ্রূষা করিতাম। তিনি নিদ্রিতা হইলে আমি শুইতাম। অনেকক্ষণ ঘুম হইত না; কেবল তাঁর কথা মনে হয়ে মনটা আকুল হোতো, চোক্ জলে ভরে আস্‌তো।

উপরে যাইবার সিঁড়িটা যে ঘরের মধ্য দিয়া সেই ঘরে কতক কতক জিনিষ পত্রাদি থাকিত, তার পাশের পশ্চিমদিকের ঘরটা বাড়ীর ভাঁড়ার ঘর ছিল। সময় সময় ভাঁড়ারে যে জিনিস রাখিতে হইবে ভাঁড়ারের দ্বার বন্ধ থাকিলে এবং চাবি তখন না পাওয়া গেলে, সে জিনিষ ঐ ঘরের মধ্যেই তখন কার মত রাখা হইত। তারপর চাবি পাইলে ঘর খুলিয়া ভিতরে রাখা হইত। ভাণ্ডারের চাবি আমার শাশুড়ি

ঠাকুরাণীর আচলে বাঁধা থাকিত সুতরাং তিনি যদি কার্য্যান্তরে আবদ্ধ থাকিলেন অথবা বাড়ীতে না থাকিতেন তবে আর ভাণ্ডার খুলিবার কোন উপায় ছিল না। সুতরাং সময় সময় ঐ সিঁড়ির ঘরে কোন কোন জিনিষ রাখা অনিবার্য্য হইয়া পড়িত। সিঁড়িটা পূর্ব্ব দিককার দেওয়ালের পাশ দিয়া ছিল, ঠিক তার সম্মুখে সে ঘর হইতে বাহির হইবার দরজা। সিঁড়ি হইতে প্রায় ৮।১০ হাত পশ্চিমে সেদিককার দেওয়াল, তাতেই ভাণ্ডারের দরজা লাগান। দক্ষিণদিককার দেওয়ালে, দুটি জানালা।

(৩)

একদিন বৈকাল বেলা কলুবাড়ী থেকে বড় একটা ভাঁড়ে করে প্রায় ১০ সের তেল বাড়িতে আসিল। এ বাড়ীতে নিজ খামার জমিতে যে সরষে হয় তাহাই কলুবাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে ভাঙ্গিয়ে তেল ঘোরে আনা হয়। বাড়ীর চাকর রামচরণ যখন তেল নিয়ে বাড়ীতে এল তখন বেলা ৪টা বেজে গেছে।

খাশুড়ীঠাকুরাণী প্রতিবেশীদের মধ্যে কারও অসুখ করেছে শুনে তাকে দেখতে গেছেন, সুতরাং ভাণ্ডারের চাবি পাওয়ার উপায় নাই। বুড়ী খাশুড়ী কি কাজে ছিলেন, রামচরণকে ঘরের মধ্যে থেকেই বলিলেন "তেলের ভাঁড়টা সিঁড়ির ঘরে বেশ জুত্ ঘোরে বসিয়ে রেখে যা বাবা! দিদি এলে ভাড়ারে তুলে রাখা হবে।" রামচরণ "আচ্ছা মা ঠাক্‌রোণ্" বলে তেলের ভাঁড় নিয়ে সেই ঘরের দিকে চলে গেল। কোথায় কি ভাবে সেটা রেখে গেল আমি তা লক্ষ্যও করি নাই। আমি তখন রান্নাঘরের বারান্দায় বসে রাত্রির রান্নার জন্য তরকারী কুটছিলাম।

সেকাজ শেষ হয়ে গেলে সন্ধ্যা প্রদীপ সব ঠিক কোরতে ব্যস্ত থাকিলাম। উপরের ঘরে কেরোসিনের টেবিলল্যাম্প কি দেওয়ালগির ছিল, তা সব চাকরেই পরিষ্কার কোর্ত্তো। ভাণ্ডার ঘর, ঠাকুরঘর আর শাশুড়ীঠাকুরাণীর জল খাবার ঘরে আর তুলসী মঞ্চে তেলের প্রদীপ দেওয়া হইত। সেই সব প্রদীপ সকাল বেলা জলে ভিজিয়ে দেওয়া হইত, সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেগুলি তুলে বেশকোরে পুছে ফেলে তেল সল্‌তে দিয়ে জ্বালিয়ে ঘরে ঘরে দেওয়া হোতো।

আমি সেইসব ঠিক কচ্ছি এমন সময় শাশুড়ী-ঠাকুরাণী এলেন, তাঁকে তেলের ভাঁড়ের কথা কেউ বলেনেন না। আমি তা তাঁর সঙ্গে কথাই বলি না। তিনি এসে কি কাজে তাঁর নিজের ঘরে গেলেন। সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়া দিবার সময়ের তখনও একটু বিলম্ব আছে দেখে সেগুলি আমি বেশ কোরে সাজিয়ে রাখলাম। সূর্য্যদেব তখন ডুবুডুবু। গাছের মাথায় তাঁর সোনালি রং লেগে পাতাগুলি সোণার মতই চিক্‌মিক্ কচ্ছে। পশ্চিমের আকাশে কে যেন হোলি খেলে আবিরে লালে লাল কোরে দিয়েছে। সোণা রং এর মেঘের ছানাগুলি সেই আবিরে মাখা আকাশের গায়ে ছুটোছুটি কোরে বেড়াচ্ছে। আমার ইচ্ছা হোলো উপরে গিয়ে এই গোধূলির শোভাটা একটু দেখে আসি।

এই ভেবে আমি উপরের ঘরে যাওয়ার জন্য সিঁড়ির ঘরের মধ্যে ঢুকলাম এবং সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গিয়ে উঠ্‌তে যাবো, এমন সময় সিঁড়ির উপরের দিকে চটি জুতোর চটাপট্ আওয়াজ শুন্‌তে পেয়েই বুঝ্‌লাম যে ঠাকুরপো উপরে ছিলেন, তিনি নীচে নাম্‌ছেন্। আমি তাড়াতাড়ি উঠি নাই তাহলে একেবারে সামনাসামনি পড়ে যেতাম এই ভেবে সিঁড়ির সম্মুখ থেকে পশ্চিমদিকে একটু সরে দাঁড়াতে গেলাম যে ঠাকুরপো নেমে গেলে আমি উঠ্‌বো। ঠাকুরপো যে উপরে ছিলেন তা আমি আগে জান্‌তাম্ না। যাহোক একটু সন্ত্রাস্তভাবে তাড়াতাড়ি যাই আমি সরে দাঁড়াতে পশ্চিমে

সরে গেছি অমনি আমার পায়ে যেন কি বাজলো—আর সঙ্গে সঙ্গেই উল্‌টে পড়ে গেল পায়ের দিকে চেয়ে দেখি সর্ব্বনাশ! তেলের ভাঁড়টা একেবারে কাতহয়ে পড়েছে আর ঘরের মেজেতে তেল ঢেউ খেল্‌ছে! দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল, সত্যিই মাথার মধ্যে যেন চিড়িক মেরে উঠলো আর শাশুড়ীঠাকুরাণীর রাগের সময়ের সেই উগ্রমূর্ত্তি আমার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠে আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। আমি ঠক্‌ঠক্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগলাম, বুক ফেটে কান্না আস্‌তে লাগলো—যাঁর কাছ থেকে এতস্নেহ আদর পেয়েছি আজ তাঁর কাছ থেকে কি তিরস্কার কি ভৎসনাই যে পাইব তাহা মনে করিতেই শরীর শিহরিয়া উঠিল। মনে হইল এখনই যদি মৃত্যু হইত, অথবা একটা ভূমিকম্প হইয়া ঘরটার ছাদ আমার মাথার ভেঙ্গে পড়তো, সেও তো সহস্রগুণে ভাল। আমার মনের যে তখন কি অবস্থা সেটা আমার ভগিনী গণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন। আর আমি যে সময়ের কথা বল্‌ছি সে অন্ততঃ ২৫।২৬ বছর পূর্ব্বের কথা। তখন পাড়াগাঁয়ে নূতন বৌয়ের শ্বশুরবাড়ীতে কি ভাবে চলিতে হইত সেটা যাঁরা ভুক্তভোগিনী তাঁরাই বুঝছেন। আমি এখন চল্লিশ বছর পার হয়ে গিয়েছি, নিজেও শাশুড়ী হয়ে পড়েছি কিন্তু এখনও সেই স্বর্গগতা শাশুড়ী এবং খুড়ীশাশুড়ীর কথা মনে হইলে সম্ভ্রমে তাঁহাদের উদ্দেশে মাথা নত করিয়াই সুখ পাই। তাঁরা জীবিত থাকিলে বোধহয় এখনও সব কাজে তাঁদের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া চলিতেই আগ্রহবতী হইতাম, নিজে আদেশী হইবার আকাঙ্ক্ষা হইত না।

যাহা হউক সে সময় আমার মনের এই ভয়ানক অবস্থা আমি একেবারে 'থ' হইয়া গিয়াছি, ন যযৌ ন তস্থৌ, সংসারের আর সব আমার কাছ থেকে যেন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মনের চোখের সাম্নে দেখিতেছি কেবল দুটি জিনিস—মেজের উপর উলটিয়া পড়া তেলের ভাঁড়, তেলের স্রোত, আর শাশুড়ীর রুদ্রমূর্ত্তি!

লিখিতে যতসময় লাগিল মনের মধ্যে এইসব ভাবের আবির্ভাব হইতে তাহার দশাংশও বোধহয় লাগে নাই। ঠাকুরপো যে উপর হইতে নামিতে ছিলেন তাও ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তিনি যে নেমে এসে আমাকে ঐ ভাবে দাঁড়াতে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন, সেটা আবছায়া মত একটু মনে হইলেও তাতে আমার মনের উপর কোন সাড়া দিতে যেন পারিল না। মন যেন অবশ, বিকল। কোন ধারণা করিবার ক্ষমতা যেন আর নাই। ঠাকুরপোর বিস্মিত "এ কি!" শুনিয়া আমার চমক ভাঙ্গিল এবং আমি আগাগোড়া ঠক্‌-ঠক্ কোরে কেঁপে উঠলাম, আর যেন অবশন্ন হয়ে পড়ে যাবার মত হোলাম।

ঠাকুরপো নিশ্চয়ই মুহূর্ত্ত মধ্যেই অবস্থাটা বেশ বুঝেনিয়ে ছিলেন! আমি যে কি লজ্জার দায়ে ঠেকিয়াছি, সে ব্যথা তিনি নিজে বেশ রকমই অনুভব করেছিলেন, তাই আমার সে ব্যথা ঘুচাবার জন্যে তিনি যেন প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। আমার ভাব দেখে খপ করে আমার হাত ধরে ফেল্লেন এবং কাল-বিলম্ব না করে যন্ত্র-চালিতভাবে আমাকে সিড়ির কাছে নিয়ে গিয়ে সমবেদনা মাখা বড় মিষ্টিভাবে আশ্বাস করে বল্লেন কোন ভয় নেই, উপরে চলে যান।" আমি শুধু দাঁড়িয়ে রইলাম দেখে আবার বল্লেন," যান্, যান্, একটুও দেরী কর্‌বেন না।" এইবলে আমাকে সিড়িতে জোর কোরেই উঠিয়ে দিলেন। আমি বুঝতে পার্‌লাম তিনি কি কোরবেন। কৃতজ্ঞতাতে "আমার মন প্রাণ ভরে উঠলো; আমি তাঁর এই উদারতায় ঝর্‌ঝর্ করে চোখের জলফেলতে ফেলতে উপরে উঠতে লাগলাম।

এদিকে আমি উপরে পৌঁছে গেছি ঠিক সেই

সময় তিনি সিঁড়ির ঘরে বেজায় চেঁচামিচি আরম্ভ কোরে দিলেন "বড় মা! ও বড় মা (আমার শাশুড়ীকে তিনি এইরকমই ডাকতেন) কে এখানে তেলের ভাঁড় রেখেছে! কি বেয়াক্কিলে কাণ্ড! দেখতো! আমার চটি জোড়া একেবারে মাটি হোলো! কে ভাঁড় এমন জায়গায় রেখেছে!" তাঁর রাগেভরা গর্জ্জনে সশব্যস্ত হয়ে মা, খুড়ী মারা সেখানে এসে পড়লেন, রামচরণ চাকরও এসে দাঁড়াল।

"দেখুন দেখি বড় মা! এমন জায়গায় কেউ তেল ভরা ভাঁড় রাখে নাকি শুনি!

আর তার সন্ধ্যা বেলা, ঘরের মধ্যে কি ভাল দেখা যায়! উপর থেকে তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে পায়ের ঠেলা লেগে উল্টে গেল! আমি সামনে না গেলে আছাড় খেয়ে আমিও পড়তাম, আর হয়ত হাত পা ভেঙ্গে গিয়ে ডাক্তারের পেট ভরাতে হোতো; নিজেও কয়মাস পড়ে থাকতুম বিছানায় কে জানে!"

খুড়ীমা তাঁকে একটু উৎসনা কর্ত্তে গিয়ে বললেন "তুই বুড়ো ঢেঁকি, হনুমানের মত লাফিয়ে চলিস্, এখনো কি ভাঁড়টা দেখা যাচ্ছে না যে চোকের মাথাখেয়ে এতখানি তেলের লোকসান করি!"

ঠাকুরপোও রেগেই জবাব দিলেন "তুমিই বুঝি রেখেছিলে তাহলে? সুক্ষ্মবুদ্ধির বেড় কি না! তোমার তেলের লোকসানটাই বড় হোলো. আর আমি যে হাত পা না ভেঙ্গে বেঁচে গেছি সেটা কিছুই নয় কেমন? আর আমার জুতো জোড়া যে তেল লেগে মাটি হোলো? যেমন খুয়ে ছিলে, তেমন আমার নতুন জুতোর দাম দিতে হবে তা বলছি কিন্তু!" এইবলে বড়মার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলেন—সে মুখে ঝড়ের আগে প্রকৃতির নিস্তব্ধভাবের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বলা বাহুল্য চেঁচামেচির সময় আমি আবার নীচে নেমে এসেছিলাম!

বড়মার ভাব দেখে ঠাকুরপো আবার রাগ ও দুঃখ মিশালভাবে ধরা গলায় বড় বড় কোরে বলতে লাগলেন "আমি দেখছি আমার এ জীবনটার দাম দশ সের তেলের চেয়েও ঢের কম! তা না হলে সকলে মিলে তেলের লোকসান নিয়েই ব্যস্ত কর্ত্তে যাও কিন্তু আমি যে ঘর ভাঁড়া থেকে বাঁচলুম এ বলে কেউই একটু কথাও বললে না! যা-ই যখন তা ভাবছে না, তখন আর কি! বড় মা তো এর উপর প্রলয় কাণ্ড করবেনই তা জানি! হায়রে, কেন আমার হাত পা ভাঙ্গলো না, তা হোলে তখন আর তেলের দিকে কারো নজর থাকতো না, তার জন্যেও কেউ মুখ ভার কোরে থাকতেন না, ডাক্তার আনার দিকেই সকলের লক্ষ্য হোতো! তা এখুনি না হয় তেলের উপর হোঁচট খেয়ে পড়ি, হাত পা যা হয় ভাঙ্গুক, তেলের শোকে গালাগালির হাত থেকে তো বাঁচি।" এইবলে আমার দিকে একটু কটাক্ষপাত কোরে অভিমান দেখিয়ে তিনি তেলের স্রোতের উপর হোঁচট খেতেই যেন চলেন এমন সময় শাশুড়িঠাকুরাণী খপ্ কোরে তাঁর হাত ধোরে টেনে সাবধানে নিয়ে এলেন. আর মাথার উপর হাত বুলিয়ে বল্লেন "পাগলামি করিস্‌নে ভুলু! বৌমা, ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ দিয়ে এস। হরির লুট দিতে হবে। ভুলুর আমার আজ বড় ফাঁড়া কেটে গেছে এইবলে ছেলের মুখখানি তুলে ধরে থুতনীতে হাত ছুঁইয়ে সেই হাত নিজ ওষ্ঠাধরে নিয়ে চুমো খেলেন, ভুলু উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন মেঘ কাটিয়া গিয়াছে, বড়মার মুখাকাশে প্রসন্ন চন্দ্রালোক মাতৃস্নেহের ছটা।

ভুলু বড়মার পাশে মাথা ঠেকিয়া প্রণাম করিতেই বড়মা কি করিস্ বলে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, চোক থেকে দুটি মুক্তবিন্দু স্বর্গের অমৃত বিন্দুর মত ভুলুর মাথায় পড়িল।

এতকাল গত হইয়াছে কিন্তু ঠাকুরপোর সেই ব্যাপার বাধা হওয়ার চিত্র খানি এমন দিন নাই যে আমার মনে আসে নাই।

ঠাকুরপোর সেই একদিন ারে আমি তাঁকে আমার ব্যথার ব্যথী বলিয়া নে প্রাণে অনুভব করেছিলাম আর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ "তাতে এবং শ্রদ্ধাতে আমার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছিল। আজ এই ২৫।২৬ বৎসর আমার সেই শ্রদ্ধা সেই স্নেহ ক্রমাগত বাড়িয়াই গিয়াছে, এমন একদিন যায় নাই যে দিন ঠাকুরপোতে এবং আমাতে অতি সামান্য সময়ের জন্য একটুমাত্রও মনোমালিন্য ঘটিয়াছে।

সেই দিনকার তাঁহার আত্মত্যাগের উৎসাহ তাঁহাকে আমার হৃদয়ের এতকাছে আনিয়া দিয়াছিল, তাঁহাকে আমার এত আপনার করিয়া দিয়াছিল যে আমার নিজের ভাইএর চেয়েও আমি তাঁহাকে বেশী ভাল বাসিতাম, বেশী শ্রদ্ধা করিতাম, এবং এখনও করি। আমার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহা ক্রমেই বেশী হইয়াছে।

তারপর হইতেই আমি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধ কাজ করিয়া কখন তাঁর প্রাণে বেদনা দিব না সংকল্প করিয়াছিলাম। গৃহদেবতা শ্রীধরের আশীর্ব্বাদে সে সংকল্প আজও আমি অটুট রেখেছি পরেও নিশ্চয়ই রাখিব। ঠাকুরপো বয়সে আমার অপেক্ষা প্রায় ৪ বছরের বড় হইলেও সম্বন্ধ হিসাবে আমার প্রাপ্য সম্মান আমাকে ষোল আনা দিয়াও আমার সঙ্গে নির্দ্দোষ রহস্যালাপ এবং আমোদে কাটাইতে বড় সুখী হন এবং যাহাতে আমি সুখী হই সে বিষয়ে সর্ব্বদা অবহিত থাকেন।

ঠাকুরপোর যখন বিয়ে হয় তখন একদিন সেই স্ত্রীকে আমার কাছে এনে দুজনে আমাকে প্রণাম করে বল্‌লেন, "দেখ, তোমাকে বলে দিচ্ছি আমার বৌদি আর দাদার চেয়ে এসংসারে কেউ বড় নয়! কখন বৌদিকে অপমান করবে না, তাঁর কথায় অবাধ্য হবে না, তিনি যা বল্‌বেন, যা করবেন তাই সন্তুষ্টচিত্তে হাসিমুখে স্বীকার করবে, আজ তার পায়ের সামনে বসে এই প্রতিজ্ঞা কর আমি স্নেহের ঋণে বিকি, তিনি যদি দেন তবেই তুমি পাবে, কিন্তু তাঁকে ছেড়ে পাবেনা তা জেনো!" সেও সেই যে প্রতিজ্ঞা করেছিল, বল্‌তে চোখে জল আস্‌ছে—এপর্য্যন্ত সে প্রতিজ্ঞা সর্ব্বপ্রকারে পালন কচ্ছে! মায়ের পেটের বোনও বোধ হয় এত আনুগত্য জানে না, এত মাথা ব্যথা জানে না। আর ঠাকুরপো? আমি ভগবানের নাম নিয়ে আমার কুমারী ভগ্নিদের প্রার্থনায় আশীর্ব্বাদ করি যেন তারা বিবাহিতা হলে আমার এই ব্যথার ব্যথীর মত দেবর সৌভাগ্যলাভ করে। সত্যি সত্যিই তাকে আমি কেবল দেবর বলে করি না, সে আমার স্নেহের ভাই, হৃদয়ের বন্ধু, সুখের সাথী আর সকলের উপরে প্রাণ দিয়া মন দিয়া আর শরীর দিয়া সে সর্ব্বদার জন্য আমার ব্যথার ব্যথী।

পল্লীব্রজ।

(শ্রীকালিদাস রায় বি এ)

আমাদের—গ্রামের ধারের কাননটি আজ
কেন আমার মানস হরে?
অদূরের— কূলভরণ মুখর নদী
যমুনারি রূপটি ধরে।

বাগানের— আম লিচুর আমার পৌতা
তলার— ছায়লতা গেল কোথা?
ওপারে— কাশের বনে দুধের সাগর,
গোকুল আমার মনে পড়ে।

ও কি ও?—ঝিনী?—না—না, ঝুমুর ঝুমুর ঘুঙুর বাজে,
কিঙ্কিনি?—শুকসারী কি কইছে কথা বনের মাঝে?
সাদা মেঘ— যায় না চেনা আজকে দেখে
মেঘুয়া— নামছে যেন পাহাড় থেকে,
আজিকে— কীচক বনের উতল হাওয়া
পাগল হলো বাঁশীর সুরে।

ছুলে ঐ— দুইয়ে পড়ে কৃষ্ণচূড়ার উমন শাখা
দেখা যায়—উহার তলে কার যেন পায় আলতা আঁকা,
কোঁকড়া- - চুলে গোঁজা সন্ধ্যামণি
কোমরে— গামছা বাঁধা, ঐ পাঁচনি
রাখালের— বেশটি মোহন বাঁকা চলন
আজি আমায় উদাস করে।

মরুপথে

(বড় গল্প)

[শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৬)

একমাস দুমাস তিনমাস গোবিন্দ বাড়ী নাই, মা তাহার ইতিমধ্যেই মরিয়া গিয়াছিল—বাপ বাঁচিয়া আছে যদিও বাপের খোঁজ খবর আর কেই লইল না। জগৎবল্লভীকেও জানাইয়া গেল না—সে কোথায় [illegible]। জগতের উৎকণ্ঠার সীমা নাই। এদিকে গয়লাদের ছেলেটি রোজ রোজ প্রায় ভেট পাঠাইতেছে। বেচারা এ যাবৎ বিবাহ করিতে পারে নাই। তাহাদের মাতৃকুলে কি একটা অপবাদ রটিয়া গিয়াছে, সে কারণ কোন গোপবালাই বরমালা লইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইল না—অথচ বেলাও অপরাহ্ণ হইয়া আসিতেছিল। বেচারীর জমি জায়গা পয়সা কড়িও কিছু আছে, জগৎ মুখের একটি কথা খসাইলে সে একবারে তাহাকে বাড়ীর মধ্যে তুলিয়া লইয়া যাইবে। জগৎ সংশয়ে দুলিতে ছিল, অন্তরের সায় এক মুহূর্ত্ত পাইতেছিল না অথচ অভাবের তীব্র যাতনা দিন দিনই সহিতে-ছিল।

এ বিষয়ে মালতীই ছিল ঘটকী। সেও জগতের কম হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল না। এখন মালতী স্পষ্টই বলিতেছে যদি সে জগৎকে ভুলু গোয়ালার করিয়া দিতে পারে দশ টাকা সে নগদ পাইয়া যাইবে।

পুলীশও আসিয়া মাঝে মাঝে গোবিন্দর খোঁজ লইয়া যাইতেছে। এক একদিন জগতের এমি মনে হয় যদি সে একটু গোবিন্দর কথা জানিতে পারে তবে পাখী হইয়া তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া লইয়া আসে কিন্তু কোথায় গোবিন্দ? এমি করিয়া ছয় মাস কাটিয়া গেল। গোবিন্দর বাপ শীতলও আস্তে আস্তে জরাভার-ক্লান্ত দেহে একদিন ঘুমাইয়া পড়িল। জগতের আপনার বলিতে কেহই রহিল না—রহিল কেবল গোবিন্দর স্মৃতি।

কেন এমন হইল। যেখানে কোন ঠাকুর দেবতা দেখিতে পায় সেই খানেই মাটীতে লুটাইয়া জিজ্ঞাসা করে ঠাকুর কেন এমন হলো—কোথায় গেল?"

এমন সময় একদিন খবর পাওয়া গেল গোবিন্দ

বর্দ্ধমানের রাস্তায় ডাকাতি করিতেছিল,. মেজবাবু বর্দ্ধমান যাইতেছিলেন গর্দ্দানঘাটীর মাঠে তাহাকে দলবলসহ পুলীশে ধরাইয়া দিয়াছেন।

আর কাহারও কিছু ইতস্ততঃ করিবার রহিল না। জগৎও খানিক কাঁদিয়া তারপর চিরতরে চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। এখন তাহাকে আবার এক নূতন ঠাটে সাজিতে হইবে।

মালতীকে বলিল—একটা লোকের জাতমারা সে আমার দ্বারা হবে না মালতী খুড়ী, তুই অন্য লোক ভাখ্।

মালতী মিনতি করিয়া বলিল সে কিন্তু বড্ড পছন্দ করে যে জগৎ।

জগৎ বলিল, তার কি করিব।

এই রকমে জগতের যখন মন নরম হইয়া আসিতেছে তখন বাবুদের বাড়ী বাসন মাজিবার জন্য তাহাকে একদিন ডাক পড়িল। আর না বলিয়া যাইতে পারিব না বলিবার সে ক্ষমতাও নাই। বিশেষ বড়বাবু মেজ বাবুর ডাক যেন যমের ডাক। গ্রামের সমস্ত ইতর ভদ্র ঐ লোক দুটাকে ভয় করিয়া চলিত।

আদেশ পালন করিতে তাহার ইতস্ততঃ করা চলিল না, আসিতেই হইল।

আসিয়া দেখিল, বাড়ীতে মেয়ে মানুষ নামা কেহ নাই। শুধু দুটা একটা চাকর আর মেজবাবুর বড় ছেলে সতীশ মাত্র রহিয়াছে।

জগৎ বাড়ী প্রবেশ করিতেই সতীশ কি রকম এক লোলুপ চাহনিতে জগতের দিকে তাকাইয়া রহিল।

তাহার দেহে যৌবন প্রকাশ পাইয়া অবধি অনেকে তাহার দিকে এমনি চাহিয়াছে, সেইজন্য তাহাতে নূতনত্ব কিছু ছিল না। সে ভদ্রজাতির এই নির্লজ্জ লোলুপতাটীকে তাহাদের ভদ্রমানীর একটা অঙ্গ মনে করিয়াই ঘৃণা করিয়া চলিত।

কিন্তু খানিক পরে সেই সতীশবাবু যখন একটা নির্জ্জন ঘর হইতে তাহাকে ডাক দিল তখনি তাহার বুক ধমিয়া গেল।

অনেকক্ষণ যাইতে ইতস্ততঃ করিল কিন্তু পুনঃ পুনঃ আহ্বানে না যাইয়াও পারিল না।

বাবু আহারান্তে খাটের উপর পা ছড়াইয়া একটা গড়গড়ার সটকা ধরিয়া টান দিতেছিল। জগৎ ঘরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইতেই জগতের দিকে আড় নয়নে চাহিয়া বলিলেন এতক্ষণ তোকে ডাকাডাকি করলুম, আসছিলিনে কেন? ও কি ঘরের বাইরেতেই যে ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলি, এই জন্য কি ডাকলুম নাকি? তোর আমাকে ভয় করচে! বুঝেছি, আমার ঘরের ভিতর ঢুকতেও তুই সঙ্কোচ কচ্চিস্, তা ভাখ বাবুনের মুখের কথাই হল শাস্ত্র, আমি যখন বলচি তোর আসতে বাধা নেই, ঘোমটাও দেখচি হাত পাঁচ ছয় টেনে দিয়ে বসেছিস। আমি কি তোর ভিন্ গাঁয়ের বড় ঠাকুর নাকি? নে, ঐ খানটায় টিকে কয়লা তামাক আছে, এখন ভাল ক'রে এক কলকে তামাক সেজে যে দেখি, তার পর অন্য কথা হবে এখন্।"

জগৎ ভয়ে কাঠ হইয়া আর এক পা আগাইতেও পারিতেছিল না, পিছাইতেও পারিতেছিল না। ঘোমটার ভিতর তাহার মুখখানা ঘামে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

সতীশ দ্রুত দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনিয়া সমঝিয়া বলিল, "বুঝেছি তোর এখনও খাওয়া হয় নি, তা নে ঐ খানটায় ঐ থলেটায় চাউল আছে তোর যতখানি দরকার নিয়ে যা—আহা তুই হলি আমাদের গাঁয়ের মেয়ে। আপদে বিপদে তোকে আমরা দেখব না ত কে দেখবে বল্—দেখবে কি এসে ঐ ও গাঁয়ের ভট্চাজ্জি! সতীশ কষ্ট করিয়া উঠিয়া আসিয়া চাউলের থলে দেখাইয়া দিল।

জগতের ইচ্ছা হইতেছিল না যে এই চাউল গ্রহণ করে কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঘরের অভ্যন্তরে শিশুকে মনে পড়িল। মান বাঁচানো অপেক্ষা শিশুর প্রাণ

বাঁচানোই আজকাল বড় চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল সেইজন্য কোন আপত্তি তাহার মনের দুয়ার পর্য্যন্ত আসিয়া আর আমল পাইত না, তাহাকে ঘোমটা দিয়াই চালের বস্তার কাছে দাঁড়াইতে হইল।

সতীশ প্রায় সের পাঁচেক হবে চাউল জগতের আঁচলে দিয়া বলিল, "এই নিয়ে যাও।" তারপর অনেকখানি দন্তপংক্তি বিস্তার করিয়া বলিলেন, "ঘরে নাওয়া আহা এ তোমারই ঘর অন্ততঃ এখনও পাঁচ ছয় মাস ত বটেই। বউরা সব পশ্চিম গেছে, বাড়ীতে কেবল রইতে রইতে রইলুম তুমি আর আমি। তোমার ছেলেকে খাইয়ে হলো বা সঙ্গে করেই এইখানে নিয়ে এসো না। কেউ কিছু বলবে না—আর বলবেই বা কে কি?—"

জগৎ যেন মোহিত হইয়া যাইতেছিল। সতীশের [illegible] কথা তাহাকে যেন তাহার নিতান্ত অজ্ঞাতে কোন্ এক সুখ-স্বর্গলোকের পানে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল।

বাড়ী আসিয়া যখন উনান জ্বালাইয়া তাহাতে চাল চাপাইয়া ছেলেকে কাছে টানিয়া লইল, তখন আজকের সমস্ত ঘটনা মনের মধ্যে উঠিয়া পড়িয়া কেমন অনুশোচনা আসিয়া গেল। কোথায় কোন্ জোয়ানের ঘরের গিন্নী হইয়া ভোগের সহিত দিন কাটাইত—তা নয় নিজের পেটের ভাতও করিতে হইবে রূপ বেচিয়া—

এই সব ভাবিয়া জগতের চোখে জল আসিতে লাগিল। তাহার ছেলেটা অনেকবার তাহার এই মায়ের কান্না দেখিয়াছিল কিন্তু একটি দিনের তরে কোন কথা বলে নাই, আজ প্রবল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আকুল অতৃপ্ত নয়নে তাহার মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। আর জগত মনে মনে বলিতেছিল, হায়রে মা, জগতের মধ্যে কি অভাগিনী তুই তোর চোখের জল মুছাইতে কেহ নাই।

(৭)

সন্ধ্যাবেলায় আবার তাহার ডাক পড়িল, ইতি-মধ্যে রাত্রির মধ্যে গ্রাম ছাড়িয়া যাইবার সংকল্প করিয়াছিল তাহাও আর ঘটিয়া উঠিল না। লোকের পর লোক আসিয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিতে লাগিল, তাহার যাইলেও সর্ব্বনাশ না যাইলেও সর্ব্বনাশ।

আবার তাহার বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস উঠা নামা করিতে লাগিল।

মালতী আসিয়া বলিল, "যা-না লো কি করতে বাবু ডাকছেন শুনেই আয় না,—দুটো বাসনকোশন ধোয়া এ আর পারবিনে, তোর ভাগ্যি ভাল যে বাবু তোকেই ডেকেছে।

মালতী এ ডাকটার অর্থ জানিত। তাহার যৌবন কালটিতেও ঐ রকম দিন কতক ডাক পড়িয়াছিল, তাহার পর এ ভাঙ্গাহাটে সেই সুখের রাত্রির স্মৃতিটা মাত্র তাহার মনে গাঁথা আছে।

জগৎ ইতস্ততঃ করিতেছিল। মালতীই একরকম জোর করিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া আসিল।

জগৎ করুণ নেত্রে মালতীকে বলিল—"এমন ধারা করে আমার সর্ব্বনাশটা করিসনে খুড়ি!"

মালতী বলিল, "সর্ব্বনাশ কি পৌষ মাস তা তখন বুঝবি।" অত্যন্ত চুপি চুপি বলিল, "নে না এখনও দিনকাল রয়েছে, দিন থাকতে কিছু বাগিয়ে রাখতে পারলে ত তোরই আখেরে ভাল। একটা টানা নথ চাইবি, তুই না পারিস আমি চেয়ে নেব। দেখিস্ তখন নথ নেড়ে আমার সঙ্গে কথাই কইবি না।"

জগৎ উত্তর দিবে কি মালতীর পানে চাহিয়া রহিল। সে কাপড়খানা একটু ময়লা পড়িত, মাথার চুলটাও ভাল করিয়া বাঁধিত। তাহার মনে হইতে লাগিল এগুলা করিয়া কি অন্যায়ই করিয়াছি। যাহারা তাহার স্বামিটীকে জেলে ঠেলিয়া দিয়া আসিয়াছে তাহাদেরই মন জোগাইতে তাহার সর্ব্বস্ব

খোয়াইয়া আসিতে হইবে। চোখে জল আসিতে লাগিল।

মালতী তাহাকে বাবুদের বাহিরের একটা ঘরে পুরিয়া রাখিয়া আসিল। তখন সবে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল।

জগৎ বার বার করিয়া অন্তর্যামীর পানে হাত জোড় করিয়া বলিতে লাগিল, ভগবান তুমিই সাক্ষী। আমার কোন উপায় নাই। কোন অপরাধ নাই।

মদে টলিতে টলিতে ও আর এক যোতল মদ লইয়া সতীশ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দিবা দ্বিপ্রহরেই সে পঞ্চমকার লইয়া তাণ্ডবে মাতিত, গাঁয়ের লোক তাহা জানিত এবং তাহাদের চক্ষে এ বিষয়টার মোটেই নূতনত্ব ছিল না। সমাজও কখন তার জন্য ভ্রূকুটী করিয়া যায় নাই। সমাজ ভ্রূকুটি করিবে কাহাকে? যে দুর্ব্বল যাহার পেছনে কেহ নাই তাহারই টুঁটি চাপিয়া ধরিবে। আর আজকের দিনে সমাজের শাসন-দণ্ড যে ইহাদের হাতে চলিতেছে, কাজেই জাতি বিচার ধর্ম্ম-বিগর্হিত কাজ এ কথা বলিবার কাহার ও সাহস নাই।

সতীশ আসিয়া এক গ্লাস ঢালিয়া জগতের সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "খাও।"

জগৎ এক হাতে গ্লাসটা ধরিয়া, এক হাতে সতীশের পা ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিল, "আজকের মত আমায় মাপ করুন। তারপর—

সতীশ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল "মাপ টাপ আমার কাছে কিছু নাই। বল, এখানে না গোবার বাড়ীর ভেতরেই নিয়ে যাচ্ছি।"

জগৎ তেমনি বুকভাঙা মিনতির কণ্ঠে বলিল, "আমার ছেলের যে অসুখ।"

সতীশ বলিল, "তা হোক অসুখ, ছেলের অসুখ তা তুই গিয়ে কি করবি, টাকা নিয়ে যাবি ডাক্তার ডাকিয়ে চিকিৎসা করাবি" বলিয়া কোমরের ট্যাঁকে যে কয়টা টাকা ছিল, না গনিয়াই জগতের আচলের উপরে ফেলিয়া দিল।

সে গুলা ঝম্ ঝম্ শব্দ করিয়া কতক মেঝের উপর পড়িল। কম প্রলোভন নহে, তাহার বুকের ভিতর যে একটা অনাবিল প্রেমজ্যোতিঃ একনিষ্ঠ পতি-নিষ্ঠতার গৌরবে জ্বলিতেছিল, এই রৌপ্যচক্রের চক্রতলে একবারে পিষ্ট হইয়া ভাঙিয়া গেল।

জগৎ হাঁপাইয়া বলিল, "আমায় একটু জল দাও বাবু বড় তেষ্টা পেয়েছে।"

"জল খাবি. আচ্ছা হাঁ কর্। এতেও পিপাসা যাবে" বলিয়া সতীশ হস্ হস্ করিয়া খানিকটা মদ জগতের মুখে ঢালিয়া দিল।

জগৎ মুখটা বিকৃত করিয়া মদটা গিলিয়া ফেলিয়া বলিল, "বাপু মদ দিলে?" সতীশ বলিল, "হাঁ এতেও তেষ্টা যায়।"

জগৎ মুখটা ঝিমাইয়া বসিয়া রহিল। সতীশ ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত আঁচলের টাকা কয়টা কুড়াইয়া দিয়া পুনরায় তাহার খুঁটেই বাঁধিয়া দিল।

তৎক্ষণ জগৎ নেশায় অভিভূত হইয়া আসিতেছিল। তাহার দিগ্বিদিকের চেতনা লুপ্ত হইয়া পড়িতেছিল, সে কখন তাহার নিজের অজ্ঞাতে নিজের সমস্ত জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিয়া সতীশের দুটি পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সে নিজেই জানিতে পারে নাই। অনেক রাত্রিতে সতীশ যখন তাহাকে ধরিয়া ধরিয়া তাহার বাড়ীতে দিয়া গেল, তখন সে ছেলেটিকে বুকে করিয়া আবার কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু কাঁদিলেই কি সকল দুঃখের অবসান হয়? সে যে আজ আত্মঘাতী, প্রলোভনের কাছে নিজেকে বিক্রয় করিয়াছে। সে ভাবিতে লাগিল এই ছেলেটিকে মানুষ করিতে না জানি জগতের আর ও কত পাপভার মাথায় করিয়া তুলিয়া লইতে হইবে।

(৮)

এবারেও গোবিন্দর কয়েদ হইল। দীর্ঘ দুটি বৎসর কাল তাহাকে কয়েদে থাকিতে হইবে। দুই বৎসর কয়েদ খাটিয়া মানুষের ঘরে ফিরিয়া আসা

একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়। অনেকেই ঐরূপ বলাবলি করিতে লাগিল, জগত ও শুনিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, তারপর আপনার কাজে গেল। বাবুদের বাড়ী সেই এখন বড়ন্তির পোষ্ট পাইয়াছে। সে বাবুদের ছেলে মানুষ করে, তেল কাজল পরায়, আবার গলা মর্দ্দও করে।

সতীশ বাবুর দৃষ্টি তাহার উপর তেমনি তীক্ষ্ণ রহিয়াছে। আগে যে দৃষ্টির পানে চাহিয়া তাহার মনে হইত আগুন ঠিকরিয়া বাহির হইতেছে, এখন তাহাতে জ্যোৎস্নালোকের স্নিগ্ধতা দেখিতে লাগিল; তাহার ছেলেটীও বেশ গোলগাল হইয়া ছুটাছুট করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কল্পনায় যে একটা পরিপূর্ণতার আভাষ অনুভব করিয়াছিল আজ জীবনের এই প্রাচুর্য্যতার দিনে তাহা রোমে রোমে উপভোগ করিয়া লইতে লাগিল।

পাড়া প্রতিবেশীরাও এখন জগতের সুখ দেখিয়া হিংসা করে। কি ছিল তাহার—একখানা ঘর ও ছিল না, এখন সে ঘর করিয়াছে, দুয়ার করিয়াছে, আবার দুখানা বাসন কোশন, দুটো বিছানাপত্র মাদুর তাহাও করিয়া হইয়াছে। এখন ঝুটরীপাড়ায় কাহারও বাড়ী কুটুম আসিলে জগতের বাড়ী তাহাদিগকে বিছানা, বার করিয়া চাহিয়া লইয়া যাইতে হয়। সতীশ বাবুর বৈসে আছে বলিয়া কাহারও কিছু বলিবার ও এক্তিয়ার নাই। এখন পাড়ার মধ্যে জগৎ একটা গণ্যমান্য মানুষ।

জগৎও আস্তে আস্তে ভুলিয়াছিল। তাহার চোখের উপর হইতে সমস্ত অতীত দিনের দুঃখ-স্মৃতি একটা দুঃস্বপ্নের মত হৃদয়ের এক কোণায় গিয়া ঠেকিয়াছিল।

তাই যখন সে হাসিতে হাসিতে সতীশ বাবুর সহিত কথা কহিতে বসিত তখন একটুও চিন্তা বা দুঃখ তাহার হৃদয়ে স্থান পাইত না।

জ্যোৎস্না রাত্রি পাড়া প্রায় নিষুতি। জগতের অনেক দিনকার সাধ তাহার নিটোল রাত্র দুটিতে একজোড়া অনন্ত গড়াইয়া লয়। অনেক ঝিএর ত ইহা আছে, টানা নত না হয় সে পাইয়াছে, কিন্তু ঐ দুর্লভ বস্তুটি তাহাকে লইতে হইবে। তাই সতীশ বাবুর হুকাটাতে আগুন দিয়া কাছটিতে বসিয়া সোহাগ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ গা বাবু অনেক কাল হ'তে আমার একটা সাধ আছে কিন্তু—"

সতীশ বলিল "কি সাধ রে--"

জগৎ বলিল, "আগে যদি তুমি যাও তা হলেই বলি। তোমাকেও অবশিষ্ট সব টাকা দিতে হবে না। কর্ত্তা বাবুর কাছে আমারও দশ গণ্ডা টাকা জমা আছে, আর তুমি দশ গণ্ডা যদি যাও তা হলে হয়।"

সতীশ সাধের বস্তুটির কথা জানিত কারণ এমন অনেক দিনই সে জগতের কাছে শুনিয়াছিল তাই বলিল, "আচ্ছা তুই কোথায় জিনিস আছে খবর নিস্ তারপর দেখা যাবে। নতুন গড়ানো ত সোজা কথা নয়—তারপর হাসিয়া বলিল, "তোর দেখচি দুদিন বাহার মেরে না দাঁড়ালে চলবে না কেমন?"

জগৎ মুখ টিপিয়া বলিল, "বাহার দিতে কার ইচ্ছা যায় না বলো—তুমি যে পাঁচ ছেলের বাপ, তবু তুমি চলে কলপ দাও, একটা বাউরীর মেয়েকে পোষ—কেন?"

"তুই যেমচি কথায় কথায় বড় জবাব করিস্ বলিয়া" কতকটা রাগিয়াই সতীশ উঠিয়া পড়িতে চাহিল, জগৎ হাতটা ধরিয়া বসাইয়া দিয়া বলিল, "নাও ঠাকুর চটে উঠো না। কিন্তু মাইরি বলচি, আমার বড্ড সাধ।" বলিয়া দুই হাতে তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিল।

সতীশ বলিল, "আচ্ছা পেলেই ত হচ্চে।" "না তুমি সত্যি করে বলো দেবে কি না, তোমার কথায় ত বিশ্বাস নেই, ছ মাস পরে নথ দিয়েছিলে,—"

সতীশ উঠি উঠি করিতেছিল, গহনা পাইবার প্রলোভনে জগৎমোহিনীর আজ সতীশকে ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। সে এখন বেশ মনে

মনে ঠিক দিতে শিখিয়াছিল—পুরুষমানুষকে হাব, ভাব-ভঙ্গিমায়, চোখের কটাক্ষে একবারে চরম মোহের আবর্ত্তের মধ্যে না টানিয়া আনিতে পারিলে কিছু পাইবার উপায় নাই। তাই তাহার ঠাট বাট সব বদলাইয়া গিয়াছিল। এখন সতীশও মনে ভাবে তাহাকে ছাড়া জগৎ দুনিয়ার আর কাহাকেও জানে না। অনেক রাত্রি হইয়া গেল দেখিয়া সতীশ বিদায় লইয়া আবার উঠিতে চাহিল, জগৎ তথাপি উঠিতে দিতে চাহিল না। ইহাতে সতীশ যে একটু বিরক্তও না হইতেছিল এমন নয় কিন্তু সোহাগের আবার তাহাকেও সহিতে হইল। বাউরীর মেয়ে হইলে কি হয়—তাহাকে সেও ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে।

সহসা বাহিরে কে ডাকিল—জগৎ। এতরাত্রে সহসা কে ডাকে। গলার আওয়াজটা যে অনেক দিনকার পরিচিত কণ্ঠস্বর।

সতীশও ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিয়াছিল। মুখটা বেজায় করিয়া অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ঐ হ'লো ত, কে দত্তি দানা তাখ, ঐ জন্ত আমি বেশীক্ষণ থাকতে চাইনে।" ভিতরকার দুর্ব্বলতাটা সাহসে ভরাইয়া তুলিতে লাগিল।

জগৎ চিত্রার্পিতের মত দুয়ারের কাছটায় দাঁড়াইয়া বলিল—"আহা, তুমি বেরিয়ে যাও।" কিন্তু জগৎ তাহার ঘরের দুয়ার খুলিতেই সতীশ সম্মুখের যমদূত সদৃশ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া, "ইস্" বলিয়া অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল।

জগৎ কিন্তু তাহাকে চিনিয়াছিল, সেইজন্ত তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হয় নাই। সে শুধু ভাবিতেছিল—এমন সময় গোবিন্দ আসিল—তাহার আর কিছু লুকাইবার রহিল না।

সতীশ তাহাদের দুইজনের চুপচাপ দেখিয়া কথঞ্চিত সাহস পাইয়া বলিল—"কে রে সেই গোপনে ডাকাতটা নাকি? ও সীতেনাথ ও গোষ্ঠ"—উচ্চকণ্ঠে চীৎকার জুড়িয়া দিল।

জগৎ তাহার দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিল "চেঁচাও কেন বাবু, তোমাকেই বলছি, তুমি বেরিয়ে যাও! গোবিন্দ তুমি এসো।"

একটা ছেঁড়া চট ছিল, সেইটা দাওয়ার উপর পাতিয়া দিল।

গোবিন্দরও ভিতরে ভিতরে একটা দুর্দ্দিবার আলা ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। সতীশের দিকে যতই চাহিতেছিল ততই মেজবাবুর ছেলে মনে হইয়া তাহার সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান একটা ঘুঁসির মধ্যে আসিয়া জমাইত হইতেছিল। নহিলে সে সারা রাস্তাই একটা ভাল মতলব লইয়া আসিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, আর কোন প্রকার আবর্জ্জনার মধ্যে নয়, এইবার বিবাহাদি করিয়া চুপচাপ সংসারী হইয়া বসিবে। কিন্তু সতীশ যখন ক্রমেই বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিতে লাগিল—তখন গোবিন্দ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল, "কেন বাবু বাড়াবাড়ি কচ্ছো—আমি এখন চোর নই ডাকাতও নই।"

"ডাকাত নস্ তুই? ওরে ও সীতেনাথ ওকে এখুনি বের করে দে,—তোর এ গাঁয়ে ত যায়গা হবে না মকিন্দ, ওঠ্ ওঠ্ শীগগীর ওঠ।"

জগৎ মিনতি করিয়া বলিল "সারাদিন খাওয়া হয়নি বাবু ওর, দুটো থাক্, কেন তুমি গোল-মাল কচ্ছো? দেখনা মুখখানা শুকিয়ে গেছে।"

স্নেহের একটু অমৃত স্পর্শে গোবিন্দ একেবারে উন্মাদের মত হইয়া উঠিল। ডাগর চোখ দুটোকে বাঁকাইয়া একটা হুঙ্কার দিল, তারপর বলিল—"সর সর জগৎ। ওরই বা এত রাত্রে এখানে এসে চোর ডাকাত বলবার কি এক্তিয়ার আছে জান্তে চাই।"

হাত দুটো ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া দিবার জোগাড় করিতেছে সতীশ এমন অস্বাভাবিক ভাবে "মেরে ফেল্লে গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল যে, সে সঙ্গে পাড়াপ্রতিবেশীরা ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

গোবিন্দ তখন হতবুদ্ধি হইয়া ঘরের দাওয়াটার

উপরে বসিয়া পড়িয়াছিল এবং জগৎবল্লভীর ৪টী চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিতেছিল।

রসরাজ খাঁ চৌকীদার আসিতেই সতীশ তাহাকে হুকুম দিল, "খাঁ ঐ ব্যাটাকে আমি, একে একবার শেষ দেখতে চাই! আমায় আবার খুন করতে এলো গা—আমি এসেছিলাম কি না জগৎকে একটা কথা বলতে তা ব্যাটার কি একেবারে আমার হাত ধরে ফেলো! চল্ নিয়ে থানা—"

উপস্থিত সকলেই সতীশবাবু জগতকে কথা বলিতে আসার কথাটা জানিত এবং প্রতিদিনই যে তাহাকে একবার করিয়া কথা বলিতে আসিতে হয়, তাহাও গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানিত। তাই এ বিষয়ে তাহাদের বাদানুবাদ করিবার মোটেই আবশ্যক ছিল না—কিন্তু গোবিন্দের কেন হইতে আসিয়া মতিচ্ছন্নটা যে কেন এমন হইয়া উঠিল, তাহা কেহই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না; সকলেই একবাক্যে গোবিন্দর নিন্দা করিতে লাগিল।

রসরাজ খাঁ আসিয়া হুকুম করিয়া বলিল, "চল ভাই, আবার যেতে হচ্ছে বলে কি করবে দাদা। তোমারও বরাত মন্দ নইলে এসেই একবারে সতীশ বাবুর হাতে ধরা।—"

গোবিন্দ দাঁত খিচাইয়া রসরাজকে বলিল, "তোকে আর মোড়লী করতে হবে না রসরাজ। তুই শুধু নিয়ে চল। ছেলেবেলা একসঙ্গে তোতে আমাতে সক চরাতাম না? যাক তোর কাজ তুই কর।

জগৎ আছাড় খাইয়া সতীশবাবুর উপর হুমড়ী খাইয়া পড়িল। দুটো পা দৃঢ় করিয়া ধরিয়া বলিল, "এ যাত্রা মাপ করতে হবে সতীশবাবু। ওর বাস্তবিক কোন দোষ নেই।"

জগতের এই আস্পর্দা দেখিয়া সকলে অত্যন্ত অবাক হইয়া গেল।

সতীশ বলিল—"না মোটেই ওকে রেহাই দেওয়া হবে না। লম্পটের জায়গা বরং হবে, তবু চোর ডাকাতের জায়গা এ গাঁয়ে হবে না, তা আমি বলে রাখছি। ওরে রসরাজ, আমার সঙ্গে আয় থানায় এতলা পাঠাতেই হবে।

গোবিন্দ হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—"তাই যারে রসরাজ। আমি কি আর জেলখানাকে ভয় করি মনে করিস? তাই যাওগে বাবু তাই যাও। তোমরা ত লিখবে একটা মিথ্যা জাল জুয়াচুরি বলতে কয়েদ খালাস হয়েই গোবিন্দ আবার চুরি করতে এসেছিল সাক্ষীও পাবে। তা তোমাদের ধর্মই যে আজকাল ঐ পিদে মারা আর কেড়ে নেওয়া..... মারো! খুব মারো! ওপরে কি ঈশ্বর নাই!"

"ব্যাটা, আমার ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির" বলিয়া সতীশ পরোয়ানা লিখিতে রসরাজকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

সকলে হায়—হায় করিয়া গোবিন্দকে বলিল, "হাঁ গোবিন্দ, এমন কাজ তুই কেন করলি?"

গোবিন্দ বলিল, "কি কাজ?"

অনেকজন। "তুই নাকি বাবুর হাত ধরেছিলি!"

গোবিন্দ—"হাঁ ধরেছিলাম তা এতরাত্রে আমার মেয়ে মানুষের ঘরে বাবু কি জন্য আসে? ধরবো না আমি যে ওর টুঁটি ছিঁড়ে নিইনি এই ভাগ্যি, আর ছিঁড়লেই বা কে কি করতো?"

মালতী। তোমার ত বিয়োলো বউ নয়, জগৎ এত সবাই জানে!—

গোবিন্দ মালতীকে একটা ধমক দিয়া বলিল, "তা জানুক গে, তোকে তার জন্য সাক্ষী মানতে ডাকা হয় নি," তারপর জগতের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "ঘরে তোর ভাত আছে জগৎ দুটো যে খেয়ে, বড্ড খিদে পেয়েছে।"

জগৎ অশ্রু মুছিতে মুছিতে ভাত বাড়িয়া আনিল। গোবিন্দ কোনদিকে দৃকপাত না করিয়া গপাগপ ভাত তুলিতে লাগিল। খানিক পরে আত্মা-পুরুষ একটু ঠাণ্ডা হইলে, মকিন্দর বউ মালতীকে

বলিল, "জানিস খুড়ি, দু বছরের পর আজ দুটো ভাল-ভাত খাচ্ছি!"

জগৎ মালতীকেও একবার ধরিয়া পাড়িয়া বলিল, "তুই যা খুড়ি, সতীশবাবুকে একটু বুঝিয়ে শুঝিয়ে বলে আয়, বাবু তোর কথা রাখবে। মোহাই আর থানার খবর যেন না দেয়।"

মালতী বাহির হইয়া গেল কিন্তু খানিকবাদে আসিয়া খবর দিল, রসরাজ এবেলা লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে।

ভোররাত্রে জগৎ গোবিন্দকে ঠেলিয়া তুলিয়া বলিল,—"ওগো শুনচো পালাও।"

গোবিন্দ ঘুমে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। পাঁচ সাতবার ডাকিয়াও তাহাকে চেতন করাইতে পারিল না।

কিন্তু মনে মনে জগৎ শঙ্কিত হইয়া পড়িতেছিল, যদি আবার পুলীশের লোক আসিয়া পড়ে। দেখা গেল অনেকখানি বেলা পর্য্যন্ত কোন প্রকার উকোচাকা নাই। অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া জগৎ সংসারের কাজ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সময় করিয়া একবার মেজবাবুর সহিত ও দেখা করিয়া আসিয়াছিল। মেজবাবুও তাহাকে ভরসা দিয়াছে তিনি কিছু করিবেন না। গোবিন্দর কিন্তু কোন দিকে দৃকপাতও নাই, সে একবারে নিশ্চিন্তে ও নির্ভয়ে পাড়ার ছেলেদেরও বুড়োদের সঙ্গে হাসি-গল্পে মাতিয়া আছে। জগতের ছেলেটীকে সকাল হইতে একদণ্ড বুক হইতে নামায় নাই। জগতের চক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা এই দৃশ্যটাই বেশী মনহরণ করিতে লাগিল। কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে তাহার সব স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। দলবলসহ পুলিশ আসিয়া গোবিন্দকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিল। তাহার অপরাধ যে রাত্রে সে আসিয়াছিল, সেই রাত্রেই মেজবাবুর বাড়ীতে চুরি করিতে উঠিয়াছিল; এবং এক বস্তা ধান আনিয়া উঠানে নামাইয়াছিল। সাক্ষী আছে—রসরাজ খাঁ এবং স্বয়ং সতীশবাবু।

গোবিন্দ খানিকটা হো হো করিয়া উন্মাদ অট্টহাস্য করিয়া লইল, তারপর জগৎমোহিনীকে ডাকিয়া বলিল, "ও জগদী, শুন্‌লি, আমি বলিনি তারা এই করবে। ওদের হাতে কলম আছে, টাকা আছে, আমাদের হাতে কিছুই নেই। চলো কনেষ্টবল বাবারা, তোমাদের ঘরই আমার ঘর। ঘরে ত এখন হাওয়া খেতে আসি।"

রসরাজ শুদ্ধ গোবিন্দর সম্মুখে হাজির করা হইল। গোবিন্দ জগৎকে বলিল, "নিয়ে আসতে পারলে তোর একমাসের খোরাকী হতো, যা আবার বাবুদের পায়ের কাছে, আপনার রূপ কিস্তী করগে কিন্তু এবার যদি ফিরে আসি তবে আমারি একদিন কি ওদেরি একদিন—"

জগতের প্রাণভেদি চীৎকারের মধ্যে গোবিন্দকে থানায় লইয়া যাওয়া হইল। গোবিন্দর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই, সে বরং বেশ সুর করিয়াই গাহিতেছিল—

এ মায়া প্রপঞ্চ মাঝে
রসের নট নটবর হরি যারে যা সাজাও—
সে তাই সাজে—
এ মায়া প্রপঞ্চ মাঝে।

(১০)

আবার যথারীতি বিচারের অভিনয় সুরু হইল। ছোটবাবু এবারও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ সাফ জবাব দিল ছোটবাবুকে—"কোন দরকার নেই ছোটবাবু, যদ্দিন ইচ্ছে হাকিম মেরাদ দিয়ে দিক—এখানে যে বিচার চায় সেই ঠকে। আমার জীবনে তিন তিনবার ঠকাতে, তবে যথেষ্ট জ্ঞান হয়েছে এখন আমি বুঝেছি ধর্ম্মের মূলসূত্র কোন খানটায়।"

অভিনয় শেষে গোবিন্দর এক বৎসরের জন্য কারাবাসের হুকুম হইল।

গোবিন্দ প্রথম কাঠগড়ার ঢোকে তখন দেখিয়াছিল, আদালতের আমতলায় জগৎ দাঁড়াইয়া।

বিচার শেষে যখন লোহার বলয় পরিয়া জেল খানার দুয়ারে যায় তখনও তেমনি সে একান্তে চাহিয়া আছে। চারিদিকের কতলোক আনাগোনা করিতেছে, কোনদিকে জগতের ভ্রূক্ষেপ ও নাই।

আসন্ন একটা বেদের ছায়া জগতের উপরে প্রলয় কল্লোল তুলিয়া ছুটিয়া আসিতেছে, তবু জগৎ এক দৃষ্টে চাহিয়াই রহিল।

গোবিন্দ একবার ডাকিল, "জগৎ! ও জগৎ!" জগৎ উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া গোবিন্দর কাছে আসিতে চাহিল, রক্ষীরা বাধা দিল। জগৎ প্রতিহত হইয়া সেই খানটায় পড়িয়া গেল। আবার উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া আসিল, তখন গোবিন্দকে জন্তুর মত কয়েদ-খানার মধ্যে পুরিয়া ফেলা হইয়াছে।

জগৎ বার কয়েক হতাশ হইয়া জেলখানার দুয়ারে মাথা কুটিল, রক্ষী চাবুক উঠাইয়া তাড়াইয়া দিল। আরও কয়েকবার কারা প্রাচীরের চারিধার ঘুরিয়া বেড়াইল তারপর ঘন অন্ধকারের মধ্যে তাহাকে আর দেখা গেল না।

পরদিন সহরবাসীরা শুনিল রাত্রের ঝড়ে একটা স্ত্রীলোক কাঁদারের জলে পড়িয়া মরিয়াছে। জেলে গোবিন্দর কাছে ও কথাটা রক্ষীরা তুলিল। গোবিন্দর কিন্তু তখন কোন দিকে কাণ দিবার সময় ছিল না। লোহার মুগুর দিয়া দমাদম করিয়া পাথর ভাঙ্গিতেছিল।

সমাপ্ত।

ভিখারিণী

[চিত্র]

(শ্রীঅজয়কুমার সেন)

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়া ভোরের দিকে সবেমাত্র একটু তন্দ্রার আবেশ আসিয়াছে, এমন সময় কিছুদূর হইতে একটা মিঠে সুরের ঢেউ কাণে আসিয়া আমাকে সজাগ করিয়া তুলিল। অনুভবে বুঝিলাম কোন এক অভাগিনী নারীর করুণ কণ্ঠধ্বনি।

শয্যাত্যাগ করিয়া যেদিক হইতে সুর-লহর আসিতেছিল, সেই দিকে চলিলাম। সেই সুমিষ্ট স্বর ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল,—তার পর আরও কাছে আসিল।

গাইতে গাইতে পথ চলিতেছিল একটী রমণী। তাহার হাত ধরিয়া একটী আট বছরের বালক। আমাকে দেখিয়া বালকটি অভিবাদন করিল; হাতছাড়া হইবামাত্র রমণীও মাথা নত করিয়া আমাকে নমস্কার জানাইল।

ভিখারিণীর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম, প্রকৃতি-দেবী তাহাকে সৌন্দর্য্য-শ্রীমণ্ডিত করিতে কৃপণতা করেন নাই। তাহার পরিধানে শত-গ্রন্থি-যুক্ত মলিন বসন সত্ত্বেও তাহাকে সুন্দরী বলিয়া ধারণা হইল। তার পর প্রভাত-অরুণের প্রথমচ্ছটায় যখন স্পষ্ট করিয়া তাহাকে দেখিলাম, তখন বসন্তের শুটিকার চিহ্ন তাহার রূপ-লাবণ্যকে যে হতশ্রী করিয়া দিয়াছে, তাহা বেশ বুঝিলাম।

মধুর-কণ্ঠে বালক একটি গান করিল। গান যখন পর্দ্দায়-পর্দ্দায় উঠিতে লাগিল, তখন তাহার সুমিষ্ট স্বর শুনিয়া আমার অজ্ঞাতে শ্রোতায় ভরিয়া গেল

যে যেখানে পারিল, সে সেইখানে দাঁড়াইয়া মন্ত্র-মুগ্ধের মত সে গান শুনিতে লাগিল।

বালকের গান থামিলে ভিখারিণী তাহার একতারার ঝঙ্কার দিল। পরিচিত হস্তের কোমল স্পর্শে যন্ত্র রিণি-রিণি করিয়া বাজিয়া উঠিয়া পুঞ্জীভূত বিষাদের সুরে গগন পবন মুখর করিয়া তুলিল। সমাগত লোকমণ্ডলী সমবেদনায় চোখের জল ফেলিতে লাগিল; আর স্তম্ভিত হইল ভিখারিণীর অসামান্য নিপুণতা দেখিয়া। তার পর যন্ত্র-সাহায্যে ভিখারিণী গান ধরিল। করুণ-কণ্ঠ-ধ্বনি যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আকাশে বাতাসে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং সুরের মোহন আবেশে বাতাস যেন মন্থর হইয়া পড়িল।

গান থামিল, কিন্তু সুরের লীলায়িত মধুর নিক্কণ সকলের কর্ণবিবরে তখনও ধ্বনিত হইতে লাগিল।

বিস্ময়-বিমুগ্ধ জনতা একবাক্যে তাহাকে ধন্য-বাদ করিল।

গান শুনিতে শুনিতে আমি আপন-হারা হইয়া গিয়াছিলাম। জনমণ্ডলীর সমবেত প্রশংসা-ধ্বনি থামিয়া গেলে আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম। তখন চাহিয়া দেখিলাম গায়িকার কৃষ্ণ-তারকা দু'টি নিষ্ফল,—বুঝিলাম ভিখারিণী অন্ধ।

বাটীর ভিতর হইতে অনুরোধ আসিল, তাহাদিগকে বাটীর মধ্যে লইয়া যাইতে। আমিও তাহাদিগকে ভিতরে যাইতে বলিলাম। ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র গৃহিণী ভিখারিণীর হাত ধরিয়া তাহার জীবনের ঘটনা জানিবার জন্য আগ্রহান্বিতা হইলেন। সে তাঁহাকে সংক্ষেপে যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই—

পূর্ব্বে তাহাদের অবস্থা ভালই ছিল। তাহার স্বামী গান গাহিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতেই তাহাদিগের সংসার একরূপ চলিয়া যাইত। কন্যার অন্নপ্রাশনের পরপ্রাশনে বসিয়া ভিখারিণী সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল। তাহাদের গৃহখানি আনন্দের কোলাহলে মুখর ছিল।

হঠাৎ কোথা হইতে একটা ব্যাধি আসিয়া তাহার সুখের বাসা ভাঙ্গিয়া দিল। তাহার স্বামী একেবারে শয্যাশায়ী হইলেন। ক্রমে এমন অবস্থা হইল যে, অপরের সাহায্য ব্যতীত তিনি ঘরের বাহিরে যাইতে পারিতেন না।

স্বামীর সেবা করিতে করিতে তাহারও শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার পর একদিন তাহার সর্ব্বাঙ্গে বসন্তের গুটি দেখা দিল। তাহার জীবনের আশা ছিল না বলিলেই হয়। বহু চেষ্টায় তাহার জীবন রক্ষা পাইল; কিন্তু এই জীবনের বিনিময়ে তাহাকে দিতে হইল—চক্ষুরত্ন; ভিখারিণী জগতের আলো আর দেখিতে পাইল না। অভাগিনী তখন স্বামীর পদপ্রান্তে আছড়াইয়া পড়িল। স্বামী তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, তোমার জীবন অন্ধকারময় হইল, ইহাতে ক্ষোভ করিও না। মনে রাখিও, ভগবান দয়াময়। তাঁহার দয়ায় অবিশ্বাসী হইও না—শান্তি পাইবে। ভয় কি?"

সেইদিন হইতে ভিখারিণী যদিও বিশ্বের সৌন্দর্য্য আর দেখিতে পাইল না; কিন্তু স্বামীর উপদেশ সর্ব্বদা তাহার হৃদয়ে ধ্বনিত হইত। কষ্টে যন্ত্রণায় কাতর হইয়া সে করযোড়ে বলিত "যন্ত্রণা বড়ই পাইতেছি; তবুও হে প্রভু, তুমি দয়াময়!"

সঙ্গের ছেলেটি তাহার একমাত্র সন্তান—অন্ধের যষ্টি। ইহাকে সঙ্গে লইয়া সে স্বামী ও পুত্রের জীবন-রক্ষার জন্য পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়।

গৃহিণী ভিখারিণীর কথা শুনিয়া সজলনয়নে অতিরিক্ত পয়সা দিয়া বলিলেন, "যখন সুবিধা হইবে, মাঝে মাঝে আসিও।"

ছেলেটি আমার পায়ের উপর মাথা নত করিয়া কহিল, "বাবুজী, আমার বাবা যে কাল থেকে কিছু খায়নি—আমরা এখন যাই। বাবা আমাদের পথ

চেয়ে বসে আছেন। তাঁর বড় কষ্ট। তিনি নড়তে পারেন না—আর আমার মাও চোখে দেখেন না। আমরা এখন আসি।" এই বলিয়া ছেলেটি তাহার অন্ধ মাতার হাত ধরিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল।

তাহার পরে কত দিন চলিয়া গেল—তাহাদের আর দেখা নাই! এই সহরে কোথায় তাহাদের খোঁজ করিব। কিন্তু, এখনও সময়ে সময়ে তাহাদের সেই বেদনা-কাতর মুখ মনে পড়িয়া দুঃখের অবসর হয়।

ক্ষণিকে

(গল্প)

[শ্রীমতী নির্ম্মলা মিত্র]

(১)

এলাহাবাদ ষ্টেশনে মেল-ট্রেণ আসিয়া দাঁড়াতেই অমিতাভ তার ছোট ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। লোকেও ক্লাস কামরার সাম্‌নে আস্‌তেই উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে অপূর্ব্ব-মাধুর্য্য-মণ্ডিত একখানি মুখ তার চোখে পড়ে গেল। তরুণী সোণার চশমার ভিতর থেকে তার মুখের উপর দৃষ্টি ফেলে অতি ব্যগ্রভাবে সুন্দর হাতখানি দিয়ে দেখিয়ে বল্‌ল, "আমার ঐ ফাউণ্টেন পেন্‌টা তুলে দিন না।" অমিতাভ কুঁকে পড়ে পেন্‌টা তুলে নিয়ে দেখ্‌লে—সেটি সোনার। অমিতাভ দরজার হাতল ঘুরিয়ে খুলে উঠে পড়লো। তরুণী উঠে দাঁড়িয়ে পেন্‌টা পাবার উদ্দেশে হাত বাড়িয়ে বল্লে, "ধন্যবাদ, আপনি না তুলে দিলে আমার সাধের পেনটী একেবারে যেত।" অমিতাভ একটু হেসে মুখ তুলে তার দিক চাইতেই, তার চোখ-দুটো নত হ'য়ে গেল। অমিতাভ অপ্রতিভের মত তার হাতে পেনটা দিয়ে, অপর বেঞ্চিতে ব্যাগটা রেখে নেমে পড়লো। তরুণীও নিজের স্থানে বসে হাতের বই মুখের উপর উঁচু করে ধর্‌লে।

মেল ছেড়ে দিতেই অমিতাভ উঠে, ব্যাগ থেকে লক্ষ্ণৌয়ের বাহির করে পেতে বসবার জোগাড় কর্‌তে কর্‌তে দেখ্‌লে, সাম্‌নের বেঞ্চে খানার আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে একটী বৃদ্ধ শুয়ে আছেন, খালি তার মুখের কিয়দংশ অর্থাৎ পাকা দাড়ী দেখা যাচ্ছে, আর তার পায়ের দিকে একটী প্রৌঢ়া মহিলা বসে আছেন।

অমিতাভ খানিকটা উস্‌খুস্ করে একখানা খবরের কাগজ বার করে বসে গেল বটে পড়্‌তে, কিন্তু মন তার বড়ই অস্থির হয়ে উঠ্‌লো—ঐ তরুণীর পরিচয় জান্‌বার বা দুটো কথা বলবার জন্যে। কিন্তু তরুণী ওদিকে বইএ এমনই মনযোগ দিল যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতীত হতে লাগল, তবু সে চোখ তুলে চাইলে না বা তার উপকারী বন্ধুটীকে একটা ধন্যবাদের কথাও বল্লে না।

ক্রমে দুটি যাত্রীর কি গভীর নিদ্রা! অমিতাভ ক্রমশঃ বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ছিল, সেই সময় তরুণী একবার তার হাতের ঘড়ীটার দিকে চাইলেন। অমিতাভ চট্ করে তার হাতের কাগজটা মুখের উপর তুলে ধর্‌লে, যেহেতু তার দিক চাইতেও তার ভয়ানক লজ্জা করছিল। মুখের পরে কাগজ তোলা থাক্‌লেও কাণ তার খুব সতর্ক ছিল। অমিতাভ বেশ বুঝিয়াছিল যে সে উঠে দাঁড়িয়েছে, দু-একবার মৃদু মৃদু জুতার শব্দ হ'লো, এবং শান্ত-কণ্ঠে বল্লে, "দাদাবাবু উঠুন, নামবার সময় হয়েছে।"

অমিতাভের প্রাণের ভিতরটা চন্ চন্ করে উঠ্‌লো; এত শীগ্‌গির কোথায় নাম্‌বে এরা? আমি ভাব্‌ছিলুম এরা কল্‌কাতার যাত্রী, আমার

নদী। সে কাগজখানা চোখ থেকে সরিয়ে দিয়ে দেখ্‌লে, যে পেছন ফিরে একখানা শাল মুড়ি দিচ্ছে, সে রোগা ছিপ্‌ছিপে, বয়স আন্দাজ ১৬।১৭ হ'বে। অমিতাভ আবার কাগজ খানা মুখের পরে নামিয়ে নিলে। তরুণী চুপ করে বসে পড়ে বল্লে, "এ কি কুম্ভকর্ণের ঘুম বাবা, আমি শিশিরদার সঙ্গে নেবে যাব, থাক পড়ে মাসি মা।"

অমিতাভ এবার আর থাক্‌তে না পেরে বল্লে, "কোথায় নামবেন আপনারা?" "মোগল সরাই" বলেই তরুণী মুখটা ফিরিয়ে দিয়ে জান্‌লার বাইরে চেয়ে রইলো। লজ্জা কি বিরক্তি তার মুখে প্রকাশ পেলে, সেটা ঠিক মত বুঝ্‌তে না পেরে অমিতাভ নীরব হ'য়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই 'মোগল সরাই' ষ্টেশনে ট্রেণ থাম্‌তেই, "দাদাবাবু, দাদাবাবু" শব্দে একটী গৌরবর্ণ যুবক দোর খুলে প্রবেশ কর্‌লে এবং কুলি, কুলি এই গাড়ীতে ইত্যাদি, এবং জিনিষপত্র নামাবার হড়মুড় শব্দে, অমিতাভ কাগজ খানা রেখে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌লে, যাদের জিম্মা কুম্ভকর্ণের মত তাঁরা আগে নেমে দাঁড়িয়েছেন আর তরুণী কুলিকে "এইটে, ঐটে," ভিতরে দাঁড়িয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন। অমিতাভ জানলার বাইরে চেয়ে চুপ করে বসে ছিল, হঠাৎ কাণে এলো, "নমস্কার"।

অমিতাভ প্রাত-নমস্কারের জন্য মুখ তুল্‌তেই দেখ্‌লে —চস্‌মাহীন দুটিকালো চোখের গভীর দৃষ্টি ফেলে দিয়ে তরুণী নেমে পড়লো। না নিল সে প্রতি-নমস্কার, আর না বল্লে কোন কথা। অমিতাভ বিস্ময়ে বিমূঢ়ের মত অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো - ট্রেনের দরজার দিকে। রেলের একটা বাঁকুনিতে যখন তার চৈতন্য ফিরে এলো, তখন দেখে মেল ট্রেন ষ্টেশন ছেড়ে হু, হু,পক্ষে ছুটে চলেছে আঁধার চিরে গন্তব্য পথে। সতরঞ্চির উপর শুয়ে পড়ে অমিতাভ অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ কর্‌লে, "দৃষ্টিতে যা দিয়ে গেল তা কি শুধুই কৃতজ্ঞতা—না আরো গভীর কিছু?"

সেই ঘটনার পর সুদীর্ঘ দুই বৎসর অতীত হ'য়েছে, অমিতাভ এখন এম্‌, এ পড়ছে। ছোট বোন নীহারিকা তার বিয়ে; বাড়ী আত্মীয়-কুটুম্বে ভরে গিয়াছে। অমিতাভ বিয়ে করেনি বলেই মাতৃহারা দিদির ভাই বড় দুঃখ। দিদির অনেক বলা কওয়া ও কান্নাকাটি সব-ই ব্যর্থ হয়েছে।

আজ সকালে অমিতাভ ভাত খেতে বসেছে সামনে দিদি বসে আছেন। বিয়েরই কথা হচ্ছিল। এমন সময় কি এসে খবর দিলে "নূতন কারা এসেছেন, দিদিমণি উঠে আসুন।"

দিদি উঠে গেলেন, পরক্ষণেই ফিরে এসে বস্‌তেই, অমিতাভ বল্লে, "কারা দিদি?" "ও তুই চিন্‌বি না। অমলা আর তার মা—অমলা, নীহারের সখী, বেথুন কলেজে ওরা এক সঙ্গে পড়তো।

"নীহারের ও নামে যে কোন সখি আছে তা ত শুনিনি। দিদি বিরক্ত হ'য়ে বল্লেন, "অত পরিচয় আমি এখন দিতে পারব না বাপু, তুমি একটু শিগ্‌গীর করে খেয়ে নাও। আমি নইলে খাওয়াই হয় না তোমার,—এদিকে কাজের বাড়ী বসে থাক্‌লে কি চলে। এই যে "আসুন আসুন" দিদির সম্ভ্রমপূর্ণ বাক্যে মুখ তুল্‌তেই অমিতাভ দেখ্‌লে, একটি যুবতী মহিলা। সে মুখ নামাতেই তিনি বল্লেন "এটি তোমার ভাই বুঝি মা?" "হাঁ মা, বাপের এই একমাত্র বংশধর, তা বিয়ে থা কিছু করবে না—তাই বলছিলেম—"

অমিতাভ মধ্য পথে বাধা দিয়ে বল্লে, "ও গল্প করবার আরো ত সময় আছে দিদি—"

অমিতাভের ভারি লজ্জা করছিল, সে তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠে পড়লো। একে ত সে লাজুক তাতে আবার এ রকম প্রসঙ্গ।

দুপুরবেলা অমিতাভ বাহিরের ঘরে বসে বই পড়ছিল। অথচ পড়া বইয়ে আজ তার মন লাগছিলো না। অতীতের একটা মধুর স্মৃতি তার মনটাকে অবসন্ন করে আনছিল। সে একটু শোবার চেষ্টায়

ফিরলে নিজের ঘরে এসে একখানা কৌচে শুয়ে পড়লো। তার পাশের ঘরটি নীহারের, সেখানে বেশ পুরোদমেই তরুণীদের একটা আড্ডা বসেছিল। তাদের মধ্যে একজন বলে, "বল না ভাই, তোর দাদা কেন বিয়ে করতে চান না?"

অমিতাভ বেশ বুঝতে পারলে এ প্রসঙ্গ অনেকক্ষণ থেকে চল্‌ছে এবং এইবার নীহারের বলবার পালা, বলিবার ভঙ্গী যে তার কত, তাও অমিতাভের জানতে বাকি ছিল না, তাই সে আড়ষ্ট হয়ে বিছানায় পড়ে রইলো।

নীহার বলে সে একটা সুন্দর নভেল বলেই হয়; অবশ্য আমি বেশী কিছু শুনতে পাইনি। দিদি দাদার বিয়ের জন্য ওঁর এক বন্ধুকে দিয়ে বলায়, তাইতে দাদা বলেছিলেন কবে দাদা এলাহাবাদ থেকে ফেরবার পথে কোন এক তরুণীর পেন কুড়িয়ে দিয়েছিল, তাতে সে দাদাকে ধন্যবাদ দেয়; তার নম্রতা, তার মাধুর্য্য দাদা ভুলতে পারবে না। এই কথায় তার বন্ধুটি বল্‌লে, "হ্যাঁ ও আবার একটা কথা, কোথাকার কে তার ঠিক নেই, তারজন্যে এখন হ্যাংলা হ'য়ে থেকে লাভ কি? আর সে যদি বিবাহিতাই হয়?"

দাদা বলে "বলেই বা বিবাহিতা, আমি ত ওঁর কাছ থেকে কোন জন্মে কিছু দাবী করতে যাব না। ভোগের জন্যই যে ভালবাসার জন্ম, এটা অনেকে মনে করে বটে, কিন্তু আমি সে স্বীকার করি না। আমি মনে করি ত্যাগই বিশুদ্ধ প্রেম; শুধু তার স্মৃতিটুকু নিয়ে আমি ধন্য হ'তে চাই। যে স্মৃতি আমার বুকে মধ্যে অমর হ'য়ে রয়েছে, তাকে আঘাৎ করে তোমাদের লাভ কি ভাই; বরং তার মধুর স্মৃতিকে সঞ্জিবনী জলে সিক্ত করে সদা। রাখাই প্রেমের অমরত্ব। আর সেই পবিত্র ভালবাসা।"

নীহার নীরব হ'তেই একটা হাসির মৃদু গুঞ্জন উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে ও একটী তরুণী বললেন, "ধন্য সেই অপরিচিতার ভাগ্য।"

অমিতাভ এ ঘরে লজ্জায় মরমে মরে গেল, অত গরমেও পাতলার র‍্যাপার খানা টেনে মুড়ি দিলে। তার কেবলি মনে হ'তে লাগলো, ও ঘরের কৌতূহলী চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি গুলি ভিত্তিভেদ করে তার গায়ে এসে বিঁধছে।

(৩)

সন্ধ্যা হয়েছে প্রায়, অমিতাভ কি একটা কাজের জন্য তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে ফিরে এলো, কিন্তু ভিতর থেকে একটী স্পষ্ট স্বর এলো "আসুন না" ফিরে যাওয়া ঢুকতে গিয়ে দেখলে অপর দোরে খালি তার পরণের শাড়ীর একটু প্রান্ত; গোলাপী আভায় উজ্জ্বল; আর কিছু না, কিন্তু তার গলার স্বরটী অমিতাভের হৃদয় মনের তন্ত্রীতে এমনই ভাবে একটী ছোট ঘা দিল যে, অমিতাভের মাথাটী প্রকৃতিস্থ রইলো না, যত উৎসাহের সঙ্গে সে যে কাজটী করতে যাচ্ছিল, সেটা করবার তার বিন্দুমাত্র উৎসাহ সে পেলে না, অবশ ভাবে সে একখানা ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লো।

ফাল্গুনীর চন্দ্র যখন কলায় ফুটে উঠেছিলেন, বাগানটী রজনীগন্ধার ভরপুর। মর্ম্মর-বেদীর মধ্যখানে তার উপর ফুঁইয়ের ঝোপ এসে পড়ায় ঠিক একটী কুঞ্জের মত দেখাচ্ছিল। বাগানটী অমিতাভের খুব সখের জিনিষ, সে অধিকাংশ সময় এই বাগানে কাটাতো, কিন্তু আজ কাল এত গরমেও এখানে আসা বন্ধ বেচারার বন্ধ হয়েছে। যেহেতু মিসমিটা মহিলার দল তার বাগানে অধিকার করেছেন।

আজ অনেক দিন বাদে সে নিজের বাগানটিতে বেড়াতে এল। বেদীর উপর পাটী পেতে সে চেঁচিয়ে বল্লে, "ওগো কি এক গেলাস জল, আর দুটো পান দিয়ে যাও।" বলে সে পাটীর উপর শুয়ে পড়লো।

খানিক বাদে বুড়ো কি এক গেলাস জল নিয়ে আস্‌তে অমিতাভ হাত বাড়িয়ে বল্লে "কই পান দাও।"

"পান এখন সাজ্‌ছেন, সব সাজা পান খরচ হয়ে গেছে।" অমিতাভ অবাক হ'য়ে বল্লে, "সে কি সকলেই চলে গেছে খিয়েটার দেখতে তবে পান সাজছে কে?

অমলাদিদির মাথা ধরেছে বলে তিনি যান নাই, পান সেজে তিনি নিয়ে আসছেন।

অনেকটা চুপ্‌ ক'রে থেকে অমিতাভ বল্লে "না, না, তাঁর অসুখ করেছে বল সে শুয়ে থাকতে, আমার পান চাই না বুঝলে।" সেজে তিনিই নিয়ে আস্‌বেন বল্লেন আমি যাই শুই গে—হাঁ না কোন উত্তর না দিতে কি অসুখ হয়ে গেল।

অমিতাভ চুপ্‌ করে পাটীতে পড়ে ছিল। এমন সময় চুড়ীর ঝুম ঝুম শব্দ কাণে আস্‌তেই তার হাত পা হিম্‌ হয়ে গেল। একটা আশঙ্কায়, এই নির্জ্জন বাগানে যদি কেউ দেখে ত কি বল্‌বে?

মাথার কাছেই কাপড়ের খস্‌ খস্‌ আর আতরের গন্ধ তার নাকে এসে লাগলো; তারপরেই বেদীর উপর ঠুক করে রেকাবী রাখবার শব্দ হ'লো। অমিতাভ জোর করিয়া চোখ দুটি বন্ধ করে পড়ে রইলো, কি ভাবছিল তখন সেই জানে।

আবার একটু মৃদু শব্দে অমিতাভ চম্‌কে চাইতেই দেখ্‌লে তাম্বুলবাহিকা তখনো দাড়িয়ে। অমিতাভ অপ্রতিভভাবে বল্লে, "মাপ করবেন, আপনি যে এখনো দাড়িয়ে আছেন, তা আমি জান্‌তে পারিনি, আমার আর কিছু দরকার নেই আপনি যেতে পারেন।"

মিনিট দু'তিন বাদে অমিতাভ মাথা ফিরিয়ে দেখলে সে তখনো সেই খানেই দাড়িয়ে আছে, "কি বিপদ! আপনি দেখছি ভারি ছেলেমানুষ।"

এই অবস্থায় কেউ দেখ্‌লে কি বলবে ভাবুন তো?" এই বলে সে উঠে বসলো; রেগে উঠে একটা বলাও তার ভাল হয়নি! কিন্তু ওদিক থেকে খালি একটু মৃদু হাসি ছাড়া আর কোন লক্ষণই প্রকাশ পেলো না।

এইবার বাস্তবিক-ই অমিতাভ রেগে উঠ্‌লো। এ কি ভদ্রতা, এমন বেহায়া যে থাকতে পারে এ ধারণাও তার ছিল না, কিন্তু সংযতস্বরে সে বল্লে, "তবে থাকুন আপনি—আমিই-যাই" বলে বেদী থেকে নেমে পাটীটা গুটোতেই, অমলা তাড়াতাড়ি উঠে পাটীটায় বসে পড়ে বল্‌লে, "আপনিই বুঝি বাগানে থাকতে জানেন, আর বুঝি কেউ জানে না, থাক পাটী আমি শোব।"

অপরিচিতার সেই চিরপরিচিত স্বরে অমিতাভের সমস্ত সংযম একমুহূর্ত্তে ভেসে গেল। আবেগপূর্ণ হৃদয়ে ঝুঁকে পড়ে অমলার হাত দুখানি ধরতেই সে বল্লে, "এখুনি বা লোকে বলবে কি? আর এই বুঝি আপনার অমর প্রেম—হিঃ হিঃ।"

অমিতাভ নিকটে বসে পড়ে বল্লে, "নিশ্চয়-ই, সেই ট্রেনে শেষ-মুহূর্ত্তে ক্ষণিক চাওয়ায় যে অমৃত তোমার চোখ থেকে ঝরে পড়েছিল অমলা, তাই বুকে ধরে, তোমার সামান্য উপকারী বন্ধুটি অমর প্রেমের বিজয়-মালা আজ গলায় পরলে।" এই বলে চাঁদের আলোয় জোর করে অমিতাভ অমলার মুখখানি তুলে ধরলে।

অমিতাভের বুকের ভেতর মুখ নামিয়ে, জড়িতস্বরে অমলা বল্লে, "তোমার সেই অমৃত-সাগরে অবগাহন করে, আমার নারী-জীবন ধন্য হোল।"

কোটা ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে জুঁইয়ের ঝাড়কে শিউরে দিয়ে ঝির্‌ ঝির্‌ করে বয়ে গেল একটু শীতল মৃদু বাতাস, সঙ্গে সঙ্গে ভাবী দম্পতীর মাথায় গায়ে দেবতার আশীষের মত চাঁদের কৌমুদী মেখে যোঁটা খুলে ঝ'রে প'ড়লো অসংখ্য জুঁই।

গভীর ভক্তিতে ও শ্রদ্ধাভরে দুজনে মাথা নত ক'রে প্রণাম কর্‌লে তাঁর পায়ের উদ্দেশে।

কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্য-প্রতিভা

(কালিদাস মিত্র এম এ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১৯। ধর্ম্মমূলক নাটক

'দক্ষযজ্ঞ' 'ধ্রুবচরিত্র' 'নলদময়ন্তী' প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক যখন 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চে একাধিক্রমে অভিনীত হইতেছিল, তখন কয়েকখানি ধর্ম্ম-মূলক নাটক ও অভিনীত হয়, তাহার মধ্যে 'চৈতন্যলীলা' 'নিমাই সন্ন্যাস' 'রূপসনাতন' অন্যতম। 'চৈতন্য লীলায়' কলিহত জীবের উদ্ধারকর্ত্তা মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ-দেবের সন্ন্যাস-গ্রহণ ও প্রেমধর্ম্ম প্রচার ও 'নিমাই সন্ন্যাসে' তাঁহারই ভক্ত ও প্রেমিক নিমাইয়ের সন্ন্যাস অবলম্বন এবং 'রূপসনাতনে' তাঁহারই প্রেমের আক-র্ষণে বাঙ্গালার সম্রাটের অমাত্যদ্বয়ের সংসার-ত্যাগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। 'বিল্বমঙ্গলের' উপাখ্যান ভাগ কবির মৌলিক কল্পনা প্রসূত না হইলেও, তাঁহার লেখনী চাতুর্য্যে ইহা ভক্তের প্রাণের অতি আদরের বস্তু হইয়াছে। ইহাতে আমরা যে উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে অনেক অভক্ত ভক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে বলিয়া আমা-দের দৃঢ় বিশ্বাস। ইহাতে কবি দেখাইয়াছেন, যে ভগবৎপ্রেমের সংস্পর্শে অতি অভাজনও উদ্ধার পায়। অগ্নি যেমন নিজের দাহিকাশক্তিবলে স্বর্ণের ময়লামাটি ভস্মীভূত করিয়া তাহাকে উজ্জ্বল প্রদান করে, সেইরূপ প্রকৃতপ্রেমের অগ্নি মানুষকে সাধক করিয়া তুলে। তাহার হৃদয়ের সমস্ত ময়লামাটী এ আগুনে ভস্মীভূত হইয়া যায়। বাস্তবিক প্রেমই মানুষকে দেবতার পদে অধিষ্ঠিত করে।

'চৈতন্যলীলা' ও 'নিমাই সন্ন্যাস' গিরিশচন্দ্রের ভাবরাজ্যের অমৃত ফল! এই দুইখানি ও ইহাদের পরবর্ত্তী 'বুদ্ধদেব', 'বিল্বমঙ্গল,' ও 'রূপসনাতন' প্রভৃতির অভিনয়ে রঙ্গালয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়। গিরিশচন্দ্র ধর্ম্মোপদেষ্টার আসন পরিগ্রহ করিয়া রঙ্গালয়ের মধ্য দিয়া দেশে ধর্ম্মের কল্পস্রোতামুখ খুলিয়া দেন। বঙ্গবাসী রঙ্গশালাকে ঘৃণার চক্ষে না দেখিয়া ধর্ম্মশালার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত দেখিতে লাগিল। 'চৈতন্যলীলার' অভিনয়ে সমস্ত বঙ্গদেশ হরিনামে মাতিয়া উঠিল। নবদ্বীপ শান্তিপুর প্রভৃতি স্থান হইতে বিদগ্ধজনমণ্ডলী ও ভক্ত সাধুসজ্জনেরা নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত ভাবে অভিনয় দর্শনে আসিয়া রঙ্গালয়ের মর্য্যাদাবৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

এই 'চৈতন্যলীলা' রচনাকালে গিরিশচন্দ্রের ধর্ম্মজীবনে মহাপরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ইহার অভিনয়খ্যাতি শ্রবণ করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যাচিয়া আসিয়া অভিনয় দর্শনে প্রীতি-উৎফুল্ল হৃদয়ে গিরিশচন্দ্রকে পদাশ্রয় দেন। গিরিশচন্দ্রের জীবনে উহা এক শুভ মুহূর্ত্ত।

'চৈতন্যলীলা' নাটকে চৈতন্য দেবের গৃহ-ত্যাগ, প্রেম-ধর্ম্ম প্রচার, পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার দীক্ষা, জগাই-মাধাই উদ্ধার ও হরিনামের সহিত আবালবৃদ্ধ বণিতায় প্রেমবিতরণ ইত্যাদি মূল-সংস্থানে রঙ্গালয় ধর্ম্মভবনে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কথিত আছে যে রমণী চৈতন্যের ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণা হন, তাঁহার অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া পরমবৈষ্ণব মহাপুরুষ ও সাধকগণ ভাবাবেশে তাহা-কেই গৌরাঙ্গজ্ঞানে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সেই রমণীর হৃদয়েও ধর্ম্মভাব

এরূপ বদ্ধমূল হয় যে তিনি অভিনয়-ব্যাপার ও ব্যবসায়বুদ্ধি ছাড়িয়া দেন। আজিকালও অনেক ধর্ম্মমূলক নাটকের অভিনয় হয় সত্য, কিন্তু কয়জন অভিনেতা, বা অভিনেত্রী প্রাণপণ অভিনয়ে লোককে মাতাইয়া হর্ষের পুণ্যবর্ত্তিকা হৃদয়ে জ্বালিয়া দিয়া রঙ্গমঞ্চ হইতে সাধনমার্গে উদ্যত হয়? ভক্তি-রসোজ্জ্বল মধুমাখা লেখা যেমন আজকাল বিরল হইয়াছে, তেমন প্রাণ দিয়া অভিনয়ও আর হয় না। পাষণ্ড জগাই মাধাই দুইজনের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিয়া নাস্তিক-প্রকৃতি পাষণ্ডেরা আঁধার জীবন-পথে আলোকের রেখা দেখিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়াছিল। রঙ্গালয় যে শুধু আমোদিগকে আমোদ দিবার জন্য সৃষ্ট তাহা নহে, রঙ্গালয়ও যে আমাদিগের প্রকৃত শিক্ষক একথা তখনকার অভিনয় যাহারা দেখিয়াছেন তাহাদের সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। হায় কবে আমরা আবার রঙ্গালয়গুলিতে ঐরূপ প্রাণঘাতান নাটকের অভিনয় দেখিয়া সৎশিক্ষা লাভ করিব!

'চৈতন্যলীলা' ও 'নিমাই সন্ন্যাস' অভিনয় দর্শনে সাধারণে গিরিশচন্দ্রকে ভক্তির চক্ষে দেখিতে থাকেন। নিমাই-সন্ন্যাস অভিনয় দর্শন করিয়া আত্মহারা পরমহংসদেব উন্মত্তের মত গিরিশচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। আর আমাদের বোধ হয় এই খানেই এই অবস্থাতেই গিরিশচন্দ্রের দীক্ষালাভ হয়। সাধারণতঃ আমাদের ধারণা গুরু কর্ত্তৃক কর্ণে মন্ত্রোচ্চারিত হইলেই দীক্ষা হয়; কিন্তু প্রকৃত দীক্ষা কেবলমাত্র মন্ত্র-সাহায্যেই যে সম্পন্ন হয় তাহা নহে। গুরুর দর্শন বা স্পর্শন বা স্মরণ যখন শিষ্যের প্রাণের ভিতর তাঁহার মরমের কথা জানাইয়া দেয়—যখন তাহার অজ্ঞানান্ধকার দূর হইয়া যায়। যখন শিষ্য গুরু কৃপাবলে ভর্গাধীনকে দেখিতে পায়, তখনই প্রকৃত দীক্ষা হয়। প্রকৃত দীক্ষা হইলে মায়া-পাশ ছিন্ন হইয়া যায়—কুল-ভাব ভিন্ন হইয়া যায়।

এই দুইখানি নাটকের অনেকগুলি গানই সাধারণের অত্যন্ত প্রিয়। 'কেশব কুরু করুণা দীনে কুরু-কাননচারী,' 'মন মজালে গৌর হে, কেন দেখা দিয়া লুকালে,' 'কাঁহা মেরা বৃন্দাবন,' 'রাধা বৈ নাইক আমার', 'আর ঘুমাও না মন' ইতি দীর্ঘক আধ্যাত্মিক গীত, 'হরি মন মজালে লুকালে কোথায়?' 'ডাকে হে পতিত তোমায় পতিতপাবন পুরাও সাধ' প্রভৃতি গান ভক্তের কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিয়া দেয়। এ গানগুলি বাঙ্গালী চিরকালই আদর করিবে। 'নিমাই সন্ন্যাসে' নিমাই-বিচ্ছেদে বিষ্ণুপ্রিয়ার কাতরোক্তি 'কি দোষে ঠেলিলে বল না পায়' পতি-প্রাণা পত্নীর করুণ সঙ্গীত ও 'চৈতন্যলীলায়', 'রাধা বৈ আর নাইক আমার' ইত্যাদি সঙ্গীতে প্রেমের একনিষ্ঠার যে অপূর্ব্ব মনোরম চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা অন্য জাতির ভাষায় সুদুর্লভ। 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটকে নিমাই, চৈতন্য ও বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণলীলা অভিনয়চ্ছলে গাহিতেছেন —

"আজ ধরবো লো সই মনোচোরা আমার,
নয়ন জলে গেঁথে মালা, বঁধুর গলায় দিব!
সইগো সাধের কালোচাঁদে,
প্রাণ মন আমি দিছি সাধে,
আমার চিকণ কালা ভালবাসি,
কালা রাধার প্রাণাধার॥
কথা কইবলো কত, বল্‌বো তারে কেঁদেছি যত,
দেখ্‌বো যদি হ'তে পারি তার মনের মত;
সে আমার হয় বা না হয়,
আমি তো সই হ'ব তার।"

কি ঐকান্তিক প্রেমে আত্মসমর্পণের অপরূপ নিদর্শন। নিমাই-সন্ন্যাস নাটকে প্রেমোন্মাদিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার ঐকান্তিকতায় ও তন্ময়তায় কাহার হৃদয় না দ্রবীভূত হয়?

এই দুইখানি নাটক অভিনীত হইবার পর 'ষ্টারে' গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব,' 'বিল্বমঙ্গল,' 'রূপসনাতন',

'নসীরাম' অভিনীত হয়। বুদ্ধদেব চরিত অভিনয় দর্শন করিয়া সার এডুইন আর্ণল্ড বঙ্গ-নাট্য-শিল্পের উন্নতিকল্পে গিরিশচন্দ্রের যত্নোদ্যম ও অভিজ্ঞতার যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করেন। তিনি বলেন, 'যদিও বাঙ্গলা রঙ্গালয়ের দৃশ্যপটাদি দেখিয়া বিলাতী থিয়েটারের অবস্থা হাস্য করিবেন, কিন্তু উচ্চভাবাপন্ন নাটকাভিনয় ও অভিনয়-চাতুর্য্য দর্শনে নিশ্চয়ই তাহারা চমৎকৃত হইবেন। 'বুদ্ধদেব' অভিনয় দর্শনে কলিকাতার অন্যতম্য সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রায় নবলাল বসু মহাশয়ের জীব হিংসায় এতদূর বিরাগ জন্মিয়াছিল যে, সেইবৎসর হইতে তিনি তাঁহার বাটীতে ৺ মহাপূজার সময় বলিদান বন্ধ করিয়া দেন।

'বুদ্ধদেব' নাটকে সিদ্ধার্থের সংসারত্যাগ বুদ্ধত্ব ও নির্ব্বাণলাভ, স্বামীপ্রাণা প্রেমবিরহিনী গোপার সন্ন্যাস-গ্রহণ এবং বিম্বিসার-রাজগৃহে তথাগত-প্রবর্ত্তিত 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম'-প্রচার দ্বারা বলি-রহিত-করণ এই কয়েকটী অংশ বড়ই সুন্দর। সিদ্ধার্থের পার্থিব মোহভঙ্গের জন্য দেববালাগণ তাহার প্রমোদ-কাননে নৃত্যগীত-কুশলা নারীরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মুখে—

"ভুলাইতে চাই কোথায় ভুলাই?
কোথা হ'তে আসি কোথা ভেসে যাই?"

প্রভৃতি সংগীত মোহাচ্ছন্ন মানবের সুপ্ত বিবেককে ক্ষণিকের জন্যও প্রবুদ্ধ করিয়া তুলে—ক্ষণিকের তরেও একটা অজানা পূর্ব্ব-স্মৃতি মনের উপর দিয়া মৃদু-হিল্লোলে খেলিয়া যায়। আমাদের এই পৃথিবীর প্রবাস-জীবনের কথা, আমাদের সেই চিরপুরাতন, চির-আনন্দময় ঘরে অবস্থিত আপন-জনের কথা ক্ষণতরে মনে করিয়া দেয়। কলা-কুশলী চিত্রকর যেমন কয়েকটী রেখার দ্বারা, চিত্রে ভাবের স্ফুরণ করিয়া দেন, গিরিশচন্দ্রও সেইরূপ কয়েকটি ঘটনার সমাবেশে নাটকান্তর্গত পূর্ণা ও সুজাতা চরিত্র দুটী অঙ্কিত করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এই রমণীদ্বয়ের ভক্তি-গদগদ হৃদয়ের সহিত কবির ভক্তি-উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

পাপী তাপী, পতিত অভাজন ও ভগবৎ প্রেমের বলে মুক্তি পায় ইহাই 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণির অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন যে অনেক পাপীকে সংশোধনের পথে লইয়া গিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিল্বমঙ্গলের যে একনিষ্ঠ-প্রেম, চিন্তামণির প্রতি অপ্রতিহতভাবে বহিত, যে প্রেমের বশে ঘোর দুর্য্যোগ উপেক্ষা করিয়া শবকে তরী জ্ঞানে, সর্পকে রজ্জুজ্ঞানে, বিল্বমঙ্গল স্বীয় প্রেমিকাগৃহে উপনীত হইয়াছিল, সেই প্রেমই পরিণামে আরও উচ্চতর প্রদেশে উন্নীত হইয়া ভগবৎ প্রীতিতে বিলীন হয়। এই নাটকের পাগলিনী চরিত্র কবির অপরূপ সৃষ্টি। পাগলিনী সঙ্গীতের সুধাতানে অতঃকের, মোহান্ধ নরনারীর হৃদয়ের ভক্তি প্রস্রবণ খুলিয়া দিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি গিরিশচন্দ্র কোন দিন ভণ্ডামীর প্রশ্রয় দেন নাই, ধর্ম্মেও তিনি ভণ্ডামী ভাল বাসিতেন না। তাঁহার সাধক চরিত্র গুলি, কোথাও ভণ্ড নন। তিনি ধর্ম্মের গোঁড়ামীও ভাল বাসিতেন না। তাঁহার ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন, প্রেমের ধর্ম্ম। এখানে শাক্ত বৈষ্ণব, শৈব সকলেরই এক অধিকার। তাই "তাঁহার পাগলিনী গায় 'ও মা! কেমন মা কে জানে।' 'আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা।' আবার 'ওগো, ওই বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে।' আর আমাদিগের বিশ্বাস ধর্ম্মান্ধতার লেশমাত্র নাই বলিয়া বাঙ্গালার সর্ব্ব ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকেরা 'বিল্বমঙ্গল' দেখিতে আসিয়া থাকেন। এখনও 'বিল্বমঙ্গল' অভিনয়ে রঙ্গালয়ে স্থানাভাব হইতে দেখা যায়। এই বিল্বমঙ্গল পাঠ করিয়া বাঙ্গালার নবযুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "আমি এরূপ উচ্চভাবের গ্রন্থ কখনও পড়ি নাই।"

'রূপসনাতন' ও 'নসীরাম' নাটকে এই ভক্তি-

রসের শেষ জোয়ার বহিয়াছিল। 'রূপসনাতনে' রূপ ও সনাতন গোস্বামীর সংসার-ত্যাগ ও সন্ন্যাস-গ্রহণ বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহাদের ও অন্যান্য গোস্বামীর ভক্তিগদগদ হৃদয়ে ঐহিক সর্ব্বস্বত্যাগ ও তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীগণের গৌরাঙ্গদেবের শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণের ভাব কি মধুর! কি চিত্তস্পর্শী! এইরূপ ঐকান্তিক বিশ্বাসের অধিকারী না হইলে কি ভগবানের কৃপা পাওয়া যায়? সংসার-মায়াবদ্ধ মোহান্ধ সুবুদ্ধি চক্রবর্ত্তীর সাংসারিকতার চিত্র কঠোর বৈরাগ্যের চিত্রের পার্শ্বে বেশ উজ্জ্বল হইয়াছে।

নসীরাম ভক্ত ও সাধক। তাঁহার ঐকান্তিক সাধনায় শ্রীহরি স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে ধরা দিয়াছেন। তাঁহার মত একনিষ্ঠ সাধককে ধরা না দিয়া থাকিবার উপায় নাই? নসীরামের ভাবোন্মাদ ও সাধনোন্মাদ শিক্ষাপ্রদ। নসীরামের প্রভাবে অনাথ-নাথের মত পরিবর্ত্তন ও হরিপ্রেমতন্ময়তার চিত্র কি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী! নসীরামের নিকট সুখ দুঃখের ভেদাভেদ নাই। শ্রীহরির প্রতি তাঁহার অটল বিশ্বাস। নসীরাম প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া বুঝিয়াছিলেন, "যে আপনার ভাবনা ভাবে না হরি তারই ভাবনা ভাবে।" একথা খাঁটি সত্য। অহং জ্ঞান—আমি কর্ত্তা এই ভাবনা—মানবকে ভগবানের নিকট হইতে দূরে রাখিয়া দেয়। সংসারেও দেখিতে পাওয়া যায় জনকজননী, নির্ভরশীল সন্তান সন্ততির জন্য যতটা ভাবিয়া থাকেন ততটা কৃতী শক্তিমান সন্তানের জন্য ভাবিয়া থাকেন না; ভাবিবার আবশ্যকতাও হয় না; সেইরূপ ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল যাঁহারা তাঁহাদের ভাবনা তিনি না ভাবিয়া থাকিতে পারেন না? নসীরামের ভগবৎ প্রেমরূপ অরিস্পর্শে সোণার খাঁদ কাটিয়া গিয়াছিল; অনাথনাথের বিরজার প্রতি রূপজ-মোহ কাটিয়া গিয়া প্রদ্ধা প্রীতি আসিয়াছিল। এম অঙ্ক ৩য় দৃশ্যে নসীরাম বলিতেছেন, "বোঝ কামে প্রেমে তফাৎ—কাম স্বার্থপর মনকে কুঁকড়ে রেখে; প্রেম-জগদ্ব্যাপী, প্রেমে প্রাণ মন জগদ্ব্যাপী হয়।"

বাস্তবিক 'নসীরামের' মত নাটক পাঠ করিলে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠের ফললাভ হয়। নাটকাকারে কবিবর প্রেমের দার্শনিকতত্ত্ব ইহাতে বুঝাইয়াছেন। বিরজা ও অনাথনাথের নির্ম্মল প্রণয়-চিত্র বড়ই মনোরম, মানবীয় প্রেমের পরাকাষ্ঠা যে ভগবৎপ্রেমে তাহা গিরিশচন্দ্র ঘটনাচক্রের ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা বিরজার চরিত্রে বেশ উজ্জ্বল করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অনাথ-নাথ প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে বিরজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, (প্রথম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক) "বল বল গো আমার হবে?' বিরজা উত্তরে বলিলেন, 'না।' তখন অনাথনাথ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা কবির ভাষায় একবার শুনুন :—

'কেবা ভাগ্যবান!
কারে তুমি সঁপিয়াছ প্রাণ?
বল এনে মিলাই তোমার সনে;
দিনেকের তরে সুখী—হেরে তোরে
যাব চলে যথা যাবে প্রাণ
তুমি মাত্র ধ্যান রবে হৃদে।'

ইহাই আদর্শের প্রেমিকের মত কথা! প্রকৃত প্রেমিক প্রণয়-পাত্রকে সুখী দেখিতে পাইলেই সুখী —আপনার সুখকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রণয়ীর সুখে সুখলাভ করাই প্রকৃত প্রেম। অন্যান্যস্থল হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চাই না গিরিশচন্দ্রের প্রেম-তত্ত্ব কত মহান্। তবে প্রথম অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্কে পিতার নিকট তাঁহার মুখেরই উপর অনাথনাথের বিরজার প্রতি প্রেম-জ্ঞাপন একটু যেন প্রগল্‌ভতাভাবা-পন্ন হইয়াছে।

রাজা, কাপালিক ও সোণার উক্তিগুলির ভিতর আপত্তিকর কুরুচিপূর্ণ কথা অনেক আছে। এগুলি এ পুস্তকে চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায়। পরিশেষে কিন্তু রাজা ও সোণার চরিত্রে পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল। তাহাদের চরিত্রে হরিনামের উজান বহিয়াছিল, নাম

হস্তার তাহারা ভাসিয়া গিয়াছিল। কামুক কাপালিকের ছলনায় ভৈরবীচক্রে অপহৃত-সতীত্ব-নিধি সোনা নিঃস্বার্থ পরোপকারের প্রতি-কৃতি। দুরাচার ক্রূর প্রকৃতি কাপালিকের কূট-বুদ্ধির খেলা ও পরিণামে তাহার শোচনীয় পরিণাম সকলকেই স্তম্ভিত করে। প্রকৃতিকে সমুচিত প্রতিশোধ লইতে দেখিয়া বাস্তবিকই মনে একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদ্রেক হয়। ইহজীবনেই যে দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী তাহা দেখিয়াই কবি-বর সমাজে যাহাতে পাপের স্রোত কিয়ৎপরিমাণেও হ্রাস হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছেন।

মুরলতার রাজার প্রতি সোণার ছলনাময় অভিনয় অস্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

ইহার পর যখন গিরিশচন্দ্র ধনকুবের গোপাল-লাল শীল-প্রতিষ্ঠিত 'এমারেল্ড' থিয়েটারে কার্য্য করেন তখন 'পূর্ণচন্দ্র' নামক ধর্ম্ম সম্বলিত উপাখ্যান মূলক নাটক লিখিয়া অভিনয় করেন। ইহার অভিনয় দর্শনে তৎকালের Rais & Rayyat পত্রের সুযোগ্য প্রতিভাশালী সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখো-পাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন,—"এক 'পূর্ণচন্দ্রে' গোপালবাবুর বিশ হাজার টাকার উপর আদায় হইয়াছে।" যাহা হউক এই নাটকে বিশেষ উজ্জ্বল চরিত্রের চিত্র বড় একটা নাই। নীচবংশীয়া ছোটরাণী সুন্দরী সুনার পাপ-অভিসন্ধি ও তাহার পরিণাম, রাজার ত্রৈণতা ও তাহার শেষ ফল সরল-ভাবেই চিত্রিত হইয়াছে। 'সুন্দরা' চরিত্রটী ইংরাজী চরিত্রের অনুকরণে চিত্রিত হইলেও ইহাতে সজীবতা আছে। তবে এই নাটকে সুন্দরা ও নারীর ন্যায় দুইটী সম্ভ্রান্ত মহিলার ইতরজনোচিত গানের তালে তালে, গোরক্ষনাথের ন্যায় তীব্রযোগীর ভণ্ডামিষা—ঘাঘোদরকে তুলার পোষাক পরিয়া সিঁদুর মাখা মুখে, বানর সাজিয়া লাঙ্গুল নাড়িয়া, প্রকাশ্য রাজ-পথে দাঁড়াইয়া ঠমকে ঠমকে নাচিতে দেখিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। ইহার পূর্ব্বে ধর্ম্মমূলক নাটকাদিতে গিরিশচন্দ্র হাস্যরসের অবতারণার জন্য এরূপ বেরিকলপার চিত্র অঙ্কিত করেন নাই। এ রুচির আমরা পক্ষপাতী নই। গভীর দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে এ রুচি সম্পূর্ণ কুরুচি। ইহার জন্য দর্শকবৃন্দকে দায়ী করিতে পারা যায় না। সময়ে সময়ে রঙ্গালয়ের পক্ষ হইতে দর্শকগণ এইরূপ দৃশ্য দেখিতে চান বলিয়া নাট্য-কারকে বাধ্য হইয়া এইরূপ চিত্র অঙ্কিত করিতে হয় বলিয়া একটা অভিযোগ শুনা যায়। বাস্তবিক এ অভিযোগের কোন মূলাই নাই। গিরিশচন্দ্র ইতা-পূর্ব্বে পৌরাণিক বা ধর্ম্মমূলক নাটকে এইরূপ বিদ-দৃশ দৃশ্যের অবতারণা করেন নাই; এবং সকল সময়ে তাঁহার অপূর্ব্ব মনীষা বলে তিনি রুচির সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং এই অভিনব দৃশ্যের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গিরিশচন্দ্রের প্রতিভাকে দায়ী করা যাইতে পারেনা। ধর্ম্মমূলক নাটকে এরূপ অপ্রয়োজনীয় নৃত্যগীত বাহুল্য বিরক্তি-প্রদ। দেব-দাসের মুখে সুন্দরীর সখির নিকট সুধীর মোহিনী-শক্তি-বিষয়ক বর্ণনাও আমাদের ভাল লাগে নাই। এই নাটকে গোরক্ষনাথের শিষ্যগণের মুখে যে শিব-গুণ কীর্ত্তন বিষয়ক গীত গুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাতে মন ভক্তিরসাপ্লুত হয়। এগুলিতে পরম যোগী শ্মশানচারী দেবাধিদেব মহেশ্বরের একটি পরিস্ফুট চিত্র পাওয়া যায়।

'জিনার্ভা' নাট্যাচার্য্যরূপে অধিষ্ঠান কালে গিরিশচন্দ্র 'করমেতী বাই' নামক ধর্ম্মমূলক নাটক রচনা করেন। এখানি ভক্তিরসের অনন্ত উৎস। করমেতি বাইয়ের ভক্তি-উদ্ভাসিত হৃদয়ের সঙ্গীত ও উক্তি পাষাণ প্রাণেও ভক্তিরসের সঞ্চার করে। 'ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ' এই বাক্যের সার্থকতা তাঁহার জীবনে অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছিল। তিনি ভক্তিতে তাঁহার হৃদয়ের ধন শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন,—তাঁহার হৃদয়ের দেবতাকে তাঁহার প্রেমের ডোরে বাঁধিতে পারিয়াছিলেন।

এই নাটকের অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র যথেষ্ট

অর্থব্যয়ে American panorama প্রস্তুত করাইয়া দেবদেবীর আবির্ভাব প্রকাশ-দ্বারা গ্রন্থের নাটকীয় সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে সহায়তা করেন।

'শঙ্করাচার্য্য' ও 'তপোবল' গিরিশচন্দ্রের ধর্ম্মমূলক নাট্য রচনার চরম ফল। 'আগমনী' গীতি-নাট্যে মায়ের আবাহন-গীতি গাহিয়া গিরীশচন্দ্রের যে নাট্য-প্রতিভার উন্মেষ, 'শঙ্করাচার্য্যে' তাঁহার সেই নাটকীয় প্রতিভার চরম উৎকর্ষ, 'তপোবলে' সেই বঙ্গরঙ্গ-ভূমির উত্তর-সাধক গিরিশচন্দ্রের জীবন-ব্রত সাধনার উদ্যাপন ও সিদ্ধিলাভ। তাঁহার আজন্ম তপস্যার ফল ফলিয়াছে। তিনি স্বীয় একনিষ্ঠ সাহিত্য ও নাট্য-কলাসাধনব্রতরূপ তপোবলে পুণ্যার্জ্জিত কামফলের অধিকারী হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

অদ্বৈত মতের প্রতিষ্ঠাতা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের লীলাবলম্বনে শঙ্করাচার্য্য নাটক বিরচিত। ইহার প্রশংসাধ্বনিতে আজ সমস্ত বঙ্গদেশ মুখরিত। ইহা যে সুধী বিদ্বজ্জন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার একটী কারণ, চারিমাসের ভিতর ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক শঙ্করাচার্য্য নাটক প্রণীত হইবার পূর্ব্বে কি কেহ স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন যে এরূপ শুষ্ক দার্শনিক-তত্ত্ব-সম্বলিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নাটক বাঙ্গালা ভাষায় সম্ভবপর? ইহার বিষয় গুরুগম্ভীর। এতৎসত্ত্বেও ইহা নাট্যামোদী সুধী সমাজে সমাদরে পরিগৃহীত হইয়াছে। সত্য কথা বলিতে গেলে শঙ্করাচার্য্য নাট্যাকারে শঙ্করের দার্শনিক মতের আলোচনা—তাঁহার অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যান। যখন বৌদ্ধ কাপালিকগণ, "বেদ বিধি-বন্ধরহিত নিরীশ্বর স্বেচ্ছাচার শূন্যবাদ" ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত পাশবিক অত্যাচারে, ভারতের হিন্দু নরনারীকে পর্য্যুদস্ত ও বিব্রত করিয়া তুলিতেছিল, বৌদ্ধধর্ম্মের দোহাই দিয়া অনার্য্যগণ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের প্রচার করিতেছিল সেই সময়ে মানবের, ভারতের ও হিন্দুধর্ম্মের মঙ্গল সাধনের জন্য, বেদের প্রকৃত মর্ম্ম প্রচারকল্পে অদ্বৈতমতের প্রতিষ্ঠা দ্বারা জগৎকে জ্ঞানের নূতন আলোক প্রদান জন্য শিব-অংশে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। শঙ্করের অমানুষিক কার্য্যাবলী ভারত হইতে বৌদ্ধ-কাপালিক-গণের দূরীকরণ ও বিদ্যোপার্জ্জন, মণ্ডন-পরাজয় ও তদীয় পত্নী সরস্বতীরূপিনী 'কামকলা'র সহিত বাক্‌যুদ্ধে শঙ্করের বিজয়লাভ প্রভৃতি গিরিশচন্দ্র কি নিপুণতা সহকারেই বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার এই সময়ের রচনা দেখিলে উহা কোন ঐশী শক্তির প্রেরণা-সঞ্জাত বলিয়া বোধ হয়। ইংরাজীতে যাহাকে inspired বলে।

এই ঐশীশক্তির প্রেরণা তিনি কোথা হইতে লাভ করিয়াছিলেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশচন্দ্রের ভক্তিপ্রীতি ও বিশ্বাসে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা' বলিয়া সার্টিফিকেট পত্র দিয়াছিলেন সেই মহাপুরুষের সংসর্গে আসিয়া অগ্নিসংস্পর্শে স্বর্ণ যেমন বিশুদ্ধতা ও ঔজ্জ্বল্য লাভ করে, গিরিশচন্দ্রের প্রতিভাও সেইরূপ ঔজ্জ্বল্য ও বিশুদ্ধতা লাভ করিয়াছিল। তিনি তাঁহারই রাতুল চরণাশ্রয়ে ধর্ম্মবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হন। বাঙ্গালা দেশে ত শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় এরূপ উচ্চাঙ্গের নাটক ইহার পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, এমন কি পৃথিবীর কোন দেশে হইয়াছে কি না সন্দেহ! অবশ্য আমরা জগতের ভাল ভাল নাট্য-সাহিত্যের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়া যে ধারণা করিয়াছি তাহা হইতেই এ কথা বলিলাম।

শিশু শঙ্কর যখন দুর্ব্বলা মাতৃদেবীর পথশ্রম দূর করিবার জন্য পাপতাপনাশিনী জাহ্নবী দেবীকে স্তবে তুষ্ট করিয়া নিজেদের বাটীর দ্বার দিয়া প্রবাহিতা হইতে অনুরোধ করিতেছেন, তখন কবি কি সুন্দর সরল প্রসূনের ভাষায় শিশু-হৃদয়ের প্রার্থনা ব্যক্ত করিয়াছেন:—

"এস দেবী—
সলিলরূপিনী শস্যপ্রদায়িনী—
জীবকোষ সন্তাপহারিনী,
এস ভূধরনন্দিনী সাগরগামিনী
• • •
এস পাছে করতালি শুনি,
কিলোলতরঙ্গে জলরাশি !
মুকুতা-নির্ঝর—
হুংকারে হুংকারে
নিরন্তর করিয়া স্বজন।"

যখন প্রিয় শিষ্য সনন্দন ব্যাসদেবের সহিত শুক শঙ্করাচার্য্যের শাস্ত্র-বিতর্ক শ্রবণে শাস্ত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া, শুকদেবকে পরস্পর বিরোধী দর্শন শাস্ত্র হইতে কিরূপে মীমাংসার সম্ভবপর, কিরূপে তাহাদের সমন্বয় করা যায়, কিরূপেই বা মিথ্যার আবরণ ভেদ করিয়া সত্যের প্রকৃত মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করা যায়, এতৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন. তখন শঙ্করাচার্য্য বুঝাইলেন,

"তর্ক যুক্তি শক্তিহীন সত্য নিরূপণে,
তর্কে তাহা হয় নিরূপিত ;
তর্ক-বুদ্ধি নাশ হেতু তর্ক প্রয়োজন।
• • • •
মানব কল্যাণ হেতু মহাঋষিগণ,
যে সময়ে মানবের অবস্থা যেমন,
করেছেন উপযোগী দর্শন রচনা।
বেদমর্ম্মবর্জ্জিত কুতর্ক-রত জন
—নিরাশ কারণ,
দর্শনের প্রয়োজন।"

আবার অদ্বৈতমতের সমর্থনে শঙ্কর কি বলিতেছেন একবার অনুধাবিত চিত্তে শুনুন ;—

"ধীরভাবে কর বৎস মন সন্নিবেশ
আত্মা হতে প্রিয় আর কি আছে আমার ?
পুত্র পরিবার প্রিয় বস্তু যা আছে সংসারে
প্রিয় তাহা আমার বলিয়া।
ব্রহ্ম বস্তু প্রিয় হয় আমার সমান,
জানিলে এ জ্ঞান—
আমি—তিনি ভেদ নাহি রহে,
প্রিয় জ্ঞানে, একজ্ঞান জন্মে ব্রহ্মসনে।
এই প্রিয় জ্ঞানে ক্ষুদ্র "অহম্" বিনাশি,
ক্ষুদ্রত্ব ত্যজিয়া হয় অসীম "অহম্"।
ব্রহ্মজ্ঞানে বিলুপ্ত "অহম্"
উদয় "সোঽহম্" ভাব "অহম্" বর্জ্জনে !"

এরূপ উচ্চাঙ্গের দার্শনিক তত্ত্ব, এরূপ সহজবোধ্য ভাষায় শাস্ত্রনীতি ব্যাখ্যা কোন্ দেশে কোন্ ভাষায় নাট্যসাহিত্য পরিলক্ষিত হয় ? রঙ্গালয়ে আমোদের সহিত শাস্ত্রানুশীলনে ও দার্শনিক গূঢ় তত্ত্বের অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ করায় নাট্যকারের অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শিত হয় নাই।

শঙ্করাচার্য্য ব্যতীত এই নাটকের অন্তর্গত মহামায়া, শঙ্করজননী বিশিষ্টা দেবী, জগন্নাথ ভৃত্য, পদ্ম পাদ, মণ্ডন মিশ্র, শিউলী ও শিউলী-পত্নীর চিত্র সুন্দর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। মহামায়া ও তৎসঙ্গিনীগণের মুখে—

"যেন পাতা নেয় মাথা পেতে, গাল বাজালে হ'য় খুসী।
মান অপমান সবই সমান, নয় কেউ তার কাছে দোষী।"

গানটী এখনও যেন কাণে বাজিতেছে। এই নাটকে ক্রূর কাপালিকগণের কুকর্ম্মাবলীর চিত্রও গাঢ়বর্ণে প্রদর্শিত হইয়াছে। কাশীর শ্মশান-ঘাটে চণ্ডালবেশী ধর্ম্মের সহিত শঙ্করের আলাপন কি উচ্চাঙ্গের শিক্ষাপ্রদ। শিউলি ও শিউলি-পত্নীর ভক্তিরসউজ্জ্বল হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া কাহার মন না ভক্তিরসে আপ্লুত হয় ? বিশিষ্টা দেবীর মৃত্যু-শয্যায় শঙ্করের মুখ হইতে গিরিশচন্দ্র যে—

"নগেন্দ্র-নন্দিনী-নাথ নিরীশ্বর
নিন্দি রজত নিভ' নন্দধর।
নিশানাথ নয়রঞ্জিত মূর্দ্ধনী,
নয়নীপগল নাগধর।
ন কায়ায় নমঃ।"

প্রভৃতি শিবস্তব বলাইয়াছেন, তাঁহার মত মধুর রচনা বড় একটা পাঠ করা যায় না। ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব মৌলিক কল্পনা-প্রসূত। তর্ক-দ্বন্দ্বে মণ্ডন মিশ্রের পরাজয় ও কর্ম্মবাদ খণ্ডনদ্বারা অদ্বৈত-বাদের বিষয়-ঘোষণায় গিরিশচন্দ্র কি সুন্দর যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন তাহা পাঠ বা উক্ত নাটকের অভিনয় দর্শন করিলে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

'তপোবল' গিরিশচন্দ্রের শেষ নাটা-রচনা। ইহাতে তপোবলে ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মণ্য লাভ বিবৃত হইয়াছে। একদিকে যেমন উগ্র তাপস অদ্ভুত-কর্ম্মা ব্রহ্মর্ষিপদ-প্রয়াসী রাজর্ষি বিশ্বা-মিত্র, অন্যদিকে সেইরূপ ক্ষমাধর্ম্মের অবতার শান্ত সৌম্য বশিষ্ঠ দেব। বৈপরীত্য সাধনে কি সুন্দর চরিত্র বিকাশ! পুত্রশোকও বশিষ্ঠকে ক্ষমা-ধর্ম্ম হইতে টলাইতে পারে নাই, নিজের প্রাণ আহুতি দিয়াও তিনি বিশ্বামিত্রকে ব্রহ্মণ্যাধিকার প্রদান প্রয়াসী। ধন্য ব্রাহ্মণ! তোমার এই গুণে, এই ঔদার্য্যে, এই মহত্বে মুগ্ধ হইয়া ভারতবর্ষ চিরকাল সমাজে তোমার শ্রেষ্ঠ আসন নির্দ্দেশ করিয়াছে। বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মর্ষিত্বলাভে, উগ্র তপশ্চরণে ও তপের বলে সপ্তর্ষি মণ্ডল সম্বলিত নূতন স্বর্গ সৃষ্টি নূতন নূতন তরুলতা ও নূতন প্রাণী জগতের আবর্ত্তন প্রভৃতি চিত্তচমক-প্রদ। কিন্তু এই উদ্দাম আকাঙ্খা পরিপূরণ ফলে তপঃ প্রভাব হ্রাস পদে পদে প্রদর্শন করিয়া কবি দেখাইতে ভুলেন নাই যে জগতের সকল কাজেই একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। স্বেচ্ছাচার জগতের নিয়ম নহে। তপোবলে মানব অসাধ্য সাধন করিতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম পরিবর্ত্তনে বা প্রকৃ-তির সহিত বিরোধে আত্মার অবনতি অবশ্যম্ভাবী।

এই নাটকে যোগমাতা, অরুন্ধতী, ব্রহ্মণ্যদেব প্রভৃতি কয়েকটী চরিত্রাবতারণায় ও সেই সেই চরিত্রে বিকাশ-সাধনে গিরিশচন্দ্র যথেষ্ট মৌলিকতা ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে কয়েকটী ভাল ভাল সংগীত থাকিলেও ব্রহ্মণ্যদেবের ন্যায় গম্ভীর প্রকৃতির লোককে 'ফিরে চুমুকমারা'র দ্বৈত-নৃত্যগীতে আসর গ্রহণ করিতে অনেকেই আশা করেন নাই। ইহাতে নাটকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি না করিয়া বরং যথেষ্ট ক্ষতিই করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা গিরিশচন্দ্রের রচনাশক্তির অপব্যয় ব্যতীত আর কিছুই হয় নাই। (ক্রমশঃ)

ভিক্ষার শেষ

(শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি. এ)

সুন্দর তুমি, তবু কেন এত নিষ্ঠুর—তাই ভাবি,
সারাটি জীবন বসা'য়ে রাখিলে, বলেছিলে শুধু—'পাবি'।
আমি ত' চাহিনি আপনা হইতে, কিছু করি নাই আশা,
ঘুরায়ে ফিরায়ে কত ইঙ্গিতে, তবু সে সর্ব্বনাশা
নেশাটি ধরায়ে, ভুল করে' দিলে জীবনের সব কাজে,
নিষ্ফলতার মরু-মরীচিকা বিছাইলে পথমাঝে!
দুয়ার হইতে দু'মুঠি পাইলে ফিরিত যে হাসিমুখে,
কেন রাজভোগ-প্রসাদের লোভ জাগাইলে তারো বুকে

দুয়ারে তোমার দুটি ভিখ্ মাগি' বারবার আসা-যাওয়া—
হঠাৎ এবার ধরিল তাহারে এ কোন পাগলে-পাওয়া!
এমন করিয়া কেন গো ভুলালে শীত-শিশিরের মাসে,
ছেঁড়া কাঁথাখানি বিলাইয়া দিনু শাল-দোশালার আশে।
তাই ভেবেছিনু সকলি স্বপন—সুন্দর মরীচিকা!
কেহ কোথা নাই, বহুদূর পথ, বাতাসে অনলশিখা।

তবু বেঁচে আছি কোন্ বারি পিয়ে—কোথা তার উৎসার!
পিপাসার দাহ জুড়াইয়া দেয় কল্পনা-সুরাসার!
একি আপনারি নয়নের জল? তবে কেন মিঠা লাগে?
তাই পান করি' প্রাণ ভরি' ওঠে দুরাশার অনুরাগে!
আকাশের কোণে রং ধরে ওই, রূপালি বালির গায়
ঝিক্ ঝিক্ করে সোণার পালিশ এ কোন্ পূর্ণিমায়!
আঁধারের দাগ নাই যে কোথা'ও—আমারি যে ছায়া কালো!
আজ মনে হয়—কিছু পাওয়া নয়, সব হারাণোই ভালো!..
আগে ভাবিতাম, ধরণীর স্বামী, অখিলের তুমি রাজা,
কাহারো পূরাও অমিত বাসনা, কাহারে দাও বা সাজা!
আজি সুন্দর! অপরূপ তব ভুবন-ভুলানো রূপে
ভিক্ষার ঝুলি হাত হ'তে খুলি' খসে' যায় চুপে চুপে!
শোভা সম্পদ্ তোমারি সে থাক্, কথাটি চাহিনা তার,
শুধু তারি মাঝে আমারেও প্রভু করে' নাও আপনার।

ভারতে জাতীয়তার ব্যবস্থা

(শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু এম্, এ)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ অতি দ্রুতগতিতে বহু প্রকারের পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিতেছে। ইংরাজ রাজত্ব এদেশে স্থাপিত হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত রাজশক্তির একছত্র প্রভুত্ব সম্বন্ধীয় ধারণার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছিল কিনা সে কথা আজও ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়ীভূত। ভারতে সাম্রাজ্য কখন চিরস্থায়ী হয় নাই। প্রাচীন গ্রীস সম্বন্ধে একটা কথা আছে "Greet was great indiversity." অর্থাৎ গ্রীস যখন বহুধা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তখনই গ্রীস অতি উন্নত ছিল,—গ্রীসে সাম্রাজ্য স্থাপনের সহিত তাহার পতন হয়। ভারত সম্বন্ধে ঠিক একথাটি না খাটিলেও ভারতের গতি, রাজশক্তির প্রভুত্ব সম্বন্ধীয় ধারণা সত্ত্বেও, চিরদিন ঐরূপ বহুরাজ্য স্থাপনের দিকেই ছিল। এ সম্বন্ধে দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এক কথা, ভারতবর্ষ কোন দিনই একটী দেশ নহে, দ্বিতীয়ত, এক জাতিত্বের ধারণা যে ভারতে নি

আধুনিক, একথা অস্বীকার করা যায় না। যে কারণেই হউক, ইতিহাসে দেখি ভারতবর্ষে এক-একবার একটা সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়া অল্পদিন পরেই তাহা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া আবার বহু-রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল সাম্রাজ্যের পরেও ভারতের এইরূপ ঘটিয়াছিল। ছোট বড় বহু রাজত্ব মোগল সম্রাজ্য খাইয়া দিয়া মস্তক উন্নত করিয়াছিল। কিন্তু যত-দূর দেখা যায় ইহাতে ভারতের চিরন্তর ধারায় কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিছিল না। দক্ষিণে মহারাষ্ট্র, নিজাম, মহীশূর, উত্তরে শিখ, সন্ধিয়া, রোহিলা, অযোধ্যা, বাঙ্গালা, সর্ব্বত্রই ব্যক্তিগত প্রভুত্ব ও বংশগত একছত্র রাজত্ব স্থাপনের জন্যই শারীরিক ও মানসিক সর্ব্বপ্রকার শক্তি ব্যয়িত হইতেছিল। ঠিক কিসের পুনরভ্যুত্থানে মুসলমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল একথা স্বীকার করা যায় না। কারণ মোগল সাম্রাজ্যের পতনে যে সমস্ত রাজ্যের উৎপত্তি দেখিতে পাই তাহার অধিকাংশই মুসলমান। তাহা ছাড়া মানসিক উৎকর্ষের দ্বারা বশে কোনও নূতন ভাবের আদান-প্রদান তাহারও কোন সাক্ষী পাওয়া যায় না। জ্ঞানোন্মেষ ও মানসিক উৎকর্ষের দিক দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায়, প্রায় সাত আট শত বৎসরের মুসলমান প্রাধান্যের ভিতর ভারতে মাঝে মাঝে সেই পুরাতন সামজিক ধর্ম্মগত আভিজাত্যের গতি নাড়াইয়া দিবার জন্য সেই পুরাতন বৌদ্ধতন্ত্রের করুণানুযায়ী সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে। নানক কবির যাহা করিয়াছেন তাহা কোন প্রকারেই কোন নূতন জিনিষ নহে। তাহার ভিতর পার-লৌকিক আকাঙ্খাটা এত বড় যে তাহাতে এত বড় হাদেশের এতগুলির লোকের ইহলৌকিক জীবন গঠনের শান্তি শৃঙ্খলা সাধনের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে পারে নাই। তাহার ধর্ম্মের বাঁশীর সুর কার্য্যত হইয়া হিন্দু-মুসলমানকে সাম্প্রদায়িকতা ভুলাইতে পারে নাই, বরং গণ্ডীর ভিতর গণ্ডীর মত এক একটা ভিন্ন সম্প্রদায় গড়িয়া ভারতীয় বৈচিত্রে আর একটু রং ফলাইয়া গিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দী হইতে ইউরোপে যে নূতন বাতাস বহিয়াছে, যাহার ফলে সেখানে স্বাধীন চিন্তাশক্তি স্ফূরিত হইয়া দর্শন বিজ্ঞানের বহু উন্নতি সাধন করিয়া জগৎকে চমকিত করিয়াছে, এবং যাহার সামাজিক মনুষ্যত্ব বিকাশের চরমফল বিরাট ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব, তাহা ভারত-বর্ষকে তখন স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাহার অন্যান্য কারণ বাদে একটা প্রধান কারণ ছিল যে ভারত ও ইউরোপের মাঝখানে ছিল—প্রবল সাম্য-বাদী অথচ অপরিবর্ত্তনীয় প্রাচীনতার উপাসক মুসলমান।

যেদিন ভারতে ইংরাজ রাজত্ব স্থাপিত হইতেছিল, সে সময় ইউরোপ ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রবল তাড়নে উদ্বেলিত। ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনের সহিত অবশ্য তাহার প্রধান মতবাদের আঘাত ভারতের তীরেও আসিয়া লাগিয়াছিল। কিন্তু ভারত তখন তাহা সম্যক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। কারণ তখনও ভারতের প্রাচীনতার ধারা বিন্দুমাত্র টলে নাই। প্রাচীনতাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে চাহিলেও মানুষের অন্তঃকরণের এতকালের গঠিত ধরণ ত বদলাইতে পারে না। তাই সেই সাম্যবাদের মূর্ত্তি ভারতীয় ছাঁচে প্রথমে গড়িয়া উঠিল। রামমোহন রায় ও কেশব সেনের সামাজিক ধর্ম্ম সংস্কার ভারতের প্রাচীন পটে পাশ্চাত্য তুলির অঙ্কণ মাত্র। এবং তাহাও মুষ্টিমেয় শিক্ষিত উদারতার হাওয়ায় মুগ্ধ সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব পিপাসুর গণ্ডী কাটাইয়া বিশাল নিরক্ষর ভারতীয় জনসাধারণকে নয়নতৃপ্তিকর কিছুই দিতে পারে নাই। কারণ সামাজিক সাম্যবাদের উপর ভক্তি রসের ব্যাখ্যা হিন্দুর নিকট এক ঘেয়ে হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়ত, বৈষ্ণব ধর্ম্মের পরিণাম কোন হিন্দুর কাছেই প্রীতিকর নহে। তৃতীয়ত, সামাজিক সাম্প্রদায়িক আভিজাত্যের দাবী বংশানুগতই হইয়া থাকে, এখানে নূতন লোকের জোর করিয়া প্রবেশ সম্ভব নহে, তাহা সময় সাপেক্ষ।

তবে ব্রাহ্ম আন্দোলনের ফলে দেশে অন্তভাবে একটা গতি আরম্ভ হইয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম ধাক্কা সহ্য করিতে না পারিয়া যাহারা প্রবল বন্যায় ভাসিয়া সমাজ হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছিল তাহাদিগের একটা দাঁড়াইবার স্থান হইল। তার-পর পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন বৃদ্ধির সহিত এ নূতন সাম্যবাদের বহু কথা ধীরে ধীরে সমাজের চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। অবশ্য প্রথম ধাক্কায় শিক্ষিত সমাজের অন্তঃকরণে প্রাচীনতার প্রতি একটা বিজাতীয় ঘৃণার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মও যে প্রাচীনতার ভিত্তির উপর গঠিত, তাহারই রূপান্তরিত ভাব ছড়াইয়া ধর্ম্ম ও সমাজের আপোষ মীমাংসা করিয়া রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি নূতন করিয়া সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উদারতার উপর এদেশে মানুষ গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু কার্য্যত শেষোক্ত আন্দোলনটী হইয়া পড়িল ব্রাহ্মধর্ম্মের কতকটা পাল্টা জবাবের মত। ইহার ফলে প্রাচ্য বিদ্বেষ উল্টাইয়া ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য বিদ্বেষে পরিণত হইতে লাগিল।

ভারতের অবস্থা বিপর্য্যয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে অবশ্য বাঙ্গালার স্থান খুব বড়। এখানে আর এক দিয়া একটা বাঙ্গালী জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এডিসনের বইতে পড়িয়াছি যে ইংরাজের জাতিব একতার মস্ত কারণ তাহার জাতিয় ভাষা ও জাতিয় কবি সেক্সপিয়র। বিগত একশত বৎসরের ভিতর বাঙ্গালীর একটা নিজস্ব ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে। রামমোহন রায়ের সময় হইতে ইহার উৎপত্তি। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি ইহার পুষ্টি সাধন করিয়া গিয়াছেন। আর বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে সমস্ত বাঙ্গলার ধন, সমস্ত বাঙ্গালীর প্রাণের অভিব্যক্তি করিয়া দিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র আজ বাঙ্গালীর জাতিয় সামগ্রী, জাতিয় গৌরব। পাশ্চাত্য শিক্ষার সাম্য-বাদ ও তাহার বিশ্ব-বিশ্লেষণকারী দর্শন বিজ্ঞান সমাজের সমস্ত উড়াইয়া দেওয়ার মুখে যেমন ধ কয়েকটা আন্দোলনে জাতিয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার এব পন্থা হইল, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকে শুধু ভা উন্মেষ হয় নাই। বাঙ্গালীর সামাজিক ও পা বারিক স্বাতন্ত্র্য পাশ্চাত্য বন্যায় ভাসিয়া যাই ভয়ও দূরীভূত হইয়াছে।

ভারতবাসীর এবং বিশেষভাবে বাঙ্গালীর জা জীবনে পারিবারিক স্বাতন্ত্র্য একটা মস্ত জিনি যদি এ জাতি কখনও মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় ত হইলে তাহার এ কবিকল্পনার অতীত মাধুর্য্যম সমগ্র ধর্ম্ম ও নীতিকারগণের সর্ব্ব কল্পনার অতী শৃঙ্খলাযুক্ত পারিবারিক জীবন সমগ্র জগতের উ বড় কম প্রভাব বিস্তার করিবে না! পাশ শিক্ষার প্রভাবে ধর্ম্মনীতির বিপ্লব সাধনে বারিক জীবনের প্রধান ভিত্তি স্বামী স্ত্রীর পর্য্যন্ত ভিন্নরূপ ধারণ করা কিছুমাত্র বিচিত্র না। কারণ এ কথা অস্বীকার করা যায় না স্বাধীন চিন্তামূলক সাম্যবাদ সমাজের ভিত্তি করি গেলে স্বামী স্ত্রীর সংস্কারগত ধর্ম্মসম্বন্ধ কিছু টিকিতে পারে না। তারপর পাশ্চাত্য প্রেমপরি ঠিক এদেশের ধাতে আজও সহে নাই। এর ক্ষেত্রে দারুণ পারিবারিক বিপ্লব ঘটিতে পারিত কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র শিখাইলেন স্বামী স্ত্রীর সংস্কার মূল ধর্ম্মসম্বন্ধের কথা ছাড়িয়া নিলেও মানুষের জীব আরও অনেক দিক আছে যাহার পূর্ণ স্ফূর্ত্তি সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে। স্বামী স্ত্রীর সম্ব মাধুর্য্য আছে, কঠোর কর্ত্তব্যের ভিতর দিয়া মনু ষ্যত্বের বিকাশ আছে। স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ শুধু ধর্ম্ম নহে, ইহা সাধারণ মনুষ্য জীবনের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য;—ইহা ঘৃণিত সংস্কার মাত্র নহে, এ কর্ত্তব্য প্রীতিপ্রদ, শান্তিদায়ক।

বাঙ্গালাদেশে উনবিংশ শতাব্দীতে এইভাবে বাঙ্গালীর জীবনে তাহার ধর্ম্ম, সমাজ ও পরিবারি জীবনের ভিত্তি গাথা হইয়াছে। এ কয়টী জিনি

রই প্রধান সম্বল অবশ্য বাঙ্গালীর ভাষা। সেই ভাষা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙ্গালীর জীবনে আর এক নূতন সুরের বাঁশী বাজাইতে আরম্ভ করে,—সেটী দেশভক্তি। এ কথাটীর অবশ্য বস্তুগত ব্যাখ্যা ঠিক পরিষ্কার হইবে না। কারণ এক জাতিয়ত্ববোধের পূর্ব্বে দেশভক্তির কোন অর্থ হয় না। প্রকৃত পক্ষে জাতির কল্যাণ ও সমাজের উন্নতি লইয়াই দেশভক্তি। যাহাদের সে বালাই নাই তাহাদের দেশভক্তি কবিতায় শোভা পাইতে পারে কিন্তু জীবনের কার্য্য ক্ষেত্রে তাহার বড় বেশী কিছু প্রভাব বিস্তার করিতে দেখা যায় না। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে জাতি গঠন ও দেশভক্তি এক সঙ্গে আরম্ভ হইতে পারে অথবা দেশভক্তির কবিত্ব প্রভাব হইতে ক্রমে জাতিয়তার ভিত্তি দৃঢ় হওয়া বিচিত্র নহে। বাঙ্গালীর হয়ত সেইরূপ হইয়াছে। অথবা কে বলিতে পারে বঙ্কিম চন্দ্রের আনন্দমঠ, কমলাকান্ত কি হেমচন্দ্রের ভারত-সঙ্গীত তাহাদের উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বেই জন্মগ্রহণ করিয়া অকালে শ্রোতাহীন অবস্থায় গাহিয়া গলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কি না। আবার মনে হয় নানাভাবের ঘাতপ্রতিঘাতে জাতিয়তার আধ-জাগরণের মুখে দেশভক্তির প্রতি যে নজর পড়ে তাহাতে বিলাতী কাচের ভিতর এমনি করিয়া মনোরম চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহার প্রভাব যে ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহা অস্বীকার করা কঠিন।

সমাজিক অবস্থা বাদে রাষ্ট্রীয় ও শাসন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তণেও ক্রমে জাতিয়তার একদিক উন্মুক্ত হইয়া পড়িবার অবসর পাইয়াছে। ভারতীয় শাসনপদ্ধতী মুসলমান রাজত্ব পর্য্যন্ত ভারতীয়ই ছিল। গত উনবিংশ শতাব্দীতে ক্রমে তাহার ভারতীয়ত্ব একেবারে বিদূরিত হইয়াছে। আমরা আইন যাহা পাইয়াছি তাহা কতকটা হিসাবে পাশ্চত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দান। কিন্তু শাসন পদ্ধতি যাহা পাইয়াছি তাহা ভারতীয় নহে, আজও পাশ্চত্য হইয়া উঠে নাই। দেশে জাতীয় স্তর বিভাগের হিসাবের উপর ও সাম্প্রদায়িক আভিজাত্যের উপর যে সামাজিক বিশিষ্টতা ভারতে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল, তাহা খারাপ হউক বা ভাল হউক, দেশের লোকের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। আজ যাহা পাইয়াছি তাহা তাহার ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তি নহে। বাঙ্গালাদেশে জমিদারগণ সাধারণ হিসাবে দেশের শাসক ও শান্তিরক্ষক ছিলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরেও কিছুদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের হাতে পুলিশ ব্যবস্থার ভার ছিল। কিন্তু ক্রমে তাঁহাদের সমস্ত ক্ষমতার বিলোপ সাধন করিয়া বর্ত্তমানে প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদিগকে মাত্র রাজস্ব-আদায়কারীতে পরিণত করা হইয়াছে। ইহাতে প্রাচীন সম্পত্তিশালী আভিজাত্যের ক্রমে সম্ভ্রমহানি ঘটিয়াছে। তার পর পাশ্চাত্য শিক্ষায় বহুল প্রচারে আজ সম্পত্তিগত ও বংশানুক্রমে সে মর্য্যাদা আর রাখিবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে সাধারণের প্রতিযোগিতার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে, এবং দেশে গণতন্ত্রের ধারণা করা লোকের পক্ষে সুবিধাজনক হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে শাসনপদ্ধতি যাহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার সহিত না আছে জনসাধারণের সম্পর্ক, না আছে শাসন-সৌকর্য্যের উপর শাসকগণের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ। বাস্তবিক বিচার করিয়া দেখিতে গেলে এ কথা বুঝা কঠিন যে কাহার স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ভারত শাসন করা হয়। শাসকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেন খেয়ালের বশে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিয়া যান। প্রশ্ন উঠিলেই জগতের সভ্যতার ফলস্বরূপ বহু ব্যাখ্যাত দর্শনাদির সাহায্য লইয়া নিজেদের কার্য্যের সমর্থন করিয়া থাকেন। যে ইংরাজ জাতি এদেশের কর্ত্তা তাহাদের স্বার্থই যে সব সময় রক্ষিত হয় এরূপ সব সময় মনে হয় না। এ অদ্ভুত শাসন পদ্ধতিও প্রথম অবস্থায় সাধারণের বিশেষ বিরক্তিকর হয় নাই। কারণ সরকার

চাকুরীর বহু সুবিধা উন্মুক্ত করিয়া তখনকার মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোক লইয়া শাসক সম্প্রদায়রূপ একটা নূতন আভিজাত্যের সৃষ্টি করা হয়। সমাজে সহজে আত্মপ্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত থাকিতে সমাজে অসন্তুষ্টি আসিতে পারে না। তারপর প্রাচীন জমিদারবর্গের স্বার্থান্ধ প্রভৃতির দরুণ বহুকাল ধরিয়া উৎপীড়িত হইয়া আসিয়া ইংরাজ রাজত্বের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনাদিও অন্যান্য কতকগুলি সুবিধার জন্য প্রজাগণ বহুদিন পর্য্যন্ত বিশেষ সন্তুষ্টই ছিল। কিন্তু শিক্ষার প্রসারে শাসক-সম্প্রদায়ের আভিজাত্যে আঘাত পড়িতে আরম্ভ করে, এবং পাশ্চাত্য জাতীয়তার সহিত বিজড়িত হইয়া মানুষের মন ভিন্ন পথে চালাইয়া দেয়।

আর একটি জিনিষ ইহার সহিত ক্রমে ভীষণ আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করে। সেটী অর্থ সমস্যা বা অন্ন-সমস্যা। ইংরাজ রাজত্বে বহুকারণ বশতঃ এবং প্রতিযোগীতায় অসমর্থ হইয়া প্রাচীন ভারতের জগতবিখ্যাত বাণিজ্য মরিয়া গিয়াছে। ভারতের শাসন কর্ত্তাগণ দেশের প্রতিযোগীতার অক্ষম বাণিজ্যকে অন্যান্য দেশের ন্যায় সাহায্য করেন নাই। ইহার ফলে ভারতের শিল্পীসম্প্রদায়-গুলির উচ্ছেদসাধন হইয়া গিয়াছে। ফলে ভারতীয় জাতিভেদ-ক্লিষ্ট সমাজের যে গুণটুকু ছিল তাহা বিলুপ্ত হইয়া দোষগুলি একেবারে নগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম অবস্থায় শিক্ষিত সমাজ সরকারী চাকরীর দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া অন্যদিকের অসুবিধার প্রতি নজর করেন নাই। তাহাতে সমাজে যে পরিবর্ত্তনই হইয়া থাকুক না কেন সহজে কোন অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু চাকুরী সম্ভব নহে, আর শিক্ষা সর্ব্বজনীন হইবার মত হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অভিজাত্য বজায় রাখিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি আজ অসম্ভব। মর্য্যাদা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেও লাঙ্গলের মুঠায় পর্য্যন্ত আজ আর অন্ন জোটে না। দেশে কোন শিল্প নাই, প্রতিযোগীতার মুখে আজ নূতন করিয়া তাহা গড়িয়া তোলাও সম্ভব নহে। অবাধ বহির্বাণিজ্যের প্রবল প্রভাব, ক্ষেত্র-জাত কাঁচা ফসল পর্য্যন্ত দেশের লোকের মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে। সমস্ত দেশের কোথাও তেমন ভাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে চির দুর্ভিক্ষ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ বাহ্যিক ঠাটে দেশ ভরিয়া যাইতেছে। বড় বড় নূতন নূতন সহর গড়া হইতেছে। শাসকগণের বাহ্যিক সম্মান ইত্যাদি সব বাড়িয়া যাইতেছে। ষ্ট্রাচি সাহেব বলিয়াছেন, 'আজও ভারতে মোগল রাজত্বের জাকজমক দূরীভূত হয় নাই!' বাহির হইতে কেহ আসিয়া দেখিয়া ভাবিবে ভারতকে রত্নসম্ভারে-পূর্ণ ভিন্ন আর কিছুই বলিবে না। রেলের লাইন জালের মত ভারতের বক্ষে লৌহ শৃঙ্খল পাতিয়াছে। ইহার কোথায় আবশ্যক, কোথায় অর্থের অপব্যয় হইবে না, যে সব বিচার নাই। কেবল শাসন সৌকর্য্যের নামে বাহাদুরীর মাত্রা বাড়ান অনেক ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট।

অন্নচিন্তা হইতে দেশে যে অসন্তুষ্টির জন্ম হইয়াছে তাহা হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে জাতিয়তার ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। লর্ড রিপন ভারতবাসীকে আর একভাবে প্রীত রাখিবার দরুণ ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড প্রভৃতির প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু আমলাতন্ত্রের সহস্র বন্ধনের ভিতর বসিয়া স্বায়ত্বশাসনের প্রকৃত সত্তা কেহ কোন দিন অনুভব করিতে পারে নাই। অন্নচিন্তাক্লিষ্ট ভারতবাসীও তাহার মোহে বেশীদিন মুগ্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে নাই। তাহারা একটা যেন জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বসিয়া থাকিয়া আরাম উপভোগ করিবার অবসর নাই। পূর্ব্ব-মানসিক পরিবর্ত্তনের সহিত সমাজ ধর্ম্ম ও জাতিয়তার যে ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে বুভুক্ষিতের আর্ত্তনাদ, আর স্বাস্থ্যহীন দেহে মরণের অভিশাপ।

...অবস্থার মুখে লর্ড কার্জন তুলিয়া ... জমি পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। ...তেই বিস্ফোরক পদার্থ পদনিম্নে সঞ্চিত ...আসিতেছিল। সহসা একটা দিয়াশলাই ...তে যে প্রলয় আলোড়ন উপস্থিত হইল, তাহাতে ...লে কাঁপিয়া উঠিল। তারপরের ইতিহাস ...রাজত্বের পক্ষে বড় প্রশংসনীয় চিত্র আঁকিতে ...য়ে নাই। মুসলমানগণকে ...ত দেখাইয়া হিন্দু ...দিগের নিকট হইতে ভাঙাইয়া লইয়া, পরে নানা-বিধ দমন নীতির প্রয়োগ, স্বাধীন দেশের লোক হইয়া স্বাধীনতার উপাসক হইয়া এবং আমাদিগকে স্বাধীনতার মন্ত্র শিখাইয়া আবার সাধারণ জীবন ধারণের প্রতিপদে দায়ত্বের নিগড় কঠিন করা, প্রভৃতি ব্যাপারগুলি পাশ্চাত্য সভ্যতার অতিবড় বীভৎস মূর্তি। তার কশাঘাত অসহ্য হওয়ায় বাঙ্গালী যুবক বিপ্লববাদী হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তাহা ক্রমে থামিয়া আসিতেছিল। বঙ্গবিভাগের একটা গোজামিল মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তারপর সহসা যেদিন ইউরোপে প্রলয়ঙ্কর দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, সেদিন তাহা ভারতের কাণেও পশিয়াছিল। তখন ইংরাজ সরকার তাহার বুকভরা অবিশ্বাস লইয়া যাহার উপর নির্ভর করিতে হইবে তাহাকে প্রথমে দূরে রাখিতে চেষ্টা করেন। যাহারা অকপটে স্বাধীনতার উপাসনায় গবর্ণমেণ্টকে ইউরোপীয় সমরে সাহায্য করিতে চাহিয়াছিল তাহারা প্রাণে বড় দাগা অনুভব করিল। সেই সৈন্য সংগ্রহ এদেশ হইতে শেষ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু সদা সন্দিগ্ধচিত্ত ভারতীয় আমলাতন্ত্র মানুষের স্বতঃপ্রণোদিত স্বেচ্ছাকৃত দান উপেক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার পরেই কোমাগাটামারু জাহাজের ঘটনা, এবং তাহার পরই সমস্ত দেশময় বিপ্লবপন্থীদের আর একবার আবির্ভাব। ফলে ইংরাজ সরকার প্রাচীন অসভ্য যুগের ব্যবস্থার ন্যায় বিনা বিচারে সহস্র সহস্র লোক আটক করিয়া রাখিলেন। তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া আবার অধিকতর দমননীতি-মূলক আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। এই আইনের প্রতি দেশব্যাপী যে তীব্র প্রতিবাদের ধ্বনি উঠিয়াছিল তাহার ফল ১৯১৯ সালের পাঞ্জাবের নৃশংস ব্যাপার। ভারতবাসী কোন রকমেই জালিয়ানওয়ালা বাগের রক্তের দাগ অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছে না। সর্বশক্তি বিবর্জিত ভারতবাসী আজ নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, এক কথায় বলিতে গেলে জগতে মানুষ বলিয়া বাঁচিয়া থাকিবার জন্য, অসহযোগের একমাত্র সফল অসংযোগ পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। আমরা পাশ্চাত্য স্বাধীনতার কোন অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি কি না জানি না, ভারতীয় শাসন পদ্ধতির পরিবর্তে পূর্ণ-গণতন্ত্র শাসন চাহি কি না তাহাও বলিতে পারি না, অথবা সে সমস্ত ভাবিয়া দেখিবার সময় নাই। আমরা আপাততঃ বাঁচিয়া থাকিতে চাহি। জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই নরহত্যা ভারতকে পেঞ্চন দিয়া ইংরাজ সরকার সমগ্র জগতের মনুষ্যত্বকে অতি বর্বরোচিত অবমাননা করিয়াছেন। তাঁহাদের জাতির স্বার্থ তাহাতে বিন্দুমাত্রও লাভবান হইয়াছে কি না ভাবিয়া পাই না। কিন্তু এদিকে আমাদিগের বাঁচিয়া থাকা আরও সন্দেহজনক আরও অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।

সঙ্কলন

(বস্ত্র সমস্যা)

(আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়)

[চন্দ্রকান্ত বক্তৃতা]

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় চরকার উপার্জ্জন করা
র এবং চরকায় ও তাঁতে সখ মিটান যায় এই
থাই ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি কিন্তু চরকা ব্যবহারের
ক্ষকতার আরো একটা বড় দিক আছে,
ং পৃথিবীর সমস্ত জাতিরই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা কায়িক
া দ্বারা জীবিকার্জ্জনের কথা বলিয়া গিয়াছেন।
শ্রীষ্টের অনুজ্ঞা এই যে "Earn thy bread by
e sweat of thy brow"—মাথার ঘাম পায়
লিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিবে।" উপনিষদের
ক্তা "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।"
র করিয়া শত বৎসর জীবন ধারণ করিবে।
ষ্টের এবং উপনিষদের বাণীর অর্থ এক। পর-
পেক্ষী হইয়া সঞ্চিত ধনের অধিকারী হইয়া
সভাবে জীবনযাপন করিবে না। কায়িক শ্রম-
া জীবিকা অর্জ্জন করিবে। মহাপুরুষদিগের
: "বাক্য মানুষের অন্তরের আকাঙ্ক্ষার বড়
রোধী। কি করিয়া বিনাশ্রমে জীবিকা অর্জ্জন
রিব, শুধু নিজে নয় কি করিয়া সন্তান সন্ততির
জীবিকার সংস্থান করিয়া রাখিব, এই আকাঙ্ক্ষা
করারে সনাতন। ফলতঃ এখনকার সমাজের
ত নিয়ম কানুন এই বিনাশ্রমে ভোগ করিবার
ার অনুবর্ত্তী। মানুষ কেবলি চেষ্টা করিয়া
গিয়াছে এবং উপযুক্ত আইন-কানুন করিয়া
য়াছে যে, কি করিয়া নিজে এবং বংশানুক্রমে
র সন্ততি বিনাশ্রমে জীবনযাপন করিতে পারে।
কের খাটিয়া খাইতে হয়। যে খাটে, এবং যে
খাটিয়া খায়, উভয়েই খাটিবার আবশ্যকতা না
হওয়াকে বড় স্থান দিয়া থাকে। খাওয়া আর
—মানুষের দুই আদিম আবশ্যক সকল কায়িক
শ্রম দ্বারা মিটাইবার কিঞ্চিন্মাত্র চেষ্টা করিলে,
আধুনিক সামাজিক অসমতার অন্যায় করিয়া
আসিত। সুতাকাটার কায়িক শ্রমে অর্থবানকে
মনে করিয়া জীবিকার সংস্থান করিতে হয়। শ্রমি-
কের গোষ্ঠীর ভিতর সে যে নিজেও একজন, এই
অনুভূতি অনেক শ্রমিকের প্রভুর পানে প্রবৃত্তি
উপস্থিত করিত। অপরে খাটিবে, তাহার শ্রমলব্ধ
ফলে আমি আয়েস করিব, এই মনোবৃত্তির একটা
বাস্তব প্রতিষেধক হইত। এই ঘাস করিবার
মনোবৃত্তি আজ সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদেশে বিদ্যমান।
যেমন সমাজস্থ একজন অপরের শ্রমের ফলের ভোগ
করিতে সচেষ্ট, তেমনি একজাতিও অপর জাতির
শ্রমলব্ধ ফল ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত।

এ কথা বলা যাইতে পারে যে, খাওয়া পরা
যদি দুই আদিম আবশ্যক—ধরিয়া লওয়া যায়, তবে
কেবল চরকা কাটা বা পরার চেষ্টাকে একটা বড়
আসন দেওয়া হয় কেন। সুস্থিবৃত্তির কায়িক চেষ্টা-
কেও সমান গৌরবের স্থান দিতে হয়। বাস্তবিক
তাহাই দিতে হয় এবং আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাত-
সারে তাহাই দিয়া থাকি। নারীরা নিজহস্তে
রন্ধনের কার্য্য লইয়া এই সুস্থিবৃত্তির চেষ্টাকে আকার
দান করিয়াছেন। পুরুষ চাষ করিয়া শস্য বা খাদ্য-
দ্রব্যের সংস্থান করিতেছেন। নারী রান্না করিয়া
তাহা আহারোপযোগী করিয়া দিতেছেন। এক-
কালে সকল নারীই সুতাকাটার কার্য্যে ব্যাপৃত
থাকিয়া পরার অভাব কায়িক শ্রমদ্বারা মোচন
করিতেন এবং পুরুষ প্রতি পরিবারে নারীর এই
কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। ইংরাজীতে
অবিবাহিতা কন্যার নামই হইল "Spinster" কি

...ism এবং
...সভ্যতার
... কেবল
...সংঘের এ... ...া ধনি-সম্প্রদায়ের
...ন্ন নষ্ট করিবার একটা ...মাত্র। এই সমাজে
...রেরই মুখে বড় আদর্শ আছে, কিন্তু ভিতরে
...সারশূন্যতা অনেকখানি। Struggle for
existenceএর পরিবর্তে Live and let live মন্ত্রে
...খনও Socialistরাও কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করেন
...করেন নাই। হিংসা দ্বারা হিংসাকে জয় করিয়া
...মাজিক সমতালাভে ইউরোপ আগুয়ান। ভারত-
...হইতে বুদ্ধাবতার অহিংসা মন্ত্র Live and let
live মন্ত্র কবে উচ্চারণ করিয়াছিলেন! তাঁহার মন্ত্র
...র্থ হয় নাই। ভারতীয় সভ্যতার রক্তমাংসে উহা
...রিয়া গিয়াছে। তাই আজ আবার ভারতের যে
...নীবী অহিংসা মন্ত্রে শ্রদ্ধার কথা, অহিংসার বিশ্বাসের
...বাণী প্রচার করিতেছেন, তাহাতে সমস্ত
ভারতবর্ষের মন আলোড়িত হইয়াছে। সুতা
কাটার সহিত অহিংসার যোগ কোথায়? অহিংসার
যোগ কোথায়? অহিংসার যোগ এইখানে যে,
চরকায় শ্রম করিয়া এমন মনোবৃত্তি জন্মিবে, যাহা
শ্রমিক ও ধনিককে এক শ্রমসূত্রে গাঁথিয়া সংঘাত
নিবারণ করিবে। ভারতবর্ষের মন বলশোভিজমের
বিরোধী। আধুনিক শ্রমের পদ্ধতিতে বলশেভিক
পথে অনেক যাত্রী হইতে পারে। চরকার প্রবর্তনে
প্রত্যেক পুরুষ নিত্যকর্মস্বরূপ সুতা কাটিয়া শ্রমিকের
সহিত ধনিকের এক যোগ অনুভব করিবে।
বলশেভিজম বলিতে শ্রমিকের সহিত ধনিকের
এবং পরিশেষে শ্রমিকের সুর বুঝি [illegible] মতে
এই সংঘাতের কারণস্বরূপ, চরকা তাহা
করিবে।

—বসুমতী।

মণিকাঞ্চন

(উপন্যাস)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীকালীপ্রসন্ন পাল।

(১৬)

বিজয়মাধব ও রাজলক্ষ্মী অত্যন্ত উৎসুক ভাবে পথের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিলেন, এমন সময় হিমাংশু ও অপূর্বকৃষ্ণ পিছনে লতিকা কক্ষমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। পিতামাতার সম্মুখে লতিকার মুখ সহসা লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল; প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সে তাহার প্রতিরোধ করিতে পারিল না। সে কোন রকমে জনকজননীকে প্রণাম করিয়া নতমুখে একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিজয়মাধব কক্ষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অত্যন্ত গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "লতিকা তোমার আচরণ একবারেই ন্যায়সঙ্গত হয় নি—তুমি বুদ্ধিমতী, একবার সুস্থ হ'য়ে চিন্তা করে দেখলেই নিজের ভ্রম বুঝতে পারবে।"

লতিকা তেমনিই নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

হিমাংশু রুক্ষকণ্ঠে কহিল, "যত দোষ ঐ বিমলের, তাইই পরামর্শে—"

লতিকার সারা দেহ কম্পিত হইয়া উঠিল, সে তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মিথ্যে কথা বল না দাদা।"

এই বলিয়া সে চঞ্চলপদে বাহির হইয়া গেল। সকলে নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

খানিকক্ষণ এই ভাবে অতিবাহিত হইলে বিজয়-মাধব শ্মশ্রু কণ্ডূয়ণ করিতে করিতে গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "ব্যাপার দেখ্‌ছি বিশেষ জটিল হ'য়ে উঠেছে। এর আশু বিধান করা একান্ত প্রয়োজন।" তারপর রাজলক্ষ্মীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "রাজলক্ষ্মি, তুমি যদি ঐ ব্রাহ্মবিদ্বেষী হিন্দু [illegible]কে আত্মীয়ের মত গৃহে স্থান না দিতে তা হ'লে পৃথিবী আজ এ ব্যাপার সংঘটিত হ'ত না। তারই ফলস্পর্শে এসে লতিকা এই প্রকার দুর্বিনীত হয়ে উঠেছে! এর জন্য করুণাময় ভগবানের কাছে তোমার জবাবদিহি করতে হবে। এখন অনুতাপ করা ছাড়া করুণাসাগর জগদীশ্বরের দয়া লাভ করবার অন্য কোন পথ নেই। আমিও তোমার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব।" এই নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া তিনি আবেগভরে চক্ষু মুদিত করিলেন। তাঁহার দুই চক্ষুর কোল বহিয়া অশ্রু বাহির হইয়া আসিল।

রাজলক্ষ্মীও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সে অশ্রু অনুতাপের না স্নেহের তাহা এক অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন। খানিক পরে তিনি অঞ্চল-প্রান্তে চক্ষু মুছিয়া সে স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে বিজয়মাধব বাবু অতি সন্তর্পণে চক্ষু উন্মিলিত করিয়া কহিলেন, "রাজলক্ষ্মি, তোমার সহিত আমার বিশেষ পরামর্শের আবশ্যক, তুমি এখনই এ স্থান ত্যাগ কর না।"

রাজলক্ষ্মী দাঁড়াইলেন। স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি একবার লতাকে দেখে আসি।" এই বলিয়া তিনি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

লতিকা কম্পিতপদে সিঁড়ি বাহিয়া দ্বিতল

কক্ষে প্রবেশ [illegible] শয্যায়
দেহলতা[illegible] দিয়া নি[illegible]
রহিল। শয্যা[illegible] তাহার নয়নজলে[illegible]
হইয়া উঠি[illegible] কও [illegible] কিছু না বলিয়া ধী[illegible]
বসে[illegible] দাওয়াটা যে কতদূর অন্যায়[illegible]
হই[illegible] মনে করিয়া সে অবিশ্রান্ত
কাঁ[illegible] নিজের জন্য নহে, নির্দ্দো[illegible]
বি[illegible] অবিরাম অশ্রুবর্ষণ করিতে[illegible]
ল[illegible] সে ক্রুদ্ধ পিতাকে বুঝা[illegible]
ত[illegible] সহিত বিমলের কোন সম্বন্ধ[illegible]
ন[illegible] স করিয়াছে, নিজের বুদ্ধিতে[illegible]
সে [illegible]লের পরামর্শে নহে! তাহা[illegible]
[illegible] ল রকমেই চেনে। তিনি যখন
[illegible] দোষী সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছেন,
[illegible]মলকে সহজে অব্যাহতি দিবেন
[illegible] করিয়া সে অন্তরে গুরুতর বেদনা
[illegible] লাগিল। ইহার প্রতিকার
[illegible]ক রক্ষা করিবার উপায় কি, সে
[illegible]ন্তরকে বারম্বার এই প্রশ্ন করিতে

[illegible]াজলক্ষ্মী কক্ষমধ্যে আসিয়া প্রবেশ
[illegible]রে ধীরে মর্ম্মাহত কন্যার লুণ্ঠিত
[illegible] গিয়া বসিলেন। সস্নেহে কন্যার
[illegible]তেই, লতিকা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া
[illegible]লনয়নে জননীর মুখের দিকে চাহিয়াই
[illegible]ড়াইয়া জননীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া
[illegible] মুখ লুকাইয়া পড়িয়া রহিল।

[illegible] পরে বিজয়মাধব পত্নী রাজলক্ষ্মীকে
[illegible]তিকার বিবাহ দেওয়াই স্থির করিলাম
[illegible]ঘরে জন্মগ্রহণ করলেও তার অন্তরটা
[illegible]ঙ্কীর্ণ নয়, সে কালই ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা
[illegible] প্রস্তুত হ'য়েছে।"

[illegible]ী কোনরূপ উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া
[illegible]লতিকার মত নেওয়া হ'য়েছে?"